পনেরটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পনেরটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

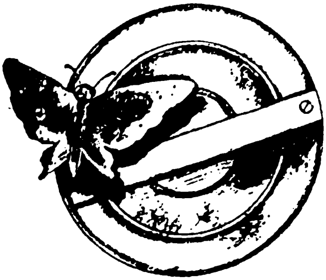

পনেরটি
শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস

আনন্দ

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১২

© শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-084-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

DASTI UPANYAS
[Novel]
by
Sirshendu Mukhopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

মূল্য : ৫০০ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পনেরটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস–
কাগজের বউ, ঘুনপোকা, সাঝের বেলা, ফুল চোর, দিন যায়, নীলু হাজারার হত্যারহস্য, রক্তের বিষ, জীবন পাত্র, অসুখের পরে, ছায়াময়ী, ক্ষয়, শিউলির গন্ধ, লাল নীল মানুষ, সুখ দুঃখ এবং ঘর জামাই নিয়ে প্রকাশিত হল বর্তমান সংগ্রহটি।
আশা করি, আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এটিও পাঠক সমাজে আদৃত হবে।

সূচিপত্র

কাগজের বউ ৯

ঘুনপোকা ৯০

সাঝের বেলা ১৫২

ফুল চোর ১৬১

দিন যায় ২২৪

নীলু হাজারার হত্যারহস্য ৩০১

রক্তের বিষ ৩৭৮

জীবন পাত্র ৪৪১

অসুখের পরে ৪৮৮

ছায়াময়ী ৫৫১

ক্ষয় ৬১৭

শিউলির গন্ধ ৬৫৭

লাল নীল মানুষ ৭৩৪

সুখ দুঃখ ৭৯৬

ঘর জামাই ৮০৫

গ্রন্থ-পরিচয় ৮৩১

কাগজের বউ

১

ছোঁচা শব্দটা কোত্থেকে এল মশাই? ছুঁচো থেকে নাকি? হাতটান শব্দটারই বা ইতিহাস কী? কিংবা দু' কান-কাটা কথাটাই বা অমন অপমানজক কেন?

অবশ্য অপমান কথাটারও কোনও মানে হয় না। অপমান মনে করলেই অপমান। আমার যা অবস্থা তাতে অপমান গায়ে মাখতে যাওয়াটাও এক লাটসাহেবি শৌখিনতা।

সুবিনয়দের পিছনের বারান্দায় আমি শুই। বারান্দাটা খারাপ নয়। বুক-সমান দেয়ালের গাঁথুনি, তার ওপরটা গ্রিল দেওয়া। বারান্দার অর্ধেকটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে খাওয়ার ঘর হয়েছে, বাকি অর্ধেকটায় এঁটো বাসনপত্র ডাঁই করা থাকে, মুখ ধোওয়ার বেসিন রয়েছে, কয়েকটা প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে খালি। এইসব বাক্সে বিদেশ থেকে কেমিকালস আসে। বিদেশের জিনিস বলে বাক্সগুলো বেশ মজবুত। দিনের বেলা প্যাকিং বাক্সগুলো, মোট তিনটে, একটার ওপর আর-একটা দাঁড় করানো থাকে। রাত্রিবেলা ওগুলো নামিয়ে আমি পাশাপাশি সাজিয়ে নিই। বাক্সগুলো সমান নয়, যার ফলে একটু উঁচু-নিচু হয়। তা হোক, তা হোক। আমার কিছু অসুবিধা হয় না। একেবারে মেঝেয় শোওয়ার চেয়ে এটুকু উচ্চতা মন্দ কী?

বারান্দার লাগোয়া পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে সুবিনয়ের বিধবা মা শোন খাটে, মেঝেয় শোয় ষোলো-সতেরো বছর বয়সের ঝি কুসুম। অন্য ঘরে সুবিনয় এক খাটে শোয়, অন্য খাটে দুই বাচ্চা নিয়ে সুবিনয়ের বউ ক্ষণা। সামনের দিকে আরও দুটো ঘর আছে। তার একটা সুবিনয়ের ল্যাবরেটরি, অন্যটা বসবার ঘর। কিন্তু সেইসব ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়ার কথা ওদের মনে হয়নি। সুবিনয়ের এক বোন ছিল এই সেদিন পর্যন্ত বিয়ে হচ্ছিল না কিছুতেই। যতই তার বিয়ের দেরি হচ্ছিল ততই সে দিনরাত মুখ আর হাত-পায়ের পরিচর্যা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। ছেলে-ছোকরা দেখলে কেমন হন্যের মতো হয়ে যেত, এবং শেষমেষ আমার মতো অপদার্থের দিকেও তার কিছুটা ঝুঁকে পড়ার লক্ষণ দেখে আমি বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ি। একদিন তো সে পরিষ্কার তার বউদিকে বলে দিল, এই শীতে উপলদা একদম খোলা বারান্দায় শোয়, তার চেয়ে খাওয়ার ঘরটায় শুতে দাও না কেন? এ কথা যখন হচ্ছিল তখন আমি চার-পাঁচ হাত দূরে বসে সুবিনয়ের মুখোমুখি খাওয়ার টেবিলে চা খাচ্ছি। চোর-চোখে তাকিয়ে দেখি, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ানো সুবিনয়ের বোন অচলার দিকে চেয়ে রান্নাঘরের ভিতরে টুলে-বসা ক্ষণা একটু চোখের ইঙ্গিত করে চাপা স্বরে বলল, উঃ হুঁ!

আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ঠিকই তো! খাওয়ার ঘরে দেয়ালের র‍্যাকে দামি স্টিলের বাসনপত্র, চামচ থেকে শুরু করে কত কী থাকে সরানোর মতো। এখানে আমাকে শোওয়ানো বোকামি। তা সে যাক গে। অচলার যখন ওইরকম হন্যে দশা, তখন আমার এ বাড়িতে বাস সে এক রাতে প্রায় উঠিয়ে দিয়েছিল আর কী! কোথাও কিছু না, মাঝরাতে একদিন দুম করে চলে এসেছিল বারান্দায়। বাথরুমে যাওয়ার প্যাসেজের ধারেই আমি শুই, মাঝরাতে বারান্দা দিয়ে বাথরুমে আনাগোনা করতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু অচলা বাথরুমে যায়নি, সটান এসে আমার প্যাকিং

বাপ্পের বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল। সেটা নিতান্ত মানবিক করুণাবশতও হতে পারে। কিন্তু তাইতেই আমার পাতলা ঘুম ভেঙে যেতে আমি 'বাবা গো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম ভূত ভেবে। অচলা সময় মতো পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে বিকট শব্দ করেছিল। গোলমাল শুনে তার মা উঠে এসে বারান্দায় তদন্ত করেন, আমি তাঁকে বলি যে আমি দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। তিনি তা বিশ্বাস করেননি এবং আমার উদ্দেশেই বোধহয় বলেন, এ সব একদম ভাল কথা নয়। কালই সুবিনয়কে বলছি।

সুবিনয়কে তিনি কী বলেছিলেন কে জানে, কিন্তু সুবিনয় ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। ঘামালে বিপদ ছিল। কারণ, সুবিনয়ের চেহারা দানবের মতো বিশাল এবং রাগলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কোনও ব্যাপার নিয়েই সে বড় একটা মাথা ঘামায় না। সর্বদাই সে এক ভাবনার ঘোরে বাস করে। জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তাকে কেউ কোনও কথা বললে সে ভারী বিরক্ত হয়। এই যে আমি তার বাড়িতে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, এটাও যে খুব বাঞ্ছিত ব্যাপার নয় কোনও গৃহস্থের কাছে তাও সে বোঝে না। সে সর্বদাই তার কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে আছে। মস্ত এক কোম্পানির চিফ কেমিস্ট, কিছু পেপার লিখে বৈজ্ঞানিক জগতেও নাম-টাম করেছে। প্রায়ই বিদেশে যায়। সুবিনয় বাংলাদেশের সেই লুপ্তপ্রায় স্বামীদের একজন যাদের বউ খানিকটা সমীহ করে চলে। স্ত্রী স্বামীকে সমীহ করে, এ ব্যাপারটা আমি আর কোথাও দেখিনি এ জীবনে। সুবিনয়ের এই কর্তৃত্বময় অস্তিত্বের দরুনই আমি এ বাড়িতে বেশ কিছুকাল টিকে আছি। সুবিনয় যে আমাকে তাড়ায় না তার একটা গূঢ় কারণও আছে।

তা বলে যেন কেউ মনে না করেন যে, আমার প্রতি সুবিনয় স্নেহশীল। সত্য বটে, স্কুলজীবনে আমরা সহপাঠী ছিলাম মিত্র ইনস্টিটিউশনে। গলায় গলায় ভাব ছিল তখন। কলেজে ও সায়েন্স নিল, আমি কমার্স। কোনওক্রমে বি কম পাশ করে আমি লেখাপড়া ছাড়ি, সুবিনয় সোনার মেডেল পেয়ে এগিয়ে গেল। আমরা ভিন্ন হয়ে গেলাম। দুই বন্ধুর একজন খুব কৃতী হয়ে উঠলে আর বন্ধুত্ব থাকে না, কমপ্লেকস এসে যায়।

এখন আমাকে সবাই অপদার্থ বলে জানে। কেবল দীর্ঘকাল আমি নিজেই সেটা বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, আমার প্রতিভা একদিন বিকশিত হবেই। আমি মোটামুটি ভাল গান গাইতে পারতাম, চমৎকার থিয়েটার করতাম, নাটক-ফাটকও লিখেছি এককালে উদ্বাস্তুদের দুঃখ নিয়ে, অল্পস্বল্প ছবি আঁকতে পারতাম, সবচেয়ে ভাল পারতাম কাদামাটি দিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরি করতে। এত বহুমুখী প্রতিভা নিজের ভিতরে দেখে আমার ধারণা ছিল, একটা না একটা লাইন ধরে আমি ঠিক উন্নতি করব, আর সবক'টা লাইনেই যদি উন্নতি করি তা হলে তো কথাই নেই। আরও অনেকেরই এককালে ধারণা ছিল। আমার বিচক্ষণ বাবা কিন্তু বরাবর বলে এসেছেন, এ ছেলের কিছু হবে না। এত দিকে মাথা দিলে কি কারও কিছু হয়?

আমার পারিবারিক ইতিহাসটি খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। আমার পাঁচ বছর বয়সে মা মারা গেলে বাবা আমার এক মাসিকে বিয়ে করেন। মায়ের পিসতুতো বোন। মাসির এক চোখ কানা আর দাঁত উঁচু বলে তাঁর বিয়ে হচ্ছিল না। আমি সেই মাসির কাছে মানুষ। বি কম পরীক্ষার কিছু আগে বাবা অপ্রকট হলেন। দুনিয়ায় তখন আমার মাসি, আর মাসির আমি ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু কেউ কারও ভরসা নই। মাসি বলত, তুই যদি চুরি ছ্যাঁচড়ামি গুন্ডামি বা ডাকাতি করেও দুটো পয়সা আনতে পারতিস।

বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে-সব উন্নতি হয় বলে শুনেছি তার কিছুই আমার হল না। হ্যাঁ, গান আমি এখনও আগের মতোই গাই, সুযোগ পেলে অভিনয়ও খারাপ করব না, আগের মতো নাটকও লিখতে পারি। ছবি কিংবা মাটির পুতুলও আঁকতে বা বানাতে পারি। কিন্তু সে সবও যেন কোথায় আটকে আছে, উন্নতি হয়নি। সিনেমায় নামতে গিয়েছিলাম। দু'-চারটে সিনেমায় চান্সও

পেলাম বটে ছোট ছোট ভূমিকায় কিন্তু তাকে সিনেমায় নামা বলে না ঠিক। দুটো-একটা চাকরিও পেয়েছিলাম, একটার কোম্পানি ক্লোজার হল, অন্যটায় অস্থায়ী চাকরি টিকল না। মাসির লেখাপড়া ছিল না তেমন। বাবা লোকান্তরিত হওয়ার পর মাসি বিস্তর সেলাই-ফোঁড়াই করে সংসার চালাতে গিয়ে একটা ভাল চোখকেও প্রায় খারাপ করে ফেলল। মাসি যখন কাঁদত তখন কিন্তু তার অন্ধ চোখেও জল পড়ত।

বিনা কাজে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। বেশ লাগত। কাজকর্ম না করতে করতে এক ধরনের কাজের আলসেমি পেয়ে বসেছিল। আড্ডার অভাব ছিল না। সংসারের ভাবনা একা মাসিকে ভাবতে দিয়ে আমি চৌপর দিন বাইরে কাটাতাম। নিছক সঙ্গী না জুটলে ময়দানের ম্যাজিক, খোলামাঠের ফুটবল বা ক্রিকেট, ইউসিস লাইব্রেরিতে ঢুকে ছবির ম্যাগাজিন দেখে সময় কাটাতাম। বাবা বাড়ি করে যাননি, ভাড়া বাকি পড়ায় একবার বাড়িওলা হুড়ো দিয়ে তুলে দিল। বুড়ো বাড়িওলা মারা গেছে, ছেলেরা লায়েক হয়েছে। তাদের অত মায়া-দয়া নেই। মহা আতান্তরে পড়ে মাসি তার লতায়-পাতায় সম্পর্কের এক বড়লোক ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে উঠল। ভাই মাসিকে তাড়াল না, গরিব আত্মীয়দের আশ্রয় দিলে বিস্তর কাজ আদায় করা যায়। কিন্তু সেখানে আমার ঠাঁই হল না। তাঁরা পরিষ্কারই বলে দিলেন, তোমার বোনপোকে রাখতে পারব না বাপু, বড়সড় ছেলে, নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে। এ কথা শুনে মাসি বলে, ওমা, বোনপো কী? ও আমার ছেলে, নিজের হাতে মানুষ করেছি যে! কিন্তু তারা কিছুতেই মত দিল না যখন মাসির তখন হাউ-হাউ করে কান্না। আমি মাসিকে অনেক স্তোকবাক্য দিয়ে তখনকার মতো ঠান্ডা করে কেটে পড়লাম। আমার যা হোক, কানা মাসিটা আমার তো না খেয়ে মরবে না। তবে সে বাড়িতে আমার যাতায়াত আছে, কয়েক বার নেমন্তন্নও খেয়েছি।

তখন হাওড়া-কদমতলা রুটের একটা প্রাইভেট বাসে কন্ডাক্টরি করি। সারাদিন পয়সার ঝনঝন, লোকের ঘেমো গা, গাড়ির চলা, তার মধ্যে কখনও ঘুণাক্ষরেও মনে পড়ত না যে, আমি বি কম পাশ বা এ কাজের চেয়ে একটা কেরানিগিরি পেলে অনেক ভাল হত। সে যা হোক, কন্ডাক্টরি কিছু খারাপ লাগত না। তবে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়ার সময়ে আমি বেশি সুবিধা করতে পারতাম না। আর একটা লাভও হত বেশ, প্যাসেঞ্জারদের মুখে নানা খবর শুনে শুনে দুনিয়া সম্পর্কে বিনা মাগনা অনেক জ্ঞানলাভও হয়ে যেত। কয়েক দিনের মধ্যেই এলাকার হেক্কোড়দের চিনে ফেললাম, তাদের কাছে টিকিট বেচার প্রশ্ন উঠত না, উলটে খাতির দিতে হত। মনাই ঘোষ ছিলেন এলাকার মাথা। মনে আছে একবার তিনি পঞ্চাননতলার মোড়ে বাস থামিয়ে নেমে গিয়ে লন্ড্রির জামা-কাপড় আনলেন, বাস ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। চোর, ছিনতাইবাজ, পকেটমার বিস্তর চেনা-জানা হয়ে গেল, আজও ও-সব জায়গায় গেলে দু'-চার কাপ চা বিনা পয়সায় লোকে ডেকে খাওয়ায়। আনাড়ি ছিলাম বলে প্রথম দিকে আমার ব্যাগ থেকে বার দুই খুচরো হাপিশ হয়েছে। পরের দিকে কাকের মতো চালাক হয়ে উঠি। বাস চালাত ধন সিং নামে একটা রাজপুত। জলের ট্যাঙ্কের কাছে একবার সে একটা ছোকরাকে চাপা দিলে রাস্তার লোক রে রে করে তাড়া করল। ভয়ে ধন সিংয়ের আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। পঞ্চাননতলার সরু রাস্তায় যে আপ-ডাউন বাস কী করে চলে সেইটাই লোকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না, আর সেই মারাত্মক ভিড়ের সরু রাস্তায় ধন সিং বাসের গতি বোধকরি ত্রিশ-চল্লিশ মাইল তুলে দিল। কোনও স্টপে গাড়ি দাঁড়াচ্ছে না। প্যাসেঞ্জাররা প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও। এই স্টুপিড! এই উল্লুকের বাচ্চা! এই শুয়োরের বাচ্চা! কে শোনে কার কথা! আমরা দুই কন্ডাক্টর, আমি আর গোবিন্দ, দুই দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বিপদ দেখলেই লাফাব। ধন সিং কদমতলা পর্যন্ত উড়িয়ে নিল বাস। তারপর যেই থামল, অমনি কোত্থেকে যে শয়ে শয়ে লোক জুটে গেল চারধারে কে জানে! পালানোর পথ ছিল না। ধন সিং প্রচণ্ড মার খেয়ে আধমরা হয়ে হাসপাতালে গেল, আমি আর গোবিন্দ ঠ্যাঙানি খেয়ে কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে পড়ে রইলাম

রাস্তায়। মুখ-টুখ ফুলে, গায়ে গতরে একশো ফোড়ার ব্যথা হয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা।

অনেক পরে চেনা একটা হোটেলের বাচ্চা বয়গুলো এসে আমাদের জলটল দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। দু'জনে কষ্টেসৃষ্টে চেনা দোকানে গিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে বসলাম। ব্যাগ দু'জনেরই হাপিশ হয়ে গেছে, জামা-টামা ছিঁড়ে একাকার, গোবিন্দর চটিজোড়াও হাওয়া। পাবলিক প্যাঁদালে তো কিছু করার নেই। রাগও করা যায় না, কার মুখ মনে করে রাগ করব? গোটা জীবন আর তাবৎ দুনিয়ার ওপর রাগে চোখে জল আসে শুধু। গোবিন্দ আর আমি একটা করে কোয়ার্টার রুটি আর ছোট সানকির মতো কলাই করা প্লেটে হাফ প্লেট করে মাংস নিয়ে বসলাম। মাংস মুখে দিয়েই গোবিন্দ উঁহু উঁহু করে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, জিভটা কেটে এই ফুলেছে মাইরি, নুন ঝাল পড়তেই যা চিড়িক দিয়েছে না! খাই কী করে বল তো!

এ সব কথা যখন হচ্ছে তখনই ছোকরা বয়টা এসে বলল, গোবিন্দদা, আপনার দেশ থেকে আপনার খোঁজে একটা লোক অনেক বার এসে ঘুরে গেছে। ওই আবার এসেছে, দেখুন।

গোবিন্দ মুখ তুলল, আমিও দেখলাম, বুড়ো মতো একটা লোক খুব বিষণ্ণ মুখের ভাব করে এসে বেঞ্চে বসে মুখের ঘাম মুছল সাদা একটা ন্যাকড়া পকেট থেকে বের করে।

গোবিন্দ বলল, তারক জ্যাঠা, খবর-টবর কী? খারাপ নাকি?

হ্যাঁ বাবা। তোমার পিতৃদেব—

গোবিন্দ আঁতকে উঠে বলল, আর বলবেন না, আর বলবেন না।

লোকটা ভড়কে থেমে গেল। আর দেখলাম, গোবিন্দ গোগ্রাসে মাংস-রুটি খাচ্ছে জিভের মায়া ত্যাগ করে। খেতে খেতেই বলল, ও শুনলেই খাওয়া নষ্ট। এখন পেটে দশটা বাঘের খিদে। একটু বসুন, ও খবর পাঁচ মিনিট পরে শুনলেও চলবে। শত হোক, হিন্দুর ছেলে তো! ও খবর শুনলে খাই কী করে!

খাওয়ার শেষে গোবিন্দ উঠে দাম-টাম দিয়ে এল, বলল, চলুন, দেশে যেতে হবে তো?

তারক জ্যাঠা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা তো হবেই। পরশুদিনের ঘটনা বাবা, মাঠ থেকে ফিরে তোমার বাবামশাই হঠাৎ উঠোনে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কত জল, পাখা, ওঝা, বদ্যি, হাঃ—

গোবিন্দ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, উপল, খবরটা ভাল। তারপর গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, হক্কের মরা মরেছে, জ্যাঠা। আর বেঁচে থেকে হতটা কী? দুনিয়া তো ছিবড়ে হয়ে গিয়েছিল। এই বলে সে আমার দিকে চেয়ে বলল, উপল, তুইও চল। গায়ের ব্যথাটা ঝেড়ে আসবি। দেশে আমাদের ধানজমি আছে। বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল বদমাইশির জন্য, তাই ফিরতে পারছিলাম না। নইলে কোন শালা মরতে কন্ডাক্টরি করে।

বিনা নোটিশে চাকরি ছেড়ে দু'জনে সেই রাতে কেটে পড়লাম হাওড়া জেলার শিবগঞ্জে।

আমার স্বভাব বসতে পেলেই ঠেলেঠুলে শুয়ে পড়া। গোবিন্দর দেশটা বেশ ভালই। বাগনান থেকে বাসে ঘণ্টা কয়েকের রাস্তা। পৌঁছে গেলে মনে হয়, ঠিক এ রকমধারা জায়গাই তো এতকাল খুঁজছিলাম। গোবিন্দদের ধানজমি বেশি না হোক, ওদের দু'বেলা ভাতের অভাব নেই। বিরাট একটা নারকোল বাগান আছে। মেটে দোতলা বাড়িতে বেশ মাঝারি বড় সংসার।

দু'বেলা খাওয়ার-শোওয়ার ভাবনা নেই, আমি তাই নিশ্চিন্তে সেখানে শেকড় চালিয়ে দিলাম। ভরসা হল, বাকি জীবনটা এখানেই কেটে যাবে বুঝি! গোবিন্দ তখন প্রায়ই বলত, দাঁড়া তোকে এ দিকেই সেটল করিয়ে দেব। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই গোবিন্দ বিয়ে করে বসল, আর তার দু'মাস বাদেই গোবিন্দর মুখ হাঁড়ি। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। বুঝলাম, ওর বউ বুদ্ধি দিয়েছে। তবু গায়ে না-মেখে আমি আরও এক মাস কাটিয়ে দিলাম। মোট ছ' মাস পর গোবিন্দর বড় ভাই একদিন খাড়ুবেড়েতে যাত্রা দেখে ফেরার পথে গহিন রাতে রাস্তায় টর্চ ফেলে

ফেলে আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে নরমে গরমে বলেই ফেলল, এ বয়সটা তো বসে খাওয়ার বয়স নয় গো বাপু। গাঁ-ঘরে কাজকর্মই বা কোথায় পাবে। বরং কলকাতার বাজারটাই ঘুরে দেখোগে।

গোবিন্দর বড় ভাই নন্দদুলালের খুব ইচ্ছে ছিল তার মেয়ে কমলিনীকে আমি বিয়ে করি। কিন্তু কমলিনীর বয়স মোটে বারো, সুশ্রীও নয়, তা ছাড়া আমারও বিয়ের ব্যাপারটা বড় ঝামেলা বলে মনে হয়, তাই রাজি হইনি, ঘরজামাই রাখলেও না হয় ভেবে দেখতাম। তা সে প্রস্তাবও নয়, বরং কমলিনীর মা আমাকে প্রায়ই কাজ খোঁজার জন্য হুড়ো দিত, চাষবাস দেখতে পাঠাত। বেলপুকুর বাজারে গিয়ে শুকনো নারকোল বেচে এসেছি কতবার। আখের চাষ হবে বলে গোটা একটা খেত নাড়া জ্বেলে আগুনে পোড়াতে হয়েছিল। এত সব কাজকর্ম আমার ভাল লাগে না। বউ হলে সে আরও তাড়া দেবে সারা জন্ম।

এক বর্ষার রাতে গোবিন্দদের গোলাঘরে চোরে সিঁধ দিল। বিস্তর ধান লোপাট। সকালবেলা খুব চেঁচামেচি হল, তারপর থিতু হয়ে সবাই বসে এক মাথা হয়ে ঠিক করল যে, এবার থেকে আমাকে সারা রাত বাড়ি চৌকি দিতে হবে। একটা নিষ্কর্মা লোক সারা দিন বসে খাবে, কোনও কাজে লাগবে না, এ কি হয়?

দিন পনেরো পাহারা দিতেও হল। এক রাতে ফের চোর এল। আমার চোখের সামনে পরিষ্কার পাঁচ-ছ'জন কালো কালো লোক। তাদের দু'-একজন আমার মুখ চেনা। দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বসে লণ্ঠন পাশে নিয়ে একটা লম্বা লাঠি উঠোনে মাঝে মাঝে ঠুকছিলাম, দুটো দিশি কুকুর সামনে ঝিমোচ্ছে। এ সময়ে এই কাণ্ড। চোর দেখে ভিরমি খাই আর কী। লাঠি যে মানুষের কোন কাজে লাগে তা তখনও মাথায় সেঁধোচ্ছে না। চোর ক'জন এসে সোজা আমার চারধারে দাঁড়িয়ে গেল, একজন বলল, উপল শালা, মেরে মাঠে পুঁতে দিয়ে আসব, মনে থাকে যেন। কুকুর দুটো দু'বার ভুক ভুক করে হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে লাগল চোরদের খাতির দেখানোর জন্য। দিশি কুকুরদের বীরত্ব জানা আছে। আমিও তাদের দেখে কায়দাটা শিখে গেলাম, এক গাল হেসে বললাম, আরে তোমরা ভাবো কী বলো তো, অ্যাঁ? পাহারা কি আসলে দিই? গুঁতোর চোটে পাহারা দেওয়ায়। যা করার চটপট সেরে নাও ভাই সকল, আমি চার দিকে চোখ রাখছি।

চোরেরা যখন মহা ব্যস্ত ঠিক তখনই আখের বুঝে আমি লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে লম্বা দিলাম। নইলে পরদিন আমার ওপর দিয়ে বিস্তর ঝামেলা যেত।

তা সেই লাঠি আর লণ্ঠন ছাড়া তখন আর আমার কোনও মূলধন ছিল না। আফসোস হল, চোরদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে যদি কিছু নগদ বা ঘটিবাটি গোবিন্দদের বাড়ি থেকে হাতিয়ে আনতে পারতাম তো বেশ হত।

আমার বাবা সারা জীবনটাই ছিলেন ডাকঘরের পিয়োন, শেষ জীবনে সর্টার, আর এক থাক উঁচুতে উঠতে পারলে তাঁকে ভদ্রলোক বলা চলত, তা তিনি উঠতে পারেননি। বিস্তর ধারকর্জ করে খাওয়া-দাওয়া ভাল করতেন। ওই এক শখ ছিল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর অর্ধেকই প্রায় ফৌত হয়ে গিয়েছিল ওই কর্মে। সারাটা জীবন তাঁকে কেবল টাকা খুঁজতে দেখেছি। অন্য সব টাকার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বাড়ির আনাচে কানাচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশের মতো সার্চ চালাতেন। বিছানার তোশক উলটে, জাজিম উঁচু করে চাটাইয়ের তলা পর্যন্ত, ওদিকে কাঠের আলমারির মাথা থেকে শুরু করে রান্নাঘরের কৌটো বাউটো, পুরনো চিঠিপত্রের বান্ডিলের মধ্যে পরম উৎসাহে তিনি টাকা বা পয়সা খুঁজতেন। কদাচিৎ এক আধটা দশ বা পাঁচ পয়সা পেয়ে আনন্দে 'অ্যাই যে, অ্যাই যে, বলেছিলুম না!' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। ঘরের গোছগাছ হাঁটকানোর জন্য মাসি খুব রাগ করতেন বাবার ওপর। বাবা সে-সব গায়ে মাখতেন না, বরং সুর করে মাসিকে খ্যাপাতেন, 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ...।' কানা মাসির নামই হয়ে গিয়েছিল কানামাছি।

বাবার কাছ থেকে ওই একটা স্বভাব আমি পেয়েছি। আমারও স্বভাব যখন তখন যেখানে

সেখানে অবসর পেলেই পয়সা খোঁজা, হাটে-বাজারে, রাস্তায়-ঘাটে ঘর-দোরে প্রায় সময়েই আমি হাঁট পাট করে পয়সা খুঁজি। সিকিটা আধুলিটা পেয়েও গেছি কখনও সখনও। না পেলেও ক্ষতি নেই, খোঁজাটার মধ্যেই একটা আনন্দ আছে, যেমন লোকে খামোকা ঘুড়ি উড়িয়ে বা মাছ ধরতে বসে আনন্দ পায় এ অনেকটা সে রকমই আনন্দ।

একবার হরতালের আগের দিন বিকেলে বাবা পরদিনের বাজার করতে গেছেন। তখনও বুড়ো বাড়িওলা বেঁচে। বাজারে বাবার সঙ্গে দেখা হতেই বুড়ো বাড়িওলা আঁতকে উঠে বললেন, এ কী বাপু, তোমাকে না আজ সকালেই বাজার করে ফিরতে দেখলুম! আবার এ বেলা বাজারে কেন বাবা? বাবা মাথা চুলকে বললেন, কাল হরতাল কিনা, তাই কালকের বাজারটা সেরে রাখছি। শুনে বুড়ো রেগেমেগে খেঁকিয়ে উঠলেন, হরতাল ছিল তো হরতালই হত, শাকভাত নুনভাত কি মুড়ি-টুড়ি চিবিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতে না! অ্যাঁ? এ কী ধরনের অমিতব্যয় তোমাদের, দিনে দু'-দুবার বাজার! এ বয়সেই যদি দুটো পয়সা রাখতে না পারো তো কি গুচ্ছের ছেলেপুলে হয়ে গেলে তখন পারবে? দুটো পয়সার মর্ম যে কবে বুঝবে তোমরা! বয়স হয়ে গেলে কপাল চাপড়াবে।

সেই থেকে বাবা একটা ঠাট্টার কথা পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সময়েই খুক খুক করে হাসতে হাসতে বললেন, দুটো পয়সা রাখতে না পারলে...!

কিন্তু ঠাট্টার কথা হলেও, ওই দুটো পয়সা রাখতে না পারায় কানা মাসিকে ভাইয়ের বাড়িতে ঝিগিরি করতে হচ্ছে। আর আমার হাতে হারিকেন।

বাস্তবিকই হারিকেন আর লাঠি সম্বল করে গোবিন্দর বাড়ি থেকে যেদিন পালাই সেই দিন রাতে ভারী একটা দুঃখ হচ্ছিল আমার। বলতে কী গোবিন্দর বাড়িতে থাকতে আমি দুটো পয়সা করেছিলাম। প্রায় দিনই এটা-সেটা নিয়ে গোপনে বেচে দিতাম, ঘরের মেঝেয় একটা সোনার মাকড়ি কুড়িয়ে পেয়ে রেখে দিয়েছিলাম, দু'-চারটে পয়সা কুড়িয়ে-টুড়িয়ে একটা বাঁশের চোঙায় জমিয়েও রেখেছিলাম। সেই গুপ্ত সম্পদ গোবিন্দদের পশ্চিমের বাতায় গোঁজা আছে। আনতে পারিনি।

২

কাল রাতে সুবিনয় আর ক্ষণা অনেকক্ষণ আমাকে নিয়ে কথা বলাবলি করছিল। ক্ষণা চায় না যে আমি আর এক দিনও এ বাড়িতে থাকি। কথায় কথায় সে তার বরকে বলল, বাজার-ফেরত পঁয়ত্রিশটা পয়সা তুমি খাওয়ার টেবিলে রাখলে আজ সকালে, নিজের চোখে দেখা আমার। পনেরো মিনিট বাদে গিয়ে দেখি পয়সা হাওয়া। তোমার ওই দু' কান-কাটা ছোঁচা বন্ধুটির কিন্তু বেশ ভালরকম হাতটান আছে।

সুবিনয় ঘুমগলায় বলল, পয়সা-কড়ি সরিয়ে রাখলেই হয় সাবধান মতো।

আহা, কী কথার ছিরি? সারাক্ষণ ঘরে একটা চোর ছোঁচা বসবাস করলে কাঁহাতক সাবধান হবে মানুষ? তার চেয়ে ওকে এবার সরে পড়তে বলো, অনেক দিন হয়ে গেছে। আজ তুমি বাজার করলে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই তো তোমার ওই প্রাণের বন্ধুই বাজার করে, বাজারে কত পয়সা হাতায় তার হিসেব কে করছে?

এই রকম সব কথা হচ্ছিল, আমি প্যাকিং বাক্সের বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজায় কান পেতে সব শুনছি। খুবই অপমানজনক কথা। কিন্তু কতটা অপমানজনক তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া, আমাকে শুনিয়েও তো বলেনি যে খামোকা অপমান বোধ করতে যাব!

নিশুত রাতে আমার বিছানায় শুয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে এক ভাঙা চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুম ছুটে

গেল। কী করে বোঝাই এদের যে, আমারও দু'-চারটে পয়সাকড়ির দরকার হয়! আমার সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, আমার আজকাল বড় খিদের ভয়। সারা দিন আমার পেটে একটা খিদের ভাব চুপ করে বসে আছে। ভরা পেটেও সেই খিদের স্মৃতি। কেবল ভয় করে, আবার যখন খিদে পাবে তখন খেতে পাব তো!

আমার আর-একটা সমস্যা হল, পয়সা। পয়সা খুঁজতে খুঁজতে আমার জীবনটা গেল। সেই যে লণ্ঠন আর লাঠি হাতে গোবিন্দদের বাড়ি থেকে নিশুত রাতে বেরিয়ে পড়লাম, সেই থেকে পয়সা খোঁজার বিরাম নেই। পয়সাও যে কত কায়দায় আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে, জীবনভোর লুকোচুরি খেলছে আমার সঙ্গে তা বলে শেষ হয় না।

লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে সেই পালানোর পর দু'দিন বাদে বাগনানের বাসের আড্ডায় তিনটে ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। তাদের ব্যাবসাপত্র খারাপ নয়, চুরি, ছিনতাই আর ছোটখাটো ডাকাতি করে তাদের ভালই চলে। অনেক বলে কয়ে ভিড়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। তারা আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে, বিস্তর শাসিয়ে সাবধান করে দিল, বেগরবাঁই করলে জান যাবে।

বাগনান বাজারে এক দুপুরে বসে আছি, ছোট্ট একটা খুকি তার বাচ্চা ঝিয়ের সঙ্গে দোকানের সওদা করতে এসেছে। ছ্যাঁচোড়দের একজন কদম বলল, ওই খুকিটা হল হোমিয়ো ডাক্তার কালীপদ ঘোষের ছোট মেয়ে, কানে একজোড়া সোনার বেলফুল দেখা যাচ্ছে! দেখবে নাকি হে উপল ভদ্র?

ওরা কেন যে আমার নামের সঙ্গে ভদ্র কথাটা জুড়ে নিয়েছে তা ওরাই জানে। প্রস্তাব শুনে আমার হাত-পা ঝিমঝিম করছিল। আসলে আমার সব কাজে বাগড়া দেওয়ার জন্য একজন সং আছে। সে আমার বিবেকবুড়ো। যখন-তখন এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করে রাজ্যের হিতকথা ফেঁদে বসে। তাকে না পারি তাড়াতে, না পারি এড়াতে।

ছ্যাঁচোড়দের অন্য একজন হাজু আমাকে জোর একটা চিমটি দিয়ে বলল, দু'দিন ধরে খাওয়াচ্ছি তোমাকে, সে কি এমনি? যাও কাজে লেগে পড়ো। ধরা পড়ে মার খাও তো সেও এ লাইনের একটা শিক্ষা। মারধর বিস্তর খেতে হবে। বাবুয়ানি কীসের?

সত্যিই তো। আমার যে মাঝে মাঝে এক পাগলাটে খিদে পায়। সেই সব খিদের কথা ভেবে বড় ভয় পাই। কাজে না-নামলে কেউ খেতে দেবে কেন? উঠে পড়লাম।

জানা আছে, কালীপদ ঘোষের মেয়ে, কাজেই একটা সুবিধে। অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটিতে খানিকটা বনস্পতি কিনে মেয়েটা রাস্তায় পা দিতেই গিয়ে বললাম, ও খুকি, কালীপদদার কাণ্ডখানা কী বলো তো! পেট ব্যথার একটা ওষুধ কবে থেকে করে দিতে বলছি।

খুকি কিছু অবাক হয়ে বলল, বাবা তো খড়্গপুরে গেছে।

খুশি হয়ে বলি, আমাকে চিনতে পারছ তো? আমি রামকাকা, লেভেল ক্রসিং-এর ধারে রঘুদের বাড়ি থাকি। চেনো?

খুকি মাথা নাড়ল দ্বিধাভরে। চেনে।

আমি বললাম, তোমার বাবা কয়েকটা জিনিস চেয়ে রেখেছিল আমার কাছে, দেব দিচ্ছি করে আর দেওয়া হয়নি। মহীনের দোকানে রেখে দিয়েছি, নিয়ে যাবে এসো।

বলে বাজারের ভিতর দিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যাই। ঝি মেয়েটা দুনিয়া কিছু বেশি চেনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, ও বিন্তি যাসনে, এ লোকটা ভাল না।

ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে এক ধমক মারলাম, মারব এক থাপ্পড় বদমাশ ছোটলোক কোথাকার! এই সেদিনও কালীপদদা বলছিল বটে, বাচ্চা একটা ঝি রেখেছে সেটা চোর। তোর কথাই বলছিল তবে।

ঝি মেয়েটা ভয় খেয়ে চুপ করে গেল। মাথাটা আমার বরাবরই পরিষ্কার। মতলব ভালই খেলে।

খানিকটা ভয়ে, খানিকটা বিশ্বাসে খুকিটা এল আমার সঙ্গে, ঝি মেয়েটাও। বাজারের দোকানঘরের পিছু দিকটায় একটা গলি মতন। মুদির দোকান থেকে একটা ঠোঙায় কিছু ত্রিফলা কিনে এনে খুকির হাতে দিয়ে বললাম, এইটে বাবাকে দিয়ে আমার কথা বোলো, তা হলেই হবে। সবই বলা আছে।

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল, ঠোঙা হাতে আমাকে অবাক হয়ে দেখছিল। পিছু ফিরতেই আমি ফের ডেকে বললাম, ও বিন্তি, তোমার বাপ-মায়ের কি আক্কেল নেই! ওইটুকু মেয়ের কানে সোনার দুল পরিয়ে বাড়ির বার করেছে! এসো, এসো, ওটা খুলে ঠোঙায় ভরে নাও। কে কোথায় গুন্ডা বদমাশ দেখবে, দু' থাপ্পড় দিয়ে কেড়ে নেবে। কালও ছিনতাই হয়েছে এখানে।

মেয়েটা কাঠ হয়ে আছে। ঝি মেয়েটা ঝেঁঝে উঠল, কেন খুলবে, অ্যাঁ? চালাকির আর জায়গা পাওনি?

তাকে ফের একটা ধমক মারলাম। কিন্তু বিন্তিও দুল খুলতে রাজি নয়। মাথা নেড়ে বলল, না, খুলব না। সদ্য কান বিঁধিয়েছি, দুল খুললে ছ্যাঁদা বুঁজে যাবে।

কথাটা আমারও যুক্তিযুক্ত মনে হল। এ অবস্থায় ওর কান থেকে দুল খুলি কী করে?

ছ্যাঁচোড়দের তিন নম্বর হল পৈলেন। সে কম কথা আর বেশি কাজের মানুষ। আমি যখন খুকিটিকে তার ঝি সমেত চলে যেতে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি, ওরাও চলে যাচ্ছে, ঠিক সে সময়ে পৈলেন এসে গলির মুখটা আটকে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, রোগা কিন্তু পাকানো শক্ত চেহারা। কলাকৌশলের ধার দিয়েও গেল না। ঝি মেয়েটাকে একখানা পেল্লায় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, চেঁচালে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব।

সেই দৃশ্য দেখে বিন্তি থর থর করে কাঁপে, কথা সরে না। এক-একটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে পৈলেন পুট পুট করে দুটো বেলকুঁড়ি তার কান থেকে খুলে বলল, বাড়ি যাও, কাউকে কিছু বললে কিন্তু মেরে ফেলব।

রেল স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পৈলেন আমাকে বলল, সব জায়গায় কি আর কৌশল করতে আছে রে আহাম্মক? গায়ের জোর ফলালে যেখানে বেশি কাজ হয়, সেখানে অত পেঁচিয়ে কাজ করবি কেন?

হক কথা।

বেলকুঁড়ি দুটো বেচে যে পয়সা পাওয়া গেল তার হিস্যা ওরা আমাকে দিল না, আমার আহাম্মুকিতেই তো ব্যাপারটা নষ্ট হচ্ছিল প্রায়।

এক দিন পাঁশকুড়া-হাওড়া ডাউন লোকালে তক্কে তক্কে চারমূর্তি উঠেছি। শনিবার সন্ধে, ভিড় বেশি নেই। এক কামরায় একজোড়া বুড়োবুড়ি উঠেছে। বুড়ির গায়ে গয়নার বন্যা। ইদানীং কারও হাতে মোটা বালা সমেত ছ'গাছা করে বারোগাছা চুড়ি, গলায় মটরদানা হার বা কানে ঝাপটা দেখিনি। আঙুলে অন্তত পাঁচ আনি সোনার দুটো আংটি। বুড়োর হাতে ঘড়ি, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি। এ যেন চোর-ছ্যাঁচোড়দের কাছে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়ে বেরোনো।

ফাঁকা ফাঁকা কামরায় বুড়ো উসখুস করছে। মুখোমুখি আমরা বসে ঘুমের ভান করে চোখ মিটমিট করে সব দেখছি। বুড়ো চাপা গলায় বলল, এত সব গয়না-টয়না পরে বেরিয়ে ভাল কাজ করোনি। ভয়-ভয় করছে।

বুড়ি ধমক দিয়ে বলল, রাখো তো ভয়! গা থেকে গয়না খুলে রেখে আমি কোনও দিন বেরিয়েছি নাকি? ও সব আমার ধাতে সইবে না।

বুড়ি ঝাঁপি থেকে স্টিলের তৈরি ঝকঝকে পানের বাটা বের করে বসল। বাটাখানা চমৎকার। বারোটা খোপে বারো রকমের মশলা, মাঝখানে পরিষ্কার ন্যাতায় জড়ানো পানপাতা। দামি জিনিস।

পৈলেন আর হাজু গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, আমি আর কদম কামরার দু'ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পৈলেনের পিস্তল আছে, হাজুর ছুরি। কদম নলবন্দুক হাতে ওধার সামলাচ্ছে। কী জানি কেন, আমার হাতে ওরা অস্ত্রশস্ত্র কিছু দেয়নি। কেবল ধারালো দুটো ব্লেড আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরতে শিখিয়ে দিয়েছে হাজু, বলেছে, যখন কাউকে ব্লেড ধরা হাতে আলতো করে গালে-মুখে বুলিয়ে দিবি, তখন দেখবি কাণ্ডখানা। রক্তের স্রোত বইবে।

পৈলেন পিস্তল ধরতেই বুড়ো বলে উঠল, ওই যে দেখো গো, বলেছিলুম না! ওই দেখো, হয়ে গেল।

বুড়ি পানটা মুখে দিয়ে পৈলেনের দিকে তাকিয়ে বলল, এ মিনসেটাই ডাকাত নাকি! ওমা, এ যে একটু আগেও সামনে বসে ঝিমোচ্ছিল গো!

বুড়ো আস্তে করে বলল, এখন ঝিমুনি কেটে গেছে। সামলাও ঠ্যালা।

বুড়ি ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে, আমি সামলাব কেন তুমি পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকতে? এককালে তো খুব ঠ্যাঙা-লাঠি নিয়ে আবগারির দারোগাগিরি করতে! এখন অমন মেনিমুখো হলে চলবে কেন?

পৈলেন ধৈর্য হারিয়ে বলল, অত কথার সময় নেই, চটপট করুন। আমাদের তাড়া আছে।

বুড়ি ঝংকার দিল, তাড়া আছে সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু গয়না আমি খুলছি না। তাড়া থাকলে চলে যাও।

হাজু 'চপ' বলে একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে হাতের আধ-হাত দোধার ছোরাটা বুড়োর গলায় ঠেকিয়ে বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি গয়না খুলতে। যদি দেরি হয় তো এই বুড়োমানুষটার হয়ে যাবে দিদিমা। বিধবা হবেন।

বুড়ি জর্দা আটকে দু'বার হেঁচকি তুলে হঠাৎ হাঁউড়ে মাউড়ে করে কেঁদে উঠে চেঁচাতে লাগল, ওমা গো, ওগো তোমরা সব দেখো, কী কাণ্ড। বুড়োটাকে মেরে ফেলল যে!

কামরায় মোট জনা কুড়ি লোকও হবে না। এধার-ওধার ছিটিয়ে বসে ছিল। কেউ নড়ল না। সবাই অন্যমনস্ক হয়ে কিংবা ভয়ে পাথর হয়ে রইল। কেবল দুটো ছোকরা টিটকিরি দিল কোথা থেকে, দাদাদের কমিশন কত? একজন বলল, ও দাদা, অথরিটি কত করে নেয়? সব বন্দোবস্ত করা আছে, না?

গলায় ছোরা-ঠেকানো অবস্থায় বুড়ো তখন তম্বি করছে, কী ব্যাপার বলো তো তোমার! গা করছ না যে? পাঁচ মিনিটের আর কত বাকি আছে শুনি। শিগগির গয়না খোলো।

বুড়ি তখনও জর্দার ধক সামলাতে পারেনি। তিন-তিনটে হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, খুলতে বললেই খুলব, না? এ সব গয়না ফের আমাকে কে তৈরি করে দেবে আগে বলো! তুমি দেবে?

দেব, দেব। শিগগির খোলো।— বুড়ো তাড়া দেয়।

কিন্তু বুড়ি তবু গা করে না। কষ্টেসৃষ্টে একগাছা চুড়ি ডান হাত থেকে আঙুলের গাঁট পর্যন্ত এনে বলে, সেই কবে পরেছিলুম, এখন তো মোটা হয়ে গেছি, এ কি আর খোলা সহজ?

হাজু তার ছোরাটা এগিয়ে দিয়ে পিস্তলটা পৈলেনের হাত থেকে নেয়। পৈলেন ছোরাটা চুড়ির ফাঁকে ঢুকিয়ে এক টানে কেটে নেয়। দিদিমা চেঁচাতে থাকেন ভয়ে, কিন্তু পৈলেনের হাত পাকা, কোথাও একটুও ছড়ে যায়নি। পৈলেন পটাপট চুড়িগুলো কাটতে থাকে।

দিদিমা দাদুর দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, কথা দিলে কিন্তু! সব গয়না ঠিক এ রকম তৈরি করে দিতে হবে। তখন নাকিসুরে বলতে পারবে না, এঁখঁন রিঁটাঁয়াঁর কঁরেঁছি, কোঁখেঁকেঁ দেঁবঁ!

দেব, দেব।

দিদিমা তখন চার দিকে তাকিয়ে লোকজনের মুখ চেয়ে বলে, শুনে রেখো তোমরা সব, সাক্ষী রইলে কিন্তু। উনি বলেছেন সব ফের গড়িয়ে দেবেন।

পৈলেন গোটা চারেক চুড়ি ততক্ষণে খুলে ফেলেছে কেটে, চমৎকার কাজ হচ্ছে। হাজু বাঁ হাত বাড়িয়ে বুড়ো লোকটার হাতঘড়ি খুলে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল, এবার গলার কাছে পাঞ্জাবির সোনার বোতামের প্রথমটা খুলে ফেলেছে। আমার কিছু করার নেই, দাঁড়িয়ে দেখছি। বলতে কী ট্রেনের কামরায় ডাকাতির কথা বিস্তর শুনলেও চোখে কখনও দেখিনি সে দৃশ্য। তাই প্রাণভরে দেখে নিচ্ছিলাম।

বুড়ি ফের দুটো হেঁচকি তুলে বুড়োর দিকে চেয়ে বলল, পিস্তলের নল মাথায় ঠেকিয়ে বোকার মতো বসে আছ কী? বোতামটা নিজেই খুলে দাও, নইলে ও মিনসে যেভাবে বোতাম খুলছে পুরনো পাঞ্জাবিটা না ফেঁসে যায়। আর প্রেশারের বড়ি থাকলে দাও তো, খেয়ে ফেলি। মাথাটা কেমন করছে। দুটো বড়ি দিয়ো।

এ সব কথাবার্তার মাঝখানেই হঠাৎ একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল কী করে। মাঝখানের ফাঁকা বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ যাবৎ একটা লোক হাকুচ ময়লা একটা চাদরে আগাপাশতলা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। এই সব গণ্ডগোলে বোধহয় এতক্ষণে কী করে তার ঘুম ভেঙেছে। চাদরটা সরিয়ে মস্ত একটা গোলপানা মুখ তুলে লোকটা তাকাল। চোখদুটো টকটকে লাল, নাকের নীচে মস্ত ভুঁড়ো গোঁফ, গালে বিজবিজে কালো দাড়ি। লাল চোখে কয়েক পলক দৃশ্যটা দেখেই লোকটা হঠাৎ ঘুমের ধন্দভাব ঝেড়ে ফেলে তড়াক করে উঠে বসে বিকট গলায় বলে উঠল, মানকে বলে সাবাস!

কথাটার অর্থ কী তা আমি আজও জানি না। কিন্তু ওই দুর্বোধ্য বিকট চিৎকারে হাজুর নার্ভ নষ্ট হয়ে গেল বুঝি। পৈলেনের পিস্তলটাও বোধহয় সে আগে বড় একটা হাতে পায়নি। পিস্তল হাতে থাকলে আনাড়িদের যেমন হয় হাজুরও তেমন হঠাৎ ফালতু বীরত্ব চাগিয়ে উঠল। বুড়োকে ছেড়ে ঘুরে হুড়ুম করে আচমকা একটা গুলি ছুড়ল সে। গুলিটা গাড়ির ছাদে একটা ঘুরন্ত পাখায় পটাং করে লাগল শুনলাম। যে লোকটা চেঁচিয়েছিল সে লোকটা হঠাৎ দ্বিগুণ চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে চার দিকে দাপাতে লাগল, মেরে ফেলেছে রে, মেরে ফেলেছে রে! তখন দেখি, লোকটার পরনে একটা খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। পুঁটলির মতো একটা ভুঁড়ি সামনের দিকে দাপানোর তালে তালে নড়ছে। পৈলেন ছোরা হাতে বাঁই করে ঘুরে দৃশ্যটা দেখল। আমার আজও সন্দেহ হয়, পৈলেন লোকটাকে নির্ঘাৎ পুলিশ বলে ভেবেছিল। নইলে এমন কিছু ঘটেনি যে পৈলেন মাথা গুলিয়ে ফেলে হঠাৎ দৌড় লাগাবে। আমি আজও বুঝি না, পৈলেনের সেই দৌড়টার কী মানে হয়। দৌড়ে সে যেতে চেয়েছিল কোথায়? চলন্ত গাড়ি থেকে তো আর দৌড়ে পালানো সম্ভব নয়।

তবু ছোরাটা উঁচিয়ে ধরে পৈলেনও এক সাংঘাতিক আতঙ্কের স্বরে 'যে ধরবি মেরে ফেলব, জান লিয়ে লেবো শ্শালা...জান লিয়ে লেবো—রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে বলে দিচ্ছি...' এই বলতে বলতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খ্যাপার মতো এ দরজা থেকে ও দরজা পর্যন্ত কেন যে খামোকা ছোটাছুটি করল তা ওই জানে। কেউ ওকে ধরতেও যায়নি, মারতেও যায়নি। কিন্তু ও তখন আতঙ্কে, মাথার গণ্ডগোলে কেমনধারা হয়ে মস্ত খোলা দরজার দিকে পিছন করে কামরার ভিতরবাগে ছোরা উঁচিয়ে নাহক লোকেদের বাপ-মা তুলে গালাগাল করছিল। দরজার কাছেই সেই দুটো টিটকিরিবাজ ছেলে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেয়েছে এতক্ষণ। তাদেরই একজন, স্পষ্ট দেখলাম, আস্তে করে পা বাড়িয়ে টুক করে একটা টোকা মারল পৈলেনের হাঁটুতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটু কেতরে জোর একটা লাথি কষাল পৈলেনের পেটে। প্রথম টোকাটায় পৈলেনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরের লাথিটা সামলাতে পারল না। বাইরের চলন্ত অন্ধকারে বোঁ করে বেরিয়ে গেল, যেমন গুবরে পোকারা ঘর থেকে বাইরে উড়ে যায়।

হাজুর আনাড়ি হাতে ধরা পিস্তলটা তখন ঠকাঠক কাঁপছে। পুরনো পিস্তল, আর কলকবজা কিছু নড়বড়ে হবে হয়তো। একটা ঢিলে নাটবল্টুর শব্দ হচ্ছিল যেন। অকারণে সে আর-এক বার গুলি

ছুড়ল। মোটা কালো লোকটা তিড়িং করে লাফিয়ে একটা বেঞ্চে উঠে চেঁচাচ্ছে সমানে, গুল্লি, গুল্লি! শ্যাষ হয়ে গেলাম। প্যাটটা গেল। বুকটা গেল!

কিন্তু আমি দেখেছি, গুলিটা একটা জোনাকি পোকার মতো নির্দোষভাবে জানালা দিয়ে উড়ে বাইরে গেছে। কিন্তু হাফ প্যান্ট পরা লোকটাকে সে কথা তখন বোঝায় কে? লোকটা এখন নিজের উরুতে থাবড়া মেরে কেবল বলছে, মান্‌কে বলে সাবাস! আবার গুল্লি?

হাজু তখন বুড়োকে ছেড়ে হঠাৎ দুটো বেঞ্চের মাঝখানে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে পিস্তলটা মাঝে মাঝে নাড়ে আর বলে, চেন টানবে না কোনও শুয়োরের বাচ্চা। খবরদার, এখনও চারটে গুলি আছে, চারটে লাশ ফেলে দেব।

এ সব সময়ে হামাগুড়ি দেওয়াটা যে কত বড় ভুল তা বুঝলাম যখন দেখি হাজুর মাথায় কে যেন একটা পাঁচ-সাত কেজি ওজনের চাল বা গমের বস্তা গদাম করে ফেলে দিল। বস্তার তলায় চেপটা লেগে হাজু দম সামলাতে না সামলাতেই দরজার ছেলে দুটো পাকা ফুটবল খেলাড়ির মতো দু'ধার থেকে তার মাথায় লম্বা লম্বা কয়েকটা গোল কিক-এর শট জমিয়ে দিল। কামরার অন্য ধার থেকে কদম তখন চেঁচাচ্ছে, আমাকে ধরেছে। এই শালার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করি। এই রাঁড়ের ছেলে হাজু, পিস্তল চালা শালা, লাশ ফেলে দে...।

কিন্তু তখন হাজুর জ্ঞান নেই, পিস্তল ছিটকে গেছে বেঞ্চের তলায়। দু' সেকেন্ডের মধ্যে ওধার থেকে হাটুরে মারের শব্দ আসতে লাগল। লোকজন সব সাহস পেয়ে গেছে। সোনার বোতামওলা বুড়োটাও তখন রুপো-বাঁধানো লাঠি হাতে উঠে গেল ওধারে। তাকে বলতে শুনলাম, আহা হা, সবাইকেই চান্স দিতে হবে তো। অমন ঘিরে থাকলে চলে! একটু সরো দিকি বাবারা এধার থেকে, সরো, সরো...

বলতে না বলতেই কদমের মাথায় লাঠিবাজির শব্দ আসে ফটাস করে। কামরাসুদ্ধু লোক ওদিকে ধেয়ে যাচ্ছে। এধারে হাজুর মাথায় সমানে ফুটবলের লাথি, কয়েকটা গাঁইয়া লোক উঠে এসে উবু হয়ে বসে বেধড়ক থাপড়াচ্ছে, একজন বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে হাজুর নাকে আঙুল ঢুকিয়ে চড়চড়িয়ে নাকটা ছিঁড়ছে।

আমি বেকুবের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারি, আরে! আমিও যে এদের দলে ছিলাম! বুঝেই হঠাৎ চারধারে চনমনে হয়ে তাকিয়ে পালানোর পথ খুঁজি।

ঠিক এ সময়ে সেই মোটা কালো লোকটা বেঞ্চের ওপর থেকে নেমে এসে দু' হাতে আমাকে সাপটে ধরে ফেলল। বিকট স্বরে বলল, মান্‌কে বলে সাবাস! দেখেন তো মশয়, আমার কোথায় কোথায় গুল্লি দু'টো ঢুকল। দেখেন, ভাল করে দেখেন। রক্ত দেখা যায়?

আমি খুব অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, আরে না, আপনার গুলি লাগেনি।

বলেন কী?— লোকটা অবাক হয়ে বলল, মান্‌কে বলে সাবাস! লাগে নাই? অ্যাঁ। দুঃ দুইটা গুল্লি!

লাগেনি। আমি দেখেছি।

ওধার থেকে কদম আমার নাম ধরে বারকয়েক ডাক দিয়েই থেমে গেল। পাইকারি মারের চোটে তার মুখ থেকে কয়েকটা 'কোঁক কোঁক' আওয়াজ বেরোল মাত্র। এধারে হাজুর আধমরা শরীরটার তখনও ডলাইমলাই চলছে।

মোটা কালো লোকটা ভাল করে নিজের গা দেখে-টেখে গুলি লাগেনি বুঝে নিশ্চিত হয়ে চারধারে তাকিয়ে অবস্থাটা দেখল। বোধহয় পৌরুষ জেগে উঠল তার। হাজুকে দেখে সে পছন্দ করল না। বলেই ফেলল, এইটারে আর মেরে হবেটা কী? টেরই পাবে না। চলেন, ওই ধারের হারামজাদারে দুইটা দেই।

এই বলে আমাকে টানতে টানতে ওধারে নিয়ে গেল। রুপো-বাঁধানো লাঠি হাতে বুড়ো লোকটা

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কত আর পারা যায়! হাতে আবার আর্থারাইটিস।

যারা মার দিচ্ছিল তারা কিছু ক্লান্ত। দু'-একজন সরে গিয়ে আমাদের জায়গা করে দিয়ে খাতির করে বলল, ভালমতো দেবেন। এদের গায়ে মারধর তেমন লাগে না।

কালো মোটা লোকটা অসুরের মতো লাফিয়ে পড়ল কদমের ওপর। মুহূর্তে কদমের মাথার একমুঠো চুল উপড়ে এনে আলোতে দেখে বলল, হেই শালা, পরচুলা নাকি?

না, পরচুলা নয়। আমি জানি। কিন্তু সে কথা বলাটা ঠিক হবে না বলে বললাম না। কালো লোকটা আমাকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাড়া দিল, মারেন, মারেন! দেখেন কী?

মারতেই হল। চক্ষুলজ্জা আছে, নিজের প্রাণের ভয় আছে। একটু আস্তের ওপর দুটো লাথি কষালাম। গালে একটা চাপড়। কদমের জ্ঞান ছিল। একবার চোখ তুলে দেখল। কিন্তু কথা বলার অবস্থা নয়। গাড়ির দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে উবু হয়ে মার খেতে লাগল নাগাড়ে। তারপর শুয়ে পড়ল।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই হই-রই কাণ্ড। ভিড়ে ভিড়াক্কার। সেই ফাঁকে পালিয়ে অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠলাম গিয়ে। হঠাৎ দেখি, আমার সঙ্গে সেই কালো মোটা লোকটাও উঠেছে এসে। আমাকে একটা বিড়ি দিয়ে বলল, পালিয়ে এসে ভাল কাজ করেছেন। আপনি বুদ্ধিমান। নইলে থানা-পুলিশের ঝামেলায় পড়ে যেতে হত।

আমি একটা হুঁ দিলাম। বাস্তবিকই বোধহয় আমি বুদ্ধিমান। ডাকাতের দলে আমিও যে ছিলাম সেটা কেউ ধরতেই পারল না।

কথায় কথায় লোকটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। বেশ লোক। ক্যানিংয়ের বাজারে তার আটাকল আছে, তিনটে নৌকোরও মালিক। আমাকেও লোকটা পছন্দ করে ফেলল। শেষমেশ বলেই ফেলল, তোমারে তো বিশ্বাসী মানুষ বলেই মনে হয়। আমার তিনটে মালের নৌকো লাট এলাকায় খেপ দেয়। চাও তো তোমারে তদারকির কাজে লাগিয়ে দিই। মান্‌কে বলে সাবাস! বলে খুব হাসল। গলা নামিয়ে বলে, আমার নামই মানিক। মানিকচন্দ্র সাহা, বৈশ্য। আবার বৈষ্ণবও বটে হে। বাঙাল দেশে বাড়ি। কিন্তু এতদঞ্চলে থাইকতে থাইকতে দেশি ভাষা প্রায় ভুলে গেছি। যাবা নাকি আমার সঙ্গে? আমি লোক ভাল।

রাজি হয়ে ক্যানিং চললাম। বরাবর দেখেছি, উড়নচণ্ডীদের ঠিক সহায়-সম্বল জুটে যায় কী করে যেন। ঘর ছেড়ে এক বার বেরিয়ে পড়লে আর বড় একটা ঘরের অভাব হয় না।

৩

ক্যানিং জায়গা ভাল। ঘিঞ্জি বাজারটার ভিতরে মানিক সাহার আটাকল। আটাকলের পিছনেই দমবন্ধ তিনটে ঘরে তার তিন-তিনটে জলজ্যান্ত বউ থাকে। ছেলেপুলে কত তা গুনে শেষ করতে পারিনি। যে ক'দিন ছিলাম সেখানে প্রায় দিনই ছেলেপুলেদের মধ্যে দু'-একটা নতুন মুখ দেখতাম। তার ক'টা ছেলেমেয়ে তা জিজ্ঞেস করলে মানিক নিজেও প্রায়ই গুলিয়ে ফেলত। এক দিন আমার চোখের সামনেই রাস্তায় ঘুগনিওলার ছেলে কাদা মাখছিল, মানিক সাহা তাকে নিজের ছেলে মনে করে নড়া ধরে তুলে এনে আচ্ছাসে পিটুনি দিয়ে দিল। ভুল ধরা পড়তেই জিভ কেটে বলল, মান্‌কে বলে সাবাস।

বড় ভাল লোক মানিক সাহা। সে নিজেও সে কথা প্রায়ই বলত, বুঝলে হে উপল, আমি লোকটা বড় ভাল। লোকে আমারে ভয় দেখায়, বলে, একের অধিক বিবাহ বে-আইনি। একদিন নাকি আমারে জেল খাটতে হবে। কিন্তু আমি কই, জেল খাটাবা খাটাও, কিন্তু আমারে মন্দ কোয়ো না

কেউ। আমি তো কোনও মেয়ের সঙ্গে নষ্টামি করি নাই। বদমাইশ লোক ঘরে বউ থুয়ে অন্যের সঙ্গে নষ্টামি করে। আমি বদমাইশ না। মেয়েছেলে দেখে মাথা খারাপ হলে আমি তারে বিয়ে করে ফেলি। এইটে সাহসের কাজ, না কি ডুব দিয়ে জল খাওয়াটা সাহসের?

ঘিঞ্জি বাজারটা পার হলেই বিপুল নদী, আকাশ, ব্রিটিশ আমলের কুঠিবাড়ি। হাজার রকমের মাল বোঝাই হয়ে নৌকো যায় বাসন্তী হয়ে গোসাবা। আরও ভিতরবাগে নানা নদীনালা ধরে ধরে গহিন সুন্দরবন পর্যন্ত। নৌকোয় থেকে থেকে জোয়ার-ভাঁটা, গাঙের চরিত্র, মেঘ, বর্ষা, শীত সবই চিনে গেলাম। নদীর জীবনে না থাকলে পৃথিবীর কত রূপ অদেখা থেকে যেত। লাট অঞ্চলে রাস্তাঘাট নেই, মোটরগাড়ি নেই, রিকশা নেই, এমনকী সাইকেল বা গো-গাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। মাইল মাইল চষা খেতের তফাতে এক-এক খানা গ্রাম। নৌকো ভিড়িয়ে প্রায়দিনই গাঁ দেখতে চলে গেছি গভীর দেশের মধ্যে। সেখানে নিঝুম এক আশ্চর্য জগৎ। ফিরে আসতে মন চাইত না।

আমার সে-জীবনটা ভণ্ডুল করে দিল মানিক সাহা নিজেই। বাসন্তী ছেড়ে ক্যানিংমুখো নৌকো বড় গাঙে পড়তেই ঝড়। মাল গস্ত করতে সেবার মানিক সাহা নিজেই গিয়েছিল। খড় কিনে ফিরছে। পাহাড়-প্রমাণ বোঝাই নৌকো। মানিক হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় খালি গায়ে হালের কাছে বসে গুন গুন করে ঢপের গান গাইছে। সুরের জ্ঞান ছিল। একটু আগেই একটা পচা কাঠ কুমিরের মতো আধো ডুবন্ত ভেসে যাচ্ছিল দেখে কামঠ! কামঠ! বলে চেঁচিয়ে আমাদের সঙ্গে রঙ্গ করছিল। জোর বাতাস ছাড়তেই কিছু আলগা খড় উড়ে গেল ডাইনির চুলের মতো। আকাশে গুমগুম শব্দ। নৌকোর জোড় আর বাঁধনে একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল বিপদের। জল ঘোর কালো। আকাশে ঘূর্ণি মেঘ উড়ে আসছে।

কেমনধারা অন্য রকম চোখে মানিক সাহা এক বার পিছু ফিরে দেখল। তার দু' হাত পিছনে আমি দাঁড়িয়ে, আমার পিছনে খড়ের গাদা। কিন্তু আমাকে বা খড়ের গাদাকে দেখল না মানিক সাহা। এমনকী গোঙানো জলে গহিন ছায়া ফেলে যে প্রকাণ্ড ঝড় আসছে তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করল না সে। তবু কী যেন দেখল। মাঝিরা চেঁচামেচি করছিল নৌকো সামলাতে।

মোজাম্মেল খড়ের গাদার ওপর থেকে একটা দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে নেমে এসে মানিক সাহাকে বলল, সাহাবাবু, খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ুন। ইদিক-সিদিক কিছু হলে তিন-তিনটে ঠাকরোন বিধবা হবেন।

খাকি হাফপ্যান্ট পরা মানিক সাহা উবু হয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি রইল। পুরনো পালের কাপড় হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে ফেড়ে গিয়ে নিশেনের মতো উড়ছে। নৌকো কিছু বেসামাল। মাঝিরা ডাঙার দিকে মুখ ঘুরিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু একটা ঘোলায় পড়ে নৌকোটা এগোতে চাইছে না। ওদিকে দিকবিদিক একটা ধোঁয়াটে চাদরের মতো আড়াল করে বড় গাঙ ধরে উড়োজাহাজের শব্দ তুলে ঝড় আসছে। আলগা খড় মুঠো মুঠো উড়ে যায় বাতাসে, এদিক-সেদিক পাক খেয়ে জলে পড়ে। মানিক সাহা যেভাবে উবু হয়ে বসে আছে ধারে তাতে বাতাসের তেমন চোট এলে না উলটে জলে গিয়ে পড়ে।

ভাল ভেবে আমি গিয়ে পিছন থেকে মানিক সাহার বাঁ কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরে বললাম, মানিকদা, চলো খোলে বসে কেত্তন গাই।

মানিক সাহা মুখ তুলে, ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তার বাঁ হাতে রুপোর চেনে বাঁধা পীত পোখরাজ, গোমেদ, বৈদূর্যমণি, সিংহলের মুক্তো, চুনি নিয়ে পাঁচটা পাথর, তা ছাড়া তাগায় বাঁধা দুটি মাদুলি। আমি যেখানটায় ধরেছি তার হাত, সেখানে তাবিজ আর পাথর খজবজ করে উঠল। দেখি, মানিক সাহার দু' চোখে টলমল করছে জল।

হাত বাড়িয়ে আমার গলা ধরে মাথাটা তার মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, কাজগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। না?

কী কাজ খারাপ হয়েছে, কেনই বা হল, তার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু বুঝতে পারছি, মানিক সাহার হঠাৎ কোনও কারণে বড় অনুতাপ এসে গেছে।

আন্দাজে বললাম, কেন, কাজ খারাপ হবে কেন? আমি তো কিছু খারাপ দেখি না।

মানিক সাহা কথা বলল না। সেই ঝড় বাতাসে খাকি হাফপ্যান্ট পরে, স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে উবু হয়ে বসে চোখের জলে গঙ্গার জল বাড়াতে থাকে, আর কেবল কী মনে করে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে।

ও সব কথার তখন সময় নেই। ঘুণে ধরা মাস্তুল পালের নিশেন সমেত মড়াৎ করে ভেঙে জলে ভেসে গেল। নন্দর মাথায় চোট হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে গাল ভাসিয়ে। এই তক্কে নৌকো ঘোলা পেরিয়ে একখানা চক্কর মারল। ধড়াস ধড়াস করে তিন-চারজন আমরা কুমড়ো গড়াগড়ি দিয়ে উঠে দেখি, দুনিয়া মুছে গেছে। চার দিকে বাতাসের হাহাকার শব্দ। তাল-বেতাল জল ফুলে উঠছে গহিন আঁধার গাঙে। নৌকো আকাশে উঠে পাতালে পড়ছে।

এই সব গোলমালে যে যার সামলাতে যখন ব্যস্ত তখন মানিক সাহার হাফপ্যান্ট পরা শরীর পাটাতনে চিত হয়ে পড়ে আছে। মাল্লারা নৌকো একটা ঘাটের মাটির বাঁধে প্রচণ্ড ঘষটানি লাগিয়ে ভিড়িয়ে দিল। লাফিয়ে নেমে সব দড়িদড়া আর খোঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মানিক সাহা তখনও চিত হয়ে পড়ে আছে। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির ধারালো বর্শা ফুঁড়ছে চার দিক। আগুনের হলকা ছড়িয়ে দড়াম দড়াম করে বাজ পড়ে কাছেপিঠে। মানিক সাহা চোখ বুজে পড়ে আছে। তাগা ছিঁড়ে কয়েকটা তাবিজ আর কবচ ছিটকে পড়েছে চারধারে।

আমি তাকে নাড়া দিতেই সে সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই, যেন বিছানায় শুয়ে আছে, এমন আরামে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, কাজগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে।

এ অঞ্চলের ঝড় হঠাৎ এসে হঠাৎ যায়। ঝড় থেমে গেলে দেখা গেল, খড় ভিজে নৌকো তিন গুণ ভারী হয়ে জলের নীচে মাটিতে বসে গেছে। তার ওপর ভাঁটিতে এখন উলটো স্রোত। মাল্লারা ওপরে উঠে খড়ের চাপান কমানোর জন্য ভেজা খড়ের আঁটি হাতে হাতে চালান করছিল ডাঙায়। ভিজে সবাই চুব্বুস। খড়গুলো পড়ে থাকবে এখানে, কাল অন্য নৌকো নিয়ে যাবে এসে।

খোলের ভিতর আমার একটা টিনের সুটকেস আছে। তার ভিতর থেকে সস্তার সিগারেট আর দেশলাই এনে পাটাতনে মানিক সাহার পাশে বসলাম। দিব্যি ঠান্ডা হাওয়া। পরিষ্কার আকাশে ফুটফুট করছে তারা। ভেজা গায়ে উঠে বসে মানিক সাহা একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বলল, উপলভাই, বড় অপরাধ করে ফেলেছি হে। মানকে বলে সাবাস।

কিছুই বুঝতে পারছি না। ধমক দিয়ে বললাম, ব্যাপারটা কী?

সে গম্ভীর হয়ে বলে, তখন তুমি ফচ করে এসে যদি হাতটা না-ধরতে তা হলে এতক্ষণে আমার লাশ গাঙে ভাসত। যেই না মনের জ্বালায় লাফিয়ে পড়ব বলে মন করেছি অমনি তুমি এসে—

শুনে ভয় খেয়ে যাই। মানিক সাহা লাফিয়ে পড়লে আগামী কাল থেকে আমার গতি হত কী? বললাম, লাফাবে কেন?

ঝড়জলের ওই বিকট চেহারা দেখে হঠাৎ নিজের সব পাপের কথা মনে পড়ে গেল কিনা। কাজগুলো স খারাপ হয়েছে।

সারাক্ষণ মানিক সাহার সেই এক কথা। কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে। কী খারাপ হল, কেন খারাপ হল এ সব জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। সে রাতে লঞ্চ ধরে ক্যানিং ফিরে এসে অবধি তার মাথার জট ছাড়ল না। তারপর তিন দিন, চার দিন করে সময় যেতে লাগল। মানিক সাহা খায় দায়, হাসে, গল্প করে, কিন্তু হঠাৎ সব কিছুর মাঝখানে একটা বড় শ্বাস বুক থেকে ছেড়ে বলে, কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

মাসখানেকের মধ্যে তিনটে নৌকো বেচে দিল সে জলের দরে। আটাকল আর দোকানঘর

বউদের নামে লিখে দিল। বউরা কেউ মরাকান্না কাঁদে, কেউ বিকট চেঁচিয়ে গালমন্দ করে মানিক সাহাকে। কিন্তু লোকটা নির্বিকার, কেবল বলে, কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

আরও ক'দিন বাদে আমার কাছে গোপনে সে ঝেড়ে কাশল। বললে, তিন বিয়ে ভাল নয়, বুঝলে? অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে এক বিয়ে ভাল। আর এই ব্যাবসা-ট্যাবসার কোনও মানে হয় না, আসল জিনিস হল চাষবাস।

আমি ঢাকের বাঁয়া হয়ে মাথা নাড়ি।

কিছুদিন বাদে একদিন সকালে মানিক সাহা আমাকে নিয়ে দাঁতন করতে করতে বাঁধে হাঁটতে লাগল। সেদিনও তার পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গা আদুড়। খানিক দূর গিয়ে দাঁতন জলে ফেলে দিয়ে পিছু ফিরে আমাকে বলল, দৌড়োও!

বলে সে নিজে হাঁসফাঁস করে ছুটতে থাকে। আমার জাগতিক অবলম্বনকে ছুটতে দেখে আমিও দৌড়োই। লঞ্চ তখন ছাড়ে-ছাড়ে অবস্থা। মানিক সাহা এক লম্ফে চড়ে গেল, পিছনে আমি।

একগাল হেসে সে বলল, খুব জোর পালিয়েছি হে। তিন-তিনটে বউ যার, জীবনে কি তার শান্তি আছে? বউগুলো চারটে শালাকে আমদানি করেছে আমাকে নজরে রাখার জন্য। মান্‌কে বলে সাবাস।

আমি বেজার মুখে বললাম, কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?

মানিক সাহা সংক্ষেপে বলল, এক বিয়ে, আর চাষবাস। আর কোনও ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

গোসাবায় নেমে মাইল পাঁচেক মাঠ বরাবর হেঁটে পাখিরালয় গাঁ। সেখান থেকে নদী পেরিয়ে দয়াপুর। সেখানে পৌঁছতে বেলা কাবার হয়ে গেল। গিয়ে দেখি, মানিক সাহা সেখানে আগেই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে কবে থেকে। জমিজোত কেনা হয়ে গেছে, দিব্যি মাটির বাড়ি আর ঘেরা বাগান। লোকজন কাজকর্ম করছে। এমনকী সেখানে ডজন খানেক খাকি হাফপ্যান্টও মজুত রয়েছে।

পরদিনই মানিক সাহা বিয়ে বসল। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে ছিল আগে থেকেই। গরিবের ঘরের শ্রীময়ী একটা কালো, অল্পবয়সি মেয়ে লাজুক হেসে মানিকের বউ হয়ে গেল। নাম ঝুমুর।

মানিক আমাকে চুপি চুপি বলল, এক বিয়ে, বুঝলে? এখন থেকে আর বহু বিবাহ নয়।

আমি বুঝদারের মতো মাথা নাড়ি। তখন মানিক হঠাৎ ধর্মভয়ে কাতর হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে—বলো তো, ধর্মত আমি কাউকে ঠকাইনি তো, জোচ্চুরি করিনি তো কারও সঙ্গে? সকলের পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দিয়ে এসেছি তো? তারপর নিজেই কর গুনে হিসেব করে বলে, বউদের ছেলেপুলে, টাকা-পয়সার অভাব রাখিনি, এক, মহাজনের কাছেও বাকি বলে কিছু পড়ে নেই, দুই, কর্মচারীদের কারও এক পয়সা মারিনি, তিন...

দয়াপুরে দিব্যি আমার থাকা চলছিল। কাজকর্ম নেই, বসে খাও, আর চাষবাস একটু দেখাশোনা করো, কাজের লোকদের কিছু হাঁকডাক করো, বাস হয়ে গেল। সেই খিদের চিন্তাটা তেমন মাথা চাড়া দেয় না। ভাবলাম, আমার সেই খিদের ভূত বোধহয় রোজার হাতে পড়েছে।

কিন্তু মানিক সাহার নতুন বউ জ্বালালে। এক মাসের মাথায় সে আমার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি শুরু করে। সেটা মন্দ লাগত না। মেয়েছেলের সঙ্গ তো খারাপ না, সময়টা কাটেও ভাল। কিন্তু দু' মাস যেতে না যেতেই সে নানা রকম ইশারা ইঙ্গিত শুরু করল। রাত-বিরেতে উঠে আসত আমার বিছানায়।

আমি তাকে বলতাম, দেখো, মেয়েমানুষের চেয়ে আমার ঢের বেশি দরকার একটা আশ্রয়। তুমি অমন করলে একদিন ধরা পড়ব ঠিক, তখন মান্‌কে আমাকে তাড়াবে।

ইস, তাড়ালেই হল?— বলে খুব দেমাক দেখাত। আবার কখনও বলত, চলো পালিয়ে যাই।

অত বোকা আমি নই। পালানোর কথায় পাশ কাটাতাম।

শেষতক ঝুমুরের মধ্যে একটা হন্যে ভাব দেখা দিল। কাঁচা অল্পবয়সি পুরুষমানুষের গন্ধে তার আর রাখ-ঢাক রইল না। মানিক সাহা খেত থেকে ফিরে এসে যখন জিরেন নিচ্ছে তখন আমি কত বার বলেছি, যাও বউঠান, একটু হাওয়া-টাওয়া করো, দুটো ডাব কেটে দাও।

সে তখন আমার সঙ্গে প্রায় মান্‌কের চোখের সামনে ঢলাচ্ছে। বলত, ডাব ও নিজে কেটে নিতে পারবে না?

রাত-বিরেতে মান্‌কে ভাল করে ঘুমোবার আগেই উঠে আসত। চোখের সামনেই দিন দুপুরে আমাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে যেত বাগানের দিকে।

টের না-পাওয়ার কথা নয় মান্‌কের। ভাল করে দেখেশুনে সে অবশেষে একদিন গর্জন করে উঠে বলল, অসতী! অসতী!

যাদের স্বভাব খারাপ তারা টপ করে পায়ে ধরতে পারে। ঝুমুরও পায়ে ধরে কান্নাকাটি করল। প্রথম বলল, ভুল দেখেছ। পরে স্বীকার হয়ে বলল, আর হবে না এ রকম।

কিন্তু তাই কি হয়! যা হওয়ার তাই হচ্ছিল ফের।

এবার মানিক সাহা কেঁদে উঠল এক রাতে। বউয়ের হাত-পায়ে ধরে বিস্তর বোঝাল। ঝুমুরও কাঁদল, আদর করে বলল, তোমায় ছুঁয়ে বলছি, আর হবে না।

আবার হল।

তৃতীয় দফায় মানিক সাহা একদিন বউকে ধরে বেধড়ক ঠেঙাল, তারপর দেড় বেলা বেঁধে রাখল ঘরে।

কী জানি কেন এ ব্যাপারে আমাকে তেমন কিছু বলত না মানিক। মাঝে মাঝে কেবল ছানি পড়া চোখের মতো যেন ভাল ঠাহর করতে পারছে না, এমনভাবে তাকাত। এক-আধবার করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, উপলভাই, এর চেয়ে কি তিন বিয়েই ভাল ছিল?

আমি তার কী জানি। চুপ করে থাকতাম।

সে নিজেই ভেবেচিন্তে বলত, তিনটে বউ থাকলে সুবিধে এই যে, তারা পরপুরুষের কথা ভাববার সময় পায় না, একটাকে নিয়েই কাড়াকাড়ি করে। হিংসুক জাত তো! এক বিয়ের দেখছি বিস্তর ঝামেলা।

ইদানীং খুব তাড়ি খাওয়া ধরেছিল মান্‌কে। ঝুমুর কাঁকড়ার ঝাল, মাছের চচ্চড়ি করে দিত। আমি আর মান্‌কে সেই চাট দিয়ে জ্যোৎস্নার উঠোনে বসে সন্ধের পর খেতাম।

ঝুমুর একদিন আধ টিন পোকামারার সাংঘাতিক বিষ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আজ রাতেই নিকেশ করবে।

বোকা মেয়েমানুষ। ডাক্তার, থানা-পুলিশ, আদালত এ সব খেয়াল নেই। কিন্তু ঝুমুরের চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, রাজি না হলে এ বিষ একদিন আমার ভিতরে কোনও কৌশলে চালান করে দেবে। একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে ও।

টিন নিয়ে গ্যাঁজানো তাড়িতে মেশাতে হল।

কী বুদ্ধি!— ঝুমুর দেখে বলল, প্রথমটায় খেলেই তো গন্ধে টের পাবে। আগে ভাল তাড়ি দিয়ে নেশা করিয়ে নেবে তারপর এটা দিয়ো। নেশার ঝোঁকে কী খাচ্ছে টের পাবে না।

ঝুমুরের বুদ্ধি দেখে আমি তখন অবাক। মেয়েমানুষ একই সঙ্গে কত বোকা আর চালাক হতে পারে!

সন্ধেবেলা ঝুমুর বাপের বাড়ি গেল। কাল সকালে ফিরে এসে কান্নাকাটি করবে। বিধবা হবে তো!

আমি আর মান্‌কে তাড়িতে বসলাম।

আকাশে চাঁদ ছিল না, উঠোনে একটা হারিকেন ছিল শুধু। চাঁদের অভাবে মান্‌কে উদাস চোখে

হারিকেনটার দিকে চেয়ে ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে। আমি তাকে পা দিয়ে ছোট একটা আদুরে লাথি মেরে মুখটা কাছে আনতে ইশারা করলাম। সে হামাগুড়ি দিয়ে কাছে আসতেই বললাম, বোঝো কেমন?

কী বুঝব ভাই?

শোনো মানিকদা, যখন-তখন না দেখেশুনে যা-তা খেয়ে বোসো না এ বাড়িতে।

কেন বলো তো?

দু' নম্বর হাঁড়িতে বিষ মেশানো আছে।

বিষ?

বলে হঠাৎ হাফপ্যান্ট পরা মানিক লাফিয়ে উঠে হাতের ভাঁড় ছুড়ে ফেলে পেল্লায় চেঁচাতে থাকল, বিষ দিছে! বিষ দিছে! মরে গেলাম, ও বাবা রে, মরে গেলাম। আমার বুকটা কেমন করে। আমার প্যাটটা কেমন করে।

এই বলে আর সারা উঠোন জুড়ে লাফিয়ে নৃত্য করে।

হুবহু সেই ট্রেনের কামরার দৃশ্য।

হাতের ভাঁড়টা শেষ করে আমি হারিকেনটা তুলে নিয়ে রওনা দিলাম। পুঁটুলি একটা বাঁধাই ছিল। মাঠ পেরিয়ে যখন ঘাটের কাছে পৌঁছেছি তখন পিছন থেকে মানিকও হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। কোনও কথা হল না দু'জনে। জোয়ারের জল এখন বেশ ফেঁপে আছে। পাড়ে তোলা নৌকোটা এঁটেল কাদায় ঠেলে নিয়ে জলে ফেলে দু'জনে উঠে বসলাম।

মানিক সাহা পাখিরালয়ে নেমে গেল অন্ধকারে। আমি তাকে হারিকেনটা ধরিয়ে দিলাম হাতে। সেই আলোতে দেখা গেল, তার মুখ-চোখ কেমন ভোম্বলপানা হয়ে আছে। পিছনে দিগন্তজোড়া অন্ধকার পৃথিবী, অচেনা। সেদিকে চাইল। তারপর আমাকে বলল, না ভাই, এবার পুরো ব্যাচেলার। চিরকুমার থাকব এখন থেকে।

এই বলে খাড়াই ভেঙে উঠে গেল। কোথায় গেল তা আমি আজও জানি না। আমি নৌকো বেঁধে রেখে গোসাবামুখো হাঁটা ধরলাম।

৪

বারান্দাটায় থাকতে আমার কিছু খারাপ লাগে না। শীত বা বর্ষায় একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ও সব গায়ে মাখা আমার অভ্যাস নয়।

বারান্দার বাতি নিভলেই রোজ এক অতিথি আসে। কেঁদো একটা ছুঁচো। এত স্বাস্থ্যবান ছুঁচো কদাচিৎ দেখা যায়। হুলো বেড়ালের মতো বড় চেহারার এক মিস্টার ইউনিভার্স, বেসিনের তলায় এঁটো বাসন-কোসন ডাঁই করা থাকে, সে এসেই বাসনপত্রে হুটোপাটি শুরু করে দেয়। বাতি জ্বাললেই গ্রিলের দরজার বাইরে বা জালের ফুটোর ভিতরে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। তার লোমহীন মোটা লেজটা দেখা যায়। ভারী চালাক ছুঁচো। রান্নাঘরে এক রাতে চারখানা পরোটা নিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে গেল। গোটা তিনেক নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন ক্ষণা বারবারই সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এ কি আর ছুঁচোর কাজ! বাটির ঢাকনায় নোড়া চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। অত ভারী জিনিস সরাতে পারে নাকি ছুঁচোরা? এ অন্য ছুঁচোর কাজ। যাদের লোকে ছোঁচা বলে।

শুনে আমার একটু লজ্জা করল। ছুঁচোটার ওপর রাগও হল খুব।

এ বাড়িতে আর একটা উৎপাত আছে চড়াই পাখির। গ্রিলের ফুটো দিয়ে রাজ্যের চড়াই এসে লোহার বিমের খাঁজে রাত কাটায়। রাতে বিমের গায়ে ডিম ডিম সব চড়াই বসে নানা রকমের শব্দ

করে। অসুবিধে হল তাদের পুরীষ নিয়ে। যখন-তখন লাজলজ্জার বালাই নেই, হড়াক করে খানিকটা সাদায় কালোয় ক্বাথ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। আমার বালিশ বিছানা বলতে যা একটু কিছু আছে সব দাগ-ধরা হয়ে গেল। এখন কাচলেও ওঠে না। মাঝেমধ্যে প্রথম রাতে দুটো-তিনটে চড়াইয়ের মধ্যে মাথা গরম করা ঝগড়া লেগে পড়ে। একটা আর-একটাকে খোঁচাতে খোঁচাতে দুটো-তিনটে মিলে জড়াজড়ি করে পড়ে যায় নীচে।

এ দুই উৎপাত ছাড়া এখন আর কোনও অসুবিধে নেই।

ছুঁচোটার সাহস ক্রমেই বাড়ছে। পরোটা চুরির পরদিন যেই এসেছে অমনি উঠে বাতি জ্বাললাম। একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। রোজ যেমন সুট করে পালায় সেদিন মোটেই তেমন কিছু করল না। একটু লজ্জার ভান করে কয়েক পা দৌড়ে গ্রিলের দরজার কাছে গিয়ে সামনের পায়ের মধ্যে মুখ ঘষে প্রসাধন করতে লাগল নিশ্চিন্তে।

কিছু করার নেই। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। অল্প একটু অভিমান হয়েছিল বটে ছুঁচোটার ওপর, কিন্তু সেটা বোঝার মতো হৃদয় ওর নেই।

কয়েকটা বাজারের থলি খামকা দাঁতে কেটে রেখে গেল কয়েক বার। একটা বাসি চাদর বারান্দায় পড়ে ছিল, পরদিন ঝি কাচবে, সেটা সাত জায়গায় ছ্যাঁদা হল একদিন। তা ছাড়া নাদি মেখে রেখে যায় বারান্দায় রোজ। পরিষ্কার করতে ঝি চেঁচামেচি করে। আজকাল আবার রাতে এত বেশি সাড়াশব্দ শুরু করে যে আমার ঘুম চটে যায়। বাতি জ্বেলে তাড়া দিলে চলে যায় ঠিকই। বাতি নেভালেই আসে।

ক্ষণা একটা লাঠি আমার বিছানার পাশে রেখে দিয়ে এক রাতে বলল, শুধু চেয়ে চেয়ে ছুঁচোর কাণ্ড দেখলেই তো হবে না। এটা দিয়ে আজ ওটাকে পিটিয়ে মারা চাই।

আমার কমলাকান্তের মতো অবস্থা। সে রাতে ছুঁচো মহারাজ এলে আমি নানা শব্দ-সাড়া করে উঠে বাতি জ্বাললাম। ছুঁচোটার ভয় ভেঙে গেছে একেবারেই। আজকাল আমাকে দেখলে নড়েও না। কষে এক বার লাঠিটা চালালাম, সে অলিম্পিকের চালে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ক্ষণাকে শোনানোর জন্য কয়েক বার প্রবল লাঠির শব্দ আর গালাগাল করে আমিও শুয়ে পড়ি।

কয়েক রাত এইভাবে কাটলে একদিন ক্ষণা বলল, অসহ্য করে তুলল তো ছুঁচোটা। আজ বাজার থেকে ইঁদুর মারা বিষ আনবেন তো। অন্য কিছুতে হবে না।

শুনে আমার ঘাম দিল।

শেষবার বিষ দিয়েছিলাম মানিক সাহার তাড়িতে। আর বিষ-টিষ বড় একটা দেওয়া হয়নি। দুনিয়ায় ফালতু লোক বা অপ্রয়োজনীয় জীবজন্তু কীটপতঙ্গের অভাব নেই ঠিকই, তবু এই জনে জনে বিষ দিয়ে বেড়ানোর কাজটা আমার তেমন পছন্দ নয়।

দু'-চারদিন গড়িমসি করে কাটিয়ে দিই। রাতে ছুঁচোটা এসে ফের হুটোপাটা শুরু করলে অন্ধকারে মাথা-তোলা দিয়ে আধশোয়া হয়ে তাকে ডাকি, এই মোটা, শুনছিস? পালা, পালিয়ে যা মানিক সাহার মতো।

ছুঁচোটা চিড়িক মিড়িক করে কী জবাবও দেয় যেন। কিন্তু ঠিক ভাবের আদানপ্রদান হয় না। নির্বোধটাকে কী করে বোঝাই যে, মানুষকে অত বিশ্বাস করা ঠিক নয়?

মশা বা ছারপোকাও আমি পারতপক্ষে মারতে পারি না। আমার বাবারও এই স্বভাব ছিল। প্রায়ই বলতেন, লেট দি লিটল ক্রিচারস এনজয় দেয়ার লিটল লাইভস। একজন মহাপুরুষের বাণী থেকে কোটেশনটা মুখস্থ করেছিলেন। আমাদের একটা পোষা বেড়ালকে মাঝে মাঝে খড়ম দিয়ে এক ঘা দু' ঘা দিয়েছেন বড় জোর, তাঁর নিষ্ঠুরতা এর বেশি যেতে পারত না। বেড়ালটা খড়মের ঘা খেয়ে লাফিয়ে গিয়ে জানালায় উঠে বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। তার চোখে অবিশ্বাসভরে যেন বলে উঠত, ইউ টু ব্রুটাস? বাবাও তার দিকে চেয়ে খুব সবজান্তার মতো বলতেন, কেমন লাগল

বল? মনে করছিস তেমন কিছু লাগেনি? সে এখন টের পাবি না। রাত হোক, হাড়ের জোড়ে জোড়ে টের পাবি।

বেড়ালটা টের পেত কি না জানি না, তবে বাবাকে দেখেছি, রাতের বেলা চুপি চুপি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট জলে গুলে বেড়ালকে জোর করে খাইয়ে দিতেন।

আমার কানা মাসিরও প্রাণটা ভাল ছিল। রাজ্যের কাক, কুকুর, বেড়াল, পায়রাকে ডেকে ডেকে এঁটো-কাঁটা খাওয়াতেন। এই করে করে কুকুর বেড়াল তো পোষ মেনে গিয়েছিলই, কয়েকটা কাক শালিকও তার ভক্ত হয়ে পড়ে। মাসি কোথাও বেরোলে রাস্তা থেকে গুনে গুনে এগারোটা কুকুর তার পিছু নিত। বড় রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসত। কানা মাসি যখন রান্নাঘরে বসে ছ্যাঁক ছোঁক করছে তখন চৌকাঠে এসে নির্ভয়ে কাক তাকে ডেকে কত রকম কথা বলত ক্যাও ম্যাও করে। সেসব কথার জবাবও কানা মাসিকে দিতে শুনেছি, রোসো বাছা, খিদেয় তোমাদের সব সময়ে পেটের ছেলে পড়ে গেলে তো চলবে না। বসে থাকো, ভাতের দলা মেখে দিচ্ছি একটু বাদে...

ছেলেবেলা থেকে এই সব দেখেশুনে আমার প্রাণেও একটা ভেজা-ভাব এসে গেছে।

কিন্তু সকলের প্রাণ তো আমারটার মতো পান্তা ভাত নয়। ক্ষণার ও সব দুর্বলতা নেই। তিন দিন বাদে সে আমাকে বাজারের টাকা দেওয়ার সময়ে সকালবেলাটাতেই বলে ফেলল, ফর্দ দেখে জিনিস আনেন, তবু ভুল হয় কেন বলুন তো! আজ যদি বিষ আনতে ভুল হয় তবে কিন্তু...।

বাকিটা প্রকাশ করল না ক্ষণা। কিন্তু তাতেই নানা রকম অজানা ভয় ভীতিতে আমার ভিতরটা ভরে গেল। ক্ষণার মুখে একপলকের জন্য ঝুমুরের সেই মুখের ছায়া দেখতে পেলাম বুঝি।

ক্ষণার চেহারা খারাপ নয়, আবার ভালও নয়। ওই একরকমের চেহারা থাকে, না লম্বা না বেঁটে, না ফরসা না কালো। ক্ষণার মুখ নাক চোখ কান সব ঠিকঠাক। গালের মাংস বেশি নয়, কমও নয়। দাঁত উঁচুও নয়, আবার ভিতরে ঢোকানোও নয়। অর্থাৎ, ক্ষণাকে যদি কেউ সুন্দর দেখে তো বলার কিছু নেই, আবার খারাপ দেখলেও প্রতিবাদের মানে হয় না।

হাত পেতে বাজারের টাকা নেওয়ার সময়ে আজ আমি ক্ষণাকে একটু আড় চোখে দেখে নিলাম। ক্ষণাকে এক-এক সময়ে এক-এক রকম দেখায়। আজ খুব রগচটা, রসকষহীন দেখাচ্ছিল।

সুবিনয় পারতপক্ষে বাজারহাট করতে চায় না, ওসব তার অভ্যাস নেই। খুবই চিন্তাশীল, ব্যস্ত মানুষ। নিজের ঘর-সংসার বা আত্মজনদের সে চোখে দেখেও দেখতে পায় না। তার এই দেখা-টেখাগুলো অনেকটা ফিল্মহীন ক্যামেরায় ছবি তোলার মতো। শাটার টিপে যাও, ছবি উঠবে না। সুবিনয়ের ভিতরেও সেই ফিল্মের অভাব আমি টের পাই। নিজের মনোমতো কাজ ছাড়া দুনিয়ার কোনও কিছুই সে লক্ষ করে না।

বাজারের থলি হাতে যাচ্ছি, রাস্তায় সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা। সুবিনয় মস্ত লম্বা লোক, ছ' ফুট দু'-তিন ইঞ্চি হবে। গায়ের রং কালচে। স্বাস্থ্য খারাপ নয় বলে দানবের মতো দেখায়। ওর গায়ে যে অসুরের মতো শক্তি আছে সেটাও ও জানে না ভাল করে। নিজে সুন্দর কি কুচ্ছিত তাও ও খেয়াল করে কি?

এই লম্বা-চওড়া হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। যেমন কাজের নয় খুব সুন্দর বা বিখ্যাত হওয়া। যারা খুব লম্বা-চওড়া, কিংবা খুব সুন্দর দেখতে, কিংবা বিখ্যাত ফিল্মস্টার, নেতা বা খেলোয়াড় তাদের একটা অসুবিধে তারা দরকার মতো চট করে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে না, অচেনা জায়গায় পালিয়ে যেতে পারে না। তারা কী করছে না করছে তা সব সময়েই চারপাশের লোক লক্ষ করে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত গুন্ডা হল নব। সেই নব যখন রাস্তাঘাটে বেরোয় বা দোকানপাটে যায় তখন তাকে পর্যন্ত লোক ফিরে ফিরে দেখে। ভারী অস্বস্তি তাতে। এই যে রাস্তা উপচে শয়ে শয়ে লোকের যাতায়াত, এই ভিড়ে এমনিতে কেউ কাউকে লক্ষ না করুক, ভিড়ের

মাথা ছাড়িয়ে তালগাছের মতো উঁচু মাথার সুবিনয়কে সবাই দু' পলক দেখে যাচ্ছে। সুবিনয় যদি এখন থুতু ফেলে, কি ডাবের খোলায় লাথি মারে, বা একটা আধুলি কুড়িয়ে পায় তো সবাই সেটা নজর করবে।

ঠিক এই কারণেই আমার কখনও গড়পড়তা মানুষের ওপরে উঠতে ইচ্ছে হয় না। কখনও কখনও লুকিয়ে পড়া বা পালিয়ে যাওয়ার বড় দরকার হয় মানুষের। বড় মানুষ হলে পালানোর বা লুকোনোর বড় অসুবিধে।

সুবিনয়ের ডান হাতের আঙুলে লম্বা একটা ফিলটার সিগারেট, বাঁ হাতে মাথার চুল পিছন দিকে সটাসট সরিয়ে দিচ্ছে বারবার। এটাই ওর সব সময়ের অভ্যাস।

আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল, ফিল্মহীন ক্যামেরার চোখে এক বার তাকালও আমার দিকে। কিন্তু চিনতে পারল না একদম।

আমি ওকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেছি, তখন হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিল, উপল!

দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাই।

ও খুব বিরক্ত মুখে চেয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

বাজারে।

বাজারে!

বলে সুবিনয় যেন খানিকক্ষণ 'বাজার' শব্দটা নিয়ে ভাবল। শব্দটা কোথায় যেন শুনেছি বলে মনে হল ওর, একটু ভ্রু কুঁচকে চেনা শব্দটা একটু বাজিয়ে নিল বোধহয় মনে মনে। তারপর বলল, কিন্তু তোকে যে আমার খুব দরকার! একটা জায়গায় যেতে হবে।

বলতে কী অন্য কারও চেয়ে সুবিনয়ের ফাইফরমাশ খাটতেই আমার অনিচ্ছা কম হয়। বললাম, বাজারটা সেরে যাচ্ছি।

সুবিনয় হাতঘড়ি দেখে বলল, না, দেরি হয়ে যাবে।

তা হলে?

সুবিনয় জটিল সমস্যাটা মুহূর্তে জল করে দিয়ে বলল, আমি বরং বাজার করছি। তুই এক বার প্রীতির কাছে যা।

এই বলে সুবিনয় পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, এটা দিস।

খামে প্রীতির ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো। সুবিনয় নিজেই বলল, ডাকে দিতে গিয়ে ভাবলাম দেরি হয়ে যাবে পেতে। হাতে হাতে দেওয়াই ভাল। মুখেও বলে দিস।

কী বলব?

বলিস রবিবার।— সুবিনয়ের মুখটা খুবই থমথমে দেখাচ্ছিল।

এ সব সংকেত বুঝতে আমার আজকাল আর অসুবিধে হয় না। গত বছরখানেক এই কর্ম করছি। বাজারের ফর্দ, থলি আর টাকা ওর হাতে দিয়ে বললাম, ক্ষণা বলেছিল, ইঁদুরের বিষ আনতে।

'বিষ' কথাটায় বুঝি অন্যমনস্ক সুবিনয় শিউরে উঠল। বলল, কীসের বিষ?

ইঁদুরের। একটা ছুঁচো খুব উৎপাত করে।

সুবিনয় আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল বাজারমুখো। ভ্রু কোঁচকাল, মুখ গম্ভীর। হঠাৎ বলল, আমার কোম্পানিও প্রোডাকশনে নামছে।

কীসের?

পেস্টিসাইড, ইনসেকটিসাইড আর র‍্যাটকিলার। তার মধ্যে র‍্যাটকিলারটাই ইম্পর্ট্যান্ট। কত লক্ষ টন ক্রপ যেন রোজ ইঁদুরেরা খেয়ে ফেলছে, তুই কিছু জানিস?

অনেক খাচ্ছে শুনেছি।

হুঁ, অনেক। কোম্পানি বলছে এমন একটা পয়জন তৈরি করবে যা ইনস্ট্যান্ট, চিপ, ইজিলি

অ্যাভেইলেবেল হবে। এখনকার র‍্যাটকিলার যেমন আটার গুলি-ফুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয় সে রকম হবে না। বিষটা ইটসেলফ্ ইঁদুরদের কাছে খুব প্যালেটেবল হওয়া চাই। নইলে কোটি কোটি ইঁদুর মারতে হাজার হাজার মন গম খরচ করতে হয়।

কোটি কোটি ইঁদুর নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার পরিচিত মোটা ছুঁচোটাকে নিয়েই আমার একটুখানি উদ্বেগ রয়েছে মাত্র। বললাম, বিষটা তৈরি করে ফেল তাড়াতাড়ি। অত খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়া ঠিক নয়।

কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট জব। ও রকম পয়জন বের করতে পারলে রিভোলিউশনারি ব্যাপার হবে। প্রীতিকে বলিস কিন্তু মনে করে। রবিবার।

এই বলে সুবিনয় রাহাখরচ বাবদ পাঁচটা টাকা আমার দিকে বাতাসে ছুড়ে দিল।

লুফে নিয়ে বলি, হ্যাঁ রবিবার। মনে আছে।

খানিক এসে সুবিনয় বাজারের রাস্তা ধরল। আমি সোজা গিয়ে বাসরাস্তায় উঠে পড়ি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুবিনয় ইঁদুর মারা বিষ কিনতে ভুলে যাবে। ফর্দের প্রথমেই লেখা আছে, ইঁদুরের বিষ। কিন্তু ফর্দটা তেমন লক্ষ করবে কি সুবিনয়? ভুল হবেই।

সুবিনয়ের বেহিসেবি বুদ্ধি। যে চিঠি হাতে হাতে দেওয়া হবে তাতে পঁচিশ পয়সার ডাকটিকিটটা একদম ফালতু খরচ। আমি পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনতে পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে নিই। আর পানের জলে আঙুল ভিজিয়ে সাবধানে খাম থেকে ডাক টিকিটটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখি। যদিও আমি জন্মে কাউকে চিঠি লিখি না, তবু কখন কী কাজে লেগে যায় কে বলবে!

৫

গোলপার্কের কাছে একটা দারুণ ফ্ল্যাটে এক বান্ধবীর সঙ্গে প্রীতি থাকে। সুবিনয়ের একটু দূর সম্পর্কের শালি। এখন অবশ্য প্রীতিকে আর সুবিনয়ের শালী বলা যায় না। এইসব প্রাথমিক স্তর ওরা অনেককাল অতিক্রম করে এসেছে।

কী করে ব্যাপারটা হয়েছিল তা আমি সঠিক জানি না। তবে এটা ঠিকই যে, প্রীতি দেখতে চমৎকার। ছোটখাটো, রোগা, আর খুব ফরসা চেহারা প্রীতির। এমন একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব ওকে ঘিরে থাকে যে, রক্তমাংসের মানুষ বলে মনেই হয় না। ঘাড় পর্যন্ত বব করা হলেও ওর মাথার চুল অসম্ভব ঘন। তেলহীন, একটু রুক্ষ চুলের মাঝখানে মুখখানি টুলটুল করে। বড় দু'খানা চোখ, পাতলা নাক; পুরন্ত ঠোঁট, থুতনির গভীর খাঁজ। অর্থাৎ, সুন্দর হওয়ার জন্য যা যা লাগে সবই স্টকে আছে। বাঁ গালে এক ইঞ্চি লম্বা একটা জড়ুল আছে। অন্য কারও হলে জড়ুলটাই সৌন্দর্যহানি ঘটাত, কিন্তু প্রীতির সৌন্দর্য এমনই যে জড়ুলটাকে পর্যন্ত সৌন্দর্যের খনি করে তুলেছে।

প্রীতি কেমিস্ট্রির এম এসসি। ডক্টরেট করতে আমেরিকা গিয়েছিল চার বছরের জন্য।

যত দূর জানি, আমেরিকায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রীতি সুবিনয়ের শালিই ছিল। এমনকী মাঝে মাঝে প্রীতি তার জামাইবাবুর কাছে পড়াশুনো করতেও আসত। আমেরিকায় যাওয়ার আগে সে নাকি সুবিনয়কে বলেছিল, একা একা সাত হাজার মাইল দূরের দেশে যেতে যা ভয় করছে না জামাইবাবু! আপনি যদি সঙ্গে যেতেন তো বেশ হত।

সুবিনয় ফি-বছরই এক-আধবার ইউরোপ, আমেরিকায় যায়। দু'-চার-ছ' মাস থেকে আসে। যেবার প্রীতি গেল তার ছ' মাসের মধ্যে সুবিনয়ও গেল আমেরিকায়। ওদের সম্পর্কটা হয়তো সেখানেই পালটে যায়। শুনেছি, সেটা বেশ খোলামেলা ফুর্তির দেশ, অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। বিস্মহীন সুবিনয় এমনিতে মেয়েদের খুব একটা লক্ষ করে না, কিন্তু বিদেশে গিয়ে সুন্দরী শালিটির

সৌন্দর্য বোধহয় সে প্রথম লক্ষ করল। যখন ফিরে এল তখন সে অসম্ভব অন্যমনস্ক আর নার্ভাস। ডক্টরেটের জন্য প্রীতি আমেরিকায় রয়ে গেছে, আর এদিকে আমেরিকা শব্দটা শুনলেই সুবিনয় চমকে ওঠে। ক'মাস চিঠি আর টেলিগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্যপরায়ণ ডাকবিভাগকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সে। আমার ধারণা, ম্যাসাচুসেটসের যে-কোনও ডাকপিয়নই প্রীতি রায় নামটা শুনলেই আজও আঁতকে উঠে বলবে, প্রীতি এগেইন। ওঃ মাই গড!

সুন্দরবন থেকে ফিরে তখন কলকাতায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে ঘুরতে টাকা ধার করার চেষ্টা করি। সুবিনয়কেও বার কয়েক ট্যাপ করলাম। ও কয়েক বারই বিনা প্রশ্নে এবং মুখ বেজার না করে ধার দিয়ে গেল। শোধ হবে না জেনেও। তারপর একদিন বলল, তুই আমার বাড়িতে এসে কয়েক দিন থাক। তোর সঙ্গে আমার দরকার আছে।

আমার মনটা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল। ঠিক এইরকমই আমি চাই। অন্যের সাজানো সুখের সংসারের এককোণে বেশ নিরিবিলিতে থেকে যাব। পোষা বেড়াল-কুকুরের মতো। ঝামেলা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই।

আমি তো জেনে গেছি, দুনিয়াতে আমার আর বেশি কিছু করার নেই, হওয়ার নেই।

আমি যখন সুবিনয়ের বাড়ি প্রথম আসি তখন এই চিঠির যুগ চলছে। সেইসব চিঠির অধিকাংশই আমার নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলা। এর কিছুকাল বাদে প্রীতি ফিরে এসে কলেজে চাকরি নিল।

যাতায়াতের জন্য সুবিনয় যে রাহাখরচ দিয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় বহুগুণ বেশি। এখন মনে হতে পারে যে, সুবিনয়ের কাছে ভাঙানি ছিল না বলেই, গোটা পাঁচ টাকার নোটটাই দিতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সুখের ব্যাপার হল, যেদিনই প্রীতির কাছে আমাকে কোনও চিঠি বা খবর নিয়ে যেতে হয় সেদিনই সুবিনয়ের কাছে ভাঙানি থাকে না, পাঁচ বা দশ টাকার নোট দিতে হয়। আর কোনও দিনই সে ফেরত পয়সা চায় না।

আমার মনে হয়, এই রাহাখরচের বহুগুণ বেশি টাকা দেওয়ার মধ্যে একটা নিঃশব্দ কাকুতি-মিনতি আছে। টাকাটা প্রায় সময়েই আমার পকেটের মধ্যে খচমচ শব্দ করে দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে অনুরোধ করে, বোলো না, কাউকে বোলো না।

আমি বলতে যাব কোন দুঃখে! বলার কোনও মানেও হয় না। আমার সন্দেহ হয়, যদি আমি বলেও দিই তা হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে, উপলটা তো গাড়ল, কত আগড়ম-বাগড়ম বলে।

বহু কষ্টে এই গাড়লত্ব আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। ভেবে দেখেছি, চূড়ান্ত গাড়ল না হলে দুনিয়াতে টিকে থাকা মুশকিল। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই হাফ বুদ্ধিমান হয়ে জন্মায়, তারপর কেউ কেউ পুরো বুদ্ধিমান হওয়ার বৃথা চেষ্টায় আয়ুক্ষয় করে, কেউ কেউ বিনা চেষ্টায় গাড়ল হতে থাকে। আমি বরাবর এই দু' নম্বরি দলের।

গাড়লদের সবচেয়ে বড় গুণ হল, তারা ওপরসা-ওপরসা দুনিয়াটাকে দেখে, আর ভাবে, দুনিয়াটা খুব স্বাভাবিকভাবে চলছে। দিন হচ্ছে, বাতাস বইছে, কীটপতঙ্গ পশু-পাখি মানুষ সব বিষয়কর্মে ব্যস্ত রয়েছে, গাছে ফুল ফুটছে, আকাশে চাঁদ উঠছে, রোজ খবরের কাগজ বেরোচ্ছে বা রেডিয়োতে গান হচ্ছে, মেয়ে-পুরুষরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর করছে। ন্যায্য জীবন যে-রকম হয় আর কী! বেশ চলছে সব কিছু। গাড়লরা কখনও দুনিয়ার গায়ের এই স্বাভাবিকতার জামাটা তুলে ভিতরের খোস-পাঁচড়া, দাদ-চুলকুনি দেখার চেষ্টা করে না।

আমিও করি না। সুবিনয়ের প্রীতিকে দেওয়া এইসব চিঠি বা কথার সংকেতের মধ্যে কী জিনিস লুকিয়ে আছে তা যেমন গাড়ল পাবলিকের জানার কথা নয়, তেমনি আমিও না-জানার চেষ্টা করি।

রবিবার। রবিবার। আমার অবশ্য পুরো জীবনটাই রবিবার। স্কুল-কলেজে এক হপ্তায় আরও

ছ'টা দিন ছিল, বাস-কন্ডাক্টরি করার সময়ে হপ্তায় রবিবারটাও ঘুচে পুরো সাতটা কাজের দিন হল। তারপর সাত-সাতটা কাজের দিন জীবনের ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলে এক অচেনা মাস্টারমশাই চকখড়ি দিয়ে কেবল রবিবার কথাটা লিখে দিলেন। রোজ সেই কথাটা আমি ব্ল্যাকবোর্ড থেকে মুখস্থ করি।

রবিবার নিয়ে আমি খুব বেশি কিছু ভাবতে চাই না। সুবিনয় বা প্রীতির রবিবার কেমন সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ গাড়ল থাকতে চাই।

যে বন্ধুর সঙ্গে প্রীতি বসবাস করে তার নাম রুমা মজুমদার। হাওড়া জেলা মহিলা ভলিবল টিমের প্রাক্তন খেলোয়াড় রুমা বিদ্যুতের গতি আর বজ্রের মতো জোরালো স্ম্যাশ করে বিস্তর পয়েন্ট করেছিল এককালে। তার নামই ছিল স্ম্যাশিং রুমা। এক বার বাংলা দলেও খেলেছিল। হাওড়ায় বাস কন্ডাক্টরি করার সময়ে একবার গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে দু' দিন জিরেন নিচ্ছি, সে সময়ে ডালমিয়া পার্কে মেয়েদের ম্যাচ প্র্যাকটিস হচ্ছে। আমরা কয়েকজন চ্যাংড়া-প্যাংড়া মেয়েদের উরু দেখব বলে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। লাল রঙের খাটো প্যান্ট আর সাদা জামা পরা মস্ত চেহারার রুমাকে তখনই দেখি, উড়ন্ত বলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ আটকে আছে, চিতাবাঘের মতো লাফানোর আগে একটু কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ পাকানো শরীরটাকে হাউইয়ের মতো শূন্যে তুলে ডান বা বাঁ হাতে হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিচ্ছে বলে, সেই বসান খেয়ে তোড়ে চোটে বলটা যেন ধোঁয়াটে মতো হয়ে যেত, চোখে ভাল করে ঠাহর হওয়ার আগেই মাটিতে মাথা ঠুকে রুমাকে পয়েন্ট এনে দিত। লম্বা, কালো জোরালো চেহারা। ভাল দৌড়ত, হাইজাম্প দিত, ডিসকাস ছুড়তে পারত, গঙ্গার সাঁতারে কয়েকবার জিতেছে। এখন সরকারি দফতরের ছোট অফিসার। খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছে। মাঝেসাঝে একটু-আধটু সাঁতরায় বা টেবিল টেনিস খেলে। অফিসে তার অধস্তনরা তাকে যমের মতো ভয় খায়।

রুমার চেহারাটা একটু বন্য প্রকৃতির হলেও আর মুখে একটু মেদহীন চোয়াড়ে ভাব থাকলেও ভয়াবহ কিছু নেই। বরং আর পাঁচটা লাফ-ঝাঁপ করা মেয়ের তুলনায় সে দেখতে ভাল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে এমন এক তাচ্ছিল্য আর ঠোঁটে এমন এক বক্র হাসি যে মুখোমুখি হলেই কেমন এক অস্বস্তি হতে থাকে। আর মুশকিল এই যে, পুরুষদের সে দু'চোখে দেখতে পারে না। উইমেনস লিব-এর সে একজন গোঁড়া সমর্থক। ছেলে-মেয়েদের প্রেম ভালবাসাকে সে 'পশুর মতো আচরণ' বলে মনে করে। অসম্ভব সিগারেট খায় রুমা। দিনে তিন প্যাকেট। ধোঁয়া দিয়ে নিখুঁত রিং ছাড়তে পারে।

পাড়ার বখাটেরা পর্যন্ত রুমাকে আওয়াজ দেয় না। এক বার একটি ফাজিল ছোঁড়া তাকে 'ক্লিওপেট্রা' বলে ডেকেছিল, রুমা তাকে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছ থেকে ধাওয়া করে রেল লাইন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য ছেলেটা ডাউন ট্রেনে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

রুমা মজুমদারের জন্যই প্রীতির দোতলার এই ফ্ল্যাটে আসতে আমার কিছু ভয় ভয় করে। প্রথম দিন আমাকে দেখেই রুমা খুব রক্ত-জল করা ঠান্ডা গলায় বলেছিল, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো! মুখটা চেনা-চেনা লাগছে!

সেই শুনে ভয়ে আমি সিঁটিয়ে যাই।

হয়েছিল কী, সেই ডালমিয়া পার্কে দু' দলের ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় দু'-চারজন সুযোগ সন্ধানী মতলববাজ দর্শক উপস্থিত ছিল। প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোক সব। ময়দানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের হকি খেলা দেখতে যারা ভিড় করে তাদেরই সমগোত্রের লোক। খুব বাহবা বা হায় হায় দিচ্ছিল খেলা দেখে, যেন ও খেলার ওপর দেশের সম্মান নির্ভর করছে। যেই রুমার দল শেষ সেট জিতে ম্যাচ নিল অমনি সেই ভদ্রবাবুরা দৌড়ে গিয়ে কোর্টে ঢুকে যে যাকে পারে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানানোর চেষ্টা করেছিল। একজন লোক মেয়েদের চুমু খাওয়ারও চেষ্টা করে। মেয়েরা

অতিষ্ঠ হয়ে রাঙামুখে পালানোর চেষ্টা করছে। সেই দেখে হঠাৎ হরির লুটের গন্ধ পেয়ে আমি বিনি মাগনা একটা মেয়েছেলের গা ছোঁব বলে নেমে পড়েছিলাম। কপাল মন্দ। আমি হাতের সামনে এই রুমাকেই পেয়ে গিয়েছিলাম, যে কিনা এক নম্বরের ম্যানহেটার। 'সাবাস' বলে চেঁচিয়ে যেই তাকে ধরতে গেছি অমনি কসরত করা মেয়েটা এক পা পিছিয়ে চটাং করে একটা চড় মেরেছিল বাঁ গালে। আমার মাথাটা ভলিবলের মতোই সেই স্ম্যাশে জমি পর্যন্ত নেমে গেল, সেইসঙ্গে আমার গোটা শরীরটাও।

কাজেই আমি রুমাকে কখনও দেখেছি বলে স্বীকার করিনি। বলেছি, কোথায় আর দেখবেন! আমি তো হাওড়ার লোক নই।

সেই রুমাই আজ দরজা খুলল। পরনে গোলাপের ছাপওলা হাউসকোট, বুকের দিকটায় তিনটে বোতাম লাগানো নেই বলে হাউসকোটের তলায় স্পোর্টস গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। গেঞ্জির সহনশীলতাকে চরম পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে ওর বুকের দুর্দান্ত মেয়েমানুষি।

ভয় খেয়ে চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে তাকাই।

নিরুত্তাপ গলায় রুমা বলে, কী খবর?

রুমা সুবিনয়ের চিঠির খবর জানে না। সে জানে, আমি প্রীতির দিদির বাড়ি থেকে খোঁজ নিতে আসি। কিন্তু এই ঘন ঘন আসাটাকে সে বড় ভাল চোখে দেখে না।

আমি নিচু স্বরে বলি, ক্ষণা পাঠাল।

রুমা তেমনি উদাস স্বরে বলল, প্রায়ই পাঠাচ্ছে। আসুন ভিতরে, প্রীতি আছে।

বলে রুমা সামনের ঘর দিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল। একটু বাদেই ও-ঘর থেকে স্টিরিওতে ট্যাংগো নাচের বিকট জোর বাজনা শুনতে পেলাম। ট্যাংগো কি না তা আমি সঠিক জানি না, জোরালো বিদেশি বাজনা মাত্র-ই আমার কাছে ট্যাংগো।

সামনের ঘরটায় প্রীতি থাকে। ঘরের দুটি দিক বুক-শেলফ বোঝাই। এক ধারে সিঙ্গল খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ঘোরানো যায় এমন চেয়ার। মস্ত আলমারির একটা আধ-খোলা পাল্লা দিয়ে ভিতরে শাড়ির বন্যা দেখা যাচ্ছে। মেঝেয় একটা টমেটো রঙের নরম উলের কার্পেট, সেখানেও বই-খাতা পড়ে আছে।

প্রীতি টেবিলে ঝুঁকে কিছু লিখছিল। সম্প্রতি এক কলেজের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হয়েছে সে। বড়লোকের মেয়ে হওয়ায় দেদার টাকা ওড়াতে পারে।

আমি ঢুকতেই দেখি প্রীতি তার স্বপ্নঘেরা মুখখানা ফিরিয়ে দরজার দিকেই চেয়ে আছে। হাতের কলমটা নিক্ষেপে উদ্যত ছুরির মতো ধরা। প্রীতি দেখতে যতই সুন্দর হোক, রাগলে ওর কালো জভুলটা লালচে হয়ে যায়, এটা ক'দিন লক্ষ করেছি। আজও জভুলটা লালচে দেখাচ্ছিল।

আমি খুব বেশি সাহস পেলাম না কাছে যাওয়ার। ঘরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুখে একটু বিনীত হাসি নিয়ে এগিয়ে ব্রেক কষলাম।

প্রীতি খুব বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু আমার কাজ তো আমাকে করতেই হবে। চিঠিটা বের করে দূর থেকে একটু আলগা হাতে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, রবিবার।

রবিবার কী?— প্রীতি দাঁতে কলমটা কামড়ে ঠান্ডা চোখে চেয়ে বলল।

আমি আর জানি না।— বললাম।

প্রীতি চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, আপনারা দু'জনেই পাগল। জামাইবাবুকে বলবেন, রবিবার নয়, কোনও বারই না। আমি আর এ সব প্রশ্রয় দেব না।

আমি ফের বললাম, রবিবারটা মনে রাখবেন।

বলেই পিছু হটে দরজার নাগালে পৌঁছে যাই প্রায়। প্রীতি চিঠিটা নেড়ে আমাকে ডেকে বলল, উপলবাবু, একটু শুনুন।

আমি দাঁড়াই। প্রীতি উঠে কয়েক পা কাছে আসে, তারও পরনে হালকা গোলাপি রঙের হাউসকোট। বোতাম সব লাগানো। পিছনে হাত রেখে সে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, আপনি তো জানেন, জামাইবাবু এ সব চিঠিতে আবোল-তাবোল সব কথা লেখেন। জানেন তো!

না। আমি কখনও খুলে পড়িনি।— ভয়ে ভয়ে বলি।

পড়েননি!— বলে প্রীতি যেন একটু চিন্তিত হয়, বলে, পড়েননি কেন?

যাঃ, পরের চিঠি পড়ে না, কেন খুব যা-তা লেখে নাকি?

প্রীতি চিঠিটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, আমি এটা এখনও পড়িনি। পড়বার ইচ্ছেও নেই। আপনি বরং পড়ে দেখুন। উনি একদম পাগল হয়ে গেছেন। এরপর আমি ক্ষণাদিকে জানাব।

একটু ভড়কে যাই। গলা খাঁকারি দিয়ে বলি, এ চিঠিটা হয়তো অনুতাপের। পড়ে দেখুন না!

প্রীতি খুব করুণ হেসে বলল, বেচারা!

কে?

আপনি।

প্রীতি চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মাথার খাটো চুল দু'হাতে পেছনের দিকে সরিয়ে চুলের গোড়া মুঠো করে ধরে রইল খানিকক্ষণ। খুবই মনোরম ভঙ্গি। নানা উদ্‌বেগ সত্ত্বেও আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। প্রীতি আমার মুখের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, অনুতাপের চিঠি হলে রবিবার কথাটা মুখে বলে পাঠাত না। উপলবাবু, আপনি কি রবিবার কথাটারও অর্থ জানেন না?

আমি যথেষ্ট গাড়ল হওয়ার চেষ্টা করে বলি, সপ্তাহের সপ্তম দিন।

প্রীতি গভীর শ্বাস ফেলে বলে, বেচারা।

কে?

আপনি?

কেন?

রবিবার কথাটার অর্থ অত সহজ নয়। জামাইবাবু চান, রবিবারে আমি একটা বিশেষ জায়গায় ওঁর সঙ্গে দেখা করি। আপনাকে দিয়ে ও অনেক বারই অনেক কথা বলে পাঠিয়েছে। যেমন কার্জন পার্ক কিংবা বিজলি সিনেমায় ছ'টার শো কিংবা স্যাটারডে ক্লাব। আপনি কি কখনও এ-সব কথা ডিসাইফার করার চেষ্টা করেননি?

না। তবে খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম।

বসুন। আপনাকে কয়েকটা কথা বলব।

বলে প্রীতি তার নিজের ঘুরন্ত চেয়ারে ফিরে গেল। আমি একটা টুল গোছের গদি-আঁটা নিচু জিনিসের ওপর বসলাম। কত রকম আসবাবপত্র আছে দুনিয়ায়, সবগুলোর নাম কি আর জানি! যেটার ওপর বসেছি সেটা কী বস্তু তা আজও জানা নেই।

প্রীতি চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে বলল, কোম্পানি থেকে জামাইবাবুকে সাউথ এন্ড পার্কে একটা দারুণ ফ্ল্যাট দিয়েছে, আপনি জানেন?

আমি মাথা নিচু করে রাখি। দুর্ভাগ্যবশত ফ্ল্যাটের কথা আমি জানি এবং এমনকী সুবিনয়ের নির্দেশমতো সেই ফ্ল্যাটটা নানা আসবাবপত্র দিয়ে আমাকেই সাজাতে হয়েছে। প্রায়ই সেখানে সুবিনয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়।

প্রীতি আমার অপরাধবোধের ভাবটা লক্ষ না-করেই বলল, ফ্ল্যাটটা এখান থেকে খুব দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ফ্ল্যাট পেয়েও জামাইবাবু সেখানে তার ফ্যামিলি শিফট করেনি। কেন জানেন?

আমি গলা খাঁকারি দিই। পাশের ঘরে ট্যাংগো থেমে গেছে। পরদা সরিয়ে এক বার দরজার ফ্রেমে রুমা এসে দাঁড়াল, বলল, এনি ট্রাবল প্রীতি?

প্রীতি ঘাড় নেড়ে বলল, না।

তা হলে আমি বাথরুমে যাচ্ছি।— বলে চলে যাওয়ার আগে খুব কূট সন্দেহের চোখে রুমা আমাকে এক বার দেখে নিল। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। বাঙালি মেয়েরা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

প্রীতি একটু দুষ্টু হেসে বলল, আপনি এলেই রুমা ও ঘরে স্টিরিয়োতে লাউড মিউজিক বাজায় কেন জানেন?

না তো! তবে বাজায় লক্ষ করেছি।

ওর ধারণা, আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসেন।

বুকটা কেঁপে গেল। আমি এবার সত্যিকারের গাড়লের মতো বলে ফেললাম, মাইরি না।

বেচারা!— প্রীতি বলল।

কে?

আপনি।

এই নিয়ে এ ডায়লগ তিন বার হল। আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

প্রীতি বলল, রুমা প্রেম-ট্রেম দু'চোখে দেখতে পারে না। তাই পাছে আপনার আর আমার প্রেমের কথাবার্তা ওর কানে যায় সেই ঘেন্নায় আপনি এলেই ও স্টিরিয়ো চালায়। বেচারা!

কে?

রুমা।

আমি স্বস্তির শ্বাস ফেলি।

প্রীতি গভীর অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, তবু তো রুমা আসল ব্যাপারটা জানে না। যদি জানত, একজন লোক যার স্ত্রী এবং সন্তান আছে, সে সব ভুলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে তা হলে বোধহয় সুইসাইড করে বসত।

আমিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর কী করব? প্রীতি এই ক'দিন আগেও এত ভাল মেয়ে ছিল না। সুবিনয়কে লেখা ওর বেশ কিছু চিঠি আমি হাতসাফাই করেছি। গত সপ্তাহেও সুবিনয়ের ফ্ল্যাটের ঠিকানায় প্রীতির চিঠি গেছে। সুবিনয়টা নিতান্ত গাড়ল, প্রীতির চিঠিপত্র সে যেখানে-সেখানে বেখেয়ালে ফেলে রাখে। ক্ষণা কখনও খুলে পড়লে সর্বনাশ। কিন্তু অসময়ে কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি কয়েকখানা চিঠি সরিয়ে রেখেছি। সেগুলো আমার কানা মাসির কাছে জমা আছে।

প্রীতি বলে, হ্যাঁ, সেই ফ্ল্যাটটার কথা। জামাইবাবুর খুব ইচ্ছে আমাকে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে সংসার পাতে। তার জন্য ক্ষণাদিকে ডিভোর্স করবে বলেও ঠিক করেছে। যত দিন ডিভোর্স না হয় তত দিন আমার সঙ্গে এ রকম রবিবারে রবিবারে ওই ফ্ল্যাটে কাটানোর খুব শখ জামাইবাবুর।

আমি যথেষ্ট লজ্জিত হওয়ার ভান করি।

প্রীতি বলল, বেচারা!

কে?

জামাইবাবু। ম্যাসাচুসেটসেও আমাকে ভয়ংকর জ্বালাতন করতে শুরু করেছিল। তারপর ফিরে এসে এত চিঠি লিখেছিল যে সে চিঠি সব পড়তে গেলে রিসার্চ বন্ধ করতে হয়।

আমি মুখভাবে সমবেদনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। যদিও জানি, এটা প্রীতির আসল কথা নয়। অন্য একটা কিছু আছে এর মধ্যে।

প্রীতির ঘোরানো চেয়ারটা খুব ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে ঘুরে যাচ্ছিল। ভ্রূ কুঁচকে কী একটু ভাবতে ভাবতে প্রীতি আস্তে করে বলল, ওঁকে বুঝিয়ে বলবেন, এ হয় না। আমি অবশ্য এ সব নোংরামি থেকে পালানোর জন্য আবার আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। মিনেসোটার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও হাতে এসেছে।

বলে টেবিলের বইপত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বার আগে প্রীতি একটু হেসে বলল, আপনি অত বোকা সেজে থাকেন কেন বলুন তো! এ সব কি আপনি টের পেতেন না! আপনিই জামাইবাবুর মিডলম্যান, আপনার জানা উচিত ছিল।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বলি, আজ তা হলে আসি।

প্রীতি বলল, আসি-টাসি নয়। বলুন যাই। আর আসার কোনও প্রভিশন না-রাখাই ভাল। আপনিও খুব ভাল লোক নন উপলবাবু।

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম।

প্রীতি বলল, বেচারা!

কে?

আমি নিজেই।

আমি সকালে তেমন কিছু খাইনি, ক্ষণা দুটো বিস্কুট দিয়ে চা দিয়েছিল। সুবিনয় আজকাল ফ্যাট হওয়ার ভয়ে আর কর্মক্ষমতা এবং যৌবনরক্ষার জন্য খাওয়া-দাওয়ার খুব কাটছাঁট করেছে। সেই মাপে আমারও খোরাক কমাচ্ছে ক্ষণা। কিন্তু আমার ফ্যাটের বা কর্মক্ষমতার বা যৌবনহানির কোনও ভয়ডর নেই, আমার বাস্তবিক খিদে পায়। এখনও পেয়েছে। প্রীতিদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে নিজের ভিতরে মাঠের মতো মস্ত ধু ধু খিদেটাকে টের পেয়ে অসম্ভব খেতে ইচ্ছে করছিল। অনেকক্ষণ ধরে গোগ্রাসে খেলে তবে যেন খিদেটা যাবে। মুখ রসস্থ, শরীরটা চনমনে।

পকেটে পাঁচ টাকার কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। রেস্টুরেন্টে বসে খেলে এক লহমায় ফুরিয়ে যাবে, পেটও ভরবে না। এ সব ভাবতে ভাবতে আধাআধি সিঁড়ি নেমেছি, এ সময়ে তলার দিক থেকে আর-একটা লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। অল্প বয়সের যুবক, ভীষণ অভিজাত আর সুন্দর চেহারা। খুব লম্বা-চওড়া নয়, কিন্তু ভারী ছমছমে শরীর তার। পরনে হাঁটুর কাছে পকেটওলা নীলরঙের জিনস্, গায়ে ক্রিমরঙা দুটো বুক পকেটওলা একটা জামা, পায়ে সম্বরের গোড়ালি-ঢাকা বুট, চোখে একটা বড় চশমা, হাতে মস্ত একটা ঘড়ি, ঘাড় থেকে স্ট্র্যাপে একটা ব্যাগ ঝুলছে। এক পলকেই বোঝা যায়, এ লোকটা বিদেশে থাকে, বা সদ্য বিদেশ থেকে এসেছে। শিস দিতে দিতে তরতর করে উঠে আসছিল, আমার মুখোমুখি পড়ে 'এক্সকিউজ মি' বলে দেয়ালের দিকে সরে গেল। তার মুখে একটু মেয়েলি কমনীয়তা আছে, খুব ফরসা রং, চোখের দৃষ্টির মধ্যে যে সুদূরতা মিশে আছে তা দেখলে বোঝা যায়, এ খুব পড়াশুনা করেছে বা করে। ব্যাগের গায়ে লেখা 'প্যান-অ্যাম'। আমাকে পেরিয়ে ওপরে উঠে গেল যুবকটি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, প্রীতিদের আধ-খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যুবকটি ভালবাসার গলায় ডাক দিল, প্রীতি!

আমি তাড়াতাড়ি নেমে আসতে থাকি। আমি চাই না, প্রীতি এই অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলুক। নামবার সময়ে ভাবতে থাকি, যদি কখনও এই যুবকটির সঙ্গে সুবিনয়ের মারপিট লাগে তবে কে জিতবে! সুবিনয়েরই জেতবার কথা, যদি এ ছোকরার কোনও মার্কিন প্যাঁচ ফ্যাঁচ জানা না থাকে।

কিন্তু পৃথিবীর সুখী মানুষদের এ সব প্রেম-ভালবাসার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা আমার এখন নয়। খিদেটা অসম্ভব চাগিয়ে উঠেছে। খিদের মুখে সবসময়ে খাবার জুটবে এমন বাবুগিরির অবস্থা আমার নয়। খিদে পেলেও তা চেপে রাখার অভ্যাস আমার দীর্ঘকালের। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয়, খাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠি। তখন সব রকম রীতিনীতি ভুলে কেবল একনাগাড়ে গবগব করে খেতে ইচ্ছে করে।

খিদের মুখে মাসির কথা আমার মনে পড়বেই।

মেডিকাল কলেজের উলটো দিকে আরপুলি লেন দিয়ে ভিতরে ঢুকে মধু গুপ্ত লেন ধরে এগোলে প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ি। বাড়ি প্রকাণ্ড হলেও শরিকানার ভাগাভাগি আছে। তবে সামনের দিকের বড় একটা অংশই বড়বাবুর দখলে। বাড়ির সামনে বড় একটা দরজা, দরজার দু'দিকে চওড়া টানা দুটো রক। বাঁ দিকের রক বড়বাবুর, ডান দিকের রক ছোটবাবুর। বাইরের লোকজনের লিমিট এই রক পর্যন্ত, এর ভিতরে আর বড় কেউ একটা ঢুকবার অনুমতি পায় না। প্রায়ই দেখি, কেউ দেখা করতে এলে বড়বাবু তাঁর রকে বা ছোটবাবু তাঁর রকে এসে দাঁড়ান। দু' ভাইয়ের রংই ফরসা টকটকে, বেশি লম্বা না হলেও পেট-কাঁধ-বুক-পায়ের গোছা নিয়ে বিশাল চেহারা, পরনে গামছা, খালি গা ও পা। রকে রাজারাজড়ার মতো বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়ান, প্রয়োজন হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তেমনি দাঁড়িয়ে কথা বলেন, কখনও অভ্যাগতকে ভিতর-বাড়িতে নেওয়ার নাম করেন না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, গামছা পরে আছেন কেন, তা হলে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সকালে বা বিকেলে দু' ভাই-ই একই উত্তর দেন, এই তো, এবারে গা ধুতে যাব।

আসলে গা ধুতে যাওয়ার কথাটা স্রেফ মামদোবাজি। আমি জানি দু' ভাই-ই বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে সবসময়ে গামছা পড়ে থাকেন। অবশ্য তাঁদের গামছার প্রশংসা না করাটা অন্যায় হবে। তাঁরা যে গামছা পরে থাকেন তা বাজারের সেরা জিনিস।

বড় ভাই গিরিবাবু এক সময়ে দারুণ ঘুড়ি ওড়াতে পারতেন, এখন পায়রা পোষেন, পাশা খেলেন। চেহারার মধ্যে একটা সব পেয়েছির তৃপ্ত ভাব। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখাই যে জীবনের সব সার্থকতার মূলে তা বোঝাতে থাকেন।

এ বাড়িতে আমিও বহু বার রক থেকে ফিরে গেছি। আজকাল অন্দরে ঢুকতে বাধা হয় না। বিয়ে-পৈতে-পাল-পার্বণ বা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য হলেও মাসি আমাকে নেমন্তন্ন জুটিয়ে দেয় এ বাড়িতে। সেই থেকে ভিতর-বাড়িতে ঢোকার ভিসা পাওয়া গেছে। মিথ্যে বলব না, বড়বাবু, ছোটবাবু বা এ বাড়ির অন্যসব পুরুষদের কিছু বংশগত বদ দোষ আছে। কিন্তু এ বাড়িতে যখন নেমন্তন্ন করে কাউকে খাওয়ানো হয় তখন আয়োজন দেখে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়। ছ' রকমের ভাজা, শুকতুনি, দু' রকম ডাল, তিন ধরনের মাছ, মাংস, ডিম, চাটনি, দই মিষ্টির সে এক দিশেহারা ব্যাপার। কিন্তু অসুবিধে হল, আমি যখন এই প্রলয়ংকর ভোজের ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি তখন আমার পাশে বসেই অনর্গল কথা বলতে বলতে বড়বাবু এবং নিস্তব্ধ মুখে বড়বাবুর ছানাপোনারা অতি সাধারণ ডাল তরকারি মাছের ঝোল দিয়ে সাদামাটা খাওয়া সেরে মাথা নিচু করে বসে আছে। এ বাড়ির এই নিয়ম। বাইরের লোকের জন্য এক আয়োজন, বাড়ির লোকদের জন্য আর-এক। মাসি আমাকে একবার কানে কানে সাবধান করে দিয়েছিল, খেতে বসে— এ বাড়িতে কিন্তু কোনও পদ আর-এক বার চাসনে। ওদের বাড়তি জিনিস থাকে না।

যা যা থাকলে মেয়েদের সুন্দর বলা যায় তার যদি একটা বিশ দফা ফর্দ করা হয় তবে তার মধ্যে ষোলো দফাই বড়বাবুর মেয়ে কেতকীর সঙ্গে মিলে যাবে। গায়ের রং বড়বাবুর মতোই ফরসা, চেহারা লম্বাটে গড়নের, মুখখানা এত মিষ্টি যে মনে হয় পিঁপড়ে ধরবে। ভারী একটা সরল মুগ্ধতার হাবভাব আছে তার মধ্যে। যার দিকে চায়, যেদিকে চায় তাকেই বা সেটাকেই যেন ভালবেসে ফেলে। এই বিভ্রান্তকারী দৃষ্টি যার ওপর পড়ে সেই ভুল করে ভেবে ফেলতে পারে যে, কেতকী তার প্রেমে পড়েছে। গয়লা শিউপূজন থেকে শুরু করে পাড়ার ছেলেছোকরা এবং এমনকী আমি পর্যন্ত ভাবি। কেতকীর কটাক্ষের প্রভাব ক্যানসারের মতো সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। ট্রেনের কামরায় বা বাসের জানালায় যারা একঝুঁকে তার চোখে চোখ রাখতে পেরেছে তাদের কেউই বোধহয় আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। এইরকম হিসেব ধরলে সারা কলকাতায়

এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে কেতকীর প্রেমিক অগুনতি। কেতকীর নামে ডাকে এবং হাতে রোজ যত চিঠি আসে তার হিসেব এবং ফাইল রাখতে একটা পুরো সময়ের কেরানি দরকার।

বড়বাবু কেরানি রাখেননি, তবে কেতকীর ভাইদের অবসর সময়ের একমাত্র কাজ হল চিঠি-ধরা। দরজার ফাঁকে, জানালার ফোকরে, ডাকবাক্সে, বইয়ের ভাঁজে, ঘরের জলনিকাশী ফুটোয়, ভেন্টিলেটারে সর্বদাই তারা চিঠি খুঁজছে এবং পাচ্ছে। এমনকী ছাদে ঢিল-বাঁধা চিঠিও প্রতি দিনই বেশ কিছু এসে পড়ে। প্রেমিকদের প্রাবাল্য দেখে বড়বাবু একসময়ে ঠিক করেছিলেন কেতকীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু কেতকী পড়াশুনোয় সাংঘাতিক ভাল হওয়ার ফলে সেটা আর হয়নি। কেতকী এখন এম এ পাশ করে মঙ্গলকাব্যে নারীর সাজ নিয়ে রিসার্চ করছে। দুটো গুমসো গুমসো ভাই সঙ্গে করে ইউনিভার্সিটি বা লাইব্রেরিতে নিয়ে যায় নিয়ে আসে।

আজ ছোটবাবুর রকে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। নতুন রাঙা গামছায় তার চেহারার বড় খোলতাই হয়েছে। বাঁ হাতে তেলের শিশি থেকে ফোঁটা মেপে ডান হাতের তেলোয় তেল নিয়ে চাঁদিতে পালিশওলা ছোকরা যেমন বেগে বুরুশ চালায় তেমনি ঘষছেন। এ বাড়ির পুরুষরা চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারেন না, আমাকে দেখেও ছোটবাবু বিকট চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাই য্যা উপলচন্দোরকে দেখছি যেন! অ্যাঁ!

ছোটবাবুর পায়ের ডিম দেখে অবাক মানতে হয়। গোদ নেই, তবু পা কী করে অত মোটা হয় তা গবেষণার বিষয়। ছোটবাবুও আমার চোখ দেখে ব্যাপারটা ধরে ফেলে তেমনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এ আর কী দেখছ ভায়া, সে বয়সে দেখলে ভিরমি খেতে। এমন মাস্‌ল্ ড্যানসিং করেছি যে জজ ব্যারিস্টার পর্যন্ত দেখতে এয়েছে।

অমায়িক হেসে বড়বাবুর অংশে ঢুকতে ঢুকতে শুনি, ভিতরে বড়বাবু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছেন, অ্যাঁ, ডিম এনেচ্যা! ডিমের গুষ্টির তুষ্টি করেছি। যা ফেলে দিগে যা। কাল থেকে পোনা মাছের টক খাব বলে পই পই করে বলে রাখলুম, গুষ্টির মাথা গুচ্ছের ডিম এনে দাঁত বের করছিস কোন আক্কেলে র‍্যা!

দালানে গিয়ে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায়, এ বাড়িতে এখনও পুরুষদের প্রাধান্য। মেয়েদের দাপট অতটা নেই। বড়বাবুর এত চেঁচামেচিতে বড়গিন্নির গলার কিছু সরু শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল মাত্র।

অফিসের সময় হয়েছে, বড়বাবু খুব দাপুটে পায়ে দালান কাঁপিয়ে কলঘরে যাওয়ার সময়ে আমাকে দেখে যাওয়া না-থামিয়েই বলতে বলতে গেলেন, উপল-ভাগ্নে যে! খবর সব ভাল তো! সাত-সকালে দেখো গে যাও গোবিন্দ গুচ্ছের অযাত্রার ডিম এনে ফেলেছে। পাখি-পক্ষীর ডিম খেয়ে মানুষ বাঁচে, বলো? বাঙালির শরীরে মাছ ছাড়া রক্ত হয়, শুনেছ? বলেছি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে।

কলঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তবু ভিতর থেকে জলের শব্দের সঙ্গে চেঁচানি আসতে লাগল, পয়সা মেরেছে। হিসেব নিয়ে দেখো না। আজকাল বিড়িটিড়ি ফুঁকছে তো।

রান্নাঘরের দিক থেকে বড়গিন্নির স্বর প্রবল হল, ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় করতে হয় ছেলেকে। ডিম-ডিম করে দিনরাত পাগল করে খেলে! যা গিয়ে এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়।

কলঘর থেকে বড়কর্তা তখনও চেঁচাচ্ছেন, আরে, আমি বলেছি তো, ওর পকেট-টকেট ঝেড়ে দেখো গে। লায়েক হয়েছে, পয়সা চিনেছে। দু'-চার পয়সা এদিক-ওদিক বাজার থেকে আমরাও বয়সকালে করেছি। তা বলে পোনা মাছের বদলে বাপের জন্যে ডিম আনিনি বাবা। দাও ওর মুখে কাঁচা ডিম ঘষে।

রান্নাঘর থেকে গিন্নি গলার রগ ছিঁড়ে এবার চেঁচান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা ফেরত দিতে না পারবি তো। তেঁতুল গুলে, ফোড়ন সাজিয়ে বসে আছি, মাছ এলে রান্না হবে, উনি খেয়ে আপিস যাবেন, বেলা সাড়ে ন'টায় থলি দুলিয়ে বাবু এলেন। ঝ্যাঁটা, ঝ্যাঁটা—

তাড়া খেয়ে বড়বাবুর গুমসো মতো বড় ছেলে গোবিন্দ দালানে বেরিয়ে এল। আকাট মুখ্যুর মতো রাঙামুলো চেহারা। পাজামা আর নীল শার্ট পরা ছেলেটা ডিম ফেরত দিতে যাওয়ার সময়ে আমাকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে ভ্যাবলা মতো হেসে চলে গেল। চেহারার মধ্যে বংশের ছাপ পড়ে গেছে। বড়বাবুর চার ছেলের মধ্যে কেউই পকেটে কখনও পয়সা নিয়ে বেরোয় না, নিতান্ত বাস বা ট্রামের ভাড়াটা ছাড়া। রাস্তায় চটি ছিঁড়লে সারানোর পয়সা পর্যন্ত থাকে না পকেটে। কী সাংঘাতিক! বাড়তি পয়সা থাকলেই খরচ হওয়ার ভয়। পৌষপার্বণের দিন পিঠে তৈরি হয় বলে এ বাড়িতে সেদিন রান্না বন্ধ। সবাই পিঠে খেয়ে থাকে। আমার বাবার বাড়িওয়ালা বাবাকে হরতালের আগের দিন দু'বার বাজার করতে দেখে খেপে গিয়েছিলেন। এদের দেখলেই সেই বুড়ো বাড়িওলা ভারী খুশি হতেন।

এত চেঁচামেচির মধ্যে মাসির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। পাওয়ার কথাও নয়। আমার বোকাসোকা, ভালমানুষ কানা মাসি সবসময়ে তার আশপাশের লোকজনকে বড় বেশি চালাক-চতুর বলে মনে করে। 'কী জানি বাবা, আমি যখনই কথা কই তখনই কেমন বোকা-বোকা কথা বেরিয়ে পড়ে' প্রায়ই এই বলে দুঃখ করত মাসি। এ বাড়িতে আসা ইস্তক বোকা-কথা বলে ফেলার ভয়ে মাসির বাক্য প্রায় হরে গেছে। যাও-বা বলে তাও ফিসফিসের মতো আস্তে করে। এ বাড়ির ঝি-চাকরকেও খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে মাসি। কোনও ঝগড়া কাজিয়া চেঁচামেচির মধ্যে নাক গলায় না। কর্তা যা বোঝায় তা-ও বোঝে, আবার গিন্নি যা বোঝায় তা-ও বোঝে। যা কিছু বলার কথা থাকে তা আমাকে বলার জন্য পেটে জমিয়ে রাখে মাসি।

বকাবকি এখনও শেষ হয়নি। ভিতর-বাড়ির দিক থেকে একটা গদি-আঁটা মোড়া এক হাতে, অন্য হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বড়গিন্নি উঠে আসছিলেন বকতে বকতে, মতিচ্ছন্ন, মতিচ্ছন্ন! বাজারে যাওয়ার সময়ে পই পই করে বললুম মাছের কথা, কান দিয়ে শুনল

কলঘর থেকে বড়কর্তা বললেন, মাছ কান দিয়ে মাথায় ঢুকেই ডিম হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বের করে দাও আজই জুতোপেটা করে।

মাসির কাছে যাতায়াত করতে করতে আমি এ বাড়ির পুরনো লোক হয়ে গেছি। তাই বড়গিন্নি আমাকে দেখে লজ্জা পেলেন না, খবরের কাগজ ধরা হাতে ঘোমটাটা একটু টেনে বললেন, ডিম নিয়ে কী কাণ্ড শুনছ তো! আমার ছেলেরা সব ওইরকম। যাও, ঠাকুরঝি রান্নাঘরে আছে।

মাসি রান্নাঘরেই চৌপর দিন পড়ে থাকে, আমি জানি। ইচ্ছে করেই থাকে। রান্নাঘরের বাইরের দুনিয়াটায় মাসির বড় অস্বস্তি।

মাসি আলু কুচিয়ে নুন মাখা শেষ করেছে, কড়াইতে তেল হয়ে এল। ছাড়ার আগে তেলের ফেনার শেষ বুদ্বুদটার মিলিয়ে যাওয়া একটা চোখে সাবধানে দেখছিল। মুঠোয় ধরা জল নিংড়ানো ঝিরিঝিরি করে কুচোনো আলু। আজ মাছের বদলে বড়বাবু এই আলুভাজা খেয়েই যাবে।

'মাসি' বলে ডাকতেই মাসি ঠান্ডা সুস্থির মুখখানা ফেরাল। কানা চোখটার কোলে জল জমে আছে। একগুচ্ছ উঁচু নোংরা দাঁত ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে থাকে সবসময়ে, ওই দাঁতগুলোর জন্য কখনও দুই ঠোঁট এক হয় না। দু'গালের হনু জেগে আছে। ময়লা থানের ঘোমটায় আধো-ঢাকা মাথায় অনেকগুলো পাকাচুল ভেসে আছে। মাসি দেখতে একদম ভাল না। দাঁতগুলোর জন্যই আরও কুচ্ছিত দেখায়। বাবার দু'-একজন শুভানুধ্যায়ী বা বন্ধুবান্ধব বাবাকে বলত, বাপু হে, দ্বিতীয় বিয়েটা আর-একটু দেখেশুনে করলে পারতে! বাবা জবাব দিত, না হে, বউ সুন্দর-টুন্দর হলে আমি হয়তো বা বউ-খ্যাপা হয়ে যেতাম, তা হলে আমার উপলের কী হত! উপলকে মানুষ করার জন্যই তো দ্বিতীয় বিয়েতে বসা।

কানা মাসি সুন্দর নয় বলে আমার তো কিছু খারাপ লাগে না।

তেল থেকে ধোঁয়া উঠতে, মাসি কুচোনো আলু ছাড়তে ভুলে গিয়ে দু'গাল ভরতি করে হেসে

বলল, দিন-রাত ভাবছি। ও উপল, দু'বেলা ভরপেট খাস তো!

খাই। আমার খাওয়ার চিন্তা কী?

পিঁড়ি পেতে বোস।

বসলাম। বললাম, মাসি তেল পুড়ে যাচ্ছে, আলু ছাড়ো।

তেলে পড়ে আলু চিড়বিড়িয়ে উঠল। মাসি এক চোখের দৃষ্টিতে গোরু যেমন বাছুরকে চাটে তেমনি চেটে নিল আমাকে। বলল, একটা মাত্র চোখ, তা সে চোখে ছানি আসছে।

উদাস হয়ে বললাম, আসবেই। বয়স হচ্ছে।

কলঘর থেকে বড়বাবু মাটি কাঁপিয়ে বেরোলেন। শব্দ হল। মাছের শোক এখনও ভুলতে পারেননি, চেঁচাচ্ছেন সমানে, বললুম তো, বিড়ি-টিড়ি খেতে শিখেছে, খোঁজ নিয়ে দেখোগে যাও। কত করে ডিমের জোড়া এনেছে বলল?

বলতে বলতে বড়বাবু পুরনো সিঁড়িতে ভূমিকম্প তুলে ওপরতলায় উঠে গেলেন।

মাসি একটা সোনার মতো রঙের ঝকঝক করে মাজা কাঁসার থালায় ভাত বাড়তে লাগল। এমন যত্নে ভাত বাড়তে বহুকাল কাউকে দেখিনি। নিখুঁত একটা নৈবেদ্যের মতো সাজানো ভাতের ঢিবি, একটা ভাতও আলগা হয়ে পড়ল না। ঢিবিটার ওপর ছোট একটা মধুপর্কের মতো বাটিতে একরত্তি ঘি। নুনটুকু পর্যন্ত কত যত্নে পাতের পাশটিতে সাজিয়ে দিল। দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

মাসি বলল, আজ মাছ নেই বলে ঘিয়ের ব্যবস্থা, নইলে ঘি রোজ দেওয়ার কথা নয়। গোবিন্দটা বড্ড বকুনি খেল আজ।

মাসির রান্নার কোনও তুলনা হয় না। আমাদের মতো গরিব-গুর্বোর বাড়িতে কীই বা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল! তবু মাসি জলকে তেল বলে চালিয়ে, কি কাঠখোলায় ভাজা সম্বর দিয়ে এমন সব রান্না করত যে আমরা পাত চেটেপুটে উঠতাম। সেই রান্নার ধাঁচ আজও আছে। মাসি একটু নিরামিষ বাটিচচ্চড়ি যখন বড়বাবুর পাতে সাজিয়ে দিচ্ছিল তখন পুরনো আভিজাত্যের গন্ধ নাকে ঠেকল এসে।

বললাম, মাসি, তোমাকে এরা খেতে-টেতে দেয়?

মাসি চাপা গলায় বলল, এ সব অত জোরে বলিস না। কে শুনতে পাবে।

বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, দেয়। আবার একটু চুপ করে আলু ভাজা ওলটাল মাসি, খানিক নেড়ে চেড়ে তেল থেকে হলুদ, মুড়মুড়ে ভাজা ছেঁকে তুলে বড়বাবুর পাতের বাহার বাড়িয়ে বলল, তোকে দেয়?

দেবে না কেন? তা ছাড়া পুরুষ ছেলের আবার খাওয়ার ভাবনা। তোমার খাটুনি কেমন?

মাসি রেখে-ঢেকে বলল, সে আর বেশি কী? দু'বেলা মোটে তো রান্না। চোখটাই আজকাল বড় অসুবিধে করে। সকালে কী খেয়েছিস?

চা আর বিস্কুট। তুমি?

বড় অফিস গেলে এইবার খাব। বোস। তোর জন্য একটা জিনিস রেখেছি। কতকাল আসিস না বল তো! মাঝরাতে উঠে বুক কেমন করে। কাঁদি কত।

ওপর থেকে বড়গিন্নি ডাক দিল, ঠাকুরঝি ভাত দিয়ে যাও।

মাসি এক হাতে থালা, অন্য হাতে ডালের বাটি নিয়ে উঠে গেল। ফাঁকা রান্নাঘরে বসে নিজেকে খুব খারাপ লাগল। আমার কত কিছু হওয়ার কথা ছিল! তার একটা কিছু হলে মাসি কি এ বাড়িতে রেঁধে খায়? একটু বাদে মাসি ফিরে এসে বলল, ওদের ফাইফরমাশ খাটিস নাকি?

খাটি।

খাটিস। না খাটলে ভালমতো খেতে দেবে না। বড়কে বলে রেখেছি ওর অফিসে তোকে একটা কাজ দিতে।

বড়বাবু আমাকে দেবে কেন? তার বড় ছেলেকে ঢোকাবে বরং।

তোকেও দেবে। বি কম পাশ চাট্টিখানি কথা নাকি! বড়র একটা ছেলেরও অত বিদ্যা আছে? তা ছাড়া তুই কত কী জানিস! গান, আঁকা, পাট করা।

মাসি পুরনো একটা কৌটো খুলে দু'-তিনটে পাউরুটির টুকরো বের করে আমাকে দিয়ে বলল, খা।

মাসির এই এক রোগ, কোনও কিছু ফেলবে না। আমাদের বাড়িতে লাউ বা আলুর খোসা পর্যন্ত ফেলত না, চচ্চড়ি বা ভাজা করে ফেলত। এমনকী পেঁপের খোসা পর্যন্ত রসুন-টসুন দিয়ে বেটে ঠিক একটা ব্যঞ্জন তৈরি করে ফেলত।

পাউরুটির টুকরোগুলো বিস্কুটের মতো। কটকটে শক্ত।

উনুনের ধারে রেখে রেখে করেছি। ভাল না?

ভালই। খেতে খেতে বলি, পয়সাকড়ি দেয় কিছু?

না। পয়সা দিয়ে হবেই বা কী? এক মাঝে মাঝে তোকে একটু জামা-টামা দিতে ইচ্ছে করে। কেমন এক ছোটলোকি পোশাক পরে বেড়াস। গোবিন্দর কেমন সব জামা-কাপড়। কিন্তু কাজ-টাজ হয় না কেন তোর বল তো! তা হলে তোর কাছে থেকে দু'বেলা দুটো রেঁধে খাওয়াতাম।

ক্ষণার দেওয়া বাজারের পয়সা থেকে বা সারা বাড়ি আঁতিপাঁতি খুঁজে যা পয়সাকড়ি জমিয়েছি তা সবসুদ্ধ গোটা ত্রিশ টাকা হয়েছে। সেগুলো আনার সময় পাইনি আজ। সুবিনয়ের দেওয়া পাঁচটা টাকার যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে দুটি টাকা পকেট থেকে বের করে মাসিকে দিয়ে বলি, রেখে দাও। কিছু খেতে-টেতে ইচ্ছে করলে কিনে খেয়ো।

কানা চোখে জল পড়ছিলই, এবার ভাল চোখ দিয়েও গড়াতে লাগল।

ঠাকুরঝি, ভাত আনো।— বড়গিন্নি সিঁড়ির ওপর থেকে বলে।

যাই।— বলে মাসি বাটি-টাটি নিয়ে উঠে গেল।

রান্নাঘরটা ঝকঝক করছে পরিষ্কার। কোথাও একটু ঝুল-কালি নেই, মেঝেয় গুচ্ছের জল পড়ে নেই, খাবার আঢাকা অবস্থায় রাখা নয়। মাসি এ সব কাজে পি-এইচ ডি।

মাসি খবরের কাগজে মোড়া একটা মুগার থান হাতে ফিরে এসে বলল, এটা দিয়ে দুটো জামা করিয়ে নিস।

হাতে নিয়ে দেখি, পুরনো হলেও আসল মুগার জিনিস। এখানে সেখানে কয়েকটা ছোপ ছোপ জলের দাগ বাদ দিলে এখনও ঝকমক করছে। বললাম, কোথায় পেলে?

বড়র মা মরে গেল তা বছর দুই হবে। তার সব বাক্স-প্যাঁটরা ঘেঁটে এই সেদিন পুরনো কাপড়-চোপড় যা বেরিয়েছিল তার থেকে বড়গিন্নি এইটে আমাকে দিয়েছে। তখনই ভেবে রেখেছি, তুই এলে জামা করতে দেব। ভাল দরজিকে দিয়ে বানাস। ভাল না জিনিসটা?

হুঁ।

কেতকীর সঙ্গে খুব ঝগড়া হচ্ছে বাড়ির সবার।

কেন?

কেন আর! মেয়েটা বড় ভাল, কিন্তু ওকে ছোঁড়ারা বড় যন্ত্রণা করে। ওর দোষ কী?

আমি চুপ করে থাকি। কেতকীর ব্যাপারে মাসির একটা দুরাশা আছে। মাসি চায়, কেতকীর সঙ্গে আমার বিয়ে হোক।

বললাম, মাসি, কেতকীকে নিয়ে অত ভেবো না। তাকে নিয়ে ভাববার অনেক লোক আছে।

মাসি দমের আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়াচ্ছিল। বলল, কাকে নিয়ে না-ভেবে পারি বল। আপনা থেকেই সব ভাবনা আসে। এই যে গোবিন্দটা আজ বকুনি খেল সেই বসে বসে সারা

দিনমান ভাবব। বড্ড গোবেচারা ছেলে। ডিমের নামে পাগল। কত দিন লুকিয়ে-চুরিয়ে আনে, বলে, ভেজে দাও। আমিও দিই।

মনটা একটু খচখচ করে। একদিন ছিল, যখন মাসির গোটা বুকখানা জুড়ে আমিই ছিলাম। এখন আবার সেই জায়গায় অন্য লোকজন একটু-আধটু ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ছে। দোষ নেই, আমি মাসির বল্গাছাড়া ছেলে, এক বুক মায়া নিয়ে মাসিরই বা একা পড়ে থাকতে কেমন লাগে। মায়া এমনিই, থাকতে থাকতে দেখতে দেখতে একজন না একজনের ওপর পড়ে যায়।

বললাম, কেতকীকে নিয়ে তুমি আর ভেবো না মাসি, আমার গতিক তো দেখছ।

মাসি একটা চোখে ছানি সত্ত্বেও বেশ খর করে তাকিয়ে বলল, হালগতিক খারাপটা কী? বরাবরই তুই একটু কুঁড়ে বলে, নইলে তোরটা খেয়ে লোকে ফুরোতে পারত না। মা যেমন ছেলে চেনে তেমন আর কে চিনবে রে? ও সব বলিস না। বোস একটু, দমটা কষাই, দু'খানা রুটি দিয়ে খেয়ে যা। না কি ভাত খাবি দুটো?

না, না। ঝামেলায় যেয়ো না। পাঁচটা কথা উঠে পড়তে পারে।

মাসি একটা মাত্র ছানিপড়া চোখ সার্চলাইটের মতো আমার ওপর ফেলল। স্টিমারের বাতি যেমন তীরভূমির অন্ধকার থেকে খানাখন্দ, গাছপালা ভাসিয়ে তোলে, মাসির চোখ তেমনি আমার ভিতরকার খিদে-টিদে, জ্বালা-যন্ত্রণা সব দেখে নিল।

বেশি কথার মানুষ নয়, আলুর দম চাপিয়ে ঝকঝকে একটা কাঁসার থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, লোকে তোকে সোনা হেন মুখ করে খেতে দেবে, তেমন কপাল করেছিস নাকি? যে বাড়িতে থাকিস তারাও না জানি কত গালমন্দ শাপ-শাপান্ত করে তবে খেতে দেয়।

আমার খিদেটা কোনও সময়েই তেমন তৃপ্তি করে মেটে না। খুব তৃপ্তি করে খেলে পেটে যে একটা চমৎকার যুদ্ধবিরতির অনুভূতি হয়, তা আজকাল টের পাই না। সব সময়েই একটা খিদের ভাব থাকে, সেটা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কয়েক দিন আগে এক বিকেলে ক্ষণা সবাইকে আনারস কেটে দিয়েছিল। আমাকে কিছু কম, অন্যদের কিছু বেশি। সুবিনয় আনারস চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলছিল। দেখলাম, ক্ষণাও ছিবড়ে ফেলে, সুবিনয়ের মাও। কিন্তু আমার আর ছিবড়ে হয় না। যত বার মুখে দিয়ে চিবোই, তত বার শেষ পর্যন্ত গিলে ফেলি। পাছে ওরা লোভী ভাবে, সেই ভয়ে একবার-দু'বার অতি কষ্টে একটু-আধটু ছিবড়ে ফেলেছি বটে, কিন্তু আগাগোড়া ছিবড়ে ফেলার ব্যাপারটাকেই আমার খুব অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। আমার তো আজকাল আখ খেলেও ছিবড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে না।

মাসি ভাতের থালাটা রান্নাঘরের কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, খেতে থাক। দমটা হয়ে এল, ঘি গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে ফেলব এবার। পেট ভরে খা, ভয়ের কিছু নেই।

পেট ভরে খা এই কথাটা বহুকাল কেউ বলেনি আমাকে। আমার দুনিয়া থেকে কথাটা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে। তাই ভাবি, শুধু এক থালা ভাতের জন্য নয়, ওই কথাটুকু শুনবার জন্যই বুঝি মাসির কাছে মাঝে মাঝে এই আসা আমার।

ভাতের থালাটা নিয়ে আবডালে সরে বসে খেতে খেতে বলি, মাসি, এর জন্য তোমাকে না আবার কথা শুনতে হয়।

মাসি আলুর দমের ঢাকনা খুলে চার দিক গন্ধে লন্ডভন্ড করে দিয়ে বলল, অত কিটির কিটির করিস না তো বাপঠাকুর। সারাদিন এ বাড়ির জন্য গতরপাত করছি, তা'ও যদি আমার ছেলে এখান থেকে শুধু মুখে ফিরে যায় তো এর চেয়ে ফুটপাথে গিয়ে থাকা ভাল।

মাসির এই তেজ দেখে অবাক হই। আগে মাসির এত তেজ ছিল না। এ বাড়িতে বেগার খেটে খেটে কি মাসির একটা মরিয়া ভাব এসেছে নাকি!

জানালার শিকের ফাঁকে একটা বেড়াল লাফ দিয়ে উঠে এসে পরিষ্কার গলায় ডাকল, মা।

মাসি তার দিকে চেয়ে বলল, সারাটা সকাল কোন্ মুলুকে ছিলে? এখন হাত জোড়া, বসে থাকো ওইখানে। খাবেই বা কী, আজ মাছ-টাছের বালাই নেই।

জানালার বাইরে একটা কাক হুতুম করে এসে বসল, একটা চোখে মাসিকে দেখে খুব মেজাজে বলল, খা?

মাসি তাকেও বলল, মুখপোড়া কোথাকার! যখন-তখন তোমাদের আসবার সময় হয়। যা, এখন ঘুরে-টুরে আয়।

বলতে বলতে মাসি বেড়ালকে এক খাবলা দুধে-ভাতে মেখে দিল, জানালার বাইরে কাকটাকে দু' টুকরো বাসি রুটি দিয়ে বিদেয় করল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম, এইসব কাক বেড়াল সেই আমাদেরগুলোই নাকি! মাসির গন্ধে গন্ধে এসে এখানেও জুটেছে!

বললাম, মাসি, সারাটা জীবন তোমার পুষ্যিরা আর তোমাকে ছাড়ল না। কাক, কুকুর, বেড়াল, আমি।

মাসি বলল, মুখ্যু।

কে?

তুই।

এই যে বলে বেড়াও, আমি বি কম পাশ করা মস্ত লায়েক!

তা হলেও মুখ্যু। যে নিজেকে কাক কুকুরের সমান ভাবে, সে মুখ্যু ছাড়া কী?

তাই তো হয়ে যাচ্ছি মাসি দিনকে দিন।

বালাই ষাট। একদিন দেখিস, তোরটা কত লোকে খাবে।

আলুর দম দিয়ে মাখা ভাত মুখে দিয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গেল। আমি কোথায় আছি, আমি কে, এ সব জরুরি ব্যাপার পর্যন্ত মনে পড়ছে না। পেটের ভিতর এক অপরিসীম প্রশান্তি নেমে যাচ্ছে। মনে হয়, আমার হৃদয়ের কোনও সমস্যা নেই, মস্তিষ্কের কোনও চাহিদা নেই, আমার কেবল আছে এক অসম্ভব খিদে।

সেই মুহ্যমান অবস্থা থেকে যখন বাস্তবতায় জেগে উঠি, পৃথিবীটা তখন নতুন রকম লাগে। একটা কুয়াশার মতো আবছায়ার ভিতর থেকে রান্নাঘরটা যখন আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল তখন দেখি, দরজার চৌখুপিতে সাংঘাতিক ঝলমলে রঙে একটা মেয়ের ছবি কে এঁকে রেখেছে। অবাক হয়ে মেয়েটা আমাকে দেখছে। আমিও অবাক হয়ে তাকে দেখি।

মেয়েটা বলল, উপলদা না?

কেতকীকে দেখে মনে হল, সে খুব হালে খোলস ছেড়েছে। কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে তাকে। রোগা, বিষণ্ণ। সেই ভালবাসার চোখও যেন আর নেই।

লজ্জা পেয়ে বলি, এই দেখো না, মাসি জোর করে খাওয়াল।

কেতকী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আপনার খুব খিদে পেয়েছিল। এমনভাবে খাচ্ছিলেন!

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো বলি, হ্যাঁ, আমার খুব খিদে পায়।

আমার পায় না।

এই বলে কেতকী তার স্নান করা ভেজা এলোচুল বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এনে আঙুলে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, খাওয়া জিনিসটাই এত বাজে আর বিচ্ছিরি! আমার একদম খেতে ইচ্ছে করে না। লোকে যে কী করে খায়!

মাসি জড়সড় হয়ে বসে ছিল। বেরিয়ে থাকা দাঁতের ওপর দুটো মাছি বসে একটু মারপিট করে উড়ে গেল। মাসি টের পেল না।

কেতকী পিছনে হেলে আবার তার চুলের গোছ পিঠে ফেলে দিয়ে বলল, পিসি খুব ভাল রাঁধে, কিন্তু তবু আমার খেতে ইচ্ছে করে না।

এই বলে কেতকী চলে গেল।

মাসি অকারণে বলল, বড় ভাল মেয়েটা। খাওয়া-টাওয়া খুব কম। কোনও বায়নাক্কা নেই।

আমি বললাম, হুঁ, বেশ ভাল।

পড়াশুনোতেও খুব মাথা।

হুঁ।

কেবল ছোঁড়াগুলো জ্বালায়, তার ও কী করবে! ও কারও দিকে ফিরেও দেখে না। তবু সেদিন বড়গিন্নি ওকে কী মার মারলে! তারপর মেয়ে তিন দিন খায়নি।

অবাক হয়ে বলি, অত বড় মেয়েকে মারল কী গো?

তাও কী মার বাবা! একবার ছড়ি দিয়ে, একবার জুতো দিয়ে, শেষমেষ মেঝেয় মাথা ঠুকে ঠুকে উত্তম কুস্তম মার। সে মার দেখে আমার বুকে ধড়াস ধড়াস শব্দ আর শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল।

হয়েছিল কী?

ওই গলির মোড়ের লাল বাড়িটায় একটা গুন্ডা ছেলে থাকে। তার বড় বাড় হয়েছে। রাস্তায়-ঘাটে যখন তখন কেতকীকে জ্বালাতন করে। তার সঙ্গে আবার ছোটকর্তার সাট আছে। কাকা হয়ে ভাইঝিকে হেনস্থা করার যে কী রুচি বাবা। সেই ছোটকর্তার লাই পেয়ে ছোঁড়াটার আরও সাহস বেড়েছে। এই তো সেদিন কেতকী কলেজ থেকে ফিরছে সন্ধেবেলা। ছোঁড়াটা মোড়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, কেতকী যেই এসেছে অমনি দু'-তিনজন মিলে তাকে ধরেছে ট্যাক্সিতে তুলবে বলে। চেঁচামেচি, রই-রই কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি ভাগ্যে! সেইজন্য নির্দোষ মেয়েটাকে ধরে এই মার কি সেই মার।

পুলিশে ধরিয়ে দিল না কেন ছেলেটাকে?

কে দেবে বাবা! সে ছেলের ভয়ে নাকি সবাই থরহরি। বড়কর্তা খানিক চেঁচামেচি করল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তারপর সব চুপচাপ। মার খেয়ে কেতকী আমাকে ধরে সে কী কান্না। কেবল বলে, বাবাকে বলো আমার বিয়ে দিয়ে দিক, আমি আর এ সব যন্ত্রণা সইতে পারছি না।

উৎসুক হয়ে বলি, কাকে বিয়ে করতে চায় কিছু বলল।

না, তেমন মেয়ে নয়। মা-বাবা যার সঙ্গে দেবে তাকেই বিয়ে করবে। তাই বলছিলাম, তোর যদি একটা কিছু হত, একটু যদি মানুষের মতো হতি! বড় ভাল ছিল মেয়েটা। একদিন ঠিক ষণ্ডাগুন্ডায় টেনে নিয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ি।

৭

সুবিনয়ের সঙ্গে যদি কখনও আমার কোনও শলাপরামর্শ থাকে তবে আমরা সাধারণত সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটবাড়িতে দেখা করি। কোম্পানির লিজ নেওয়া বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ি। চারখানা মস্ত শোওয়ার ঘর, একটা বসবার, একটা খাওয়ার আর একটা পড়াশুনো করবার ঘরও আছে, তিনটে বাথরুম, গ্যাস লাইনের ব্যবস্থাসহ রান্নাঘর, টেলিফোন—কী নেই? এত ভাল বাসা ছেড়ে সুবিনয় বোকার মতো তার প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোডের পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছে। কোম্পানির দেওয়া এ বাসার খবর তার বাড়ির কেউ জানেও না।

বাইরের ঘরে সোফায় বসে মস্ত লম্বা দুটো ঠ্যাং সামনে ছড়িয়ে প্রায় চিতপাত অবস্থায় শুয়ে সুবিনয় আমার কাছ থেকে সব শুনল। একমনে সিগারেট খাচ্ছিল কেবল, কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু আমার কথা শেষ হতেই একটা ঝাঁকি মেরে উঠে বসল। তার পরনে কেবলমাত্র

একটা আন্ডারওয়্যার আর স্যান্ডো গেঞ্জি। উঠে বসতেই তার শরীরের সব সহজাত মাংসপেশিগুলো টনটনে হয়ে উঠল। দুটো চোখে আলপিনের ডগার মতো সরু এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ভ্রু কোঁচকানো। দশাসই বিশাল চেহারাটায় একটা উগ্র রাগ ডিনামাইটের মতো অপেক্ষা করছে।

বলল, তুই তো এর আগেও কত বার প্রীতিকে আমার চিঠি দিয়ে এসেছিস, কোনওবার এমন কথা বলেছে?

না।

তবে আজ বলল কেন? ঠিক কীভাবে বলল হুবহু দেখা তো! ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছে নাকি?

না, ঠাট্টা নয়। খুব সিরিয়াস।

ঠিক আছে, সে আমি বুঝব। তুই দেখা তো।

বহুকাল বাদে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আমি রুমার দরজা খোলা থেকে শুরু করেছিলাম। রুমা দরজা খুলে খুব অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কী খবর?

সুবিনয় বলল, আঃ, প্রীতিরটা দেখা না।

আমি একটু আহত হই মনে মনে। তারপর প্রীতির কথাবার্তা হাবভাব দেখাতে থাকি। তার 'বেচারা' বলার তিন রকম নিখুঁতভাবে অভিনয় করলাম। চিঠি ছিঁড়ে ফেলার ভঙ্গিটাও চমৎকার হল।

কিন্তু অত দেখল না সুবিনয়। বেরসিকের মতো অভিনয়ের মাঝখানে উঠে গিয়ে খোলা জানালার ধারে দাঁড়াল। স্যান্ডো গেঞ্জি আর মাত্র আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় খোলা জানালায় দাঁড়ানো কতটা বিপজ্জনক তা ভেবে দেখবার মতো স্থিরবুদ্ধি ওর এখন আর নেই। জানালা থেকেই মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত গমগমে বিকট গলায় আমাকে বলল, প্রীতি তোকে মিথ্যে কথা বলেছে, তা জানিস? ম্যাসাচুসেটসে ও আমাকে বারবার উত্ত্যক্ত করত, বিয়ে করার কথা বলত। ওর কয়েকটা চিঠিতেও ছিল সে সব কথা, দেশে ফিরে আমাদের বিয়ে হবে। কিন্তু চিঠিগুলো...

আমি প্রায় নিঃশব্দে বললাম, আমার কাছে আছে।

আছে?— সুবিনয় গর্জে ওঠে।

ভয় খেয়ে বলি, আছে বোধহয়।

তবে?

বলে বুনো মোষের মতো ঘরের মাঝখান অবধি তেড়ে এল সুবিনয়, সিলিং-ছোয়া বিকট দানবীয় চেহারাটা ধক ধক করছে রাগে। আবার বলল, তবে?

আমি খুব সংযত গলায় বললাম, সুবিনয়, ছেড়ে দে না। তোর তো ক্ষণা আছেই। আবার কেন হাঙ্গামায় জড়াবি?

সুবিনয় হঠাৎ অট্টহাসি হাসল। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, পৃথিবীতে কোনও জিনিয়াস কখনও একটামাত্র মেয়েমানুষ নিয়ে থাকতে পারে না। দে নিড গার্লস। এ লট অব গার্লস। বুঝলি? এক সময়ে গ্রিক ফিলজফাররা রক্ষিতাদের বাড়িতে বা বেশ্যাপাড়ায় বসে শাস্ত্রের আলোচনা করত।

মিনমিন করে বললাম, প্রীতি যখন চাইছে না তখন ছেড়ে দে।

ডোন্ট টক লাইক এ ফুল।

ভয় পাই, তবু বলি, ক্ষণাকে কেন ডিভোর্স করবি? ও তো কোনও অন্যায় করেনি!

সুবিনয় গর্জে ওঠে ফের, অন্যায় করেনি তো কী? ওকে নিয়েই আমাকে থাকতে হবে এমন কোনও কথা আছে? যা তো, দুনিয়ার সব বিবাহিত পুরুষমানুষকে জিজ্ঞেস করে আয়, তাদের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট তাদের একজিস্টিং ওয়াইফকে ছেড়ে নতুন কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চায় কি না! যদি না চায় তো আমি কান কেটে কুত্তার গলায় ঝোলাব।

মরিয়া হয়ে বললাম, প্রীতির একজন আছে, বললাম তো। সেও বাগড়া দেবে।

সুবিনয় সোজা এসে আমার কলারটা চেপে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বাগড়া দেবে! বাগড়া দেবে! উইল হি লিভ আপ টু দেন?

সামান্যই ঝাঁকুনি, কিন্তু সুবিনয়ের আসুরিক শক্তির দুটো নাড়া খেয়েই আমার দম বেরিয়ে গেল। একটা মানুষের শারীরিক শক্তি যে কী প্রবল হতে পারে তা সেই ঝাঁকুনিতে টের পেলাম। যদি প্রীতির সেই ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে সুবিনয়ের বাস্তবিকই কোনও শো-ডাউন হয় তো আমি নির্দ্বিধায় সুবিনয়ের দিকেই বাজি ধরব।

সুবিনয় আমাকে ছেড়ে দিয়ে ফের সোফায় চিতপাত হয়ে বসল। সিগারেট ধরিয়ে ছাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, উপল, আই ওয়ান্ট দ্যাট চ্যাপ ফেস টু ফেস।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, ছেলেটার দোষ কী? ও কি তোর সঙ্গে প্রীতির অ্যাফেয়ার জানে?

তা হলেও, আমি ওকে একবার হাতে পেতে চাই। প্রীতির চোখের সামনে আমি ওকে গুঁড়ো করে ফেলব।

সকালবেলায় পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা যে অন্যমনস্ক লম্বা, ভদ্র বৈজ্ঞানিককে রাস্তার লোকেরা হেঁটে যেতে দেখেছে সে আর এই সুবিনয় এক নয়। আন্ডারওয়্যার আর গেঞ্জি পরা এ এক অতি বিপজ্জনক প্রেমিক।

পৃথিবীর ওপরকার জামা তুলে তার শরীরের লুকোনো দাদ চুলকুনি আমি দেখতে চাই না। তবু আমার জীবন আমাকে তা দেখাবেই।

আমি বললাম, তুই কী চাস?

সুবিনয় একটা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, এ শো-ডাউন। ভেরি প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ শো-ডাউন।

তুই মারধর করবি?

মারধরের চেয়ে দুনিয়াতে আর কোনও কুইক এফেকটিভ জিনিস নেই।

সুবিনয়!

কী?

ভেবে দ্যাখ।

দুর্বলরা ভাবে, শক্তিমানরা কাজে নামে। টেকনিকাল কাজের বাইরে আমি খুব একটা ভাবনা-চিন্তা করার লোক নই। প্রীতিকে আমার চাই, অ্যাট এনি কস্ট।

সেই ছেলেটাকে যদি মারিস তা হলে পুলিশ কেসে পড়ে যেতে হবে, মামলা মোকদ্দমায় গড়াবে। কে জানে, ছেলেটার হয়তো ভাল কানেকশনসও আছে, যদি থাকে তো তোর ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুবিনয় মাথা তুলে তাকাল। মুখের এক পাশে হলুদ আলো পড়েছে, অন্য পাশটা অন্ধকার। মেদহীন মুখের খানাখন্দে আলো-আঁধারের ধারালো রেখা। চোখ স্থির। যে-কেউ দেখলে ভয়ে হিম হয়ে যাবে।

সুবিনয় বলল, ডু আই কেয়ার?

সুবিনয় উঠে জামা-প্যান্ট পরতে লাগল। আপনমনে কেবল বলল, আমি সহজ সরল সম্পর্ক বিশ্বাস করি। জটিলতা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

আশ্চর্য এই যে, আমি নিজেও জটিলতা পছন্দ করি না। পৃথিবীটা আমার কাছে খুবই সাদামাটা। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, মানুষ বিষয়কর্মে যায়, ছানাপোনা নিয়ে ঘর করে, শীতের পর আজও বসন্ত আসে, ঘড়ির কাঁটা ধরে আমার খিদে পায়। আমার সমস্যা একটাই, বড় খিদে পায়। কখনও নিশ্চিতভাবে খিদে মেটে না। মিটলেও, আবার খিদে পাবে বলে একটা দুশ্চিন্তা থাকে। এ ছাড়া

আমার জীবন সহজ সরল। প্রীতি নেই, ক্ষণা নেই, প্রীতির প্রেমিক নেই। কেবল খিদে আছে, খিদের দুশ্চিন্তা আছে।

দিন দুই পর কালো চশমা আর নকল দাড়ি-গোঁফওলা একটা লোককে খুবই অসহায়ভাবে গোলপার্কের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। সকাল কি সন্ধেবেলা লোকটা রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে, দাঁড়ায়, উর্ধ্বপানে তাকিয়ে কী যেন দেখে, বাতাস শোঁকে। এতই পলকা তার ছদ্মবেশ যে এক নজরেই ছদ্মবেশ বলে চেনা যায়। তার হাবভাবে এত বেশি আত্মবিশ্বাসের অভাব যে, যে-কোনও সময়ে সে রাস্তার লোকের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, লোকটা প্রীতিদের ফ্ল্যাটবাড়ির নীচের তলার সদর দরজার কাছে নিচু হয়ে কী খোঁজে, কিংবা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আকাশের চিল দেখে, কিংবা উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খায়। আমি ঠিক জানি, সেই সময়ে লোকটাকে কেউ নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞেস করলে লোকটা অবশ্যই বোকার মতো একটা ভোঁ-দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, কিংবা হয়তো ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত ভয়ে। রুমা মজুমদার একদিন বিকেলে বাসায় ফেরার সময়ে লোকটাকে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে রুমাল দিয়ে নিজের জুতো মুছতে দেখে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিল। লোকটা অতি কষ্টে একটা করোনারি অ্যাটাক থেকে বেঁচে যায় সে বার। তিন-চার দিন লোকটা ওইভাবে ঘোরাঘুরি করল এলাকাটায়। নজর রাখল। নকল দাড়ির নীচে বড্ড চুলকুনি হয়, নকল গোঁফের ক্লিপ বড্ড জোরে এঁটে বসে নাকের লতিতে। কালো চশমার অনভ্যাসে চোখ ভেপে ওঠে। এইসব অস্বস্তি নিয়েও লোকটা লেগে রইল একটানা। প্রীতিকে সে রোজই দেখতে পেল, কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে। প্রীতির প্রেমিকও রোজ সকালে একবার আসে, বিকেলে আর একবার। বিকেলে প্রেমিকটি নিজের একটি জেফির গাড়ি নিয়ে আসে, প্রীতিকে নিয়ে বেড়াতে যায় কোথায় কে জানে! রাত আটটা নাগাদ ওই একই গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সকালের দিকে আসে একটা লাল রঙা স্পোর্টস-কারে। কখনও-সখনও সেই গাড়িতেই প্রীতি কলেজে যায়, যেদিন ক্লাস থাকে আগেভাগে। নইলে খালি গাড়ি নিয়ে প্রেমিকটি ফিরে যায়। লোকটা আরও খবর নিল, রুমা যদিও এখন আর ভলিবল খেলে না, তবু রোজ সন্ধের দিকে খানিকক্ষণ লেকে সাঁতরায়। কিংবা ওয়াই এম সি এ-তে গিয়ে টেবিল টেনিস খেলে। সন্ধের দিকে রুমা কখনওই বাসায় থাকে না। লোকটা আরও ধৈর্য ধরে দেখে দেখে জানল যে, প্রীতিদের বাসার নীচের তলায় দুটো ফ্ল্যাটের একটায় কয়েকজন মাদ্রাজি ছেলে মেস করে থাকে, তারা খুব নিরীহ। অন্য ফ্ল্যাটটায় এক স্বামী-স্ত্রী থাকে মাত্র। ওই স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়া হয় রোজ, আবার সিনেমায় যাওয়ারও বাতিক আছে। মাদ্রাজি ছেলেরা প্রায় রাতেই বাইরে থেকে খেয়ে ফেরে বলে সন্ধেবেলা তাদের ফ্ল্যাটটাও খালি থাকে। ওপরতলায় অন্য ফ্ল্যাটটা সদ্য খালি হয়েছে, সামনের মাসে হয়তো ভাড়াটে আসবে। লোকটি যখন এইসব খবর নিচ্ছিল তখন তার ছেলেমানুষি ছদ্মবেশ এবং আত্ম-অবিশ্বাসী হাবভাব সত্ত্বেও সে ধরা পড়েনি। তবে এক দিন একটা মফস্সলের লোক আচমকা তাকে 'গড়িয়াহাটা কোন দিকে' জিজ্ঞেস করায় সে আঁতকে উঠে জবাব না-দিয়ে হুড়মুড় করে হাঁটতে শুরু করেছিল। আর একদিন দুটো ফচকে ছোকরার একজন তাকে দেখিয়ে অন্যজনকে বলেছিল, দ্যাখ ঠিক হাবুলের বাবার মতো দেখতে! তাইতে লোকটা আত্মরক্ষার জন্য কিছুক্ষণ পাগলের অভিনয় করেছিল! নিজের স্বভাববশত লোকটা এ ক'দিন অবসর সময়ে রাস্তায়-ঘাটে পয়সা খুঁজে বেড়াত। কত লোকের পয়সা পড়ে যায় রাস্তায়। সর্ব মোট পঁচাত্তর-পয়সা, একটা দিশি কলম, একটা আস্ত বেগুন, দুটো সিগারেট সুদ্ধু একটা সিগারেটের প্যাকেট, একটা স্টিলের চামচ, একটা মেয়েলি রুমাল আর একটা প্লাস্টিকের পুতুল কুড়িয়ে পেয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটা তার কাজে লেগেছিল আর কয়েকটা পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে সে জমিয়ে রেখেছিল।

এই নকল লোকটা আমিই। রোজ রাতে সুবিনয় তার সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করত,

আমি গিয়ে তাকে সারা দিনের রিপোর্ট দিতাম। গম্ভীর হয়ে সুবিনয় শুনত, আর একটা কাগজে কখন কে বেরোয়, আর কে ঢোকে তার একটা টাইম চার্ট তৈরি করত। গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার পরা তার সুবিশাল চেহারাটা খুনির মতো দেখায় রোজ।

একদিন অনেক হিসেবের শেষে সে বলল, উপল, রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা হচ্ছে সবথেকে সেফ সময়। রুমা রোজই সাড়ে আটটায় ফেরে। প্রীতি আর তার লাভার ফেরে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাদ্রাজি ছেলেরা ন'টার আগে কমই ফেরে, দু'-একজন আগে ফিরলেও ক্ষতি নেই।

আমি আঁতকে উঠে বলি, ক্ষতি নেই কীরে? ওরা থাকলে—

সুবিনয় গম্ভীর হয়ে বলে, চার-পাঁচজনকে আমি একাই নিতে পারব। খুব বেকায়দা দেখলে তুই হেল্প করবি।

তার দরকার কী?

দরকার কে বলেছে! যদি বাই চান্স ফেরে তবেই দরকারের কথা ওঠে। বাকি থাকছে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী। এদের আচরণ আনসার্টেন। ওরা বিশেষ কোনও দিন সিনেমায় যায় না?

না। দু'দিন যায় না, তারপর যায়, আবার হয়তো তিন দিন যায় না, এইরকম আর কী!

আনওয়াইজ অফ দেম। যাকগে, অত ভাবলে চলে না।

না ভাবলেও চলবে না।

সুবিনয় আমার মুখের দিকে স্থির চেয়ে বলল, প্রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে আমেরিকায় আমি একটা ছোকরাকে ঠেঙিয়েছিলাম খোলা রাস্তার ওপর। তাতে কিছু হয়নি। অত ভাবলে চলে না।

আমি অসহায়ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

পরদিনই সুবিনয় প্রীতির ফ্ল্যাটবাড়িতে হানা দিল।

কপালটা ভালই সুবিনয়ের। সেদিন মাদ্রাজি ছেলেরা কেউ ছিল না। স্বামী-স্ত্রীও সেদিন সিনেমায় গেছে। রুমাও যথারীতি বাইরে। এবং প্রীতি আর তার প্রেমিকও সেদিন দুর্ভাগ্যবশত সাড়ে সাতটায় ফিরে এল।

সুবিনয় সিঁড়ির নীচের অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল, আমি উলটো দিকের ফুটপাথে। প্রীতি তার প্রেমিককে নিয়ে দোতলায় উঠল দেখলাম। ঠিক তার কয়েক সেকেন্ড পর সুবিনয়ের বিশাল চেহারাটা বেড়ালের মতো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে আমি।

ভেজানো দরজা ঠেলে সুবিনয় ঘরে ঢুকল। প্ল্যান মাফিক আমিও ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি আটকে পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কী ঘটছে তা দেখার সাহস আমার ছিল না। দরজার পাল্লায় পিঠ দিয়েই আমি চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। টের পাই সামনে শি-ক শি-ক, চপ, মাগো, গড, ধুপ গোছের কয়েকটা আওয়াজ হল। তারপর সব চুপচাপ।

চোখের পাতা জোর করে বন্ধ করায় ব্যথা হচ্ছিল, কানে-দেওয়া আঙুল টনটন করছে, কানের মধ্যে দপ দপ আওয়াজ হচ্ছে। বেশিক্ষণ এভাবে থাকা যায় না।

তাই অবশেষে চোখ-কান খোলা রাখতে হল।

তেমন কিছু হয়নি। ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর হয়নি, লণ্ডভণ্ডও হয়নি। প্রীতি তার ঘোরানো চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার পায়ের কাছেই পড়ে আছে প্রেমিক। প্রেমিকের চশমা একটু দূরে কার্পেটের ওপর ডানাভাঙা পাখির মতো অসহায়। সুবিনয় প্রীতির সামনে কোমরে হাত দিয়ে ওয়েস্টার্নের নায়কের মতো দাঁড়িয়ে।

পুরো একখানা বিদেশি স্টিল ছবি।

সুবিনয় ডাকল, প্রীতি, হানি, ডার্লিং!

উঁ!— স্বপ্নের ভিতর থেকে প্রীতি জবাব দিল।

তুমি কি আমাকে ভালবাসো না?

স্বপ্নের দূর গলায় প্রীতি বলল, বাসতাম। আমেরিকায়।

সুবিনয় গর্জে উঠল, আমেরিকায়? তা হলে আমরা আবার আমেরিকায় চলে যাই চলো। সেখানে তুমি আবার আমাকে ভালবাসবে।

অনেকক্ষণ ভেবে প্রীতি ওপর-নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, তাই যেতে হবে। এ দেশে থাকলে তোমাকে ভালবাসা অসম্ভব। নানা সংস্কার বাধা দেয়।

প্রীতির পড়ে-থাকা প্রেমিকের একখানা হাত সুবিনয় জুতোর ডগা দিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, এ ছেলেটা কে প্রীতি? কেমন ছেলে?

প্রীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ও একটা কাওয়ার্ড, একটা উইকলিং। এক ঘণ্টা আগেও ওকে আমি ভালবাসতাম।

এখন?— সুবিনয় গর্জন করে ওঠে।

এখন বাসি না।— প্রীতি মৃদুস্বরে বলল।

সুবিনয় কোমরে হাত রেখে টারজানের মতো হাসল। বন্য এবং সরল হাসি।

প্রীতি হাসল না। মাথা নিচু করে স্থির বসে রইল। চুলের ঘেরাটোপে মুখখানা ঢাকা।

দৃশ্যটা আমার কেন যেন বড্ড বিদেশি বলে মনে হচ্ছিল। যেন কলকাতায় নয়, নিউ ইয়র্ক বা টেক্সাসে ঘটনাটা ঘটছে। বিদেশি কোনও ছবিতে বা বইতে দৃশ্যটা কি দেখেছি বা পড়েছি? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার পেটের মধ্যে সেই স্থায়ী খিদের ভাবটা মৃদু মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল।

বাস্তবিক, এইসব হৃদয়ঘটিত কোনও সমস্যাই আমার নেই। আমার একটাই সমস্যা, বড় খিদে পায়। অনেকক্ষণ ধরে নানা সুস্বাদু খাবার খেয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সুবিনয় মার্কিন প্রেমিকের মতো লম্বা এক পদক্ষেপে প্রীতির কাছটিতে পৌঁছতেই আমি চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিই। তারপর অন্ধের মতো ঘুরে হেঁটে গিয়ে, হাতড়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি নীচে।

ঠিক সদরের দরজায় রুমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তার কাঁধে একটা ব্যাগ, মুখ গম্ভীর।

বলল, কী খবর?

আমি ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে জানাই, কোনও খবর নেই।

ও আবার বলে, প্রীতি কি আপনাকে রিফিউজ করেছে!

একটু ভেবে নিয়ে আমি ওপরে-নীচে মাথা নাড়ি, করেছে।

ভেবেছিলাম, খুশি হবে। হল না। মুখখানা গোমড়া করে বলল, প্রীতি বড্ড বোকা। একজনের পর একজনের সঙ্গে ইনভলভ্ড হয়ে যাচ্ছে। আজ ওকে একটু বকব।

আমি বললাম, প্লিজ, বকবেন না। ওর মন খুব খারাপ।

কেন?

ওর এ প্রেমটাও কেঁচে গেছে।

রুমা কিছু বলার আগেই সিঁড়িতে প্রচণ্ড ভারী পায়ের শব্দ তুলে সুবিনয় নেমে আসছিল। তার বাঁ কাঁধে একটা পাট করা চাদরের মতো প্রীতির প্রেমিক ভাঁজ হয়ে ঝুলে আছে।

রুমাকে দেখে সুবিনয় খুব স্মার্ট হেসে বলল, লোকটা নেশা করে হল্লা করছিল, নিয়ে যাচ্ছি।

দৃশ্যটা দেখে অসম সাহসী রুমাও শিউরে উঠে কাছে সরে এসে আমার একটা হাত জোরে চেপে ধরে বলল, উঃ মা গো! এ লোকটা কে?

আমি সান্ত্বনার ছলে রুমার ভেজা এলোচুলে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কিছু ভয়ের নেই। আপনি ভয় পাবেন না। আমি তো আছি।

উঠল এবং এত দ্রুত নিক্ষেপ করল জিনিসটা যে হাতখানাকে ক্ষণেকের জন্য মনে হল ওয়াশ-এর ছবি।

ববি দ্রুত ঘুরে গেলেন। কিন্তু তবু এড়ানো গেল না। ডার্ট-এর তীক্ষ্ণ মুখ এসে গভীরভাবে গেঁথে গল বা কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগস্থলে। ছিটকে গেল রক্তবিন্দু। ববি সামান্য একটা শব্দ করলেন।

তারপরই মাথায় একটা তীব্র আঘাত।

চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। ববি রায় জানেন, কখন পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।

ওয়ান টু ওয়ান হলে ইন্দ্রজিৎ ভয় খায় না। সে লড়তে প্রস্তুত। প্রতিপক্ষ যদি একা হয়, তবে সে যত বলশালীই হোক, তার হাত এড়ানো শক্ত নয়। বিশেষ করে পালানো প্রতিভা ইন্দ্রজিতের সত্যিই সাংঘাতিক। বলশালী লোকেরা, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করেছে, তেমন জোরে দৌড়তে পারে না।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের বিস্ময় অন্যত্র। সে দিব্যি গঙ্গার ঘাটে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লীনা দোলনকে নজরে রাখছিল এবং তাদের সম্ভাব্য বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে তার মনে হল, লীনা আর দোলন ছোকরা অকারণে তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপরই লীনা ফস করে গাড়ি থেকে কী একটা নিয়ে এল। আর তারপরই একটা ঢ্যাঙা পালোয়ানের আবির্ভাব।

কোনো মানে হয় এর?

কথা নেই বার্তা নেই ছোকরাটা এসেই ইন্দ্রজিতের দামী কোর্টের কলারটা ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল। কব্জির কী সাংঘাতিক জোর।

এখানে কী হচ্ছে! অ্যাঁ।

ইন্দ্রজিৎ এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরই দিল। তবে চিঁ চিঁ করে। ইংরেজিতে।

গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি।

খুব জোরে একটা নাড়া দিয়ে ছোকরা বলল, হাওয়া খাচ্ছো না আর কিছু!

ডান হাতে পটাং করে একট চড় কসাল ছোকরা। আর তাতে চোখে লাল নীল তারা দেখতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। ওয়ান টু ওয়ান বটে, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ যে একাই এতজন তা আগে জানা ছিল না ইন্দ্রজিতের।

ববিকে সে বহুবার অনুরোধ করেছে দু-একটা প্যাঁচ পয়জার শেখানো জন্য। কিন্তু কাজপাগল লোকটা শেখায়নি। ববি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট। দুর্দান্ত বক্সারও ছিল একসময়ে। ছোটখাটো চেহারা বলে মালুম হয় না, কত বগ দৈত্য দানবকে কাত করতে পারে।

কিন্তু ববির কথা মনে হতেই খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল ইন্দ্রজিৎ। ছোকরার হাতে ইঁদুরকলে ধরা অবস্থাতেই সে হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে ছাকরার তলপেটে চালিয়ে দিল।

কাজ হল চমৎকার। ছোকরা তাকে এক মুহূর্তের জন্য আলগা দিল।

ইন্দ্রজিৎ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটতে লাগল।

কিন্তু রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা ট্যাক্সি ঘ্যাস করে এসে একদম সামনে দাঁড়িয়ে গেল

ক্যা! ভাগ রহে হো? বেওকুফ!

ইন্দ্রজিৎ দেখল, সেই বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালা। স্বজাতি এক শিখ যুবকের এরকম হেনস্থা দেখে বীরের জাত সর্দারজীর ক্ষোভ হয়ে থাকবে। সিটের তলা থেকে একটা কৃপান বের করে বুড়ো নেমে এল। বয়স সত্তর হলে কী হয়, তেজ যুবকের চেয়ে বেশি।

কিন্তু ততক্ষণে লীনা দোলন আর যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়েছে। ইন্দ্রজিৎ চট করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

বুড়ো সর্দারজী মুক্ত কৃপাণটি পাশে রেখে ড্রাইভারের সিটে উঠে বলল, পিছা করু?

সর্দারজী তার নিজস্ব ভাষায় যা বলল, তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ছুকরির তো বহুৎ এলেম দেখছি। এক ছুকরির পিছনে তিন তিনজন বেওকুফ! আরে গবেট, মেয়েমানুষের মধ্যে আছেটা কি? মাংসের ডেলা ছাড়া আর কি পাও তোমরা?

এই দার্শনিক মন্তব্যসমূহে মাথা নেড়ে এবং হুঁ হাঁ করে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীই বা করার আছে ইন্দ্রজিতের?

প্রশ্ন হল, ছোকরাটা কে? হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটলই বা কেন?

অন্য গাড়িতে লীনা দোলন আর ছেলেটা পাশাপাশি বসে।

লীনা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

সাদা পোশাকের পুলিশ। আমরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল।

কেন নিয়েছিল তা বলতে পারেন?

না তবে—

না, তেমন কিছু নয়।

আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি ম্যাডাম। পুলিশকে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না ঠিকই। কিন্তু পুলিশ কতটা হেল্পফুল তা তারা জানে না বলেই।

লীনা অমায়িক হেসে বলল, বোধহয় লোকটা আমার প্রেমে পড়েছে!

চৌরঙ্গীতে ছেলেটা নেমে গেল।

১১

লীনা আজ রাত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছিল। প্রথম কথা, নীল মঞ্জিল বলে আর একটা বিপজ্জনক কানামাছি খেলায় সে নামবে কিনা। নামলেও তার ভূমিকা কী হবে?

দ্বিতীয় চিন্তা হল, ববি রায় আদৌ মরেছেন কিনা। মহেন্দ্র সিং লোকটাইবা আসলে কে? কম্পিউটারের কোড হিসেবে কতগুলো ভুল কথা তাকে কেন শিখিয়ে গিয়েছিলেন ববি? রিভলবারটা সত্যিই তার কাজে লাগবে কিনা। গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ-আবির্ভূত সেই যুবক সত্যিই কি সাদা পোশাকের পুলিশ?

প্রশ্ন অনেক। কিন্তু একটারও সদুত্তর পাওয়ার কোনো উপায় তার নেই। ববি রায়ের বাড়িতে সে অনেকবার টেলিফোন করেছে। কেউ ধরেনি। অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ববি রায়ের বাড়িতে কেউ থাকে না। তাঁর কোনো পরিবার পরিজন নেই। দুজন দারোয়ান আছে, তারা ফোন ধরে না, বাড়ি তালাবদ্ধ বলে। অফিসে থেকে সে আরো জেনেছে, ববি ট্যুরে গেছেন, এর চেয়ে বেশি অফিস আর কিছু জানে না।

বাড়িতে লীনার কোনো আপনজন নেই। দাদা খানিকটা ছিল, এখন দাদাও ভয়ঙ্কর রকমের পর।

তবু দাদাকেও ফোন করেছিল লীনা। তার দাদা দীর্ঘদিন পশ্চিম এশিয়া সফর করে সদ্য ফিরেছে। কিন্তু সন্ধ্যের পর দাদা আর স্বাভাবিক থাকে না। সম্পূর্ণ মাতাল গলায় কথা বলতে শুরু করায় বিরক্ত লীনা ফোনটা রেখে দিল। আজকাল সন্ধ্যের পর সকল পুরুষদের প্রায় কাউকেই স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। এত মদ খেয়ে কী যে হয়!

আজ বিকেলে গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে আসার পর সে আর দোলন কিছুক্ষণ একটা রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা মেরেছে। তখন লীনা নীল মঞ্জিলের কথা তুলেছিল। দোলন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছে, তোমার বস্ যদি মারা গিয়েই থাকেন তবে কেন একটা ডেড ইসুকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছো?

আমার মন কী বলছে জানো? ববি মারা যাননি।

কী করে বুঝলে? সিক্সথ সেন্স?

বলতে পারো।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই।

কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে।

তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু রিস্ক কতটা?

কী করে জানবো?

তাহলে ওটা ভুলে যাও লীনা।

তুমি কি ভীতু দোলন?

অবশ্যই। নীল মঞ্জিল হয়তো তোমার বস-এর বাগানবাড়ি। তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে...

ছিঃ দোলন! ববি পাগল ঠিকই, কিন্তু ওরকম নন। তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, ববি

মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকান না। কথায় কথায় অপমানও করেন। লোকটাকে সেই জন্যেই আমি এত অপছন্দ করি।

আচ্ছা, আচ্ছা, মানছি তোমার বস খুব সাধু ব্রহ্মচারী মানুষ। কিন্তু তা বলে নীল মঞ্জিল যে খুব নিরাপদ জায়গা এটা মনে করারও কারণ নেই।

লীনা দোলনের কথাটা চুপ করে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তার মনে সেই থেকে একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো বিঁধে আছে। অফিসের বাইরে কোনো কাজ করতেই ববি তাকে বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু লোকটার স্পর্ধিত নির্দেশের মধ্যেও যেন একটা অসহায় আর্তি আছে।

তার মা আর বাবার পার্টি থাকায় আজ একাই ডিনার খেল লীনা। ডিনার সে প্রায় কিছুই খায় না। একটুখানি সুইট কর্ন-সুপ আর আধখানা রুটি। হাসিহীন বৈষ্ণবী খাবারে তদারকি করছিল।

এই নিরানন্দ বাড়ি মাঝে মাঝে লীনার হাঁফ ধরিয়ে দেয়। তার বিপুল স্বাধীনতা আছে, সেকথা ঠিক, কিন্তু এত অনাদর এবং এত ঠাণ্ডা সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী যন্ত্রণার।

ঘরে এসে স্টিরিও চালিয়ে দিল লীনা। কিছুক্ষণ ঝাঁইঝিমাঝম বাজনার সঙ্গে একা একা নাচল ঘরময়।

তবু কেন যে মনটায় এত অস্বস্তি, এত জ্বালা, কোথায যেন একটা ভুল হচ্ছে তার। কী যেন একটা গোলমাল হচ্ছে।

হঠাৎ বৈষ্ণবী এসে দরজার কাছ থেকে ডাকল, দিদিমণি।

লীনা ঈষৎ কঠিন হয়ে বলল, কী বলছো?

তোমার একটা চিঠি এসেছিল আজ। টেলিফোনের টেবিলে রাখা ছিল। দেখলাম তুমি নাওনি। এই নাও।

লীনা চিঠিটা নিল। খামের ওপর অতিশয় জঘন্য হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা। কিন্তু হাতের লেখাটা দেখেই কেঁপে উঠল লীনা। সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ।

বৈষ্ণবী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল লীনা। বোম্বের শীলমোহর অস্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু হস্তাক্ষর কার তা তো লীনা জানে।

বিবশ হাতে খামের মুখটা ছিড়ল সে। একটা ডায়েরির ছেঁড়া পাতায় সম্বোধনহীন কয়েকটা লাইন। প্রায় অবোধ্য। তবু হাতের লেখাটা খানিকটা চেনা বলে কষ্ট করেও পড়ে ফেলল লীনা।

ইংরেজি লেখা: হয়তো এটাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। নীল মঞ্জিলে আপনি আবার সমস্যার মুখোমুখি হবেন। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। তেমন বিপদ বুঝলে লাল বোতামটা টিপে দেবেন। মাত্র তিন মিনিট সময় থাকবে হাতে। মাত্র তিন মিনিট. অন্তত তিনশো মিটার দূরে সরে যেতে হবে ওর মধ্যে। পারবেন?

কোনো মানেই হয় না এই বার্তাটির। কিন্তু কাগজটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লীনার চোখ হঠাৎ জ্বালা করে জল এল।

গভীর রাত অবধি আজকাল তার ঘুম আসে না। কিন্তু হাতের কাছে ঘুমের ওষুধ থাকা সত্ত্বেও সে কখনো তা খায় না।

আজও সে জেগে থেকে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ। ফটক খোলার আওয়াজ। তার মা আর বাবা সামান্য বেসামাল অবস্থায় ফিরল। সিঁড়িতে দুজনে উঠল তর্ক করতে করতে।

তার মা বলল, ওঃ নোঃ! হি ইজ আ স্কাউন্ড্রেল।

লীনা ব্যাপারটা জানে। সুব্রত নামে একটি সফল মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে বাবা আগ্রহী। সুব্রত নিজেও আগ্রহী লীনাকে বিয়ে করতে। বহুবার এ বাড়িতে হানা দিয়েছে লোকটা। খারাপ নয়, কিন্তু এত বেশি ড্রিঙ্ক করে যে, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়াই মুশকিল।

আজ সুব্রতর কথা ভাবতে হাসি পেল লীনার। সুব্রত বড়লোক বাপের ছেলে। হাইলি কানেকটেড। তাদের সঙ্গে একটা কলাবোরোশনের চেষ্টায় আছে লীনার বাবা। বিয়ে হলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু লীনা সুব্রতকে বিয়ে করবে কেন? তার তো কখনো আগ্রহই হয়নি

লীনা দোলনের কথা ভাবতে লাগল। দোলন একদিন মস্ত বড় মানুষ হবে, এটা লীনার স্থির বিশ্বাস। তার চেয়েও বড় কথা, দোলন হবে তার বশংবদ। ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তাদের মধ্যে কখনোই হবে না। লীনাকে দোলন এখন থেকেই ভয় পায়।

অস্থির হয়ে লীনা উঠল। তার বাবা আর মায়ের আলাদা ঘর নিঝুম হয়ে গেছে। সারা বাড়িটাই

এখন ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ।

লীনা বারান্দার রেলিং ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আজও রাস্তায় কয়েকটাগাড়ি। লীনা চেয়ে রইল, যদি কোনো গাড়িতে আজও সিগারেটের আগুন দেখা যায়!

সিগারেটের আগুন দেখা গেল না বটে, কিন্তু লীনার হঠাৎ মনে হল, একটা ছোটো গাড়ির মধ্যে যেন সামান্য নড়াচড়া। কেউ আছে জেগে বসে আছে।

লীনা সামান্য কাঁপা বুক নিয়ে ঘরে চলে এল।

তাকে অকারণে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন ববি। হয়তো ঘটনাগুলি ক্রমে বিপদের আকার ধারণ করবে। কিন্তু লীনা কিছুতেই আজ ববির ওপর রাগ করতে পারল না।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে। এই নিরাপদ নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে সে কি সুখী? এর চেয়ে একটু বিপদের মধ্যে নেমে পড়া যে অনেক বেশি কাম্য।

সে নীল মঞ্জিল রহস্য ভেদ করতে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ল লীনা।

পরদনি অফিসে যথাসময়ে পৌঁছে লীনা অবাক হেয় দেখল, তার জন্য রিসেপশনে সেই লম্বা চেহারার ছিপছিপে সাদা পোশাকের পুলিশ ছোকরাটি অপেক্ষা করছে।

তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

লীনা বুঝতে না পেরে বলল, কেন বলুন তো?

আমি জানতে এসেছিলাম যে, সেই লোকটা আর আপনার পিছু নিয়েছে কিনা। আপনি ইনসিকিওরড ফিল করছেন না তো।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কি করে।

ছোকরা মৃদু হেসে বলল, আমি পুলিশে কাজ করি, ভুলে যাচ্ছেন কেন। পুলিশকে সব খবরই রাখতে হয়।

লীনা একটু কঠিন গলায় বলল, একটা সামান্য ঘটনার জন্য আপনার এতটা কষ্ট স্বীকার করারও দরকার ছিল না। পুলিশের কি আর কাজ নেই?

ছোকরা তবু দমল না। হাসিটা দিব্যি মুখে ঝুলিয়ে রেখে বলল, এটাও তো কাজ।

লীনা বলল, ধন্যবাদ। আমাকে কেউ আর ফলো করছে না। নিজের নিরাপত্তা আমি নিজেই দেখতে পারি।

এই বলে লীনা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল লিফটের দিকে। ভ্রূ কোঁচকানো, মাথায় দুশ্চিন্তা।

ছোকরাটা এগিয়ে এসে ডাকল, মিস ভট্টাচার্য, একটা কথা।

আবার কী কথা?

কিছু মনে করবেন না, গতকাল আপনার হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেয়েছিলাম।

লীনা সাদা হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না তো।

আপনি জিনিসটকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

লীনা নিজেকে সামলে নিতে পারল। বলল, আঁচলের আড়ালে কী ছিল তা বোঝা অত সহজ নয়। আপনি ভুল দেখেছেন।

ছেলেটা খুব অমায়িক গলায় বলল, আমি কোনো অভিযোগ নিয়ে আসিনি। শুধু জানতে এসেছি ওই পিস্তলটার জন্য আপনার লাইসেন্স আছে কিনা। ফায়ার আর্মসের ব্যাপারে আমরা একটু বেশি সেনসিটিভ।

আমার কাছে কোনো পিস্তল ছিল না।

ছেলেটা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল মিস ভট্টাচার্য, পিস্তলটা আপনি আঁচলের আড়াল থেকে অত্যন্ত কৌশলে আপনার হাতব্যাগে ভরে ফেলেছিলেন। সেটা হয়তো এখনো আপনার হাতব্যাগেই আছে।

লীনা জানে আছে। ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝুলছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভারী। ব্যাগটা অবহেলায় একটু দুলিয়ে লীনা মধুর করে হেসে বলল, থাকলে আছে। আপনার আর কিছু বলার না থাকলে এবার আমি আমার ঘরে যাবো। আমার দেরি হয়ে গেছে।

ছেলেটা সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, মিস ভট্টাচার্য, আমি যদি আপনি হতাম তাহলে পিস্তলটা পুলিশকে হ্যান্ডওভার করে দিতাম। একটা পিস্তলের জন্য আপনাকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হতে পারে।

লীনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।

অটোমেটিক লিফটে ঢুকে সুইচ টিপে দিল লীনা। ছোকরার মুখের পর দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

ওপরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে লীনা ব্যাগ খুলে পিস্তলটা বের করল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একেবারে নতুন ঝকঝকে পিস্তলটা দেখতেও ভারী সুন্দর। এই বিপজ্জনক জিনিসটা ববি কেন তাকে দিয়ে গেলেন তাও বুঝতে পারছিল না লীনা। এতই কি বিপদ ঘটবে তার?

ববির নামে এক পাহাড় চিঠি এসেছে। সেগুলো খুলে যথাযথ ফাইল করতে লাগল লীনা। ফোন আসতে একের পর এক ব্যস্ততার মধ্যে লীনার অনেকটা সময় কেটে গেল।

দুপুরে লাঞ্চ ব্রেক-এর সময় আবার ফোন এল।

হ্যাল্লো।

মিস ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ।

আমি মহেন্দ্র সিং?

কে মহেন্দ্র সিং?

আমি ববি রায়ের সেই বন্ধু যে আপনাকে বোম্বে থেকে ফোন করেছিল। মনে আছে?

লীনা দাঁতে ঠোঁটে টিপে ধরল। ববির বন্ধু। তারপর বলল, হ্যাঁ মনে আছে। মহেন্দ্র সিং আপনার ছদ্মনাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি খুবই বিপন্ন।

তার মানে?

বলছি। কিন্তু কথাটা ফোনে বলা যায় না। আপনার সঙ্গে কি একা দেখা করা সম্ভব?

লীনা সতর্ক হয়ে বলল, আপনি কি কোথাও আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাইছেন?

যদি বলি তাই?

তা সম্ভব নয়।

আমি খুব নিরীহ লোক।

আপনি কেমন তা জেনে আমার লাভ নেই। দেখা করতে হলে আপনি আমার অফিসে আসতে পারেন বা বাড়িতে। অন্য কোথাও নয়।

মহেন্দ্র সিং যেন একটু হতাশ হল। স্তিমিত গলায় বলল, তা হলে আপনাকে ফোনেই একটু সাবধান করে দিই। আপনার অফিসে যে ছোকরাটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে খুব সুবিধের লোক নয়।

একথায় লীনা অবাক হল। তারপর রেগে গেল। বলল, তার মানে কি আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন?

রাগ করবেন না মিস ভট্টাচার্য, আপনার ওপর নজর রাখতে স্বর্গত ববি রায় আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন। অন্তত আরো দিন সাতেক কাজটা আমাকে করতেই হবে। তারপর অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। স্বর্গত ববি রায় তো আর পেমেন্ট করতে পারবেন না ফলে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে।

ববি রায় কি সত্যিই মারা গেছেন?

লাশ দেখিনি। কিন্তু যাদের খপ্পরে পড়েছেন তাদের হাত থেকে সুপারম্যানদের রেহাই নেই।

লীনা কথা বলতে পারল না, আজ তার সত্যিই ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে। কষ্টটা কিসের তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না সে।

মিস ভট্টাচার্য।

বলুন।

ববি রায় অতিশয় খারাপ লোক।

আপনি তাঁর কেমন বন্ধু?

নামমাত্র।

আমার তো মনে হয় আপনিও খুব খারাপ।

যে আজ্ঞে। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

পারেন।

ওই ছোকরা আপনার কাছে কী চায়।

তা জেনে আপনার কী হবে?

ছোকরাকে একটু জরিপ করা দরকার।

লীনা একটু ভেবে নিয়ে বলল ছেলেটা বলছে যে ও পুলিশে চাকরি করে।

মোটেই বিশ্বাস করবেন না যেন।

করছি না। আমি তত বোকা নই।

আর কী চায়?

জানি না, তবে মনে হয় আপনার মতো এই ছোকরাও আমার ওপর নজর রাখছে। আমার ওপর নজর রাখার লোকের অভাব নেই দেখছি।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি একটু সাবধান হবেন।

ধন্যবাদ। আমি যথেষ্ট সাবধানী।

আমি অবশ্য পিছনে আছি।

না থাকলেও ক্ষতি নেই।

লীনা ফোন রেখে দিল।

নীল মঞ্জিলে অভিযান করতে হলে এইসব নজরদারদের এড়ানো ভীষণ দরকার। লীনা ভাবতে বসল। কাল শনিবার অফিস ছুটি। লীনা কালই নীল মঞ্জিলে যাবে।

১২

গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা অনেকটা গভীর জল থেকে উঠে আসার মতো। অপ্রাকৃত এক ছায়া থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থতার ঘোর-লাগা আলো। ববি সংজ্ঞাহীনতা থেকে যখন সচেতনতায় ফিরছিলেন তখনো তাঁর ভিতরে আরও একজন কেউ যেন সতর্ক প্রহরায় ছিল। না হলে সংজ্ঞাহীনতার মধ্যেও তিনি নিজেকে টের পাচ্ছিলেন কেমন করে?

যে জেগে ছিল সেই কি তাঁর বিকল্প সত্তা, যাকে তিনি বহুবার অনুভব করেছেন তাঁর প্রথাসিদ্ধ জেন মেডিটেশনের সময়? ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাক বেল্ট ববি যখনই তাঁর ইন্ বা সহনশীলতার অভ্যাস করেছেন, যখনই ইয়ান বা দেহ ও মনের সমগ্র শক্তিকে করতে চেয়েছেন একীভূত তখনই কি বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি নিজের থেকে নিজে? যে দেহ আঘাত পায় তার থেকে ভিন্ন হয়ে নির্বিকার থাকার অভ্যাস তাঁকে দিয়েছে এক দার্শনিক সদাসঙ্গীকে। সে তাঁরই ওই বিকল্প সত্তা। ইন মানেই নম্রতা, জলের চেয়েও কমনীয় হওয়া, সমস্ত কঠিন আঘাতকে গ্রহণ করা নিজের গভীর সহনশীলতায়। শেষ অবধি কোনও আঘাতই আর আহত করে না। গায়ে ছুঁচ ফোটালেও নিশ্ছিদ্র থেকে যায় ত্বক। বড় অল্প দিনের অল্পায়াস সাধনা তো নয়। ইন আর ইয়ান-এর সেই সমন্বয় বহুদিন ধরে, গভীর অধ্যবসায়ে অধিগত করতে হয়েছে ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাক বেল্টকে।

ববির জ্ঞান ফিরল। টান টান হয়ে উঠল তাঁর চেতনা। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই চেতনার আলো। ববি নিঃঝুম হয়ে পড়ে থেকে তাঁর ইয়ানকে খুঁচিয়ে তুললেন। দেহ ও মন। দেহ আর মনের সমস্ত শক্তিকে জড়ো করতে লাগলেন একটি জায়গায়, মস্তিষ্কে।

প্রথম প্রশ্ন : তিনি কোথায়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : তিনি কতটা আহত?

তৃতীয় প্রশ্ন : তাঁর পরিস্থিতি কতটা খারাপ?

চতুর্থ প্রশ্ন : কতদূর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায়?

পঞ্চম প্রশ্ন : কতদূর শান্তভাবে তিনি পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারেন?

প্রশ্ন আরও আছে। অনেক প্রশ্ন। তবে সেগুলো আপাতত মুলতবি থাকতে পারে।

তবে এক বছর আগে একদিন নিউ ইয়র্ক থেকে কনকর্ড ফ্লাইটে প্যারিসে ফিরেছেন ববি। জেট ল্যাগ এবং অন্যান্য ক্লান্তি তো ছিলই। প্যারিসে সদ্য নিজের ছোটো ও উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে জানুয়ারির শীতে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কফি খাচ্ছিলেন। এমন সময় লোকটা এল। দরজা খুলে একজন শীর্ণকায় লম্বা বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে থেকে ববি অবাক। বাঙালি ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন। গায়ে প্রচুর গরম জামা সত্ত্বেও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন শীতে। কথা বলতে

পারছিলেন না। এমনকি নিজের পরিচয়টুকু পর্যন্ত না। ববি তাঁকে ধরে এনে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসিয়ে দিলেন। সামান্য ব্র্যান্ডি মিশিয়ে একপাত্র কফিও।

ভদ্রলোক কফিটুকু সাগ্রহে পান করলেন, পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথির শিশি বের করে কয়েকটা গুলি মুখে ফেলে পরিষ্কার ফরাসি ভাষায় বললেন, আমার নাম রবীশ ঘোষ।

রবীশ ঘোষ নামটা ববি রায়ের স্মৃতিকে কোনো তরঙ্গ তুলল না। এ নাম তিনি শোনেন নি।

রবীশ বললেন, আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি।

বলুন কী করতে পারি।

রবীশ কোটের পকেট থেকে তাঁর পাসপোর্ট বের করে ববির হাতে দিয়ে বললেন, এছাড়া আমার একটা আইডেনটিটি কার্ডও আছে। যদি চান—

ববি পাশপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়স কত?

একাশিতে পড়েছি।

ববি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এই বয়সে কেউ মিথ্যে কথা বলে না বড় একটা। আপনাকে অবশ্য ষাট টাটের বেশি মনে হয় না।

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, না, একাশিই। আমি এদেশে শেষবার এসেছি বছর পনেরো আগে। এখন চব্বিশ পরগনা বা হাওড়ার সামান্য শীতই আমার সহ্য হয় না। প্যারিসের শীত আমার মতো বৃদ্ধের কাছে কতখানি ভয়াবহ তা কল্পনা করুন। তবু আসতে হয়েছে। গত চার দিন প্যারিসে বসে আছি শুধু আপনার জন্যই। চারদিকে বরফ আর বরফ, বেরোতে পারি না।

দরকারটা কি এতটাই জরুরি?

সাঙ্ঘাতিক জরুরি।

আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলছেন, এখানে কখনো দীর্ঘদিন ছিলেন?

বহুদিন। একটানা পনেরো বছর।

আমি কিছুটা বাংলা জানি। আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন।

রবীশ তৎক্ষণাৎ বাংলায় বললেন, সেটাই নিরাপদ। আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কাণ্ডকারখানার কথা জানেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার, টেলিফোন লিঙ্ক ইত্যাদি ছাড়াও এরা আর একটা কাজ করে। গোয়েন্দাগিরি।

ববি বিস্মিত হয়ে বললেন, একথা তো আজকাল বাচ্চারাও জানে। স্যাটেলাইটরা গোয়েন্দাগিরির জন্যই আকাশে রয়েছে।

রবীশ হাসলেন, বয়সের দোষ; মায়ের কাছে মাসির গল্প করছি। আপনি জানবেন না তো কে জানবে? কথা হল, আমাদের ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশেরও দু একটা স্যাটেলাইট আছে। ভূসমলয় স্যাটেলাইট। অর্থাৎ—

ববি হাত তুলে বললেন, বুঝতে পারছি। বলুন।

কিন্তু স্পাইং করার যোগ্যতা আমাদের দুর্বল স্যাটেলাইটের নেই। তাই আমি দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছি মার্কিন এবং রুশ উপগ্রহগুলি থেকে ইনফর্মেশন সংগ্রহ করার উপায় আবিষ্কার করতে।

ববি কিছুক্ষণ খুব স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে তো চুরি?

রবীশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, চুরি নয়। চোরের ওপর বাটপাড়ি। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রতিটি বর্গফুট জায়গার ছবি এবং খবর রুশ ও মার্কিন উপগ্রহগুলি অবিরাম সংগ্রহ করে যাচ্ছে। এক স্যাটেলাইট থেকে আর এক স্যাটলাইট রিলে করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের দেশে, যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে মনিটারিং করে চলেছেন দিনরাত। আপমি তো জানেন, ঘাসের নিচে পড়ে থাকা একটি ছুঁচের খবরও এই সব স্যাটেলাইটের কাছে গোপন থাকে না।

সে কথা ঠিক।

আমাদের উপগ্রহের সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমাদেরও কিছু ইনফর্মেশন দরকার। নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদেই দরকার। ওরা যখন আমাদের অজান্তেই আমাদের দেশের সব খবর গোপন সংগ্রহ করে নিতে পারে তখন ওদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তা চুরি হবে কেন? কাজটা খুব শক্ত আমি জানি। ওদের স্যাটেলাইটে এমন লকিং ডিভাইস আছে এবং এমনই ওয়েভ লেংথে ওরা খবর পাঠায় যা ভেদ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের তো অতিকায় এবং সুপারসেনসিটিভ ডিস্ক অ্যান্টেনা নেই। মনিটরিং সিস্টেমও প্রিমিটিভ। দীর্ঘদিন ধরে আমি চেষ্টা করেছি একটা কোনো

উপায় আবিষ্কার করতে। একেবারে ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়তো হবে না আমার বয়স একাশি, আমি দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছি। আর তাই আপনার কাছে আসা।

আমার কাছে কেন?

রবীশ বুদ্ধের মতো প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললেন, আমি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের জগতের খবর সবই রাখি। আপনি এই বয়সে যে প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা বিজ্ঞানীদের অজানা নেই। আমি আপনার মোট চারটে পাবলিশড পেপার পড়েছি। পড়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তারও বেশি বিদ্যা আপনার ভিতরে আছে। আমি জানি। ইলেকট্রনিক্স আমারও বিষয়। কলকাতার কাছেই একটা গোপন জায়গায় আমি একটি মনিটরিং সেন্টার তৈরি করেছিলাম। পুরোপুরি ক্যামোফ্লেজড্ এরিয়া।

আপনাদের সরকার এসব জানেন?

রবীশ মাথা নেড়ে বললেন, আমরা কেউ কেউ ভারত সরকারে একান্ত বিশ্বাসভাজন। সরকার আমাদের কাজের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন না আমরা সেটা পছন্দ করি না বলেই। কিন্তু আমরা যা টাকা চাই তা বিনা বাক্যব্যয়ে এবং বিনা প্রশ্নে মঞ্জুর করে দেন।

বুঝেছি। তারপর বলুন।

মুশকিল হল, এতকাল আমার দুজন সহকর্মী ছিল। আমাদের কোনো সিটিকউরিটি গার্ড ছিল না। শুধু ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম রয়েছে। ইচ্ছে করেই আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে লোকের চোখ না আকৃষ্ট হয়। আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ছিল না ওখানে। এক একজন আট ঘন্টা করে রাউন্ড দি ক্লক কাজ চালু রাখতাম। কেউ অ্যারেস্টে হলে অবশ্য কাজ বন্ধ রাখতে হত। একদিন এক সহকর্মীকে কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। মাথায় গুলি, হাতে ধরা নিজের রিভলবার, পরিষ্কার আত্মহত্যা। অথচ আত্মহত্যা করার কোনো স্পষ্ট কারণ ছিল না। সুখী মানুষ, বউ আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে সংসার। তবে তার স্ত্রী বলল, মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে যেন শাসাত যে, কথামতো না চললে তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। ওই টেনশন সম্ভবত লোকটা সহ্য করতে পারেনি। তাই নিজে মরে ছেলেকে চিরকালের মতো নিরাপদ করে দিয়ে গেল।

আর আপনার দ্বিতীয় সহকর্মী?

সে তার দেশের বাড়িতে ফিরে গেছে গত মাসে। স্পস্ট করে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার সন্দেহ, সেও ওরকমই কোনো বিপদে পড়েছিল। তারও ছেলেমেয়ে আছে।

আর আপনি?

আমার কেউ নেই। ব্যাচেলর।

আপনাকে কেউ ভয় দেখায়নি?

বৃদ্ধ আবার হাসলেন, সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা। মরতে আমার ভয় নেই। শুধু ভয় আমার মৃত্যুর পর প্রজেক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। যাতে আর কারও হাতে না পড়ে তার জন্য প্রজেক্টটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আমি রেখেছি।

কিন্তু সেটা তো চরম ব্যবস্থা।

আপনার প্রস্তবটা কী?

যদি দয়া করে আমাদের অসম্পূর্ণতা এবং ঘাটতিটুকু আপনি পূরণ করে দেন। হয়তো বছরখানেক লাগবে। তারপর আপনি আবার আপনার স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবেন। আপনার জন্য আমাদের অফার স্কাই হাই নয়। আমাদের দেশ গরিব। আপনি যদিও বিদেশের নাগরিক, তবু ভারতবর্ষ আপনার মাতৃভূমি, আপনি বাঙালিও। আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধটুকু করতে এই বয়সে এতদূর ছুটে এসেছি।

ববি রায় রাজি হননি। বৃদ্ধকে একরকম ফিরিয়েই দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আবার এলেন। আবার। আর একাশি বছর বয়স্ক তদগতচিত্ত এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের ভিতরে কোনো চালাকি আর ছলচাতুরি নেই বলে ববি রায়ের লোকটা প্রতি সহানুভূতি হতে লাগল।

তারপর একদিন রাজি হলেন। দেখাই যাক অনুন্নত ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধ কী এমন কলকজা তৈরি করেছেন যা উন্নত উপগ্রহের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির লকিং ডিভাইস ববির অজানা নয়। তাঁর ধুরন্ধর মস্তিস্ক এই সব রহস্যকে জলের মতো পরিস্কার করে নিতে পারে। কিন্তু মাথা দিয়েই সব হয় না। চাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

যন্ত্রপাতি। চাই না-হাউ। চাই সহকারী।

রবীশ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যেন অন্য কোনো চাকরি বা কাজের ছুতোয় যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন। সেটা কোনো সমস্যাই হল না। কলকাতায় শাখা আছে এমন একটি মাল্টিন্যাশনালে ববি চাকরি নিলেন। ববির মতো লোক চাকরি চাওয়ায় কোম্পানি কৃতার্থ হল, বর্তে গেল। তাঁকে স্থাপন করা হল কোম্পানির প্রায় মাথায়।

রবীশ তাঁকে দমদমে রিসিভ করেননি। স্বাভাবিক সতর্কতা, দেখা করেছিলেন সাত দিন পর। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমন্টে করে, একটা বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনের দু'নম্বর কোচে। দ্বিতীয় অ্যাপয়েন্টমন্টে আরও সাত দিন পর, বালি-দুর্গাপুরের এক বাড়িতে। তারপর একদিন নানা ঘোরালো পথে, নানা আঘাটা ঘুরে, সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দেওয়ার নানা বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে, রবীশ তাঁকে নিয়ে হাজির করলেন নীল মঞ্জিলে।

বিশাল বাগান ঘেরা একটা নিঃঝুম বাড়ি। ধারে কাছে লোকালয় নামমাত্র। বাগানের মধ্যে গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি। চারদিকে উঁচু দেওয়ালে ইলেকট্রিক ফেনসিং। ফটকে অটো লক। গাছপালা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎবাহী সরু তার পেতে রাখা। আছে বিচিত্র অ্যালার্ম এবং মিনি-মাইন। আছে বুবি ট্র্যাপ। কয়েকবার হয়তো চেষ্টা করেছিল চোর ডাকাতেরা, বিচিত্র কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় খেয়ে আর কেউ এমুখো হয় না।

এ সবই শুনল ববি রায়।

নীল মঞ্জিল এক পুরনো বাড়ি। সম্ভবত কোনো ধনবান ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল। ছাদে নানা রকমের অ্যান্টেনা। ভূগর্ভের ঘরে মনিটরিং সেন্টার।

ববি সবই দেখলেন। অতিশয় মনোযোগ দিয়ে। খুব খুশি হলেন এমন বলা যায় না। তবে এই বৃদ্ধ যে এতকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

মিস্টার ঘোষ, আমি অতিমানব নই, আমার অতিমস্তিকও নেই। তবে আপনার কাজে দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এমন হতেও পারে, কিছুদিন চিন্তাভাবনা করলে আমি আপনার এইসব ডিভাইসকে খানিকটা ইমপ্রুভও করতে পারি। বিদেশী উপগ্রহকে পেনিট্রেট করা হয়তো বা সম্ভবও হবে। কিন্তু আপনি কি রকম ইনফর্মেশন চান?

সবরকম। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা চাই তা হল, কার অস্ত্র-ভাণ্ডারে কত রকম অস্ত্র জমা হচ্ছে। বিশেষ করে পরমাণু বোমা।

ববি হেসেছিলেন জেনে কী হবে?

রবীশ তার সেই অসামান্য হাসিটি হেসে বললেন, ববি আমি আপনার সম্পর্কে অনেক জানি।

কী জানেন?

আমি জানি আপনি ক্রাইটন নো-হাউ জানেন। ক্রাইটন এমনই ডিভাইস যা যে কেউ কোনও পরমাণু ওয়ারহেডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে। যদি এ দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনো পরমাণু বোমা কোথাও উদ্যত হয়ে থাকে তবে ক্রাইটন তা বিস্ফোরিত করে দিতে পারে তার বেস্-এ।

পারে, কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে।

জানি। আমরা আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটে ক্রাইটন যোগ করে দেব। আমাদের উদ্দেশ্য ও কাজের লক্ষ্য পরিষ্কার। যদি আমরা স্যাটেলাইটগুলো থেকে এমন কোনো ইঙ্গিত পাই যে, আমাদের দেশ আক্রান্ত হতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা আমদের উপগ্রহকে নির্দেশ দেব স্থির লক্ষ্যে ক্রাইটনকে তার তরঙ্গ বিস্তার করতে।

ববি একটা বড় শ্বাস ফেললেন। রবীশ অনেকটাই ভেবেছেন, বৃদ্ধ বৃথা জীবন কাটাননি।

কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে। গত কয়েক মাস ববিকে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে নীল-মঞ্জিলে। প্রতিবারই বিচিত্র ঘুরপথে, কখনও ছদ্মবেশেও।

একদিন আচমকা ববি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এত সতর্কতার কারণ কী? সিকিউরিটি? আপনার মাদ্রাজের সহকর্মী হয়তো এতদিনে পাকে পড়ে মুখ খুলে ফেলেছে।

রবীশ খুব বিষণ্ণ মুখে অধোবদন হলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন, না মুখ খুলবার উপায় তার নেই।

তার মানে?

হি ডায়েড এ ন্যাচারাল ডেথ। অবশ্য অ্যারেঞ্জড ন্যাটারাল ডেথ।

ববি মাথা নাড়লেন। বললেন, গুড, দ্যাটস গুড।

এ স্কোয়ার্ড ম্যান অলওয়েজ ডেনজারাস।

মাত্র গত সপ্তাহে এক সকালে রবীশের ফোন আসবার কথা ছিল, এল না, ববি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই ফোন করলেন।

একটা ভারী গলায় জবাব দিল, কাকে চাই?

রবীশ ঘোষ।

আপনি কে?

ওঁর এক বন্ধু।

রবীশ ঘোষ মারা গেছেন।

কিভাবে?

এ কেস অফ মার্ডার। আপনার পরিচয়—

ববি ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

রবীশ। সৌম্য কর্মপ্রাণ রবীশ। ববির ভাবাবেগহীন মনেও চমকে উঠল একটা গভীর শোকাহত ভালবাসা।

আপাতত ববি একটা কাঠের পাটাতনে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর প্রতিটি হাত ও পা আলাদা আলাদা ভাবে অতিশয় শক্ত দড়ি দিয়ে চারটে গজালের সঙ্গে বাঁধা। নড়ার উপায় পর্যন্ত নেই।

এরা জানে কি রকম নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয়।

ববি শরীরকে নরম করে রাখলেন। হাত পায়ে এতটুকু টান দিলেন না। সামান্য শক্তিক্ষয়ও নিরর্থক। শরীর তাঁর বশীভূত। শরীর ও মনের সেই সমন্বয় এক অলৌকিক ইন ও ইয়ানকে জাগ্রত করে দেয়।

ববি চুপ করে পড়ে রইলেন। একটা চৌকো ঘর, অন্ধকার। বাইরে অবশ্যই প্রহরী রয়েছে। ববির জন্য এরা বিস্তারিত আয়োজন করে রেখেছে।

ববি আস্তে আস্তে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। মন, একীভূত হও, শরীর বশীভূত হও। জাগো জেন।

১৩

বিকেলের ম্লান আলোয় রবীশের মৃত্যুনীল মুখ দেখেছিলেন ববি। একাশি বছরের তদগত বৃদ্ধকে মৃত্যুতেও প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল। যখন তাঁকে গুলি করা হয় তখন বোধহয় নিজের জানালার ধারের আরাম কেদারায় বসে রবীশ আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। আততায়ীরা যখন ঘরে ঢোকে তখনও রবীশ বোধহয় পালানোর চেষ্টা করেননি। জানতেন পালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন তা শান্তচিত্তে গ্রহণ করাই ভাল। তবে রবীশ যে প্রতিরোধ করেননি তা নয়। আরাম কেদারার ধারে তাঁর ঝুলে পড়া হাত থেকে একটা ছোটো রিভলভার খসে পড়েছিল মেঝেয়। বিপদের মধ্যে কাল কাটাতে হত বলেই বোধহয় অস্ত্রটা সব সময়ে সঙ্গে রাখতেন কিন্তু ব্যবহার করার অবকাশ পাননি।

এ সবই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন ববি। আর পুলিশ তাঁকে অজস্র জেরা করে যাচ্ছিল তিনি কে রবীশের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ইত্যাদি। পুলিশ যে ঝামেলা করবে তা তিনি জানতেন তবু রবীশের মৃতদেহটি একবার স্বচক্ষে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

দিন দুই বাদে আর একবার গেলেন ববি। একটু রাতের দিকে। রবীশের ঘরের তালা একটা স্কেলিটন কী দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, তাঁর জন্য রবীশ কোনো বার্তা রেখে গেছেন কিনা। অবশেষে পাওয়া গেল। ছোট্ট একটা পকেট টেপরেকর্ডারে ক্যাসেটটা লোড করা ছিল। প্রথমে দু মিনিট একটা কনসার্ট বাজল। তারপর রবীশের গলা পাওয়া গেল। ফরাসি ভাষায় বললেন, ববি, আপনাকে ওরা আবিষ্কার করবেই। সাবধান।

রবীশের মৃত্যুর পরই ববি বুঝলেন, তিনি ভারমুক্ত। নীল মঞ্জিলের বাকি কাজ করার দায় তাঁর নয়। তিনি এবার এ ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন। বিদেশে অনেক বড় প্রোজেক্ট তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি জানতেন চব্বিশ ঘন্টা তাঁর ওপর কেউ নজর রাখছে। তাই তিনি লীনাকে ...

ববি এখন স্থির হয়ে পড়ে আছেন ঘাটের পাটাতনে। যন্ত্রণার এখন কোনো স্থির বিন্দু নেই।

ববি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত শরীরে। অপেক্ষা করছেন। কাঠের উদোম পাটাতনটা যতেষ্ট কর্কশ। ববির প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু অসম্ভব সহনশক্তি দিয়ে নিজেকে স্থির রাখছেন ববি। কব্জী ও পা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে বাঁধা। একটু নড়লেই তার বসে যাবে মাংসের গভীরে।

একটা দরজা খোলার শব্দ হল ? ঘরে সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়ল। ববি দেখলেন একটা মস্ত বড় গুদাম ঘরের মতো ঘর। এক ধারে চটে মোড়া অনেক প্যাকিং বাক্স।

একটা লোক এগিয়ে এল কাছে।

ববি চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

লোকটা নিচু হয়ে তাঁকে একটু দেখলেন। চোখের পাতা ধরে টেনে পরীক্ষা করল চোখের মণি। তারপর স্মেলিং সল্ট-এর একটা শিশি ধরল নাকের সামনে।

ববি একটু শিউরে উঠে চোখ মেললেন।

সামনে দৈত্যাকার সেই যুবক। ভারতীয়দের গড়পড়তা চেহারা একরকম। সাধারণত হয় না। ছেলেটা সম্ভবত বাস্কেটবল বা ঐ জাতীয় কিছু খেলতে। চমৎকার আঁট শরীরের বাঁধুনি।

ববি চোখ চাইতেই ছেলেটা বলল, সরি।

সরি ?

ছেলেটা ইংরেজিতে বলল, তুমি বিখ্যাত লোক। তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে এনেছো।

তোমরা আমার কাছে কি চাও ?

একটা ঠিকানা। আর একটা কোড।

কেন চাও ?

আমরা প্রজেক্টটা ধ্বংস করে দেবো।

কেন করবে ?

ববি, আপনার এতে স্বার্থ কী? আপনি কেন এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন নিজেকে ? আপনি বলে দিন, আমরা আপনাকে সসম্মানে প্লেনে তুলে দেবো। আপনি প্যারিসে চলে যাবেন।

ববি সামান্য একটু ভ্রূ তুলে বললেন, এতই সহজ ?

আপনার ক্ষতি করে আমাদের লাভ কী ?

ববি গম্ভীরভাবে বললেন, প্রোজেক্টটা ধ্বংস করলেও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আবার তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেওয়া তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ছেলেটা একটু চিন্তিতভাবে ববির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ববি আপনার সেক্রেটারী লীনা ভট্টাচারিয়া আমাদের নজরে রয়েছেন। আজ হোক, কাল হোক, তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের পক্ষে প্রজেক্টটা নষ্ট করে দেওয়া শক্ত হবে না।

ববি সামান্য ক্লান্ত স্বরে বললেন, তোমরা শুধু প্রোজেক্টটা ধ্বংস করতে চাইলে এত কষ্ট স্বীকার করতে না। তোমরা ওর সিক্রেটটা চাও।

যুবকটির মুখে কখনো হাসি দেখা যায় না। সর্বদাই যেন চিন্তান্বিত। মাথা নেড়ে বলল, আমি কোনো সিক্রেটের কথা জানি না।

তুমি ক্রীড়নক মাত্র। যারা জানবার তারা ঠিকই জানে।

যুবকটি ধীর স্বরে বলল, ববি রায়, প্রাণ বাঁচানোর একটা শেষ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করছো। আমার পর যারা তোমাকে অনুরোধ করতে আসবে তারা ইতর লোক প্রায় পশু।

ববি মৃদু স্বরে বললো, ওদের আসতে দাও।

যেমন তোমার ইচ্ছা।

যুবকটি চলে গেল।

ববি উপুড় হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শোয়া অবস্থায় বুঝতে পারছিলেন, এই রকম ল্যাবরেটরির মরা ব্যাঙের মতো পড়ে থেকে কিছুই করা সম্ভব নয়। অন্তত একটা হাতও যদি মুক্ত করা যেত।

দরজা দিয়ে দুজন ঢুকেছে। এগিয়ে আসছে।

ববি চোখ বুজলেন। ইন আর ইয়ান। শরীর ও মন বশীভূত হও। এক হও। এ দেহ সমস্ত আঘাত সহ্য করতে পারে। জল যেমন পারে। বাতাস যেমন পারে।

ববি এক বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করে ধ্যানস্থ হলেন।

চেতনার একটা মৃদু আলো শুধু জ্বলে রইল তাঁর ভিতরে।

রবারের হোস-এর ছোট্ট টুকরো দিয়ে ওরা মারছিল। চটাস চটাস শব্দ হচ্ছিল পিঠে, পায়ে, সর্বাঙ্গে। যেখানে লাগছে সেখানেই যে আগুনের হল্‌কা স্পর্শ করে যাচ্ছে।

জাগ্রত হও, জেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট এক নাগাড়ে ঝড় বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে।

দুটো লোক থামল।

ববি চোখ মেললেন, হয়ে গেল?

লোক দুটো অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল ববির দিকে। তাদের অভিজ্ঞতায়, এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। সাধারণত এরকম মারের পর লোকে গ্যাজেলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী হল। দুটো মজবুত চেহারার নৃশংস প্রকৃতির লোক কেসের থেকে খুলে আনল নিরেট রবারের ভারী মুগর। যাকে ইংরেজিতে "কশ" বলে।

এবা ববির নিজের শরীরের ঢাকের বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন। দুম দুম। কতক্ষণ সংজ্ঞা ছিল না কে বলবে। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তখন ববি টের পেলেন, তাঁর হাত ও পায়ের বাঁধন খোলা। তবে এখনো তিনি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন কাঠের তক্তার ওপর।

শরীরটা যেন আর তাঁর নয়। এত অবশ, অসাড়, দুর্বল লাগছিল নিজেকে যে, চোখের পাতাটুকু খোলা পর্যন্ত কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। কিন্তু এরা ভুল করছে। ববিকে ওরা চেনে না। শরীরেই যে সব মানুষের শেষ নয়, শরীরকে ছিন্নভিন্ন করলেও যে কোনো কোনো মানুষকে ভেঙে ফেলা যায় না, সেই জ্ঞান এদের নেই।

ববি কোনো বোকামি করলেন না। হঠাৎ উঠে বসলেন না বা হাত পা ছুঁড়লেন না যন্ত্রণায়। তিনি শুধু উপুড় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যথা বুঝে কাত হয়ে শুলেন। হাত পা ও সমস্ত শরীরকে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে ফেলে রাখলেন। যতদূর মনে হচ্ছে কোনো হাড় ভাঙেনি। ভাঙলে বমির ভাব হত, চোখে কুয়াশা দেখতেন। তবে শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেছে সেটাও হাড় ভাঙার চেয়ে কম নয়।

চমৎকার কাজ করছে তাঁর মাথা। ববি নিজেকে বিশ্রাম দিয়ে শুধু মাথাটাকে চালনা করলেন। বৃদ্ধ রবীশ ও তাঁর দুই সহকর্মী যতদুল সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করেও সবটা পারেননি। রবীশ বৃদ্ধ হলেও কঠিন ঝুনো মানুষ। নীল মঞ্জিল তাঁরই মস্তিষ্কের ফসল। তাঁর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেললেও কোনো তথ্য বের করা সম্ভব ছিল না। তাঁর অন্য দুই সহকর্মীকে ববি চেনেন না। সম্ভবত তাঁদের কেউ কোথাও অসাবধানে মুখ খুলেছিলেন।

নীল মঞ্জিলের ঠিকানা এখনো প্রতিপক্ষ জানে না। জেনেও বিশেষ লাভ নেই। সেখানকার সুপার কম্পিউটার বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বেড়াজাল ভেদ করে প্রকৃত তথ্য জানা খুবই কঠিন, তবু যদি কোনো বিশেষজ্ঞকে ওরা কাজে লাগায় তবে একদিন হয়তো বা নীল মঞ্জিলের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব নাও হতে পারে। আজ অবধি কেউ বৃহৎ শক্তির অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের গর্ভ থেকে তথ্য চুরি করতে পারেনি। রবীশ সেইকাজে বহুদূর এগিয়েছেন। তাঁকে আরো অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন ববি। এর মধ্যে ববিকে বহুবার বিদেশে যেতে হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোপনে আমদানি করতে। এ কাজে ববি খুবই অভ্যস্ত। কখনো নিজে, কখনো আন্তর্জাতিক চোরাই চালানদের মাধ্যমে জিনিস এসেছে। কিছু বেসরকারী শিপিং কোম্পানি টাকার বিনিময়ে ববিকে সাহায্য করেছে। প্রত্যেকটা পর্যায়ের কাজ বার বার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে নথিবদ্ধ করার পর তা সাইফারে লিবিদ্ধ করেছেন রবীশ। কম্পিউটারে জটিল কোডের আবছায়ায় নির্বাসিত করেছেন তাদের। সবটা ববিও জানেন না।

কিন্তু জানতে হবে। রবীশের মৃত্যু-ম্লান মুখচ্ছবি ববির চোখের সামনে আজও অম্লান ভেসে ওঠে। একাশি বছর বয়সেও মানুষ কতখানি সঞ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ! কতখানি শক্ত! বিকেলের ছাইরঙা আলোয় রবীশের উপবিষ্ট মৃতদেহ তাঁর নিজের জয়ই ঘোষণা করছিল ভারী বিনয়ের সঙ্গে।

ববি খুব ধীরে ধীরে মাথাটা তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন। লক্ষ্য করলেন, এই পাষণ্ডেরা তাঁকে এখনো পুরোপুরি মারতে চায় না বলেই বোধ হয় একা নাঙ্গা টেবিলের ওপর এক জগ জল আর একটি ঢাকা থালি রেখে গেছে।

ববি প্রথমে কাঁপা দুর্বল হাতে জগটা তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন।

পিঠ আর পায়ের চামড়া ফেটে চিরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ফুলে আছে ক্ষতবিক্ষত শরীর। তবু ববি টের পেলেন, তাঁর খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড খিদে। সম্ভবত গত ষোল-সতেরো ঘণ্টা তিনি

কিছুই খান নি।

খুবই দুর্বল হাতে খাবারের ঢাকনাটা খুললেন ববি। কোনো হোটেল থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণীর থালি। দু মুঠো ভাত, দুখানা রুটি, দু তিনটে সব্জি আর সামান্য দৈ।

ববি খুব ধীরে ধীরে খেলেন।

তারপর উঠে দুর্বল পায়ে সামান্য কয়েক পা হাঁটলেন। বুঝলেন, চোট সাঙ্ঘাতিক। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন বিদ্যুৎ-শিখার মতো তীব্র যন্ত্রণা লক লক করে উঠছে।

ববি বসে হাঁফাতে লাগলেন। জল আর খাবারের ক্রিয়া আরো কিছুক্ষণ চললে হয়তো সবল বোধ করবেন।

কাঠের পাটাতনটার ওপর ফের শুয়ে পড়লেন। এবার সংজ্ঞাহীনতা নয়, প্রগাঢ় ঘুমে চোখ আঠা হয়ে লেগে এল।

ঘুম ভাঙল সামান্য একটা শব্দে। সম্ভবত রাত গভীর হয়েছে। গুদামের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার।

ববি উঠে বসলেন। পায়ের দিকে দরজাটা কি খুলে যাচ্ছে? কেউ ঢুকছে? ববি তার কর্তব্য স্থির করে নিলেন চোখের পলকে। এরা যদি তাঁকে আবার বাঁধে তাহলে মুশকিল হবে। তিনি অন্ধকারেই তক্তা থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে আন্দাজে এগোতে লাগলেন।

দরজাটা বেশ বড়। দুটো বিশাল কাঠের পাল্লা। একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন লোক একটা লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল। বিশাল গুদামঘরের অবশ্য সামান্যই আলোকিত হল তাতে লোকটার অন্য হাতে একটা লোহার পাঞ্চ। ববি বেয়াদপি করলে পাঞ্চ চালাবে।

ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এল লোকটা তক্তার দিকে তারপর জায়গাটা শূন্য দেখে থমকাল। চকিতে ঘুরে লণ্ঠনের আলোয় ববিকে খুঁজবার চেষ্টা করল।

তারপর কিছু বুঝে উঠবার আগেই একটা প্রবল আঘাতে লণ্ঠন সমেত চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেল।

ববির পা অত্যন্ত দুর্বল, ব্যথাতুর। তাতে একরকম ভালোই হয়েছে। যে কারাটে কিকটা ববি মেরেছেন লোকটার মাথায় সেটা সবল পায়ে মারলে লোকটার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারত।

ববি হাতড়ে হাতড়ে লোকটার কাছে গেলেন। তাঁর নিজের পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক। ববি নিপুণ হাতে লোকটার গা থেকে ট্রাউজার্স আর হাওয়াই শার্ট খুলে নিলেন। পা থেকে চটিও। ববির গা থেকে ঢোলা হবে কিন্তু আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।

ট্রাউজারের পকেটে কিছু টাকা আছে। আর আছে একটা দেশলাই।

হাই মেহদি! হোয়াটস দ্যা ম্যাটার।

দরজাটা খুলে সেই দৈত্যাকার যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা তীব্র আলো টর্চবাতি আলোটা সোজা এসে পড়েছে মঝেতে শয়ান লোকটার ওপর।

দরজায় পাল্লার আড়াল থেকে ববি হাতটা তুললেন।

মাত্র একবারই চপ্ করে একটা শব্দ হল। বিশাল দৈত্য কুঠার-ছিন্ন মস্ত গাছের মতো ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর।

ববি টর্চটা কুড়িয়ে নিলেন। কাজে লাগবে।

দৈত্যের পকেট থেকে ববি রায় এক বাণ্ডিল নোট পেয়ে গেলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকা। আর দুটো জিনিসও পেলেন। গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আর গাড়ির চাবি।

বাইরে বেরিয়ে ববি চারদিকটা সতর্ক চোখে দেখলেন জায়গাটা একটা মস্ত গো-ডাউন এলাকা। সুনসান নির্জন। রাস্তাঘাট নোংরা। প্রচুর লরি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিয়াট গাড়িটা সামনেই দাঁড় করানো। দরজায় লক নেই ববি উঠলেন। স্টার্ট দেওয়ার আগে জায়গাটা আঁচ করার চেষ্টা করলেন একটু। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

অন্তত মাইলখানেক দূরে আসবার পর ববি চওড়া রাস্তা পেয়ে গেলেন। যথেষ্ট চনমনে বোধ করছেন ববি। তবে সর্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও বিষিয়ে ওঠা ক্ষতস্থান তো সহজে ভুলবার নয়।

ববি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন আরো মাইল তিনেক যাওয়ার পর। একটা নার্সিং হোম। গাড়ি নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

রিসেপশনে যে ঘটনাটা বানিয়ে বললেন ববি, তা চমৎকার তিনি জুয়ার আড্ডায় গুণ্ডাদের

পাল্লায় পড়েছিলেন। প্রচণ্ড মার খেয়েছেন। প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন। চিকিৎসা দরকার।

রিসেপশনের ক্লার্কটি সখেদে বলল, নো বেড স্যার।

ববি অত্যন্ত অবহেলায় ভাঁজ করা দুটো একশো টাকার নোট কাউন্টারে রাখলেন, ইওরস। আই নীড ট্রীটমেন্ট। রেস্ট স্লিপ ... প্লিজ ।

লোকটা নরম হল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই চমৎকার ছোট্ট একটা কেবিন পেয়ে গেলেন ববি। একজন নার্স এসে তাঁর ক্ষতস্থানে ওষুধ দিল। ইনজেকশন করল। এক কাপ কড়া কফিও চাইলেন ববি। পেয়ে গেলেন। তারপর ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়লেন অক্লেশে।

খুব ভোরবেলা ঘুমে ভেঙে গেল ববির। আরও অনেককক্ষণ তাঁর বিশ্রাম নেওয়া উচিত, তিনি জানেন। দরকার ওষুধ এবং পথ্যেরও। কিন্তু অত সময় তাঁর হাতে নেই।

খুব ভোরবেলা লীনার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। আসলে ঘুম নয়। চটকা। লীনার ঘুম হচ্ছে না আজকাল। বার বার দুঃস্বপ্ন দেখে আর ঘুম ভেঙে যায়।

হ্যালো।

বহুদূর থেকে একটা ফ্যাসফ্যাসে ভুতুড়ে গলা বলল, আই ওয়ান্ট মিসেস ভট্টাচারিয়া।

লীনা ইংরেজিতে বলল, আমার মা এখন ঘুমোচ্ছেন। আপনি কে বলুন তো?

আমি লীনা ভট্টাচারিয়াকে চাইছি।

আমিই লীনা।

মিসেস ভট্টাচারিয়া! আর ইউ ইন ওয়ান পিস? থ্যাঙ্ক গড!

হঠাৎ সর্বাঙ্গ এমন কাঁটা দিয়ে উঠল লীনার। এ কি মৃত্যুর পরপার থেকে আসা টেলিফোন? এও কি সম্ভব?

গলায় কী যে আটকাল লীনার, কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না। শুধু একটা অস্ফুট ফোঁপানি তার গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মিসেস ভট্টাচারিয়া, আমি আমি একটু উন্ডেড। খুব বেশি নয়। কিন্তু একটু সময় লাগবে রিকভার করতে। অ্যাট লিস্ট আরও চব্বিশ ঘন্টা। আই অ্যাম ইন এ ব্রাড শেপ।

আর ইউ অ্যালাইভ? রিয়েলি অ্যালাইভ?

ভেরি মাচ।

১৪

লীনা কিছুতেই, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, তার গলায় আনন্দের কাঁপনটিকে থামাতে পারল না। গাঢ় শ্বাস ফেলে বলল, কী হয়েছিল আপনার। কোনো অ্যাকসিডেন্ট?

না, মিসেস ভট্টাচারিয়া। এ সিম্পল কেস অফ প্রহার।

কারা আপনাকে মারল আর কেন?

পয়সা পেলে তারা সবাইকেই মারে। প্রফেশন্যাল ঠ্যাঙাড়ে। মারাঠী ভাষায় যাদের বলা হয় দাদা। দাদা মানে জানেন?

জানি, দাদা মানে গুণ্ডা।

কলকাতাতেও দাদা আছে মিসেস ভট্টাচারিয়া। আপনি কোনো রিমোট জায়গা কিছুদিনের জন্য পালিয়ে যান।

কেন, বলুন তো! পালানোর মতো কী হয়েছে?

ইউ আর ইন ডেঞ্জার চাইল্ড।

ড্রপ দি চাইল্ড বিট। আমি কাউকে ভয় পাই না।

বোকা-সাহস দিয়ে কিছু হয় না মিসেস ভট্টাচারিয়া। ট্যাক্টফুল হতে হয়।

আপনি আমাকে বোকা ভেবে কি স্যাডিস্ট আনন্দ পান? জেনে রাখুন, আপনি আমার চেয়ে বেশি চালাক নন।

ববির দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনে ভেসে এল। আরও স্তিমিত গলায় ববি বললেন, চালাকিতে আমি বরং আপনার চেয়ে কিছু খাটোই হবো। কিন্তু আমার অ্যানিম্যাল ইন্‌সটিংক্ট খুব প্রবর। তাই মরতে

মরতে আমি বারবার বেঁচে যাই। আপনার ওই ইন্সটিংক্টটা নেই।

থাকার কথাও নয় মিস্টার বস।

আপনাদের অনেক কিছুই নেই মিসেসে ভট্টাচারিয়া। তাই আপনি অত্যন্ত ইজি টারগেট। ওরা যদি আপনাকে ক্রাশ করে তা হলে আমার কী আর ক্ষতিবৃদ্ধি বলুন! আমি চাইলেই আর একজন স্মার্ট এফিসিয়েন্ট সেক্রেটারি পেয়ে যাবো। কিন্তু ক্ষতিটা হবে যদি আপনার কাছ থেকে ওরা এন এম-এর হদিশটা পেয়ে যায়। তাই বলছি, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিন।

এন এম ? সেটা আবার কী ?

আর একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করুন, বুঝতে পারবেন। আপনি যে ব্রেনলেস একথা আমি বলছি না। গ্রে ম্যাটর কিছু কম. এই যা। কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুও যদি অ্যাক্টিভেট করা যায় তাহলে একজন মোটামুটি বোকাকে দিয়েও কাজ চলতে পারে।

আপনি যদি ওই গ্রে ম্যাটারগুলোকে ...

ওঃ ইউ আর হরিবর। এন এম মানে কি নীল মঞ্জিল ? আমি আজই যে সেখানে যাচ্ছি!

ববি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান করুন যেন কেউ আপনার টেলিফোনে ট্যাপ না করে থাকে। দয়া করে এন এম এর কথা ভুলে যান, ওর ত্রিসীমানায় আপনার যাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু কেন ?

ইউ আর আন্ডার অবজারভেশন মাই ডিয়ার। স্ক্রাম কিড, স্ক্র্যাম।

একটু তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে বসে রইল লীনা। হাতে বোবা টেলিফোন। ববি রাইন কেটে দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ বাদে বিবশ হাতে টেলিফোনটা ক্রেডলে রাখল লীনা। তারপর সারা শরীরে এক গভীর অবসাদ নিয়ে উঠল। আজ একটু অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছে ছিল তার। নীল মঞ্জিল নামক জায়গাটিকে আবিষ্কার করতে যাবে। ববি সেই প্রস্তাবে জল ঢেলে দিলেন।

জল ঢেলে দিলেন আরও অনেক কিছুর ওপর। ববি বেঁচে আছেন জেনে যে আবেগটা থরথরিয়ে উঠেছিল বুকের মধ্যে লোকটা মার খেয়েছে শুনে যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল সবই ভেসে গেল সেই জলে।

মার খেয়েছে ঠিক হয়েছে। খাওয়াই উচিত ওরকম অসভ্য লোকের।

কথা ছিল আজ তার সঙ্গে দোলনও যাবে। ঠিক ন'টায় দোলন আসবে। তারপর একসঙ্গে বেরোনোর কথা।

প্রোগ্রামটা পাল্টাতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে তারা ?

লীনা আর শুতে গেল না। দাঁত মাজল, ব্যায়াম করল, স্নান করল।

বেলা ন'টার একটু আগেই চোর-চোর মুখে ভয়ে ভয়ে ফটক পেরিয়ে দোলনকে ঢুকতে দেখল লীনা। সে তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তেরছা হয়ে আসা করোঞ্চ রোদ গায়ে শুষে নিচ্ছে। দোলনের হাবভাব দেখে হেসে ফেলল। গোবেচারা আর কাকে বলে!

এসো দোলন, ব্রেকফাস্ট খাওনি তো ?

খেয়েছি।

বাঃ, আর আমি যে তোমার জন্যই বসে আছি না-খেয়ে! কী খেয়েছো ?

ওঃ, সে সব মিডলক্লাস ব্রেকফাস্ট। আবার খাওয়া যায়।

বাঁচালে। শোনো, আজ আমাদের সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে না।

দোলনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হচ্ছে না! কেন বলো তো ?

আমার বস বারণ করেছে।

বসটা কে ? ববি তো পটল তুলেছেন!

মোটেই না। বেঁচে আছে।

বাঁচা গেল। কেউ মরেছে টরেছে শুনলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লীনার। দোকান খুলতে যাচ্ছেন বলে মা খুব ব্যস্ত। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে প্রোটিন বিস্কুট আর ওটমিল খাচ্ছিলেন।

মা, এই যে দোলন!

কে বলো তো!

আমার বন্ধু।

ওঃ, দ্যাট চ্যাপ! বসুন আপনি। আজ তো সময় নেই, অন্যদিন ভাল করে আলাপ হবে।

এই বলে খাবার একরকম অর্ধসমাপ্ত রেখে মিসেস ভট্টাচার্য বেরিয়ে গেলেন। দোলন সপ্রতিভ হয়ে বলল, আমাকে উনি তেমন পছন্দ করলেন না কিন্তু।

জানি। তোমার বেশি লোকের পছন্দসই হওয়ার দরকারও নেই। একজন পছন্দ করলেই যথেষ্ট।

সেও কি করে?

সন্দেহ হচ্ছে?

একটু সন্দেহ থেকেই যায় লীনা। তুমি কত বড় ঘরের মেয়ে।

আই হেট দিস সেট আপ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো। চলো বেরিয়ে পড়ি। আজ চমৎকার রোদ উঠেছে। চনচনে শীত। এরকম দিনে একদম নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে দুজনেই উঠে পড়ল।

গাড়িটা নেবে লীনা?

নিশ্চয়ই। গাড়ি ছাড়া মজা কিসের? তবে অন্য গাড়ি। ফিয়ট। বাবা দিল্লি গেছে, বাবার গাড়িটাই নিচ্ছি।

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে আনল লীনা। দোলন আর সে পাশাপাশি বসল। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে লীনা?

তুমি কখনো বারুইপুর গেছ?

বহুবার। আমার এক পিসি থাকে যে।

চলো তাহলে পিসিকে টারগেট করি আজ।

চলো, বহুকাল পিসিকে দেখতে যাইনি। বারুইপুর দারুণ জায়গা।

দক্ষিণের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল লীনা। ক্রমে গড়িয়া-টড়িয়া পেরিয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা এবং চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চারধারে।

লীনা!

কী?

একটা গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে আমাদের। দেখেছো?

না তো! ওই কালো গাড়িটা মনে হচ্ছে পন্টিয়াক। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি।

দাঁড়াও। আমাদেরই ফলো করছে কিনা একটু পরীক্ষা করে দেখি। সামনে একটা ডাইভারশন দেখা যাচ্ছে না?

ওটা কাঁচা রাস্তা। কোথায় গেছে ঠিক নেই।

তবু দেখা যাক। আমরা তো বেশি দূর যাবো না। একটু গিয়েই ফিরে আসবো।

বলত বলতে রীনা গাড়িটাকে ডানধারের রাস্তায় নামিয়ে দিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা নামল বটে, কিন্তু তারপরই খটাং একটা শব্দ হল পিছনে। হু-উস্ করে হাওয়া বেরিয়ে গেল ডানদিকের চাকা থেকে।

লীনা! কী হচ্ছে বলো তো!

সামওয়ান ইজ শুটিং অ্যাট আস।

তা হলে মাথা নামিয়ে বোসো। ওঃ বাবা, এরকম বিপদে জীবনে পড়িনি। লীনা তার হ্যান্ড ব্যাগটা খুলে পিস্তল বের করে নিয়ে বলল, সেভ ইওর লাইফ ইন ইওর ওন ওয়ে। আমি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব।

লীনা এক ঝটকায় দরজাটা খুলে নেমে পড়ল। আজ তার পড়নে স্ল্যাক্স আর কামিজ, তাই চটপট নড়াচড়া করতে পারছিল সে। দরজাটা খোলা রেখে তার আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে সে পিস্তল তুলল।

মাত্র হাত দশেক দুরে পন্টিয়াকটা বড় রাস্তায় থেমে আছে। দুজন লোক অত্যন্ত আমিরী চালে নেমে এল গাড়ি থেকে। পরনে দুজনেরই গাঢ় রঙের প্যান্ট আর ফুল হাতা সোয়েটার। দুজনেই নিরস্ত্র।

লীনা তীব্র স্বরে বলল, আই অ্যাম গোয়িং টু শুট ইউ রাসক্যালস।

দৃষ্টি। তার বাঁ হাতটার বুড়ো আঙুল বাদে আর চারটে আঙুল নিশ্চিহ্ন। আঙুলহীন হাতের চেটোটা খুন্তির ডগার মতো দেখাচ্ছে। সেই আঙুলহারা হাতের চেটোয় খুব কর্তৃত্বের একটু হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল।

কাছে যেতেই বলল, কোথায় যাচ্ছিলেন?

গিরিবাবুর বাড়িতে।

গিরিবাবু কে হয় আপনার?

আত্মীয়।

কীরকম আত্মীয়?

ভড়কে গিয়েছিলাম। আত্মীয়তাটা মনে করতে একটু সময় লাগল। তারপর বললাম, সম্পর্কে মামা।

অন্য একটা ছেলে ওপাশ থেকে বলল, ছেড়ে দে সমীর। আসে মাঝে মাঝে। রিলেটিভিটি আছে। যান দাদা, ঢুকে পড়ুন।

কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই হঠাৎ কপাটের আড়াল থেকে গামছা-পরা খালি গায়ে গিরিবাবু বেরিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে ভিতরবাগে টেনে নিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় বললেন, কী বলল ওরা বলো তো?

আমি কে জিজ্ঞেস করছিল।— অবাক হয়ে বলি, কী হয়েছে মামা?

আর বলো কেন উপল ভাগনে, আমাদের বড় বিপদ চলছে। বাড়ির বাইরে বেরোনোই এখন মুশকিল। কেউ এলে তারও বিপদ।

এই বলে গিরিবাবু আবার কলঘরে ঢুকে যান।

বাড়িটা থমথম করছে। বড়গিন্নি সিঁড়ির মাঝ বরাবর পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন, আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, কে? কে? ও উপল বুঝি?

দেখি, বড়গিন্নি বেশ রোগা হয়ে গেছেন। মুখ থমথমে। মাঝসিঁড়ি থেকেই আবার কী ভেবে উপরে উঠে গেলেন।

মাসি আমাকে দেখে একটা চোখে বড় করে চাইল। মুখখানায় নরম কয়েকটা ঢেউ খেলে গেল যেন।

আয়।

এমনভাবে বলল যেন এতক্ষণ আমার জন্যই বসে ছিল মাসি। যেন আমার জন্যই সব সময়ে বসে থাকে।

জলচৌকিতে বসে বললাম, কী ব্যাপার গো মাসি?

মাসি শ্বাস ছেড়ে বলল, মানুষ কি আর মানুষ আছে! সেই গুন্ডা ছেলেটা জ্বালিয়ে খাচ্ছে বাবা। ভাবগতিক যা দেখছি, শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচবার জন্য কর্তা-গিন্নি মিলে কেতকীকে না ওই গুন্ডাটার হাতেই তুলে দেয়। ওরা তো রকেই বসে থাকে, তোকে ধরেনি?

ধরেছিল।

সবাইকে ধরছে। পাছে মেয়ে পাচার করে দেওয়া হয় সেইজন্য পাহারা দিচ্ছে। ছোট তরফ ওদের পক্ষে। দুই তরফে দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে।

কেতকী কোথায়?

তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হয় না। একদম ঘরবন্দি। দিনরাত কান্নাকাটি।— মাসি এই বলে একটু শ্বাস ছাড়ে। তারপর একটা চোখে আমার দিকে অভিমানের দৃষ্টি দিয়ে বলে, তুই যদি একটু মানুষের মতো হতিস।

হেসে বলি, দুনিয়ায় মানুষের অভাব কী! আমার জন্য তুমি আর অত ভেবো না মাসি।

তোর কথা ছাড়া আর যে কোনও ভাবনা আসে না মাথায়।— মাসি মুখ করুণ করে বলল, তোর কথা ভাবতে ভাবতেই সারা দুনিয়ার কথা ভাবি। মনে হয়, পৃথিবীটা যদি আর-একটু ভাল জায়গা হত, অভাব-টভাব যদি না থাকত, মানুষ যদি আর-একটু দয়ালু হত, তবে আমার উপলটার এত দুর্দশা হত না। তোর যে খিদে পায় সে যদি সবাই বুঝত!

অবাক হয়ে বলি, উরে বাবা, কত ভাবো তুমি।

কত ভাবি! এই যে কাক, কুকুর, বেড়ালদের ভূত-ভোজন করাই তাও তোর কথা ভেবে। ভাবি কী, ওরা যদি আশীর্বাদ করে তবে আমার উপলের একটা গতি হবে হয়তো।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকি।

মাসি বলে, বড় ভাল ছিল মেয়েটা। তোর সঙ্গে মানাতও খুব।

গুন্ডাটা কি ওকে বিয়ে করতে চায় মাসি?

তাই তো শুনি, আমার মনে হয়, ছোট তরফের টাকা খেয়ে এ সব করছে।

বাজে কথায় সময় নষ্ট। আমি টাকাটা বের করে হাতের চেটোর আড়ালে মাসির কোলে ফেলে দিয়ে বললাম, সাবধানে রেখো।

মাসির একটা চোখই পটাং করে এত বড় হয়ে গেল। বলল, ও মা! তোর কি তা হলে কিছু হল? ও উপল, কোথায় পেলি?

বিরক্ত হয়ে বলি, অত জেরা করো কেন বলো তো?

মাসি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, ভাল টাকা তো! চুরি ছ্যাঁচড়ামি করিসনি তো বাপঠাকুর!

এই কি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস?

মাসি আঁচলের আড়ালে টাকা লুকিয়ে নিয়ে রেখে এল। এসে ফিসফিস করে বলল, কেতকী তোকে ডাকছে।

কেন?

যা না। সিঁড়ির নীচেকার ঘরে আছে। একটু বসে যা, বড় কর্তা কলঘর থেকে বেরিয়ে কাপড় মেলছে, ও ওপরে যাক।

একটু বাদে সিঁড়িতে কম্প তুলে গিরিবাবু ওপরে উঠে গেলেন। মাসি ভাত বাড়তে বসল। আমি সুট করে বেরিয়ে সিঁড়ির আড়ালে সরে যাই।

এ ঘরটায় মাসি থাকে। পরদা সরাতেই কেতকীকে দেখলাম। খাটের ওপর উপুড় হয়ে শোওয়া, চুলগুলি ঝেঁপে আছে ওর মুখ আর মাথা। ডাকতে হল না, কী করে যেন টের পেয়ে ও উঠে বসল। তখন দেখি, ওর চেহারাটা খুব ভীষণ রকমের খারাপ হয়ে গেছে। মোটা গরাদ দেওয়া ছোট জানালা দিয়ে একটুখানি আলোর যে আভা আসছে ঘরে তাতে দেখা যায়, কেতকী অনেক কালো হয়ে গেছে বুঝি। সমস্ত মুখ ফুলে আছে অবিরল কান্নার ফলে।

কোনও ভূমিকা না করেই কেতকী ভাঙা স্বরে বলল, আমি যাব।

অবাক হয়ে বলি, কোথায়?

যেখানেই হোক। এ বাড়ির বাইরে।

আমি কৃশকায় মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকি। কত বাধা ওকে ঘিরেছে আজ! বললাম, তোমার যাওয়ার কোনও জায়গা ঠিক করা আছে?

ও মাথা নেড়ে বলল, না।

তা হলে?— আমি দ্বিধায় পড়ে বলি।

কেতকীর চোখে ফের জল এল। তীব্র সেই চোখে চেয়ে বলল, আজ মা কী বলেছে জানেন? বলেছে, তোকে নিয়ে যখন এত অশান্তি তখন তুই ওই গুন্ডাটাকেই বিয়ে কর। অথচ মা ক'দিন

আগেই মিথ্যে সন্দেহ করে আমাকে মেরেছিল। আমি এ বাড়িতে থাকব না। আমাকে কোথাও নিয়ে যাবেন?

বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খাই। আশা জাগে, লোভ জাগে, ইচ্ছের নানা রঙের বর্ণালী খেলা করে। কিন্তু আমি কোথায় নিয়ে যাব ওকে? আমার তো কোনও জায়গা নেই।

আমি মাথা নিচু করে বলি, সেটা কি হয়?

কেন হয় না উপলদা? আমার লজ্জা করার সময় নেই, নইলে এত সহজে কথাটা বলতে পারতাম না। শুনুন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।

এত চমকে গিয়েছিলাম যে, মাথাটা চক্কর মারল। খাটের স্ট্যান্ড ধরে সামলে নিলাম। একটু সময় নিয়ে বললাম, কেন আমাকে বিয়ে করবে কেতকী?

এ প্রশ্নটা সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে জটিল।

কেতকী বলল, করব। ইচ্ছে। আপনি রাজি নন?

আমি মৃদুস্বরে বলি, শুনে লজ্জা পাই কেতকী। আমি বড় সামান্য মানুষ।

কেতকীর মুখ উদাস হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে রইল শূন্যের দিকে চেয়ে। তারপর আস্তে বলল, পিসি বলেছিল, আপনি রাজি হবেন।

বিপদের মধ্যে পড়ে তুমি উলটোপালটা ভাবছ। বিপদ কেটে গেলে দেখবে, এ এক মস্ত ভুল।

কেতকী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, এরকম কথা জীবনে এই প্রথম বললাম উপলদা। বেহায়ার মতো। আর কাউকে বলিনি কখনও।

বলে উপুড় হয়ে পড়ল বালিশে। কাঁদতে লাগল।

আমি কখনও ব্যায়াম-ট্যায়াম করিনি। গায়ে জোর নেই। তেমন কিছু সাহসও আমি রাখি না। কোনওক্রমে বেঁচে আছি পৃথিবীতে, এই ঢের। কেতকীর জন্য আমি কী করতে পারি?

ঘর থেকে বেরোবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই বিবেকের সঙ্গে দেখা। সেই কালো জোব্বা পরা কেশো বুড়ো, হাতে বাদ্যযন্ত্র। কাশতে কাশতে বলল, কাজটা কি ঠিক হল উপলচন্দোর?

তার আমি কী জানি বিবেকবাবা? দুনিয়ার মানুষ অধিকাংশ কাজই করে ভাল-মন্দ না ভেবে। তারা তো সবটা দেখতে পায় না।

তবু ভেবে দেখো আর একবার।

বলো কী বিবেকবাবা, শেষে গুন্ডার হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে প্রাণটা যাবে! যদি প্রাণ বাঁচাতে পারিও তা হলেও বা বউ নিয়ে খাওয়াব কী? আবার মেয়ে ভাগানোর জন্য ঝামেলাও কি কম হবে?

এই সময়টায় আমার বিবেকের একটা জোর কাশির দমক এল। সেই সুযোগে আমি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসি।

সদরের বাইরে পা দিতেই দেখি, ছোট তরফের রকে ছেলে-ছোকরাগুলো কেউ নেই। ছোট কর্তা রাঙা নতুন গামছা পরে দাঁড়িয়ে। ভারী হাসি-হাসি আহ্লাদি মুখ। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, আরে উপল ভায়া যে! তোমার তো দেখাই একদম পাই না। ভোল পালটে গেছে, অ্যাঁ! ভাল জামা-কাপড়, চেহারাও দিব্যি ফনফন করছে! পেশকারি পেয়োচ নাকি, অ্যাঁ!

খুব হাসলেন। সম্পর্কে মামা হন, তবু বরাবরই ছোট তরফ ভায়া বলে ডাকেন আদর করে।

বললাম, ছোট মামা, ভাল আছেন তো!

বেশ আছি, বেশ আছি!

বলে এই গরমকালে নাইকুণ্ডলীতে আঙুল দিয়ে তেল ঠাসতে ঠাসতে অন্য হাতে আমাকে কাছে ডেকে গলা নামিয়ে বললেন, ও বাড়ির কী সব গণ্ডগোল শুনছি হ্যাঁ! ব্যাপারখানা কী জানো কিছু?

একটু গাড়ল সেজে বললাম, আমিও শুনছি। কে একটা মাস্তান ছেলে নাকি কেতকীকে বিয়ে করতে চাইছে!

ছোট কর্তা খুব গম্ভীর মুখে শুনে মাথা নেড়ে বললেন, আমিও পাড়ায় কানাঘুষো শুনছি। কী কেলেঙ্কারি বলো তো! তা দাদা বলছে-টলছে কী?

খুব ঘাবড়ে গেছেন।

ছোট কর্তা আহ্লাদের ভাবটা চেপে রাখতে পারলেন না। প্রায় হেসেই ফেললেন বলা যায়। মুখটা নামিয়ে বললেন, কেতকীর ভাবগতিক কিছু বুঝলে?

না।

ছোটবাবু একটা দুঃখের শ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ব্যাপার কি আর ঠেকানো যায়! আজকালকার ছোঁড়াছুঁড়িদের কারবার সব। আমি বলি কি উদ্যোগ-আয়োজন করে বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়! আজকাল আর বংশ-টংশ জাত-ফাত কে-ই বা মানছে। আমেরিকা ইউরোপে তো শুনি হরির লুট পড়ে গেছে। নিগ্রোয়, চিনেম্যানে, সাহেবে, হিন্দুতে একেবারে বিয়ের খিচুড়ি। এ দেশেও হাওয়া এসে গেছে। দাদাকে বুঝিয়ে বোলো, বংশ-টংশের মর্যাদা আঁকড়ে থাকলে আর চলবে না। ছেলেটাকে আমি মোটামুটি চিনি। খারাপ তেমন কিছুই নয়, একটু হাত-ফাত চালায় আর কী!

আমি বললাম, বলব।

ছোটবাবু একটু হেসে বললেন, তোমার তা হলে ভালই চলছে বলো। পোশাক-আশাক চেহারা দেখে এক ঝটকায় চিনতেই পারিনি। মানুষের উন্নতি দেখলে বড় আনন্দ হয়। করছ-টরছ কী আজকাল?

ওই টুকটাক।

খুব ভাল, খুব ভাল। দেখছ তো চারদিকে কেমন বেকারের বন্যা এসেছে! এই রকটাই এখন নিজের দখলে থাকে না, পাড়ার ছেলেছোকরা সব এসে বসে। তাড়াতেও পারি না। তাড়ালে যাবে কোথায়! তা এই বেকারের যুগে তোমার কিছু হয়েছে দেখে বড় খুশি হলুম ভায়া।

দু'-চারটে কথা বলে কেটে আসি। বুঝতে পারি, ছোট তরফ লোক ভাল নয়, বড় তরফকে বেইজ্জত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ পাড়ায় ছোট তরফেরই হাঁকডাক বেশি, তাঁর নিজের একটা ক্লাবও আছে।

কিন্তু ছোট তরফের দোষ দিয়ে কী হবে! আমিও কি লোক ভাল? তার চেয়ে দুনিয়ার ভাল-মন্দের ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়াই কাজের কাজ। ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে হাঁটছি। বুকের মধ্যে একটা বড় কষ্ট ঘনিয়ে উঠছে। কেতকীর কথাগুলো ট্রেসার বুলেটের মতো ছুটে আসছে বার বার। ঝাঁকে ঝাঁকে। ঝাঁঝরা করে দিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন হতে পারত। হল না। হয় না।

গলির তেমাথায় আঙুলহারা সমীরের সেই স্যাঙাত দাঁড়িয়ে ছিল। রোগা শুটকো চেহারা, লম্বা চুলে তেলহীন রুক্ষতা, মস্ত মোচ চিনেদের মতো ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, একটা কথা বলব?

ছেলেটা কানকি মেরে চেয়ে বলল, বলুন।

বললাম, বিয়ে-টিয়ের অনেক ঝামেলা। মেয়েটাও রাজি হচ্ছে না। তার চেয়ে ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটিয়ে ফেললে হয় না?

ছেলেটা অন্য দিকে চেয়ে বলল, বিয়ে কে চাইছে মসাই? ক্যাস ছাড়তে বলুন, সব মিটিয়ে নিচ্ছি। নেবেন?

আলবত নেব। ক্যাস ছাড়লে আমরা কেতকীর বিয়েতে পিঁড়ি ঘুরিয়ে দিয়ে আসব। ওর বাপকে রাজি করান।

আমার সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় কাঁপছে। মাথার মধ্যে টিক টিক শব্দ। বললাম, সমীরবাবু ছাড়তে রাজি হবেন?

ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, সমীরের কি মেয়েছেলের অভাব পড়েছে নাকি! সামনে হাড়কাটা গলি থাকতে! ও সব ভড়কি দিচ্ছে। তবে আমরা দু'-চারদিন ফুর্তি-টুর্তি করব, মাল-ফাল খাব, ফাংশান করব, তার জন্য দু' হাজার ছাড়তে বলুন। যদি রাজি না হয় তবে কেস সিরিয়াস হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে তো খুব রিলেটিভিটি আছে। দেখুন বলে।

আপনারা কি গিরিবাবুর কাছে টাকা চেয়েছিলেন?

না। টাকা চাইব কেন? গিরিবাবু আমাদের পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল, তাই সমীরের জেদ চেপে গেছে, এসবার-ওসপার করে দেবে। আমরা কেলো করতে চাই না। ও সব ভদ্রঘরের, শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে সমীর বরং আরও ফেঁসে যাবে, ওর ক্লাস এইট-এর বিদ্যে। অনেক বুঝিয়েছি সমীরকে। রাজি হচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি, ক্যাস পেলে ও কেস ছেড়ে দেবে।

মাথার ভিতরটায় টাকডুমাডুম বাজছে। এক বার অস্ফুট 'দাঁড়ান' বলে দৌড়ে ফিরে আসি। সদরে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বেরোচ্ছেন। খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে রাস্তাঘাট দেখে নিচ্ছেন, চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়ার আগে।

আমাকে দেখে বললেন, ফিরে এলে যে!

একটা জিনিস ফেলে গেছি।

উনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, অ। তা এসো নিয়ে, তোমার সঙ্গে বাসরাস্তা পর্যন্ত যাবখন।

মাসিকে গিয়ে বললাম, কেতকীকে বাঁচাতে চাও তো পাঁচশোটা টাকা গুনে এনে দাও। আমার গুনবারও সময় নেই।

মাসি মুহূর্তের মধ্যে এনে দিল। আমি পাখনা মেলে উড়ে বেরিয়ে এলাম। গিরিবাবু সঙ্গ নিলেন বটে, কিন্তু আমার দৌড়-হাঁটার সঙ্গে তাল দিতে না-পেরে পিছনে পড়ে রইলেন।

ছেলেটা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে ছিল। তার বুক পকেটে ঝট করে টাকাটা ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, বাকিটা সামনের সপ্তাহে।

ছেলেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আস্তে বলল, কত আছে?

পাঁচশো।

পলকের মধ্যে ছেলেটা ভীষণ বিনয়ী হয়ে বলল, গিরিবাবু দিলেন?

মানুষ চরিয়ে খাই। পলকের মধ্যে বুঝলাম, এক্ষুনি ঘটনার লাগাম নিজের হাতে ধরে ফেলতে হবে। গিরিবাবু টাকা দিয়েছে এমন কথা মিথ্যে করে বললে ওরা বড়বাবুকে পেয়ে বসবে। ফের টাকার দরকার হলে আবার ঝামেলা করবে। গম্ভীর হয়ে বললাম, না। আমিই দিচ্ছি। কিন্তু আর কোনও ঝামেলা হলে বাকি টাকাটা তো দেবই না, উলটে অন্য রকম ঝামেলা হয়ে যাবে।

ছেলেটা সদ্য টাকা খেয়েছে। যারা টাকা খায় তাদের ব্যক্তিত্ব থাকে না। ভাল-মন্দের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। এ ছেলেটাও মাস্তানি ঝেড়ে ফেলে একটু খোশামুদে হাসি হেসে বলল, ঝামেলা হবে কেন? সমীর সালাকে আমরা টাইট দিচ্ছি। আপনি ডেফিনিট থাকুন।

গিরিবাবু পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন খুব তাড়াতাড়ি। ছেলেটা সেদিকে তাকালও না।

ছেলেটার আরও কয়েকজন সাঙাত এসে চারধারে দাঁড়িয়ে গেল। টাকার ব্যাপারটা আড়াল থেকে লক্ষ করে থাকবে। টাকার গন্ধ গোলাপ ফুলের মতো, যারা গন্ধ নিতে জানে তারা ঠিক গন্ধ পায়।

ছেলেটা সঙ্গীদের দিকে চোখ মেরে আমাকে বলল, তা হলে ফের সামনের সপ্তাহে, কেমন?

হ্যাঁ। কিন্তু ছোটবাবু কী হবে?

ছেলেটা মাথাটা সোজা রেখেই বলল, ছোটবাবু ফোতো কাপ্তান। দশ-বিশ চাক্কি ঝাঁক দিতেই

আমাদের দম বেরিয়ে যায়। ওর মামলায় আমরা আর নেই। তবে ওর ছেলে সন্তু আমাদের দোস্ত, কিন্তু তাকে টাইট দেওয়ার ভার আমার। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান।

নিশ্চিন্ত হয়েই আমি বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি। নিজের ভিতরটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। টাকাটা চলে গেল হাত থেকে। সামনের সপ্তাহে আরও যাবে। যেন এই যাওয়ার জন্যই হুড়মুড় করে টাকাটা এসেছিল।

বাসরাস্তায় ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে বড়বাবু দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই প্রায় ছুটে এসে বললেন, চেনো নাকি ওদের?

চেনা হল। আপনি আর ভাববেন না বড় মামা, সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে এসেছি। আর কেউ হুজ্জত করবে না।

মিটে গেল মানে? কী করে মেটালে?

একটু মহৎ হতে ইচ্ছে করল। অনেককাল মহৎ হইনি। বললাম, সে শুনে আপনার কী হবে? তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আর কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।

বড়বাবু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে আছেন। এ কয়দিনে তাঁর বয়স বহু বেড়ে গেছে, আয়ুক্ষয় হয়েছে অনেক। একটা বহুদিনকার চেপে রাখা শ্বাস হুস করে ছেড়ে বললেন, সত্যি বলছ উপল ভাগ্নে! তুমি কি হিপনোটিজম জানো?

জানি বড়মামা। হিমনোটিজম সবাই জানে। যাক গে, কেতকীর বিয়ের আর দেরি করবেন না। এই বেলা দিয়ে দিন।

কার সঙ্গে দেব? ওই হাতকাটা সমীরের সঙ্গে?

আরে না না।— হেসে ফেলে বলি, কলকবজা নেড়ে দিয়ে এসেছি বড়মামা, এখন আপনারা বিয়ে দিতে চাইলেও সমীর উলটো দৌড়ে পালাবে। তার কথা বলিনি। ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিন।

কিন্তু ছোট তরফ?

রা কাড়বে না।

ঠিক বলছ?

তিন সত্যি।

বড়বাবুর মন থেকে সন্দেহটা শতকরা আশিভাগ চলে গিয়েও বিশভাগ রইল। সেই তলানি সন্দেহটা মুখে ভাসিয়ে তুলে বললেন, ইঞ্জিনিয়ার ছেলে একটা হাতেই রয়েছে। বড্ড খাঁই তাদের। তা এখন আর সে সব ভেবে দেরি করলে হবে না দেখছি।

লাগিয়ে দিন।

যদি ভরসা দাও তো এ মাসেই লাগাব। কলকাতায় দুই দিনে বিয়ের জোগাড় হয়।

অন্যমনস্ক ও উদাস স্বরে 'তাই করুন বড়মামা' বলে বিনা ভূমিকায় হাঁটতে থাকি। টের পাই, বড়বাবুর চোখ আমাকে বহু দূর পর্যন্ত প্রচণ্ড বিস্ময়ে দেখতে থাকে।

অনেক দিন বাদে নিজেকে বেশ মহৎ লাগছে।

১২

একটু আগে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। লেকের জলের ধারে ঘাসের ওপর বর্ষাতি পেতে চুপ করে বসে আছি। মেঘ ভেঙে অল্প রাঙা শেষবেলার রোদ উঠল ওই। ফ্যাকাসে গাছপালা যেন রূপকথার রাজ্যে জেগে উঠল হঠাৎ। জল উঠল ঝিলমিলিয়ে। জীবন এ রকম। কখনও মেঘ, কখনও রোদ।

ক্ষণা আসবে। আমার আর ক্ষণার মধ্যে এখন গোপনীয়তা তৈরি হয়েছে। যেন পাতালের নদী। বাড়ির বাইরে আমরা আজকাল লুকিয়ে দেখা করি।

ক্ষণার ভিতরে আজকাল আর-এক ক্ষণা জন্ম নিচ্ছে। সে অন্য এক রকম চোখে নিজেকেও দেখে আয়নায়। বেরোবার সময়ে ক্ষণা বলে দিয়েছিল, লেকে থেকো। আমি সিনেমার নাম করে বেরোব। পৌনে ছ'টায় দেখা হবে।

আমি জলে একটা ঢিল ছুড়ি। ঢেউ ভাঙে। কিছু ভাবি না। কিছু মনে পড়ে না। শুধু জানি, ক্ষণা আসবে। বর্ষাতির পকেটে লুকোনো টেপ-রেকর্ডার উন্মুখ হয়ে আছে।

ঘড়িতে পাঁচটা চল্লিশ। পিচের রাস্তাটা দ্রুত পায়ে পার হয়ে ক্ষণা ঘাসে পা দিয়েই হাসিমুখে ডাকল, এই!

পলকে মুখে হাসির মুখোশ পরে তাকিয়ে বলি, এসে গেছ?

দেরি করেছি? বলো!

না। একটুও না।— বলে বর্ষাতিটা বড় করে পাতি। টেপ-রেকর্ডার চালু হয়।

ক্ষণা কাছ ঘেঁষে বসল। গায়ে গা ছোঁয়-ছোঁয়। বলল, ঠিক বেরোবার আধ ঘণ্টা আগে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি দেখে আমার যা কান্না পাচ্ছিল না! কখন থেকে তুমি এসে বসে আছ। আর আমি যদি বেরোতে না পারি!

খুব না-ভেবেই বলি, ঝড়-বৃষ্টিতে কি কিছু আটকাত ক্ষণা? তোমাকে আসতেই হত।

ক্ষণা পাশমুখে আমার দিকে তাকায়। বড় প্রকট হয়ে আছে ওর আজকের সাজ। চোখের পাতায় আউটার আই ক্রিম লাগানো, কাজল, ম্যাসকারা, মুখে মেক-আপ, কপালে মস্ত টিপ, কানে ঝুমকো, চুল ফাঁপিয়ে আঁচড়ানো, রেশমি বুটির দামি শাড়ি পরেছে কচি কলাপাতা রঙের। ঠোঁটে রক্ত-গাঢ় রং। আধবোজা মদির এক রকম চোখের দৃষ্টি খানিকক্ষণ ঢলে রইল আমার দিকে।

তারপর বলল, তুমি কী করে বুঝলে?

তারপর একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক। আমাকে আসতেই হত। কেন আসতে হত বলো তো!

কেন ক্ষণা?

ক্ষণা অকপটে চেয়ে থেকে বলল, তোমাকে ভালবাসি বলে।

সত্যিই ভালবাসো ক্ষণা?

কী করে বোঝাব বলো? সারা দিন কেবল তোমার কথা মনে আসে। সারা দিন। ঘুমিয়েও তোমার কথা ভাবি। ঘুম থেকে যেই চোখ মেলি অমনি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস করো।

আমার অবস্থা তোমার চেয়ে ভাল নয় ক্ষণা। আমার সমস্ত মাথা জুড়ে তুমি। শুধু তুমি।

শোনো।

উঁ!

ক্ষণা খুব কাছে ঘেঁষে আসে। ও বেহেড। সম্মোহিত। ওর চেতনা নেই যে, এখনও দিনের আলো ফটফট করছে। যে-কেউ, চেনা বা আধচেনা লোক আমাদের দেখে ফেলতে পারে। অবশ্য দেখে ফেললে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি। যত স্ক্যান্ডাল, তত পাবলিসিটি। যত পাবলিসিটি তত সুবিনয়ের সুবিধে। আমি এও জানি, আজ লেকে সুবিনয় সাক্ষী হিসেবে কয়েকজনকে হাজির রেখেছে। তারা

কে আমি চিনি না। কিন্তু আছে আশেপাশে। দেখছে। আমাকে আজ খুব ভাল অভিনয় করতে হবে।

ক্ষণা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, তুমি ছাড়া আর কেউ কখনও আমাকে এত সুন্দর দেখেনি। কখনও বলেনি, তুমি বড় সুন্দর।

তুমি সুন্দর ক্ষণা।— বলে ক্ষণার কোমরের দিকে হাতটা আলতোভাবে জড়াই। বলি, সকলের কি সৌন্দর্য দেখবার চোখ থাকে?

ক্ষণা অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল একটু। তারপর বলল, তোমার বন্ধু কখনও আমাকে সুন্দর দেখে না। ও আমাকে দেখলই না ভাল করে, নিলও না। বিয়ের পর থেকেই দেখছি, ও বড় কাজের মানুষ। আমরা হানিমুনে যাইনি, এমনকী সিনেমা থিয়েটার বেড়ানো কিছু নয়। এই সেদিন প্রথম সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে এল না, তোমাকে পাঠাল। চিড়িয়াখানাতেও তাই। ও কেন এ রকম বলো তো!

গম্ভীর থেকে বলি, মহৎ মানুষরা ও রকমই হয় বোধহয়। আমি সে তুলনায় কত সামান্য।

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলল, না। তুমি সামান্য নও। যদি তাই হতে তো তোমাকে এত ভালবাসলাম কী করে? তোমার ভিতর একটা কী যেন আছে, ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু সুন্দর কী যেন আছে। তুমি নিজে বোঝো না?

অবাক হয়ে বলি, না তো!

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলল, আছে।

ফের একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, কিন্তু আমি অত কাজের মানুষ, মহৎ মানুষকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম কেন বলো তো! শুনি, ওর নাকি পৃথিবীজোড়া নাম। শুনে ভয় পাই। আমার তো অত বড় মানুষের বউ হওয়ার যোগ্যতা ছিল না! আমি আরও অনেক বেশি সাধারণ কারও বউ হলে কত ভাল হত বলো তো!

কথায় কথায় বেলা যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে। আজ বৃষ্টি-বাদলা গেছে। লেক তাই বেশ নির্জন। আর এই ঘনায়মান অন্ধকার ও নির্জনতায় আমি ঠিকই টের পাই, আমাদের চারধারে ছায়া ছায়া কিছু মানুষ ঘোরাফেরা করছে। নজর রাখছে আমাদের দিকে। কারও হাতে কি ফ্ল্যাশগান লাগানো ক্যামেরা আছে? কথা ছিল, থাকবে।

ঝিরঝির একটু বৃষ্টি হেঁটে গেল চারপাশে। গাছের পাতায় পাতায় সঞ্চিত জলের বড় বড় ফোঁটা নামল। গ্রাহ্য করলাম না। ঘাস ছেড়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চে উঠে বসেছি দু'জনে, বর্ষাতিটা দু'জনের গায়ের ওপর বিছানো। বর্ষাতির নীচে আমাদের শরীর ভেপে উঠছে, ঘামছে।

ক্ষণা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওর তো দিল্লি থেকে ফেরার সময় হল।

আমিও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি, কী করবে ক্ষণা?

কী আর করব? যত যাই হোক, ওর ঘরই তো আমাকে করতে হবে!

শিউরে উঠে বলি, তা কেন ক্ষণা? আমি তোমাকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলে, তা কি হয়?

কেন হবে না?

আমার ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে যে!

তাতে কী! নিজের জীবনটা কেন নষ্ট করবে? সুবিনয়ও দেখো একদিন বিদেশে বড় চাকরি পেয়ে চলে যাবে। আর আসবে না, খোঁজও করবে না। সেদিনের জন্য তৈরি থাকা ভাল ক্ষণা।

ক্ষণা আমার হাত ধরেই ছিল। সেই ধরা হাতটা একটু শক্ত হয়ে উঠল শুধু। ও বলল, তুমি কিছু শুনছ নাকি?

শুনেছি।

ক্ষণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমারও কখনও কখনও ও রকম মনে হয়। মনে হয়, ও

যেন বিদেশের মানুষ। মনে হয়, ও একদিন খুব দূরে সরে যাবে।

সময় থাকতে তুমি কেন সাবধান হচ্ছ না ক্ষণা? আমি— আমি তোমাকে ভালবাসি।

বলতে বলতেও আমার উৎকর্ণে কোনও একটা অস্পষ্ট কাশির শব্দ পৌঁছয়। সংকেত। আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমার অভ্যন্তরে ক্ষণার জন্য একটুকু ভালবাসা নেই। তৈরি হয়নি। তবু কাজটা আমাকে করতেই হবে।

বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ ক্ষণা। আমি ভাল এক্সপোজারের জন্য বর্ষাতিটা গা থেকে ফেলে দিই। তারপর গাছের ছায়ায় গভীর অন্ধকার নির্জনে ওকে জড়িয়ে ধরি। বাধা দেওয়ার কথা নয়। দিলও না ক্ষণা। আমার বিবেক এই অবস্থায় সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আড়াল থেকে তার ঘন ঘন কাশির আওয়াজ শুনতে পাই। আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য সে কয়েক বার তার বাদ্যযন্ত্রটা বাজাল। আমি পাত্তা দিলাম না। আমি ক্ষণাকে যথেষ্ট, যত দূর সম্ভব আবেগে চুমু খাই। কষ্টকর, ভয়ের চুমু। আমি তো জানি আমরা একা নই। জানি, ক্ষণার স্বামীও দৃশ্যটা দেখছে। বড় বিস্বাদ চুমু। তবু ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে অপেক্ষা করছি ফ্ল্যাশগানের ঝলকটার জন্য। অপেক্ষা করছি। অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছে।

চমকাল। ফ্ল্যাশের আলো নীল বিদ্যুতের মতো ঝলসে দিয়ে গেল আমাদের। পর পর দু'বার।

ক্ষণা চমকে চোখ চেয়ে বলে, কী গো?

বিদ্যুৎ।

ও।

আবার সংলগ্ন হই। দক্ষ লোকদের হাতে ক্যামেরা আরও একটু পর পর চমকে চমকে উঠল।

তটস্থ ক্ষণা সোজা হয়ে বসে বলে, কে টর্চ ফেলছে?

টর্চ নয় ক্ষণা। আকাশে মেঘ চমকাল।

ক্ষণা আমার দিকে চেয়ে অন্ধকারে একটু চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ বলে, শোনো, মনে হচ্ছে কারা যেন লুকিয়ে থেকে দেখছে আমাদের।

আমার টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেট শেষ হয়ে আসছে। আমি হঠাৎ ওকে কাছে টেনে বলি, কেউ নয়। লেক হচ্ছে মুক্ত অঞ্চল, সবাই প্রেম করতে আসে। কে কাকে দেখবে? শোনো ক্ষণা, তুমি সুবিনয়কে ডিভোর্স করবে?

ক্ষণা নিজের চুল ঠিক করছিল। একটু চনমনে হয়ে চার দিকে তাকাচ্ছে। বিপদ। আমি ওকে টেনে নিই কাছে। ও বাধা দেয় না। বরং চোখ বুজে থাকে। অস্ফুট গলায় বলে, আমাকে বহুকাল কেউ আদর করে না উপল। একটু আদরের জন্য আমার ভিতরটা মরুভূমি হয়ে থাকে।

আমার রেকর্ডারের ফিতে ফুরিয়ে আসছে। সময় নেই।

বলি, বলো ক্ষণা, সুবিনয়কে ডিভোর্স করবে?

তেমনি অস্ফুট গলায় ও বলে, তুমি কি আমাকে একেবারে চাও?

চাই।

ভালবাসবে আমাকে চিরকাল?

বাসব ক্ষণা। বলো, ডিভোর্স করবে?

ও যদি বাধা দেয়! যদি মারে তোমাকে?

মারবে না ক্ষণা। ও আমাকে ভয় পায়। বাধা ও দেবে না।

ঠিক জানো?

হ্যাঁ।

আমার ছেলেমেয়ে কার কাছে থাকবে?

আমাদের কাছে।

তা হলে করব ডিভোর্স।

কথা দিলে?

দিলাম।

আদরের ছলে আমি ওকে ফের চুমু খেতে খেতে শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসি। অন্য হাতে ওর চোখ চেপে রেখে বলি, দেখো না। আমাকে দেখো না।

সামনে থেকে, পিছন থেকে, পাশ থেকে আরও তিন বার ক্যামেরার আলো ঝলসায়। অন্ধকারে ছায়া-ছায়া মূর্তি ঝোপের আড়ালে সরে যায়। আবার অন্য দুটো ছায়া দৌড়ে এক ধার থেকে অন্য ধারে সরে গেল। ফ্ল্যাশ চমকাল ফের। ক্ষণার শরীরের ঠিক কোথায় আমার হাত রয়েছে তার নির্ভুল ছবি তুলে নিল।

ক্ষণা বলল, চোখ ছাড়ো। কী করছ?

আমার সর্বাঙ্গে ঘাম। বুকের ভিতরে অসম্ভব দাপাদাপি। হাত-পা অবসাদে খিল ধরে আসে। বর্ষাতির পকেটে টেপ-রেকর্ডার থেমে গেছে। ক্যাসেট শেষ।

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, চলো ক্ষণা।

বোসো আর-একটু। আমার তো সিনেমার শো ভাঙার পরে ফিরলেও চলবে। কী সুন্দর দিন ছিল আজ, ফুরিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

লজ্জা, ভয়, ক্লান্তি ও অনিচ্ছায় আমার মাথাটা বেভুল লাগে। আর বসে থাকার মানে হয় না। ক্লান্তির বোঝা বাড়বে কেবল।

তবু অনিচ্ছায় বসে থাকতে হয়।

ক্ষণা বলল, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো। আমাকে, দোলনাকে, ঘুপটুকে। ওরা তো অবোধ।

আমার ভিতরকার অনিচ্ছার ভাবটা ঠেলে আসে গলায়। বমির মতো। আমি যতটুকু করার করেছি। টেপ শেষ হয়ে গেছে। ক্যামেরা নিয়ে সরে গেছে লোকজন। এখন আর প্রেমের কথা আসে না। ফাঁকা লাগে, নিরর্থক লাগে।

রাত্রে সুবিনয় টেপ শুনছিল। তেমনি আধখানা ছায়া, আধখানা আলোয় পাথুরে মুখ দেখা যাচ্ছে। তবে ওর মুখে আজকাল অনেকগুলি নতুন গভীর রেখা পড়েছে। টেপ শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ঘাড় এলিয়ে দিচ্ছে। আবার সোজা হয়ে বসছে কখনও। অস্থির। সিগারেট খানিক খেয়েই প্রায় আস্ত গুঁজে দিচ্ছে অ্যাশট্রেতে।

আস্তে আস্তে ঘুরে টেপ শেষ হয়। সুবিনয় নিঃশব্দে উঠে ওয়াল ক্যাবিনেট খুলে নীট হুইস্কি ঢক ঢক করে জলের মতো তিন-চার ঢোক খেয়ে একটা হেঁচকি তুলল।

খুব আস্তে মড়ার মতো একখানা মুখ ফেরাল আমার দিকে। দু'চোখে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। যেন-বা ভয়।

খুব আস্তে করে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি? ইউ আর এ বর্ন লেডি-কিলার। এ ডেমন! এ ড্রাগন!

চুপ করে থাকি। সুবিনয়ের দিক থেকে একটা মস্ত মোটা আর ভারী নোটের বান্ডিল উড়ে এসে কোলে পড়ল।

ফাইভ থাউজ্যান্ড। ইউ হ্যাভ আর্নড ইট।

এ কথা যখন বলছিল সুবিনয় তখন ওর গলায় কোনও আত্মবিশ্বাস ছিল না। ভয় পাওয়া মানুষের মতো গলা।

মাথা নিচু করে টাকাটার দিকে চেয়ে থাকি। অনেক টাকা। দারিদ্র্যের মুক্তিপণ।

সুবিনয় জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। আমার দিকে চাইছে না। সেইভাবেই থেকে

বলল, আই ডোন্ট বিলিভ ইট। ইয়েট দি ইম্পসিবল হ্যাজ হ্যাপেনড বাডি।

আমি টাকা থেকে মুখ তুললাম।

সুবিনয় এসে সোফায় তার প্রিয় চিতপাত ভঙ্গিতে বসল। নিজের সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বলল, আমার ধারণা ছিল, ক্ষণা আমার সঙ্গে পুলটিশের মতো সেঁটে গেছে। কখনও ওকে সরানো যাবে না। অ্যাডামেন্ট ওয়াইফ।

হুইস্কির আধ গেলাস টেনে নিয়ে তীব্র অ্যালকোহলের যন্ত্রণায় গলা চেপে বুম হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আলোছায়াময় মুখ তুলে অদ্ভুত হেসে বলল, ইউ হ্যাভ ডান ইট বাডি। কংগ্র্যাচুলেশনস।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। যখন দরজার কাছ বরাবর পৌঁছে গেছি তখন ও ডেকে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি, ইউ আর ইন লাভ উইথ হার। গোয়িং টু ম্যারি হার বাডি, হোয়েন আ'ল বি অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার?

আমি চুপ করে রইলাম। তারপর মাথা নাড়ালাম। না।

লাভ হার বাডি। প্লিজ।

আমি ওর দিকে তাকালাম। স্পষ্ট টের পাই, আমার চোখ বাঘের মতো জ্বলছে। সমস্ত গায়ে শিরশির করে উঠছে রাগ। কিন্তু মাতাল সুবিনয় আমাকে লক্ষই করল না। বলল, আই অ্যাম গোয়িং হোম টুনাইট। ওয়েট বাডি, আই ক্যান টেক ইউ হোম।

রাতে আমি ফের বারান্দায় শুয়েছি। প্যাকিং বাক্সগুলি একটু নড়বড় করে। বিছানাটা বড্ড শক্ত আর স্যাঁতস্যাঁতে ঠেকে। এ সবই ক'দিন সুবিনয়ের পুরু গভীর বিছানায় শোওয়ার অভ্যাসের ফল। শুয়ে জেগে থাকি। সুবিনয়ের ঘর থেকে কোনও শব্দ আসে না। ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখি। ক্ষয়া একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। বড় ভাল লাগে। চেয়ে থাকি। ভিতরটা বিস্বাদে ভরে আছে। চাঁদ বড় ভাল লাগে। চাঁদ কোনও কাজে লাগে না, ব্যবহার হয় না। শুধু অকারণে আকাশে ঝুলে থাকে। চাঁদ তাই বড় ভাল।

বুড়ো বিবেক আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, পাপ হল লঙ্কার মতো। যেমন ঝাল তেমনি স্বাদ। না উপল?

হ্যাঁ বিবেকবাবা।

কাঁদছ নাকি?

না বিবেকবাবা। চেষ্টা করে দেখেছি, আজকাল কান্না আসে না।

বিবেক শ্বাস ফেলে বলে, কাঁদলে ভাল লাগত।

জানি। কিন্তু সব সময়ে কি আসে?

বিবেক শ্বাস ফেলে বলে, পেটে অম্বল জমলে যেমন বমি করলে আরাম হয়, কান্নাও তেমনি। তোমার কোনও দুঃখের কথা মনে পড়ে না? কিছু একটা মনে করে দেখো। কান্না এসে যাবেখন।

আসে না। আমি মাথা নেড়ে বলি, অনেক দিন বাদে এই প্রথম একটা কাজ আমি শেষ করেছি বিবেকবাবা। মেলা ঝামেলা কোরো না। তুমি যাও।

বিবেক চলে যায়।

সে যেতে না যেতেই ছুঁচোর চিড়িক ডাক আসে অন্ধকার বারান্দার কোথা থেকে যেন! চমকে উঠে বসি। বহুকাল কি ছুঁচোটা আসেনি? না কি আমিই লক্ষ করিনি ওকে, নিজের অন্যমনস্কতায় ডুবেছিলাম বলে ওর ডাক কানে আসেনি?

চকিতে মনে পড়ল, বিষ আনতে বার বার ভুল হয় বলে ক্ষণা আজ নিজেই কিনে এনেছে। শোওয়ার আগে আটার গুলিতে বিষ মাখিয়ে বারান্দায় আর বাথরুমে ছড়াচ্ছিল। আর তখন একবার

আমার খুব কাছে এসে চাপা স্বরে বলেছিল, ও এসেছে। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কী করে যে আর একটা রাতও থাকব! পারছি না, একদম পারছি না। তুমি আমার কী করলে বলো তো! আমি কি নষ্ট হয়ে গেলাম? এ কি ভাল হল?

আমি উঠে বাতি জ্বালি। মুখ ধোওয়ার বেসিনের নীচে এঁটো বাসনের ওপর ছুঁচোটা তুরতুর করছে। আমাকে দেখে মুখ তুলল। দুটো চোখ আলোয় আলোময়। ওর অল্প দূরেই সেই বিষ মাখানো আটার গুলি। আমি নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিই।

লোভে আমার পায়ের কাছে ছুটে আসে ছুঁচোটা। করুণ মুখ তুলে যেন বলে, দাও। বড় খিদে।

আমি তাকে পাত্তা দিই না। তড়িৎগতিতে আমি বারান্দা আর বাথরুম থেকে আটার গুলি তুলে নিতে থাকি। ছুঁচোটা আমাকে আর ভয় পায় না। পায়ে পায়ে ঘোরে আর ডাকে। চিড়িক স্বরে যেন বলে, দাও। আমার বড় খিদে। আমাদের দর্শন-বিজ্ঞান নেই, সুখ-দুঃখ নেই, প্রেম-ভালবাসা নেই। আছে শুধু খিদে। দাও।

আমি হাঁটু গেড়ে তার মুখোমুখি বসে বলি, আমিও কি নই তোমাদের মতো? সব কিছু খেতে নেই। আমারও চারধারে কত বিষ মাখানো খাবার ছড়িয়ে রেখেছে কে যেন। মাঝে মাঝে খেয়ে ফেলি। বড় জ্বালা।

১৩

সুবিনয় অফিসে গেল। ক্ষণা গেল মার্কেটিং-এ। সুবিনয়ের মা কুসুমকে নিয়ে কালীঘাটে।

আমি বাথরুমে বসে নিবিষ্ট মনে গেঞ্জি কাচছিলাম। আজকাল ক্ষণা কাচাকাচি করতে দেখলে রাগ করে বলে, তুমি কাচবে কেন? কুসুম দেবে'খন। না হয় তো আমি দেব। পুরুষ মানুষের কাজ নাকি এ সব!

গেঞ্জি কাচা আমার খুব পছন্দের কাজ নয়। কিন্তু ভাবি, সারা জীবন আমাকেই তো কাচতে হবে। আমার তো কোনও দিন বউ হবে না। মধু গুপ্ত লেনের রুস্তমদের টাকা আমি মিটিয়ে দেব। কেতকীর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। সেই ইঞ্জিনিয়ার। তাই ভাবি, এত কাল পর কেন এই আদরটুকু নিই? আমার এমনিই যাবে।

বাথরুমের দরজায় কে এসে দাঁড়াল। প্রথমে তাকাইনি। কিন্তু নিথর এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে টের পেয়ে চোখ তুলেই চমকে উঠি।

প্রীতি!— আমার গলার স্বর কেঁপে যায়।

সাদা খোলের চওড়া জরিপেড়ে একটা ভীষণ দামি শাড়ি পরনে। ওর মুখও সাদা। ঠোঁট ফ্যাকাসে। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

ও চৌকাঠের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কাছেই এসেছি।

আমার কাছে?

উপলবাবু, ক্ষণাদিকে নষ্ট করলেন?

আমি মাথা নিচু করে বলি, না তো। আমি ওকে ভালবাসি।

প্রীতি জলময় নোংরা চৌকাঠের ওপর সাদা শাড়ির কথা ভুলে গিয়ে বসে পড়ল ঝুপ করে। ঠিক আমার চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল।

কী হল?— আমি অবাক হয়ে বলি।

আমি সব জানি উপলবাবু।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, মাইরি।

বেচারা!— প্রীতি হেসে বলে, না, ক্ষণাদিকে নয়, আপনি বড় বেশি টাকা ভালবাসেন।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। আমি টাকা ভালবাসি না। আমি শুধু চেয়েছিলাম টাকা সহজলভ্য হোক! বৃষ্টির মতো, জলপ্রপাতের মতো টাকা ঝরে পড়ুক। হ্যান্ডবিলের মতো টাকা বিলি হোক রাস্তায় রাস্তায়।

তাই টাকার জন্য আমার দিদিকে নষ্ট করলেন?

নষ্ট?

বলে আমি অবাক হয়ে তাকাই। তারপর প্রীতির কাছে হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, দেখুন। আমার মুখের মধ্যে দেখুন।

এই বলে হাঁ করে থাকি।

প্রীতি আমাকে পাগল ভেবে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী দেখব?

দেখলেন না আমার মুখের মধ্যে?

কী?

বিশ্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে। আপনিও ভাল করে দেখলে দেখতে পেতেন, আমি কাউকে নষ্ট করিনি। যে যার কর্মফলে নষ্ট হয়ে আছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।

লোকে যেমন রাস্তার পাশে পচা ইঁদুর দেখে তেমনি একরকম ঘেন্নার চোখে আমাকে দেখছিল প্রীতি। অনেকক্ষণ দেখে বলল, আপনি অন্য কোথাও যেতে চান না উপলবাবু?

গেঞ্জিটা ধুয়ে নিংড়ে আমি উঠে আসি। হেসে বলি, যাব। আমাকে তো যেতেই হবে। প্রীতি, জীবনে এই প্রথম একটা কাজ আমি সম্পূর্ণ করেছি। এই আনন্দটা আমাকে কিছুক্ষণ উপভোগ করতে দিন।

কী কাজ?

ক্ষণাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। এবার আপনারা আমেরিকা চলে যেতে পারবেন।

বেচারা!— প্রীতির দীর্ঘশ্বাস ফাঁকা বাড়িতে বড় করে শোনাল। বলল, আপনি কি ভাবেন, যে লোকটা তার বউকে স্ক্যান্ডালে জড়ানোর জন্য এত কাণ্ড করছে তাকে আমি বিশ্বাস করব? ক্ষণাদিকে আমরা ছেলেবেলা থেকে জানি। চিরকাল ওর ঘর-সংসারের দিকে ঝোঁক। এমন গুছিয়ে পুতুল খেলত যে সবাই বলত, ও খুব সংসার-গোছানি মেয়ে হবে। তাই হয়েছিল ক্ষণাদি। স্বামী, শাশুড়ি, বাচ্চা সংসার নিয়ে কেমন জড়িয়ে গিয়েছিল। অমন ভাল বউকে কেউ এত নীচে টেনে নামায়?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

প্রীতি আমার একটা হাতে হাত রেখে বলল, কেন করলেন এমন? কী দিয়ে ভোলালেন ক্ষণাদিকে?

উদাস স্বরে বলি, আমি নিমিত্ত মাত্র। যা হওয়ার তা হয়েই ছিল।

প্রীতি আরও এক পা কাছে সরে এসে বলল, কিছু হয়নি উপলবাবু। জামাইবাবুকে আমি নিইনি মনের মধ্যে। কখনও হয়তো কোনও দুর্বলতা এসেছিল, এখন নেই। আপনি দিদিকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায় প্রীতি?

আপনাকে আমার ভীষণ দরকার।

কেন প্রীতি?

বলব। আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

গোছানোর মতো কিছু নেই।

তা হলে চলুন।

আমি পোশাক পরে নিই। টাকার মস্ত বান্ডিলটা পকেটে পুরি।

প্রীতি আড়চোখে দেখে বলল, কত টাকা!

অনেক।

প্রীতি চেয়ে রইল আমার দিকে। করুণাঘন চোখ।

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিল প্রীতি। উঠতে গিয়েই চমকে উঠে দেখি, রুমা বসে আছে। পিছনের সিটে হেলে বসে নিজের বাঁ হাতের নখগুলো দেখছিল। আমার দিকে খরচোখে একবার তাকাল। প্রীতিকে বলল, ওঁকে সব বলেছ প্রীতি?

না। তুমি বলো।

বলছি।

বলে রুমা সিটের মাঝখানে সরে এসে বসল। এক ধারে প্রীতি, অন্য ধারে আমি।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালা ধীরগতিতে গাড়ি চালায়। হয়তো তাকে ও রকমই নির্দেশ দেওয়া আছে।

রুমা পাশে বসতেই আমার শরীরে একটা কাঠের মতো শক্তভাব দেখা দিল। বুকে ভয়। নার্ভাস লাগছে।

রুমা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, শুনুন রোমিও, প্রীতি অবশেষে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

আমি অনেকখানি বাতাস গিলে ফেলি।

আমাকে?

আপনাকে। কেন, আপনি রাজি নন?

উদভ্রান্তের মতো বলি, কী বলছেন? আমি কি ঠিক শুনছি?

ঠিকই শুনছেন। প্রীতি আপনাকে বিয়ে করতে চাইছে। আজই এক্ষুনি। অনেক স্যুটারের ভিতর থেকে প্রীতি আপনাকেই বেছে নিয়েছে। আপনি ভাগ্যবান।

মাথাটা ঘুলিয়ে ওঠে। কিছু বুঝতে পারি না। পাঞ্জাবি ট্যাক্সি ড্রাইভারের সবুজ পাগড়ির দিকে চেয়ে থাকি। আমার শরীরের কোথায় যেন একটা বৈদ্যুতিক তার ছুঁয়ে আছে। মৃদু শিহরনে শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। নতুন এক চোখে প্রীতির দিকে পাশ ফিরে চাইলাম।

প্রীতি আমার দিকে চেয়ে ছিল, চোখ চোখ পড়তেই মুখখানা ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

গোলপার্কে ওদের ফ্ল্যাটে এসে রুমা বলল, আমি পাশের ঘরে আছি প্রীতি। তোমরা কথা বলে নাও।

রুমা তার ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকানি দিয়ে দিল। তারপর ও ঘর থেকে সেই ট্যাংগো নাচের বাজনা আসতে লাগল।

তার সেই ঘোরানো চেয়ারে প্রীতি মাথা নত করে বসে আছে। কার্ল করা খাটো চুলের রাশি থোপা থোপা কালো আঙুরের মতো ঘিরে আছে মুখখানা।

গদি-আঁটা টুলের ওপর হতভম্ব মাথা নিয়ে বসে আছি। কথা আসছে না।

অনেকক্ষণ বাদে প্রীতি তার সুন্দর কিন্তু ফ্যাকাসে মুখখানা তুলে আমার দিকে ফেরাল। নরম আদরের গলায় ডাকল, উপল!

উঁ।

আমাকে বিয়ে করবে না উপল?

মাথা নেড়ে বললাম, আমি কি স্বপ্ন দেখছি প্রীতি?

না।— প্রীতি মাথা নেড়ে বলল, শোনো উপল, তোমাকে ছাড়া আমার উপায় নেই।

চোখের জল মুছে নিয়ে বললাম, আমাকে কেউ ভালবাসে না প্রীতি।

প্রীতি আবার কালো আঙুরের থোপায় মুখ ঢেকে মাথা নত করে মৃদু স্বরে বলল, আমি বাসি।

কবে থেকে প্রীতি?

যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম। জামাইবাবুর পাগলামির চিঠি নিয়ে এসেছিলে। আমি তোমার ওপর বিরক্ত হয়েছিলাম উপল। কিন্তু তখন থেকেই তোমাকে ভুলতে পারি না। কেন ভুলতে পারি না তা অনেক বার ভেবে দেখেছি, বিরক্ত হয়েছি নিজের ওপর। পরে বুঝতে পেরেছি, তোমাকে আমি কবে থেকে যেন ভালবেসে ফেলেছি। বুঝে নিজের ওপর রেগে গেছি। কিন্তু ভালবাসার ওপর কি কারও হাত থাকে, বলো!

প্রীতি, আমি সামান্য মানুষ।

কে বলল উপল? তুমি সামান্য নও। তোমার ভিতরে কী আছে তা তুমি কোনও দিন বুঝতে পারোনি।

কী আছে প্রীতি?

নতমুখী প্রীতি বলে, তুমি বড় ভাল লোক। তুমি খুব ভাল।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না প্রীতি। আমি ভাল নই। আমার যখন খিদে পায় তখন আমার মাথার ঠিক থাকে না। তখন মানুষ আমাকে যা করতে বলে তাই করি। বরাবর মানুষ আমাকে নিমিত্তের ভাগী করেছে প্রীতি। কিন্তু যদি খিদে না পেত—

সজল, বিশাল দু'খানা চোখে প্রীতি আমার দিকে তাকায়। তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। কথা ফোটে না প্রথমে। তারপর খুব অন্য রকম এক গলায় আস্তে করে বলে, আমি তোমাকে খাওয়াব উপল। আমি তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাব। দু'জনে মিলে খাটব, খাব। খিদের কথা বোলো না। আমার বড় কষ্ট হয়।

অবাক হয়ে বলি, আমেরিকায় নিয়ে যাবে?

ও মাথা নেড়ে বলল, নিয়ে যাব। আমি সামনের রবিবারে চলে যাচ্ছি। গিয়েই তোমার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করব। ভেবো না, সে দেশে কখনও খাবারের অভাব হয় না।

নিয়ে যাবে! আমার রক্তে রক্তে ট্যাংগো নাচের বাজনা ঢুকে যায়। আমার ভিতরে যেন এক নাচঘর তৈরি হয়ে গেল। সেই ঘরে জোড়া জোড়া পা ফেলে সাহেব-মেম নেচে বেড়াচ্ছে।

প্রীতি!

প্রীতি উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনবার চেষ্টা করছিল। জবাব দিল, উঁ!

কবে আমাদের বিয়ে হবে?

আজ। বেলা তিনটের সময় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আসবেন, সাক্ষীরা আসবেন।

আমি হাসলাম। বহুকাল এমন গাড়লের মতো হাসিনি।

প্রীতি, শোনো। বিয়ের পর আমরা জোড়ে মাসির কাছে যাব।

প্রীতি অবাক হয়ে বলে, মাসি কে?

আমার এক মাসি আছে। মাসি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। বড় খুশি হবে মাসি। কত আদর করবে তোমাকে, দেখো। যাবে তো!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব উপল।

তুমি মাসিকে প্রণাম করবে তো প্রীতি?

করব, নিশ্চয়ই করব।

ক'টা বাজে প্রীতি?

প্রীতি মৃদু হেসে বলে, তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট। তুমি ঘাবড়ে যাওনি তো উপল?

অবাক হয়ে বলি, না তো! ঘাবড়াব কেন? আমার অসম্ভব, অসহ্য এক আনন্দ হচ্ছে। প্রীতি, তুমি বিয়ের পর সিঁদুর পরবে তো?

প্রীতি করুণ মুখখানা তুলে বলে, পরতে তো হবেই।

শাঁখা?

তাও।— বলে প্রীতি হাসল। বড় সুন্দর হাসি।

তুমি কি রাঁধতে পারো প্রীতিসোনা?

প্রীতি ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ। আমি অনেক রকম রান্না জানি। দেশি, বিলিতি। আমেরিকায় তো আমাকেই রাঁধতে হবে তোমার জন্য।

কেন প্রীতি? আমরা রান্নার লোক রাখব।

ওদের দেশে ভীষণ টাকা লাগে লোক রাখতে।

লাগুক। তোমাকে আমি তা বলে রাঁধতে দেব না।

আচ্ছা।— বলে প্রীতি চোখে চোখে একটু হাসে।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ উঠে আসছে। উত্তেজনায় কেঁপে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

প্রীতিও উঠে দাঁড়ায়। ম্লান মুখ করে বলে, ওরা আসছে।

আমি আজ দাড়ি কামাইনি প্রীতি।— গালে হাত বুলিয়ে বলি।

তাতে কিছু হবে না উপল। সারা জীবন তো কামাবেই।

সাজিনি।

তোমাকে অনেক পোশাক করে দেব।

তিনজন লোক ঘরে এসে দাঁড়ায়। একজনের হাতে খাতাপত্র। প্রথমে উত্তেজনার বশে আমি তাদের মুখ ভাল করে দেখতে পাই না। তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়; তিনজনের মধ্যে একজন প্রীতির সেই প্রেমিক।

প্রীতি আমার কাছে ঘেঁষে এসেছিল। ওর একটা হাত কখন আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আমি ফিস ফিস করে বলি, ও কে প্রীতি? ও কেন এখানে?

প্রীতি মৃদু স্বরে বলে, ও আমার কেউ না উপল। ও শুধু সাক্ষী দিতে এসেছে।

পাশের ঘরে ট্যাংগো থামল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল রুমা। খাতা হাতে লোকটা চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসল। প্রীতির প্রাক্তন প্রেমিক আর একজন অচেনা লোক গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

থমথম করছে ঘর। কেউ কোনও আনন্দ করছে না। এই শোকের ছায়ার মধ্যে কী করে বিয়ে হবে?

প্রীতি আমার হাত চেপে ধরে বলল, এসো উপল।

আমি বললাম, কেউ উলু দিল না প্রীতি, শাঁখ বাজল না।

প্রীতি আমাকে টেবিলের সামনে নিয়ে গেল। ম্যারেজ রেজিস্টার আঙুল দিয়ে ফর্মে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এইখানে সই করুন।

একদম সময় লাগল না। আমি আর প্রীতি সই করার পর রুমা, প্রীতির ভূতপূর্ব প্রেমিক আর অচেনা লোকটা সই করল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তার খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠল। চলে গেল।

প্রীতি তার ঘোরানো চেয়ারে বসে আছে। নতমুখ। কালো আঙুরের থোপায় ঘিরে আছে মুখখানা। হঠাৎ ও একটু কেঁপে উঠল। চাপা কান্নার একটা অস্ফুট শব্দ কানে এল। ঘরের মাঝখান থেকে আমি ছুটে ওর কাছে যাওয়ার জন্য এগোতেই মাঝখানে রুমা এসে দাঁড়াল।

উপলবাবু! ওকে এখন আর ডিস্টার্ব করবেন না।

ডিস্টার্ব!— আমি ভীষণ অবাক হয়ে বলি, ডিস্টার্ব মানে? ও আমার বউ। আমার বউ কাঁদছে কেন সেটা আমার জানা দরকার।

রুমার দু' পাশে প্রীতির প্রাক্তন প্রেমিক আর অচেনা লোকটাও এসে দাঁড়াল। করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে প্রেমিকটি বলল, সে তো ঠিকই উপলবাবু। ও তো চিরকালের মতোই আপনার হয়ে গেল। এখন ওকে একটু রেস্ট নিতে দিন।

তীব্র আকুলতায় আমি বললাম, আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। আমার বউ কাঁদছে।

রুমা অত্যন্ত উদাস গলায় বলল, উপলবাবু, এখনও ও কেবলমাত্র কাগজের বউ। সেটাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

ভীষণ অবাক হয়ে বলি, কাগজের বউ। তার মানে?

কাগজে সই করা বউ।— রুমা নিষ্ঠুর গলায় বলে, তার বেশি নয়।

আমি গাড়লের মতো তাকিয়ে থাকি। তিনজন মানুষ আমার সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওপাশে প্রীতি তার টেবিলে মাথা রেখে কাঁদে অঝোরে।

প্রীতি!— আমি প্রাণপণে ডাকি।

প্রীতি উত্তর দেয় না। কাঁদতে থাকে।

প্রেমিক আমার হাত ধরে বলে, ইমোশনাল হবেন না উপলবাবু। এখন আপনার অনেক দায়িত্ব।

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিকই তো। আমি বিয়ে করেছি, দায়িত্ব হওয়ারই কথা।

প্রাক্তন প্রেমিক মাথা নেড়ে বলে, সেইজন্যই তো বলছি। দেয়ার আর মাচ টু বি ডান। এখন আপনার প্রথম কাজ সুবিনয়বাবুকে খবরটা পৌঁছে দেওয়া। ওকে জানিয়ে দেবেন, প্রীতির সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। এ কাজটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট উপলবাবু।

আমি বুঝতে পারি না। সব ধোঁয়াটে লাগে। তবু মাথা ঝাঁকাই। চিরকাল লোকে আমাকে এটা-সেটা ভালমন্দ কাজ করতে বলেছে। আমি করে গেছি।

প্রাক্তন প্রেমিক বলল, কেন ইম্পট্যার্ন্ট জানেন? সুবিনয়বাবুর পাগলামি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে গেছে। উনি সব সময়ে প্রীতিকে গার্ড দিচ্ছেন। অথচ পরশুদিন প্রীতিকে ফ্লাই করতেই হবে।

পরশুদিন!— আমি চমকে উঠে বলি।

পরশুদিন রবিবার। প্রীতির প্যাসেজ বুকড হয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, আজ কী বার?

শুক্রবার।— উপলবাবু, শুনুন, সুবিনয়বাবুকে বলবেন, প্রীতির সঙ্গে কোনও রকম ঝামেলা করলে আমরা পুলিশের প্রোটেকশন নেব। প্রীতি এখন একজনের লিগাল ওয়াইফ।

একজনের নয়। আমি মাথা নাড়ি। 'একজন' কথাটা আমার পছন্দ হয় না। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলি, প্রীতি আমার বউ।

পেপার ওয়াইফ।— রুমা তীব্র গলায় বলল।

না না।— প্রেমিক বলে ওঠে, উপলবাবু ঠিকই বলছেন। প্রীতি এখন উপলবাবুরই স্ত্রী।

প্রীতি টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। অঝোর কান্না। আমার বুকের মধ্যে ঢেউ দুলে ওঠে। আমার সামনে তিনজন মানুষ দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমি বলি, একবার আপনারা আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। ও আমার বউ। আমার বউ কাঁদছে।

প্রাক্তন প্রেমিক বলে, ওকে কাঁদতে দিন। ও আনন্দে কাঁদছে। এবার কাজের কথা শুনুন উপলবাবু, সুবিনয়কে আপনি এই ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা দেখাবেন। ফেস হিম লাইক এ হিরো। মনে রাখবেন, আপনি আপনার স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য লড়ছেন।

আমি বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলি, বুঝেছি। সুবিনয় কিছু করবে না। ও আমাকে ভয় পায়।

বলে আমি হাসতে থাকি।

প্রাক্তন প্রেমিক বলে, সেটা আমরা জানি উপলবাবু। সুবিনয় আপনাকে ভয় পায়। কারণ, আপনি ওর অনেক গোপন কথা জানেন। আর ঠিক সেই কারণেই আপনাকে এ কাজের জন্য চুজ করা হয়েছে।

চুজ করা হয়েছে!— আমি বাতাস গিলে বলি, তার মানে?

স্লিপ অফ টাং মাই ডিয়ার।— প্রাক্তন প্রেমিক একটু হেসে বলল, ডোন্ট মাইন্ড। কাজের কথাটা শুনে নিন। আপনি সুবিনয়কে আরও বলবেন যে, প্রীতি পরশু দিন আমেরিকা যাচ্ছে না। তার বদলে আপনি কাল প্রীতিকে নিয়ে হানিমুনে যাচ্ছেন। কুলু ভ্যালিতে।

কুলু ভ্যালি?

কুলু ভ্যালি। সুবিনয়কে মিসলিড করবেন। ও আপনাকে ফলো করার চেষ্টা করবে। যদি করে তো আপনি কলকাতা থেকে দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রীতির রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত সুবিনয়ের কলকাতায় থাকাটা নিরাপদ নয়। হি ইজ ডেঞ্জারাস।

আমি মাথা নাড়লাম। প্রাক্তন প্রেমিক এক বান্ডিল নোট বের করে আ- পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, ফর দি এক্সপেনসেস, ফাইভ থাউজেন্ড।

অবাক হয়ে বলি, টাকা! টাকা কেন? আমি আমার স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য কাজ করব, আপনি টাকা দেবেন কেন?

কাগজের বউ।— রুমা বলল।

না না।— প্রেমিক বাধা দিয়ে বলে, আপনার বউ তো ঠিকই। কিন্তু টাকার তো দরকার হতে পারে। কিপ ইট অ্যাজ এ গিফট।

ইতস্তত করি। টাকা! কত টাকা! টাকা কি দুনিয়ায় সত্যিই সস্তা হয়ে গেল? আজকাল আমি পাশ ফিরলেও টাকা আসে। গোছা গোছা হ্যান্ডবিলের মতো টাকা।

প্রাক্তন প্রেমিক আমার পিঠে হাত রেখে দরজার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। আমি জেদির মতো দাঁড়াই।

প্রীতি মুখ তুলছে। চোখ মুছল। তারপর তাকাল আমার দিকে। দুই চোখ লাল। মুখখানা রুদ্ধ আবেগে ফেটে পড়ছে। ওর ঠোঁট নড়ল। কিছু বলল কি? কিছু শোনা গেল না। কিন্তু বুঝতে পারি, ও বলল, বেচারা!

প্রাক্তন প্রেমিকের হাত ছাড়িয়ে আমি প্রীতির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, প্রীতিসোনা, আমি তোমার জন্য সব করব। ভেবো না।

আমি প্রীতির দিকে এগিয়ে যাই। প্রীতি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি, প্রীতি, বউ আমার!

চকিত পায়ে রুমা রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। কঠিন গলায় বলে, উপলবাবু, প্রীতিকে একা থাকতে দিন।

অসম্ভব রাগে আমার শরীর স্টার্ট নেওয়া মোটরগাড়ির মতো গর্জন করতে থাকে। আমি বলি, সরে যান।

রুমা তার স্ম্যাশ করার প্রিয় ভঙ্গিতে হাতখানা ওপরে তোলে। বলে, নট এ স্টেপ ফারদার।

অভিজ্ঞতা-বলে আমি কুঁকড়ে যাই। ডালমিয়া পার্কের সেই স্মৃতি দগদগ করে ওঠে পুরনো ব্যথার মতো। প্রাক্তন প্রেমিক এসে আমার হাত ধরে সান্ত্বনার গলায় বলে, আগে কাজ তারপর সব কিছু। প্রীতি আপনারই রইল। এখন ওকে বিপদ থেকে বাঁচানোটা আগে দরকার।

আমি মাথা নাড়ি। তারপর প্রাক্তন প্রেমিকের কানে কানে বলি, এর আগে আমার কখনও বিয়ে হয়নি, জানেন! আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে।

প্রাক্তন প্রেমিক আমাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। বলে, জানি। আপনি বড় ভাল লোক। পৃথিবীর শেষ কয়েকটা ভাল লোকের মধ্যে আপনি একজন।

১৪

সুবিনয় মুখ তুলে আমাকে দেখল। নিজের সিগারেটের ধোঁয়ায় ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সারা ঘরে বিদেহী আত্মার মতো অ্যালকোহলের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরটা আবছা, অস্পষ্ট।

আমি কাঁপা গলায় ডাকি, সুবিনয়!

ইঁয়াপ বাডি।— বলে সুবিনয় হেঁচকি তোলে।

আমার কিছু কথা আছে।

কলকল করে গেলাসে মদ ঢালবার শব্দ হয়। খস করে ওঠে দেশলাই। একটু আলো জ্বলে নিবে যায়।

সুবিনয় বলে, উপল, আমার কিছুতেই নেশা হচ্ছে না। সকাল থেকে একটানা খাচ্ছি। তবু কেন নেশা হচ্ছে না বল তো!

সুবিনয়, আমার কথাটা খুব জরুরি।

কী কথা?

আমি প্রীতিকে বিয়ে করেছি।

সুবিনয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাত্র। তার সিগারেটের আগুন তেজি হয়ে মিইয়ে যায়। গেলাস টেবিলে রাখার শব্দ হয়।

সুবিনয় বলে, কংগ্র্যাচুলেশনস।

ঠাট্টা নয় সুবিনয়, প্রীতি আমার বউ। মাই লিগাল ওয়াইফ। এই দ্যাখ সার্টিফিকেট।

সুবিনয় হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নেয়। দেখে। তারপর সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বলে, ড্যাম ফুল।

কে?

সুবিনয় আবছায়ার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকাল। গাঢ় স্বরে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি? ইউ আর ফ্রেমড।

তার মানে?

সুবিনয় মাথা নেড়ে একটু হাসে। বলে, ইটস এ পেপার ম্যারেজ বাডি। এ পেপার ম্যারেজ। অ্যান্ড ইউ আর দ্য স্কেপগোট।

মাথাটা ঝিম করে ওঠে। তবু আমি যথাসাধ্য দৃঢ় গলায় বলি, না সুবিনয়, প্রীতি আমাকে ভালবাসে। ও সিঁদুর পরবে, শাঁখা পরবে। আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে।

জলপ্রপাতের মতো সুবিনয়ের হাসি ঝরে পড়তে থাকে। ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, যা, এটাকে বাঁধিয়ে রাখিস।

আমি পাকানো কাগজটা খুলে সমান করতে করতে বলি, প্রীতি এখন আমার বউ সুবিনয়, তুই ডিস্টার্ব করবি না।

সোফায় চিতপাত হয়ে শুয়ে সুবিনয় বলে, করব না উপল। বোস।

আমি বসি।

সুবিনয় উদাস গলায় বলে, প্রীতি পরশুদিন যাচ্ছে তা হলে?

না না। আমরা কাল হানিমুনে যাচ্ছি। কুলু ভ্যালিতে। মুখস্থ বলে যাই।

ও হাসে, বলে, আই ক্যান স্মেল দ্য ট্রুথ বাডি। ডোন্ট টেল লাইজ।

আমি ভয় পাই। আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ঘামতে থাকি।

সুবিনয় উঠে বসে। বলে, উপল, এ সব ছেলেমানুষি চালাকি ও করছে কেন? কোনও লাভ নেই।

আমি ইচ্ছে করলেই ওর যাওয়া আটকে দিতে পারি। ওর প্রেমিককে ছ'মাসের জন্য হাসপাতালে পাঠাতে পারি।

আমার শরীরে একটা মোটরগাড়ি হঠাৎ স্টার্ট নেয়। গরগর করে গর্জন করতে থাকে রাগ।

চাপা গলায় বলি, সুবিনয়! সাবধান।

সুবিনয় বলে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আমার সব স্বাভাবিক বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। আমি এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাই। বলি, প্রীতি সম্পর্কে আমি কোনও কথা শুনতে চাই না আর। শি ইজ মাই ওয়াইফ।

সুবিনয় একটা হেঁচকি তুলে হেসে ওঠে।

আমি বিনা দ্বিধায় ওর মুখের দিকে লাথি চালিয়ে বলি, স্কাউন্ড্রেল।

লাথি লাগল জুতোসুদ্ধ। সুবিনয় একটা ওঁক শব্দ করে দু'হাতে থুতনি চেপে ধরল। দ্বিতীয় লাথিটা লাগল ওর মাথায়। টলে সোফায় পড়ে গেল সুবিনয়। আমি বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে দু' হাতের থাবায় ওর গলার নলি আঁকড়ে ধরে বলি, মেরে ফেলব কুকুর। মেরে ফেলব।

আমার দাঁতে দাঁতে এত জোর ঘষা লাগে যে, গম পেষাইয়ের শব্দ হতে থাকে।

সুবিনয় চোখ চেয়ে খুব অবাক হয়ে আমাকে দেখল।

আমি আমার সর্বস্ব শক্তি দিয়ে ওর গলায় আঙুল বসিয়ে দিচ্ছি। মস্ত মোটা গর্দান, প্রচণ্ড মাংসপেশি। তবু আমার তো কিছু করতে হবে। প্রাণপণে ওর গলা টিপে বলি, মরে যা! মরে যা! মরে যা।

সুবিনয় বাধা দিল না। শুধু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

আমি কার্পেটের ওপর হড়াস করে পড়ে গেলাম।

আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে সুবিনয় তার মদের গেলাস তুলে নিয়ে বলল, তুই কত বোকা উপল। তুই বুঝিসনি, ওরা তোকে আমার হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে।

আস্তে আস্তে আমি উঠে বসি। মাথাটা ঘুরছে। আমি অনেকক্ষণ কিছু খাইনি।

সুবিনয় আমাকে দেখল। মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু প্রীতির জন্য তোকে আমি মারব না উপল। প্রীতি ইজ নট মাই প্রবলেম। আমি জানতে চাই, তুই ক্ষণাকে কী করেছিস।

আমি কষ্টে মুখোমুখি সোফায় উঠে বসি। শরীরে রাগ ছেড়ে যাওয়ার পর গভীর অবসাদ। মাথাটা চেপে ধরে বললাম, আমি কিছু করিনি সুবিনয়। তুই যা করতে বলেছিস।

সুবিনয় গেলাসে মদ ঢালে। ফের সিগারেট ধরায়।

উপল।

উঁ।

ক্ষণা নষ্ট হয়ে গেছে। থরোলি স্পয়েল্ট।

বলে সুবিনয় আমার দিকে অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল। দৃষ্টিতে ভয়, ঘৃণা, বিস্ময়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে আর-একটু তীব্র স্বরে বলল, ডেমন। শয়তান। ক্ষণাকে তুই কী করেছিস?

আমার সমস্ত শরীর সেই স্বরে কেঁপে ওঠে। মুখে জবাব আসে না।

সুবিনয় তার বিশাল চেহারা নিয়ে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ওকে বড় ভয়ংকর দেখাতে থাকে। আমি কুঁকড়ে বসে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকি।

ক্ষণা সম্পূর্ণভাবে আমার ছিল। আমি যা চাইতাম ও তাই করত। যেমনভাবে চলতে বলতাম তেমনি চলত। কখনও এতটুকু অবাধ্য ছিল না। আমার দিকে যখন তাকাত তখন ওর চোখে একটা আলো দেখা দিত। বড় সুন্দর আলো। পৃথিবীতে আমি ছাড়া কোনও পুরুষকে ও কোনও দিন ভাল করে লক্ষও করেনি। কিন্তু কাল রাতে ও আমাকে দেখে ভয়ে আতঙ্কে নীলবর্ণ হয়ে গেল। কাছে এল না। চোখে চোখ রাখল না। বার বার আমার চোখ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল। কী করেছিস উপল?

আমি মার ঠেকানোর জন্য দুটো হাত তুলে বলি, সুবিনয়, দ্যাখ।

সুবিনয় এক পা এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বলে, কী দেখব?

আমি হাঁ করে আমার মুখের ভিতরটা দেখতে ওকে ইঙ্গিত করি। ও দেখে, তারপর বলে, কী?

দেখলি না?

না। কী দেখাচ্ছিস হাঁ করে?

শ্বাস ফেলে বলি, বিশ্বরূপ। অর্জুন দেখেছিল। তুইও দেখলে দেখতে পেতিস, যা হওয়ার তা হয়ে আছে। আমি নিমিত্তমাত্র।

সুবিনয় দুই হাতের চাপে মদের গেলাসটা ভেঙে ফেলল। তীব্র বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আমাকে বলল, তুই ক্ষণাকে কীরকম বিশ্বরূপ দেখিয়েছিস উপল? ওকে কী করে নষ্ট করলি?

আমি কী করব সুবিনয়? আমাকে দিয়ে করিয়েছিস তুই।

সুবিনয় মাথা নাড়ল, ক্ষণা কী করে নষ্ট হতে পারে? কী করে আমাকে ছেড়ে ও তোকে ভালবাসে উপল? ইজ ইট পসিবল?

কাছে এগিয়ে এসে সুবিনয় আমার বুকের জামাটা ধরে টেনে তোলে আমাকে। তারপর ছেঁচড়ে নিয়ে যায় আলোর কাছে। ভাল করে দেখে আমাকে। মৃদু সাপের মতো হিসহিসে স্বরে বলে, কী আছে তোর মধ্যে? কী দেখেছিল ক্ষণা? টেল মি বাস্টার্ড, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান টু হার?

আমার জামার কলার এঁটে বসে গেছে। দম নেওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করি। সুবিনয় আমার চোখের ভিতর দিয়ে আমার ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করে। বলে, কী করেছিস তুই আমার ক্ষণাকে? কেন ক্ষণা আর আমাকে ভালবাসে না? বল। বল।

আমাকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেয় সুবিনয়। আমি দাঁড়াই। ঠিক তৎক্ষণাৎ সুবিনয়ের ঘুসি এসে লাগে আমার মুখে।

সমস্ত চেতনায় ঝিঝি ডেকে ওঠে। অতল অন্ধকারে পড়ে যেতে থাকি। শুনতে পাই এক ঘ্যাঙানে ভিখিরির স্বরে সুবিনয় বলছে, ফিরিয়ে দে। ফিরিয়ে দে ক্ষণাকে।

সারা শরীর ব্যথা-বেদনার ডুবজলে ডুবে আছে। মাথাটা ফাঁকা, ভার। কঁকিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করি। হাত বাড়িয়ে একটা রেলিং-এর থাম হাতে পাই। ধরি। চোখে ভাল ঠাহর হয় না। ঝাপসা বুঝতে পারি, দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে অনেক ওপরে। ওখান থেকে গড়িয়ে পড়েছি এত দূরে।

সিঁড়িটা আমার দিকে চেয়ে আছে। করুণ চোখে বলে দিচ্ছে, যা দিয়ে নামা যায় তা-ই দিয়েই ওঠা যায়। কিন্তু তুমি আর সিঁড়ি বেয়ে উঠো না উপলভায়া। এই আশ্রয়টাও তুমি হারালে।

সিঁড়ির দিকে চেয়ে আমি মাথা নাড়ি। বুঝেছি।

কাঁকালটা চেপে ধরে অষ্টাবক্রের মতো বেরিয়ে আসি রাস্তায়। ফাঁকা আকাশ, খোলা হাওয়া। এখন এ ছাড়া আমার আর কী রইল? বড় ভাল লাগল দুনিয়াটাকে।

কিন্তু বিবেকশালা কি ছাড়ে? পিছু থেকে এসে কানে কানে বলে দেয়, আছে হে। এখনও অনেক আছে।

পকেটে হাত দিই। ট্যাঁকে হাত দিই। হাজার হাজার টাকা খচমচ করে ওঠে।

বিবেক বলে, একটা ট্যাক্সি করো হে উপলচন্দোর। ওড়াও।

জিভটা কেটে দু' আধখানা হয়ে গেছে প্রায়। জমাট রক্ত থুঃ করে ফেলি। কপালের দু'ধারে দুটো আলু উঠেছে। চোখ ফুলে ঢোল। পাঁজরায় খিঁচ ধরে আছে। ঘাড় শক্ত। হাতের পায়ের জোড়ে সাড় নেই।

কাটা জিভটা নেড়ে বড় কষ্টে বলি, সবাই বড় মারে বিবেকবাবা।

সামনে একটা ট্যাক্সি থামে। উঠে পড়ি। ট্যাক্সিওলা সন্দেহের চোখে এক বার, দু' বার তাকায় আমার দিকে। ভয়ে সিঁটিয়ে বসে থাকি। যদি এই মার-খাওয়া চেহারা দেখে নিতে না চায়।

পরমুহূর্তেই মনে পড়ে, আমার পকেটে অফুরন্ত টাকা আছে। অনেক টাকা। ব্যক্তিত্ব এসে যায়। আত্মবিশ্বাস আসতে থাকে। গম্ভীর মুখ করে বলি, মধু গুপ্ত লেন চলুন।

মধু গুপ্ত লেন-এর সমীর আর তার সাঙাতরা দিনরাত আমার পথ চেয়ে আছে। ওরা আশায় আশায় পথে পায়চারি করছিল। ট্যাক্সি থামতেই ছুটে এল রুস্তমরা।

আমি টাকা মুঠো করে জানালার বাইরে হাত বাড়াই। কাটা জিভে বড় কষ্টে বলি, কেতকীকে ছেড়ে দেবেন।

এক রুস্তম জানালায় ঝুঁকে পড়ে বলে, আপনি কেতকীকে নেবেন? বলুন, তুলে এনে গাড়িতে ভরে দিই।

আমি মাথা নাড়ি, না। আমার বউ আছে। আমি বউয়ের কাছে যাব।

আগের দিনের সেই ছেলেটা গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বলে, কোন বাঞ্চোত আপনার গায়ে হাত তুলেছে বলুন তো? শুধু ঠিকানা বলে দিন, খবর হয়ে যাবে।

আমি মাথা নাড়ি, না। আমি সবাইকে ক্ষমা করেছি। আমি আমার বউয়ের কাছে যাব এখন। আমার ব্যথার জায়গাগুলোয় সে হাত বুলিয়ে দেবে। আমি ঘুমিয়ে পড়ব। অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে ঘুমোব।

ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আমি বড় রাস্তায় চলে আসি। চার দিকে রাত আটটার কলকাতা ডগমগ করছে। বড় ভাল লাগে। যেন এক অনন্ত উৎসব চলেছে। সুখী মানুষরা জড়ো হয়েছে দোকানে দোকানে, সিনেমায়, রাস্তায়।

কাটা জিভ নেড়ে বলি, মানুষকে আরও সুখী করতে চাই আমি বিবেকবাবা। আজ রাতে আমি আমার বউয়ের কাছে যাব তো! আজ সবাই সুখী হোক। আশীর্বাদ করুক।

আমার বিবেক তার বাদ্যযন্ত্রে একটা পিড়িং শব্দ তুলে বলে, এখনও অনেক টাকা রয়ে গেল তোমার উপলচন্দোর। তুমি যে হ্যান্ডবিলের মতো টাকা ওড়াতে চেয়েছিলে।

ঠিক। ঠিক।— আমি মাথা নাড়ি।

এক মুঠো টাকা বান্ডিল থেকে খুলে এনে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিই বাইরে। ঠিক অবিকল হ্যান্ডবিলের মতো বাতাসের ঝটকায় টাকা উড়ে যায়। ঘুড়ির মতো লাট খায় শূন্যে। তারপর আলোকিত রাস্তা-ঘাট আর মানুষজনের ওপর নেমে আসে।

পিছনের কাচ দিয়ে আমি ঘুরে দেখি। মানুষজন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দৌড়োচ্ছে টাকার দিকে। চলন্ত ট্রাম-বাস থেকে নেমে পড়ছে রাশি রাশি মানুষ। একটা লোক চলন্ত গাড়ির নীচে চলে গেল টাকা কুড়োতে গিয়ে।

আর-এক মুঠো উড়িয়ে দিই। দেখি। দোকান ছেড়ে নেমে আসছে দোকানি। হাড়কাটা গলির ভাড়াটে মেয়েরা খদ্দের ভুলে পিল পিল করে রঙিন মুখ আর তেল-সিঁদুরের ছোপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একটা ঠ্যাং-ভাঙা লোক টানা রিকশায় বসে মেডিকেল কলেজে যাচ্ছিল, সে হঠাৎ দু' পায়ে লাফ মারল রাস্তায়।

বউবাজারের মোড় পেরিয়ে আর-এক মুঠো ওড়াই।

ট্যাক্সিওলা ট্যাক্সি থামিয়ে বলে, কী হচ্ছে বলুন তো পিছনে?

কিছু না। আপনি চলুন।

ট্যাক্সিওলা আবার গাড়ি ছাড়ে। আমি টাকা ওড়াতে থাকি। আমার পিছু পিছু কলকাতা পাগল হতে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ ডিউটি ভুলে লাফিয়ে পড়ে রাস্তায়। সিনেমা ভেঙে যায়। দোকানে-বাজারে ঝাঁপ পড়তে থাকে। দাঙ্গা লেগে যায়। ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হতে থাকে। একটা কালো পুলিশের গাড়ি ধেয়ে আসতে থাকে আমার দিকে। আমি পাত্তা দিই না। চৌরঙ্গির মোড়ে আমি মহানন্দে টাকা ছড়াই।

টাকা ওড়ে। লাট খায়। পড়ে।

আমি মুগ্ধ চোখে দেখি। ঠিক এইরকম ভাবে আমি টাকাকে দেখতে চেয়েছি বরাবর। সস্তা, সহজ, প্রচুর। দেখতে দেখতে এত মোহিত হয়ে যাই যে, আমার কিছু খেয়াল থাকে না। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে কখন। পুলিশের গাড়ি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

সিপাইজিরা যখন ধরাধরি করে গাড়িতে তুলছিল তখন কেবল আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলছিলাম, ছেড়ে দাও আমাকে। আমার বউ বসে আছে আমার জন্য। আমি তার কাছে যাব।

পিস্তলওলা এক পুলিশ সাহেব বলল, এত কালো টাকা আমি কখনও দেখিনি।

আমার ক'মাসের মেয়াদ হয়েছিল আমি জানি না। যখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রায় পড়ছিলেন তখন আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

কম্বলে শুয়ে আমার গায়ে বড় চুলকুনি হয়েছে, তাই খুব চুলকোচ্ছিলামও। রায় পড়া হয়ে গেলে পুলিশ আমাকে জেলে আটকে রাখল।

তারপর ছেড়েও দিল একদিন।

কোনও মানে হয় না। খামোকা এই আটকে রাখা আর ছেড়ে দেওয়া।

বেরিয়ে এসে পৃথিবীর রাস্তাঘাট কিছু অচেনা ঠেকছিল, আর-একটা লোকও ছাড়া পেয়ে সঙ্গে নিয়েছিল। পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, শালারা বোকা।

কারা?

ওই যারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল। বুঝলে! আসলে খুনটা আমিই করেছিলাম। বদ্যিনাথ নয়। তা বদ্যিনাথের যাবজ্জীবন হল, আমার ছ' মাস।

বলে খুব হাসল লোকটা। বলল, কালীমায়ের থানে একটা পুজো দিই গে। তারপর গঙ্গাস্নান করে সোজা বাড়ি। তুমি কোন দিকে?

বেঁটে, কালো, মজবুত চেহারার লোকটার দিকে চেয়ে থাকি। তারপর বলি, আমার রাস্তাঘাট সব গুলিয়ে গেছে। ঠিক চিনতে পারছি না। আমি আমার বউয়ের কাছে যাব।

তা আর ভাবনা কী। চলো একসঙ্গে যাই। একদিন-না-একদিন ঠিক বউ এসে জুটবে তোমার।

আমি মাথা নেড়ে তার সঙ্গ ধরলাম।

লোকটা পুজো দিল, গঙ্গাস্নান করল। তারপর আমাকে নিয়ে কালীঘাট স্টেশন থেকে ট্রেন ধরল। ফের শিয়ালদায় এসে ট্রেন পালটে আর-এক ট্রেন। লোকটা যায়। আমিও যাই। বরাবরই দেখেছি একবার বেরিয়ে পড়লে কেউ-না-কেউ জুটে যাবেই।

পলাশি স্টেশনে নেমে অনেকখানি মাঠঘাট, খানাখন্দ পেরিয়ে হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে বলি, ওহে বাপু, বড় যে নিয়ে যাচ্ছ, খুব খাটাবে নাকি?

লোকটা ভালমানুষি ঝেড়ে ফেলে বলে, তার মানে? কালীঘাটে খাওয়ালুম, এতগুলো গাড়িভাড়া গুনলুম, সে কি এমনি এমনি নাকি? মুখ দেখব বলে তো নয়। একটু ছিটেল লোক আছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু বসে খাওয়া আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। গতরখাস হয়ে বসে থাকলে ঠ্যাঙানি খাবে।

এরকমই সব হওয়ার কথা। একটা শ্বাস ফেলি। ভাবি, একদিন রাস্তাঘাট যখন সব ভেসে উঠবে চোখের সামনে, সেদিন দুনিয়ার সুন্দর একটা সহজ রাস্তা ধরে আমি যাব আমার বউয়ের কাছে। তত দিন একটু অপেক্ষা। মাথাটা পরিষ্কার হোক।

লোকটার কাজ বড় কম ছিল না। দু'বিঘে একটা চাষের জমি কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে ভেজাতে হয়। বড় কষ্ট। আগাছা সাফ করি। উঠোন ঝাঁটাই। গোরুর জাবনা দিই। সারা দিন আর সময় হয়ে ওঠে না—

রাত্রিবেলা সব দিন ঘুম আসে না। বিছানা ছেড়ে উঠে চলে আসি খোলা হাওয়ায়, মাঠের মধ্যে। চার দিকে মস্ত আকাশ, পায়ের নীচে মস্ত মাটি। এই আকাশ গোটা দুনিয়াকে ঘিরে রেখেছে। এই মাটি চলে গেছে বরাবর সব মানুষের পায়ের নীচ দিয়ে। যোগ রেখেছে সকলের সঙ্গে সকলের। ভাবতে বড় ভাল লাগে।

এক-একদিন বুড়ো বিবেক এসে পাশে বসে। বলে, উপলচন্দোর, তোমাকে একটু দুঃখের গান শোনাতে ইচ্ছে করছে।

শোনাও।

কিন্তু গান গাইতে গেলেই বিবেকের বড় কাশি উঠে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর শোনাতে পারে না। হাঁপিয়ে উঠে বলে, কী কাণ্ড। ওঃ, কেতকীর বিয়েতে খুব খাইয়েছিল হে উপলচন্দোর। খুব। কুমড়োর একটা ছক্কা যা করেছিল!

কেতকী কি কেঁদেছিল বিবেকবাবা?

তা কাঁদবে না? মেয়েরা শ্বশুরঘরে যাওয়ার সময়ে কত কাঁদে।

কিন্তু আমার জন্যও তার কাঁদবার কথা ছিল যে!

বিবেক বলে, তা সে এক কান্নার মধ্যেই মানুষের কত কান্না মিলেমিশে থাকে। আলাদা করে কি বোঝা যায় কার জন্য কোন হিক্কাটা তুলল। তবে তোমার মাসিকে একবার বলেছিল বটে, পিসি, উপলদা এল না। তার জন্যই আমার এত ভাল বিয়ে হচ্ছে। সে কথা থাক উপলচন্দোর। তোমাকে বরং কুমড়োর ছক্কাটার কথা বলি, কী ভুরভুরে ঘিয়ের বাস, গরম মশলার সে যে কী প্রাণকাড়া গন্ধ, কাবলি ছোলা দিয়েছিল তার মধ্যে আবার।

সুবিনয় কি ক্ষণার সঙ্গে ঘর করে বিবেকবাবা?

বিবেক ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, খুব করে, খুব করে। সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তারা এখন খুব সিনেমা-থিয়েটারে যায়। আর সময় পেলেই তোমার খুব নিন্দে করে বসে বসে।

বিবেকবাবা, প্রীতির কথা কিছু জানো?

সে আর জানা শক্ত কী। আমেরিকায় গিয়ে তোমার নামে ডিভোর্সের মামলা দায়ের করল। তুমি তখন জেলে। একতরফা ডিক্রি পেয়ে তার সেই ভাবের লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। পাঁচ হাজার টাকা কি তোমাকে এমনি এমনি দিয়েছিল বাপু? তবে মাঝে মাঝে বলে বটে, উপলটা বড্ড বেচারা!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি।

বিবেক আমার দিকে চায়। বলে, আরও খবর চাও নাকি? সেই যে পৈলেন ট্রেন থেকে পড়ে গেল। মনে আছে? সে কিন্তু মরেনি। এক ঠ্যাং কাটা গেছে, সে এখন ন্যাকড়ার পুতুল তৈরি করে বেচে। হাজু আর কদম এখনও ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়াচ্ছে। সেই মানিক সাহা সুন্দরবনে একা থাকে, এক নৌকোয় চাকরি পেয়েছে। বড় আনন্দে আছে। আরও শুনবে?

মাথা নেড়ে বলি, না বিবেকবাবা।

বিবেক বলে, আমিও তাই বলি। শুনে কাজ কী উপলচন্দোর? ও সব তো তোমার সমস্যা নয়। তোমার সমস্যা তুমি নিজেই। তাই বরং তোমাকে কুমড়োর ছক্কার গল্পটা বলি, আচ্ছা, না হয় কেতকীর বিয়েতে যে রসকদম্ব খাইয়েছিল সেটার কথা শোনো। সে রসকদম্বের কোনও জুড়ি নেই—

আমি ঘুমিয়ে পড়ি শুনতে শুনতে। বিবেক বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

আর তখন সেই অন্ধকার, একা মাঠের মধ্যে হঠাৎ চিড়িক করে ডেকে ওঠে মেঠো ছুঁচো, ইঁদুর, কীটপতঙ্গেরা, চার দিকে তাদের ডাক বেজে ওঠে। পরস্পরকে ডেকে জাগিয়ে তোলে তারা।

আমিও জাগি। বসে থাকি চুপ করে। আস্তে আস্তে আমার পেটের মধ্যে জেগে ওঠে ভূতের মতো খিদে। ক্যানসারের মতো, কুষ্ঠের মতো দুরারোগ্য খিদে। জেগে টের পাই, পৃথিবী জুড়ে খিদে

জাগে, ঘুম ভেঙে যায় ইঁদুরের, মানুষের, কীট ও পতঙ্গের।

শেষরাতে চাঁদ উঠে আসে আকাশে। চেয়ে থাকি। ইঁদুরেরাও চায়। বলি, বড় খিদে পায়।

বিদ্যুৎবেগে আমার সেই কথা চলে যায় দিকবিদিকে। সারা দেশ ও বিদেশ জুড়ে পশু পাখি ও মানুষের অনেক স্বর বলে ওঠে, আমাদের হৃদয়ের কোনও সমস্যা নেই। দর্শন, বিজ্ঞান, প্রেম-ভালবাসা নেই। শুধু খিদে পায়। বড় খিদে পায়।

ঘুণপোকা

।।১।।

সেইন্ট্ অ্যাণ্ড মিলারের চাকরিটা জুন মাসে ছেড়ে দিল শ্যাম।

চাকরি ছাড়ার কারণটা তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। তার ড্রইংয়ে একটা ভুল থাকায় উপরওয়ালা হরি মজুমদার জনান্তিকে বলেছিলেন-বাস্টার্ড। মজুমদার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দেয়। তা ছাড়া এতকাল শ্যাম হরি মজুমদারের অনেক হাব-ভাব, কথাবার্তা, নকল করে আসছিল। মাঝে মাঝে বেয়ারা এবং দু-একজন শিক্ষানবীশ ড্রাফটস্ম্যানকে সে মজুমদারের মার্কামারা গালাগালগুলো একই ভঙ্গীতে এবং সুরে উপহার দিয়েছে। এবং এমনকি তার এরকম বিশ্বাস এসে যাচ্ছিল যে, পুরনো এইসব গালাগালগুলো বহু ব্যবহারে শক্তিহীন হয়ে গেছে, এগুলোর আর তেমন জোর বা তেজ নেই। আরো কিছু নতুন রকমের গালাগাল আবিষ্কৃত না হলে আর চলছে না।

তবু মজুমদারের কথাটা কানে এলে দু' একদিন একটু ভাবল শ্যাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে 'টাই'য়ের 'নট' নিয়ে নাড়াচাড়া করল, বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে অর্থহীনভাবে চেয়ে রইল, আড্ডা না মেরে ঘরে শুয়ে রইল সন্ধেবেলায়। মন-খারাপ তবু ছাড়ল না তাকে। সে নিজেকে বোঝাল যে গালাগালটা আসলে কিছুই না। মজুমদার শব্দের অর্থ ভেবে গাল দেয় না, সে শুধু ঐ সব শব্দ উচ্চারণ করে রাগ প্রকাশ করে মাত্র। শ্যাম নিজেও তো কতবার কতজনকে ওরকম গাল দিয়েছে; যা নিজেই সে লোককে দিয়েছে তা ফিরে পেতে আপত্তি হবে কেন? আর, এ চাকরি কিছু দিনের মধ্যেই সোনার ডিম পাড়বে। ইতিমধ্যেই সে বাজার ঘুরে ফ্রিজিডেয়ার রেডিওগ্রাম এবং পুরোনো ছোট্ট মোটরগাড়ির দাম জানবার চেষ্টা করেছে, বড়লোকদের নিরিবিলি পাড়ার দুই বা তিন ঘরের ছিমছাম একটা ফ্ল্যাটের সন্ধানেও ছিল সে। তবু বড় অসহায় বোধ করল শ্যাম। চাকরি ছাড়ার কথা সে ভাবতেও পারে না, কারণ এতদিনে এ চাকরি তাকে উচ্চাশাসম্পন্ন করে তুলেছে।

তবু আস্তে আস্তে শ্যামের ক্লান্তি বেড়ে চলল। শিস্ দিয়ে রাস্তায় হাঁটা রবিবারে শ্যাম্পু, ছুটির দুপুরে ঘুম-এ সবের ভেতর আর তেমন আনন্দ নেই। মাঝে মাঝে যে সব বড় রেস্তোরা বা বার-এ সে সময় কাটাতো সে সব জায়গায় যেতেও তার অনিচ্ছা দেখা দিল। অবসর সময়ে ভয়ঙ্কর অবসাদ আর মাথাধরা নিয়ে সে ঘরেই শুয়ে থাকতে লাগল। রাতেও ভাল ঘুম হয় না। দুদিন সে মাঝরাতে উঠে স্নান করল, তারপর সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে সারাটা শেষরাতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াল। সে খুব ভাবপ্রবণ ছিল না কোনোদিন, গভীর চিন্তাও তার অপছন্দ ছিল, হুল্লোড় ছাড়া বাঁচা যায় না এমন বিশ্বাসই সে এতকাল পুষে এসেছে। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারল একটি গালাগাল থেকে একটি ভূত বেরিয়ে এসে তার মাথাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর-একটা বদ-অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল তার-কেবলই সে আয়নায় মুখ দেখে দাড়ি কামানোর ছোট্ট হাত-আয়নাটা সে প্রায় সারাক্ষণ কাছে রাখে। বার বার মুখ দেখে। একদিন সে সবিস্ময়ে আয়নায় লক্ষ্য করল যে, তার ঠোঁট নড়ছে। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল যে সে বে-খেয়ালে আপনমনে উচ্চারণ করে চলেছে, বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! খুব ভয় পেয়ে গেল শ্যাম, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো!

অবশেষে জুন মাসের এক ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের মাঝরাতে উঠে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে সে তার ইস্তফাপত্রটি লিখে ফেলল। আর একটি চিঠি লিখল মাকে... আমার চাকরি গিয়াছে। আমার উপর আর খুব ভরসা করিও না। অন্ততঃ আরো দু'তিন মাস তোমাদের কষ্ট করিয়া চালাইতে হইবে....। ইত্যাদি। চিঠি লিখবার পর সেই রাতে তার গভীর ঘুম হল।

শৌখিন জিনিসপত্রের মধ্যে তার ঘরে ছিল ভাড়া-করা একটা ওয়ার্ডরোব, আর একটা বুক কেস। রূপশ্রী ফার্নিশার্স থেকে লোক এসে একদিন ঠেলা-গাড়িতে তুলে সেগুলো নিয়ে গেল। মেজের ওপর স্তূপাকৃতি বই, ওয়ার্ডরোব আর বুক-কেসের দুটো চৌকো দাগ তেকে চোখ তুলে ঘরটাকে বেশ বড় বলে মনে হল তার। অনেক সুস্থ বোধ করল সে ভারমুক্ত হিসেব করে দেখল ফার্ম থেকে সে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে টাকা পাবে তাতে ঘরটা আরো কিছুদিন রাখ যাবে। দক্ষিণ-খোলা সুন্দর ঘরটি তার, সঙ্গে স্নান-ঘর।

সূতীর জামাকাপড় পরা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছিল শ্যাম। তার বেশীর ভাগই টেরিলিন, ট্রপিক্যাল বা সিল্কের শার্ট-প্যান্ট। বিদেশী টাইও ছিল কয়েকটা। ট্রাঙ্ক আর সুটকেশ খুলে সেগুলোর দিকে কৌতুকের চোখে চেয়ে দেখল সে। এখন আর এসব পরার মানে হয় না। খুঁজোপেতে সে ট্রাঙ্কের তলা থেকে পুরোনো কয়েকটা সূতির শার্টপ্যান্ট বের করল। প্যান্টের ঘের আঠারো ইঞ্চি, শার্টের কলার অনাধুনিক। সেগুলো পরে নিজেকে বে-টপ মনে হচ্ছিল তার। হাসি চেপে সে সেই পোশাকে চাকরি খুঁজতে বেরোলো।

চাকরি হ্যাঁ, হতে পারে। তার মতো অভিজ্ঞ, অথচ তরুণ লোকের চাকরি আটকাবে না। তবে একটু দেরী হবে। আর হ্যাঁ, সে হরি মজুমদারের ফার্ম ছাড়ল কেন? কোনো গোলমাল হয়েছিল? কী ধরনের গোলমাল! অত বড় ইঞ্জিনিয়ার, শেল্-ডিজাইনে যার জুড়ি নেই! তাছাড়া দেশী ফার্ম দেশের অহংকার! অমন লোকটাকে ছাড়ল কেন সে?

ক্রমে শ্যাম বুঝল এইসব ফার্মগুলোতে নালী ঘায়ের মতো মজুমদারের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। মাস তিনেক পর আবার সামান্য ক্লান্তি ও মাথাধরা পেয়ে বসল তাকে। একদিন ভিড়ের এক চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বিকেলের মরা আলোর দিকে চেয়ে সে বিড় বিড় করে বলল, আমি শেষ হয়ে গেছি। পরমুহূর্তেই চমকে উঠে সে দ্রুত এলোপাথাড়ি হাঁটতে লাগল।

আর একদিন সে হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে ডানহাতের চকচকে একটা সুন্দর ব্লেড কণ্ঠনালীর ওপর রাখল সামান্য একটু চাপ দিল। বড় আরাম! কিছুক্ষণ পর সরু রক্তের কয়েকটা রেখা তার গেঞ্জীর ওপর নেমে বুক ভাসিয়ে দিল। ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে সে হেসে আপনমনে বলল, ধ্যুৎ বড্ড নাটুকে। তারপর তোয়ালে দিয়ে গলা মুছে ডেটল লাগাল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা করছে। ক্ষতের ওপর ভেজা তুলো চেপে সে চোখ বুজল। আঃ। বড় আরাম।

তার দুটি শৌখিনতা ছিল। টেলিফোন করা, আর সকালে রোজ দাড়ি কামানো। অফিসে তার টেবিলে যখন নিজস্ব টেলিফোন থাকত তখন সে একটু অবসর পেলেই প্রায় অকারণে একে ওকে তাকে ফোন করত। কতজনকে যে সে তার ফোনের নম্বর দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। টেলিফোনে লোকের গলা শুনতে আর টেলিফোনের জন্যই তৈরী করা কৃত্রিম গলায় কথা বলতে তার ভাল লাগত। চাকরি যাওয়ার ছ'মাসের মধ্যে সে টেলিফোন করল মাত্র দু'টি। প্রথমটা করল কলেজ স্ট্রীট ওয়াই এম সি এ থেকে তার অফিসে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা কবে পাওয়া যাবে তা জানতে। দ্বিতীয়টা করল শিয়ালদার স্বয়ংক্রিয় বুথ থেকে ইতুকে, যার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় দক্ষিণ কলকাতার এক রেস্তোরায় এবং যাকে কয়েকবারই সে তার শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মেলামেশাটা, যা ঠিক প্রেম নয়, তা বিয়েতে একটা রফায় পৌছুতে পারত। তাদের এরকম কথাবার্তা হল।

শ্যাম–ইতু! কেমন আছো।

ইতু–ভাল না। তোমার দেখা নেই দু'মাস।

–আমার খোঁজ করেছিলে?

–হ্যাঁ, অফিসে প্রায় মাস দুই আগে টেলিফোন করেছিলুম।

–ওরা কী বলল?

–বলল তোমাকে ..... তোমাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম একটু ভেবে বলল– কথাটা ঠিক নয়। আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

–কেন?

–হি কল্‌ড মি নেমস্‌।

–হু?

–দি বস্‌, দি বাস্‌টার্ড।

ইতু একটু চুপ থেকে বলল–এতদিন কী করছিলে? চাকরির খোঁজ!

–হুঁ।

–কিছু পেলে? বেটা্‌ম কিছু?

–ন্‌ ন্‌ন্‌ নাঃ।

–এখন কী করবে?

শ্যাম মৃদু হাসল–ভাবছি বিয়ে করলে কেমন হয়। ইট্‌স্‌ হাই টাইম।

–বেশ তো! কাকে?

–তুমি রাজী আছ?

–হুঁউ। এক্ষুনি। বলতে বলতে ইতুর গলায় খুব আবেগ এসে গেল, মহীয়সী মহিলার মতো শোনালো তার গলা–শ্যাম, আমিও ছোটোখাটো একটা চাকরি করি, তা ছাড়া আমার কিছু গয়না আছে। আমাদের দু'জনের..

শুনতে শুনতে শ্যাম খুব ধীরে ধীরে কান থেকে ফোনটা নামিয়ে আনল, তারপর ঘুমন্ত বাচ্চাকে মা যেভাবে শোওয়ায় সেই রকম সন্তর্পনে ক্র্যাডেলে রেখে দিল ফোনটা।

আজকাল প্রায়ই শ্যামের মুখে দাড়ি বেড়ে যায়। সেই চাপা চিবুক, গভীর খাঁজওয়ালা সুন্দর থুঁতনি, ঝকঝকে মুখে সামান্য নিষ্ঠুরতা–যা তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত তা মাত্র কয়েক দিনের নাকামানো দাড়ির তলায় চাপা পড়ে যায়। বড় নিরীহ ও অসহায় দেখায় তাকে। কার্যকারণ সূত্র জানে না শ্যাম, তবু তার মনে হয় দাড়ি কামানো না থাকলে চোখ দুটোকেও কেমন যেন একটু ঘোলাটে আর অনুজ্জ্বল দেখায়।

সময় কাটে না বলে শ্যাম মাঝে মাঝে বাসে উঠে টার্মিনাল থেকে টার্মিনাল পর্যন্ত ঘুরে আসে। সুন্দর সময় কেটে যায়। একদিন বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারের বাসে উঠেছিল শ্যাম। ভবানীপুরে বাস বিকল হল। বিরক্ত না হয়ে শ্যাম ধীরে সুস্থে নেমে পড়ল। ঘড়িতে সময় দেখল, আড়াইটে। সামনেই একটা ফাঁকা সিনেমা হল। ছবির নামটাও পড়ল না শ্যাম, বাইরের আঁকা ছবিগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না, টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। নিশ্চিত ফ্লপ, ছবি লোকে দেখছে না। আধো অন্ধকার হলের ভিতরে পা দিতেই একটি টর্চের আলো আর একটা ভূতুড়ে হাত এগিয়ে আসে। নিশ্চিন্ত মনে টিকিটটা লোকটার হাতে গুঁজে দেয় শ্যাম, তারপর তার পিছু পিছু চলতে থাকে। সিট দেখিয়ে লোকটা ফিরে যাচ্ছিল, শ্যাম ডাকল–মানুমামা না? টর্চ হাতে লোকটা চমকে ফিরে তাকাল-আরে! শ্যাম! এই সিনেমা হলেই যে মানুমামা কাজ করে তা শ্যাম বার বারই ভুলে যায়। মনে পড়ে বেশ কিছুদিন আগে বৃন্দা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে এখানে ছবি দেখতে এসেছিল একদিন, মানুমামার কথা তার খেয়াল ছিল না। সেদিনও মানুমামা সিট দেখিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান মানুমামা সেদিন তাকে চিনবার বা তার সঙ্গে কথা বলবার কোনো চেষ্টা করেনি। তবু সারাক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল শ্যাম। বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল আর কোনোদিন এই হলে আসবে না। কিন্তু এখন এবার সে আধো অন্ধকারে টর্চ হাতে মানুমামার দিকে সহজ চোখে

তাকিয়ে হেসে বলল- কেমন আছো মামু" তারপর কী ভেবে হঠাৎ অনভ্যাসজনিত দ্বিধা ত্যাগ করে নীচু হয়ে মানুমামাকে প্রণাম করল। অন্ততঃ বিশজন লোক এই দৃশ্য দেখল। খুশী হয়ে মানুমামা বলল, তোকে চেনাই যায় না, রোগা হয়ে গেছিস গালে একগাল দাড়ি কি হয়েছে? অমায়িক একটু হাসল শ্যাম, তারপর অবলীলায় বলল, গারদ থেকে বেরোলুম। মানুমামা চমকে ওঠে, কি গারদ? শ্যাম আস্তে করে বলে- পাগলা। মানুমামা একটু ইতস্ততঃ করে-চাকরিটা? শ্যাম বলে গেছে। মানুমামা দরজার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, তুই বোস। আমি পরে এসে কথা বলে যাবো। শ্যাম বসল এবং আপনমনে হাসল। মিথ্যেটুকুর জন্য সামান্য ঘেন্না হচ্ছিল তার, তবু কে জানে হয়তো মানুমামা খুশীই হল। আত্মীয়-স্বজনদের সে বরাবর এড়িয়ে চলে তারাও তাকে ঘাঁটায় না। তার কোনো অমঙ্গল ঘটলে এরা কেউ কেউ খুশী হতে পারে। ইন্টারভ্যালোর পর হল অন্ধকার হয়ে গেল সে একসময়ে চমকে উঠে টের পেল তার ডান হাতে কে যেন একটি ভর্তি ঠোঙা গুঁজে দিচ্ছে। চেয়ে দেখল মানুমামা, বাদাম-চানাচুরের ঠোঙাটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সিটের পাশেই প্যাসেজে উবু হয়ে বসে হাসছে। সে তাকাতেই বলল, বড় ছেলে বিশুটাকে একদিন তোর কাছে পাঠাব। ওর সঙ্গে আমাদের বাসায় চলে আসবি। আমাদের গাড়িয়ায় মস্ত বড় এক তান্ত্রিক আছেন, সব অসুখ সারিয়ে দেন, তোকে দেখিয়ে দেবো। শ্যাম মৃদু হেসে বলল, দেখা যাবে। মানুমামা ভূতের মতোই হলের অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল। শ্যাম গালের দাড়িতে হাত বোলায়। তার জামাকাপড় নোংরা, চোখ ঘোলাটে। কে জানে হয়তো তার দুর্দশা দেখে মানুমামা খুশী হয়নি। কাজেই মানুমামার ভুলটা ভেঙে দেওয়া দরকার মনে করে সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারে আন্দাজে 'মামু-উ' বলে ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার কাঁধের ওপর একখানা ভারীহাত এসে পড়ল-আস্তে , দাদা! সামান্য হাসির শব্দ। ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা গলাও শোনা গেল-মামাকে পরে খুঁজবেন এখন ছবি দেখুন। শ্যাম আস্তে করে বলল, শালা! তারপর চুপ করে অর্থহীন চোখে ছবি দেখতে লাগল। ভেবে দেখল এখন মামুর ভুল ভাঙতে গেলে আরো গোলমাল হয়ে যাবে। আরো ভেবে দেখল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই তার অনেক আত্মীয়-স্বজন জেনে যাবে যে সে পাগল হয়ে গেছে বা গিয়েছিল! অন্ধকারে আপনমনে নিঃশব্দে হাসল শ্যাম, তারপর সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

চাকরি যাওয়ার পর থেকে যে পাইস হোটেলে দুবেলা খচ্ছিল শ্যাম, সেখানে সুবোধ মিত্রের সঙ্গে আলাপ। একদিন রাতে মুখোমুখি খেতে বসে মিত্র বলল-কী মশাই, সংসার-টংসার ছাড়ার মতলব আছে নাকি? দাড়িফাড়ি না কামালে যে বড় উদাসীন দেখায় আপনাকে।

শ্যাম মৃদু হাসে, সংসার কোথায় যে ছাড়াবো?

মিত্র বলে -কেন, আপনার তো মা বাবা আছেন। তাঁদের জন্য এবার একটি ডবকা দেখে দাসী এনে ফেলুন।

-সে তো আপনিও আনাতে পারতেন।

মিত্রকে হঠাৎ খুব গম্ভীর দেখালো। একটু চুপ করে থেকে শ্বাস ছেড়ে বলল- আমার জীবনে একটা ট্রাজেডী আছে মশাই। বলে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিত্র মৃদু হেসে গলা নামিয়ে বলল-আমার মশাই, একটা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল। সে মেয়েটা তার বিয়ের পর অনেক কেঁদেকেটে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যেন বিয়ে না করি। তখন সেন্টিমেন্টের বয়স, তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। কিন্তু এখন..... মিত্র শ্বাস ছেড়ে বলল- এখন ভাবি কী সব-বোকামি! এ সব প্রতিজ্ঞার কোনো দাম নেই, কী বলেন?

শ্যাম মোলায়েম গলায় বলে -দূর দূর.....

মিত্র নিশ্চিন্ত গলায় বলে-কি জানি মশাই, এখনো কেমন যেন খচ খচ করে মনের মধ্যে··

শ্যাম বিস্মিত গলায় বলে-শব্দ হয়?

-অ্যাঁ? অন্যমনস্ক মিত্র কথাটা খেয়াল করল না।

শ্যাম মাথা নেড়ে বলল-কিছু না।

হঠাৎ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে মিত্র বলল—আমার বয়স তেত্রিশ। আমরা মশাই ময়মনসিংহের মিত্র। ঝাড়া হাত পা একটি বোন ছিল, কাঁচড়াপাড়ায় বিয়ে দিয়েছি ছোটভাই সাহারাণপুরে ফিটার ভাল ফুটবল খেলতো। ছিলুম মা আর আমি তা মা মারা গেলে একটি চাকর রেখে চালাচ্ছিলুম সে চুরি করতে শুরু করায় তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে এই হোটেলে জুটেছি, কিন্তু এখন মশাই পেটে সইছে না। তা ছাড়া মা মরে গিয়ে বাসাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে.. বলে একটু দুঃখের হাসি হাসল মিত্র— আমার মশাই দাবী-দাওয়া নেই। একটু দেখবেন তো

এত কথা শুনছিল না শ্যাম। মিত্রের বয়সের কথায় তার মন আটকে ছিল। মিত্রের বয়স তেত্রিশ। তার সন্দেহ হল যে, বিয়ের লোভে মিত্র অন্তঃ সাত আট বছর বয়স কমিয়ে বলছে।

মিত্রের এঁটো ডান হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে এসেছিল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠল শ্যাম, বলল—দেখব। তারপর আঁচাতে গিয়ে বেসিনের ওপর আয়নায় নিজের মুখখানা এক পলকে দেখে নিল সে। তেলতেল করছে তার মুখ, অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি, অনেকদিন তেল বা শ্যাম্পু না দেওয়া রুক্ষ চুলে তাকে পাগলাটে দেখায়। হাত-আয়নায় রোজ সে মুখ দেখে, কিন্তু এই বড় আয়নায় তাকে অন্যরকম দেখায়। তার মনে হয়, দু'চোখে এক ধরনের পরিবর্তন এসে যাচ্ছে।

আঁচিয়ে এসে মৌরি মুখে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ডিসেম্বরের শীতরাত্রির ফুটপাথে সে কয়েকটা ঘুমন্ত ঘেয়ো কুকুরকে ডিঙিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল গাড়িবারান্দার তলায় শুয়ে থাকা জড়োসড়ো কয়েকটি ভিখিরিকে, যেতে যেতে বাড়ির দেয়ালগুলোতে হাত রেখে শিস দিল সে। সামনেই একটা পার্ক—শীত আর ঘণ কুয়াশায় জমে আছে। রেলিঙ টপকে সে ভিতরে ঢুকল। বেঞ্চিগুলি ফাঁকা পড়ে আছে। শ্যাম বসে সিগারেট ধরায়। পায়ের স্যান্ডেল ঘাসের শিশিরে ভিজে গেছে। পা বেয়ে শিরশির করে উঠে আসছে শীত, কুয়াশায় দমচাপা ভাব কাঠ কিংবা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। শ্যাম নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে, ঘড়ির দিকে তাকায় না, তার মন গুনগুন করে ওঠে—উদাসীন, বড় উদাসীন দেখায় তোমাকে শ্যাম!

আকাশে তারা না, মেঘ না, কিছুই দেখা যায় না। শধু ধোঁয়ার মতো কুয়াশা তাকে ঘিরে ধরে। বহুদূর দিয়ে মন্থর বিষণ্ন ট্রাম চলে যাওয়ার শব্দ হয়, টুপ-টাপ করে অন্ধকারে কোথাও গাছের পাতা কি শিশির ঝড়ে পড়ে। দূরে কোনো ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আভা লেগে কুয়াশা সামান্য হলদে হয়ে আছে, এত ক্ষীণ সেই আলো যে, তাতে শ্যামের ছায়াও পড়ে না। শ্যামের মনে হয়, জীবনে সবচেয়ে সুসময় এইটাই যা সে পেরিয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখলে এখন তার মন উচ্চাশার হাত থেকে মুক্ত। তার চাকরি যাওয়ার পর ছ' মাস কেটে গেছে। হাতের জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে ক্রমে। তবু তার কোনো উদ্বেগ নেই। কোনো দুশ্চিন্তাই সে বোধ করছে না। তার পরনে ধুতি শার্ট আর কবেকার পুরোনো একটি এণ্ডির চাদর। ছ'মাস আগে এ পোশাকে বেরোনোর কথা তার কল্পনায়ও আসত না। দুপুরে তার অফিসে ছিল বাঁধা লাঞ্চ রাত্রে খাওয়ার স্থিরতা ছিল না— তা কোম্পানীর মক্কেলদেরই কেউ না কেউ তাকে বড় হোটেলগুলিতে নিয়ে যেতো। না, সে সৎ ছিল না, এখনো সততার প্রতি কোনো মোহ নেই। ইচ্ছে করলে এবং প্রয়োজন হলে এখনো সে যে কোনো কাজ করতে পারে যে কোনো পাপও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখন আর তার ইচ্ছাগুলির কোনোজোর নেই, না আছে কোনো স্পষ্ট প্রয়োজনবোধ। কি করে, কখন কবে তার উচ্চাশাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কি ভাবেই বা কেটে গেছে উদ্বেগ তা সে টেরও পায়নি। নিজেকে বড় উদাসীন মনে হয় তার। হঠাৎ সুবোধ মিত্রের কথা মনে পড়লে সে 'আঃ' শব্দ করে অন্ধকারেই আপনমনে হেসে উঠল। চল্লিশে এসে মিত্র কাঙালের মতো বিয়ের কথা পাড়ছে এলোপাথাড়ি পাইস হোটেলে মুখোমুখি খেতে বসে। ইচ্ছে করে মিত্রের কাছে গিয়ে সে তার প্রেমের কাহিনীগুলি শুনিয়ে আসে। হ্যাঁ মশাই, সে সব মেয়ের কথা আপনি ভাবতেও পারবেন না। বৃন্দাকে প্রথম দেখি পার্ক স্ট্রীটের এক রেস্তরায় সঙ্গে ভালমানুষ গোছের একটি প্রেমিক ছেলে। দু'বার ঠিক দু'বার সে তাকিয়েছিল আমার দিকে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—যেদিক থেকে আমার মুখশ্রী সবচেয়ে ভাল দেখায়,

সেই দিকটাই ফেরানো ছিল তার দিকে; হ্যাঁ মশাই, বাঁ দিক থেকেই আমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। আমি তারপর সোজা উঠে গেলুম তাদের টেবিলের কাছে বৃন্দার দিকে চোখ রেখে আমি ছেলেটার দিকে হাত বাড়ালুম-দেশলাইটা। বিরক্তির সঙ্গেই বোধ হয় ছেলেটি দেশলাই এগিয়ে দিলে। অপ্রয়োজনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমি বৃন্দার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলুম। সেই হাসি আমি শিখেছিলুম কলকাতার সবচেয়ে সেরা বদমাশদের কাছ থেকে। অনেক বার ও রেস্তোরাঁ ঘুরে তা আমাকে শিখতে হয়েছিল। তার পরদিন বৃন্দা সেই রেস্তোরাঁয় এসেছিল একা। কি করে সে তার প্রেমিক সঙ্গীটিকে কাটিয়ে এসেছিল তা আমিও জানি না। হ্যাঁ মশাই, তারপর বৃন্দাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পেরেছিলুম। কিংবা মাধবীর কথা ধরা যাক-যাকে আমি প্রথম দেখি এক ফিল্ম ক্লাবের শোতে। যার নীল রঙের প্লিমাউথ গাড়িটাকে আমার ভাড়াটে ট্যাক্সি বাঘের মতো তাড়া করেছিল। তারপর মাধীবকেও একদিন -হ্যাঁ মশাই, তারপর মাধবীও একদিন বলেছিল-দিন দিন তুমি কী হয়ে যাচ্ছো শ্যাম, তুমি ইতরের মতো তাকাতে শিখেছো-বলতে বলতে সে তার নরম মেরুদন্ড পিছনে হেলিয়ে ভেঙে দিয়েছিল সবুজ ডিভানে। তবু বলি, আমার মন ছিল হাঁসের শরীর। আমার শরীরের ভিতরে ছিল বিশুদ্ধ বাতাস, আর উজ্জ্বল রক্ত। কোনোদিন কখনো কোনো মেয়ের জন্য আমি হাঁটু ভেঙে প্রার্থনায় বসিনি। বলিনি-দয়া করে আমাকে ভালোবাসো। কেননা তার দরকার ছিল না। শুধু ঐ মেয়েটি, ঐ আটপৌরে ইতু কোনোদিনই বিয়ে করার কথা ভুলতে পারল না। যেমন পারেননি আপনি। কেমন সেই মেয়ে যার প্রেমে আপনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত টিকে গেলেন। প্রেমের নামে আমি মশাই শিস দিই, আমার চোখ ইতর হয়ে যায়, আমার ঠোঁটে ফুটে ওঠে সেই হাসি। আমি প্রেম ঐরকম বুঝি মশাই। আমার কেবল ভয় ঐ আটপৌরে মেয়েদের চারদিন কথা বলার পর যারা পাঁচদিনের দিন মিনমিন করে বলে-বাবা বলছিল, ছেলেটাকে একবার নিয়ে আসিস তো খুকী, দেখব। হ্যাগো মিত্তিরমশাই, আপনার জুলিয়েটটি কেমন ছিল? ঐ রকম আটপৌরে তো, শেষ পর্যন্ত দেখুন এত বয়সেও আপনাকে হাফ-সন্ন্যাসী! করে রেখে গেছে! বিয়ে করবেন? তা আপনার কপালে ঐ রকম আটপৌরেই জোটার সম্ভাবনা যে আর-একজন সন্ন্যাস বানিয়ে আপনার ঘর করতে আসবে নিশ্চিন্ত মুখে। তার সেই প্রেমিকের স্মৃতি তার চন্দনের হাতবাক্স, বা গোপন চিঠির মতো মাঝে মাঝে পানের বাটার সামনে বসে বা ছেলে মানুষ করতে করতে মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখবে। ঈশ্বর! আমার ভাগ্য ভাল যে, আমার শরীরের ভিতরে এখনো রয়েছে বিশুদ্ধ বাতাস আর উজ্জ্বল রক্ত। কখনো কোনো মেয়ের জন্য আমি হাঁটু গেড়ে বসিনি প্রার্থনায়। আমার মন মশাই হাঁসের শরীর। হ্যাঁ, চমৎকারভাবেই আমি এতকাল মেয়েদের ব্যবহার করে এসেছি। আঁচলের গেরোয় বাঁধা পড়িনি। আমি নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ। আজ আমার দূরবস্থা দেখে ভাববেন না। সেই তরমুজ বিক্রেতার কথা ভেবে দেখুন যে বলেছিল- আমরা কি ভগবানের হাত থেকে কেবল ভালটাই গ্রহণ করব, মন্দটা নয়? তা আমার অবস্থা এমন কি খারাপও নয়। চাকরি নেই, কিন্তু যে কোন সময়ে চাকরি হয়ে যেতে পারে। দরকার একটু ঘোরাঘুরির উৎসাহ। দাড়িটা যদি কামাই, ছ'মাস আগেকার প্যান্ট শার্ট টাই যদি গায়ে দিই, আর চোখের সেই অভ্যস্ত চাউনি আর হাসিটা যদি দু-একদিন অভ্যেস করে নিই, তবে অল্পদিনেই আবার আমার চারদিকে চাঁদের জেল্লা লেগে যাবে। হায়, শুধু কেবল কেন যেন উৎসাহ পাই না আর! আঃ আমার হাই উঠছে।

বাস্তবিক শ্যামের হাই উঠছিল। কুয়াশা আরো একটু ঘন হয়েছে। তার শীত করতে থাকে। দূরে কোথাও ফুটপাথে পাহারাওয়ালার লাঠি ঠোকার আওয়াজ হচ্ছে। ঘড়ি এই আলো-আঁধারিতে দেখা যায় না, সে সময় আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না। কুকুর কাঁদছে, শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠের একটু গান। শ্যাম উঠে পড়ল।

সেই রাত্রে শ্যাম ছোট হাত-আয়নায় তার মুখখানা পবিত্র গ্রন্থের মতো পাঠ করল রাত জেগে জেগে। উদাসীন! বড় কি উদাসীন দেখায় আমাকে! ভাবতে ভাবতে শ্যাম হেসে উঠল। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। তারপর অতর্কিতে ঘুমিয়ে পড়ল আলো না নিভিয়ে।

শীত এসে গেছে। কলকাতার স্বল্প স্থায়ী শীত। বাতাসে শৌখীন ঠাণ্ডা ভাব। রোজ সকালে অল্প কুয়াশা হয়,রোদের রঙ থাকে লাল। আগে যখন সাড়ে আটটায় অফিসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়তে হত, সেই তখনকার পুরোনো অভ্যাসমতোই সকালে ঘুম ভেঙে যায় শ্যামের। ভোরের জানালার দিকে সে এক পলক চেয়ে দেখে, তারপর আবার চোখ বুজে বালিশ আঁকড়ে ধরে চোখের ওপর লেপ টেনে আলো ঢেকে দেয়। শরীরের ভিতরে জ্বরভাব, শীত আর সামান্য মাথাধরা নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। শরীর তাজা রাখার জন্য সে আগে ভোরে উঠে সামান্য ফ্রি-হ্যাণ্ড ব্যায়াম করত, কয়েকটা বেন্ডিং আর তিন চারটে আসন। সে কথা ভাবতেই এখন ক্লান্তিতে হাই ওঠে তার। চোখ বুজে সে পুরোনো শ্যামকে দেখতে পায়। দেখে, সে মেঝেতে ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ডন মারছে, কখনো নীচু হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, কখনো বা বাতাসে ঘুষি ছুঁড়েতে ছুঁড়তে অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ফিরছে ঘরময়। সেই ঘুষিতে একবার রূপশ্রী ফার্নিশার্সের ওয়ার্ডরোবটার একটা পাল্লা চোট খেয়েছিল আর দেয়ালের দুর্বল একটা জায়গায় চুনাবালি খসে পড়েছিল বলে বড় খুশী হয়ে ছিল শ্যাম। পুরোনো সে শ্যামের শরীর নিয়ে এই সব অর্থহীন নাড়াচাড়া মনে করে সে হাসে, তারপর দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শোয়। শরীরের ওপর বড় মায়া ছিল শ্যামের সবসময়ে নিজেকে সে চোখে চোখে রাখত। সে খুব সতর্কভাবে রাস্তা পার হত, সুন্দর ভঙ্গীতে সিঁড়ি বেয়ে উঠত কিংবা নামত, সুন্দর ভঙ্গীতে টেলিফোন তুলে নিত কানে–সবকিছুতেই তখন বড় মনোযোগ ছিল তার। যেন কখনো কোনো সময়েই তাকে কুৎসিত না দেখায়।

লেপের ভিতরে একটা খোঁদল তৈরি করে শুয়ে থাকে শ্যাম। আস্তে আস্তে বেলা গাড়িয়ে যায়। খোঁদলের ভিতর তার নিঃশ্বাস আর গায়ের তাপ জমে ওঠে। মুখের ঢাকা সরালে চোখে আলো এসে ঘরময় পায়চারি করে। মাঝে মাঝে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে। ঘরেই রয়েছে তার চায়ের সরঞ্জাম–কেরোসিন স্টোভ, কেটলী চা, চিনি, দুধের কৌটো। চাকরির সময়ে সে সকালের সামান্য অবসরেই চা তৈরী করত, ডিম সিদ্ধ করে খেয়ে নিত। এখন আর তার অত সময় নেই। গত কয়েক মাসে কৌটোর চায়ে ছাতা ধরেছে বোধ হয়, হয়তো পচে গেছে টিনের দুধ– সে খুলে দেখেনি। এখন ইংরিজি খবরের কাগজখানা মেঝের পায়ের নীচে লুটোপুটি খায়, আগে সেখানার কদর ছিল–সকালে আগাপাশতলা চোখ বুলোতো, রাত্রে ফিরে কখনো কখনো ভাল করে খুঁটিয়ে পড়ত।

বেলা আর একটু বাড়লে সে হোটেলের দিকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সোজা চলে যায় দুপুরের ফাঁকা কোনো বাস বা ট্রাম টার্মিনাল বা স্টপে। চেনাশোনা লোকের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। হলেও শ্যাম এড়িয়ে যেতে পারে। তার গালে দাড়ি, চুল বড় বড় এবং ভাগ্যক্রমে সে অনেকটা রোগা আর কালো হয়ে গেছে, হাঁটাচলার ভঙ্গীও পাল্টে ফেলেছে অনেকটা, তা ছাড়া সে ভেবেচিন্তে একটা রোদ-চশমা কিনে নিয়েছে। সব মিলিয়ে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক তার ছদ্মবেশ। এই আড়াল থেকে সে মাঝে মাঝে দু'-একজন চেনা মানুষকে অসতর্ক অবস্থায় দেখে নেয়। একদিন মাধুকে দেখল শ্যাম। দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে মাধু চর্বিতে থলথল করছে শরীর এই শীতেও ঘামছে। ঘামে আর চর্বিতে নাকের ভারী চশমাটা পিছলে নেমে এসেছে অনেকটা। পায়ের একটা স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, সেই ছেঁড়া চটি হাতে নিয়ে খুবই বিপন্ন আর চিন্তিত মুখে ট্রামের সীটে বসে আছে মাধু। আরো লক্ষ্য করল শ্যাম –মাধুর গায়ে নতুন মটকার পাঞ্জাবি ধোয়া ধুতি পরনে, কাঁধে শাল,আর শালের নীচে শান্তি নিকেতনী ঝোলা ব্যাগ। বছরখানেক আগে যখন দেখা হত, তখন বাইরে মফঃস্বলের কোথাও মাস্টারী করত মাধু তখন ওর মায়ের ক্যান্সার, প্রায়ই কলকাতায় ছোটাছুটি করতে হত। শ্যামকে কতবার বলেছে মাধু–আমাকে কলকাতায় একটা চাকরি জুটিয়ে দে শ্যাম, মফঃস্বলে লাইফ নেই। তা ছাড়া আমার মায়ের ক্যান্সার বিশুষ্ক আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখতো মাধুকে, এড়িয়ে যেতো শ্যাম। ভিড়ের ভিতরে রড ধরে দাঁড়িয়ে [illegible] মাধুকে শ্যামের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারত না চাকরনাকরের মতো ব্যবহার

করত। মৃদু হেসে তাই মাধুকে এড়িয়ে যেতো শ্যাম। ভীড়ের ভিতরে রড ধরে দাঁড়িয়ে বিকেলের ট্রামে মাধুকে ভাল করে লক্ষ্য করছিল শ্যাম। মাধুকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল–শুধু স্ট্র্যাম-ছেঁড়া চটিটার জন্যেই যা একটু চিন্তিত বোধ হয়। ধার দিয়ে শ্যামের মনে থাকে না, ধার নিয়েও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাধুর কাছে তার পঁচিশটা -টাকা পাওনা আছে। মনে হচ্ছে, মাধুর অবস্থা এখন ভালই। মাধুর কাছে টাকাটা চেয়ে বসলে কেমন হয়? ভাবতেই হাসিতে তার গা শিরশির করে উঠল। একট্রাম ভিড়ের মধ্যে বেশ গলা ছেড়েই টাকাটার কথা বলা যাবে। ভেবে ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে সামান্য এগিয়ে গিয়েছিল শ্যাম হঠাৎ মাঝপথে থেমে সে নিশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দিল–শালা হারামী বিট্রেয়ার। কেননা মাধুর পাশে জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছে সুন্দর কটকী ছাপের শাড়ি পরা অল্পবয়সী একটি বউ–মাধুর বউ সন্দেহ নেই। ভিড়ে এতক্ষণ বৌটি আড়াল ছিল। জানালার কাঠে কনুইয়ের ভর হাতের চেটোয় রেখেছে মুখ, সে মুখ জানালার দিকে ফেরানো। শ্যাম গলা বাড়িয়ে দেখছিল । খেয়াল ছিল না, তার খোঁচা দাড়ির ঘষা লাগল মোটা মত একটা লোকের ঘাড়ে। লোকটা মুখ ফিরিয়ে নীরবে চোখ দিয়ে একটা ধমক দিলে শ্যাম সামান্য পিছিয়ে আসে। বস্তুতঃ মাধুর মা যে আর বেঁচে নেই, তা মাধুর তপ্ত মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আর ঐ বউটা বোধ হয় মাধুর মায়ের শেষ ইচ্ছে। ছেলের বউ না দেখে মরবেন না এরকম একটা বায়না ধরছিলেন বলেই বোধ হয় মাধু তাড়াহুড়ো করে বিয়েটা করে ফেলেছে। নইলে ওর যা রোজগার তাতে বিয়ে করার কথা নয়। অবশ্য, মা মরে গিয়ে থাকলে এখন মাধুর খরচ কিছুটা বাঁচছে। কে জানে, হয়তো মা মরে যাবে হিসেব করেই সামান্য ঝুঁকি নিয়ে বিয়েটা করেছে ও। শ্যাম আবার মনে মনে বলল–শালা বিট্রেয়ার। অকারণেই মাধুর ওপর তার রাগ হচ্ছিল। ঠাণ্ডা মাথায় সে ভেবে দেখল এখন মাধুকে দু'ভাবে বিপদে ফেলা যায়। সোজা ওর কাছে গিয়ে বলা যায়–আরে মাধু!

ভীষণ চমকে উঠে তাকে দেখে অস্বস্তির হাসি হাসবে মাধু–ম্যাম! ইস্, তোকে চেনাই যায় না! তারপর......?

–তুই একটু মুটিয়েছিস। বলেই হেসে চোখের ইঙ্গিত করবে শ্যাম, বউটিকে দেখিয়ে ভ্রূ নাচাবে– কে?

–এ হেঃ, তোকে খবর দিইনি বুঝি! এ হচ্ছে মাধুরী, আমার বউ। তারপর প্রায় জলে পড়ে গিয়ে বউয়ের দিকে মুখ নামিয়ে বলবে মাধুরী–, এই শ্যাম, আমার বন্ধু। এর কথা–তারপর শ্যামের দিকে ফিরে বলবে, তোর অফিসে কিন্তু খবর দিতে গিয়েছিলাম। ওরা বলল তোর চাকরি গেছে।

ব্যস, ওটুকুতেই শ্যাম ওকে অপমান করার যথেষ্ট কারণ পেয়ে যাবে। সকলের সামনে ও তার চাকরি যাওয়ার কথা কেন বলল? তখন সে মৃদু হেসে বলবে–হ্যাঁ, গেছে। বড় কষ্টে আছি ভাই। তারপর গলা সামান্য খাটো করবে শ্যাম এমনভাবে, যেন বউটি এবং কাছাকাছি কয়েকজন শুনতে পায়–মাধু, তোর কাছে যে টাকাটা পাওনা আছে–

–মাধু, বিপন্ন মুখে–কোনটা বল তো!

–ঐ যে বে শালা, গত শীতে এক রাতে মাল খাবি বলে নিয়েছিলি! মনে নেই? বলতে বলতে শ্যাম লক্ষ্য করবে বউটি নড়ে উঠল একটু।

মাধু ভীষণ ভয় পেয়ে বলবে–আমি?

হ্যাঁ রে শালা, এক শনিবার, তুই রেসের মাঠে পঁয়ষট্টি টাকা হেরে গেলি! পবননন্দন আর টিটানির ওপর ডাবল ধরেছিলি–মনে নেই! তারপর খালাসিটোলা–

জীবনে মদ খেয়েছে মাধু–এমন মনে হয় না। তবু শ্যাম জানে এ সব কথা চাপা দেওয়ার জন্যেই কাষ্ঠহাসি হেসে মাধু বলবে–ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যাম কী রোগা হয়ে গেছিস! একদিন আয় না, কলকাতাতেই বাসা করেছি এখন, এখানেই চাকরি।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম বলবে–যাবো। ঠিকানাটা–?

বিমর্ষ মুখে মাধু ঠিকানা বলে যাবে, বলবে–টুইশ্যানির জ্বালায় ঘরে থাকা যায় না রে ছুটির দিনে আসিস। আগে খবর দিবি, নইলে সিনেমা–টিনেমায় হয়তো গেলুম–

বস্তুতঃ ঠিকানা দিয়ে মাধু আর এক ধরনের বিপদে পড়বে। মৃদু বিষের মতো সেই বিপদ। কেননা মাধু দেখেছে কেমন কৃতিত্বের সঙ্গে অনায়াসে মেয়েদের ব্যবহার করে শ্যাম। তাছাড়া শ্যামের না আছে বাছবিচার, না আছে ধর্মবোধ। ঠিকানা দিয়ে তার সেই ভয় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বউটি ঠিকঠাক সতী হলেও কোনো লাভ নেই। বউকে বিশ্বাস করবে এমন মনের জোর মাধুর কোথায়?

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠল শ্যাম। কাছাকাছি লোকেরা তার দিকে চেয়ে দেখল। মাধু নেমে গেল কালীঘাটে, গোয়ালন্দের স্টীমারের মতো ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এক হাতে সসঙ্কোচে ধরে থাকা ছেঁড়া চটি, পিছনে বউ। তার দিকে ফিরেও তাকাল না। বউটির ঘোমটার পাড় শ্যামের থুঁতনি ছুঁয়ে গেল। নেমে দাঁড়াতে একটু গলা বাড়িয়ে দেখল শ্যাম–বউটা মাধুর সমান লম্বা। স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে ট্রাম, এ সময়ে শ্যামের মনে হল, একটা কিছু করলে হত। তার সামান্য আফসোস হচ্ছিল। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটা। শ্যামের ইচ্ছে হচ্ছিল তার ঘাড়ে আর একবার দাড়ি ঘষে দেয়। তারপর এক সময়ে সে মনে মনে মাধুকে মুক্তি দিয়ে বলল–তুই আরো সুখী হয়ে যা মাধু, তুই আরো মোটা হয়ে যা। তোকে পঁচিশ টাকা ছেড়ে দিলুম। আশীর্বাদ করছি, তোকে যেন বেশী হাঁটতে না হয়, যেন কাছাকাছিই তুই একটা মুচি পেয়ে যাস। মনে মনে এই কথা বলে খুব তৃপ্তি পেল শ্যাম।

আর –একদিন হঠাৎ ডবলডেকারে কলেজ স্ট্রীট পেরিয়ে যেতে যেতে দোতলা থেকে শ্যাম একঝলক দেখতে পেল আরপুলি লেনের মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মিনু দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে একটা শেয়াল রঙের পুলওভার, পরনে কালো চাপা একটা প্যান্ট, পায়ে হকিবুট। বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত, একটা হাঁটু ভাঁজ করা–পা পিছনের দেয়ালে তোলা, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে মিনু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শ্যাম জানে মুহূর্তেই ঐ ভঙ্গী মিনু বদলে ফেলতে পারে, শরীরের ভাঁজ খুলে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার কালো লম্বা চেহারাটা লকলক করে ওঠে। একঝলক মিনুকে ঐভাবে দেখে শ্যামের মন 'মিনু' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। নামবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল। তারপর দেখল বাসে বেজায় ভিড়, নামতে নামতে সে আরো দুটো স্টপ ছাড়িয়ে যাবে। তারপর পিছু হটে এসেও যে মিনুকে ঐখানে পাওয়া যাবেই তার কোনো স্থিরতা নেই। তা ছাড়া দেখা হলেও সবসময়ে লাভ হয় না। হাতে কাজ থাকলে তাকে চিনবেই না মিনু। অল্প একটু হেসে হয়তো বলবে, 'আরে শ্যাম! আজ তুই কেটে পড়, আমার কাজ আছে।' 'কি কাজ!' মাথায় সামান্য আঙুল চালিয়ে ঠাণ্ডাগলায় বলবে মিনু, 'ঝামেলা হবে এক্ষুণি। তুই কেটে পড়।' এ সব কথা যখন বলে মিনু তখন তার গলার স্বরে এক ধরনের চমক লক্ষ করছে শ্যাম। হঠাৎ মনে হয় মিনুর গলায় মাইক্রোফোন লাগনো আছে। স্বর খুব উঁচু নয়,তবু মনে হয় তা খুব গভীর কুয়োর ভিতর থেকে আসছে। ঐ স্বর শুনে যে-কোন লোকের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠতে পারে।

মিনুর সঙ্গে একবার দেখা বছর আট-দশ আগে। তখন শ্যাম ছোট্ট একটা কোম্পানীতে দুশো টাকার একটা সামান্য কাজ করে। এক তারিখে মাইনে পেয়ে সে ভিড়ের বাসের দরজায় ঝুলে ফিরছিল। কালীঘাটের স্টপে বাস থেমে ছাড়ার মুহূর্তে শ্যাম অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। বাস ছেড়ে দিল। কিন্তু শ্যামা টের পেল ভিড়ের মধ্যে লোহার মতো শক্ত একখানা হাতের পাঞ্জা তার কনুইয়ের ওপর চেপে ধরেছে। পরমুহূর্তেই সেই হাতখানা তাকে বাসের হাতল থেকে ছিঁড়ে আনল। কার মাথায় শ্যামের দাঁত ঠুকে গেল, আর একখানা কনুই লাগল বুকে। দরজার লোকেরা চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাসটা থামতে থামতেও থামল না। বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় শূন্যে হাত তুলে টাল খেয়ে ঘুরে ফুটপাথে আছড়ে পড়ে যাচ্ছিল শ্যাম। কিন্তু যে তাকে ধরেছিল সে তাকে পড়ে যেতে তাই দিল না। দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যথায় চোখে জল

এসে গিয়েছিল শ্যামের, মাথার ভিতরে ধোঁয়াটে ভাব। তাই সে কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না যে, কে তাকে টেনে নামিয়েছে। তারপর অবশেষে সে মিনুকে দেখতে পেল। শীতকালে মিনুর সেই মার্কমারা পোশাক–শেয়াল রঙের পুলওভার আর কালো চাপা প্যান্ট। মিনু হাসছে। দু'-একজন চলতি লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই মিনু তার হাত ধরে একটু দূরে নিয়ে গেল। মুখোমুখি দাঁড়ালে মিনু তার দীর্ঘ লোহার রডের মতো শক্ত ডান হাতখানা শ্যামের কাঁদে আলতোভাবে রেখে নিঃশব্দে হাসল, তোর লেগেছে শ্যাম? শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ল–না। আবার নিঃশব্দে হেসে ডান হাতখানা খুব ধীরে ধীরে তার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে মনে হয় দু'পা মাটিতে পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে, একটুও নড়ানো যাবে না। এমনিতে মিনুর চোখ সুন্দর–টানা, ভাসা ভাসা। চোখের পাতায় অর্ধেক ঢাকা আধ–ঘুমন্ত চোখে উদাসীন বিরাগ নিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে। কিন্তু যখন কখনো হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর মিনু তাকায়, তখন এক পলকে ওর চেহারা পালটে যায় দয়াহীন, নিষ্ঠুর মিনুকে তখন আর চেনা যায় না। অল্প ভ্রূ কোঁচকানোর ভিতর দিয়ে মিনু প্রায় ম্যাজিক দেখাতে পারে। শ্যাম তখন ভাল ছেলে। তাই সামান্য অস্বস্তি নিয়ে মিনুর সেই শান্ত, আধখোলা, আধ–ঘুমন্ত চোখের দিকে চেয়ে রইল। সে স্পষ্টই বোঝাতে চেয়েছিল–আমি খুশী হইনি... তোকে দেখে খুশী হইনি মিনু।

অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে শ্যামের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মিনু বলল, আজ এক তারিখ, তোর কাছে আজ অনেক টাকা আছে না শ্যাম বুঝতে পারছিল ছেলেবেলার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যই যে মিনু তাকে বাস থেকে টেনে নামিয়েছে তা নয়। মিনুর সঙ্গে দেখা হলে শ্যাম যে খুশী হয় না তা বোধ হয় মিনু জানে। বস্তুতঃ তাদের আর বন্ধু বলা যায় না। শ্যাম তাই মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। অকারণেই একটা ভয় পেয়ে বসছিল তাকে। বিকেলের রাস্তায় অনেক লোক রয়েছে তাদের চারপাশে তবু শ্যামের নিজেকে বড় একলা মনে হচ্ছিল। মিনুকে কী ভীষণ ঢ্যাঙা আর কালো দেখাচ্ছে! শ্যাম মিনুর মুখের দিকে চোখ রেখে অল্প মাথা নেড়ে বলল, আজ মাইনে পেয়েছি।

মিনু দুই পকেটে হাত রেখে কাঁধ দুটো অল্প তুলে আবার নিঃশব্দে হাসল, জানতুম। তাই তোকে ও বাসটায় যেতে দিলুম না। বাসটা গরম ছিল। 'গরম' কথাটার অর্থ শ্যাম যে একেবারে বোঝে না তা নয়। তবু চুপ করে চেয়ে রইল। মিনু সস্নেহে হেসে বলল, ও বাসে যে ছোকরারা ছিল তারা আমার চেনা, ওদের হাত খুব পরিষ্কার, তুই টেরও পেতিস না। শুনে শ্যাম চকিতে তার পকেট দেখাবার জন্য হাত বাড়াতেই মিনু হাত তুলে হাসল–ভয় নেই। সব ঠিক আছে। আমি দেখে নিয়েছি। মিনুর অলস, নিস্তেজ উদ্দেশ্যহীন চোখের দিকে চেয়ে শ্যাম হেসে ফেলল–ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি! কী চোখ তোর! বস্তুতঃ তখন শ্যামকে দেখছিল না মিনু, কিছুই দেখছিল না। তবু শ্যাম বুঝেছিল মিনু কতদূর দেখে, কতদূর দেখতে পায়। মিনু হাসে, ফিকে নিঃশব্দ হাসি। সে হাসিতে কোনো ইচ্ছে বা প্রাণ নেই। শ্যাম হঠাৎ টের পাচ্ছিল, যদিও তার টাকা ক'টা মিনুর জন্যই আজ বেঁচে গেল, তবু তার ভিতরে এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ জাগছে না। মিনুকে সত্যিই আর ভালবাসে না বলে শ্যাম মনে মনে লজ্জা পেল। এ উচিত নয়, এ রকম হওয়া উচিত নয়। এই বিশ্রী ঠাণ্ডা সম্পর্ক কাটিয়ে দেওয়ার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলল–মিনু, চা খাবি? চল, তোর সঙ্গে অনেককাল কথাবার্তা হয় না।

শ্যামের কথা শুনছিল না মিনু। সে হঠাৎ শ্যামকে ভুলে গিয়ে উপেক্ষা করে চকিতে ঝলসানো চোখে ডাইনে বাঁয়ে আর পিছু ফিরে কি যেন বিদ্যুৎগতিতে দেখে নিল। পরমুহূর্তেই আবার অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাসল মিনু, পুলওভারটা টেনে কোমরের চওড়া বেল্টের যে সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল তা ঢেকে দিল। বলল–আমি একা নই শ্যাম, আমার সঙ্গে লোক আছে। শ্যামের বুকের ভিতরে আবার গুরগুর শব্দ হচ্ছিল। মিনুর পিছনে হলদে রঙের গীর্জা বাড়ি, সামনেই বাস–ষ্টপে লোকের ভিড়, একটু সামনে একটা পার্ক–শীতের নিষ্পত্র গাছে কাক বসে

আছে, ধুলো-ময়লা মাখা ক্লান্ত মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোথায় রয়েছে মিনুর লোকেরা, তা ভেবেও পেল না শ্যাম। সে জিজ্ঞেস করল–কোথায় তোর লোক? মিনু আবার হাসে, ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে তুই দেখতে পাবি না। তার চেয়ে চল, তোকে এগিয়ে দিই, একটা ঠাণ্ডা বাসে উঠে চলে যাবি। শ্যাম বুঝতে পারছিল মিনুর একটা আলাদা সমাজ আছে, যেখানে সে শ্যামের মতো নীতিপরায়ণ লোকদের একেবারেই পাত্তা দেয় না। সেখানে সে মিনুর কাছে শিশু। ছেলেবেলায় মিনুর সঙ্গে তার কত গোপন কথার অংশীদারী ছিল। আর এতদিনে তার এবং এই প্রায় অচেনা মিনুরও আরো কত গোপন কথা তৈরি হয়ে গেছে, যার খবর কেউই আর রাখেনা। তবু শ্যাম চলে যেতে পারছিল না। তার মনে হল মিনুকে আরো কিছু ভাল কথা বলা দরকার যাতে মিনুর ভাল হয়। সে বলল, মিনু, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। মিনু ভ্রূ কুঁচকে বলে, কি কথা! শ্যাম বিকারহীন গলায় বলে, আছে। মিনু ওর দুটি চোখের গভীর পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। একদিন তোর বাসায় যাবো। মাংস রাঁধবো দু'জনে। তারপর সারা দুপুর তোর কথা শোনা যাবে। শ্যাম মিনুকে দেখছিল না, সে লক্ষ্য করল অদূরে রাস্তার মোড়ে গীর্জার বাইরে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক পাশাপাশি। তারা একবারও মিনু বা তার দিকে তাকাল না, চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তাদের পরনে সাধারণ ধুতি আর শার্ট, শার্টের হাতা গোটানো। হঠাৎ দেখে কিছুই মনে হয় না, সাধারণ চেহারার দুটি লোক। কিন্তু কেন যেন ওদের কোথাও মিল আছে। ওদের ঐ অলস ভঙ্গী লোককে দেখানোর জন্য। আসলে কোনো কাজে ওরা ভয়ঙ্কর রকমের নিপুণ। হঠাৎ শ্যাম মিনুর দিকে চেয়ে হাসল, তোর সঙ্গে ক'জন লোক মিনু? ঐ দুজন তো! বলে আঙুল তুলে লোক দুটোকে দেখায় শ্যাম। তড়িৎগতিতে মিনু তার দীর্ঘ শক্ত হাতে শ্যামের হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে, আঙুল দেখাস না। সামান্য চঞ্চল দেখায় মিনুকে, তবু সে মুখে হাসি টেনে বলে, ওই দু'জন। আরো চারজন আছে। তোর বেশ চোখ আছে শ্যাম! কিন্তু এবার তুই বাড়ি যা। শ্যাম সামান্য মজা পেয়ে হেসে উঠে বলল, দাঁড়া, মিনু। তারপর যেন মিনুর দেওয়া কোনো ধাঁধার উত্তর খুঁজছে ঠিক এভাবে সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলে, আরো চারজনকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব। মিনু শক্ত হাতে তার কাঁধ ধরে বলল, তোকে খুঁজতে হবে না, আমার সঙ্গে একটু হেঁটে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে তার দিকে পিছু ফিরে মিনু হেঁটে যেতে লাগল দীর্ঘ শ্লথ পায়ে। শ্যাম পিছু নিল। দু-চার পা হেঁটেই মিনু দাঁড়াল, পিছু ফিরে শ্যামকে বলল–দ্যাখ। শ্যাম মিনুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কোথায়! মিনু মাথা হেলিয়ে রাস্তার ওপারে ফুটপাথটা দেখিয়ে বলল, ও পাশে চায়ের দোকানটার সামনে দ্যাখ দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বেঁটে, গায়ে সুরকি রঙের পুলওভার, প্যান্টের পকেটে হাত, অন্যজন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান, গায়ে গোল-গলা গেঞ্জী, পরনে আমার মতো কালো প্যান্ট। শ্যাম আস্তে আস্তে বুঝতে পারে বিশেষ কারো জন্যে এই ফাঁদ পাতা হয়েছে। তার হাত পা অবশ হয়ে আসে, তবু প্রাণপণে নিজের গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, আর দুজন? মিনু লম্বা মাপা পায়ে সরে গেল, এদিকে আয়। যেভাবে লোকে নিজের ঘরবাড়ি নতুন অতিথিকে দেখায় তেমন স্বাভাবিক ভঙ্গী তার। পার্কটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মিনু দেখাল পার্কের গায়ে একটা গলি। নিঃশব্দে আবার হাসে মিনু, যাকে ধরা হচ্ছে আজ সে ঐ গলিতে থাকে। গলির মুখে দ্যাখ একটা ট্যাক্সি, মিটার ডাউন করা। পিছনের সীটে একজন, তাকে এখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। গভীর শ্বাস টেনে শ্যাম বলে, আর একজন? মিনু মাথা নাড়ে, আর একজন এখানে নেই, সে আমাদের মক্কেলকে নিয়ে আসতে গেছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনবে। শ্যামের মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগে, থরথর করে কাঁপে তার পা। মনে হয় এই খানে এই ভিড়ের মধ্যে মিনু অলক্ষ্যে এক স্টেজ খাড়া করেছে, যেখানে এক্ষুণি একটা নাটক হবে; কিংবা নাটকও নয়, কেননা মিনুর এইসব ব্যাপার নিশ্চিত কিছু সত্যিকারের রক্তপাত ঘটে যায়। তবু কাষ্ঠ-হাসি হেসে সে বলে, মিনু, তোরা কাকে ধরছিস? মিনু হাসে না আর; তার ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, তীব্র চোখ তবু তাকে এই মুহূর্তে খুব ভয়ঙ্কর দেখায় না। যেন। খানিকটা অসহায়ের মতো ঠোঁট উল্টে বলে, কি জানি! তাকে চিনিও না। শ্যাম যেন আপন

মনেই নিজেকে প্রশ্ন করে,তবে? মিনু তার কপালের ওপর একটা চুলের ঘুরলি আঙুলে জড়ায়, কেমন অন্যমনস্ক এবং আবার উদাসীন দেখায় তাকে। কিছুক্ষণ পরে সে শ্যামের দিকে চেয়ে বলে, বাড়ি যা শ্যাম। আবার দেখা হবে। শ্যাম কোনো কথা না বলে মিনুর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে, কিছুদূর গিয়ে কেমন চমকে সে ফিরে তাকায় , মিনু তার দিকে চেয়ে আছে। অস্বস্তির চোখ। শ্যাম ফিরে আসে আবার, মিনু, এই দু'জন তোর বন্ধু? যেন বা সে প্রশ্ন করতে চায়-এই দু'জন মিনুর কেমন বন্ধু, যেমন বন্ধু সে একদিন মিনুর ছিল! মিনু সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে দেখে, তারপর মাথা নেড়ে জানায়-হ্যাঁ। শ্যামের কেমন বমি বমি করছিল, সব কিছু ভাল করে লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থা ছিল না, তবু সে লক্ষ্য করল মিনুর মুখে চোখে একটা অসহায় দ্বিধার ভাব। শ্যাম মাথা নেড়ে মিনুকে জনাল যে, সে বুঝতে পেরেছে। তারপর বলল-আচ্ছা মিনু ,চলি। মিনু আস্তে মাথা নাড়ে-আচ্ছা। শ্যাম বলে-তাহলে একদিন আসছিস তো! ছুটির দিনে আসিস। মিনু মাথা নাড়ে আবার হ্যাঁ। তারপর হেসে ঠাট্টার ছলে বলে, যদি ততদিন থাকি। এই কথাটুকুই যেন ধাক্কা দিয়ে শ্যামকে মিনুর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। সে দ্রুত বাস-স্টপের দিকে হাঁটতে থাকে। পিছু ফিরে আর তাকায় না।

গীর্জার রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে সেইরকম উদাসীন ভঙ্গীতেই লোক দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তারা দুজনেই অবহেলার চোখে শ্যামকে এক পলক দেখে নেয়। শ্যাম তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাস-স্টপে এসে দাঁড়ায় গা-ঘেঁষা এক পাল লোকের ভিড়ের মধ্যে। শীত নেই তেমন, তবু শ্যামের হাত-পা-ঘাড়ে কেমন ঠাণ্ডা লাগছিল। বুকের ভিতরে সেই দুড়দুড় শব্দ -কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে, কে যেন পালিয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরে। তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তখন মাঝে মাঝে শ্যামের এরকম হত। বুক কাঁপা তার পুরোনো রোগ। বাস স্টপের ভিড়, পিছনে দোকানের আলো, ডান দিকে বাঁদিকে কয়েকটা ম্যাড়ম্যাড়ে গাছ-সব কিছুই বড় নিষ্প্রাণ। এই তো একটু আগে সে অফিস থেকে বেরিয়েছে, ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠেছে, তারপর মিনু তাকে টেনে নামাল-ততক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন হাতে পায়ে জড়ানো শীত, কাঁপা বুক আর অনিশ্চিত একটা উদ্বেগের ভিতরে দাঁড়িয়ে থেকে তার হঠাৎ মনে হচ্ছিল, বাস্তবিক এ শহর তার চেনা নয়। যেমন তার চেনা নয় তার ছেলেবেলার বন্ধু কিংবা তার দু'জন সঙ্গী।

মিনুর জন্যেই সেদিনকার বিকেলটা তার বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। বাসে উঠবার পরও সে সতর্ক হবার চেষ্টা করেনি। হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছিল, টের পাচ্ছিল তাকে ঘিরে অনেক হাত। কোন্‌টার কোন্‌ উদ্দেশ্য তা বুঝবার চেষ্টাও করেনি সে।

তারপর অনেকদিন ভিড়ের ভিতরে সন্ত্রস্ত চোখে সে চেয়ে থেকেছে। মনে হয়েছে, এদের ভিতরে রুক্ষ চেহারার দয়াহীন কিছু লোক গা-ঢাকা দিয়ে ধারালো কঠিন চোখে তাকে লক্ষ্য রাখছে। দৌড় দৌড়-বুকের ভিতরে সেই শব্দ শোনা যেত। যেন অদূরেই কোথাও মিনুর সেই ছয়জন সঙ্গী বাতাসের সঙ্গে মিশে নিঃশব্দে অপেক্ষায় আছে। অথচ সে জানত যে, এ ভয় অকারণ। বস্তুতঃ এতই নিরীহ, নিরামিষ তার জীবন যে, সে কারও ভয়ঙ্কর কোনো ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে না। তবে কি কারণে তার ওপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের সেই ভীতু অথচ দয়ালু শ্যামের সঙ্গে কারো কোনোদিনই আর দেখা হবে না। মনে পড়তেই শ্যাম নিজেও মৃদু একটু হাসল স্টেটবাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে ভিড়ের মধ্যে যেন সেই শ্যামকে হেঁটে যেতে দেখল, দেখল শ্যাম মোড়ের ভিখিরির বাটিতে ফেলে দিচ্ছে একটা দুটো পয়সা , ঠনঠনে পেরিয়ে যাওয়ার সময় সবার অলক্ষ্যে একটু মাথা নীচু করে দ্রুত একবার হাত দুটো জোড় করেই সরিয়ে নিচ্ছে, কিংবা বাসের দরজায় ধরা পড়েছে পকেটমার-সেই ভিড় থেকে দ্রুত পায়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ গলির মধ্যে। ভাবতে ভাবতে শ্যাম মৃদু হেসে মনে মনে বলল-ওঃ শ্যাম দি কাইণ্ডহার্টেড!

অনেককাল মিনুর সঙ্গে আর দেখা হয় না। কারণ, ক্রমে ক্রমে শ্যামের চাকরি গেল পাল্টে,

তার চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল কয়েকটা বাছাই করা রাস্তায়, অফিস-রেস্তরাঁ-বার কিংবা দক্ষিণের ভাল পাড়ায় তার ছোট্ট একটেরে ঘরটা—এইটুকুর মধ্যেই সুখে আটকে ছিল শ্যাম। আর মিনু ঘুরে বেড়ায় নোংরা গলি ঘুঁজি, চোরা চায়ের দোকান, চোলাই কিংবা জুয়ার আড্ডায়, পারুল কিংবা চাঁপার ঘরে। কাছাকাছিই ছিল তারা; তবু দুটো আলাদা শহরে। একটার ভিতরে আর একটা কিংবা আরো অনেকগুলো কলকাতা পোরা আছে। তারা দু'জনেই যে এক শহরে বাস করে, তা নয়। যেমন স্টেটবাসের ডানধারে বসে সে একরকম দেখছে, বাঁ ধারে বসলে দেখাতো অন্যরকম, পাঁচতলার ছাদ থেকে যেমন দেখা যায়, ম্যানহোলের ভিতর থেকে মাথা তুলে দেখলে তেমন নয়। আসলে দিকের তফাত, উঁচু কিংবা নীচু থেকে দেখার তফাত, এক এক রকম কলকাতা অন্যরকমের কলকাতার ভিতরে ঢুকে আছে। তার ইচ্ছে করছিল এখন গিয়ে একবার মিনুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার কাঁধে চাপড় মেরে বলে, আঃ হাঃ মিনু! কেমন আছিস গুরু? তারপর গলা নামিয়ে বলে, আমাকে দলে নিবি গুরু? দেখিস শালা, আমি দু'হাতে চালাব মেশিন কিংবা পাঞ্চ, তলপেটে ছোরা ঢোকাবো যেন মাখনে, দেখে নিস গুরু কেমন পকাপক চলে সোডার বোতল! তারপর গিয়ে বসে গোপন আস্তানায় চায়ের দোকনের পিছনে অন্ধকার অলিগলির মধ্যে, যেখানে ভয়ঙ্কর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার ঝোলে দেয়ালে, আর ভোমা নীলমাছি উড়বার শব্দ। সমানে সমানে মিনুর মুখোমুখি বসে অন্তরঙ্গ সুরে মিনুকে বলতে ইচ্ছে করে—কি চলবে গুরু? ঝিট মানে গাঁজা, আর অ্যান্টিক হচ্ছে চোলাই। নেশা জমে এলে আস্তে আস্তে মাথা নাড়বে শ্যাম—না গুরু, তুই ঢস্‌কে গেছিস। তোর বয়স শুরু হয়ে গেছে। আমার চেয়ে তুই বছর ছয়েকের বড়, আমার এখন বত্রিশ বোধ হয়। তাহলে তোর-যাকগে শালা, এখন কি চলছে তোর? ছিনতাই, না এক-দুশোর কেপমারী? বোর্ডে ধরিয়েছিস? চাঁপার ঝাঁপিতে কত গেছে রে শালা! ওরা তো ক্যাশমেমো দেয় না, দিলে ক'হাজারে দাঁড়াতো গুরু? ভাবিস না, ভাবিস না মিনু, আমি তোর দিনকাল ফিরিয়ে আনবো। উঠতি ছোকরার মতো আমার রক্ত গরম, বুড়োর মতো ঠাণ্ডা মাথা, গোয়েন্দার মতো চোখ। যে কোনোভাবে বাঁচতে বা যে কোনোভাবে মরতে আমি তৈরি—আঃ গুরু, কি বলবো তোকে, একটা উইক পয়েন্টে আমি মার খেয়ে গেছি জোর, মা-বাপ তোলা একটা গালাগাল আমি সইতে পারলুম না—

পাশের লোকটি সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলল, কিছু বলছেন?

ভয়ঙ্কর চমকে উঠল শ্যাম। বুঝতে পারল, সে বে-খেয়ালে হঠাৎ কথা বলে উঠেছিল। বাসের সামনের বা পিছনের সীটের দু-একজন তার দিকে ফিরে দেখল। বিবেকানন্দ রোডের কাছে ভিড় ঠেলে নেমে গেল শ্যাম।

।। ২।।

খুব সকালবেলা দরজার ধাক্কা শুনে ঘুম ভাঙল শ্যামের। উঠে দরজা খুলে দেখল, ইতু।

—ইতু!

—শ্যাম!

এক ঝলক সাদার মধ্যে ইতু দাঁড়িয়ে আছে। তার শাড়ি সাদা, ব্লাউজ সাদা, হাতের ব্যাগটি সাদা, এমন কি তার কাপলেও শ্বেত চন্দনের টিপ। শ্যামের ঘুম জড়ানো চোখে সেই সাদা রঙ কট কট করে লাগে। চোখ পিট পিট করে সে হেসে বলল—হাতের বীণাটি কোথায় রেখে এলে!

জানালা দিয়ে ঘরে আসছে রোদ, তার আভায় ইতুকে সুন্দর এবং গম্ভীর দেখায়। ইতু দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে না, ওপাশ থেকেই বলে—তোমার ঘরটা একটু গুছিয়ে নাও শ্যাম। এই বিশ্রী ঘরে কোনো ভদ্রমহিলা আসতে পারে না।

শ্যাম তাড়াতাড়ি তার বসবার চেয়ারটা একটু টেনে আনে ঘরের মাঝখানে, পা দিয়ে সরিয়ে দেয় কয়েকখানা বই. বিছানার লেপটা জড়ো করে রাখে পায়ের দিকে, বলে—তুমি আসবে জানলে আগে থেকেই গুছিয়ে রাখতুম। চেয়ারটা দেখিয়ে বলে—বোসো ইতু।

ইতু চেয়ারে বসে না। হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে বিছানায়, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে কনুইয়ের ভর রেখে আধশোয়া হয়। বলে–মুখটুখ যা ধোয়ার ধুয়ে এসো, আমি আজ সারারদিন থাকবো এখানে।

শ্যাম হাসে।

ভ্রূ কুঁচকে ইতু বলে–তুমি টেলিফোনে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে শ্যাম?

শ্যাম মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–আমি রাজী হয়েছিলুম?

শ্যাম আবার মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–আর কথার মাঝখানে তুমি টেলিফোন রেখে দিয়েছিলে?

শ্যাম লাজুক গলায় বলে –হু।

সামান্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইতু–তুমি কী চাও?

কথা না বলে শ্যাম তাক থেকে তার টুথব্রাশ তুলে নেয়। বাথরুমের দরজায় পা দিয়ে বলে–বোসো ইতু, আমি তোমাকে চা করে খাওয়াবো। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

বাথরুমে ঢুকে সে খানিকক্ষণ শূন্য চোখে সামনের সাদা দেয়ালটার দিকে চেয়ে থাকে। সারা শরীরে এখন গভীর আলস্য, কোনোখানে এতটুকু উত্তেজনা নেই, আশ্চর্য! সে কল খুলে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে হাত রাখে, হাসে, মনোযোগ দিয়ে জল পড়ার কলকল শব্দ শোনে কিছুক্ষণ, তারপর মন্থর হাতে পেস্ট-এর টিউব খুলতে থাকে।

আধঘন্টা পর বেরিয়ে এসে সে নীরবে স্টোভ জ্বালে, এতকাল ব্যবহার না-করা চা-চিনির কৌটো নামায় তাক থেকে। জমানো দুধের কৌটোয় ঝাঁকানি দিয়ে দেখে, তারপর কৌটোর ফুটোয় চোখ রেখে ভিতরটা দেখে নিয়ে ইতুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়ে–চা হবে না। দুধ শুকিয়ে গেছে।

–কী শুকিয়ে গেছে?

শ্যাম কৌটো দেখিয়ে বলে–দুধ।

ইতু সামান্য হাসে– দি মিল্ক অব হিউম্যান কাইন্ডনেস?

খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়েও হাসে না শ্যাম, স্মিতমুখে বলে–আঃ! ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে।

–তোমাকে চা করতে হবে না শ্যাম। তুমি আমার কাছে এসো।

শ্যাম কৌটোটা মেঝের ওপর খটাস করে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে জানালার দিকে সরে যেতে থাকে।

–এসো শ্যাম। শান্ত গলায় ইতু বলে।

শ্যাম জানালার চৌকাঠে হাত রেখে রোদে পিঠ আর ইতুর দিকে মুখ রেখে দাঁড়ায়। হেসে বলে–ইতু, তোমাকে খুব পবিত্র দেখাচ্ছে।

–আমি তা জানি।

–আরো কিছুক্ষণ তোমাকে পবিত্র দেখাক। তারপর–

ইতু দাঁতে দাঁত চেপে বলে–তারপর কী?

ইতু মাথা নাড়ে–না। দি মর্নিং শোজ দি ডে। কাছে এসো শ্যামা। আমি তোমার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

শ্যাম মৃদু ম্লান হাসে– তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে ইতু।

–কাছে এসো শ্যাম। তোমাকে একবার ছুঁলেই আমি বুঝতে পারবো তোমার কি হয়েছে।

যেন নিজের ছেলেকে কাছে ডাকছে এমনি মায়ের মতো আদুরে শোনায় ইতুর গলা। চোখে মুখে বলতে চাইছে–তোমার সব দুষ্টুমি ধরে ফেলেছি।

শ্যাম কাছে আসে না, জানালার কাছ থেকেই বলে–কী করে বুঝলে!

-কাছে এসো, আমাকে ছুঁতে দাও। তারপর দ্যাখো বলতে পারি কিনা!

শ্যাম ধীরে ধীরে দু'পা এগোয়, হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে-ছোঁও।

ইতুর হাত এগিয়ে আসতেই শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্যখানে রেখে বলে-ছোঁও।

আঃ শ্যাম! বলতে বলতে ইতু হাত বাড়ায়।

শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে বাড়িয়ে বলে-এবার ছোঁও।

-কি হচ্ছে? বলে ঠোঁটে হাসিচেপে উঠবার উপক্রম করে ইতু।

-উঠো না ইতু। শ্যাম এক পা এগিয়ে আসে, বলে-ছোঁও।

হাতের নাগালে শ্যামাকে পেয়ে ইতু আবার বসে পড়ে, তার পর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ শ্যামের শার্টটা ধরার চেষ্টা করে।

তড়িৎগতিতে লঘু পায়ে সরে যায় শ্যাম, হাসে-ধরবে? তারপর জানালার আরো কাছে সরে গিয়ে বলে-ধরো তো দেখি?

-আঃ শ্যাম! কাছে এসো।

-তুমি এসো ইতু। শ্যাম গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

-তোমার ভয় কী শ্যাম! তুমি অনেক মেয়েকে ছুঁয়েছো। তুমি পাকা লম্পট।

শ্যাম মাথা নাড়ে-ঠিক।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ইতু-ভয় কী শ্যাম!

ইতু কাছে এসে তার কাঁধের দিকে হাত বাড়ায়। শ্যাম মৃদু হাসিমুখে আস্তে আস্তে নুইয়ে দেয় কাঁধ। ইতু ফিসফিস করে বলে-ভয় কী শ্যাম! ভয় কী!

ইতুর হাত নরমভাবে কাঁধের ওপর নেমে আসছে, এক্ষুনি ছুঁয়ে ফেলবে তাকে, শ্যাম আরো নীচু হয়, তারপর পিছল গতিতে ইতুর হাতের তলা থেকে সরে যায় ঘরের মাঝখানে। ইতুর হাত খানিকটা শূন্য থেকে ধপ করে নেমে আসে, দুটো কাচের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়। সে ঘুরে ভ্রূ কুঁচকে শ্যামের দিকে তাকায়।

-ধরো তো দেখি! শ্যাম হাসে। ইতুর দিকে খেলার ছলে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে ছোঁও তো দেখি!

কিছুক্ষণ কুঁচকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসে ইতু। বলে, তুমি খেলতে চাও?

শ্যাম মাথা নাড়ে-হ্যাঁ।

-ঠিক আছে। ইতু পলকের মধ্যে তার শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেয়-ছুঁতে পারলে আমার জিত!

-জিত!

শ্যাম দরজা বন্ধ করে দেয়।

মুখোমুখি দুজন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ইতুর শরীর ভারী হয়ে গেছে অনেক। কোমরে আঁচল জড়ানোর পর এখন দেখা যাচ্ছে তার তলপেটে চর্বির একটু ঢিবি। হাতে গলায় মাংসের খাঁজ। তবু শ্যাম জানে ইতু নাচ শিখতো। তাই সে সতর্ক হয়।

ইতু সোজা এগোয় না, হাল্কা পায়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে ঘুরে আসতে থাকে। হাসে। শ্যাম চটুল পায়ে উল্টো দিকে ঘুরে যায়, বলে-বাক্ আপ, ইতু।

ইতু হাসে। ঘুরতে থাকে। শ্যাম ঘুরতে থাকে। ঘরের সবকিছুই শ্যামের চেনা। দরজার দিকে গেলে তার ডানধারে চৌকি, মাঝখানে চেয়ার, বাঁ ধারে স্টোভ জ্বলছে। জানালার দিকে গেলে ঠিক উল্টো। একধারে স্তূপ হয়ে থাকা বই। একটা মোটা বই মেঝের ভিতরে এগিয়ে আছে। শ্যাম বইটা পেরিয়ে যায়, চৌকির পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে সরে যায়, চেয়ারটায় একবার হাত রাখে। ডান ধারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে বিদ্যুৎগতিতে সোজা এগিয়ে আসে। সাপের ছোবলের মতো তার হাত ছুটে আসে শ্যামের বুকের দিকে। অল্পের জন্য এড়িয়ে যায় শ্যাম, লাফিয়ে উঠে যায় চৌকিতে, দরজার দিকে লাফ দিয়ে নামে। হাসে। বাঁ দিক ঘুরতে থাকে।

ইতু দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ-এই, কী হচ্ছে ছেলেমানুষী।

শ্যাম দাঁড়ায়, দূর থেকে বলে-ছুঁতে পারলে তোমার জিত।

-আমি জিত চাই না। তুমি কাছে এসো।

-খেলার নিয়ম ভেঙো না ইতু। শ্যাম বলে- খেলে জেতো।

ইতু বিছানায় বসে পা নাচায়-আচ্ছা, ছুঁতে চাই না তোমাকে।

শ্যাম দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতু ঠোঁট টিপে হাসে, অন্যদিকে চোখ রাখে, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে আসে। শ্যাম চমকে সরে যেতে গিয়ে কষ্টে স্টোভটার ওপর পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়। জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে সরে যায়, বলে-আঃ ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে। তোমার উন্নতির আর দেরী নেই।

সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, ইতু সেই জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে মারে। বিছানায় পড়লে শ্যাম সেটাকে তুলে নিয়ে বলে-থ্যাঙ্ক ইউ।

ইতু বেপরোয়াভাবে চেয়ারটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, কপালের ওপর থেকে কুঁচো চুল সরায়, সোজা এগিয়ে আসে। শ্যাম নীচু হয়ে তার পাশ দিয়ে, খুব কাছে দিয়ে উল্টোদিকে চলে যায়, বলে-ঠাণ্ডা মাথায় খেলো, রেগে গেলে শুধু ঘুরে মরতে হবে।

ইতু সে কথা শোনে না। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে। অন্ধের মতো সে পর পর চেয়ার চৌকি এবং দেয়ালে ধাক্কা খায়, মেঝের মোটা বইটাতে হোঁচট খেয়ে সামলে যায়। রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপে। তার মুখলাল হয়ে আসে, মুখে ঘাম চিকমিক করে ওঠে।

অল্প একটু উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। খেলা তাকে পেয়ে বসে। হাল্কা গলায় সে বলে-খেল ইতু, খেল। তোমাকে এখন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

বিছানার কাছে ইতু একটু থেমে যায়। হাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে শ্যামের দিকে। শ্যাম মাথা নীচু করলে সেটা দেয়ালে লাগে, তরপর সোজা নেমে সে স্টোভের ওপর থেকে কেটলীটা উল্টে দেয়। দপ করে স্টেভের আগুন ওপরে ওঠে, কেটলীর জল মেঝে ভাসিয়ে দিতে থকে। শ্যাম তার চেনা ঘরের নিরাপদ কোণে সরে যায়।

ইতু একটানে চেয়ারটাকে সরিয়ে দেয়, মেঝের ঘরম জল লাফ দিয়ে পার হতে যায়। পুরো টাল সামলাতে পারে না। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁফায়, বলে-শ্যাম, আমাকে আর কষ্ট দিও না।

ইতুকে হঠাৎ খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। কোমরের আঁচল খুলে স্টোভের ওপর ঝুলছে।

শ্যাম বলে-থেমো না ইতু, খেল। খেলে যাও। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে।-এই তো আমি। ছোঁও।

শ্যাম হাসে, দূরে সরে যায়, লাফ দিয়ে ওঠে চৌকির ওপর-এসো ইতু, খেল, নইলে এক্ষুণি আবার আমি ঝিমিয়ে পড়ব।

ইতু তবু দাঁড়িয়ে থাকে, বলে-আমি আর পারছি না, শ্যাম।

-পারবে। শ্যাম হাসে- ঠাণ্ডা হয়ে বসে থেকে কী লাভ। খেল।

ইতু শ্লথ পায়ে এগোয়। শ্যাম সরে সরে যায়। তারপর চেয়ারটার চারদিকে তারা ঘুরপাক খায়। বড় বড় শ্বাসের শব্দে ভরে ওঠে ঘর। তবু শ্যাম হাসে, ইতুকে থামতে দেয় না। ইতু প্রাণপণে চেষ্টা করে। শ্যাম ঘুরে ঘুরে চৌকির ওপর ওঠে, জানালার ধারে চলে যায়, দেয়ালের দিকে সরে আসে, গরম জলের স্রোত লাফিয়ে পার হয়। লক্ষ্য করে, ইতু দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো ঘুরছে, শ্যাম যেদিকে তার উল্টো দিকে যাচ্ছে। শ্যাম শিস দিয়ে জানিয়ে দেয় সে কোন্‌দিকে আছে।

শ্যাম হাসে, শ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে-খেল ইতু, খেল। তোমাকে একটু ভাল লাগতে দাও। আমার শরীর গরম হচ্ছে না ইতু, বহুকাল ধরে আমি ঠাণ্ডা হয়ে আছি। খেল ইতু, খেলে আমাকে ছোঁও। তারপর তোমার জিত। আঃ ইতু, তুমি মোটা হয়ে গেছ একটু, পেটে চর্বি জমছে, বয়সও হয়ে এল। সময় থাকতে থাকতে খেলে নাও, বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে খেলে

নাও ...মরে যাওয়ার আগে খেলে নাও.... সব কিছু সহজে পেতে নেই, পাওয়া উচিত নয়... এতকাল তোমাকে বড় সহজেই পেয়ে যেতুম, তাই তুমি আমাকে সবচেয়ে কম লাভবান করেছো। ... আঃ এত সহজে হাল ছেড়ে দিও না .. থেমো না.. থামলেই তুমি দুয়ো..থামলেই তুমি বুড়ো...থামলেই তুমি মাটির ঢেলা ...ঘোরো, ঘুরতে থাকো .....ঘুরতে ঘুরতে ছায়া হয়ে যাও ইতু.....মায়াবিনী হয়ে যাও ....রহস্যময়ী হয়ে যাও..... দুপ্রাপ্য হয়ে যাও.. রহস্যময়ী হয়ে যাও... দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাও.... আমি যেন ভিখিরির মতো তোমাকে কামনা করি... আমি যেন হাঁটু গেড়ে বসি তোমার জন্য... আমি যেন তোমার জন্য পাগল হতে পারি.... অ° হাঃ ইতু, তুমি স্টোভের বড় কাছে গেছ.... ধীর হয়ে গেছে তোমার পা... আবার তোমার আঁচল খুলে দুলছে আগুনের ওপর ... ওঃ ইতু!

বড় হতাশ হয় শ্যাম। থেমে যায়। দাঁড়িয়ে দেখে, ইতুর আঁচল দপ করে জ্বলে উঠল।

–ওঃ শ্যাম! হাঁফাতে হাঁফাতে কেঁদে ওঠে ইতু–আমি কী করব শ্যাম!

ইতু তার আঁচল আলগা করে ধরে শ্যামের দিকে আসতে থাকে। শ্যাম। সরে যায়।

–ওঃ শ্যাম!

শ্যাম মাথা নাড়ে–আমি খেলার নিয়ম ভাঙি না ইতু।

–কী করব শ্যাম!

শ্যাম বিছানা থেকে লেপটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে–এটা দিয়ে চাপা দাও।

ইতু মেঝেতে উবু হয়ে বসে। লেপ চাপা দিয়ে আগুন নেভায়। আঁচলটা সবে ধরেছিল, নেভাতে কষ্ট হয় না। শ্যাম দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে ইতু। শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। তারপর পোড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে শ্যামের বিছানায় এসে বসে। হাঁফায়।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে দেয় শ্যাম। ইতু চমকে ওঠে। তারপর যেন ঘুম এবং স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ইতু। দরজার কাছে গিয়ে একটু থামে, বলে– তোমার বিছানাটা স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাম, রোদে দিও।

শ্যাম মাথা নাড়ে–আচ্ছা।

–তুমি অনেকদিন দাড়ি কামাওনি।

শ্যাম মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ।

শ্যাম হাসে–হ্যাঁ।

–চলি শ্যাম।

–আচ্ছা।

শ্যাম দেখে, ছোট্ট, ছোট্ট প্যাসেজটা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে ইতু। পিঠে পোড় আঁচল। একবার তার ইচ্ছে হয় ইতুকে ডেকে বলে– কাপড়টা ফিরিয়ে পরে যাও। পরমুহূর্তেই ভাবে থাক। কেননা তার মনে হয়, ইতুকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

।।৩।।

–আপনি খেলোয়াড় ছিলেন?

–হ্যাঁ।

–কী খেলতেন আপনি?

চেয়ারে সামান্য শব্দ করে উঠে দাঁড়ায় শ্যাম–ব্যাগাটেলি আর ক্যারম।

লোকটা তাড়াতাড়ি নিজের চশমায় হাত দিয়ে টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকায়–কই এখানে লিখেছেন ক্রিকেট আর ফুটবল।

শ্যাম টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলে –দেন হোয়াই ডু ইউ আস্‌ক!

লোকটা অবাক চোখে শ্যামকে একটু দেখে নিয়ে বলে–ওঃ! আচ্ছা, আপনি বসুন।

শ্যাম আবার বসে পড়ে। তার গাল গলা ভয়ঙ্কর চুলকোচ্ছিল, অনেকদিন পর গায়ে ক্ষুর পড়ায় দাড়ির গোড়া ফুলে উঠেছে। সে গালে হাত বোলাতে থাকে। লম্বা সেক্রেট্যারিয়েট টেবিলের ওপাশে তিনজন। এ পাশে শ্যাম একা। দু'ধারে দু'জনের দিকে তাকায় না শ্যাম। মাঝখানে তার মুখোমুখি অল্পবয়সী যে লোকটি বসে আছে তার দিকেই চেয়ে থাকে। লোকটি কাগজপত্র থেকে আবার মুখ তোলে এবং প্রশ্ন করে–কভার পয়েন্টটা কোন্ অঞ্চল তা ডায়াগ্রাম না দেখিয়ে শুধু মুখে বুঝিয়ে দিন তো!

শ্যাম টেবিলের নীচে সামান্য পা নাচায়; নির্বিকারভাবে বলে–ভুলে গিছি।

লোকটা আবার মুখ খোলে, কথা বেরোবার আগেই শ্যাম তাড়াতাড়ি বলে–আমি সিভিল ড্রাফটস্‌ম্যান, আমার খেলা দিয়ে আপনারা কী করবেন?

লোকটা হতাশভাবে চেয়ারের পিছনে ঠেস দেয়, মুখের ওপর আড়াআড়িভাবে তুলে ধরে একটি পেন্সিল, তারপর চিন্তান্বিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে।

এইবার ডানদিক থেকে ইংরিজিতে প্রশ্ন আসে–হু ইজ ডীন রাস্ক?

শ্যাম এতক্ষণে দেখে লোকটাকে। আধবুড়ো মাথায় টাক, মোটা গোঁফ আর ঠাণ্ডা কূটনৈতিক হাসি তার মুখে।

শ্যাম মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলে আমি রিপোর্টার নই। তারপর কোলে রাখা ড্রইংয়ের ফাইলটা তুলে টেবিলে রাখে–তোমরা আমার ড্রইং দেখেছো।

লোকটা তেমনি ঠাণ্ডা হাসি হাসে– আমরা একজন আপ-টু-ডেট লোক চাই, শুধু ড্রাফটস্‌ম্যান নয়। তোমার কাগজপত্রে লেখা আছে সেইন্ট অ্যাণ্ড মিলারে তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চাকরি করতে, ড্রাফটস্‌ম্যানের নয়। প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্যাম দ্রুত চিন্তা করে যায়। কিছুই মনে পড়ে না তার। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। তবু সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বে-পরোয়াভাবে বলে–তিনজন ডীন রাস্ক আছে। কোনজনের কথা জিজ্ঞেস করছো?

লোকটা সামান্য থমকে গিয়ে বলে–বাকী দুজন কে?

শ্যাম চোখ বুজে আন্দাজে বানিয়ে বলে–একজন নিউজিল্যাণ্ডের ভলিবল খেলোয়াড় অন্যজন অস্ট্রেলিয়ান কেমিস্ট।

লোকটি সামান্য দুলে ওঠে–অ্যান্ড দি থার্ড ওয়ান?

অসহায়ভাবে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে শ্যাম, তারপর আস্তে আস্তে বলে–আমি জানি না। দি থার্ড ওয়ান মাস্ট বি আনইম্পর্ট্যান্ট।

–কিন্তু তুমিই বলেছো তিনজন আছে। সুতরাং আর একজন কে তা তোমার জানা উচিত। –কিন্তু তুমি জানো না!

শ্যাম মাথা নাড়ে–না। তারপর আস্তে আস্তে বলে–ডীন রাস্ক নামে কেউ আছে কিনা আমি জানি না, যেমন ডীন রাস্কও জানেন না শ্যাম চক্রবর্তী বলে কেউ আছে কিনা! ইট ইজ মিউচুয়্যাল ইগনোর‍্যান্স স্যার!

তারপর আর কোনো শব্দ হয় না। অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। শ্যাম তিনজনকেই নীরবে লক্ষ্য করে। বাঁ দিকে কালো রোগা মাঝবয়সী মাদ্রাজী ভদ্রলোক বোধ হয় কম দামী অফিসার, সারাক্ষণ লোকটি তার ওপরওয়ালাদের সামনে মাথা নীচু করে আছে, একটিও কথা বলেনি। সামনে মুখোমুখি–বসা অল্পবয়সী বাঙালী লোকটি ছটফটে, অহঙ্কারী, খুব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যেতে চায়। অনেকটা তার মতো। ডান দিকের আধবুড়ো লোকটিই সবচেয়ে শান্ত। মুখে হাসি, তবু পাথরের মতো অনড় মুখ, একটিও পেশী নড়ে না। বোঝা যায় না কোন্ দেশী লোক। আস্তে আস্তে শ্যামের হাই উঠতে থাকে, শরীর এলিয়ে আসে। শ্যাম জানে এরা কুকুরের মতো সতর্ক, খরগোশের মতো উৎকর্ণ লোক পছন্দ করে। তবু সে সাবধান হয় না। মাথা এলিয়ে দেয় চেয়ারের

পেছনে, হাই তোলে, চোখ রগড়ায়।

মুখোমুখি বসা লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে বলে–আচ্ছা, আপনি আসতে পারেন।

শ্যাম ধীরে সুস্থে ওঠে, দরজার দিকে এগোয়। তারপর মাঝপথে সে দাঁড়িয়ে পড়ে –দরজাটা ডানদিকে সরে গেছে। একটু ইতস্ততঃ করে শ্যাম, তারপর ডানদিকে ঘুরে এগোয় চেষ্টা করে। তারপরই বুঝতে পারে বৃথা চেষ্টা, দরজাটা চক্রাকারে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। বড় অদ্ভুত। সে আবার দাঁড়ায়। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে চোখ বুজে কয়েক পা হাঁটে। চোখ খুলে দেখে সেক্রেট্যারিয়েট টেবিলটার মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশের তিনজন সকৌতুকে তাকে দেখছে। সামান্য লজ্জা বোধ করে শ্যাম। তিনজনের দিকে চেয়ে একটু হেসে অনাবশ্যক কথা বলে–আমার ড্রইং আপনারা দেখেছেন, আমার কাগজপত্র ও আমাকেও। এখন জিজ্ঞেস করি এ চাকরিটা কি আমার হতে পারে? বলতে বলতে সে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে যায়। মাঝখানের আর বাঁ দিকের লোক দু'জন কথা বলে না, সম্ভবতঃ তার অবস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়। ডানদিকের আধবুড়ো লোকটা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, শান্ত গলায় বলে– সাইকোলিজিক্যালি ইউ আর আনফিট ফর দি জব।

পিছনে হাত বাড়িয়ে শ্যাম দরজার গোল হাতলটা হাতে পায়, তারপর 'ইয়াঃ বলে হেসে উঠে। ইচ্ছে করে এগিয়ে গিয়ে সে লোকটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে– । আমি জানতুম তুমিই এদের মধ্যে সবচেয়ে পাকা। আমি হলে তোমকেই নিয়ে নিতুম আমার কোম্পানীতে।

ঝট করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে শ্যাম। রুমালে মুখ মোছে। খোলা বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে শ্যাম। এবার তার দিক ঠিক থাকে, পা ফেলতে গোলমাল হয় না। বস্তুতঃ চাকরিটা হল না বলে সে খুব স্বস্তি বোধ করতে থাকে, তার চোখেমুখে হাওয়া লাগে।

বস্তুতঃ সে বুঝতে পারে, তার আর কিছুই করবার নেই।

।। ৪ ।।

তেইশে ডিসেম্বর শ্যাম তার একত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে যাচ্ছিল। সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই তার খেয়াল হয়েছিল–আজ আমার জন্মদিন। তখনো বিছানা ছাড়েনি শ্যাম, চোখে আধো ঘুম, লেপের ওম-এর ভিতর থেকে সে অনেক বার গুণ গুণ করল–আহা! আজ আমার জন্মদিন! এতকাল সে জন্মদিনকে হিসেবের মধ্যে আনত না, তার ধারণা ছিল ওতে স্পীড কমে যায়। ধরো, তুমি সিঁড়ি ভেঙে উঠছো কিংবা নামছো, লিফটের দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে বাড়িয়েছো হাত, জুতোর ফিতে খুলতে বা বাঁধতে যাচ্ছো, চুমু খেতে বাড়িয়েছো ঠোঁট, দাড়ি কাটতে গিয়ে হয়তো মাত্র জুলপির নীচে বসিয়েছো ক্ষুর–অমনি বয়স হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়লে আস্তে শিথিল হয়ে যায় হাত-পা, মন এলিয়ে পড়ে হাই উঠতে থাকে। অনাবশ্যকভাবে মনে হয়–কী হবে আর এইসব করে? কিছুই তো আর থাকে না শেষ পর্যন্ত! শ্যামের জন্মদিনে তাই কোনো বছরেই কোনো উৎসব নেই, তেইশে ডিসেম্বরের কথা তার খেয়ালই থাকে না।

রোজকার চেয়ে একটু দেরী করে বিছানা ছাড়ল শ্যাম। হাতমুখ ধুয়ে আয়নায় মুখ দেখে শ্যাম। আজকাল তাকে অনেকটা সাধু-সন্তের মতো দেখায়। চুল বেড়ে গিয়ে ঘাড়ের কাছে বাবরি পাক খেতে শুরু করেছে। আয়না হাতে শ্যাম এসে জানালায় দাঁড়াল। দক্ষিণের জানালায় রোদ পড়ে আছে। সামনেই একটা আমগাছ–কয়েকটা পাতার ছায়ায় একটা মাকড়সার জালে এখনো শিশিরের জল আটকে আছে। তার হাতের আয়না থেকে রোদ ঠিকরে জালটার ওপর পড়তেই শ্যাম আয়না ঘুরিয়ে নিল। তড়িৎগতিতে আলোটা গিয়ে পড়ল উল্টোদিকের বাড়ির তিনতলার একটা জানালায়। সামান্য কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে দেখল শ্যাম-একটা অয়েল পেইন্টিঙের ওপর পড়েছে আলোটা-বড়ো একটি মুখ, ঠোঁটে সকৌতুক হাসি। ভ্রূ কুঁচকে শ্যাম

আপনমনে বলল 'ব্ল্যাক-মার্কোটিয়ার! তারপর আলো ঘুরিয়ে নিল। লাল দরজাওলা একটা গ্যারেজের সামনে ডাস্টবিনের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তিনটে কুকুরছানা, তাদের ওপর আলো ফেলল শ্যাম। কিন্তু খোলা রাস্তায় যথেষ্ট রোদ রয়েছে, তাই আলোটা জমল না। সে একটু ঝুঁকে ছায়া খুঁজতে থাকে। ছেলেবেলায় আলো-ফেলার খেলা অনেক খেলেছে শ্যাম। এখন বয়স হয়ে গেছে। আজ একত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে সে। ভেবে সামান্য হাসল শ্যাম। যেমন হাসি ছিল তার ক্লাশ সিক্সে বা সেভেনে। গলা বাড়িয়ে দেখল বাঁ দিকের মোড় পেরিয়ে শ্লথগতিতে আসছে রিকশা, তাতে গীটার হাতে একটি মেয়ে। সতর্ক হাতে আয়না সামলে নিল শ্যাম। কে জানে আলো ফেললে মেয়েটা রিকশা থামিয়ে দোতলায় উঠে আসবে কিনা, লাজুক হেসে বলবে কি না-ডাকছিলেন, তাই এলুম! শ্যাম জাফরানী শাড়ি পরা, ব্যাগ হাতে আর একটি মেয়েকেও ছেড়ে দিল-মেয়েটা অনেক দূর পর্যন্ত সোজা হেঁটে চলে গেল। শ্যাম আলোটাকে কয়েকবার দত্তবাড়ির দেয়ালে নাচিয়ে দিল, দেয়াল-ঘেরা লন-তাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কাক, সিঁড়ির নীচের ফুটো থেকে বেরিয়ে এসে একটা সাদা বেড়াল ডন দিচ্ছে। বেড়ালের মুখে শ্যাম আলো ফেলল, কোন ফল হল না, মুখ ঘুরিয়ে রাজরাণীর মতো অবহেলায় বেড়ালটা সিঁড়ি ভেঙে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। শ্যাম আলো ঘুরিয়ে দিতে একটা কাক উড়ে গেল। লনের ওপাশে দূরের একটা বাড়ির জানালায় অসাবধানে আলো পড়তেই চিকমিক করে উঠল কয়েকটা সাজিয়ে রাখা পেয়ালা পিরিচ। শ্যাম আলো ফেলতে ফেলতে ক্রমে আলোটার নাড়াচড়ার ওপর কর্তৃত্ব খুঁজে পাচ্ছিল। মিস্তিরদের বুড়ো বাপ বাজার করে ফিরছে, পিছনে চাকর-শ্যাম দুজনকেই ছেড়ে দেয়। খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে একটা ট্যাক্সি-জানালায় একটা অবাঙালী বাচ্চা ছেলে, শ্যাম ঝট করে তার মুখে ফেলে আলো, তারপর ট্যাক্সির গতির সঙ্গে তাল রেখে আলোটা স্থির রাখে একটুক্ষণ। বাচ্চাটা তার দিকে তাকায়, হাতে চোখ আড়াল করে, খানিকটা দূরে গিয়ে হঠাৎ জিভ ভেঙিয়ে চলে যায়। তারপর আলো ফেলতে তার ক্লান্তি লাগে। সে একটা গরু একটা বুড়ী আর একটা সিনেমার পোস্টারে নায়িকার মুখে পর পর আলো ফেলে। তারপর আয়নাটা রেখে দেওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে চলে আসছিল শ্যাম। ঠিক এ সময়ে সে শুনতে পেল একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ, ডান দিকে মোড়ের ওপাশ থেকে আসছে। দ্রুত তার হাত-পায়ের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। অনেকদিন ধরে সেই কবে থেকে যেন মোটর সাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার। দ্রুত জানালার কাছে ঘুরে আসে সে। মোটর সাইকেলটা এক্ষুণি মোড়ে এসে বাঁক নেবে- মোড়টা তেমাথা। শ্যাম লক্ষ্য করে, বড় রাস্তার ওপর একটা গরু ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে। মোড়ের থেকে মোটর সাইকেলের মুখ আর লোকটার কালো মাথা দেখা যেতেই শ্যামের আয়নার আলো ঠিকরে পড়ল মুখে-ঠিক মুখে। ঝড়ের মতো শব্দ তুলে বাঁক নিচ্ছিল মোটর সাইকেল, শ্যাম এক পলকের জন্য দেখল লোকটা তার আলো থেকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে কাত হল। তারপর আর কিছু দেখার ছিল না, শুধু গরুটার ভয়ঙ্কর লাফিয়ে ওঠা ছাড়া। তড়িৎগতিতে শ্যাম মেঝেতে বসে পড়ল, শুনতে পেল রাস্তার ওপর মোটর সাইকেলটার আছড়ে পড়ার ধাতব কঠিন শব্দ। সে হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে চলে এল। আয়নাটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তার ভিড়টাকে এগিয়ে গেল সে। লোকজন জড়ো হচ্ছিল দ্রুত। শ্যাম তাদের পাড়া ছাড়িয়ে গেল। খুব সুন্দর রোদ আজ, তেমন খুব শীতও। খুঁজে সে একটা নিরিবিলি চায়ের দোকান বের করল। খুবই ওঁছা দোকান। কোণের দিকে একটা জায়গা দখল করে বসে পড়ল কেন যে মোটরসাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার-তা ঠিক মনে পড়ছিল না শ্যামের। মনে করতে গিয়ে মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে উঠল। মেঝের পড়েছিল খবরের কাগজ। সে নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিল। অনেকদিন খবরের কাগজ পড়া হয় না। অন্যমনস্ক থাকার জন্যে সে খবরের কাগজে মাথা গুঁজে দিল। দিয়েই দেখল খেলার পাতা। একজন খেলোয়াড় কাল থেকে আটানব্বই রানে নট আউট আছে। বেচারা! সারারাত নিশ্চিত ওর ঘুম

হয়নি! কম রানে আউট হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত। তবু আরো দুই রান, মাত্র আর দুটো ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মতো রান–বাইশ আর বাইশ চুয়াল্লিশ গজ মাত্র! শ্যামের ইচ্ছে হল লোকটার জন্য এক্ষুণি চুয়াল্লিশ গজ একটা ছুট দিয়ে আসে। এতটুকুর জন্য সারারাত না-ঘুমোনো, খাওয়ার অনিচ্ছা মহিলার প্রতি শীতল আচরণ–সবই সম্ভব। বেচারা লোকটা! ঐ দুটো রান না হলে...! না হলে কী যে হবে ভেবে শ্যাম খুবই অসহায়ভাবে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। মনে হল দৈব ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঐ দুটো রান যে হবেই কোনো মানুষ তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সামান্য অস্থির বোধ করে শ্যাম। সে খবরের কাগজটা ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। দাম দিয়ে দেয়। তারপর খোলা রাস্তায় রোদ আর বাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এলোমেলো হেঁটে যায় এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা।

তারপর দুপুরবেলা সে তার পাইস হোটেলে নিজের সম্মানে নিজেকেই একটা ভোজ দিল। মাংসের হাড় ভাঙল মড় মড় করে, দই খেল চেটেপুটে। সুবোধ মিত্র সকাল ন'টায় খেয়ে আফিসে যায়। দেখা হল না। কিন্তু ভেবে রাখল শ্যাম, রাত্রে দেখা হলে মিত্রকে সে খাইয়ে দেবে। আজ মৌরি নিল না শ্যাম, বাইরে এসে দোকান থকে পান খেল একটা, আর কিনে নিল খুব দামী এক প্যাকেট সিগারেট। ভিখিরিদের দেওয়ার জন্য পুরো একটি আধুলি খুচরো করে নিয়ে পকেটে রাখল। বস্তুতঃ এখন মাসের শেষ, কিন্তু তার কোনো চিন্তাই নেই। ব্যাঙ্কে এখনো আড়াই হাজারের মতো মজুত আছে। ইচ্ছে করলে মাসের যে কোনো দিনকে মাস পয়লার বিকেলের মতো সুসময় করে তোলা যায়। একত্রিশের জন্মদিনে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিল তার। তার এমনও মনে হচ্ছিল যে, আজকের দিনটা বোধ হয় ভালই কেটে যাবে। পরমহূর্তেই মনে মনে নিজেকে শাসন করল সে। ভবিষ্যৎ-চিন্তাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। অতীত চিন্তাও। কাজেই সে সকালের কথা ভুলে গেল, বিকেলের কথাও আর ভাবল না। খর রোদ আর উত্তুরে বাতাসের চমৎকার এই দুপুরের মধ্যেই মজে গেল তার মন। খ্রীস্ মাসের আর দেরী নেই। দোকানে লাল শালুতে লেখা 'হ্যাপি খ্রীসমাস। শো কেসে সাজানো কেক তুলা দিয়ে তৈরী তুষারক্ষেত্র আর বুড়ো সান্টা ক্লস। সামনেই একটা রুটির ভ্যান, পিছনের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত খোপে খোপে সাজানো রুটি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীতে বড় সুসময় এসে গেছে। এবার বোধ হয় মাঠে মাঠে ফসল ফলেছে খুব, চাষাবাদের গৃহিণীরা হয়েছে সন্তানবর্তী। সরকারী বিজ্ঞপ্তি চলে গেছে গ্রামে গ্রামে–'আরো সন্তান উৎপাদন করো গো মা-জননীরা। জমিন পতিত রেখো না গো বাপ-সকল, সুসন্তানে ভরে দাও দেশ। আমাদের কারখানায় বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের কৃষিতে বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের খনিতে বাড়ছে উ ৎপাদন। এত ভোগ করার লোক কই গো? খাওয়ার লোক নেই বলে আমরা ইলিশের ঝাঁককে সমুদ্রে চলে যেতে দিলুম, বাছুরে খেতে শেষ করতে পারে না বলে আমাদের দুগ্ধবতী গরুগুলির বাঁট ফুলে দুধ খসে পড়ছে মাটিতে, ভরভরন্ত পাকা ফসলের ক্ষেতে আমরা ছেড়ে দিয়েছি মোষের পাল, আবাদের মৌচাক থেকে চুঁইয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মধু। মা-জননীরা লোকজনে ভরে দাও দেশ। সুসন্তান দাও গো বাপ-সকল!' মুখে সামান্য হাসি, গায়ে শীতের স্বাস্থ্যকর রোদ আর ভরা পেটে শ্যাম আস্তে আস্তে হাঁটছিল। অতীতের কোনো মুখ মনে পড়ে না ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা মনে আসে না। বড় তৃপ্ত এবং স্নিগ্ধ লাগছিল নিজেকে। ফুটপাথে ডাকবাক্সের পিছনে ছেঁড়া কাঁথার সংসার থেকে একটা ভিখিরির ছানা হামা দিলে ফুটপাথের মাঝামাঝি চলে এসেছে। শ্যাম এক লাফে তাকে ডিঙিয়ে গেল। একজন হকার ধীর গম্ভীর স্বরে তাকে উদ্দেশ করে হাঁকল, ' গেঞ্জী...! ভীষণ চমকে উঠল শ্যাম। তারপর দ্রুত পেরিয়ে গেল গেঞ্জীওয়ালাকে। আর একটু হলেই অতীতের কথা মনে পড়ে যেত। সে সামনেই মোড়ের মাথায় বাঁক নিল। ফাঁকা রাস্তা। ঢিমে তালে ক্লান্ত একটি লোক ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যাম টক করে চোখ বুজে ফেলে। অমনি চোখের ওপর ছবি ফুটে ওঠে। সারি সারি সব দোকান, সৎ দোকানীরা পবিত্র চোখ নিয়ে বসে আছে। শালীন ও সুন্দরী যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, শান্ত ও সুন্দর শিশুরা হেঁটে যাচ্ছে,

নির্লোভ, বিনয়ী ও স্বাস্থ্যবান যুবা-পুরুষ দ্রুত চলেছে কাজে, কর্মঠ ও বিজ্ঞ বুড়োরা সকৌতুক চোখে বারান্দায় বা ব্যালকনিতে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে সুন্দর অবসরের জীবন। সর্বত্রই অদৃশ্য বিজ্ঞাপন—বেঁচে থাকুন। আপনার জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান।

হাইড্র্যান্টের জলে শ্যামের ডান পা ছপ্ করে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল । চোখ চেয়ে হাসল শ্যাম। সামান্য ক্লান্তি লাগছিল তার। অনভ্যাসের বেশী খাবার তার পাকস্থলীতে ডেলা পাকিয়ে উঠছে। তবু ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হল না তার। হাঁটতে হাঁটতে সে আবার বড় রাস্তায় চলে এল। চৌরঙ্গীর দিকে গেলে মন্দ হয় না, খ্রীসমাস ইভে ঐ দিকটাই জমজমাট। বাস-স্টপে ঘ্যান-ঘ্যান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা নানা বয়সের ভিখিরি, কালো চশমাপরা এক মহিলা রুমালে মুখ চেপে চোখ ফিরিয়ে বাসের পথ চেয়ে আছে, রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ' টেরিলিন-পরা দুই ছোকরা। বাস এসে গেল। সামান্য ভিড় ঠেলে নামা-ওঠার মধ্যে যে ধাক্কাধাক্কি তাতে গা ছেড়ে দিল শ্যাম। তারপর বাসের হাতল ধরার ঠিক আগের মুহূর্তে পকেটের যাবতীয় খুচরো পয়সা মুঠো করে তুলে ফেলে দিল রাস্তায়। রিনরিন ঠিনঠিন সেই শব্দ কয়েক মুহূর্তের জন্য রাস্তার অন্য শব্দকে ডুবিয়ে দিল। সেই শব্দের এত জোর যে চমকে উঠল আশপাশের লোকজন, নামতে বা উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল অনেকে। হাসি চেপে শ্যাম দেখল ফুটবোর্ডের ওপর একজন বুড়ো বাসের হাতল ছেড়ে দিয়ে টাল খেতে খেতে ভীষণ সন্দেহে নিজের তিনটে পকেট হাতড়ে দেখছে। পয়সা! আরে! পয়সা পড়ল কার! এরকম একটা চাপা উত্তেজনা তৈরী হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল; ভিড়ের মধ্যে পানকৌড়ির মতো ডুব দিল দুটো লোক। শ্যাম নিশ্চিন্তে উঠে গেল বাসে। কন্ডাক্টর ঘন্টির দড়ি টেনে রেখে দিল, তারপর একটু ইতস্তত করে দ্রুত বাজিয়ে দিল ঘন্টি, চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে! ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল শ্যাম, বাস-স্টপের ভিখিরিদের মধ্যে ছোটোখাটো একটা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। কিছু লোক জমে গেছে ইতিমধ্যেই। মুখ ফিরিয়ে শ্যাম বাসের ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। তারপর রড ধরে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ফেলল। সামান্য ভাত-ঘুম পেয়ে বসছিল তাকে।

এলগিন রোড পেরিয়ে সে বসবার জায়গা পেল। থিয়েটার রোডের কাছাকাছি কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে পকেটে হাত দিয়ে সামান্য থমকে গেল শ্যাম। একটিও খুচরো পয়সা নেই। বুক পকেটে দুটো দশ টাকার নোট। একটা বাড়িয়ে দিয়ে শ্যাম কন্ডাক্টরের দিকে তাকাল। ঝাঁকড়া চুলওলা কর্কশ চেহারার লোক, মুখে শিরা-উপশিরা জেগে আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটা বলল—খুচরো দিন। বাসটা একটা স্টপে ধরল। শ্যাম লোকটার চোখে স্থির চোখ রেখে বলল—নেই। কন্ডাক্টর হাতের টিকিটে 'টিরিক' করে করে আঙুল দিয়ে শব্দ তুলল,পিছনে তাকিয়ে পার্টনারকে পুরুষ গলায় বলল—বলবে ভাই! তারপর দ্রুত হাতে ঘন্টির শব্দ তুলে শ্যামের দিকে চেয়ে বলল—খুচরো নেই? শ্যাম মাথা নাড়ে—নেই। আবার সেই হাতের টিকিটে 'টিরিক' শব্দ, বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকায় লোকটি—নোটের ভাঙানি হবে না। শ্যাম নিথর-দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলে—তাহলে? লোকটা অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাচ্ছিল্যের গলায় বলে—তাহলে আর কী! এমনিই চলুন। বলতে বলতে লোকটা ভিড়ের ভিতরে ঢুকে যায়, নেপথ্য থেকে তার গলা শোনা যায়—অনেকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, বাসে বড় নোটের ভাঙানি পাওয়া যায় না। মুহূর্তেই চোখে-মুখে রক্ত ছুটে এল শ্যামের রাগে আর অপমানে শরীর কেঁপে উঠল তার। ইচ্ছে হল লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে সবাইকে বলে—ভাইসব, একটু আগে গড়িয়াহাটার মোড়ে আমি মুঠো-ভরতি খুচরো পয়সা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছি....। কিন্তু বস্তুতঃ তা করল না শ্যাম। শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। কন্ডাক্টর পিছন ফিরে ওদিককার টিকিট নিচ্ছে, শ্যাম তার পিঠে খোঁচা দিয়ে বলল— আমি নেমে যাচ্ছি। লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল, একটুও দুঃখিত না হয়ে বলল—আপনার ইচ্ছে। বাসসুদ্ধ লোক দেখছিল শ্যামকে। উকিলের মতো কালো পোশাকপরা বুড়ো একটা লোক শ্যামের রাস্তা আটকে বলল—দাঁড়ান, আমি দেখছি। আমার কাছে থাকতে পারে। বলেই লোকটা হাতের ফোলিও ব্যাগ এগিয়ে দেয় শ্যামের দিকে—এটা ধরুন। আমার

ভিতরের পকেটে আছে কিনা দেখি। শ্যাম বিনীতভাবে তার ব্যাগটা ধরল হাত বাড়িয়ে। লোকটা চলন্ত বাসে দোল খেতে খেতে তার গলাবন্দ কোটের তিনটে বোতাম খোলে, তারপর রহস্যময় অন্দরমহলে হাত চালিয়ে বের করে আনে একটা প্রকাণ্ড নোট-বই। লোকটা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে শ্যাম লোকটার কাঁধ চেপে ধরে রাখে, পিছন থেকে একজন দয়ালু হিন্দুস্থানীও লোকটার পিঠে নিজের কাঁধ ঠেকো দেয়। লোকটা তার নোট-বই খুলতেই একগাদা খুচরো কাগজ ঝরে পড়ে। 'আহাঃ বলে বুড়ো তখন নীচু হয়ে কাগজ কুড়োয়, শ্যাম আর হিন্দুস্থানীটা তাকে ধরে রাখে। দাঁড়িয়ে এবার সতর্কভাবে অনেক কাগজপত্রের ভিতর থেকে টাকা বের করে লোকটা, গুণে-গেঁথে শ্যামের হাতে দেয়। প্রথমে ফোলিও ব্যাগটা, তারপর দশ টাকার নোট তার হাতে দেয় শ্যাম, তারপর একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে, পরোপকার করতে পারায় বুড়োর মুখেও সামান্য হাসি দেখা দেয়। শ্যাম ধীরেসুস্থে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, পিছন ফিরে আর তাকায় না। কন্টাক্টরের কর্কশ গলা শোনা যায়, 'কি হল? ভাড়াটা?-শ্যাম উত্তর দেয় না। ভাড়া দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই সে বোধ করে না। তাই নিজেই ঘন্টির দড়ি টেনে বাস থামায় স্টপে, তারপর নামবার আগে নিজেই ছাড়বার ঘন্টি দিয়ে দেয়, ময়দানের কাছে নেমে পড়ে। চলন্ত বাস থেকে সামান্য গোলমাল তার কানে আসে, সে কান ফিরিয়ে নেয়। হাসিমুখে মাঠের টলটলে রোদের মধ্যে নেমে যায়।

একটা পাথর কুড়িয়ে অনির্দিষ্ট দিকে ছুঁড়ে মারে শ্যাম। ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে চিবোয়, খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। সে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না, কি কারণে, কেন মোটর-সাইক্লিস্টদের ওপর তার একটা পুরোনো, পোষা রাগ আছে। ভ্রূ সামান্য কুঁচকে ওঠে তার। পকেট হাতড়ে সে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। পেটের ভিতরে গাঁজিয়ে উঠেছে দুপুরের খাবার, তার সামান্য বুকজ্বালা করে। দেশলাই জ্বালতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল তার আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। গত কয়েক মাসে তার শরীর শুকিয়ে গেছে অনেক। এককালে প্রতি মাসের চার তারিখে ওজন নেওয়া তার বাতিক ছিল, তখন দিনের মধ্যে কয়েকবারই তার নিজেকে রোগা কিংবা মোটা বলে মনে হত। বহুকাল ওজন নেওয়া হয়নি আর। তবু সে জানে ওজন অনেক কমে গেছে। অনেক দুশ্চিন্তা ও মেদ ঝরে গেছে তার।

খুশী মনেই শ্যাম মাঠের মধ্যে অনেক দূর হেঁটে যায়। এলোমেলো হওয়ায় তার তেল-না-দেওয়া রুক্ষ চুল উড়ে আসে কপালের ওপর। আঙুল দিতেই চুলের জট টের পাওয়া যায়, চিরুনি বসালে চোখে জল আসে। শ্যাম সাদা পোশাক-পরা একদল ক্রিকেট খেলোয়াড়কে অন্যমনস্কভাবে পেরিয়ে গেল। পাতা-পোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় হঠাৎ। তারপর মাঠ-ভরা রোদ্দুরের ভিতরে সে ইচ্ছেমতো হাঁটতে থাকে, যেদিকে খুশী চলে যায়। বাঁ দিকে সাদা শূন্যতায় ধু-ধু করছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ডান ধারে বহুদূরে দেখা যায় হাঁটু মুড়ে গঙ্গার কোল জুড়ে আছে হাওড়ার পোল, ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ জীর্ণ স্তম্ভটির মতো বিবর্ণ নিঃসঙ্গ অক্টরলোনী মনুমেন্ট। তারপর এক সময়ে তার আর দিক ঠিক থাকে না। সে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে দেখে হাওড়ার পোল তার বাঁ দিকে চলে গেছে, ডান দিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আবার কয়েক পা হেঁটে সে ডাইনে বাঁয়ে কোনটাকেই খুঁজে পায় না। কখনো সে সামনে পিছনে, কখনো বাঁয়ে ডাইনে, কখনো ডাইনে বাঁয়ে ওই দুটিকে দেখতে থাকে। মাঠের মধ্যে এত দূরে চলে এসেছে সে যে, দূরের রাস্তায় লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। প্রকাণ্ড মাঠ ভূতগ্রস্তের মতো ঝিমঝিম করছে রোদে, ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে নিয়ে খেলছে বাতাস, আর পাতাপোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ। তার শিরা-উপশিরায় রক্তের, গতি ক্রমে ঝিমিয়ে আসছে সে টের পায়। সে কোনোক্রমে একটা গাছের ছায়ার দিকে হেঁটে যেতে থাকে। গাছটা কেবলই সরে যায় ডাইনে বাঁয়ে দূরে সরে যায়। হাঁপিয়ে ওঠে শ্যাম। সামান্য অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তারপর আবার সে চেষ্টা করতে থাকে। গাছটার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, চোখ বুজে এবং চোখ খুলে সে গাছটার ছায়ায় পৌঁছুতে চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ লেগে যায়। এবং এক সময়ে সে গাছটার কাছে

পৌছে যায়। আপনমনে মৃদু কৃতিত্বের হাসি হাসে শ্যাম, তারপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। প্রকাণ্ড খোলা উদোম আকাশ হঠাৎ নেমে আসে তার চেতনার ওপর। ক্রমে চোখ থেকে আলো মুছে যায়। অসহায় শ্যাম হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে চায় ঘাস-মাটি, গাছের ছায়া, কিন্তু টের পায়, তার জাগরণের তটভূমি অতিক্রম করে আসছে ঘুমের ঢেউ। তাকে নিয়ে যেতে থাকে। শেবারের মতো একঝলক চেয়ে দেখে শ্যাম, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হয় তার জাগরণ কিংবা ঘুম কোনোটাই তার ইচ্ছাধীন নয়। ভয়ংকর শক্তিমান কেউ তাকে তার ইচ্ছামতো চালিয়ে নিচ্ছে, কাঠি ছুঁইয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছে ঘুম, কাঠি ছুঁইয়ে জাগাচ্ছে। এই রোদ, এই মাঠ, এই ঘাস কিংবা গাছের ছায়া, অথবা ওই ন্যাংটো উদোম আকাশের মধ্যেই কোথাও রয়েছে সে। শেষ চেষ্টায় সে খুঁজে দেখে প্রাণপণে, তারপর ধপ করে তার চেতনাহীন মাথা নরম ঘাস-মাটির মধ্যে ঘুমে ডুবে যায়।

মোটর-সাইকেলের ভীষণ শব্দে চমকে ঘুম ভেঙে গেল শ্যামের। শিউরে উঠে বসল সে। তড়িৎ গতিতে তাকিয়ে দেখল চারদিকে। তারপর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল আওয়াজ। সে স্পষ্ট টের পেল শব্দটা আসছে তার মাথার ভিতর থেকে। সার্কাসে কিংবা শিয়ালদার রথের মেলায় জালে-ঘেরা গোল খাঁচার মধ্যে মৃত্যুকূপের সেই খেলায় যে-ভাবে মোটর-সাইকেল ঘুরতে ঘুরতে ওঠে কিংবা নামে, চক্কর দেয়, ঠিক অবিকল সেইরকমভাবে একটা মোটর সাইকেল এতক্ষণ তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেল। সে জেগে উঠতেই সেই শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গভীর নিস্তব্ধতার ভিতরে মিলিয়ে গেল। তারপর নিজের হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দ শুনতে পেল সে। কিছুক্ষণ সে ভীষণ বোকার মতো, গাড়লের মতো তার চতুর্দিকে অন্ধকার মাঠ, আর কুয়াশায় ভরা শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল। মনে হয় নিশিরাতের পরী তাকে উড়িয়ে এনেছে, শুইয়ে দিয়ে গেছে এই মাঠের মধ্যে। তারা নিয়ে গেছে তার স্মৃতি, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ চিন্তা। এখন আর নিজের নাম মনে পড়ে না, পরিচয় মনে পড়ে না। হিম পড়ে ভিজে গেছে তার ধুতি আর চাদর, স্যাঁতস্যাঁত করছে স্যান্ডেল। উত্তরের বাতাস লাগে হঠাৎ, হি-হি ঠাণ্ডায় সে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ খেয়াল হয়, ডান হাতের মুঠোয় ধরা দশ টাকার ভাঙানো নোট। মনে পড়ে যায়, বাস-ভাড়া দেওয়া হয়নি। মনে পড়ে যায়, আজ তার একত্রিশের জন্মদিন। মনে পড়ে যায় যে, সে শ্যাম।

উঠে পড়ে শ্যাম। ধীরেসুস্থে মাঠ পার হয়। ঘাসে হিম জমে আছে-শিশিরে ভিজে পায়ের পাতা থেকে কিলবিল করে শীত উঠে আসে শরীরে। বাস-রাস্তায় এসে সে বাস ধরল। সারা রাস্তায় সে কিছুতেই ভেবে পেল না, কেন সে ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল! কেন সে বাসের ভাড়া দেয়নি! কেন সে খুচরো ছিটিয়ে দিয়েছিল রাস্তায়! কেন সে আয়নার আলো ফেলেছিল একজন মোটরসাইক্লিস্টের মুখে।

পাইস হোটেলের দরজায় সুবোধ মিত্রর সঙ্গে দেখা। মিত্র হই-হই করে ওঠে-সাড়েসাতটায় আপনি এখানে! আমিতো মাত্র বিকেলের থার্ড কাপ চা চালিয়ে গেলুম, দশটায় খেতে আসবো। চলুন মশাই-বলে মিত্র শ্যামের হাত ধরে-এক্ষুণি রাতের খাওয়া শেষ করলে মাঝরাতে খিদে পাবে। চলুন-

এতক্ষণের শীতভাব কেটে যায় শ্যামের। শরীরের উত্তাপ ফিরে আসে। মনে পড়ে, সারা দিন সে কথা বলেছে খুব কম। হিসেব করে দেখল, সকাল থেকে সে কথা বলেছে মাত্র চারটি লোকের সঙ্গে- প্রথম, চায়ের দোকানের বয়, তারপর হোটেলের ছোকরা চাকরকে মাংস আর দই দিতে বলেছিল, পানের দোকানদারের কাছে চেয়েছিল সিগারেট আর পান, কন্ডাক্টরকে বলেছিল খুচরো নেই, আর আমি নেমে যাচ্ছি।

সে হেসে মিত্রকে বলল-নিয়ে চললেন, কোথায়!

-কাছেই আমার আস্তানা মশাই। চলুন, দেখে আসবেন।

অনুগতের মতো শ্যাম মিত্রর সঙ্গে হাঁটতে থাকে, কেননা, এখন যে-কোনো সঙ্গই তার কাছে প্রিয় বলে মনে হয়। সে মিত্রর দিকে চেয়ে দেখে, এবং পাশ থেকে মিত্রর প্রোফাইল দেখে

তার এমন ধারণা হতে থাকে, যে, মিত্রর বয়স খুব বেশী নাও হতে পারে!

যেতে যেতে মিত্র লন্ড্রী থেকে কাপড় নিল, মুদির দোকান থেকে নিল বাতাসা, ফুলের দাকান থেকে গ্যাঁদফুল নিল কলাপাতায় মুড়ে। এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল মিত্র–আপনি মশাই ক্রিমিনাল!(শ্যামের শীত করে ওঠে।) আমি ভেবেছিলুম আপনি বেকার। আজ হোটেলের ম্যানেজারের কাছে শুনলুম, বেশ ভাল একটা চাকরি করতেন আপনি–অফিসার। ডিরেক্টারের বদমাইসী ধরে দিয়েছিলেন বলে আপনার চাকরি গেছে। হাঃ .....হাঃ... সত্যি নাকি! (শ্যাম মৃদু হাসে) তা আপনি মশাই, এখনো বেশ আদর্শ-ফাদশ্য মেনে চলেন দেখছি!....তা আমারও ছিল মশাই–ওই আদর্শ যাকে বলে। রাজযোগ আর লাইফ ডিভাইন–আমার নিত্যপাঠ্য ছিল, কণ্ঠস্থ ছিল গীতাখানা। কিন্তু মশাই.... (মিত্রর সঙ্গে শ্যামও দুঃখিতচিত্তে মাথা নাড়ে–হয় না।) খানিকটা উঠেও ছিলুম। শেষ দিকে ধ্যানে বসলে গা শিরশির করত, শরীর হালকা বোধ হত, আর জ্যোতি-ফ্যোতিও খানিকটা দেখতে পেতুম। বয়স!... না, তখন আর বয়স এমন কি কুড়ি-টুড়ি হবে। মেরুদন্ড শালগাছের মতো সোজা রেখে হাঁটতুম, বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়াতুম বিবেকানন্দের মতো, আপনমনে বিড়বিড় করতুম–মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যাণ্ড সিস্টার্স.... হাঃ..হাঃ.....! সেই সময়ে আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়সে, রাস্তা-ঘাটে, ঘরে-ছাদে, ক্যালেন্ডারের ছবিতে, সিনেমার পোস্টারে, স্মৃতিতে-স্বপ্নে এত মেয়েছেলে ছিল না মশাই! আর এখন দেখুন, হুড়মুড় করে কোথা থেকে এল এত মেয়েছেলে, ভরে গেল দেশ! বলতে বলতে কেমন ফ্যাকাশে দেখাল মিত্রকে, বিহ্বল চোখে সে একবার চারদিকে চেয়ে দেখল।

শ্যাম লক্ষ্য করে, মিত্রর বাঁ বগলে লন্ড্রীতে ধোয়ানো কাপড়, বাঁ হাতের বাতাসার ঠোঙা, ডান হাতে কলাপাতায় মোড়া ফুল। এখন যদি হঠাৎ মিত্রর ঘাড় কি নাক চুলকে ওঠে, তাহলে হয়তো মিত্র শ্যামকেই বলবে–দিন তো মশাই আমার ঘাড়টা(কি নাকটা) একটু চুলকে! ভাবতেই শ্যাম খুব বিনয়ের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বলল–আপনার ফুলটা আমর হাতে দিন।

মিত্র ঘাড় নাড়ে-না, না। এ আমার নিত্যকর্ম মশাই, মা কাঠের সিংহাসনে একটা ঠাকুর বসিয়েছিলেন, মরবার সময় মিনমিন করে বললেন–ঠাকুরকে একটু ফুল বাতাসা দিস। আমিও রোজ দিয়ে যাই। চার-ছ আনায় হয়ে যায় ব্যাপারটা। নইলে মশাই, ঠাকুর-দেবতায় আমার আর তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। ভগবান টগবান আছে বলে মনে হয় আপনার? বলে উৎসুক চোখে মিত্র শ্যামের দিকে তাকায়, তারপর নিজেই বলে–আছে বোধ হয় কিছু একটা, কিন্তু

বলতে বলতে গলির শেষে মিত্রর ঘরের সামনে পৌছে যায় তারা। মিত্র তালা খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালায়, বলে– এই আমার আস্তানা।

দেয়ালে অনেক ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো গোটা তিনেক ক্যালেন্ডার. ইজিচেয়ার, টেবিল আর এখানে-ওখানে স্তূপীকৃত বইপত্র। জ্যোতিষ-বিদ্যার দুটো পত্রিকা বিছানায় ওলটানো। টেবিলের রবিঠাকুরের ছবিতে একটা মালা পরানো, সামনে ধূপকাঠির স্ট্যান্ড। বিস্তর ধূলো জমেছে সর্বত্র। ঘরের জানালা মাত্র একটি, ভিতরের দিকে আর একটা দরজা। মিত্র বাঁ হাতে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে ডান হাতে দরজাটার ছিটকিনি নামিয়ে বলে–ভিতরটা দেখবেন নাকি!

শ্যাম বলে–থাক।

মিত্র শ্বাস ছাড়ে–কিচেন আছে একটা, ঘুপচি একটা স্টোররুম, ফ্যামিলির কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সব লক্ষ্মীছাড়া।

মিত্র দ্রুত ধুতি শার্ট পাল্টে লুঙ্গি পরে নিল, এক লহমায় ভিতরে গিয়ে চোখ-মুখে, হাতে-পায়ে জল দিয়ে এল, তারপর টেবিলের সামনে একটা আসন পেতে মেঝেতে বসে শ্যামকে হাত দেখিয়ে একটু অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল। শ্যাম লক্ষ্য করে, টেবিলের নীচে ঘুপচির ভিতরে একটা কাঠের ছোট্ট পালঙ্ক। সেখানে রয়েছে পিতলের গোপাল, মাটির কালী. রামকৃষ্ণ আর সারদামণির ছবি, একদিকে আলাদা একটি পিতলের সিংহাসনে চকচক করছে শিবলিঙ্গ। ছোট থালায় গ্লাসে জল আর বাতাসা সাজিয়ে দিল মিত্র, ফুল ভাগ করে দিল সব

দেবতাকে, তারপর চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড বসে রইল।

মিত্র উঠে দাঁড়াতেই শ্যাম বলে –কী মন্ত্র বললেন?

–বললুম, ঠাকুর, খাও। মা ঐ মন্ত্রই বলতেন। বলে মিত্র হাল্কা চালে হাসে–কিছু না মশাই, এ স্রেফ অভ্যাস। অনেকদিন ভুল করে একবার দেওয়া বাতাসা আবার দিয়েছি, জ্বরজারি হলে বিছানায় শুয়ে বলি, ঠাকুর, খাও। ঠাকুর তখন কি খায় কে জানে। তবে প্রসাদী বাতাসা আমি জমিয়ে রাখি কৌটোয়। বিকেলে মুড়ির সঙ্গে চলে যায়–হাঃ হাঃ..

মিত্র যত্নে রবিঠাকুরের ছবির সামনে ধুপকাঠি জ্বেলে দিল। শ্যাম লক্ষ্য করে, ছবির গলায় মালাটা তরতাজা। বোধ হয় সকালে কেনা। সে বলে–ও মালাটা কেন?

মিত্র লাজুক একটু হাসে–এটাও অভ্যাস বলতে পারেন। তবে-বলে একটু দ্বিধা করে মিত্র–আপনাকে বলছিলাম যে, ঠাকুরদেবতায় আমার আর ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু কোথাও কিছু একটা আছে মশাই...রবিঠাকুর... রবিঠাকুর.. বলতে বলতে মিত্র আবর লাজুক একটু হাসে–সে একটা ব্যাপার আছে মশাই, আপনি ঠিক বুঝবেন না।

–কেন?

মিত্র চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে–আসলে রবিঠাকুরকে আমি খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করি।

–সে তো অনেকেই করে। শ্যাম হাসে।

–না, ঠিক সেরকম নয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমি যাই না কখনো, শান্তি-নিকেতন দেখিনি, জোড়াসাঁকোরও ঠিকানা জানি না। না মশাই, রবিঠাকুরের কবিতাও আমি খুব একটা পড়িনি, কেবল বাংলা সিলেকশনে যা ছিল তাই, আর দু একটা ছুটকোছাটকা। পুরো কবিতা একটাও মুখস্ত নেই, তবে দু-একটা লাইন যদি বলতে বলেন তো পারি, যেমন –রমনীর মন সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন। কিংবা, ওগো বধু সুন্দরী... হাঃ হাঃ... না মশাই, ঠিক আপনারা যে চোখে দেখেন, সে চোখে নয়। রবিঠাকুর আমার কাছে অন্য রকম–একেবারে অন্যরকম। আলাদা।

মিত্র এসে শ্যামের পাশে চৌকিতে বসে, গলা সামান্য নামিয়ে বলে– বিপদে পড়লেই আমি রবিঠাকুরকে ডাকি, মশাই। মিত্রর মুখচোখ সামান্য গম্ভীর দেখায়। বলে, ছেলেবেলা থেকে মশাই, আমার এই অভ্যাস। ভাল মনে পড়ে না, সেই কবে ছেলেবেলায় একবার মাথায় টিকটিকি পড়েছিল বলে ভয়ে আমি দৌড় দিয়েছিলাম, দড়াম করে ধাক্কা খেয়েছিলাম বাবার পড়াশুনোর টেবিলে, কেঁদে উঠতে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর রবিঠাকুরের ঐ ছবি–মালা পরানো, সামনে ধুপকাঠি জ্বলছে, আমি কেঁদে বললুম–রবিঠাকুর , আমার মাথায় টিকটিকি...তুমি তাড়িয়ে দাও। আমার ঘন চুলের ভিতর থেকে তক্ষুনি টিকটিকির বাচ্চাটা ছিটকে পড়ল টেবিলে, তারপর দেয়াল বেয়ে উঠে গেল। আমি শিউরে উঠলুম। হাসবেন না মশাই, আমার মনে হয়েছিল, ছবির রবিঠাকুরের চোখেমুখে একটু হাসি ঝিকমিকিয়ে গেল। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিল, পালিয়ে গেলুম। তারপর ক্রমে বুঝতে পারলুম, আমি গোপনে একটা আলাদা রবিঠাকুরকে পেয়ে গেছি। সে আমার গোপন কথার মতো, মায়ের কাছে গায়ের জ্বর লুকিয়ে রাখার মতো করে আমি সকলের কাছ থেকে রবিঠাকুরকে আলাদা করে নিলুম, রাত্তিরে একা অন্ধকার ঘর পেরোতে পারছি না, ডাকলুম–রবিঠাকুর, আমি অন্ধকার পেরোতে পারছি না, পার করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে মনে হত খুব আপনজনের মতো কেউ আমার হাত ধরল, আমি গটমট করে পেরিয়ে যেতুম ঘর। ঘুড়ি ধরা নিয়ে একবার খালাসীপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট লাগছে আমি মার খেঁয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম–ঠাকুর, রবিঠাকুর, আমাকে এরা মারছে, তুমি আমাকে নিয়ে যাও। শুনে থমকে গিয়ে ছেলেগুলো হেসে গড়িয়ে পড়ল–রবিঠাকুর নিয়ে যাবে কি রে ছেলেটা। তাদের হাসির ফাঁকে গলে গিয়ে আমি টেনে দৌড় মেরেছিলুম। আমি কতবার আমাদের ফুলবাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি রবিঠাকুরের সঙ্গে, চলে গেছি বহু দূরের নীলকুঠিতে ফল খেতে, রেল ব্রীজ হেঁটে পার হয়ে চলে গেছি শম্ভুগঞ্জের মেলায়, মাঝিদের ফাঁকি দিয়ে পাট-বোঝাই দুদারা নৌকোর গাঁটরির ফাঁকে বসে চলে গেছি অচেনা গঞ্জে। লোকে ভাবত, একা একা গেছে সুবোধ। কিন্তু তা নয়, আমার সঙ্গে

সব সময়েই থাকত রবিঠাকুর–ঐ অতো লম্বা, মাথায় কালো ঠোঙার মতো টুপি, গায়ে জোব্বা আর দুধ-সাদা দাড়িওলা রবিঠাকুর সবসময়ে থাকত আমার সঙ্গে, একটু কুঁজো হয়ে নরম একখানা প্রকাণ্ড হাতে ধরে থাকত আমার হাত। আমি নিশ্চিন্তে চলে যেতুম যেখানে সেখানে, পথ-হারানোর ভয় থাকত না, জানতুম রবিঠাকুর ঠিক পৌঁছে দেবে, ঝড়ে-জলে জোব্বার আড়ালে ঘিরে রাখবে আমাকে, ঘুমের আগে শুনিয়ে দেবে রূপকথার গল্প। মা, দিদি বা ঠাকুরমার কাছে কতবার শুনেছি, ভূতের ভয় পেলে বুকে রাম নাম লিখিস। সন্ধ্যেবেলা চার তারা না দেখে ঘরে ঢুকিস না। রাত্রে সাপের নাম করলে তিনবার আস্তিক মুনির নাম নিস। আমি সে-সব মানতুম না। আমি গোপনে রবিঠাকুরকে বলতুম–এরা তো জানে না যে, আমার তুমি আছো। তারপর খুব হাসতুম দু'জনে। আমাদের দু'জনের ছিল বাদবাকী সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। না, সবসময়ে নয়, সবকিছু চাইলেই যে পাওয়া যেত তা নয়। এক বার একটা ছেলে আমাদের পোষা দাঁড়ের তোতা পাখীকে ঢিল মেরেছিল বলে আমি চেঁচিয়ে বলেছিলুম–রবিঠাকুর ওর চোখ দুটো কানা করে দাও। তার ফলে দু'দিন বাদে আমার চোখ উঠল। আর একবার আমি আমার ছোটো বোনের কাছে জোঁক করে বলেছিলুম যে, আমি রাত দশটার সময় একা একা ছাদে বেড়িয়ে আসতে পারি। সে বলল, ইল্লি! সঙ্গে সঙ্গে আমি বললুম-বাজি! সে তার জমানো পয়সা বাজি ধরলো। একদিন রাত দশটায় আমি হাসতে হাসতে ছাদে চলে গেলুম। কিন্তু নামবার সময় আমাদের পোষা বেড়ালের গায়ে পা পড়তে বেড়ালটা আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিল। সে রাতে রবিঠাকুর আর কথা বলেনি আমার সঙ্গে; কেননা–কেন আমি জেনেশুনে বাজি ধরেছিলুম। কেন আমি ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিলুম আমার ছোটো বোনটার টিফিন-না-খাওয়া, পুঁতির-মালা-না-কেনা কষ্টে জমানো পয়সা! হ্যাঁ মশাই, যতক্ষণ আমি পবিত্র ও শুদ্ধ থাকতুম, ততক্ষণই রবিঠাকুর থাকত আমার সঙ্গে। ঝড়ে-জলে, আলোয়-অন্ধকারে, ঘরে কিংবা দূরে–সবসময়ে ঐ অতো লম্বা, মাথায় কালো টুপি, জোব্বা পরা দাড়িওলা লোকটা সব কাজ পেলে আমার সঙ্গে থাকত।

ক্রমে মিত্রর চোখে চিকচিক করে ওঠে জল–না মশাই, আপনাদের রক্তমাংসের রবিঠাকুরকে আমি চোখে দেখিনি। আপনার কি মনে হয় আমার রবিঠাকুরের সঙ্গে আপনাদের রবিঠাকুরের কোনো মিল আছে?

শ্যাম মাথা নাড়ে–না।

–আঃ! ঠিক তাই। আসলে আমিই ঠিক আসল রবিঠাকুরকে পেয়েছিলুম মশাই। কিন্তু রাখতে পারলুম না। ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল, গালে এল ব্রণ ঘুমে এল অবৈধ স্বপ্ন, চলায় ফেরায় এল সতর্কতা। আমার ভিতরে মশাই পাপ ঢুকে যেতে লাগল। তখন রবিঠাকুরের কবিতা পড়ি স্কুলে, মানে বই থেকে অর্থ দেখে নিই। কিন্তু কেবলই মনে হয় আমি যাকে চিনতুম এ সে নয়। একদিন আমি আমাদের বাগানের কোণে শিমুলগাছতলায় বসে ঘাসের ডাঁটি দাঁতে কামড়ে আস্তে ডাকলুম–রবিঠাকুর! কোনো সাড়া এল না। আবার ডাকলাম। সাড়া এল না। এল না তো এলই না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ডাকলুম, সকালে নদীর জলের দিকে চেয়ে ডাকলুম......তারপর বসলুম আমার গোপন কান্না কাঁদতে। গেল আমার রবিঠাকুর, গেল আমার সাহস, শুদ্ধতা, গেল আমার শৈশব; বুকের শব্দে বিসর্জনের বাজনা শুনলুম।

মিত্রর চোখ বেয়ে, নেমে এল জল–ঘুমের মধ্যে কোল থেকে যেভাবে সরে যায় বাচ্চা ছেলে। তারপর থেকেই আমার জীবন একটা ট্র্যাজেডী মশাই....

বলতে বলতে আস্তে ফুঁপিয়ে ওঠে মিত্র, হাঁটু মুড়ে মুখ গুঁজে দেয়, কাঁদতে থাকে। একটা ঘোরের মধ্যে শ্যাম এগিয়ে গিয়ে মিত্রর কাছ ঘেঁষে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, এলোমেলোভাবে বলতে চেষ্টা করে–আমি বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি .....

শ্যাম মিত্রর অস্ফুট কথা শুনতে পাচ্ছিল–রবিঠাকুর ছাড়া আমার কিছু নেই–নেই। এখন আমাকে কে আবার দেবে সেই রবিঠাকুর? কে দেবে?

গভীর দুঃখে শ্যাম মাথা নাড়ে–ঠিক।

মুখ না তুলেই মিত্র বলে–সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন।

–কী?

–আমার আর ভালবাসা নেই।

–ভালবাসা নেই? শ্যাম অবুঝের মতো প্রশ্ন করে।

–নেই। আমি আর কোনোদিনই কোনো কিছুতেই তেমন করে ভালবাসতে পারলুম না। বলেই মিত্র গভীরতর কান্নায় ডুবে যেতে লাগল।

মিত্রকে কাঁদতে দিয়ে শ্যাম ধীর, নিঃশব্দ পায়ে উঠে এল। বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে বের করল পকেট থেকে। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে খস্‌ শব্দে হঠাৎ মনে পড়ে যে, আজ একত্রিশ, জন্মদিন পার হয়ে গেল। মিত্রকে খাওয়ানোর কথা ছিল আজ। হল না। সামান্য একটু হেসে শ্যাম হাঁটতে থাকে।

গলির মুখে নির্জন রাস্তায় হঠাৎ একটা খুব লম্বা লোক শ্যামের উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসে। চমকে যায় শ্যাম–মিনু না! না, মিনু না, অন্য লোক, অনেকটা মিনুর মতো দেখতে।

দোতলার সিঁড়িতে সাদা একটা বেড়াল বলের মতো গোল হয়ে শুয়েছিল। শ্যাম অন্য মনে লাথি ছুঁড়ল, "ফ্যাঁস করে লাফিয়ে ওঠে বেড়ালটা, নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ির মাথায়, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যামের দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্যাম দাঁড়িয়ে থাকে, বেড়ালটার দিকে চেয়ে দেখে–ভয়ঙ্কর ঘেন্নায় রাগে বেড়ালটার দু'চোখ জ্বলছে। শ্যাম টের পায়, তার সামনের বাতাস বিদ্বেষে বিষিয়ে আছে। সিঁড়ি ভাঙতে পা তোলে শ্যাম, কিন্তু এগোতে পারে না। বেড়ালটা স্থির চোখে তাকে দেখে। হঠাৎ সে শুনতে পায়, তাকে ফেলে রেখে তারই পায়ের শব্দ সামনের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে আস্তে হেসে ফেলে শ্যাম। না, সব ঠিক আছে। সে নিজই উঠছে সিঁড়ি ভেঙে! শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য সে নিজের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

অনেক রাতেও শ্যাম তার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে ঘন কুয়াশা, গাছপালা স্থির। একটা ল্যাম্পপোস্টের একটু পাথুরে আলোর ভিতর দিয়ে ল্যাঙ করে একটা ঘেয়ো কুকুর চলে যায়। দূরে পুলিশের বুটের শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে শূন্য রাস্তায়।

শ্যাম তার সকালে কেনা প্যাকেটের শেষ সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে।

দেশলাই জ্বালাবার খস্‌ শব্দে ভীষণ চমকে ওঠে সে। তার মাথার ভিতরে টলমল করে ওঠে ঘোলা জল। শূন্য চোখে কুয়াশার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়–মাই গু-উ-ডনেস! টু-ডে কিল্‌ড এ ম্যান!

।।৬।।

লোকটা যে মরেছেই, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অনেকেই দেখেছে ব্যাপারটা, পাড়ায় একটু খোঁজ-খবর করলেই সঠিক খবরটা জানা যেতে পারে। তবু সামান্য দ্বিধায় পড়ল শ্যাম, কেননা, সে যে জানালায় দাঁড়িয়ে আয়নার আলো ফেলছিল এটাও অনেকের পক্ষে দেখে থাকা সম্ভব।

সকালে উঠে তাই শ্যাম প্রথমে খবরের কাগজটা দেখল। না, তাতে কোনো মোটর-সাইক্লিস্টের মৃত্যুর খবর নেই। একজন সাইক্লিস্টের সঙ্গে একটি টেম্পো ভ্যানের ধাক্কা লেগেছিল চিৎপুরে, একটি বাচ্চা ছেলে মারা গেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে রাস্তা পার হতে গিয়ে লরির চাপায়, একজন অজ্ঞাতনামা (৪০) লোক বাস থেকে পড়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে, আর একজন...না, কোনো মোটর সাইক্লিস্ট নয়। কাল কলকাতায় কোনো মোটর-সাইক্লিস্টেরই হয়নি।

বড় হতাশ হল শ্যাম। এখন এই লোকটা, এই লোকটা, এই মোটর-সাইক্লিস্ট লোকটা যদি মরে না গিয়ে থাকে, তবে হয়তো তার হাত-পা একটু কেটেকুটে গেছে, কিংবা ভেঙেছে কয়েকটা হাড়গোড়। সে ক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার পর লোকটা অনায়াসে তার জানালাটা খুঁজে বার করতে পারে, এবং তারপর তাকেও। তখন একদিন না একদিন অকারণে আয়নার

আলো ফেলার জন্য তাকে একটা অচেনা লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। শ্যাম জানে লোকটা আইনগভাবে কিছুই করতে পারে না। তবে লোকটা খুব লম্বা চওড়া এবং নিষ্ঠুর হতে পারে। না, তাকে ভাল করে দেখেনি শ্যাম, শুধু আয়নার আলো তার মুখে ফেলে জানালার নীচে বসে পড়েছিল। কেন আলো ফেলেছিল তা শ্যামের জানা নেই, তবু শ্যাম মাত্র এইটুকুই বলতে পারে।

–না মশাই, আপনার ওপর আমার কোনো রাগ ছিল না। আপনাকে আমি চিনতুমই না। অনেকদিন ধরে আমার হাতে কোনো কাজ নেই, জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে, আর ক্রমে ক্রমে আমি কেমন ঠাণ্ডা মেরে আসছি। কাজেই শরীর-মন গরম রাখার জন্য ঝিমিয়ে পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সারাদিন আমাকে নানা খেলা তৈরি করে নিতে হয়। এই সবকিছুই মশাই একটি কার্যকারণসূত্র বাঁধা। যদি একটা মা-বাপ তোলা গালাগাল আমি সহ্য করতে পারতুম তাহলে আমি আজও থাকতুম সেই শ্যাম–যে টেলিফোন তুলে নেওয়া থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, এই সব কাজই খুব সুন্দর এবং ভদ্রভাবে করত, যে সারাদিন কেবল নিজের কথাই ভেবে যেতো এবং তাহলে এই আলো ফেলার খেলা তাকে খেলতে হত না এবং আপনিও নিরাপদে তেমাথায় মোড় ঘুরতে পারতেন–

শ্যামের এইসব যুক্তি যে লোকটা শ্যামের মতো করেই বুঝবে তার কোনো মানে নেই। সে ক্ষেত্রে লোকটা শ্যামের দিকে দু'-এ পা এগিয়ে আসতে পারে। তখন কী করা উচিত তাও শ্যাম ভেবে দেখল। সে ক্ষেত্রে হাতের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকা দরকার, দেয়ালে থাকা দরকার একটা পালিয়ে যাওয়ার গুপ্ত দরজা, আর জানালা দিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য একটা দড়ির সিঁড়ি। কিংবা, ইতুর সঙ্গে যে ছোঁয়াছুঁয়ির খেলাটা খেলেছিল শ্যাম, সেই খেলাটাও তখন খেলা যেতে পারে। কিংবা সুবোধ মিত্রকে গিয়ে বলা যেতে পারে, 'এক জায়গায় বেশি দিন থাকা ঠিক নয় মশাই, আসুন আমরা ঘর বদল করে ফেলি।'

শ্যাম সামান্য উত্তেজনা বোধ করতে থাকে। সে দ্রুত তার ঘরের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়। একটা মাত্র দরজা, তারপর অপরিসর প্যাসেজ, সিঁড়ি। জানালার কাছে এসে দেখে, প্রায় বারো চৌদ্দ ফুট নীচে শান বাঁধানো ফুটপাত। ফিরে আবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখে শ্যাম। চিন্তায় তার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। ডান দিকের দেয়ালে বাথরুমের পলকা দরজা। নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হয় না শ্যামের। কোনোখানেই সেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, বা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। লোকটা যদি খুব গায়ের জোরওয়ালা লোক হয়, যদি খুব লম্বা চওড়া, নিষ্ঠুর হয়, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য শ্যামকে একটু প্রস্তুত থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় শ্যাম ঘরের ভিতরে অদৃশ্য এবং অনুস্থিত প্রতিপক্ষে তাড়া খেয়ে এদিক-ওদিক দ্রুত সরে গেল। লাফ মেরে উঠল চৌকিতে, কয়েক পাক ঘুরল, বাতাসে ঘুঁষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল, ঘুঁষি মারল দেয়ালে–যেমন ঘুঁষি খেয়ে একবার রূপশ্রী ফার্নিশার্সের ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা চোট খেয়েছিল, আর দেয়ালের একটা দুর্বল অংশের চুণবালি পড়েছিল খসে।

তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে শ্যাম আপনমনে বলল–না মশাই,আপনার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। ছিলও না। বলতে বলতে বাতাসে হাত এগিয়ে দিল শ্যাম খুব বিনীতভাবে, অদৃশ্য এবং অনুপস্থিত লোকটার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, তারপর বলল–চা খাবেন?...হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন, বিছানাতেই বসুন, কিংবা–বলতে বলতে শ্যাম ঘরের একমাত্র চেয়ারটাকে জানালার কাছে টেনে আনল–কিংবা এই চেয়ারটায় বসুন, রোদে পিঠ দিয়ে। চমৎকার আরাম লাগবে, তারপর, আমি আপনাকে দেবো গরম-গরম এক কাপ চা-

বলতে বলতে শ্যাম সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়ায়–না, আপনাকে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছেনা। যদিও আপনার মুখটা একটু কেটেকুটে গেছে, একটা হাতে এখনো ব্যাণ্ডেজ, তবুও আপনাকে বেশ বীরের মতোই দেখাচ্ছে–অনেকটা যুদ্ধফেরত সোলজারের মতোই আপনি কি বিবাহিত? না? তাহলে আরো ভাল, এই অবস্থাতে আপনি মেয়েদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করতে পারবেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বীরপুরুষ ছেলেদের দেখাই পায় না, যে পুরুষ তারা দেখে

সে-ছোকরারা মিনমিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েদের স্কুল-কলেজের আশেপাশে, যাতায়াতের রাস্তায়, পিছু নিচ্ছে কিছুদূর পর্যন্ত, ভুল বানানে লিখছে প্রেমপত্র, পরিচয় হলে নিয়ে যাচ্ছে বড়জোর লেক বা ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায় বা পার্কে, তারপর সেখানে বসে ...থাকগে! আসল কথা, আহত পুরুষ মেয়েরা পছন্দ করে। তাছাড়া, আপনাকে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দেয়নি, আপনি টেম্পো বা ঠেলাগাড়ির ধাক্কা খাননি, রাস্তার হামেশা হাঙ্গামায় বেমক্কা ইঁটের টুকরো এসে পড়েনি আপনার গায়ে। আপনি খানাখন্দেও পড়ে যাননি। আপনি আহত হয়েছেন, মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায়। ব্যাপারটার মধ্যে একটু বীরত্বের গন্ধ আছে না? বলতেই চোখে ছবি ভেসে ওঠে-একটু অহঙ্কারী, সাহসী ছুটন্ত এক পুরুষ দুটো ছড়ানো হাতে বুনো ঘোড়ার ঝুঁটির মতো ধরে-থাকা মোটর -সাইকেলের কাঁপা হাতল, বুক চিতিয়ে, পা বাঁকিয়ে বসে থাকার সেই উগ্র ভঙ্গী,হাওয়ায় উড়ছে চুল, শার্টের কলার এলোমেলো, দাঁতে টিপে রাখা একরোখা একটু হাসি... চমৎকার নয়! ছেলেবেলা থেকেই মোটর-সাইক্লিস্টদের আমি ঐ চোখে দেখে আসছি। বলতে কি, আমার জীবনের একসময়ে একমাত্র লক্ষ্য ছিল বেপরোয়া একজন মোটর সাইক্লিস্ট হয়ে যাওয়া-আর কিছু নয়-কেবল খুব ছুটন্ত একটা মোটর-সাইকেলে ঐ ভাবে বসে থাকা। সেই কারণেই আমার সতেরো-আঠারো বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় এসে আমি সার্জেন্ট দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কোমরে ধূসর রঙের পিস্তল, মাথায় কালো টুপি আর ঐ লাল মোটর-সাইকেল! সার্জেন্ট দেখলে আমি রাস্তার সুন্দরী মেয়েদের লক্ষ্যই করতুম না.....

চেয়ারে অদৃশ্য লোকটা নড়ে ওঠে যেন।

শ্যাম সেঙ্গ সঙ্গে দু'হাত তুলে বলে-না মশাই, আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলছি না, একথা সত্যিই যে খেলার জন্যও আপনার মুখে আয়নার আলো ফেলা ঠিক হয়নি ..কিন্তু দেখুন, আমারও কিছু করার নেই। বড় অসময় চলছে ...সকাল থেকেই দিন লম্বা হতে শুরু করে, সন্ধ্যে থেকেই রাত অফুরান মনে হয়। কিছু ঘটে না, বস্তুতঃ কিছুই ঘটে না। দিনে দু'বার চিঠির বাক্স খুলি; আমি ... পাখির বাসার মতো ছোট্ট চিঠির বাক্স খুলতে গিয়ে প্রতি বার মনে হয়-দরজা খুললেই লাফিয়ে পড়বে একটা খরগোসের বাচ্চা, কিংবা হাত দিলেই পাওয়া যাবে গোলাপী কাগজে মোড়া কোনো উপহার, কিংবা অচেনা মেয়ের লেখা ভালবাসার চিঠি। কিছুই ঘটে না, বস্তুতঃ কিছু ঘটে না।..... সকালে উঠে মনে হয় আজ কেউ আসবে-খুব অচেনা রহস্যময় কেউ-যাকে দেখে মনে হবে চেনা, অথচ চেনা যাবে না, এবং যে যাওয়ার সময় কিচু রহস্য রেখে যাবে; ঘুমোবার সময়ে মনে হয় আজ স্বপ্নের ভিতরে আমি পেয়ে যাবো কোনো দৈব শিকড়বাকড়, ক্যানসারের ওষুধ কিংবা গুপ্তধনের সন্ধান; কুয়াশার রাস্তায় হাঁটবার সময়ে, মনে হয়, কুয়াশা কেটে গেলেই দেখতে পাবো আমি হঠাৎ অচেনা বিদেশে পৌঁছে গেছি, যেখানে খাওয়ার লোক নেই বলে ইলিশের ঝাঁক চলে যাচেছ সমুদ্রে, গরুর বাঁট থেকে খসে পড়ছে দুধ, চাক থেকে মধু চুঁইয়ে মাঠ যাচ্ছে ভিজে, যেখানে সৎ ব্যবসায়ীরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে-যোখানে সারা দেশে একদাম, যেখানে শান্ত ধার্মিক মানুষেরা ধীরে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারা বছর যেখানে চলেছে উৎসব ...

শ্যাম চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়ায়, মাথা নাড়ে-কিছুই ঘটে না! বস্তুতঃ কিছুই ঘটে না!

তারপর শ্যাম বিনীতভাবে অদৃশ্য অনুপস্থিত লোকটাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়-আচ্ছা, আবার দেখা হবে.......

ঘরের মাঝখানে আবার ফিরে আসে শ্যাম, বিষণ্নভাবে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ 'ইয়াঃ বলে চমকে হেসে ওঠে। সিগারেট ধরিয়ে আবার খবরের কাগজটা তুলে নেয়, গুন গুন করে বলে-মাই গু-উ-ড-নেস, আই কুডনট কিল দ্যা ম্যান।

ঘরের চারিদিকে অন্য মনে চেয়ে দেখে শ্যাম-নাঃ, বস্তুতঃ কোথাও নেই লুকিয়ে থাকবার জায়গা কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

দুপুরে বেরোনোর সময় শ্যাম তিনটে চিঠি পেল।

জীবনবীমার প্রিমিয়ামের চিঠি, খামের উপর দু'হাতে আড়াল করা প্রদীপের ছবি আপনার জীবন মূল্যবান। ইলেকট্রিকের বিল, আর পাকিস্তানের কালচে খামে বাবার চিঠি। কোনোটাই ভাল করে পড়ে দেখে না শ্যাম। বাবার চিঠির দিকে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-আধটা লাইন চোখে পড়ে– সঞ্চয়ী না হইলে ভবিষ্যতে নিরুপায় হইবা... এতদূর হইতে আমরা তোমার জন্য আর কী করিতে পারি, ভরসা একমাত্র দয়াল ঠাকুর.... চাকুরীর বন্দোবস্ত হইল কিনা সত্বর জানাইবা...সোনাকাকা ও রাঙাপিসির খোঁজখবর লইও, অভাবের সময়ে আত্মীয়স্বজন.. আশু গাঙ্গুলীর সহিত দেখা করিও। সে আমার বাল্যবন্ধু, হাওড়ায় তিনটা লোহার কারখানা, ডোভার লেনে চারিতলা বাড়ি, গাড়ি...জমিজমা আর কিনিতে ভরসা হয় না, অসময় পড়িয়াছে....সময় থাকিতে হিন্দুস্থানে না যাওয়া অবিবেচকের কাজ হইয়াছে......এখানে গঙ্গা নাই, বড় দুঃখ.....ধনভাইয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সমারোহ হয় নাই, হিন্দুস্থান হইতে তাঁহার ছেলেরা আসিতে পারে নাই, জ্ঞাতিরা মুখাগ্নি করিয়াছে....বড় ভয় হয়...তোমার মায়ের অবস্থা পূর্বতবৎ শয্যাশায়ী. পুলিনের বউ আসিয়া রান্নাবান্নার কাজ করিয়া দিয়া যায়......তোমার মা ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে তোমার নাম ধরিয়া ডাকেন......এখানে জিনিসপত্রের দাম....চালের দাম যাহা শুনি, তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়....বাঙালীর ছেলে, দুইবেলা ভাত না খাইলে শরীর থাকে না....সাবধানে থাকিও.....এখন ঠাকুর ভরসা ....তোমাকে সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চিন্তে চোখ বুজিতাম।

দশ বছর আগে বাবা শেষবার এসেছিল কলকাতায়, শেয়ালদায় আনতে গিয়েছিল শ্যাম। দেখল, যেন একটা অচেনা লোক, একটু কুঁজো, কালো রোগা চেহারা। প্রণাম করতেই পিঠে হাত রেখেছিল বাবা, কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপেছিল–মনু, কেমন আছ? যে কয়দিন ছিল, বাবা একটুও স্থির থাকেনি। কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, বৈঁচীগ্রাম, সোদপুর কিংবা ডায়মন্ড হারবার ঘুরে বেড়িয়েছিল আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি। তাকে ডেকে বলত– মনু, চিন্যা রাখ। আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিগুষ্টি চিন্যা রাখতে হয়, বিপদে আপদে আপনা রক্তের মানুষ কামে লাগে। এদিকে জমিজমার খোঁজ করেছিল, সম্পত্তি বিনিময়ের চেষ্টাও হয়েছিল একটু, তারপর বলেছিল–আমাগো আর আহন হইব না। ভাল লাগে না রে মনু, এই দ্যাশ বড় রুঠা! পাকিস্তান উঠে যাবে কিনা সে খোঁজখবরও একটু নিয়েছিল বাবা। মা পাঠিয়েছিল আমসত্ত্ব, গোকুল পিঠে আর নতুন কাপড়। মাসখানেক পরে বনগাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত বাবাকে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল শ্যাম। মনু, ভালো থাইকো–এই কথা বলে এদেশের সীমা ডিঙিয়ে গেল।

এখন এই যে লোকটা তাকে চিঠি লেখে, তার ভালমন্দের খবর নেয়–এ লোকটা কে! বাবা? কিরকম বাবা! তার মুখ মনে পড়ে না, ভিন্‌দেশী এক অচেনা লোক, ভিটের মায়া ছেড়ে আসতে পারেনি–এ লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? শ্যামের বাক্সে বাবা-মার একটা জোড়ের ফটো আছে। পিছনে রাজবাড়ির সিন্‌ ফেলা, পাশে ফুলের টব, সূতীর ডোরাকাটা একটা কোট গায়ে, ধুতি আর পাম্পশু পরা গ্রাম্য লোকটা বুক চিতিয়ে বসে আছে পাশে ধোয়া পাট-ভাঙা জংলা-পেড়ে শাড়ি-পরা মা-জবুথবু, ছোট্ট একটুখানি মানুষ, ক্যামেরার লেনসের দিকে কৌতূহলী চোখ। বিশ্বাস হতে চায় না যে এঁরা শ্যামের মা-বাবা, এঁরাই তার জন্মের কারণ এঁরাও তো জানেন না শ্যাম কে, কিংবা কোথা থেকে এল!

না, বহুকাল আর সেই ছবি বের করে দেখে না শ্যাম, আগে মায়ের জন্য কাঁদতো, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে কিংবা নতুন চাকরিতে যাওয়ার সময়ে প্রণাম করে যেতো ঐ ছবি। তারপর আস্তে আস্তে কর্পূরের গন্ধের মতো মন থেকে মুছে গেছে ঐ দুটি মুখ। মনে পড়ে না, আর তেমন করে মনে পড়ে না। কেবল মাঝে মাঝে হরিধ্বনি দিয়ে যখন মড়া নিয়ে যায়, তখন চমকে উঠে মনে পড়ে কুয়োতলা, ঘাটে যাওয়ার মেঠো পথ, করমজার গাছ, পগারে লাফিয়ে পড়ছে ব্যাঙ; মনে পড়ে, প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের ঘরের দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো করে মা বসে আছে– মুখের চামড়ায় নেমেছে শিকড়বাকড়, কথা বলতে গেলে মাথা

কাঁপে–সামনের অন্ধকার, এক– আকাশ, অস্পষ্ট নক্ষত্র, আর রক্তের মধ্যে অতি দুর্বোধ্য মৃত্যুর হিম অনুভব করতে করতে অসহায় মা বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছে–মনু, মনু রে, অ মনু মনু ...মনু, মনু রে, অ মনু ....

মনে মনে শ্যাম প্রশ্ন করে–তুমি আমার কে? তোমরা কারা? না, আমি তোমাদের চিনি না। তারপর চমকে ওঠে সে অস্থির হয়ে আবার বিড়বিড় করে বলে–তোমরা ভাল থেকো। বেঁচে থেকো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না আমি ভাল আছি। আমি খুব ভাল আছি। দেখো, একদিন খুব সুসময় এসে যাবে। ভাল জমিতে আমরা তুলবো ঘরবাড়ি, তৈরি করবো বাগান, মাছ ছেড়ে দেবো পুকুরে, ছাড়া জমিতে বসিয়ে দেবো জ্ঞাতিদের ঘর, এক-আধজন বোষ্টম, আর ধোপা নাপিত। দূর বিদেশ থেকে আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসবো, আমি নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসবো সুদিন......। সেই কবে ছেলেবেলায় শোনা ঘুমপাড়ানি গান গুন গুন করে শ্যাম–মায়রে দিলাম ডবল শাঁখা, ভাই করাইলাম বিয়া, বাপরে দিলাম সোনার মটুক, তীর্থ কর গিয়া ......

।। ৭।।

ঠিক দুপুরবেলা গড়িয়াহাটার মোড় থেকে একটা লোকের পিছু নিল শ্যাম। অকারণে। লোকটা কালো, হাড়গিলে রোগা চেহারা অত্যন্ত কর্কশ তার মুখ, সেই মুখে মোটা গোঁফ, চোখে গগল্‌স; পরনে টেরিকটনের গাঢ় রঙের চাপা চোঙা প্যান্ট, গায়ে ঝকঝকে ক্রীম রঙের সিল্ক শার্ট, হাতে ফোলিও ব্যাগ। চমৎকার ঝকঝকে পোশাকের ভিতরে কালো হাড়গিলে লোকটাকে বেমানান এবং আরো কুচ্ছিত দেখাচ্ছিল–যেন কারো জামাকাপড় চুরি করে এনে পরেছে।

লোকটা বাটার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জুতো দেখল, তারপর শ্লথ গতিতে হেঁটে গেল মোড় পর্যন্ত, সিগারেটের দোকান থেকে কিনে নিল এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট, কাপড়ের দোকানের ডামির দিকে চেয়ে একটু হাসল আপনমনে, একটা কানা ভিখিরিকে তাড়া দিল, দাঁড়িয়ে দঁড়িয়ে লক্ষ্য করল একটি সুন্দরী মেয়ের চলে-যাওয়া। তারপর ধীর গতিতে পার হয়ে ট্রাম স্টপের দিকে চলে যাচ্ছিল লোকটা।

আগাগোড়া লোকটাকে লক্ষ্য করছিল শ্যাম। মনে হয় খুব সহজ শান্ত ও ভদ্র জীবন যাপন করে না লোকটা। চারদিকে ওর সতর্ক চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে ও ধরনের লোকই ভদ্রলোকদের পকেট হাতড়ে দেখে কিংবা নিদেন সবার অলক্ষ্যে মেয়েদের নরম বুক ছুঁয়ে সরে যায়। একটা কিছু এ ধরনের কাজ করবেই লোকটা । শ্যাম নিশ্চিত। সামান্য উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। লোকটাকে চোখে চোখে রাখে, পিছু নিয়ে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়ায়। লোকটা সবুজ রুমাল বের করে অকারণে ঘাড় গলা মোছে, স্টপে দাঁড়ানো মেয়েদের লক্ষ্য করে–চোখেমুখে চিকমিক করে ওঠে কামনা-বাসনা। কিন্তু কিছুই করে না লোকটা।

ট্রামে উঠেও লোকটা খুব ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকে–মেয়েদের কাছে ঘেঁষে না, ভদলোকদের পকেটের দিকে তাকায় না।

এন্ডির চাদরের ভিতরে শ্যামের হাত মুঠো পকিয়ে যায়, সে মনে মনে বলে–এবার একটা কিছু করো হে আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। ভয় কি! ঐ যে মোটা মতো লোকটা–পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, ঘাড়ের চুল পুলিসদের মতো করে ছাঁটা, লক্ষ্য করে দ্যাখো লোকটা ঢুলছে। ওর বুক-পকেট থেকে মুখ বের করে আছে একটা খাম। ওটা তুলে নাও। কিংবা ঐ যে মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো–পরনে মভ রঙের শাড়ি, মাথায় বিড়ে-খোঁপা, ওর চোখমুখ দ্যাখো –সুন্দর নয়, কিন্তু বাঘিনীর মতো কামুকা-জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা ওর স্বভাব–ওর গায়ে তুমি নিশ্চিন্তে হাত দিতে পারো–কিছুই হবে না। ভয় কি?

কিন্তু লোকটা খুব ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটু কুঁজো হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাঘাট দেখবার চেষ্টা করে। শ্যাম হতাশ হতে থাকে। এমন পাকা বদমাসের মতো চেহারা তোমার!–শ্যাম বলতে থাকে– তুমি শুধু চোখ দিয়ে যে-কোনো মেয়েকে গর্ভবতী করে দিতে

আর তার একটু অনিশ্চিত চোখ আর নগ্ন দুটি হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্লান্তহীন টেলিফোনের চাবি থেকে নোট বই, খোলা কাগজ এবং আবার টেলিফোনে। দুটি কাজের হাত তারা–স্বয়ংক্রিয়। তবু শ্যাম দেখে, যেন পিয়ানোর চাবি ছুঁয়ে যাচ্ছে।

শ্যামের আশেপাশে যারা বসেছিল, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে এসেছে, তাই একটু পরে পরে প্রত্যেকেরই ডাক এল। ভিতর থেকে, এবং এইভাবে আস্তে আস্তে তার আশপাশ খালি হয়ে গেল। এক সময়ে দেখল শ্যাম যে, সে একা বসে আছে। আর রিসেপশনের মেয়েটি তার অত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ্য করছে

খুব অবাক হয়ে শ্যাম টের পায়, তার বুকের মধ্যে রেলগাড়ির সেই স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার শব্দ–ধীরে থেকে দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। সামান্য তেষ্টা পাচ্ছিল তার। পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেট নেই। কাঁচের দরজা ঠেলে দুটি চটপটে মার্কিন ভদ্রলোক ঘরে আসে, কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়, নীচু স্বরে কী একটু রসিকতা করে। মেয়েটি হেসে তার সমাপ্রতিভ চোখেমুখে জবাব দিয়ে দেয়। আবার শূন্য হয়ে যায় ঘর। কিছু একটা লিখে রাখতে গিয়ে কোনো ভুল ধরা পড়ায় মেয়েটি জিভ কেটে পরিষ্কার বাংলায় বলে 'এঃ মা!' চকিতে একপলক শ্যামকে লক্ষ্য করে চোখ নামিয়ে নেয়। টেলিফোন শব্দ করে উঠলে অবলীলায় টেলিফোন তুলে নিয়ে তুখোড় ইংরিজীতে বলে–ওঃ বোস .... মিস্টার বোস! ইয়েস মিস্টার বোস...হিয়ার হি ইজ...থ্যাঙ্ক ইউ। আবার চকিতে চোখাচোখি হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে অস্বস্তি পেয়ে বসে শ্যামকে। সেই এই প্রথম টের পায় অনেকদিন হয়ে গেল সে আর নিজেকে সাজায় না। অযত্নের বাগানের মতো বন্য হয়ে গেছে তার শরীর, পুরোনো পুঁথিপত্রের মতো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে চোখের চাউনি। এণ্ডির চাদরের তলায় তার স্খলিত হাত আর পেট থেকে বুক পর্যন্ত সন্তর্পণে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখে–না, কোনোখানে নেই সেই পুরোনো শ্যাম। বস্তুতঃ তার মনে হয় এই-যে লোকটা সে–এণ্ডির চাদর গায়ে, গালে দাড়ি, ভিতরে অস্থির এক রেলগাড়ির পুল পেরিয়ে যাওয়ার গুম্ গুম্ শব্দ–একে কোনোকালে কখনো চিনত না শ্যাম। ঐ মেয়েটির সামনে ধরাপড়া অসহায় এক অচেনা লোক বসে আছে।

কি ভাবছো তুমি? আমি বাইরের দুপুরের রোদ এড়াতে কৌশলে তোমাদের এই ঠাণ্ডা সুন্দর ঘরে ঢুকে বে-আইনীভাবে বসে আছি? কিংবা আমি বদমাস, তোমাকে সুন্দর দেখে তোমার মুখোমুখি বসে আছি, সময়মতো হতো বা পিছু নেবো? কিংবা আমি যে চোর-জোচ্চোর মতলববাজ নই সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত হতে পারছো না? শ্যাম মনে মনে এই সব কথা বলে মেয়েটিকে। যেন বা একা একটি ঘরে সুন্দরী মেয়েটির মুখোমুখি তাকে বসিয়ে রেখে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

সে সহ্য করতে পারে না। সামনের টেবিলে রাখা এক স্তূপ পত্র-পত্রিকা থেকে একটা ছবির কাগজ তুলে নিয়ে তার ওপর মুখ নীচু করে রাখে। সিগারেট নেই–সে কথা ভুলে গিয়ে পকেটের দিকে হাত বাড়াতেই চটাস করে শব্দে–হাত পা কেঁপে ওঠে তার।

এইসব ছোটোখাটো অথচ গুরুতর ঘটনা ঘটে যেতে থাকলে শ্যাম প্রাণপণে চেষ্টা করে মেয়েটার দিকে আর না তাকানোর। কিন্তু তারপর একটা সময় এল যখন আর ভিজিটর আসছিল না, টেলিফোনেও আর কোনো শব্দ নেই, শূন্য ঘরে মেয়েটি ও সে দূরন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে ছিল।

তারপর টেলিফোনের ক্র্যাডেল থেকে রিসিভার তোলার শব্দ, তারপর দ্রুত ডায়াল করবার মিষ্টি শব্দ হচ্ছিল। তখন মেয়েটি ব্যস্ত আছে ভেবে সন্তর্পণে একবার চোখ তুলেই ভয়ঙ্কর চমকে উঠল শ্যাম। মেয়েটি বাঁ হাতে টেলিফোনটা কানের কাছে ধরে রেখেছে, ডান হাতের সামনের রিসেপশন কাউন্টারে একটা হলুদ পেন্সিল ধরে আছে কিন্তু সে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে শ্যামের দিকে। চোখ পড়তেই সে পেন্সিলটা রেখে দ্রুত তার ডান হাত তুলে মাউথপীসটা চাপা দিল, পরমুহূর্তে সে পাখির মতো তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলায় সোজা তাকে প্রশ্ন করল–হুম্ ডু ইউ ওয়ান্ট, প্লীজ?

মাথার ভিতরের হঠাৎ ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। কাকে চাই? আমি কাকে চাই? তীব্র আবেগে থরথর করে শ্যামের হাত পা কেঁপে ওঠে। মুহূর্তেই ভুলে পেয়ে বসে তাকে। মনে পড়ে না কাকে চাই, কিছুতেই তার মনে গড়ে না। শুধু মনে হয় এতক্ষণ এইখানে এই-সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরে সুন্দর মেয়েটির মুখোমুখি বেমানান বসে থেকে সে এদের শৌখীন সুন্দর কোনো আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছিল– বাস্তবিক সে কেন এখানে বসে আছে? কেন বসে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তার গলা আটকে আসছিল শুধু মাথা নেড়ে জানাল–না, সে কাউকেই চায় না। সে কারো জন্য বসে নেই। এখানে তার কোনো কাজ নেই।

দরজার দিকে কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম। দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয়ে শিউরে ওঠে তার গা। লক্ষ্য করে, হাঁটবার সময়ে দরজাটা সরে যাচ্ছে। বাঁ থেকে ডাইনে। আবার বাঁয়ে। বড় অদ্ভুত! শ্যাম দ্রুত চোখ বুজে ফেলে। আবার হেঁটে যায় কয়েক পা। চোখ খুলে দেখে সে কাউন্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ভ্রূ সামান্য তুলে তাকে দেখছে। যেন প্রশ্ন করতে চায়–তুমি কে?

আমি কে! স্মৃতিহীন নির্বোধ শিশুর মতো শ্যাম অবাক চোখে অচেনা চারদিকে চেয়ে দেখে। বড় অসহায়ের মতো হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ারের হাতল কিংবা একটা টেবিলের কিনারা খোঁজে সে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, সে বিড়বিড় করে বলে–প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না। বৃষ্টির জলের মতো দুঃখে তার বুক ভরে ওঠে–আমি জানি না আমি কেন গাছ হয়ে জন্মাইনি! জানি না আমি মাছ হয়ে জন্মালেই বা কী ক্ষতি ছিল।

চেয়ার থেকে ধীরে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি–লে' মি হেল্প ইউ!

বুকের ভিতরে আর্তস্বরে কথা বলে শ্যাম–না। আমাকে ছুঁয়ো না। মুখে কথা ফোটে না, তাই সে কেবল মাথা নাড়ে-না। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছু হেঁটে যায় শ্যাম। কাচের পাল্লায় হাত রাখে। সাদা মুখে ঘাবড়ে যাওয়া মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থাকে।

পাল্লা ঠেলে রোদ আর লোকজনের ভিতরে বেরিয়ে আসে শ্যাম। ফুটপথে দাঁড়িয়েও সে বিড়বিড় করে বলে–প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না।

তারপর শ্যাম হঠাৎ 'ইয়াঃ' বলে হেসে ওঠে। মাথা নাড়ে–না, কোনোখানেই নেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। সব জায়গাতেই তার জন্য অপেক্ষা করছে ঐ প্রশ্ন –তুমি কে!

না, শ্যাম জানে না। শ্যাম সত্যিই জানে না।

অনেকক্ষণ বাদে তার ফেরানো পিঠে হাত রাখল অরুণ–কি ব্যাপার! বাইরে কেন?

–এমনিতেই ! শ্যাম ম্লান হাসে।

–ভিতরে তোকে খুঁজে না পেয়ে চমকে গিয়েছিলুম! শেষে রিসপেশনের মেয়েটি দেখিয়ে দিল যে, তুই বাহিরে দাঁড়িয়ে আছিস। বলে সুন্দর ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি দাঁতে কামড়ে ধরল অরুণ–দেখলি–

–কি?

অরুণ বড় চোখে তাকায়–তোমাকে আমি চিনি না শালা! আমি ইচ্ছে করেই দেরী করছিলুম, ঠিক জানতুম তোর এক্স-রে আই, এ-ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেখে নিবি! তবে এটা তেমন নয়, বুঝলি! মিস্ দত্ত আরো হট্। এ নতুন। বলতে বলতে চিকমিক করে ওঠে অরুণ–আলাপ করবি? আমার সঙ্গে কয়েকদিনের যাতায়াতেই খুব খাতির। নাম-লীলা ভট্টাচার্য। করবি আলাপ?

–না। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে– না।

শ্যাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজার কাঁচের পাল্লা দিয়ে রাস্তা থেকেও মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির কৌতূহলী চোখ আবার তার চোখে পড়ল। শ্যাম ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

–কী হল তোর শ্যাম! জিভ দিয়ে চিক্‌চিক্ একটা শব্দ করে অরুণ।

–কি জানি! হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম বলল–কোনখানে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে

আমার।

ভ্রূ কুঁচকে অরুণ বলে—কি রকম!

—হাইস্কুলে পড়ার সময় মেয়ে দেখলে যেমন হত অনেকটা সেরকম নার্ভাস বোধ করছিলুম। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আমি কাউকে চাই কিনা। অমনি মনে হল ওখানে বসে থেকে আমি অন্যায় করছি, চোরের মতো উঠে এলুম। অথচ এর চেয়েও কত তুখোড় কেতাওয়ালা জায়গায় আমি অনায়াসে গেছি সেদিনও, কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে এরকম মেয়েদের বলেছি, 'হেল্লো'...

জিজ্ঞাসার চোখে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ।

—গোলমাল হয়ে গেছে। শ্যাম মাথা নাড়ে—অনেকদিন বাদে আমি টের পেলুম যে, আমি প্রেমে পড়ে যেতে পারি।

লীলার?

—না। লীলা বলে নয়। যে কোন মেয়ের। আশ্চর্য! এতকাল যখন বৃন্দা মাধবী কিংবা ইতুর সঙ্গে ঘুরেছি, শুয়েছি এক বিছানায়, আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ভাল লাগার মতো কিছু পাওয়া যায় কিনা তখনো আমাকে বুকের মধ্যে রেলগাড়ির শব্দ হয়নি কখনো। মনে হয়নি যে, এর মধ্যে কোন রহস্য আছে আর। মনে হয়, কোনো কিছুই বাকী রাখিনি বলে আমার ঠিক তৃপ্তি কখনো হয়নি। বুকের কাছে কোথাও একটা দুঃখ চাপ বেঁধে আছে।

—কী সব বলীছস রে?

—ঠিক বলছি। শ্যাম মাথা নীচু রেখে বলে—কে যেন বলেছিল, ঈশ্বরজ্ঞান না হলে মেয়েদের ঠিকমতো চেনা যায় না! কে বলেছিল বল তো!

—কি জানি! ঠোঁট ওল্টায় অরুণ—রামকৃষ্ণ-ফৃষ্ণ কেউ হবে!

—হবে!

একটু চিন্তিতভাবে মৃদু হাসে অরুণ—এক লীলা ভট্টাচার্যই তোকে ঈশ্বরজ্ঞান দিয়ে দিল আধ ঘন্টায়!

—না। শ্যাম হাসে—আমি শুধু এটুকু বুঝলুম যে, আমার ভিতরে এখনো এত আশ্চর্য রেলগাড়ির শব্দ আছে, আর আছে অতৃপ্তি। মনে হয় মেয়েরাই আমাকে ঠকিয়েছে সবচেয়ে বেশী। সবকিছু নিয়েও আসল রহস্যটুকু আঁচলে বেঁধে নিয়ে গেছে। কিংবা কি জানি, হয়তো সে রহস্যও আমার সামনে খোলা চিঠির মতো মেলে-ধরা ছিল। আমি ধরতে পারিনি। তাই মেয়েটা যখন প্রশ্ন করল আমি কাউকে চাই কিনা তখন হঠাৎ নিজেকে ভিখিরি বলে মনে হল, মনে হল আমার নাম-পরিচয় নেই। আমি এত তুচ্ছ ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যান্ট্ যে, আমার জন্ম না হলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলুম না, আমি গাছ হয়ে কেন জন্মাইনি, আমি কেন হইনি জলের মাছ?

ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল অরুণ—শ্যাম!

—কথা বলিস না অরুণ। শ্যাম আস্তে বলল—আমি নিজেকে এতকাল ভীষণ ইম্পোর্ট্যান্ট ভেবে এসেছি। আমার সবকিছুই খুব সহজে পাওয়ার কথা—আমি ভেবেছিলুম। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে—যা পেয়েছিলুম তা ভুল। আমাকে এতকাল সবাই ঠকিয়ে এসেছে। নইলে কেন আমার বুকের ভিতরে এখনো রেলগাড়ির শব্দ? আমি কেন মাঝে মাঝে দরজা খুঁজে পাই না? গাছের ছায়া খুঁজে পাই না? কোথায় ভুল হচ্ছে? এতকাল তো আমার সব দরজাই ছিল চেনা, সহজে খুলেছি... হঠাৎ ভালবাসার জন্য আবার আমার হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছে করছে।

চোখ কপালে তোলে অরুণ—কী ব্যাপার বল তো!

ক্লান্তভাবে হাসে শ্যাম—কিছু না।

—ধুস্ শালা! অরুণ হো হো করে হাসে, হাসতে হাসতে নিজের পেটের দিকে আঙুল দেখায়— সবকিছুর মূলে ঐ পেট! বায়ু থেকেই তোর সবকিছু হচ্ছে। রোজ রাতে ইসবগুলের ভূষি খাবি, সকালে উঠে গরমজলে লেবুর রস। আমি যখন ব্যাচেলর ছিলুম তখন আমার পেটের

কমপ্লেনই ছিল এগারো রকমের... লীলা ভট্‌চার্যকে আমি বলে রাখব যে, তুই সেইন্ট্‌ অ্যান্ড মিলারের এক্স-ছোটসাহেব। ভাল খেলোয়াড়-উভয়ার্থে। বলে রাখব যে, তুই দাড়ি না কামিয়ে চাদর গায়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ভুল করে যেন তোকে ছেড়ে না দেয়। ....

এসপ্ল্যানেডে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ' হেঃ ট্যাক্সি ....' বলে ট্যাক্সি দাঁড় করায় অরুণ। শ্যামকে বলে চল তোকে পৌছে দি।

হাই তোলে শ্যাম, বলে-নাঃ। বাসায় ফেরার তাড়া নেই। আমি একটু ঘুরে-ফিরে যাবো। তুই যা।

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার আগে অরুণ নীচু গলায় বলল-যদি মনে ধরে থাকে তো লেগে যা। আমি দেখব। ..চাকরির জন্য ভাবিস না শ্যাম, আমার শ্বশুরের ফার্ম, আমি যাওয়ার আগে বুড়োকে পগিয়ে যাবো, তোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলতে বলতে ভীষণ বদমাসের মতো হাসে অরুণ-শরীরটা কেমন দেখছিস আমার? ভাল না?

-আঃ ফাইন! শ্যাম হাসে।

-ফর অ্যামেরিকা, দি ল্যাণ্ড অব্‌ ফ্রি সেক্স! দেখিস, ষাট বছর বয়সেও আমি শরীর রেখে দেবো! চিয়ারিও....

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে হাত দেখায় অরুণ। বিদেশী এক অরুণ যাকে ঠিক ঠিক চেনে না শ্যাম অথচ চেনা বলে মনে হয়!

শূন্য মনে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথার মধ্যে ভ্রমরের শব্দের মতো দূরাগত এক মোটর সাইকেলের আওয়াজ ঘুরে বেড়ায়। অস্থির বোধ করে সে। খ্রীস্‌মাসের জন্য সাজানো দোকানপাট রঙীন কাগজের শেকল, বুড়ো সান্টা ক্লস আর নকল পাইন গাছ চোখের পাশ দিয়ে সরে যায়। হ্যাণ্ডবিলে বিজ্ঞাপন বিলি করছে একটা লোক। শ্যামের হাতেও সে একটা কাগজ গুঁজে দেয়। তাতে ইংরেজীতে বড় হরফ লেখা-আপনার বিপদ কেটে গেছে.. তারপর একটা ওষুধের গুণ-বর্ণনা। মৃদু হেসে কাগজটা দুমড়ে ফেলে দেয় শ্যাম-মনে মনে গুন্‌ গুন্‌ করে শ্যাম-আঃ, আমার বিপদ কেটে গেছে! বিপদ আর নেই।

।। ৮ ।।

ফিরবার সময়ে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের জানালার ধার ঘেঁষে বসা একটা লোক মাথা নীচু করে তাকে আদাব দিল। পরনে পায়জামা, লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা পাঞ্জাবি আর মাথায় মোটা সুতোয় বোনা নেট্‌-এর একটা গোল টুপি, যা মাথার সঙ্গে চেপে বসেছে। চোখে সূর্মা। ইরফান!

-ইরফান! কেমন আছো!

শ্যাম ট্রামে উঠতেই লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিল-বসুন চক্রবর্তী বাবু।

শ্যাম বসল না, ইরফানের কাঁধে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে বলল-আরে তুমি বোসো। বোসো।

ইরফান মৃদু হেসে বলল-কী খবর?

ইরফানের মুখে আবার সেই বিনয়ের হাসি-আজকাল আসেন না আর!

না, অনেককাল শ্যাম আর যায় না রাজাবাজারের ইরফানের কাছে। যাওয়ার দরকার হয় না। আগে প্রতিমাসে যেতে হত। আড়াইশ টাকা জমা দিলে ইরফান তার ঢাকার এক আত্মীয়কে চিঠি লিখে দিত-"আমাদের দক্ষিণের বাগানে এবার খুব আম হইয়াছে। বানিখাড়ার কমলাক্ষ চক্রবর্তীকে দুইশত আম পাঠাইয়া দিবেন।" আর বাবা ঠিকঠাক দুই শ'টাকা পেয়ে যেতো ওখানে।

-কাজ-কারবার কেমন। শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

-মন্দা। হুণ্ডি ধরে ফেলেছে। নীচু গলায় বলে ইরফান। হাসে-এখন কারবার সাহাবাবুদের হাতে আর ঢাকার মাড়োয়ারী।

কোনো কথাই ভাল করে শুনছিল না শ্যাম। একটা অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রাম, হু হু করে হাওয়া লাগে। শ্যাম বয়স্ক ইরফানের সুর্মা-টানা সঙের চোখের মতো চোখে চোখ রেখে চেয়ে থাকে। ভদ্রতার হাসি হাসে।

পার্ক স্ট্রীটে নেমে গেল ইরফান। নামার আগে হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলল–যদি পাকিস্তানে যাওয়ার দরকার পড়েতো বলবেন। হাতে ভাল এজেন্ট আছে, বর্ডার পার করে দেবে, আবার দশদিনের মাথায় ফিরিয়ে আনবে। কোনো ভয়-ডর নেই। বলবেন।

পার্ক স্ট্রীটে নেমে গেল ইরফান। যাওয়ার সময়ে আবার আদাব দিল রাস্তা থেকে।

ইরফান নেমে গেল হঠাৎ শ্যামের মনে পড়ল যে, লোকটা মুসলমান। মনে পড়ল যে, সে হিন্দু। আশ্চর্য! সে যে হিন্দু এ কথাটা অনেকদিন হয় তার খেয়ালই ছিল না। মনে পড়েনি– আমি হিন্দু। মনে পড়তেই শ্যাম সামান্য হেসে ওঠে–আশ্চর্য আমি হিন্দু! কেমন হিন্দু আমি! হিন্দু হয়ে আমি কেমন আছি?

অনেক ভেবেও শ্যাম শব্দটার কোন অর্থ খুঁজে পেল না। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, সে হিন্দু। সে ভারতীয়। কিংবা সে বাঙালী। অবিশ্বাসী মনে হয় যে, সে কমলাক্ষ চক্রবর্তীর ছেলে, সাকিন–বানিখাড়া ঢাকা জেলা। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, শ্যাম চক্রবর্তী নামে কেউ সেইন্ট মিলারের প্রাক্তন ছোটোসাহেব কিংবা ক্লাবের এককালের লেফ্‌ট আউট। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম পরিচয়ের মধ্যে সে বাঁধা আছে। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম–পরিচয়ের বাইরে তার আর কোন অস্তিত্ব নেই।

কুয়াশার ভিতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ট্রাম, ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয়। শ্যাম জানালার কাঠে মাথা হেলিয়ে দেয়। তারপর ক্রমে লক্ষ্য ভুলে গিয়ে তার ট্রামগাড়ি অচেনা অজানায় পাড়ি দেয়। চারদিকে চাঁদ আর কুয়াশায় মায়া, হু হু করে কেঁদে ওঠে প্রকাণ্ড নিষ্ফলা মাঠে, গাছে ভূতুড়ে ছায়া পাথরের মতো জমে আছে।

–টিকিট্‌।

বিরক্ত শ্যাম হাত তুলে কন্ডাক্টরকে সরে যেতে বলে। কন্ডাক্টর সরে যায়।

মায়াবী ট্রামগাড়ি চেনা পথ ছেড়ে দিয়ে বেঁকে যায়, ঘুরে যায় অচেনায়। গাছপালা ডেকে ওকে –এসো শ্যাম! বাতাস ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে– এসো শ্যাম! তারপর তাকে ছুঁয়ে আনন্দে বাতাস ছুটে যায় গভীরতর রাজ্যের ভিতরে; পাহাড়ে গুহায় নদী কিংবা সমুদ্রের ওপর দিয়ে সুগন্ধের মতো ভেসে যায় সুসংবাদ–শ্যাম আমাদের শ্যাম! মাটিতে পা রাখতেই মায়ের মতো মাটি ডেকে ওঠে–শ্যাম! পাখিরা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের মতো শিশির জমে আছে ঘাসে। কাল–কাসুন্দীর ঝোপে, কুলবড়ই গাছের তলায় কুয়োর পাড়ে আতাবনে বাদুড়ের মতো ঝুলছে অন্ধকার, চক্‌মক্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোনাকি পোকা। নোনাপুকুরের আঁশটে গন্ধ পায় শ্যাম, শাপলার গায়ের গন্ধ নিথর রাতকে চমকে দিয়ে জলে ঘাই দেয় বড় মাছ, তারপর শান্ত জলের নীচে পরীদের গভীর রাজ্যে চলে যায় তার অতিকায় নিঃশব্দ গতিময় ছায়া।

দূরে গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপর উড়োজাহাজের বিষণ্ন শব্দ। শ্যাম অন্যমনে সাড়া দিয়ে–যাই।

ময়দানে পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে মাত্র কয়েক পলকের জন্য স্বপ্নের সেই দেশ শ্যামের চেতনাকে ছুঁয়ে গেল।

ক্লান্ত শ্যাম ট্রাম থেকে নেমে ধীর পায়ে পেরিয়ে গেল গড়িয়াহাটার মোড়। তার গা ঘেঁষে বুড়ো গেঞ্জীওয়ালা উল্টোদিকে হেঁটে যায়, ধীরে গম্ভীর স্বরে হাঁকে–গেঞ্জী......!

কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর শোনে হতাশ এক গেঞ্জীওয়ালা স্বর টেনে চলেছে– গেঞ্জী! দূরে চলে যাচ্ছে সেই ডাক। মাথার ভিতরে হঠাৎ আবার টলমল করে ওঠে ঘোলা জল, কিন্তু মনে পড়ে না, মনে পড়ে না–

আবার কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ে, অস্ফুট গলায় বলে

ওঠে– সোনাকাকা!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে উজিয়ে আসতে চেষ্টা করে শ্যাম। কিন্তু ততক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে গেঞ্জীওয়ালার ওই ডাক। শ্যাম মাথা নেড়ে আপনমনে বলে–আঃ সোনাকাকা!

তার মনের মধ্যে বুড়ো মুখ তুলে ছানি–পড়া চোখে বে-ভুল চেয়ে থাকে সোনাকাকা–আঃ মনু! মাথা নেড়ে বলে–মনু রে!

তার কাঁধে হাত রাখে শ্যাম–সোনাকাকা, বাইচ্যা থাইকো। আরো কিছুদিন বাইচ্যা থাইকো।

বিড় বিড় করে কথা বলে শ্যাম–আমি নিয়ে আসবো সুদিন। অপেক্ষা করো।

হোটেলে মিত্রর সঙ্গে দেখা হলে মিত্র চোখ কপালে তুলে বলল–আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেল মশাই ভালবাসার ব্যাপার খুব ইন্টারেস্টিং–

শ্যাম ভ্রূ তুলে হাসল–বটে!

মিত্র ঝুঁকে বলল– মেয়েটি কুমারী থেকে এক লাফে বিধবা হয়ে গেছে। ডবল প্রমোশন।..... মাঝখানে মাসখানেক আসেনি, আজ এল, পরণে সাদা থান, হাতে চুড়ি নেই, কানে দুল,গলায় হার নেই, মুখচোখ থম্‌থম্ করছে। আমরা তো প্রথমে কিছু জিজ্ঞেসই করতে পারি না, এ ওর মুখ চাই–এই সেদিনকার কুমারী মেয়ে বিয়ে হয়নি, হঠাৎ এ কী? জিজ্ঞেস করতেই প্রথমে কেঁদে ভাসাল বলল– আমি বিধবা। আমার স্বামী মারা গেছে।...... কিন্তু বিয়ে হল কবে? জিজ্ঞেস করলে কেবল মাথা নেড়ে বলে –হয়েছিল।...কিন্তু কবে? অনেক কষ্টে তারপর মুখ ফুটল মেয়ের–বিয়ে হয়নি, কিন্তু হয়ে যেতো। আমি মনে মনে ওকে স্বামী বলে জানতুম আর কেউ কখনো কোনোদিন আমার স্বামী হবে না..... শুনলুম ছোকরা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে মশাই...

বলতে বলতে মিত্র গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ বলল– অদ্ভুত ব্যাপার মশাই, এই ভালবাসা। কী বলেন?

শ্যাম হাসে। হঠাৎ তার মাথার ভিতর আস্তে জেগে ওঠে ভ্রমরের শব্দের মতো মোটর সাইকেলের আওয়াজ অ্যাকসিডেন্ট! কিরকম অ্যাকসিডেন্ট?

মিত্র অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে–কী জানি, আজকাল লোকে বলে ভালবাসা–টাসা পুরোনো ঘায়ে খোঁচা লেগেছে মশাই! খুব মজা করলুম বটে অফিসে ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু মনটা ভার হয়ে আছে। ভিতরে ভিতরে একটা হেমরেজ টের পাচ্ছি।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে এসে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দু'জনে। চলে যাওয়ার আগে মিত্র হঠাৎ বলল– দেখুন, আমাকেও কিরকম বিধবা করে রেখে গেছে একজন। পুরুষ বলে থানটা পরিনি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে... না মশাই, হাসবেন না, কিন্তু এক একদিন নিরালা ঘরে বসে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে শ্যাম টের পেল রাস্তা দিয়ে একজন হকার গেঞ্জী হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছে।

এত রাতে? মনে হতেই লেপ সরিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল শ্যাম। বাঁ দিকে চেয়ে দেখল–রাস্তা শূন্য। ডানদিকে চেয়ে দেখল-রাস্তা শূন্য। তবু বহু দূর থেকে দূরে রাতের গভীরে চলে যাচ্ছে ঐ ডাক– গেঞ্জী ..... গেঞ্জী....

সোনাকাকা! নিজের কান চেপে অভিভূত শ্যাম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখল শ্যাম। নিথর কালপুরুষ ছায়াপথ নক্ষত্রমন্ডলী। আর সেই হিম আকাশে, নক্ষত্রে, তারা থেকে তারার ছায়াপথ পেরিয়ে রোগা, বুড়ো, প্রায়-অন্ধ সোনাকাকা ফেরি করতে করতে চলে যাচ্ছে তার সওদা গেঞ্জী.... গেঞ্জী.....!

।। ৯ ।।

তেইশে ডিসেম্বর মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি আজ হাসপাতালে মারা গেছেন—এরকম একটা খবর পর পর কিছুদিন পত্রিকায় খুঁজে দেখল শ্যাম নেই। নেই। অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে দুর্ঘটনার খবর থাকে। কতভাবে যে মরে যাচ্ছে মানুষ ইঁদুর আরশোলা কিংবা রোজ জল-না-পাওয়া চারাগাছের মতো দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এইভাবে মরে মরে যদি পৃথিবী ভিড় কমে যায়! যদি আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে আসে পৃথিবী। ভাবতেই শ্যামের চোখেমুখে আনন্দ রক্তোচ্ছ্বাসের ঝাপটা এসে লাগে। তখন বড় সুন্দর হবে এই শহর, আরো রহস্যময়ী হবে পৃথিবী। তখন সব মানুষই হয়ে যাবে সব মানুষের চেনা পরিচিত আত্মজন। ভালবাসায় ভরে উঠবে পৃথিবী। থাকবে না প্রতিযোগিতা, আক্রমণ লোপ পাবে, তখন মানুষের ভাষা থেকে লুপ্ত হবে গালাগাল, অশ্লীল কিংবা কঠিন শব্দ। তখন দূরের মহাদেশ নিয়ে রূপকথার গল্প জমবে খুব। তখন আরো পাখি প্রজাপতি ও উদ্ভিদের জন্ম হবে পৃথিবীতে। পরিষ্কার সুগন্ধী বাতাস বয়ে যাবে। তখন পাওয়া যাবে দূরের শব্দ কিংবা গন্ধ, আর নিজেকে পাওয়া যাবে হাতের মুঠিতে। অল্প কিছু লোকের ভিতর থেকে সহজেই বেছে নেওয়া যাবে কয়েকটি বন্ধ, কিংবা নিজের স্ত্রীকে, আলাদা করে চেনা যাবে ভাঁড় কিংবা শয়তানকে, এখনকার মতো সব গোলামেলে মনে হবে না।

কিংবা যদি আরো নির্জন হয়ে যায় পৃথিবী! যদি ক্রমে ক্রমে জনশূন্য হয়ে যায় শহর, প্রান্তর, মহাদেশ! সমস্ত পৃথিবীতে আর একটিও মানুষ বেঁচে নেই একমাত্র শ্যাম ছাড়া!

ভাবতে ভাবতে শ্যাম ঘরের মেঝেয় ছড়ানো সিগারেটের টুকরোর ওপর পা ফেলে দ্রুত পায়চারি করে, লাথি মেরে সরিয়ে দেয় একটা বই, জ্বরো রুগীর মতো নিজের লম্বা জট-পাকানো চুল চেপে ধরে উঃ বলে হেসে ওঠে। আয়না তুলে ধরে নিজের ক্ষেপাটে অচেনা মুখের সামনে। হ্যাঁ, তখন? মানুষের তৈরী কলকারখানাগুলি গভীর ঘাসের সবুজে ডুবে যাবে, রেল-ইঞ্জিনগুলি জং ধরে আস্তে আস্তে মিশে যাবে মাটিতে, জাহাজ গলে জল হয়ে যাবে, এরোপ্লেনের গা জড়িয়ে উঠবে মাধবীলতা, উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মাথায় জাতীয় পতাকার মতো উড়বে অশ্বত্থের পাতা, আমাদের কাঠের আসবাবগুলি আবার উদ্ভিদ হয়ে যাবে। একটি মানুষের জন্য থাকবে একটি সূর্য, চাঁদ এক-আকাশে নক্ষত্র, একটি পৃথিবীময় জল-স্থল-শূন্যময় খোলা জায়গা।

নিজেকেই বিড়বিড় করে প্রশ্ন করে শ্যাম। নিজেই উত্তর দেয়।

তখন কি তোমার খুব একা লাগবে না শ্যাম?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে না!

তখন কাউকেই কি তোমার দরকার হবে না। শ্যাম! মায়ের মতো কেউ, কিংবা বৃন্দা, মাধবী, ইতুর মতো কেউ? শিশু-সন্তানের মতো কেউ? ভাইয়ের মতো কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে না।

যদি তুমি তখন কথা বলতে ভুলে যাও। যদি ভুলে যাও গান গাইতে। কিংবা ভুলে যাও ভাষার ব্যবাহার! রতিক্রিয়া ভুলে যাবে? চিঠি লেখা? তোমাকে প্রশংসা করার লোক থাকবে না! এমন কেউ থাকবে না যে তোমাকে সুন্দর দেখে? তোমার কাছে থেকে দূরে যাওয়ার কেউ থাকবে না? থাকবে না কাছে আসার কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে না।

তারপর শ্যাম আস্তে হেসে ওঠে। আয়নার নিজের মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে একটি ধাধ জিজ্ঞেস করে—

বল তো এমন একা কে? জল স্থল শূন্যময় যার অখন্ড পরিসর! যে আত্মস্বজনহীন! যার নেই দূরে যাওয়ার বা কাছে আসার কেউ? কে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্যাম?

শ্যাম বিড় বিড় করে বলে—আমি।

আবার খবরের কাগজ তুলে নেয় শ্যাম। হতাশভাবে মাথা নাড়ে। না লোকটি মরেনি

হয়তো কিছু হয়নি লোকটার। সে হয়তো আড়াল থেকে শ্যামকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে, অপেক্ষা করছে একটি মুহূর্তের– যখন শ্যাম কোনো রাস্তার বাঁকে মোড় নেবে, তখন তার হাতের আয়নার রোদ ঝলসে উঠে পড়বে শ্যামের মুখে।

না, লোকটা মরেনি। শ্যাম নিশ্চিত। সে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাস্তাটা ভাল করে দেখে নেয়। ঐ তো চেনা পেট-মোটা বেঁটে লাল ডাকবাক্সটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, ল্যাম্পপোস্টে লাগানো চৌকো বাক্সের গায়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন, চেনা লাল হলুদ সাদা কয়েকটা বাড়ি দত্তদের বাগানে খেলছে কাক আর সিঁড়িতে শুয়ে আছে পাঁচটা বেড়াল, দুটো ট্যাক্সি গেল পর পর, পিছনে মন্থরগতি এক ঠেলাওয়ালা,একটি দুটি মেয়ে আর কয়েকজন শান্ত নিরীহ চেহারার লোক, সকালের রোদ চারদিকে ফসলের মতো ফলে আছে। কোনোখানেই সন্দেহের কিছু নেই, তবু শ্যাম টের পায়, এই সব কিছুর আড়াল থেকে দুটি চোখ তাকে চোখে চোখে রাখছে।

কেমন সেই লোক যার মুখে শ্যাম আলো ফেলেছিল? মিনুর মতোই নিষ্ঠুর কেউ কি? তার মুখ দেখেনি শ্যাম, লক্ষ্য করেনি তার গায়ের রঙ, জানে না সে কতটা লম্বা কিংবা তার বাড়িতে কে কে আছে, কে জানে সে সুবোধ মিত্র অফিসের সেই কুমারী বিধবা মেয়েটির প্রেমিক কিনা। কিংবা কে বলতে পারে যে লোকটা মিনু নয়। কিংবা নয় তার সঙ্গীদের একজন!

শ্যাম মনে মনে বলে– তবু পৃথিবী থেকে লোকজন ঢের কমে যাওয়া ভাল। আরো শালিক আরো চড়াই আরো উদ্ভিদের, আরো ভালবাসা, রহস্য ও স্বপ্নের বড় প্রয়োজন আমাদের।

একদিন এস প্ল্যানেডের খোলা রাস্তার হঠাৎ অসময় বৃষ্টি নামল। অকালে। গোপনে মেঘ জমেছিল আকশে শ্যাম টের পায়নি। হঠাৎ খেয়াল করল তার চারপাশে হরিণের খুরের শব্দ। চরাচর জুড়ে ছুটে আসছে অজস্রী অসংখ্য হরিণ। হাঁওয়ার সামান্য গতিতে ছুটে যাচ্ছে তার চারপাশ দিয়ে।

শ্যাম ছুটে গিয়ে দাঁড়াল একটা গাড়ি–বারান্দার তলায় এক পাল লোকের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে। ময়লা, ভ্যাপসা গন্দওয়ালা রুমালটা পকেট থেকে বের করে বহুদিন পর কাজে লাগল, শ্যাম চুল আর দাড়িতে জল মুছে নিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড় শীত করে উঠল তার। সে ভিড়ের ভিতরে একজন মোটাসোটা লোক খুঁজে দেখল যার পিছনে দাঁড়ানো যায়। নেই। পকেটে হাত দিল সিগারেটের জন্য। নেই। আর্কেডের তলায় খুঁজল একটা সিগারেটের দোকান। পেয়ে গেল। মন্থর পায়ে ভিড় ঠেলে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াতেই ভয়ঙ্কর চমকে গেল শ্যাম। প্রায় চার ফুট চওড়া একটা দোকান–জোড়া আয়না–অজস্র মাথা ও মুখের ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে, সে নিজের সম্পূর্ণ অচেনা ভিখিরির মতো কাঙাল মুখ দেখতে পাচ্ছি, আর দেখল পিছনের ভিড় থেকে একটি আধোচেনা মুখ ঘাড় ঘুরিয়ে সামান্য কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। একটি মেয়ে। সিগারেটের জন্য খুচরো পয়সা– ধরা বাড়ানো হাত থেমে রইল, শ্যামের বুকের ভিতরটার শূন্যতার মধ্যে চমকে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড, রেলগাড়ির আওয়াজ শুরু হয়ে যায়।

মুখ ফিরিয়ে শ্যাম মেয়েটির দিকে তাকাতেই মেয়েটি কৌশলে অন্যমনস্কতার ভান করে সরিয়ে নিল চোখ, তারপর খুব সাবধানে যেন বিশ্রী না দেখায় এমনভাবে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বয়ঃসন্ধির সময়ের মতো লাজুক হয়ে গেল তার হাত-পা। সমস্ত শরীর কাঁটা দিল।

চেনে শ্যাম। মেয়েটিকে সে চেনে। কিন্তু কোথায় দেখেছিল ঐ অসম্ভব সুন্দর মুখ! ঐ কপল–ঢাকা চুল গোল মুখ, মুখে নিঃশব্দে কথা–জানো আমি খুব বেঁচে আছি! আমার এখনো বয়স হয়নি। আমার কাছে অদেখা পৃথিবী অনেক বড় রয়ে গেছে দেখা–পৃথিবীর চেয়ে।

ঐ মুখ কোথায় দেখেছিল শ্যাম? কবে? মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে উঠে। কোথায়?

পিছন থেকে কেবল মেয়েটির একটু দীর্ঘ বাঁকা ঘাড় দেখা যাচ্ছিল। সে পরেছে হাল্কা নীল রঙের শাড়ি, মেটে সিঁদুরের রঙের যার পাড়ে, কাশ্মীরী একটা স্কার্ফ গলায় জড়ানো। হাত দুটি বুকের ওপর মুড়ে রাখা, পিছন থেকে ভাল বোঝা যায় না, হয়তো সে বুকের ওপর কিছু একটা

চেপে ধরে আছে। হয়তো তার ব্যাগটা। বোঝা যায় যে সে একা।

একটু লালচে আভার চুলের বড় খোঁপা তার যার ওপর কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জলে বজ্র-বিদ্যুৎ আর অহংকার ফুটে আছে নিঃশব্দে।

আর একবার তার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করে শ্যামের। কিন্তু মেয়েটি মুখ ফেরায় না। যেন অদৃশ্য কোনো থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমনি অলস এবং অবহেলার ভঙ্গী তার।

খুচরা পয়সাগুলি আস্তে আস্তে পকেটে রেখে দেয় শ্যাম। মৃদু হেসে সে বিড় বিড় করে বলে– তোমাকে এমন কোথাও দেখেছি যেখানে তোমকে মানায় না। তাই তোমাকে মনে করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াও, আগে ভাল করে তোমাকে দেখতে দাও–

কিন্তু কাছে যেতে সাহস হয় না শ্যামের। সে ভিড়ের ভিতরে গা-ঢাকা দেয়, একটু কুঁজো হয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, অর্ধ চক্রাকারে ঘুরে যেতে থাকে মেয়েটির সামনের দিকে নিজেকে মেয়েটির কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রাখার চেষ্টা করে। ভিড়ের মধ্যে বিরক্ত মানুষেরা তার দিকে চেয়ে দেখে। শ্যাম গ্রাহ্য করে না।

বুড়ো এক পাঞ্জাবীর পা মাড়িয়ে দেয় শ্যাম, বাচ্চা একটা ছেলের পিঠে হাত রেখে তাকে সরিয়ে দেয়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দুটি ছেলে, তাদের ঠেলে মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যায় সে। তার মুখ বাঁ দিকে ঘোরানো, চোখ লক্ষ্যবস্তুর ওপর স্থির। ক্রমে তার চার পাশ মানুষেরা ছায়ার মতো অলীক হয়ে আসে যেন আর কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। শুধু ক্রমে ক্রমে মেয়েটির ছোট কানের ইয়ারিং থেকে গালের ডৌল, একটু চাপা নাক, ঠোঁট ক্রমে গোল সম্পূর্ণ মুখটি চলে আসে তার চোখের নাগালে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ফুটপাতের ধারে চলে এসেছিল শ্যাম। তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃষ্টির জলকণা, হু-হু বাতাস তার এণ্ডির চাদর নিশানের মতো ওড়াতে থাকে। কনকন করে ওঠে কান। শ্যাম গ্রাহ্যও করে না। একটা চোর-বেড়ালের মতো সে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে দূরগামী হরিণের পায়ের শব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ হয়ে যেতে থাকে।

মেয়েটির গা ঘেঁষে চলে যায় কয়েকটি পুরুষ। হাত-পা রি রি করে ওঠে শ্যামের। কী সাহস। আবার অনেকদিন পর শ্যামের মনে হয় যে, বহুদিন হয়ে গেল সেই আর নিজেকে সাজায় না। তার গালে রুক্ষ দাড়ি, মাথায় লম্বা জটার মতো জড়িয়ে থাকা এলোমেলো চুল, গায়ে ময়লা এণ্ডির চাদর। সে অনেক রোগা, লাবণ্যহীন আর দুর্বল হয়ে গেছে। তার আর সেই সাহস নেই সহজেই যে-কোনো মেয়ের কাছাকাছি চলে যাওয়ার। কোথায় গেল সেই ভেলার মতো ভাসমান হাল্কা মন! সেই খেলার ছল! এখন তার বুকের মধ্যে সেই রেল গাড়ির স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আর পুল পেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। সে নিজের বুকে হাত রাখে। না, এই অচেনা রহস্যময় শ্যামকে চেনে না শ্যাম। তার শরীরের ভিতরে, মনের ভিতরে ডেকে উঠছে মেঘ, চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, আর সমস্ত চেতনা জুড়ে নেমে আসছে অদ্ভুত এক নিঃশব্দ বৃষ্টি। বুক ভরে ওঠে। ভরে ওঠে ভালবাসায়। ছোঁয়া যায় না। এখন আর শরীর ছোঁয়া যায় না। কাঁটা দেয়।

মেয়েটির চোখে হঠাৎ চোখ পড়ে যায় শ্যামের। ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি তাকে এক পলক দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নেয়। সামান্য এক–আধ পা সরে যায়, একটু ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম আবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় ফুটপাথের ধার ঘেষে, আবার মেয়েটির মুখোমুখি হয়, মেয়েটির চোখ আবার তার চোখের ওপর ঘুরে যায়। সামান্য নড়ে ওঠে মেয়েটি, শীতে কিংবা ভয়ে সামান্য কেঁপে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে নেয়। অসহায়ের মতো হঠাৎ চারদিকে চেয়ে দেখে। বিরক্তিতে কামড়ে ধরে ঠোঁট, মাটিতে পা ঘষে নেয় রাগে।

হঠাৎ শ্যামের খেয়াল হয় যে, তার চারপাশে কথাবার্তার শব্দ থেমে গেছে। অনেকেই লক্ষ্য করছে তাকে। কথা থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অনেক লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ সরিয়ে দেখে নিচ্ছে মেয়েটিকে। তাদের চোখে মুখে কৌতুক। ভীষণ চমকে ওঠে শ্যাম, তার হাত পা কেঁপে ওঠে। সে নিজের দিকে চেয়ে দেখে–কী করেছে সে। এতক্ষণ সে কী করেছে!

চকিতে শ্যাম মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার নাকে মুখে ছুটে আসে রক্তের গরম ঝাঁপটা। অপমানে কেঁপে ওঠে তার শরীর। দ্রুত সে ফুটপাথ ছেড়ে বৃষ্টির রাস্তায় নেমে পড়ে। হেঁটে যেতে থাকে।

তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ। চারদিকে অজস্র অসংখ্য ধাবমান অদৃশ্য হরিণের পায়ের শব্দ। যতদূর চোখ যায়, বাষ্পাকার জলকণায় আধো-অন্ধকারে রাস্তাঘাট, ময়দান আদিগন্ত রহস্যময় হয়ে গেছে। নিশ্চিত মনে নিরুপদ্রবে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথা গাল দাড়ি বেয়ে নেমে আসে কেঁচোর মতো হিম জলের কয়েকটা রেখা। শীতে তার শীর কাঁপে। তবু সে টের পায় তার ভিতরে উষ্ণ রক্তস্রোত, বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল, মাথার মধ্যে যন্ত্রণার মতো একটি প্রশ্ন-তুমি কে? তুমি কে?

হঠাৎ মনে পড়ে যায় শ্যামের। দুটি সাদা সুন্দর হাত টেলিফোন থেকে নোট বইয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মদরঙের কাঠের পালিশে ছায়া ফেলে। নীলা!

ইয়াঃ বলে হেসে ওঠে শ্যাম। লীলাই! হায় ঈশ্বর! তোমার জন্যই আমি বৃষ্টির মধ্যে খোলা রাস্তায় নেমে এলুম! গায়ে তুলে নিলুম শীত!

হঠাৎ দুটি হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো আপন মনে আবার হাসে শ্যাম-ঠিক আছে তোমার জিত।

অনেকদিন পর নিজেকে একটু জীবন্ত বলে মনে হয় শ্যামের। সে শুনতে পায় তার শরীরের মধ্যে কারখানা চলার মতো শব্দ করে চলেছে কলকজা। সে বড় বেঁচে আছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে আধো ঘুমের ভিতরে সে তার বালিশের কাছে একটা নাম বলে রাখল। বালিশে নাক ঘষল। লীলা! আঃ-হাঃ!

।। ১০ ।।

নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টাই করল না শ্যাম। খোলা রাস্তায় রোদের মধ্যে সে দাঁড়াল থামে ঠেস দিয়ে। অদূরে কাঁচের শার্শী লাগান দরজাটা। চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে নিল শ্যাম। প্রথমে ভাল দেখা গেল না, বেলা তিনটের খর রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল সে। তারপর ছায়া মূর্তির মতো আবছা লীলাকে দেখা গেল মদ-রঙের কাউন্টারের ওপাশে। প্রথমে চেনা গেল না লীলাকে। তার মুখ চোখ ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল, লীলার পিছনের দেওয়ালে একটা ফ্লুরেসেন্ট আলো জ্বলছে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা গেল সেই দুটি সুরে বাঁধা হাত, স্বয়ংক্রিয়, কাজ করে যাচ্ছে। কপাল থেকে চূর্ণ চুল সরিয়ে দিচ্ছে লীলা, ডান হাতে তুলে নিচ্ছে পেন্সিল, বাঁ হাতে টেলিফোন, রিসিভার কানে চেপে কাত হয়ে শুনছে কিংবা একটু ক্লান্ত দীর্ঘ মিষ্টি স্বরে বলছে 'হেঃ.... লেলা.....' দুটি চোখে সামান্য ঘুম পাওয়া ভাব। ভ্রূ তুলে কথা বলছে তার নানা অতিথির সঙ্গে, হেসে ঠাট্টার উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। তবু কিছুতেই তাকে এই পৃথিবীতে ব্যবহৃত মেয়ে বলে মনে হয় না শ্যামের, মনে হয় না যেন সে খাওয়া-পরার জন্য উন্নতির জন্য, সঞ্চয়ের জন্য কাজ করছে। মনে হয় না একটি নাম কিংবা পরিচয়ে বাঁধা আছে সে।

শ্যাম সরল একটা গাছের মতো সামান্য একটু পিছনে হেলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। মুখে মৃদু হাসি। তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছায়ার মতো অলীক লোকজন-যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, যেন র‍্যাকেটে ঝোলানো জামা-কাপড়। চারদিকের কোনো শব্দও পায় না শ্যাম- যেন সে এক নিঝুম ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কাঁচের দরজাটা ঠেলে লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কারো মুখই ভাল করে দেখে না শ্যাম। দুটি ভিখিরি এসে ঘ্যান ঘ্যান করল শ্যামের সামনে, তারা মেয়ে না পুরুষ তাও দেখল না শ্যাম, পকেট থেকে পয়সা তুলে দিয়ে দিল, কী দিল বা কত তা খেয়াল করল না। একবারও ঘড়ি দেখল না শ্যাম, ক'টা বাজে- এ প্রশ্ন তার কাছে অপার্থিব মনে হল। সে শুধু টের পাচ্ছিল যে, শুধু দু' পায়ের জোরে সে এখানে দাঁড়িয়ে নেই, আর তার ভিতরে জন্ম নেওয়ার আগে শিশুর মতো কোনো বোধ কেঁপে উঠছে। এণ্ডির চাদরের তলায় তার সমস্ত শরীর শক্ত, লোহার মতো কঠিন হয়ে আছে সমস্ত পেশী, মাঝে মাঝে তার চোয়ালের হাড়

ঢিবির মতো ফুলে উঠছে। আর ক্রমান্বয়ে বুকের ভিতরে নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে অদৃশ্য বৃষ্টিপাত,আর হরিণ দৌড়ে যাওয়ার শব্দ। সে টের পায় সে বড় বেঁচে আছে।

লীলা কাজ করে যাচ্ছে। কেবলই কাজ করে যাচ্ছে। নড়ে যাচ্ছে তার দুটি কাজের হাত, তার ঠোঁট কেবলই কথা বলে যাচ্ছে। কোন কথাই বুঝতে পারে না শ্যাম, তবু যেন বুঝতে পারে। হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কী বলছো। তুমি দূর-দূরান্তের লোককে বলতে চাইছো–দেখ, আমি কত বেঁচে আছি। দেখ, আমার এখনো বয়স হয়নি। আমার কাছে এখনো বড় রহস্যময় এই জীবন। আমি ভালবাসতে শিখেছি।

মাঝে মাঝে তার সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখ রাস্তার ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল হয়তো সে এক পলক দেখে নিল একটা লোকের কালো কোট, একটা গাছের একটু পাতা, দুই একটি কাক, একটা দেয়ালে সাঁটা মিছিলের আহ্বান।

শ্যাম অপেক্ষা করে রইল। এই ভিড়ের রাস্তায়, এত কিছুর মধ্যে তুমি আমার দিকে একবারও লক্ষ্য করবে কি!

শ্যাম টের পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে আলো মরে আসছে। অন্ধকার হয়ে গেলে লীলা আর তাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তখন উজ্জ্বল ঘরের মধ্যে লীলাকে আরো স্পষ্ট দেখা যাবে। শ্যাম মুখে মৃদু হাসি আর ঋজু শক্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়েই রইল। হয়তো কিছুই ঘটবে না। হয়তো বিস্ফোরণের মতো কিছু ঘটবে। শ্যাম জানে না।

লীলার মুখ আড়াল করে একটি লোক কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়াল একটু ক্ষণ। সরে গেল। লম্বা একটা লোক শ্যামের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল। কয়েক পলক আবার আড়ালে পড়ল লীলার মুখ। বিরক্তিতে আট ফুট লম্বা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল শ্যামের সেই ইচ্ছে টের পেয়েই বোধ হয় লোকটা তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সামান্য চমকে উঠল শ্যাম–মিনু না? পর মুহূর্তেই লোকটাকে ভুলে গিয়ে লীলার ওপর চোখ রাখল। লীলার চারদিকে ক্রমে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়ছে, নিঃশব্দে শ্যামের চারদিকে নেমে আসছে অন্ধকার।

আর একটু হলেই অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিত শ্যামকে। এ সময়ে লীলা নোট টুকে রাখতে গিয়ে বাধা পেয়ে বাঁ হাতে টেলিফোন নিয়ে মুখ তুলতেই তার চোখ শ্যামের ওপর আটকে গেল। পলকে পাথর হয়ে গেল লীলা, মুখ সামান্য ফাঁক করে সে চেয়ে রইল, চীৎকার করে ওঠার আগের মতো ভয়ে তার ডান হাত উঠে এল মুখের কাছে, যেন সে এক্ষুণি লোক জড়ো করে ফেলবে। কয়েকটি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত ধরে সে শ্যামের ছায়ার মত মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। তারপর শ্লথ হয়ে নেমে গেল তার হাত, কাউন্টারের ওপর সেই হলুদ পেন্সিল চেপে ধরল প্রাণপণে, চোখ বুজে সে দাঁত দাঁত চেপে টেলিফোনে কথা বলে গেল।

একটুও নড়ল না শ্যাম। সে মৃদু হাসল। শরীরের ভিতরে চালু কারখানায় শব্দ। সে বড় বেঁচে পড়ল কাউন্টারের ওপর। জোর করে নামিয়ে রাখা মুখ ঘাড়ের তেজী বাঁকের ওপর অহঙ্কার আর অবহেলা ফুটে আছে। শ্যাম লক্ষ্য করল। তার দুঃখ হচ্ছিল যে, সে আজও নিজেকে সাজায়নি। সাজলে আজ লীলা তাকে চিনতোই না। গালে রুক্ষ দাড়ি, গায়ে এন্ডির চাদর ধুতি আর স্যান্ডেল পরা এই চেহারা তার নিয়তির মতো, লীলার কাছে তাকে এভাবেই আসতে হবে, শ্যাম জানে। নইলে লীলা তাকে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবে, পেন্সিল, চেপে ধরবে না প্রাণপণে, চোখ বুজে ফেলবে না, নামিয়ে নেবে না মুখ, শ্যাম জানে।

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল লীলার ভঙ্গী। কিন্তু তার অলস ভাব রইল না, সে আর হাসল না এবং একবারও তাকাল না শ্যামের দিকে। সে শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে দরজাটা দেখে নিচ্ছিল বোধ হয় এই ভয়ে যে, শ্যাম যে কোনো সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তে পারে।

শ্যাম মৃদু হাসে। দাঁড়িয়েই থাকে। মাঝে মাঝে শুধু শরীরের ভর এ পা থেকেও ও পায়ে সরিয়ে নেয়।

অন্ধকার হয়ে এল। শ্যামের মাথার উপর টুক করে জ্বেলে উঠল রাস্তার আলো। শ্যামের

সামনে দাঁড়িয়ে একটা বেঁটে লোক, সে একটা দামী চোরাই কলম, কিনবে কিনা তা বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল। শ্যাম মাথা নাড়ল না। বস্তুতঃ কলম শব্দটাই সে ধরতে পারল না।

ক্রমশঃ সে বুঝতে পারছিল তার চার ধারে লোকজনের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে, অফিস-ছুটির ভিড়। এবার অনেকেই তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হবে। কে জানে এদের মধ্যে সেদিন বৃষ্টির বিকেলের দু'-একজন লোক আছে কিনা যারা তাকে আর লীলাকে চিনতে পারবে। মৃদু হাসল শ্যাম। তবু দাঁড়িয়েই রইল।

সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে হাতের কাজ শেষ করে ফেলল লীলা। গুছিয়ে রাখল তার কাগজ। তারপর চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা। এবার সে বেরিয়ে আসবে। সে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ঝলমল করে উঠল তার হলুদ শাড়ি, শাড়ির সবুজ পাড়, সবুজ ব্লাউজ উঁচু চেয়ার থেকে নামতেই তাকে ছোটোখাটো দেখাচ্ছিল। সে ক্লান্ত ভঙ্গীতে কপালের চুল সরিয়ে কাউন্টারের ভিতর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ পর কাঁচের দরজা ঠেলে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এল রাস্তায়। শ্যাম দেখল তার সঙ্গে খাকী পোশাক পরা পিওন গোছের একজন লোক রয়েছে। সতর্কতা। লোকটা লীলার পাশাপাশি হেঁটে গেল। পিছু নিল শ্যাম। একটু দূরে থেকে দেখল বড় দ্রুত হাঁটছে তারা। লোকটাই একটা ট্যাক্সির সামনে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাল। একবারও ফিরে তাকাল না লীলা। চকিত ট্যাক্সির ভিতরের অন্ধকারে ঢুকে গেল। এত দ্রুত ঘটল এ-সব ঘটনা যে, শ্যামা তার ঘোর কাটিয়ে উঠতে না পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখল। দাঁড়িয়েই রইল। মুখে সেই মৃদু হাসি সমস্ত শরীরে শক্ত ঋজুভাব।

রাতে খাওয়ার সময় আবার মুখোমুখি মিত্রর সঙ্গে দেখা। বলল—অটোমেশন এসে যাচ্ছে মশাই। আমাদের অপশন দিয়ে সময়ের আগেই অবসর নিয়ে নিন কোম্পানী কমপেনসেশন দেবে মোটা টাকার। তা ভাবছি এবার বসেই পড়ি মশাই এত খাটাখাটনি যে কার জন্য তা বুঝতেই পারি না।

শ্যাম অন্যমনস্কভাবে হাসে।

—পনেরো বছরের ওপর চাকরি হয়ে গেল—বয়সের কথাটা বোধ হয় খেয়াল ছিল না মিত্রর তাই বলেই চকিতে একটু হাসল—সার্টিফিকেটে যা-ই থাক মশাই, আমার প্রায় চল্লিশ এখন, কিন্তু এখনই কেমন বুড়ো বুড়ো লাগে নিজেকে। অফিসে যতক্ষণ কাজকর্মে থাকি ততক্ষণ মনে হয় বাইরে বোধ হয় খুব আলো-বাতাস, হইহল্লা আনন্দের মচ্ছব চলছে, আবার বাইরে এসে সময় কাটতে চায় না। আগে ফুটবল খেলা দেখার ঝোঁক ছিল, একটু আধটু তাস দাবা খেলতুম না এখন আর তাও পরিশ্রম বলে মনে হয়। বইপত্রও ঘাটি না কতদিন! মাঝে মাঝে শুধু জ্যোতিষের বই খুলে নিজের হাত দেখি আর হাসি। বলতে বলতেই একটু ঝুঁকে পড়ল মিত্র সামান্য চাপা গলায় বলল—বিশ্বাস করুন মশাই আমার হাতে অনেক ভাল সাইন ছিল, সুন্দর সান লাইন আর বৃহস্পতির মাউন্ট —বলতে বলতে মিত্র তার এটো ডান হাতটার প্লেটের কাণায় একটু চেঁছে নিয়ে খুলে দেখাল—দেখুন না!

শ্যাম দেখল মিত্রর এবড়ো খেবড়ো হাত ভোতা নখ আর মাছের ঝোল লাগা কালচে একটা হাতের চেটো। বলল—বাঃ!

মিত্র হাসে—হাতের জন্যই কনফিডেন্স ছিল আমার, ভেবেছিলুম এর জোরে বেরিয়ে যাবো। তা ছাড়া দেখুন কূর্মপৃষ্ঠের মতো আমার লাইন অব হেড। শুক্রস্থান ভাল। হাতে প্রেমের চিহ্ন আছে—লাভ ম্যারেজ। কিন্তু ঠোঁট উল্টে হাসল মিত্র—কিছুতেই কিছু হয় না মশাই! চল্লিশে আমি রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবছি! ছুটি নিয়ে গ্রামে-ট্রামে চলে যাবো, খুলবো একটা পোলট্রী, ডিম মুর্গী বেচবো। কী বলেন?

শ্যাম হাসে।

মিত্র মাথা নাড়ে—কিংবা রমতা যোগীও হয়ে যেতে পারি। ঠিক নেই। কেদারবদ্রী কাশীধাম

ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। বড় ইচ্ছে ছিল মশাই ঘুরে বেড়াবার, কিন্তু কেমন যেন মন হয়নি, হাওড়া ব্রীজ পেরোবার কথা হলেই আলিস্যি ধরে, কতকাল যে রেলগাড়িতে চড়িনি।

বাইরে এসেও শ্যামের সঙ্গ ছাড়ল না মিত্র। বলল—চলুন অনেককাল পর আজ মনটা হাল্কা আছে একটু ঘুরে বেড়াই রাস্তায় খাওয়ার পর হাঁটা ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে মিত্র কথা বলে—জীবনটাকে দেখতে হলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হয় মশাই। ঘরে থাকলেই কেবল ভার-ভার ভয়-ভয় লাগে, কেবলই ট্রাঙ্ক—বাক্সে হাত বুলোই জানালা দরজা নেড়ে দেখি অকাজের চিন্তায় বুকে গর্ত খুঁড়ে ফেলি। অথচ আমার ভাবনার কিছু নেই—ঝাড়া হাত—পা, ভাই চাকরিতে বোনের বিয়ে হয়ে গেছে বুড়ো বাপ-মা নেই কিন্তু ঐ একটুখানি একখানা ঘরই আমাকে মেরে রেখেছে মশাই ওইটুকুরই বড় মায়া! বড় করে শ্বাস ছেড়ে মিত্র, ভাল করে চাদর জড়ায় গায়ে। বলে—ইচ্ছে ছিল ঘরটাকে অমন অনাবাদী ফেলে রাখবো না... হাঃ হাঃ ফলে—ফুলে ভরে তুলবো!

গোল পার্ক থেকে গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে আসে দু'জন। পাশাপাশি হাঁটে। মিত্রই কথা বলে যায়।—অটোমেশন এসে গেল যন্ত্রপাতির হাতে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এবার আয়েসী মানুষদের ছুটি। এতদিনে বুঝি মশাই কাজকর্ম আসলে যন্ত্রপাতিরই মানুষে নয়।

শ্যাম হাসে। অন্যমনে হাঁটে।

—বিধবাতেও আমার আপত্তি ছিল না মশাই আমি শুধু শান্তশিষ্ট একজনকে চেয়েছিলুম, বয়স জাত রূপ কোনোটাই আমার দেখার ছিল না। কিন্তু কেবল মুখ ফুটে কাউকেই বলতে পারলুম না! বড় লজ্জা করে। একটু বেশী বয়সেই বিয়ের কথা ভেবেছিলুম, বয়স থাকার সময়ে ভাবতুম কেবল তার কথা, যে আমাকে দিব্যি দিয়ে নিজে সরে পড়েছে। আয়ুটা বড় লম্বা, কী বলেন? তা ঠিক বয়সে যখন বিয়ে করিনি এই বয়সে আর লোককে নিজের বিয়ের কথা কি করে বলা যায়...। বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন আটকে যায়। বলতে পারি না। লজ্জা করে।

গড়িয়াহাটার কাছে মিত্রকে ছেড়ে দিল শ্যাম। মিত্রকে একই সঙ্গে খুশী আর বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও পিছু হটে এল মিত্র বলল—আমাকে খুব অসহায় মনে করবেন না মশাই, আমি নিরস্ত্র নই। অনেক দিন থেকে নিজেকে সশস্ত্র রেখেছি আমি...... হাঃ হাঃ সময় থাকতেই জোগাড় করে রেখেছি পরিমাণ মতো ঘুমের ওষুধ সতেরোটা ট্যাবলেট আছে আমার, হ্যাঁ মশাই সতেরোটা! মায়ের ছিল না—ঘুমোনোর অসুখ, তখন থেকে চুরি করে জমিয়ে রাখা... জানতুম একদিন না একদিন কাজে লাগতে পারে মাঝে মাঝে শিশিটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখি... হাতে নিলেই মশাই কেমন একটা জোর পাই, মনে বল—ভরসা এসে যায়, আর ভয় লাগে না...হাঃ হাঃ

তারপর গলা নামিয়ে বলল—দরকার হলে বলবেন। যা ট্যাবলেট আছে তাতে দু'জনের ঢের হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে আরও এক-আধজনকে বলে দেখবেন। অনেকেই রাজী হবে। আমি ফ্রি দেবো...হাঃ হাঃ

শ্যাম মৃদু হেসে বলল—নেবো। আমার দরকার হবে।

—আচ্ছা, বলে গম্ভীর মুখে মিত্র চলে গেল।

দূরে থেকে শ্যাম দেখল খয়েরী তুস চাদর গায়ে মাতাল একটা ভল্লুকের মতো মিত্র আলো-ছায়ায় হেঁটে যাচ্ছে তার জমিয়ে রাখা সতেরোটা ঘুমের বড়ির দিকে। তাকে পিছু ডাকতে ইচ্ছে হয় না। তাকে শ্যাম চলে যেতে দিল।

।। ১১ ।।

ঠিক দুপুরবেলায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যাম। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খুলে দেখল—শেষ সিগারেট। সেটা ধরিয়ে নিয়ে প্যাকেটটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বা পায়ে নিখুঁত একটা সট করল সে। প্যাকেটটা রেলিঙ টপকে গিয়ে দেয়ালে লেগে পড়ল সিঁড়ির বুক ঘুরবার চাতালে, শ্যাম আপনমনে হাসল—গো-ও- ওল! রেলিঙে ঝুঁকে ভারসাম্য রাখল তারপর মসৃণ রেলিঙে হাত ছুঁইয়ে

তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল। পায়ে করে আবার সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নেয় সে। তারপর পায়ে পায়ে সেটাকে নিয়ে খেলতে খেলতে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে—ইন আউট...ইন আউট আন উট—আপনমনে বলে সে। অনেক স্মৃতি অনেক কথা ও দৃশ্য ভাঙা শব্দ বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে ঝিলমিল করে ওঠে তার। কচ্ছপের পিঠের মতো এক ঢল সবুজ মাঠ, একটা সাদা বল, আর সে ছুটছে আর ছুটছে... সামান্য হাসে সে শ্বাস টানে তারপর আবার নামতে থাকে।

বড় রাস্তায় এসে এসপ্ল্যানেডের বাস ধরল শ্যাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াল শ্যাম। চোখের রোদ-চশমা খুলে নিল। মৃদু হাসল।

আবছা দেখা যেতে লাগল লীলার অবয়ব। তারপর জলের গভীর থেকে যেভাবে আস্তে আস্তে মাছ উঠে আসে জলের ওপরে, তেমনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল সেই দুখানি সাদা ব্যস্ত হাত, গোল সুন্দর মুখখানা, কপাল—ঢাকা চুল আজ তার সাদা ব্লাউজ। মাথায় উঁচু করে বাঁধা মস্ত খোঁপা।

দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। চমকে উঠল না লীলা, মুখ ফাঁক হয়ে গেল না। বরং জুড়ে গেল ঠোঁটে ঠোঁট ভ্রূ কুঁচকে উঠল, দৃঢ় হয়ে গেল চোয়ালের হাড়। এক পলক দেখা হতেই সে তার চোখ সরিয়ে নিল। ব্যস্ত হয়ে গেল কাজে।

শ্যাম জানত এরকমই হবে। এরকমই হয়। মৃদু হেসে সে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে অলীক এক আবছায়ার মধ্যে চলে যেতে লাগল তার চারপাশ পথ-চলতি লোকজন, লুপ্ত হয়ে গেল সময়ের বোধ। আর কেবলই রেলগাড়ির শব্দ হরিণের খুরের আওয়াজ, নিঃশব্দ এক বৃষ্টিপাতে ভরে আসে বুক শরীরের ভিতরে ধীর গম্ভীর মেঘ ডেকে ওঠে।

চোয়াড়ে চেহারার একটা লোক লীলার সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার পরনে গাঢ় গরম প্যান্ট গায়ে সাদা সোয়েটার। লোকটা খুব ভদ্রভাবে হাসছে, কিন্তু তার মতলব শ্যাম পরিষ্কার বুঝতে পারে। সে নানা কথায় ভোলাচ্ছে লীলাকে। ঐ তো লীলার মুখচোখ কোমল হয়ে এল, স্বপ্ন দেখার মতো অলস হয়ে এল, চোখ দুটি ব্যস্ত হাত কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে আছে কাউন্টারের ওপর। লীলার ঠোঁটে চাপা আনন্দের হাসি! বোধ হয় ঘরে আর কেউ নেই কিছুক্ষণের অবসর পেয়ে গেছে লীলা। টেলিফোনটাও বোধ হয় বাজছে না কিংবা বাজলেও উত্তর দিচ্ছে না লীলা।

লোকটাকে শ্যামের চেনা মনে হয়। অনেক্ষণ সে দেখে। সেই লোকটা কি শ্যাম যার পিছু নিয়েছিল। লোকটা ঐ বদমাস লোকটা এখানে কেন তা বুঝল না শ্যামা সে শুধু মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল—কথা বোলো না। ওর সঙ্গে কথা বেলো না। কী কথা ওর সাথে? মুখ ফিরিয়ে নাও, কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক্ষণ ধরে তোমার টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, উত্তর দাও। বাইরে সন্ধ্যে হয়ে এল তুমি কাজ সেরে নাও। ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলো—আচ্ছা আপনি এখন আসুন...। কিংবা আরো কোনো কর্কশ কথা বলো লীলা, ওকে বের করে দাও। কিংবা আমাকে চোখের ইশারায় ডাকো আমি ভিতরে গিয়ে ওকে বের করে আনছি। আমি ওকে চিনি ও ভিড়ের মধ্যে লোকের একট হাতড়ে দেখে, মেয়েদের বুক ছুঁয়ে আসে ওর লোভী হাত। কথা বোলো না আর। লীলা চুপ করো। কী কথা ওর সাথে! তুমি কি জানো না যে, একজন তোমাকে দেখছে

বোধ হয় টেলিফোন বাজল। লীলা একটু হেলে কানে চেপে ধরল টেলিফোন ডান হাতে সে হলুদ পেন্সিলটা ঠুকতে লাগল ডেস্কের ওপর তবু লোকটার দিকে চেয়ে আছে সে, মৃদু হাসছে। লোকটা সোয়েটারটা দু'হাত দিয়ে একটু টেনে নামায় ডেস্কের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ায় টেলিফোনটার দিকে। লীলা মাথা নাড়ে, পিছনে একটু হেলে সরে যায়। হাসে।

ওরা খেলছে—শ্যাম টের পায়। সমস্ত শরীর রি-রি করে ওঠে শ্যামের। আত্মবিস্মৃতি ঘটে যেতে থাকে। কী সাহস ওই লোকটার! কেবল কাছে দাঁড়িয়ে থেকে, কেবল কথা বলে বা কেবল চোখের দৃষ্টিতে ও নষ্ট করে দিচ্ছে লীলা পবিত্রতা।

আর লীলা জানে যে শ্যাম তাকে দেখছে। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কিংবা কে জানে, লীলা তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে কিনা!

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যায় শ্যাম। কী করছে তা বুঝতে পারে না। দরজার খুব কাছ এসে সে দাঁড়ায়। কাছের পাল্লায় তার লম্বা, শীর্ণ, এলোমেলো পোশাক পরা চেহারার ছায়া ভেসে ওঠে। তার নিঃশ্বাসের ভাপ লেগে আবছা হয়ে যায় খানিকটা কাচ। তীব্র চোখে সে ভিতরের দিকে চেয়ে থাকে।

টেলিফোন রেখে সোজা হয়ে বসেই হঠাৎ শিউরে ওঠে লীলা, চীৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখে হাত চাপা দেয়, অসহায় দুটি চোখ বিশাল হয়ে যায়। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা বিদ্যুৎবেগে চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম দেখে, তার দুটো হাত মুঠো পাকানো কিন্তু হতভম্বের মতো শ্যামের দিকে চেয়ে আছে। শ্যাম মৃদু হাসে। তারপর এক-পা এক পা করে পিছিয়ে আসে আবার। ল্যাম্পেপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় নিশ্চিন্ত মনে। শান্তচোখে চেয়ে থাকে হতভম্ব বিব্রত লোকটার দিকে। চোখ দিয়েই বুঝিয়ে দেয়– সাবধান! আমি পাহারায় আছি।

লোকটা একটুক্ষণ তাকে দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নেয়। লীলা মুখ নীচু করে বসে আছে। দু'জন স্যুট পরা সাহেব ভিতরে ঢুকে গেল। তার লীলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল। শ্যাম লক্ষ্য করে যে লীলার মুখ অল্প লাল, সে অনায়াসে হাসছে না আর, মাথা নেড়ে থমথমে মুখে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। ঘর খালি হয়ে গেল আবার। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা লীলার দিকে ফিরে কী যেন জিজ্ঞেস করল। লীলা মাথা নাড়ল–না। চোখ নীচু করে রইল। লোকটার মুখে সামান্য হতাশা ফুটে উঠছে। শ্যাম দেখে। লোকটা একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর কাউন্টারের ওপরে রাখা ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে এসে লোকটা থমকে শ্যামের দিকে এক পলক তাকায়। শ্যাম গ্রাহ্য করে না। লোকটা বা দিকে হেঁটে চলে গেল।

নিশ্চিত মনে দাঁড়িয়ে থাকে শ্যাম। নড়ে না।

আস্তে আস্তে তার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। ঘরের মধ্যে লীলাকে উজ্জ্বল দেখায়। বাচ্চা মেয়ের মতো অভিমানী গম্ভীর তার মুখ। শ্যাম হাসে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে–তোমাকে ওখানে মানায় না। ভেবো না, আমি তোমার জন্যেই একদিন পৃথিবীকে খুব নির্জন করে দেবো, চুপ করিয়ে দেবো সবাইকে। গভীর সরবনের জঙ্গলে ডুবিয়ে দিয়ে যাবো সমস্ত শহর। কে ওই লোক যার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে? ওরকম হৃদয়হীন চেহারার লোক পৃথিবী থেকে যত কমে যায় তত ভাল। তুমি কখনো ওই লোকের সঙ্গে দূরে যেও না।

কাজ শেষ হয়ে গেলে লীলা সতর্কভাবে একবার দরজার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর একটা টেলিফোন করল। পিছন হেলান দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। ঘরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করল অনেক লোক, শ্যাম তাদের লক্ষ্য করল না। লীলার বসে থাকার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারল যে, সে কারো অপেক্ষায় আছে। মৃদু হাসল শ্যাম, কেননা সে জানে যে, তাতে লীলার কোনো লাভ নেই।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ এল না। লীলা উঠে ভিতরে গেল, আবার ঘুরে এল, কাউন্টারের উপর ঝুঁকে দরজার দিকে পিঠ করে কিছু একটা দেখার ভান করে অপেক্ষা করল। আবার অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে একটু হেঁটে বেড়াল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল লীলা। পিছনে আলো, তাই লীলাকে ছায়ার মতো দেখায়। কাচের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল লীলা। শ্যাম স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওই অন্ধকার মুখ থেকে দুটি অদৃশ্য চোখ তাকে লক্ষ্য করছে, বলছে–কী চাও রাস্তার লোক? কী চাও অচেনা?

সে দুটি প্রশ্নই শুনতে পায় যেন। অমনি কেঁপে ওঠে তার শরীর ভুল পেয়ে বসে তাকে। সে বিড় বিড় করে বলে–আমি জানি না আমি কী চাই। আমি জানি না।

অস্থিরভাবে চোখ সরিয়ে নেয় শ্যাম। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে সে শুনতে পায় দূরের রাস্তায় বাঁক নিয়ে ছুটে আসছে একটা মোটর সাইকেল তারপর তার গতি কমে আসে, ধীরে ধীরে মোটর-সাইকেলটা তার ঠিক পিছনে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ায়। নিথর হয়ে যায় শ্যাম। অবশ চোখে চেয়ে দেখে তার পাশ দিয়ে চটপট পায়ে একটি ছেলে চলে গেল কাচের দরজাটার দিকে। চাপা কালো প্যান্ট আর সাদা পুল-ওভার পরা, ছোটো করে ছাঁটা মাথার চুল একটু বেঁটে কিন্তু মজবুত

চেহারার ছেলেটি দরজার দিকে হাত বাড়াতেই যেন মন্ত্র বলে দরজা খুলে গেল। সেই প্রথম দিন শোনা একটু তীক্ষ্ণ কিন্তু মিষ্টি গলাটি শুনতে পেল শ্যাম—এত দেরী! কখন টেলিফোন করে বসে আছি...

ছেলেটি হাসে—এই বিশ্রী ট্র্যাফিকে আসা যায়? ঘুরে আসতে হল, তাও ক্লিয়ার রাস্তা পেলুম না... কি ব্যাপার?

—কই! কিছু না!

—কিছু না?

—না।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এল শ্যামের দিকেই। নড়ল না শ্যাম। লীলা ছেলেটির বাঁ পাশে ছিল, যে পাশে শ্যাম। কয়েক পা হাঁটার মধ্যেই লীলা কৌশলে ছেলেটির ডান পাশ সরে গেল। তারপর তাকে পেরিয়ে গেল তারা। শ্যাম ঘাড় ঘোরাল না। শুনতে পেল স্টার্টারে লাথি মারার শব্দ তারপর গুর গুর করে ডেকে উঠল মোটর-সাইকেল। দূরের দিকে ছুটে গেল। সরল একটি গাছের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসে পেট্রলের গন্ধের সঙ্গে আর একটি মিষ্টি মৃদু গন্ধ, বোধ হয় পাউডারের। আগে অনেক পাউডারের গন্ধ চেনা ছিল শ্যামের। এখন ভুলে গেছে মৃদু হেসে সে মাথা নাড়ল—না সে এ গন্ধটা চেনে না।

তোমার কি অনেক প্রেমিক? ভাল কিন্তু দেখো একদিন পৃথিবী খুব নির্জন হয়ে যাবে। তখন তোমার লুকিয়ে থাকার নিরাপদ জায়গা থাকবে না, থাকবে না পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

ভিড়ের ভিতরে পথ করে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। হাঁটতে হাঁটতে বলছিল—আমি জানি না কি করে ভয় দেখাতে হয় চোয়াড়ে চেহারার বিশ্রী স্বভাবের লোকদের, আমি জানি কিভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয় মোটর-সাইক্লিস্টদের। তুমি কেন দেখিয়ে দাওনি আমাকে! কেন ছেলেটিকে বলোনি যে, এই লোকটার জন্যই আমি রাস্তায় একা বেরোতে পারছিলুম। না! কিংবা তুমি সেই চোয়াড়ে চেহারার লোকটাকেও বলতে পারতে—আমাকে বাঁচাও।

হাঁটতে হাঁটতে অভিভূতের মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যাম। কেন? পিছন থেকে চলন্ত একটা লোক তার গায়ে ধাক্কা খায়। শ্যাম টাল খেয়ে হেসে ওঠে—কেন ধরিয়ে দাওনি আমাকে? তারপর আবার হেঁটে যায়।

বস্তুতঃ পৃথিবী খুব নির্জন হয়েই গেছে। খুব জীবন্ত মানুষজন শ্যামের চোখে পড়ে না। ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাকাপড় হেঁটে যাচ্ছে, ট্যাক্সি-ডার্মি করা মুখ কিংবা শরীর তার চোখে পড়ে। এলোমেলো আলোয় পড়ছে চলন্ত ছায়া, ভেঙে যাচ্ছে। নানা রাস্তায় ঘুরে বেড়াল শ্যাম। একটিও চেনা মুখ চোখে পড়ে না, একটিও প্রিয় মুখ চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে হয়, একশ বছর একটানা ঘুমিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে সে আর কিছুই চিনতে পারছে না। একশ বছর ধরে পচে গলে ঝরে গেছে চেনা-পরিচয়, একশ বছর ধরে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে প্রিয় মুখগুলি। অল্প কুয়াশা জমে আছে চারদিকে, বেশী দূরে চোখ যায় না। মনে হয় কুয়াশা কেটে গেলেই দেখা যাবে বিদেশ। দেখা যাবে, লীলা একা নির্জন রাস্তার শেষে কাঁচের দরজার ওপাশে তার অপেক্ষায় আছে। তাকে দেখলেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে, তারপর তারা দু'জন পরিত্যক্ত জনহীন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে পরস্পরকে না-ছুঁয়ে। যে কোনো বাড়িতেই তাদের জন্য সুন্দর বিছানা পাতা থাকবে, দোকানে দোকানে সাজানো থাকবে জিনিস, তার একবার স্পর্শ করবে বলে গাছে গাছে ফুল ফুটে ফল ফলে থাকবে। তাদের দু'জনের উদ্দেশেই তখন রোদ বা বৃষ্টিপাত ঘটবে পৃথিবীতে।

না শ্যাম মাথা নাড়ে। পৃথিবীতে এরকম কিছুই ঘটে না। সে জানে। তাই পৃথিবী এখনো তেমন সুন্দর নয়। এখনো এখানে রয়ে গেছে কিছু অহঙ্কারী মোটর-সাইক্লিস্ট আর কিছু চোয়াড়ে লোক।

হোটেলে আজ মিত্রকে না দেখে সামান্য চমকে গেল শ্যাম। রোজ যে দেখা হয় তা নয়।

তবু আজ খেতে বসে বড় একা লাগল শ্যামের। সামনের উল্টোদিকের শূন্য চেয়ারটার দিকে চোরা চোখে চেয়ে দেখল অনেকবার। সামান্য সন্দেহে তার মন দুলে গেল। খাবারের তেমন কোনো স্পষ্ট স্বাদ পেল না শ্যাম। খেয়ে গেল।

হোটেলের ম্যানেজার লোকটার সঙ্গে কোনোদিনই প্রায় কথা বলে না শ্যাম। দরজার কাছে একটা ক্ষুদে টেবিল কোলে করে বসে থাকে বিনয়ী এবং মোটা থলথলে লোকটি দুটি ঢুলুঢুলু চোখ, দেখলে মনে হয়, সন্ধ্যের দিকে এক-আধ ছিলিম গাঁজা খায় ম্যানেজার। কথা কম বলে, হাসে অনেক বেশী কিন্তু শব্দ হয় না কখনো শ্যাম শোনেনি যে লোকটি ছোকরা চাকর কিংবা ঠাকুরকে চেঁচিয়ে বকছে। বস্তুতঃ বকাঝকা করার জন্যই আলাদা একজন লোক রাখা আছে-সে লোকটা চাকরদের ওপরওয়ালা। ম্যানেজার শুধু চুপ-চাপ বসে থাকে শান্তভাবে। শ্যাম লক্ষ্য করেছে, দিনে দিনে লোকটা আরো শান্ত হয়ে যাচ্ছে, নড়াচড়া কমে যাচ্ছে আরো। মুখের হাসিতে আরো বিনয় ও উদসীনতা ফুটে উঠছে মুখের কথা কমে গেছে অনেক। লোকটার মাথার ওপরে পিছনের দেয়ালে লোকটার মৃত বাবার একটা ছবি টাঙানো আছে, ছবির চারধারে একটা গত বছরের শুকানো বেলফুলের মালা। মাঝে মাঝে শ্যামের সন্দেহ হয় যে, হয়তো খুব শীগগীরই এ লোকটাও তার ছেলেকে ক্ষুদে টেবিলের কাছে নিজের পুরোনো জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে একলাফে উঠে যাবে ওপরের দেয়ালে তার বাবার ছবির পাশে। তারপর ওরকমই একটা শুকনো বেলফুলের মালা পরে ছবি হয়ে যাবে একদিন, খুব শীগগীরই! নয়তো যেখানে বসে আছে সেখানেই বসে থেকে আস্তে আস্তে একদিন সিমেন্ট কংক্রিটের মতোই জমে যাবে লোকটা-ঠাণ্ডা পাথর হয়ে যাবে, আর নড়বেই না কোনোদিন!

আজ বেরোবার মুখে শ্যাম ক্ষুদে টেবিলটার সামনে একটু দাঁড়াল। বাইরের দিকে চেয়ে দেখল, কুকুর-অনেক কুকুর বসে আছে। রোজ যেমন থাকে। অকারণে শ্যাম মৃদু হেসে বলল-আঃ, কুকুর! তারপর এক দুই তিন করে গুনে গেল। এগারোটা।

-এত কুকুর! শ্যাম মৃদু হেসে শান্ত লোকটির দিকে তাকাল-এত কুকুরকে আপনি রোজ ভাত দেন?

-দিই। বড় বিনয়ে হাসল লোকটি। চোখ বুজে গেল হাসিতে।

-এগারোটা কুকুরকে? শ্যাম চোখ বড় করে তাকাল-আপনার খুব বেশী পুণ্য জমে যাচ্ছে! খুব তাড়াতাড়িই পুণ্য করে নিচ্ছেন আপনি, সময় থাকতেই!

বড় বিনয়ে লোকটি ঘাড় কাত করল, বলল-এগারোটার বেশী-কমও হয়।

হয়?

-হয়। লোকটা বিষণ্ন চোখে কুকুরগুলোর দিকে তাকাল, বলল-দিনে দিনে বাড়ছে। আরো বাড়বে।

-কেন?

-কেন! লোকটি চিন্তিত মুখে শ্যামের দিকে তাকাল-খাবার পাচ্ছে না কোথাও। দেশের যা অবস্থা, ক্রমে ক্রমে এখানে এসে জুটছে।

ঠিক। শ্যাম বিজ্ঞের মতে মাথা নাড়ে। বস্তুতঃ দেশের খাদ্যাবস্থা বহুকাল হয় শ্যামের আর জানা নেই। তবু লোকটার এত কথা বলা শুনতে তার ভাল লাগছিল।

-সব ক'টাই বাজে কুকুর নয়। লোকটা বলল-লক্ষ্য করে দেখুন, মাঝখানের সাদা কুকুরটা-ওই যে একটা ছাইরঙা দেখলে আর বোঝা যায় না, ওটা বোসদের কুকুর ছিল-অ্যালসেশিয়ান। গায়ে ঘা হয়ে পচে-টচে রাস্তার কুকুর হয়ে গেছে। বুঝলে মশাই, ওদের মধ্যেও-বলতে বলতে হাসল লোকটি একজন খদ্দেরকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তাকে পয়সা গুনে দিতে টেবিলের ওপরটা ডালার মতো তুলে ফেলল।

একটু অপেক্ষা করল শ্যাম, তারপর মুখ তুলতেই বলল-মিত্রকে দেখেননি আজ! সুবোধ মিত্রকে?

অমায়িক হাসল লোকটি; মাথা নাড়ল—না। এখনো আসেননি। বলে সস্নেহে কুকরগুলির দিকে চেয়ে রইল। শ্যাম লক্ষ্য করল, কুকুরগুলি বড় স্নেহে এবং ভালবাসায় শান্ত লোকটির দিকে চেয়ে আছে।

আর কথা না বলে বেরিয়ে এল শ্যাম। সে কুকুরগুলির ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল, তারা একটু সরে পথ করে দিল। সন্দেহজনক শ্যানিয়েলটির দিকে একবার আদরের হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিল শ্যাম। তাতেই খুশী হয়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে দিল। ভিখিরি ব্যাটা—শ্যাম মনে মনে গাল দিল তাকে।

শ্যামের মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে একটা সন্দেহ। কাছেই সুবোধ মিত্রর বাসা। ইচ্ছে করলে একবার ঘুরে আসতে পারে শ্যাম। কিন্তু ইচ্ছে হয় না। যদি তেমন কোনো ঘটনাই ঘটে থাকে, তবে তার গিয়ে কী লাভ এবং এখন গেলে পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। ভাবতেই ভয়ঙ্কর অলস লাগল শরীর। শ্যাম হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়াল। হাই তুলল। যদি ঘটনা ঘটেই থাকে তবে বলতেই হয় যে, মিত্র কথা রাখেনি। সতেরোটা ঘুমের বড়ির অর্ধেক বখরা শ্যামের পাওনা ছিল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যাম। তার ক'টা বড়ি পাওনা ছিল? হিসেব করলে ক'টা দাঁড়ায়! আটটা না নটা! অর্ধেক নেওয়ার কথা বলেছিল মিত্র, কিন্তু ঠিক ক'টা তা বলেনি। শ্যাম ভেবে দেখল, আর একজনকে দলে নিলেও ঠিক ঠিক তিন ভাগ করা যাচেছ না। ভাবতে ভাবতে বড় সমস্যায় পড়ে গেল শ্যাম। সে এই সিদ্ধান্তে পৌছোলো যে, ভাগ-বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যা বিশ্রী। তারপর আবার হাঁটতে লাগল।

পৃথিবী অনেক নির্জন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আরো যাবে। আস্তে আস্তে তার একার হয়ে যাবে সব কিছু। মিত্রকে দিয়ে শুরু হল হয়তো বা। কিংবা ঠিক তা নয়—আরো আগে থেকে—

তার মাথার ভিতরে অমনি বগরী পাখীর মতো গুর গুরু করে ডেকে উঠল একটি প্রায়-ভুলে-যাওয়া মোটর-সাইকেলের আওয়াজ। মৃত্যুকূপে সেই খেলার মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে আবার নীচে নেমে যেতে লাগল। শ্যাম দ্রুত হাঁটতে থাকে।

।। ১২ ।।

হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসেছিল। তখন শ্যাম ছিল না। হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসে যাবে। তখন শ্যাম থাকবে না। কেমন ছিল সেই সুসময় কে জানে! কিংবা কে জানে কেমন হবে সেই সুসময়! শ্যাম জানে না। মাঝে মাঝে কে কেবল তার চারধারে দেখতে পায় সেইসব সুসময়ের অনেক চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। যেমন পাখীর মুখ থেকে খসে পড়া ফসলের বীজ দেখে বোঝা যায় যে, কাছাকাছি এইখানে কোথাও ফসল ফলেছিল, যেমন আকাশের মেঘ দেখলে বোঝা যায় আমাদের বীজক্ষেত্রে বৃষ্টি হবে।

কিংবা কে জানে এইটাই সেই সবচেয়ে সুসময় কিনা যা শ্যম পেরিয়ে যাচ্ছে!

দুপুর রোঁদ মাথায় করে শ্যাম তার রোজকার পরিচিত থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এত আলোর মধ্যেও তার মনে হচ্ছিল যে, চারধারে ছায়ার মতো অলীক অনর্থক মানুষেরা অকাজে হেঁটে যাচ্ছে। সব কিছুই বস্তুতঃ অবাস্তব, একমাত্র সামনের ঐ কাচের দরজাটা ছাড়া। ওপাশে শীলা বসে আছে। ব্যস্ত কর্মঠ তার দুটি সাদা সুন্দর হাত, অল্প গম্ভীর ও বিষণ্ন তারুণ্মুখ। শ্যাম জানে শীলা এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি। এখনো বড় দয়ালু ওর মনে আঘাত করার আগে তাকে সতর্ক হওয়ার সময় দিচ্ছে। শ্যাম জানে, খুব শীগগীরই একদিন রাস্তার লোকেরাই তাকে ঘিরে ধরবে, চোখ পাকিয়ে তাকে সরে পড়তে বলবে। তবু যতদিন তা না ঘটবে ততদিনই বড় সুসময়। সবচেয়ে সুসময়।

তারপর একদিন হয়তো সে ইরফানের কাছে সোজা গিয়ে বলবে—আমি পাকিস্তানে চলে যাবো। আমাকে সীমানা পার করে দাও।

কিংবা সে হয়তো ঘুরে ঘুরে কষ্টে সৃষ্টে জোগাড় করার চেষ্টা করবে সতেরোটা ঘুমের বড়ি যা হাতে নিলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায়, বালিশের পাশে নিয়ে শুলে কেটে যায় ভয় কিংবা ভবিষ্যৎ চিন্তা।

কি করবে তা ঠিক জানে না শ্যাম। কেবল মনে হয়, এখনই হয়তো সবচেয়ে সুসময়।

আজও লীলা কাচের দরজার সামনে সে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা কিংবা অপেক্ষা! তারপর শ্যামকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে দরজা খুলে লীলা রাস্তায় নেমে এল। একা। ধীর পায়ে হেঁটে যেতে লাগল।

প্রথমে কিছুক্ষণ এটা বিশ্বাস করল না শ্যাম। তারপর বুঝল মেয়েটা লীলাই, এবং সে একা হেঁটে যাচ্ছে। ধীর পায়ে।

নিঃশব্দে বেড়ালের মতো পায়ে, গোয়েন্দার মতো সন্ধানী চোখে লীলাকে রেখে, ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে শ্যাম হাঁটে। হেঁটে যায়।

গাঢ় বাদামী জমির ওপর ফ্যাকাশে কলকা এবং আরো লাল জ্যামিতিক ছাপ দেওয়া একটা শাড়ি পরেছে লীলা, মোটা একটা বেণীতে বাঁধা তার চুল। পিছন থেকেও লীলাকে বড় পবিত্র দেখাচ্ছে। অলস মন্থরভাবে সে হাঁটছে, বাঁ হাতটা বুকের ওপর গোটানো বোধ হয়। সে তার সাদা ব্যাগটা বুকে চেপে ধরে আছে, গলায় জড়ানো কাশ্মীরী স্কার্ফের আঁচল উড়ছে হাওয়ায়।

রাস্তায় ভিড়, তবু ভিড়টাকে যথেষ্ট বলে মনে হয় না শ্যামের। তার এবং লীলার মধ্যে অনেকটা শূন্য জমি। লীলা ঘাড় ঘোরালেই চোখাচোখি হয়ে যেতে পারে। তার শূন্য বুকের ভিতরে লাফিয়ে ছুটছে হরিণ, শরীরের ভিতরে রহস্যময় মেঘ ডেকে ওঠে, বৃষ্টি নামে কালো একটা রেলগাড়ি খুব লম্বা একটা পুল পেরোতে থাকে। যদি চোখাচোখি হয়–যদি চোখাচোখি হয়ে যায়! যদি কথা বলে লীলা! যদি প্রশ্ন করে–তুমি কে?

ভাবতেই জড়িয়ে আসে শ্যামের হাত-পা। খালি রাস্তায় সে হোঁচট খায়। হাসে। আবার হাঁটে। তাহলে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, অদৃশ্য থেকে নেমে আসবে এক ঢল জলের প্লাবন, হয়তো বা কথা বলে উঠবে রাস্তাঘাট! আর তখন নিশ্চিত নিজের পরিচয় ভুলে যাবে শ্যাম, লীলার সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ ভুলে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো ভীত চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিড় বিড় করে বলবে–প্রশ্ন কোরো না আমি কে। আমি জানি না।

সামনের মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার অপেক্ষায় ভিড় জমে আছে। পুলিশের উত্তোলিত হাত চলন্ত গাড়িগুলো আটকে দিল! লীলা সামান্য থেমে আবার হাঁটে। রাস্তা পার হয়। ধীর মন্থর তার গতি–কোনোখানে যাওয়ার তাড়া বা লক্ষ্য নেই তার। চারধারে অর্থহীন অলীক ছায়ার মতো লোকজন। শ্যাম এদের কাউকেই চেনে না, জানে না এরা বাস্তবিক আছে কিনা। এরাও কি তা জানে! শ্যাম এইসব ছায়া ভেদ করে হেঁটে যায়। বাস-স্টপ থেকে কারা যেন লীলাকে উদ্দেশ্য করে বলে–বাঃ-বেশ। অমনি গরগর করে ওঠে শ্যাম, অন্ধের মতো রুখে ঘুরে দাঁড়ায়, ফিস ফিস করে চাপা হিংস্র গলায় বলে–সাবধান! আমি পাহারায় আছি। হাসে। আবার হাঁটতে থাকে। নিজেকে বড় জীবন্ত মনে হয় তার। শরীরের ভিতরে কলকারখানা চলার আওয়াজ। সুসময় ...পৃথিবীতে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে সুসময় যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে।

লীলার গতি ক্রমে আরো মন্থর হয়ে আসে। সে অন্যমনে ফুটপাথের আরো ধার ঘেঁষে যায়, মুখ ফিরিয়ে শোকেসের জিনিস দেখতে দেখতে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে যায়, মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখে, তারপর পা পা করে হাঁটতে থাকে। লীলাকে যতটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ততটা সে নয়–শ্যাম জানে। লীলার শরীর সতর্ক, কান উদ্‌গ্রীব, সে জানে যে, শ্যাম তার পিছনে আছে। খোলামেলা রাস্তায় একা অরক্ষিত লীলা। কে জানে লীলা তাকে নিঃশব্দে বলছে কিনা–কাছে এসো ভাল করে দেখতে দাও তোমার মুখ। তোমরা কি হিন্দু? তোমরা কী গোত্র? তোমার নাম পরিচয় আমাকে বলো। তোমার বাড়ি--ঘরদোরের অবস্থা আমাকে বলো। তোমরা ক'ভাইবোন? আর তোমার চাকরি.....?

এ সবকিছুই খুব জরুরী প্রশ্ন। লীলার জানা দরকার। শ্যাম তাই মনে মনে উত্তর দিয়ে দেয়--শ্যাম চক্রবর্তী আমার নাম, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমরা শাণ্ডিল্য গোত্র, বিক্রমপুরের বানিপাড়া গ্রামে আমাদের বাড়ি....না.... সেইন্ট অ্যাণ্ড মিলারে আমি ছিলুম ছোটোসাহেব, ওপারওয়ালা বাসটার্ড বলে গাল দেওয়ায় আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলুম...তবু সত্যি বলতে কি আমি জানি না আমি কে কিংবা আমি কি রকম......

লীলা আস্তে আস্তে হাঁটে যে কোনো দোকানের সামনে একটু দাঁড়ায়, শোকেস দেখে নেয়, আবার হেঁটে যায়। সাহসী লোকেরা তার কাছ ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে।

ক্রমে লিণ্ডসে স্ট্রীটের কাছে চলে এল তারা। রাস্তা ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসছে। রাস্তা পার হওয়ার আগে লীলা একবার ফিরে তাকায় অন্যমনে। অবহেলার চোখ–তাচ্ছিল্য ফুটে আছে। পরমুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নেয়। তবু বঁড়শির মতো সেই দুটি চোখ শ্যামের বুকের মধ্যে গেঁথে যায়। তার শরীর যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে। বুকের মধ্যে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে।

নিঃশব্দে লীলা বলে ওঠে–কাছে এসো।

শ্যাম আপনমনে মাথা নাড়ে। না আমি জানি কাছে যেতে চেষ্টা করলে চারদিকের বাড়িঘর কেঁপে উঠবে, মাঠ ময়দান থেকে শিকড় ছিঁড়ে ছুটে আসবে গাছপালা, বাতাস আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলবে–রক্ষা করো, রক্ষা করো; আমি জানি, এখানে নয়, অন্য কোনো সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের দেখা হওয়া ভাল। এখানে নয়–এত লোকজন আর এত ভিড়ের মধ্যে নয়। দেখো একদিন খুব শীগগীরই আমি পৃথিবীতে সুসময় এনে দেবো।

সে লীলার নিঃশব্দ স্বর শুনতে পায়–কথা বলো।

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। এখনো নয়। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যই আমি আলাদা একটা ভাষা তৈরী করবো দেখো। সেই ভাষায় থাকবে না কোনো কঠিন, রূঢ় কিংবা অশ্লীল শব্দ, তাতে থাকবে না কোনো গালাগাল। এখনো মানুষের ভাষা তেমন সুন্দর নয়। এখনো তাদের জানা বহু শব্দ রয়ে গেছে–যা রহস্যময়, কিংবা যা রাগ ও বিদ্বেষের, যা অবহেলা কিংবা প্রত্যাখ্যানের। আগে তুমি সেই সব শব্দ ভুলে যাও, তারপর.......

লীলা রাস্তা পার হল না। বাঁয়ে মোড় ঘুরল। কয়েক পা হেঁটে একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল হঠাৎ। পিছনে ফিরে অন্যমনস্ক চোখে একবার চারদিকে দেখে নিল। তারপর দরজার ভিতরে চলে গেল।

শ্যাম ধীরে ধীরে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভিতরে কেবল দেখা যাচ্ছে একটা সরু সিঁড়ি–স্টীমারের সিঁড়ির মতো সুন্দর, লোহার চকচকে পাতিকে বসানো, মসৃণ রেলিঙ, খুব উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সিঁড়িতে লীলা নেই। উঠে গেছে। নতুন রঙের গন্ধ পাওয়া যায়, আর মৃদু, খুব মৃদু পাউডারের গন্ধ।

এটা কি রেস্তোরাঁ! শ্যাম কয়েক পা পিছিয়ে এসে দরজার ওপরে দেখল রেস্তোরাঁ। সাইন বোর্ডে নাম লেখা আছে। শ্যাম জানে এখানে লীলার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে। শ্যামের জানা দরকার লোকটা কে! সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কোনো মোটর-সাইকেল দাঁড় করানো আছে কিনা। নেই।

কোনো দ্বিধাই বোধ করল না শ্যাম। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

হলঘরের মতো প্রকাণ্ড একটা ঘর। এত উজ্জ্বল আলো জ্বলছে যে শ্যামের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পেয়ালা পিরিচ, চামচ কিংবা টেবিলের কাচের চাদর থেকে ঠিকরে এসে আলো তার চোখে আলপিনের মতো বেঁধে। কিছুক্ষণ সে ভাল করে লীলাকে দেখতে পেল না। সে তার রুক্ষ চেহারা এবং এলোমেলো পোশাকে এই ঝকঝকে ঘরে বেমানান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর লীলাকে দেখতে পেল সে। প্রায় ফাঁকা রেস্তোরাঁ। কয়েকটিই মাত্র লোক ছড়িয়ে বসেছে, একেবারে কোনো দূরের টেবিলে বসেছে লীলা, টেবিলের ওপর অল্প নোয়ানো কাঁধ, মুখ

নীচু যেন টেবিলের কাছে সে তার মুখের ছায়া দেখছে। না, নীলা একা নয়,তার মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছে সুন্দর চেহারার একটি লোক।

অরুণ না! ভ্রু কুঁচকে শ্যাম দেখে, তারপরে মৃদু হাসে। হ্যাঁ, অরুণই।

অরুণ তাকে প্রথম দেখতে পেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো লাফিয়ে উঠল অরুণের, কপালে পড়ল ভাঁজ। মুখ সামান্য ফাঁক হয়ে রইল একটুক্ষণ। শ্যাম বুঝল না, কেন এরকম হল অরুণের! সে মৃদু হাসিমুখে চেয়ে রইল অরুণের দিকে।

সামান্য ফিসফিস করে অরুণ বলল–শ্যাম! অনেকক্ষণ পর হাসল–আয়! আশ্চর্য যে, নীলা তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

অরুণের ডাকটাকে গ্রাহ্য করল না শ্যাম। মাঝখানের তিনটে টেবিল সে বাদ দিয়ে বসল। একা। এক কাপ চায়ের কথা বলে দিল বুড়ো বেয়ারাকে।

আড়চোখে সব কিছু লক্ষ্য করে শ্যাম। অরুণের মুখ অল্প লাল। তাকে লাজুক আর ভীতু দেখাচ্ছে। খুবই আশ্চর্য হল শ্যাম। এরকম হওয়ার কথা ছিল না। তার নিজের অতীতের মতোই অরুণের চরিত্র--সে জানে। কোনো লোকের বদলে অরুণকে দেখে শ্যাম বরং স্বস্তি পায়। শ্যাম জানে যে, সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অরুণের কাছে থেকে নীলার কোনো ভয় নেই। শ্যাম নিজে অরুণের চেয়ে অনেক পাকা লোক ছিল।

সে লক্ষ্য করল, অরুণ কথা বলছে না নীলার সঙ্গে। সে কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো আলুর বড়া মুখে পুরে ভয়ঙ্কর জোরে উত্তেজিত ভাবে চিবোচ্ছে। ঝনন করে তার চামচ পিরিচের সঙ্গে ঠুকে সামনের দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দর চেহারা আর সুন্দর পোশাক অরুণের ওই ভাবভঙ্গী খুব বেমানান লাগে শ্যামের কাছে।

নীলা খুব ঠাণ্ডা এবং সহজ ভঙ্গীতে বসেছে এখন। নোয়ানো মাথা তুলে অরুণের দিকে চেয়ে দেখছে। তার মুখে একটু স্মিত কৌতুকের ভাব। হঠাৎ সে তার একটু তীক্ষ্ম পাখীর মতো মিষ্টি গলায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে বলল–আপনি আমাকে ডেকেছিলেন!

অরুণ সামান্য অস্থির অবস্থির হাসি হাসে, মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–আমি এসেছি।

খুব মৃদু গলায় অরুণ কিছু বলল। শ্যাম শুনতে পেল না। শুধু দেখল, অরুণের কথার উত্তরে নীলা শুধু মাথা নেড়ে জানাল–না।

নীলাকে কেন এখানে ডেকে এনেছে অরুণ তা শ্যাম বোঝে। তবু নীলাকে খুব শান্ত ও দৃঢ় দেখায়–যেন নীলার সঙ্গে আছে কোনো সমর্থ লোক যে নীলাকে আপদে রক্ষা করবে। নীলার চোখেমুখে সেই প্রত্যয় দেখে শ্যাম। লক্ষ্য করে, অরুণ তার শুকনো ঠোঁট চাটছে, এবং বোকার মতো এড়িয়ে যাচ্ছে শ্যামের চোখ। শ্যাম মৃদু হাসে। তার সামনের টেবিলে রাখা এক কাপ চা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যেতে থাকে।

ওরা আর কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। নীলার সামনে রাখা খাবারের প্লেট পড়ে থাকে। শ্যাম একটু বিস্মিত হয়–নীলা কি জানে না যে, শ্যাম তার খুব কাছেই বসে আছে!

নীলা জানে। একটু পরেই শ্যাম সেটা টের পায়।

বাঁ হাতে জলের গ্লাস ধরে ডান হাতে নীলা তার বেণীটা বুকের ওপর টেনে আনে। ঐ ভাবে কৌশলে ঘাড় কাত করে অরুণের অজান্তে নীলা হঠাৎ সোজা শ্যামের দিকে তাকায়। যেন নীলা একবারও ঘাড় না ঘুরিয়েই জানত শ্যাম কোথায় বসে আছে। তার চোখের ওপর নীলার চোখ ঝলমল করে ওঠে। আর সেই মুহূর্ত খুব চমকে উঠে শ্যাম দেখতে পায়, নীলা একটু হেসেই হাসিটা ঠোঁটে টিপে দিল, তার চোখ আঙুলের মতো একটু সংকেত করে দেখিয়ে দিল অরুণকে। নিঃশব্দে কয়েক পলকে এইসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। তারপরই স্বাভাবিকভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল নীলা।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারে শ্যাম। বুঝতে পারে আজ বিকেলে ইচ্ছে করে কেন একা ধীরে ধীরে এতদূর হেঁটে এল নীলা। নীলা জানত শ্যাম তার পিছু নেবে। তাই খুব এতদূর কৌশলে তাকে টেনে এনেছে নীলা। নীলা ঘাড় না ঘুরিয়েও জানতে যে সে খুব কাছেই বসে আছে। নীলা

জানে যে, যে কোনো আপদে-বিপদে শ্যাম তাকে রক্ষা করবে। তাই সে কৌশলে শ্যামকে বলে দিল-এই লোকটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতা অনুভব করে শ্যাম। দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো শক্ত হয়ে যায় তার চোয়াল। সে অরুণের দিকে চেয়ে থাকে। তার রক্তে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। আর একটিমাত্র ইঙ্গিতের জন্য তার সমস্ত শরীর প্রস্তুত থাকে।

মৃদু স্বরে কথা বলে অরুণ। বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকায় লীলা। না। না, না। তারপর কিছুক্ষণ চলে। শান্তভাবে বসে থাকে শ্যাম। অপেক্ষা করে। তার মাথার ভিতরে ধীরে ধীরে আর সব বোধ লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু কুয়াশার মতো জমে ওঠে রাগ।

শ্যাম দেখে, অরুণ বিল মিটিয়ে দিচ্ছে। টেবিলের ওপর থেকে সাদা হাতব্যাগ তুলে নিচ্ছে লীলা। ওরা উঠে দাঁড়াল। ওরা হেঁটে এল, সামনে লীলা। একবার-সেটাও ভুল হতে পারে-মাত্র একবার শ্যামের মনে হল, লীলার চোখ তার টেবিলের একটা কোণ ছুঁয়ে গেল।

অরুণ তার দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসিতে কোনো ইচ্ছা বা প্রাণ নেই। সেই উঁচু ফিসফিস স্বরে বলল-শ্যাম! একটু দ্বিধায় দাঁড়াল, বলল-পরে কথা হবে।

লীলা ফিরে তাকাল না। তার দরকারও নেই। শ্যাম বোঝে।

সিঁড়ির চৌপুরীতে ওরা নেমে গেলে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তাড়াতাড়ি একটা ট্রে হাতে ছুটে এল বুড়ো বেয়ারা। বিরক্তিকর ভাবে পথ আটকাল। পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সা যতখানি হাতে পেল, তুলে এনে ঝনাৎ করে তার ট্রে-তে ফেলে দিল শ্যাম। তারপর আর ফিরেও তাকাল না।

নিচে নেমে এসে দেখল কোথাও কেউ নেই, তাড়াহুড়ো করে ওদের খুঁজল না শ্যাম। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে নিশ্চিত মনে বাস ধরল।

হোটেলে ঢুকে ভূত দেখে আঁতকে উঠল শ্যাম। সুবোধ মিত্র। অনেককালের পুরনো বন্ধুর মতো হাসল মিত্র।

--কাল আসেননি। শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

-না। মিত্র মাথা নাড়ে-কাল একটা বরযাত্রী গিয়েছিলুম।

-শ্যাম উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে।

মিত্র বলল-কাল একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম মশাই। বরযাত্রী গিয়েছিলুম পুটিয়ারি পশ্চিম না দক্ষিণ ঠিক মনে নেই, টালিগঞ্জের খাল পেরিয়ে যেতে হয়। ও-সব গ্রাম-গঞ্জ কিছুকাল আগেও। কিন্তু গিয়ে শুনলুম ওটাও নাকি কলকাতা....হাঃ হাঃ দু'দিন পরে আপনি যেদিকেই যাবেন, যতদূর যাবেন, দেখবেন কলকাতা আর কলকাতা.. কলকাতার শেষ নেই আর... লাফিয়ে লাফিয়ে শহর বেড়ে যাচ্ছে মশাই, গ্রাম-গঞ্জ ক্ষেত-খামার যা পাচ্ছে হাতের কাছে তাতেই স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছে-ক্যালকাটা!... হাঃ হাঃ ...বাড়তে বাড়তে একদিন এই কলকাতাই না দুনিয়াময় হয়ে যায়! ...হাঃ হাঃ.... এতকাল কলকাতার মাঝখানে থেকে টেরও পাইনি যে, কলকাতা কেমন বেড়ে যাচ্ছে চারিদিকে! এরপর আর কলকাতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও যাওয়া যাবে না মশাই, খুব অদ্ভুত ব্যাপার হবে, দেখবেন! তখন পাহাড়ে যাবেন তাও কলকাতায়, সমুদ্রে যাবেন তাও কলকাতায়; তখন কলকাতায় জন্মে সারাজীবন কলকাতাতেই ঘুরে মরবে লোক .....হাঃ হাঃ....

খাওয়া হয়ে গেলে এক সঙ্গে বেরোলো দু'জন। শ্যাম গুনে দেখল আজ পনেরোটা কুকুর। সে হঠাৎ বলল-কুকুর খুব বেড়ে যাচ্ছে, দেখেছেন!

-হ্যাঁ। মাথা নাড়ে মিত্র। হেসে বলে-আমাদের ম্যানেজার লোকটা খুব কুকুরভক্ত। তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল-বোধ হয় রোজ মহাভারত পড়ে.... হাঃ..হাঃ...

মিত্রকে গড়িয়াহাটায় দিয়ে ঘরের দিকে ফিরল শ্যাম। দূর থেকেই দেখল বাসার সামনে রাস্তার ফুটপাথে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার টাইয়ের 'নট ঢিলে হয়ে গেছে, রাস্তার মৃদু আলোতে তার মুখটা লাল আর চোখ দুটো হতভম্ব দেখায়।

-ওঃ শ্যাম! অরুণ সামান্য টলমলে পায়ে এগিয়ে আসে, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোকা-হাসি হাসে-তোর সঙ্গে কথা আছে......

শ্যাম তার হাত ছোঁয় না, দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকে দেখে। নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতাকে অনুভব করে সে। ঠাণ্ডা গলায় বলে-আয়।

হুইস্কির চেনা গন্ধ পায় শ্যাম। সামান্য অস্থির পায়ে অরুণ তার পিছনে হেঁটে আসে। আসতে আসতে কথা বলে–ওঃ, শ্যাম, আমার বড় কষ্ট রে। আমি আর পারছি না রে

হুইস্কির চেনা গন্ধ–বহু দুর অতীত থেকে ঐ গন্ধ ভেসে আসছে। স্বাদ ভুলে গেছে শ্যাম। ভাবতে ভাবতে সে সিঁড়ি ভাঙ্গে। পিছনে অরুণ।

ঘরে ঢুকে অরুণ হাঁফায় বিছানায় বসে পড়ে, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে আধশোয়া হয়। তার স্যুটের ভাঁজ নষ্ট হচ্ছে, সেদিকে তবু খেয়াল করে না অরুণ। বলে–তুই দেখছিস্। তুই সব দেখে বুঝে নিয়েছিস শালা.. তোকে আমি.... বলতে বলতে আবার দৃষ্টি শূন্য হয়ে যায় অরুণের। হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

শ্যাম তার চেয়ার জানালার কাছে টেনে আনে, তার ওপর একখানা পা তুলে দিয়ে দাঁড়ায়। অরুণকে দেখে।

কী বলছিল তা ভুলে গিয়ে অরুণ বলল–ওঃ তোকে আমার শ্বশুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, না? তোর হয়ে শ্যাম, তুই ভাবিস না। আমি বাইরে যাওয়ার আগে তোকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। বোকার মতো অর্থহীন হাসি হাসে অরুণ-আমি অনেক কিছু পারি, জানিস! আমি শালা অনেক কিছু ধীরে...ধীরে চোখ বোজে অরুণ। বমি করার আগের মুহূর্তের মতো শরীর কেঁপে ওঠে তার, চোখ ঠিকরে ওঠে, মুখ লাল। আবার সামনে যায় অরুণ। হাঁফায়। বলে–তবু কী বলবো, ঐ বুড়োটাকে আমি ভয় পাই, ওই শালা বুড়ো আমার সব কিছু হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছে, ইচ্ছে করলে ও আমায় বাঁদরনাচ নাচাতে পারে, শালা হারামির বাচ্চা...... বলতে বলতে আবার বমির ভাব সামলে নেয় অরুণ–আমার পিছনে লোক লাগিয়েছে শালা, শাসিয়েছে দরকার হলে আমাকে গুন্ডা দিয়ে মারবে......

–কে! শ্যাম ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে।

–আমার বউয়ের বাপ। শালা শ্বশুর...শালা একটা সুন্দর মেয়ের জন্ম দিতে পারেনি মাইরি, তবু শালা শ্বশুর ! আমার শ্বশুর!.... তুই ভাবতে পারবি না শ্যাম, আমার বউটা কী কুচ্ছিত, ঘর অন্ধকার করে দেওয়ার চেহারা!... তবু আমাকে ইন্ টাইম ঘরে ফিরতে হবে শালা, না হলে আমি চরিত্রহীন!.... আমার বউটাকে যদি তুই দেখতিস শ্যাম! ও যদি অ্যাডলটারি করতে চায় শেয়ালেও ছোঁবে না ওকে... বলতে বলতে বিছানা থেকে মুখ বের করে মাথা নামায় অরুণ। সমস্ত শরীরে হেঁচকি তোলার মত কাঁপুনি। শ্যাম লক্ষ্য করে, ঘোষা জলের স্রোত অরুণের মুখ থেকে কলের জলের মতো ধারায় নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার ঘরের মেঝে। মুহূর্তেই হুইস্কি আর টক বমি গন্ধে ঘর ভরে যায়। বিষিয়ে ওঠে বাতাস। শ্যাম তবু একটুও নড়ে না। পাথরের চাঙরের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থেকে অরুণকে লক্ষ্য করে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে অরুণ। কোনো দ্বিধা না করে শ্যামের বালিশ থেকে ময়লা তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখ মুছে, আবার সেটা বালিশে পেতে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারপর অধৈর্য ক্লান্ত একটা হাত বাড়িয়ে বলে–সিগুরেট!

শ্যাম তার সস্তা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বিছানায় ছুঁড়ে দেয়। অনেক কষ্টে সিগারেট ধরায় অরুণ, আগুনের ফুলকি ঠিকরে পড়ে বিছানায়।

–আমার শরীরে শালা চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু শালা আমাকে ইন্ টাইম ঘরে ফিরতে হবে, তারপর ওই কুচ্ছিত বউটা..মাইরি, একটু লাবণ্য নেই, ডায়েট কন্ট্রোল না করেও এমন হাড়গিলে... ওঃ অ্যামেরিকা.....

বালিশে মাথা গুঁজে দেয় অরুণ। কিছুক্ষণ যেন স্বপ্নের ঘোরে একটু হাসে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তোলে আবার। অপরিচিতের চোখে শ্যামের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়–শ্যাম!

তারপর কথা ভূলে গিয়ে আবার হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

–তুই জানিস না শ্যাম, আমার পিছনে লোক গেলে আছে। কিছুতেই সেই লোককে ধরতে পারছি না। আমার সব খবর সে দিয়ে দিচ্ছে শালা বুড়োকে। আমি রেস্তোরাঁর পর রেস্তোরাঁ পাল-টাচ্ছি, কত গলিঘুঁজিতে চলে যাচ্ছি মেয়েছেলে নিয়ে, কত অচেনা জায়গায় যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই পালাতে পারছি না, লুকিয়ে থাকতে পারছি না। বুড়ো আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার সারাদিনের সব গোপন রিপোর্ট আমাকেই শুনিয়ে দিচ্ছে।...মাইরি, তারপর চাকরবাকরের মতো ট্রিট্ করছে, বাচ্চা ছেলের মতো ধমকাচ্ছে...। কী করে খবর পাচ্ছে..

তারপর হঠাৎ হাসে অরুণ–দাঁড়া শালা, একবারই আমি শালা পালাবো, ভিসাটা হাতে পাই, তারপর জেট্‌ইওর ওয়ে টু অ্যামেরিকা... ভোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ..

যে হাতে এরোপ্লেনের ভঙ্গী করে দেখাল অরুণ, সেইহাতটাই হঠাৎ মুঠো পাকিয়ে চাপা গলায় বলল–কিন্তু কে খবর দিচ্ছে! আমি শালা কিছুতেই ধরতে পারছি না, কে!... রাস্তায় হাঁটি রেস্তোরাঁয় বসি, বারে যাই, কিন্তু সব সময়ে আমার ঘাড় সুড় সুড় করে, পিঠের চামড়ায় যেন কার চোখ টের পাই। সব সময়ে ভয়-ভয়, চিন্তা টেনশন! কে খবর দিচ্ছে! কে।

বাতাসে শূন্য চোখে চেয়ে অরুণ জিজ্ঞেস করে-কে! তারপর আবার ককিয়ে ওঠে–তুই জানিস না শ্যাম অ্যামেরিকা যাওয়ার মাঝপথ থেকে ওই বুড়ো আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইচ্ছে করলে তছনছ করে দিতে পারে আমার ক্যারিয়ার, যখন খুশী ভয় দেখাতে পারে আমাকে... মেয়ের নামে তিনটে বাড়ি দিয়েছে শালা,দুলাখ টাকা। আমি শালা বড়লোক। কিন্তু সব কেড়েকুড়ে নিতে পারে আবার। ইচ্ছে করলে..ইচ্ছে করলে আমাকে হাওয়া করে দিতে পারে....অথচ আমার শরীরে চিতাভাগ ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা সুন্দর মেয়ের জন্য... একটা সুন্দর কিছুর জন্য.....আমি শালা....

আস্তে আস্তে চোখের জল ঝরে পড়ে অরুণের। কোনো শব্দ হয় না, শুধু ঠোঁট দুটো কাঁপে। শ্যাম স্থির দাঁড়িয়ে দেখে। আস্তে আস্তে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ, ফোঁপানো গলায় বলে–তুই আজ আমাকে দেখছিস!

শ্যাম মাথা নাড়ে। হ্যাঁ।

অরুণ বলে–তোকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলুম। বলে অস্বস্থির হাসি হাসল–অনেকদিন তোর খোঁজ–খবর রাখিনি, জানি না সত্যিই এখন কী করছিস। সেদিন তোর সঙ্গে দেখা হলে অনেক কথা বলে দিয়েছিলুম। আজ তাই হঠাৎ তোকে দেখে কেমন যেন মনে হল তুই–ই আমার শ্বশুরের সেই লোক। বলে হাসে অরুণ-তোকে পাকা মস্তানের মতো দেখাচ্ছিল।

উত্তর দেয় না শ্যাম। স্থির দাঁড়িয়ে অরুণকে দেখে।

আস্তে আস্তে অরুণের মুখ থেকে হাসি সরে যায়। ভিখিরির মতো গলায় সে বলে–আমি তোর জন্য সব করবো শ্যাম। আমি অনেক কিছু পারি। আমি শালা পালাতে চাই। একবার যেতে পারলে আমি আর ফিরবো না। ....ওই কুচ্ছিত বউ, ওই হারামী বুড়ো আর এই ভিখিরির দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে শালা... আবার আমি বড়লোক হয়ে যাবো। বলে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকায় অরুণ, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে–আমার এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আমার বয়স আছে... কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে শ্যাম, যদি তুই একবার ফোন তুলে বুড়োকে বলে দিস যে, আমি আজ লীলার সঙ্গে ছিলুম বিকেলে...

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। হরিণ দৌড়োয়। আর কালো রেলগাড়ি লম্বা একটা রেল পুল পেরিয়ে যেতে থাকে।

ধীর শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করে–তুই লীলাকে কখনো ছুঁয়েছিস্?

–অ্যাঁ! বলে অরুণ অর্থহীন চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দুঃখে মাথা নাড়ে–না। তারপর বদমাসের মতো হাসে–সী ইজ ইন লাভ। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো বলেছিলুম না? করবি আলাপ?

শ্যাম আবার বলে–আজ বিকেলে কী কী হয়েছিল?

–নাথিং। হাসে অরুণ–আমরা ভাইবোনের মতো ছিলুম। বলে বড় করে শ্বাস ছাড়ে অরুণ–আজই প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বললুম, ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াই চল। বলল, না। জিজ্ঞেস করলুম, রাত্রে একা একা লাগে না? ভীষণ রেগে গেল–বলতে বলতে অরুণ হেঁচকি তুলে হেসে উঠল– আসলে মেয়েটা একেবারে বাচ্চা, আর নতুন। তার ওপর বোধ হয় এনগেজড্। তবু আমি আম্বিকা হালদারের জামাই, আমাকে এড়াতে পারে না বলে এসেছিল–বলতে বলতে সামান্য অহঙ্কারী হয়ে গেল অরুণের মুখচোখ! হেসে বলল–দূর শালা, এর চেয়ে মিস্ দত্ত অনেক হট্ ছিল। কী বাটক্ মাইরি...

আস্তে আস্তে উঠে মেঝেতে নিজের বমির ওপর দাঁড়াল অরুণ। বলল–শ্যাম, আমার দিব্যি মাইরি, বুড়ো যদি জানতে পারে.. তোর শালা চোখ বটে! কী করে খুঁজে খুঁজে ঐ রেস্তোরাঁয় বের করলি আমাকে? নাকি শালা তুই সারাদিন আমার পিছনে লেগেছিলি! অ্যাঁ?

শ্যাম চুপচাপ চেয়ে থাকে। না, তাকে আর কিছুই করতে হবে না। সে বুঝে যায় অরুণকে কষ্ট দেওয়ার ভার অরুণই নিয়েছে।

অরুণ তার বমির ওপর একবার পা হড়কায়, সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার কাছে চলে যায়। হাত তোলে। হেসে বলে–টু অ্যামেরিকা.....! চলে যায়। দরজা পর্যন্ত মেঝেতে তার বমিতে ভেজা পায়ের ছাপ পড়ে থাকে।

শ্যাম জানালা দিয়ে দেখে অরুণ রাস্তার ধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একখানা হাত শূন্যে তুলে অদৃশ্য ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করছে।

সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অরুণ ঠিক পৌছে যাবে–শ্যাম জানে। কাল সকালে আজকের কথা মনে থাকবে না অরুণের। প্রতিদিনই ওইভাবে আগে দিনের কথা ভুলে যেতে যেতে ঠিকঠাক মতোই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে যাবে অরুণ। ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে অর্থহীন হাসল শ্যাম।

অনেকদিন পর তার ইচ্ছে করল ঘরটাকে একটু সাজায়।

।। ১৩ ।।

হ্যাঁ। আজকের কাগজে খবরটা আছে। ঠিক বোঝা যায় না, তবু বোধ হয় এটাই সেই খবর।

প্রথমে কিছুক্ষণ নিজের চোখ, বোধশক্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্বাস হয় না শ্যামের। তারপর আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে ঘটনাটা বোধ হয় ঘটে গেছে। সত্যিই। কিছুকাল আগে দক্ষিণ কলকাতায় এক মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত শ্রীগৌর ভৌমিক (৩২) গতকাল দুপুরবেলা শূকলাল কারনানি হাসপাতালে মারা গেছে। দুর্ঘটনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল না। মৃত্যুর দু' বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল এবং তার একটি শিশুকন্যা আছে। আছে বাবা মা এবং তিন ভাইবোন। লোকটা খুব অখ্যাত ছিল না, রেডিওতে গান গাইত এবং তার দুটি রেকর্ডও আছে। যদিও গান শোনেনি শ্যাম এবং লোকটার নামও তার জানা ছিল না।

এই সেই লোক কি না কে জানে! শ্যাম জানে না। আস্তে আস্তে খবরের কাগজটা সে মাটিতে রেখে দিল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরায়। আজও সেই রকম রোদ, অবিকল তেইশে ডিসেম্বরের মতো। ওই সেই রাস্তার তেমাথার বাঁক। লোকটা ডানদিকে মোড় ঘুরতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় আছড়ে পড়েছিল। গৌর ভৌমিক! গান গাইত! একটা শিশু মেয়ে আছে তার! আছে বউ! আছে বাবা মা ভাইবোন! আশ্চর্য, এত সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা ছিল লোকটা! অথচ শ্যাম টেরও পায়নি। সে শুধু দেখেছিল একটা মোটর-সাইকেলের কালো ভোঁতা মুখ, আর অচেনা একটা মানুষের ছুটন্ত শরীর। কে জানত যে লোকটার অত পরিচয় আছে!

তবু এই সেই লোক কিনা কে জানে! শ্যাম জানে না। যদি এই সেই লোক হয়ে থাকে তবে শ্যাম এ জন্মের মতো বেঁচে গেল। কোনোদিনই অকারণে আয়নার আলো ফেলার জন্য কেউ তাকে দায়ী করবে না। সমস্ত প্রমাণ লোপ পেল, গোপন রইল কারণ, শুধু জানা গেল যে লোকটা মারা গেছে।

অনেকদিন হয় আর আয়না দেখেনি শ্যাম। তাকের ওপর থেকে আয়নাটা তুলে নিতে গিয়ে দেখল অনেক ধুলো জমে আছে। নিজের আবছা অলীক এক মুখচ্ছবির দিকে সে একটু তাকিয়ে রইল। বলল–আমি নই। তারপর মাথা নেড়ে নিজের প্রতিচ্ছবিকে বলল–তুমি! তুমি করেছিলে! তারপর হাসল শ্যাম।

না। তোমাকে চিনি না। শ্যাম বলল।

ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে জাড়িয়ে নিল শ্যাম। সাবধানে তালা দিল ঘরে। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল।

এসে বসল সেই ছোট্ট নির্জন চায়ের দোকানটায়। এক কাপ চা নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে সে বাচ্চা বয়টাকে ডেকে আর এক কাপ চা দিতে বলল। চা দিয়ে গেলে সে চায়ের কাপটা উল্টো দিকের শূন্য চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপর রাখে, ছাইদানীটা বসায় চায়ের কাপটার পাশে, একটা সিগারেট ধরিয়ে যত্নে রাখে ছাইদানীটার ওপর। বাচ্চা বয়টা চোখ গোল করে এই দৃশ্য দেখে, দোকানের বুড়ো মালিক তাকে লক্ষ্য করে, দুটি ছোকরা খদ্দের কথা থামিয়ে চেয়ে থাকে। শ্যাম লক্ষ্যও করে না তাদের। শূন্য

চেয়ারটার সামনে টেবিলের ওপর নিঃশব্দে পুড়তে থাকে একটি আস্ত সিগারেট। ধোঁয়া উঠে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে আসে এক কাপ চা। মনে মনে নত হয়ে কথা বলে শ্যাম-গৌর ভৌমিক, যদি পারো তবে আবার জন্ম নিও। আমি জানি, আবার জন্ম নেওয়া বড় সহজ হবে না। শূন্য থেকে জল থেকে, বাতাস থেকে, মাটি থেকে আবার নিজের শরীর সংগ্রহ করে আনা, এবং তারপরও আবার ভুল, কেবল ভুল জীবন যাপন করে যাওয়া..... তবু বড় ইচ্ছে হয় আর একবার, আরো একবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে...... গৌর ভৌমিক, হয় না! যদি পারো আরো একবার জন্ম নিও, ততদিনে আমি পৃথিবীতে সুন্দরন করে দেবো, তুমি নিরাপদে পেরিয়ে যাবে, রাস্তার প্রতিটি বাঁক ঝড়ের বেগে পার হবে... নীলার কোলে শিশু হয়ে এসো, আমি যত্নে তোমাকে বড় করে তুলবো।...

তারপর সে ওঠে। দু'কাপ চায়ের দাম দিয়ে দেয়। বেরিয়ে পড়ে।

তুমি ছেলে ছিলে, তুমি স্বামী ছিলে, তুমি ছিলে বাবা। তুমি এত কিছু ছিলে কেউ জানতোই না। আবার দেখ, তুমিই উড়ন্ত মোটর-সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না। ... গৌর ভৌমিক, আমার ওপরওয়ালা বাসটার্ড বলে গাল না দিলে আমি কি চাকরি ছাড়তুম? চাকরি না ছাড়লে আমি খেলার ছলে তোমার মুখে ফেলতুম আয়নার আলো? দেখ, এ সবকিছুই একটি রহস্যময় কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। তুমি কাকে দায়ী করবে? এই দুহাত শূন্যে তুলে ধরে বলছি-আমি দায়ী নই। আবার দেখ মাথা নীচু করে আমিই স্বীকার করছি-আমি দায়ী। তুমি কাকে দায়ী করবে? মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের ঘোরে আমি ডাক দিয়ে উঠি-শ্যাম! আবার নিজেই উত্তর দিই-যাই। নিজের সঙ্গে সব বোঝাপড়া আমার শেষ হয়নি। এখনো আমার ভিতরে রয়েছে একজন অচেনা শ্যাম।..... না, পৃথিবী এখনো তেমন সুন্দর নয়, তবু আমি অপেক্ষায় আছি.... জন্ম নাও, আর একবার জন্ম নাও, আমাদের কাছে এসো..

অনেক্ষণ ধরে ধীরে হেঁটে হেঁটে বিচিত্র সব রাস্তার ভিতর দিয়ে চলে গেল শ্যাম। কখনো মাথার ভিতরে, কখনো বুকের ভিতরে ভ্রমরের গুনগুন শব্দের মতো গভীর থেকে গভীরে চলে গেল একটি মোটর-সাইকেলের শব্দ। মাঝে মাঝে চমকে উঠল শ্যাম। নিজেকে ডেকে বলল-তুমিও.. তুমিও উড়ন্ত মোটর-সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না......

না, তা নয়। শ্যাম জানে। সে শ্যাম চক্রবর্তী, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী, বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রামে তার দেশ, সে ছিল সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের ছোটসাহেব। এ সব কিছুর মধ্যে সে বাধা আছে।

অথচ সে জানে না সে কে! কিংবা সে কি রকম!

।।১৪।।

তালু শুকনো অল্প একটু মাথা ধরা আর সামান্য পিপাসা টের পাচ্ছিল শ্যাম। তার জ্বর আসছে। দুপুরে স্নান করার সময় তার গা শিরশির করছিল। তবু তার মনে হয়েছিল যে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হচ্ছে না তার গা। শরীরেও অনেক ময়লা জমে আছে। তোয়ালে ঘসে সারা শরীরের ময়লা তোলার চেষ্টা করেছিল সে তারপর অনেক জল ঢেলেছিল। তেল না-দেওয়া রুক্ষ শরীর শীতে ফেটে-ফুটে গেছে, সেইসব ফাটা জায়গায় ঠাণ্ডা জল ঢুকে রি-রি করে কাঁপছিল তাকে। কান কনকন করে উঠল, ঠাণ্ডায় মাথা ধরে গেল, দাঁত ব্যাথা করে উঠল। তবুও সে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিল আজ। তারপর ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে দিয়ে যখন সে হোটেলে বেরোচ্ছিল তখন থিরথির করে তার শরীর কাঁপছে, চোখে জ্বালা-জ্বালা ভাব এবং মনে সন্দেহ যে শরীর যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি। ময়লা রয়ে গেছে। আরো অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে তার স্নান করা দরকার।

ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই সে টের পেল ঘূর্ণী ঝড়ের মতো শরীরের ভিতর থেকে বমি উল্টে আসছে। টেবিলে ভর রেখে চীনেমাটির প্লেটের ওপর সে মুখ নিচু করে রইল অনেক্ষণ। তার মুখ থেকে কস বেয়ে লালা নেমে যাচ্ছিল প্লেটের ওপর। কেউ দেখে ফেলার আগেই সে রুমালে ঢেকে নিল মুখ তারপর মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। অস্পষ্ট গলায় আধঘুমন্ত ম্যানেজারকে বলল- খাবারটা কুকুরকে দিয়ে দেবেন।

কি হল?

-শরীর ভাল নেই।

বেরিয়ে এসে পানের দোকান থেকে নুন, মশলা আর লেবুর রস দেওয়া একটা সোডা খল

সে, আর দুটো মাথা ধরার বড়ি। জিভে কোনো স্বাদ নেই। তার জ্বর আসছে। হয়তো খুব অসুখ হবে তার। অনেকদিন সে তার শরীরের যত্ন নেয়নি, অনেকদিন ভাল করে লক্ষ্য করেনি নিজেকে। তাকে অন্যমনস্ক রেখে অনেকদিন ধরে তার শরীর অসুখ তৈরী করেছে। কে জানে, হয়তো এবার বহুকাল তাকে শুয়ে থাকতে হবে ঘরে কিংবা হাসপাতালে।

ধীরে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। অকারণে তার কেবল মনে হচ্ছিল, অসুখটা এসে পড়ার আগে কোন একটা কাজ তার শেষ করার আছে। শরীর কাঁপছে তার। মনের ভিতরেও একটা তাড়াহুড়োর ভাব, যেন বৃষ্টি আসছে–তাঁর আগেই উঠোন থেকে তুলে আনতে হবে রোদে দেওয়া কাপড়চোপড় কিংবা ডালের বড়ি। কিংবা ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি বাজছে, সময় নেই, ছাড়ার আগেই তাই বিদায় দিতে আসা মানুষদের কয়েকটা জরুরী কথা বলে যাওয়া দরকার। আমার ঘরদোর সামলে রেখো, আমার পোষা পাখীকে দিও দানা আর জল, দেখো যেন চুরি না হয়, আমি ফিরে আসার আগেই যেন বিদায় না নেয় আমার কোনো প্রিয়জন, আমার সুন্দর বাগানে যেন না ঢোকে গরু-ছাগল, আমার নিজের হাতে লাগানো গাছগুলি যেন উড়ে না যায় বৈশাখের ঝড়ে!

এইসব অর্থহীন কথা সে বিড় বিড় করে বলছিল। ঠিক জানে না শ্যাম, কিন্তু কেবলই মনে হয় ওরকমই জরুরী কিছু কথা কাউকে তার বলে নেওয়ার আছে। কাকে! ভেবেও পেল না শ্যাম। তার চারপাশে বেলুনের মতো শূন্যে মানুষেরা হাঁটছে–তার নিতান্তই অপরিচিত এইসব মানুষ। এদের কাউকে কি?

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। না।

শেষ দুপুরে যখন রোদে পাকা ধানের মতো রঙ ধরেছে তখন সে এসে তার থামটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কাচের দরজাটার মুখোমুখি। আস্তে আস্তে হাঁফাতে লাগল। চেয়ে দেখল হঠাৎ বড় ঘোলাটে হয়ে গেছে কাচ, ভিতরটা প্রায় দেখাই যায় না। বিরক্ত হল শ্যাম–এরা কাজে বড় ফাঁকি দেয়, কাচের পাল্লাটা রোজ ধোয়া-মোছা করা উচিত। তার ইচ্ছে করছিল, ভিতরে গিয়ে কথাটা ওপরওয়ালাদের বলে আসে–আপনাদের কাচের দরজাটা নোংরা হয়ে আছে। ওটাকে পরিস্কার করে দিন।

কিন্তু শ্যাম নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। সে তার সমস্ত মন এবং হৃদয় দিয়ে কাচের সেই অস্বচ্ছতা ভেদ করার চেষ্টা করছিল।

চারদিকে ছায়ার মতো অলীক লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। কেউ টেরও পাচ্ছে না তাদের চেনা এই চতুর্দিক রাস্তাঘাট বাড়িঘর ভেদ করে এসে একে একে হেঁটে আসছে মায়াবী হরিণেরা। তাদের মৃদু খুরের শব্দ বেজে যাচ্ছে। আর মেঘ ডেকে উঠছে শরীরের ভিতরে, বৃষ্টি নামছে, সেই বৃষ্টির জলের মতো ভালবাসায় টলটল করে ভরে আসছে বুক, বহু দূরে অচেনা এক রেল পুল পেরিয়ে যাচ্ছে কালো একটা রেলগাড়ি।

স্পষ্ট দেখতে পায় না শ্যাম, তার কেবল মনে হয় ভিড় থেকে খুব লম্বা কালো চেহারার একটা লোক বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। বড় নিষ্ঠুর তার মুখ, দয়াহীন। সামান্য চমকে ওঠে শ্যাম–মিনু না!

লোকটা স্থির চোখে দেখে তাকে। তার ঠোঁট নড়ছে, কথা বলছে সে। স্পষ্ট বুঝতে পারে না শ্যাম, তার মনে হয় মিনু তাঁকে জিজ্ঞেস করছে–তুমিকে? কি চাও?

–আমি! শ্যাম প্রাণপণে বলে–মিনু! আমি শ্যাম! চক্রবর্তী, বানিখাড়া গ্রামের কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা.. আর তুই মিনু, নারায়ণগঞ্জের মিনু--- না?

কাঁচের দরজাটা আড়াল করে লোকটা দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড দেখায় তার চেহারা, তার ঠোঁট আবার নড়ে উঠল। শ্যাম বুঝল মিনু বলছে–তোমাকে চিনি না। পরমুহূর্তেই ঝলসে উঠল লোকটার ডান হাত, শ্যাম দেখল সেই হাতে উকোর মতো দেখতে একটা লোহার পাঞ্চ। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল সেই হাতখানা। অসহায় শ্যাম তা আটকাবার কোনো চেষ্টাই করল না। কোথায় তার লাগল তা বুঝতে পারল না সে। শুধু টের পায় মসৃণ থামের গা বেয়ে তার অবশ শরীর ফুটপাথে নেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে উঠে বসবার চেষ্টা করে, দেখতে পায় দু'খানা খুঁটির মতো পায়ে লোকটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠতেই হকি বুটের একটা লাথি এসে বসে গেল তার পেটে। পলকে সমস্ত শরীর থেকে বমি উল্টে এল, কলকল করে তার বিস্বাদ জিভ অতিক্রম করে টক-তেতো জলের ধারা নামল। ভিজে গেল বুক। অদ্ভুত হাল্কা লাগল তার বুক–অনেকদিন ধরে

এই বমিটা তার ভিতরে জমে ছিল। আবার উঠবার চেষ্টা করে শ্যাম! কিন্তু তাকে আর উঠতে হয় না। লোকটা বাঁ হাত বাড়িয়ে গলার কাছে তার চাদরটা মুঠো করে ধরে, তারপর টেনে তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। আবার ঝলসে ওঠে তার ডান হাত, হাতে উকোর মতো দেখতে সেই পাঞ্জা। হাতখানা ছুটে আসে। মৃদু হাসে শ্যাম। বাধা দেয় না। ঘুষির জোরে টলে ওঠে তার মাথা, ঝনন করে ঠুকে যায় পিছনের থামে। আশ্চর্য! শ্যামের বড় ভাল লাগল। টলে পড়তে পড়তে সে লোকটার চাদর-ধরা-হাতে আটকে থেকে বিড়বিড় করে-কেন মারছিস মিনু? কেন মারছিস! আমি এখানে এসে লীলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি বলে? নাকি অনেকদিন আগে আমি একজনের মুখে আয়নার আলো ফেলেছিলুম বলে?.... আঃ. যে কারণই হোক...... থামিস না মিনু....সাবাস!

সে শুনতে পায় মিনু বলছে- শুয়োরের বাচ্চা, বেজম্মা....

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। আমি শ্যাম চক্রবর্তী, কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা, বিক্রমপুরে বানিখাড়া গ্রামে আমার দেশ....

সে দেখতে পায় পানা পুকুর ঘাটে যাওয়ার পথ, কামরাঙা গাছ আর কুয়োপাড়ের আতাবনে চকচক করছে জোনাকী পোকা, আর প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো করে বসে মা হঠাৎ বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে মৃদু স্বরে ডাকছে-মনু..মনু রে, অ মনু...মনু :....

চারদিক থেকে ছুটে আসছে লোক। লম্বা কালো চেহারার মিনু আঙুল তুলে তাকে শাসাল। ঠিক বুঝতে পারল না শ্যাম, মিনু কি বলছে, তবু সে মাথা নেড়ে বলবার চেষ্টা করল-ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

মিনু কাউকে কোনো জবাবদিহি করল না, নীরবে শেষবার শ্যামকে দেখে নিয়ে ভিড় ঠেলে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আবার আস্তে আস্তে মিনুর হাত থেকে ছাড়া-পাওয়া তার শরীর মাটির দিকে নেমে যাচ্ছিল। কেন মিনু তাকে মারল তা বুঝল না শ্যাম। বুঝবার দরকারও ছিল না। শরীর ভরে আসছে জ্বর, সে কোনো ব্যথা-বেদনা টের পায় না, তার কেবল ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। চেয়ে দেখে, অচেনা অলীক ছায়ার মতো মানুষেরা তাকে ঘিরে জড়ো হচ্ছে। সে বিড় বিড় করে বলে-সরে যাও, ঐ কাচের দরজাটা আড়াল কোরো না।

আশ্চর্য! ভিড় ভেদ কর সে কাঁচের দরজাটা দেখতে পায়। ছায়ার মতো লীলা এসে কাঁচের গায়ে মুখ রেখে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারে শ্যাম, লীলা আজ তার অপেক্ষায় ছিল। শ্যামের প্রিয় ছিল বাসন্তী রঙ। সেই রঙেরই শাড়ি পরেছে লীলা, শান্ত বিষণ্ণ তার চোখ, সমস্ত শরীরের মা হওয়ার আগের নম্রতা ফুটে আছে। চাপা কান্নায় লীলার ঠোঁট কাঁপছে কেন, এত নিষ্ঠুর কেন তোমরা! ও লোকটা আমার কোনো ক্ষতি করেনি কোনোদিন....

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ছুটতে থাকে হরিণের পাল.....তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ, সরল ও সুন্দর চোখের হরিণেরা ছুটে আসে দিগ্বিদিক জুড়ে....... মেঘের দুপুরে অচেনা এক রেলপুল পার হতে থাকে কালো রেলগাড়ি....বৃষ্টির জলে ভরে ওঠে বুক......

অস্বচ্ছ চোখে ভিড়ের মধ্যে এক-আধটা চেনা মুখ খুঁজে বেড়ায় শ্যাম-আঃ সোনাকাকা! রাঙ্গাপিসি! মানুমামা! আমি মনু, আমি তোমাদের মনু.... জন্ম নেওয়া বড় কষ্টকর, তবু তোমাদের জন্যই এই দেখ আমি আর একবার জন্ম নিচ্ছি... ভালবাসা যে কত কষ্টের তা জানে আমার মা, তবু আমি সেই কষ্ট বুকে করে নিলুম.. শীগগীরই আমি সুসময় নিয়ে আসছি পৃথিবীতে অপেক্ষা করো....

বড় মায়ায়, বড় ভালবাসায় ধুলোমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় শ্যাম।

সাঁঝের বেলা

শুষনি শাক তুলতে গিয়ে খেতে সাপ দেখেছিল মেজো বউ। 'সাপ সাপ' বলে ধেয়ে আসছিল, বেড়ায় আঁচল আটকে ধড়াস করে পড়ল। পেটে ছ'মাসের বাচ্চা। তাই নিজের ব্যথা ভুলে পেট চেপে কোনও সর্বনাশের কথা ভেবে কেঁদে উঠল চেঁচিয়ে।

দশ পয়সা, দু-আনার বাকির খদ্দের কয়েকজন। সকালে একবাটি বার্লি গিলে যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতে বসে আছে। সামনে প্রায় ত্রিশবছরের পুরোনো টেবিল তার ওপর ত্রিশ বছরের পুরোনো ব্লটিং পেপার পাতা চিঠি গেঁথে রাখার স্ট্যান্ড, পিচবোর্ডের বাক্স, পুরিয়ার কাগজ রাখার কৌটো, আঠার শিশি, ওষুধের খুদে চামচ—এইসব রাখা। মাছি বসছে উড়ে-উড়ে। যতীন ডাক্তার ঘোলাটে চোখে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসেছিল। ঘরের সামনেই একটা সুরকির রাস্তা, রাস্তার ধারে একটা বাবলা গাছ। বালীর এ অঞ্চলে বাবলা গাছ বড় একটা দেখা যায় না। তবু কী করে বালী-দুর্গাপুরে একটা বাবলা গাছ হয়েছে। হলদেটে ছোটো ছোটো তুলির মতো ফুল ফোটে! বাবলার কচি পাতা চিবিয়ে বা রস করে খেলে পেটের ভারি উপকার, বাবলা গাছের ওপাশে আবার বাড়ির এক সার, তার ওপাশে রেলের লাইন। বর্ধমান কর্ড টিপটিপ করে মাটি কাঁপাচ্ছে, দূরে মালগাড়ির হাক্লান্ত ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠছে। পৃথিবীতে আর কিছু দেখার বড় একটা নেই। ফাঁকা ঘরে মাছি উড়ে-উড়ে বসছে, নাকের ডগায়, ভুরুতে জ্বালাতন করে খাচ্ছে একটা মাছি। যতবার উড়িয়ে দেয় ততবার এসে ঠিক ওইখানটায় বসে। মাছির বড় জিদ। আজ সকালে কেউ আসেনি। বড় ফাঁকা, একা লাগছে। কমললতা ওই রাস্তাটা দিয়েই ফিরবে একটু বাদে। ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আজকাল জিগ্যেস করে যায়—কেমন আছ ডাক্তারবাবু।

যতীন ডাক্তার আজকাল আর উত্তর দিতে পারে না। কমললতার মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এসে যায়। বউ মরেছিল, সেই কবে, তার মুখখানা মনেও পড়ে না আর। তিনটে নাবালক ছেলে নিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিল তখন। সে সময়ে রুগির ভিড় থাকত হামেহাল। বড়বাজারের শেঠেদের দোকান থেকে ওষুধ এনে তা থেকে আবার ওষুধ তৈরি করা, এরারুটের গুঁড়ো বানানো, পুরিয়া করা—অনেক কাজ! ছেলেগুলো ধুলোয় পড়ে কাঁদত। সে সময়ে কমললতা যৌবনের গরবিনী। ঝিগিরি করত বটে, কিন্তু হাঁটাচলায় ভারি একটা মোহ সৃষ্টি করে যেত। যতীন ডাক্তারের বাড়ি ঠিকে কাজ করত, একদিন বলল—ও বাবু তোমার ছেলেদের একদিন ঠিক শেয়ালে নে যাবে। যতীন ডাক্তারের তখন শেষ যৌবন। কমললতার দুটো হাত ধরে ফেলে বলল—আমার ছেলেগুলো তুই নিয়ে যা কমল। তাতে অবশ্য কমল রাজি হয়নি। তবে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলল সে। নিজের একটা অপছন্দের বর ছিল বটে কমললতার, সে উদো মানুষটা ইটখোলার কুলিগিরি, জুটমিলের চাকরি এসব করেটরে অবশেষে সাধু হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে—কমললতার কাম দমন করার মতো পৌরুষ ছিল না বলেই সে নাকি লম্বা দিয়েছিল। তবে আসত মাঝে-মাঝে বাইরে থেকে—ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ বলে চেঁচিয়ে জানান দিত। দরকার মতো এক আধ রাত কাটিয়ে যেত বউয়ের সঙ্গে। আর তখন কমললতার বরকে যা-নয়-তাই বলে গুষ্টি উদ্ধার করে দিত। ত্রিশূল ভাঙত, দাড়ি ছিঁড়ত, কমণ্ডলু আছড়ে টোল ধরিয়ে দিত। কিন্তু তবু লোকটা সাধুগিরি থেকে মাঝে-মাঝে কী এক নেশায় মাস দু-মাস বাদে এসে হাজির হত ঠিকই।

সেই অপছন্দের লোকটাকে যেমন পাত্তা দিত না সে, তেমন আর কোনও পুরুষকেও দিত না। কিন্তু যতীন ডাক্তার তাকে কাবু করে ফেলে। তিনটে ফুলের মতো ছেলে ধুলোয় গড়ায়। কবে এসে হুলো বেড়াল গলার নলি কেটে রেখে যায়, দেখবে কে? ডাক্তারের বিয়ে করারও ফুরসৎ নেই আর একটা। আর দেখেই বা কে? কমললতা তাই একদিন ঠিকে থেকে স্থায়ী ঝি হয়ে গেল এ বাড়ির। প্রথম প্রথম আলাদা ঘরে ছেলেদের নিয়ে শুতো সে। তারপর ব্যবস্থা পালটালো। ডাক্তারের সঙ্গে বিছানাটা এক হয়ে গেল একদা। লোকে কু বলত। কিন্তু বলা কথায় কী আসে যায়। কোনও অনুষ্ঠান ছাড়াই কমললতা হয়ে গেল ডাক্তারের বউ। অবশ্য বউয়ের মতো থাকত না। ঝিগিরিই করত বরাবর। ছেলেরা নাম ধরে ডাকত, তুই-তোকারি করত।

বিশ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এই সংসারের সঙ্গে জান লড়িয়ে দিয়েছিল সে। ছেলে মানুষ করা, সংসার সামলানো, ডাক্তারির সাহায্য: সব। ঝিয়ের মতো থাকত, কিন্তু তার কথাতেই চলত

রোদভরা উঠানে শান্ত সকালে নরম শরীর বলের মতো গুটিয়ে বসে আছে সাদা কালো কয়েকটা বেড়াল। টিপকলের ধারে বসে বাসন মাজছিল ঝি সুধা। তাকে ঘিরে ওপর-নীচে 'খা-খা' করে ডাকছে কাক। বড় পাজি কাক এখানে, লাফিয়ে এসে খোঁপায় ঠোক্কর দেয় সুধার। আশ থেকে পাশ থেকে এঁটোকাঁটা নির্ভয়ে খেয়ে যায়, কখনও বা সাবানের টুকরো, চামচ, ঠাকুরের খুদে প্রসাদের থালা গেলাস মুখে করে নিয়ে যায়। এ বাড়ি ও বাড়ি ফেলে দিয়ে আসে। বাসন মাজতে বসে সুধার তাই বড় জ্বালাতন। বসে-বসে সে কাকের গুষ্টির উদ্ধার করছিল—কেলেভূত, নোংরাখেকো, গুখেকো গুলোন, মর মর! ভগবানের ছিষ্টি বটে বাবা, যেমন ছিরি তেমনি স্বভাব! রোসো, কাল থেকে এঁটোকাঁটায় ইঁদুর মারা বিষ না মিশিয়ে দিই তো—তা কাকেরা শোনে না। কাটা ঘুড়ির মতো নেমে আসে। সুধার মুখের দিকে চেয়ে 'খা' বলে ডাকে, লাফিয়ে সরে যায়, আবার চেয়ে ডাকে 'খা'।

বাঙালিয়া দুধ দিতে এসেছে। নোংরা ধুতি, গায়ে একটা নতুন সাদা ফতুয়া, কাঁধে নোংরা গামছা। অদ্ভুত দেখায় তাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গোঁফ চুমরাচ্ছিল। দুধের ডেকচি এখনও মাজা হয়নি। ঝামেলা। একবার ডেকে বলছিল—এহ সুধারানী, বর্তন ভৈল? কেতো সময় লাগে তুমার—হাঁ? শুনে সুধা ঝামড়ে উঠেছিল—থামতো তুই খোট্টা খালভরা কোথাকার। আমি মরছি বটে নিজের জ্বালায়। বাঙালিয়া একটু হেসে খৈনির থুক ফেলে বলে—কৌয়া তো খুব দিক করে তুমাকে? একঠো বন্দু মূলাও না।

বড় বউ চায়ের কেটলি আঁচল চেপে নামিয়ে কৌটো খুলে দেখে চা-পাতা নেই। কুমুকে ফের পড়া থেকে তুলে দোকানে পাঠাতে হবে, একটু আগে একবার দোকানে গিয়ে পাঁউরুটি আর ছোট খোকার রসগোল্লা এনে দিয়েছে। মেজাজটা বিগড়ে গেল বড় বউয়ের। জানালা দিয়ে ধমক দিল সে—ও সুধা, কেবল বক বক করলে কি হাত চলে? বাঙালিয়া কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওর তো আর বাড়ির গাহেক আছে না কি?

এই যে বড়বউয়ের মেজাজ বিগড়ালে এর জের সারাদিন চলবে। একে তাকে ওকে সারাদিন বকতেই থাকবে যতক্ষণ না আবার তার বর বিষ্ণুচরণের মেজাজ বিগড়োয়। বিষ্ণুচরণ ধৈর্য হারালে বড়বউ পেটায়। মেজহরিচরণ আবার তেমন নয়। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ বউকে দেখে। উঠানে হয়তো কাপড় মেলে মেজো বউ কলধারে একটু রুমাল গেঞ্জি কাচতে যায়, কি চুল শুকোয় তখন হরিচরণ জানালার পরদার ফাঁক দিয়ে কি কপাটের আড়ালে লুকিয়ে বউকে দেখে। কখনও কখনও আবার কোকিলস্বরে আড়াল থেকে বলে—কু—উ! সেই শুনে আবার বড় বউয়ের বুক জ্বলে! বলে—এমন মাগীমার্কা ব্যাটাছেলে দেখিনি বাপু জন্মে। হরিচরণ আবার সেটা টের পায়, ডেকে বলে—বউদি গো, বউ আমার খাবে দাবে বসে থাকবে, শুধু তুলবে পাড়বে বিছানা।

যতীন এখন বুড়ো হয়েছে। হোমিওপ্যাথির ফোঁটা ফেলতে হাত কেঁপে যায়, এক কৌটার

জায়গায় দু-ফোঁটা তিন ফোঁটা পড়ে গিয়ে ওষুধ নষ্ট। লোকে বলে—যতীন ডাক্তারের হাতের জোর নষ্ট হয়ে গেছে ছোট ছেলেটা মরার পর থেকে; ছোটো ছেলে ব্রহ্মচরণ অবশ্য বাপের সু-পুত্র ছিল না। দা, কুড়ুল দিয়ে বাপ ভাইদের কাটতে উঠত প্রায়ই বাড়ির মধ্যে। মুখে আনতে নেই এমন মুখখারাপ করে গাল দিত! এ হল মেজাজের বাড়ি। সকলেই মেজাজওয়ালা মানুষ। ব্রহ্মচরণ আবার তার মধ্যেই ছিল নুনের ছিটে। সে মরায় এ বাড়ির লোক বেঁচেছে। মরল কীভাবে কে জানে! নিরুদ্দেশ বলে রা উঠেছিল, তারপর একদিন ঝিলে তার শরীর ভেসে উঠল। সারা গায়ে ছোরার গর্ত। কোনও কিনারা হয়নি, কিনারা করার আগ্রহও নেই কারও। কেবল বুড়ো যতীন ডাক্তার আজকাল ঝাপসা দেখে, হাত কাঁপে, রাতে ঘুমোতে পারে না, উঠে-উঠে বাইরে যায়, বিড়ি টানে, কাশে।

অভ্যাস মতো যতীন ডাক্তার তার বাইরের ঘরে ওষুধের বাক্স নিয়ে বসেছে। রুগিপত্র বড় একটা হয় না। দু-চারজন গল্পবাজ বুড়ো এসে বসে আড্ডা দিতে। আর আসে দীন-দরিদ্র সংসার। ডাক্তার সোনাদানা, শাড়ি কাপড় দিয়েছে ঢেলে, কখনও কুকথা বলেনি, আদর করেছে খুব। শরীর উস্কালে রাত জেগে বসে থেকেছে। সাধু অবশ্য এ সংসারেও হানা দিয়েছিল। সে কী চোটপাট, হম্বিতম্বি, পুলিশের ভয় দেখানো! কিছু চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে এসে হামলারও চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার ভয় খেয়ে গিয়েছিল। কমললতা ভয় খায়নি। শুধু একবার দু চোখ মেলে খর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল সাধুর দিকে। তাইতেই সাধুর বুক চুপসে যায়। আসত বটে তার পরেও, তবে ভিক্ষে বা সিধে নিয়ে যেত, আর কিছু চাইত না।

কমললতা ভেবেছিল, এরকমই দিন যাবে। একটা জীবন আর ক'দিনের। মানুষ তো টুকুস করে মরে যায়। কিন্তু দিন যায়নি। ছেলেরা বড় হয়ে বুঝতে শিখে আপত্তি শুরু করে। এরকম সম্পর্ক নিয়ে বাপের থাকা চলবে না। সম্মান থাকে না। ঝঞ্ঝাটের শুরু তখন থেকেই। সেটা চরমে ওঠে বড় ছেলের বিয়ের পর। বড় বউ বিয়ের পর এ বাড়িতে ঢুকেই যেন সাপ দেখল। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বলতে থাকে—আমার বাবা বলেছে, এখানে রাখবে না। এ হচ্ছে নিশ্চরিত্র জায়গা, নরক। স্বামীর ঘর করার সুখের চাইতে বাড়িতে থাকার দুঃখেও সোয়াস্তি আছে। হরিচরণ আর বিষ্ণুচরণও ক্ষেপে গেল হঠাৎ। এক ব্রহ্মচরণ মা বলে ডাকত তাকে, সে বুক দিয়ে ঠেকাত। কিন্তু হাউড়ে ছেলে, বাইরে দাঙ্গাবাজি করে বেড়ায়, ঘরে থাকে কতক্ষণ? ডাক্তারও বুড়োবয়সে ছেলেদের সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তবু ব্রহ্মচরণ বেঁচে থাকা অব্দি ছিল কমললতা। তারপর বেরিয়ে যেতে হল। ইটখোলার দিকে আবার ঘর নিয়েছে সে। বুড়োবয়সে সে এখন পাঁচবাড়ি ঠিকে ঝি-র কাজ করে খায়। একটি ছোট্ট বোনপোকে এনে রেখেছে, সেই দেখাশোনা করে।

মায়া তো যায় না। রোজ তাই বাইরে থেকে একবার কি দুবার খোঁজ নিয়ে যায় সে ডাক্তারের।

সারাদিন ওইটুকুই অপেক্ষায় থাকে ডাক্তার। এই একা ফাঁকা বিশ্ব-সংসারে ওই কমললতা ছাড়া আর কেউ বন্ধু নেই।

মাছিটা উড়ে-উড়ে এসে বৃতে বসছে। সুড়সুড়ি পায়ে নাক বেয়ে নেমে আসে। উড়িয়ে দেয় ডাক্তার। আবার টক্ করে এসে নাকের ডগায় বসে। নড়ে চড়ে হাঁটে। সকাল বেলাটা কেমন আঁধার-আঁধার মতো লাগে। নিঃশব্দ ঘরে শ্বাস পড়ে শ্বাস ওঠে। ভগবান।

হরিচরণ মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ করে। সকালে যেতে হয়। দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টায় মেজবউ নারায়ণী কখনও কাছে যদি থাকে ঠিক পালিয়ে বেড়াবে। নিজেকে দুর্লভ করার ওই হচ্ছে তার কলাকৌশল। পুরুষমানুষকে জ্বালাতন করে না খেলে আর মেয়েছেলের কাছা হয় না? দুবার তিনবার 'ক-উ ক-উ' ডাক ডাকল সে। এই ডাকে দুটো কাজ হয়। বউকে জানান দেওয়া হয়, আবার বড় বউকে জ্বালানোও হয়। ডালভাতে আর কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ফ্যানসা ভাত খেতে টকচা টেঁকুর তুলে হরিচরণ বিরক্ত হয়ে বসে থাকে। মুখখানা না দেখে বেরোই কী করে। দিনটাই খারাপ হয়ে যাবে। কুমু আর রাখু দাদার দুই ছেলেমেয়ে হল্লা চিল্লা করছে পাশের ঘরে। বিরক্তি। মেজাজ খারাপ থাকলে শব্দ সহ্য হয় না। 'অ্যা-ই' বলে একটা ধমক দিল এখর থেকে—লেখাপড়া ফেলে হচ্ছেটা কী? শব্দটা বন্ধ হলে আবার 'কু-উ' ডাক ছাড়ে সে।

বড় বউ বোধহয় শুনতে পায়। খেঁকিয়ে ওঠে সুধাকে—তোমার আক্কেল দেখে মরে যাই। ইস্টিলের বাসন কেউ ছাই দিয়ে মাজে? দ্যাখো তো দাগ ধরে গেল কেমন?

হরিচরণ একটু হাসে। বড় বউয়ের মেজাজ ভালো নেই। ডালশুখোটা আজ মেখেছিল নারায়ণী! একটু হিঙের গুঁড়ো দিয়ে তেলে উলটেপালটে বাসি-ডালটার দিব্যি তার করেছিল। বড়বউ খাওয়ার সময়ে জিগ্যেস করল—কেমন ডালশুখো খাচ্ছ গো, মেজদা?

—বেশ।

—তার আর কথা কী। কথাতেই বলে—বউ রেঁধেছে মুলো, খেলে লাগে তুলো-তুলো।

আসলে নারায়ণী নিজের হাতে বরের ডালশুখো করেছে বলে রাগ। হিন্দমোটরের মেকানিক বিষ্ণুচরণ যখন সাঁঝের ঘোরে এসে আজ পেঁটাবে তখন কেঁদে-কেটে রাগ পড়বে।

কিন্তু বউটা যে কোথায় গেল?

মেজবউ শাকের খেতে সাপ দেখেছিল। শুষনি শাক অযত্নে হয়ে আছে। এ সময়টায় জিভের স্বাদের কোনও ঠিক থাকে না। ফোটা ভাতের গন্ধে বমি আসে, আবার চামড়া পোড়া গন্ধ পেলে বুক ভরে দম নিতে ইচ্ছে করে। এই শীত আসি-আসি শরৎকালটা বড্ড ভালো। আকাশ কেমন নীলাম্বরী হয়ে আছে। গাছপালার রং ধোয়ামোছা ঝকঝকে! রোদ এখন ওম লাগে।

শীত-রোদে নিশ্চিন্তে দক্ষিণের বাগানে শুষনি শাক তুলছিল মেজবউ, লোকটা এখন বেরোবে। ফুঁসছে। তবু এখন কাছে যাবে না সে। অত বউমুখো মেনিমুখো কেন যে লোকটা। বড্ড লজ্জা করে নারায়ণীর। বিয়ের পর যেমন তেমন ছিল, কিন্তু পেটে বাচ্চা আসার পর এখন চক্ষুলজ্জা বলে বস্তু নেই। দিনরাত পারলে হামলায়।

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘাসজমি, আগাছার মধ্যে শুষনির পাতা ডাঁটা টুকুস-টুকুস করে ছিঁড়ছিল। মাঝে-মাঝে চোখ তুলে দেখছিল চারিধারে। অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশ যেন নীল! গাছ যেমন সবুজ। দুটো চারটে ঘুড়ি উড়ছে আকাশে ওই উঁচুতে চিল। ছাতারে উড়ে যায় একটা। কালচে একটা কুবো পাখি কালকাসুন্দের ডালে হাঁটছে। 'বুক বুক বুক বুক' করে একটা মন খারাপ-করা ডাক ডাকছিল একটু আগেই।

একটা টসটসে ডগা ছিঁড়তে হাত বাড়িয়েই মেজবউ ঘাসের মধ্যে চকরাবকরা দেখতে পায়। প্রথমটায় যেন গা নড়ে না, পা চলে না। সারা গায়ে শিরশিরানি। রোঁয়া দাঁড়িয়ে আছে। লকলকে শরীরটা এঁকেবেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! লম্বা ঘাসে হারিয়ে আবার জেগে উঠছে।

সাপ! সাপ! বলে চেঁচিয়ে বাগানের ফটক পেরে হয়ে গিয়ে আঁচল আটকে পড়ে গেল মেজবউ। পড়ে কিছু টের পায় না। কোনও ব্যথা না, জ্বালা না। কেবল বুকটা হাহাকারে ভরে দিয়ে যায় এক আতঙ্ক। ছ'মাসের বাচ্চা যে পেটে! কী হবে ভগবান!

কেঁদে ওঠে মেজবউ।

বড় বউ স্তম্ভিত হয়ে যায়। নড়ে না। দাঁড়িয়ে আবার থরথর করে বসে পড়তে থাকে ভীতু, বউ-সর্বস্ব হরিচরণ। কলতলায় একটা বাসন আছড়ে ছুটে আসে সুধা। আর আসে কমু রাখু!

বাঙালিয়া দুধ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। বালতিটা রেখে এসে প্রথম ধরে নারায়ণীকে। বলে ক্যা হুয়া? সাপ কাটা হ্যায় কিয়া!

বাঙালিয়ার বেশি বুদ্ধি নেই। সে মেজবউকে ছুঁয়েই বুঝতে পারে, রূপের আগুনে তার হাত পুড়ে গেল বুঝি। কী ফরসা, কী নরম, কী সুন্দর! এরকমই হয় বটে বাবুদের বাড়ির মেয়েরা। নাকি বাঙালি বলেই নরম। নরম শনিচারী কিছু কম নয়। কিন্তু এ তো তুলো। তার ওপর নাক-মুখ-চোখ আর ফরসা রঙের কী বাহার।

মেজবউ তার হাত ছাড়িয়ে নিল। বোকার মতো দাঁড়িয়েই থাকে তবু বাঙালিয়া। খাসজমিতে যেন পুজোর ফুল কে একরাশ ঢেলে দিয়ে গেছে। বউটিকে কতবার দেখেছে সে। ছোঁয়নি। ছোঁয়ার পর সে যেন সব আলাদারকম দেখে। হাতটা মেখে আছে নরম স্পর্শে।

হরিচরণ আসে। বড়বউ এসে ধরে তোলে নারায়ণীকে। সুধা এসে মাজাটা ওর মধ্যেই একটু ডলে দেয়, বলে—ভালো করো, ভালো করো, ভালো করো ভগবান।

আশপাশের বাড়ি থেকে দু-চারজন এসে জুটে যায়।

সাপের দাঁতের দাগ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার রাস্তার দিকে চেয়েছিল অপলক। মাছিটা বড় জ্বালাচ্ছে। চোখকোটা কেন আঁধার-আঁধার লাগছে আজ? ডাক্তার একটা চিৎকার শুনতে পায়, 'সাপ-সাপ'! চেয়ারে শরীরটা বাঁ-ধার থেকে ডান ধারে মুচড়ে বসে ডাক্তার। পা দুটো তুলে হাঁটু জড়ো করে বুকের কাছে। বাতাসে একটু শীতভাব। সময়টা ভালো না। কে চেঁচায় 'ডাক্তার ডাক্তার' বলে? না, ডাক্তার বলে নয়, 'সাপ সাপ' বলে। মেয়েছেলের গলা। কমল নয় তো।

মাথাটা ভালো লাগে না ডাক্তারের।

পেছনে জোর করে শব্দ উঠে যেন। ডাক্তার ভয় খায় নবৃত্তি রাখুকে। মিষ্টি ওষুধের লোভে প্রায়ই এসে চুরি করে শিশিকে শিশি ফাঁক করে দেয়। অ্যাকেসিসের বদলার চিৎকার একবার শিশিসুদ্ধ খেয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার পিছু ফিরে দেখে। বেড়ালটা হল-হল করে শব্দ করে। বেড়ালটা সবজে চোখ মেলে তার দিকে চায়। ক্ষীণ একটা শব্দ করে। কমল এদের পালত পুষত। দুটো কমলের সঙ্গে গেছে, আর দুটো রয়ে গেছে। কেউ পারে না, পোষে না, আদর করে না। এরা এমনি থাকে।

বাবা। একটা বুকফাটা চিৎকার করে কে ঘরে ঢোকে।

ডাক্তার চমকে ওঠে। মাথার মধ্যে একটা আলো যেন ঝলসে উঠেই নিভে যায়। মাছিটা ঠিক বসে আছে ভুরু মাঝখানে নড়ছে হাঁটছে।

—বাবা, শিগগির আসুন।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরায়—কে?

—আমি হরি।

—ও! চেঁচিও না।

—চেঁচাব না কী। আপনার বউমার কী হয়েছে দেখে যান।

—তোমরা দ্যাখো গে।

হরিচরণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর এই চরিত্রহীন অপদার্থ নাম ডোবানো বুড়োটার প্রতি তীব্র হিংস্র একটা আক্রোশ বোধ করে সে। দু-হাতে যতীনের কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় সে।

—কী বলছো?

—ওঃ! যতীন নাড়া খেয়ে ভারী ভয় পেয়ে যায়। মাথার মধ্যে লাল আলো নিভে একটা সাদা আলো জ্বলে। আবার সাদাটাও নিভে যায়!

—শিগগির আসুন।

—কোথায়?

—আপনার বউমাকে সাপে কামড়েছে।

ভিতরে একটা হলুস্থুলের শব্দ হচ্ছে! সেই শব্দ থেকেই বড় বউ গলা তুলে বলে—সাপে কামড়াল কোথায়! কামড়ায়নি! পড়ে গেছে বাপু।

হরিচরণ বাবাকে একটা খোঁচা দেয়—পড়ে গেছে। বাচ্চাটা নষ্ট হতে পারে। আসুন।

—পড়ে গেছে। যতীন বড়-বড় চোখ করে চারিদিকে চায়। শালার মাছিটা! ঠিক বসে আছে এখন নাকের ডগায়। ছাড়ছে না। যতীন বলে—কী করব!

—একটু দেখুন।

—ডাক্তার ডাক।

—ডাকতে পাঠিয়েছি। সে তো দু-মাইল দূর থেকে, আসতে যেতে তিন ঘণ্টা। তার মধ্যে কিছু যদি হয়ে যায়?

ডাক্তার ভাবে ওষুধের নাম কিছুই মনেই পড়ে না। অনেক ভেবে বলে—থুজা টু হানড্রেড।

—কী বলছেন?

—উঁহ। ডানদিকে ব্যথা তো? লাইকোপোডিয়াম দেওয়াই ঠিক হবে।

—ডানদিকে না কোনদিকে কে জানে। আপনি আসুন।

ছেলের দিকে ভীত চোখে চেয়ে থাকে ডাক্তার। বলে—আমি কিছু জানি না বাপু, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

তার হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে হরিচরণ বলে—তা বলে একবার চোখে এসে দেখবেন না। আপনারই তো ছেলের বউ।

বিড়বিড় করে ডাক্তার বলে—ছেলে না ইয়ে। তোমরা আমার কেউ না। বলতে-বলতেও ভাগ্যের সঙ্গে-সঙ্গে যায়। হ্যাঁচকা টানে বুকের বাঁ-দিকে একটা খিঁচ ব্যথা ওঠে। মাথাটা দুটো টাল খায়। আলোটা দপ করে জ্বলে ফুস করে নিভে যায়।

ভিতরের ঘরে লোকজন জুটেছে মন্দ নয়। মেজবউ শুয়ে আছে খাটে। কোঁকাচ্ছে। শ্বাসকষ্টের কোঁকানি, চোখের তারা স্থির। মুখে গাঁজলার মতো কষ গড়াচ্ছে।

বিড়বিড় করে যতীন ডাক্তার বলে—নাক্স ভমিকা টু হানড্রেড! শিগগির।

হরিচরণ ছুটে যাচ্ছিল ডিসপেনসারিতে ওষুধ আনতে।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে—না। ভুল।

—তবে?

—সালফার থার্টি।

—কী সব বলছেন?

—ভুলে যাই যে বাবা।

হরিচরণ কী করবে ভেবে পায় না। হাঁ করে চেয়ে থাকে অপদার্থ বাপের দিকে। যতীন ডাক্তার বিড়বিড় করে বলে—পুত্র আর মূত্র একই পথ দিয়ে আসে। বুঝলে? পুত্র যদি পুত্রের কাজ না করে সে তো মূত্র। না কী?

কথাটা অবশ্য হরিচরণের কানে যায় না। কিন্তু সে লক্ষ করে এই দুঃসময়েও তার বাবা বিড়বিড় করে বকছে। এরকম কখনও করত না তো বুড়ো। পেগলে গেল নাকি।

কাজলিয়া বাঁ-হাতে খৈনির গুঁড়োর ওপর ডান হাতে একটা আনন্দিত চাপড় মারে। কনুইয়ের ভাঁজ থেকে দুধের খালি বালতি ঝুলছে, মনে অনেক আশ্চর্য আলো এসে পড়েছে আজ। ভারী অন্যমনস্ক সে। একটা দেশওয়ালি গান গুনগুন করে গায় সে। হাতে একটা নরম স্পর্শ লেগে আছে এখনও।

কমললতার সঙ্গে দেখা।

—জানো যে কমলদিদি।

—ও বাড়িতে কী হয়েছে রে বাঙালু?

—সাপু কাটা নেহি। গিরে পড়ল।

—কে?

—বহুজী। যান না, দেখিয়ে আসন।

বিপদে বারণ নেই। কমললতা তাই এদিক-ওদিক একটু দেখে নেয়। ভয় করে। পঁচিশ বছর কাটিয়েও ভয়। তবু সে ঢুকে পড়ে।

—কী হয়েছে?

বলে সে সোজা ঘরে ঢুকে যায়। কেউ কিছু বলে না, বারণ করে না। সাহস পেয়ে কমললতা বিছানার কাছে উপুড় হয়ে দেখে নারায়ণীকে। মুখটা তুলে বলে—বড়বউমা একটু গরম জল করো, আর মালসায় একটু আগুন। এ কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।

কেউ কিছু বুদ্ধি খুঁজে পাচ্ছিল না। কমললতার কথায় যেন বিশ্বাস খুঁজে পায় সবাই। বড় বউ ধেয়ে যায় রান্নাঘরে। চোখের জল মুছে, উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে জল চাপায়।

কমললতা সাহস পেয়ে মেজবউয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে হাওয়া করে। বহুকাল বাদে নিজের হারানো জায়গাটা যেন পেয়ে গেছে কমললতা। হরিচরণকে ডেকে বলে—তোর বাপের ঘর থেকে অ্যালকোহল দশ ফোঁটা একটু গরম দুধে দিয়ে নিয়ে আয়।

হরিচরণ কমললতার দিকে এক পলক চায়। চোখে কী ফোটে না জানে। তারপর বাপের ঘরের দিকে চায়।

যতীন ডাক্তার খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল। মেজবউয়ের দিকে নয়। মেজবউ বা পৃথিবী আর কিছুর কোনও অস্তিত্বই তো নেই। সে চেয়েছিল কমললতার দিকে। কাম কবে মরে গেছে, যৌবনের প্রেম বলতে কিছু নেই এখন। কিন্তু বুক জুড়ে আছে সহবাস। সে বিড়বিড় করে ডাকে—কমল, কমল, কমল বড় একা ফাঁকা জগৎ। থাকো। এখানেই কেন থাকো না। থাকো।

কমললতা যতীনের দিকে চায়। বুড়োটার চোখ ঘোলাটে লাগে যে? বিড়বিড় করে কী বকছে। আহা, ওরা কি আর যত্ন করে?

সন্ধের দিকেই ঠিক হয়ে যায় মেজবউ। ডাক্তার দেখে গেছে। বলছে, গাইনির ডাক্তার দেখাতে। তবে ভয় নেই। বিকেলের দিকে মেজবউ ওঠা-হাঁটাও করল খানিক। চুল বাঁধল। হাসল। হরিচরণ গেছে কলকাতা থেকে বউয়ের জন্য বলকারী ওষুধ আনতে।

সারাদিন কমললতা আজ এ বাড়িতে রয়ে গেল। মেজবউয়ের কাছেই রইল বেশিক্ষণ। যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতেই আগাগোড়া বসে আছে আজ। ভাত খেতে বসে অর্ধেক খেয়ে উঠে গেল দুপুরে। শরীরটা খারাপ নাকি। কমললতার বুকের মধ্যে কেমন করে। তিন-চারদিন আগে খবর এসেছে, সাধু মানুষটা মরেছে কুলটির হাসপাতালে। একটু কেঁদেছিল কমল। কামটা মেয়েদের রোগ, নইলে সে মানুষের জন্য কান্নাই কী, দুঃখই কী। কমললতা ভালোবাসা যা পেয়েছে তা এই যতীন ডাক্তারের কাছে। কাছে যাবে সে উপায় নেই। কে কী বলে। বাড়ি থেকে বেরই করে দিল হয়তো। এ বাড়ির বাতাসে শ্বাস না নিলে বুক মরুভূমি হয়ে থাকে। সাধুটা মরে গেল। ডাক্তারও কেমন যেন করছে। তাই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না আজ। মেজবউয়ের সেবার নাম করে সারাটা দিন থেকেছে। বড়বউ ডেকে দুমুঠো খাইয়েছে দুপুরে। সে কথা ভাবতেই মনটা ভালো লাগে।

সন্ধের পর একটু ফাঁক পেয়েই কমললতা বুড়োমানুষটার ঘরে আসে। ডিসপেন্সারি থেকে উঠে এসে কখন বিছানায় শুয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় কমললতার মুখের দিকে চাইল। বলল—মাছিটা কেবল বসছে।

—কোথায় মাছি?

—কপালে। সকাল থেকে উড়ে-উড়ে বসছে।

কমললতা কপালটা দেখে। বলে—নেই তো।

—আছে।

কমললতা যতীন ডাক্তারের মুখখানা দেখে ভালো করে। চোখ ঘোলা আর লালচে। শ্বাস গরম। কপালে হাত চেপে ধরলে বোঝা যায়, শিরার মধ্যে রক্ত লাফাচ্ছে। কমল বলে—আমি কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

—তুমি থাকো।

—থাকার জো কী? বিষ্ণুচরণ এলেই তাড়াবে।

—না। তুমি থাকো।

—আচ্ছা, শরীরটা কি খারাপ?

—না। বড় একা লাগে।

—একা কেন? সবাই রয়েছে।

—কেউ নেই।

কমললতার চোখে জল আসে। গাল বেয়ে নামে। নাকে সর্দি টানার শব্দ হয়। একটা গাঢ় শ্বাস ফেলে সে। সংসার বড় মায়াহীন।

ডাক্তার দেখে কমললতা চাঁদকে লণ্ঠনের মতো ধরে আলো দেখাচ্ছে। ডাক্তার ওঠে। বলে—দাঁড়াও, ওষুধ বানাচ্ছি।

—বানাও।

এ ওষুধে দুজনের সব সেরে যাবে, বুঝলে কমল?

—জানি। তুমি ধন্বন্তরী।

ডাক্তার জ্যোৎস্নার লণ্ঠনে কমললতার সঙ্গে পথ চিনে বাগানে যায়। ফুল তুলে আনে। চুপিচুপি ডিসপেন্সারিতে ঢোকে দুজন। ডাক্তার একটা ঝিনুকে ফুল টিপে মধু ফেলে ক'ফোঁটা। একটু জ্যোৎস্না মেশায়। একটু চোখের জল তার সঙ্গে। আর দু-ফোঁটা অ্যাকসিস।

—অমৃত। ঝিনুকটা তুলে ডাক্তার বলে।

—জানি।

—দুজনে খাই, এসো।

স্বপ্নটা ভেঙে যায়। ডাক্তার জাগে। কেউ কোথাও নেই। মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা সব বোধ গুলিয়ে দেয়।

যতীন ওঠে। তারপর শূন্য ডিসপেন্সারিতে গিয়ে ঢোকে। অন্ধকার। খোলা জানালা দিয়ে দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ঘর।

আধছায়ায় যতীন ডাক্তার উলটোদিকের চেয়ারটায় গিয়ে বসে। তারপর নিজের বসা শূন্য চেয়ারটার দিকে চেয়ে বলে—ডাক্তারবাবু, আমার বড় অসুখ। বড় অসুখ।

হরিচরণ তখন বউকে জড়িয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে হাতে পায়ে বেঁধে রেখেছে। নারায়ণী ঘুমের মধ্যে ঠেলা দিয়ে বলে—আঃ, দম আটকে মারবে নাকি বাপু?

হরিচরণ ঘুমচোখে বলে—তুমি যা দুষ্টু হয়েছ।

—উঃ সরো বাপু। গরম লাগছে।

হরিচরণ বলে—তোমার জন্যে সবসময়ে ভয়ে-ভয়ে থাকি।

নারায়ণী পাশ ফিরে বলে—ইঃ।

তখন হামলে তাকে আদর করতে থাকে হরিচরণ। বাধা মানে না।

বিষ্ণুচরণ বউয়ের গা-ঘেঁষা ভাব পছন্দ করে না। লাইনের ওপারে তার আবার মেয়েছেলে রাখা আছে। এক কাতে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে বউ বলল—কমল কিন্তু অনেক সেবা-টেবা করেছে।

—করুকগে। আর ঢুকতে দিও না।

মায়া পড়ে গেছে তোমাদের ওপর।

—হুঁ। শেষমেষ বাড়ির অংশ চাইবে। তা ছাড়া কলঙ্ক। আপদ যখন বিদেয় হয়েছে, আর না।

—কোলেপিঠে করেছে তোমাদের।

—খুব দরদ যে!

—বলছিলাম মাঝে মধ্যে আসে যদি আসুক।

—উঁহু। ফের যদি ঢুকতে দাও তো তোমার কপালে কষ্ট আছে।

—কিন্তু ওকে ছাড়া বুড়োমানুষটা যে থাকতে পারে না।

বিষ্ণুচরণ ঝাঁকি মেরে ওঠে—পারে না। অ্যাঁঃ। এই বুড়ো বয়সেও রস আছে নাকি? ভয় খেয়ে বড়বউ চুপ করে যায়।

ডিসপেন্সারি থেকে উঠে নিজের ঘরে আসে যতীন। আবার ডিসপেন্সারিতে যায়। তারপর বেভুল হয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে থাকে হারানো শিশুর মতো। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে একটু কাঁদে। মাছিটা উড়ে-উড়ে বসছে ভ্রূতে, নাকে, কপালে সুড়সুড়ি পায়ে হাঁটছে, যতীন ডাক্তার চারধারে পৃথিবীর রহস্যটা গুলিয়ে ফেলতে থাকে। চাঁদের আলো, গাছপালা, ঘরদোর—সবকিছুই অবোধ চোখে দেখে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে—কমললতা মা, মা গো, কমলমা, মাছিটা তাড়িয়ে দাও...মাছিটা তাড়িয়ে দাও...মা...

ফুল চোর

হারমোনিয়াম সম্পর্কে আমি কতটুকুই বা জানি! তবু এদের বাড়ির পুরনো হারমোনিয়ামটা দেখেই আমার মনে হচ্ছিল, শুধু রিড নয়, এর গায়ের কাঠের কাঠামোটাও নড়বড়ে হয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলার বয়স খুব বেশি হবে না। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রোগা, ফরসা। এবং মুখের হাড় প্রকট হওয়ায় একটু খিটখিটে চেহারার। বললেন, রিডগুলো জার্মান।

পাশের ঘরে একটা বাচ্চা মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পশুপতি আমাকে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিল। সম্ভবত কোনও ইশারা। কিন্তু কীসের ইশারা তা আমি ধরতে পারলাম না। এই হারমোনিয়াম কেনার ব্যাপারে সে-ই অবশ্য দালালি করছে।

আমি মাদুরের ওপর রাখা হারমোনিয়ামটার সামনেই বসে আছি। আমার সামনে চায়ের কাপ, ডিশে দুটো থিন এরারুট বিস্কুট। আমি ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললাম, ও।

কিন্তু আসলে আমি তখন হারমোনিয়ামের রিডের চেয়ে থিন এরারুট বিস্কুট সম্পর্কেই বেশি ভাবছি। হঠাৎ আমার খেয়াল হয়েছে, এরারুট দিয়ে সম্ভবত এই বিস্কুট তৈরি হয় না। যতদূর মনে পড়ে, ছেলেবেলা থেকেই থিন এরারুট বিস্কুট কথাটা শুনে আসছি। অথচ কোনও দিনই থিন কথাটা বা এরারুট ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি। আজ পুরনো হারমোনিয়াম কিনতে এসে ভাবতে লাগলাম।

যথেষ্টই আপ্যায়ন করছেন এরা। কেউ পুরনো হারমোনিয়াম কিনতে এলে তাকে হাতপাখার বাতাস বা চা বিস্কুট দেওয়ার নিয়ম আছে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু চা বিস্কুট দেওয়াতে আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি কনে দেখতে এসেছি! এক্ষুনি ও-ঘর থেকে পরদা সরিয়ে কনে ঢুকবে। নিয়মমাফিক নমস্কার করবে এবং হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতি গাইবে।

ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামটার ওধারে বসে আছেন। মুখ চোখ যথেষ্ট ধূর্ত এবং সচেতন। হাতের পাখাটা জোরে নাড়তে নাড়তে একটু ঝুঁকে বললেন, চা ঠান্ডা হচ্ছে যে!

ঠান্ডা হওয়াটাই দরকার ছিল। এবার বড় প্যাঁচপ্যাচে গরম পড়েছে। ঘরে ইলেকট্রিক পাখা নেই। হাতপাখায় তেমন জুতও হচ্ছে না। এর মধ্যে গরম চা পেটে গেলে আরও অস্বস্তি।

ভদ্রতাবশে আমি চায়ে চুমুক দিলাম। এবং সেই সময়ে বেটাইমে পশুপতি আমাকে কনুই দিয়ে আর একটা ঠেলা দিল। খুব সাবধানেই দিল। চা চলকায়নি। কিন্তু আমি দ্বিতীয়বারও ইঙ্গিতটা ধরতে না পেরে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। পাশের ঘরে কাঁদুনে মেয়েটাকে কে এক জন ফিসফিস করে মন-ভোলানো কথা বলছে। গলাটা পুরুষের বলেই মনে হচ্ছিল। অথচ ভদ্রমহিলা বলেছেন, তাঁর স্বামী বাড়ি নেই। অবশ্য পাকা ঘর হলে পাশের ঘরের কথা এ-ঘর থেকে শুনতে পাওয়া যায় না। মাঝখানের দরজাটা শক্ত করে আঁটা রয়েছে। কিন্তু বাঁশের বেড়ার ঘরে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই মুশকিল।

পাশের ঘরে মেয়েটা বলছে, ছাই দেবে তুমি। কত কিছু তো কিনে দেবে বলো। দাও?

ফিসফিস স্বরে বলে, আস্তে। শুনতে পেলে কী মনে করবে। ডবল রিডের ভাল হারমোনিয়াম দেখে এসেছি। কী আওয়াজ!

চাই না। পুরনোই আমার ভাল।

এটা তো পচা জিনিস ছিল, তাই বেচে দিচ্ছি।

সব জানি। মিথ্যে কথা।

আমাকে কানখাড়া করে শুনতে দেখেই বোধ হয় ভদ্রমহিলা সতর্ক হলেন। খুব জোর দু' ঝাপটা হাওয়া মেরে আমার কান থেকে কথাগুলো তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে-করতে বললেন, কত লোক আসে। দেখেই বলে, এমন জিনিস আজকাল পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না। বেচে দেওয়ার ইচ্ছেও ছিল না, কিন্তু আমার বড় মেয়ে এখন সংগীত প্রভাকর পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে তো, তাই স্কেল চেঞ্জার না হলে ভারী অসুবিধে।

আমি বললাম, ঠিক কথাই তো।

হারমোনিয়ামের একটা রিডের তলায় একটা দেশলাইয়ের কাঠি গোঁজা দেখে আমি কৌতূহলবশে এবং সম্ভবত কান চুলকোনোর জন্যই আনমনে দু' আঙুলে সেটা টেনে আনলাম। সঙ্গে সঙ্গে রিডটা নড়া দাঁতের মতো ডেবে গেল। অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ রকমই হওয়ার কথা।

রিডটার নেমকহারামি লক্ষ করেই কিনা কে জানে, ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বললেন, চা-টা কিন্তু সত্যিই জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি চা খেতে থাকি। কিন্তু কেবলই মন বলছে, কনে কোথায়? কনে কোথায়?

আমাকে দোষ দেওয়া যায় না। গ্রীষ্মের শেষ বেলার আলোটা বেশ মোলায়েম লালচে হয়ে পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। ভারী কিম্ভূত আলো!. সামনে হারমোনিয়াম। পরিবেশটা একদম হুবহু কনে দেখার। পরদা সরিয়ে কনে ঘরে এলেই হয়।

এল না। পশুপতি এবার হাঁটু দিয়ে আমার হাঁটুতে চাপ দিল। আমি ধীরে সুস্থে চা শেষ করি।

বিস্কুটটা খেলেন না যে!— ভদ্রমহিলা খুবই আকুল হয়ে বললেন।

ডিশে চা পড়ে বিস্কুটটা ভিজে নেতিয়ে গেছে। ওই ক্যাতক্যাতে বিস্কুট খেতে আমার ভারী ঘেন্না হয়। কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না। তাই আমি বললাম, চায়ের সঙ্গে কিছু খাই না!

পশুপতি এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিল! এবার হঠাৎ বলে উঠল, বউদি, আপনার গানের গলা কিন্তু দারুণ ছিল।

আর গলা! — বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা।

আমি যে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড হারমোনিয়াম কিনতে এসেছি সেটা ভুলে গিয়ে কখন যে খোলা দরজার সরে যাওয়া পরদার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেছি তা খেয়ালই ছিল না। অদ্ভুত লালচে গাঢ় আলোয় সামনের বাগানটা মাখামাখি। এইমাত্র কয়েকটা বেলকুঁড়ি বুঝি ফুল হয়ে ফুটল। একটা দমকা বাতাসে চেনা দুরন্ত গন্ধটা এসে মাতাল করে দিয়ে গেল ঘর। আমরা নিচু ভিটের মেঝেয় মাদুরে বসা। ঘরের একধারে একটা সরু বেঞ্চির মতো চৌকিতে রং-ওঠা নীল বেডকভারে ঢাকা বিছানা। একটা সস্তা কাঠের আলমারি। একটা পড়ার টেবিল আর লোহার চেয়ার। বেড়ার বাঁখারির ফাঁকে ফাঁকে চিরুনি, কাঠের তাক, নতুন কাপড় থেকে তুলে নেওয়া ছবিওলা লেবেল, সিগারেটের প্যাকেট কেটে তৈরি করা মালা, কাজললতা এবং আরও বহু কিছু গোঁজা রয়েছে। ঘরের কোণে একটা কাঠের মই রয়েছে যা বেয়ে পাটাতনে ওঠা যায়। এ সব তেমন দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। তবু ওই বেলফুলের গন্ধ, এক চিলতে বাগান আর লালে লাল আলো পুরো 'হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়' ভাব। মন বার বার বিয়ে-পাগলা বরের মতো জিজ্ঞেস করছে, কনে কোথায়? কনে কোথায়?

আমার অন্যমনস্কতার ফাঁকে পশুপতি আর ভদ্রমহিলার মধ্যে বেশ কিছু কথা চালাচালি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। না হলে হঠাৎ কেনই বা ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে প্যাঁ প্যাঁ করে বাজাতে থাকবেন, আর কেনই বা মিনিট পাঁচেক খামোকা হারমোনিয়ামে নানা গৎ খেলিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলবেন, এই করেছ ভাল নিঠুর হে...

গান শেষ হলে কিছু বলতে হয় বলে বললাম, বেশ।

ভদ্রমহিলা ঝুঁকে বললেন, ভাল না আওয়াজটা?

আমার দুটো আওয়াজই বেশ স্পষ্ট ও জোরালো লেগেছিল। তাই বললাম, ভালই তো। এখনও আপনার গলা বেশ রেওয়াজি।

সময় কোথায় পাই বলুন! সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, সেই থেকে সংসার আর সংসার। এখন মেয়েদের শেখানোর জন্য যা একটু বসি টসি মাঝে-মাঝে। আমার উনি একদম গান বাজনা ভালবাসতেন না। ঘরের লোক মুখ ফিরিয়ে থাকলে কি চর্চা রাখা যায় বলুন!

ঠিকই তো।

পশুপতি খুব হাসছিল। হাসি ওর রোগ বিশেষ। তবে হঠাৎ হাসিটা সামলে বলে উঠতে পারল, তা হলে এবার কাজের কথা হোক।

ভদ্রমহিলা ভীষণ গম্ভীর হয়ে মুখ নামিয়ে পাখার উঁচু-নিচু শিরগুলোয় আঙুল বোলাতে-বোলাতে বললেন, আপনারাই বলুন। জার্মান রিড, পুরনো সাবেকি জিনিস। দেখতে তেমন কিছু নয় বটে, কিন্তু এখনও কী রকম সুরেলা আওয়াজ, শুনলেন তো!

এবার সেই বিপজ্জনক দরাদরির ব্যাপারটা এগিয়ে আসছে। আমি তাই প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। ফুলের গন্ধ ও কনে দেখা আলোর স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মৃদু মৃদু হাসতে থাকি। তবু দুনিয়ার যত ছিদ্র আমার চোখে পড়বেই। ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামের বেলোটা চেপে বন্ধ করেননি। ফলে আমি স্পষ্ট দেখলাম বেলোর ভিতরে দু' জায়গায় ব্ল্যাক টেপের পট্টি সাঁটা রয়েছে।

দরাদরির সময় পশুপতি কোন পক্ষ নেবে তা বলা মুশকিল। হারমোনিয়ামটা কিনতে সেই আমাকে রাজি করিয়েছে। বলেছে, জিনিসটা ভাল, পরে বেশি দামে বেচে দেওয়া যাবে। আমার টাকা থাকলে আমিই কিনতুম। আর আপনি যদি কেনেন তবে আমি পরে দশ-বিশ টাকা বেশি দিয়ে আপনার কাছ থেকেই নিয়ে নেব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পশুপতি বিক্রেতাদের কাছ থেকেই কমিশন পায়, ক্রেতাদের কাছ থেকে বড় একটা নয়। সুতরাং ভদ্রমহিলার পক্ষ নেওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকই যদি হারমোনিয়ামটা বাগানোই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে দর কমানোতেই তার স্বার্থ। কিন্তু পশুপতিকে ঠিক মতো আঁচ করা খুবই শক্ত।

ভদ্রমহিলা নতমুখ ফের তুলে আমার দিকে পাগলকরা এক দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আর একটা গান শুনব।

কথাটা মাথায় আসতে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। দরাদরি জিনিসটা আমি একদম পছন্দ করি না।

গানের কথায় ভদ্রমহিলা একটু খুশিই হলেন কি! মুখটা যেন জ্যোৎস্নায় ভিজে গেল। বললেন, আমার গান আর কী শুনবেন! আমার বড় মেয়ে বাড়িতে থাকলে তার গান শুনিয়ে দিতাম। দারুণ গায়।

আমি নির্লজ্জের মতো জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বড় মেয়ে কোথায়?

রবিবারে ওর গানের ক্লাস থাকে।

পাশের ঘরে কান্না থেমেছে। তবে একটা কচি মেয়ের গলা আর একটা ধেড়ে পুরুষের গলা খুব জোর ফিসফিসিয়ে গল্প করছে। আমার মনে হল, আজ রবিবারে ভদ্রমহিলার স্বামী বোধ হয় বাড়িতেই আছেন। তবে সম্ভবত উনি আমার সেজোকাকার মতোই মেনিমুখো এবং স্ত্রীর অধীন। বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজওয়ালা, শিশিবোতলওয়ালা, ছুরি কাঁচি শানওয়ালা, শিলোকোটাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা বা শালওয়ালা এলে কাকিমা কক্ষনও কাকাকে তাদের সামনে বেরোতে দেন না। কারণ ভালমানুষ কাকা সকলের সব কথাই বিশ্বাস করে বসেন, দর তুলতে বা

নামাতে পারেন না এবং ঝগড়া-টগড়া লাগলে ভীষণভাবে ল্যাজেগোবরে হয়ে যান। এমনকী আমার খুড়তুতো বোনকে যখন পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল তখনও কাকাকে ঠিক এইভাবে পাশের ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, যেমনভাবে এই ভদ্রমহিলার স্বামীকে রাখা হয়েছে। পাত্রপক্ষ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কাকা পাশের ঘরে বসে প্লাস পাওয়ারের চশমা এঁটে প্রায় তিন কিলো চালের ধান আর কাঁকর বেছে ফেলেছিলেন। এই ভদ্রলোককে তেমন কোনও কাজ দেওয়া হয়েছে কি না কে জানে!

তবে ভদ্রলোকের জন্য আমার বেশ মায়া হচ্ছিল। ওঁর করুণ অবস্থাটা আমি এত স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যে বেখেয়ালে হঠাৎ বলেই ফেললাম, আপনার স্বামীকেও এই ঘরে ডাকুন না।

ভদ্রমহিলা ফরসা এবং ফ্যাকাসে। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি রক্তাল্পতায় ভুগছেন। কিন্তু আমার কথা শুনে হঠাৎ এমন রাঙা হয়ে উঠলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমার ধারণা ভুল। ওঁর রক্তাল্পতা থাকতেই পারে না।

উনি ফের মুখ নত করলেন এবং আবার মুখ তুলে বললেন, উনি তো বাড়িতে নেই। তবে হয়তো ফিরে আসতেও পারেন। লাজুক মানুষ লোকজন দেখে হয়তো পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছেন। ও ঘরে কথাও শুনছি বেশ।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। মাঝখানের দরজা এতক্ষণ দমবন্ধ করে এঁটে ছিল। এবার হঠাৎ খুলে যাওয়ায় অবারিত শ্বাসবায়ুতে সারা বাড়িটা খোলামেলা, হাসিখুশি হয়ে গেল হঠাৎ। আর ঘরে কনে-দেখা আলোয় ভদ্রমহিলা অবিকল কনের মতোই লুঙ্গি পরা আদুড়ে গায়ের মাঝবয়সি মজবুত চেহারার লাজুক স্বামীটিকে ধরে ধরে এনে দাঁড় করাল। খুব হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছিলাম। দেখুন, চুপি চুপি এসে পাশের ঘরে মেয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। মেয়ে অন্ত প্রাণ একেবারে।

ভদ্রলোক মাথা চুলকোতে চুলকোতে খুব বিনয় ও লজ্জার সঙ্গে হাসছেন। জীবনে অসফল ভদ্রলোকেরা ঠিক এইভাবেই হাসেন এবং নিজেকে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন। অবিকল আমার সেজোকাকা।

বসুন।— আমি বললাম।

মাদুরে আর জায়গা ছিল না। উনি অবশ্য মাদুর-টাদুরের তোয়াক্কা করেন বলে মনে হল না। খুব অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেঝেয় বাবু হয়ে বসে পড়লেন।

এই সময়ে পশুপতি খুব আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আমাকে ঠেলা দিয়ে বলে, কাজের কথাটা তুলুন না।

কনে কই? আমার মন তার দাবি আবার পেশ করল। আমি বললাম, মেয়েদেরও ডাকুন।

পরদার ফাঁক দিয়ে একটা কচিমুখ উঁকি দিয়েই ছিল, সে-ই জবাব দিল, দিদি সুধাদির বাড়িতে আছে। ডেকে আনব?

ভদ্রমহিলার রক্তাল্পতা কেটে গিয়ে রক্তাধিক্যই দেখা যাচ্ছে এখন। কিন্তু তুখোড় চালাক বলে পলকে হেসে ফেলে বললেন, ওমা! তাই বুঝি! আমাকে তো বলে গেল গানের ক্লাসে যাচ্ছে। তা আন না ডেকে।

মেয়েটা ঘরের ভিতর দিয়েই এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল! পশুপতি ঘাম মুছছে। ভদ্রমহিলা করুণ চোখে চেয়ে বললেন, দেরি হয়ে গেছে বলে বোধ হয় আজ আর গানের ক্লাসে যায়নি।

পশুপতি ঘামভেজা রুমালটা শুকোনোর জন্য মাদুরের ওপর পেতে দিয়ে বলল, এবার কাজের কথাটা হয়ে যাক।

আপনারাই বলুন।— ভদ্রমহিলা বললেন, জিনিসটা ঘরের বার করার ইচ্ছে কারও নেই। মেয়েরা তো সারাক্ষণ কিটমিট করছে। কিন্তু আমি বলি, স্কেল চেঞ্জার যখন কেনা হচ্ছেই তখন আর একটা হারমোনিয়াম ঘরে রেখে জঞ্জাল বাড়ানো কেন!

এ সবই দরের ইংগিত। কিন্তু পুরনো বা নতুন কোনও হারমোনিয়ামের দর সম্পর্কেই আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে পশুপতি বলেছিল, প্রথমে পঞ্চাশ বলবেন। ধীরে ধীরে পঁচাত্তর অবধি উঠে একদম থেমে যাবেন।

কিন্তু হারমোনিয়ামটার দিকে না তাকিয়ে কেবল ঘরদোর এবং লোকজনের দিকে চেয়েই পঞ্চাশ টাকা বলতে আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকছে।

এ সময়ে ভদ্রমহিলা ডুবন্ত মানুষের দিকে একটা লাঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, পাঁচশো টাকায় কেনা জিনিস।

দরাদরিতে দালালের কথা বলার নিয়ম নেই। তা হলে তার পক্ষপাত প্রকাশ পাবে। পশুপতি শুধু শ্বাস নেওয়া আর ছাড়াটা বন্ধ করে ছিল। ফলে ঘরে একটা গর্ভিনী নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হল। প্রচণ্ড টেনশন। দামের কথাটা এখন কে তুলবে?

নিস্তব্ধতা ভেঙে আমি হঠাৎ বললাম, আমি গান জানি না।

ভদ্রমহিলা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। কথাটার অর্থ বুঝলেন না বোধ হয়।

আমি তাই মৃদু হেসে বললাম, গান না জানলেও হারমোনিয়াম ঘরে রাখার নিশ্চয়ই কিছু-কিছু উপকারিতা আছে।

ভদ্রমহিলা তুখোড় হলেও এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত নন। কনে দেখতে এসে কেউ যদি বলে, আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, তবে যেমনটা হয় আর কি!

উনি তাই বললেন, গান না জানলে হারমোনিয়াম দিয়ে কী করবেন? কিন্তু তা হলে কিনছেনই বা কেন?

যদি শিখি?

ভদ্রমহিলা একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন, সে তো খুব ভাল কথা। শিখতে গেলে হারমোনিয়াম ছাড়া কিছুতেই হবে না।

কিন্তু কে শেখাবে সেইটেই সমস্যা। আমি মুখ চুন করে বলি, একদম বিগিনারকে শেখানোর তো অনেক ঝামেলা। তা ছাড়া আমার কোনও সুরজ্ঞান নেই।

ভদ্রমহিলা ডগমগ হয়ে বলেন, ও নিয়ে আপনাকে মোটেই ভাবতে হবে না। আমিই শেখাব।

আপনি? আপনার তো সংসার করে বাড়তি সময়ই নেই।

সপ্তাহে এক দিন বা দু' দিন শেখালেই যথেষ্ট। বাদ বাকি দিনগুলোয় আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন!

বাইরের দরজার পরদা সরিয়ে এ সময়ে ম্লানমুখী একটি মেয়ে ঢুকল। আর সে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটার যা কিছু খাঁকতি ছিল, তার পূরণ হয়ে গেল। কনে-দেখা আলো, পুষ্পগন্ধ, রঙ্গমঞ্চের সব সাজ এবং একা ও দুঃখী হারমোনিয়াম সবই সজীব ও অর্থবহ হয়ে উঠল। মন বলল, এইজন্যই তো এতক্ষণ বসে থাকা। অবশেষে কনে এল।

কাটুসোনা

কাল রাতে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। মাগো! ভাবতেই ভয় করে। গায়ে কাঁটা দেয়। সবচেয়ে বেশি ভয় ভূতকে আর চোরকে।

আমাদের একটা লোমওয়ালা সুন্দর ভুটিয়া কুকুর ছিল। তার নাম পপি। ছোটখাটো, ভুসকো রঙের, ভারী মিষ্টি দেখতে। ভুক ভুক করে যখন ডাকত তখন ডাকটাও মিষ্টি শোনাত। সেই ছোট্ট একটু কুকুরছানা অবস্থায় আমাদের বাড়িতে আনা হয়েছিল তাকে। আমিও তখন ছোট্ট একটুখানি।

টানা বারো বছর আমাদের সঙ্গেই সে বড় হল, বুড়ো হল। তারপর এই তো গেলবার শীতের শেষ টানে মরে গেল একদিন। পপির জন্য আজও বুকের কান্না সব শেষ হয়নি। ভাবলেই কান্না পায়। কেন যে কুকুরের পরমায়ু এত কম! আমি তো এখনও ভাল করে যুবতীও হয়ে উঠিনি, এর মধ্যেই পপি বুড়ো হয়ে মরে গেল!

তা যাই হোক, পপির মতো এত নিরীহ কুকুর হয় না। কোনও দিন কাউকে কামড়ায়নি, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে মারপিট করেনি। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকতে ভালবাসত। তবে ভুক ভুক করে ডাক ছাড়ত ঠিকই। আর তার ভয়েই গত বারো বছরে কোনও দিন আমাদের বাড়িতে চোর আসেনি। পপি মরবার পর এ পর্যন্ত কম করেও দশ-বারো বার চোর হানা দিয়েছে।

কাল রাতের চোরটাকে বাঁটুল দেখেছে। ঠাকুমার কাছে বাঁটুল আর চিনি শোয়। বাঁটুলের ভয়ংকর কৃমির উৎপাত। সারা রাত দাঁত কড়মড় করে। গতবারেও তার গলা দিয়ে এত বড় কেঁচো বেরিয়েছিল। মাঝে-মাঝে সে বিছানায় ছোট-বাইরে করে ফেলে। সেও নাকি কৃমির জন্যই। কাল মাঝরাতে ছোট-বাইরে পাওয়ায় কোন ভাগ্যিতে তার ঘুম ভেঙেছিল। সলতে কমানো হ্যারিকেনের অল্প আলোয় সে দেখতে পায় একটা লম্বা বাঁখারি জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে আলনা থেকে ঠাকুমার থানধুতিটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁটুল ভয়ে আধমরা অবস্থায় চোখ মিটমিটিয়ে জানালার দিকে চেয়ে দ্যাখে, একটা লোক। কেমন লোক, রোগা না মোটা, কালো না ফরসা, লম্বা না বেঁটে তার কিছুই বলতে পারেনি। শুধু একটা লোককে সে দেখেছে। ওই অবস্থায় আমি হলে ভয়ে জানালার দিকে চাইতামই না। কড়াক্কর করে চোখ বন্ধ করে রাখতাম। বাঁটুল লোকটাকে দেখে ঠাকুমাকে চিমটি দিয়ে জাগিয়ে দেয়।

ঠাকুমা তো বুঝতে পারেনি কেন বাঁটুল চিমটি কেটেছে। ফলে ঠাকুমা উঃ বলে জেগে উঠে বাঁটুলকে বকে উঠেছে, এ ছেলেটার সঙ্গে শোওয়াই যায় না। এই হাঁটু দিয়ে গুঁতোচ্ছে, এই গায়ে পা তুলে দিচ্ছে, এই দাঁত কড়মড় করছে, এখন আবার চিমটিও দিতে শুরু করেছে।

সাড়াশব্দে বাইরের ঘরে ভৈরবকাকা জেগে উঠে গম্ভীর গলায় বলল, কে রে?

চোর কি আর তখন ত্রিসীমানায় থাকে? চোর ধরতে হলে কখনও আওয়াজ দিতে নেই। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে নাকি হঠাৎ সাপটে ধরতে হয়। কিন্তু সে সাহস এ বাড়ির কারও আছে বলে মনে হয় না। তবে মাঝরাতে বেশ একটা হই-হই হল আমাদের বাড়িতে। বাঁটুল চোর কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমে ঠাকুমা, তারপর ভৈরবকাকা এবং তারপর ঘুম ভেঙে বাড়ির প্রায় সবাই আতঙ্কে বিকট গলায় চোর! চোর! চোর! চোর! করে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু কেউ দরজা খুলে বেরোয় না। পাড়ার লোক যখন জড়ো হল তখন চোর তার বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে।

কিন্তু আমরা বাড়িসুদ্ধু লোক সেই যে জেগে গেলাম তারপর আর সহজে কেউ ঘুমোতে গেল না। আলনা থেকে ঠাকুমার থানধুতি ছাড়া চিনির একটা সোয়েটার আর ভৈরবকাকার একটা পুরনো পাজামা চুরি গেছে। পুরনো পাজামাটার জন্য দুঃখের কিছু নেই, ওটা ঠাকুমা ন্যাতা করবে বলে এনে রেখেছিল। কিন্তু তবু এই চুরি উপলক্ষ করেই বাড়িতে মাঝরাতে সিরিয়াস আলোচনাসভা বসে গেল। এমনকী এক রাউন্ড চা পর্যন্ত হয়ে গেল। সেই চা করতে রান্নাঘরে যেতে হল আমাকেই, সঙ্গে অবশ্য পিসি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভৈরবকাকা বললেন, চোরেদের নিয়ম হল, চুরি করে গেরস্তবাড়িতে পায়খানা করে যায়।

বাবা বললেন, দূর! ও সব সেকেলে চোরদের নিয়ম।

তবু দেখা যাক।

বলে ভৈরবকাকা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আর বিরাট লাঠি হাতে বেরোলেন। সঙ্গে আমাকে আর বাঁটুলকে নিলেন। বললেন, আমার চোখ তো আর অত বেশি তেজি নয়। তোরা একটু নজর করতে পারবি।

ভয়ে আমার হাত পা হিম হয়ে আসছিল। বাঁটুল তার এয়ারগান বগলদাবা করে আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, কোনও ভয় নেই রে মেজদি, এয়ারগানের সামনে পড়লে চোরকে উড়িয়ে দেব।

আমি বললাম, হুঁ! খুব বীর।

টর্চ জ্বেলে ভিতরের মস্ত উঠোন আর বাইরের বাগান খুঁজে দেখা হল। কোথাও সে রকম কিছু পাওয়া গেল না।

তখন ভোর হয়ে আসছে। ভৈরবকাকা বললেন, আর শুয়ে কাজ নেই। চল, মর্নিং ওয়াকটা সেরে আসি।

বেড়িয়ে ফেরার পথে মল্লিকদের বাড়ির বাগানে অনেক বেলফুল দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। ওদের বাড়িতে কুকুর নেই। তাই নিশ্চিন্তে ফটক খুলে ঢুকে এক কোঁচড় বেলকুঁড়ি তুলে ফেললাম। ভিজে ন্যাকড়ায় ঢাকা দিয়ে রাখলে বিকেলে ফুটে মউ মউ করবে গন্ধে। ফুল তুলছি আপনমনে, এমন সময় হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে একটা বিদঘুটে হারমোনিয়ামের শব্দ উঠল। খুব অবাক হয়েছি। এ বাড়িতে গানাদার কেউ নেই হারমোনিয়ামও নেই জানি। তবে?

সারেগামার কোনও রিডেই সুর লাগছে না। সেই সঙ্গে আচমকা একজন পুরুষের গলা বেসুরে মা ধরল। এমন হাসি পেয়েছিল, কী বলব!

ভৈরবকাকা কাকভোরে জাম্বুবানের মতো ফটকের বাইরে লাঠি আর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে। হারমোনিয়াম শুনে তিনি বললেন, কাটুসোনা, চলে আয়। বাঁটুল ফুল চুরিতে আগ্রহী নয় বলে একটু এগিয়ে গেছে।

এ বাড়িতে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লেও আমার ভয় নেই। বলতে কী এ বাড়িতে আমার কিছু অধিকারও আছে। এ বাড়ির ছোট ছেলে অমিতের সঙ্গে বহুকাল হল আমার বিয়ের কথা ঠিকঠাক। সে আমেরিকা থেকে এক ফাঁকে এসে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। আমিও তৈরি।

ভৈরবকাকা অবশ্য ফুল চুরির ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না। কারণ হবু বউ ভাবী শ্বশুরবাড়িতে ফুল চুরি করতে এসে ধরা পড়লে ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়। তাই উনি তাড়া দিয়ে বললেন, সব জেগে পড়েছে। পালিয়ে আয়। অত ফুল তোর কোন কাজে লাগবে শুনি?

মনে মনে বললাম, মালা গাঁথব।

মুখে বললাম, একটু দাঁড়াও না। এ বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে কে?

কে জানে! তবে ওদের একটা মাথা-পাগলা গোছের ভাই এসেছে কলকাতা থেকে শুনেছি। সে-ই বোধ হয়।

কী রকম ভাই?

সে কত রকম হতে পারে। পিসতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো, জ্ঞাতির কি শেষ আছে! কে জানে?

আমি খুশি হতে পারি না।

হারমোনিয়ামটা তারস্বরে বিকট আওয়াজ ছাড়ছে। সঙ্গে গলাটা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য সুরে। যাকে বলে বেসুরের সঙ্গে বেসুরের লড়াই।

আমি কোঁচড় ভরতি ফুল নিয়ে চলে আসি। ভৈরবকাকাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি দেখেছ লোকটাকে?

লোকটা নয়, ছেলেটা। একেবারে পুঁচকে ছোকরা। টাউন ডেভেলপমেন্টের চাকরি নিয়ে এসেছে কিছু দিন হল। সে দিন দেখি প্রকাণ্ড একটা পাকা কাঁঠাল নিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। পিছনে-পিছনে দুটো গোরু তাড়া করাতে মালগুদামের রাস্তা দিয়ে দৌড় দিচ্ছিল। তাই দেখে সকলে কী হাসাহাসি।

মল্লিকবাড়ি এখন অবশ্য ফাঁকাই থাকে। ছেলেরা সবাই বিদেশ-বিভুঁয়ে চাকরি করে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে বুড়ো আর বুড়ি। অবশ্য বুড়োবুড়ি বলতে সাঙ্ঘাতিক বুড়োবুড়ি তাঁরা

নন। আমার হবু শাশুড়ির চেহারায় এখনও যৌবনের ঢল আছে। হবু শ্বশুরমশাই এখনও বাহান্ন ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে দিনে চার মাইল করে হেঁটে আসেন। দরকার হলে সাইকেলও চালান।

হারমোনিয়ামের শব্দটা বহু দূর পর্যন্ত আমাদের তাড়া করল।

রাস্তার মোড়েই দাঁড়িয়েছিল বাঁটুল। ভৈরবকাকাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে আমি আর বাঁটুল পাশাপাশি হাঁটছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ রে বাঁটুল, মল্লিকবাড়িতে কে নাকি এসেছে?

হ্যাঁ। পাগলা দাশু।

তার মানে?

অমিতদার ভাই। সবাই তাকে পাগলা দাশু বলে ডাকে।

কেন?

কী জানি? লোকটার একটু ট্যানজিস্টার শর্ট আছে।

বাঁটুলের সব কথাই অমনি। ভাল বোঝা যায় না। তবে একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ঠিকই। বললাম, সত্যিকারের পাগল নাকি?

না, না। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রোজ বাঘাযতীন পার্কে ফুটবল খেলতে যায় সে। গোলকিপিং করে। কিন্তু একদম পারে না। বল হয়তো ডান দিক দিয়ে গোলে ঢুকছে, সে বাঁ দিকে ডাইভ দেয়। আমরা হেসে বাঁচি না।

তবে খেলায় নিস কেন?

বাঁটুল গম্ভীর হয়ে বলে, না নিয়ে উপায় আছে? এ পর্যন্ত তিনটে রাশিয়ান টাইপের ফুটবল কিনে দিয়েছে তা জানিস? এক-একটার দাম ষাট-সত্তর টাকা।

ভূত বা চোরের মতো পাগল আর মাতালদেরও আমার ভীষণ ভয়। কিন্তু যারা পুরো পাগল নয়, যারা আধপাগলা খ্যাপাটে ধরনের তাদের আমার কিন্তু মন্দ লাগে না। এই যেমন ভৈরবকাকা। খুঁজে দেখতে গেলে ভৈরবকাকা আমাদের রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়। জ্ঞাতি মাত্র। বিয়ে শাদি করেনি, একা-একা একটা জীবন দিব্যি কাটিয়ে দিল। সাত ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে গত পনেরো-ষোলো বছর আমাদের পরিবারে ঠাঁই নিয়েছে। বিয়ে না করলে একটা বাই-বাতিক হয় মানুষের। সব সময়েই উদ্ভট সব চিন্তা আসে মাথায়। ভৈরবকাকাও তাই। খামখেয়ালি, রাগী, অভিমানী আবার জলের মতো মানুষ। এমন লোককে কার না ভাল লাগে? আমার তো বেশ লাগে। খ্যাপামি না থাকলে মানুষের মধ্যে মজা কই? আমার বাপু বেশি ভাবগম্ভীর হিসেবি লোক তেমন ভাল লাগে না। রবি ঠাকুরের বিশু পাগলা বা ঠাকুরদার মতো চরিত্র আমার বেশি পছন্দ।

আমি বাঁটুলকে জিজ্ঞেস করি, পাগলা দাশু আর কী কী করে?

বাঁটুল বলে, সে অনেক কাণ্ড। ছুটির দিনে নতুন পাহাড় আবিষ্কার করতে একা-একা চলে যায়। নতুন-নতুন গাছ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তা ছাড়া সাইকেলে চড়া শিখতে গিয়ে রোজ দড়াম-দড়াম করে আছাড় খায়। গান শিখবে বলে লিচুদিদের পুরনো হারমোনিয়ামটা দুশো টাকায় কিনে এনেছে।

দুশো টাকা?— বলে আমি চোখ কপালে তুলি।

লোকটা বোকা আছে মাইরি রে।

ফের মাইরি বলছিস?

বাঁটুল জিব কাটল।

আমি ভাবছি একটা লোক আমার ভাবী শ্বশুরবাড়িতে এসে খানা গেড়েছে, বাঁটুলদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, লিচুদের হারমোনিয়াম কিনেছে, আর আমি লোকটার কোনও খবরই রাখতুম না!

সকালে আজ অনেক বেশি কাপ চা ছাঁকতে হল। চোরের খবর নিতে পাড়ার লোকজন এল। দারোগা কাকা নিজে তদন্তে এলেন। ভারী হাসিখুশি ভুঁড়িওলা প্রকাণ্ড মানুষ। চুরির বিবরণ শুনে

বাঙাল টানে বললেন, চোরের ইজ্জত নাই, নিতে নিল ভৈরবদার পাজামাখান? ইস্। কপাল ভাল যে ভৈরবদারে দিগম্বর কইরা পরনের লুঙ্গিখানা লইয়া যায় নাই।

বলতে বলতে নিজেই হেসে অস্থির। চোখে জল পর্যন্ত চলে এল হাসতে হাসতে।

ভৈরবকাকা রেগে গিয়ে বলেন, তোমাদের অ্যাডমিনস্ট্রেশন দিনে দিনে যা হচ্ছে তাতে পরনের লুঙ্গিও টেনে নেবে একদিন ঠিকই। তার আর বেশি দেরিও নেই। ঘরের বউ, বেটাবেটিকেও টেনে নিয়ে যাবে।

দারোগাকাকা রাগবার মানুষ নন। তাঁর দুই প্রিয় জিনিস হল শ্যামাসংগীত আর জর্দাপান। একটা শুনলে আর অন্যটা খেলে তাঁর দুই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসে। চায়ের পর জর্দাপান খেয়ে এখনও তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু করছিল। বলেন, অ্যাডমিনস্ট্রেশন তো আমরা চালাই না, চালায় গবর্নমেন্ট। যদি গবর্নমেন্টটা কে চালায় তয় কইতে হয় ভূতে।

ভৈরবকাকা চেঁচিয়ে বলেন, আলবত ভূতে। তোমাদের গোটা অ্যাডমিনস্ট্রেশনটাই আগাগোড়া ভূতের নৃত্য। চুরি বাটপারি, রেপ রাহাজানি এভরিথিং তোমাদের নলেজে হচ্ছে। প্রত্যেকটা সমাজবিরোধীর কাছ থেকে তোমরা রেগুলার ঘুষ খাও।

দারোগাকাকা অবাক হওয়ার ভান করে বলেন, ঘুষ খামু না ক্যান? ঘুষের মধ্যে কোন পোক পড়ছে?

ভৈরবকাকা উত্তেজিতভাবে বলেন, না ঘুষে পোকা পড়বে কেন? পোকা পড়েছে আমাদের কপালে।

দারোগাকাকা আবার ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে বলেন, আপনের গেছে তো একখান ছিঁড়া পায়জামা, হেইটার লিগ্যাই এই চিল্লা-চিল্লি? তা হইলে সোনাদানা গেলে কী করতেন?

ছেঁড়া পায়জামাই বা যাবে কেন? ইফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ গুড দেন হোয়াই ছেঁড়া পায়জামা—

ভৈরবকাকা ইংরিজিতে আর থই না পেয়ে থেমে যান। আমরা হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়ি।

ভৈরবকাকা উত্তেজনা সামলে নিয়ে আবার বলেন, ছেঁড়া পায়জামাটা কোনও ফ্যাকটর নয়, ফ্যাকটর হল চুরিটা। আমার প্রশ্ন, চুরি হবে কেন?

দারোগাকাকা বলেন, কুত্তা পোষেন।

কুকুরই বা পুষতে হবে কেন?

তা হইলে চুরিও হইব।

আর তোমাদের যে পুষেছি। এত দারোগা পুলিশ যে সরকাব রেখেছে আমাদের ট্যাক থেকে নিয়ে?

কই আর পুষলেন। ভাবছিলাম চাকরি ছাইড়া দিয়া আপনের পুষ্যিপুত্তুর হমু। কিন্তু আপনে তো কথাটা কানেই লন না।

কথায়-কথায় পলিটিকস এসে গেল এবং তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। আরও দু' রাউন্ড চা করতে হল। পরে দারোগাকাকা উঠতে উঠতে বললেন, চোরটারে ধরতে পারলে এমন শিক্ষা দিমু যে আর কওনের না। হারামজাদায় জানে না, ভৈরবদার ছিঁড়া পাজামা আমাগো ন্যাশনাল প্রপার্টি।

এ সব গোলমাল মিটলে বাড়িটা একটু ঠান্ডা হল। ভৈরবকাকার বদলে আজ দাদা বাজার করে এনেছে। ফলে রান্নাঘরে আমরা সবাই ব্যস্ত। এক প্রস্থ জলখাবার হবে, সেই সঙ্গে বাবার আর দাদার অফিসের ভাতও।

জলখাবারের চচ্চড়ির আলু ধুতে গিয়ে কুয়োর পাড়ে দেখি, চিনি বাড়ির মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে পড়তে উঠে এসে পুতুল স্নান করাচ্ছে।

বললাম, অ্যাই, মাস্টারমশাই বসে আছেন না?

ছোড়দার অঙ্ক দেখছেন তো।

তা বলে তুই এই সাতসকালে পুতুল খেলবি? যা।

সে গুটি-গুটি চলে যায়। ওর সোয়েটারটা গেছে আমার দোষেই। সামনের শীতের জন্য প্যাটার্ন তুলতে ওটা নিয়েছিল লিচু। কালই ফেরত দিয়ে গেছে। আলিস্যির জন্য আমি ওটা তুলে না রেখে ঠাকুমার ঘরে আলনায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।

কালও কই হারমোনিয়ামটা নিয়ে একটা কথাও তো বলেনি লিচু। আচ্ছা সেয়ানা মেয়ে যা হোক। ওদের বাড়িতে কখনও গান তুলতে গেলে ওই হারমোনিয়াম দেখলেই আমার হাসি পায়। মাগনা দিলেও নেওয়ার নয়। পাগলা দাশুকে খুব জক দিয়েছে ওরা।

গোমড়ামুখো দাদা কুয়োর পাড়ে এসে সিগারেট ধরাচ্ছে। বাথরুমে যাবে। দেশলাইটা কুয়োর কার্নিশে রেখে বলল, ঘরে নিয়ে যাস তো। নইলে কাক ঠোঁটে করে তুলে পালায়।

পাগলা দাশুকে চিনিস দাদা?

কোন পাগলা দাশু?

মল্লিকদের বাড়িতে যে এসেছে।

ও, অসিতের ভাই। পাগলা নয় তো। পাগলা হতে যাবে কেন?

কথাটা তুলেই আমার লজ্জা করছিল। ব্যাপারটা এত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ওই হারমোনিয়াম কেনার কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে! লিচুরা আচ্ছা ছোটলোক তো! কী বলতে ওই অখাদ্য হারমোনিয়ামটার জন্য দুশো টাকা নিল?

বাইরের ঘরে একটা বাজখাই গলা শুনে কুয়োতলা থেকেও বুঝতে পারলাম, মল্লিকবুড়ো অর্থাৎ আমার হবু শ্বশুর এসেছেন। চোর আসার খবর পেয়েই আসছে সবাই।

চচ্চড়ির আলু ধুয়ে রান্নাঘরে যেতেই মা বলল, বীরেনবাবুর চা-টা তুই-ই কর।

বীরেনবাবু অর্থাৎ মল্লিকবুড়োর চায়ে বায়নাক্কা আছে। দুধ বা চিনি চলবে না, লিকারে শুধু পাতিনেবুর রস মেশাতে হবে তাও টক চা হলে চলবে না। লিকারে শুধু একটু গন্ধ হবে।

আমি বাগানে পাতিলেবু আনতে যাওয়ার সময় বৈঠকখানার দরজায় পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম মল্লিকবুড়ো বলছেন, শেষ রাতে তো শুনলাম আমার বাগানেও চোর ঢুকেছিল। আমার ভাইপো কানু দেখেছে, ছুকরি একটা চোর বেলফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সাড়াশব্দ পেয়ে পালিয়ে যায়।

বাবা বললেন, ও। সে তো ফুলচোর!

আমি রাঙা হয়ে উঠলাম লজ্জায়।

পাগলা দাশু

দুনিয়ার কোনও কাজই বড় সহজ নয়। গান শেখা, সাইকেলে চড়া বা পাহাড়ে ওঠা। সহজ সুরের রামপ্রসাদী আমায় দাও মা তবিলদারি গানটা কতবার গলায় খেলানোর চেষ্টা করলাম। কিছুতেই হল না। অথচ সুরটা কানে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সহজ, অতি সহজ গান। কিন্তু আমার কান শুনলেও গলা সেই সুর মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। যে সুরটা কানে বাজছে কিন্তু গলায় আসছে না তাকে গলায় আনতে গেলে কী করা দরকার তা জানবার জন্য আমি সিভিল হাসপাতালের ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে একদিন হানা দিলাম।

খুবই ভিড় ছিল আউটডোরে। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় অবশেষে তার চেম্বারে ঢুকতে পেরেছি।

নমস্কার ডাক্তারবাবু।

নমস্কার। বলুন তো কী হয়েছে?

আমার কানের সঙ্গে গলার কোনও সমঝোতা হচ্ছে না।

তার মানে কী?

অর্থাৎ কানে যে গানটা শুনতে পাচ্ছি, কিছুতেই সেটা গলায় তুলতে পারছি না।

আপনি কি গায়ক?

না, তবে চেষ্টা করছি।

হাঁ করুন।

করলাম হাঁ। মস্ত হাঁ। ডাক্তার গলা দেখলেন, কপালে আটা গোল একটা আয়না থেকে আলো ফেলে নাক এবং কানও তদন্ত করলেন। তারপর মস্ত একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, হুঁ।

ডিফেক্টটা ধরতে পারলেন?

ডান কানে একটা তেকোনা হাড় উঁচু হয়ে আছে। নাকের চ্যানেলে ভাঙা হাড় আর পলিপাস। গলায় ফ্যারিনজাইটিস। সব ক'টারই ট্রিটমেন্ট দরকার। নাক আর কান দুটোই অপারেশন করালে ভাল হয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এত কিছুর পর গান গলায় আসবে?

আশা তো করি।— বলে ডাক্তার মৃদু হাসলেন। চাপা স্বরে বললেন, এ সব কি হাসপাতালে হয়? বিকেলের দিকে আমার হাকিমপাড়ার বাসায় যে চেম্বার আছে সেখানে চলে আসবেন।

আমি চলে আসি।

আমার গলায় যে সুর খেলছে না সেটা আমাকে প্রথম ধরে দেয় পশুপতি। লিচুর মা কিন্তু রোজই ভরসা দিচ্ছেন যে, একটু-একটু করে আমার হচ্ছে। একদিন মা লাগাতে পারছি অন্যদিন রে-ও লাগছে।

পশুপতি আমার ওপর খুবই রেগে ছিল। হারমোনিয়াম কেনার পর দু' দিন আমার সঙ্গে দেখা করেনি। তিন দিনের দিন এসে ফালতু কথা ছেড়ে সহজ ভাষায় বলল, আপনার মতো আহাম্মক দেখিনি। ওই গর্দা মালের জন্য কেউ দুশো টাকা দেয়? টাকা কি ফ্যালনা নাকি?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, পশুপতি, কোন জিনিসের আসলে কী দাম তা তুমিও জানো না আমিও জানি না। ঠকেছি না জিতেছি সে বিচারও বড় সহজ নয়।

আর আমি যে একশো টাকার খদ্দের ঠিক করে রেখেছি তার কী হবে? সে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। আমি তো আপনাকে পইপই করে বলে রেখেছিলাম পঁচাত্তর টাকার ওপরে উঠবেন না। আপনি মাল না চিনলেও আমি তো চিনি।

এ কথার কোনও জবাব হয় না। পশুপতিকে কী করে বোঝানো যাবে যে, লিচুদের বাড়িতে সেদিন এক মোহময় বিকেল এসেছিল। ছিল কনে দেখা আলো, ফুলের গন্ধ, হারমোনিয়ামের একাকিত্ব। মন বলছিল, কনে কই? কনে কই? সেই সময়ে কেউ টাকার কথা বলতে পারে? আমি তবু দুশো টাকা বলেছিলাম। এবং বলেই মনে হয়েছিল খুব কম বলা হয়ে গেল। লিচু, লিচুর মা বাবা বোন অবশ্য খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। হতভম্ব হয়ে গেল পশুপতিও। কিন্তু ওই দামের নীচে সেদিন যে হারমোনিয়ামটা কেনা ঠিক হত না তা কেউ বুঝবে না।

পশুপতি হঠাৎ খুব গরম হয়ে বলল, ওটা তো আপনার কোনও কাজেই আসত না। আমাকে একশো টাকায় দিয়ে দিন।

আমি বললাম, আমি একটু-আধটু গানের চর্চা করছি পশুপতি। এটা দেওয়া যাবে না।

পশুপতি ধৈর্য হারাল না। সে দিন চলে গেল বটে কিন্তু ফের একদিন এল। আমার গলা সাধা শুনল। বলল, এ জন্মে আপনার গান হবে না কানুবাবু। আপনার গলায় সুরের স-ও নেই।

অথচ সপ্তাহে দু' দিন সন্ধেবেলা আমি রিকশায় হারমোনিয়াম চাপিয়ে লিচুদের বাড়ি গিয়ে হাজির হই। লিচুর মা শত কাজ থাকলেও সব ফেলে রেখে আমাকে গান শেখাতে বসেন, কাছে লিচুও বসে থাকে। আমার সা রে গা মা শুনে কেউ হাসে না, এবং উৎসাহ দেয়। গান শিখবার জন্য আমি লিচুর মাকে মাসে-মাসে পঁচিশ টাকা করে দেব বলেছি।

সকালের দিকে বাঘাযতীন পার্কে আমি সাইকেলে চড়া প্র্যাকটিস করি। দুটো সরু চাকার ওপর সাইকেলে কী ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কী ভাবেই বা চলে তা নিয়ে আমার মনে বহুকাল ধরে প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমি আগাগোড়া মধ্য কলকাতায় মানুষ। সেখানে সাইকেল আরোহীর সংখ্যা বেশি নয়, তা ছাড়া অঢেল ট্রাম বাস থাকায় সাইকেল চড়ারও দরকার পড়েনি। এই উত্তরবাংলার শহরে এসে দেখি, প্রচুর সাইকেলবাজ লোক চারদিকে। কাকার বাড়িতে তিন-তিনটে সাইকেল। একটা কাকা চালান, আর দুটো সাইকেল পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। কাকা বললেন, খামোকা রোজ অফিস যেতে আসতে রিকশা-ভাড়া দিস কেন? সাইকেলে যাবি আসবি। দুটো পয়সা বাঁচাতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

সেই থেকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সাইকেল কিছুতেই আমাকে সমেত খাড়া থাকতে চায় না। আসলে সাইকেলটা পড়ে যাবে আশংকা করে আমি নিজেও ডান বা বাঁদিকে একটু কেতরে থাকি। ফলে সাইকেল আরও তাড়াতাড়ি পড়ে যায়।

পশুপতি এই সব লক্ষ করে একদিন বলল, সাইকেল হল গরিবদের গাড়ি। আসল বাবুরা চলাফেরা করে রিকশা বা মোটরে। বীরেনবাবুকে কত বার বলেছি, আপনাদের তিন-তিনটে সাইকেল তার গোটা দুই আমাকে বেচে দিন। কিছুতেই রাজি হয় না। একবার বলে দেখবেন নাকি আপনার কাকাকে? ভাল দর দেব।

পশুপতি এ সব কথা ছাড়া দ্বিতীয় কথা জানে না। হয় কেনার কথা বলে, নয়তো বেচার কথা। হারমোনিয়ামটার আশা সে এখনও ছাড়েনি। আমি গানের আশা ছাড়লেই সে হারমোনিয়ামটা অর্ধেক দরে কিনতে পারবে বলে আশা করে আছে। সাইকেলের আশাও তার আছে।

কিন্তু আমি সাইকেল বা গান কোনওটার আশাই ছাড়িনি, আমার জীবনের মূলমন্ত্রই হল, চেষ্টা।

একদিন বিকেলে হঠাৎ লিচু এল।

তার চেহারাটা বেশ লাবণ্যে ভরা। একটু চাপা রং, চোখ দুটো বড় বড়, মুখখানা একটু লম্বাটে, থুতনির খাঁজটি বেশ গভীর। খুব লম্বা নয় লিচু, তবে হালকা গড়ন বলে বেঁটেও মনে হয় না। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব আছে শরীরে।

বলল, আপনি কি সত্যিই গান শিখবেন? নাকি ইয়ার্কি করছেন?

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

লিচু আমার নির্জন ঘরে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই চৌকির বিছানায় বসে বলল, আমরা খুব লজ্জায় পড়ে গেছি।

কেন, কী হয়েছে?

শুনছি, আমরা নাকি আপনাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে হারমোনিয়ামটা বেশি দামে বেচেছি।

আমি মাথা নেড়ে বলি, তা কেন? দাম তো তোমরা বলোনি। আমি বলেছি।

সে কথা লোকে বিশ্বাস করলে তো? আপনি হারমোনিয়ামটা আমাদের ফেরত দিন, আপনার টাকা আমরা দিয়ে দেব।

কথাগুলো আমার একদম ভাল লাগছিল না। কলকাতায় হলে কে কার হারমোনিয়াম কত টাকায় কিনল এ নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা থাকত না। কিন্তু মফস্সল শহরগুলোয় ব্যক্তিস্বাধীনতা খুবই কম।

আমি লিচুকে বললাম, ফেরত দেওয়ার জন্য তো কিনিনি। আমি সিরিয়াসলি গান শেখার চেষ্টা করছি।

গান আপনার হবে না।

কে বলল?

আমি গলা চিনি, তা ছাড়া গান শেখার আগ্রহ আপনার নেই।

কে বলল?

আমিই বলছি। আমার মনে হয় আপনি ইচ্ছে করেই হারমোনিয়ামটা বেশি দামে কিনেছেন।

লোকে কি ইচ্ছে করে ঠকতে চায়?

আপনি হয়তো আমাদের গরিব দেখে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। কথাটা কেউ বুঝবে না, কেন আমি হারমোনিয়ামটার দুশো টাকা দাম বলেছিলাম। আমার তো মনে হয়, দুশো টাকাও বেশ কমই বলা হয়েছিল। কোন জিনিসের কত দাম তা আজও ঠিক-ঠিক কেউ বলতে পারে না।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, তা নয়। তোমরা তো তত গরিব নও।

আমরা খুবই গরিব।— উদাস স্বরে লিচু বলে, এতটাই গরিব যে, আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি যদি সকলের কাছে স্বীকার করি যে হারমোনিয়ামটার দর আমিই দিয়েছিলাম।

তাতেও লাভ নেই এখন। লোকে অন্যরকম সন্দেহ করবে। ভাববে, পুরনো জিনিস বেশি দামে কেনার পিছনে আপনার অন্য মতলব আছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। আমার অন্য কোনও মতলবই হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা খারাপ কিছু নয়।

লিচু অবাক হয়ে বলে, কী মতলব?

আমি মৃদু হেসে বললাম, সেদিন আমার মনে হয়েছিল, এই হারমোনিয়ামটা হাতছাড়া করতে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার বোন কাঁদছিল, তুমিও বাড়ি থেকে বোধ হয় রাগ করেই চলে গিয়ে অন্য বাড়িতে বসে ছিলে। এই হারমোনিয়ামটার ওপর তোমাদের মায়া মমতা দেখে আমার মনে হল, শুধু জিনিসটার দাম যাই হোক, এটার ওপর তোমাদের টান ভালবাসারও তো একটা আলাদা দাম আছে। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটার কথা ভেবে দ্যাখো। যে কসাইটা মহেশকে কিনতে এসেছিল তার কাছে শুধু চামড়াটুকুর যা দাম, কিন্তু গফুরের কাছে তো তা নয়। শোনো লিচু, আমি কসাই নই। আমি ভালবাসার দাম বুঝি।

শুনে লিচু কেমন কেঁপে উঠল একটু। চোখে জল ভরে এল বুঝি। মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মুখ তুলে ধরা গলায় বলল, আমাদের বাড়িতে তেমন কোনও আনন্দের ব্যাপার হয় না, জানেন। বাবার একটা সাইকেল সারাইয়ের দোকান আছে, তেমন চলে না। অভাবের সংসারে সুখ আর কী বলুন। তবু ওই হারমোনিয়ামটা ছিল, আমরা ওটাকে আঁকড়ে ধরেই বড় হয়েছি। যখন মন খারাপ হত, খিদে পেত কি রাগ হত তখন হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গান গাইতে বসে যেতাম। আমাদের কাছে ওটা যে কতখানি ছিল কেউ বুঝবে না।

তা হলে বিক্রি করলে কেন?

কী করব? বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় আমাদের অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল। মা আমাদের অনেক বুঝিয়েছিল, হারমোনিয়ামটা বিক্রি করে এখন ধার কিছু শোধ করা হবে, পরে অবস্থা ফিরলে আমরা একটা স্কেল চেঞ্জার কিনবই। তখনই আমরা দুই বোন বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের একমাত্র আনন্দের জিনিসটাও আর থাকছে না। বাড়িটা একদম ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে এরপর।

তোমরা কত দাম আশা করেছিলে?

একশো টাকার বেশি কিছুতেই নয়। পশুপতিবাবুকে তো আমরা চিনি। উনিই আমাদের বাড়ির

বাসন কোসন, গয়না, পুরনো আসবাবপত্র সবই কিনেছেন বা বন্ধক রেখেছেন, এমনকী বাবার সাইকেলের দোকানটা পর্যন্ত ওঁর কাছে বাঁধা আছে। উনি কখনও বেশি দাম দেন না। তবে অভাব অনটন বা দরকারের সময় উনিই যে-কোনও জিনিস বাঁধা রেখে টাকা দেন বা পুরনো জিনিস কিনে নেন। আপনি দুশো টাকা দাম বলায় আমরা সবাই ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। পশুপতিবাবু অত বেশি দাম হাঁকার লোক নন।

আমাকে বোকা ভেবেছিলে বোধ হয়?

লিচু মাথা নেড়ে বলল, অনেকটা তাই। তবে আমার মনে হয়েছিল আপনি একটু পাগলাটে, ভাল মানুষ আর টাকাওয়ালা লোক।

আমি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলি, কথাটা ঠিক নয় লিচু। আমার কখনও মনে হয়নি যে, হারমোনিয়ামটা কিনে আমি ঠকে গেছি।

লিচু খুব অদ্ভুত অবাক-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আপনি সত্যিই ঠকেছেন। খুব ঠকেছেন। আমাদের খুব নিন্দে হচ্ছে। আপনার পায়ে পড়ি, হারমোনিয়ামটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। বাবা আপনার টাকা শোধ করে দেবে।

আমি তা জানি লিচু। তবু আমাকে কয়েকদিন ভেবে দেখতে দাও।

লিচু যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠল তখন জানালা দিয়ে কিছু রোদ ওর মুখে এসে পড়েছিল কি না ঠিক বলতে পারছি না, তবে মুখখানায় হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখা গিয়েছিল।

রাত হলে রোজই আমি খাওয়ার আগে একটু সামনের বাগানে বেড়াই। আজ পূর্ণিমার ভর ভরন্ত চাঁদ যেন উদ্বৃত্ত জ্যোৎস্নায় ফেটে পড়েছে। গবগব করে নেমে আসছে জ্যোৎস্না। মাঠ ঘাট রাস্তা ভাসিয়ে ড্রেন বেয়ে যাচ্ছে। ছাদ থেকে রেনপাইপ বেয়ে নেমে আসছে। তেমন গরম নেই। বেলফুল ফুটেছে, তার মাতাল গন্ধে বাতাস মন্থর এবং ভারী। এত গন্ধে মাথা ধরে যায়। শ্বাসকষ্ট হয়। বুক কেমন করে। কলকাতায় আমি কখনও এতটা জায়গা পাইনি। এমন বিনা পয়সায় ফুলের গন্ধের হরির লুট ঘটে না সেখানে। চাঁদের আলো যে এত তীব্র হতে পারে তাও কলকাতায় কখনও খেয়াল করিনি। এ সবই আমার কাছে ভয়ংকর বাড়াবাড়ি। এত বেশি আমার পছন্দ নয় কিছুই।

খোলা রাস্তায় জ্যোৎস্নায় তাড়া খেয়ে একজন মানুষ মাথা বাঁচাতে দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে কোলকুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কে ও? কর্ণবাবু নাকি?

জগদীশ মাস্টারমশাইকে এই জ্যোৎস্নায় একদম অন্যরকম লাগে। মুখের বুড়োটে খাঁজগুলোয় চোখের ঘোলাটে মণিতে কাঁচাপাকা দাড়িতে জ্যোৎস্নার ফোঁটা পড়েছে। নবীন যুবকের মতো তাজা কবি হয়ে গেছে মুখখানা। পরনে ধুতি, গায়ে হাফ হাতা শার্ট, হাতে ছাতা।

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছেন?

এই পথেই রোজ টিউশানি সেরে ফিরি। যাতায়াতের সময় রোজই শুনতে পাই আপনি গান করছেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে। বেশ লাগে। দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড গান শুনতেও ইচ্ছে করে। তবে সময় হয় না। রোজই ভাবি একদিন সামনে বসে শুনে যাব।

লজ্জা পেয়ে বলি, গান করছি বললে ভুল হবে। শিখছি।

ভেরি গুড, শেখা জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে। কোয়ালিফিকেশন যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। দুনিয়ায় কোয়ালিফিকেশনের মতো জিনিস হয় না। যত কোয়ালিফিকেশন তত অপরচুনিটি, যত অপরচুনিটি তত ফ্রিডম, যত ফ্রিডম তত মর‍্যাল কারেজ। কোয়ালিফিকেশন আরও বাড়াতে থাকুন। ছবি আঁকুন আর্টিকেল লিখুন, ল পড়ুন। কোয়ালিফিকেশনের অভাবেই দেখুন না, মোটে পাঁচটা টিউশানি করছি মেরে কেটে। সায়েন্স জানলে ডজনখানেক করতাম।

তা ঠিক।— আমি বলি।

জগদীশ মাস্টারমশাই এই জ্যোৎস্নায় কিছু মাতাল হয়েছেন। কোনওদিন এত কথা বলেন না। আজ ফটকের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, অবশ্য এখানে এই এঁদো জায়গায় কোয়ালিফিকেশন বাড়ানো খুবই কঠিন। আমার এক ছাত্রী শান্তিনিকেতনে নাচ শিখত। এখন তার খুব নামডাক।

জগদীশ মাস্টারমশাই কখনও ছাত্রীকে ছাত্রা ছাড়া বললেন না। ছাত্রী শব্দটা নাকি ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ নয়। আমি বললাম, তাই নাকি? খুব ভাল।

তার ওপর এম এ পাশ, গান জানে, ইংরিজিতে কথা বলতে পারে। রং কালো হলে কী হয়, শুনছি খুব বড় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে। স্রেফ কোয়ালিফিকেশনের জোরে। এই জোরটা যে কত বড় তা অনেকেই বুঝতে চায় না। বললে ভাবে জগদীশ মাস্টার মাথা পাগলা লোক, আগড়ম বাগড়ম বকে।

বলতে কী জগদীশ মাস্টারমশাইয়ের কথাকে আমি মোটেই আগড়ম বাগড়ম মনে করছিলাম না, আমার মনে হচ্ছিল, কথাগুলো বেশ ভেবে দেখার মতো।

আমি ছাত্রদের নিচু ক্লাসেই শিখিয়ে দিই, কখনও কাম হিয়ার বলবে না, কাম একটা চলিষ্ণু শব্দ, হিয়ার একটা স্থান শব্দ। এই দুইয়ে মিল খায় না। তাই কাম হিয়ার বলতে নেই, বলতে হয় কাম হিদার। আমার এক ছাত্র নাইনটিন ফিফটিতে এক সাহেব কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিল কাম হিদার কথাটা বলে।

আমি বেশ মন দিয়ে শুনি এবং অকৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বলি, তাই নাকি?

দুঃখের সঙ্গে জগদীশবাবু বলেন, দিনকাল আর আগের মতো নেই। ছেলেমেয়েরা আজকাল মাস্টারমশাইয়ের কথা গ্রাহ্য করে কই? এখানকার ফার্স্ট বয়ের খাতাতেও দেখবেন নিখুঁত বাঁধা উত্তর। উদ্ভাবনা নেই, মাথা খাটানো নেই, চিন্তাশীলতা নেই, নাইনটিন ফর্টিনাইনে কিংবা কাছাকাছি কোনও বছরে ম্যাট্রিক রচনা এসেছিল—কোনও এক মহাপুরুষের জীবনী, মেদিনীপুরের এক ছাত্র সেই রচনায় নিজের বাবার কথা লিখেছিল। লিখেছিল—দীনদরিদ্র পাঠশালার অল্প বেতনের পণ্ডিত আমার বাবা। কোন ভোর থাকতে উঠে উনি পুজোপাঠ সেরে বাড়ির সামনে তেঁতুলের ছায়ায় শতরঞ্চি পেতে বসেন। তাঁর ছাত্ররা আসে, পুত্রবৎ স্নেহের সঙ্গে তাঁদের বিবিধ বিদ্যা শেখান তিনি। বিদ্যা বিক্রয় পাপ বলে কারও কাছ থেকে কোনও টাকা নেন না। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরেন, কিন্তু আমাদের সর্বদাই তিনি চরিত্রবান হতে বলেন। বড়ই অভাবের সংসার আমাদের, তবু আমার বাবাকে আমি কখনও উদ্বিগ্ন হতে দেখি না। তিনি শান্ত, নিরুদ্বেগ আত্মবিশ্বাসী। ক্লাসে যেতে কখনও এক মিনিটও দেরি হয় না তাঁর। আমাদের বাড়িতে কোনও ঘড়ি নেই, তবু বাবাকে দেখি সর্বদাই সময়নিষ্ঠ। সাহায্যের জন্য কেউ এসে দাঁড়ালে কখনও তাকে বিমুখ করেন না। কোথায় কোন মানুষের কী বিপদ ঘটল তাই খুঁজে খুঁজে বেড়ান। পরোপকার কথাটা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি বলেন, পৃথিবীতে পর বলে কেউ নেই। এইরকমভাবে নিজের বাবার কথা লিখে গেছে আগাগোড়া। শেষ করে বলেছে, আমার জীবনে দেখা এত বড় মহাপুরুষ আর নেই। রচনাটা পড়তে পড়তে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ির লোক আর পাড়াপড়শিকে ডেকে ডেকে পড়িয়েছি, চেঁচিয়ে বলেছি, আমার সোনার ছেলে রে। আমার গোপাল রে। পঁচিশের মধ্যে তাকে চব্বিশ দিয়েছিলাম, মনে আছে। সেই সব ছেলেরা কোথায় গেল বলুন তো!

বলে জগদীশ মাস্টারমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তাঁর দেখাদেখি আমিও। জগদীশবাবুর দুঃখ হতেই পারে। কারণ তাঁর একমাত্র সন্তান পশুপতি তাঁকে দ্যাখে না। একই বাড়িতে ছেলে আর ছেলের বউয়ের আলাদা সংসার, ভিন্ন হাঁড়ি। ছেলের প্রসঙ্গ উঠলে জগদীশবাবু শ্বাস ছেড়ে শুধু বলেন, কুপুত্র। কুপুত্র। যতদূর মনে হয়, পশুপতিকে কোনও মহাপুরুষের জীবনী লিখতে দিলে সে কোনওকালেই জগদীশবাবুর কথা লিখবে না।

হঠাৎ জগদীশবাবু গলার স্বরটা নিচু করে বললেন, দামড়াটা আপনার কাছে খুব আনাগোনা করে বলে শুনেছি।

আমি ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলি, আসেন টাসেন, মাঝে মাঝে।

জগদীশবাবু ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিসিয়ে বলেন, খুব সাবধান। একদম বিশ্বাস করবেন না। নিজের ছেলে, তাও বলছি।

আমি পশুপতির হয়ে একটু ওকালতি করে বলি, কেন? এমনিতে লোক তো খারাপ নন।

জগদীশবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, লোক খারাপ নয়! বলেন কী? কত লোকের যে সর্বনাশ করেছে। দামড়াটার জন্য সমাজে আমার মুখ দেখানোর উপায় নেই, সর্বদা তাই সঙ্গে ছাতা রাখি।

আমি আনমনে বললাম, ছাতা অনেক কাজে লাগে।

যথার্থই বলেছেন। ছাতার কাজ হয়, লাঠির কাজ হয়, আমি অনেক সময় বাজারের থলি না থাকলে ছাতায় ভরে আনাজপাতিও আনি, কিন্তু মুখ লুকোবার জন্য যে জগদীশমাস্টারকে একদিন ছাতার আশ্রয় নিতে হবে তা কখনও কল্পনা করিনি। কুপুত্র! কুপুত্র! ওর সংস্পর্শে আমার পর্যন্ত মর‍্যালিটি নষ্ট হয়ে গেছে, তা জানেন? ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমিই তো ওর হলে গার্ড ছিলাম। আমার চোখের সামনে দামড়াটা বই খুলে টুকছিল। দেখেও দেখলাম না। ধরলে আর-এ হয়ে যাবে। নিজের বিদ্যের জোরে পাশ করার মুরোদ নেই। শত হলেও নিজের ছেলে তো! দুর্বল হয়ে পড়লাম। এমনকী বাংলা পরীক্ষার দিন ব্যাকরণে মধ্যপদলোপীকে মধ্যপদলোভী লিখেছিল বলে সেটা পর্যন্ত কারেক্ট করে দিয়েছিলাম মনে আছে। তারপর থেকে আমি চাকরিতে মাস্টার হলেও জাতে আর মাস্টার নেই।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, ছেলেপুলের জন্য বাপ-মায়েদের অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, চরিত্র পর্যন্ত।— জগদীশবাবু বিষাক্ত গলায় বললেন, তবু কি হারামজাদার মন পেয়েছি নাকি? পাঁচটা পয়সা পর্যন্ত হাতে ধরে দেয় না কখনও। নাকের ডগায় বসে রোজ মাছ মাংস আর ভাল ভাল সব পদ বউ ছেলেপুলে নিয়ে খায়, কোনওদিন বাবা-মাকে একটু দিয়ে পর্যন্ত খায় না। সারাটা জীবন মাস্টারির আয়ে সংসার চালিয়েছি, ভালমন্দ তো বড় একটা জোটেনি। এই বয়সে একটু খেতে-টেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু খাব তার জো কী? গতকাল ডালনা খাব বলে এক জোড়া হাঁসের ডিম এনেছিলাম। আমার গিন্নি সে-দুটো সেদ্দ করে খোলা ছাড়িয়ে রেখেছেন ডালনা রাঁধবেন। এমন সময় বউমা বোধ হয় আবডালে থেকে ছোট নাতনিটাকে লেলিয়ে দিল। সে হাঁটি হাঁটি পায়ে এসে ঠাকুমার সামনেই থাবিয়ে ডিমদুটো খেয়ে চলে গেল। কিছু বলার নেই। নাতনি খেয়েছে। বুড়োবুড়ি রাতে ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে ভাত গিললাম শুকনো মুখে। বড় ছেলে তাকিয়ে সবই দেখল, তবু একটা আহা উহু পর্যন্ত করল না। রোজই এমন হয়। ভালমন্দ রেঁধে খেতেই পারি না। নাতি নাতনিদের লেলিয়ে দেয়।

জগদীশবাবু খুব সন্তর্পণে ছাতাটা একটু ফাঁক করে দেখালেন, ভিতরে কাগজে মোড়া বড় মাছের দুটো টুকরো রয়েছে। বললেন, কালবোশ খুব তেলালো মাছ। গিন্নিকে বলা আছে মশলা-টশলা করে রাখবে। একটু বেশি রাত হলে নাতি নাতনিরা যখন অঘোরে ঘুমোবে তখন রেঁধে দু'জনে খাব।

বলে মৃদু মৃদু হাসলেন জগদীশবাবু। জ্যোৎস্নায় তাঁর চোখে ভারী স্বপ্নের মতো একটা আচ্ছন্নতা দেখা গেল। মাছের কথা বলার পরই দাঁড়ালেন না, বিদায় না জানিয়েই কেমন যেন সম্মোহিতের মতো হেঁটে চলে গেলেন।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের একটেরে নির্জন ঘরটায় বসে বসে বাইরের প্রবল জ্যোৎস্নার বাড়াবাড়ি কাণ্ড দেখতে দেখতে আমি অনেকক্ষণ কোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম।

কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি তা খেয়াল নেই। গভীর রাতে লিচুদের হারমোনিয়ামটা যেন নিজে

নিজেই বেজে উঠল। খুব করুণ একটা গৎ ঘুরেফিরে বাজছে। মাঝে-মাঝে ফুটো বেলো দিয়ে হাঁফির টানের মতো ভুসভুসে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে বটে, তেমন মিঠে আওয়াজও হচ্ছে না। তবু সুরটা যে করুণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘুমের মধ্যেই আমি বললাম, কিছু বলছ?

আমি যে গান গেয়েছিলেম।

তাতে কী? সব হারমোনিয়ামই গান গায়। আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান তার বদলে তুমি...

প্রতিদান? তাও দিয়েছি তো! দুশো টাকা।

অর্ধেক ধরা দিয়েছি গো, অর্ধেক আছে বাকি...হারমোনিয়াম গাইতে লাগল।

কাটুসোনা

অনেকে মনে করে, অমিতের সঙ্গে আমার বুঝি ভাব-ভালবাসা আছে। তা মোটেই নয়।

এই শহরে কাছাকাছি থাকা হলে অনেকেই অনেকের চেনা হয়। তারপর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আমাদের দুই পরিবারেও অনেকটা তেমনি। তা বলে অমিতের সঙ্গে আমার তেমন গাঢ় ভাব কোনওকালেই ছিল না। কথা হয়েছে খুবই কম। আমার দাদার বন্ধু বলে কখনও-সখনও অমিতদা বলে ডেকেছি মাত্র। অমিতও আমাকে তেমন করে আলাদাভাবে লক্ষ করত না।

অমিত খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলে, দারুণ ছাত্র, সব বিষয়েই সে ভীষণ সিরিয়াস, কথাবার্তা বেশি না, যেটুকু বলে তা খুব ওজন করে। এখান থেকে সে স্কলারশিপ নিয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করে শিবপুরে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়। সেখানেও আবার দারুণ রেজাল্ট করে। তারপর যায় আমেরিকায়। সেখানেও সে আরও পড়েছে, এখন বড় চাকরি করছে টেকসাসে। আমেরিকায় যাওয়ার কথা যখন হচ্ছিল তখনই আমার হবু শাশুড়ি আর শ্বশুর একদিন খুব সাজগোজ করে মিষ্টির বাক্স নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন।

গিন্নি গিয়ে সোজা শোওয়ার ঘরে ঢুকে মাকে বললেন, তোমার কাটুকে আমার অমিতের জন্যে রিজার্ভ করে রাখলাম।

প্রস্তাব নয়, সিদ্ধান্ত। প্রস্তাবটা খুবই আচমকা, সৃষ্টিছাড়া। কেন না আমি তখন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছি, ঢ্যাঙা রোগাটে চেহারা। সুন্দরী কি না তা সেই খোলস বদলের বয়সে অতটা বোঝাও যেত না। এখন যায়।

আমার হবু শ্বশুর বাইরের ঘরে বাবাকে প্রায় হুকুম করে বললেন, ও মেয়েটার আর অন্য জায়গায় সম্বন্ধ দেখবেন না।

বাবা অবশ্য তেড়িয়া মানুষ, নিজের পছন্দ-অপছন্দটা খুব জোরালো। গম্ভীর হয়ে বললেন, কেন?

আমার অমিত কি ছেলে খারাপ?

অমিতের কথায় বাবা ভিজলেন। চরিত্রবান, তুখোড়, গুণী অমিতকে কে না জামাই হিসেবে চায়? বাবা গলাটলা ঝেড়ে বললেন, খুব ভাল। তবে কিনা আমেরিকায় যাচ্ছে শুনছি!

তা তো ঠিকই।

সেখানে গিয়ে যদি মেম বিয়ে করে!

হবু শ্বশুর খুব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন, এখনকার ছেলেমেয়েরা কি আগের দিনের মতো বোকা? এখন আর মেম দেখে তারা ন্যালায় না, বুঝলেন! হাজার-হাজার বাঙালি

ছেলে বিদেশে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে ক'টা মেম বিয়ে করছে আজকাল?

বাবা ঠোঁটকাটা লোক। বলেই ফেললেন, আহা, শুধু বিয়েটাই কি আর কথা! ও দেশে গেলে চরিত্রও বড় একটা থাকে না। বড্ড বেশি সেক্স যে ওখানে!

হবু শ্বশুর গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন ভায়া, তা যদি বলেন তবে গ্যারান্টি দিতে পারি না। অমিত ফূর্তি মারবার ছেলে নয়। যদি বা কারও সঙ্গে ফূর্তি মারে তবে তাকে শেষতক বিয়েও করবে। ছ্যাবলা নয় তো। তাই ওকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কিন্তু অঘটনের সম্ভাবনা খুব কম পারসেন্ট। আর যদি কাটুকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে যায় তবে চন্দ্র সূর্য ভেঙে পড়লেও করবেই!

বাবা ভেবেচিন্তে বললেন, টোপটা বড় জব্বর। না গিলে করিই বা কী। তা গিললাম।

ভাল করে গিলুন, যেন বড়শি খসে না যায়।

বাবার জেরা হল উকিলের জেরা। পরের মুহূর্তেই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কাটুকে আপনাদের পছন্দই বা কেন?

মেয়ের বাপের তো এ প্রশ্ন করার কথা নয়। তারা বলবে, মেয়ে আমাদের অপছন্দ করলেন কেন? এ তো উলটো গেরো।

আফটার অল, ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকা ভাল।

হবু শ্বশুর একটু বিপাকে পড়ে বললেন, আসলে কী জানেন, মেয়েটিকে বোধ হয় আমি ভাল করে দেখিওনি, পছন্দের প্রশ্ন তাই ওঠে না। তবে আমার গিন্নির ভীষণ পছন্দ।

বাবা হেসে উঠে বললেন, এ তো পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

হবু শ্বশুর গম্ভীর হয়ে বললেন, কথাটা ঠিকই। তবে খেতে খারাপ লাগে না। তা ছাড়া আমার মত হল, বিয়ের পর তো ঝগড়া করবে শাশুড়ি আর বউতে, তাই শাশুড়িরই বউ পছন্দ করা ভাল।

তবু কাটুকে আপনার নিজের চোখে একবার দেখা উচিত।

আহা, তার কী দরকার? ওসব ফর্মালিটি রাখুন। দেখার দরকার হলে রাস্তায় ঘাটেই দেখে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া ভাল করে দেখিনি বলে কি আর একেবারেই দেখিনি! শ্রীময়ী মেয়ে, অমিতের সঙ্গে মানাবে।

বাবা বিনয়ের ধার না ধেরে বললেন, আর একটা প্রশ্ন। ওকে যদি আপনাদের পছন্দই তবে অমিত আমেরিকায় যাওয়ার আগেই বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

শ্বশুরমশাই এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, সেটা কি উচিত হত? নিজের ছেলে সম্পর্কে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বলছি, অনেক দূর দেশে যাচ্ছে, সেখানে কী হয় না হয়, ভাল ভাবে ফিরতে পারে কি না কে বলবে! সেক্ষেত্রে একটা মেয়েকে দুর্ভোগে ফেলা কেন? আরও একটা কথা হল, বিয়ে হয়ে থাকলে দু'জনেরই মন টনটন করবে, উড়ু উড়ু হবে, বিরহ-টিরহ এসে ভার হয়ে বসবে বুকের ওপর। তাতে দু' জনেরই ক্ষতি।

বাবা এই দ্বিতীয় পয়েন্টটা খুব উপভোগ করলেন, হেসে বললেন, সে অবশ্য খুব ঠিক। আমি ওকালতি পরীক্ষার আগে বিয়ে করায় তিন বারে পাশ করেছিলাম।

শ্বশুরমশাই চিমটি কেটে বললেন, নইলে হয়তো ছয় বার লাগত।

এ সব কথা শুনে আমি সেদিন অবাক, কাঁদো কাঁদো। রেগেও যাচ্ছি। এ মা! আমার বিয়ে! আমি তো মোটে এইটুকু, সেদিন ফ্রক ছেড়েছি, এর মধ্যেই এরা কেন বিয়ের কথা বলছে? মাথা-টাথা কেমন ওলটপালট লাগছিল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব। মনে হয়েছিল, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই কোথাও।

বাইরের ঘরের পরদার আড়াল থেকে বাবা আর হবু শ্বশুরের কথা শুনে যখন চোখের জল মুছছি তখন চিনি এসে খবর দিল, মা ডাকছে।

গেলাম। শোওয়ার ঘরে বিছানায় দুই গিন্নি বসে। শাশুড়ি একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে

বসালেন। বললেন, পেট ভরে খাবে দু'বেলা। শরীর সারলে তোমার রাজরানির মতো চেহারা হবে।

এইটুকু হয়ে আছে আজ ক' বছর হল। বলতে নেই আমার শরীর সেরেছে। লোকে সুন্দরীই বলে। বাপের বাড়িতে আমার জীবনটা যেমন সুখে কাটছে শ্বশুরবাড়িতেও তেমনি বা হয়তো তার চেয়েও সুখে কাটবে।

তবে দুঃখও কি নেই? এই যেমন বাপি মরে যাওয়ার দুঃখ, পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ার দুঃখ, বিনা কারণে মন খারাপ হওয়ার দুঃখ। তবে এ সব তো আর সত্যিকারের দুঃখ নয়! আমি বেশ বুঝে গেছি, এই বয়সে আমার চেয়ে সুখের জীবন খুব বেশি মেয়ের নেই। সেইজন্যই আমার ওপর হিংসেও লোকের বড় কম নয়।

গরিব হলেও লিচুদের খুব দেমাক। ভাঙে তো মচকায় না। আমার সুখে ওর বুকটা যদি জ্বলত তবে এক রকম সুখ ছিল আমার। কিন্তু তা হওয়ার নয়। আজ পর্যন্ত ও অমিত আর আমার বিয়ে নিয়ে তেমন কিছু বলেনি। অমিতের মতো এত ভাল পাত্র যে হয় না তাও স্বীকার করেনি কোনওদিন।

বলতে নেই, লিচু দারুণ গান গায়। এই শহরে যত ফাংশন হয়, ও তার বাঁধা আর্টিস্ট। শিলিগুড়ি রেডিয়ো স্টেশনে বহুবার ওর গান হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, শিগগির কলকাতা থেকেও ডাক আসবে। প্র্যাকটিস করার জন্য ওর স্কেল চেঞ্জারের দরকার ছিল। কিন্তু সেটা হল না। পুরনো হারমোনিয়ামটা পাগলা দাশুকে দুশো টাকায় গছিয়েও স্কেল চেঞ্জারের দামের কানাকড়িও ওঠেনি।

আমিও ছাড়িনি। সে দিন নিউ মার্কেটে দেখা। এ কথা সেকথার পর বললাম, তোরা নাকি পুরনো হারমোনিয়ামটা বেচে দিয়েছিস?

শুনে মুখ চুন হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ, বীরেনবাবুর এক ভাইপো এসেছে কলকাতা থেকে, সে জোর করে কিনে নিল।

জোর করে কেন? তোদের বেচার ইচ্ছে ছিল না নাকি?

আমার ছিল না। মা তবু বেচে দিল।

কততে বেচলি?

দুশো টাকায়।

বাঃ, বেশ ভাল দাম পেয়েছিস তো!

আমরা দাম-টামের কথা বলিনি, উনিই ওই দাম দিলেন।

লোকটা বেশ সরল আর বোকা বোধ হয়!

কে জানে? তোর হবু দেওর, তোরই বেশি জানার কথা।

আমি ও বাড়িতে যাই বুঝি? লোকটাকে চোখেই দেখিনি।

লিচু এবার খুব একটা রহস্যময় হাসি হেসে বলল, দেখে নিস। দেখতে খারাপ নয়।

আমিও খোঁচা দিতে ছাড়িনি, যার ইন্টারেস্ট আছে সেই বুঝুকগে খারাপ কি ভাল। আমার দরকার নেই.

লিচু বেশ অহংকারের সঙ্গেই বলল, তবে আমি ঠিক করেছি হারমোনিয়ামটা নিয়ে ওঁর টাকাটা ফেরত দেব।

কেন? আরও বেশি দাম পাবি নাকি?

মোটেই না। বরং দামটা উনি বেশি দিয়েছেন বলেই ফেরত দেব।

তাতে লাভ কী?

সব ব্যাপারেই লাভ চাইলে চলবে কেন?

আমি একটু শ্লেষের হাসি হাসলাম। যাদের ঘটিবাটি বিক্রি করে খাওয়া জোটাতে হয় তাদের

মুখে দেমাকের কথা মানায় না। বললাম, তাই নাকি? শুনলেও ভাল লাগে।

লিচুর মুখ আবার চুন হল। মৃদুস্বরে বলল, উনি গান গাইতেও জানেন না। হারমোনিয়ামটা শুধু শুধুই কিনেছেন।

আমি তো শুনেছি, তোরা ওঁকে গান শেখাচ্ছিস।

সেটাও ওঁর মরজি। আমরা তো সাধতে যাইনি।

তবু শেখাচ্ছিস তো?

শিখতে চাইলে কী করব?

শেখাবি।— উদাস ভাব করে বললাম।

লিচু একটু রেগে গিয়ে বলল, আমরা শেখালে যদি দোষ হয়ে থাকে তবে তুই-ই শেখা না!

এটা আমাকে গায়ে পড়ে অপমান। আমি বাথরুমে একটু-আধটু গুনগুন করি বটে, কিন্তু সত্যিকারের গান জানি না। এই গান না জানা নিয়ে মল্লিকবাড়ির কর্তা গিন্নির একটু দুঃখ আছে। বীরেনবাবু এককালে এ শহরের নামকরা তবলচি ছিলেন। অমিত কিছুকাল কলকাতায় ক্ল্যাসিকাল শিখেছিল, তবে এখন আর গান গাইবার সময় পায় না।

তবে গান না জানায় আমার জীবনে তো কোনও বাধা হয়নি। একটু দুঃখ মাঝে-মাঝে হয় বটে কিন্তু সেটিও সত্যিকারের দুঃখ কিছু নয়। গান না জানাটাকেও আমি আমার অহংকারের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। সকলের তো গান জানার দরকার হয় না।

তাই আমি দেমাক করে বললাম, আমি শেখাতে যাব কেন? গানের মাস্টারি করে তো আমাকে পেট চালাতে হবে না। গান শেখা বা শেখানোর দরকারই হয় না আমার। আমাদের বাড়িতে বাইজিবাড়ির মতো সব সময়ে গান বাজনা হয়ও না।

লিচু কতটা অপমান বোধ করল জানি না। তবে মুখটা আরও একটু কালো হয়ে গেল। থমথমে গলায় বলল, কর্ণবাবুকে আমরা আর গান শেখাব না বলেও দিয়েছি।

পাগলা দাশুর নাম যে কর্ণ তা এই প্রথম জানলাম। কেউ তো বলেনি নামটা আমাকে। তবু সেই অচেনা মানুষটা যেহেতু আমার শ্বশুরবাড়ির দিককার লোক সেই জন্য ওঁর হারমোনিয়াম কেনা নিয়ে মনে মনে লিচুদের ওপর একটা আক্রোশ তৈরি হয়েছিল আমার। লিচুকে খানিকটা অপমান করতে পেরে জ্বালাটা জুড়োল।

আমি ভোরবেলায় উঠি বটে কিন্তু ভৈরবকাকার মতো ব্রাহ্মমুহূর্তে নয়। সেদিন মাকে বললাম, এবার থেকে আমি ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠব, আমাকে ডেকে দিয়ো তো।

উঠে কী করবি?

গলা সাধব।

মা একটু অবাক হলেও কিছু বলল না।

বাবাকে গিয়ে বললাম, আমার একটা স্কেল চেঞ্জার চাই।

বাবাও অবাক হয়ে বলল, কী করবি?

গান গাইব।

বাবা শুনে খুশিই হলেন। বাবা মানুষের কর্মব্যস্ততা পছন্দ করেন। কাজ না থাকে তো যা হোক কিছু করো, পরের কাজ টেনে নাও নিজের ঘাড়ে। সময় যেন বৃথা না যায়।

বাবা বললেন, কিন্তু তোকে শেখাবে কে?

কালীবাবুর কাছে শিখব। ওঁকে তুমি রাজি করাও।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্কেল চেঞ্জার এসে গেল। কালীবাবুও রাজি হলেন। উনি অবশ্য অ্যাডভান্সড ছাত্রছাত্রী ছাড়া নেন না, কিন্তু টাকা এবং প্রভাবে কী না হয়!

আমার গলা শুনে কালীবাবু খুব হতাশও হলেন না। বললেন, গলায় প্রচ্ছন্ন সুর আছে। শান দিলে

বেরিয়ে আসবে। সকালে আর বিকেলে কম করেও দু' ঘণ্টা করে গলা সেধো।

তা সাধতে লাগলাম। প্রথম দিকে বুকের জ্বালা, আক্রোশ, টেক্কা মারার প্রবল ইচ্ছেয় দু' ঘণ্টার জায়গায় তিন-চার ঘণ্টাও সাধতে লাগলাম।

কিন্তু গলায় প্রচ্ছন্ন সুর থাকলেও আমার ভিতরে গানের প্রতি গভীর ভালবাসা নেই। তাই গলা সাধার পর খুব ক্লান্তি লাগে। তবু ছেড়েও দিচ্ছি না।

খবর পেয়ে মল্লিকবাড়ির কর্তা একদিন এসে হাজির। বললেন, তবলাডুগি কোথায়? তবলচি ছাড়া কি গান হয়? দাঁড়াও আমিই পাঠিয়ে দেবখন। আমারটা তো পড়েই আছে।

ভাবী বউমা গান শিখছে জেনে ভারী খুশি হয়েছেন, ওঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। চিনি ছাড়া চা করে দিলাম। চুমুক দিয়ে বললেন, চমৎকার! সবই চমৎকার। কী চমৎকার তা অবশ্য ভেঙে বললেন না।

সেই দিনই ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে ডুগি তবলা এল। রিকশা থেকে চামড়ার ওপর গদির ঢাকনা দেওয়া পেতলের ডুগি আর তবলা নিয়ে ও বাড়ির চাকর নামল। তবলার সঙ্গে শাড়ির পাড় দিয়ে জড়ানো বিড়ে পর্যন্ত।

দেখে এমন লজ্জা পেলাম!

মল্লিকবাড়ির চাকর সর্বেশ্বর বলল, বাবু তো শিকদার তবলচিকে দিদিমণির জন্য ঠিক করেছেন। কালী গায়েনের সঙ্গে তিনিও আসবেন।

শুনে আমার হাত পা হিম হওয়ার জোগাড়। একেই কালীবাবুর কাছে গান শেখাটাই আমার আস্পদ্দা, তার ওপর শিকদার তবলচি। শিকদার হলেন এ জেলার সবচেয়ে ওস্তাদ লোক। কলকাতার সদারঙ্গ আর বঙ্গ সংস্কৃতিতেও বাজিয়েছেন। শোনা যায় কণ্ঠে মহারাজের কাছে শিখেছিলেন। দুই বাঘা ওস্তাদ আমার মতো আনাড়িকে শেখাতে আসবেন শুনে আমার গান সম্পর্কে ভয় বরং আরও বাড়ল।

বাড়ির লোকও আয়োজন দেখে কিন্তু-কিন্তু করছে। ব্যাপারটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তা আমিও টের পাচ্ছি। কিন্তু বড়শি গিললে আর কি ওগরানো যায়?

আমার রাশভারী দাদা বলল, এ যে একেবারে মাথা ধরিয়ে ছাড়লি রে কাটু!

বাঁটুল আর চিনিকে পড়াতে আসেন জগদীশ মাস্টারমশাই। এ বাড়ির বাঁধা প্রাইভেট টিউটর। ওঁর কাছে দাদা পড়েছে, আমিও পড়েছি। গান বাজনা শুনে উনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, এই তো চাই। কোয়ালিফিকেশন যত বাড়ানো যায় ততই মানুষের শক্তি বাড়ে। খুব গাও, গেয়ে একেবারে ঝড় তুলে দাও। সঙ্গে নাচও শিখে ফেলো। ছবি আঁকা, হোমিওপ্যাথি, ইলেকট্রিকের কাজ যা শিখবে তাই জীবনে কাজে লাগবে।

আমি হাসি চাপবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাঁটুল আর চিনি এমন বদমাশ যে, হি হি করে ওঁর মুখের সামনেই হেসে ফেলল। সেই দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়েও আমি হাসি সামলাতে পারলাম না।

জগদীশবাবু সরল মানুষ। হাসি দেখে নিজেও হাসলেন। বললেন, ইদানীং একটা গানের হাওয়া এসেছে মনে হচ্ছে। বীরেনবাবুর ভাইপোও গান শিখছে। চারদিকেই গান আর গান। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকেই গানের শব্দ কানে আসে।

আড়চোখে লক্ষ করি, জগদীশবাবুর জামার পকেট থেকে কাগজে মোড়া লটকা মাছের শুঁটকি উঁকি দিচ্ছে। সেইদিকে চেয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শহরের সব বাড়িতে সবাই গান গাইলে আমার আর গান শেখার মানে হয় না।

একদিন সকালে উঠে গলা সাধতে বসে হারমোনিয়ামটার দিকে ক্লান্তভাবে চেয়ে রইলাম। একদম ইচ্ছে করছে না গলা সাধতে।

ভৈরবকাকা প্রাতঃভ্রমণে বেরোচ্ছিলেন। আমি বললাম, আমিও যাব।

গলা সাধবি না?

একদিন না সাধলে কিছু হবে না। ফিরে এসে সাধব'খন।

চল তা হলে।

এক-একটা সময় আসে যখন ঘাড়ে ভূত চাপে। মাথাটা পাগল-পাগল লাগে। সারা শরীরে খুসখুস একটা ভাব। তখন বেহেড একটা কিছু করতে ইচ্ছে যায়। মনে হয় ঢিল মারি, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আবোল-তাবোল বলি, ছন্নছাড়া উন্মাদের মতো খুব নাচি, হঠাৎ গিয়ে রাস্তার লোকের কান মলে দিই, হোঃ হোঃ করে হাসি কিংবা হাউমাউ করে কাঁদি।

কোনও মানে হয় না, তবু এ রকম হয়। আজ সকালে আমার এ রকম হচ্ছিল।

ভৈরবকাকাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে আমি সত্যিই রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে এ বাড়ি সে বাড়ির ছাদে ছুড়ে মারতে লাগলাম। টিনের চাল না হলে শব্দ হয় না। কী করব, ধারে কাছে টিনের চালই নেই। তখন কাকভোরের মায়াবী অন্ধকারে আমি খোঁপা খুলে চুল এলো করে দিই, কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়াই, তারপর চৌপথিতে দাঁড়িয়ে ধিন ধিন করে খানিকটা বেতালা নেচে নিই।

শুলশুল ভাবটা তবু যায় না।

মনের মধ্যে লুকোনো দুষ্টুমি ছিলই। নইলে খামোকা আবার মল্লিকবাড়ির ফটক খুলে বাগানে ঢুকব কেন? ধরা পড়লে লজ্জার একশেষ। বাড়ির ভাবী বউয়ের কোমরে আঁচলবাঁধা এলোকেশী মূর্তি দেখলে কর্তা গিন্নি মূর্ছা যাবেন।

তবু কেন যে মনের মধ্যে এমন পাগল-পাগল! আমি গাছ মুড়িয়ে ফুল ছিঁড়তে থাকি। কোঁচড় ভরে ওঠে। তবু ছাড়ি না। ওদিকে আকাশ ফরসা হয়ে যাচ্ছে। লোকজন জেগে উঠছে। ফুল ছেড়ে আমি কয়েকটা গাছের নরম ডাল শব্দ করে ভেঙে দিলাম।

ধরা পড়ব? পড়েই দেখি না!

পাগলা দাশু

মেয়েটা যে চোর নয় তা আমি জানি। এর আগেও ওকে একদিন ফুল চুরি করতে দেখেছি। তবে ফুল চুরি সত্যিকারের চুরির মধ্যে পড়ে না বলে আমি ওকে ধরিনি।

লিচুদের হারমোনিয়াম ফেরত দিয়েছি। লিচুর বাবা আমাকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলেছেন বাকিটা পরে দেবেন।

পশুপতি সব খবরই রাখে। হারমোনিয়াম ফেরত দেওয়ার পরের দিন এসে এক গাল হেসে বলল, ও টাকা আর পেয়েছেন!

আমি বললাম, ওরা লোক খারাপ নয়।

আপনি ওদের কতটুকু চেনেন? আমি বহুকাল ধরে ওদের জানি।

কী জানেন?

জানি যে হারমোনিয়ামের টাকা আপনি ফেরত পাবেন না। ওই যে পঁচিশটা টাকা ঠেকিয়েছে ওই ঢের। বরং আমাকে অর্ধেক দামে দিলেও আপনার শতখানেক টাকা উসুল হত।

আমি একটু সন্দিহান হই। কেন যেন মনে হচ্ছে, টাকাটা আমি সত্যিই পাব না। তবু দৃঢ়স্বরে বলি, ওদের আত্মমর্যাদার বোধ বেশ টনটনে।

আপনি সবাইকেই ভাল দ্যাখেন। অভ্যেসটা খারাপ নয়। কিন্তু এটা ভালমানুষীর যুগ নয় কিনা।— বলেই পশুপতি আচমকা জিজ্ঞেস করে, লিচুকে আপনার কেমন লাগে?

আমি একটু থতমত খেয়ে বলি, হঠাৎ একথা কেন?

কারণ আছে বলেই জানতে চাইছি।— পশুপতি মিটিমিটি হাসে।

আমি পশুপতির মতলবটা বুঝতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করে বলি, খারাপ কী? ভালই তো।

কচু বুঝেছেন।

তার মানে?

পশুপতি একটা শ্বাস ফেলে বলে, বেশি ভেঙে বলতে চাই না তবে এবার থেকে লিচু বোধহয় আপনার কাছে একটু ঘন ঘন যাতায়াত করবে।

কেন?

যুবতী মেয়েদের দিয়ে অনেক কাজ উদ্ধার হয় কিনা। আপনি পাত্র হিসেবেও ভাল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, খোলসা করে বলুন তো! কাজ উদ্ধারের কথাটা কী?

দূর মশাই! এ তো আজকাল বাচ্চারাও বোঝে।

আমি বাচ্চাদেরও অধম।

পশুপতি কথাটা স্বীকার করে মাথা নাড়ল, সেটা মিথ্যে বলেননি। নইলে কেউ ভাঙা হারমোনিয়ামের জন্য দুশো টাকা দেয়! সে তো না হয় টাকার ওপর দিয়ে গেছে, কিন্তু এখন যে আপনার জীবন নিয়ে টানাটানি।

তার মানে?— আমি অবাক হই, একটু চমকেও যাই।

লিচুকে আপনার সঙ্গে ভজানোর তাল করেছে। লিচুর বাবা একটু গবেট বটে, কিন্তু মা অতি ঘড়েল। মতলবটা তারই।

বাজে কথা। ওরা ওরকম নয়।

পশুপতি মিটিমিটি হাসে। বলে, লিচুর মা লোক চেনে, যে মানুষ ভাঙা হারমোনিয়াম দুশো টাকায় কিনতে পারে সে কালো কুচ্ছিত মেয়েকেও বিনা পণে ঘরে তুলতে পারে। দুনিয়ায় কিছু বোকা লোক না থাকলে চালাকদের পেট চলত কী ভাবে?

আমি কথা খুঁজে না পেয়ে বলি, লিচু মোটেই কালো কুচ্ছিত নয়।

ও বাবা! তাহলে কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। পশুপতি খুব আহ্লাদের হাসি হেসে বলে, বলে কী! লিচু কালো কুচ্ছিত নয়? লিচুর মা সত্যিই লোক চেনে দেখছি!

আমি শ্লেষের হাসি হেসে বলি, আমি অত বোকা লোক নই।

না হলেই ভাল। সুপাত্ররা হচ্ছে উঁচু গাছের ফল। পাড়তে আঁকশি লাগে। মেহনত লাগে। শুধু লক্ষ রাখবেন যেন নজরটা ছোট করতে না হয়।

আপনার সন্দেহটা অমূলক। লিচু আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করেনি।

পশুপতি বলল, এবার করবে, যাতে আপনি টাকার তাগাদাটা না করতে পারেন। আপনি মল্লিকবাবুর ভাইপো, তায় ভাল চাকরি করেন। লিচু যদি আপনাকে ভজাতে পারে তো হারমোনিয়ামের ফেরত-টাকাটাও ঘরে রইল। ভাল জামাইও জুটল।

যাঃ!

পশুপতি নিচু স্বরে বলল, আমি ওদের হারমোনিয়ামটার জন্য গতকালই পঁচাত্তর টাকা অফার দিয়ে এসেছি। কিন্তু ওদের নজর আপনি উঁচু করে দিয়ে এসেছেন। পঁচাত্তর শুনে বাড়িশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। লিচুর মা এখন পৌনে দুশো হাঁকছে। যাক সে কথা। কাল ওই দরাদরির ফাঁকেই লিচুর মা বলে ফেলল, কর্ণবাবুর সঙ্গে লিচুকে বেশ মানায়। মনে হয় কর্ণবাবুরও লিচুকে পছন্দ।

আমি কথাটার মধ্যে খারাপ কিছু খুঁজে না পেয়ে বলি, তাতে কী হল?

এখনও কিছু হয়নি বটে, তবে সাবধান করে দিলাম। উঁচু গাছের ফল উঁচুতেই ঝুলে থাকবার

চেষ্টা করবেন। টুক করে যার তার কোঁচড়ে খসে পড়বেন না। আর একটা কথা।

কী?

টাকাটা যদিও ওরা দেবে না, তবু আপনি তাগাদা দিতেও ছাড়বেন না। আমার এক চেনা লোককে একবার পঁচিশটা টাকা ধার দিয়েছিলাম। মহা ধুরন্ধর লোক, ছ' মাস ঘুরিয়ে কুড়িটা টাকা শোধ দিল, পাঁচটা টাকা আর দেয় না। ভেবেছিল কুড়ি টাকা পেয়ে ওই পাঁচটা টাকা বোধহয় আমি ছেড়ে দেব। আমি কিন্তু ছাড়িনি। প্রতি সপ্তাহে গিয়ে তার দোকানে দেখা করেছি, চা খেয়েছি, গল্প করেছি, উঠে আসবার সময় বলেছি, আমার সেই পাঁচটা টাকা কবে দেবেন? মনে মনে জানতাম, দেওয়ার মতলব নেই, তবু তাগাদা দেওয়াটা ধর্ম হিসেবে নিয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর পরে লোকটা তিতিবিরক্ত হয়ে শেষ পাঁচটা টাকা একদিন ঝপ করে দিয়ে ফেলল। তাই বলছি, লোককে তাগাদা দিতে ছাড়বেন না। দেনাদারকে তার দেনার কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ দিতে নেই। সবসময়ে তাগাদায় রাখলে সে তার অন্যমনস্কতা বা কুমতলব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, সে আমি পারব না।

পশুপতি খুব আন্তরিকভাবে বলে, কথাটা অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখুন। যদি আপনার টাকাটা ওরা মেরেই দেয় তবে সেটা তো ওদের পাপই হল? জেনেশুনে একটা লোককে পাপের ভাগী হতে দেওয়াটা কি ভাল? শক্ত কাজ কিছু তো নয়!

তাগাদা দিতে আমার লজ্জা করবে। থাকগে টাকা।

পশুপতি স্নেহের সঙ্গে বলে, আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ। একটু শক্ত-পোক্ত না হলে, চক্ষুলজ্জা-টজ্জা বাদ না দিলে এই মতলববাজদের দুনিয়ার টিঁকে থাকবেন কী করে? কী করতে হবে তা শিখিয়ে দিচ্ছি। বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে হিলকার্ট রোডে লিচুর বাবার সাইকেলের দোকানে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হবেন। বৃষ্টি-বাদলার কথা বলবেন, বাজার দরের কথা বলবেন, চলে আসবার সময় খুব আলতো করে বলে আসবেন, সেই হারমোনিয়ামের টাকাটার কথা মনে আছে তো? ব্যস, ওতেই হবে। শুধু মনে করিয়ে দেবেন মাঝে মাঝে।

আমি চুপ করে আছি দেখে পশুপতি মিটিমিটি হেসে বলল, দাসীর কথা বাসি হলে কাজে লাগে। একটা পরামর্শ দিয়ে রাখি। লিচু যদি বেশি মাখামাখি করতে আসে, আর আপনিও যদি ভজে যান, আর তারপর যদি কখনও ওর হাত থেকে বাঁচবার জন্য আঁকুপাঁকু করেন তাহলে মাঝে মাঝে লিচুকেও টাকার কথাটা বলবেন। প্রেম কাটানোর এমন ওষুধ আর নেই। টাকার তাগাদা হল হাতুড়ির ঘা, আর প্রেম হল ঠুনঠুন পেয়ালা।

ব্যাপারটা এই পর্যন্ত হয়ে থেমে আছে। পশুপতির কথায় আমি গুরুত্ব দিইনি বটে কিন্তু ভারী একটা অস্বস্তি হচ্ছে সেই থেকে। গতকাল সকালেই লিচুর বাবা এসে ওঁদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর নেমন্তন্ন করে গিয়েছিল। আমি যাইনি অস্বস্তিতে। নিজের ওপর আমার কোনও বিশ্বাস নেই। এই সেদিনও হারমোনিয়ামটা কিনতে গিয়ে আমার মন 'কনে কই, কনে কই' বলে নাচানাচি জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমার কনে তো ঠিক হয়েই আছে, কতকাল ধরে। কলকাতার হিদারাম বাঁড়ুজ্জে লেনের সায়ন্তনীই আমার সেই ভাবী কনে। তবু যে আমার মন মাঝে মাঝে দুর্বল হয় তার কারণ বোধ হয়, সায়ন্তনী আর আমার মাঝখানে কয়েকশো মাইলের মাঠ-ঘাট, জল-জঙ্গল, নদী-নালার দূরত্ব। তারপর উত্তরের এই হিমালয়-ঘেঁষা জায়গাটার দোষ আছে। প্রথম প্রথম এখানে এসে আমার কলকাতার জন্য মন কেমন করলেও ধীরে ধীরে এ জায়গার বাতাসে একটা গভীর বনজঙ্গলের মাতলা গন্ধ, উত্তরে ভোরের ব্রোঞ্জ-রঙা পাহাড়ের ধীরে ধীরে রং পালটানো, উদাস আকাশ আমাকে নানা ব্যঞ্জন দিয়ে ধীরে ধীরে মেখে ফেলেছে। ছুটির দিনে নতুন নতুন পাহাড় আর জঙ্গল খুঁজতে গিয়ে এমন গভীর নির্জনতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। তাই ধীরে ধীরে কলকাতার কথা ভুলে যাচ্ছি। কলকাতার কথা মনে না পড়লে

কিছুতেই সায়ন্তনীর কথাও মনে পড়ে না। আর যত সায়ন্তনীর কথা মনে না পড়ে তত আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।

আজকাল আমি নিয়ম করে রোজ সকাল বিকেল দু' ঘণ্টা করে কলকাতা আর সায়ন্তনীর কথা ভাবতে চেষ্টা করি। ঠিক পরীক্ষার পড়ার মতো করে। কিন্তু খারাপ পড়ুয়া যেমন বারবার ঘ্যান ঘ্যান করে মুখস্থ করেও পড়া ভুলে যায়, আমারও অবিকল সেই অবস্থা।

আজও ভোরবেলা উঠে আমি জানালা দিয়ে ব্রোঞ্জ রঙের পাহাড়ের দিকে চেয়েই বুঝলাম, ওই চুম্বক পাহাড় রোজই একটু একটু করে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মগজ ধোলাই করছে। কলকাতাকে মনে হয় পিকিং বা আডেলেডের মতো দূরের শহর।

ফলে আজ সকালে আমি উঠে প্রথমে কিছুক্ষণ কলকাতার অলিগলি, আবর্জনা, ডবলডেকার, ট্রাম, মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া আর হাওড়ার ব্রিজের ছবি ধ্যান করলাম। খুবই অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া দেখাল। এরপর কিছুক্ষণ সায়ন্তনীর কথা ভাবতে গিয়ে আতঙ্কে আমার বুক হিম হয়ে গেল। কালও সায়ন্তনীর ছোট কপাল, থুতনি আর কানের বড় বড় লতি ধ্যানে দেখতে পেয়েছিলাম। আজ শুধু কপালটা ধ্যানে এল, বাকিটা একদম মনে পড়ল না। আগামীকাল যদি ধ্যানে সেই কপালটুকুও না আসে!

প্রাণপণে সেই কপালটাকেই যখন স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করছি তখনই ফটকে শব্দ। ফুলচোরের আগমন।

এই মেয়েটাকে আমি আগেও একবার ফুল চুরি করতে দেখেছি। কিছু বলিনি। আজও ভাবলাম কিছু বলব না। বাগান থেকে কিছু ফুল চুরি গেলে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমার মনের বাগানের সব ফুলই যে চুরি হয়ে গেল! কলকাতা নেই, সায়ন্তনী নেই! তবু যে কী করে বেঁচে আছি!

জানালাটা ভেজিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে রইলাম চোখ বুজে।

কিন্তু ফুলচোরের সাহস আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে। আমার জানালার নীচে দোলনচাঁপার গাছের নরম ডগাগুলো ভাঙছে মটমট করে, গন্ধরাজের গাছে প্রায় ঝড় তুলল কিছুক্ষণ, তারপর চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ মাড়িয়ে বাগানের পশ্চিমধারে কলাবতীর বনে ঢুকল মত্ত হাতির মতো।

এতটা সহ্য করা যায় না। তড়াক করে উঠে পড়লাম।

বাগানে যখন পা দিয়েছি তখন চারদিক বেশ ফরসা। সবই প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গন্ধরাজ গাছের পাশে ফুলচোরকেও জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এবং আশ্চর্যের কথা, ফুলচোরও আমাকে বড় বড় চোখে দেখছে। ভয় পাচ্ছে না, পালাচ্ছেও না।

চোর যদি চোরের মতো আচরণ না করে তবে যারা চোর ধরতে যায় তাদেব বড় মুশকিল।

চোরের সঙ্গে চোখাচোখি হলে কী বলতে হয় তা ভেবে না পেয়ে আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম! যেন দেখিনি। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বুঝতে দিলাম যে, সে এখন চলে গেলে আমি কিছু বলব না।

কিন্তু ফুলচোর গেল না। বরং পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ফুলচোর যথেষ্ট কাছে এসে গেছে।

ফুলচোর আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি পাগলা দাশু?

সত্য বটে, এখানকার চ্যাংড়া ছেলেরা আমার খ্যাপানো নাম রেখেছে পাগলা দাশু।

ফাজিল মেয়েটার দিকে আমি কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলি, আপনাকে এর আগেও আমি একদিন এই বাগান থেকে ফুল চুরি করতে দেখেছি। কী ব্যাপার বলুন তো!

ফুলচোর যথেষ্ট সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী। গন্ধরাজের বাগানে সে দাঁড়িয়ে। পিছনে ব্রোঞ্জ-রঙা পাহাড়, ফিরোজা আকাশ, গাছপালার চালচিত্র নিয়ে খুব ঢিলাঢালা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন গোটা দুনিয়াটাই ওর। ডোনট কেয়ার গলায় বলল, ফুল দেখলেই আমার তুলতে ইচ্ছে করে যে! কী করব বলুন।

তা কথাটা মেয়েটার মুখে মানিয়েও গেল। সুন্দরীদের হয়তো সবই মানায়। বলতে নেই, ফুলচোর দেখতে বেশ। পেট-কোঁচড়ে এক কাঁড়ি ফুল থাকায় গর্ভিণীর মতো দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু সেই সামান্য অপ্রাসঙ্গিক জিনিসটা উপেক্ষা করলে ফুলচোরের যথেষ্ট ফরসা রং, লম্বাটে প্রখর শরীর, নরুন দিয়ে চাঁছা তীব্র সুন্দর মুখখানা রীতিমতো আক্রমণ করে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ওর দৃষ্টিতে দুঃখহীন অকারণ আনন্দের উজ্জ্বলতা। হয়তো ফুলচোর রোজ ভাল খায় এবং হজম করে। হয়তো বড় ঘরের মেয়ে। সম্ভবত কোনওদিনই ও রাতে দুঃস্বপ্ন দ্যাখে না। ভাল বরও ঠিক হয়ে গেছে কি? নইলে এমন উজ্জ্বলতা চোখে আসার কোনও কারণ নেই। আমার মন বেহায়া বেশরম রকমে নেচে উঠে বলতে লাগল, এই কি কনে? এই কি কনে?

ফুল তোলা নিয়ে বার্নার্ড শ-এর একটা বেশ জুতসই কথা আছে। এই মওকায় কথাটা লাগাতে পারলে হত। কিন্তু আমার কখনও ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি মনে পড়ে না। এ বারেও পড়ল না। গম্ভীর হলে আমাকে চারলি চ্যাপলিনের মতো দেখায় জেনেও আমি যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বললাম, ও।

মেয়েটা খুব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল, রাগ করলেন?

বঙ্কিমের বিড়াল প্রবন্ধে একটা কথা আছে না: দুধ আমার বাপেরও নয়, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই। সুতরাং রাগ করিতে পারি না। এই ব্যাপারেও তাই। ফুল গাছের, তুলেছে ফুলচোর। এ ফুলে আমার বা কাকার যে অধিকার, ফুলচোরেরও তাই।

বললাম, না, রাগ করার কী?

মনে মনে ভাবলাম, কোনও খেঁদি-পেঁচি এরকম চোখের সামনে দিনেদুপুরে পুকুরচুরির মতো ফুল চুরি করতে এলে এত সহজে আমি কঠিন থেকে তরল হতে পারতাম না। মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যটা চোরদের একটা বাড়তি সুবিধে। ভাবলে, সৌন্দর্যটা সকলের পক্ষেই বেশ সুবিধাজনক। আদতে ওটা একটা ফালতু উপরি জিনিস। কেউ কেউ ওই ফালতু জিনিসটা নিয়েই জন্মায়, আর তারাই দুনিয়ার বেশির ভাগ পুরুষের মনোযোগ কব্জা করে রাখে। যারা সমান অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে বিস্তর মারদাঙ্গা, হামলা, আন্দোলন চালাচ্ছে তারা এ ব্যাপারটা বুঝতে চায় না। একজন সুন্দরীর যে অধিকার, একজন খেঁদি বা পেঁচি কোনওকালে সে অধিকার অর্জন করতে পারে না, প্রকৃতির নিয়মেই সমান অধিকার বলে কিছু নেই।

ফুলচোর করুণ মুখ করে বলল, তা হলে মাঝে মাঝে এ বাগানে ফুল তুলতে আসব তো! কিছু মনে করবেন না?

আমি বললাম, না, মনে করার কী?

বারবারই আমার মনে কী যেন পড়িপড়ি করেও পড়ছে না। সুন্দর বলে নয়, আমি ফুলচোরকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে বার বার দেখছি অন্য কারণে। মুখটা চেনা। ভীষণ চেনা। এক্ষুনি চিনে ফেলব বলে মনে হচ্ছে, অথচ স্পষ্ট মনে পড়ছে না।

মেয়েটি বলল, পাগলা দাশু বলেছি বলে কিছু মনে করেননি তো! আপনার একটা পোশাকি নামও যেন শুনেছিলাম কার কাছে! লিচু? হ্যাঁ লিচুই বলছিল সেদিন। কী যেন! কানমলা না ওরকমই শুনতে অনেকটা—কী যেন!

আমি ফাজিল মেয়েদের ভালই চিনি। কোনও কোনও মেয়ে এ ব্যাপারটাও নিয়েই জন্মায়। ফাজলামিতে তাদের ক্ষমতা এতই উঁচু দরের যে টক্কর দিতে যাওয়াটা বোকামি।

আমি বললাম, অনেকটা ওরকমই শুনতে। কর্ণ মল্লিক।

মেয়েটা আবার করুণ মুখ করল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। কী যে ভুল হয় না মানুষের। লিচুকে আপনি চেনেন? আমার বন্ধু। খুব বন্ধু আমার। আপনি লিচুদের হারমোনিয়াম কিনেছিলেন, তাও জানি।

আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, হারমোনিয়াম ফেরত দিয়েছি।

তাই নাকি? ও মাঃ, ফুলচোর তার চোখ কপালে তুলে বলল, তা হলে কী হবে! গান শেখা ছেড়ে দিলেন বুঝি?

মাথা নেড়ে বলি, ঠিক তা নয়। তবে অনেকটা ওরকমই। আসলে গান বোধ হয় আমার লাইন নয়।

করুণ মুখ করে ফুলচোর বলে, আমারও নয়। তবু শিখতে হচ্ছে, জানেন!

কেন?

বিয়ের জন্য!— ফুলচোর খুব হেসে বলল, গান না জানলে বিয়েই হবে না যে!

ফাজলামি বুঝে আমি গম্ভীর হয়ে বলি, কারও কারও বিয়ের জন্য না ভাবলেও চলে।

হাতে ভাল পাত্র আছে বুঝি?

ব্যথিত হয়ে বলি, থাকলেই বা কী? সুন্দরীরা সুপাত্রের হাতে বড় একটা পড়ে না।

ফুলচোর হেসে ফেলে এবং গজদন্ত সমেত তার অসমান দাঁত দেখে আবার মন উথাল পাথাল করতে থাকে। একে আমি কোথায় দেখেছি! ভীষণ চেনা মুখ যে!

ফুলচোর বলল, আমার কিন্তু ভীষণ সুপাত্রের হাতে পড়ার ইচ্ছে। সেইজন্যই কোয়ালিফিকেশন বাড়াচ্ছি। সুপাত্রের খোঁজ পেলে আমার জন্য দেখবেন তো!

সেজোকাকা উঠে পড়েছেন, টের পাচ্ছি! ভিতরবাড়িতে তাঁর হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। কাকিমা কাল রাতে বোধ হয় ত্রিফলার জল দিতে ভুলে গেছেন। সেজোকাকা চেঁচিয়ে বলছেন, এখন সকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে কী করে? কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে দিনটাই যে মাটি!

সুন্দরীদের এইসব প্রসঙ্গ না শোনাই ভাল। তারা-আলো আর বুলবুলির মতো জীবনের গাছে ডালে ডালে খেলা করবে। কোষ্ঠ পরিষ্কারের মতো বস্তুগত বিষয়ে তাদের না থাকাই উচিত।

আমি বললাম, আপনি এবার চলে যান। বেলা হয়েছে। আমার কাকা-কাকিমা উঠে পড়েছে।

ফুলচোর একটু ফিচকে হাসি হেসে কোঁচড়টা আগলে ফটকের দিকে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, আবার দেখা হবে কিন্তু।

হবেই তো। আমি জানি, দেখা হবে! বললাম, নিশ্চয়ই, রোজ আসবেন!

কাটুসোনা

সকালে কাক ডাকল কা, অমনি ফটকের কাছে ভিখিরিও ডাকল, মা!

বলতে কী সকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে ভিখিরির আনাগোনা। প্রথম আসে রামশংকর। আমার জন্মের আগে থেকে আজ পর্যন্ত সে সপ্তাহে ক্যালেন্ডার ধরে তিন দিন আসবেই। সে এলেই বুঝতে পারি, আজ হয় সোম, নয়তো বুধ, না হয়তো শনিবার। রামশংকরকে সবাই চেনে হাঁটুভাঙা রামা বলে। দিব্যি স্বাস্থ্য। দোষের মধ্যে তার হাঁটু সোজা হয় না। বাঁকা হাঁটু নিয়ে খানিক নিলডাউন হয়ে সে হাঁটে। বেশ জোরেই। রামার আবার তাড়া থাকে। একবার-দু'বার ডাকবে, মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ভিক্ষে না পেলে সে ভারী রাগারাগি শুরু করে দেয়, আরে, এইসন হোলে আমার চলবে? আমারও তো পাঁচঠো বাড়ি যেতে হোবে, তার পোরে তো পেট ভোরবে! এ হো দিদি, ও মাইজি, এ বুড়ঢা মাইজি, আরে ও খোকাবাবু...

ভিক্ষের চাল আলাদা একটা লোহার ড্রামে থাকে। তাতে জারমান সিলভারের একটা কৌটো।

ভরভরন্ত এক কৌটো চাল পেয়ে রামশংকর গেল তো এল অন্নদা বুড়ি। তার নাম অবশ্য অন্নদা নয়। ম্যাট্রিকুলেশন বেঙ্গলি সিলেকশনে ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা ছিল, অন্নদার জরতী বেশে ব্যাস ছলনা। অন্নদা যে বুড়ির বেশ ধরে ব্যাসদেবকে ছলনা করে নতুন কাশীকে ব্যাসকাশী বানিয়েছিলেন এই বুড়ি হুবহু সেইরকম। ফটকের কাছে বসে মাথার উকুন চুলকোবে, ঘ্যানর ঘ্যানর করে সংসারের দুঃখের কথা বলবে, ভিক্ষেটা বড় কথা নয় তার কাছে, কথা বলতে পারলে বাঁচে। ভৈরবকাকা তার নাম দিয়েছেন অন্নদা বুড়ি।

বোবা মুকুন্দ আসে রোববার আর ছুটির দিনে। লোকে বলে সে ফাঁসিদেওয়ায় এক ইস্কুলে দফতরির কাজ করে। ছুটিতে ভিক্ষে করতে বেরোয়। সেও এক কৌটো চাল নেয়। আর আসে ছেলে কোলে নিয়ে মানময়ী। বলতে কী মানময়ীও তার নাম নয়। বছরের পর বছর সে একটা বছরখানেক বয়সের ছেলে কোলে নিয়ে আসছে দেখে একদিন ঠাকুমার সন্দেহ হয়। ঠাকুমা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, বলি ও মেয়ে, তোমার কোলের বাচ্চাটি কি সেই আগেরটাই? না কি একে আবার নতুন জোগাড় করেছো? এই শুনে মানময়ী কেঁদে আকুল, আমার পুয়ে পাঁওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে এত কথা কীসের তোমাদের? না হয় ভিক্ষেই দেবে, তা বলে কি আমাদের মান নেই? সেই থেকে মানময়ী। তবে আমরাও জানি মানময়ীর কোলের বাচ্চার বয়স বাড়ে না। একজন একটু বড় হয় তো ঠিক সেই বয়সী আর একটাকে কোত্থেকে জোগাড় করে আনে। কিন্তু সে কথা বলবে এত বুকের পাটা কার?

বাঁধা ভিখিরি দশ-বারোজন। তাছাড়া উটকো ছুটকো আরও জনা বিশেক। কেউ শুধু হাতে ফিরবে না, মায়ের আর ঠাকুমার এই নিয়ম। পপি বেঁচে থাকতে সেও ভিখিরি দেখলে ঘেউ-ঘেউ করত না, বরং দৌড়ে এসে ভিতরবাড়ির খবর দিত।

ভিখিরি নানারকমের আছে। কেউ ফটকের ওপাশ থেকে হাত বাড়ায়, কেউ বা ভিতরবাড়িতেও আসে ভিখিরিপানা করতে। আমি বয়সে পা দিতে না দিতেই এরকম কয়েকজন ভিখিরির আনাগোনা শুরু হয়ে গেল।

একবার আমাদের পুরনো রেডিয়োটা খারাপ হওয়াতে হিলকার্ট রোড থেকে দাদা পল্টুদাকে নিয়ে এল।

পল্টুদা রেডিয়ো দেখবে কী, আমাকে দেখে আর চোখই সরাতে চায় না। সেদিনই মা'র সঙ্গে মাসিমা পাতিয়ে বাবাকে মেসো ডেকে ভিত তৈরি করে রেখে গেল। তারপর প্রায়ই সাইকেলে চলে আসে। পল্টুদার রেডিয়ো সারাই ছাড়া আর তেমন কোনও গুণ আছে বলে কেউ জানে না। বেশ মোটা থলথলে চেহারা। কথা বলার সময় শ্বাসের জোরালো শব্দ হয়। হাসিয়ে দিলে হেসে বেদম হয়ে পড়ে।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পল্টুদা বিস্তর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেচারা! কী দিয়ে চোখ টানবে তা বুঝতে না পেরে তার যে আর একটা মাত্র বাহাদুরি ছিল সেইটেই আমাকে দেখাতে চাইত। সেই বাহাদুরিটা হল খাওয়া। বকরাক্ষসের মতো এমন খেতে আমি আর কাউকে দেখিনি। মা আর ঠাকুমা লোককে খাওয়াতে ভালবাসে। পল্টুদা রোজ খাওয়ার গল্প ফাঁদে দেখে একদিন তাকে নেমন্তন্ন করা হল। দেড় সের মাংস আর সেরটাক চালের ভাত ঘপাৎ ঘপাৎ করে খেল পল্টুদা, আগাগোড়া আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে আর মৃদু মৃদু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে। খাওয়ার শেষে আমাকেই বলল, দেখলে তো কাটু, পারবে আজকালকার ছেলেরা এরকম? পঁচিশ খানা রুটি আর দুটো মুরগি আমি রোজ রাতে খাই।

মেয়েরা যে খাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করে না এটা পল্টুদাকে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। তাই এর পর থেকে পল্টুদা প্রায়ই বাইরে থেকে পাঁচ দশ টাকার তেলেভাজা কি পঞ্চাশটা চপ কিংবা পাঁচ সের রসগোল্লা নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসত। এ বাড়ির কেউ তেমন খাউন্তি নয়। দু'-চারখানা সবাই

মিলে হয়তো খেল, বাকিটা পল্টুদা। খেয়ে উদগার তুলে বলত, এখনও যতটা খেয়েছি ততটা আরও পারি। বুঝলে কাটু! খাওয়াটা একটা আর্ট!

পুরুষগুলো কী বোকা। কী বোকা! এরকম খেয়ে খেয়ে বছর দুইয়ের মধ্যে পল্টুদার প্রেসার বেড়ে দুশো ছাড়াল। রক্তে ধরা পড়ল ডায়াবেটিসের লক্ষণ। মাথার চুল পড়ে পাতলা হয়ে গেল। গায়ের মাংস দুল-দুল করে ঝুলতে লাগল। মুখে বয়সের ছাপ পড়ে গেল। ডাক্তারের বারণে খাওয়া দাওয়া একদম বাঁধাবাঁধি হল।

যখন আমি ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি তখন হঠাৎ একদিন অবনী রায় এসে হাজির। অবনীবাবু এ শহরের নামকরা পণ্ডিত লোক, ভাল কবিতা লেখেন, নিরীহ রোগা চেহারা। বয়স খুব বেশি নয়, তবে নিশ্চয়ই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। উদাস এবং অন্যমনস্ক মানুষ। চোখদুটো স্বপ্নে ভরা। এসে বাবার সঙ্গে বসে অনেক কথা-টথা বললেন। তারপর আমাকে আর চিনিকে ডাকিয়ে নিয়ে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করলেন। নিজে থেকেই আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকলেন, বইপত্র ঘাঁটলেন, দু'-চারটে পড়া জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বাবাকে বললেন, আপনার মেয়েরা ইংরিজিতে কাঁচা। ঠিক আছে, কাল থেকে আমি ওদের পড়াব।

বলতে কী সেই প্রস্তাবে বাড়ির লোক হাতে চাঁদ পেল। অবনী রায় প্রাইভেট টিউশানি খুব অল্পই করেন। কারণ তাঁর পয়সার অভাব নেই। ওঁর বাবা শহরের মস্ত টিম্বার মার্চেন্ট। তবু মাঝে মধ্যে লোকে ধরলে উনি ছেলেমেয়েদের পড়ান। কিন্তু যাদের পড়ান তারা দুর্দান্ত রেজাল্ট করবেই। এই জন্য অবনী রায়ের চাহিদা ভীষণ। মারোয়াড়িরা দুশো আড়াইশো টাকা পর্যন্ত দিতে চায় ছেলেমেয়েদের জন্য ওঁকে প্রাইভেট টিউটর রাখতে।

বাড়ির সবাই এই প্রস্তাবে খুশি হলেও আমি আড়ালে আপন মনে জ্বালাভরা হাসি হেসে ঠোঁট কামড়েছি। অবনী রায় আমার দিকে এক আধ ঝলকের বেশি তাকাননি। কিন্তু আমি তো কিশোরী মেয়ে। আমি পুরুষের দৃষ্টি বুঝতে পারি।

তখনও ফ্রকই পরি। কখনও-সখনও শাড়ি। অবনী রায় এসে সকালবেলা অনেকক্ষণ পড়াতেন। কখনও কোনও বেচাল কথা বলেননি, চোখের ইশারা করেননি বা প্রয়োজনের চেয়ে এক পলকও বেশি তাকাননি মুখের দিকে। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে বগড়ি পাখি ডাকত। টের পেতাম।

মাসের শেষে টাকার কথা তুলল বাবা। অবনী রায় মৃদু হেসে বললেন, হি হি! কাটু আর চিনিকে টাকার জন্য পড়াই নাকি?

অবনী রায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আর কথা চলে না। অমন সম্মানিত লোককে টাকার কথা বলাটাও অন্যায়।

এইট থেকে আমি সেকেন্ড হয়ে নাইনে উঠলাম। চিনি তার ক্লাসে ফার্স্ট হল। জগদীশবাবু তখনও বিকেলে আমাদের পড়াতেন। খুব দেমাক করে বলে বেড়ালেন, দেখলে তো! গাধা পিটিয়ে কেমন ঘোড়া করেছি! কিন্তু আমরা সবাই বুঝলাম কার জন্য আমাদের এত ভাল রেজাল্ট। জীবনে কখনও সেকেন্ড থার্ড হইনি আমি। সেই প্রথম।

ফাইনাল পর্যন্ত অবনী রায় আমাকে টানা পড়ালেন। আমি ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পেরোলাম। বাড়িতে উৎসব পড়ে গেল। বাবা একটা খুব দামি শাল কিনে এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, অবনীর বাড়িতে গিয়ে এটা দিয়ে প্রণাম করে আয়।

সেই সন্ধেটা বেশ মনে আছে। অবনীবাবু তাঁর ঘরে ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। সব সময় বই-ই পড়তেন। শালটা পায়ের ওপর রেখে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালাম। বরাবরই আমি একটু ফিচেল। বললাম, আমি নয়, আপনিই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছেন।

অবনীবাবু হাসিমুখে বললেন, কথাটার মানে কী দাঁড়াল?

আমি বললাম, আমার তো এত গুণ ছিল না। আপনিই করিয়েছেন।

অবনীবাবু হাসছিলেন মৃদু মৃদু। নিজের ভ্রু-র চুল টানার একটা মুদ্রাদোষ ছিল। দু' আঙুলে ডান দিকের ঘন ভ্রু-র চুল টানতে টানতে বললেন, তা হলে তোমার আর আমার মিলিত প্রচেষ্টারই এই ফল।

নিশ্চয়ই।

এই প্রথম অবনী রায় প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, এই মিলিত প্রচেষ্টা যদি বজায় রাখতে চাই তা হলে কি তুমি রাজি হবে?

আমি তো প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। দু'-আড়াই বছর ধরে ওঁর কাছে পড়বার সময় মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মন বলত অন্য কোনও ব্যাপার আছে। কাজেই অবাক হইনি। তবু মুখটা বোকার মতো করে বললাম, কলেজের পড়াও পড়াবেন? খুব ভাল হয় তা হলে।

আমি সে কথা বলিনি। আমি তোমাকে পড়াব না। কিন্তু পড়ানো ছাড়াও কি অন্য সম্পর্ক হতে নেই? আরও ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়তা!

এ কথার জবাব হয় না। আমি তখন সতেরো বছরের যুবতী। উনি চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। বিয়ে করেননি বটে, তা বলে তো আর খোকাটি নন। আমি কথা না বলে আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসি।

পরদিন সকালেই শহরের একজন বিশিষ্ট প্রবীণ ভদ্রলোক মন্মথবাবু এসে হাজির। বাবার সঙ্গে হরেক কথা ফেঁদে বসলেন। তারপর বললেন, অবনী কাটুকে পড়াত। তা বলতে নেই, কাটু একরকম অবনীরই সৃষ্টি। পাত্রও চমৎকার। এমন পাত্র পাওয়া বিরাট ভাগ্য। আপনার ভাগ্য খুবই ভাল যে, অবনী এত মেয়ে থাকতে কাটুকেই পছন্দ করেছে। কাটুরও বোধ হয় অপছন্দ নয়। এখন আপনাদের মত হলেই শুভকাজ হয়ে যেতে পারে।

এই প্রস্তাবে বাড়ির সবাই একটু অবাক হল বটে, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় যে অবনী রায়ের মতো পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথাই। শোনা যাচ্ছে, অবনী অক্সফোর্ডে রিসার্চ করতে যাচ্ছেন, বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবেন। বাড়িতে সেই রাত্রে আলোচনা সভা বসল। অবনী রায়ের বয়স নিয়ে একটু খুঁতখুঁতুনি থাকলেও প্রস্তাবটা কারও অপছন্দ হল না। বয়সটাই তো বড় কথা নয়, অমন গুণের ছেলে ক'টা আছে?

বাড়ির সকলের মত হলেও আমি রাজি নই। যতবার অবনী রায়কে স্বামী হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করেছি ততবার কেন যেন গা চিড়বিড়িয়ে উঠেছে। মনটা আক্রোশে ভরে গেছে। কেন লোকটা আমাকে বিয়ে করতে চায়? কেনই বা লোভের বশে আমাকে বিনা পয়সায় পড়াতে এসেছিল? দু'-আড়াই বছরের ঘটনা যত ভাবলাম ততই মনটা বিরুদ্ধে দাঁড়াল। গা ঘিন ঘিন করল।

আমি স্পষ্ট করেই বাড়ির লোককে বলে দিলাম, না।

আমার বাবা মা কেউই আমার মতের ওপর মত চাপাল না। বাবা পরের দিন মন্মথবাবুকে একটু নরম সরম করে, প্রলেপ মাখিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমাদের অমত ছিল না, কিন্তু কাটুরও তো একটা মত আছে। ও এত শিগগির বিয়েতে রাজি নয়। সবে তো ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। তা ছাড়া পড়াশুনোরও ইচ্ছে খুব।

মন্মথবাবু বাবার কথাকে পাত্তাই দিলেন না। বললেন, আরে ওটুকু মেয়ের আবার মতামত কী? এ সুযোগ কি আবার আসবে? অবনীরও তো আর আইবুড়ো থাকা চলে না। পড়াশুনো করবে বেশ ভাল কথা। সে তো অবনীও চায়। বিলেতে গিয়ে পড়াবেই তো। ঠেকছে কোথায় তা হলে?

বাবা এ কথায় খুব ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। কিছু বলার ছিল না। কয়েকদিন বাদে অবনী রায়ের মা বাবা আমাকে দেখতেও এলেন। দু'জনেই কিছু গম্ভীর। আমি সামনে যেতে চাইনি, কিন্তু বাড়ির সম্মান এবং ওঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ভেবে যেতে হল। সামনে গিয়ে বুঝলাম, অবনী রায়ের

মা বাবাও এই সম্বন্ধ তেমন পছন্দ করছেন না। ভদ্রলোক চুপ করেই রইলেন, ভদ্রমহিলা দু'-চারটে কাটা ছাঁটা কথা বললেন, অবনীর তো কত ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে সব মেয়েই তো যেতে চায়। ছেলের মতিগতি কিছু বুঝতে পারি না বাবা...ইত্যাদি। একটু ফাঁকাভাবে উনি আমাকেই জানিয়েই দিচ্ছিলেন যে, অবনী রায়ের মাথা খেয়ে কাজটা আমি ভাল করিনি।

অবনী অবশ্য আর কখনও আমাদের বাড়িতে আসতেন না। আমার সঙ্গে দেখা করারও কোনও চেষ্টা করতেন না, সেদিক দিয়ে খুব ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু মন্মথবাবু রোজ আসতেন তাগাদা দিতে, বলতেন, কই মশাই, আপনারা এমন নিস্তেজ হয়ে থাকলে চলবে কেন? উদ্‌যোগ নেই কেন? পাকা কথার দিন স্থির করুন। আশীর্বাদ হয়ে যাক।

আমি বাড়ির লোককে আবার বললাম, না।

অবশেষে বাবা মন্মথবাবুকে বলতে বাধ্য হলেন, কাটু রাজি নয়। তবে আমাদের অমত নেই। আপনারা কাটুকে রাজি করাতে পারলে আমরাও রাজি। মেয়ের অমতে কিছু করতে পারব না।

সেই থেকে শুরু হল মন্মথবাবুর আমাকে রাজি করানোর প্রাণপণ চেষ্টা। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রবীণ মানুষও এসে জুটলেন। কলেজে, পাড়ায় গোটা শহরেই রটে গিয়েছিল, অবনী রায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। রাগে, আক্রোশে আমার হাত-পা নিশপিশ করত। কারা রটিয়েছিল জানি না, কিন্তু তাদের মতলব ছিল। সেই সময় অবনী মন্মথবাবুর হাত দিয়ে আমাকে প্রথম একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটা না পড়েই আমি মন্মথবাবুর চোখের সামনে ছিঁড়ে ফেলে দিই।

অবনী বুঝলেন, আমি সত্যিই রাজি নই। চিঠি ছিঁড়ে ফেলার এক মাসের মধ্যেই অবনী বিয়ে করলেন গার্লস স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী অমিতাদিকে। যেমন কালো, তেমনি মোটা। তার ওপর দাঁত উঁচু, ঠোঁট পুরু এবং যথেষ্ট বয়স্কা। অমিতাদিকে বেছে বের করে অবনী বিয়ে করেছিলেন বোধ হয় আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই। নইলে ওরকম কুচ্ছিত মেয়েকে বিয়ে করার অন্য কোনও মানেই হয় না।

বিয়ের নেমন্তন্নে আমরা বাড়িসুদ্ধু সবাই গিয়েছিলাম। অবনীবাবু আমাকে ভিতরের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে একগোছা রজনীগন্ধা হাতে দিয়ে বললেন, কার সঙ্গে আমার বিয়ে হল জানো তো!

জানি। অমিতাদি।

অবনীবাবু হাসছিলেন। সেই মৃদু অদ্ভুত হাসি। বললেন, মোটেই নয়। বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখো।

ভেবে দেখার কিছু ছিল না। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বিরক্ত হয়েছিলাম মাত্র।

অবনীবাবু অমিতাদিকে নিয়ে বিলেত যাননি। কালিম্পং-এর একটা মিশনারি স্কুলে দু'জনে চাকরি করেন।

এইরকম ভিখিরির হাত বার বার আমাকে চেয়েছে। সব কথা বলতে নেই। বলা যায়ও না। কারণ আমি তো সব ভিখিরিকেই ফিরিয়ে দিইনি। এক একটা ডাকাত ভিখিরি আসে। হম্বিতম্বি করে কেড়ে নিয়ে যায়।

বাইরে থেকে আমাকে যতই সুখী আর শান্ত দেখাক, ভিতরে ভিতরে আমার অসহ্য ছটফটানি। যতই ভিতরের উতরোল সেই ঢেউ চেপে রাখি ততই আমি বদমেজাজি হতে থাকি, মন তত খিচড়ে থাকে। এই ছটফটানি কোনও কাম নয়, প্রেমও নয়। শুধু এই বাঁধানো সুন্দর জীবন থেকে একটু বাইরে যাওয়া, একটু বেনিয়মে পা দেওয়ার ইচ্ছে।

আমার ভিতরে এক বদ্ধ পাগলির বাস। সারাদিন হোঃ হোঃ করে হাসতে চায়, হাউমাউ করে কাঁদতে চায়। তার ইচ্ছে একদিন রাস্তার ধুলো খামচে তুলে সারা গায়ে মাখে। মাঝে মাঝে সে ভাবে, যাই গিয়ে নাপিতের কাছে বসে ন্যাড়া হয়ে আসি। রাস্তার ওই যে নাক উঁচু একটা লোক যাচ্ছে দৌড়ে গিয়ে ওর নাকটা একটু ঘেঁটে দিলে কেমন হয়? নিজের গায়ে চিমটি দিলে খুব লাগে? দিয়ে দেখি তো একটু! উঃ বাবা! জ্বলে গেল! মদ খেয়ে যদি মাতাল হই একবার! যদি সাতজন

বা-জোয়ান মিলিটারি আমাকে তাদের ব্যারাকে টেনে নিয়ে যায়!

এইসব নিয়মভাঙা কথা সেই পাগলি সব সময়ে ভাবছে। যত ভাবে তত গা নিশপিশ করে, হাত-পা শুলশুল করে, মন গলায় দড়ি বাঁধা হনুমানের মতো নাচতে থাকে।

মল্লিকবাড়ি থেকে সকালে যে একরাশ ফুল চুরি করে এনেছিলাম তা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই ছিঁড়েছি, ছিটিয়েছি। চুরির কোনও মানেই হয় না।

পাগলা দাশু একদম স্মার্ট নয়, কে বলবে কলকাতার ছেলে! জলজ্যান্ত আমাকে সামনে দেখে একদম ঘাবড়ে গিয়েছিল! পুরুষের চোখ আমার ভীষণ চেনা, ওর নজর দেখেই বুঝে গেছি ও আর একটা ভিখিরি। পাগলা দাশু জানে না যে, ও আমার ভাবী দেওর। জানলে হয়তো আজ সকালে একটা প্রমাণই পেয়ে যেতাম।

আমাদের বাড়িতে এতকাল প্রেশার কুকার ছিল না। মা আর ঠাকুমা দু'জনেরই ওসব আধুনিক জিনিস অপছন্দ। তাঁরা সাবেকি ঠাটেই বেশি স্বস্তি পায়। তবু কাল রাতে বাবা একটা বিরাট প্রেশার কুকার কিনে এনে বলল, সকলেই বলছে, এ হল একটা স্ট্যাটাস সিম্বল। রান্নাও নাকি চমৎকার হয়, খাদ্যগুণ বজায় থাকে, সময় কম লাগে।

শুনে ভৈরবকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, সব জোচ্চোর। তোমাকে যাচ্ছেতাই বুঝিয়ে, কৃত্রিম অভাববোধ তৈরি করেছে। এটাই হল এখনকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি। মনোহারী বিপণিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি রোজ দেখি, গাড়ল মানুষগুলো এসে যত আননেসেসারি জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফটার শেভ লোশন, টুথপিক, মাস্টার্ড, কর্নফ্লেক্স, আইব্রো পেনসিল, লিপস্টিক, লোমনাশক, শ্যাম্পু, মাথা-মুন্ডু। পকেটের পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। ফিটকিরি দিয়ে যে কাজ হয়ে যায়, তার জন্য গুচ্ছের টাকা দিয়ে গাড়ল ছাড়া আর কেউ আফটার শেভ কেনে? সোজা কথা তোমার প্রয়োজন থাক বা না থাক তোমার প্রয়োজনের বোধটা জাগিয়ে দিতে পারলে ইউ বিকাম এ পারফেক্ট গাড়ল।

ভৈরবকাকা আমাদের কাকা নয়, আত্মীয়ও নয়, বাবার চেয়ে বয়সে অন্তত দশ বছরের বড়। তবে অনাশ্রিত ভালমানুষ ভৈরবকাকা বহুকাল আমাদের সংসারে আছেন। আমাদের আপন কাকাদের চেয়ে ভৈরবকাকা কম আপন নন। যশোরে কিছু জমিজমা ছিল। সম্পত্তি বদল করে আমবাড়ি ফালাকাটায় বেশ অনেকটা চাষের জমি পেয়েছেন। খানিকটা বাস্তুভিটেও। সেই আয়ে তাঁর চলে, আমাদের সংসারেও অনেক দেন। বিয়ে-টিয়ে কোনওকালে করেননি। এক জমিদারের মেয়েকে সে আমলে ভালবেসে ফেলেছিলেন কিন্তু বিয়ে না হওয়ায় সতেরোবার দেবদাস পড়ে মদ খাওয়া ধরলেন। মদ সহ্য হল না, আমাশা হয়ে গেল। তারপর নামলেন দেশের কাজে। বিস্তর বেগার খেটে কখনও মশানাশিনী ক্লাব, কখনও কখনও কচুরিপানা উদ্ধার সমিতি, কখনও ম্যালেরিয়া অভিযান সংঘ, কখনও সর্বধর্ম সৎকার সমিতি বা কখনও নিখিল ভারত শীতলপাটি শিল্পী মহাসংঘ তৈরি করেছেন। কোনওটাই টিকে নেই। তবে অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করেন। তাঁর ভয়ে এখনও এ বাড়ির কেউ টুথপেস্ট বা টুথব্রাশ ব্যবহার করে না। দাঁতন বা ঘুঁটের ছাই দিয়ে আমরা দাঁত মাজি। লিপস্টিক পারতপক্ষে মাখি না। তবে লুকনো একটা থাকে, বিয়েবাড়ি-টাড়ি যেতে গোপনে লাগিয়ে যাই।

আজ সকাল থেকে ভৈরবকাকা আবার প্রেশার কুকারের পিছনে লেগেছেন। তার অবশ্য কারণও আছে। প্রেশার কুকারে রান্না হবে বলে বাবা আজ বাজার থেকে দুই কেজি খাসির মাংস এনেছে। অত মাংস আমরা দু'দিনেও খেয়ে ফুরোতে পারব না। মাংসের পরিমাণ দেখে মাও চেঁচামেচি করছে। বাবা কিছু অপ্রতিভ।

ভৈরবকাকা বললেন, ওই যে গল্প আছে না, এক সাধু লেংটি বাঁচাতে বেড়াল পুষল, বেড়াল খাওয়াতে গোরু কিনল, আর ওই করতে করতে ঘোর সংসারী হল! এ হল সেই প্রস্তাব। প্রেশার

কুকার কিনলে তো মাংস আনতে হল। এই কাঁড়ি মাংস বাঁচাতে এরপর না আবার তুমি ফ্রিজ কিনতে ছোটো!

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে, ফ্যাদরা প্যাঁচাল পেড়ো না তো ভৈরবদা। প্রেশার কুকারটা বেশ বড় বলেই আমি একটু বেশি মাংস কিনে ফেলেছি। না হয় নিজেরা আজ একটু বেশি করেই খাব। বেয়াই বাড়িতেও পাঠানো যাবে।

ভৈরবকাকা চটে উঠে বললেন, তোমার খুব টাকা হয়েছে, না? তাই ওড়াচ্ছো? কেন প্রেশার কুকার ছাড়া এতদিন কি আধসেদ্ধ ডাল আর আধকাঁচা মাংস খেয়ে এসেছ!

এসব কথায় মা ঠাকুমা ভৈরবকাকার পক্ষে।

বাবাকে একা দেখে আমি তার পক্ষ নিয়ে বললাম, মানুষের শখ বলেও তো একটা জিনিস আছে! টেকনোলজি যত ডেভেলপ করবে তত আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন চাই।

হুঃ।— ভৈরবকাকা রাগে গরগর করতে করতে বলে, ওসব হচ্ছে বিজ্ঞাপনের শেখানো কথা। আরও কত কথা আছে! বলে কিনা, প্রেশার কুকার হল নারীদের রান্নাঘর থেকে মুক্তি। ফ্রিজ মানে জিনিসের সাশ্রয়। এসব হচ্ছে অটোসাজেশন। মানুষের মগজে কথাগুলো ক্রমে ক্রমে সেট করে দেওয়া। উন্মাদের মতো কাছা খুলে মানুষ জিনিসও কিনছে বাপ!

প্রেশার কুকার হুইসিল দিতেই মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, ও বাবা, এ আবার ফেটে-ফুটে না যায়। কাটু তুই বরং দ্যাখ। আমার অভ্যেস নেই।

মাংস রাঁধতে গিয়ে কী করে যে মনটা আবার ভাল হয়ে গেল কে জানে!

পাগলা দাশু

আমি একটা পাথরের চাতালে বসে আছি। বহু নীচে বাগরাকোটে যাওয়ার পিচের রাস্তার একটা বাঁক মাত্র চোখে পড়ে। তারও হাজার ফুট নীচে কোনও শাখানদীর জল সরু সুতোর মতো দেখা যায়। কিছুক্ষণ আগে বাগরাকোটমুখো এক লরি থেকে নেমে আমি যখন এই পাহাড়টা আবিষ্কার করতে শুরু করেছিলাম তখন এক কাঠুরে, পাহাড় থেকে নামবার মুখে আমাকে বলল, সাবধানে যাবেন। ওপরে একটু আগেই আমি মস্ত এক সাপ দেখেছি। সাপের ভয়ে আমি থেমে থাকিনি। বর্ষায় পিছল সরু একটু পথের আভাস মাত্র পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে। আলগা মাটি আর নুড়ি পাথরে কেডসে রবার শোল কামড়ে ধরে না বলে বারবার পা হড়কে যায়। ক্রমশ ভার হয়ে ওঠে চায়ের ফ্লাস্ক, জলের বোতল আর পাউরুটি এবং কলা বওয়ার ঝোলা ব্যাগ। লোহার নাল বসানো লাঠিখানা পর্যন্ত বোঝা বলে মনে হয়। মেঘভাঙা চড়া রোদের গরমে সারা গা ঘামে সপসপে ভেজা। শ্বাস ঘন ও গরম। বুকে হাঁফ।

অনেকটা উঠে এই পাথরের জিভ বের করা ব্যালকনি পাওয়া গেল। বেশির ভাগ গাছ লতা বা ঝোপ আমি চিনি না, বহু ফুল জন্মেও দেখিনি, বহু নতুন রকমের পাখির ডাক কানে আসছে। তাই যে কোনও পাহাড়ে ওঠাই আমার কাছে আবিষ্কারের মতো। পাহাড়ের চূড়া ঘন জঙ্গলে ঢাকা। তাই আর কতটা আমাকে উঠতে হবে তা বুঝতে পারছি না। তবে উঠব। উঠবই।

ফ্লাস্কের ঢাকনায় চা ঢেলে চুমুক দিই। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। উঁচু থেকে আমি দক্ষিণের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকি। দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের খাঁড়ির ভিতর দিয়ে বহুদূরে এক ফালি সমতল দেখা যায়। রোদে ধু ধু করা, দিগন্ত পর্যন্ত গড়ানো। এদিকে কলকাতা, যেখানে আমার জন্ম, যেখানে আমি এতকাল বেড়ে উঠেছি একটানা। হায়, আজ সকালে কলকাতার স্মৃতি আরও আবছা হয়েছে মনে করতে গিয়ে দেখি, ধর্মতলা দিয়ে মহানন্দা বয়ে যাচ্ছে। হাওড়ার পোলের ওপর

পঞ্চাজের বাগান। শ্যামবাজারের দিকে বিশাল, নীলবর্ণ পাহাড় উঁচু হয়ে আছে। সায়ন্তনীর কপালটাও আজ মনে পড়ল না। যতবার ভেবেছি ততবারই দেখি, খুব ফরসা চেহারার একটা মেয়ে, লম্বাটে চেহারা, চোখদুটো ভীষণ উজ্জ্বল। সায়ন্তনী ওরকম নয় মোটেই। সে ছোটখাটো রোগা, শ্যামলা এবং সাধারণ। জোর করে আবার মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে যে শ্যামলা এবং ছোটখাটো মেয়েটিকে দেখতে পেলাম সেও সায়ন্তনী নয়। ভাল করে লক্ষ করলে হয়তো লিচুর মুখের আদল আসত। আমি তাই ভয়ে চোখ খুলে ফেলি।

কাল লিচুদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর নেমন্তন্ন ছিল। হারমোনিয়াম ফেরত দেওয়ার পর এই প্রথম ওদের বাড়ি যাওয়া। বাড়িতে কাল অনেক এন্ডিগেন্ডি কাচ্চা-বাচ্চা আর গ্রাম্য মহিলাদের ভিড় হয়েছিল। দু' বাটি শিন্নি খাওয়ার পর লিচু আমাকে এসে চোখ পাকিয়ে বলল, কী হচ্ছেটা কী? কাঁচা আটার শিন্নি অত খেলে পেট খারাপ করবে যে।

আমি জীবনে কখনও শিন্নি খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কলকাতার বাড়িতে বা আশেপাশে কখনও সত্যনারায়ণ পুজোও হয়নি, বললাম, খেতে বড় ভাল তো!

ভাল বলেই কী? শিন্নি অত খেতে নেই।

আমি হতাশ হয়ে বাটিটা ফেরত দিই। কাঁঠাল, আম আর নারকেল মেশানো চমৎকার জিনিসটা আমি আরও দু' বাটি খেতে পারতাম। বললাম, তাহলে থাক।

অমনি আমার ওপর মায়া হল লিচুর। বলল, আহা রে, কিন্তু কী করি বলুন তো? এ জিনিস আপনাকে বেশি খাওয়াতে পারি না।

লিচু গিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই আবার ফিরে এল।

বলল, সত্যিই আরও খেতে ইচ্ছে করছে?

আমি লাজুক মুখে বললাম, না, থাকগে।

দেখুন তো, আপনার আরও শিন্নি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, অথচ আমি আপনাকে খেতে দিইনি শুনে মা খুব রাগ করছে।

খচ্ করে একটা অম্বলের ঢেঁকুর উঠল। পেটটাও বেশ ভরা ভরা লাগছিল ততক্ষণে। আমি বললাম, আমি আর খাবও না।

লিচু আমার মুখের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অম্বল হয়নি তো! দাঁড়ান জোয়ান এনে দিই।

আবার দৌড়ে চলে গেল। জোয়ান নিয়ে ফিরে এল।

কিছুক্ষণ বাদে এসে আবার জিজ্ঞেস করল, এখন একটু ভাল লাগছে? বড় বাটির দু' বাটি শিন্নি, যা ভয় হচ্ছে না আমার।

এক ঘর লোকের মধ্যেই এইসব করল লিচু।

মাঝখানে একবার ওর বাবা এসে খুব হেঁঃ হেঁঃ করে গেল খানিকক্ষণ। বলল, ঘরদোর আজ সব লিচুই সাজিয়েছে। বড় কাজের মেয়ে।

ঘরদোরে অবশ্য সাজানোর কোনও লক্ষণ ছিল না। তবু আমি মাথা নেড়ে হুঁ দিলাম।

এক ফাঁকে লিচুর মাও এসে দেখা করে গেলেন। বললেন, নিজে সবাইকে যত্ন আত্তি করতে পারছি না বাবা, কিছু মনে কোরো না। লিচুর ওপরেই সব ছেড়ে দিয়েছি। সে তোমার যত্ন আত্তি করেছে তো? তুমি অবশ্য ঘরের লোক।

এই সব কথাবার্তা এবং হাবভাবের মধ্যে আমি সুস্পষ্টই একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাই। পশুপতি খুব মিথ্যে বলেনি হয়তো।

সত্যি কথা বলতে কী, লিচুকে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু কেন খারাপ লাগে না তাই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে আজকাল। নিজের ওপরে ক্রমে রেগে যাই। লিচুকে খারাপ লাগাই তো উচিত, তবে কেন খারাপ লাগছে না আমার! চোরা নদীর স্রোতে তবে কি

তলে তলে ভূমিক্ষয় হল আমার! এরপর একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ব?

জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল কাল। ফিরে আসার সময় লিচু আমাকে অনেকটা এগিয়ে দিল।

এখানকার জ্যোৎস্নাও কী সাংঘাতিক! সার্চ লাইটের মতো এমন স্পষ্ট ও তীব্র জ্যোৎস্না আমি খুব বেশি দেখিনি। এ যেন চাঁদের বিস্ফোরণ। আদিগন্ত পাহাড় পর্বত জ্যোৎস্নার মলমে মাখা। সেই জ্যোৎস্নায় পরির ছদ্মবেশ ধরেছিল লিচু। বলল, আপনার জন্য আমাকে সেদিন কাটুর কাছে কথা শুনতে হল।

আমি অবাক হয়ে বলি, কাটু আবার কে?

ও মা! অমিতদার ভাবী বউ, রায়বাড়ির মেয়ে। চেনেন না?

না তো। কেউ আমাকে বলেনি। অমিতদার কি বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?

কবে!— লিচু হেসে বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয়ও নেই! সত্যি বললেন?

আমি মিথ্যে বড় একটা বলি না।

লিচু খুব চোখ টেরে বলল, কিন্তু আপনার জন্য খুব দরদ দেখলাম যে। আপনি না চিনলেও কাটু আপনাকে ঠিকই চেনে। কত কথা শোনাল আপনার হয়ে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার হয়ে তোমাকে কথা শোনানোর কী? কেনই বা শোনাচ্ছে?

সেই হারমোনিয়াম।

হারমোনিয়ামের পাট তো চুকে গেছে। আমি গান গাওয়া ছেড়েও দিয়েছি। আর এ হল আমার নিজের ব্যাপার, এতে অন্য কারও মাথা ঘামানোর কথা নয়।

কাটু হয়তো ভাবী দেওরের স্বার্থ ভেবেই বলেছে।

মেয়েটাকে চিনিয়ে দিয়ো। বকে দেব।

ও বাবা!— লিচু ভয়-খাওয়া হাসি হেসে বলল, কাটুকে বকার সাহস কারও নেই। যা দেমাক!

খুব দেমাক নাকি?

ভীষণ। অবনী রায়ের মতো পাত্রকেই পাত্তা দেয়নি।

দেমাক তোমারও আছে। আমি মেয়েদের দেমাক পছন্দ করি।

আহা, আমার দেমাক দেখলেন কোথায়?

দেখেছি। যার আছে সে বোঝে না। অবনী রায়টা কে?

শচীবাবুর ছেলে। বিরাট বড়লোক। তার ওপর খুব শিক্ষিতও বটে। কাটু হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল ওঁর জন্যই তো! সেই কৃতজ্ঞতাবোধটুকু পর্যন্ত কাটুর নেই। বয়সের অবশ্য একটু তফাত ছিল, কিন্তু তাতে কী?

কাটুর জায়গায় তুমি হলে অবনী রায়কে বিয়ে করতে?

লিচু মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আমাকে চোখের ছোবল মারল। বলতে নেই লিচুর চোখদুটি বিশাল। বলল, হঠাৎ আমার কথা কেন?

সব জিনিস নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভাবতে হয়, তবে বোঝা যায় অন্যে কেন কোন কাজটা করল বা করল না।

লিচু হেসে বলল, কাটুর মতো কপাল কি আমার! আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ বিয়েই করতে চায়নি। তাহলে কী করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভাবব বলুন!

আমি বললাম, এ কথাটা সত্যি নয় লিচু।

লিচু মাথা নিচু করল হঠাৎ। তারপর মাথা তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আমরা একটা মাঠের ভিতর পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে হাঁটছিলাম। সকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাঠে অল্প-স্বল্প কাদা ছিল। দু'ধারে দুটো সাদা বাঁকাচোরা গোলপোস্ট। জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছিল চারিধার।

লিচু ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ, চেয়েছিল। তাতে কী?

তুমি কি তাদের পাত্তা দিয়েছ?

লিচু মাথা নেড়ে হেসে বলে, পাত্তা দেওয়ার মতো নয়।

আমি শ্বাস ফেলে বললাম, দেমাক কারও কম নয় লিচু।

দুই গোলপোস্টের মাঝামাঝি জ্যোৎস্নার কুহকে আমাদের মতিচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। লিচু টলটলে জ্যোৎস্নায় ধোয়া স্বপ্নাতুর দুই চোখ তুলে তাকাল। জাদুকর পি সি সরকার করাত দিয়ে মেয়ে কাটার আগে যেভাবে তাকে সম্মোহিত করতেন অবিকল সেই সম্মোহন আমার ওপর কাজ করছিল।

লিচু ধরা গলায় বলল, দেমাক। আমাদের আবার দেমাক! কী আছে বলুন তো আমার দেমাক করার মতো?

দেমাকের জন্য কিছু থাকার দরকার হয় না। শুধু দেমাক থাকলেই হয়। দেমাক থাকা ভাল লিচু, তাহলে আজেবাজে আমার মতো লোক কাছ ঘেঁষতে পারে না।

ভুল হয়েছিল, বড় ভুল হয়েছিল ওই কথা বলা। জ্যোৎস্না ঢুকে গিয়েছিল মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে। চোখের সম্মোহন ছিল বড়ই গভীর। মাথায় ছিল বিভ্রম।

লিচু ঠিক সেন্টার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ তুলে স্পষ্ট করে চাইল আমার দিকে। বলল, তাই বুঝি?

আমি একটা সাদা গোলপোস্টের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। ওই গোলপোস্টে আমার হাত ফসকে কতবার গোলে বল ঢুকে গেছে। ছেলেরা বলে, পাগলা দাশু এত গোল খায় যে বাড়িতে গিয়ে আর ভাত খেতে হয় না।

আমি বললাম, তাই নয় বুঝি?

লিচু মাথা নত করে বলল, আমি বুঝি তোমাকে ঘেঁষতে দিই না? আর কীভাবে বোঝাব বলো তো? বোকা কোথাকার!

এত সুন্দর গলায় বলল যে, জ্যোৎস্না আর একটু ফরসা হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, আকাশ থেকে চাঁদটা গড়িয়ে পড়ল মাঠের মধ্যে। পড়ে লাফাল বার কয়েক। কে যে চাঁদটাকে ফুটবলের মতো শট করল তা বোঝা গেল না। কিন্তু পশ্চিম ধারের গোলপোস্টে সেটা কোনাকুনি ঢুকে গেল বিনা বাধায়। আমি হাত বাড়িয়েও গোল আটকাতে পারলাম না।

কিন্তু নেপথ্যে একটা গলার স্বর বারবার আমাকে কী যেন প্রম্পট করছিল। ফিসফিস করে খুব জরুরি গলায় বলছিল, বলুন। বলুন। এই বেলা বলে ফেলুন।

লিচু নতমুখ তুলে একটু হাসল।

আমি হাত বাড়িয়ে লিচুর একটা হাত ধরলাম। গলা আমারও ধরে এসেছে। বুকের মধ্যে ঘন শ্বাস। বললাম, লিচু, আমি যে তোমাকে...

ঠিক এই সময়ে আমার মাথার মধ্যে লাউড স্পিকারের ভিতর দিয়ে প্রম্পটার বলে উঠল, না! না! মনে নেই কী শিখিয়ে দিয়েছিলাম!

আমি চিনলাম। আমার মাথার মধ্যে প্রম্পট করছে পশুপতি। পশুপতি তাড়া দিয়ে বলল, আহাঃ! টাকার কথাটা বলুন। বলুন!

আমি লিচুর দিকে চেয়ে যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা গিলে ফেলে নতুন করে বললাম, লিচু, তোমার বাবার কাছে আমি এখনও একশো পঁচাত্তর টাকা পাই।

লিচুর হাত চমকে উঠে খসে গেল আমার মুঠো থেকে।

আমি ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করি এবং পাথরের চাতাল ছেড়ে আবার পাহাড়ে ওঠা শুরু করি। এর চূড়ায় আমাকে উঠতেই হবে।

রাস্তাটা আর দেখতে পাই না। গাছের গোড়ায়, পাথরে বহুকালের পুরোনো শ্যাওলা।

লতাপাতায় জড়ানো ঘন গাছের জঙ্গল। পথ নেই। ডাইনে বাঁয়ে খুঁজে অবশেষে আমি একটা ঝোরার সন্ধান পেয়ে যাই। এখনও তেমন বর্ষা শুরু হয়নি বলে জলধারা প্রবল নয়। ঝিরঝির করে কয়েকটা সরু ধারা নেমে যাচ্ছে। খাত বেয়ে আমি উঠতে থাকি। বড্ড খাড়াই। পা রাখার জায়গা পাই না। ফলে আবার জঙ্গলে ঢুকে যেতে হয়। আদাড় বাদাড় ভেঙে প্রাণপণে শুধু উঁচুতে ওঠা বজায় রাখি।

কিন্তু না উঠলেই বা কী?

পায়ের ডিম আর কুঁচকিতে অসহ্য শিরার টান টের পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে কথাটা ভাবি। উপরে উঠে আমি কিছু পাব না। না পাহাড় জয়ের আনন্দ, না ব্যায়ামের সুফল।

উপর থেকে একটা ঘন্টানাড়া পাখির ডাক আসছিল। তীব্র, উঁচু একটানা, অবিকল পুজোর ঘণ্টার মতো। সেই ধ্বনির মধ্যে বারবার একটা 'না না না না' শব্দ বেজে যাচ্ছে। জীবন কিছু না, প্রেম কিছু না, অর্থ কিছু না, মায়া মোহ কিছুই কিছু না।

আমি মাটিতে রাখা কেডস জোড়ার দিকে চেয়ে থাকি নতমুখে। কিছুই নেই, তবু জীবন তো যাপন করে যেতেই হয়। আমি একটু দম নিই, তারপর ধীরে ধীরে আবার উঠতে থাকি।

যখন চড়াই শেষ হল তখন বুঝতে পারলাম, আমি চূড়ায় উঠেছি। একরত্তি দম নেই বুকে, শরীরে এক ফোঁটা জোরও নেই আর। কপাল থেকে বৃষ্টির মতো ঘাম নামছে, পিঠ বুক বেয়ে ঘামের পাগলা ঝোরা। চারদিকে ঘন কালচে সবুজ জঙ্গল। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। এতদূর উঠে কোনও তৃপ্তি বা আনন্দও বোধ করি না। কেবল শরীর আর মন ভরা বিরক্তিকর এক ক্লান্তি।

ছোট একটা চৌকো পাথর হয়ে তার ওপর বসলাম। মনের মধ্যে ঘোর এক বৈরাগ্য ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে লাগল। বুঝতে পারছি, আমি আর কলকাতার কেউ নই, কলকাতাও আমার কেউ নয়। বুঝতে পারি, আমি সায়ন্তনীকে ভালবাসি না, লিচুকেও না।

ভাবতে ভাবতে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ি।

দিন সাতেক বাদে আবার ফুলবাগানে চোর এল। আমি আজকাল সকালে উঠে কলকাতা বা সায়ন্তনীর কথা ভাববার চেষ্টা করি না। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলে জানালার কাছে বসে ব্রোঞ্জ রঙের পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকি। ঘোর অন্ধকার থেকে ক্রমে ফিকে অন্ধকার। আকাশের গায়ে পাহাড় হঠাৎ আবছা জাহাজের মতো জেগে ওঠে। আমার সমস্ত শরীরে ভয় আর শিহরন খেলে যায়।

আস্তে আস্তে ব্রোঞ্জ সোনা হয়, তারপর রুপোর রং ধরে।

আজ অবশ্য দেখার কিছুই ছিল না। গত সাতদিন এক আদিম হিংস্র বৃষ্টি গিলে রেখেছিল শহরটাকে। এই শহর যথেষ্ট উঁচু বলে বন্যা হয় না। তবু রাস্তায় ঘাটে জল জমে আছে। আশপাশ থেকে পাহাড়ি নদীতে ভয়াবহ বানের খবর আসছে। শহর ডুবছে, গাঁ ডুবছে, চাষের জমিতে গলা বা মাথা ছাড়িয়ে জল।

কাল রাতে বৃষ্টি ছেড়েছে। তবু ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা, উত্তরে পাহাড় বলে যে কিছু ছিল তা আর বোঝাই যায় না। তবু অভ্যাসবশে আমি রোজই উঠে বসে থাকি ভোরে।

আজও যেমন, মেঘলা দিনের মলিন ভোরের আলো কষ্টেসৃষ্টে অনেক চেষ্টায় যখন চারদিক সামান্য ভাসিয়ে তুলেছে তখনই ফুলচোর এল। আগের বারের মতোই ডাকাবুকো হাবভাব। শব্দ করে ফটক খুলল, চোরদের মতো ঢাক গুড়গুড় নেই। ভয় ভীতি নেই। এ কেমন চোর?

ধরা পড়ার ভয়ে বরং আমিই দেয়ালের দিকে সরে দাঁড়িয়ে চুপিসারে দেখতে থাকি। আজ কীই-বা চুরি করবে ফুলচোর? বাগানে গোড়ালি-ডুব জল, জলের নীচে থকথকে কাদা। হিংস্র বৃষ্টিতে একটাও আস্ত ফুল টিঁকে থাকতে পারেনি গাছে। বহু গাছ শুয়ে পড়েছে মাটিতে। জলে আধাডোবা, কাদায় মাখামাখি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ফুলচোর আমার জানালার ধারের ঝুমকো লতার ঝোপের মধ্যে মাথা নিচু করে ঢুকে আসে যে! চুপি চুপি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

শুনছেন?

সেই ডাকে আমার হাত পা কেঁপে ওঠে। ধরা পড়ে যাই। জানালার সামনে সরে এসে বলি, শুনছি! বলুন।

আপনি জেগে ছিলেন?

আমি খুব ভোরে উঠি। এ সময়টায় রোজ আমি পাহাড় দেখি।

তবে আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন কেন?

চোর ধরার জন্যই লুকোতে হয়।

ফুলচোর হাসল একটু। বলল, কিন্তু আমি তো ধরা পড়তে ভয় পাই না, পালিয়েও যাই না। আমাকে ধরতে লুকোতে হবে কেন?

কথাটা ভেবে দেখার মতো। বাস্তবিকই তো আমি চোর ধরার জন্য লুকোইনি, লুকিয়েছি চোরেরই ভয়ে। কিন্তু সেটা কবুল করি কী করে? এ চোরও আলাদা ধাতের। কোথায় আমি চোরকে জেরা করব, তা নয় চোরই উল্টে আমার নিকেশ নিচ্ছে। আমি একটু দুর্বল গলায় বলি, কথাটা ঠিক, আপনি পালান না। তার মানে, হয়তো আমার কাকা কাকিমার সঙ্গে আপনার চেনা আছে।

বাব্বাঃ, ভীষণ বুদ্ধি তো আপনার। এতই যদি বুদ্ধি তবে বলুন লুকোলেন কেন?

সেটা বলা শক্ত। হঠাৎ আপনাকে দেখে কেন যেন লুকোতে ইচ্ছে হল।

ফুলচোর হি হি করে হাসে। বলে, সাধে কি লোকে নাম দিয়েছে পাগলা দাশু!

আমি কথাটা শুনি না শুনি না করে পাশ কাটিয়ে বলি, আজ কী চুরি করবেন? দেখুন, বাগানটার দুর্দশা!

আপনার সাজানো বাগান কি শুকিয়ে গেল?— ফুলচোর এখনও হাসছে।

একটা বড় শ্বাস হঠাৎ বেরিয়ে যায় বুক থেকে। জবাব দিই না। কোনও জবাব মাথায় আসছেও না। ফাজিল মেয়েদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়াটাই বোকামি।

ফুলচোর গলা একটু মাখো মাখো করে বলে, গান শেখা ছেড়েছেন, ফুটবলের মাঠে যান না, সাইকেলেও চড়তে দেখা যায় না আজকাল; আপনার কী হয়েছে বলুন তো!

আমি ফুলচোরের ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছি আজ! তবে কি ফুলচোর আমার প্রেমে পড়েছে! এই ভোরে সেই ভালবাসাই জানাতে এল। আমার মাথার ভিতরে হঠাৎ পশুপতির গলার স্বর প্রম্পট করতে থাকে, বলে ফেলুন! বলে ফেলুন! ভালবাসা একেবারে ছানার মতো ছেড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই বলার নেই আমার। ফুলচোরের বাবাকে আমি টাকা ধার দিইনি। ওর বাবা কে তাই জানি না। পশুপতি ভুল পার্ট প্রম্পট করছে।

আমি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, আজ আপনি ফুল চুরি করতে আসেননি।

তবে কী করতে এসেছি?

আপনার অন্য মতলব আছে।

আছেই তো!

আমার সম্পর্কে এত খবর আপনাকে কে দিল?

খবর জোগাড় করতে হয়।

কেন জোগাড় করতে হচ্ছে?

আমার মতলব আছে যে।

আপনি একটু বেশিরকম ডেসপারেট।

সেটাও সবাই বলে। নতুন কথা কিছু আছে?— ফুলচোর মুখে ভালমানুষি মাখিয়ে বলে।

আছে।— আমি গম্ভীর ভাবে বলি, এর আগে আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি।

ফুলচোর হি হি করে হেসে বলে, আমারও তাই মনে হয়,জানেন। মনে হয় যেন, কত কালের চেনা।

আমার গা জ্বলে যায়। বলি, কী বলতে এসেছেন বলুন তো!

রাগ করলেন?

না, সাবধান হচ্ছি। আমার কাকা কাকিমাও আরলি রাইজার। যে কোনও সময়ে এদিকে এসে পড়তে পারেন।

ও বাবা!

বলে ফুলচোর চকিতে একবার চারদিক দেখে নেয়। এখনও যথেষ্ট আলো ফোটেনি। আবছা আলোর মধ্যে এখনও ভুতুড়ে দেখাচ্ছে গাছপালা, ঘরবাড়ি। ফুলচোর আমার দিকে আবার মুখ ফিরিয়ে বলে, লিচুর সঙ্গে কি আপনার ঝগড়া হয়েছে?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার?

লিচু ভীষণ কাঁদছে যে।

কাঁদছে! কেন কাঁদছে?

তার আমি কী জানি? পাড়ার লোকে বলছে, আপনার সঙ্গে নাকি ওর ভাব ছিল।

মোটেই নয়।

ফুলচোর আচমকা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ন্যাপথালিন খেলে কি লোকে মরে?

আমি জানি না। কেন?

লিচু ন্যাপথালিন খেয়ে মরার চেষ্টা করেছিল। হাসপাতালে পর্যন্ত নিতে হয়।

উদ্বেগের সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করি, বেঁচে আছে তো!

আছে। কিচ্ছু হয়নি। বেশি খায়ওনি। হাসপাতালে পেটে নল ঢুকিয়ে সব বের করে দিয়েছে।

মরতে চেয়েছিল কেন?

বোধহয় আপনার জন্য। অবশ্য ভেঙে কিছু বলছে না।

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, এতক্ষণ ইয়ার্কি না করে এই সিরিয়াস খবরটা অনেক আগেই আপনার দেওয়া উচিত ছিল।

আপনার সঙ্গে যে আমার ইয়ার্কিরও একটা সম্পর্ক আছে।

তার মানে?

পালাই, আপনার অত ভয়ের কিছু নেই। লিচু ভাল আছে।

কিন্তু ইয়ার্কির সম্পর্ক না কী যেন বলছিলেন।

না, বলছিলাম যে, আমি ভীষণ ইয়ার্কি করি। বাড়িতে তার জন্য অনেক বকুনিও খাই। বলে ফুলচোর আবার হি হি করে হাসে। তারপর বলে, লিচু কিন্তু খুব কাঁদছে।

তার আমি কী করতে পারি?

আপনি কি ওকে রিফিউজ করেছেন?

রিফিউজের প্রশ্ন ওঠে না। ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আমি একজনকে অলরেডি ভালবাসি!

তাই বলুন! বাব্বা! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

কেন?

আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি লিচুকেই বুঝি বিয়ে করবেন!

বিয়ে অত সস্তা নয়।

আপনার লাভার কি কলকাতার মেয়ে?

হ্যাঁ।

খুব স্মার্ট?
তা জেনে কী হবে?
বলুন না। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।
স্মার্ট বটে, তবে আপনার মতো নয়।
দেখতে?
তাও আপনার মতো নয়। রূপটাই কি সব?
সে অবশ্য ঠিক। গায়ের রং কেমন? খুব ফরসা?
না। শ্যামলা। আপনার পাশে দাঁড়ালে কালোই বলবে লোকে।
লম্বা?
লম্বা আপনার মতো নয়। অ্যাভারেজ।
রোগা?
হ্যাঁ, বেশ রোগা।
বোধ হয় পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট?
একদম নয়। তবে গ্র্যাজুয়েট।
বয়স?
আমার প্রায় সমান। আপনার তুলনায় বুড়ি।
বারবার আমার সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন কেন?
খুশি করার জন্য! মেয়েরা অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দেখতে ভালবাসে।
আচ্ছা, আচ্ছা। এবার বলুন তার নাম কী?
সায়ন্তনী। আপনার নামটা কি তার চেয়ে ভাল?
চালাকি করে নাম জেনে নেবেন, আমি তত বোকা নই।
নামটা বলতে দোষ কী?
চোরেরা নাম বলে না।
না কি অন্য কোনও কারণ আছে?
থাকতে পারে। সকাল হয়ে এল, আমি যাই!
আবার কবে আসছেন?
নিচু হয়ে ঝোপ পেরোতে পেরোতে একবার ফিরে তাকায় ফুলচোর। চাপা স্বরে বলে, এলে খুশি হবেন?
বোধ হয় খারাপ লাগবে না। আজ তো বেশ লাগল।
ফুলচোর হি হি করে হাসে, তাহলে আসব।
বলে ঝোপটা জোর পায়ে পেরিয়ে চলে গেল ফুলচোর। ওকে বলা হল না যে, সব কথা আমি সত্যি বলিনি। কী করে বলব? সায়ন্তনীর চেহারাটা আমার মনে পড়ছে না যে।

কাটুসোনা

আজ দুপুরে হাউ-হাউ করে হঠাৎ পপির জন্য খানিকটা কাঁদলাম।

দুপুরে এক বাঁদরনাচওলাকে ধরে এনেছিল বাঁটুল, দড়ি বাঁধা দুটো বাঁদর ডুগডুগির তালে নাচল, ডিগবাজি খেল, পরস্পরকে পছন্দ করল, বিয়ে করল। খেলার ফাঁকে ফাঁকে পুটুর পুটুর চেয়ে দেখল ভিড়ের মানুষদের। বসে বসে আমাদের দেওয়া কলা ছাড়িয়ে খেল।

বড় কষ্ট বাঁদরগুলোর। খেলা দেখতে দেখতে অবোলা জীবের কষ্টে যখন বুকে মোচড় দিল একটু তখনই পপির কথাও মনে পড়ে গেল। কাজল-পরানো মায়াবী একজোড়া চোখ ছিল পপির। কী মায়া ছিল ওর দৃষ্টিতে! তাকিয়ে থাকত ঠিক যেন আপনজনের মতো। কথাটাই শুধু বলত না, কিন্তু আর সবই বোঝাতে পারত হাবেভাবে। এসব মনে পড়তেই বুকের মোচড় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসলাম।

কাঁদতে যে কী সুখ! কাঁদতে কাঁদতে পপিকে ছেড়ে আরও কত কী ভাবতে ভাবতে আরও কাঁদতে থাকি।

গতবারই কলকাতায় একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল। ভৈরবকাকার সঙ্গে মা আর আমরা ভাইবোনেরা মামাবাড়ি বেড়াতে গেলাম। মা'র বাপের বাড়ি যাওয়া আর সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে পুজোর বাজার করে আনা, দুই-ই হবে। মামারা কেউ এক জায়গায় থাকে না। তাছাড়া কারওরই বাসা খুব বড় নয়। ফলে আমরা এক এক বাসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম। আমাকে নিয়ে গেল হাতিবাগানের বড়মামা।

বলতে কী মামাবাড়িতে আমাদের বড় একটা যাওয়া হয় না। কলকাতা শহরটা আমাদের কাছে বড় ভয়ের। সে এক সাংঘাতিক ভিড়ে ভরা শহর। মাথা গুলিয়ে দেওয়া ধাঁধার মতো রাস্তাঘাট। তার ওপর আত্মীয়দের কারও বাড়িতেই হাত পা ছড়িয়ে থাকার মতো জায়গা হয় না! আমরা সেখানে গেলে একা বেরোতে পারি না, রাস্তা পেরোতে বুক ঢিপ ঢিপ করে। ফলে আমরা কলকাতায় কালেভদ্রে যাই। হয়তো তিন চার বা পাঁচ বছর পর। ততদিনে কলকাতার আত্মীয়দের সঙ্গে আবার একটু অচেনার পর্দা পড়ে যায়।

বড়মামার মেয়ে মঞ্জু আমার বয়সী, ছেলে শঙ্কু তিন-চার বছরের বড়। সেই বাড়িতে পা দিতে না দিতেই আমি টের পেলাম আমার মামাতো দাদা শঙ্কুর মাথা আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি। বলতে নেই, ব্যাপারটা আমি উপভোগই করেছিলাম। কাছাকাছি একটা কাঁচা বয়সের ছেলে রয়েছে, অথচ আমাকে দেখে সে হাঁ করে চেয়ে থাকছে না, নিজের কেরদানি দেখানোর জন্য নানা বোকা-বোকা কাণ্ড করছে না বা নিজের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে আগড়ম বাগড়ম বকছে না—সেটা আমার অহংকারে লাগে।

তবু হয়তো আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। একে তো আমার বিয়ে একজনের সঙ্গে পাকা হয়ে আছে, তার ওপর শঙ্কুদা আমার আপন মামাতো ভাই। কিন্তু বয়সটাই এমন যে, আত্মীয়তার বেড়া বাঁধ মানতে চায় না। যাতায়াত কম বলে আত্মীয়তাটা তেমন জোরালোও হয়ে ওঠেনি। ভাই বোন বলে জানি, কিন্তু সেরকম কিছু একটা দায়িত্ব বোধ করি না। আরও একটা কথা আছে। সেটা হল কিছু কিছু মানুষ বোধ হয় এরকম অসামাজিক, বাঁধভাঙা কাণ্ড করতে বেশি আনন্দ পায়।

লম্বার ওপর শঙ্কুদার চেহারাটা খারাপ নয়। একটু মস্তানের মতো হাবভাব। এ জি বেঙ্গলে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে এবং বিয়ে-টিয়ের কথাও ভাবছে। দ্বিতীয় দিন অফিস থেকে ফিরেই আমাকে বলল, সাত দিনের ছুটি নিলাম। তোকে কলকাতা শহরটা খুব ঘুরিয়ে দেখাব বলে।

আমি মুখেও হাসলাম, মনে মনেও হাসলাম। দুটো অবশ্য দু'রকম হাসি। মুখে বললাম, খুব ভাল করেছ। কলকাতাকে যা ভয় আমার! মনে মনে বললাম, সব জানি গো, সব বুঝি!

ছেলে নতুন চাকরিতে ঢুকে ছুটি নেওয়ায় মামা মামি খুশি হননি তা তাদের মুখ দেখেই বুঝলাম। মঞ্জু তো মুখের ওপরেই বলল, তোকে দরকার কী? কলকাতা তো কাটুকে আমিই দেখাতে পারি।

কিন্তু শুধু আমিই মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিলাম কলকাতা দেখানো না হাতি!

শঙ্কুদা পরদিনই গুচ্ছের ট্যাকসি ভাড়া দিয়ে আমাকে আর মঞ্জুকে নিয়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রিট দেখাল, রেস্টুরেন্টে খাওয়াল, সিনেমায় নিয়ে গেল। মঞ্জু বারবার আমার কানে কানে বলছিল, ইস্! কী পরিমাণ টাকা ওড়াচ্ছে দেখেছিস!

শুনে আমার একটু লজ্জা হল। বেচারা শঙ্কুদা! এখন তো ওর মাথার ঠিক নেই। পরদিনই বাড়িশুদ্ধু সবাইকে স্টারে থিয়েটার দেখাল। মামি বলল, যাক, কাটুর কল্যাণে শঙ্কুর পয়সায় থিয়েটার দেখা গেল।

এমনি দু'-তিন দিন যাওয়ার পরই বাড়ির লোক কিছু ক্লান্তি বোধ করে ক্ষ্যামা দিল। তখন শঙ্কুদা আমাকে নিয়ে একা বেড়াতে বেরোল। চার দিনের দিন ট্যাকসিতে আমার হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, পুজোর আগে কিন্তু ছাড়ছি না। কলকাতার পুজো দেখে যাও এবার।

তুই থেকে তুমিতে প্রোমোশন পেয়ে আমি আবার মুখে আর মনে দু'রকম হাসি হাসলাম। বললাম, যাঃ, তাই হয় নাকি?

কেন হবে না? ইচ্ছে থাকলেই হয়। আমি পিসিকে বলে পারমিশন নেব।

মা আমাকে রেখে যাবেই না।

খুব যাবে।

উঁহু। পুজোর পরেই আমার পরীক্ষা।

পরীক্ষা-টরিক্ষা রাখো তো। পুজোর পর কেন, সারা জীবনই যদি আর যেতে না দিই?

কথাটা বড় সোজাসুজি বলে ফেলে বোধ হয় নিজেই ঘাবড়ে গিয়েছিল শঙ্কুদা। তাড়াতাড়ি বলল, সাবিরের রেজালা খেয়েছ? চলো আজ খাওয়াব।

বাঁধ ভাঙতে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু তার একটা মাত্রা আছে। দিন পাঁচেকের মধ্যেই বুঝলাম, শঙ্কুদাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে আমি বিপদ ডেকে এনেছি। ভাড়াটে বাড়ির ছাদে ওঠার এজমালি সিঁড়িতে শঙ্কুদা আমাকে সেদিন চুমু খাওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। দু' দিনের দিন সকালে ওর ঘোর লাল চোখ দেখে বুঝলাম, সারা রাত ঘুমোয়নি। আমার কথা ভেবেছে।

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল। পুরুষরা জন্মসূত্রেই বোকা, মেয়েরা তো তা নয়। আমি সাবধান হই। মামাকে সেদিনই বললাম, আজ খিদিরপুরে মেজোমামার বাড়িতে যাব। মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মামার মাথায় তো ঘোরপ্যাঁচ নেই। বলল, তা আমার তো অফিস, তোকে বরং শঙ্কু গিয়ে রেখে আসুক। প্রস্তাব শুনে শঙ্কুদা আমার দিকে নিষ্পলক অদ্ভুত পাগলা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে, বিকেলে নিয়ে যাব। বলেই বেরিয়ে গেল। দুপুরে বেশ দেরিতে ফিরে এসেই বলল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

আমি তৈরিই ছিলাম। ভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। রাস্তায় পা দিয়েই শঙ্কুদা বলল, কাটু, আমাকে বিট্রে করবে না তো? তাহলে কিন্তু মারা যাব।

বলতে নেই, আমি বুদ্ধিমতী। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, এখন যদি কোনও কড়া কথা বলি তাহলে একদম খেপে যাবে। তাই মুখে হাসি মাখিয়ে বললাম, তুমি এরকম করছ কেন বলো তো! আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি?

আমেরিকার ছেলেটাকে চিঠি লিখে দাও যে, তুমি তাকে বিয়ে করবে না।

আমার বুক তখন ধুকপুক করছে। বললাম, ওরম কোরো না। তোমাকে ভীষণ অন্যরকম দেখাচ্ছে।

পুরুষেরা বোকা বটে, কিন্তু কখনও-সখনও ভারী বিপজ্জনকও। বিশেষ করে প্রেমট্রেমে পড়লে।

২

সেটা বুঝলাম যখন আমাদের ট্যাক্সি খিদিরপুরে না গিয়ে বিচিত্র সব পথে চলতে লাগল।

শঙ্কুদা পাগলের মতো কখনও আমার হাত চেপে ধরে, কখনও কাঁধে হাত রেখে, কখনও গলা পেঁচিয়ে ধরে কেবল ভালবাসার কথা বলে যেতে লাগল। সেদিন শঙ্কুদার সব বাঁধ ভেঙে গেছে, কোনও আব্রু নেই, লুকোছাপা নেই, লজ্জা নেই, ভয় ভীতি নেই। বলে, বিশ্বাস করো আমার মা বাবা কিছু মনে করবে না...আমি আলাদা বাসা করব...বিয়ে করেই দ্যাখো, প্রথমে একটু সবাই হয়তো রাগ টাগ করবে, কিন্তু দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে...কলকাতায় এরকম ভাইবোনে কত বিয়ে হয়, এটাই আজকাল ফ্যাশান...আমি আলাদা বাসা নেব, না হয় খুব দূরে বদলি হয়ে চলে যাব...

শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা। মাথা চক্কর দিচ্ছে। লজ্জাও হচ্ছিল খুব!

ট্যাকসিতেই অবশ্য শেষ হয়নি। ট্যাকসিওয়ালা স্পষ্টই সব শুনছে।

আমরা ময়দানে বসলাম, রেস্টুরেন্টেও খেলাম, রাস্তাতেও হাঁটলাম।

বেলা পড়ে এলে বললাম, শঙ্কুদা, এবার আমাকে দিয়ে এসো। আমি না গেলে মা আর ভৈরবকাকা পুজোর বাজার করতে বেরোবে না।

ও! পুজোর বাজার এখন রাখো। তার আগে আমাদের বিয়ের বাজার তো হোক।

শঙ্কুদা সত্যিই নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা দেড়শো টাকার শাড়ি কিনে দিল জোর করে। এত খারাপ লাগছিল কী বলব!

সন্ধে হয়ে এল, তবু শঙ্কুদা আমাকে রেখে আসার নাম করে না। বরং বলল, চলো, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এক জায়গায় আমার বন্ধুরা আসবে।

আমি ভয়ে কেঁপে উঠে বললাম, না না।

চলো না। তারপর ঠিক রেখে আসব।

ডাক ছেড়ে তখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। শঙ্কুদা যত পাগলামি করছে তত ওর ওপর বিতৃষ্ণা আসছে আমার। পারলে তখন ছুটে পালাই। কিন্তু চারদিকেই তো বিপজ্জনক অচেনা কলকাতা। কোথায় যাব?

ধর্মতলার কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে সত্যিই নিয়ে গেল আমাকে শঙ্কুদা। সেখানে পাঁচ-ছ'জন ছোকরা বসে আছে। শঙ্কুদা আমাকে তাদের সামনে হাজির করে বলল, এই আমার ভাবী ওয়াইফ। তারপরই একটু হেসে বলল, ভাবীও নয়। শুধু ওয়াইফ!

আমার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে এখন। রাগে দুঃখে ছিঁড়ে যাচ্ছে বুক। কিন্তু অত লোকের সামনে কী করব? হেসে বরং ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কথা-টথাও বলতে হল। বন্ধুগুলো খারাপ নয়। তবে এক-আধজন একটু মোটা ইঙ্গিত করছিল। আমি তাদের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছি বন্ধুদের কাছে আমাকে নিজের বউ পরিচয় দিয়ে শঙ্কুদা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সাক্ষী রাখতে চাইছে। বেঁধে ফেলতে চাইছে।

একবার পালাতে পারলে জীবনে আর কোনওদিন ওর ছায়া মাড়াব না, মনে মনে তখন ঠিক করেছি। তাই দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে যাচ্ছিলাম। জানি, আর একটু পরেই মুক্তি পাব।

কিন্তু খুব ভুল ভেবেছিলাম! আমি মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছিলাম। তবু বন্ধুদের সঙ্গে অনেক রাত করে ফেলল শঙ্কুদা।

রাত ন'টা নাগাদ বন্ধুদের বিদায় দিয়ে শঙ্কুদা রাস্তায় নেমে বলল, এত রাতে আর কোথায় যাবে কাটু?

আমি চমকে উঠে বলি, তার মানে?

এখন বাস ট্রামের অবস্থা খুব খারাপ! ট্যাকসিও খিদিরপুর যেতে চাইবে না।

তাহলে?

শঙ্কুদা হেসে বললে, আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারো, কিন্তু সেটা হয়তো খারাপ দেখাবে!

তুমি কী বলতে চাইছ?

ভয় পেয়ো না কাটু। আমি একটা খুব ভাল পথ ভেবে বের করেছি। আজকের রাতটা আমরা একটা হোটেলে কাটাব!

শুনে আতঙ্কে কেমন হাত পা ছেড়ে দিল আমার। বুক ঠেলে কান্না এল। কোনও বাধা মানল না। সেই কান্না আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললাম, এসব তুমি কী বলছ?

শঙ্কুদা অনেক সান্ত্বনা দিচ্ছিল, ক্ষমা চাইছিল। বলল, বুঝছ না কেন, কেউ টের পাবে না। বরং এত রাতে কোনও বাড়িতে গিয়ে উঠলেই সন্দেহ করবে বেশি। কোনও ভয় নেই।

পুরুষরা যখন পাগল হয় তখন বোকামির মধ্যেও তাদের শয়তানি বুদ্ধি কাজ করে। আমার তখন পাগলের মতো এলোমেলো মাথা। তবু আমি বুঝতে পারলাম, আমি যে ওকে কাটাতে চাইছি তা ও বুঝতে পেরেছে। তাই আমাকে এঁটো করে রাখতে চায়, যাতে আমি বাধ্য হই মাথা নোয়াতে।

কোথায় সেই হোটেলটা ছিল তা আমি আজও বলতে পারব না। তবে কলকাতার মাঝামাঝি কোথাও। হোটেলটার নামও আমি লক্ষ করিনি। কিছুই লক্ষ করার মতো অবস্থা নয়। তবে মনে হচ্ছিল, আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল সব।

দোতলার একটা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে তুলল শঙ্কুদা। সে ঘরে একটা মাত্র ডবল খাটের বিছানা। টেবিলে দু'জনের খাবার দিয়ে গেল বেয়ারা, কিছু না বলতেই। শঙ্কুদা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, ঘাবড়ে যেয়ো না। ওসব কিছুই কেউ জানবে না। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো।

বিপদের অনুভূতির প্রথম প্রবল ভাবটা কেটে গেল তখন। বাথরুমে গিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। মাথা বশে এল একটু। বুকে টিপিটিপিনি কমে গেল।

মানুষের মনে কত কী থাকে তার হিসেব নেই। সেই হোটেলের ঘরে আবার যখন ঢুকছিলাম তখন খুব খারাপ লাগল না। বরং মনে হল, দোষ কী? কে জানবে? আমার জীবনটা বড় বাঁধা পথে চলছে। একটু এদিক ওদিক হোক না।

এমনকী আমি তখন ভাতও খেতে পারলাম। হয়তো খাওয়ার পর বিছানাতেও চলে যেতাম কিছু পরে।

কিন্তু শঙ্কুদা যখন দরজার ছিটকিনি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তখন সমস্ত প্রস্তুতিটা কেটে গেল।

ছেলেদের মুখে ওরকম কাঙালপনা দেখতে আমার এমন ঘেন্না হয়!

শঙ্কুদা আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে এসে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল।

কেন নয় কাটু? একটুখানি। একবার। কেউ জানবে না।

তা হয় না। মেয়েরা ও জিনিসটা এত সহজে দিতে পারে না।

প্লিজ কাটু। আজ থেকে তুমি তো আমার স্ত্রী।

আমি চেয়ারে বসে রইলাম বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি রেখে, দৃঢ়ভাবে।

তারপর সারা রাত চলল অনুনয় বিনয়, পায়ে ধরা, মাথা কোটা, কান্না হাসি। আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। একটা রাত যে কত লম্বা হতে পারে তার কোনও ধারণা ছিল না আমার। তবে একটা কথা আমি জানতাম। কোনও মেয়ে যদি ইচ্ছে না করে তবে দশটা পুরুষেরও সাধ্য নেই তাকে রেপ করে। মেয়েদের তেমনই ক্ষমতা প্রকৃতি দিয়ে রেখেছে। মেয়েরা যে ভোগের জিনিস তা কি ভগবানের মতো চালাক লোক জানেন না! ভৈরবকাকাও একবার দারোগা কাকার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বলেছিল, যে সব মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়, তারা হয় নিজের ইচ্ছেতেই বশ মানে, না হলে ভয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

কথাটা ঠিক। শঙ্কুদা রাজি করাতে না পেরে শেষরাতে জোর খাটাতে লাগল। সে এক বীভৎস

লড়াই। কিন্তু সে লড়াই শেষ হওয়ার আগেই ভোর হয়ে গেল। আমার গায়ে কয়েকটা আঁচড়-কামড়ের দাগ বসে গিয়েছিল শুধু। আর কিছু নয়।

মা আর বড়মামা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। যুক্তি করে খুব বুদ্ধির সঙ্গে তারা ঘটনাটা চেপে দেয়। বড়মামি আর মঞ্জুও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল, কেননা সেই রাতে শঙ্কুদা বাসায় ফেরেনি। কিন্তু কতখানি টের পেয়েছিল তা আমি জানি না! ওদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

অনেকক্ষণ কাঁদলে মনের ভার কমে যায়। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ কেঁদেও কেন যে আমার মনটা তবু ভার হয়ে রইল!

এ শহরের স্কুল কলেজ গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ। আশপাশের নিচু জায়গা বানে ভেসে যাওয়ায় বহু লোক এসে উঠেছে সেখানে। লঙ্গরখানা চালু হয়েছে। বৃষ্টির জন্য সাত দিন বাড়িতে আটকে আছি। বিকেলে রোদ ফুটল। ভাবলাম, যাই লিচুকে দেখে আসি।

লিচু আমাকে দেখে খুশি হল না। গোমড়া মুখ করে রইল।

ওর মা বলল, এসো এসো। বড়লোকের মেয়ে এসেছে আমাদের ঘর আলো করতে।

কথাটায় খোঁচা ছিল কি না কে বলবে! তবে অত ভাববার সময় নেই।

কেমন আছিস?— লিচুকে জিজ্ঞেস করি।

ভাল। খুব ভাল। বেঁচেই আছি, মরে যাইনি।

আজ তোকে ভাল দেখাচ্ছে।

ভাল দেখাবে না কেন? ভালই আছি তো।

বাব্বাঃ। অত মেজাজ করছিস কেন বল তো?

কোথায় মেজাজ! আমাদের মেজাজ বলে কিছু থাকতে আছে নাকি?

কমও তো দেখছি না।

এ কথাতে হঠাৎ লিচু হু-হু করে কেঁদে উঠল হাঁটুতে মুখ গুঁজে।

ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, কাঁদছিস কেন? আজকাল ওসব ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?

লিচু জবাব দিল না। অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে কেঁদে তারপর একটু শান্ত হয়ে মুখ তুলল। আস্তে করে বলল, আমি কাঁদছি হারমোনিয়ামটার জন্য।

আবার হারমোনিয়াম? সেটার কী হল?

কর্ণবাবুর টাকা শোধ দেওয়ার জন্য এবার সেটা মা বেচে দিচ্ছে পশুপতিবাবুর কাছে। আমার তবে আর কী থাকল বল?

টাকা শোধ দেওয়ার তাড়া কী? সময় নে না। না হয় আমিই বলে দেবখন কর্ণবাবুকে।

ছিঃ!— লিচু জ্বলে উঠে বলে, কক্ষনও নয়। ওঁর কাছে আমরা একদিনও ঋণী থাকতে চাই না।

পাগলা দাণ্ডর ওপর তুই খুব রেগে গেছিস।

ভেতরটা কেটে যাচ্ছে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো তক্ষুনি বাড়ি ফিরে গলায় দড়ি দিত। কলকাতার ছেলেরা যে এরকমই হয় তা অবশ্য জানতাম। তোর দেওর, তাই বেশি কিছু বলতে চাই না।

দেওর তো কী?

তুই হয়তো ভাববি, দোষটা আমারই।

মোটেই না। তবে তোর আর একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল। শুনেছি কর্ণর কলকাতায় একজন লাভার আছে।

আছে!— বলে লিচু চোখ কপালে তুলল, কী শয়তান!

তুই যেটা ধরিস সেটাকেই বড় সিরিয়াস ভাবে ধরিস। আজকাল এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কেউ ভাবে নাকি?

আমি তো তুই নই।

কেন, আমি কীরকম?

তোর সবই মানায়। আমার তো তোর মতো রূপ, গুণ বা টাকা নেই যে একজনকে ছেড়ে দিলেও আর একজন জুটবে। আমাদের সব কিছু হিসেব কষে করতে হয়।

আমি বুঝি প্রায়ই একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ধরি?

তা তো বলিনি। বললাম, রূপ গুণ থাকলে ওরকম করা যায়। নিজের গায়ে টানিস না। রাগ করলি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, তোর কথা ভেবেই আমি কর্ণর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছি।

কী বলল?

বলল, ওর লাভার খুব স্মার্ট। খুব সুন্দর।

মুখখানা কালো হয়ে গেল লিচুর। বলল, তা হলে তো ভালই, আমাকে কখনও অবশ্য লাভারের কথা বলেনি।

তুই হয়তো জানতে চাসনি। কোনও ছেলের সঙ্গে আলাপ হলে ওটাই প্রথম জেনে নিতে হয়।

জেনে রাখলাম। তুই বুঝি তাই করিস?

নিশ্চয়ই। তবে আমার ইন্টারেস্টটা অ্যাকাডেমিক। তোর তো তা নয়। আবার একজনকে হাতের কাছে পেলেই হয়তো হুড়মুড়িয়ে প্রেমে পড়বি। তাই জানিয়ে দিলাম।

লিচু থমথমে মুখে বলে, আমার জেনে দরকার নেই। যে ছেলেদের মাথা চিবিয়ে বেড়ায় তারই ওটা বেশি জানা দরকার।

আমার মনের মধ্যে তখন থেকে কী যেন একটা ধিক ধিক করছে। কী যেন একটা মনে পড়ি-পড়ি করছে। পড়ছে না। মনটাও ভীষণ ভার। কিছুতেই কাটাতে পারছি না। তাই কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করছিল না। তবু একটু মোলায়েম বিষমেশানো গলায় বললাম, ছেলেরা কাউকে কাউকে মাথা চিবোতে দেয়। সুযোগ পেলে চিবোতে কেউ ছাড়ে না।

সন্ধে হয়ে এসেছে। উঠব উঠব করছি, এমন সময়ে পাগলা দাশু বাইরে থেকে ডাকল, লিচু!

আমি টুক করে উঠে পড়লাম।

ডাক শুনে লিচু এত চমকে উঠে, শিহরিত হয়ে, স্তম্ভিত মুখে বসে রইল যে আমার সরে পড়াটা লক্ষই করল না। ওর মুখে ভয়, চোখে অবিশ্বাস, মুখে স্বপ্নের আস্তরণ। বেচারা।

আমি উঠোনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আসার সময় একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। কর্ণর চেহারাটা সত্যিই বেশ। লম্বা চওড়া, পুরুষোচিত। কিন্তু সাজগোজ অত্যন্ত ক্যাবলার মতো। মুখে অন্যমনস্কতা।

হঠাৎ মনের মধ্যে টিকটিকিটা খুব জোর ডেকে উঠল। এমনকী দুলে উঠল হৃৎপিণ্ড। পায়ের নীচে মাটিও কেঁপে গেল যেন। আশ্চর্য। কর্ণ মল্লিককে যে আমিও আগে কোথায় দেখেছি।

পাগলা দাশু

একদিনই মাত্র রোদ উঠেছিল কিছুক্ষণ। তারপর আবার ঘনঘোর মেঘ করে এল। গরাদের মতো বৃষ্টি ঘিরে ধরল আমাদের। এই যেন পৃথিবীর শেষ বৃষ্টিপাত। এত তেজ সেই বৃষ্টির যে মাটিতে পড়ে তিন হাত লাফিয়ে ওঠে জলের ছাঁট। বুঝি বা ফুটো করে দেয় মাটি। আমার ভয় হয়, বৃষ্টি থামলে বুঝি দেখব গোটা শহরটাই একটা চালুনির মতো অজস্র ছ্যাঁদায় ভরে আছে।

প্রথম বর্ষায় কিছু জায়গা ডুবেছিল। এই দ্বিতীয় বর্ষায় পাহাড়ি ঢল নেমে ভেসে যেতে লাগল গাঁ গঞ্জ। শহরের আশেপাশে নিচু জায়গায় জল ঢুকছে। ট্রেন বন্ধ, সড়ক বন্ধ, এরোপ্লেন উড়ছে না।

কখনও আমি লঙ্গরখানায় ধুন্ধুমার জ্বলন্ত উনুনে জাহাজের মতো বিশাল কড়াইয়ে খিচুড়িতে হাতা মারছি। ঘামে চুবচুবে শরীর। কখনও দলবল নিয়ে বাজার ঢুঁড়ে ব্যাবসাদারদের গদি থেকে চাল ডাল তুলে আনছি। কখনও পার্কে ময়দানে বাঁশ পুঁতে খাড়া করছি ক্রিপলের আশ্রয় শিবির। প্রতিদিন শহরের বাইরে ভেসে-যাওয়া গাঁ গঞ্জ থেকে যে হাজার হাজার লোক আসছে তাদের মাথা গুনতি করে বেড়াচ্ছি। মিলিটারির এক বাঙালি ক্যাপটেনের সঙ্গে ভাব করে ডিফেন্সের নৌকোয় চলে যাচ্ছি লোক উদ্ধার করতে। আমি কোথায় তা কাকা-কাকিমা টের পায় না, এমনকী অফিস টের পায় না, আমি নিজে পর্যন্ত টের পাই না। কখন খাচ্ছি, কখন ঘুমোচ্ছি তার কোনও ঠিক ঠিকানা জানি না। মাঝে মাঝে টের পাচ্ছি গায়ের ভেজা জামাকাপড় গায়েই শুকিয়ে যাচ্ছে। চিমসে গন্ধ বেরোচ্ছে শরীর থেকে। দাড়ি যৌবনের রবি ঠাকুরকে ধরে ফেলেছে প্রায়। চুলে জট। গায়ে আঙুল দিয়ে একটু ঘষলেই পুরু মাটির স্তর উঠে আসে। গায়ে গায়ে অনেক ক্ষত ওষুধের অভাবে, এমনিই শুকিয়ে আসছে। আমবাড়িতে একবার জলের তোড়ে নৌকো উল্টে ভেসে গেলাম। ফাঁসিদেওয়ায় অল্পের জন্য সাপের ছোবল থেকে বেঁচে যাই। ডামাডোলে আমার ঘড়িটা হারিয়ে গেছে, জুতোজোড়া ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ায় ফেলে দিয়েছি, শার্টটা বদান্যতাবশে এক রিফিউজিকে দিয়ে দিলাম। এখন আছে শুধু গেঞ্জি ছেঁড়া প্যান্ট, আর আছি আমি। গুরুং বস্তির অন্তত শ দুয়েক লোক নিখোঁজ। মাইল পাঁচেক দূরে খরস্রোতা নদী বেয়ে গিয়ে গাছ থেকে আমরা জনা দশেক আধমরা মানুষকে উদ্ধার করলাম। তিস্তার জলের তোড়ে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া এক দুর্গম শহরে ঢুকে লাশ আর জিয়ন্ত মানুষ বাছতে হিমশিম খেতে হল। আমি কী করে এখনও বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য লাগে খুব।

কলকাতাতেও বৃষ্টি পড়ছে কি? কীরকম হয়েছে এখন কলকাতার অবস্থা? চোখ বুজে ভাবতে গিয়ে দেখি, গোটা কলকাতাকেই উপড়ে নিয়ে কে যেন একটা উঁচু পাহাড়ের ঢালে যত্ন করে সাজিয়েছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাচ্চাদের জন্য মস্ত লোহার ড্রামে খাবলে খাবলে গরম জলে গুঁড়ো দুধ গুলতে গুলতে আমি একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কলকাতাকে নিয়ে ভাববার এর পর কোনও মানেই হয় না। সময়ও নেই। রিলিফের কাজ করতে করতে কখন যে সবাই আমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে কে জানে। চেনা অচেনা, ছেলে বুড়ো অফিসার পাবলিক হাজারটা লোক মুহুর্মুহু এসে এ কাজে সে কাজে পরামর্শ চাইছে। কর্ণদা, কর্ণবাবু, কর্ণ ভায়া, মল্লিক মশাই, মিস্টার মল্লিক, মল্লিক শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। সব কাজই আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু একটা আমি যেন দশটা হয়ে উঠি। এবং দশ থেকে ক্রমে এগারোটা, বারোটা ছাড়িয়ে একশোর দিকে এগোই।

কে যেন এসে খবর দিল, কর্ণদা, আপনার অফিসের পিয়োন আপনাকে খুঁজতে এসেছে।

অফিস!— আমি লজ্জায় জিব কাটি। এতদিনে অফিসের কথা একদম খেয়াল ছিল না। পিয়োন আমাকে দেখে চোখ কপালে তোলে, আপনিই কি আমাদের জুনিয়ার অফিসার কর্ণ মল্লিক? একদম পাল্টে গেছেন স্যার!

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করলাম মাত্র। পিয়োন আমাকে একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গেল। আজ

ফ্লাড সিচুয়েশন নিয়ে অফিসারদের জরুরি মিটিং। বেলা বারোটায়।

আজকাল কোথাও বসে একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলেই আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই, সেই ভয়ে এক মুহূর্তও আমি বসি না। কিন্তু জেলা অফিসারের ঘরের মিটিং-এ গদি আঁটা চেয়ারে বসে ফ্লাড সিচুয়েশন সম্পর্কে তাঁর কথা শুনতে শুনতে বার বার আমার চোখ চুম্বকের মতো সেঁটে যাচ্ছিল. জেলা অফিসার প্রথমে আমাকে চিনতে পারেননি। তারপর বলেছেন, ইউ লুক ভেরি সিক। তারপর নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলেছেন, ইউ স্টিংক।

সবই সত্য। তবে আমার কীই-বা করার আছে?

মিটিং-এর শুরুতেই জেলা অফিসার বললেন, ফ্লাডের যা অবস্থা তাতে আমাদের ইমিডিয়েটলি রিলিফ ওয়ার্ক শুরু করতে হবে। আপনারা এক একজন এক একটা রিলিফ ওয়ার্কের চার্জ নেবেন। সরকারি অর্ডার, সব অফিসারকেই রিলিফ ওয়ার্কে নামতে হবে।

আমি হাই তোলায় জেলা অফিসার আমার দিকে কঠিন চোখে একবার তাকালেন। বললেন, ডোন্ট ইউ অ্যাগ্রি?

ইয়েস স্যার।

আমি ওপর নীচে মাথা নাড়লাম। বাড়ি যাওয়ার সময় পাইনি। ক্যাম্প থেকে একজন ভলান্টিয়ারের আধময়লা জামা চেয়ে পরে এসেছি। একজোড়া হাওয়াই চটি ধার দিয়েছে আর একজন। আমাকে নিশ্চয়ই খুব বিশ্বস্ত অফিসারের মতো দেখাচ্ছে না!

জেলা অফিসার সবাইকে কাজ ভাগ করে দিচ্ছিলেন। আমি অতি কষ্টে বার বার ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও জেগে থাকার চেষ্টা করছি।

মিস্টার মল্লিক!

ইয়েস স্যার।

আপনি কীসের চার্জ নেবেন?

আমি ঘুমকাতর গলায় বলি, আমি জীবনে কখনও রিলিফ ওয়ার্ক করিনি। আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

হিমশীতল গলায় জেলা অফিসার বললেন, কথাটা সত্যি নয় মল্লিক। আপনি গত কয়েকদিন অফিসের কাজ ফেলে রেখে বিস্তর রিলিফের কাজ করছেন। কিন্তু তার একটাও সরকারি নীতিবিধি মেনে করেননি। একজন সরকারি অফিসারের দায়িত্ব যা হতে পারে তার একটাও পালন করেননি।

ক্রমে তাঁর গলা একটু একটু করে উঁচুতে উঠতে থাকে, উইদাউট ইকুইপড উইথ প্রপার ক্রেডেনসিয়ালস অ্যাজ এ পাবলিক সারভেন্ট আপনি ডিফেনস-এর রিলিফ টিমের সঙ্গে বহু জায়গায় গেছেন এবং সেটাও গেছেন উইদাউট প্রায়র অ্যাপরুভ্যাল। আপনি সরকারি গোডাউন থেকে সমস্ত প্রোটোকল অগ্রাহ্য করে ফুডগ্রেন বের করে দিয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কমপ্লেন করেছেন, আপনি গাঁধী ময়দানে তাঁবু খাটাতে গিয়ে ত্রিপলের এক কোনার দড়ি গাঁধীর স্ট্যাচুর গলায় বেঁধেছিলেন। দেয়ার ইজ এ ভেরি সিরিয়াস চার্জ এগেনস্ট ইউ। আমার প্রশ্ন, এগুলো আপনি কেন করেছেন? পাবলিকের চোখে হিরো হওয়ার জন্য?

আমি অতল ঘুম থেকে নিজেকে টেনে তুলে বলি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার।

আপনি যখন রাইটার্স বিল্ডিংসে ছিলেন তখনও এই ধরনের কিছু কিছু কাজ করেছেন। আপনার সি আর-এ তার উল্লেখ আছে। স্বয়ং মিনিস্টারও আপনার ওপর খুশি নন। গত ইলেকশনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি একটা বুথ সিল হয়ে যাওয়ার পরও রিওপেন করেছিলেন। ব্যালটের বদলে লোককে নিজে সই করে সাদা কাগজ দিয়েছিলেন ব্যালট হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আপনি পরে রিপোর্টে বলেছিলেন, ওই বুথ ওপেন করার আগেই সব ভোট জমা পড়ে যাওয়ায় আপনি ওই কাণ্ড করেন। সেটা হতেও পারে। কিন্তু কেউ কারচুপি করে যদি বুথ দখল করেই থাকে তার জন্য

প্রপার প্রসিডিওর আছে। সাদা কাগজকে ব্যালট হিসেবে ব্যবহার করার নজির আপনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন। সেখানেও পাবলিক আপনাকে ম্যানহ্যান্ডেল করায় আপনাকে প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। উই নো এভরিথিং অ্যাবাউট ইউ।

এ সবই সত্য। আমার কিছু বলার থাকে না আর। বসে বসে আমি এক বিকট চেহারার ঘুম-রাক্ষসের সঙ্গে আমার দুর্বল লড়াই চালাতে থাকি।

জেলা অফিসার হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি পাগল?

না, স্যার।— আমি দুর্বল গলায় বলি!

আপনার মেডিক্যাল রিপোর্টও খুব ফেবারেবল নয় মিস্টার মল্লিক। হাসপাতালের ডাক্তারদের অভিমত হল, সেই বুথ নিয়ে গণ্ডগোলের সময় আপনার ব্রেন ড্যামেজ হয়েছিল। যাকগে, এইসব নানা কারণেই আপনাকে নর্থ বেঙ্গলে ট্রান্সফার করা হয়েছে। বোধ হয় আপনিও সেটা জানেন।

আমি চকিতে ঘুমিয়ে কয়েক সেকেন্ড একটা স্বপ্ন দেখে ফেলি। দেখতে পাই, ফুলচোরের সঙ্গে আমি একটা জাহাজের ডেক-এ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। চোখ খুলে আমি বলি, কিন্তু তার পরেও আমি সরকারি কাজে আরও কয়েকবার পাবলিকের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছি স্যার। তবে আমার ধারণা প্রত্যেকবারই আমাকে পিটিয়েছিল হয় কোনও পলিটিক্যাল পার্টির লোক, নয়তো সাদা পোশাকের পুলিশ। পাবলিক নয়। এনিওয়ে আমার ব্রেন ড্যামেজের কথাটা আমি অস্বীকার করছি না।

জেলা অফিসার ঘড়ি দেখছিলেন। বললেন, পুরো এক মিনিট পর আপনি আমার কথার জবাব দিলেন। যাকগে, ইউ আর টায়ার্ড, আই নো। আপনাকে রিলিফ ওয়ার্ক থেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম।

জেলা অফিসার বললেন, শুনুন! আপনি ফ্লাডে এখানে যা করেছেন তার জন্য সরকারিভাবে আপনি হিরো তো ননই, বরং ইউ আর এ সিরিয়াস ডিফলটার! তাই সরকারিভাবে আমি আপনাকে ধন্যবাদও দিচ্ছি না! কিন্তু—

কিন্তু?— আমি অবসন্নভাবে চেয়ে থাকি!

জেলা অফিসারের থমথমে মুখে হঠাৎ হাসির বজ্রপাত হল। হো হো হো করে হেসে বললেন, কিন্তু বেসরকারিভাবে আই র‍্যাদার লাইক ইউ।

ফিরে এসে আমি আবার লঙ্গরখানায় খিচুড়ি হাড়িতে হাতা মারতে থাকি। জীবনে আমার আর কী করার আছে বা ছিল তা আমার ঘুমে আর ক্লান্তিতে ভোম্বল হয়ে যাওয়া মাথায় কিছুতেই খেলে না। ভাবছি নিজের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টটা চুরি করে একবার দেখতে হবে। কলকাতায় আমি আর কী কী কাণ্ড করেছিলাম তা জানা দরকার। জানলে যদি আবার কলকাতার কথা আমার মনে পড়ে।

কে একজন এসে জরুরি গলায় বলল, কর্ণবাবু! আপনার কাকা।

ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই কাকা এসে আমার হাত থেকে হাতা কেড়ে নিয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে! এবার বাড়ি চল, চল শিগগির।

বাড়ি ফিরে কী করেছি তা মনে নেই। এক মাতালের মতো গভীর ঘুমের কুয়ো আমাকে টেনে নিয়েছিল।

ক'দিন পর ঘুম থেকে উঠলাম তা বলতে পারব না, কিন্তু যখন উঠলাম তখন আমার সারা গায়ে এক হাজার রকমের ব্যথা। হাড়ের জোড়ে জোড়ে খিল ধরে আছে, কান ভোঁ ভোঁ করছে। একজন ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করছেন। কাকা চেয়ারে এবং কাকিমা আমার বিছানায় গম্ভীর মুখে বসা।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার কী হয়েছে?

ডাক্তার চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললেন, তেমন কিছু তো দেখছি না।

কাকা গম্ভীর গলায় বললেন, খুবই আশ্চর্যের কথা। আমার তো মনে হয়েছিল, ও আর বাঁচবেই না। চেহারাটা দেখুন, চেনা যায় ওকে? গাড়লটাকে সবাই মিলে খাটিয়েই প্রায় মেরে ফেলেছিল। আমি যখন গিয়ে ওকে ধরে আনলাম তখন ওর কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

কাকিমা কথা বলছেন না তবে আমার গায়ে হাত রেখে বসে আছেন চুপচাপ।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, একজসন, একসট্রিম একজসন। ফুল রেস্টে রাখবেন।

আমি দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। আমার সময়ের কোনও জ্ঞান থাকে না। ঘুম ও জাগরণের মধ্যে পার্থক্যও লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।

শুনছেন?

বলুন।

আপনি কেমন আছেন?

ভাল।

আপনাকে দেখতে এলাম।

আপনি কি ভোরের পাখি? ভোর ছাড়া আসেন না তো।

আমি ফুলচোর। আমার এইটেই সময়।

আমি জানি আপনি আজকাল ফুল চুরি করতে আসেন না।

আপনার বাগানে যে ফুলই নেই। শুধু কাদা আর জল।

ফুল যখন নেই তখন কেন এলেন?

বললাম যে! আপনাকে দেখতে।

আমার কি কোনও অসুখ করেছে?

সে তো আপনারই ভাল জানার কথা। লোকে বলছে আপনি বন্যার সময় খুব খেটেছেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার দিকে চেয়ে থাকি। জানালার বাইরে কাকভোরের আবছা অন্ধকারে ফুলচোর দাঁড়িয়ে। আজ গলায় কোনও ইয়ার্কির ভাব নেই।

আমি বিছানায় উঠে বসি। বলি, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমার অসুখ অন্য।

সেটা কী?

যে শহরে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, কিছুতেই তার কথা মনে পড়ছে না। কী যে যন্ত্রণা!

জানি। লিচুও আমাকে এরকম একটা কথা বলছিল। আপনার নাকি সায়ন্তনীর কথাও মনে পড়ছে না।

না। কী করি বলুন তো!

ফুলচোর এবার একটু ফাজিল স্বরে বলল, সিনেমায় এরকম ঘটনা কত ঘটে! অ্যাকসিডেন্টে স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ফের আর একটা অ্যাকসিডেন্টে স্মৃতি ফিরে আসে। ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক। ভয় পাচ্ছেন কেন?

আমি মাথা নেড়ে বলি, এটা স্মৃতিভ্রংশ নয়।

তবে কী?

মানুষ কিছু জিনিস ভুলতে চায় বলেই ভুলে যায়। কিন্তু আমি কেন কলকাতার কথা ভুলতে চাইছি?

ভুললেন আর কোথায়?— ফুলচোর অন্ধকারেই একটু শব্দ করে হাসে, সেদিন তো নিজের ভালবাসার মহিলাটির কথা অনেক বললেন!

আমি অন্ধকারেই বসে বসে আপনমনে মাথা নাড়ি। বলি, কবে যেন, আজ না কাল, স্বপ্ন

দেখছিলাম, আমি একটা লুপ্ত শহর আর একটা লাশ খুঁজতে বেরিয়েছি। দেখি, যেখানে কলকাতা ছিল, সেখানে মস্ত নিষ্ফলা মাঠ। একটা টিনের পাতে আলকাতরা দিয়ে কে লিখে রেখেছে, হিয়ার লাইজ ক্যালকাটা।

লাশটা কার?

বোধ হয় সায়ন্তনীর।

যাঃ।

আমি বললাম, সেই জন্যই আমি কিছুদিন কলকাতা থেকে ঘুরে আসতে চাই।

ফুলচোর চুপ করে রইল। বহুক্ষণ বাদে বলল, যাবেন কী করে? এখনও ট্রেন চলছে না যে।

প্লেন চলছে। আমাকে যেতেই হবে।

আপনার শরীর তো এখনও দুর্বল।

আপনি আমাকে নিয়ে খুব ভাবেন তো।

কোনও জবাব এল না।

আধো ঘুমে, আধো জাগরণে আমি টের পাই, ফুলচোর এসেছিল। চলে গেছে।

কাটুসোনা

আমার সর্বনাশ চৌকাঠের ওপাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে ঘরে ঢুকবে। বুকের মধ্যে অলক্ষনে টিকটিকি ডাকছে সব সময় টিক টিক টিক টিক।

আমার জন্ম এই শহরে। আমি এখানে রাজহাঁসের মতো অহংকারে মাথা উঁচু করে হাঁটি। রাজ্যের মেয়ে আমাকে হিংসে করে। আমার বড় সুখের বাঁধানো জীবন ছিল। সেই সব কিছু লন্ডভন্ড করতে কেন এল পাগলা দাশু?

শঙ্কুদার রেস্টুরেন্টের বন্ধুদের কারও মুখই আমি ভাল করে দেখিনি। এতদিনে কারও মুখই মনে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, এই একটা মুখ কী করে যেন খুব অস্পষ্ট জলছাপের মতো থেকে গিয়েছিল মনের মধ্যে। লিচুদের বাড়িতে সেদিন পাগলা দাশু গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে না গেলে হয়তো-বা কোনওদিনই মনে পড়ত না।

অমিতের সঙ্গে বিয়ে না হলেও আমার তেমন কিছু যাবে আসবে না, ওর সঙ্গে তো আমার ভাব ভালবাসা ছিল না। শুধু জানি লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। মনটাকে সেইভাবে তৈরি রেখেছি। কিন্তু সেই মন ভেঙে আবার গড়ে নিতে কষ্ট হবে না তেমন, যেটা সবচেয়ে ভয়ের কথা তা হল শঙ্কুদার সঙ্গে আমার সেই ঘনিষ্ঠতা যা আজ পর্যন্ত খুব কম লোক জানে। বলতে গেলে দু'জন, মা আর বড়মামা।

বহুদিন বাদে শঙ্কুদার সঙ্গে সেই ঘটনাটার গা ঘিনঘিনে স্মৃতি, তার লজ্জা তার ভয় নিয়ে ফিরে এল। পরিষ্কার মনে পড়ছে টেবিলের বাঁ ধারে মুখোমুখি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল পাগলা দাশু। কথা বলছিল খুব কম। তবে মাঝে-মাঝে খুব বড় বড় চোখে চেয়ে দেখছিল আমাকে। যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা।

আর কিছু মনে নেই। শুধু ওইটুকু।

পাগলা দাশুরও তেমন করে মনে রাখার কথা নয় আমাকে, কিন্তু তবু কী করে যেন মনে রেখেছে ও। একটু আলোছায়া রয়েছে এখনও, কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে পড়বে হয়তো, তক্ষুনি লাফিয়ে উঠবে। বলবে, আরে! সেই মেয়েটা না?

কী লজ্জা!

বড় বেশি পাগল হয়েছিল শঙ্কুদা। রাত্রে হোটেলের ঘরে যখন আমাদের মরণপণ লড়াই চলছে তখন একবার পাগলের মতো হেসে উঠেছিল, আমার বন্ধুরা জানে যে তুমি আজ আমার সঙ্গে হোটেলে রাত কাটাবে। এই হোটেলের মালিকও ওদেরই একজন। সব জানাজানি হয়ে গেছে কাটু। এখন পিছিয়ে গিয়ে লাভ নেই।

সেই কথাটা এত দিন গুরুতর হয়ে দেখা দেয়নি, আজ বিষ বিছের হুল হয়ে ফিরে এল। তার মানে পাগলা দাশুও সব জানে। জানে, কিন্তু মনে পড়ছে না। যতক্ষণ মনে না পড়ে ততক্ষণ সর্বনাশ চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ইদানীং আমাদের সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে রক্তকরবীর নন্দিনী আর রাজার মতো। আমি খুব ভোরে উঠে পড়ি। রাতে ঘুমই হয় না। সারা রাত বুকে টিকটিকির ডাক! ঘুমোই কী করে?

প্রায়ই সন্তর্পণে গিয়ে মল্লিকবাড়ির জানলার ধারে দাঁড়াই।

শুনছেন?

পাগলা দাশুও জেগে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে জানলার ধারে, মুখে বিষণ্ণ হাসি, বলে, ফুলচোর!

ও হয়তো ভাবে, আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। ভাবুক, যা খুশি ভাবুক, শুধু যেন মনে না পড়ে আমাকে। আমি ওর মাথা আরও গুলিয়ে দেব। মেয়েরা তো পারে ওই সব। আমি কিছু বেশিই পারি।

একদিন মৃদু মোলায়েম স্বরে বলে ফেলি, চুরি করতে নয়, আমি আজকাল ধরা দিতে আসি।

ঠাট্টা করছেন?

কেন, আমি সব সময়ে কি শুধু ঠাট্টাই করি? আমার মন বলে কিছু নেই?

ফাজিল মেয়েরা কতভাবে পুরুষকে নাচায়।

আপনি আর নাচছেন কই?

আমার কথা আলাদা। আমি আর স্বাভাবিক নই। কিছু মনে পড়ছে না। যতদিন না সব ঠিকঠাক মনে পড়ে, ততদিন আমি আর স্বাভাবিক নই।

মনে করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। খামোকা চেষ্টা করছেন কেন? ওতে মাথা আরও গুলিয়ে যায়।

পাগলা দাশু ইদানিং বড় অস্থির, দু' হাতে মাথার চুল খামচে বড় বড় আনমনা চোখে দূরের অন্ধকার পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, মানুষ আসলে কিছুই ভোলে না, সব তার মস্তিষ্কের কোষে সাজানো থাকে থরে থরে। কিন্তু সব কথা সে মনে রাখতে চায় না। কিছু ঘটনাকে সে বাতিল করে দেয়, ভুলতে চায়। তাই ভুলে যায়। কিন্তু আমি কেন ভুলতে চাইছি?

আমি কথাটা ঘুরিয়ে দিই। জিজ্ঞেস করি, আপনি কলকাতায় কবে যাবেন?

শিগগিরই যাব। অফিস ছুটি দিতে চাইছে না। যেদিন দেবে সেদিনই রওনা হব।

সায়ন্তনী আপনাকে চিঠি দেয় না?

দেয়। খুব ভাল চিঠি লেখে সায়ন্তনী।

আপনাদের বিয়ে কবে?

আসছে শীতে।

আমি করুণ মুখ করে বলি, আপনি কলকাতায় গেলে এই জানলাটা আমার কাছে একদম ফাঁকা লাগবে ক'দিন।

পাগলা দাশু হাসে। বলে, চিরকালের জন্যও ফাঁকা লাগতে পারে, আমি কলকাতায় বদলি চেয়ে দরখাস্ত করেছি।

শুনে আমার মনে খুশির জোয়ার এল। জানলার গ্রিল প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেলি, কবে?

পাগলা দাশু একটু যেন অবাক হয় আমার উৎসাহ দ্যাখে, বলে কে জানে! হয়তো হবেই না, ইনএফিসিয়েন্সি আর ডিসওবিডিয়েন্স-এর জন্য আমাকে কলকাতা থেকে ট্রানসফার করা হয়েছিল, ওরা আমাকে হয়তো ফেরত নেবে না।

আমি নিভে যাই। বলি, ও।

খুশি হলেন না তো!

আমি আবার কথা ঘোরানোর জন্য বলি, সায়ন্তনী আপনাকে চিঠিতে কী লেখে?

কী আর লিখবে? আমরা প্রায় ছেলেবেলা থেকে দু'জনে দু'জনকে ভালবাসি। তাই দু'জনের মধ্যে নতুন কথা তো কিছু নেই। আমাকে ও ভাল থাকতে লেখে, সাবধানে চলতে বলে, মন দিয়ে চাকরি করতে হুকুম দেয়, ঠিক প্রেমের চিঠি নয়। কিন্তু ভাল চিঠি।

সায়ন্তনী আপনাকে কখনও সন্দেহ করে না?

না, কেন করবে? আমি তো অবিশ্বাসের কিছু করিনি!— বলেই হঠাৎ থমকে যায় পাগলা দাশু। সঙ্গে সঙ্গে বলে, না, করেছি, নিশ্চয়ই করেছি। নইলে আমি ভুলতে চাইছি কেন?

আমিও অনেক কিছু ভুলে যেতে চাই। আপনার মতো যদি ভুলতে পারতাম।

কী ভুলতে চান আপনি?

ধরুন এই জানলাটা, এই বাগান, এই কয়েকটা ভোরবেলার কথা। সবচেয়ে বেশি ভুলতে চাই আপনাকে।

ফাজিল।— বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় পাগলা দাশু।

আমি গম্ভীর স্বরে বলি, সত্যি। বিশ্বাস করুন ফুলচোর, এটা ইয়ারকির কথা নয়। আমার সমস্যা অনেক জটিল।

আমি অভিমান করে বলি, লিচুর জন্য আপনার যে দরদ সেটুকুও কি আমার জন্য নেই?

পাগলা দাশু কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে যায়, হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে। তারপর একটু হেসে বলে, লিচু আপনার মতো ফাজিল নয়।

আমি অভিমানের সুরটা বজায় রেখে বলি, এ বাগানে সাপ আছে পোকামাকড় আছে। এই অন্ধকার ভোরে সাপখোপের ভয়কে তুচ্ছ করে শুধু ফাজলামির জন্য কেউ আসে?

ইচ্ছে হয় বলি, রাধা কি কৃষ্ণের কাছে ফাজলামি করতে যেত? কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে, আর পাগলা দাশু সেটাকে আরও ফাজলামি ভাববে বলে চেপে যাই।

পাগলা দাশু সাপের কথায় ভয় পেয়ে বলল, একটা টর্চ নিয়ে আসতে পারেন না!

ও বাবা! তা হলে দরদও তো আছে দেখছি।

আছে। বোধ হয় আছে। কিন্তু আমি জানি আপনি অভিসারে মোটেই আসেন না ফুলচোর, আপনার অন্য কোনও মতলব আছে।

কী করে বুঝলেন?

আপনার মুখ অনেক কথা বলে, চোখ বলে না, আপনি আমাকে জ্বালাতে আসেন। আজও তাই আমাকে আপনার নামটাও বলেননি।

আমার নাম কৃষ্ণা।

হতে পারে। নাও হতে পারে।

বিশ্বাস হয় না আমাকে?

না। কী করে বোঝাই বলুন তো!

এ সব বোঝাতে হয় না ফুলচোর। আপনা থেকেই বোঝা যায়।

ভোর হয়ে আসে। আমি পালিয়ে আসি।

খেলাটা খুবই বিপজ্জনক, এই মফস্‌সল শহরে একবার যদি পাগলা দাশুর সঙ্গে আমার জানালার আড্ডার কথা লোকে জেনে যায় তবে সারা শহরে টি টি পড়ে যাবে। এ তো কলকাতা নয় যে, কারও খবর কেউ রাখে না। তবু আমি ঝুঁকিটা নিই বড় আর এক সর্বনাশ ঠেকাতে।

মা একদিন জিজ্ঞেসই করল, সকালে আজকাল গলা সাধতে বসিস না?

ইচ্ছে করে না!

কত দামি হারমোনিয়ামটা কেনালি, কালীবাবু গুচ্ছের টাকা নিচ্ছেন, তবলচিকে দিতে হচ্ছে। এ তোর কেমন উড়নচণ্ডী স্বভাব?

ভাল লাগে না, কী করব?

তা হলে রোজ ভোরবেলায় উঠে করিস কী?

মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই।

মা মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলে না।

আমি আবার একদিন পাগলা দাশুর জানলায় হানা দিয়ে বলি, আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন?

গ্রে স্ট্রিট।

সেটা কোথায়?

উত্তর কলকাতায়। কেন, গ্রে স্ট্রিট চেনেন না? বিখ্যাত জায়গা।

আমি এবার সন্তর্পণে একটা টোপ ফেলি। বলি, আমি কখনও কলকাতায় যাইনি।

যাননি!— বলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে লোকটা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বলে, তা হলে আগে আমি আপনাকে কোথায় দেখেছি? কলকাতায় নয়? তবে কোথায়?

আপনি আমাকে আগে কখনও দ্যাখেননি।

পাগলা দাশু মাথা নাড়ে, দেখেছি। ভীষণ চেনা মুখ। ভেবেছিলাম কলকাতায় গেলেই আপনাকে আমার ঠিক মনে পড়ে যাবে। তা নয় তা হলে?

না। আমি কলকাতায় যাইনি। যেতে খুব ইচ্ছে করে।— বলতে বলতেও টের পাই, আমার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঢিবঢিব করছে। কলকাতায় গেলে মনে পড়বে? তা হলে আমার সর্বনাশ যে চৌকাঠ ডিঙোবে!

পাগলা দাশু বলে, কখনও কলকাতায় যাননি? সত্যি?

না।— আমি গম্ভীর মুখে বলি, আপনি কবে যাচ্ছেন?

ছুটি পেলেই।

পাননি এখনও?

না, দিচ্ছে না। বন্যার সময় আমি বিনা নোটিসে কামাই করায় খুব গণ্ডগোল চলছে।

তা হলে?

যেতে পারছি না। কিন্তু যাওয়াটা দরকার।

একদিন দুপুরে ম্লানমুখী লিচু এসে বলল, আমাদের হারমোনিয়ামটা আজ পশুপতিবাবু নিয়ে গেল। মাত্র পঁচাত্তর টাকায়।

বলেই আমার নির্জন ঘরের বিছানায় বসে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

বড় কষ্ট হল বুকের মধ্যে। পুরনো ভাঙা একটা হারমোনিয়াম নিয়েই ওর কত সাধ আহ্লাদ!

পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কাঁদছিস কেন? আমার নতুন স্কেল চেঞ্জারটা পড়েই থাকে। তুই যখন খুশি এসে গান গাস।

একটু কেঁদে ও চোখ মুছে বলল, সে কি হয়?

কেন হয় না? এ বাড়িতে তোর কোন ভাসুর থাকে?

তা নয় রে! নিজের হাতের কাছে একটা জিনিস থাকা, ভাঙা হোক, পুরনো হোক, সেটা তবু আমাদের নিজস্ব ছিল।

মাসিমাই বা কেন হারমোনিয়ামটা বিক্রি করেই ছাড়লেন? এটা অন্যায়।— আমি রাগ করে বলি।

লিচু বলে, কর্ণবাবু হারমোনিয়ামটা কেনায় আমাদের বদনাম হয়েছিল। সেই থেকে ওটার ওপর মায়ের রাগ। তা ছাড়া টাকাটাও শোধ দিতে হবে।

লিচুর সমস্যা আমি কোনও দিনই ঠিক বুঝতে পারব না। ওর এক রকম, আমার লড়াই আর এক রকম।

পর দিন ভোরবেলা আমি গিয়ে পাগলা দাশুর জানালায় হানা দিই।

শুনেছেন লিচুদের হারমোনিয়ামটা বিক্রি হয়ে গেল?

শুনেছি।

আমি শ্বাস ফেলে বললাম, মাত্র পঁচাত্তর টাকায়। আপনি কত ঠকে গিয়েছিলেন এবার ভেবে দেখুন।

পাগলা দাশু খুব অপ্রতিভ হেসে বলল, তা বটে। তবে দ্বিতীয়বার দামটা আরও বেশি পড়ে গেল আমার।

তার মানে?

ঘটনাটা ভারী মজার। কাল রাতে পশুপতি এসে হঠাৎ বলল, বলেছিলাম কি না পঁচাত্তর টাকাতেই দেবে! আমি অবাক হয়ে বললাম, কী! পশুপতি বলল, সেই যে লিচুদের হারমোনিয়ামটা! আপনি তো না-হক দুশো টাকা দিয়ে বাজারটাই খারাপ করে দিয়েছিলেন। সেই হারমোনিয়াম আজ আমি পঁচাত্তর টাকায় রফা করে নিয়ে এলাম। শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। লিচুরা হারমোনিয়ামটাকে বড় ভালবাসে। তাই আমি তখন পশুপতিকে বললাম হারমোনিয়ামটা আমি আবার কিনতে চাই। শুনে পশুপতি আকাশ থেকে পড়ে বলল, আবার! আমি বললাম, হ্যাঁ আবার! তখন পশুপতি মাথা চুলকে বলল, আপনার তো দেখছি হারমোনিয়ামটার জন্য বিস্তর খরচা পড়ে যাচ্ছে। আমি দর জিজ্ঞেস করায় পশুপতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, আপনি কিনবেন জানলে কেনা-দামটা আপনাকে বলতাম না। তা কী আর করা যাবে, ওই দুশোই দেবেন, যা ওদের দিয়েছিলেন!

আমি অবাক হয়ে বলি, আবার কিনলেন?

আবার কিনলাম।

কিন্তু লিচুরা কিছুতেই ওই হারমোনিয়াম আপনার কাছ থেকে নেবে না।

জানি। তাই পশুপতিকে সেই ভার দিয়েছি। সে হারমোনিয়ামটা ওদের বাসায় দিয়ে বলে আসবে যে ওর বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না, জায়গা হলে হারমোনিয়াম নিয়ে যাবে।

আমি খুশি হতে পারলাম না কেন কে জানে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, লিচুকে আপনি খুব ভালবাসেন?

বাসলে কি আপনার হিংসে হবে?

জানি না।— আমি থমথমে মুখে বলি।

খুব হাসে পাগলা দাশু। বলে, খুব ভাল পার্ট করছেন আপনি। একদম আসলের মতো। ভীষণ হিংসুটে দেখাচ্ছে আপনাকে।

জবাব না দিয়ে চলে আসি। বুকের মধ্যে বার বার আক্রোশে হুল বিঁধিয়ে দিচ্ছে একটা কাঁকড়াবিছে, এমন জ্বালা।

পাগলা দাশু পিছন থেকে বলল, শুনুন। আমার সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। কাল কলকাতা যাচ্ছি।

ফটকের কাছ বরাবর এসে পড়েছিলাম। হঠাৎ এই বজ্রাঘাতে থমকে দাঁড়াই, তারপর পাথর বাঁধা দুই পা ঠেলে ঠেলে ফিরে আসি নিজের ঘরে।

কাঁদতে বড় সুখ। তাই বালিশে মুখ গুঁজে ভিতরকার পাগলা ঝোরা খুলে দিই।

পাগলা দাশু

মেঘ ফুঁড়ে প্লেন নামছে। পায়ের নীচে বিশাল সেই শহর। এত উঁচু থেকেও তার বুঝি শেষ দেখা যায় না। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চেয়ে থাকি। ক্রমে শহরটা ছুটে চলে আসে আমাকে লক্ষ করে। তারপর আর দেখা যায়। না তাকে। খানিক বড় ঘাসের মাঠ জানালার বাইরে উলটোদিকে ছুটে যায়। ঝম ক'রে দমদম এয়ারপোর্টের কংক্রিটে পা রাখল প্লেন। হু হু করে কলকাতা ঢুকে যাচ্ছে আমার মধ্যে। অত্যন্ত দ্রুত আমার মগজের মধ্যে জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়।

মনে পড়ে গেল। সব মনে পড়ে গেল। ভারী লজ্জা করছিল কলকাতার মুখোমুখি হতে। ভুলে গিয়ে অপরাধী হয়ে আছি। আড়ষ্ট লাগছে একটু। দীর্ঘ প্রবাসের পর ফেরার মতো।

সায়ন।

ডাক শুনে শ্যামলা রোগা, ছোটখাটো মেয়েটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা নিয়ন আলোর মতো জ্বলে উঠল না তো। তবে স্বাভাবিক খুশিই দেখাল ওকে।

বলল, তুমি। কত ভাবছিলাম তোমার কথা। কই চিঠিতে আসবে বলে লেখোনি তো!

হঠাৎ এলাম।

কেমন ছিলে? কেমন জায়গা?

সে অনেক কথা সায়ন। চলো, কলকাতাটা ঘুরে দেখি।

ঠিক আগের মতো আমরা ট্রামে, বাসে উঠে উঠে চলে যাই এখানে সেখানে। ময়দানে, পার্কে, গঙ্গার ধারে, রেস্টুরেন্টে, থিয়েটারে, সিনেমায়। কথা ফুরোতে চায় না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে পড়ে এ কথাটা ওকে বলা হল না। কাল বলব। পরদিন নতুন কথা মনে পড়ে।

আমাদের পুরনো ভাড়াটে বাড়িটার সেই শ্যাওলাধরা কলতলার আঁশটে গন্ধ বুক ভরে নিই। মায়ের আঁচলের গন্ধ নিয়ে রাখি। রাত জেগে আড্ডা দিই ভাইবোনেদের সঙ্গে।

চারদিনের দিন কাকভোরে জানালা দিয়ে সেই স্বর এল।

শুনছেন।

ফুলচোর।— আমি মৃদু হেসে মুখ তুলি।

যাক, চিনতে পারলেন!

পারব না কেন?

চোখের আড়াল হলেই তো আপনি মানুষকে ভুলে যান। তবে এখন এই কলকাতায় কী করে মনে পড়ল আমাকে?

কী জানি। হয়তো আপনাকে ভুলতে চাই না।

কলকাতা কি ফিরে এল আপনার মনে?

এল।

সায়ন্তনী?

সেও।

তা হলে আমি বরং যাই।

শুনুন।

কী?

আমার আর একটা কথাও মনে পড়ছে যে।

কী কথা?

আপনাকে আমি আগে কোথায় দেখেছি।

পলকে মিলিয়ে গেল ফুলচোর।

ঘুম ভেঙে আমি হঠাৎ টানটান হয়ে বিছানায় উঠে বসি। মাথার ঘুমোনো কোনও বন্ধ ঘর থেকে ফুলচোরের জলজ্যান্ত স্মৃতি বেরিয়ে এসেছে। বেশি দিনের কথা তো নয়, মাত্র বছরখানেক।

পরদিনই শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করি। সব শুনে শঙ্কু খুব অপরাধী-হাসি হেসে বলে, সে সময়টায় মাথার ঠিক ছিল না। তোকে বলেই বলছি। ওই শহরে যখন আছিস, তখন সবই তো জানতে পারবি। কাটু আমার আপন পিসতুতো বোন।

কাটু!— আমি ছ্যাঁকা খেয়ে চমকে উঠি। লিচুর মুখে কাটুর কথা শুনেছি না! অমিতদার ভাবী বউ।

শঙ্কু বিষণ্ণ গলায় বলে, দোষটা আমারই। ও রাজি ছিল না।

তারা হোটেলে রাত কাটিয়েছিলি না সেদিন?

কাটিয়েছিলাম। কিন্তু কাটু নরম হয়নি। হলে আজ আমাদের ফ্যামিলিতে একটা বিরাট গণ্ডগোল হয়ে যেত। প্লিজ, এ ব্যাপারটা কাউকে বলিস না।

আমি মাথা নাড়লাম। বলব না।

সায়ন, আমাকে তোমার একটা ফোটো দেবে? আমি নিয়ে যাব।

ফোটো!— সায়ন্তনী একটু অবাক হয়ে বলে, ফোটো তো নেই। তোলানো হয়নি।

আমার যে দরকার।

সায়ন হাসে, তুমি এমন নতুন প্রেমিকের মতো করছ! ফোটো চাই তো আগে বলোনি কেন? তা হলে তুলিয়ে রাখতাম।

আমি ওর হাত ধরে টেনে নিতে নিতে বলি, চলো আজই দু' জনে ছবি তুলিয়ে রাখি।

সায়ন্তনী বাধা দেয় না, তবে বলে, আজ ফোটো তোলালে কি কাল দিতে পারবে? তুমি তো কালই চলে যাচ্ছ।

আমি ওর কথায় কান দিই না।

স্টুডিয়োয় ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সায়ন্তনী আমার কানে কানে বলল, আমার ছবি ভাল ওঠে না।

ভালর দরকার নেই।

কেন চাইছ ছবি? শীতকালেই তো বিয়ে। আর ক'টা মাস।

হোক সায়ন। এই ক'টা মাসই হয়তো বিপজ্জনক।

কীসের বিপদ?

ফোটোগ্রাফার দৃঢ় স্বরে বলল, আঃ! কথা বলবেন না। আর একটু ক্লোজ হয়ে দাঁড়ান দু' জনে।...আর একটু...নড়বেন না...রেডি...

সায়ন্তনী খুক করে হেসে ফেলে। ক্যামেরার একটা প্লেট নষ্ট হয়। ফোটোগ্রাফার রেগে যায়। আবার তোলে।

বেরিয়ে এসে সায়ন্তনী বলে, বাব্বা! ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে যা বুক ঢিবঢিপ করে!
কেন বুক ঢিবঢিব করে সায়ন?
কী জানি বাবা! মনে হয় একচোখো যন্ত্রটা আমার কী না জানি দেখে নিচ্ছে।
কী দেখবে! ক্যামেরাকে আমরা যা দেখাই তাই দ্যাখে। তার বেশি দ্যাখার সাধ্যই ওর নেই।
তবু ভয় করে।
মানুষের চোখ ক্যামেরার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পারে, মানুষের চোখকে ভয় পাও না?
তোমার সব উদ্ভট প্রশ্ন, জানি না যাও। শোনো, তুমি কেন বললে এই ক'টা মাসই বিপজ্জনক?
ও এমনি।
তা নয়। তুমি কিছু মিন করেছিলে।
আমি ওর হাত ধরে মৃদু ভাবে চেপে রাখি মুঠোয়। বলি, আমার সব কিছুই কেন অন্য রকম বলো তো!
কী রকম?
অন্য রকম। আমার জানালা দিয়ে পাহাড় দেখা যায়। সে ভীষণ উঁচু পাহাড়, অদ্ভুত তার রং। যেখানে ভয়ংকর জোরে বৃষ্টি নামে। গাছপালা ভীষণ ঝাঁঝালো।
সায়ন্তনী সামান্য রুক্ষ স্বরে বলে, ও জায়গাটা তো আর রূপকথার দেশ নয়। ওরকমভাবে বলছ কেন?
তা ঠিক। তবু আমার যেন কী রকম হয়।
কী হয়, বলবে?
আমার কিছুতেই কলকাতার কথা মনে পড়ে না। তোমার কথাও না।
তাই ফোটো তুলে নিলে?
হ্যাঁ।
সায়ন্তনী ম্লান মুখে হেসে বলল, জানলা দিয়ে পাহাড় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না তো?
আর কী?
কোনও মহিলাকে?
যাঃ, কী যে বলো!
লোকে এমনি-এমনি তো ভুলে যায় না! পাহাড়, প্রকৃতি, বৃষ্টি এগুলো কি ভুলে যাওয়ার কারণ হতে পারে?
না, তা হয়তো নয়।
তবে কী?
আমি ক্লিষ্ট হেসে বলি, বোধ হয় মাথায় সেই চোট হওয়ার পর থেকে আমার ব্রেনটা একটু ডিফেক্টিভ হয়ে আছে সায়ন।
সায়ন্তনী ভ্রু কোঁচকায়। বলে, তোমার ব্রেন খারাপ হলে আমি সবচেয়ে আগে টের পেতাম। তোমার মাথায় কোনও দিন কোনও গোলমাল হয়নি।
তবে ভুলে যাচ্ছি কেন?
একদিন তুমিই তা বলতে পারবে।
তুমি পারো না?
না।— সায়ন্তনী মাথা নাড়ে, আমি তোমার কী-ই বা জানি বলো? ওখানে গিয়ে তোমার কী হল তা এতদূর থেকে বলব কী করে? তবে মনে হচ্ছে তুমি ফিরে গিয়ে আবার আমাকে ভুলে যাবে।
না না।— বলে আমি ওর হাত চেপে ধরি! তারপর শিথিল অবশ গলায় বলি, আমি তো ভুলতে চাই না।

বলেই মনে হয়, মিথ্যে বললাম নাকি?

পরদিনই আমি দার্জিলিং মেল ধরি। সঙ্গে সদ্যতোলা সায়ন্তনীর ছবি। বারবার নিজেকে আমি বোঝাই, ভুলব না। এবার ভুলব না।

বাংকে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত্রি ভেদ করে ট্রেন চলেছে। ভোর হবে এক আশ্চর্য সুন্দর অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি উপত্যকায়। শরৎকাল আসছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ উপুড় করে দেবে তার রোদ। সে ভারী সুন্দর জায়গা। আমি সেখানে যাচ্ছি।

কে যেন গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকল, শুনছেন?

উঁ!

আপনার জলের ফ্লাস্কটা একটু নেব? আমাদেরটায় জল নেই।

নিন না। ওই তো রয়েছে।

বলে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তে থাকি। ঘুমচোখে অস্পষ্ট দেখতে পাই, আমার ফ্লাস্ক খুলে নীচের সিটে একটা বাচ্চা ছেলেকে চুকচুক করে জল খাওয়াচ্ছে তার মা, আর তার বাবা মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখছে।

আহা, দৃশ্যটা বড় সুন্দর। দেখতে দেখতে আমি ঘুমে ঢলে পড়ি। কাল আমি আবার সেই মহান পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে পাব। অন্ধকারে হঠাৎ জাহাজের মতো ভেসে ওঠে ভোরের পাহাড়, ব্রোঞ্জের রং ধরে। ব্রোঞ্জ ক্রমে সোনা হয়।

কাকভোরে ফুলচোর আসবে ঠিক। ডাকবে, শুনছেন!

আপনার ঘড়িটা! ও মশাই!

আমি ঘুমের টিকিট আঁটা চোখ খুলে বলি, উঁ।

ঘড়িটা দিয়ে দিন।

আমি বাঁ হাতের ঘড়িটা খুলে লোকটার হাতে দিয়ে দিই। চোখ বুজেই দেখি, পাহাড়ের গায়ে সেই পাথরটায় বসে আছি। ঘণ্টানাড়া একটা পাখি ডাকছে। ঝোরার শব্দ।

পেটে একটা খোঁচা লাগে। ককিয়ে উঠে আবার চোখ মেলি। প্রবল হাহাকারের শব্দ তুলে উন্মত্ত ট্রেন ছুটছে। প্রচণ্ড তার দুলুনি। মুখের সামনে আর একটা কাঠখোট্টা মুখ ঝুঁকে আছে।

আপনার মানিব্যাগটা?

হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগটা ঘুমন্ত হাতে বের করে দিয়ে দিই। তারপর ঘুমে তলিয়ে যাই আবার। ঘুমের মধ্যে লিচুদের হারমোনিয়ামটা প্যাঁ-পোঁ করে বাজতে থাকে। বারবার বাজে। বেজে বেজে বলে, সখি ভালবাসা কারে কয়, সে কি শুধুই যাতনাময়...

কে যেন একটা লোক বিকট চেঁচিয়ে বলছে, শব্দ করলে জানে মেরে দেব! চোওপ শালা! জানে মেরে দেব! কেউ শব্দ করবে না। জান নিয়ে নেব!

ফের আমাকে কে যেন ধাক্কা দেয়, আর কী আছে? ও মশাই আর কী আছে?

কে যেন কাকে একটা ঘুসি বা লাথি মারল পাশের কিউবিকলে। 'বাবা রে!' বলে ককিয়ে উঠে একটা লোক পড়ে যায়। তারপর ভয়ে বীভৎস রকমের বিকৃত গলায় বলে, মেরো না! মেরো না! দিচ্ছি!

আর একটা শব্দ করলে মাল ভরে দেব! চোওপ শুয়োরের বাচ্চা।

একটা হাত আমার কোমর, পকেট, জামার নীচে হাতড়াচ্ছে। আমি চোখ মেলে চাইতেই মুখের সামনেকার হলুদ আলোটা কটকট করে চোখে লাগল।

কী চাই?— আমি কাঠখোট্টা মুখটার দিকে তাকিয়ে বললাম।

আর কী আছে?

আমি চোখ বুজে বলি, কিছু নেই।

হয়তো আবার ঘুমের ঝোঁক এসেছিল। আবার কে যেন ডাকল, শুনছেন?

ফুলচোর! আমি মাথা তুলে শিয়রের জানলাটা দেখতে চেষ্টা করি।

শুনছেন! শুনছেন!— খুব চাপা জরুরি গলায় আমাকে ডাকছে কেউ। নীচের সিটে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল।

শুনুন না। শুনছেন না কেন?— বলতে বলতে কেঁদে ওঠেন একজন মহিলা।

আমি চোখ চাই।

কী হয়েছে?

সেই বাচ্চার মা মুখ তুলে চেয়ে আছে আমার দিকে। মুখে আতঙ্ক, চোখে জল।

ওরা আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। কী হবে?

কারা?— আমি বিরক্তির গলায় বলি।

ডাকাতরা। এতক্ষণ ধরে কী কাণ্ড করল টের পাননি? প্লিজ! কেউ কিছু বলছে না ওদের।

শুনতে শুনতেই আমি নেমে পড়তে থাকি বাংক থেকে।

আপনার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল কেন?

বাচ্চার হাত থেকে বালা নিতে চেয়েছিল, আমার হ্যান্ডব্যাগ নিতে দিচ্ছিল না। ওই শুনুন।

বাথরুমের দিক থেকে একটা কান ফাটানো আওয়াজ আসে। বোধ হয় চড়ের আওয়াজ।

কামরার সব লোক চোখ চেয়ে স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। নড়ছে না।

আমি বরাবর দেখেছি, আমি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই আমার শরীর তার কাজে নেমে পড়ে। এ দুইয়ের মধ্যে বোধ হয় একটা যোগাযোগের অভাব আছে।

বাথরুমের গলিতে অল্প আলোয় একটা লোককে গাড়ির দেয়ালে ঠেসে ধরে আছে চার মস্তান। হাতে ছোরা, রিভলভারও।

একবার দু'বার মার খাওয়ার পর আর মারের ভয় থাকে না। আমার ভয় অবশ্য প্রথম থেকেই ছিল না। আমি বহুবার মার খেয়েছি। আমার মাথার একটা অংশ বোধ হয় আজও ফাঁকা।

আমি কিছু ভাবি না। পিছন থেকে চুল ধেরে দুটো লোককে সরিয়ে দিই হ্যাঁচকা টান মেরে। রিভলবারওয়ালা ফিরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আমার লাথি জমে যায় তার পেটে।

কমিকসের বীরপুরুষরা একাই কত লোককে ঘায়েল করে দেয়। জেমস বন্ড আরও কত বিপজ্জনক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সিনেমার হিরোরা অবিরল ক্লান্তিহীন মারপিট করে যেতে পারে।

হায়! আমি তাদের মতো নই।

তবু প্রথম ঝটকায় ভারী চমৎকার কাজ হয়ে যায়। একটা লোক বসে কোঁকাচ্ছে, বাকি তিনটে ভ্যাবাচ্যাকা। কিন্তু সেটা পলকের জন্য মাত্র।

আমি আর একবার হাত তুলেছিলাম। সে হাত কোথাও পৌঁছোয় না। একজন চাপা ভয়ংকর গলায় বলল, ছেড়ে দে। আমি দেখছি।

পিঠের দিক থেকে একটা ধাক্কা খাই। একবার, দু'বার।

ধাক্কাগুলো সাধারণ নয়। কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। পেটটা গুলিয়ে ওঠে। মাথাটা চক্কর মারতে থাকে।

কে যেন বলল, আর একটু ওপরে আর একবার চালা!

চালাল। তৃতীয়বার ছড়াৎ করে খানিকটা রক্ত ছিটকে আসে সামনের দিকে।

আমি মুখ তুলি। দেয়ালে ঠেস দেওয়া বাচ্চার বাবা আমার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে।

আমি তাকেই জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে আমার?

লোকটা হতভম্বের মতো মাথা নেড়ে জানাল, না।

আমি অবাক হই। কিছু হয়নি? তবে আমার দুটো হাতের আঙুল কেন কুঁকড়ে আসে? কেন উঠতে পারছি না? পায়ের কাছে কেন এক পুকুর রক্ত জমা হচ্ছে?

চারটে লোক সরে যায় দু' দিকে দরজার কাছে। উপুড় হয়ে আমি বসে আছি। কিন্তু বসে থাকতে পারছি না। বড় ঘুম। বমি পাচ্ছে। শরীরটা চমকে চমকে উঠছে।

পিছন থেকে বাচ্চার মা ডাকছে, চলে এসো। কী বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ ওখানে?

বাচ্চার বাবা চমকে ওঠে। তারপর সাবধানে রক্তের পুকুরটা ডিঙিয়ে বাচ্চার মায়ের কাছে যায়। তারপর তারা বোধ হয় ফিরে গেল তাদের বাচ্চাটার কাছে। যাবেই তো! বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদছে।

ট্রেন হুইসিল দিচ্ছে বার বার । কুক কুক কু—উ। কুক কুক কু—উ! থেমে আসছে গাড়ি। দু' দিকের দরজা খুলে যায়। চারটে লোক নেমে গেল।

আমার গলা দিয়ে ঘরর ঘরর করে একটা শব্দ হয়। জিভে সামান্য ফেনা। ধোঁয়াটে চোখেও আমি দেখতে পাই, মুখের ফেনার রং লাল।

হঠাৎ কামরায় তুমুল হট্টরোল ফেটে পড়ল। কারা চেঁচাচ্ছে, খুন! খুন! ডাকাত! বাঁচাও! খুবই ক্ষীণ শোনায় সেই শব্দ। আমার কানে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ঘন, তীব্র, একটানা।

কয়েকজন আমাকে তুলছে মেঝে থেকে। চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। লাভ নেই।

সায়ন!

তুমি আমার কেউ না।

আঃ সায়ন!

আমি তোমাকে ভুলে গেছি।

উঃ সায়ন।

ছবিটা ফেরত দেবে? আমাদের জোড়া ছবি কারও হাতে পড়লে কী ভাববে বলো তো! তুমি বেঁচে থাকলে এক কথা ছিল। তা যখন হচ্ছে না তখন কেন ওটা রাখবে? দাও নষ্ট করে ফেলি।

আমি ওর কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝতে পারি। ছবিটা বের করে ওর হাতে দিই। ও বসে বসে ছিঁড়তে থাকে।

লিচু!

ওঃ দারুণ মজা! দারুণ মজা!

কেন লিচু?

দেখুন, কত বার হাতবদল হয়ে আমাদের হারমোনিয়াম আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। খুশি তো লিচু?

ভীষণ। হারমোনিয়াম থাকলে আর কিছু চাই না। ঘর না, বর না, টাকা পয়সা না।

একদিন জ্যোৎস্নারাতে তুমি কিন্তু আমাকে চেয়েছিলে লিচু!

উঃ!— লিচু লজ্জায় মুখ ঢাকে। বলে, তা ঠিক। তবে গরিবরা সব সময়ই এটা চায়, ওটা চায়। না পেলেও দুঃখ হয় না আমাদের। আপনি কিছু ভাববেন না। হারমোনিয়াম আমাকে সব ভুলিয়ে দেবে।

শিয়রের জানালায় ফুলচোর ডাক দেয়, শুনছেন!

ফুলচোর!

কলকাতায় কী হল?

সে অনেক কথা।

ম্লান মুখে বিষণ্ণ গলায় ফুলচোর বলল, আমাকে চিনতে পারলেন শেষমেষ?

না, ফুলচোর।

বললেন যে সেদিন!

ওটা মিথ্যে কথা। আপনি তো কোনওদিন কলকাতায় যাননি।

ফুলচোর জানালার গ্রিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ওঠে, আপনি সব জানেন, আপনি সব জানেন। এখন আমার কী হবে?

কিছু হবে না। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আমি কাউকে বলিনি। কোনওদিন বলব না। ভুলে যাব। দেখবেন।

ফুলচোর চোখের জল মুছে হাসে, আমি জানতাম, আপনি কখনও অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আপনার মন বড় সুন্দর। লিচুদের হারমোনিয়ামটা নইলে আপনি কিনতেন না।

পশুপতিকে বলবেন লিচুদের হারমোনিয়ামটা যেন দিয়ে দেয়।

বলব।

এই জানলাটা এখন কি খুব ফাঁকা লাগবে আপনার?

ওমা! লাগবে না? আমি তো রোজ আসি। যখন আপনি ছিলেন না তখনও। ফাঁকা জানলায় একা একা কত কথা কয়ে যাই।

ফাজিল।

ফুলচোর তাকায়। চোখে করুণ দৃষ্টি।

কোনওদিন বোঝেননি আপনি।— বলতে বলতে ফুলচোরের সুন্দর ঠোঁটজোড়া কেঁপে ওঠে।

কী বুঝব?

আমি বুঝি শুধু আপনার সেই আমাকে মনে পড়ার ভয়ে আসতাম?

তবে?

আমি আসতাম ফুল তুলতে।— স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলে ফুলচোর।

আমি চেয়ে থাকি। বুকের মধ্যে ডুগডুগির শব্দ।

ফুলচোর অকপটে চেয়ে থেকে বলে, একটা সাদা ফুল। ছোট্ট, সুন্দর।

ফাজিল।

দেবেন সেই ফুলটা আজ? দিন না!

ফুলচোর হাত বাড়ায়। গভীর গাঢ় স্বরে বলে, সাদা সুন্দর ফুলের মতো ওই হৃদয়। দেবেন?

আমি চোখ মেলি। হাসপাতালের ঘর নয়? তাই হবে। উপুড় করা রক্তের বোতল থেকে শিরায় ড্রিপ নেমে আসছে। নাকে নল।

একটা কালো ঢেউ আসে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, গাড়ি বদল! গাড়ি বদল!

মাঝরাতে অন্ধকার এক জংশনে গাড়ি থেকে নামি। ঘোর অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওপাশে এক অন্ধকার ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠি। একা।

জানলার ধারে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে থাকি।

ট্রেন ছাড়ে। দুলে দুলে চলে। কোথায় যাচ্ছি তা প্রশ্ন করতে নেই। কেউ জবাব দেবে না।

তা ছাড়া কোথায় যাচ্ছি তা তো আমি জানি।

কিন্তু জানালায় তবু ফুলচোরের মুখ ভেসে আসে। করুণ, তীব্র এক স্বরে সে বলে, পৃথিবী আর সুন্দর থাকবে না যে। ফুল ফুটবে না আর! ভোর আসবে না। আপনি যাবেন না, আমাকে দয়া করুন।

আপনাকে দয়া, ফুলচোর? হাসালেন!

কেন যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? আমাদের কাছে থাকতে আপনার একটুও ইচ্ছে করে না?

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করি। বলি, বড় মারে এরা। বড় ভুল বোঝে। প্রত্যাখ্যান করে। তার চেয়ে এই লম্বা ঘুমই ভাল। অনেক দিন ধরে আমি এই রকম ঘুমিয়ে পড়তে চাইছি ফুলচোর।

আমি যে রোজ একটা ফুলই তুলতে আসতাম তা কি জানেন?

জানি।

আজও সেই ফুল তোলা হল না আমার। পৃথিবীতে তো সেই ফুল আর ফুটবে না কোনও দিন। প্লিজ!

আমি ক্লান্ত বোধ করি। বলি, আপনি বাগদত্তা, ফুলচোর।

খুব জানেন। বোকা কোথাকার!

নন?

নই।

আর সায়ন?

পৃথিবীতে আর কেউ আমার মতো অপেক্ষা করছে না আপনার জন্য। শুধু আমি। শুধু একা আমি।

কেন ফুলচোর?

ওই সুন্দর সাদা ছোট্ট ফুল, ওটা আমার চাই।

আস্তে আস্তে গাড়ি থামে। পিছু হাঁটে। আবার জংশন। আবার গাড়ি-বদল।

চোখের পাতায় হিমালয়ের ভার। তবু আমি আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাই।

দিন যায়

সীতাকে বহুকাল বাদে দেখল মনোরম।

দেখল, কিন্তু দেখা-হওয়া একে বলে না। দুপুরে উপর্ঝরণ বৃষ্টি গেছে। তারপর মেঘভাঙা রোদ উঠেছে। সমস্ত কলকাতা জলের আয়না হয়ে বেলা চারটের রোদকে ফেরত দিচ্ছে। ভবানীপুরের ট্রাম বন্ধ, চৌরঙ্গির মুখে জ্যাম। সবকিছু থেমে আছে, রোদ ঝলসাচ্ছে, ভ্যাপসা গরম। মনোরমের পেটে ঠাণ্ডা বিয়ার এখন দুর্গন্ধ ঘাম হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের কাজ করা মোটা পাঞ্জাবি আর বিনির টেরিকটন স্ট্রাইপ বেলবটম প্যান্টের ভিতর মনোরম নিজের শরীরে কয়েকটা জলধারা টের পাচ্ছে। গরম, পচা, লালচে ঘাম তার। সীতা রাগ করত।

বিয়ারটা খাওয়াল বিশ্বাস। নতুন কারবার খুলেছে বিশ্বাস। ভারী নিরাপদে কারবার, ক্যাপিট্যাল প্রায় 'নিল'। কলকাতার বড় কোম্পানিগুলোর ক্যাশমেমো ব্লকসুদ্ধু ছাপিয়েছে, সিরিয়াল নম্বর-টম্বর সহ। ব্যবসাদার বা কন্ট্রাক্টররা আয়কর ফাঁকি দিতে বিস্তর পারচেজ দেখায়। সেইসব ভুয়ো পারচেজের জন্য এইসব ভুয়ো রসিদ। মাল যদি না কিনে থাক তবে 'কন্ট্যাক্ট বিশ্বাস। হি উইল ফিক্স এভরিথিং ফর ইউ।' যত টাকার পারচেজই হোক রসিদ পাবে, এন্ট্রি দেখাতে পারবে। সব বড় বড় কোম্পানির পারচেজ ভাউচার। বিশ্বাস এক পারসেন্ট কি দু পারসেন্ট নেবে। তাতেই অঢেল, যদি ক্লায়েন্ট আসে ঠিকমতো।

কিন্তু কারবারটার অসুবিধে এই যে, বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। হাশ পাবলিসিটি। লোকে জানবে কী করে যে কলকাতার কোন গাড্ডায় বিশ্বাস বরাভয় উঁচিয়ে বসে আছে উদ্বিগ্ন আয়করদাতাদের জন্য? যে সব চেনা লোক কলকাতার বাজারে চালু আছে, তাদেরই বলে রাখছে সে। কমিশন দেবে।

—দিস ইজ দি জিস্ট ব্যানার্জি! বিশ্বাস বলল—এবার ইন্টারেস্টেড মক্কেলদের টিপ্‌সটা দেবেন।

মনোরম কলকাতার ঘুঘু। শুনে-টুনে মৃদু একটু হাসল, বলল—বিশ্বাস, এর চেয়ে চিট ফান্ডের ব্যবসা করুন। এটা পুরনো হয়ে গেছে। কলকাতায় অন্তত ত্রিশটা রসিদ কোম্পানিকে আমি চিনি।

বহুকাল আগে একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছিল মনোরম। শরীরে কাটাছেঁড়াগুলো মিলিয়ে গেছে, ভাঙা হাড় জুড়ে গেছে। কেবল জিভটাই এখনও ঠিক হয়নি। দাঁত বসে গিয়ে জিভটা অর্ধেক নেমে গিয়েছিল। জোড়া লেগেছে বটে, কিন্তু কথা বলার সময়ে থরথর করে কাঁপে। কথাগুলো একটু এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। কিন্তু তাতে আত্মবিশ্বাস এতটুকু কমেনি মনোরমের।

বিশাল থলথলে চেহারার বিশ্বাস উত্তেজনায় চেয়ারে নড়ে বসল। মোকাম্বোর মজবুত চেয়ার তাতে একটু নড়বড় করে। প্রকাণ্ড গরম শ্বাস ফেলে বিশ্বাস ঝুঁকে মুগুরের মতো দুখানা হাতের কনুই দিয়ে ভর রাখল টেবিলের ওপর। বলল—ব্যানার্জি, আমার তিন মাসের ব্যবসাতে কত লাভ হয়েছে জানেন?

—কত?

বিশ্বাস শুধু মুখটা গম্ভীরতর করে অবহেলায় বলে—হুঁ।

মনোরম বলল—কিন্তু কম্পিটিশন তো বাড়ছে এ কারবারেও!

—ট্যাক্স পেয়ার কি কমে যাচ্ছে? জোচ্চুরি কমেছে? যতদিন এদেশে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসা থাকবে, ততদিন আমারও ব্যবসা থাকবে। এর মধ্যেই আমার ক্লায়েন্ট তিনশো ছাড়িয়ে গেছে, দু-আড়াই লাখ টাকার রসিদ ইসু হয়েছে। অ্যান্ড উইদাউট মাচ পাবলিসিটি। আপনার স্বভাব হচ্ছে সব ব্যাপারের নৈরাশ্যের দিকটা দেখা। ভেরি ব্যাড।

বিশ্বাস ঠিক বলেনি। মনোরমের এটা স্বভাব নয়। নৈরাশ্যের দিকটা সে কখনও দেখে না।

বিশ্বাস বিয়ার খায় সরাসরি বোতল থেকে। বোতলের শেষ কয়েকটা ফোঁটা গলায় ঢেলে আবার নতুন বোতলের অর্ডার দিল। তারপর তেমনি মনোরমের মুখে ঝোড়ো লু-বাতাসের মতো শ্বাস ফেলে বলল—দেন?

মনোরম কিছুক্ষণ এক ঢোঁক বিয়ার মুখে নিয়ে তিতকুটে স্বাদটায় জখম জিভটা ডুবিয়ে রাখল। মুখের

ভিতরে ঠিক যেন একটা জিওল মাছ নড়ছে। গিলে ফেলল বিয়ারটা। আস্তে করে বলল—কত কমিশন?

—আমার কমিশন থেকে টুয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট দেব।

—আর একটু উঠুন।

—কত?

—ফিফটি।

বিশ্বাস ভ্রূ তুলল না, বিস্ময় বা বিরক্তি দেখাল না। একটু হাসল কেবল। বিশ্বাস পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। তবু ওর দাঁতগুলো এখনও ঝকঝকে। নতুন বোতলটা তুলে নীরবে অর্ধেক শেষ করল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলল—ফিফটি! অ্যাঁ?

—ফিফটি।

—ব্যানার্জি, আমি যেমন প্রফিট করি তেমন রিস্কটা আমারই। ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে গভর্নমেন্ট কী রকম হুজ্জত করে আজকাল জানেন না? যদি ধরা পড়ি তো মোটা হাতে খাওয়াতে হবে নয়তো শ্বশুরাল ঘুরিয়ে আনবে। আমার প্রফিটের পারসেন্টেজ সবাই চায়, রিস্কের পারসেন্টেজ কেউ নেয় না। এটাই মুশকিল।

বিশ্বাস তেমন ঝোড়ো শ্বাস ছাড়ে। ওর নাকের বড় বড় লোমের গুছি বের হয়ে আসে। গালের দাড়ি অসম্ভব কড়া, তাই রোজ কামালেও গালে দাড়ির গোড়া সব গোটার মতো ফুটে আছে। ঘন ভ্রূ। আকাশি রঙের বুশ শার্টের বুকের কাছ দিয়ে কালো রোমশ শরীর দেখা যায়। গলায় সোনার চেন-এ সাঁইবাবার ছবিওলা ছোট্ট লকেট।

মনোরম মুখে বিয়ার নিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে ডুবিয়ে রাখে বিয়ারে। মুখের ভিতরে একটা চুকচুক শব্দ হতে থাকে। শালার জিভটা নড়ছে অবিকল ছোট্ট মাছের মতন।

রসিদের কারবারটা মনোরমের কাছে ছেলেমানুষির মতো লাগে। সে আস্তে করে বলল—আজকাল ফলস রসিদ টিকছে না। স্পটে গিয়ে এনকোয়ারি হয়, কোম্পানি নিজেদের সিরিয়াল নম্বর দেখে বলে দেয় যে, রিয়্যাল পারচেজ হয়নি। তখন মক্কেলরা ঝোলে।

বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বলে—ঝুলবে কেন? আজকাল কেউ ঝোলে না। ধরা পড়লে খাওয়াবে কিছু।

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে—খাওয়াবে আর খাওয়াবে। কত খাওয়াবে মশাই? এত খাওয়ালে নিজে খাবে কী? তার ওপর ফলস রসিদ ধরা পড়লে ক্রিমিনাল কেস হয়ে যায়।

বিশ্বাস ঝুঁকে বলল—আপনি আমার ইয়ে বোঝেন। আমি আরও তিনটে কোম্পানি চালাই ব্যানার্জি। সেগুলো অনেক বেশি রিস্কি। বলে উত্তেজিত বিশ্বাস ধবধবে সাদা রুমালে ঘেমো কপালটা মুছল। তারপর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে বলল—আপনার ওই একটা বড় বদ স্বভাব। পেসিমিস্টিক অ্যাটিচুড। ভেরি ব্যাড।

মনোরম নিরুৎসাহের হাসি হাসে।

বিশ্বাস বলল—একটা কথা মনে রাখবেন। না সুন্দরী বউ যার, হয় না যার শালা, তার ঘরে অলক্ষ্মী অচলা।

—মানে?

—মানে হচ্ছে 'না' কথাটা যার সুন্দরী বউয়ের মতো প্রিয়, 'হয় না' কথাটাকে যে নিজের শালার মতো খাতির-যত্ন করে, সে কখনও সাকসেসফুল হতে পারে না।

মনোরম বালকের মতো হাসে। এমন সে অনেকদিন হাসেনি।

বিশ্বাস স্মিতমুখে বলে—এক মহাপুরুষের কথা। আমি অবশ্য বাজে ব্যাপারে প্রয়োগ করলাম।

—ঠিক আছে। মনোরম বলল—আমি দেখব।

—টুয়েন্টি ফাইভ?

—টুয়েন্টি ফাইভ।

বিশ্বাস আত্মতৃপ্তিতে হাসল। বলল—এটা আমার সাইড বিজনেস। না টিকলেও ক্ষতি নেই।

বন্ধুবান্ধবদের বলছি, যদি কাউকে কিছু টাকা পাইয়ে দিতে পারি। আপনার অবস্থা তো ভাল যাচ্ছে না ব্যানার্জি!

মনোরম মাথা নেড়ে বলল—না।

বিশ্বাস দুঃখিত গলায় বলল—দ্যাট উওম্যান?

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে—দ্যাট উওম্যান।

বিশ্বাস গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলে—ব্যানার্জি, বউ বিশ্বাসী না হলে ভারী মুশকিল। আমাদের মতো বয়সে পুরুষ মানুষের বউ ছাড়া আর বিশ্বস্ত কেউ তেমন থাকে না। আমারও সব কিছু বউয়ের নামে। বাড়ি, গাড়ি এভরিথিং। বউটা দজ্জালও বটে, কিন্তু ফেইথফুল।

মনোরম টাকরা দিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে চেপে ধরে থাকে। রক্তের ঝাপটা তার মুখে লাগে। কান দুটো গরম হয়ে ওঠে।

বিশ্বাস সেটা খেয়াল করল না। বলল—দুপুরে বিজনেস পিক আওয়ার্স বলে বিয়ার বেশি খাই না। তারপর সন্ধে হলে স্কচ থেকে শুরু করে দেশি কত কী গিলব তার ঠিক নেই। রাত দশটায় যখন ফিরব বউ ফারনেস হয়ে আছে। কলিং বেল টিপে আধতলা সিঁড়ি নেমে রেলিংয়ের পাশে লুকিয়ে বসে থাকি। বউ দরজা হাট করে খুলে দেয়, তারপর উঁকিঝুঁকি না দিয়ে ভিতরে অপেক্ষা করে। আমি তখন আবার উঠে আসি। ভিতরে ঢুকি না। বাইরে থেকে এক পাটি জুতো পা থেকে খুলে ভিতরে ছুড়ে দিয়ে অপেক্ষা করি। যদি জুতোটা খুব জোরে ঘর থেকে ব্যাক করে আসে তবে বুঝি বউ আজ আপসে আসবে না, জোর খিচান হবে। যদি জুতো ব্যাক না করে তবে বুঝি বউ খুব খিচান করবে না, বউ বড় জোর বাপ-মা তুলে দু-একটা গালাগাল দেবে।

মনোরম এক নাগাড়ে হাসছে। গাল ব্যথা হয়ে গেল। বলল—থামুন মশাই, বিষম খাব।

—ব্যাপারটা কিন্তু একজ্যাক্টলি এরকম। বাড়িয়ে বলছি না। যেদিন খিচান হয় সেদিন বউ মারধোরও করে। চুল ধরে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে যায়, তারপর দরজা বন্ধ করে...

—বাথরুমে কেন?

—বাঃ, ছেলেমেয়েরা রয়েছে না! বলে বিশ্বাস সুখী গৃহস্থের মতো হাসে। বিশ্বাসের চেহারাটা যদিও মা দুর্গার পায়ের তলাকার অসুরটার মতোই—কালো, প্রকাণ্ড রোমশ এবং বিপজ্জনক, তবু এখন তার মুখখানা একটা গার্হস্থ্য সুখের লাবণ্যে ভরে গেল। বলল—কিন্তু তবু আমার বউ ফেইথফুল। লাইক এ বিচ। নানারকম মেয়েলি রোগে ভুগে শরীরটা শেষ করেছে। আমি আবার একটু বেশি সেক্সি, তাই আমাকে ঠিক এন্টারটেন করতে পারে না, অ্যান্ড আই গো টু আদার গার্লস।

—বউ জানে?

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বলে—জানে মানে আন্দাজ করে। তবে চুপচাপ থাকে। ভেরি কনসিডারেট। এটা তো ঠিক যে সে শরীরটা দিতে পারে না। তাই শরীর আমি বাইরে থেকে কিনি। কিন্তু তা ছাড়া আমিও ফেইথফুল।

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বললেও ওর ফিসফাস কথা দশ হাত দূর থেকে শোনা যায়। মনোরম আশপাশের টেবিলে একটু চেয়ে দেখে নিল। তারপর বলল—আপনি সুখী?

—খুব। আপনার কেসটা কী?

—বনত না।

—কেন?

—বুঝতে পারতাম না। তবে আমাদের দুজনেরই ছিল পরস্পরের প্রতি এক রকমের রিপালশান। সেটা বেড়ে বেড়ে একসময়ে কানেকশন কেটে গেল।

—স্যাড।

মনোরম মৃদু একটু হাসল। বলল—আরও স্যাড যে, আমিও অন্য সকলের মতো বউয়ের নামে টাকা রাখতাম, জমি কিনেছিলাম, লকারেও কিছু ছিল। সেগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল।

—কিছু রিয়ালাইজ করতে পারেননি?

—না। আমি প্রায় ব্যাঙ্করাপ্ট। আমার সম্বন্ধী দুঁদে অ্যাডভোকেট। ডিভোর্সের সময়ে মাসোহারা ও

বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। বিশ্বাস, আমার একটা ওপেনিং দরকার। যে কোনও একটা কাজ। আমি আবার দাঁড়াতে চাই।

বিশ্বাস গম্ভীর এবং সমবেদনার মুখ করে বলল—দেখব ব্যানার্জি, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

—দেখবেন।

বিয়ার শেষ করে দুজনেই উঠেছিল। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা পার্ক স্ট্রিটটাকে কুচকুচে কালো দেখাচ্ছিল। জলে ছায়া ফেলে নিথর দাঁড়িয়ে ছিল বিশ্বাসের গাড়িখানা। পুরনো মরিস। তার সাদা রংটা থেকে মেঘভাঙা রোদ পিছলে আসছে।

বিশ্বাসের গাড়িতে একটা লিফট পেতে পারত মনোরম। কিন্তু রেস্তরাঁর দরজায় বিশ্বাস তার একজন চেনা লোক পেয়ে গেল হঠাৎ।

অবিকল টেলিফোনে কথা বলার মতো বিশ্বাস চেঁচিয়ে বলল—হ্যালো! অরোরা, ইজনট ইট? বিসোয়াস হিয়ার।

দুজনে আবার ঢুকে যাচ্ছিল রেস্তরাঁয়। বিশ্বাস ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—আচ্ছা ব্যানার্জি, বাই।

মনোরম হাতটা তুলল। তারপর পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে লাগল পশ্চিমমুখো।

ময়দানের ধার ঘেঁষে দক্ষিণমুখো ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এতক্ষণ লোকজন বৃষ্টির জন্য আটকে ছিল গাড়ি-বারান্দায়, দোকানঘরে, বাস-স্টপের শেড-এ। এখন সব সরষেদানার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারধারে। ট্রাম বন্ধ, বাসে তাই লাদাই ভিড়। হাতে পায়ে চুম্বকওয়ালা কলকাত্তাই লোকেরা বাসের গায়ে সেঁটে আছে অবলীলায়। বাসের গা থেকে অন্তত তিন হাত বেরিয়ে আছে মানুষের নশ্বর শরীর।

মনোরমের ঠিক এক্ষুনি কোথাও যাওয়ার নেই। যতক্ষণ বিয়ারের গন্ধ শরীরে আছে ততক্ষণ গড়িয়াহাটার কাছে মামার কাঠগোলায় ফেরা যাবে না। বৃষ্টির পর এসপ্লানেড এখন ভারী ঝলমলে, রঙিন শো-উইনডোতে দোকানের হাজার জিনিস, রঙিন পোশাকের মানুষ, রঙিন বিজ্ঞাপন। টেকনিকালার ছবির মতো চারদিকের চেহারা এখন ধুলোটে ভাবটা ধুয়ে যাওয়ার পর। কাজ না থাকলেও এসপ্লানেডে ঘুরলে সময় কেটে যায়।

রাস্তা পার হয়ে মেট্রোর উল্টোদিকে ট্যাক্সির চাতালে তখন উঠে-যাওয়া পসারিরা দ্রুত ফুচকার ঝুড়ি, ভেলপুরির বাক্স, ছুরি কাঁচি কিংবা মনোহারি জিনিস সাজাচ্ছে। ট্রাম টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ট্রাম। তারই একটাতে উঠে একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকবে ভেবেছিল মনোরম। ফুটপাথ ছেড়ে ইট-বাঁধানো চাতালটায় নামতে গিয়েও সে বাড়ানো পা টেনে নিল। সীতা না?

সীতাই। সোনা রঙের মুর্শিদাবাদি শাড়ি পরনে, ডান হাতে ধরা দু-একটা কাগজের প্যাকেট বুকে চেপে সাবধানে হাঁটছে। বাঁ হাতে শাড়িটা একটু তুলে পা ফেলছে। মাথা নোয়ানো। পাতলা গড়ন, ছিপছিপে ছোট্ট সীতা। নরম মুখশ্রী, কাগজের মতো পাতলা ধারালো ছোট্ট নাক, লম্বাটে মুখখানা, ছোট্ট কপাল, চোখের তারা দুটি ঈষৎ তাম্রাভ, মাথার চুল বব করা। বেশ একটু দূরে সীতা, ওর মুখখানা সঠিক দেখতে পেল না মনোরম। কিন্তু দূর থেকে দেখেই সবটুকু সীতাকে মনে পড়ে গেল। ছয়-সাত বছর ধরে সীতার সবটুকু দেখার কিছুই তো বাকি ছিল না। আশ্চর্য কার্যকারণ! একটু আগে বিয়ারের বোতল সামনে নিয়ে সে হোঁতকা বিশ্বাসটার কাছে সীতার কথা বলছিল।

একটা রগ মাথার মধ্যে ঝিনন করে চিড়িক দেয়। মনোরম গাছের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখে, কী সুন্দর অপরূপ রোদে সীতা একটু ভেঙে নুয়ে মহার্ঘ মানুষের মতো হেঁটে চলেছে। সব জায়গা থেকে হঠাৎ সূর্যরশ্মিগুলি থিয়েটারের আলোর মতো এসে ওকে উদ্ভাসিত করে। পিছনে মরা গাছ, মেঘলা আকাশ, এসপ্লানেড ইস্টের বাড়ির আকাশরেখা, চার দিকে ফড়ে, দালাল, দোকানির আনাগোনা। কিন্তু আবহের আলো এই ভিড়ে কেবলমাত্র সীতাকেই উদ্ভাসিত করে। সোনালি শাড়িটা আগাগোড়া সোনালি, কোথাও কোনও কাজ নেই, আঁচল নেই, সোনালি ব্লাউজ, পায়ে কালো সরু স্ট্রাপের চপ্পল—সবটুকু ঝলসায় এই রোদে, কিংবা রোদই ঝলসে ওঠে ওকে পেয়ে? পেটে অঢেল বিয়ার, তাই ঠিক বুঝতে পারে না মনোরম। তলপেটটা জলে ভারী হয়ে টনটন করছে, একটা কেমন গরমি ভাপ বেরোচ্ছে শরীর থেকে, আকণ্ঠ তেষ্টা। ভিখিরি যেমন ঐশ্বর্যের দিকে তাকায়, তেমনি অপলক তাকিয়ে

থাকে মনোরম। মনে হয় এই সীতাকে সে কখনও স্পর্শ করেনি।

কোথায় যাচ্ছে সীতা? কোথায় এসেছিল? বোধহয় বেহালার ট্রাম ধরতেই যাচ্ছে। ওদিকের ট্রাম চালু আছে কি? চালু থাকলেও এই ভিড়ে উঠতে পারবে তো সীতা? ভাবল একটু মনোরম।

সীতা ট্রাম লাইন বরাবর হেঁটে গেল। একটু দাঁড়াল, চেয়ে দেখল দু'ধারে। তারপর দুটো থেমে থাকা ট্রামের মাঝ দিয়ে সুন্দর পদক্ষেপের বিভঙ্গ তুলে ওপাশে চলে গেল। দৃশ্যের শেষে যেমন মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়, নেমে আসে পর্দা, তেমনই হয়ে গেল চারধার। কিছু আর দেখার রইল না।

মনোরম চলল চাতালটা পেরিয়ে গোলঘরের দিকে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধের ভিতরে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করল। এবং বেরিয়ে আসার পর টের পেল, ভীষণ একা আর ক্লান্ত লাগছে। কোথাও একটু যাওয়া দরকার এক্ষুনি। কারও সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা দরকার। সীতাকে দেখার ধাক্কাটা সে ঠিক সামলাতে পারছে না। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সে সত্যিই সীতাকে দেখেছে। এমন আচমকা হঠাৎ কেন যে দেখল। দেখল, কিন্তু দেখা হওয়া একে বলে না।

আকাশ আজ খেলছে। দ্রুত গুটিয়ে নিল রোদের চাদর। বৃষ্টিটা চেপে আসবে। দু-চারটে চড়বড়ে ফোঁটা মনোরমের আশেপাশে যেন বা হেঁটে গেল। ততক্ষণে অবশ্য মনোরম লম্বা পা ফেলে জোহানসন অ্যান্ড রো-র অফিস বাড়িটায় পৌঁছে গেছে।

পুরনো সাহেবি অফিস। বাড়িখানা সেই সাহেব আমলের গথিক ধরনের। শ্বেতপাথরের মতো সাদা রং, বৃষ্টিতে ভিজেও শুভ্রতা হারায়নি। সামনে খানিকটা সবুজ সযত্নরচিত জমি, শেকল দিয়ে ঘেরা। বাঁকা হয়ে ড্রাইভওয়ে ঢুকে গেছে। সার সার গাড়ি দাঁড়ানো। তার মধ্যে সমীরের সাদা গাড়িটা দেখল মনোরম। অফিসেই আছে।

চমৎকার কয়েকটা থামে ঘেরা পোর্টিকো পেরিয়ে রিসেপশনের মুখোমুখি হওয়ার আগে মনোরম আকাশটা দেখল। গির্জার ওপর ক্রুশচিহ্ন, তার ওপাশে আকাশটা সাদা বৃষ্টির চাদরে ঢাকা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সীতা ট্রামে উঠেছে? না হলে ভিজবে। খুব ভিজবে।

রিসেপশনের বাঙালি ছেলেটা চমৎকার ইংরেজিতে বলে—সমীর রয়? অ্যাকাউন্টস। আপ ফার্স্ট ফ্লোর।

মনোরম মাথা নেড়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। শ্বেতপাথরের প্রাচীন এবং রাজসিক সিঁড়ি। বহুকাল ধরে পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গিয়ে ধাপগুলো নৌকোর খোলের মতে দেবে গেছে একটু। তবু সুন্দর দোতলার মেঝেতে পা দিলে মেজেতে পারসিক কার্পেটের সূক্ষ্ম এবং রঙিন সুতোর মতো কারুকাজ দেখা যায়। কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে, তবু তেলতেল করছে পরিষ্কার। মোটা দেওয়ালের মাঝখানে নিঃশব্দ করিডোর, তাতে বদ্ধ বাতাসের গন্ধ। অফিসবাড়িটায় পা দিলেই একটা 'গুডউইলের' অলক্ষ্য অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। গুডউইল। বিশ্বস্ততা এবং সুনাম।

একটা বড় হলঘরের একধারে টিকপ্লাইয়ে ঘেরা চেম্বার। সেখানে সমীর রায় বসে। সামনে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওধারে সমীর। মনোরমের ভায়রাভাই। কিংবা ভূতপূর্ব ভায়রাভাই। লম্বা চেহারায় এখন একটু মেদ জমেছে, রংটা কালোই ছিল, এখন ইটচাপা ঘাসের মতো ফরসা হয়েছে। ভাল খায়-দায়, গাড়ি চড়ে বেড়ায়, গায়ে গলায় রোদ লাগে না। সরু টাই, চেয়ারের পিছনে কোট ঝুলছে। ঝুঁকে একটা কাগজ দেখছিল সমীর। চমৎকার একজোড়া মদরঙের ফ্রেমের চশমার ওপর ওর বড় কপাল, লালচে চুল, টিকোলো নাক, এবং গভীর খাঁজওলা থুতনিতে আভিজাত্য ফুটে আছে। সেই মুখশ্রীতে ওর চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটা ধরা যায় না। অনেক কম বলে মনে হয়।

মনোরমের কোনও কাজ নেই। ব্যস্ত সমীরের কাছে দু'দণ্ড বসা কি সম্ভব হবে! দু-চারটে কথা কি ও বলবে মনোরমের সাথে! একটু দ্বিধা ও অনিশ্চয়তায় ও টেবিলটার কাছাকাছি এল।

সমীর মুখ তুলে বলল—আরে, মনোরম! কী খবর?

তীক্ষ্ণ চোখে মনোরম সমীরের মুখখানা দেখে নিল। না, খুশি হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। চোখ দুটি সামান্য বিস্ফারিত হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। যারা অভিজাত তাদের একটা সুশিক্ষা আছেই, মনোভাব তারা ঢেকে রাখতে পারে। বিস্ময় এবং বিরক্তিকে অনায়াসে চাপা দিয়ে সমীর হাসল।

—একটু এলাম। খুব ব্যস্ত নাকি? মনোরম বলে।

—একটু, বলে সমীর চেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুলে মাথার চুল পাট করতে করতে বলল—সাড়ে চারটেয় কিক অফ। ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি কাজটাজ চুকিয়ে একটু মাঠে যাব। বলে ঘড়ি দেখে সমীর বলে—ঠিক আছে, তুমি বোসো। খানিকক্ষণ সময় আছে।

বিয়ারটা এখনও পেটে, ঘাম বা পেচ্ছাপের সঙ্গে এখনও পুরোটা বেরিয়ে যায়নি। মনোরম চেয়ার টেনে বসে হিসেব করে নিচ্ছিল, এতবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পার হয়ে সমীরের নাকে অ্যালকোহলের গন্ধটা যাচ্ছে কিনা। টেবিলের ওপর হেলাভরে পড়ে আছে এক প্যাকেট বেনসন আর হেজেস, ছোট্ট দেশলাই। মনোরম প্যাকেটটা টেনে সিগারেট ধরাল। সমীর লক্ষ না-করার ভান করে নিচু হয়ে একটা ড্রয়ার টেনে কী একটু দেখতে লাগল কাগজপত্র।

দামি সিগারেট, কিন্তু বিয়ারের পেটে কোনও ভাল গন্ধ পাওয়া মুশকিল। মনোরম যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল—গীতাদি ভাল?

—ভালই। একটা বাচ্চা হয়েছে জানো তো! ছেলে।

—না।

—সাড়ে তিন কেজি। রুমি ভাই পেয়ে খুব খুশি। দিনরাত বেড়ালের মতো থাবা গেড়ে ভাইয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছে।

বলে এবার সত্যিকারের খুশির হাসি হাসল সমীর। মেয়ে রুমির পর দশ বছর বাদে ওদের ছেলে হল। খুশি হওয়ারই কথা।

মনোরম যান্ত্রিক এবং অন্যমনস্ক গলায় বলে—কংগ্র্যাচুলেশনস।

সমীর মাথার চুলে মুদ্রাদোষবশত আঙুল চালাতে চালাতে বলে—একটু বেশি বয়সে হল, ঠিকমতো মানুষ করে যেতে পারব কি না কে জানে!

সমীরের গলার স্বরটা ভারী এবং পরিষ্কার। একেই কি বাস্ ভয়েস বলে? এত ভদ্র এবং মাজা গলা যেন মনে হয় খুব উঁচু থেকে আসছে। এত শিক্ষিত ও ভদ্র গলায় কখনও কোনও অশ্লীল কথা বলা যায় না। সমীর বোধহয় তার বউকেও কখনও কোনও অশ্লীল কথা বলেনি, যা সবাই বলে! সীতাকে অনেক অশ্লীল কথা শিখিয়েছিল মনোরম, সীতা শুনে দুহাতে মুখ ঢেকে হাসতে হাসতে বলত—মাগো! পরে দু'-একটা ওইসব খারাপ কথা সীতাও বলত। ঠিক সুরে বা উচ্চারণে বলতে পারত না। তখন মনোরম হাসত। এবং ঠিক উচ্চারণটা আর সুরটা শেখাত। সীতা শিখতে চাইত না। সমীর আর গীতা কি অন্তরঙ্গ প্রবল সব মুহূর্তে ওরকম কিছু বলে? বোধহয় না। ওদের রক্ত অনেক উঁচু জাতের।

মনোরম সমীরের নম্র এবং সুন্দর কমনীয় মুখটির দিকে চেয়ে থেকে বলল—মানুষ করবার ভার আপনার ওপর নয়। টাকার ওপর। একটা হেভি ইন্সিওরেন্স করিয়ে রাখুন।

সামান্য একটু গম্ভীর হয়ে গেল সমীর। কিন্তু কথাটা গায়ে মাখল না। ডজ করে বেরিয়ে গেল। বলল—তার অবশ্য দরকার হবে না। যা আছে...বলে একটু দ্বিধাভরে থেমে থাকল। এত ভদ্র সমীর যে, টাকার কথাটা মুখে আনতে পারল না। মনোরমেরই ভুল। সমীররা তিন পুরুষের বড়লোক। ওর এক ভাই আমেরিকার হিউসটনে আছে, বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা মাইনে পায়, অন্য ভাই ফিলম প্রোডিউসার। সমীর নিজে বিলেতফেরত অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সীতাদের পরিবারের উপযুক্ত জামাই। এ সব প্রায় ভুলেই গিয়েছিল মনোরম। প্রায় একবছর সীতাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তেমনি চুলে আঙুল চালিয়ে সমীর বলে—তবে ছেলেকে মানুষ হতে দেখে যাওয়াটা বাপের একটা স্যাটিসফ্যাকশন।

মুখে কোনও বিরক্তির চিহ্ন নেই, তবু সমীরের বিরক্তিটা টের পাচ্ছিল মনোরম। ওর চোখ মনোরমের লম্বা চুল, বড় জুলপি আর কাজ করা পাঞ্জাবির ওপর থেমে থেমে সরে গেল। বোধহয় মনে মনে পোশাকটাকে সমীর পছন্দ করল না। কিন্তু কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলা সমীরের স্বভাব নয়। অভিজাতদের এইসব সুশিক্ষা থাকেই।

সমীর চোরাচোখে ঘড়িটা একবার দেখে নিল, বলল—তোমার কি কিছু বলার ছিল?

মনোরম মাথা নেড়ে বলল—না। একটু বসব বলে এসেছিলাম। বাইরে যা বৃষ্টি!

—বৃষ্টি! চোখ বড় করে বলে সমীর, তারপর একটু লাজুক হাসি হেসে বলে—বাইরের রোদ বা

বৃষ্টি এখানে বসে কিছু বোঝা যায় না। তারপর একটু চিন্তিতভাবে বলে—খুব বৃষ্টি?

—থেমেছিল। আবার বোধহয় শুরু হয়েছে।

অন্যমনস্কভাবে সমীর বলে—খেলাটা না ওয়াশড আউট হয়ে যায়!

—কার খেলা?

—ছোটবাঙাল আর বড়বাঙাল। উয়াড়ি ভারসাস ইস্টবেঙ্গল। সমীর তার সরু কিন্তু সুবিন্যস্ত দাঁত আর কোমল ঠোঁট দিয়ে আকর্ষক হাসিটা হাসে, তারপর ফোনটা তুলে নিতে নিতে বলে—দাঁড়াও, জেনে নিই।

ফোন করল। বোধহয় ক্লাবে। সমীর অনেক ক্লাবের মেম্বার। আই এফ-এ, সি-এ-বি, ওয়াই-এম-সি-এ এবং আরও কয়েকটার। বোধহয় রোটারিয়ানও। বহুকাল ধরে মেম্বার। এতদিনে দু-চারটে ক্লাবের কর্মকর্তাও হয়েছে বোধহয়।

ফোনটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বলল—না, খেলা হচ্ছে। বৃষ্টিটা বোধহয় থেমে গেল। লিগের যা অবস্থা আজকের খেলাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

থুতনিই বোধহয় মানুষের মুখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। অনেকক্ষণ সমীরকে লক্ষ করে এই সত্যটা উপলব্ধি করে মনোরম। থুতনির চমৎকার খাঁজটি সমীরের বংশগত, ওই খাঁজটিই ওর মুখটাকে এত উঁচুদরের মানুষের মুখের মতো করেছে। অনেক মানুষের মুখই সুন্দর কিন্তু সেই সৌন্দর্যে সব সময়ে ব্যক্তিত্ব থাকে না। সমীরকে দেখলেই যে সম্ভ্রান্ত এবং উঁচুদরের লোক বলে মনে হয় তা কি ওর চমৎকার খাঁজওলা ওই থুতনিটার জন্যই? মনোরম ভাবে। সমীর ঘড়ি দেখছে। বোধহয় প্রায় চারটে বাজে। ওর ওঠা দরকার। কিন্তু সে কথাটা ভদ্রতাবশত মনোরমকে বলতে পারছে না।

মনোরম সংকোচটা ঝেড়ে ফেলে বলে—সীতার কোনও খবর জানেন?

আবার মদরঙের চশমার ভিতরে চোখটা সামান্য বিস্ফারিত হল। বিস্ময়ে। একটু অস্বস্তির সঙ্গে সমীর বলে—সীতা! ভালই আছে। একদিন কি দু'দিন নার্সিং হোম-এ গিয়েছিল ওর দিদিকে দেখতে।

—সে খবর নয়, অন্য কোনও খবর?

—আর কী? ওদের বাড়িতে বহুদিন যাই না, ঠিক কিছু বলতে পারব না। কীসের খবর চাও?

মনোরম টেবিলের ওপর কাচের ভিতরে চাপা একটা ছবি দেখল। রঙিন ফটোগ্রাফ বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। তা নয়, হাতে আঁকা রঙিন প্রিন্ট। বনভূমিতে বেলাশেষের সিঁদুরে আলো, কয়েকটা গোরুর গাড়ি ঝুঁকে আছে, মাঝখানে আদিবাসী কয়েকজন নারী ও পুরুষ রান্নাবান্না করছে। পথের ওপর গেরস্থালি। ছবিটার মধ্যে একটা গল্প আছে।

সে মুখ তুলে বলল—একটু আগে আমি সীতাকে দেখলাম।

সমীর অস্বস্তিতে চেয়ারের একদিক থেকে আর একদিকে শরীরে ভর দিল। বলল—ও! কোথায়?

—এসপ্লানেডে। বোধহয় মার্কেটিংয়ে এসেছিল। ফিরে যাচ্ছিল তখন।

চুলে তেমনি আঙুল চালায় সমীর। চোখ সরিয়ে নেয় মনোরমের চোখ থেকে, তারপর একটু হালকা গলায় বলে—কথাটথা বললে নাকি?

—না। আমি কথা বললেও ও পাত্তা দিত না।

মনোরম ক্ষীণ একটু হাসে। সমীর চিন্তিতমুখে পার্টিশনটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে—আর কিছু বলবে? হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে—এখনও একটু সময় আছে।

—ক'টা বাজে?

—চারটে প্রায়।

—আমার কিছু বলার ছিল।

—খুব কি জরুরি কথা?

—খুব। অন্তত আমার কাছে।

—খুব জরুরি হলে না হয় আজকের প্রোগ্রামটা...

—না না। আমি...আমার খুব অল্প কথা।

সমীর একটু ঝুঁকে মুখখানা তুলে চেয়ে রইল।

মনোরম বলার আগে আর একবার বনভূমির ছবিটা দেখে নিল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কয়েকটা গোরুর গাড়ি। গাছের ছায়ায় গোধূলি, আদিবাসী নারী ও পুরুষ উনুন জ্বেলেছে।

—আমি আজ সীতাকে দেখলাম।

—বলেছ তো।

—বলেছি। তবু বলতে ইচ্ছে করছে।

—কী?

—সীতা এরপর কী করবে কিছু জানেন?

—ফ্রাঙ্কলি জানি না।

সমীর দুঃখিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। মুখে সত্যিকারের সমবেদনা। রক্তাভ সুন্দর আঙুল দিয়ে থুতনির খাঁজটা মুছে নিল অকারণ। একটা পোখরাজ একটু ঝলসে যায়। মনোরম বুঝতে পারে, সমীরের কিছু বলার নেই।

কিন্তু তবু মনোরমের ইচ্ছে হয়, আরও একটুক্ষণ এই সফল সুপুরুষ ও উঁচু ধরনের লোকটির সঙ্গে কাটায়। আর একটু দেখতে ইচ্ছে করে, কী আছে লোকটার। সীতার কথা একটু শুনতে ইচ্ছে করছিল তার।

সে একটা মিছে কথা বলল। চেয়ারটা ঠেলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে—আমিও মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম।

—যাবে? বলে একটু বিস্মিতভাবে তাকিয়েই সেই ভদ্র আন্তরিক হাসিটি হেসে বলে—ইউ আর ওয়েলকাম। আমার সঙ্গে চলো।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে মনোরম বলে—যাব?

—যাবে না কেন?

মনোরম একটু বোকা-হাসি হেসে বলে—আমি কিন্তু একটু মদ্যপান করেছি। অবশ্য তেমন কিছু না, একটু বিয়ার...

তেমন ভদ্র হাসি হেসে সমীর উঠতে উঠতে বলে—গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাতে কী? আমিও তো মাঝে মাঝে খাই। ইটস অল ইন দ্য গেম।

টেবিল থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার আগে শেষবারের মতো মনোরম ছবিটা দেখছিল। রাঙা আলোর বনভূমিতে গো-গাড়ি থামিয়ে গেরস্থালি পেতেছে কয়েকজন আদিবাসী পুরুষ ও রমণী। কী চমৎকার বিষয়, যেন ঠিক একটা গল্প বলা আছে ছবির ভিতরে। ছবিটা দেখতে দেখতেই সমীরের শেষ বাক্যটির চমৎকার ইংরিজি ক'টা শব্দ শুনে সে চমকে গেল। এখনও ভাল ইংরিজি-বলা লোককে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়। আদিবাসীদের ছবি থেকে সে চোখ সরিয়ে কলকাতায় চলে এল এক পলকে। কিছুক্ষণের জন্য যেন বা সে ওই ছবির বনভূমিতে চলে গিয়েছিল।

—আমার কার্ড নেই, লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হবে।

—টিকিট? লোকটা পরতে পরতে আবার সেই ভদ্র হাসি, কোমল লাবণ্য, ক্ষমা, সব বিকিরণ করে সমীর বলে—আরে কার্ড-ফার্ড লাগবে না। আমি...বলে আবার সেই ভদ্রতাসূচক স্তব্ধতা, থেমে বলল—গভর্নিং বডির মেম্বার।

আন্দাজ করেছিল। তাই হাসল মনোরম, মনে মনে বলল—জানতাম। ঘাড় দুটো উঁচু করে শ্রাগ করল। বলল—না। আমি সবুজ গ্যালারিতেই যাব।

—চলো তো।

নিঃশব্দ গাড়ি। ছুটল, শব্দ হল না। কথা না বলে গাড়িটার জোরালো ইঞ্জিনের টান ও গতিটুকু উপভোগ করে মনোরম। কনভার্টিবল বুইক। একটু পুরনো। তবু ভাল। যে কোনও ভাল জিনিস—এমনকী একটা গাড়ির চলাও—নিবিড়ভাবে উপভোগ করার আছে। মনোরম করে। মামার গাড়িটা ভাল নয়, সেই গাড়িতে সে আজকাল প্রায়ই বীরুর পিছু নেয়।

ইডেন গার্ডেনের উল্টো দিকে গাড়িটা দাঁড় করায় সমীর। বৃষ্টিটা থেমেছে। পিঁপড়ের মতো ময়দান ভেদ করে লোক চলেছে। দূরে উড়ছে একটা লাল সোনালি পতাকা। মাঠে সমীর গাড়ির কাচ বন্ধ করে

দরজা লক করে বলল—এখানেই থাক। দূরে থাকাই সেফ।

হাঁটতে হাঁটতে মনোরম বলে—আপনি রোজ খেলা দেখেন?

—আরে না, না। মাঝে-মধ্যে। তবে গভর্নিং বডিতে যাওয়ার পর প্রায়ই আসতে হচ্ছে। ওটা এটিকেট।

—কখনও টিকিটের গ্যালারি থেকে খেলা দেখেননি?

একটু অস্বস্তি বোধ করে সমীর, দ্বিধাভরে বলে—সেই ছেলেবেলায়, দু-একবার, ঠিক মনে নেই।

—কেন যান না?

—এমনিই। যেতে তো হয় না, তা ছাড়া ওদিকের ওরা একটু হস্টাইল।

সাধারণ দর্শকের গ্যালারি থেকে যখন মানুষ জামা প্যান্ট খুলে বাতাসে ওড়ায়, চেঁচিয়ে বাপ-মা তুলে গাল দেয় খেলোয়াড়কে, যখন ঘাড়ে লাফিয়ে ওঠে, মস্তিষ্কশূন্য খ্যা-খ্যা হাসে, কনুয়ের বা হাঁটুর গুঁতো দেয়, তখন তার মাঝখানে এই অতি সুকুমার ও ভদ্র মানুষটিকে কেমন দেখাবে? যখন ইট ছুড়ে মারবে, রেফারি, লাইনসম্যান আর ক্লাবের কর্মকর্তাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করবে তখন কেমন হবে ওই মুখখানার ভাব!

—ওরা হস্টাইল কেন, তা কিন্তু একবার আপনার নিজের দেখে আসা উচিত। গভর্নিং বডির মেম্বারদের দর্শক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা ভাল।

সমীর দ্বিধাভরে বলে—মন্দ বলোনি। কিন্তু এ বয়সে একটা মোটামুটি ভদ্র জীবন যাপন করে, ওই ইট-ছোড়া আর খারাপ কথা ভাল লাগে না। হার্শনেসটা ঠিক সহ্য হয় না আমার।

মাঠের কাছাকাছি এসে মনোরম হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সমীরের কোমল, পরিষ্কার এবং রক্তাভ একখানা হাত ধরল—আসুন।

সমীর অবাক হয়ে বলে—কোথায়?

—সবুজ গ্যালারিতে।

—আরে পাগল, টিম মাঠে নামবে, মেম্বাররা খোঁজাখুঁজি করবে।

মনোরম মিনতি করে—আসুন না। একদিন আমার সঙ্গে দেখুন। ওদের বলবেন শরীর খারাপ ছিল।

সমীর হাত টানাটানি করল না, বিরক্তি দেখাল না। কেবল সহৃদয়ভাবে হেসে বলল—আরে, আজ তুমি আমার গেস্ট। এসো এসো—

লড়াইটা মর্যাদার ছিল! সবুজ গ্যালারিতে লম্বা লাইনে সমীরকে দাঁড় করাবে, গ্যালারিতে খিস্তির সমুদ্রে দাঁড় করিয়ে পাশাপাশি খেলা দেখবে—এতটা আশা করেনি মনোরম। বড়লোকেরা যে কী জিনিস দিয়ে তৈরি! টপ করে হারিয়ে দেয়। মনোরম ওই মহার্ঘ গলার স্বরের প্রভুত্বের কাছে হেরে গেল। খুবই বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে।

সমীর তার কাঁধটা বন্ধুর মতো ধরে বলল—চলো।

মনোরম চলল। সসম্ভ্রমে গেট-এর পাহারাদাররা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মনোরম কে সে প্রশ্নই ওঠে না।

ভিতরে দু-চারজন কর্তাব্যক্তি গোছের লোক সমীরকে ঘিরে ধরে। সমীর যে বড় 'ডোনার' এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, নইলে মনোরমের সন্দেহ ও কোনওকালে ফুটবলে লাথিই দেয়নি।

কথা বলতে বলতেই সমীর ব্যস্তভাবে চলে গেল টেন্ট-এর দিকে, মনোরম যে সঙ্গে আছে, খেয়ালই করল না। একা দাঁড়িয়ে থেকে মনোরম তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। একা সে দাঁড়িয়ে, চারদিকে ব্যস্ত-সমস্ত লোকজন চলে যাচ্ছে। এখন কেউ তাকে সে কে জিজ্ঞেস করলে তার তেমন কিছু বলার নেই। চলাচলের রাস্তাটা ছেড়ে সে গ্যালারির তলদেশে আবছায়ায় এসে দাঁড়ায়। টেন্ট-এর খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সমীর যে কোথায় গেল! বড্ড একা লাগে মনোরমের। আর সেই নিঃসঙ্গতায় কেবল টুক টুক করে মুখের ভিতরে নড়ে তার অসহায় জখমি জিভখানা।

ঝলসানো রঙের জার্সিপরা খেলোয়াড়রা সারিবদ্ধভাবে টেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। কী চমৎকার তাদের সতেজ উরু, নোয়ানো কিন্তু গর্বিত মাথা, চারদিককে অবহেলা করে তারা পলকে গ্যালারির ভিতরকার রাস্তা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় মাঠের দিকে। সামনে পেছনে পাশে কয়েকজন ভাল চেহারার

লোকজন তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল। মনোরম ঈর্ষার চোখে এই তাজা বয়সি খেলোয়াড়দের চলে-যাওয়া দেখছিল। সে যদি খেলোয়াড় হত!

আলো থেকে চোখ সরিয়ে গ্যালারির তলার আবছায়ার দিকে তাকিয়ে মনোরম নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। পায়ে বুট, হোস আর রঙিন জার্সি। নোয়ানো মাথা, আত্মবিশ্বাসী সতেজ উরুদ্বয়ে মাংসল শক্তির পিচ্ছিলতা। হেঁটে যাচ্ছে মনোরম খেলার মাঠের দিকে। সেখানে হাড়ভাঙা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গ্যালারিতে সীতা বসে আছে, উদগ্রীব তার শুষ্ক উজ্জ্বল মুখখানা। মাঠে বাইশজনের একজন হয়ে মনোরম প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে পড়ে। কী খেলাই খেলছে মনোরম, কী খেলাই যে খেলছে! বাইশজনের মধ্যে ঠিক একজনকেই দেখছে সীতা। মনোরমকে।

হঠাৎ মাঠে চিৎকার ফেটে পড়ে। টিম মাঠে নামছে। কল্পনাটা ভেঙে যায়।

মাঠ থেকে চিৎকার আসছে। বলে বুটে লাগাবার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ। একজন চেঁচিয়ে উঠল—হেগো...হলদে চিনি দিয়ে খা। একা বিষণ্ণ এবং চুপচাপ দাঁড়িয়ে শোনে মনোরম। আজ বিকেলে সে সীতাকে দেখেছিল। ভুলতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত স্মৃতি ছাড়া মানুষের কিছুই থাকে না বুঝি! গ্যালারিতে ঝুঁকে মানুষ খেলা দেখছে, মাঠে রগ-ছেঁড়া লড়াই কত উত্তেজক, বলে পা লাগার শব্দ কী মাদকতাময় কত মানুষের কাছে! একাকী মনোরম দাঁড়িয়ে আছে গ্যালারির ছায়ায়, বিষণ্ণ, স্মৃতিতাড়িত, উদাসীন। এখনও, মানুষ পৃথিবীতে খেলা করে। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা। চারদিকে বৃষ্টিবিন্দুর মুক্তো আর মেঘভাঙা রোদের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মাটিতেই হেঁটে গেছে সীতা। কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় চলে গেল কে জানে! প্রায় এক বছরে সীতা কত দূরের হয়ে গেছে! সীতাকে চেনার চিহ্নগুলি কি শেষ পর্যন্ত মনোরমের থাকবে। ভুলে যাবে না তো! স্মৃতি ছাড়া তার আর কিছুই নেই। প্রবল বৃষ্টিতে যেমন গাছপালার ধুলোময়লা ধুয়ে যায় তেমনই কি সীতা মনোরমের সব স্মৃতি ধুয়ে-মুছে ফেলেছে? কিছু কি নেই?

মুখের ভিতরে জিভটা নড়ছে টুক টুক করে। চামচের মতো নড়ন্ত জিভটাই যেন তার স্মৃতিকে ঘুলিয়ে তোলে। সীতা তীব্র আশ্লেষের সময়ে কতবার তার সুন্দর দাঁতে মুখের ভিতরে মনোরমের জিভটাকে নরম করে চেপে ধরে রেখেছে। শ্বাসবায়ুর স্বরে বলেছে 'নোড়ো না জিভ, চুপ করো।' সীতার সুগন্ধী সুস্বাদু মুখের ভিতরে জিভটা নিথর হয়ে থাকত। এমন প্রবলভাবে সেই অনুভূতিটা আক্রমণ করে মনোরমকে যে তার চোখ বুজে আসে, মুখটা আস্তে একটু ফাঁক হয়, জিভটা লোভে-প্রত্যাশায় বেরিয়ে আসে। মুখে স্বেদবিন্দু ফুটে ওঠে মনোরমের, গায়ে কাঁটা দেয়, শ্বাস গাঢ় হয়ে আসে। সমস্ত শরীরটা এক অদৃশ্য সীতার ঝুঁকে-পড়া, কাছে আসা, আলিঙ্গন-আশ্লেষে বদ্ধ অস্তিত্বের স্বাদ নিতে থাকে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন।

ঠিক এই অবস্থায় তাকে দেখল সমীর। টেন্ট-এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে সে অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কাছে এসে বলল—তোমার শরীর কি খারাপ মনোরম?

—না, না। লজ্জা পেয়ে মনোরম বলে।

সমীরের অবাক ভাবটা কাটেনি, বলল—চোখ বুজে, জিভ বের করে এমনভাবে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে যে আমি চমকে উঠেছিলাম।

কী করবে মনোরম! মনে পড়ে, বড্ড যে মনে পড়ে! কিছু একটা প্রবলভাবে মনে পড়লেই তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। এই ইংরিজি শব্দটা সীতাই শিখিয়েছিল তাকে। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে সীতা, অখণ্ড মনোযোগে, খুব ধীর হাতে, চোখ ছোট, ঠোঁট দুটো পাখির ঠোঁটের মতো ছুঁচোলো। দেখতে দেখতে মনোরমেরও চোখ ছোট হয়ে যেত, ঠোঁট ছুঁচোলো হয়ে আসত, দুটো হাত আপনা থেকেই শূন্যে উঠে ছুঁচে সুতো পরানোর ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকত, হঠাৎ চোখ তুলে দৃশ্যটা দেখেই হেসে ফেলে সীতা একদিন বলেছিল—তোমার ইডিও-মোটর অ্যাকশন আছে। না বুঝে মনোরম বলেছিল—মানে? সীতা উত্তর দিয়েছিল—ওটা সাইকোলজিকাল একটা ব্যাপার। কখনও কখনও সেই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে মনোরমের। কোনও কারণ থাকে না, হঠাৎ মনে পড়ে। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ, অন্ধকার রাত, হঠাৎ ঘুম-ভাঙা আধো-চেতনায় টের পেত, চারদিকে ট্রেনের কামরা ভাঙার শব্দ, কে যেন তাকে বাতাসে ছুড়ে দিচ্ছে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল মনোরম। মনে

পড়লেই তার হাত মুঠো পাকায়, শরীর কুঁকড়ে আসে, চোখ বুজে সে কাল্পনিক আঘাতে বিকট মুখভঙ্গি করতে থাকে। এ দৃশ্য দেখেও সীতা ওই ইংরিজি শব্দটা বলেছিল। ইডিও-মোটর অ্যাকশন। বলত— তোমার যখন ছেলে হবে, আর ছেলেকে যখন আমি ঝিনুকে দুধ খাওয়াব তখন তা দেখে ঠিক তুমিও হাঁ করবে, ঢোক গিলবে, দেখো। ইডিও-মোটর অ্যাকশন থাকলে ওরকম হয়।

দুর্ঘটনাটা এড়ানো গেছে। তাদের ছেলেপুলে হয়নি। সীতা তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের পর অবিকল বিয়ের আগের মতো কুমারী হয়ে গেছে। কিন্তু তা কি হয়? হতে পারে? স্মৃতি থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত স্মৃতিই থাকে। কুমারী সীতার বুকভরা বিবাহের স্মৃতি, মনোরম জানে।

—এসো, বলে সমীর হাঁটতে থাকে। এবং মনোরম কেন সমীরের সঙ্গে এতক্ষণ লেগে আছে তা না-বুঝেই পিছু নেয়। গ্যালারির ফাঁক দিয়ে মাঠে রঙিন জার্সির ছোটাছুটি দেখা যায়। একটু এগোতেই মস্ত আকাশের নীচে সতেজ সবুজ মাঠ, গ্যালারিতে আনন্দিত ভিড়, সাদা উড়ন্ত বলখানা—সব মিলিয়ে সুন্দর দৃশ্যটা দেখে মনোরম। দেখে, কিন্তু তাকে কিছুই স্পর্শ করে না। বরং একটা খোলা বাতাস এসে ঝাপটা দিতেই তার গা শিরশির করে, একটু শীত করে। সে এই খেলার কিছুই মানে বুঝতে পারে না। তবু সমীরের পিছু পিছু সে যায়। লোহার ঘেরা-বেড়ার গেট দিয়ে মাঠের সাইড লাইনের ধারে গিয়ে বসে। একটা প্রবল চিৎকার উঠতে উঠতে হঠাৎ ফেটে পড়ে উল্লাসে। গোল। দুহাতে কান ঢেকে মনোরম চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। এত কোলাহল তার সীতার হেঁটে-যাওয়ার ছবিটা ছিঁড়ে দেয় বুঝি!

সমীর গাঢ় একটা শ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল। মুখে হাসি। একটু ঝুঁকে বলল—বি পাল খেলছে না, আমাদের রেগুলার স্ট্রাইকার। খুব চিন্তা ছিল।

না-বুঝে মনোরম হাসল, যেন বা গোলটা হওয়ায় সেও নিশ্চিন্ত। খানিকটা অসহায়ভাবেই সে মাঠের দিকে চেয়ে খেলাটা বুঝবার চেষ্টা করে। সারা মাঠ জুড়ে রঙিন জার্সির ছোটাছুটি। মাঠে চোরা জল লাথি খেয়ে হঠাৎ ছিটকে ওঠে ফোয়ারার মতো। পিছলে পড়ে বহু দূর মাটিতে ঘষটে যায় চতুর খেলোয়াড়েরা। কী সুন্দর ভঙ্গিতে হরিণের মতো লাফিয়ে ওঠে শূন্যে গোলমুখে কয়েকজন হালকা শরীরের মানুষ। বলটা বাতাসে কেমন ধনুকের মতো বাঁক নেয়। দেখতে দেখতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। পা শূন্যে ওঠে, মাথাটা হঠাৎ নড়ে, দুহাত মুঠো পাকায়।

দুটো গোলের পর সমীর হাসল—গেম ইজ ইন দি পকেট। তুমি কী বলবে বলেছিলে মনোরম!

মনোরম একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে—মানস লাহিড়িকে আপনি চেনেন?

সমীর একটু থমকায়। তারপর চিন্তা করে বলে—কোন মানস বলো তো!

—জিমন্যাস্ট ছিল। রিং থেকে পড়ে গিয়ে যার কলারবোন ভেঙেছিল এখন রেলের অফিসার, দু-চারটে ক্লাবের কোচ। চেনেন না?

সমীর মাথা নাড়ল, বলল—হ্যাঁ, চিনি।

—আমি খবর রাখি, সীতা ওকে বিয়ে করবে।

সমীর নীরবে কিছুক্ষণ খেলাটা দেখে যেতে থাকল। ভ্রূ কোঁচকাল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল— মনোরম, ফ্র্যাঙ্কলি আমি কিছুই জানি না। কিন্তু যদি সীতা আবার বিয়ে করেই তাতেই বা কী?

মনোরম সহজ উত্তর দিল না। বলল—ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক বাকি। তারপর আইনত সীতা বিয়ে করতে পারে। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—আমার কয়েকটা কথা ছিল।

সমীরের ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, একটু অধৈর্যের গলায় বলে—আমাকে এ সব ব্যাপারের মধ্যে টেনো না মনোরম। আমি ইনভলভড হতে চাই না। তা ছাড়া সীতার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তো চুকেই গেছে। আবার কেন? লিভ হার অ্যালোন।

মনোরম মাথা নাড়ল। বলল—তা হয় না। সীতা এখনও আমার কাছ থেকে মাসোহারা পায়।

—তাতে কী?

—তাতে এটুকু প্রমাণ হয় যে, সে আমার ওপর এখনও কিছুটা নির্ভরশীল। নীতিগতভাবে তার সম্বন্ধে দু-চারটে কথা আমি বললে দোষ হয় না।

—কিন্তু আমাকে কেন জড়াচ্ছ?

—আপনাকে জড়াচ্ছি না। সীতার কোনও খবর পাওয়ার উপায় আমার নেই। আপনি ও বাড়ির জামাই, আপনি খবর পান। তাই আপনাকে ছাড়া আর উপায় কী?

—তুমি বরং সীতাকে চিঠি লেখো, কিংবা টেলিফোন করো।

—টেলিফোন করলে ও ফোন রেখে দেবে। চিঠি ছিঁড়ে ফেলবে।

সমীরের ভদ্র ও সুকুমার মুখে ইতিমধ্যে অধৈর্যের ভাব ফুটে উঠেছে। মনোরম সেটা লক্ষ করে। তবু সমীর বলে—কী বলতে চাও?

গোলের সামনে একজন ফরোয়ার্ড ল্যাং খেয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে। চারদিক থেকে প্রবল একটা চিৎকার ওঠে। রেফারির বাঁশি বাজে। সমীর হঠাৎ দুহাতে মাথাটা ধরে ধরা গলায় চেঁচিয়ে বলে—গড! পেনাল্টি!

স্পটে বল বসানো হয়েছে। কিন্তু কে কিক নেবে তা নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি হতে থাকে। কেউ এগোয় না। মাঠসুদ্ধ লোক ঝুঁকে আছে ব্যাপারটার দিকে। সমীর নিথর। কথাগুলো আটকে আছে মনোরমের গলায়। পেনাল্টি শটটা নিতে ওরা বড় দেরি করতে থাকে। মনোরমের ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে শটটা দিয়ে ফিরে এসে সমীরকে কথাগুলো বলে।

কালো লম্বা একটা ছেলে অবশেষে এগিয়ে যায়। কোমরে হাত দিয়ে হাত দশেক দূর থেকে বলটাকে দেখে। দৌড়োয়। ডান পায়ে কিকটা নেয়। কোমর সমান উঁচু হয়ে ভীমরুলের ডাক ডেকে বলটা গোলে ঢুকে যায়। মাঠ স্তব্ধ।

সেই স্তব্ধতার মধ্যেই মাঠের মাঝখানে বলটা চলে আসে। দুপাশে খেলোয়াড়রা দাঁড়ায় যথাযথ। সমীর অস্ফুট গলায় বলে—গড!

তারপর সিগারেট ধরায়।

মোটে আর একটা গোলের লিড থাকছে। হাফটাইম পর্যন্ত ব্যাপারটা যথেষ্ট নিরাপদ নয়। মনোরম সমীরের মুখ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল।

চিন্তিত সমীর মনোরমের দিকে মুখ ফেরায় এবং স্বয়ংক্রিয় হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দেয়।

—কী বলছিলে যেন!

মনোরম একটা শ্বাস ফেলে বলে—সীতার কথা।

—ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

—আসলে সীতার কথাও আমি বলতে চাইছি না।

—তবে কী বলতে চাইছ?

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

—বলো।

—মানস লাহিড়ি আমার বন্ধু ছিল, আমাদের বাসায় আসত-টাসত। এবং নামকরা জিমন্যাস্ট বলে আমি তাকে যথেষ্ট খাতির করতাম। সে সীতার খুব প্রশংসা করত। ক্রমে সীতার ভাল লাগতে থাকে। মানস লাহিড়িকে তো আপনি জানেন, কী রকম পেটা প্রকাণ্ড শরীর, কাঁধের হাড় ভাঙা বলে বাঁ দিকটা একটু বেঁকে থাকে, তবু খুবই পুরুষালি চেহারা। অন্য দিকে সীতা একটা চড়াই পাখির মতো ছোট্ট আর নরম আর সুন্দর।

—গুডনেস! সমীর আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে।

ও বিরক্ত হয়েছে মনে করে মনোরম থেমে যায়। কিন্তু তারপরই দেখে কর্নার ফ্লাগের কাছ পর্যন্ত গিয়ে সমীরের টিমের রাইট-আউট বলটা সেন্টার করতে পারেনি। বল লাইন পার হয়ে গেছে। গোল কিক।

—কী বলছিলে যেন?

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

—বলো।

—কোনও অন্য পুরুষ যখন কোনও বিবাহিতা মহিলার প্রশংসা শুরু করে এবং সেই মহিলা যখন সেই প্রশংসা গ্রহণ করে খুশি হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে একটা যৌন ঋণ গড়ে ওঠে।

—কীসের ঋণ।

—যৌন ঋণ।

—ওঃ গড!

পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে একজন খেলোয়াড় বলটা বাইরে মেরেছে। মনোরম গভীরভাবে সিগারেটে টান দেয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে।

—কী বলছিলে মনোরম? কীসের ঋণ?

—যৌন ঋণ।

—সেটা কী ব্যাপার?

—পরস্পরের কাছে তখন একটা না-বলা দাবি-দাওয়া তৈরি হতে থাকে। অপরিশোধ্য একটা ঋণ গড়ে ওঠে। ঠিক ভালবাসা এ নয়, এটুকুর জন্য কেউ ঘর-সংসার ভাঙে না, তবু এও এক ধরনের স্খলন বা পতন। পরস্পরকে যখনই ভাল লাগতে থাকে, তখনই ভিতরে ভিতরে একটা বাঁধ ভাঙার ইচ্ছে উঁকি দিতে থাকে। যেহেতু সেটা অবৈধ সেই জন্যই সেটা আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

—ডিসগাস্টিং। বি পাল খেললে এরকমটা হত না।

—কার কথা বলছেন?

—বি পাল। আমাদের স্ট্রাইকার। গোল-লাইন থেকে বলটা ব্যাক করতে পারা ছেলেখেলা ছিল, মজুমদার পারল না দেখলে?

—আমি মানস লাহিড়ির কথা বলছিলাম।

—ওঃ হ্যাঁ, বলো।

—আসলে মানস লাহিড়ির কথাও নয়।

—তবে কার কথা।

—স্বামী-স্ত্রীর কথা।

—বলো।

—বিয়ের ছয়-সাত বছর পর আর পরস্পরকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর তেমন উত্তেজনা থাকে না।

—বটেই তো।

—সীতার আর আমারও ছিল না।

—হুঁ, হুঁ।

—আর তখন মানস লাহিড়ি আসত।

—ঠিক।

—আর তখন আমরা যখন, অর্থাৎ আমি আর সীতা যখন শারীরিক দিক দিয়ে মিলিত হতাম, মানে—বুঝতেই পারছেন—

—ও-গুডনেস—

সমীরের টিম অন্য টিমের গোলপোস্ট ছেঁকে ধরেছে। পর পর চারজন গোলে মারল। পোস্ট, বার খেলোয়াড়ের গা থেকে ফিরে এল। শেষ শটটা গোলকিপার উড়িয়ে দিল বারের ওপর দিয়ে। কর্নার।

কর্নার কিকটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে মনোরম।

কিক থেকে একটা নিষ্ফলা হেড। তারপর গোল-কিক আবার।

শ্বাস ফেলে সমীর বলল—বলো।

—যখন আমরা মিলিত হতাম—মানে শারীরিকভাবে, বুঝলেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।

—তখন আমার প্রায়ই মনে হত সীতা আমার কথা ভাবছে না।

—তবে কার কথা?

—মনে হত, সীতা চোখ বুজে আমার জায়গায় আর একজনকে ভেবে নিচ্ছে এবং তাতে তার সমস্ত

শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। মনে মনে সে তখন সেই ঋণ শোধ দিচ্ছে।

—মাই গুডনেস! সমীর চাপা তীব্র গলায় বলে।

মনোরম চমকে মাঠের দিকে তাকাল। না, মাঠে কোনও ঘটনা ঘটেনি। মাঝ-মাঠে একজন বল নিয়ে দুর্বল পায়ে দৌড়োচ্ছে। বেরোতে পারবে না।

সমীর তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনোরম লজ্জা পায়।

—কী বলছ মনোরম?

—আমার ওরকম মনে হত।

—কেন?

—মনে হওয়াকে কেউ ঠেকাতে পারে না।

সমীর দ্রুত সিগারেটে টান দেয়। বলে—তারপর?

মনোরম দুঃখিত গলায় বলে—আমার একটা দোষ, আমি বড্ড বেশি কৌতূহলী। সব ব্যাপারটা আমি জানতে চাই। তাই সীতাকে আমি জিজ্ঞেস করি। মানস লাহিড়িকেও।

—বলো কী?

মনোরম ম্লান একটু হাসল। বলল—দুজনেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আমি জানতাম ওরা মিছে কথা বলছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী রকম কঠিন হয়ে দাঁড়াল ভেবে দেখুন। আমি সীতার স্বামী, তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি, সম্পূর্ণ বৈধ ভাবে। অথচ জানছি, আমি নই, তার বুক জুড়ে আর একজনের কাছে ঋণ। আমি সেই আর একজনের প্রতিনিধি হয়ে সেই ঋণ শোধ নিচ্ছি মাত্র। এভাবেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমে অবৈধ হয়ে ওঠে।

সমীরের মুখের সুকুমার ভাবটুকু ভেদ করে একটা ঘেন্নার ভাব ফুটে ওঠে। সে বলল—ডিসগাস্টিং। এ সব কী বলছ মনোরম!

—আমি সীতা বা মানসের কথা বলতে চাইছি না। আমি আসলে জানতে চাইছি সব স্বামী-স্ত্রীরই কি এরকম হয়? এরকম হওয়াটাই কি স্বাভাবিক?

—নিশ্চয়ই নয়।

—আপনি কখনও গীতাদিকে জিজ্ঞেস করেছেন?

—কী?

—তিনি কখনও আর কাউকে...

পলকে ফণা তোলে সমীর। দুখানা চোখ ধ্বক ধ্বক করে ওঠে। মনোরম মুখ আড়াল করে উদ্যত হাতে, যেন বা মার ঠেকাবে।

—রিডিকুলাস মনোরম! ভেরি রিডিকুলাস! তুমি কি পাগল?

মনোরম অবাক হয়ে টের পায়, সমীরের টিম একটা গোল দিয়েছে। ৩-১। সমস্ত মাঠ ফেটে পড়ছে উল্লাসে। সবুজ গ্যালারির ওপর শূন্যে ভাসছে ছাতা, উড়ছে জুতো, জামা। সমীর এক পলক তাকিয়ে দেখল মাত্র। উত্তেজিত হল না।

মনোরম আস্তে আস্তে বলল—আমার যন্ত্রণাটা ঠিক এইভাবে শুরু হয়। অথচ কখনও সীতা বা মানস লাহিড়ি পরস্পরের দিকে এক পাও এগোয়নি। বৈঠকখানা ঘরে তারা বরাবরের মতো দুটো দূরের চেয়ারে বসে থেকেছে, হেসেছে, স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু আমি কেন—আমারই কেন যে শান্তি ছিল না!

সমীর হঠাৎ উঠতে উঠতে বলে—মনোরম, তুমি কি খেলাটা আর দেখবে? দেখলে দেখো। আমি যাচ্ছি।

—না। বলে মনোরম উঠে সমীরের পিছু নেয়।

গ্যালারির কলরোল তখনও থামেনি। উদ্দণ্ড নাচ নাচছে লোকজন। একজন বুড়ো মোটা মানুষ একসঙ্গে তিনটে সিগারেট ধরিয়ে টানছে, তাকে ঘিরে ভিড়। গ্যালারির সরু রাস্তাটা দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। আগে সমীর, পিছনে মনোরম। সবুজ পার হয়ে তারা বড় রাস্তায় এসে পড়ে।

সমীর দ্রুত লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিল, যেন বা মনোরম তার সঙ্গে নেই। হঠাৎ থমকে সমীর মুখ

ফিরিয়ে বলল—পুরুষমানুষের অনেক কাজ থাকে মনোরম। শুধু বউয়ের চিন্তা নিয়ে থাকলেই তার চলে না।

মনোরম দাঁড়িয়ে গেল। সমীর পিছন ফিরে আর তাকাল না, নিজের গাড়ির দিকে চলে গেল।

বিষণ্ণ মনোরম বড় রাস্তা ছেড়ে একা মাঠের মধ্যে নামল। তারপর প্রকাণ্ড মাঠ খানা-জল-কাদা ভেঙে পার হতে থাকল। প্রকাণ্ড আকাশের নীচে মাঠখানা বড় অফুরান, ক্লান্তিকর লাগছিল তার।

॥ দুই ॥

ঝরঝর করে খানিকটা জল পড়ল কাঁধে। ব্লাউজের হাতটা ভিজে গেল। সীতা মুখ তুলে দেখে, ট্রামের জানালার খাঁজে জল জমে আসছে। ময়দানের দিক সাদা করে আর এক ঝাঁক বৃষ্টি আসছে। নড়বড়ে জানালাটা বন্ধ করতে একবার চেষ্টা করল সীতা। পারল না। এক ভিড় লোক তাকে দেখছে। সকলের চোখের সামনে দ্বিতীয়বার জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করতে তার লজ্জা করছিল। অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে বসে থাকে সীতা। ঝরঝর করে জল পড়তেই থাকে। সরে বসবে যে তার উপায় নেই, পাশে মুশকোমতো এক পুরুষমানুষ বসে আছে। লোভী মুখচোখ, আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখছে।

কেনাকাটা করাটা সীতার একটা নেশার মতো। দরকার থাক বা না থাক, সীতা বরাবর দুপুরের দিকে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে। গড়িয়াহাটা বা নিউ মার্কেটে ঘুরে ঘুরে টুকটাক জিনিস কেনে, বেশি টাকার জিনিস নয়, সস্তা বাহারি চটি, হাতব্যাগ, স্টিলের ছাঁকনি বা চামচ, ডোনার কিংবা অন্য কোনও রূপটান। সংসারে কোনও জিনিস ফেলা যায় না। যখন সীতার সংসার ছিল তখন সব কিছুই কাজে লাগত। এখন তার নিজের সংসার বলে কিছু নেই। তবু নেশাটা রয়ে গেছে। দু পিস ব্লাউজের লন কাপড় কিনেছে সে, একটা শাড়িতে লাগানোর ফলস পাড়, এক কৌটো কাজল, ফাউন্ডেশন, ভাইঝির জন্য স্টিলের চেন-এ একটা ঝকমকে লকেট, এরকম আরও কিছু কাজ বা অকাজের জিনিস। এ সব তার কোলের ওপর জড়ো হয়ে আছে। তার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ আর ভাঁজ করা ছাতা। ব্যাগটা ছোট বলে সব জিনিস আঁটেনি। ব্লাউজপিসের প্যাকেটটা ভিজে যাচ্ছে। অস্বস্তিতে আবার চোখ তুলে জলের উৎসটা দেখে সীতা। বৃষ্টিও এসে গেল। ছাঁট আসছে।

পাশের লোকটা হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে—জানালাটা বন্ধ করে দেব!

সীতা ঘাড়টা একটু নাড়ল মাত্র।

লোকটা উঠে সীতার ওপর দিয়ে ঝুঁকে জানলাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। সীতা লোকটার বগলের ঘেমো গন্ধ পায়। বুক পেট গুলিয়ে ওঠে তার। লোকটা জানলা বন্ধ করতে বেশ সময় নিতে থাকে। ততক্ষণ দমবন্ধ করে বসে থাকে সীতা। এবং নির্ভুল ভাবে টের পায়, লোকটা তার নিজের বুকটা হালকাভাবে তার কপালে ছোঁয়াল। জানলাটা বন্ধ করে হাতটা টেনে নেওয়ার সময় খুব কৌশলে সেই হাতটা সীতার কাঁধ স্পর্শ করে গেল। সীতা দাঁতে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে নিজেকে সামলে নেয়। মেয়েদের শরীরের প্রতি পুরুষের দাবি-দাওয়ার শেষ নেই। হাঁটু, কনুই, হাত যা দিয়ে হোক একটু ছোঁয়ানো চাই।

জানলা বন্ধ করে লোকটা চেপে বসল। সীতা লোকটার প্রকাণ্ড ভারী উরুর ঘন স্পর্শ পেল। নিজের উরুতে। যতদূর সম্ভব জানলা ঘেঁষে বসল। ঘামতে লাগল। অস্বস্তি। জানলা বন্ধ, ফলে লোকের ঘামের গন্ধ, ভ্যাপসা গরম, পাশের লোকটার উরু, এবং ক্রমে কাঁধের স্পর্শও সীতাকে আক্রমণ করে। লোকটা বুঝে গেছে, সীতা কিছু বলবে না, সে লাজুক মুখচোরা মেয়ে। তাই লোকটা ট্রাম থেমে আবার চললেই ঝাঁকুনি লাগার ভান করে ঢলে পড়ছে সামান্য। আর কেউ কিছু টের পায় না, কেবল সীতা পায়। সে ঘামে লাল হয়, আর দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। এ সব নতুন নয় তবু সীতার ঠিক সহ্য হয় না।

ট্রামটা থেমে গেল। রেসকোর্স পার হয়ে ব্রিজটায় উঠবার মুখে। সামনে একটা ট্রাম বোধ হয় খারাপ। সময় লাগবে। ট্রামের ভেতরটা ক্রমে ভেপে পচে ফুলে উঠছে। পচে যাচ্ছে মানুষের শরীর। চারদিক থেকে চোরাচোখের আক্রমণ। পাশের লোকটা ঘেঁষে আসে। ঘাম। গরম। চমকা বৃষ্টিটা থেমে আবার রোদ উঠেছে বাইরে। বড় উজ্জ্বল রাংতারোদ।

সীতা ছোট্ট রুমালে মুখ, গলা মুছল। আর তখনই আবার লোকটার হাতে তার কনুই লাগে। সীতা আড়ষ্ট হয়ে নিজের কোলে হাত দুখানা ফেলে রাখে। অন্যমনস্ক থাকার জন্য সে একটা কোনও চিন্তা করার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ। কোনও সুন্দর চিন্তা এলই না।

কেবলই ভেঙে-যাওয়া সংসারের কথাই মনে পড়ছিল সীতার। দুটি ঘর ছিল তাদের। মাঝখানের দরজায় একটা হালকা আকাশি রঙের সার্টিনের পর্দা। সন্ধেবেলা ঝোড়ো কলকাতার হাওয়া সেই পর্দাটিকে ওড়াত বারবার। টিউবলাইটের আলোয় দুঘরের কোথাও কোনও অন্ধকার ছিল না। এ ঘরে মেঝেয় উবু হয়ে বসে যত্নে পেয়ালায় চা ছাঁকতে ছাঁকতে সে দেখতে পেত ও ঘরে ক্লান্ত মনোরম চেয়ার এলিয়ে বসে আছে। শুধু শার্ট ছেড়েছে আর জুতোজোড়া। পরনে ফুল প্যান্ট, আর স্যান্ডো গেঞ্জি। চোখ বোজা। যতখানি ক্লান্ত তার চেয়ে বেশি ভান করত, সীতার একটু আদর-সোহাগের জন্য। আদর-সোহাগের বড় কাঙাল ছিল মনোরম। রোগ-ভোগা মানুষ একটু নেই-আঁকড়ে আর মাথাভরা চিন্তা-দুশ্চিন্তার বাসা। চা করতে করতে সীতা মাঝে মাঝে তাকাত। মায়া-মমতায় ভরে উঠত বুক। সেটা ঠিক প্রেম নয়, গাঢ় মমতা। করুণাও। সে যাই হোক, একভাবে না একভাবে তাদের জোড় মিলেছিল তো! মনোরমের সেই চা আর সীতার স্পর্শের জন্য অপেক্ষারত দৃশ্যটা মনে পড়ে।

দৃশ্যটা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করে সীতা। পারে না। কান্না পায়। কেবলই মনে পড়ে দুঘরের মাঝখানে পর্দা উড়ছে হাওয়ায়, ধু ধু করে জ্বলছে নীলাভ আলো। কোনওখানে অন্ধকার নেই। ও ঘরে তার ক্লান্ত কাঙাল স্বামী মনোরম। ভিতু খুঁতখুঁতে, অসম্ভব পরনির্ভরশীল।

সীতা শুনেছে এখন মনোরম বড় বড় চুল রাখে, লম্বা জুলপি, আর খুব আধুনিক পোশাক-টোশাক পরে। কেন এ সব করে মনোরম তা সীতা জানে না, কিন্তু তখন মনোরম ভাল পোশাক পরত না। সীতা কখনও ঝকমকে শার্ট বা প্যান্ট করে দিলে রাগ করত। ক্রপ করে ছোট্ট চুল রাখত মনোরম। তারা খুব অদ্ভুতভাবে শুত, মনোরমের স্বভাব ছিল সীতার বুকে মুখ গুঁজে শোওয়ার। ওই কদমছাঁট চুল খোঁচা দিত সীতার শরীরে। প্রথমে বিরক্ত হত সীতা। তারপর বুঝেছিল মানুষটা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে, জেগেও নানা ভয়ের উদ্বেগের চিন্তা করে। মনে মনে বড্ড একা অসহায় ছিল তার মানুষটা। তাই সীতাকে আঁকড়ে ধরত অমন। বুকে মাথা গুঁজে শুত, এবং সেই শোওয়ার মধ্যে কোনও যৌনকাতরতা ছিল না। ছিল নির্ভরশীলতা। তাই সীতা ওই কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা বুকের মধ্যে ধরে রাখতে শিখেছিল। খোঁচা টের পেত না। এবং এমনই অভ্যাসের গুণ যে, ক্রমে ওভাবে মনোরম না শুলে তার অস্বস্তি হতে থাকত। ঘুমের মধ্যে কথা বলত মনোরম। কখনও চেঁচিয়ে উঠত ভয়ে। উঠে বসত। তারপর সীতাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা ছেলের মতো আকুলি-ব্যাকুলি করত। সীতা ঘুম ভেঙে বলত—আহা, বাট ষাট। এই তো আমি রয়েছি, ভয় কী? ঠিক যেমন শিশুকে মা ভোলায়। গানের গলা ছিল না মনোরমের। কিন্তু প্রায়দিনই একটা গান সে গাইত। হঠাৎ হঠাৎ বাথরুমে শোওয়ার ঘরে। কিংবা খেতে বসে গেয়ে উঠত—জয় জগদীশ হরে...। একটাই লাইন মাত্র। সীতা হাসত—মোটে আধখানা লাইন ছাড়া আর কিছু জানো না? মনোরম কেমন বিষণ্ণ হেসে একদিন বলেছিল—ছেলেবেলায় ইস্কুলে এই গানটা ছিল আমাদের প্রেয়ার। মনে আছে, ইস্কুলে খুব লম্বা সাত-আট ধাপ সিঁড়ি ছিল, সেখানে সারি দিয়ে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে ওই গান গাইতাম। যন্ত্রের মতো। গানের অর্থ কিছু বুঝতাম না। একদিন কী যে হল! অনেক দিন টানা বর্ষার পর সেদিন রোদ উঠেছে। বাহান্ন দিন টাইফয়েডে ভুগে সেদিন সকালে আমার দাদা মনোময় মারা যায়। আগের রাতে দাদার বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমাকে প্রতিবেশীদের এক বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকেই সকালে খেয়েদেয়ে ইস্কুলে যাব বলে বেরিয়েছি, রাস্তায় পা দিয়েই শুনলাম, আমাদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল উঠেছে। যেই শুনলাম অমনি ইস্কুলের দিকে দৌড়োতে শুরু করলাম। দুকানে হাত চেপে দৌড়োচ্ছি, কাঁধের ঝোলানো বইয়ের ব্যাগটা টপাটপ ধাক্কা দিচ্ছে কোমরে, ঘেমে হাঁফিয়ে যাচ্ছি, তবু প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতার হাত থেকে আমি প্রাণপণে পালাতে লাগলাম। ইস্কুলে সেদিনও প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো গাইছি—জয় জগদীশ হরে...। গাইতে গাইতে দেখি চোখ ভরে জল নেমেছে। চারদিকে আকাশ কী গভীর নীল, কত বড় সেই আকাশ! তার তলায় আমরা কতটুকু-টুকু সব মানুষ! ছোট্ট মানুষ আমরা মস্ত আকাশের দিকে হাতজোড় করে গাইছি—জয় জগদীশ হরে...। সেইদিনই যেন গানটা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এখনও

অন্য মনে কেবলই মনে পড়ে ওই লাইন। আধখানা। সবটা মনে নেই। গাইলেই বহুকালের পুরনো একটা রোদভরা আকাশ ঝুঁকে পড়ে চোখের ওপরে, কোথা থেকে যেন একটা আনন্দের, বিষাদের গভীর ঢেউ এসে আমাকে তুলে নেয় আমি যেন তখন পৃথিবীর ধুলোময়লা থেকে ওপরে উঠে ভাসতে থাকি। তাই গাই।

এক একদিন ঘুম ভেঙে অন্ধকারে উঠে ঝুম হয়ে বসে থাকত মনোরম। সীতা ঘুমের মধ্যে বুকের ভিতরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করে চোখ মেলে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, অন্ধকারে মনোরমের হাত মুঠো পাকানো, শরীর শক্ত, চোয়াল দৃঢ়ভাবে লেগে আছে। সীতা জানত, ওর সেই ট্রেন দুর্ঘটনার কথা মনে পড়েছে।

তখন ও এক বিদেশি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি। ফার্স্ট ক্লাসে উড়িষ্যা-বিহার ঘুরে বেড়াত। রোগা হলেও সুন্দর মুখশ্রী আর চালাকচতুর হাবভাবের জন্য, চমৎকার ইংরিজি বলার জন্যই অত ভাল চাকরি পেয়েছিল মনোরম। প্রায় হাজার টাকা মাইনে পেত, তার ওপর টি এ ছিল অনেক। সেবার উড়িষ্যা যাওয়ার সময়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে মাঝরাতে। তখনও মনোরমের বিয়ে হয়নি সীতার সঙ্গে। কী হয়েছিল তা সঠিক জানত না সীতা। তবে মনোরম দীর্ঘদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ফিরে আসে। চাকরিটা যায়নি, তবে কোম্পানি তাকে প্রতিনিধির কাজ থেকে অফিসে নিয়ে আসে নিরাপদ একটু উঁচুদরের কেরানির চাকরিতে। মাইনে কমল না, কিন্তু টি এ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মনোরম ছটফট করত অন্য কারণে। ওই যে কলকাতা ছেড়ে প্রায়ই বেরিয়ে পড়া রাতের গাড়িতে, ভোরের আবছা আলোয় গাড়ির জানলা খুলে দক্ষিণ বিহার আর উড়িষ্যার টিলা, উপত্যকা, নদী, পাহাড় আর জঙ্গল দেখে এক অবিশ্বাস্য, অসহ্য আনন্দ, সেইটাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। কোম্পানির বস্বের অফিসে কিছুদিন কাজ করেছিল মনোরম। ভাল লাগল না। আবার বিহার-উড়িষ্যার শ্বাসরোধকারী প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে উশ্রী নদীর ছোট্ট পোলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, ধারোয়ার তীরবর্তী টিলার গা বেয়ে উঠে যাবে আস্তে আস্তে, কয়লা খনির অঞ্চলগুলিতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গভীর রাতে লরি ড্রাইভারের পাশে বসে দেখবে অন্ধকারের দ্রুতগামী সৌন্দর্য। অফিসের চাকরি সে সহ্য করতে পারত না। একটা নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি তখন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ছিটকিনি, দরজার নব, নানা রকম অ্যাঙ্গেল আর গৃহস্থালীর জিনিস তৈরি করছিল। তাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে আবার বিহার-উড়িষ্যা ঘুরে বেড়াতে লাগল মনোরম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না, ট্রেন খুব জোরে চললে বা আচমকা ঝাঁকুনি লাগলে সে ঘুম ভেঙে আতঙ্কে উঠে বসত, অনেকক্ষণ বুক কাঁপত তার, ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকত। তখন চাকরি ছেড়ে সেই কোম্পানিরই এজেন্সি নিল সে।

দেখা হয়েছিল শিমুলতলায়। পুজোর ছুটিতে। প্রবাসে বেড়াতে গেলে বাঙালিদের ভাব হয়। তেমন হয়েছিল। সীতা তার আগে কখনও প্রেমে পড়েনি। সদ্য-যুবতী, তখনও কৈশোরের গন্ধ গায়ে, তখনও শরীরে সেই আশ্চর্য স্বেদগন্ধ। ফুলের পাপড়ি ঝরে গিয়ে সদ্য ফলের গুটি ধরেছে। মনোরম পিছনে বনভূমি রেখে ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছিল, একটু আনমনা, রুগ্ণ সুন্দর চিকন মুখশ্রী, বালকের মতো স্বভাব। তারা একসঙ্গে সকলের সাথে বনভোজন করতে গিয়েছিল। ইচ্ছে করে দলছুট হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তারা। বিহারের তীব্র শীত সবে দেখা দিচ্ছে। একটা তিরতিরে নদী বয়ে যাচ্ছিল, স্বচ্ছ জল, জলে তাদের ছায়া। ছায়ায় ঝুঁকে মনোরম ইংরিজিতে বলেছিল—মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...কী চমৎকার টনটনে উচ্চারণ সেই ইংরিজির! নিস্তব্ধপ্রায় সেই শাল জঙ্গলের ভিতরে বয়ে-যাওয়া নদীর শব্দের সঙ্গে কবিতার শব্দগুলিকে কী করে যে মিলিয়ে দিয়েছিল মনোরম! সামনেই পাহাড় ছিল, ওপরে নীল আকাশ, পাখিও কি ছিল না, আর প্রজাপতি! কী সব যে ছিল সেখানে কে জানে! ছিল বোধ হয় কবিতার সেই ঘণ্টাধ্বনিও তাদের মনে, আর ছিল শরীরে সুন্দর গন্ধ ও রোমহর্ষ, ছিল জলে ভেঙে-যাওয়া তাদের ছায়া। এ সবই থাকে। থাকে না কি! নদীর জলে একটা পাথর ছুড়ে মনোরম বলল—তুমিও ছুড়ে দাও, ওইখানে। সীতা ছুড়েছিল। কী হয়েছিল তাতে? কিন্তু মনোরম হেসেছিল, সীতাও। বহু দূর থেকে বনভোজনের দলছুট মানুষজনের গলার স্বর আসছিল। পোড়া পাতার গন্ধ। তবু নিস্তব্ধতাই ছিল। তাদের কথা বলে যাচ্ছিল সেই কুলুকুলুধ্বনিময় স্বচ্ছ জলের নদী,

গাছের পাতায় বাতাস, পাখির স্বর।

ভালবাসা কিনা কে জানে। তবে তারা কেউ কাউকে ছোঁয়নি, জাপটে ধরেনি, ওই নির্জনতা সত্ত্বেও। মনোরম শুধু বলেছিল—আমি এতদিন স্বপ্নের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতাম।

—সে কেমন? সীতা তার তখনও না যাওয়া কৈশোরের কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করেছিল।

—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রেমের শখ। এত বেশি শখ যে, ছেলেবেলা থেকেই আমি কাল্পনিক মেয়েদের সঙ্গে একা একা কথা বলি। সেই সব মেয়েদের একজন ছিল রিনা। কিন্তু রিনা ঠিক কাল্পনিক ছিল না। আমার আট-দশ বছর বয়সে আমি সত্যিই এক রিনাকে দেখেছিলাম। তারও বয়স ছিল আমার মতোই। পরিচয় ছিল না, কখনও কথা হয়নি, একবারের বেশি দেখা হয়নি, তার মুখ এখন আর আমার মনেও নেই। শুধু মনে আছে, এক বিয়েবাড়ির সিঁড়ির রেলিংয়ে ঝুঁকে সে বর-বউয়ের কড়িখেলা দেখছিল। পরনে লাল ফ্রক, মুখখানা ঘিরে ফ্রিলের মতো চিনেছাঁটের চুল। বয়স্কা এক মহিলার গলা তলার হলঘর থেকে তার নাম ধরে ডেকে বলেছিল—রিনা নীচে আয় না, অত লজ্জা কীসের! রিনা তার সুন্দর ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচের ভিড়ের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। এতদিন আগেকার সে ঘটনা, আর আমিও এত ছোট ছিলাম যে, সেই স্মৃতি একটু সুগন্ধের মতো মাত্র অবশিষ্ট আছে। কখনও মনে হয় সে ঘটনা ঘটেইনি, আমার মাথা তা কল্পনা করে নিয়েছে, অথবা আমি কখনও স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওই উৎসবের বাড়ি আর ওই মেয়ের কথা আমি অনেক ভেবেছি, কখনও সত্য কখনও কাল্পনিক মনে হয়েছে। তবে সেই নামটা কী করে মনে রয়ে গেছে, মনে রয়ে গেছে যে মেয়েটি বড় সুন্দর ছিল—যার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু তাতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না। আমার মনে যে সব অচেনা মুখ ভেসে যায়, তাদের কাউকে কাউকে রিনা বলে মনে হয়। ওই নামে ডাকি, সাড়া পাই, ভালবাসা জেগে ওঠে, বিশ্বাস হয় কি?

—না।

—তবে তোমাকে বলি, আমার মেম-বউয়ের কথা?

—বউ? বলে ভীষণ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থেকেছিল সীতা।

—না না, আসলে সে কেউ না। আমাদের আলমারিতে ছিল পাথরের তৈরি এক মেমসাহেব পুতুল। তার গোলাপি গা, গোলাপি গাউন, হাঁটু পর্যন্ত সেই গাউনের ঝুল, চোখের তারা নীল। ছেলেবেলায় ঠাকুমা সেই পুতুলটা দেখিয়ে বলত—তোর বউ। আশ্চর্যের কথা, এখনও মাঝে মাঝে যখন কখনও আমার কাল্পনিক বউয়ের কথা ভাবি, তখন ঠিক সেই গোলাপি গা, সোনালি ফ্রক, নীল চোখ, মধুরঙের চুলওলা পুতুলটাই চোখে ভেসে ওঠে। হায়, তার বাস্তবতা নেই, তবু সে আমার মনের মধ্যে চলা ফেরা করে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আমার কাল্পনিক সন্তানের চুল আঁচড়ে দেয়, দিনশেষে জানলার ধারে বসে আমার অপেক্ষায় চেয়ে থাকে।

—এখনও? আজও?

মিটমিট করে হেসে মনোরম বলেছিল—ছেলেবেলায় আমি খুব অদ্ভুত ছিলাম। দরজা, জানালা, দেয়ালের সঙ্গে কথা বলতাম। কত সব কথা।

মানুষের সঙ্গেই আমার কথা হত কম। কিন্তু কথা হত কল্পনার মানুষদের সাথে। রোজ যাদের দেখতাম, তাদেরই কাউকে কাউকে মনে মনে কুড়িয়ে আনতাম, কল্পনায় খেলব বলে। আমাদের মফস্বল শহরের স্টেশনে একটা নির্জন সুন্দর ওভারব্রিজ আছে। সাধারণত লোকে হেঁটেই লাইন পার হয়, ওভারব্রিজ বড় একটা ব্যবহার করে না। আমাদের ওভারব্রিজটা তাই জনশূন্য পড়ে থাকত। আমি সন্ধেবেলায় ওখানে দাঁড়িয়ে প্রায়ই দূরের দিকে চেয়ে থাকতাম। আমি যে-স্বপ্নের জগতে বাস করতাম, সেখানে বাস করতে গেলে, চেনা লোক, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ লোকজন এক বিষম বাধা। তাতে স্বপ্নের সুতো বারবার ছিঁড়ে যায়। আমারও তাই তেমন কেউ ছিল না, তাই আমারও অধিকাংশ বিকেল কাটত নিঃসঙ্গভাবে ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কল্পনার ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেত। সেদিন সন্ধে সাতটার শেষ ট্রেন আমাদের ছোট স্টেশন ছেড়ে গেছে। ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম শূন্য প্ল্যাটফর্মে কিছু ছড়ানো মালপত্রের মাঝখানে একটি তোরঙ্গের ওপর মেয়েটি বসে আছে। উদ্বিগ্ন তার মুখচোখ। কাছাকাছি সময়ে আর ট্রেন নেই, পরের গাড়ি ভোরবেলায়।

মেয়েটি যে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কে জানে? আমি মাত্র এইটুকু দেখেছিলাম। আর মনে হয়েছিল মেয়েটি যেন আমার আবছাভাবে চেনা। এর বেশি আর বাস্তবে কিছু ঘটেনি, ঘটেছিল বোধহয় কল্পনায়।

মনোরমের আবার সেই হাসি, শব্দহীন, অর্থময়।

—বলুন না! বলে শরীরের সুগন্ধ নিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিল সীতা। উন্মুখ পানপাত্রের মতো।

—তারপর তাকে আবার দেখি আমাদের ফুলবাগানে, শীতকালের ভোরবেলায়। পাড়ার বাচ্চা মেয়েরা রোজ সকালে আমাদের বাগান থেকে ফুল চুরি করে নিয়ে যায়। একদিন রাতে ঘুম হয়নি, সারারাত ভয়ঙ্কর সব কল্পনার ছবি দেখেছি। সকালে তেষ্টা পেল আর খোলা বাতাসের জন্য আকুল ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে এলাম। বাগান তখন ঘন কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে। আমি দেখলাম, বাগানের ফটকের কাছে একটি মেয়ে ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে। ও কি ফুলচোর? আমি সাড়া দিইনি, চেয়েছিলাম। সেও একদৃষ্টে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসল। আমি ভয়ঙ্কর চমকে উঠে চিনলাম, এ সেই মেয়ে যাকে আমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখেছিলাম এবং আরও আগে কবে থেকে যেন চেনা ছিল। সে হেসে এগিয়ে আসতে থাকে ফটক পার হয়ে। আমি হিম হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পরনে নীল শাড়ি, গলায় কাশ্মীরি স্কার্ফ জড়ানো, ঠিক যেরকম স্কার্ফ আমার মায়ের একটা আছে, নীল শাড়িটাও যেন চেনা। সে লাল সুরকির পথ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসে মিহি গলায় জিগ্যেস করল—এ বাসায় তুমি থাকো? আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। সে হাসল—তোমাকে সেদিন দেখেছিলুম স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়েছিলে। বিড়বিড় করে কী বকো তুমি বলো তো? তোমার ঠোঁট নড়ছিল। আমি হেসে মাথা নেড়ে বললাম—কী জানি, হবে হয়তো। সে এবার কাছে এগিয়ে আসে, খুব কাছে। বলে—আমি সেই ছেলেবেলায় কবে তোমাকে দেখেছিলাম, আর এখন তুমি কত বড় হয়ে গেছ। তুমি কেমন মানুষ হয়েছ তা তো জানি না! কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি খুব সৎ আর তোমার মনে খুব মায়া। আমি হাসলাম—কী জানি! জানি না। সে বাগানের দিকে একবার ফিরে দেখে নিল, বলল—সৎ লোকেরা কখনও সুখী হয় না। তুমিও দুঃখী বোধ হয়। আর দেখছি তুমি তেমন সবল হওনি, দৃঢ়চেতা হওনি, তাই না? আমি মাথা নাড়ি—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে সুন্দর সকালের রোদের মতোই ফুটফুটে হাসি হাসল—ছেলেবেলার কবেকার এই পুরনো ভুলে-যাওয়া মফস্বল শহরে এতদিন পর আমি আবার কেন এসেছি জান? তোমার জন্যই। বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—আসব তোমার কাছে, মাঝে মাঝে আসব। শুধু এই খুব অসময়ে দেখা হবে, যখন মানুষ ঘুমোয় কিংবা কেউ থাকে না কোথাও। অসময়ে—মনে রেখো। বলতে বলতে সে পিছন ফিরল। আমাদের বাগানে গাছপালা ঘন, সারাদিন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে থাকে। সে এইসব গাছগাছালির মায়াময় ছায়াচ্ছন্নতার ভিতরে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। আমি আবার ভোরবেলায় উঠলাম পরদিন। আমাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন বাগানে কেউ ছিল না। আমি সুরকির পথ ধরে বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ঝুম কুয়াশায় খুব ভোর-আলোর ভিতরে যতদূর চোখ যায় চেয়ে দেখলাম, সব শূন্য। সে নেই। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, এ ভুল। আমি আগের দিন ভোরে বাস্তবিক কাউকেই দেখিনি। সে আমার কল্পনা। ফিকে বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। তবে আমার একটা সুবিধে এই যে আমার কিছু হারায় না। আমি কল্পনায় সব পেয়ে যাই। সেখানে সেও রয়ে গেল চিরদিনের মতো। ভাবতে ভাবতে আমি ভোর, শীতল, প্রায়ান্ধকার জনশূন্য রাস্তায় রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। স্বপ্নের সেই মেয়েটি আমাকে কথা দিয়েও ভুলে গেছে বলে কোনও ক্ষোভ রইল না।—ইচ্ছে থাকলেও আমি রোজ রাতে একই স্বপ্ন দেখতে পারি কি? তবে দুঃখ কীসের? ফিরে এসে দেখি ফটকের কাছে আমার ছোট বোন মাধবীলতার আর্চের কাছে দাঁড়িয়ে, মা বারান্দায়। শুধু আমি সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি, আমার বোনের পরনে চেনা নীল শাড়ি, আর মায়ের গলায় সেই কাশ্মীরি স্কার্ফ জড়ানো।

—এ তো স্বপ্ন!

—স্বপ্ন না থাকলে এই অতি সুকঠিন, বিবর্ণ বাস্তবতা নিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি, আমার মশারির এক ধার তুলে সে আমার দিকে ঝুঁকে চেয়ে আছে।

আমার চেতনা জুড়ে তীব্র ভয় লাফিয়ে উঠল। বল-এর মতো লাফাতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ড! সে মৃদু হাসল—তুমি খুব দুর্বল? কেন? আমি জবাব দিলাম না। সেদিন তার পোশাক ছিল গোলাপি, তাতে জরির কাজ। সে স্নেহের একটি হাত আমার বুকের ওপর ফেলে রেখে ধীরে ধীরে বসল। আমি দেখলাম, সে সালোয়ার আর কামিজ পরে আছে। আমার স্মৃতি তার টানে আমাকে একবার অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে কী যেন দেখে নিতে বলল। আমি কিছুই মনে করতে পারলাম না। সে আবার মৃদু হেসে বলল—ছেলেবেলা থেকেই তুমি দুর্বল। তোমার মাথায় স্বপ্নের বাসা, তোমার মনে একরত্তি বাস্তবতা নেই। বলতে বলতে সে আরও ঝুঁকে পড়ে সামান্য তীব্রস্বরে বলল—আমাকে মনে পড়ে না তোমার? একদিন আমরা বনভোজনে গিয়েছিলাম ছেলেমেয়েরা। দলছাড়া হয়ে তুমি আর আমি পালালাম নদীর ধারে। তুমি ছিলে ভিতু, আমি সব সময়ে তোমাকে সাহস দিতাম। সেই নদীর ধারে আমি তোমাকে কবিতা শুনিয়েছিলাম। তুমি ছিলে বোকা, আসলে কবিতার ভিতর দিয়েই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, আমি তোমাকে...। তুমি ভয়ংকর অস্বস্তি আর অস্থিরতায় তার মানে বুঝবার চেষ্টা করোনি। তুমি বলেছিলে, পায়ে পড়ি ফিরে চলো। মনে পড়ে? আমি বললাম—না। মনে পড়ে না। আবার সেই হাসি হাসল সে—দ্বিধামুক্ত, কোমল কিন্তু জীবনশক্তিতে ভরা। বলল—তুমি সব পেয়েও পেতে চাও না, কেবল পালাতে চাও স্বপ্নের ভিতরে। তাই আমাকে অনেক রাস্তা পার হতে হল। তার গলার স্বরে এবার আস্তে আস্তে আমার সামান্য সাহস ফিরে আসে। বললাম—কোথা থেকে এলে তুমি অত বাক্সবোঝা নিয়ে? রেল গাড়িতেই তুমি কি এসেছ? অনেক দূরে থাকো কি তুমি? না, ছেলেবেলার তোমাকে আমার মনে নেই। তুমি কি রিনা? কিংবা আর কেউ, যাকে আমার মনে নেই? সে আমার মাথার ঝুঁটি নেড়ে দিল, বলল—তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। হায়! আমাকে তোমার মনে পড়ল না? অথচ কতদূর থেকে আমি এলুম শুধু তোমার জন্যই। কথা বোলো না, আমার হাত ধরে চুপ করে শুয়ে থাকো। শোনো, আমি তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ির একটা গোপন কুঠুরির তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেই ঘরে ছিল কাঠের একটা পুরনো সিন্দুক। তার ভেতরে ছিল অনেক কাগজপত্র, রহস্যময় অনেক পুরনো দলিল, অনেক চিঠি। তুমি আর আমি আমাদের নিষেধের ছেলেবেলায় এক দুপুরে বসে অনেক চিঠি পড়েছিলুম একসঙ্গে। সেইসব চিঠি ছিল আমার মা আর বাবার মধ্যে লেখা প্রেমপত্র। না ভুল বললাম, শুধু প্রেমপত্র নয়, সেগুলো বিয়ের পরে লেখা। কিছু সাংসারিক কথাও তার মধ্যে ছিল। পড়তে পড়তে, হাসতে হাসতে আমরা এক সময়ে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলুম। সেই কাঠের সিন্দুকের ওপর অনেক পুরনো কাগজের গন্ধের মধ্যে। মনে পড়ে? তোমার মনে নেই, কেননা সে সবই অতি তুচ্ছ ঘটনা, খুব সামান্য; তাদের যত্ন করে আমিই মনে রেখেছি এতদিন। হায়! সে সব তুচ্ছ ঘটনা ছাড়া আমার আর কিছু নেই। তোমাকে সেইসব ফিরিয়ে দিতে এসেছি। দিয়ে গেলুম। আমি তার হাত মুঠো করে ধরে রইলুম। সে অন্ধকার ঘরের চারদিকে চাইল। বলল—এই ঘরে আর কে থাকে? ওই বিছানায় তোমার বুড়ি ঠাকুমা আর ছোট ভাই বোন, না? আর পাশের ঘরে তোমার মা বাবা, তাই না? আর এই ছোট্ট বিছানায় তুমি! সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—সুন্দর সংসার তোমাদের। শান্ত পরিপাটি ভাল মানুষদের পরিবার। তোমাদের ঘরের আনাচে কানাচে সুন্দর সব স্বপ্নেরা ঘুরে বেড়ায়, প্রজাপতির মতো ওড়ে কল্পনা! এরকম পরিবারই আমি ভালবাসি। এতদিন হয়ে গেছে, এখন আর বলাই যায় না যে, আমি তোমাকে...। সে থেমে শুধু আমার দিকে চেয়ে রইল। ঘরে কোথাও আলো ছিল না, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কামিজের কলারে জরি তার ঘাড়ের সুন্দর রঙের ওপর জ্বলছে। তার মেরুন ঠোঁট থেকে শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘরের বাতাস। তার নরম হাত ক্রমশ গলে যাচ্ছে আমার হাতের মৃদু উত্তাপে। সে অনেকক্ষণ ওইভাবে বসে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মৃদু গলায় বলল—ঘুমোও। যতক্ষণ ঘুমিয়ে না পড়ো ততক্ষণ বসে থাকব। তৎক্ষণাৎ আমি বললাম—তা হলে ঘুমোব না। এসো, দুজনে জেগে থাকি। সে তার দুটো আঙুল আমার চোখের ওপর রাখল, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর জুড়ে নেমে এল সম্মোহন, ঘুমের এক ঢল।

নিথর হয়ে গল্পটা শুনেছিল সীতা। প্রায় কিশোরী-বয়সি সে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল—সেই বনভোজনে কী কবিতা সে শুনিয়েছিল?

মনোরম তৃপ্তির হাসি হেসে একটা নুড়ি ছুড়ে দিল জলে, বলল—মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...।

সীতা মুখ নিচু করে ছিল তারপর। নদীটা তট অতিক্রম করে তার বুকে উঠে এল। তারপর বুক জুড়ে বয়ে যেতে লাগল। তখন দূরে দু-একটা কণ্ঠস্বর তাদের নাম ধরে ডাকছিল। তারা কেউ উত্তর দিল না। শুনতে পেল না।

সীতা মৃদুস্বরে বলল—এ সবই গল্প।

—গল্পই! তোমাকে বলি, চপলা ছাড়া কোনও অনাত্মীয়া মেয়ের গা আমি কখনও ছুঁইনি, ছোঁয়ার মতো করে। অনাত্মীয়াই বা বলি কী করে। চপলা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়াই ছিল। আমরা দেশের বাড়িতে যখন যেতাম, তখন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের একটা বেশ বড় দঙ্গল এক ঢালাও বিছানায় শুতাম। তখন প্রায়ই চপলা আমার মাথার বালিশে ভাগ বসাত। আমার অসতর্ক ঠোঁটে চুমু খেত, ভয়ে আমি কাঠ হয়ে থাকতাম। সঞ্জীবচন্দ্রের একটা উপন্যাসে ছেলেবেলায় আমি একটা প্রেমের ঘটনা পড়ি। নায়িকা তেলের প্রদীপ হাতে রাত্রিবেলায় নায়ককে দেয়ালের ছবি দেখাচ্ছে ঘুরে ঘুরে। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ নায়ক মুখ ফিরিয়ে বলল—তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদগন্ধ। শুনে প্রদীপ ফেলে নায়িকা ছুটে পালিয়ে গেল। ওই কথা দীর্ঘকাল ধরে গুনগুন করে ওঠার মতো আমার মনে রয়ে গেছে, তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদগন্ধ। চপলার শরীরের গন্ধ মনে নেই। বোধহয় সে ঘামের তেলের, কচি ঠোঁটের মিলিত গন্ধ—কিশোরী বা বালিকার গায়ে বোধহয় ওইরকম গন্ধ থাকে। তবু এখনও যখন গভীর রাতে কল্পনায় চপলা চুপি চুপি মশারি সরিয়ে সেই ছেলেবেলার দেশের রাত্রির মতো কাছে আসে, তখন এখনও আমি ফিসফিস করে বলে উঠি—তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ! চপলা প্রদীপ ফেলে পালায়।

এটুকু বলে মনোরম প্রতীক্ষায় চেয়েছিল।

কী বলবে সীতা? তবে সে ইঙ্গিত বুঝেছিল। অবশেষে বলল—সে সব তো স্বপ্নে!

—স্বপ্নই। কিন্তু আর তো কখনও তাদের স্বপ্ন দেখব না।

—কেন?

মনোরম তীব্র হাতে আবার নুড়ি ছুড়ে মারল জলে, বলল—সে সব রেখে গেলাম ওইখানে। নদীতে। চপলা, রিনা, আর সব...

—তবে কী থাকল?

—তুমি বলো তো?

—...

—আমি কি আর কখনও সেই আশ্চর্য গন্ধ পাব? পাব না বোধহয়, না?

কৃত্রিম দুঃখে ভরা গলায় বলেছিল মনোরম।

—কী জানি।

—তুমি বলো।

মনোরম স্পর্শ করেছিল তাকে, কী সাহস! অনেকক্ষণ বুক ভরে টেনেছিল বাতাস, নতুন ফোটা ফুলের গন্ধ যেমন নেয় লোকে ঠিক তেমনি। সীতার সুন্দর গন্ধ নিয়েছিল মনোরম। বলেছিল—আমি আর স্বপ্ন চাই না।

প্রবাসে, বিদেশে ছুটিতে যায় যুবক-যুবতীরা। কাছাকাছি হয়, একটু রং ছোড়াছুড়ি করে। কলকাতায় পা দিয়ে সব ভুলে যায়। বাইরে থেকে ঘরে এসে যেমন বাইরের ধুলো হাত-পা থেকে ধুয়ে ফেলে লোক তেমনি ধুয়ে ফেলে সব স্মৃতি। কিন্তু সীতা ভোলেনি। কলকাতায় ফিরেও।

সীতার দেওয়া টেলিফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেনি মনোরমও। টেলিফোন করেছিল।

আজ বহুকাল বাদে বৃষ্টিতে-ধোয়া ময়দান পেরিয়ে, ব্রিজ পেরিয়ে, ঢালু বেয়ে যখন নেমে যাচ্ছে ট্রামগাড়ি, তখন সীতা স্পষ্ট সেই বহুকালের পুরনো টেলিফোনটা কানে তুলে শুনছিল কাঁপা কাঁপা একটা

ভিতু গলা—আমি মনোরম। তুমি কি সীতা?

গায়ে কাঁটা দেয়। এখনও।

কলকাতায় তো সেই বনভূমি নেই, স্বচ্ছ জলের নদীটিও নেই। তবু মানুষ ইচ্ছে করলে মনে মনে সেই বনভূমি আর সেই নদী সৃষ্টি করে নিতে পারে। তারা নিয়েছিল।

ভালবাসা? হবেও বা। তখন মনোরম বড় ছন্নছাড়া, চাকরি ছেড়ে এজেন্সি নেওয়ার কথা মাঝে মাঝে বলে। সীতার বাবা ব্যাপারটা আন্দাজ করে বলল—ও ছেলে এখনও লাইন পাচ্ছে না, ওর কি কোনও কেরিয়ার তৈরি হচ্ছে?

তবু বিয়ে হয়েছিল। যেসব ছেলেরা নিজেরা যেচে মেয়েদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, তাদের কেমন যেন পছন্দ হয় না সীতার। মনোরমও করেনি। সীতা করেছিল প্রস্তাব।

তারা সুখী হয়েছিল কিনা তা ঠিক বুঝতে বা ভাবতে চেষ্টা করেনি সীতা। সে শুধু ধীরে ধীরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে ক্রমে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে রাখতে শিখেছিল। ভালবাসা কি ওইরকমই কিছু? আর একজনের ইচ্ছাকে নিজেরও ইচ্ছা করে নেওয়া? নাকি আরও বড় বিশাল কিছু?

সীতা ভেবে পায় না। আজও বড় মনে পড়ে, দুঘরের মাঝখানে নীল পর্দাটা উড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায়, দুঘর উদ্ভাসিত আলো। এ ঘরে চা ছাঁকছে সীতা, ও ঘরে ক্লান্ত মনোরম বসে আছে। অপেক্ষায়। কেবলই এই দৃশ্যটা মনে পড়ে। ঘরের আনাচে কানাচে সুখ তার অঙ্কুরের ডানা মেলেছিল কিনা কে জানে। তবু দৃশ্যটা বোধহয় আজ সুখী করে সীতাকে। দুঃখীও করে।

ট্রামগাড়ি অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে চলে। রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন। শেষ বেলার রোদ উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে উদাসীন চেয়েছিল সীতা। পাশে বসা পুরুষ কিংবা মানুষের লোভী চোখের আক্রমণ আর টের পাচ্ছিল না সীতা।

একটা মেঘের স্তরের ভেতর সূর্য ডুবে গেল। সীতা বাড়ির রাস্তায় এসে পড়ল যখন, তখন হালকা অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছে। একটু অন্যমনে হাঁটছিল, বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়ানো অপেক্ষারত মানুষটিকে সে প্রথমে লক্ষ করেনি। কাছাকাছি হতেই লোকটা তীব্র শ্বাসের শব্দ করে ডাকল—সীতা।

চমকে উঠে তাকিয়ে সে মজবুত কাঠামোর প্রকাণ্ড শরীরওলা মানসকে দেখতে পেল। মানস লাহিড়ি।

এক পা এগিয়ে এসে মানস বলে—এখন বাড়িতে ঢুকো না।

—কেন?

—তা হলে আর বেরোতে পারবে না, আবার পারমিশান-ফারমিশান নিতে হবে। তার দরকার কী? চলো কেটে পড়ি, ঘুরে-টুরে একেবারে ফিরবে।

—সেই জন্যই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়?

—সেই জন্যই। তোমাকে মাঝপথে ধরব বলে। চলো জিনিসগুলো আমাকে দাও—নিচ্ছি। কোথায় গিয়েছিলে?

—মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। এমনি ঘুরে এলাম একটু।

—ট্যাক্সি নেব?

সীতা হাসল। বলল—ট্যাক্সি কেন? অনেক দূরের প্রোগ্রাম।

—না, না। কোনও প্রোগ্রাম নেই। যেখানে খুশি একটু যাব। কত কথা জমে আছে।

দুজনে আবার বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি।

—খড়্গপুরে গিয়েছিলাম কদিনের জন্য। মানস বলে।

—জানি তো! সীতা হাসল।

—জানো তো বটেই। কিন্তু এ ক'দিন তোমাকে না দেখে কীরকম কেটেছিল খড়্গপুরে তা তো বলিনি।

সীতা মাথা নিচু করল একটু। কথা বলল না।

—আমার শরীরে কোনও রোগ নেই, তবু এ ক'দিন আমার শরীর জ্বরজ্বর করেছে। মাথা ধরেছে। ইন্টার রেল ওয়েটলিফটিং-এ আমি ছিলাম একজন জাজ, কিন্তু জাজমেন্টও দিয়েছি আবোলতাবোল। কিছু ভাল করে লক্ষই করিনি। ভাবছি কী করে পাতিয়ালায় যাব। এইরকম তোমাকে ছেড়ে।

সীতা তেমনি মুখ নিচু করে থাকে।

—শুনছ?

—হুঁ।

—কিছু বলো।

—কী বলব?

—কীভাবে যাব পাতিয়ালায়? ওখানে কোচদের ট্রেনিং তো অনেক সময় নেবে আরও। খড়্গপুরে মাত্র ক'দিনেই যা অবস্থা হয়েছিল...!

সীতা একটা শ্বাস ফেলল। কিছু বলল না।

—কিছু বলো।

সীতা একটু সংকোচ বোধ করছিল। তবু বলল—এক বছর হতে আরও তিন মাস বাকি আছে। তারপর তো...

ঝকঝক করে ওঠে মানসের চোখ, সীতার দিকে ঝুঁকে বলে—তারপর কী?

সীতা সুন্দর দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়াল।

মানস মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলে—ও সব কে আর মানছে? তিন মাস আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।

—তাই কি হয়?

—কেন হয় না?

—তিনটে মাস চলে যাবে দেখতে দেখতে।

—তিনটে মাস কিছু কম সময় নয় সীতা। আমরা ইচ্ছে করলে এই তিনটে মাস গেইন করতে পারি।

—ও যদি বাধা দেয়?

—কে?

—ও। বলে মাথা নোয়ায় সীতা।

—মনোরম?

—হুঁ।

—মনোরম! মনোরম কেন বাধা দেবে?

—যদি দেয়?

—কেন দেবে? ওর কোনও ইন্টারেস্ট তো আর নেই।

—নেই? ঠিক জানেন?

মানস শব্দ করে হাসে।

—নেই আমি জানি। তা ছাড়া মনোরম এখন ধ্বংসস্তূপ। জাস্ট এ হিপ অফ্ ডেব্রিস। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ওর আর নেই।

সীতা চুপ করে থাকে।

—আজকাল রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়।

—থাকগে। আমি শুনতে চাই না। সীতা বলে।

—থাক। আমিও ঠিক বলতে চাইনি। তবে এক সময়ে ও আমার বন্ধু ছিল। আই ফিল ফর হিম।

সহজেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। বড় রাস্তার মোড়েই সওয়ারি নামাচ্ছিল ট্যাক্সিটা। মানস 'চলো' বলে দৌড়ে গিয়ে ধরল। ড্রাইভার 'কোথায় যাবেন?' এবং তারপর, 'গাড়ি খারাপ আছে দাদা' বলে এড়াতে চেয়েছিল। মানস কোনও কথাই গ্রাহ্য করল না। শান্ত হাতে দরজা খুলে সীতাকে আগে উঠতে দিল, তারপর নিজে উঠল। দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বলল—গোলমাল কোরো না, যেদিকে বলছি সেদিকে যাবে, নইলে...ড্রাইভার ঘাড় ঘুড়িয়ে এক পলক দেখে নিল মানসকে, তারপর স্টার্ট দিল।

সীতা জানে, এ অবস্থায় মনোরম হলে ট্যাক্সিওয়ালাই জিতে যেত। মনোরম কিছুতেই এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ট্যাক্সি ধরতে পারত না।

মানস একটু ঘন হয়ে বসল। ট্রামে সেই মুশকো লোকটার মতোই অবিকল। তবে সীতা এবার সরে গেল না। মানসের একটু ভাঙা চৌকো মুখ, মাথায় পাতলা চুল, চমৎকার দুখানা হরিণ চোখে এক ধরনের মারাত্মক সৌন্দর্য আছে। ওর শরীরটা যেমন কর্কশ আর প্রকাণ্ড আর জোরালো, চোখ দুখানা তেমনই মায়াবী। কাজলের মতো টানা একটা রেখা আছে ওর চোখে, জন্মগত। কথা যখন বলে তখন বড় সুন্দর শোনায় ওর গলা, ঘোষণাকারীদের মতো।

হাত বাড়িয়ে নরম জোরালো পাঞ্জায় সীতার হাত ধরল মানস। সীতা কোনও সংকোচ বোধ করে না। কেবল একটা অস্বস্তি তার হয়। সেটা হাস্যকর অস্বস্তি। মনোরম খুব সিগারেট খেত। তাই যখনই মনোরমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হত সীতা, তখনই সিগারেটের গন্ধ পেত। সিগারেটের জন্য সে কম বকেনি মনোরমকে। কিন্তু গন্ধটা তার বুকে, শিরায়, সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। যেন পুরুষের গায়ে ওই গন্ধ থাকবেই। ওটাই বুঝি পুরুষের গন্ধ। মানস সিগারেট খায় না। ট্যাক্সিতে এত কাছাকাছি বসেও সীতা তাই পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটি পাচ্ছিল না। একটা কেমন অস্বস্তি হয় তার। পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটির জন্য সে উন্মুখ হয় বুঝি মনে মনে।

ব্যাপারটা কিছু নয়। সকলকেই যে এক রকমের হতে হবে তার কী মানে আছে! সীতার হাতখানা নিয়ে আঙুল আঙুলে আশ্লেষে খেলা করল মানস। সীতা বাধা দিল না। একজনের সঙ্গে বউ হয়ে থাকার অভ্যাস ছেড়ে আর একজনের বউ হওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা সহজ নয়। এই নতুন অভ্যাসকে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সীতা।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—আগে কিছু খাই। বড্ড খিদে।

—জানি। খুব খিদে পায় আপনার।

মানস হাসল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলল—ঠিক ধরেছ। আমার শরীরটা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি আমার প্রকাণ্ড খিদে! সব রকম খিদে।

অর্থপূর্ণ হাসছিল মানস। সীতার খাটো ব্লাউজের তলায় পেট পিঠ খোলা। মানসের হাত সীতার করতল ছেড়ে উঠে এল কোমরে। নরম আঙুলে সে সীতার শরীরের মাংসে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। মানস এতকাল এ সব করেনি। এখন বোধহয় ওর ধৈর্য ভেঙে যাচ্ছে। মুখের সামনে মাংস, তবু খাবে না, এ কী রকম। সীতা একটু হাসে। তার অনিচ্ছা হয় না। আর একটু ঘন হয়ে বসে মানসের শরীরের সঙ্গে। পেটের কাছে মানসের হাতটা চেপে ধরে রাখে এক হাতে। তার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। সে অভ্যাস করে নেবে। এই বড় চেহারার শক্ত মানুষটির কাছাকাছি বসে সে নির্ভরতা পাচ্ছিল।

মানস ফিসফিস করে বলল—আমাকে 'তুমি' করে বলো।

—বলব।

—এখনই।

—তুমি।

— ব্যস, হয়ে গেল ! বলে হাসল মানস।

সীতা কিছু বুঝতে পারেনি, আচমকা খোঁপার নীচে তার ঘাড়টা চেপে ধরে মানস। অন্য হাতে থুতনি ধরে একপলকে মুখটা ফিরিয়ে নেয় তার দিকে। চুমু খায়। ছোট্ট চুমু, কয়েক সেকেন্ডের।

সীতা ছাড়া পেয়ে বলল—ট্যাক্সিতে? ওঃ মা!

—ও দেখছে না।

সীতা খুব আস্তে বলে—ওর সামনে আয়না রয়েছে।

—দেখলেই কী? আস্তে বলে মানস।

—কী ভাববে?

—কিছু ভাববে না। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের অভ্যাস আছে দেখে।

—যাঃ! সীতা হাসল।

এবং মানস আর একবার কাণ্ডটা করল। এবার একটু [illegible] নিয়ে। তার মুখের লালাতে ঠোঁট ভিজে গেল সীতার। তবু ভালই লাগল। একটু কাঁটা হয়ে রইল সে, ট্যাক্সিওয়ালাটার জন্য। কিন্তু শরীরে এক ধরনের উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। নতুন মানুষটিরই উত্তাপ। সীতা বুঝে যাচ্ছিল, সে পারবে। এরকম আত্মবিশ্বাসী, সাহসী, সরল ব্যবহারের মানুষ সে তো আগে দেখেনি। এর অভ্যাসকে নিজের অভ্যাস করে নেওয়া শক্ত নয়। সীতা জানে ট্যাক্সিওয়ালাটা দেখছে সবই, ভয়ে কিছু বলছে না। নিখুঁত চালিয়ে নিচ্ছে গাড়ি।

—বড় রেস্তরাঁয় যাব না, কেমন? মানস বলে, স্বরে গাঢ় ভালবাসা।

—যা তোমার খুশি।

—বড় রেস্তরাঁয় ভিড় কথা হয় না।

সীতা মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে—কথা তো হয়েই গেল!

—কী কথা হল।

—এই যে, যা করলে, এটাও তো কথাই।

মানস হাসল খুব। একটু অন্ধকার এখন। তাই মানসের হরিণ চোখজোড়া দেখতে পাচ্ছে না সীতা। দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব।

গড়ের ময়দান ছেড়ে চৌরঙ্গিতে পড়তেই রাস্তার আলো অপসৃয়মাণ উজ্জ্বলতা ফেলছিল গাড়ির মধ্যে। এই আলো, সেই আলো, লাল-সবুজ-সাদা। সেইসব আলোতে পলকে পলকে মুখখানা পালটে যায়। মানসের মুখ খুব কাছে। ভাল দেখা যাচ্ছে না। ভালবাসায় স্নেহে ওর মাথায় হাত রাখল সীতা। ওর হরিণ-চোখ একবার আলোকে স্পষ্ট, আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সীতা নিবিড় চোখে দেখে।

—চুল উঠে যাচ্ছে বুঝি? মানসের মাথার চুল নেড়ে সীতা বলল।

—প্রায়। টাক পড়ে যাবে শিগগির। তার আগে টোপর না পরলে...

—টোপর? একটু অবাক গলায় সীতা বলে।

—নয় কেন?

—টোপর পরা মানে তো সামাজিক বিয়ে, তা কি হবে?

—হবে না কেন? একটু অস্বস্তির গলায় মানস বলে।

সীতা হাসল একটু, বিষণ্ণ হাসিটি। বলল—তা কি হয়? কুমারী মেয়েরই সম্প্রদান হয়।

মানস হেলে পড়েছিল সীতার গায়ে, উঠে বসল।

—না হয় রেজেস্ট্রিই হল। টোপর পরাটা না হয় এ জন্মে বাদ দিলাম।

সীতা হঠাৎ তার চোখভরা জল টের পেয়ে আঁচল তুলল চোখে, বলল—টোপর পরার শখ থাকলে না হয় আমি সরে যাই...

—কী বলে রে মেয়েটা? এঃ মা, কাঁদছ? বলে মানস দুহাতে তাকে টেনে নেয় এবং তখন মানসের শরীরের মাখনের মতো নরম এবং লোহার মতো শক্ত দুরকম পেশির অস্তিত্ব টের পায় সীতা।

—কাঁদে না, কাঁদে না। টোপরটা তো ঠাট্টার কথা, আজকাল কেউ পরতেই চায় না। মানস আকুল গলায় বলে।

—না। তা কেন? বিয়েতে আলো, সানাই, টোপর-সিঁথিমোর, কড়িখেলা এ সবের একটা আলাদা স্বাদ। অনেকে বিয়ে বলতে এ সব ভাবে। তুমিও ভাব।

—কে বলল?

—আমি জানি।

—আমার বয়স কত জান?

—কত?

—একত্রিশ। এ বয়সে যে রোমাঞ্চ-টোমাঞ্চ সব ঝরে যেতে থাকে। আমি স্বপ্ন দেখি না।

—শুভদৃষ্টির কথাও কখনও ভাব না?

—ও সব নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?

—আর ফুলশয্যা?

—তুমি ঠাট্টা করছ।
—না গো।
—শোনো, আমি বড্ড ব্যস্ত মানুষ। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াই। তিন-চার বার ইউরোপ, ফার ইস্ট ঘুরেছি। অনেক দেখতে দেখতে আর অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমার ও সব সংস্কার কেটে গেছে। লক্ষ্মীটি, একদম ভেবো না। আমি সত্যি ঠাট্টা করছিলাম।
আর তখন সীতার ভাল লাগছিল খুব, মস্ত বুকে হেলান দিয়ে বসে থাকতে। সে মনে মনে হিসেব করে দেখল, যদি মানসের একত্রিশ হয়, মনোরমের এখন ছত্রিশ এবং মানস তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। সীতা কলকাতার রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপনের হেডিং দেখেছে প্রায়ই—গেট ইওরসেলফ এ ইয়ং হাজব্যান্ড। সে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ আস্তে বলল—আই অ্যাম গেটিং...
—কী?
—এ ইয়ংগার হাজব্যান্ড। বলে হাসল সীতা, সম্মোহিতের হাসি।
মানসের সাহসী ও সরল হাত একটু ওপরে উঠেছে তখন। বুকে।
ট্যাক্সিওয়ালা পার্ক স্ট্রিটের ট্র্যাফিক সিগন্যাল পার হয়ে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—কোথায় যাবেন?
—চৌরঙ্গি মার্কেট। মানস ভেবে রেখেছিল জায়গাটা। চট করে বলল। ভাবল না। এবং যেখানে হাত ছিল সেখানেই রেখে দিল। সরাল না।
বড় অবাক-করা সাহস ওর। সীতা ঠিক এরকমই চেয়েছিল।
সুরেন ব্যানার্জি রোডে ট্যাক্সি ছেড়ে ওরা ঢুকল চৌরঙ্গি মার্কেটে। ছোট্ট ছিমছাম একটা রেস্তরাঁ। খদ্দের নেই।
অনেক খাবারের অর্ডার দিল মানস। দইবড়া, চপ, ঘুগনি।
—আর কী খাবে?
—আরও? চোখ কপালে তোলে সীতা।
—খাও না বলেই তুমি রোগা।
সীতা মুখে রুমাল চেপে স্রোতস্বিনীর মতো হাসে—মেয়েরা অত খায় না মশাই।
—কারও খাওয়া দেখলে তুমি ঘেন্না পাও না তো? অনেকে পায়।
—যাঃ! যে খেতে পারে সে খাবে না কেন? ঘেন্নার কী?
—আমার বাসায় তো বড় পরিবার। সেখানে অনেকে আছে যারা আমার খাওয়া দেখতে পারে না।
—আমি পারব। ভয় নেই।
সেই তৃপ্তির হাসিটা আবার হাসে মানস। চৌকো থুতনি আর চোয়ালে হাসিটা খুব জোরালো দেখায়। ঝকঝকে সাজানো দাঁত। মুখে খুব সুন্দর একটা সুস্থতার গন্ধ পেয়েছিল সীতা, চুমুর সময়ে। হরিণ চোখ, তাতে দীর্ঘ পাতা। এত জোরালো মুখে চোখ দুটো বড় বেমানান রকমের মায়াবী। 'বড় পরিবার' কথাটা সীতার মনের মধ্যে নড়ছিল। একটু সময় নিল সে, বলল—বিয়ের পর তোমার পরিবারের কে কী বলবে?
—বললেই শুনছে কে? আমি তো গভর্নমেন্টের ফ্ল্যাট পেয়েই গেছি তারাতলায়। অগাস্টে অ্যালটমেন্ট, তুমি তো জানো।
—আলাদা থাকাটাই তো সব নয়। সম্পর্ক তো থাকবেই। আর যাতায়াতও।
—সব সম্পর্ক কেটে দিচ্ছি।
—কেন?
—কেটে না দিয়ে উপায় কী?
সীতা আবার সংশয়ের যন্ত্রণা ভোগ করে বলে—কেন কেটে দিচ্ছ? আমার জন্যই তো।
—ঠিক তা নয়। তবে তোমাকে নিয়ে আলাদা থাকতে চাই। একদম আলাদা আর একা।
—কেন? প্রশ্ন করেই আবার সীতার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। চোখে জল চলে আসতে থাকে। আজকাল তার এরকম হয়। ছন্নছাড়া, কারণহীন কান্না পায়। খুব কি বেশি অভিমানী হয়ে গেছে সে?
মানস তার হরিণ চোখ দুখানা সম্পূর্ণ মেলে চেয়ে থাকে। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর

পড়ে থাকা সীতার একখানা হাত চেপে ধরে বলে—ও কী! সীতা!

মুখোমুখি বসে ছিল তারা। মানস উঠে সীতার পাশে এসে বসল, কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, কী হল হঠাৎ?

—আমার জন্যই তুমি পরিবার ছাড়ছ তো!

—কে বলল?

—বলতে হয় না, টের পাওয়া যায়।

—কিছু জানো না। আমরা কি সুখী পরিবারে বাস করি? ছোট্ট বাসা, জায়গা নেই, রোজ ঝগড়াঝাঁটি, সে এক বিচ্ছিরি পরিবেশ। আমার মা বাবা নেই, শুধু দুই ভাই, তিন কাকা কাকিমা আর খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে থাকি। পিছুটানও কিছুই না। ও সংসার তো একদিন ছাড়তে হতই! আমি অনেকদিন ধরে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, বিয়ের পরই আলাদা হব; বিশ্বাস করো।

সীতা সামলে গেল। হাসলও একটু। বলল—আমার সব সময়ে কেন যে কান্না পায়!

—কেন কান্না পাবে? আমরা খুব সুখী হব, দেখো।

—কী করে বুঝলে?

আবেগভরে মানস বলে—আমি তোমাকে সুখী করবই। প্রতিজ্ঞা।

হালকা হাসি হাসছিল সীতা, বলল—গায়ের জোরে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলে মানস—শুধু তোমার নামটা পালটে দেব।

—কেন?

—ও নামে তোমাকে ডাকতে আমার ভাল লাগে না।

—কেন গো?

—মনোরম ডাকত।

—তাতে কী? মানুষের তো একটাই নাম, সবাই ডাকে।

—তাতে মজা নেই। আলাদা নামে ডাকলেই মজা।

—নাম নিয়ে তুমি একটা কিছু ভেবেছ নিশ্চয়ই?

—ভেবেছি।

—কী?

—'সীতা' নামটার জন্যই তুমি অত দুঃখী-দুঃখী ভাব করে থাক। যেন চারধারে তোমার অশোকবন, রাক্ষসের পাহারা, যেন নির্বাসনে আছ।

'অশোকবন' কথাটায় একটা বিস্মৃতপ্রায় বনভূমির ছায়া সীতার চোখের ওপর দুলে গেল বুঝি? এক পলকের অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সে বলল—ডেকো! যে-নামে খুশি।

—আমি ভেবে রেখেছি।

—কী?

—মৌ।

সীতা একটু অবাক হয়ে আবার হেসে ফেলে—বেশ এক অক্ষরের নাম তো?

—ভাল নয়?

—তুমি যে নাম দেবে, তাই ভাল।

—না। তোমার পছন্দ হয়নি?

—হয়েছে। ডাকলে কেউ ভুল করে শুনবে 'বউ' বলে ডাকছ।

—আসলে তো তাই ডাকা। মৌ মানে মধু।

—জানি।

—বাংলার বধূ, বুকে তার মধু, পড়নি?

—জানি। সীতা স্মিতমুখে মুখ তুলে মানসের মুখে চেয়ে থাকে।

নিঃশব্দ পায়ে হঠাৎ বেয়ারা খাবার রেখে যায়।

—খাও। মানস গাঢ় চোখে তাকিয়ে বলে।

—আর কি খিদে থাকে?
—কেন?
—থাকে না গো। ভেতরটা আনন্দে ফেটে পড়ছে।
মানস খুব খুশি হয়। ভারী বোকার মতো হাসতেই থাকে। অকপট হাসি। একটু ঘন হয়ে আসে। সীতা ঘুগনির বাটিতে চামচ ডোবায়।
—ঝাল। মানস বলল।
—ঝালই তো ভাল।
—আমি ঝাল খেতে পারি না।
—তবে তোমাকে রোজ শুকতুনি রেঁধে দেব।
—আমি খাই ফ্যানসুদ্ধু ভাত, লাল আটার রুটি, খোসাসুদ্ধু তরকারি, কাঁচা সবজি।
—ভিটামিন?
—ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ক্যালোরি। আমার কখনও অসুখ হয় না।
—বলতে নেই।
—কী?
—'অসুখ হয় না' বলতে নেই।
—বলব না তা হলে।
সীতা ঘুগনির সুন্দর স্বাদ জিভে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে মানসের দিকে তাকাল । সে সুখী হবে।
—আমার শুধু একটা ভয়। সীতা মুখ টিপে বলল।
— কীসের ভয়?
—আমার একটা অতীত আছে।
—তাতে কী?
—কোনওদিন যদি ও কিছু করে? যদি পিছু নেয়, যদি প্রতিশোধ নেয়?
ভ্রূ কুঁচকে চেয়েছিল মানস। প্রবল হাতে হঠাৎ সীতার হাতটা চেপে ধরে বলল—তা হলে ও আমার হাতে শেষ হয়ে যাবে।
সীতা ততটা উদ্বেগে নয়, যতটা ঠাট্টার গলায় বলল—ভয় তোমাকেও।
—কেন?
—যদি কখনও তোমার মনে কিছু হয়?
তক্ষুনি আবেগে মানস প্রায় সীতাকে বুকে টেনে নিতে যাচ্ছিল। রেস্তোরাঁ বলে পারল না। কিন্তু তার মুখচোখ লাল হয়ে গেল উত্তেজনায়, আবেগে, ভালবাসায়। প্রায় বুজে-যাওয়া গলায় বলল—কোনওদিন না। তুমি এ সব কী বলছ ? আমি তোমার জন্য—তোমার জন্য—বলতে বলতে কথা খুঁজে না পেয়ে মানস রুমাল বের করে মুখ মুছল।
পুরুষকে পাগল করার আয়ুধগুলি মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত। এই প্রকাণ্ড মানুষটার শরীরে এখন আর হাড়গোড় নেই। একতাল পিণ্ডের মতো সীতার অভিমান, সংশয় আর ভালবাসার উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে। এখুনি সর্বস্ব দিয়ে দিতে প্রস্তুত। ও এখন সীতার জন্য দশদিন উপোস করতে পারে, খুন করতে পারে, যা খুশি করতে পারে।
সীতা সতর্ক হয়ে গেল। ওকে পাগল করার ইচ্ছে তার নেই। বরং গভীর মায়ায় সীতা বলল—তোমার কথা আমাকে কখনও কিছু বলো না।
মানস আস্তে আস্তে সহজ হয়ে বসল। রেডিয়োর ঘোষণাকারীর মতো গম্ভীর ঘুমভাঙা সুন্দর গলায় বলল—কী বলব! আমার ছেলেবেলা সুন্দর ছিল না। অল্প বয়সে বাবা মারা গেছে, আমরা দু ভাই আর মা কাকাদের কাছে ছিলাম। দুঃখে কষ্টেই। কাকারা খারাপ লোক নয়, কাকিমারাও ভাল ব্যবহার করেছে, কিন্তু মা আমাদের শান্তি দেয়নি। স্বামী হারিয়ে মা বড় অভিমানী, খুঁতখুঁতে হয়ে গিয়েছিল। কাকিমাদের বা কাকাদের সঙ্গে একটু কিছু হলেই কাঁদত, বিলাপ করত, আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে। এইভাবেই ক্রমে কাকাদের আর কাকিমাদের ধৈর্য ভেঙে

গিয়েছিল। ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি। তাই মাকে নিয়ে আলাদা হব বলে ছেলেবেলা থেকেই চাকরির চেষ্টা করতাম। করেছিও চাকরি। খেলাধুলোয় ভাল ছিলাম বলে স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই চাকরি করেছি। আলাদা বাসা করার মতো টাকা পেতাম না, তবু কিছু টাকা আসত। এইভাবে বড় হয়েছি আর কী?

—কখনও স্বপ্ন দেখনি তুমি?

—কীসের স্বপ্ন?

—অনেকে তো অনেক রকম স্বপ্ন-টপ্ন দেখে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মানস। ভেবে ভেবে বলল—স্বপ্ন ছাড়া বোধহয় মানুষ নেই। আমিও কি দেখিনি? অলিম্পিকে যাব, সোনা আনব—এ সব খুব স্বপ্ন দেখতাম। হল না। ন্যাশনাল মিট-এ বার থেকে পড়ে যাই, তারপর আর জিমন্যাস্টিকসে ফিরে যাওয়া হল না।

—কখনও মেয়েদের কথা ভাবনি?

ম্লান হাসে মানস, বলে—মেয়ে! তাদের কথা চিন্তা করতে সাহসই পেতাম না। মা আর ভাইকে নিয়ে আলাদা একটা বাসা হবে, শুধু সেই চিন্তাই করতাম। মাত্র তো কয়েক বছর আগে রেলে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু ততদিনে মা মরে গেছে। কাকাদের সংসারে কিছু টাকাপয়সা দিই বলে কাকারাও আর ছাড়েনি। রয়ে গেলাম। মেয়েদের চিন্তা প্রথম শুরু হয় তোমাকে দেখে। মনোরম তো একটা ক্রিপল, ওর মনও সুস্থ নয়। ওর ঘরে তোমাকে দেখে আমার কী যে হত!

বলে আবার গাঢ় চোখে তাকায় মানস। হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে—তোমার কিছু হত না আমাকে দেখে?

সীতা অস্বস্তি বোধ করল একটু। না, হত না। মনোরম বড় ভুল করেছিল ওই একটা জায়গায়। মানসকে দেখে কেন কিছু মনে হবে সীতার? তখন তো সীতা সেই কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে নিজের বুকের মধ্যে নিতে শিখে গিয়েছিল।

সীতা মৃদুস্বরে একটা মিথ্যে কথা বলল—হত।

বলে মুখ নামিয়ে নিল টেবিলের ওপর। টেবিলে গাঢ় সবুজ রঙের কাচ তাতে তার আবছা মুখচ্ছবি, ও কি নদীর জলে তার ছায়া?

—কী হত?

—কী জানি! অত কি বলা যায়?

—বলো না। আমি বুঝে নিয়েছি।

সীতা হাসল।

—চলো, কোথাও যাই।

—কোথায়?

—চলো না।

—রাত হয়ে যাচ্ছে।

—তাতে কী? তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

সীতা চুপ করে বসে থাকে। মাথা নোয়ানো।

—ভয় পাচ্ছ? আমাকে? একটা জীবন আমার সঙ্গেই তো থাকতে হবে!

সীতা একটু চমকায়। ঠিকই তো? ভয়ের কী? বাধ্য মেয়ের মতো সে উঠল।

ট্যাক্সি ধরে তারা এল মস্ত একটা ক্লাব ঘরে। বহু পুরনো আমলের প্রকাণ্ড ক্লাব, সাহেবরা তৈরি করেছিল। সামনে লন, তারপর পোর্টিকো, রিসেপশন হল। মানস সীতার হাত ধরে নিয়ে গেল, কোথাও বাধা পেল না, কেউ চেয়েও দেখল না। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ক্লাব ঘর প্রায় ফাঁকা। দু-চারজন খুব দামি পোশাক পরা লোক গেলাস হাতে বসে আছে, চোখ নিমীলিত।

তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কেউ নেই। একটা ঘরে সারি সারি টেবিল টেনিসের টেবিল পাতা। সব খালি, কেবল একটা টেবিলে দুজন ক্লান্ত ছেলে একনাগাড়ে খেলে যাচ্ছে। খুটখাট-টিং শব্দ হচ্ছে। ঘরটা পেরিয়ে তারা আর একটা ঘরে এল। ফাঁকা, আলো জ্বলছে। সুন্দর সাজানো ঘর।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মুখ ঘোরাল মানস। আর তখনই সীতা হঠাৎ বুঝতে পারল, মানস প্রকৃতিস্থ নেই। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে, মুখে রক্তাভা, ঠোঁট নড়ছে। সীতার একটুও ভয় করল না।

মানস এগিয়ে এসে তার দুকাঁধ ধরে বলল—একটা কথা...

—বলো।

—আমার কাছে মেয়েরা রহস্যই থেকে গেছে। মানসের গলা কাঁপল।

—জানি।

—আমি মেয়েদের কিছু জানি না। তাদের শরীর...তুমি আমাকে এই এক্সপিরিয়েন্সটা দেবে?

নির্দ্বিধায় সীতা বলে—দেব।

—এখনই। দ্রুত দৌড়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এল মানস।

পর মুহূর্তেই তারা পাগল হয়ে যাচ্ছিল। ডিভান না সোফা কে জানে, তার ওপর তারা ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ওলটপালট খাচ্ছিল।

প্রথম—কিন্তু সীতার এ তো প্রথম নয়। সে তো কুমারী নয়। তার রহস্য দেখেছিল প্রথম আর একজন। বনভূমি পিছনে রেখে একটা ঢালু বেয়ে নেমে এসেছিল এক কৃশ ও সুন্দর পুরুষ। বহুদিন, সে কি বহুদিন হয়ে গেল? সেই পুরুষ মনোরম না হয়ে মানস হতে পারত। হলে সে আজ কত সুখী হত।

ঝড়টা যখন তাকে ঘিরে ফেটে পড়ছে, তখন সীতা আকুল শ্বাস টানছিল বার বার। কোথাও...কোথাও...কোথাও সামান্য একটু সিগারেটের গন্ধ নেই। নেই কেন? তার পিপাসায় সীতা শুঁকছিল মানসের মুখ, গাল, গলা, শ্বাস। না-নেই। কিন্তু একটু সিগারেটের কণামাত্র গন্ধের জন্য বড় পাগল পাগল লাগছিল সীতার। সে অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে বলল—এ রকম নয়। না, না...

বসন খোলার মুহূর্তেই থেমে গেল মানস। একটু উদভ্রান্ত সে। কিন্তু চট করে নিজেকে সংযত করার অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী। ঘোলাটে চোখে সে সীতার দিকে চেয়ে বলে—না?

সীতা কষ্টে হাসল একটু। মাথা নেড়ে জানাল, না।

—কেন?

সীতা উত্তর দিল না।

মানস একপলকে গায়ের জ্বর ঝেড়ে ফেলল। হাসল। বলল—তা হলে থাক। আমার তাড়া নেই।

টিক-টক-টুং শব্দ আসছে। বলটা মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। গড়াল। একটা অস্পষ্ট গলা শোনা গেল—নাইন সিক্স...সাইড আউট। আবার টিক্-ট্-টি্-টক্ শব্দ।

যখন বেরিয়ে আসছিল তারা তখনও পাশের ঘরে সেই দুটি ক্লান্ত ছেলে ফাঁকা ঘরে একনাগাড়ে টেবিল টেনিস খেলে যাচ্ছে। টিক্-টক্-টিক্-টক্-টিক্-টক্...

আবার ট্যাক্সি। আবছা অন্ধকার। বাইরের আলো নানা রং ফেলে যাচ্ছে তাদের ওপর।

—আমার তাড়া নেই।

সীতা একটু হাসল, স্নায়ুবিকারের হাসি।

মানস রাগ করেনি, একটু হতাশ হয়েছে বোধহয়। কিন্তু সে কিছু না। আবার বলল—যখন নিমন্ত্রণ করে পাতপিঁড়ি পেড়ে খাওয়াবে, তখন খাব।

—কী?

—তোমাকে।

সীতা হাসে।

—পাতিয়ালায় যাওয়ার আগে আমি বিয়ে করব সীতা।

—আইন?

—দূর হোক গে।

সীতা শ্বাস টানে, একটা সুন্দর সিগারেটের গন্ধ আসছে কোথা থেকে। সীতা চেয়ে দেখে, ড্রাইভারের পাশে বসা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটা একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বুক ভরে বাতাস টানল সীতা।

বাড়ির সামনে নেমে যাওয়ার আগে সীতা হঠাৎ জিগ্যেস করল—তুমি সিগারেট খাও না?

—না। কেন?

—খাও না কেন?

মানস বুঝতে না পেরে বলে—আমার কোনও নেশা নেই। সিগারেট খেলে দমের ক্ষতি হয়।

—খুব ক্ষতি।

মানস হাসল, বলল—কেন, সিগারেট খাওয়া তুমি পছন্দ কর?

—মাঝে মাঝে খেয়ো, যদি খুব ক্ষতি না হয়।

মানস সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল—খাব। আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবে মাঝে মাঝে খাব, এবার থেকে। ঠিক আছে?

সীতা সুন্দর ভালবাসার হাসি হাসল। নেমে যেতে যেতে বলল—খেয়ো। মাঝে মাঝে।

—কাল আসব যখন তোমার কাছে, তখন...

—আচ্ছা।

—যাই।

দাদার ঘরে তখনও মক্কেল আছে। আলো জ্বলছে। কথাবার্তা শুনতে পেল সীতা। সিঁড়িটা অন্ধকার। সীতা পা টিপে টিপে উঠে এল দোতলায়।

বারান্দায় আলো জ্বলছে। বউদি রেলিং থেকে ঝুঁকে আকাশ দেখছে। এ সময়টায় বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে বউদি রোজই সিঁড়ির মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ দাদা উঠে না আসে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ, তাই এখনও স্বামীর জন্যে আগ্রহ শেষ হয়নি।

—ঠাকুরঝি এলে?

—হুঁ।

—কত রাত হল। প্রায় সাড়ে দশটা।

—একটু ঘুরে এলাম। ঘরে ভাল লাগে না।

—কোথায়?

—অনেক জায়গায়।

—একা?

সীতা ভ্রূ কোঁচকাল। বউদির বয়স কম। কৌতূহল বড্ড বেশি।

সীতা বলল—না। দুজন।

—আর কে?

—তুমি চিনবে না।

—তোমার ভাই ভীষণ সাহস।

সীতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল—বউদি, আমি সধবাও নই, কুমারীও নই, আমি হিসেবের বাইরের মানুষ। আমার জন্য কারও কিছু এসে যায় না।

—তা অবশ্য ঠিক। বলে বউদি চুপ করে যায়। তারপরই হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বলল—দেখো না, বৃষ্টি এসে গেল প্রায়, তবু মক্কেলগুলো যাচ্ছে না।

এই ছেলেমানুষিটুকুর জন্যই বউদিটাকে খারাপ লাগে না সীতার। দাদার আগের পক্ষের একটা ছেলে, বিলু। দার্জিলিঙে স্কুলে পড়ে। দাদা ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে তাকে, যাতে সৎমায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকে। কিন্তু দরকার ছিল না। বিলুকে ভালই বাসে বউদি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেয়। মা-মরা ছেলেটার জন্য কাঁদেও মাঝে মাঝে।

এ সময়ে বাড়িটা নিঃঝুম। বাবা তার ঘরে শুয়ে পড়েছে ন'টায়।

সীতার একটু ক্লান্তি লাগছিল। কিন্তু মনে কোনও অবসাদ নেই। সেখানে রঙিন আলো জ্বলছে।

ঘরে এসে টিউবলাইটটা জ্বালে সীতা। তার একার ঘর। ফাঁকা, নিঃঝুম চারদিক। কাপড় না-ছেড়েই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। একটু শুয়ে থাকে চোখ বুজে। ঝোড়ো বিকেলটার কথা মনে করার চেষ্টা করে। মাথাটা টিপ-টিপ করছে। অনেকদিন বাদে এত চুমুতে ঠোঁট ফুলে আছে সীতার। ভারী লাগছে, ডান

গালে কামড় দিয়েছিল মানস, তার জ্বালা। চোখ বুজে একটু হাসে সীতা। গা এলিয়ে দেয়। পুরুষের মতো একটা প্রবল বাতাস আসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরে। জলকণা মেশানো বাতাস। ঠাণ্ডা। আজ রাতে কিছু খাবে না সীতা, কাপড় ছাড়বে না, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমোবে? না, ঘুম আসবে না ঠিক। আজ এতদিনের মধ্যে প্রথম মানস এতটা এগোল। শরীরের কাছে শরীরের কত কথা জমে থাকে। মুখ টিপে সীতা আবার হাসে। হঠাৎ ঝড়ে একটা জানালার পাল্লা ঠাস করে শব্দ করে। একটু চমকায় সে। জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘর ভিজে যাচ্ছে হ্যাঁচলায়, ভিজুক গে। চোখ বুজে একটা ঝিমঝিমানির মধ্যে চলে যাচ্ছিল সীতা। হঠাৎ শুনতে পেল ফাঁকা হলঘরে দুজন ক্লান্ত ছেলে টেবিল টেনিস খেলছে। টিক-টক-টিক-টক...টিক-টক...

চমকে চোখ মেলে চায় সে। ধু-ধু আলো জ্বলছে ঘরে। নীল পর্দা কি ওটা? নীলই তো! পর্দাটা উড়ছে হাওয়ায়। সীতা সমস্তটা মন নিয়ে উঠে বসে। পরদার ওপাশ কী?

কিছু না। অন্ধকার। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে বারান্দা, তার রেলিং। অঝোর বৃষ্টি।

সীতা হাতমুখ ধুয়ে এসে বাতি নেবাল। দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ল। নির্ঘুম চোখে তার মনে পড়ল, মনোরমের আর কিছুই নেই।

বিয়ের পরই চাকরি ছেড়ে সীতার নামে এজেন্সিটা নিয়েছিল মনোরম। হঠাৎ বাজারে নতুন ধরনের অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। বড়লোক না হলেও ঢের টাকা রোজগার করেছিল সে। টাকা রাখত লকারে, আয়কর ফাঁকি দিতে সোনা কিনেছিল অনেক। জমি কিনেছিল। সবই সীতার নামে। ঠাট্টা করে বলত—আমি হচ্ছি সীতা ব্যানার্জির ম্যানেজার। সবাই তাই জানে।

সীতা কোনও খোঁজখবর রাখত না। মাঝেমধ্যে কাগজপত্র আর চেকে সই দিত, লকার খুলতে তাকেই নিয়ে যেত মনোরম। ব্যাঙ্কে তারা লকার খুলবার যে কোড ব্যবহার করত তা ছিল 'লাভ'। এখনও লকারটা সীতার নামেই আছে। মাঝে মাঝে সে যায় লকার খুলতে, এখনও। কোড বলে—'লাভ'। বলবার সময়ে কিছু কি মনে হয়?

ডিভোর্সের সময়ে সে ব্যবসাটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল মনোরমকে। দাদা ছাড়তে দেয়নি। বলেছে, ও পুরুষমানুষ, ভবিষ্যতে আবার দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু তুই মেয়ে, তোর নামে কোম্পানি, ও কেউ না। এবং আইনমাফিক ম্যানেজারের চাকরি থেকে সীতা মনোরম ব্যানার্জিকে বরখাস্ত করে। তারপর থেকে দাদাই কোম্পানি দেখে, চালায়। লকারে টাকা, সোনা, যাদবপুরে সেন্ট্রাল রোড-এ জমি, সব নিয়ে সীতার কোনও ভাবনা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে মনোরমকে নিংড়ে না নিলেও হত।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ হতে থাকে। আধোঘুমে সীতা শুনতে পায়, ফাঁকা ঘরে দুই ক্লান্ত খেলোয়াড়ের একটানা টেবিল টেনিস খেলার শব্দ। টিক-টক...টিক-টক...টিক-টক...

॥ তিন ॥

আমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব।

আমি উল্টে রেখেছি বই, আলো নিবিয়ে দিয়েছি। এখন আর কাউকেই আমার কিছু বলার নেই। আমার মাথার নীচে একটিমাত্র শক্ত বালিশ, বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে, বেডকভারটা ময়লা। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এই একটু ভেজা ভেজা বিছানায়, ময়লা চাদরে ঠিক ঘুমিয়ে পড়ব।

শুভরাত্রি হে আমার টেবিল-ল্যাম্প। হাতঘড়ি, বিদায়। বিদায় সিগারেট। কাল আবার দেখা হবে। বিদায়, জেমস বন্ড। কাল আবার দেখা হবে সমুদ্রের তীরে, বিকিনি-পরা ওই মেয়েটি—কী যেন নাম—তার পাশে। শুভরাত্রি হে আমার দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবি। শুভরাত্রি হে আমার জানলার পাশে বকুল গাছ। রাত্রির আকাশ, বিদায়। আমি মনোরম, তোমাদের মনোরম। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। না, ভুল...ভুল বললাম; ঘুমের আগে এই যে একটু সময়—যখন সমস্ত শরীরে রিমঝিম করে নেমে আসছে চেতনাহীনতা, যখন শ্রাবণ জুড়ে কেবল ঝিঁঝি পোকার ডাক—তখন এই সময়টুকুতে আমি আর মনোরম নই, তখন আমি এক শিশু ছেলে, যার ডাকনাম ছিল ঝুমু। মা আর বাবার সেই ছোট্ট ঝুমু। বারো মাস অসুখে ভুগে যার রক্তহীন, সাদা, রোগা ডিগডিগে চেহারা। ডান হাতে মাদুলি, গলায় কবচ। এখন

আমি সেই ছোট্ট ঝুমু—একটু নির্বোধ, আর একটু অসহায়!...কেউ কিছু বলছ? না, আমার আর কিছুই দরকার হবে না। মানুষ ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে। ওই তো ঘুম আসছে ডাকপিওনের মতো। সে আমাদের গলির মুখের ল্যাম্প-পোস্ট পার হয়ে এল। হাইড্র্যান্টের জল উপচে রাস্তা বুঝি একাকার! সে বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে জলময় জায়গাটুকু পার হয়। এখন সে সদরে, রাস্তার মৃদু আলো ঠিক জ্যোৎস্নার মতো পড়ল তার অস্পষ্ট মুখে। শেষ-হওয়া সিগারেটের অংশটুকু ছুড়ে ফেলে দিল সে। উঠে আসছে নিঃশব্দে। দরজার বাইরে পাপোষে সে তার জুতোয় লেগে থাকা অন্ধকারের কণাগুলি মুছে নিচ্ছে। হাঁসের মতো গা ঝাড়া দিয়ে সে শরীর থেকে জলকণার মতো ঝেড়ে ফেলছে অন্ধকার। এখন সে ঘরের মধ্যে। কবজি উলটে ঘড়ি দেখে সে বলল—ভাবনাচিন্তা করার সময় আর অল্পই আছে।

জানি, আমি তা জানি। আমার জানলার পাশে বকুলের ডালপালায় খেলছে বাতাস। কোন দূরের রাস্তায় ঠুন-ঠুন করে চলে যাচ্ছে একজন একা রিকশাওয়ালা। কোথায় যেন ট্যাক্সির মিটার জলতরঙ্গের মতো টুং-টাং ঘুরে গেল। বালিশের নীচে টিক টিক শব্দ করছে আমার হাতঘড়ি। বিদায় হে রাতের শব্দরা। হে কোমল অন্ধকার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি হে আমার জানালার আলো। শুভরাত্রি হে দেয়ালের অচেনা ছায়ারা। বিদায় হাতঘড়ি, বিদায় ক্যালেন্ডারের ছবি, বিদায় শেষ সিগারেট। স্বপ্ন ও বাস্তবের মতো দিনশেষে এখন আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আসছে ঘুমের অন্ধকার তরঙ্গেরা। একের পর এক। বিদায় হে চিন্তাশক্তি। বিদায় বাস্তবতা। শুভরাত্রি হে স্বাবলম্বন। ওই আমার ঘুম, তার দীর্ঘ আঙুল বাড়িয়ে দিল আমার ভিতরে। সে বোতাম টিপে দিতে থাকে একে একে। আর আমার শরীরের ভিতরে যে অন্ধকার সেইখানে নীল লাল স্বপ্নের মৃদু আলোগুলি জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে দেখা যায়, এক জনশূন্য বিশাল প্রেক্ষাগৃহ, তার দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কোতে আঁকা আমার শৈশবের ছবি। পর্দার ওপাশে মঞ্চে কারা যেন আসবাব টানাটানি করে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পর্দা অকস্মাৎ সরে যায়। দেখা যায়, ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ টানা কয়েকটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে শ-তিনেক ছেলে দাঁড়িয়ে—গাইছে—জয় জগদীশ হরে...

বাইরে কি বৃষ্টি? বৃষ্টিই। ঝড়ের বাতাস দিচ্ছে। পাশ ফিরে শুল মনোরম। তার এলানো হাত পড়ে আছে বিছানায়। বিস্তৃত হাতখানা যতদূর যায় কিছুই স্পর্শ করে না। কেউ নেই। একটু ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে বিছানায় পড়ে আছে নিরুপায় হাতখানা। বাইরে ঝড়। কী অঝোর বৃষ্টি! মনোরম সেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল না। সে তখন তার শৈশবের স্বপ্ন দেখছিল।

কয়েকদিন বাদে মামার সঙ্গে কানোরিয়াদের বাড়িতে গিয়েছিল মনোরম। সেখানে কাঠের কাজ হচ্ছে। মনোরম কাঠ চেনে না, প্রতি সি এফটি কোনটার কত দাম তা জানে না। আসলে কাঠের ব্যবসায় তার মন নেই। এক একটা ব্যবসা আছে যার নো-হাউ জানতে বিস্তর সময় লেগে যায়। কাঠ হচ্ছে সেই ব্যবসা। 'পুরাতন বাড়ি ভাঙা হইতেছে'—খবরের কাগজে এরকম বিজ্ঞাপন দেখলেই মামা সেখানে মনোরমকে নিয়ে যায়। কড়ি-বরগা দেখেই ধরে ফেলে কোনটা কী কাঠ। সত্তর, আশি, কি একশো, দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ির অভাব নেই কলকাতায়। বিস্তর জমি নিয়ে হাতির মতো পড়ে আছে। বড় বড় সব ঘর পুরনো আমলের। দু-তিন তলা সব বাড়ি, এখনকার দশতলার কাছাকাছি উঁচু। সে সব ভেঙে নতুন ধরনের মাল্টিস্টোরিড বাড়ি উঠছে, অফিস আর ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়ার জন্য। আটটা-দশটা ফ্লোর, নতুন ধরনের সব গ্যাজেটস, অ্যামেনিটিস। তাই পুরনো বাড়ি আর থাকছে না কলকাতায়। পুরনো বাড়ি, বিশেষ করে সাহেববাড়ি হলে তার কাঠ হবে আসল বার্মা-টিক, বাজারে পাওয়া যায় না। সত্তর থেকে দেড়শো বছরের কাঠ, রস মরে ঝুন হয়ে গেছে। চেরাইয়ের পর পালিশ করলে রঙিন কাচের মতো দেখায়। মামা বিস্তর নিলাম ডেকে গোলা ভর্তি করেছে সেই দুর্লভ কাঠে। কাজেই বড়লোকদের বাড়ির কাজ হেসে-খেলে পায় মামা।

ওল্ড বালিগঞ্জে একটা নির্জন রাস্তায় বাড়ি। এখনও বাড়িটা শেষ হয়নি। কানোরিয়ারা বড়লোক সে তো জানা কথা। কিন্তু কতটা তা ঠিক জানা ছিল না মনোরমের। বাড়িটা দেখে তাক লেগে গেল। বেশি বড় নয়, বড়জোর পাঁচ সোয়া পাঁচ কাঠা জুড়ে একটা কংক্রিটের স্বপ্ন। সামনে একটা লন, একধারে টেনিস কোর্ট, সেটা পেরোলে থামহীন একটা গাড়ি-বারান্দা—একটা বৃত্তাকার প্রকাণ্ড সিমেন্টের চাকতি শূন্যে ঝুলে আছে। বৈঠকখানার কোনও দরজাই যেন নেই, এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত

চওড়া-চওড়ি হাঁ হয়ে আছে। দরজা নেই নয়। আছে। সে দরজা দেয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। চারিদিকে কাচ আর কাচ। ঘরের একদিকে মেঝেয় একটা মস্ত চৌবাচ্চার মতো ডিপ্রেশন। সেখানে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই জায়গাটায় নিখুঁত মাপে ভারী 'কোজি' সোফাসেট তৈরি করে বসানো হচ্ছে। ভেতরের দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি একটা প্যাঁচ খাওয়া ঢাল হয়ে উঠে গেছে, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ আলাদা আলাদা কংক্রিটের স্ল্যাব, জাবদা সিঁড়ি নয়। তিনতলা বাড়ির জন্য বসানো হচ্ছে লিফট। ডানদিকে ঘুরে আরও একটু ভেতরে এগোলে দেখা যায়, ঘরের মধ্যেই ছোট্ট একটা মিনিয়েচার দীঘি—'লিলিপুল'। তার ওপরে একটা খেলাঘরের ব্রিজের মতো চমৎকার ব্রিজ। 'লিলিপুল'-এর উপরে ছাদটা কাচের, প্রাকৃতিক আলো আসবার জন্য।

দেখাশুনো করছেন এক মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ার, তার পরনে সাদা লুঙ্গির মতো কাপড়, সাদা জামা, কপালে তিলক, পায়ে চটি। গম্ভীর এবং শান্ত মানুষ। মুখে কথা প্রায় নেইই। মামার হেডমিস্ত্রি আজ কাজে আসেনি, তার জন্য মামা তাকে বিস্তর কৈফিয়ত দিচ্ছিল এখনও জলশূন্য লিলিপুলের ধারে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিনিয়ার লোকটা হাতে ব্লু-প্রিন্ট দেখেছে, ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, উত্তর দিচ্ছে না। উত্তর পেতে মামার সময় লাগবে বিবেচনা করে মনোরম উঠে এল উপরে, চমৎকার সিঁড়িটা বেয়ে। কোনটা ঘর, কোনটা প্যাসেজ, কোনটা বারান্দা কিছু বোঝা যায় না। সবটাই নিস্তব্ধ স্বপ্নদৃশ্যের মতো। এমনকী কত টাকা খরচ হচ্ছে বাড়িটায়, তারও কোনও হিসেব পায় না সে। চার-পাঁচ লাখ হতে পারে, বিশ-ত্রিশ লাখও হওয়া সম্ভব। আরও বেশি হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এখনও সর্বত্র মেঝেয় মার্বেল ঘষা হয়নি, দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি। কোণের দুটো ঘর শেষ হয়েছে, সেখানে মিস্ত্রিরা কাঠের আসবাব বানাচ্ছে। মাঝারি বড়লোকেরা, বড় জোর প্রবর্তক বা আমকার থেকে আসবাব কিনে আনে। এরা বাজারি আসবাব কেনে না। ঘরের মাপজোক আর ডিজাইন অনুযায়ী আসবাব তৈরি করিয়ে নেয়। মামা মোটে তিনটে শোওয়ার ঘর আর দরজা জানলার খানিকটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। সেটাও বোধহয় বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার।

মনোরমকে দেখে মিস্ত্রিরা কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। তাদের চোখে ভয়।

রাধু বলল—কী হবে বাবু, হেডমিস্ত্রি আজ এল না।

মনোরম বাড়িটায় ঘুরে সব দেখে কেমন একরকমের হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট জায়গায় এত টাকার কারবার দেখে মাথাটা গরম। একটু ঝেঁঝে বলল—তাতে কী? তোমরা কাজ জানো না!

—জানি তো, কিন্তু সকালে আজ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব খুব রাগ করেছে। ভয়ে আমাদের হাত চলছে না। যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়।

মনোরম কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে এল। তিনতলায় উঠল ধীরে ধীরে। অনেক মানুষ খাটছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে না, গল্প করছে না। সব চুপচাপ। চারিদিকে একটা সম্ভ্রম আর ভয়-ভয় ভাব। রাজমিস্ত্রিরা কাজ করতে করতে চোরা-চোখে তাকে দেখল, যেন একটু বেশি মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। বাড়ির মালিক কে তারা জানে না। মনোরমের পরনে স্ট্রাইপওলা বেলবটস, গুরু পাঞ্জাবি, চোখে রোদচশমা ইস্পাতের ফ্রেমে। মিস্ত্রিরা বুঝতে পারছে না, এই লোকটা মালিকপক্ষের কেউ কিনা। মনোরম খানিকটা মালিকপক্ষের মতোই অবহেলার ভঙ্গিতে একটু ঘুরে দেখল চারদিক। এ তলায় ঘর বেশি নেই, যা আছে তার চারটে দেয়ালই ঘষা কাচের, মস্ত একটা রুফ-গার্ডেনের প্রস্তুতি চলছে।

লিফট এখনও বসানো হয়নি। কুয়োর মতো গহ্বরটা নেমে গেছে। চতুষ্কোণ, একটু অন্ধকার। দরজা নেই। মনোরম ফাঁকা জায়গাটায় মুখ বাড়িয়ে নীচে তাকাল। হাত-পা শিরশির করে উঠল তার। ভার্টিগো। এক পা পিছিয়ে এল। দেয়াল ধরে দাঁড়াল একটু। জিভটা নড়ছে মুখের ভিতরে। শরীরে একটা সংকোচন। একটা দুর্ঘটনার স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার করে দিল মাথা।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তাকাল। কাচের ঘর এবং ছাদের বাগানের সুন্দর বিস্তারটি দেখল। মানুষ কত বড়লোক হয়। তিনতলা বাড়ির জন্য লিফট লাগায়, ছাদে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাগান তৈরি করে, ঘরের মধ্যে বানায় পদ্মসরোবর। ছোকরারা কেন বিপ্লবের কথা শহরের দেওয়াল জুড়ে লেখে, তার একটা অর্থ যেন খুঁজে পায় সে। ডিনামাইট সহজপ্রাপ্য হলে সেও একটা কিছু এক্ষুনি করত। পকেট হাতড়ে সে বের করল সস্তা সিগারেটের প্যাকেট। সীতা চলে যাওয়ার পর তার বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে এ পর্যন্ত মোট

পাঁচ মাসের। দুশো কুড়ি টাকার দুঘরের ফ্ল্যাট পূর্ণ দাস রোডে। পুরনো বাড়িওলা একটা আশ্রমকে বাড়িটা দান করেছে। আশ্রমের লোকেরা দুঁদে বাড়িওলা নয়, তার ওপর ধর্মকর্ম করে, তাই ঠিক ঘাড়ে ধাক্কা দিচ্ছে না। কিন্তু গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীরা প্রায়ই আসে আজকাল, দেখা করে যায়, মিষ্টি হেসে তার আর্থিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে। মনোরম তাদের ধর্মকথায় টেনে নিয়ে যায়। তারা অস্বস্তি বোধ করে।

পরিপূর্ণ ফুসফুসে সিগারেটের ধোঁয়া ভরে নিল মনোরম। মাথাটা ঝিম করে ওঠে। সমস্ত শরীর একটা রহস্যময় আনন্দে ভরে যায়। আকাশ টেরিলিনের মতো মসৃণ এবং নীল। শুধু এক কোণে ময়লা রুমালের মতো একখণ্ড বেমানান মেঘ। রুফ গার্ডেনের রেলিঙে হাত রেখে মনোরম একটু দাঁড়িয়ে থাকে। দমকা বাতাসে দ্রুত পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। সে একটু শ্বাস ফেলে নেমে এল।

অনেকক্ষণ চেষ্টায় মামা মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারটিকে কেবল মাথা নাড়ানোয় সফল হয়েছে। কথা ফোটেনি। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখল মনোরম, লিফটের কুয়োর মধ্যে ছুড়ে দিল সিগারেট। এগোল।

—মাই নেফিউ। পরিচয় দিল মামা।

মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ার এক ঝলক তাকাল মাত্র, রিকগনাইজ করল না।

—টুমরো দি হেডমিস্ত্রি উইল ডেফিনিটলি কাম। ময়মনসিংহের অ্যাকসেন্টে ইংরেজিটা বলল মামা।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক একটু ভ্রূ কোঁচকাল মাত্র।

—অলরাইট? মামা জিজ্ঞেস করে।

ভদ্রলোক হাতের প্ল্যানটার দিকে নীরবে তাকিয়ে একটা শ্বাস ছাড়ল।

মামা রুমালে ঘাম মুছে মনোরমের দিকে তাকাল। মনোরম মামার মুখ দেখে বুঝতে পারে, এতক্ষণ মামার খুব খাটুনি গেছে।

লন ঘেঁষে মামার দিশি গাড়িটা দাঁড় করানো। তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘন নীল রঙের জাপানি ক্রাউন গাড়ি, তার নীলাভ কাচের ভেতর দিয়ে ভেতরে চমৎকার মেয়ে-শরীরের মতো নরম গদি দেখা যাচ্ছে। কী অ্যারিস্টোক্র্যাট তার ড্যাশবোর্ড আর হুইল। এয়ারকন্ডিশনড। মনোরম ঝুঁকে গাড়িটা একটু দেখল। ভারী পছন্দ হয়ে গেল তার।

মামা তার গাড়ির লক খুলতে খুলতে বলে—সাড়ে চারজন মানুষের জন্য এত ব্যাপার-স্যাপার।

—কারা সাড়ে চারজন?

—কানোরিয়ারা। বুড়োবুড়ি, ছেলে আর ছেলের বউ। আর বোধহয় একটা বাচ্চা।

—মোটে?

—তাও ছেলে আর ছেলের বউ চোদ্দোবার বিজনেস টুর আর হানিমুন করতে ইউরোপ আমেরিকা যাচ্ছে, বুড়োবুড়ির তীর্থ করাই বাই। থাকবেটা কে গুচ্ছের চাকরবাকর ছাড়া? ঝুমু, মাদ্রাজিরা কেমন লোক হয়?

—ভালই। জেন্টল।

—আমিও তো তাই জানি। কিন্তু এ লোকটাকে ঠিক বোঝা যায় না। বিশ মিনিট ধরে বোঝালাম, কিছু বুঝেছে কিনা কে জানে। তোকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, ইংরিজিটা ভালই বলিস, কিন্তু বিজনেসটা একদম বুঝিস না। তোকে দিয়ে যে আমার কী লাভ হবে। ভেবেছিলাম, ইংরিজিটা তোকে দিয়ে বলিয়ে যদি ইমপ্রেস করা যায়, কিন্তু তুই বলবি কি? শুধু ইংরিজিতে কি কিছু হয়? একটু যদি বুঝতিস।

দিশি গাড়িটা চলছে। ক্রাউন গাড়িটার ছায়া এখনও মনোরমের চোখে ভাসে। দিশি গাড়িটায় বসে তার মনে হয় সে একটা ইঞ্জিন লাগানো মুড়ির টিনের মধ্যে বসে আছে।

মামার চেহারাটা লম্বা, সুড়ুঙ্গে, মাথা প্রায় গাড়ির ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। একটু কুঁজো হয়ে বসে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে। রোগা বলে গায়ের হাওয়াই শার্ট লটর পটর করে। প্যান্টে পাছার দিকটা টান হয় না মাংসের অভাবে। বছরখানেক আগে প্রথম স্ট্রোক হয়ে গেছে। এখন আর একা বেরোতে সাহস পায় না, মনোরমকে সঙ্গে নেয়।

কানোরিয়াদের নির্মীয়মাণ বাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে মনোরম হঠাৎ বলল—ওরা খুব বড়লোক।

—কারা?

—কানোরিয়ারা।

মামা মন দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে একটা গম্ভীর 'হুঁ' দিল।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ মামা তিক্ত গলায় বলে—বাঙালির ছেলে যে কবে ব্যবসা শিখবে।

মনোরম হাই তোলে। প্রসঙ্গটা আসছে।

—কিছুই তো পারলি না। এজেন্সি পেয়েছিলি, তা সে পরের তৈরি মাল বেচে কমিশন পেতিস। কাঠের কারবার তো তা নয়, এ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু তুই শিখছিস কোথায়?

—শিখছি তো। সময় লাগবে।

—নন্-বেঙ্গলিরা কলকাতায় ওইসব বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে, গাড়ি দাবড়াচ্ছে। আর তোদের কেবল আলোচনা গবেষণা আর মেয়েছেলেদের মতো ছিঁচকাঁদুনে সেন্টিমেন্ট।

—নেতাজি এলে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। বাঙালি জাগবে।

কথাটা মামার প্রাণের কথা। কিন্তু মনোরমের মুখে শুনতে ঠিক প্রস্তুত ছিল না বলে, মামা রাস্তা থেকে চোখ টপ করে সরিয়ে একবার মনোরমের মুখ দেখে নেয়। ঠাট্টা কিনা তা বুঝতে চেষ্টা করে।

—ঝুমু।

মনোরম মুখখানা স্বাভাবিক রেখেই বলে—উঁ!

—অবিশ্বাসের কী? বিনা প্রমাণে তো এতগুলো লোক ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না!

—কিন্তু কোনজন? শৌলমারির সন্ন্যাসী, না গোপবন্ধুনগরে যাকে দেখা গিয়েছিল সেই সাধু, নাকি রাশিয়াতে চিনা ডেলিগেটদের ছবিতে যে লোকটার আইডেন্টিফিকেশন নিয়ে কথা উঠেছিল, কিংবা নেহরুর অন্তিমশয্যার পাশে যাকে দেখা গিয়েছিল। কোনজন, সেইটেই প্রবলেম।

—যে-ই হোক, তিনি আছেন। মামা একটু অধৈর্যের গলায় বলে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—আর তিনি আছেন সন্ন্যাস নিয়ে।

—কী করে বুঝলে।

—বার্মায় তখন তিনি খুব ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর এক সঙ্গী তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এক মন্দিরে নিয়ে যায়। মন্দিরে গিয়েই তিনি কাঁদতে থাকেন, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন, সঙ্গীকে তিনি পরে বলেছিলেন—জানো না, মন্দির-টন্দির এখন আর আমি যাই না। হাতে অনেক কাজ, মন্দিরে গেলে আমার কাজ পড়ে থাকবে। কিছুই করতে পারব না। কাজ শেষ হোক, তারপর আমি তো সন্ন্যাস নেবই। সন্ন্যাস তাঁর রক্তে ছিল। আমার কাছে যে বই আর পত্রিকাগুলো আছে তা পড়ে দেখিস, প্রতি সপ্তাহে আমাদের একটা মিট হয়, যেতে পারিস।

—আমি অবিশ্বাস করছি না।

—তোমরা জাত-অবিশ্বাসী। তোমাদের জেনারেশন। অবিশ্বাসী বলেই তোমরা কোনও রিলেশন এস্টাব্লিশ করতে পার না। যে বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল ভালবাসা থাকার কথা, সে বয়সে তোমাদের বিয়ে ভেঙে যায়। দেশপ্রেম তোমাদের কাছে হাসিঠাট্টার ব্যাপার; ট্র্যাডিশন, মরালিটি এ সব তোমরা ভেবেও দেখ না। ডিসগাসটিং।

মনোরম চুপ করেছিল।

একটা সিগারেটের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মামা। মনোরমের দিকে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল—এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক নিয়ে আয়।

—তোমার না সিগারেট বারণ?

—গোল্ডফ্লেক বারণ নয়। যা। তুই আমাকে অ্যাজিটেট করেছিস।

মনোরম সিগারেট কিনে এনে দেখে মামা ড্রাইভিং সিট থেকে সরে বসেছে। মাথা এলানো, চোখ বোজা। সিগারেট প্যাকেট আর খুচরো টাকা-পয়সা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল—তুই চালা। আমার নার্ভ ঠিক নেই।

মনোরম ক্ষীণ একটু হেসে ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলে—কেন?

মামা তেমনি ঘাড় এলিয়ে চোখ বুজে সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। আস্তে করে বলল—যা বুঝিস না তা নিয়ে কখনও ঠাট্টা করিস না।

মনোরম গাড়িটা চালাতে চালাতে বলে—মামা, যদি কেউ আসেই কোথাও থেকে, তবে সে এখনও আসছে না কেন? আমরা তো ঘোর বিপন্ন! যে-ই আসুক তার আসতে আর দেরি করা উচিত নয়।

—আসবে দেখিস। একদিন ভারতবর্ষ শাসন করবে সন্ন্যাসীরা।

মনোরম ভিতরে হাসল। বাইরে মুখখানা স্বাভাবিক।

মামা আবার বলে—বাঙালি-বাঙালি করি, কারণ গত সাতাশ বছর কলকাতায় থেকে আমি কখনও এ শহরটাকে বাঙালির শহর বলে ভাবতে পারি না। এ শহরটায় কয়েকটা বাঙালি পকেট আছে মাত্র। যে সব জায়গায় ক্যাপিটাল আর বিজনেসের খেলা, সেখানে তারা কোথায়? ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি, ভাল ইন্ডাস্ট্রি, তাদের ক'টা? এ সব তো নেই-ই, তার ওপর নেই আদর্শবোধ। খাওয়া-পরার ধান্ধায় ঘোর ক্ষতি নেই, তার সঙ্গে সমাজ সংসার নিয়ে একটু ভাববি তো! তুই কোন ভাষায় কথা বলিস, কোন দেশে বসত করিস, এগুলো নিয়ে ভাববি না? আমি তো জানি প্রতিটি মানুষ তার নিজের, পরিবারের, দেশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।

মনোরম চুপ করে থাকে। মামার বাঙালিপ্রেমটা পরিচিত মহলে বেশ বিখ্যাত ব্যাপার। দার্জিলিং যাওয়ার সময়ে একবার মামা স্টিমার পেরিয়ে মনিহারিঘাটে ট্রেনে উঠবার সময়ে পুরো একটা কম্পার্টমেন্টে কেবল বাঙালি বোঝাই করেছিল। ওই রোগা চেহারা, কিন্তু অসামান্য তেজ। দরজা জুড়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে পথ আটকে ছিল মামা। কেউ উঠতে গেলেই প্রশ্ন—আপনি বাঙালি? 'না' বললে হটো, 'হ্যাঁ' বললে ওঠো। মনোরমের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, সে যে মামার কাঠগোলায় কাজ পেয়েছে, তা ভাগ্নে বলে ততটা নয়, যতটা বাঙালি বলে।

—তোর কত টাকা বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে বলছিলি? মামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

—পাঁচ মাস।

—তাতে কত দাঁড়াচ্ছে?

—দুশো কুড়ি টাকা মাসে।

—এগারো শো?

—ও-রকম। তবে আপাতত অর্ধেকটা দিয়ে দিলে একটা আপস করে নেওয়া যায়।

—তা তুই ওখানে আছিস কেন এখনও? আমার বাড়িতে নীচের তলায় অনেকগুলো ঘর ফাঁকা।

—কেন, ফাঁকা কেন? বাঙালি ভাড়াটে পাচ্ছ না?

—তা নয়। আগের ভাড়াটেরা এমনই গোলমাল ঝগড়াঝাঁটি পাকিয়েছিল যে সেই থেকে তোর মামির হার্ট খারাপ। ভাড়াটে বসাব না। প্রেস্টিজে না লাগলে চলে আয়।

—দেখি।

—দেখি কী? ভারী মালপত্রগুলো বেচে দে। একটা চৌকি আর দু-চারটে বাক্স হলেই তো তোর ঢের। একা মানুষ। আবার যদি কখনও সংসার-টংসার করিস তো সে তখন দেখা যাবে।

মনোরম উত্তর দেয় না।

—কী হে? ইচ্ছে নেই? তোর মামি একটু কচালে মানুষ বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়। বড় জোর তোর বউয়ের ব্যাপারে দু-চারটে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করবে। তার বেশি কিছু না। একটা ঘরে পড়ে থাকবি নীচের তলায়, কেউ ডিসটার্ব করবে না। ছেলেটা তো মানুষ না, মডার্ন বাঙালি। পোশাক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাবা মরলে গদিতে বসবে। মাথায় কোনও আদর্শ-ফাদর্শ নেই। খেলে বেড়ায়, জলসায় সিনেমায় যায়। তুই থাকলে তবু...

মামা চুপ করে কী একটু ভাবে। বলে—প্রেস্টিজে লাগলে গোলায় থাকতে পারিস। অফিস ঘরখানায় একজন অনায়াসে থাকতে পারে। অবাঙালিরা কত কষ্ট করে কলকাতায় থাকে। এক পশ্চিমা পানওয়ালাকে দেখেছিলাম, হ্যারিসন রোডে মোট বারো ইঞ্চি ডেপথের একটা খোঁদল ভাড়া নিতে পেরেছিল। দেয়ালের গায়ে সেই খোঁদলে কাঠ-ফাট লাগিয়ে ওপরে দোকান, নীচে গেরস্থালি। রাতে ফুটপাথে রান্না করে খেত, শোয়ার সময়ে সেই বারো ইঞ্চি জায়গায় কাত হয়ে শুয়ে সামনে কাঠের তক্তা

লাগিয়ে নিত পড়ে যাওয়ার ভয়ে। ওই ভাবে দোতলা বাড়ি করেছিল। তো তুই কেন একা মানুষ দু' ঘরের অত ভাড়ার ফ্ল্যাটে খামোখা থাকবি? টাকা নষ্ট। অন্য কারণেও ওই বাড়ি তোর ছাড়া উচিত।

—কেন?

—ওখানে থাকলেই পুরনো কথা মনে পড়বে, আর হা-হুতাশ করবি। বউমার কোনও খবর পাস?

—না।

মামা একটা শ্বাস ফেলে বলে—বউ নিয়ে ভাবতে হবে, এ আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। আমাদের ধারণা ছিল, বিয়ে হলেই বউ আত্মীয় হয়ে গেল, এক মরা ছাড়া আর কোনও ছাড়ান কাটান নেই। গায়ের চামড়ার মতো হয়ে গেল। পাত কুড়িয়ে খায়, হামলে পড়ে সংসার করে, উচ্চুঙ্গে ঝগড়া করে, আবার মায়ের মতো ভালবাসে। বউ চলে যাবে, এ আবার কী কথা রে বাঙালির বাচ্চা?

দু-চার জায়গায় ঘুরে কাঠগোলায় ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। মামার ছেলে বীরু বসে আছে। বাপের মতোই লম্বা তবে অতটা সুড়ুঙ্গে রোগা নয়। খেলাধুলো করে বলে ফিট চেহারা। মায়াদয়াহীন মুখ। মুখে হাসি নেই। গরম বলে জামা খুলে স্যান্ডো গেঞ্জি, ফুলপ্যান্ট পরে বসে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে। একমাত্র বংশধর আর গম্ভীর প্রকৃতির বলে মামা ছেলেকে বড্ড ভয় পায়। ছেলেতে বাপেতে বড় একটা কথাবার্তা নেই। বীরুর নিজস্ব একটা ফিয়াট গাড়ি আছে, যেটা নিয়ে মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায়। সে যাই করুক, ছেলেটির হিসেবি বুদ্ধি প্রখর। আর একটা প্রখর জিনিস হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। কর্মচারীরা মামাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, আবার মামার কাজে ফাঁকিও দেয়, চেয়েচিন্তে পাওনার বেশি টাকা আদায়ও করে। আর বীরুকে পায় ভয়।

মনোরমকে কী চোখে বীরু দেখে তা কে জানে! মনোরম তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। মনোরম যে বেশিদিন মামার কাঠগোলায় আড়াইশো টাকায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারি করবে না, এটা বীরু বোধহয় জানে। কাজেই সে মনোরমের প্রতি মনোযোগ দেয় না। কথাবার্তা হয়ই না বলতে গেলে। তারা যে মামাতো পিসতুতো ভাই, এ সম্পর্কটা বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই।

সামনের চালাঘরটাই আসলে অফিস। বুড়ো মানুষ ভূপতিচরণ ক্যাশ আগলে বসে থাকে। সামনে পিছনে কাঠ আর কাঠ। দাঁড় করানো, শোয়ানো তক্তা, বিম, টুকরো-টাকরা কাঠের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। চালা পেরিয়ে অফিসঘর। নামে মাত্র অফিসঘর, ওটা আসলে মামার জিরোবার জায়গা। ওপরে টিন, কাঠের বেড়া। একটা মজবুত চওড়া বেঞ্চ, তাতে ডানলোপিলোর গদি পাতা, তোয়ালে-ঢাকা বালিশ। প্রথম স্ট্রোকের পর এ সব ব্যবস্থা হয়েছে। পিছনে করাতকল থেকে ঘষটানো আওয়াজ আসছে। মিহিন, মিষ্টি শব্দটা মনোরমের বড় ভাল লাগে। ঘুম পেয়ে যায়!

মামা ভূপতিচরণের দিকে একবার তাকায়, ভূপতিচরণ হতাশার ভঙ্গিতে মাথাটা হেলায়। ইঙ্গিতটা মনোরম বুঝে গেছে আজকাল। তার মানে বীরু ক্যাশ থেকে আজও টাকা নিয়েছে। মামা ভিতরের ঘরে ঢুকে যাওয়ার আগে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে—ঝুমু, তুই একটু ক্যাশ-এ বোস। ভূপতির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

মনোরমকে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে ভূপতিচরণ উঠে গেল। মনোরম বসল। মুখোমুখি বীরু। ভ্রূ কুঁচকে ফ্ল্যাট ফাইল খুলে কাগজপত্র দেখছে। একটা চূড়ান্ত অগ্রাহ্যের ভাব তার ভঙ্গিতে। চোখ তুলে তাকাল না। ভিতরের ঘরে এখন বীরুকে নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে মামার আর ভূপতিচরণের মধ্যে। বীরু বোধ হয় সেটা জানে। কাগজ দেখতে দেখতেই তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সেই ও বুঝে গেছে, পৃথিবীটা ওর একার।

কপাল। মামার ছেলেটা এ রকম না হলে মনোরম চাকরিটা পেত না। সীতা চলে যাওয়ার পর তখনই একটা চাকরি না হলে মনোরমের চলছিল না। ল্যাং ল্যাং করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সেই সময়ে একদিন গ্র্যান্ড হোটেলের উল্টোদিকে পার্ক করা গাড়িগুলো আস্তে, ধীরে হেঁটে হেঁটে দেখছিল সে। গাড়ি দেখা তার একটা পাস্টাইম। জেফির, অস্টিন, কেমব্রিজ, হিলম্যান, প্যাকার্ড কত গাড়ি! দেখে দেখে ফুরোয় না। দেখতে দেখতে প্রতিটি মেকারের গাড়ি তার চেনা হয়ে গেছে। যে কোনও ছুটন্ত গাড়ি দূর থেকেই দেখে সে বলে দিতে পারে কোন মেকারের। নতুন কোনও গাড়ি কলকাতায় এসেছে কিনা তা দেখার জন্যই সে পার্কিং লট-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে একটা

ভোঁতা মুখ, বৈশিষ্ট্যহীন দিশি গাড়ির ভিতর থেকে মামা ডাকল— ঝুমু।

চাকরি হয়ে গেল। আত্মীয়তা ঝরে গিয়েছিল অনেক আগেই। মা মারা গেছে বছর পনেরো, তারপর থেকে আর তেমন দেখাশুনা ছিল না। বড়লোক মামাকে এড়িয়েই চলত মনোরম বরাবর। কাজেই মামা যখন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল এক ছুটির দুপুরে, তারপর বলল—'আমার কারখানায় ঢুকে পড়। কাজটাজ শেখ!' তখনই মনোরম বুঝে গিয়েছিল, এটা চাকরিই। মামা বস। তার আপত্তির কিছু ছিল না। ক'দিনের মধ্যেই সে বুঝে গিয়েছিল যে, সে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-ট্যানেজার কিছু নয়। সর্বসাকুল্যে জনা ত্রিশেক মিস্তিরি, একজন ক্যাশিয়ার আর একজন ম্যানেজার নিয়ে কাঠের কারবার। কোম্পানি মামির নামে, ম্যানেজার মামা। আর কোনও স্টাফের দরকার হয় না। তবু মনোরমকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করা হয়েছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত প্রথম স্ট্রোকের পর মামা একা ঘোরাঘুরি করতে ভয় পায়। দু নম্বর, মনোরমের চোস্ত ইংরিজি বলা। আর একটা কারণ হল বীরু। মামার একমাত্র সন্তান, একটু বেশি বয়সে হয়েছিল।

মামা প্রায়ই বলে—বীরুর সঙ্গে তোর এখনও বন্ধুত্ব হয়নি ঝুমু?

—বন্ধুত্ব! একটু অবাক হয়ে মনোরম বলে—না তো! হওয়ার কথাও নয়।

—কেন?

—কী করে হবে? আমার ছত্রিশ, ওর বড় জোর তেইশ। তা ছাড়া...

—কী?

—বন্ধুত্বের দরকারই বা কী?

মামা শ্বাস ফেলে বলে—ঝুমু, তুই ওর সঙ্গে একটু কথা-টথা বলিস। আমি চাই ওর সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হোক।

—এটাও কি চাকরির মধ্যে?

—তোর বড্ড খোঁচানো কথা। চাকরি আবার কী। মামাতো পিসতুতো ভাই তোরা, ভাবসাব থাকারই তো কথা!

—সব কিছু কি জোর করে হয়? বীরু অন্য ধরনের, আমি অন্য ধরনের।

—ও সব কোনও বাধা নয়। বন্ধুত্ব চাইলেই হয়।

—হয় না মামা।

—তুই তো খুব চালাক চতুর ছিলি বরাবর। তুই ঠিক পারবি।

মনোরম তখনই অবাক হয়েছিল। মামা স্পষ্টই চায় বীরুর সঙ্গে তার মেলামেশা হোক।

আবার একদিন মামা প্রসঙ্গটা তোলে—ঝুমু, তুই যদি আমার ব্যবসাটা বুঝে নিতিস, তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। তুই শিখে নিয়ে ওকেও শেখাতে পারতিস।

—কার কথা বলছ?

—ওই হারামজাদা। ওকে আমি কিছু বুঝতে পারি না। কারবারটা আমার জলে যাবে।

—বীরুর কথা বলছ? ও খুব চালাক, চিন্তা কোরো না।

—চিন্তা করব না! বলিস কী?

—ও শি[illegible] নেবে।

—অত সোজা নয় ঝুমু! এত ব্যাপারে ওর ইন্টারেস্ট ছড়ানো যে ও কনসেন্ট্রেট করতেই পারবে না। তাই তোকে বলি, তুই ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা কর। ওকে একটু বোঝ। দ্যাখ যদি ফেরাতে পারিস। আলটিমেটলি আমি ম্যানেজারিটা তোকে দেব, বীরু থাকবে প্রপাইটার। তোর মামির সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে।

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ওকে একটু সময় দাও। বয়স হলে ও ব্যবসায় মন দেবে।

—ব্যস্ত হচ্ছি, আমার শরীরকে আমি ভয় পাই। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, আবার কখন কী হয়ে যায়! ওর জন্য চিন্তা করে করে আমি আরও শেষ হয়ে যাচ্ছি।

—এত চিন্তার কী?

—মাসে দু-তিন হাজার টাকা ওর কীসে লাগে বল তো! কোথায় যায়, কী করে কিচ্ছু জানি না।

সেইজন্যই চাইছিলাম তুই একটু দ্যাখ। তোর সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি আছে। বহু লোক দেখেছিস, মিশেছিস। বীরুকে বুঝতে পারবি না?

মনোরম ব্যাপারটা সেই প্রথম গায়ে মাখে। মাসে দু-তিন হাজার টাকা একজন একা খরচ করে! আর সে নিজে ব্যাঙ্করাপ্ট। বীরুকে তখনই সে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিল।

মাসে থোক হাতখরচ পায়, তার ওপর মামিও কিছু লুকিয়ে দেয়। তবু বীরু এসে ক্যাশ থেকে টাকা নেয়। নির্দ্বিধায় নেয়, কারও কাছে জবাবদিহি করার কথা ভাবেই না। ছেলেটার এই দ্বিধাহীন ব্যবহারেই বোধহয় মামা ওকে ভয় পায়। চোখে চোখ রাখে না।

—নিচ্ছে নিক, টাকাটা তো শেষ পর্যন্ত ওরই। এ কথা একদিন বলেছিল মনোরম মামাকে।

—দ্যাখ ঝুমু, টাকা কারও নয়। যে রাখতে পারে তার লক্ষ্মী, যে ওড়ায় তার বালাই। এই বিতিকিচ্ছিরি চেহারার কাঠগোলার পেছনে কত লাখ টাকার কাজ হচ্ছে তা তো তুই বুঝিস। এত টাকা তো এমনি এমনি হয়নি। এর পেছনে আমার যেমন পরিশ্রম আছে, তেমনই আদর্শবোধও। বাঙালি ব্যবসা জানে না—এ অপবাদ আমি আমার জীবনে ঘুচিয়েছি। আর ওই হারামজাদা 'বাঙালি' কথাটার অর্থই জানে না, ব্যবসার 'ব' বোঝে না।

—তুমি বলো না ওকে।

—বলব। আমি? ও আমাকে বাড়ির চাকরবাকরের বেশি কিছু মনে করে নাকি? আমার পারসোনালিটি নেই, আমি জানি। পারসোনালিটি ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্রং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। আমি কী পছন্দ করি না, কী করি তা ওকে কোনওদিনই বোঝাতে পারিনি। ও যখন ছোট ছিল, তখন থেকেই ওর মুখের দিকে তাকালেই আমি বরাবর আত্মবিস্মৃত হয়েছি। অন্য ক্ষেত্রে আমার যাও-বা একটু ব্যক্তিত্ব আছে, ওর কাছে কিচ্ছু নেই। আমারই দোষ। কিন্তু এখন কিছু আর করার নেই। যদি তুই কিছু করতে পারিস।

—কী করব?

—আমার ধারণা, ও খুব সেফ লাইফ কাটায় না। ওকে ওয়াচ করা দরকার, গার্ড করাও দরকার। কোনদিন কী বিপদ ঘটাবে!

—কী বিপদ?

—কে জানে! আমি কী করে বলব? কিছুই জানি না, বলেছি তো। হঠাৎ তিন-চার দিনের জন্য না বলে উধাও হয়ে যায়। কখনও-সখনও একমাস কোনও খবর পাই না। ভেবে ভেবে আমার একটা অসহ্য আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে। কেবলই মনে হয়, শিগগিরই হঠাৎ একদিন ওর বদলে ওর ডেডবডি লোকে ধরাধরি করে বয়ে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে...দুর্গা, দুর্গা...এ সব মনে হয় বলেই আমার স্ট্রোকটা হয়েছিল।

মনোরম বুঝতে পেরেছিল, তার দায়িত্ব বাড়ছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল—তুমি আমাকে কী করতে বলো?

—তুই ওকে মাঝে মাঝে 'ফলো' কর।

—'ফলো'? মাই গু-উ-ডনেস!

—ঝুমু, ওকে ওয়াচ করা দরকার। অন্য উপায় নেই।

—'ফলো' করে কী করব?

—দেখবি ও কী করে। যদি বিপদে পড়ে তো সামলাস।

—আমি?

—নয় কেন?

—আমি পারব না মামা।

—কেন?

—আমি ঠিক...ঠিক সুস্থ নই। সেই অ্যাকসিডেন্টের পর আমারও আর আত্মবিশ্বাস নেই। কী যেন একটা হারিয়ে গেছে। আমি ভয় পাই।

—তবে বীরুর কী হবে ঝুমু? আমার যে তুই-ই সবচেয়ে ভরসা ছিলি।

—ফলো-টলো করা খুব রিস্কি মামা। বীরু টের পেলে?

—বীরু টের পাবে? মামা চোখ বড় বড় করল।

—পাবে না?

—তুই কি ভাবিস বীরু চারপাশটাকে লক্ষ করে? করলে আমি ভাবতাম নাকি? ও যখন গাড়ি চালায় তখন উন্মাদের মতো চালায়, আগুপিছু কিছু লক্ষ করে না। কারও তোয়াক্কা নেই, লক্ষ করবে কেন? তুই আমার গাড়িটা নিয়ে সেফলি ফলো করতে পারিস, ও কখনও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবেই না। গাড়ির নম্বর-প্লেট তো দূরের কথা, আস্ত গাড়িটাকেই ও নজর করবে না। আমি ওকে ফলো করে দেখেছি ঝুমু।

—করেছ?

—করেছি। কিন্তু পারি না। অত জোরে গাড়ি চালানোর নার্ভ আমার নেই। তা ছাড়া আফটার অল আমার ছেলে, তার সব কিছু ওয়াচ করতে আমার সংকোচ হয়। তোর তো তা নয়।

মনোরমের এই প্রথম মামার জন্য কষ্ট হয়েছিল খুব। যে লোকটা মনিহারিঘাটে একবার কামরার দরজা আটকে কেবল বাঙালি তুলেছিল গাড়িতে, তার সেই তেজ-টেজ বীরুর কাছে এসে কোথায় মিলিয়ে গেছে। নব্বই পারসেন্ট বাঙালির চাকরির জন্য যে লোকটা সব লড়াই করতে প্রস্তুত তার এ কেমন ব্যক্তিগত পরাজয়!

মনোরম নিমরাজি হয়েছিল। কাঠগোলায় বসে থাকার চেয়ে বরং একটু খোলা-আলো-বাতাসে একা একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, ব্যাপারটা ভাবতে ভালই।

একদিন বীরু ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সামনেই দাঁড়ানো ওর ফিয়াটখানা। উঠল। গাড়িটা ছাড়তেই, মামা ভিতরঘর থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাল—ঝুমু, ফলো হিম! এই যে গাড়ির চাবি...মামা ছুড়ে দিয়েছিল চাবিটা।

মনোরম লুফে নিল। দৌড়ে গিয়ে মামার গাড়িটায় উঠে পড়ল। তখন উত্তেজনায় তার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুকে স্কুটারের শব্দের মতো হুড়হুড় শব্দ। মামার ভোঁতা মুখওলা দিশি গাড়িটা ছাড়ল মনোরম। এবং বুঝতে পারল এ গাড়ি নিয়ে বীরুর বিদেশি ফিয়াট গাড়িটার পিছু নেওয়া বেশ শক্ত। তার ওপর বীরু তার ফিয়াট গাড়ির ইঞ্জিন মেকানিক দিয়ে হট্-আপ করিয়ে নিয়েছে। স্পিডের জন্য।

লেকের ভিতর দিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ হয়ে যাচ্ছে গাড়িখানা। ভোঁতা-মুখ দেশি গাড়িটায় বসে দাঁতে দাঁত চাপল মনোরম। জিভটা তখন ধড়াধড় ধাক্কা দিচ্ছে বন্ধ দাঁতে। ঘামছিল মনোরম। গাড়ির গতি বাড়তেই মনে পড়ল সেই দুর্ঘটনা...ছুটন্ত ট্রেন তার লাইন ছেড়ে অসহায় মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে—লোভী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, লুঠেরা মানুষেরা ফিস-প্লেট খুলে রেখেছিল, অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে...একটা প্রলয় ঝড়ের মধ্যে ট্রেনের কামরার নিরাপদ প্রথম শ্রেণীর বার্থসুদ্ধ মনোরম হঠাৎ এরোপ্লেনের মতো উড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার হয়ে গেল মাথা। আবার ফিরে এল আলো। ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে বীরুর ফিয়াট।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল মনোরম। দাঁতে দাঁত চেপে ভেবেছিল—নো মোর স্পিড ফর মি। আমি এখন একটা স্লো-মোশান ম্যান। জোকার।

মামা হতাশ হয়নি। বলেছিল—লেগে থাক। তুই-ই পারবি।

প্রথম প্রথম কয়েকবারই ব্যর্থ হল মনোরম। অলীক ছায়াছবির মতো মিলিয়ে যায় বীরু আর তার ফিয়াট। কলকাতার ভিড়ে ঠিক জাদুকরের মতো বীরু তার অদৃশ্য রাস্তা করে নেয়। মনোরম হতাশ হয়। এক রাতে স্বপ্ন দেখল, বীরু তার গাড়ি নিয়ে আশি-নব্বই মাইল বেগে ছুটছে একটা দেয়ালের দিকে, সুইসাইড করবে। মামার দিশি গাড়িখানা ঝকাং ঝকাং করে মুড়ির টিনের শব্দ করতে করতে চলেছে। গাড়ির রেডিয়োতে মামার আকুল স্বর শোনা যাচ্ছে—ঝুমু, ওকে বাঁচা, ঝুমু-উ—। কিন্তু গাড়ি চলছে না। স্বপ্নের মধ্যেই ইডিও-মোটর অ্যাকশন হচ্ছিল মনোরমের। বীরুর গাড়িটা দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ছে...ঠিক এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে দেখল মনোরম, তার হাত দুটো সামনে বাড়ানো, একটা পা তোলা। স্বপ্নের মধ্যে সে চিৎকার করেছিল, সেই চিৎকারের শব্দ এখনও তার কানে লেগে আছে। যেন বা নিজের স্বপ্নের চিৎকারেই তার ঘুম ভেঙেছে।

মামার কিছু টাকা খরচ হল। মেকানিক দিয়ে পুরনো গাড়িখানা একটু 'হট-আপ' করাতে হল।

মেকানিক বলল—দিশি মেশিন, খুব বেশি স্পিড তুলবে না।

তারপর একদিন প্রাণপাত করল মনোরম। গাড়ি চালানোর অভ্যাস গেছে বহুদিন। গ্রেবালদের মোটর ট্রেনিং স্কুলে শিখেছিল। আশা ছিল, নিজের গাড়ি হবে একদিন। হয়নি। কাজেই অভ্যাসে মরচে পড়ে গেছে। তার ওপর দুর্ঘটনার স্মৃতি, ইডিও-মোটর অ্যাকশন, নড়ন্ত জিভ, সীতা! এতগুলো বাধা তার সব গতি কেড়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। তবু সে একদিন বীরুকে ধরল এক দুপুরে। মামাদের বাড়ির সামনে থেকেই ফিয়াটখানা ছাড়ল। দশ গজ দূরে মনোরম মামার গাড়ির হুইলের পিছনে প্রকাণ্ড গোগো চশমা পরে বসে। গাড়িটা চলেছিল সেদিন। মনোরমের বুকে স্কুটার ডেকেছিল, মনে পড়েছিল সেই দুর্ঘটনা, জিভ নড়েছিল, সীতার জন্য দুঃখিত ছিল হৃদয়। ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল সে। বীরুর মায়াবী ফিয়াট মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। একটু অবহেলায় কাত হয়ে বসেছে বীরু, ডান হাতে আলতো ছুঁয়ে রেখেছে হুইল, ঠোঁটে সিগারেট। চেষ্টাহীন সেই চালানো। বিদেশি মসৃণ গাড়িখানা সিল্কের অলীক রাস্তায় পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনে দিশি গাড়িখানায় মনোরমের শ্বাস গাঢ় ও দ্রুত হয়ে উঠছে তখন, ধোঁয়াচ্ছে গোঙানো ইঞ্জিন, ঘাম, স্বপ্ন ও স্মৃতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন সম্মুখ। সে কী প্রাণপণে দিক ঠিক রেখেছিল মনোরম। ইনট্যুইশনের ওপর ভর করে বাঁক নিয়েছিল, কারণ বীরু হারিয়ে যাচ্ছিল প্রায়ই। এসপ্ল্যানেডেই যাচ্ছে বীরু—এই আন্দাজে চালিয়ে অবশেষে লেনিন সরণির মোড়ে ট্রাফিকে সে বীরুর গাড়ির দশখানা গাড়ির পিছনে থামল।

সেদিন বীরু খুব বেশি দূর যায়নি। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ে ঢুকে একটা চওড়া সম্ভ্রান্ত গলিতে গাড়ি দাঁড় করাল। অবহেলার ভঙ্গিতে নামল, দরজা লক না করে এবং গাড়িটার দিকে একবারও পিছু ফিরে না তাকিয়ে ঢুকে গেল একটা মস্ত দোকানে। ধীরে ধীরে দিশি গাড়িটাকে দোকানের সামনে আনল মনোরম। দেখল, রেডিয়ো আর গ্রামোফোনের খুব বড় দোকান। সামনে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কাচ লাগানো দুটো শো-কেসে অজস্র রেডিয়ো, গ্রামোফোনের ডিসপ্লে। ঠিক গোয়েন্দার মতো সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল মনোরম। বাইরে দিনের আলো। কাচের গায়ে নানা রকম প্রতিবিম্ব পড়েছে। ওই সব প্রতিবিম্বের জন্য ভিতরটা ভাল দেখা যায় না। তবু প্রাণপণে লক্ষ করল মনোরম। ভিতরের মৃদু আলোয় দেখল, দোকানের ভিতরে আর একটা কাচের পার্টিশন আছে। সেই পার্টিশনের কাচের পাল্লা ঠেলে বীরুর লম্বা চেহারাটা ভিতরে ঢুকে গেল। ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক করে একটা পপ মিউজিক বাজছে ভিতরে। রক্ত গরম করা বাদ্যযন্ত্র। শুনলেই হাত-পা নাচের জন্য দামাল হয়ে ওঠে। কাচের পাল্লাটা খুললেই গাঁক গাঁক করে শব্দটা বেরিয়ে আসছে। পাল্লাটা বন্ধ হলেই শব্দ মৃদু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবিরল শব্দটা হয়েই চলেছে।

মনোরম অনেকক্ষণ বসে সিগারেট পোড়াল। তারপর বীরু বেরিয়ে এল। একটা ধৈর্যহীন চাপা উত্তেজনাময় চেহারা তার, অসুখী, অতৃপ্ত। তার পিছনে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল একটা দামি সুন্দর স্টিরিও সিস্টেম। সেই জিনিসটা গাড়ির পিছনে তুলে আবার গাড়ি ছাড়ে বীরু। মনোরমের আবার সেই প্রাণান্তকর পিছু-নেওয়া। রিচি রোডের একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, তেমনি লক না করে, পিছু না ফিরে ঢুকে গেল ভিতরে। একটু পরে দুজন দারোয়ান-চেহারার লোক এসে দুটো বাক্সের মতো স্পিকার আর রেকর্ড প্লেয়ার সহ স্টিরিওটা নামিয়ে নিয়ে গেল। ধৈর্যশীল মনোরম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইল। বীরুর গাড়িটা হিম হতে লাগল। মনোরম দু'বার পেচ্ছাপ করল, প্রায় দেড় প্যাকেট সিগারেট খেয়ে ফেলল। অনেক রাতে নেমে এল বীরু। শিস দিচ্ছে, একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বোধহয় কিছুটা মদ খেয়েছে। গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘুমের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল মনোরমের। চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল। রাত হয়ে গেছে। এত রাতে পিছু নিলে বীরু টের পাবে। ভাবল মনোরম। কিন্তু বীরু কিছু লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িটা ছাড়ল। তেমন স্পিড দিল না এবার। আস্তে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল। বীরু বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর মনোরম দিশি গাড়িটা গ্যারেজে তুলে মামার দারোয়ানের হাতে চাবি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল। সেই রাতে সাফল্যের আনন্দে তার ভাল ঘুম হয়।

পরদিন মামা সব শুনে ভ্রূ কুঁচকে বলল—অ্যাপার্টমেন্ট হাউস? ওখানে ও করে কী?

—কে জানে! চেনাশোনা কেউ থাকতে পারে।

—ভাড়া দেয়নি তো?

—কে জানে।

—খোঁজ নে।

—আমি কি ডিটেকটিভ হয়ে যাচ্ছি মামা?

মামা চিন্তিত মুখ তুলে বলেছিল—তোকে এর জন্য না হয় কিছু বেশি টাকা দেব। ওকে দেখিস ঝুমু।

দেখেছে মনোরম। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটায় আটশো টাকা ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে বীরু। মাঝে মাঝে থাকে সেখানে। তার বেশি কিছু জানা যায়নি। মনোরম অনেক ভেবেছে, বুঝতে পারেনি, কেন বীরু নিজেদের অমন প্রকাণ্ড বাড়ি থাকতে এবং সেখানে অতগুলো খালি ঘর থাকতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে। মামাও ভেবে পায়নি। দু'জনে চিন্তিতভাবে দু'জনের দিকে চেয়ে থেকেছে। মামা শ্বাস ফেলে বলেছে—ঝুমু, লক্ষ রাখিস। আমার একটাই সন্তান।

বীরুর কলেজের সামনেও অপেক্ষা করেছে মনোরম। বিশাল ইউনিভার্সিটি কলেজ। অনেকগুলো বিল্ডিং, করিডোর, মাঠ, ছেলেমেয়ে, ঠিক থৈ পাওয়া মুশকিল। তবু মনোরম ঘাপটি মেরে ঘুরেছে কলেজের মাঠে, করিডোরে, দালানে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, বীরু তাকে লক্ষ করেনি। এক দঙ্গল মেয়ের সাথে করিডোরে প্রায়ই আড্ডা দেয় বীরু। সকলের প্রতি সমান মনোযোগ। ক্ষতিকর কিছু নয়, একদিন শুধু কলেজ ভেঙে যাওয়ার পর মনোরম দেখেছিল, একটা ফাঁকা ক্লাশঘরের দরজার চৌকাঠে বীরু দাঁড়িয়ে। লম্বা শরীরটা ঝুঁকে আছে, দরজায় কাঠের ওপর হাত তুলে ভর রেখেছে শরীরের। ওর দীর্ঘ শরীরের আড়ালে একটা চৌখশ, সুন্দর, প্রায় কিশোরী মেয়ে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির বয়স এত কম, মুখে এমন একটা নিষ্পাপ ভাব যে, সহজেই যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে। মনোরম দেখছিল, বীরু কথা বলতে বলতে ডান হাতে মেয়েটির বাঁ বগলের শর্ট স্লিভসের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে। মেয়েটি হেসে বলছে—যাঃ, রীতা এ কথা বলতেই পারে না।

—সত্যিই বলেছে, গৌরী প্রেগন্যান্ট।

—রীতাটা মিথ্যুক।

—তা হলে সত্যিটা কী? তুমি প্রেগন্যান্ট নও?

—যাঃ! বলে মেয়েটি একটুমাত্র লাজুক ভাব করে খিলখিল হাসল। বলল—একদম ফ্রি আছি বাবা। ভয় নেই।

এইটুকু শুনেছিল মনোরম, সেদিন। ধৈর্যহীন, অতৃপ্ত যুবা বীরু চট করে হাতের ভরটা তুলে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, চলি।

মামাকে এটা জানানো যায় না। জানায়নি সে। বীরু যে ওই মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছে না, সেটা বোঝা গেল আর একদিন। অপরাহ্ণের ফাঁকা ক্লাশঘরে বসে সে অন্য এক মেয়ের সাথে দ্বৈত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল। একটা উঁচু ডেস্কের দু'ধারে দু'জন, ডেস্কের ওপর নামানো মাথা, থুঁতনিতে থুঁতনি ঠেকে আছে। অনুচ্চ স্বরে, আবেগভরে এবং সুন্দর গলায় দু'জনে গাইছিল—অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ...সারাক্ষণই গানের মধ্যে তারা পরস্পরকে চুম্বন করছিল। দেখে ভারী উত্তেজিত হয়েছিল মনোরম। আগের দিনের সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তা হলে বীরু প্রেম করছে না? কেন করছে না? কী সুন্দর মেয়ে, অনায়াসে মিস ক্যালকাটা জিতে যেতে পারে, অমন সুন্দর মেয়ে বীরু পাবে কোথায়! মেয়েটা ইচ্ছে করলে মনোরমকে সীতার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে, আর বীরু ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। হায় ঈশ্বর! প্রেম করবি না তো ওর বগলে তুই কেন হাত দিলি বীরু। কেন জিজ্ঞেস করলি, ও প্রেগন্যান্ট কিনা। ঠাট্টা নয় তো? ঠাট্টা! এরকম ঠাট্টা কোনও মেয়েকে করা যায়, আর এরকম ঠাট্টা শুনে কোনও মেয়ে হাসে, মনোরম জানত না। মাথা গরম হয়ে গেল মনোরমের। তার সামনে একটা উত্তেজক নতুন জগতের ছবি ফুটে উঠেছিল।

দক্ষিণ কলকাতার একটা নামকরা গানের স্কুল থেকে একদিন চমৎকার শরীরওলা একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলল বীরু। মনোরমের দিশি গাড়িটা প্রায় বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালায়। ইচ্ছে করলে ওভারটেকও করতে পারে। মনোরম লক্ষ করে, মেয়েটার নিজের প্রকাণ্ড একখানা হাম্বার গাড়ি আছে। বীরুর গাড়িতে ওঠার আগে মেয়েটি নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে গিয়ে নিচু স্বরে কী বলল

গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটা জিভ দিয়ে ওপর ঠোঁট চেটে বীরুর পাশে উঠে বসল, খোঁপা ঠিক করল। সহজ ভঙ্গি, বীরু তাকে নিয়ে এল তার অ্যাপার্টমেন্টে। দু'জনে নেমে এগিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা হঠাৎ থেমে বলল—ওই যাঃ! ব্যাগটা ফেলে এসেছি।

—তাতে কী হয়েছে?

—দাঁড়াও না, নিয়ে আসি। ব্যাগটা না থাকলে বড্ড হেলপলেস লাগে।

দৌড়ে গাড়ির সিট থেকে ভ্যানিটি.ব্যাগটা নিয়ে মেয়েটা বীরুর সঙ্গে বাড়িটায় ঢুকে গেল।

মাঝে মধ্যেই এটা হতে থাকে। মনোরম একান্তভাবে পিছু নেয়। এবং লক্ষ করে, মেয়েটার স্বভাবই হচ্ছে ব্যাগ ফেলে যাওয়া। ক'দিনই মেয়েটা ব্যাগ ফেলে গেল। দু-একবার মনে পড়তে ফিরে এল। অন্য কয়েকবার ব্যাগটা পড়েই রইল গাড়িতে। ওরা বাড়ি থেকে বেরোত অন্তত তিন-চার ঘণ্টা পরে। ওরা কী করে এতক্ষণ তা জলের মতো পরিষ্কার। অথচ মেয়েটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ নয়। তার গাড়ি আছে, যে স্কুলে সে গান শেখে তা খুবই উঁচু জাতের, চেহারা বড়ঘরের মেয়ের মতো। তবে কি বীরু প্রেম করছে অবশেষে? মনোরম দিশি গাড়িটায় বসে ভাবত আর ঘামত।

সাহস বেড়েছিল মনোরমের। কৌতূহলও। মেয়েটা প্রায়ই ব্যাগ ফেলে যায়। একদিন মনোরম থাকতে না পেরে নেমে আসে। চারদিক চেয়ে দেখে। কেউ লক্ষ করে না। সোজা গিয়ে বীরুর লক-না-করা গাড়ির দরজা খুলে গাড়ির ভিতরে ঢোকে। তুঁতে রঙের ব্যাগটা পড়ে আছে অবহেলায়। সে খোলে। প্রথমে কিছু সাধারণ জিনিস পায়। আইব্রো পেনসিল, লিপস্টিক, পাউডারের কেস, ফাউন্ডেশন, ক্লিপ, রাংতার প্যাকেট মাথা ধরার বড়ি, কয়েকটা ট্র্যাংকুলাইজার ট্যাবলেট এবং তারপরই বেরিয়ে আসে কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেটের একটা প্রায় খালি প্যাকেট। একুশটা ট্যাবলেট থাকে। তার মধ্যে মোটে দুটো অবশিষ্ট আছে। মনোরম সভয়ে নেমে আসে। দিশি গাড়িটায় বসে ক্রমান্বয়ে সিগারেট খায়।

গত শীতে পাঁচটা টেস্ট খেলাই দেখল বীরু। বাইরের টেস্ট খেলা দেখতে প্লেনে যাতায়াত করল কানপুর, মাদ্রাজ, দিল্লি, আর বম্বে। এলাহি টাকার কারবার। ক'জন ভারতীয় পাঁচটা টেস্ট খেলা দেখার ঝুঁকি নিতে পারে মনোরমের হিসেবে আসে না। শেষে টেস্ট খেলা দেখে ফেরার সময়ে একটা সিঙ্গি টিন-এজারকে পেয়ে গেল বীরু। ভারী সুন্দর, উগ্র এবং ছটফটে মেয়েটি। এক ঝলকে মেমসাহেব বললে ভুল হয়। পিঙ্গল চুল, মিনি স্কার্ট আর খয়েরি চোখের তারা। দমদমে বীরুকে আনতে গিয়েছিল মনোরম। মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল বীরু। মেয়েটির সঙ্গে তার বাবা ছিল। অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারা। বোঝা গেল মেয়েটির দানাপানির অভাব নেই। তিন-চার দিন পরেই বীরু তার অ্যাপার্টমেন্টে এনে তুলল তাকে। মেয়েটি খুব হাসছিল, মুখচোখ ঝলমল করছে খুশিতে। মনোরম বুঝতে পারে, এই মেয়েটিও জানে বীরু তাকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে কী হবে। জেনেও বিন্দুমাত্র ভয় নেই। মনোরম হাই তোলে। তার বিস্ময়বোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিনেই মনোরম বুঝতে পারে, বীরু তার আটশো টাকার অ্যাপার্টমেন্টের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করে। এবং কোনও মেয়েই বেশ্যা নয়। বাছাই, চমৎকার মেয়ে সব। কেউই রোগা বা মোটা নয়, গরিবঘরের নয়, হাঘরে নয়, বীরুর চেয়েও ঢের বড়লোকের বাড়ির মেয়েও আছে তার মধ্যে। এবং কারও সঙ্গেই বীরুর প্রেম নেই। এক একদিন এক দঙ্গল পুরুষ আর মেয়ে বন্ধু নিয়েও ও ঢুকে যায় অ্যাপার্টমেন্টে। ক্রমশ সাহসী মনোরম দিশি গাড়ি ছেড়ে ঢুকে পড়ে বাড়িটায়। লিফটে উঠে আসে ওপরে। মোজেইক মেঝের ওপরে নিঃশব্দে হেঁটে এসে বীরুর চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টের ফ্লাশ-ডোরে কান রেখে শোনে ভিতরে ঝিক-ঝাঁই ঝিক-ঝাই ইও ইও ইও ইও টিরিকিটি টিরিকিটি টিরিকিটি ঝাঁই এরকম সব অদ্ভুত শব্দে স্টিরিও বাজছে। ঝনাৎ করে পড়ে ভেঙে গেল মদের গেলাশ। উদ্দণ্ড নাচের শব্দ। হো-হো চিৎকার। কণ্টকিত হয়েছে মনোরম। হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকে যেতে ইচ্ছে হয়েছে উদ্দাম আনন্দিত ঘরখানার মধ্যে। পাপ হবে না, কেউ দোষ দেখবে না। ঢুকবে?

তক্ষুনি নড়ন্ত জিভটাকে টের পেয়েছে সে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। মনে পড়ে বয়স, সীতা। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। নিঃশব্দে নেমে এসেছে মনোরম। দিশি গাড়িটায় বসে সিগারেট টেনেছে।

ছেলেটার কোনও ক্লান্তি নেই। সারা শীতকাল একনাগাড়ে টেনিস খেলল একটা ক্লাবে। একটু দূর থেকে, পার্কের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মনোরম দেখে গেল টেনিস বলের এ কোর্ট থেকে ও কোর্ট যাতায়াত, আর পফ পফ শব্দ শুনল। ফার্স্ট ডিভিশন লিগে খেলে গেল ক্রিকেট। গ্রীষ্মে একটা দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবে খোলা মাঠে জলে কাদায় ভূত হয়ে ফুটবল লাথিয়ে গেল। কোনও খেলাই খুব মন্দ খেলে না। কিন্তু কেমন একটু নিরাসক্ত উদাসীন ভাব। যেন কোনও কিছুতেই গা নেই।

ও কি নিরাসক্ত, সন্ন্যাসী? না কি পাষণ্ড?

ইউ এস আই এস-এর সামনে ছাত্রদের একটা র‍্যালি ছিল, ভিয়েতনামের যুদ্ধের প্রতিবাদে। সেদিন একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের মাউথপিস মুখের কাছে টেনে বীরু বক্তৃতা করল। প্রথমে ধীরে ধীরে ভিয়েতনামের যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করল, মার্কিন ভূমিকার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল, সিয়াটোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করল, প্রসঙ্গত ইয়োরোপ এবং এশিয়ায় মার্কিন দুমুখো নীতির চমৎকার সমালোচনা করল, সমাজতন্ত্র কী এবং সমগ্র এশিয়ার অর্থনৈতিক মুক্তি কী ভাবে আসবে তা বলে গেল বিশুদ্ধ বাংলায়। বলতে বলতে থেমে গেল না, কিন্তু ভাবতে ভাবতে বলল, থেমে থেমে। ঝোড়ো আবেগ নেই, কিন্তু নিবেদনটি ভারী আন্তরিক। ও যে এত ভাল বাংলা জানে কে জানত তা? কিংবা রাজনীতির এত খবর রাখে, জানে ভূগোল ইতিহাস? দাঁড়াল ঠিক তরুণ এক বিদ্রোহীর মতো। এত সুন্দর ভঙ্গিটি!

সব রকমের জুয়া খেলে বীরু। সাট্টা থেকে ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে একদিন মুখোমুখি পড়ে গেল মনোরম। অবিরল হারছিল বীরু। মুখে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু হতাশা বা ভেঙে-পড়া ভাব ছিল না। রেজাল্ট ওঠা মাত্র হাতের টিকিট দুমড়ে ফেলে দিচ্ছিল। আবার লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল কাউন্টারের দিকে। বীরু কিছুই দেখে না—এই বিশ্বাসে মনোরম সেদিন তেমন আড়াল হয়নি। খোলাখুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘোড়াদের স্টার্টিং পয়েন্টে হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছে পঞ্চম রেস-এর আগে। রেলিং ধরে বীরু দাঁড়িয়ে ঘোড়া দেখল, তারপর হঠাৎ কাউন্টারে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি।

একটু অবাক হল বীরু, সামান্য কৌতূহল দেখা গেল চোখে। ঘাবড়ে গেল না একটুও। বরং মনোরম ঘাবড়ে যাচ্ছিল।

বীরু একটু এগিয়ে এসে বলে—তুমি খেল?

—খেলি।

—দেখিনে তো কখনও!

—গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে আসি না তো!

—আমি তো দুই স্ট্যান্ডেই খেলি। বলে মিষ্টি করে হাসল। বলল—কী খেলছ এটায়?

—ঠিক করিনি।

—আমি 'ডাকু'র ওপর অনেক টাকা খেলছি, কিন্তু হবে না, দিনটা খারাপ। কুড়িটা জ্যাকপট মিলিয়ে রেখেছিলাম। সবক'টা গেছে ফিফ্‌থ রেস-এর মধ্যে।

—কত হেরেছিস?

—হাজারের ওপর তো বটেই। এখনও হিসেব করিনি। তুমি?

—গোটা পঞ্চাশ।

—মোটে? তুমি তো লাকি। আবার হাসল বীরু।

—আর খেলিস না।

—কেন? বীরু ভ্রূ তোলে।

—খামোকা খেলবি। এক একটা দিন অনেকে কেবল হারে।

—আমি রোজ হারি! হারজিত তো আছেই। তবে এ রেসটার পর কেটে পড়ব। ভাল লাগছে না।

—আমিও।

—কোথায় যাবে?

—ঠিক নেই। মামার কাছে যেতে পারি।

—ঠিক আছে। একসঙ্গে ফিরব। আমার গাড়ি নেই, গ্যারেজে দিয়েছি, ট্যাক্সিতে ফেরা যাবে।

সেটা জানত মনোরম। তাই একটু বিপদে পড়ল। তারও গাড়ি আছে। মামার দিশি গাড়িটা। বলল—আমার গাড়ি আছে।

অবাক হয়ে বীরু বলে—নিজের গাড়ি?

—না না, মামার গাড়িটাই। কয়েক ঘণ্টার জন্য চেয়ে এনেছি।

—বাবা দিল? কাউকে তো দেয় না।

—আমি তো বিজনেস টুর-এ আছি।

—তাই বলো। নইলে দিত না।

রেস-এর পর তারা গাড়িতে এসে উঠল। বীরু গাড়িতে বসে চারদিকে চেয়ে গাড়িটা একটু দেখে বলে—রদ্দি জিনিস।

—কী?

—এটা। গাড়িটা।

—দিশি মাল, আর কত ভাল হবে।

—তুমি তো ভালই চালাও।

—অভ্যেস।

—অভ্যেস কেন? বাবা তোমাকে দিয়েই সফারের কাজ করায় নাকি?

—না, তা নয়। স্ট্রোকের পর নিজে চালাতে ভরসা পায় না, আমিই চালাই।

—অঃ!

একটু চুপ।

—বাবা তোমাকে কত দেয়?

—দেয় কিছু। আমার চলে যায়।

—তোমার একটা বিজনেস ছিল না?

—ছিল। বেহাত হয়ে গেছে।

—শুনেছি, খুব রোজগার করতে?

—হত মন্দ না।

—তা হলে এখন চলে যাচ্ছে কী করে? বাবা বেশি দেওয়ার লোক নয়।

—একা মানুষ তো, চলে যায়।

—একা তো আমিও।

—তুই একা কেন? মামা মামি কি হিসেবের মধ্যে নয়?

—হলেও তারা ডিপেন্ডেন্ট তো নয়। বরং আমিই ডিপেন্ডেন্ট। একা আমারই তো কত খরচ! গাড়িটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে নাও, সামনের রাস্তায়।

—কেন?

—আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে রিচি রোডে, যাব।

একটু চমকে গিয়েছিল মনোরম। ওর যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে সেটা জানতে মনোরমকে কত কষ্ট করতে হয়েছে; আর সেই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য খবরটা ও কত সহজেই দিয়ে দিচ্ছে নিজে। বিন্দুমাত্র গোপন করবার চেষ্টা নেই। একটু হতাশ হয় মনোরম।

মনোরম গাড়ি ঘোরাল।

—যাবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে?

—সেখানে তুই কী করিস?

—অনেক কিছু। তবে বেশিরভাগ সময়ে বসে রেস্ট নিই, আর বই পড়ি। তুমি ড্রিঙ্ক করো?

—কী বলছিস?

—ড্রিঙ্ক করো তো?

একটু ভাবল মনোরম। বলল—করি।

—আমার ফ্ল্যাটে একটা ছোট্ট বার আছে। যাবে? রেস-এর পর তোমার টায়ার্ড লাগছে না?

—লাগছে।

—তা হলে চলো। ওল্ড স্মাগলার হুইস্কি খাওয়াব।

একটু চুপ।

—মামা জানে?

—কী?

—তোর যে একটা ফ্ল্যাট আছে!

—জানলে জানে। আমি তো লুকোইনি, আবার আগ বাড়িয়ে কিছু বলিওনি।

—বলিসনি কেন?

—ওটা আমার একার জায়গা। আমার মেয়েবন্ধুরা আসে। ছেলেবন্ধুরা আসে। গেট-টুগেদার হয়। নাচ-গানও হয়। বাবা মা জানলে ওখানে হানা দিতে থাকবে। ফ্ল্যাট নেওয়ার উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হবে তা হলে।

—আমাকে তবে নিচ্ছিস কেন?

বীরু হাসে, বলে—এমনিই। রেস-এর মাঠে তোমাকে দেখে খুব মায়া হল। ভারী ছন্নছাড়া দেখাচ্ছিল তোমাকে। ভাবলাম হঠাৎ বিপাকে পড়ে বাবার চাকরি করছ, নিশ্চয় তুমি খুব সুখে নেই। তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু ড্রিঙ্ক করি।

মনোরম একটু হেসে বলল—তুই আমার ছোট ভাই, তা জানিস?

—সম্পর্কটা এখন খুঁচিয়ে তুলবে নাকি?

—না, না, এমনি বললাম।

—আত্মীয়তা ব্যাপারটা আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। ওটার মধ্যে অনেক ভণ্ডামি আছে।

—কীরকম?

—আত্মীয় বলেই অনেকে অনেকের কাছ থেকে কিছু সম্মান বা সুবিধে পায়, যেটা তাদের পাওনা নয়। সম্মান বা সুবিধে পাওয়ার জন্য মিনিমাম কিছু যোগ্যতা থাকা দরকার। কেবল আত্মীয়তা কখনও সেই যোগ্যতা হতে পারে না। সেইজন্য আমি গুরুজনটন মানি না।

মনোরম বুঝেছে, মাথা নাড়ল।

বীরু কী সুন্দর নরম ব্যবহার করছিল সেদিন! ভাবা যায় না। বীরু যে এত নরম এবং বিষণ্ণ স্বরে কথা বলতে পারে, তা কে জানত?

গোপনে গোয়েন্দার মতো দিনের পর দিন যে ফ্ল্যাটটার ওপর নজর রাখত মনোরম সেই ফ্ল্যাটে সেদিন সে অনায়াসে ঢুকল।

ফ্ল্যাটটা ভালই। এ সব ফ্ল্যাট যেমন হয়, তেমনি। তিনখানা ঘর, ডাইনিং স্পেস-কাম-বৈঠকখানা, সবই আছে, কিন্তু আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। একটা বেশ বড় খাট, তাতে ফোম রবারের গদি, গদির ওপর মণিপুরি চাদরে ঢাকা বিছানা কুঁচকে আছে। চেয়ার টেবিলগুলো দামি কিন্তু যেখানে সেখানে ছড়ানো, মেঝে ভর্তি সিগারেটের শেষ টুকরো সব পড়ে আছে, টেবিলের ওপর ডাব্বাই অ্যাশ-ট্রে উপচে পড়ছে ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি আর সিগারেটের টুকরোয়। মেঝের ওপর পড়ে আছে স্টিরিওটা। রেকর্ডের গাদা দুটো স্পিকারের ওপর রাখা। মেয়েলি হাতের স্পর্শ নেই। অজস্র বই চোখে পড়ে। সবই ইংরিজি। দর্শন, রাজনীতি থেকে ডিটেকটিভ বই পর্যন্ত। বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে বিল্ট-ইন ক্যাবিনেট খুলে গেলাস বের করে বীরু, আর হুইস্কির বোতল। বলে—ডাইলিউট করতে হলে ট্যাপ থেকে জল মিশিয়ে নাও। আমি নিট খাই, সোডা-ফোডার ঝামেলা নেই।

সন্ধে নাগাদ অনেকটাই মাতাল হয়ে গিয়েছিল মনোরম। কথা একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। পেটে পুরনো গ্যাসট্রিকের ব্যথা, খালি পেটে অ্যালকোহল পড়তে চিন চিন করে উঠছিল মাঝে মাঝে। ব্যথাটা কমাতেই বেশি খেল মনোরম।

—তোর মেয়ে-বন্ধুরা এখানে আসে?

—আসবে না কেন?

—একা?

—একাও।

আবার কিছুক্ষণ মদ খেল দু'জন।

—বীরু।

—উঁ।

—মেয়েবন্ধুদের মধ্যে কাকে তোর ভাল লাগে সবচেয়ে?

—সবাইকে। অদ্ভুত মদির হাসি হাসে বীরু, বলে—কে ভাল নয় বলো! মেয়েরা সবাই এত ভাল, এত সিমপ্যাথেটিক। আই লাভ দেম।

—কাউকে বেশি ভাল লাগে না?

—কাউকে অন্য কারও চেয়ে বেশি ভাল লাগতে পারে। তবে সকলেরই আলাদা রকমের ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে।

—ধর, কারও সঙ্গে প্রেম করিস না?

—প্রেমই তো। শুধু আন্ডারওয়্যার পরে বসে ছিল বীরু বেতের গোল চেয়ারে। লম্বা পা দুখানা সামনে ছড়ানো। এমনভাবে 'প্রেমই তো' বলল, যেন ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির নিন্দে করছে।

—তোর গার্ল ফ্রেন্ডদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে?

—কে সুন্দর নয়! হাসল বীরু—সবাই নিজের মতো করে সুন্দর। আমি একদম হারিয়ে যাই ওদের মধ্যে। আজকাল আমার এমন হয়েছে যে রাতে শুয়ে যদি কারও কথা ভাবি তা হলে ওর চোখ ওর মুখে এসে বসে, এর ঠোঁট তার মুখে চলে যায়। বিশেষ কাউকে মনে পড়ে না। সে এক ভারী ঝামেলা। শোওয়ার সময়ে বিশেষ একজনকে ভাবতে ইচ্ছে করে, পারি না।

—কাকে?

—রোজ তো একজনকে নয়!

—তোর বন্ধুদের মধ্যে একজন আছে না, গৌরী! মাতাল মনোরম বলে ফেলল।

একটু স্থির হয়ে যায় বীরু, তারপর বলে, জানলে কী করে?

মনোরম মনে মনে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু ফেরার উপায় নেই।

খুব চালাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল—গৌরী তো কমন নাম! আন্দাজে টোপ ফেললাম একটা।

—আন্দাজে! বলে একটু হাসে বীরু, তারপর বিষণ্ণ মুখে বলে—আন্দাজে হলেও লাগিয়েছ ঠিক। গৌরী একজন আছে।

—সে আসে?

—আসবে কী, সে এখন নার্সিং হোমে!

—কেন?

—বড্ড বোকা মেয়ে। আজকাল কেউ যে অত বোকা আছে তা জানতাম না।

মনোরম ধৈর্যভরে পান করল আর একটুক্ষণ।

—কী হয়েছে?

—অ্যাকলেমশিয়া। তার ওপর ডানদিকটা পড়ে গেছে।

—সে সব তো বাচ্চা-টাচ্চা হলে হয়।

—তাই তো হয়েছে। প্রি-ম্যাচিওর বাচ্চা একটা।

—কী করে হল?

—যেমন করে হয়। আজকাল যে এমন বোকা মেয়ে আছে, কে জানত! প্রেগন্যান্সিটা কেবলই অস্বীকার করে যেত। অথচ আমরা জানতাম। আমার মতো ওর অনেক বিশ্বস্ত এবং সৎ বন্ধু ছিল। ও স্বীকার করলে আমরা খুব সেফলি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতাম, কেউ জানত না। ও লজ্জায় কোনওদিন স্বীকার করেনি।

—বাঁচবে?

—চান্স কম। প্রচুর হেমারেজ হয়েছে। 'কোমা'য় পড়ে আছে। কথা-টথা বলতে পারে না, জ্ঞানও ঠিক নেই। কাল থেকেই মনটা তাই খারাপ। মাঠ থেকেও সেজন্যই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

—তুই ওকে ভালবাসিস না বীরু?

—বাসি। বিশেষ করে আজ তো ওকেই ভালবাসছি। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হওয়া তো ভালবাসাই, না?

—ও যদি বাঁচে?

—খুব ভাল হয় তা হলে। আমি একটা পার্টি দেব।

—বিয়ে করবি ওকে বীরু?

—বিয়ে? বীরু তাকায়। একটু ভাবে। তারপর বলে—ওকেই কেন করব?

—বড় ভাল দেখতে মেয়েটা।

—কোথায় দেখলে? একটুও বিস্মিত না হয়ে সাধারণভাবে প্রশ্ন করে বীরু।

—দেখেছি।

—হ্যাঁ, ভালই। বিয়ে ওকেও করতে পারি। কোনও প্রেজুডিস নেই।

—কে ওকে প্রেগন্যান্ট করল?

—কে জানে। যেই হোক, গৌরীর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওরই দোষ। মুঠো মুঠো ট্যাবলেট বাজারে বিক্রি হয়। কত মেয়ে নিজেরাই গিয়ে কেনে। ওরই কেবল লজ্জা আর লজ্জা।

—তুই ওকে বিয়ে করিস বীরু।

—আগে বাঁচুক তো! তুমি কি আরও খাবে? খেয়ো না। গাড়ি নিয়ে যাবে তো, না খাওয়াই ভাল। আমি আজ বাড়ি ফিরছি না। আর একটু খেয়ে পড়ে থাকব।

—বাড়িতে খবর দেব?

—না না, কোনও দরকার নেই। মাঝে মাঝে আমি ফিরি না, সবাই জানে। তুমি যাও।

শূন্য গেলাস রেখে মনোরম উঠে এসেছিল।

সেই একটা সুদিন এসেছিল। তার পরদিন থেকেই বীরু আবার আলাদা মানুষ। গ্রাহ্য করে না, তাকায় না। কথা তো নেই-ই, আবার একজন অচেনা মানুষ হয়ে যায় বীরু।

খুঁজে খুঁজে নার্সিং হোমটা বের করেছিল মনোরম। মেয়েটা বেঁচে গেছে। বীরু আবার গাড়ি দাবড়াচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে। ওর ঘরে উদ্দাম বেজে যাচ্ছে স্টিরিওতে নাচের বাজনা। মনোরমের কথা কি মনে রেখেছে বীরু? না ভুলে গেছে?

ও কি উদাসীন সন্ন্যাসী? ও কি পাষণ্ড? ওকে ঠিক বুঝতে পারে না মনোরম। একেই কি জেনারেশন গ্যাপ বলে? বীরুর পিছু নিতে নিতেই মনোরম তার পোশাক পালটে ফেলল। রাখল বড় চুল, জুলফি। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে যেমন বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে তার দূরত্বটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, তেমনি জেনারেশন গ্যাপটাও অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে।

সেই মায়াদয়াহীন মুখখানা! বীরু বসে আছে টেবিলের উল্টোদিকে। ফাইলপত্র ঘাঁটছে। মনোরম অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ে ছিল।

ফাইলটা বন্ধ করে বীরু মুখ তুলল। হঠাৎ আতঙ্কিত আনন্দে মনোরম দেখে ও হাসছে।

—তোমার বউকে কাল দেখলাম।

—কে! কার কথা বলছিস?

—তোমার বউ সীতা।

সীতা! বউ! বউদি নয়? একটু অবাক হয় মনোরম।

—কোথায়?

—নিউ মার্কেটে। শি হ্যাড কোম্পানি।

—ওঃ! তোকে চিনল?

—এক-আধবারের দেখা, ঠিক চিনতে পারেনি। আমি চিনেছি। মেয়েদের মুখ আমার মনে থাকে।

—কথা-টথা বললি?

—হুঁ। সেইটেই একটা ভুল হয়ে গেল।

—ভুল?

—চিনতে পেরেই হঠাৎ 'বউদি' বলে ডেকে ফেলেছিলাম। খুব ঘাবড়ে গেল। তাই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। একটু কষ্টে চিনল। দু-চারটে কথাবার্তা হল।

—বউদি বলে ডাকলি?

—তবে কী বলে? বউদিই তো হয়! ছাই সেটাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল।

—কেন?

—সঙ্গে যে লোকটা ছিল, ওয়েলবিল্ট কেভম্যান, সে লোকটা আমার দিকে ভীষণভাবে চেয়ে রইল। আমি বউদির সঙ্গে কথা বলছি, আর লোকটা অপলক চেয়ে আছে, যেন খেয়ে ফেলবে। যখন চলে আসছি তখন লোকটা আমাকে ডাকল, একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—আপনি ওকে বউদি ডাকলেন, কিন্তু ও এখন কারও বউ নয়, জানেন? আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। ক্ষমা-টমা চেয়ে নিলাম। ও নিজেই বলল—বরং ওকে নাম ধরে ডাকতে পারেন, কিংবা মিস সান্যাল বলে। আমি সেটাও মেনে নিলাম। চলে আসবার সময়ে তোমার এক্স-বউকে ডেকে বললাম—সীতা চলি।

মনোরম কিছু শুনছিল না। শুধু বলল—হুঁ।

—লোকটা রুস্তম টাইপের, আর খুব জেলাস। গায়ে অনেক মাংস, সাতটা বাঘে খেয়ে শেষ করতে পারে না।

কৌতুকভরে বীরু চেয়ে আছে মনোরমের মুখের দিকে। মনোরম মুখটা ফিরিয়ে নেয়। জিভটা সব সময়েই নড়ে, কিন্তু অভ্যাস বলে সব সময়ে মনোরম তা টের পায় না। এখন পেল। মুখের ভিতরে যেন একটা হৃৎপিণ্ড, অবিরল তার মৃদু শব্দ।

॥ চার ॥

দিন যায়। মাঝে মাঝে খুব মেঘ করে আসে। বৃষ্টি হয়। কখনও রোদ উঠে নীল জলের মতো আকাশ দেখা যায়। ঘরে ভাল লাগে না। স্পষ্টই বোঝে, বাড়িতে কুমারী-জীবনে যেমন ছিল সে, তেমনটি আর নেই। বিবাহিতা অবস্থায় যেমন ছিল, তেমনটাও নেই। দাদাই যা একটু সহজ। কিন্তু সীতার সঙ্গে দাদার দেখা হয় কতটুকু সময়। মক্কেল আর কোর্ট-কাছারি নিয়ে দাদা বড় ব্যস্ত।

মনোরম জামাই হিসেবে এ বাড়ির কারও পছন্দের ছিল না। তবু সবাই এক রকম তাকেই ছোট জামাই হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সীতা ভুল করেছে, এ কথা সবাই বুঝত। সীতাও বুঝেছে, একটু দেরিতে।

বাবা ইদানীং কানে বড় কম শোনে। একটা যন্ত্র আছে কানে পরবার। তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। একটু চেঁচিয়ে বললে শোনে।

"মেয়ে, কখনও পরপুরুষের সঙ্গে একা রাস্তায় হেঁটো না।"

"মেয়ে, বাবা আর ভাই ছাড়া কোনও পুরুষের উপহার নিয়ো না।"

বিয়ের আগে এ সব কথা একটা ক্ষুদে বই থেকে বাবা তাকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাত। বইটার নাম ছিল, নারীর নীতি। উপদেশ দুটো সীতা মানেনি। শিমুলতলার প্রকৃতিতে কী একটা ছিল, মাদকতাময়, বাধা ছিন্ন করার নিমন্ত্রণ।

বিয়েটা পছন্দের না হোক, বাবা তবু বিয়ের পর সেই বইটা থেকেই আবার শোনাত—স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের বিশ্রামের জায়গা। যখন খেটেখুটে সে ফিরে আসবে, তখনই তাকে অভাব-অভিযোগের কথা বোলো না। তাকে সেবা দিয়ো, সুস্থ করে তুলো, তারপর মৃদু নম্র ভাবে যা বলার বলো। মনে রেখো, তুমি তাকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করে রাখার চেষ্টা করলে সে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবে। সার্থক হবে না সে। বরং তাকে আদর্শের দিকে ঠেলে দিয়ো, সে পৃথিবী জয় করবে...ইত্যাদি। বয়সে অনেক বড় ছিল মনোরম, সীতার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। বাবাকে এ ব্যাপারটা খুব খুশি করেছিল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের বেশি তফাত থাকাই নাকি ভাল, এগুলো মনে রাখার কথা নয়। সীতা রাখেনি। উপদেশ

হচ্ছে পেটেন্ট ওষুধের মতো। রোগ কী তা না জেনেই কিনে এনে খাও। সকলেরই তো একই রোগ নয়। বিশেষ অসুখের জন্য বিশেষ ওষুধ দরকার। তার জীবনে উপদেশটা ঠিক খাটেনি। তবু বিয়ের পর বহুকাল বাবা তাকে নারীর নীতি পড়ে শুনিয়েছে। মনোরমকে কোনও আদর্শের দিকেই ঠেলে দিতে পারেনি সীতা। তারা প্রেম করেছে, রতিক্রিয়া করেছে, খেয়েছে, ঘুরেছে। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, আবার ভাবও। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস এসেছে, আবার প্রেমও করেছে। এবং তারপর ক্লান্তি এসেছিল। এল নিস্পৃহতা। যত বয়স বাড়ছিল, ততই মনোরম পুরোপুরি বাধ্য পরিচারিকা তৈরি করতে চেয়েছিল সীতাকে। প্রেমের কথা, ভালবাসার স্পর্শ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অনেক সময়ে শরীর ঘাঁটত না একনাগাড়ে সপ্তাহভর। কেবল বুকের মাঝখানে কামগন্ধহীন মাথাটা এগিয়ে দিত। সীতা মাঝে মাঝে সে মাথাটা সন্তর্পণে বালিশে তুলে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে। মানস এসে বসত বাইরের ঘরে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসত, কিন্তু তার হাসি, আন্তরিকতাময় কথাবার্তা শরীরের দূরত্বটুকু অতিক্রম করত অনায়াসে। কিন্তু এগুলো কারণ নয়। আসল কারণ ওই সন্দেহ। মাঝেমধ্যে একটা অস্পষ্ট যৌনঋণ-এর কথা উল্লেখ করতে থাকে মনোরম। ক্বচিৎ কদাচিৎ যখন তারা শরীরে শরীর মেলাত, তখন মনোরমের ছিল শ্বাসকষ্টের মতো দম ফেলতে ফেলতে ওই প্রশ্ন—বলো তো, আমি কে?

—তুমি! তুমি তো তুমিই! আবার কে?

—না, না, ঠিক করে বলো। ঠিক করে বলো। আমি কে?

—তা হলে জানি না।

—তা হলে আমি বলি?

—বলো।

—রাগ করবে না?

—কী এমন বলবে যে রাগ করব?

—আমি এখন—আমি বোধ হয়—মানস লাহিড়ি!

—কী বলছ?

—নই?

—তুমি অন্য লোক হতে যাবে কেন?

—আমি অন্য লোক নই। কিন্তু তুমি যাকে ভাব?

—ভাবব? ভাবব আবার কী? কেন ভাবব?

—আমি তো পুরনো হয়ে গেছি। আমি তো আর উত্তেজক নই! এই বয়সেই স্বামী-স্ত্রী অন্য মানুষকে ভাবতে শুরু করে।

স্তব্ধ হয়ে থেকেছে সীতা। বুকের ওপর মানুষ, কত কাছের মানুষ, তবু কী অস্বস্তিকর জটিলতা!

কোনওদিন বা সুখকর ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে—

—মানুষের মন, তার কোনও ছবি দেখা যায় না।

—কী বলছ?

—মানুষ মনে যে কে কাকে ভাবে!

সীতা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে—স্পষ্ট করে বলো।

—আমি এখন তোমার মনের ভিতরটা দেখতে চাই।

—কেন?

—দেখতে চাই, সেখানে কে আছে!

—তুমি কি পাগল?

—কেন?

—তুমি আমাকে সন্দেহ কর?

মনোরম চুপ।

সীতা দু'হাতে মনোরমের বাহু খামচে ধরে বলেছে—বলো, সন্দেহ করার মতো তুমি কী দেখেছ! কী করেছি আমি?

—কিছু দেখিনি। শুধু দেখেছি, তোমরা বাইরের ঘরের টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসে আছ। তুমি উল বুনছ. মানস তোমার দিকে চেয়ে আছে। আর কিছু না।

—তবে?

—কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তোমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য সার্কল। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো কী একটা যাতায়াত করছে। একটা বলয়, সেটা শূন্য, অদৃশ্য, কিন্তু আছে। তোমরা ভালবাসার কথা বলো না। কিন্তু ও তোমাকে কমপ্লিমেন্ট দেয়, যা আমি আগে দিতাম তোমাকে, এখন আর দিতে পারি না। আমার স্টক ফুরিয়েছে। তোমাকে পেয়েছি যখন, তখনই হারিয়েছি। রহস্য শেষ হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু ও নতুন, বাইরে থেকে এসেছে। ওর দেওয়ার আছে অনেক। তুমিও নিচ্ছ। জমে উঠছে ঋণ। সে ঋণ কী ভাবে শোধ হবে?

সীতা কেঁদেছে, না বুঝে।

মনোরম তবু বলেছে—সেই ঋণ শোধ হয় কল্পনায়। আমার শরীরে চলে আসে মানস লাহিড়ি।

কাঁদতে কাঁদতেও সীতা রেগে গিয়ে বলেছে—কল্পনা। সে তো তোমারই! তুমি মেয়েদের নিয়ে কল্পনা করতে না?

—এখনও করি। করি বলেই ধরতে পারি।

—না, আমি তোমার মতো স্বপ্ন দেখি না। আমার অত কল্পনাশক্তি নেই। কারও ধার আমি ধারি না।

এইভাবে মাঝরাতে উঠে তাদের ঝগড়া হত। প্রচণ্ড ঝগড়া।

মনোরম ভুল করেছিল তার নিজের কল্পনাশক্তিই খেয়ে ফেলেছে তাকে। নিজের দোষ সে সীতার ওপর আরোপ করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু মানস আসত। উল বুনত সীতা। মানস বসে থাকত। না, দূরত্বটা কখনও অতিক্রম করত না মানস। তার আছে নিজেকে ধরে রাখার অমানুষিক ক্ষমতা। কিন্তু থেমে-থাকা স্টার্ট-দেওয়া মোটরগাড়ি যেমন কাঁপে, তেমনই কি কেঁপেছে মানস! বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও সে সীতার শরীর আক্রমণ করেনি বহুদিন। অপেক্ষা করেছে। মাত্র সেদিন সে...

কিন্তু ঘুরেফিরে সেই মানসই এল। মনোরম ভুল বলেছিল বটে, তবু ভুলটাকে সত্যি করে দিল নাকি সীতা! এখন যদি মনোরম কখনও সামনে এসে দাঁড়ায়, যদি প্রশ্ন করে, তবে মূক হয়ে মাথা নত করে নেবে না কি সে?

১

বাবা সেই ক্ষুদে বইটা থেকে তাকে উপদেশ শুনিয়েছে কুমারী অবস্থায়। বিবাহিতা জীবনে। কিন্তু যখন এই তৃতীয় অবস্থায় সে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে, তখন আর বাবা সেই ক্ষুদে বইটা পড়ে তাকে শোনায় না। বেশির ভাগ সময়েই কানের যন্ত্রটা বাবা আজকাল খুলে রাখে।

গোপন কোনও কথা বলতে হলে দাদা বাবাকে ছাদে নিয়ে যায়। সেখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে। সীতা এবার এলেও দাদা ওরকমভাবে বাবাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়েছে। বাবা সীতাকে কিছু বলেনি। কেবল তাঁর দন্তহীন মুখে বার বার ঠোঁট জোড়া গিলে ফেলেছে বাবা। চারদিকে চেয়ে কী যেন খুঁজেছে। এ সময়ে বোধহয় মৃতা স্ত্রীকেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল মানুষটার। ছেলেমেয়েদের কথা বাবা আর বুঝতে পারে না। স্ত্রী বেঁচে থাকলে একমাত্র তার কথাই মানুষটা বুঝতে পারত।

নীচে দাদার অফিসঘরে টেলিফোন আছে। ওপরের হলঘরে তার এক্সটেনশন। 'কল' এলে দুটো ফোনই বাজে। নিয়ম হল টেলিফোনে রিং হলে নীচে দাদা ধরে, ওপরে সীতা, বাবা কিংবা বউদি। দাদার কল হলে ছেড়ে দেয়, নিজেদের 'কল' হলে দাদা ছেড়ে দেয়।

সেদিন বউদি কালীঘাট গেছে, সীতা বাথরুমে। বাবা হলঘরে বসে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছে। সে সময়ে টেলিফোন বাজছিল। বাবা ধরল না। সীতার গায়ে তখন সাবান। সে চেঁচিয়ে বলল—বাবা,

ফোনটা ধরো। শোনার কথা নয় বাবার। বেজে বেজে টেলিফোন থেমে গেল। নীচে দাদা ধরেছে। একটু পরেই দাদা সিঁড়ির গোড়ায় এসে চেঁচিয়ে বলল—সীতা, ফোনটা ধর। তোর 'কল'।

কোনওক্রমে গায়ে কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এসছিল সীতা। ফোন কানে নিল। কোনও শব্দ হল না। হ্যালো, হ্যালো, অনেকবার করল সে। কোনও উত্তর নেই। বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে। ফোনটা রেখে দেওয়ার আগে তার অস্পষ্টভাবে মনে হল, ওপাশে যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের অস্ফুট আওয়াজ হল। ভ্রূ কোঁচকাল সীতা। ভুলই হবে। রেখে দিল। বাবাকে বলল—ফোনটা ধরনি কেন বাবা, দেখ তো লাইনটা কেটে গেল।

বলেই লক্ষ করল, বাবার কানে যন্ত্রটা নেই। বাবার ঘর থেকে যন্ত্রটা নিয়ে এল সীতা। বাবার কানে লাগাতে লাগাতে বলল—কেন যে যন্ত্রটা পরে থাক না!

বাবা হঠাৎ মুখ তুলে আঁতকে উঠে বলে—না, না! ওটা লাগাস না।

সীতা অবাক হয়ে বলল—কেন?

বাবা সীতার ঠোঁট নড়া দেখে বলে—ওটার আর দরকার নেই।

—বাঃ! তুমি যে এটা না হলে শুনতে পাও না!

বাবা চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলে—অনেক শুনেছি। সারা জীবন। আর কিছু শুনতে চাই না। ঠাকুর করুন, যে ক'টা দিন বাঁচি, আর যেন কিছু শুনতে না হয়। এটা ফেলে দে।

এইভাবেই বাবা তার পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার জগতে চলে গেছে। স্বেচ্ছায় নির্বাসন। মাঝে মাঝে বাবার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে সীতার। যায়। বাবা চোখ সরিয়ে নেয়। আর বারবার দন্তহীন মুখে নিজের ঠোঁটজোড়া গিলে ফেলতে থাকে। কচ্ছপের মুখের মতো। কথা বলে না। বলতে পারে না। বাঁধানো দাঁতের পাটিজোড়া বাবা ছেড়ে রেখেছে, খাওয়ার সময় ছাড়া পরে না। চশমাও খুলেই রেখে দেয় বেশির ভাগ সময়। একটু বুড়োটে, আর কুঁজো হয়ে বসে থাকে ঘরে। যেন বা নকল দাঁত, নকল চোখ, নকল কান, কিছুরই আর প্রয়োজন নেই বাবার। ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যই—এরকম বিশ্বাসে সব নির্মোক ঝেড়ে ফেলে প্রতীক্ষায় বসে আছে বাবা। কীসের? এক পরিপূর্ণতম নিস্তব্ধতার? নিশ্ছিদ্র এক অন্ধকারের? অন্তহীন ঘুমের? বাবা কিছুই শোনে না। চারধারে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ। সীতা মাঝে মাঝে যায়। বসে থাকে। ক্ষুদে বইটা থেকে উপদেশগুলো বাবা আর কোনওদিনই শোনাবে না, বুঝতে পারে। বাবার নিস্তব্ধতার কাছে ক্ষণেক বসে থাকে সে। ঠিক সহ্য করতে পারে না। অসহ্য হয়ে উঠে আসে।

নতুন কেনা একটা শাড়িতে 'ফলস' লাগাচ্ছিল সীতা। বউদি এসে একটু দাঁড়িয়ে দেখল।

—নতুন শাড়ি?

—হুঁ।

—কে দিল?

—কে দেবে? নিজেই কিনলাম।

—শাড়িটার অনেক দাম নিয়েছে?

—মন্দ না।

—আশি নব্বই?

—ওরকমই।

বউদি একটা শ্বাস ছাড়ে, বলে—ঠাকুরঝি, তোমার কত টাকা! তুমি কত স্বাধীন!

—তুমি কি গরিব? পরাধীন?

—তা নয়। তবে ইচ্ছেমতো কিছু কিনে আনব, তার তো উপায় নেই! যা করব, সব অনুমতি নিয়ে করতে হবে। তুমি বেশ আছ।

—এরকম 'বেশ' থাকতে চাও নাকি?

—চাই-ই তো।

—কেন?

—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সব সংসারটা হাটকে মাটকে দিয়ে চলে যাই। মেয়েমানুষ হওয়া একটা অভিশাপ।

—ওরকম সবাই বলে। আবার এ সব নিয়েই থাকে।

—তুমি তো থাকোনি।

সীতা দাঁতে ঠোঁট চাপে। আস্তে বলে—ও সব কথা থাক বউদি। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

বউদি চলে গেলে অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ফলসটার দিকে চেয়ে থাকে সীতা। ফুটপাতের দোকান থেকে কেনা ফলস মাপে অনেকটা ছোট হল, শাড়ির পুরো কুঁচিটা ঢাকা পড়বে না। খুব ঠকে সীতা। দেখেশুনে কেনে, তবু ঠিক ঠকে যায়। বরাবর। মনোরম খুব রাগ করত, বলত—মেয়েদের অভ্যাসই হচ্ছে সস্তা খোঁজা। সারা কলকাতা দু' নম্বর মালে ছেয়ে গেছে, আসল-নকল চিনবার উপায়ই নেই, কেন নিজে নিজে কিনতে যাও?

ফলসটায় ঠকে গেছে বলে সীতার মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। এতটাই খারাপ হল যে, উঠে বিছানায় গিয়ে শুল। এবং একটু পরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে মনে মনে প্রাণপণে তার কান্নার গূঢ় কারণটাও বোধহয় খুঁজে দেখছিল। কারণটা খুঁজে পেল একটু পরে। বউদি একটা কথা বলেছিল—তোমার কত টাকা। তুমি কত স্বাধীন। কথাটার মধ্যে কিছু নেই। তবু আছে। মনোরমের সর্বস্ব কেড়ে না নিলেও পারত সে। বীরু সেদিন বলছিল, মনোরম তার কৃপণ মামার কাঠগোলায় চাকরি করছে। বীরু ছেলেটা মুখ-পলকা। হেসে বলেছিল—আমার বাবার কাছে কাজ করা মানে কিন্তু সুখে থাকা নয়। জানো তো। না জানলেও বোঝে সীতা। সুখে নেই।

মানস আবার কাল চলে যাবে দিল্লি। চার-পাঁচ দিন পরে ফিরবে ফোন করল দুপুরে।

—আজ বিকেলে ফ্রি থেকো মৌ।

—আমি তো সব সময়ে ফ্রি।

—একটু ঘুরব।

—আচ্ছা।

—দিল্লি যাচ্ছি।

—জানি তো।

—ভাল লাগে না।

সীতা হাসল। শব্দ করে। যাতে মানস ফোনে হাসিটা শোনে।

—বেশি দিন তো নয়।

—তা নয়। দুঃখিত গলায় মানস বলে—কিন্তু সারাজীবনই এরকম মাঝে মাঝে আমাকে চলে যেতে হবে। ছেড়ে থাকতে পারব তো?

সীতা শ্বাস ফেলল, এবং সেটাও শুনতে পেল মানস। আবেগের সঙ্গে বলল—মাঝে মাঝে তোমাকেও নিয়ে যাব।

—যেয়ো।

—আমি সেই ক্লাবটা থেকে ফোন করছি।

—কোন ক্লাব?

—সেই ক্লাবটা, যেখানে সেদিন...হাসিটা ফোনে শোনাল মানস।

সীতা একটু হাসল।

মানস বলল—ইচ্ছে করলে আজ আবার আমরা এখানে আসতে পারি।

সীতা উত্তর দিল না।

—রেডি থেকো। পাঁচটায়।

কথা শেষ হয়ে যায়। তবু একটু ফোন ধরে থাকে দু'জন। পরস্পরের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনে।

ফোনে শ্বাসের শব্দ শুনলে সীতার কেমন একটু অন্যমনস্কতা আসে। ক'দিন আগে একটা ফোন কল কেটে গিয়েছিল। কেটে গিয়েছিল? নাকি কেউ সত্যি ছিল ওপাশে? একটা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনেছিল সীতা। ভুল? তাই হবে। কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে।

ফোন রেখে দেয়।

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বার বার সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছিল মানস। হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি নিবে যাচ্ছে বার বার। সীতা হাসছিল।

—ওভাবে নয়। হাত দুটো 'কাপ' করে নাও। সীতা বলে।

—কাপ? সেটাই তো হচ্ছে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকছে।

—থাক, খেতে হবে না।

—খাবই! এই ড্রাইভার রো্‌খ্‌কে।

ট্যাক্সি দাঁড়ালে সিগারেটটা ধরাতে চেষ্টা করে মানস। সীতা দেশলাই কেড়ে নেয়। নিজে যত্নে ধরিয়ে দেয়। ট্যাক্সি আবার চলে।

—কেন যে ছাই লোকে খায় এটা। কী আছে সিগারেটের মধ্যে?

বোধহয় ভালবাসা। মনে মনে এই কথা বলে সীতা। মুখ টিপে হাসে। দেখে, ধোঁয়া লেগে মানসের দুই হরিণ-চোখ ভরা জল।

—আর খেয়ো না।

—কেন?

—অভ্যেস নেই। কাশবে।

—আমার মুখে কি কোনও দুর্গন্ধ আছে সীতা?

—সীতা নয়, মৌ। তুমিই নাম দিয়েছিলে।

—সিগারেটের ধোঁয়ায় মাথা আবছা হয়ে গেছে। কিছু ভাবতে পারছি না। গন্ধ নেই তো?

—না তো! তোমার মুখের গন্ধ সুন্দর।

—তবে কেন সিগারেট খেতে বললে আমাকে?

—পুরুষেরা সিগারেট খায়, দেখতে আমার ভাল লাগে।

—শুধু দেখার জন্য একজনের না-খাওয়ার অভ্যাস নষ্ট করছ?

—খেয়ো না।

—রাগ করে বলছ?

—না, আমার অত সহজে রাগ হয় না।

—সিগারেট তো আমি খাচ্ছিই। অভ্যাস করে নেব।

—না। মাঝে মাঝে খেয়ো। পুরুষের মুখ কাছাকাছি এলে একটুখানি সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায়, সেটা ভীষণ ভাল লাগে।

—আচ্ছা! মনোরম খুব খেত না?

—খেত। কিন্তু তার সঙ্গে এটার কোনও সম্পর্ক নেই।

—জানি। সেদিনকার ওই লম্বা ছেলেটা কে?

—বীরু। আমার মামাশ্বশুরের ছেলে।

—তোমার মামাশ্বশুর? বলে মানস চেয়ে থাকে। খুব অবাক চোখ। সীতা অবাক হওয়ার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বলে—কী হল?

—মামাশ্বশুরের ছেলে?

—হ্যাঁ। দেওর।

—কী বলছ মৌ?

হঠাৎ খেয়াল হতে সীতা জিভ কাটে। ঠিক তো। তার আর কোনও মামাশ্বশুর নেই, দেওর নেই।

মুখ নিচু করে একটু লাজুক ভঙ্গি করল সীতা।

—ভুল হয়ে গিয়েছিল।

মানসকে একটু পাঁশুটে দেখায়। সিগারেটটা আধখাওয়া করে ফেলে দিয়ে বলে—ঠিক আছে।

—না, ঠিক নেই। তুমি রাগ করেছ। সীতা একটু ঘন হয়ে বসে।

—রাগ করিনি। তবে কেমন একটু লাগে। তুমি ঠিক ভুলতে পারছ না।

—ভুলছি। এইমাত্র সব ভুলে গেলাম। দেখ, আর এরকম হবে না।

মানস একটু থমথমে মুখে বলে—ভুলবে কী করে, যদি কলকাতাময় মনোরমের আত্মীয়তা ছড়ানো থাকে!

—ওর বেশি আত্মীয় নেই।

—নেই?

—না। ওর বুড়ো বাবা—বলে তাকিয়ে একটু হাসে সীতা, বলে—দেখ, শ্বশুর বলিনি কিন্তু।

মানস হাসে।

—ওর বুড়ো বাবা ওর ছোটভাইয়ের কাছে থাকে দূরের এক মফস্বল শহরে। সে বাড়িতে আমি মোটে বার দুই গেছি। ও বেশি সম্পর্কও রাখত না। মা নেই। এখানে যারা আছে, তারা সব মামা, মাসি, পিসি গোছের। সে সব সম্পর্কও আলগা হয়ে গেছে।

—তোমাকে আমি খুব দূরে নিয়ে গিয়ে থাকব।

—কেন? ওর আত্মীয়দের ভয়ে?

—হুঁ। আমার রেলের চাকরি। ইচ্ছে করলেই বদলি হতে পারি।

—আমার কলকাতা ভাল লাগে।

—কেন?

—আমার লাগে। একটা শখ আছে আমার, ঘুরে ঘুরে এ-জায়গা সে-জায়গা থেকে জিনিসপত্র কেনা। কিনতে যে কী ভীষণ ভাল লাগে! কলকাতা ছাড়া এরকম দোকান আর দোকান তো কোথাও নেই!

—আচ্ছা, তা হলে কলকাতাতেই থাকব। ফ্ল্যাট তো পেয়েছিই।

—আমি কিন্তু খুব জিনিস কিনি, আর ঠকে আসি।

—কিনো।

—ঠকলে বকবে না তো?

—না। মেয়েরা তো ঠকেই। কলকাতায় এই যে এত দোকান, এত ফিরিঅলা, এরা তো মেয়েদের ঠকিয়েই বেঁচে আছে।

—তুমি কত মেয়ে চেনো!

—একজনকে তো চিনি। তাকে চিনলেই সব চেনা হয়ে যায়।

—আমি একটা গ্লাটন। সামনে আস্ত একটা মুরগির রোস্ট, নিচু হয়ে সেটার গন্ধ শুঁকে বলল মানস।

—গ্লাটন মানে কী?

—লোভী। পেটুক।

—যাঃ। তুমি কি তাই?

—নয়?

—একদম নয়। তোমার শরীর আন্দাজে ওইটুকু আবার খাওয়া নাকি। একটা তো এইটুকুন মাত্র মুরগি।

—আস্ত মুরগি।

—হোকগে।

—খাওয়া কমাব, বুঝলে মৌ?

—কেন?

—তুমি খাবে এইটুকুন, আমি খাব অ্যাতো, সেটা কি ভাল দেখাবে?

—মোটেই তুমি অ্যাতো খাও না।
—খাই।
—খাও তো খাও।
—তবে তুমি খাওয়া বাড়াও।
—মেয়েরা বেশি খেতে পারে না।
—কে বলেছে? এসপ্ল্যানেডে বিকেলের দিকে মেয়েরা যা গপাগপ ফুচকা খায় না, দারা সিং অত তে পারবে না।
সীতা মুখে আঁচল তুলে হাসল।
—তুমি খাও না বলেই রোগা হয়ে অ্যানিমিক।
—স্লিম থাকাই তো ভাল। মোটা মেয়েরা বেশি ভোগে। আমার কোনও অসুখ নেই।
—তোমার ঠিক অ্যানিমিয়া আছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই ধরা পড়বে।
—থাকলে আছে।
—থাকবে কেন?
—থাকলে অপছন্দ নাকি? বিয়ে বাতিল করবে?
দু'জনে দু'পলক পরস্পরের দিকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলে।
—আইসক্রিমটা নাড়াচাড়া করছ মৌ, খাচ্ছ না।
—ভীষণ ঠাণ্ডা, দাঁত শিরশির করে। গলা বসে যাবে।
—তবে পকৌড়া খাও।
—ভাল লাগছে না। তুমি খাও, আমি দেখি।
আস্তে ধীরে খাচ্ছিল মানস, মাঝে মাঝে তাকিয়ে হাসছিল। একদৃষ্টে চেয়েছিল সীতা। সুন্দর মেদহীন চৌকো পুরুষ মুখশ্রী। কাঁধ দুটো কতদূর ছড়ানো। মস্ত হাত। দেখতে ভাল লাগে। অনেকদিন ধরে দেখছে সীতা। তবু এ নতুন করে দেখা। এ ভাবে দেখা হয়নি। এই ডবলডেকারের মতো মানুষটার কাছে সে পাখির মতো ছোট্ট। বোধহয় মানসের মাথা কোনওদিনই বুকে নিতে হবে না সীতার। এবার উল্টো নিয়ম হবে। তাকেই পাখির মতো বুকে নিয়ে শুয়ে থাকবে লোকটা। সারা রাত।
হঠাৎ সীতা আস্তে করে বলে—তুমি স্বপ্ন দেখ না?
—স্বপ্ন? একটু হাঁ করে চেয়ে থাকে মানস। তারপর অনেকক্ষণ বাদে হাসে—স্বপ্ন, মৌ? না, দেখি না। আমি খুব সাউন্ড স্লিপার। কেন?
—এমনিই। অনেকে ঘুমের মধ্যে কথা বলে।
—আগে থেকে সাবধান হচ্ছ? ভয় নেই, ও সব হয় তাদের যারা স্নায়ুর রোগে ভোগে।
—তাই!
আবার চুপ। দুজনেই। সীতা সাদা আঙুলে কাচের টেবিলে একটা শূন্য আঁকল। তারপর মুখ তুলে হাসল।
ট্যাক্সিটা বাঁক ঘুরতেই অন্ধকারের মধ্যে স্টিমারের মতো ঝলমল করে ওঠে ক্লাব। চারধারে যেন বা কালো নদী। স্টিমার চলেছে।
গাছগাছালিতে বাতাস মর্মরধ্বনি তুলেছে। আলোকিত টেনিস লন। সাইটস্ক্রিনের আড়ালে বলে দেখা যায় না কিছু। হঠাৎ পক করে বলের শব্দ আসে।
আজও কেউ বড় একটা ফিরে তাকায় না। তারা সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। টেবল-টেনিসের টেবিলে খুব ভিড় আজ। বহু খেলোয়াড়। চারদিকে বেয়ারাদের দ্রুত আনাগোনা।
মানস মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল—আজ শনিবার।
—তাতে কী?
—ভিড়।
—ও।

—শনিবারে কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে যায়।
—আমরাও কি শনিবারের পাগল?
—না। চিরকালের।
করিডোরে একজন লোক শ্লথ পায়ে আগে আগে হাঁটছিল। কথা শুনেই বোধহয় ফিরে তাকাল। অচেনা লোক। খুব ফরসা সুন্দর চেহারা, অবিকল সাহেবদের মতো। লালচে একজোড়া গোঁফ, লালচে চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। একটু হাসল কি লোকটা?
সীতা সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, সে কিছু অন্যায় করছে না। সে কোনও অপরাধ করেনি।
পিঠে মানসের আলতো হাত তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু ভয় নেই।
ঘরটা খালিই ছিল। ঠিক আগের দিনের মতো। মানস দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিল। ফিরে ইঙ্গিতময় হাসি হাসল একটু। ঠিক সেই মুহূর্তেই সীতার মনে পড়ে, ক'দিন আগে কেটে যাওয়া টেলিফোন কল। লাইনটা কি কেটে গিয়েছিল সত্যিই? না কি কেউ দীর্ঘশ্বাসই কেবল শুনিয়েছিল তাকে?
ভ্রূ আপনা থেকেই কুঁচকে গেল সীতার।
—কী হল? কিছু ভাবছ? মানস প্রশ্ন করে।
সীতা উত্তর দেয় না। শুনতেই পায় না প্রশ্নটা।
ঘরের একদিকে চমৎকার একটা পুরনো আমলের ড্রেসিং টেবিল। বেলজিয়ামের মসৃণ কাচ বসানো। সীতা ধীর পায়ে উঠে গিয়ে একটু দাঁড়াল আয়নার সামনে। অ্যানিমিক? বোধ হয়। তাকে খুব রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মিছে কথা বলেছিল সীতা মানসকে। তার আজকাল খুব অম্বল হয়, মাথা ধরে। হয়তো খুব শিগগিরই অসুখ হবে। আমার অসুখ নেই, এ কথাটা খুব ভেবে বলেনি সে। একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মানস। এতক্ষণে ওর পোশাকটা লক্ষ করেনি সীতা তেমন করে। খুব ঝকঝকে একটা চেক প্যান্ট পরনে, গায়ে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। বুকের চৌকো পাটা ফুটে আছে গেঞ্জির ওপর। বাঁ কাঁধটা ভাঙা, একটু নোয়ানো। খুবই বড় শক্তিমানের চেহারা। ওর পাশে সে কি আধখানা, না সিকিভাগ?
মানস এগিয়ে আসে।
সীতা আস্তে করে বলে—তোমাদের দু'জনের খুব অদ্ভুত মিল।
—কাদের দু'জনের কথা বলছ?
—তোমার আর ওর।
—ও কে?
—মনোরম।
—মিল?
—দুটো খুব অদ্ভুত মিল।
—কী?
—তোমাদের দুজনের নামই 'ম' দিয়ে শুরু। আর...
—আর?
—তোমাদের দুজনেরই একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।
মানস এগিয়ে এসেছিল অনেকটা, তবু দূরত্ব ছিল একটুখানি। সেই দূরত্বটা রয়েই গেল। মানসের মুখটা আস্তে আস্তে একটু গম্ভীর হয়ে যায়।
বলল—মৌ, আমাকে তুমি সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছ কেন?
—এমনিই। ভাল লাগে।
—না।
—তবে কেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সীতা।
—মনোরমের সঙ্গে আমার আরও মিল বের করতে।

—তার মানে?

—তুমি কি আমার মধ্যে মনোরমকেই চাও?

সীতা মূক হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

—ঝুমু, তুই বাসাটা ছেড়ে দে। আমার বাড়িতে চলে আয়। যা বাকি বকেয়া পড়েছে তা আমি দিয়ে দেব।

—কেন?

—ওয়াচ হিম। ওয়াচ হিজ স্টেপস।

—কোনও লাভ নেই।

—কেন?

—ওর ভিতরে কিছু সাহেবি ব্যাপার ঢুকে গেছে।

—সেটা কী?

—সব বুঝবার তোমার দরকার কী?

—আমার ছেলে, আর আমার বুঝবার দরকার নেই?

—জেনারেশন গ্যাপ বোঝো?

—বুঝব না কেন? বুঝি কিন্তু মানি না। ও সব বানানো কথা।

—হবে।

—ঝুমু, আমার কেবলই মনে হয় ও শিগগিরই নিজেকে শেষ করবে।

মনোরম চুপ করে থাকে।

—তুই সব সময়ে আমার আর ওর কাছাকাছি থাক ঝুমু।

—মানুষ তো আমি একটা, দু'জনের কাছে থাকব কী করে?

—সময় ভাগ করে নে। না, বরং তুই ওর কাছে কাছেই থাক। ওরই বিপদ বেশি।

—এ কথা বলছ কেন? কীসের বিপদ?

—ও তো কিছু বলে না, কিন্তু মনে হয়, ও একটা প্রবলেমের মধ্যে আছে।

—প্রবলেমের মধ্যে সবাই থাকে।

—কিন্তু বীরুর তো প্রবলেমের কোনও কারণ নেই। ভেবে পাই না, ওর প্রবলেমের কী থাকতে পারে! তাই মনে হয়, ওর বড় বিপদ।

বিপদ? না কিছুই খুঁজে পায় না, ভেবে পায় না মনোরম। ও খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায় না যে রোগ নিয়ে আসবে। ওর মেয়েবন্ধুরা অভিজাত পরিবারের। অবৈধ সন্তানের ভয় নেই, খোলা বাজারে বিক্রি হয় কন্ট্রাসেপটিভ। ওর প্রেমের কোনও ঝামেলা নেই, কারণ ঘুমের সময়ে ওর কারও মুখ মনে পড়ে না। জুয়ায় অনেক টাকা হেরে গেলেও ওর অনেক থাকবে।

প্রবলেমটা খুঁজে পায় না বটে মনোরম, কিন্তু খুঁজে ফেরে। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে ক্লান্তিহীন ছোটে বীরুর পিছনে। বীরু মুহুর্মুহু পোশাক কেনে, কেনে গ্রামোফোনের উত্তেজক ডিস্ক, ভাল হোটেলে খায়, নাচে, খেলে বেড়ায় বড় ছোট ক্লাবে, সাঁতরায়, মেয়েদের নিয়ে যায় অ্যাপার্টমেন্টে, মনোরম সারা কলকাতা বীরুর ফিয়াটটাকে তাড়া করে ফেরে। বীরু বিতর্কসভায় বক্তৃতা করে, ভিয়েতনামে মার্কিন বোমারু বিমানের কাণ্ডকারখানার হুবহু বর্ণনা দেয়, লাইফ ম্যাগাজিনের পাতা খুলে জনসাধারণকে দেখায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মর্মন্তুদ ছবি। কিন্তু কোথাও থেমে নেই বীরু। চলছে। চলবে।

অনেক রাতে যখন বাসায় ফেরে মনোরম, তখন ক্লান্ত লাগে। বড় ক্লান্ত লাগে। রাতে সে প্রায় কিছুই খায় না। দুধে পাঁউরুটি ভিজিয়ে বিস্বাদ দলাগুলি গিলে ফেলে। দু' ঘরেই জ্বেলে দেয় টিউবলাইটগুলি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। মাঝে মাঝে ওপরের দিকে চেয়ে দেখে।

কী দেখে মনোরম? দেখে নীলচে স্বপ্নের আলো। জানালার বুটিদার পর্দাগুলি উড়ছে বাতাসে। ঠিক মনে হয়, ঘরের ভিতরে রয়েছে তার প্রিয় মেয়েমানুষটি। সে কে? রিনা? চপলা? না কি এক প্রাণহীন মেমসাহেব-পুতুল প্রাণ পেয়ে ঘুরছে তার শূন্য ঘরে? সীতা নয় তো?

রক্তমাংসময় একজনকেই পেয়েছিল মনোরম। সীতা। যতক্ষণ সিগারেট না শেষ হয়, ততক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করে সে। কখনও দুটো-তিনটে সিগারেট ফুরিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে মনোরম। কাল্পনিক কথা, এক কাল্পনিক স্ত্রীর সঙ্গে। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায়। কল্পনাটা এমনই সত্যের মতো জোরালো হয়ে ওঠে যে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। গভীর রাতে নির্জন পূর্ণদাস রোডে কেউ তার সেই মূকাভিনয় দেখে না। দেখলে তারা দেখত, একজন প্রেমিক কেমন তার শূন্যনির্মিত নায়িকার সঙ্গে অবিকল আসল মানুষের মতো প্রেম করে।

রাত গভীর হলে সে তার ছয় বাই সাত খাটে গিয়ে শোয়। মস্ত খাট। বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে। ফুটপাথ থেকে দু' টাকা জমা রেখে আট আনা ভাড়ায় আনা ডিটেকটিভ বই খুলে বসে। হাই ওঠে। জল খায়। টেবিল ল্যাম্প নেবায়। শেষ সিগারেটটাকে পিষে মারে মেঝের ওপর। তারপর ঘুমোবার জন্য চোখ বোজে।

অমনি কল্পনায় ভিন্ন পৃথিবী জেগে উঠতে থাকে। শরীরের ভিতরে নিকষ কালো অন্ধকারে জ্বলে ওঠে নীল লাল স্বপ্নের আলো। অবিকল এক জনহীন প্রেক্ষাগৃহ। আসবাব টানাটানি করে কারা পর্দার ওপাশে মঞ্চে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পরদা সরে যায়। দীর্ঘ পৈঠার মতো ইস্কুলবাড়ির কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তাতে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে গায়—জয় জগদীশ হরে...

শূন্য বিছানায় তার প্রসারিত হাতখানা পড়ে থাকে। কিছুই স্পর্শ করে না।

সকাল দশটা থেকে কাঠগোলা। মাঝখানে একটু লাঞ্চ ব্রেক। মামাবাড়ি থেকে ভাত আসে। মামা-ভাগ্নে খায়। খেতে খেতে মামা বলে—ঝুমু, ওয়াচ হিম।

আজকাল বাঙালির কথা মামা ভুলে যাচ্ছে। নেতাজির কথাও। নিরুদ্দেশ সেই মানুষটির জন্য আর অপেক্ষা করতে ভয় পায় মামা। ফার্স্ট স্ট্রোক হয়ে গেছে। বীরু থেকে যাচ্ছে বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে।

ফিস ফিস্ করে একটা লোক কানের কাছে বলে—ব্যানার্জি না?

তখন বীরু তার গাড়িটা রেখে দ্রুতবেগে ঢুকে যাচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জে। অনুসরণ করতে করতে বাধা পেয়ে মনোরম থেমে ফিরে তাকায়। চিনতে পারে না। মস্ত একটা কাঠামোয় নড়বড় করে দুলেদুলে মাংস আর চামড়ায়। চোখের নীচে কালি। ক্লান্ত মানুষ একটা।

টেলিফোনে যেমন শোনা যায় মানুষের গলা, তেমনি, ফিসফিসিয়ে বলে—বিসোয়াস্ হিয়ার।

—বিশ্বাস! কী হয়েছে, চেনা যায় না?

—বলছি। খুব ব্যস্ত?

মনোরম মুখটা একটু বাঁকা করে হাসে—না। জাস্ট একজনকে চেজ করছিলাম।

—চেজ?

—অলমোস্ট ডিটেকশন জব। জিরো জিরো সেভেন।

—কাকে?

—এক বড়লোকের লক্কা ছেলেকে।

বিশ্বাস ক্ষীণ একটু হাসল—চা খাবেন?

—চা? বিশ্বাস, চায়ের কথা বলছেন? আপনাকে দেখেই একটা তেষ্টা পেয়েছিল, উবে গেল। অফ অল থিংস গরমের দুপুরে চা কেন?

—দি ওয়ার্ল্ড ইজ লস্ট ব্যানার্জি।

—কী হয়েছে?

—স্ট্রোক।

বিশ্বাস জোর করে চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। বসল দু'জন।

—স্ট্রোক? মনোরম বলে।

—স্ট্রোক।

—ব্যাপারটা কী রকম হয় বিশ্বাস?

—স্ট্যাবিং-এর মতো। বুকে। বিশ্বাস করবেন না। মনে হয় এতগুলো স্ট্যাবিং যদি বুকে হচ্ছেই, তবে মরছি না কেন?

—হুঁ?

—বিশ্বাস করবেন না। মৃত্যুযন্ত্রণা তবু মৃত্যু নয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তার ওপর ডায়েবেটিসটাও ধরে ফেলল এই বয়সে। হাঁটাচলা ছিল না তো, কেবল গাড়ি দাবড়াতাম। ব্যানার্জি, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

—শুনছি।

—আপনি একটা ওপেনিং চেয়েছিলেন। ম্যানেজারি করবেন?

—ম্যানেজারি, বিশ্বাস? এ নিয়ে গোটা দুই করেছি, কোনওটাতেই সুবিধে করতে পারিনি। আপনারটা থার্ড অফার।

—আমার ম্যানেজারিতে পারবেন। আমি বদ হলেও, কথা দিলে কথা রাখি।

—টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন?

—জানেন তো ব্যানার্জি, আমার বিজনেস খুব ক্লিন নয়। কিছু গোস্ট মানি খেলা করে। কাজেই—

—কী?

—ওয়াচ ইয়োর স্টেপস।

—সেই রসিদের বিজনেসটাও কি এর মধ্যে?

—এভরিথিং। আমার ব্যবসাগুলো ছোট, প্রত্যেকটার জন্য আলাদা ম্যানেজার রাখব কী করে? তবে টাকা দেব, ওভার অল প্রায় সাতশ। কিন্তু খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করবেন। কী, রাজি?

—দেখি।

—দেখি-টেখি নয়। আমি লোক খুঁজছি কতদিন ধরে। আজই কথা দিয়ে দিন।

—বিশ্বাস, এখন আমি যে চাকরিটা করছি তাতে আমি টায়ার্ড, একটা অল্পবয়সি ছেলেকে দিনরাত চেজ করা, ওর মতো স্পিড আমার নেই, হাঁফিয়ে পড়ি।

—চেজ করেন কেন?

—ওয়াচ করার জন্য, যাতে সে বিপদে না পড়ে। বিপদ কিছু নেই, তবু তার বাবার ধারণা সে বিপদে পড়বেই। তাই।

—খুব ফাস্ট লাইফ লিড করে?

—খুব। আমার এমপ্লয়ারের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

—আচ্ছা, কবে আসছেন?

—শিগগিরই।

—কিন্তু মনে রাখবেন, আমার ম্যানেজারি কিন্তু অন্ধকার জগতে। এভরিথিং ব্ল্যাক।

—জানি বিশ্বাস। চলি।

—শিগগিরই আসছেন?

—হুঁ।

মনোরম বিদায় নেয়।

আবার একদিন বীরুর পিছু নিয়ে সে এসে পড়ে সমীরের অফিসের সামনে। জোহানসন অ্যান্ড রো-র সাদা সম্ভ্রান্ত অফিস বাড়িটা। বীরুকে কলকাতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে দিয়ে মনোরম গাড়ি পার্ক করে। নামে। আঙুলে গাড়ির চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে ঢুকে যায় ভিতরে।

সমীর ঠিক সেদিনের মতোই সুকুমার কোমল মুখশ্রী তুলে বলে—আরে মনোরম!

মনোরম হাসে—কী খবর?

—তোমার খবর কী?
—একরকম।
—বোসো। চা খাও।
—না। আমি কাজে আছি।
—বোসো, একটু কথা আছে।
—কী?
—সীতার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে।
—কীসের?
—তুমি তো জানই যে ও বিয়ে করছে।
—আন্দাজ করেছিলাম। মানসকে?
—মানসকে। সীতা চাইছে তোমার বিজনেস-টিজনেস যা আছে ওর নামে, সব তোমাকে ফিরিয়ে দেয়।
—ফিরিয়ে দেবে? তবে নিল কেন?
—মানুষ তো ভুল করেই! ও বলছিল, এ সব যতদিন না ফেরত দিচ্ছে, ততদিন ও তোমাকে ভুলতে পারছে না। কাজেই তোমাকে ও অনুরোধ জানাচ্ছে, তুমি নাও। অভিমান কোরো না।

মাথাটা নিচু হয়ে আসে মনোরমের। সে কাচের নীচে সেই ছবিটা দেখতে পায়। বনভূমি, তাতে শেসবেলার রাঙা রোদ, উপুড় হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা গোরুর গাড়ি। আদিবাসী পুরুষ ও রমণীরা রাঁধছে।

সে মুখ তুলে বলল—এ সব জায়গায় আমি অনেকবার গেছি।
—কোন জায়গার কথা বলছ?
—এই যে ছবিতে। সাঁওতাল পরগনা, বিহার, উড়িষ্যায় এরকম সব অদ্ভুত বনে-জঙ্গলে আমি একসময়ে খুব ঘুরে বেড়াতাম।

সমীর করুণ চোখে চেয়ে থাকে।
—বিয়েটা কবে?
—ওরা খুব দেরি করবে না। মানস বোধহয় বদলি হয়ে যাচ্ছে আগ্রায়। বিয়ের পরেই সেখানে চলে যাবে। আমি সীতাকে কী বলব মনোরম? তুমি তো জানো, আমি কোনও ব্যাপারে নিজেকে জড়াই না। কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে সীতা এত কান্নাকাটি করেছিল যে, আমি কথা দিয়েছি তোমাকে কমিউনিকেট করব। তুমি না এলে আমিই যেতাম।
—কিছু ভাবিনি এখনও। দেখি।
—ও খুব শান্তিতে নেই।

মনোরম মনে মনে বলে—যতদিন পৃথিবীতে বনভূমি থাকবে, নদীর জলে শব্দ হবে, তত দিন ভুলবে না। ভুলবে।

বিদায় না নিয়েই একটু অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে এল মনোরম।

ট্রাম কোম্পানির বুথ থেকে টেলিফোন করল সীতার বাড়িতে। রিং-এর শব্দ হচ্ছে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে মনোরমের। সীতা কি কথা বলবে তার সঙ্গে? এরকম ঘটনা ঘটবে কি?

মেয়েলি মিষ্টি গলায় ভেসে আসে 'হ্যালো।'
—সীতা! দম বন্ধ হয়ে আসে মনোরমের। বুকে উত্তরোল ঢেউ।
—ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।

একটু পরে সীতা বলল—হ্যালো।

মনোরম কিছু বলতে পারে না প্রথমে।

সীতার গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—কে?

মনোরম চোখ বুজে, আস্তে আস্তে বলে যায়—মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...
—কে? চিৎকার করে ওঠে সীতা!

মনোরম ফোন রেখে দেয়।

ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে কবে! সময় কত তাড়াতাড়ি যায়।

সীতা সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। খুশি হবারই কথা মনোরমের। মামার গাড়িটা নিয়ে বীরুকে তাড়া করতে করতে এক সময়ে ক্লান্তি লাগে তার। পিছু-নেওয়া ছেড়ে সে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় অন্য রাস্তায়। আপনমনে ঘুরে বেড়ায়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে এল চাঁদনি চকে। তার দোকানটা এখানেই। নেমে সে দোকানঘরে উঠে এল। মনোরমের আমলে সাকুল্যে চারজন কর্মচারী ছিল। এখন বেড়েছে। পুরনোর কেউ নেই। চমৎকার সানমাইকা লাগানো কাউন্টার, দেয়াল ডিসটেম্পার করা, ডিসপ্লে বোর্ড, কাচের আলমারি। সীতার দাদা ব্যবসা ভালই বোঝে। অনেকটা বড় হয়েছে দোকান। রমরম্ করে চলছে। ভাল জামাকাপড় পরা একজন অল্পবয়সি ছোকরা কাউন্টারের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনোরমকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—বলুন।

মনোরম গ্রাহ্য করল না। চারদিকে চেয়ে দোকানঘরটা দেখল। দোকানের নাম এখনও এস ব্যানার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। সীতা এখনও ব্যানার্জি নামে সই করে। আপনমনে একটু হাসে মনোরম। কাউন্টারের ছেলেরা চেয়ে থাকে।

বাইরে একটা টেম্পো থেমেছে। কুলিরা মাল তুলে দিয়ে যাচ্ছে দোকানে। ছেলেটা ওপাশটায় গেল।

একা দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। এই দোকান-টোকান সবই সে উপহার দিয়েছিল সীতাকে। কিছু আয়কর ফাঁকি দিয়েছিল বটে, তবু তার ব্যবসাটা ছিল পরিষ্কার, দাগহীন এবং সৎ। এ সব আবার তাকে ফিরিয়ে দিলে সীতা তাকে ভুলে যেতে পারবে। পারবে কি?

কেন ভুলতে দেবে মনোরম? দেবে না। সে ফিরিয়ে নেবে না কিছুই। বিছানায় যখন মানস ঝুঁকে পড়বে সীতার ওপর, একদিন চুপি চুপি ঠিক মানসের শরীরে ভর করবে মনোরম। ভূতের মতো। থাক। মনোরম কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তার চেয়ে সে বিশ্বাসের অন্ধকার, বিপজ্জনক ব্যবসায় নেমে যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বেরিয়ে এসে গাড়ি ছাড়ে সে। মনটা হঠাৎ ভাল লাগে। আজ সে সম্পূর্ণ দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিতে পারল।

সমীরকে ফোন করল সে।

—শুনুন, আমি বিজনেস ফেরত নেব না। কিছুই নেব না।

—কেন মনোরম?

—শুনুন, আপনি হয়তো ঠিক বুঝবেন না ব্যাপারটা। তবু বলছি। সীতা ব্যবসা কেড়ে নিয়ে আমার ক্ষতিই করতে চেয়েছিল। ম্যানেজারি থেকে বরখাস্ত করেছিল আমাকে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। আমি মরে যাইনি। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা মানুষের হয় তা টাকাপয়সার নয়, বিষয়-সম্পত্তিরও নয়। মানুষ হারায় তার সময়।

—কী বলছ, বুঝতে পারছি না।

—আমার হারিয়েছে, ক্ষতি হয়েছে কেবলমাত্র সময়ের। সীতা আমার বিজনেস ফিরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু হারানো সময়টা কে ফিরিয়ে দেবে? এক বছরে আমার বয়স বেড়ে গেছে ঢের। কিছু শুরু করব আবার, তা হয় না। আমি পারব না। ওকে বলে দেবেন।

—তুমি আর একবার ভেবে দেখো।

—একবার কেন? আমি আরও বহুবার ভাবব, সারাজীবন ধরে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। আমি আমার এক বন্ধুর ব্যবসায়ে নামছি। ব্যবসা বন্ধুর, আমি সেখানে চাকরি করব। অ্যান্ড দ্যাটস অল।

ফোনটা করে খুবই শান্তি পায় মনোরম।

—তুই আমাকে ছেড়ে যেতে চাস ঝুমু? মামা একদিন ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বলে। মামার রোগা

চেহারাটা আরও একটু ভেঙে গেছে। চোখের নীচে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম কালো রেখা সব ফুটে উঠেছে। সম্ভবত শিগগিরই আবার স্ট্রোক হবে মামার।

—বীরুর সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি কি পারি মামা? ওর কত কম বয়েস, কত স্পিড ওর। কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে বীরু! আমি কি পারি পাল্লা দিতে? আমার বয়সও হল।

—কিন্তু তুই-ই বীরুকে ফেরাতে পারিস। আমি দেখেছি ও তোর সঙ্গে কথা-টথা বলে, হাসে, ঠাট্টা করে। অবিশ্বাস্য। ও যে কারও সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারে তা জানতামই না। আমার বড় আশা ছিল, তুই কিছু একটা পারবি।

মনোরম একটু ভেবেচিন্তে বলে—মামা, বীরুর পিছু-নেওয়ার চাকরি একদিন তো শেষ হবেই। একদিন বীরু ঠিকই ব্যবসা-ট্যবসা বুঝে নেবে। তখন আমার চাকরিও শেষ হয়ে যাবে।

—না। তোকে আমি ম্যানেজার করব।

—কেন করবে? আমি যে কাঠের কিছুই জানি না। কিছুই শিখলাম না। বীরু মালিক হলে যে আমাকে রাখবে তারও কিছু ঠিক নেই। বয়সও হয়ে যাবে ততদিনে। পথ বন্ধ হয়ে যাবে সব। তার চেয়ে এখনই আমাকে ছেড়ে দাও।

—যেখানে যাচ্ছিস সেখানেও তো চাকরিই করবি।

—প্রথমে তাই কথা ছিল। পরে আমি কষাকষি করে আমাকে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে নিতে রাজি করিয়েছি। কমিশন পাব।

—কীরকম ব্যবসা?

—ব্ল্যাক। ভীষণ কালো। জাল-জোচ্চুরি-স্মাগলিং সবই আছে।

—যাবি?

—যাব না কেন? আমার এ বয়সে আর ভাল বা খারাপ কিছু হওয়ার নেই।

—যাবিই? বীরুর একটা কিছু ব্যবস্থা করে যা। ওকে ফেরা।

—কোথায় ফেরাব মামা? আমার তো ওকে কিছু শেখানোর নেই। ও আমার চেয়ে দশগুণ বেশি পড়াশুনো করেছে। অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ভয়ংকর আত্মবিশ্বাসী। ওকে আমি কোথায় ফেরাব? ও আমাকে উড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। বরং ও-ই আমাকে টেনে নিচ্ছে ওর দিকে। দেখো, এই বয়সে আমি লম্বা চুল আর জুলফি রাখছি, পরছি বেলবটমের সঙ্গে পাঞ্জাবি। আর কিছুদিন বীরুর পিছু নিলে আমিই বীরু হয়ে যাব।

—আর কিছুদিন থাক ঝুমু। আমার জন্যই থাক।

—আমার বাড়িভাড়াটা এখনও বাকি পড়ে আছে মামা।

—আজই নিয়ে যাস। ভূপতিকে বলে রাখছি। থাকবি? কিছুদিন?

—দেখি। বিশ্বাসকে একটা খবর দিয়ে দিতে হবে। ওরও স্ট্রোক, খুব ভেঙে পড়েছে। সময় দিতে চাইছে না।

—ওই বিপদের ব্যবসাতে কেন যাবি ঝুমু?

—কিছু তো করতেই হবে মামা। ওপনিং কোথায়? বাজার তো দেখছ! তা ছাড়া বিপদই বা কী, সবাই করছে।

মামা খুব গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আস্তে করে বলে—তোর সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক ছিল না আমার। আজকাল আত্মীয়তার গিঁট তো আলগা হয়েই যাচ্ছে। কিন্তু এ ক'দিনে তোর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে ঝুমু। তুই চলে যাবি ভাবলে বুকটা কেমন করে। আমি কেবল তোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলাম। তোর দিকটা ভাবিনি। ঝুমু, তোর জন্য কী করব বল তো?

—কী করবে? আমার খুব অসময়ে তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

—স্ট্রোক-ফোক হলে ওই সেন্টিমেন্টটা খুব বেড়ে যায়, জানিস? ভীষণ বেড়ে যায়। স্ট্রোক হচ্ছে গাড়ি ছাড়বার ফার্স্ট ওয়ার্নিং, তখনই মানুষ গাড়ির জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বেশি করে আত্মীয়দের মুখ দেখে নেয়।

—চুপ করো। বিরক্ত হয়ে মনোরম উঠে যায়। কাঠগোলার পিছনে একটু পরিষ্কার জায়গায় গিয়ে

সিগারেট ধরায়। করাত-কলের মিষ্টি ঘসটানো শব্দটা আসে।

বর্ষা যায়। শরৎ যায়। শীত আসি-আসি করে। বিশ্বাস ফোনে তার ফিসফিস স্বরে বলে—ব্যানার্জি, আর কত সময় নেবেন? আমি আর পারছি না।

—আর ক'টা দিন, বিশ্বাস। মনোরম বলে—আর একটু সময় দিন।

—সময় কে কাকে দেয় মশাই! সময়ের কি ট্রানজাকশন হয়? সময় ফুরোয়। ব্যানার্জি, একটা ফাইনাল কিছু বলুন। অন্য লোক নিতে ভরসা হয় না। এ ব্যবসাতে ফেইথফুল লোক না হলে...আমি আর কত অপেক্ষা করব ব্যানার্জি? টেল সামথিং।

—একটু, আর একটু...

আজকাল প্রায় একটা জিনিস লক্ষ করে মনোরম। বীরু মাঝে মাঝে তার ফিয়াট দাঁড় করায় ওষুধের দোকানের সামনে। কী যেন কিনে আনে, তারপর আবার গাড়ি ছাড়ে। প্রায় দিনই, প্রতিদিনই বীরু আজকাল কাণ্ডটা করে।

কী কেনে ও? ঘুমের ওষুধ নয় তো!

মনোরম সতর্ক হতে থাকে। একদিন বীরু ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মনোরম গাড়ি থেকে নেমে ঢুকল দোকানটায়।

—একটু আগে যে লম্বা ছেলেটা এসেছিল, ও কিছু কিনল?

কাউন্টারের আধবুড়ো লোকটা কাগজ পড়ছিল। মুখ তুলে একটু বিস্ময়ভরে বলে—হুঁ।

—কী?

—অনেকগুলো ট্র্যাংকুলাইজার, কয়েকটা ঘুমের ওষুধ, নিউরোসিসের জন্য কয়েক রকমের বড়ি।

—প্রেসক্রিপশন?

—ছিল না। এ সব কিনতে আজকাল আর প্রেসক্রিপশন লাগে না। সবাই নিজের নিজের ডাক্তার।

—অসুখটা কী?

লোকটা মাথা নাড়ল—কে জানে মশাই! জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—কারণ আছে। ও একটু ডিসব্যালান্সড।

লোকটা নিজের নাকটা মুঠোয় ধরে বলল—এ সব ড্রাগই আজকাল মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে। রোগটা বোধহয় পাগলামি। দেশে পাগল বাড়ছে।

মনোরম বেরিয়ে আসে। আকাশ ভরা রোদ। এখন হেমন্তকাল। কলকাতা এখন পাখির বুকের মতো কবোষ্ণ। গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে তার কাঁধে ব্যথা, কোমর ধরে আছে, মাথা ভার। হেমন্তের সুন্দর আলোতে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াতে পারলে বেশ হত। কিন্তু জগদ্দল গাড়িটা রয়েছে সঙ্গে আর সামনে উধাও বীরু।

ক্লান্তভাবে আবার গাড়িতে ওঠে সে। ছাড়ে। ক্লান্তিহীন বীরু কি ধরা পড়ল বয়সের হাতে? নাকি অসুখ? কিংবা কর্মফল? ওষুধ কিনছে। পাগলামির ওষুধ, নার্ভের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ! বড় অবাক কাণ্ড। মনোরমের ভ্রূ কুঁচকে যায়। চিন্তিতভাবে সে চেয়ে থাকে সামনের রাস্তায়। চলন্ত গাড়িটা গিলে ফেলছে রাস্তাকে।

রাতে খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে আজ। সেটা টের পাওয়ার কথা নয়। বীরুর পিছু পিছু অনেক রাত পর্যন্ত ধাওয়া করে করে অবশেষে প্রায় রাত সাড়ে বারোটায় বীরুর গাড়ি ঢুকল রিচি রোডে। তখন লোডশেডিং। সেই অন্ধকারে হঠাৎ বানডাকা জ্যোৎস্না দেখতে পেল মনোরম।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বীরু গাড়ি দাঁড় করাল না আজ। একটু এগিয়ে গেল। বাঁ ধারে একটা মস্ত

ফাঁকা পার্ক। হিম পড়েছে। কেউ কোথাও নেই। বীরু নামল। দুধের মতো সাদা পোশাক পরেছে বীরু। সাদা ঢিলে বুশশার্ট, সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো। জ্যোৎস্নায় ওর লম্বা, সাদা অবয়বটা অপ্রাকৃত দেখায়।

গাড়ি ফেলে রেখে বীরু লম্বা পায়ে রেলিং ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল। খুব ধীরে হাঁটছে। মাঠের মাঝখানে চলে গেল। দাঁড়াল। আড়মোড়া ভাঙছে। স্লো-মোশন ছবির মতো নড়াচড়া করছে। জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশায় একটু আবছা। গাড়ির অন্ধকারে বসে মনোরম দেখতে থাকে। বীরু এক-পা এক-পা করে দৌড়ে ক্রিকেটের বোলারের মতো হাত ঘোরাল। ব্যাটসম্যানের মতো মারল বল। দু' পায়ে একটি জটিল দ্রুত নাচ নেচেই থেমে যায়। ডিসকাস ছোড়ার ভঙ্গি করে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে হাঁটে, ঠিক যেমন চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল। ঘুরে দাঁড়ায় আবার। স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় যেন চেয়ে আছে মনোরমের গাড়ির দিকেই। দেখছে।

মনোরম গাড়ির দরজা খুলে নামল। গরম জামা পরেনি, একটু শীত করে। রেলিংটা টপকায় মনোরম। হাঁটতে থাকে। কী জ্যোৎস্না, কী জ্যোৎস্না! নীলাভ হলুদ কুয়াশায় মাখা স্বপ্নের আলো। সেই আলোতে ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা অপরিচিত মানুষের মতো লম্বা সাদা অবয়ব বীরুর। স্থির দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে মহাকাশের সাদা পোশাক।

—বীরু।

—এসো। ভাবছিলাম, তোমাকে ডাকব।

—তুই জানিস যে আমি তোর পিছু নিই?

—আগে জানতাম না। ক'দিন হয় জানি। জেনেও প্রথম ভেবেছিলাম অচেনা কেউ চেজ করছে। তাই একটু চমকে গিয়েছিলাম। তারপর লক্ষ করলাম, তুমি।

—আমার দোষ নেই। মামার অর্ডার।

—বাবা কিছু জানতে চায়?

—চায়।

—আমাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিতাম। এত কষ্ট করতে হত না তোমাকে।

—কষ্ট কী? এটাই আমার চাকরি।

—বুঝতে পারছি। তোমার জন্য কষ্ট হয়।

—মামা যেদিন তোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে, সেদিন আমার এ চাকরিটা শেষ হবে। তখন হয়তো আমি কাঠগোলার ম্যানেজারি পাব। নয়তো একটা বাজে, বিপজ্জনক অসৎ ব্যবসাতে নেমে যাব। ও দুটো চাকরির চেয়ে এটা বোধ হয় একটু বেটার ছিল। তবে ক্লান্তিকর। তুই বড্ড স্পিডি।

বীরু তেমনি ধীর ভঙ্গিতে একটু হাঁটছে এদিক ওদিক। অদ্ভুত প্রাকৃতিক আলোতে ও হাঁটছে বলে মনে হয় না। যেন একটু জমাট, লম্বাটে একটা কুয়াশায় তৈরি ভৌতিক মূর্তি দুলে দুলে যাচ্ছে।

—বাবা কোনওদিনই আমার সব জানতে পারবে না।

—সেটা মামা স্বীকার করে না। কিন্তু বোঝে। তাই আমাকে লাগিয়েছে মামা। তার বিশ্বাস, আমি তোমাকে বুঝব। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে আমি এখন পাক্কা জেমস বন্ড হয়ে গেছি।

বীরু হাসল। মসৃণ কামানো গালে জ্যোৎস্না ঝিকিয়ে ওঠে একটু।

—তুমি কী বুঝলে? শান্ত স্বরে জিগ্যেস করে বীরু।

—কিছু না।

—কী বুঝতে চাও?

—তুই ওষুধ কিনছিস কেন? ও সব ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া খুব ডেঞ্জারাস।

—আজকাল সব ওষুধের পোটেন্সি এত কমিয়ে দেয় ওরা যে কাজ হয় না।

ধীরে ধীরে হেঁটে বীরু একটু দূরে যায়। আবার দুলে দুলে কাছে আসে। মনোরমের ভয় হয়, বুঝি বীরু জ্যোৎস্না আর কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে।

—বিয়ে করবি না বীরু?

—করব হয়তো কখনও।

—গৌরীকে করিস।

বীরু হাসল। বলল—তুমিই গৌরীর প্রেমে পড়ে গেছ।

—বোধহয়। তুই বলেছিলি কষ্ট হওয়াকেই ভালবাসা বলে। আমারও কষ্ট হয় ওই মেয়েটার জন্য।

—বিয়ে করে কী হবে?

—আমি তোর অনেক কিছু নকল করেছি বীরু। পোশাক, চুল, জুলফি, গাড়ির স্পিড। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে তোর কাছে শিখেছি অনেক। কেবল তোর ক্রুয়েলটিটা শিখতে পারছি না। তুই এ মেয়েটাকে ভাল না বেসে পারিস কী করে?

টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকে বীরু। প্যান্টের পকেটে দুই হাত। একটুক্ষণ স্থির থাকে।

—আমি খুব নিষ্ঠুর?

—মনে হয়।

—ইদানীং আমি খুব নেশা করছি। গাঁজা, আফিং, এল-এস-ডি, কিছু বাকি নেই। কিছু হয় না তাতে।

—কেন করছিস?

—টু ফরগেট সামথিং।

—কী?

—তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলছ? কেন? তুমি আমার কতটুকু জানো?

—কিছুই না। বীরু, আমার মনে হচ্ছে দিনে দিনে তুই আমার আরও অচেনা হয়ে যাচ্ছিস। এখনই তোকে আমার পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, যেন বা তুই অন্য গ্রহের লোক। আমি তোর মতো হার্টলেস হতে চাই। আমাকে শিখিয়ে দে।

বীরু হাসে। যথারীতি কোমল জ্যোৎস্নার লাবণ্য ওর কেঠো মসৃণ গালে এক ফোঁটা মোমের মতো ঝরে পড়ল। বলল—কেন হার্টলেস হতে চাও?

মনোরম বলে—আমরা কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে পাগল হতাম। এখনও দ্যাখ, বউয়ের দুঃখ ভুলতে পারি না। তুই কত মেয়েকে ভুলে যাস, আমি একজনকেই পারি না।

—আমি একটা জিনিস ভুলতে পারছি না।

—কী?

—যাদবপুর রেল স্টেশনে এক বান্ধবীকে তুলতে গিয়েছিলাম গাড়িতে, ট্রেনের দেরি ছিল, কথা বলছিলাম দু'জনে। ভালবাসার কথা। নকল কথা সব। লাইক কসমেটিকস। ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনের একদিকে শেড-এর তলায় গেছি, বান্ধবীটি হঠাৎ দু'পা সরে এসে বলল—মাগো, ওটা কী? দেখলাম, একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে ভিখিরিদের বিছানায়। এত রোগা যে ভাল করে না নজর করলে দেখাই যায় না। ঠিক কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো দুখানা হাত নোংরা কাঁথার স্তূপ থেকে শূন্যে উঠে একটু নড়ছে, অবিকল সেইরকমই দুখানা পা। এত নির্জীব যে খুব ধীরে ধীরে একটু একটু নড়ে, আবার কাঁথায় লুকোয়। তার গায়ের চামড়া আশি-নব্বুই বছরের বুড়োর মতো কোঁচকানো, দুলদুল করছে। হিউম্যান ফর্ম, কিন্তু কী করে বেঁচে আছে বোঝা মুশকিল। চমকে যাই যখন দেখি, তার উরুর ফাঁকে রয়েছে পিউবিক হেয়ার, পুরুষাঙ্গ। বাচ্চা ছেলের তো পিউবিক হেয়ার থাকার কথা নয়। একটা উলোঝুলো বুড়ি বসে উকুন মারছিল, সে নিজে থেকেই ডেকে বলল—ষোলো বছর বয়স বাবু, রোগে ভুগে ওই দশা। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ন নেই।—কিছুই না ব্যাপারটা, কিন্তু সেই থেকে ভুলতে পারি না।

—কেন বীরু?

—কী জানি! কলকাতায় ভিখিরি-টিকিরি তো কত দেখেছি! কত কুঠে, আধমরা, ডিফর্মড। কিন্তু এটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে, চমকে উঠি। পিউবিক হেয়ার সমেত একটা বাচ্চা তার কাঁকড়ার মতো হাত পা নাড়ছে। ভীষণ ভয় করে। যত দিন যাচ্ছে, তত সেঁটে বসে যাচ্ছে ছবিটা মনের মধ্যে। কী যে করি!

মনোরম কী বলবে! চুপ করে থাকে।

বীরু মহাকাশচারীর মতোই চাঁদের মাটিতে হাঁটে। ভ্রূ কুঁচকে বলে—বুদ্ধদেব যেন কী কী দেখেছিল? বার্ধক্য, রোগ, মৃত্যু আর সন্ন্যাস, না?

—বোধহয়।

—পিউবিক হেয়ার সমেত বাচ্চা ছেলের ফর্ম দেখলে বুদ্ধদেব কী করত বলো তো?

—কী জানি!

—পাগল হয়ে যেত। কিন্তু আমি কী করি? কী করি বলো তো?

—কী করবি?

—ভাবছি। আস্তে আস্তে অপ্রাকৃত চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়ায় সাদা দীর্ঘ অবয়ব। আস্তে করে বলে—নিষ্ঠুর নই, বুঝেছ? বাড়ি যাও।

—কেন?

—আমি একটু একা থাকি।

পকেটে হাত, চিন্তিত মুখটা নোয়ানো, বীরু আস্তে আস্তে কুয়াশার শরীর নিয়ে ঘোরে। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময়ে দূর থেকে দৃশ্যটা অস্পষ্ট দেখে মনোরম।

॥ ছয় ॥

অনেক অসুখে ভুগে উঠল সীতা। টাইফয়েড হয়েছিল, তার সঙ্গে স্নায়বিক রোগ, জ্বর সেরে যাওয়ার পরও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না।

আজকাল বারান্দা পর্যন্ত যেতে পারে সে। গায়ে একটা পশমি চাদর জড়িয়ে রেলিং ধরে বসে থাকে চেয়ারে। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে দুর্বলতায়। হাতে পায়ে শীত। সারা গায়ে খড়ি উঠছে। শরীরের সমস্ত রক্ত কে যেন সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে। এত সাদা দেখায় তাকে। কাগজের মতো পাতলা হয়ে গেছে সে। যেন ওজন নেই।

বিয়েটা পিছিয়ে গেছে। আদ্রায় জয়েন করেছে মানস। কোয়ার্টার পেয়েছে। মাঝে মাঝে আসে। পাতিয়ালার কোচিং-এ সে যাচ্ছে না। যেতে ভয় পায়।

বলে—আমি চোখের আড়াল হলেই না জানি তুমি কী ঘটিয়ে বসবে!

—কী ঘটাব!

—কী জানি! ভয় করে। তোমাকে অসুখের সময়ে দেখে মনে হত পুটুস করে মরে যাবে বুঝি! সাদা হাতে নীল শিরা দেখা যাচ্ছে, চোখে কালি, শ্বাস ফেলছ না-ফেলার মতো। কী যে আপসেট করে দাও।

এক এক সময়ে আদ্রার কথা ভাবতে ভালই লাগে সীতার। সেখানে বোধহয় নির্জনতা আছে। বনভূমি, একটা কলস্বরা নদী। কলকাতার মতো সেটা দোকানের শহর নয়। না হোক। তবু সেখানে ভুতুড়ে টেলিফোন যাবে না!

আবার মনে হয়, কলকাতা ছেড়ে যাবে? সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনা, সে যে কী ভাল! কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস, ঠকে আসবে, তারপর দাঁতে ঠোঁট কামড়াবে, আবার পরদিন বেরোবে ঠকতে, কণ্টকিত শরীরে মাঝে মাঝে শুনবে সেই গোস্ট কল। গোস্ট? হবেও বা।

সেরে উঠছে সীতা, আজকাল এ সব রোগ সহজেই সারে।

একটা ম্যাক্সি কিনেছিল সীতা শখ করে, বহুদিন আগে। সুটকেশ ঘাটতে গিয়ে টেনে বের করল। ফুল ভয়েলের ওপর পিঙ্ক লাল আর কালো চমৎকার নকশা, হাতে সূক্ষ্ম লেসের ফ্রিল। ম্যাক্সি পরার কথা তার নয়। পরবার জন্য বা ব্যবহার করার জন্য নয়, শখ করে কত অকাজের জিনিসই সে যে কেনে?

ম্যাক্সিটা বুকে করে সে আয়নার সামনে এল। খুব রোগা হয়ে গেছে সে। সাদা। কিন্তু তার মুখে অসুখের ফলে কোনও বুড়োটে ছাপ পড়েনি। বরং যেন বা বয়স কমে গেছে তার। বালিকার মতো দেখাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে আসে সীতা। শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সিটা পরে নেয়। পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুল। শরীরটা একটু আঁট বুঝি। ঘুরেফিরে আয়নায় দেখে সে নিজেকে। ওমা, সে তো আর যুবতী নেই। একদম না।

ঠিক কিশোরী সীতা। পাতলা, ফরসা, ছোট্টটি। বুকটা দেখে হেসে ফেলে সে। স্তনভার নেই। বোঝাই যায় না বুকে কিছু আছে। শুধু দুধারে কুঁচির ওপর একটু একটু ঢেউ। ঠিক প্রথম যেমন হয়। আস্তে আস্তে পা ফেলে আয়না থেকে দূরে গেল সীতা। দেখল। কাছে এল। দেখল। কোনও ভুল নেই। সেইরকম অবিকল, যেমন সে ছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে ভাবতে বসল সীতা। পশ্চাৎগামী রেলগাড়ির মতো সে ফিরে যাচ্ছিল সেই বয়সে। নানা বয়সের স্মৃতি চলন্ত রেলগাড়ি থেকে আলোর চৌখুপি ফেলে যাচ্ছে।

একদিন দুপুরে টেলিফোন এল।

—মিসেস লাহিড়ি আছেন?

—লাহিড়ি! না তো! লাহিড়ি কেউ নেই। রং নাম্বার।

সীতা ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল।

ওপাশে কণ্ঠস্বরটা আঁতকে উঠে বলে—না, না, রং নাম্বার নয়! আপনি কে বলুন!

—আমি! অবাক হয়ে সীতা বলে—আমি সীতা ব্যানার্জি!

—ব্যানার্জি? কণ্ঠস্বরটা যেন বিষম খায়, বলে—মৌ, তুমি এখনও ব্যানার্জি?

—ওঃ। বলে ভয় পেয়ে চুপ করে যায় সীতা।

—কী?

—ভুল হয়েছিল।

অধৈর্যের গলায় মানস বলে—মৌ, ডিসগাস্টিং।

—ভুল তো মানুষ করেই। আমি ভাবলাম বোধহয় এজেন্সির ব্যাপারে কেউ কিছু জানতে চাইছে। এজেন্সিটা তো ওই নামেই।

—ঠিক আছে। ক্ষমা করলাম।

—কখন এসেছ কলকাতায়?

—সকালে। কিন্তু এবার দেখা হচ্ছে না, এক্ষুনি বার্নপুরে যাচ্ছি। ফোন করছি হাওড়া থেকে। অল ইন্ডিয়া মিট, ভীষণ ব্যস্ত। কেমন আছ?

—ভাল।

—আমাকে ছেড়েও ভাল?

—না, না, তা বলিনি। এমনি ভালই।

—ভাল থাকো, ছেড়ে দিচ্ছি।

ম্যাক্সিটা মাঝে মাঝে বের করে পরে সীতা। বালিকা সেজে বসে থাকে। দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে দেয়। আয়নায় তাকিয়ে হাসে। একটা পশ্চাৎগামী রেলগাড়ি তাকে তখন তুলে নিয়ে যায়, আলোর চৌখুপিগুলি নানা রং ফেলে যেতে থাকে।

সীতা আস্তে আস্তে আবার রাস্তায় বেরোয়, একা একা চলে যায় গড়িয়াহাটা, এসপ্ল্যানেড, নিউমার্কেট, হাতিবাগান। ঘুরে ঘুরে কেনে কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস। ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে।

মাঝে মাঝে একটা চমকা ভয় বুক খামচে ধরে। চলে যেতে হবে কলকাতা ছেড়ে? সে কলকাতার বাইরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না যেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে তার কখনও ভাল লাগেনি। একবার লেগেছিল। শিমুলতলায়।

॥ সাত ॥

আজকাল ঘুমের মধ্যেও মনোরম একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পায়—ফলো হিম, ঝুমু, ওয়াচ হিম।

অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে মনোরম পাশ ফেরে। নিস্তব্ধ গলায় ঘুমের মধ্যেই বলে—আমি কি পারি মামা? ওর সঙ্গে আমি কি পারি?

—ও যে মরবে ঝুমু! ও যে শীগগির মরবে! একদিন ওর ডেডবডি ধরাধরি করে নিয়ে আসবে রাস্তার লোক।

—মরে যদি কে ঠেকাবে?

—তুই ঠেকাবি ঝুমু। ফলো হিম।

—আমার যৌবন বয়স শেষ হয়ে গেছে মামা। অত স্পিড আমি কোথায় পাব? আমি তত বড় নই যে ওকে ঢেকে রাখব, বা ওকে আড়াল করব।

—দয়া কর ঝুমু, তুই পারবি। তোর মতো ওকে কেউ বোঝে না। আমিও না।

—কী বুঝেছি মামা? কখনও মনে হয় ও চাঁদের মাটির ওপর হাঁটছে, ঠিক যেমন নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল চাঁদে। কখনও মনে হয়, ও এক অন্য গ্রহ থেকে আসা মানুষ, জ্যোৎস্নামাখা হলুদ কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে। মামা, বীরু কি রিয়ালি?

—কী বলছিস ঝুমু? রিয়াল নয়?

—বীরু নামে সত্যিই কেউ আছে?

—নেই! কী বলিস তুই! বীরু নেই?

—আছে হয়তো। অন্য পৃথিবীতে।

—তুই কি পাগল? অন্য পৃথিবী আবার কী?

—জানো তো টেলিফোনের একটা তার-এ হাজার ফ্রিকোয়েন্সিতে হাজার মানুষের কথা ভেসে চলে! ধরো, একটাই তার, তাতে আমি কথা বলছি বিশ্বাসের সঙ্গে, তুমি সেই মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। বিশ্বাসের কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ না, আমিও শুনতে পাচ্ছি না সেই মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারের কথা। ঠিক তেমনি, এই আমরা যেখানে বাস করি, সেই পৃথিবীতেই বসবাস করে বীরু। কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা, পৃথিবী আলাদা।

—তোর বড্ড হেঁয়ালি কথা! তবু যদি সত্যি হয়, ঝুমু, আমি তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব, তোকে ম্যানেজার করব, তুই বীরুর ফ্রিকোয়েন্সিতে ঢুকে পড়।

—চেষ্টা করছি মামা, পারছি না। বয়স হয়ে গেছে, তা ছাড়া আমারও কি দুঃখ-টুঃখ কিছু থাকতে নেই মামা? দেখ, নড়ন্ত জিভ, একটা অ্যাকসিডেন্টের স্মৃতি, সীতা, স্বপ্নের মেয়েরা ইডিও-মোটর অ্যাকশন—সব মিলিয়ে একটা জাল, এই জাল ছিঁড়ে সহজে কি বেরোনো যায়! চেষ্টা করছি।

—কর। তুই যা চাস তোকে আমি সব দেব।

—জানি মামা।

—কী জানিস?

—বীরুর জন্যই তুমি আমাকে ভালবাসো। কিন্তু এখন আমার ঘুমের সময়, তুমি আর স্বপ্নের মধ্যে আমাকে ডেকো না। আমি ঘুমোব, আমি উলটে রেখেছি বই, নিবিয়ে দিয়েছি বাতি। অন্ধকারে আমার শরীরের ভিতরে এক্ষুনি জ্বলে উঠবে নীল লাল স্বপ্নের আলোগুলি। ওই তো মোড়ের তে-মাথা পেরিয়ে হেঁটে আসছে আমার ঘুম, অবিকল মানুষের মতো, হাঁসের মতো গায়ের অন্ধকার কণাগুলি ঝেড়ে ফেলে সে আসবে কাছে। সম্মোহনের দীর্ঘ আঙুলগুলি নড়বে চোখের সামনে। তোমরা যাও...আমি ঘুমিয়ে পড়ব...

একটু স্যাঁতসেঁতে বিছানাটা। ফাঁকা। মনোরমের হাত এলিয়ে পড়ে থাকে। সেই হাত কিছুই স্পর্শ করে না।

ঠিক দুপুরবেলায় চোখের রোদ-চশমাটা খুলে মনোরম এসপ্ল্যানেডের ট্রামগুমটির টেলিফোন বুথ-এ ঢুকে গেল। ডায়াল করল, পয়সা ফেলল।

—হ্যালো। একটা চাপা সতর্ক গলা ভেসে আসে।
—দিস ইজ জেমস বন্ড।
—কে?
—জিরো জিরো সেভেন।
—গুডনেস। ব্যানার্জি?
—ইয়াঃ।
—বিসোয়াস হিয়ার। আমাকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে ব্যানার্জি? মানুষের আয়ুর তো শেষ আছে!
ফিসফিস করে একটা ভৌতিক গলায় কথা বলে বিশ্বাস।
—জানি বিশ্বাস। আমি একটা ট্রাফিক জ্যাম-এ পড়ে গেছি। সামনে একটা ফিয়াট গাড়ি, সেটাকে পেরোতে পারছি না। সেটাকে পেরোতে পারলেই আপনার কাছে পৌঁছে যাব। আর কয়েকটা দিন।
—ফিয়াট গাড়ি? কী বলছেন ব্যানার্জি? কার গাড়ি?
—সেই ছেলেটার পিছু-নেওয়া এখনও শেষ হয়নি বিশ্বাস।
—এখনও তাকে চেজ করছেন?
—এখনও?
—সে মরেনি তা হলে?
—না।
—তবে বোধহয় সে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমি বোধহয় বাঁচব না ব্যানার্জি।
—কেন?
—আমার গলাটা কেমন বসে গেছে, লক্ষ করেছেন?
—হুঁ।
—ক্যানসার।
—যাঃ।
—বায়োপসি করিয়েছি। মাসখানেকের মধ্যেই হাসপাতালে বেড নেব।
মনোরম চুপ করে থাকে।
—ব্যানার্জি!
—উঁ।
—সময় নেই। একদম না। আমার বাচ্চারা মাইনর, বউটা বুদ্ধি রাখে না। এত সব কে দেখবে? আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। আপনি কথা দিয়েছিলেন।
মনোরম একটা শ্বাস ছাড়ল।
—শুনছেন ব্যানার্জি?
—শুনছি।
—নতুন বিজনেস ওপেন করব ভাবছিলাম। ড্রাগ, নারকোটিকস। ম্যারিজুয়ানা থেকে হাশিস পর্যন্ত। খুব বাজার এখন। কিন্তু কী করে করব?
—দেখছি বিশ্বাস। আর কয়েকটা দিন।
—আপনাকে চাই-ই। ঠাট্টা নয় ব্যানার্জি, আপনি সত্যিকারের জিরো জিরো সেভেন হতে পারবেন। আমি একজন রিয়্যাল জিরো জিরো সেভেন চাই। হাত মেলান ভাই।
মনোরম হাসল।
—হাসবেন না। হাতটা বাড়ান...বাড়িয়েছেন?
মনোরম শূন্যে তার হাতটা সত্যিই বাড়িয়ে দিয়ে বলল—বাড়িয়েছি।
—আমিও বাড়িয়েছি...এইবার ধরুন হাতটা...মুঠো করুন।
—করেছি।
শূন্যেই হাত মুঠো করে মনোরম, শেকহ্যান্ডের ভঙ্গিতে।

—দ্যাটস দ্য বন্ড। আমরা কিন্তু হাত মিলিয়েছি ব্যানার্জি।
—ইয়াঃ।
টেলিফোনটা হুক-এ ঝুলিয়ে রাখে মনোরম।

এ বছর কলকাতায় খুব শীত পড়ে গেল। উত্তুরে হু-হু হাওয়া দেয়। ময়দানের গাছগুলো থেকে পাতা খসে খসে পড়ে গেল সব। দেহাতিরা সেই পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বালে, হাত-পা সেঁকে নেয়। বেকার আর ভবঘুরেরা পার্কে পার্কে বেঞ্চে আর ঘাসে শুয়ে কবোষ্ণ রোদে ঘুমোয় সারা বেলা। এসপ্ল্যানেডের চাতালে তিব্বতি কিংবা ভুটিয়া মেয়েরা সস্তায় সোয়েটার বিক্রি করছে। তাদের ঘিরে এ বছর ভিড় বেড়েছে। শহরতলির দিকে আপ লোকাল ট্রেনগুলো ছুটির দিনে বোঝাই হয়ে যায়। শীতের পিকনিকে যাচ্ছে কলকাতার মানুষ। চিড়িয়াখানায় ভিড়, সিনেমা হল-এ লাইন। শীতের রোদ মাখাবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ে লোকজন।

একটা তিব্বতি মেয়ের কাছ থেকে তার হলদে দাঁতের হাসি সমেত একটা পুলওভার কিনল মনোরম। সাদা। বুকে আর পেটে পাশাপাশি চারটে চারটে আটটা সবুজ বরফি। পুলওভারটা পরে বেরোলে যে কেউ মনোরমকে দুবার ফিরে দেখে।

'বাটা' বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—'শীতকালেই তো সাজগোজ'। মনোরমও তাই ভাবে। এই শীতে সে একটু সাজবে। একজোড়া চমৎকার জুতো কিনে ফেলল সে। ক্রোকোডাইল প্যাটার্নের চামড়া। হাঁটুতে পকেটওলা একটা মার্কিনি কায়দার প্যান্ট করল, যার সেলাইগুলো দূর থেকে দেখা যায়। মামা টাকা দিচ্ছে। দেওয়ার হাত একটু একটু করে আসছে মামার।

পুরনো বন্ধুদের এক-আধজনের সঙ্গে দেখা হলে তারা জিগ্যেস করে—কী ব্যাপার? চিনতেই পারা যায় না যে!

মনোরম উত্তর দেয়—জেমস বন্ড হয়ে গেছি ভাই, কমপ্লিট জিরো জিরো সেভেন।

—কাজ-কারবার?

—নতুন ব্যবসা খুলছি ভাই! কর ফাঁকি দিতে চাও, কি নতুন ধরনের নেশা করতে চাও, যা চাও কন্ট্যাক্ট বিসোয়াস অ্যান্ড ব্যানার্জি। শিগগিরই স্টার্ট করব।

•

কিন্তু ঝোলাচ্ছে বীরুটা। আর মামা। বিশ্বাসকে কথা দেওয়া আছে। কিন্তু মামা ছাড়ে না কিছুতেই। প্রতি মাসে টাকা বাড়াচ্ছে আজকাল। বলে—আর ক'টা দিন একটু দ্যাখ।

এই শীতে বীরু নতুন পোশাক তেমন কিছু করল না। শীতের শুরুতে মাসখানেকের জন্য হিল্লি-দিল্লি কোথায় কোথায় ঘুরে এল। ততদিন মামা দিনরাত তাকে কাঠের তত্ত্ব বোঝাত। মনোরমের জন্য নয়। মামার ধারণা, মনোরম শিখে বীরুকে শেখাবে। যদি বীরু না-ই শেখে কোনওদিন, তবে মনোরম ম্যানেজার হয়ে চালিয়ে নেবে কারবার। বীরুর যেন কষ্ট না হয়।

তিন দিকে ঘেরা জালের মধ্যে বীরু দাঁড়িয়ে আছে। একটা দিক খোলা। সেই খোলা দিক দিয়ে ছুটে আসে রক্তাক্ত বল। বীরুর হাতে ব্যাটটা চমকায়। কিন্তু বলের লাইনটা ধরতে পারে না, স্ট্যাম্প ভেঙে জালে লাফিয়ে পড়ে বল। পরের পর এরকম হতে থাকে। বীরু বলের লাইন দেখতে পাচ্ছে না। যে-ছেলেটা বল করছে সে নতুন, স্কুল ক্রিকেটার। বল তেমন কিছু ভাল করে না। তবু বারবারই বীরু বল খেলতে পারল না। নেট প্র্যাকটিসের বাঁধা সময় পার হয়ে গেলে সে বেরিয়ে এল।

মনোরম বশংবদ দাঁড়িয়ে আছে মাঠের ধারে। বীরুর ওপর সতর্ক চোখ।

বীরু তাকে দেখে একটু হাসল। তারপর তার ফিয়াটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—বাবার চাকরিটা করে যাচ্ছ তা হলে এখনও?

—করছি।

—করো। কিন্তু কিছু জানার নেই। আমিই জানি না।

—এখনও ভুলতে পারছিস না বীরু?

—কী?

—সেই স্টেশনে যেটা দেখেছিলি।

বীরু একটা শ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল—না।

—কেন?

—গেঁথে গেছে। অটো সাজেশানের মতো। মানুষের অনেক সময় হয়, খেতে বসলে সবচেয়ে ঘেন্নার কথা মনে পড়ে, একা ঘরে মনে পড়ে ভূতের গল্প। অনেকটা সেই রকমই। যত ভুলতে চাই, তত মনে পড়ে।

—কী করবি?

—ভাবছি।

—তুই একটুও ভাবছিস না।

—ভাবছি। তুমি অস্থির হয়ো না। চাকরিটা করে যাও।

—বীরু, মামার বড় ভয়, তুই সুইসাইড-ফাইড করবি না তো কখনও?

—সুইসাইড! বীরু একটু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটি বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর চোখে, বলে—ভাবিনি তো কখনও!

মনোরম ভীষণ হতাশ হয়ে বলে—ভাবিসনি! তবে কি আমিই তোকে মনে করিয়ে দিলাম?

—দিলে। সুইসাইডের কথা ভাবতে বোধহয় মন্দ লাগে না কখনও কখনও! মাঝে মাঝে ভাবব।

—কেন ভাববি বীরু? ভাবিস না। আমি কথাটা উইথড্র করে নিচ্ছি।

—ভয় পেয়ো না। সুইসাইডের চিন্তা কখনও করিনি। চিন্তাটা করতে বোধহয় ভালই লাগবে!

—যদি ওটাও অটো সাজেশানে দাঁড়িয়ে যায়?

বীরু ধীর পায়ে তার ফিয়াটের দিকে হেঁটে চলে গেল। আর ফিরে তাকাল না।

ক'দিনের মধ্যেই বীরু ছেঁটে ফেলল লম্বা চুল, জুলফি। শুধু ছোট একটু গোঁফ রেখে দিল। এই শীতে একটা আধময়লা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরতে লাগল। ফিয়াটটা গ্যারেজেই পড়ে থাকে। বীরু হাঁটে। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা। গলিঘুঁজিতে চলে যায়। দিশি গাড়িটা নিয়ে বড্ড বিপদে পড়ে গেল মনোরম। এখন আর গাড়িতে বীরুকে অনুসরণ করার মানেই হয় না। সব গলিতে গাড়ি ঢোকে না, তা ছাড়া মানুষের হাঁটার গতির সমান ধীর গতিতে গাড়ি চালানো যায় না সব সময়ে। অতএব গাড়ি ছেড়ে হাঁটা ধরে মনোরম। এবং প্রথম ধাক্কাতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতদূর হাঁটার অভ্যাস ছিল না তার। তার ওপর লম্বা পায়ে বীরু জোরে হেঁটে যায়, তাল রাখতে গিয়ে দমসম হয়ে পড়ে সে। তবু তীব্র এক আকর্ষণে সে ঠিকই চলে। পিছু ছাড়ে না। বীরু টের পায়। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। কখনও হাসে একটু, ম্লান হাসি। কখনও চাপা গলায় বলে—বাক আপ।

বুধবার রাতে বীরুকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে যেতে দেখেছে মনোরম। তারপর ফিরে গেছে পূর্ণদাস রোডের ফ্ল্যাটে। পরদিন সকালে আবার এসেছে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দাঁড়িয়ে থেকেছে। সারাদিন বীরু নামল না। দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিল মনোরম। না সাহেব নামেনি। অনেক রাত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। বীরু নামল না। পরদিনও না।

তৃতীয় দিন মনোরমের বুক কাঁপছিল। দারোয়ান মাথা নেড়ে বলল—কিছু জানি না। এত বড় ফ্ল্যাট বাড়ি, কে কখন আসে যায়!

সন্ধেবেলায় চাঁদ ওঠে। মনোরম হেঁটে গেল পার্ক পর্যন্ত। কুয়াশা আছে। হলুদ জ্যোৎস্না। দু-চারজন লোক আছে পার্কে, সঙ্গে কারও কারও প্রেমিকা বা ভাড়াটে মেয়েছেলে। মনোরম পার্কটার একটা কোণে দাঁড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চেয়ে রইল। বীরুর ঘরে যথারীতি অন্ধকার। তিনদিন ধরে আলো জ্বলছে না ওর ঘরে। মনোরম যখন সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল তখন দেখে তার হাত থরথর করে কাঁপছে। পেট ডাকছে কলকল করে। উদ্বেগে সে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়ার কথা মনে করেনি।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল মনোরম। পার্ক ক্রমে নির্জন হয়ে গেল। সে একা। হিম পড়ে তার গা ভিজছে, মাথা ভিজছে। ঠাণ্ডায় চোখে জল আসে। গলায় ব্যথা, একটু একটু কাশি। হাতে পায়ে খিল ধরা ভাব। ঝিঝি লেগেছে। এ কয় মাসে বীরুকে সে ভালবেসে ফেলেছিল, তা আজ বুঝতে পারল। ওই অ্যাপার্টমেন্টে কী হয়েছে তা এত রাতে জানতে যেতে সাহস হল না তার। কোত্থেকে একটা রাতচরা পুলিশ খেঁটে লাঠি দোলাতে দোলাতে কাছে এসে বলল—কেয়া?

মনোরম মাথা নেড়ে বলে—কুছ নহি।

—তব?

মনোরম হাঁটতে থাকে। পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়ে। ফিরে আসে পূর্ণদাস রোডের ফ্ল্যাটে। ঘুমোতে পারে না। স্বপ্ন দেখে না। তার কোনও ইডিও-মোটর অ্যাকশনও হয় না আজ। রোজ কয়েকবার যে কথাটা তার মনে পড়ে সেই ট্রেন দুর্ঘটনাও মনে পড়ে না। ঘরের বাতি নিবিয়ে সে বসে থাকে জানালার পাশে। সিগারেট খায়। তার নিঃসঙ্গতায় কেবলমাত্র সঙ্গে দেয় নড়ন্ত জিভটা। টুক টুক করে নড়ছে। নড়ছেই। সে বড় মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারে, বীরুকে সে বড্ড ভালবেসে ফেলেছিল। বড্ড বেশি। বোধ হয় আর কিছু করার নেই।

খুব ভোরবেলা সে আর একবার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কুয়াশায় গাঢ় আকাশে বহু দূর উঠে গেছে বাড়িটা। অন্ধকার জানালা সব। কোলাপসিবল গেট বন্ধ। বীরুর জানলায় আলো নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে থাকে। শীতটা কি খুবই পড়ল এবার? হাত পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভোর-আলোয় দুটো হাত চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে সে। হাত দুটো রক্তহীন, সাদা, আঙুলের ডগায় চামড়া কুঁচকে আছে, অনেকক্ষণ জলে ভিজলে যেমন হয়। শরীরে একটা কাঁপুনি; শীতের জন্যই? নাকি অন্তর্নিহিত গূঢ় শোক থেকে উঠে আসছে শরীর জুড়ে এক নিস্তব্ধ ক্রন্দন? নাকি ভয়? অনিশ্চয়তা? হাঁটে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নয়। খানিকটা উদভ্রান্তের মতো।

তবু ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে সে হাজির হয় কাঠগোলায়। বীরুর ফিয়াটটা বাইরে দাঁড়ানো। আপাদমস্তক শিউরে ওঠে মনোরম।

মামা বাইরের চালায় বসে আছে। কী গভীর হয়ে চোখের কোলে কালি পড়েছে! ঘুমহীন জ্বালাভরা চোখ। কষ্টে শ্বাস টানছে।

—তিন দিন তুই দেখাই দিসনি ঝুমু। বীরুর খবর কী?

—একই খবর। বীরুর গাড়িটা দেখছি—সতর্ক গলায় বলে মনোরম।

গভীর ক্লান্তিতে মামা বলে—আমিই এনেছি ওটা। গ্যারেজে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে চালু না করলে ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাবে। ওর ঘরে গাড়ির চাবিটা পড়ে ছিল। ভাবলাম নিয়ে বেরোই। কখন হুট করে এসে হাজির হবে, তখন গাড়ি রেডি না পেলেই তো মাথা গরম হবে। তাই ইঞ্জিনটা চালু রাখছি।

—ও।

—কী করছে এখন হারামজাদা?

—মামা, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার সেই বন্ধুর গলায় হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বেশি দিন নেই।

—যাবি? বলে যেন হাতের ভর স্খলিত হয়ে যায় মামার। রোগা লম্বা শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

—ঝুমু! মামা হাঁফানির শ্বাস টেনে বলে।

—বলো মামা। মনোরম মামার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—কী হয়েছে তোমার?

—শোন, ও যখনই ফিরুক, যবেই ফিরুক, ওর সব সাজানো রইল। ওর ঘর সাজানো আছে, ব্যবসাপত্র সব গুছিয়ে রাখা আছে, ওর গাড়ির ইঞ্জিন আমি চালু রাখছি। ওকে বলিস, আমার যা সাধ্য সব করে রেখেছি ওর জন্য।

—বীরু তো সবই জানে মামা।

—ভূপতিকে সব বুঝিয়ে গেলাম, তুইও দেখিস।

—তোমার কী হয়েছে?

—ঝুমু, প্রদীপ নিবে গেলে একটা তেলপোড়া গন্ধ পাওয়া যায় জানিস তো?

—হ্যাঁ, বিচ্ছিরি গন্ধ।

—সেই গন্ধটা মানুষ যখন আর পায় না, তখনই বুঝতে হবে তার আর মরার দেরি নেই।

—তার মানে?

—ও একটা তুক। মানুষ মরার আগে নেবানো প্রদীপের সামনে বসেও সেই গন্ধটা পায় না। আমি গতকাল সন্ধের সময়ে পুজোর পর প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে অনেকক্ষণ বসে গন্ধটা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। পেলাম না। ঝুমু, আমারও আর দেরি নেই।

—এ সব কথার কোনও মানে হয় না মামা।

—তুই যেন কার সঙ্গে ব্যবসাতে নাবছিস?

—বন্ধু।

—যাবিই ঝুমু?

—কথা দিয়েছি।

—তা হলে যা। ফাঁকে ফাঁকে এসে একটু বীরুকে দেখে যাস। তোর মামিকেও।

—দেখব মামা।

মনোরম কাঠগোলা থেকে বেরিয়ে আসে। মামা এখনও কিছুদিন টের পাবে না। বীরু তো এরকম কতদিন ডুব দিযে থেকেছে। সে রকমই কিছু ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবে। মনোরম একটা সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সামনেই গোল পার্কের ওপর শীতের প্রকাণ্ড আকাশ রোদভরা হয়ে ঝুঁকে আছে। হঠাৎ কলকাতা মুছে যায়। আবছা স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে মনোরম দেখতে পায় ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ সব সিঁড়ি। ইস্কুলবাড়ির তিনশো ছেলে সেই সিঁড়িতে সারি সারি দাঁড়িয়ে জোড়হাতে গাইছে—জয় জগদীশ হরে...

বহু দিনের পুরনো সেই আকাশ অতীত থেকে হঠাৎ আজ ঝুঁকে পড়ে মনোরমের চোখের ওপর। হাতের উল্টো পিঠে সে চোখের জল মুছে নেয়।

কলকাতায় এবার কি খুব শীত পড়েছে! এত রোদ্দুরে হাঁটে মনোরম, তবুও শরীর তার কেঁপে ওঠে। হাত দুটো সামনে সিঁটানো। হাঁটে মনোরম। শীত যায় না। গাড়ির শব্দ হয় চারপাশে, মানুষের পদশব্দ থেকে যায় পথে। মনোরম আর কারও পিছু নেয় না কখনও। রাতে সে তার ঠাণ্ডা বিছানায় এসে শোয়। একটু ওম-এর জন্য বড় খুঁতখুঁত করে তার শরীর। চোখ বুজতে না বুজতেই ফুলের পাপড়ির মতো স্বপ্নরা ঝরে পড়ে চোখে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। চমকে উঠে বসে সে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে।

টেলিফোনে একদিন বিশ্বাসের নম্বর ডায়াল করল মনোরম অবশেষে।

গমগমে একটা গলা উত্তর দিল—হ্যালিও...

মনোরম ভাবে, তবে কি ক্যানসার সেরে গেছে বিশ্বাসের! আবার সেই রোগমুক্ত প্রকাণ্ড চেহারাটা লু-বাতাসের মতো মুখের ওপর শ্বাস ফেলে বলবে—ব্যানার্জি, বিসোয়াস হিয়ার।

—হ্যালিও...

মনোরম জিগ্যেস করে—বিশ্বাস?

—ও।

—উনি তো হাসপাতালে আছেন।

—কিছু বলার ছিল?

—না। ঠিক আছে।

বাড়িভাড়া আবার বাকি পড়ে। জমে উঠেছে ঋণ। মনোরম হাঁটে। ওপেনিং খোঁজে। পায় না। বয়স

হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। তবু হাঁটে মনোরম। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা। সেই অ্যাপার্টমেন্টের সামনে কখনও যায় না। যায় না মামার কাঠগোলাতেও। বিশ্বাসকে আর কখনও ফোন করেনি মনোরম। থাক, সে কিছুই জানতে চায় না। মনোময় যেদিন মারা যায়, সেদিন সকালে সে প্রতিবেশীর বাসা থেকে ইস্কুলে বেরিয়ে, বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ইস্কুলে। প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। আজও পালায়, অবিকল সেইরকম। কল্পনা করে, মামা রোজ এসে কাঠগোলায় বসছে, নিবন্ত প্রদীপের গন্ধ আবার ফিরে পেয়েছে মামা। বীরু তাকে ফাঁকি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বোধহয় পালিয়ে গিয়েছিল মাঝরাতে। তারপর বোধহয় গিয়েছিল গৌরীর কাছে। ওরা দূরে কোথাও আছে, একসঙ্গে। বিশ্বাস অপারেশনের পর ভাল হয়ে আবার দাবড়াচ্ছে তার পুরনো বিদেশি গাড়ি, মদ খাচ্ছে, ফুর্তি করছে, বেশি রাতে বাড়ি ফিরে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ছুড়ে দিচ্ছে এক পাটি জুতো...

কল্পনায় সবই থাক। সত্যি কী, তা জানতে চায় না মনোরম। এবারের শীতে কলকাতা বড় সুন্দর। এ রকমই সুন্দর থাক সব কিছু। ভাবতে ভাবতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় বিশ্বাসকে, শোঁ করে গাড়িতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—'বাই...' গ্র্যান্ড হোটেলের উল্টোদিকে পার্কিং লট-এ থেমে থাকা ভোঁতামুখ গাড়ি থেকে মামা যেন ডাক দেয়—ঝুমু! আর কখনও ভিড়ের মধ্যে সামনে লম্বা বীরু হাঁটতে থাকে। ভ্রূ কুঁচকে পিছু ফিরে চায়, হাসে কখনও বলে—বাক আপ।

অবিকল এইভাবে একদিন সীতাকে দেখতে পায় মনোরম। তখন দুপুর। নিউ মার্কেটের ছায়ায় ছায়ায় শীত গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। গায়ে সাদার ওপর সবুজ বরফিওলা পুলওভার, মার্কিনি ছাঁটের প্যান্ট পরনে, পায়ে ক্রোকোডাইল মোকাসিন। ছায়া, তবু রোদ চশমাটাও ছিল চোখে, হঠাৎ দেখে, উল্টোদিক থেকে সীতা হেঁটে হেঁটে আসছে। পুরনো স্বভাব সীতার, দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে নিচু হয়ে। এক পা এক পা করে হেঁটে আসে সীতা।

স্বপ্নই। বিভ্রম। এক্ষুনি কল্পনার সীতা মিলিয়ে যাবে। তবু যতক্ষণ তাকে দেখা যায় ততক্ষণ দেখবে বলে চোখে পিপাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে মনোরম। বহু দিন সীতাকে দেখেনি। সেই কতদিন আগে দেখেছিল এসপ্ল্যানেডের চাতালে, মেঘভাঙা রোদে। মহার্ঘ মানুষের মতো মাটি থেকে যেন একটু ওপরে শূন্যে পায়ের আলপনা ফেলে চলে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক আলোগুলি রঙ্গমঞ্চের ফোকাসের মতো এসে পড়েছিল ওর গায়ে। তারপর বহুদিন বাদে আবার কল্পনায় দেখা হল। মনোরম চেয়ে থাকে।

সীতা হেঁটে আসছে। কাল্পনিক। তবু অপেক্ষা করে মনোরম। যদি তাকে না দেখে এরকমই হেঁটে আসতে থাকে, তবে সোজা এসে মনোরমের বুকে ধাক্কা খাবে। ঠিক যেমন স্থবির গাড়িতে চলন্ত ইঞ্জিন এসে লেগে যায়। সেই বিভ্রম, সেই প্রবল কাল্পনিক সংঘর্ষের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। সীতা অনন্ত পথ পার হয়ে আসছে। একটু একটু করে। বড় একটা দোষ ছিল ওর, যা খুশি কিনে আনত। কলকাতার দোকান ছেয়ে গেছে নকল দু নম্বর মালে। রোজ ঠকে আসত। বকত মনোরম। ঠিক সেই রকমই বালিকার মতো অপার কৌতূহলভরা চোখে দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে আজও। মনোরমকে দেখেনি। সচেতন নয়। মনোরমের বিভ্রমের পথ ধরে আসছে সীতা, কল্পনা, স্বপ্ন।

মনোরম ভুল করেছিল।

সীতা তাকে দেখেছিল ঠিকই। দোকানের আয়নায় প্রতিবিম্বিত মনোরমকে। একটু চমক কি লেগেছিল? কে জানে! কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভুল হয়ে গেল বিচ্ছেদ, অন্য এক পুরুষ, বহুকালের অদর্শন। তীব্র অভিমানে ফুলে উঠল সীতার বালিকা-মুখের দুটি ঠোঁট, ভ্রূ কুঁচকে গেল।

একটুও ভাবল না সীতা, অপেক্ষা করল না, কোনও ভূমিকাও না। কিশোরীর মতো দ্রুত নৃত্য-ছন্দে কয়েক পা দৌড়ে গেল মনোরমের দিকে। বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কৃশ, সাদা মুখখানা তুলে ধরে বলল—আমার যে কী ভীষণ অসুখ করেছিল!

মনোরম তাকিয়েই থাকে। বিভ্রম?

সীতা তার রোগা, পাণ্ডুর ডান হাতখানা তুলে নিঃসংকোচে তাকে দেখাল, বলল—দেখো কত রোগা হয়ে গেছি!

পৃথিবীতে মানুষের আয়ু খুব বেশিদিন নয়। বয়ে যাচ্ছে সময়। দ্রুত, কলস্বরা। মনোরম তাই বিনা প্রশ্নে সীতার রোগা হাতখানা ছুঁল।

সেই মুহূর্তেই তাদের চারধার থেকে কলকাতা মুছে যাচ্ছিল। জেগে উঠল বনভূমি। অদূরে নদীর শব্দ।

নীলু হাজারার হত্যা রহস্য

নির্জন এক নদী সারাদিন এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে মৃত্যুর করুণ গান গায়। চারদিকে নিস্তব্ধ এক উপত্যকা, দু-ধারে কালো পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে আকাশে। এই বিরলে শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের মতো হু-হু বাতাস বয়ে যায়। অজস্র সাদা ছোট বড় নুড়ি পাথর চারদিকে অনড় হয়ে পড়ে আছে। খুব সাদা, নীরব, হিম, অসাড় সব পাথরের মাঝখান দিয়ে সেই নদী—উৎস নেই, মোহনা নেই। সারাদিন এখানে শুধু তার করুণ গান, মৃদু বিলাপের মতো। কিছু নেই, কেউ নেই। শুধু হাড়ের মতো সাদা পাথর পড়ে থাকে নিথর হয়ে। উপত্যকা জুড়ে এক মৃত্যুর সম্মোহন। এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে নদী অবিরল গান গেয়ে যায়।

আনমনা আঙুল থেকে আস্ত সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল ফুটপাথে। সিগারেটের আজকাল বড্ড দাম। তার ওপর এটা বেশ দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট। শখ করে কিনে ফেলেছে বৈশম্পায়ন। আনমনেই বৈশম্পায়ন সেটা কুড়োতে নিচু হয়েছিল। শর্মিষ্ঠা দশ পা পেছনে, ছেলের বায়না মেটাতে ফুটপাথের দোকান থেকে মোজা বা গেঞ্জি কিনছে, আর অনবরত মৃদুস্বরে ধমকাচ্ছে ছেলেকে। দশ পা এগিয়ে এসেছে বৈশম্পায়ন। দশ পায়ের বিচ্ছিন্নতা। সিগারেটটা কুড়োতে হাত বাড়িয়েও সে ফিস ফিস করে বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

কুড়োনো হল না। নতুন একটা যে ধরাবে তাও হল না। এরিয়ালে এসে লাগল সেই মৃত্যু-নদীর গান। সাদা নিথর হিম পাথর সব মনে পড়ে গেল।

ডুমকি এখন অনেক দূরে। কারশিয়াং-এ। ডুমকির জন্য বড় হু-হু করে ওঠে বুক। মানুষ তো পাখি নয় যে, উড়ে যাবে। ডুমকির সঙ্গে এই অনেকটা অসহায় দূরত্ব এই মুহূর্তে ভীষণ টের পায় বৈশম্পায়ন।

দশ পায়ের দূরত্বে শর্মিষ্ঠা এখনও কী যে কিনছে। কই এসো, বলে তাকে এখন একবার তাগাদা দেওয়া যায়। কিন্তু সেরকম কোনও ইচ্ছেই হল না বৈশম্পায়নের। থাক, কিনুক। ছেলে বুবুম একবার ফিরে দেখল বাবাকে। তারপর ঝুঁকে পড়ল দোকানের জিনিসপত্রের ওপর।

বৈশম্পায়নের পকেটে গোদরেজের চাবি। পকেটে হাত পুরে চাবির রিংটা মুঠো করে ধরে থাকে সে কিছুক্ষণ। তার ফ্ল্যাট মোটামুটি নিরাপদ। প্যান্টের চোরা পকেটে বোনাসের দেড় হাজার টাকা। চাবির রিং ধরার ছলে সে দেড় হাজার টাকার ফোলা অংশটাকেও স্পর্শ করে আছে। কিন্তু এরিয়ালে নির্ভুল গানের তরঙ্গ ভেসে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে গোদরেজের চাবির নিরাপত্তা, টাকার মূল্য। বৈশম্পায়ন আর একটা সিগারেট বের করে।

সিগারেটটা ধরানো হল না কিছুতেই। আকাশ এখন কেমন ? ছেঁড়া মেঘের তুলো গড়িয়ে যাচ্ছে নীল বেডকভারে। এখনও বৃষ্টির স্যাঁতা ভাব উবে যায়নি ফুটপাথের শান থেকে। শরৎ সবচেয়ে প্রিয় ঋতু বৈশম্পায়নের। তার প্রিয় হল টাকা, প্রিয় ডুমকি আর বুবুম। প্রিয় হোক বা না হোক অবিচ্ছেদ্য হল ওই শর্মিষ্ঠা। তার আরও কিছু প্রিয় আছে, তবে সবসময়ে একরকম নয়। তার প্রিয় রং সাদা। প্রিয় রাগ হংসধ্বনি। প্রিয় অভ্যাস বসে থাকা বা ঘুম। এই শরতের প্রিয় রোদে বউ আর ছেলেকে নিয়ে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে তার আগাগোড়া ভারী ভাল লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ...

শর্মিষ্ঠা দোকান থেকে জর্দা পান মুখে দিয়ে তবে এল। হাতের জালের ব্যাগে দুটো ছোট প্যাকেট। আস্তে আস্তে প্যাকেট বাড়বে। জালের ব্যাগ উপচে পড়বে। আজ তারা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেবে। সারাদিনের প্রোগ্রাম

কিন্তু এখন বৈশম্পায়নের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি একটু অবিন্যস্ত, অস্থির। সে বলল, বাড়ি যাবে ?

শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে বলল, বাড়ি যাব ? এখনও তো কেনাকাটা শুরুই হল না ! বলতে বলতেই সে বৈশম্পায়নকে ভাল করে লক্ষ করে এবং গলার স্বর পাল্টে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে ? শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?

ভরা প্যাকেট ঢোকাতে গিয়ে সিগারেটটা দুমড়ে ফেলল বৈশম্পায়ন। চিন্তিত মুখে বলল, খারাপ লাগছে।

তা হলে চলো। ট্যাকসি ডাকি।

ডাকো। বলে বুবুমের হাত ধরে বৈশম্পায়ন। পরক্ষণেই মনে হয়, ব্যাপারটা অত্যধিক নাটুকে হয়ে যাচ্ছে। তার শরীর তেমন খারাপ নয় যে, বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কিন্তু বাসায় ফিরলে অন্তত শর্মিষ্ঠার কাছে মুখ রাখতে তাকে অসুস্থতার থিয়েটার করতেই হবে। তা পারবে না বৈশম্পায়ন। বড় অস্থির লাগছে তার, ভয়ানক অস্থিরতা দেখা দেবে।

শর্মিষ্ঠা ট্যাকসি ডাকতে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৈশম্পায়ন বলল, শোনো।

কিছু বলছ ?

কেয়াতলা চলো। মাধবদের বাসায় একটু বসি। হয়তো সেরে যাবে।

শরীর কেমন লাগছে বলো তো !

অস্থির। বোধহয় পেটে গ্যাস-ট্যাস হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা জানে, আজকাল স্ট্রোকের কোনও বয়স নেই, এবং মানুষ যখন তখন মরে যায়। দু চোখে ঘনীভূত সংশয় আর ভয় নিয়ে সে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, বরং কোনও ডাক্তারের চেম্বারে চলো। দেখিয়ে নিয়ে যাই।

বুবুম মুখে আঙুল পুরে ঊর্ধ্বমুখে বাবাকে দেখছিল। বাবাকে হাতের নাগালে পেলেই বায়না করা তার স্বভাব। কিন্তু এখন সেও কিছু টের পেয়ে গেছে। তিন বছরের বুদ্ধি আজকাল কিছু কম পাকে না। সে চুপ করে চেয়ে ছিল।

বৈশম্পায়ন বলল, ডাক্তার দেখানোর মতো কিছু নয়। একটু রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ গেল না। তবে সে আপত্তিও করল না।

গড়িয়াহাটা থেকে সামান্য হাঁটতেই কেয়াতলার মোড়। মাধবদের বাসা মোড়ের কাছেই।

দরজা খুলল মাধবদের বাচ্চা ঝি। বাসায় আর কেউ নেই।

শর্মিষ্ঠা এই অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সে বলল, ওরা তো ফিরবে। আমরা বরং একটু বসি।

ঝি শর্মিষ্ঠা এবং বৈশম্পায়নকে চেনে। মৃদু হেসে বলল, বসুন না।

বাইরের ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে ডবল সোফা রয়েছে। বৈশম্পায়ন লম্বা মানুষ। শর্মিষ্ঠা একটু চিন্তিত হয়ে বলে, তুমি বেডরুমেই চলো। শোবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নেড়ে বলে, আর না। পাখা খুলে দাও। একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।

জল খাবে ?

খাব।

শর্মিষ্ঠা নিজেই ডাইনিং স্পেস থেকে ফ্রিজের জল নিয়ে এল। বলল, আস্তে আস্তে খেয়ো। ভীষণ ঠাণ্ডা।

বৈশম্পায়নের ফ্রিজ নেই। কিনবে কিনবে করছে। খুব সাবধানে সে একটু একটু করে অল্প জল খেল। শরীরটা যে কোথায় খারাপ, কেন খারাপ তা ভেবে দেখতে লাগল সে।

বুবুমকে হিসি করাতে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। ফিরে এসে বলল, এদের সবকিছুই এত ঝকঝকে পরিষ্কার ! বাথরুমটায় শুয়ে থাকা যায়।

বৈশম্পায়ন এসব কথা নতুন শুনছে না। মাধব আর তার বউ ভালই থাকে। গুছিয়ে থাকে। সাজিয়ে থাকে। কিন্তু এই থাকা না-থাকার কোনও অর্থ আজ সে খুঁজে পাচ্ছে না। সোফায় ঘাড় হেলিয়ে সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে সে পাখার বাতাস শুষে নিচ্ছিল। সেইভাবেই রইল।

শর্মিষ্ঠা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুধের বোতল আর সন্দেশের বাক্স বের করে ছেলেকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। সারাদিনই তাকে অক্লান্ত চেষ্টা করে যেতে হয়। ছেলে খেতে চায় না। প্রথমে কাকুতি মিনতি "বুবুম লক্ষ্মী সোনা ! এই একটুখানি...আচ্ছা সেই ছড়াটা বলছি, হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তা হলে সেইটে বলি...চলে মস মস মস মস বাঁ ডান মস মস সবচেয়ে ভাল পা গাড়ি, উঃ...সেই সকালে কখন একটু দুধ খেয়েছে, এত বেলা হল, কিচ্ছুটি নয় ! খাও বলছি। খাও। দাঁড়া তো...দেব ? দেব পিঠে একটা দুম করে ?"

এসবই মুখস্থ বৈশম্পায়নের ! এরপর মৃদু একটা থাপ্পড় এবং বুবুমের কান্না। সে চোখ না খুলেই বলল, আমার শরীর ভাল লাগছে না। একটু চুপ করো।

শর্মিষ্ঠা আর শব্দ করল না। কিন্তু তার এই নীরবতা রাগে ভরা তাও বৈশম্পায়ন জানে। শর্মিষ্ঠা ছেলেকে নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেল।

বৈশম্পায়ন চোখ খুলল এবং প্যাকেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটটা বের করে সযত্নে সোজা ধরিয়ে ফেলল।

চার বেডরুমের এই ফ্ল্যাটটা মাধব কিনেছে বছর দশেক আগে। তখন ফ্ল্যাটের দাম দু লাখের কাছাকাছিই হবে বোধহয়। বাইরের ঘরটা দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত বুক কেস দিয়ে সাজানো। কিছু পেতল আর পোড়ামাটির বাছাই কাজ রয়েছে। দেয়ালে কয়েকটা তেলের ছবি, কিছু ওরিজিন্যাল প্রিন্ট। মেঝেয় একটা সত্যিকারের উলেন কারপেট। খুব বড় নয়, তবে বসার জায়গাটুকু ঢাকা দিয়েছে। কার্পেটটির বাইরে ছিট ছিট লাল-কালো-সাদা মোজাইক করা মেঝে আয়নার মতো ঝকঝকে। মাধব আর ঝিনুকের ছেলেপুলে নেই।

"আমাকে পুষ্যি নে না" বলে ঠাট্টা করেছে একসময়ে বৈশম্পায়ন। কখনও আর একটু ফাজিল হয়েছে "তোর কর্ম নয়, ঝিনুককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।" কিন্তু এখন আর কিছু বলা যায় না। ওদের আর হবে না তা বোঝা গেছে। তাই আর ঠাট্টা চলে না।

বৈশম্পায়ন খুব বড় একটা শ্বাস ফেলল। গোদরেজের তিন চারটে চাবির গোছা পকেটে থাকায় ফুটছিল। গোছাটা বের করে শর্মিষ্ঠার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রাখল সে।

আবার চোখ বুজল। তার কি শরীর খারাপ ? তার কি মন খারাপ?

খাবার ঘর থেকে বুবুমের অল্পস্বল্প কান্না আসছে। শর্মিষ্ঠা বেশ জোর গলায় ধমক মারল দুটো। বৈশম্পায়ন গ্লাসটা তুলে আবার একটু জল খায়। এখন আর জলটা তেমন ঠাণ্ডা নয়।

মাধবের সঙ্গে আগে যত ভাব ভালবাসা ছিল আজ আর তা নেই। এই পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে থেকে বৈশম্পায়ন দূরত্বটা টের পায়। কবে কখন যে আস্তে আস্তে তারা দূরে সরে গেছে তা টেরও পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজকাল মানুষের জীবন যাপনের প্রণালীটাই এমন হয়ে গেছে যে, কেউ আর নিকট হয় না কেবলই দূরে সরে যায়।

বৈশম্পায়ন জলের গ্লাসটা নাড়ে। জল ঘুরপাক খায় গ্লাসের মধ্যে। ঠাণ্ডা ভাবটা আরও কমে গেছে। আরও একটু জল খায় বৈশম্পায়ন।

মাধবের বাসায় আসতে তবু ইচ্ছে করে কেন তার ? সে রহস্যটা জানে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঝিনুকও কি জানে ?

বৈশম্পায়ন নিঃশব্দে ওঠে। পর্দা সরালেই ওদের সুন্দর শোওয়ার ঘরটি। বারো বাই চোদ্দো ফুট হবে। চার দেয়ালে চার রকম মোলায়েম রং। দুটো সিংগল খাট। মাঝখানে এক চিলতে কার্পেট। ছোট একটা ক্যাবিনেটের ওপর ফুলের ভাস। তাতে টাটকা রজনীগন্ধাও। ক্যাবিনেটের ওপর স্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো স্বামী-স্ত্রীর ফটো। বাঁ ধারে ঝিনুক। কী সুন্দর ! ঝিনুকের একটা ফটো বৈশম্পায়নের কাছেও আছে। কেউ তা জানে না। স্বয়ং ঝিনুকও নয়। সেই ফটোগ্রাফ আমৃত্যু গোপন থেকে যাবে বৈশম্পায়নের কাছে। যেদিন টের পাবে মৃত্যু আসছে, সেদিন ফটোটা নষ্ট করে দিয়ে যাবে সে।

দরজার বাঁ ধারে একটা চমৎকার শো-কেস। তার ওপর গাররেডের রেকর্ড চেঞ্জার। তার পাশে নীলুর ছবি। মাধবের কিশোর ভাই। খুন হয়ে গেছে।

নীলুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ঝিনুককে বহুক্ষণ ধরে দেখে নেয় বৈশম্পায়ন। এই এক মুখ। দেখতে দেখতে মৃত্যু ভুল হয়ে যায়, জীবনের তুচ্ছতাগুলির কথা মনে পড়ে না, দুঃখবোধ থাকে না। বুক ভরে ওঠে আনন্দে।

সে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, এ কি কাম ? এ কি পাপ ? এ কি বিশ্বাসঘাতকতা ?

মাধবের যখন বিয়ে হয় তখন বৈশম্পায়ন ডবলিউ বি সি এস পাশ করে বাঁকুড়া জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি করছে। আজও সেই চাকরি করে যেতে পারলে ভাল হত। ঝিনুকের সঙ্গে ফিরে দেখা হত না।

কিন্তু এ কেবল ইচ্ছাযুক্ত চিন্তা। দেখা হতই। দেখা না হলে হত কী করে ? আরও কয়েকটা জেলা মহকুমা ঘুরে প্রোমোশন পেয়ে এই কলকাতাতেই আসতে হত তাকে। তার আগেই অবশ্য সে এল। আলিপুরদুয়ার কোর্টে গণধোলাইয়ের পর কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে ভাঙা হাত আর জখমে শক্ত হয়ে ওঠা ঘাড় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল পাকাপাকি। একটা ব্যাঙ্কে বরাতজোরে চাকরি জুটে গেল। এ সবই নিয়তিনির্দিষ্ট, আগে থেকে ছক বাঁধা।

শর্মিষ্ঠা এসে বলল, শরীর কেমন লাগছে ?

ভাল। অনেকটা ভাল।

আর একটু বসবে ?

বসলে ভাল হয়। ওরা কি ফিরবে ?

ঝি তো বলছে ফিরবে।

একটু বসি। ওরা ফিরলে উঠব।

বুবুমের ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাড়িয়ে দাও।

আজ আর পুজোর বাজার হবে না মনে হচ্ছে।

তুমি একা গিয়ে কিনে আনো না।

এতে একটু সতেজ হয়ে শর্মিষ্ঠা বলে, যাব ? বুবুমকে কে দেখবে ?

দেখার কী ? আমি বসে থাকব, ও ঘুমোবে।

দোনোমোনো করে শর্মিষ্ঠা বলে, তোমার মায়ের কাপড় যদি তোমার পছন্দমতো কিনতে না পারি ?

পারবে।

ঠকে আসলে বকবে না ?

মেয়েরা একটু তো ঠকেই। আজ কিছু বলব না। যাও।

কার জন্য কী যেন ?

জয়ের জন্য একটা ভাল প্যান্টের পিস আর শার্টের কাপড়।

প্রতিবারই জয়কে দিচ্ছ। এখন তো চাকরি করে।

ও চাকরিতে কী হয় ! এনো। সংসারে যখন থাকি না তখন তার কমপেনসেশনও কিছু দিতে হয়।

সংসারের সঙ্গে আজকাল কেউ থাকে না। ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো।

ওঃ শর্মিষ্ঠা !

টাকা দাও।

কত লাগবে ?

হাজার খানেক দিয়ে রাখো।

বুবুমকে ঘুম পাড়িয়ে যাও। বলে চোরা পকেট থেকে টাকা বের করে বৈশম্পায়ন।

শর্মিষ্ঠা ব্যাগে টাকা রেখে ছেলের কাছে যেতে গিয়ে ফিরে বলে, চা খাবে ?

ওরা ফিরুক।

ওদের সঙ্গে তোমার কী ? ঝি করে দেবে।

তা হলে করতে বলো।

শর্মিষ্ঠা চলে গেলে বৈশম্পায়ন চোখ বোজে। সাদা হিম নুড়ি-পাথর ছড়ানো উপত্যকায় বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর নদী। কী অদ্ভুত গান!

শর্মিষ্ঠা চলে যাওয়ার পর বেডরুমের পাশের লিভিং রুমে ফোনটা বাজল।

উঠে গিয়ে ধরে বৈশম্পায়ন।

মাধব আছে?

না।

আপনি কে?

আমি ওর এক বন্ধু!

আমি মাধবের বন্ধু। আপনি কে বলুন তো। নামটা কী?

আমি বৈশম্পায়ন।

যাঃ বাব্বা! না মশাই হল না, আমরা কমন ফ্রেন্ড নই।

এরকম হতেই পারে। বৈশম্পায়ন খুব ভদ্র গলায় বলে।

ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হবে?

হতে পারে। আমি ওর জন্যই বসে আছি।

একটু কাইন্ডলি বলবেন কাল সকালে ওর বন্ধু মদন আসছে! ও চিনবে। মদন এম পি।

মদনকে আমিও চিনি।

যা বাব্বা! তবু আমি আপনাকে চিনতে পারছি না কেন?

ফোনের ভিতর দিয়েই ওপাশ থেকে একটু মদের গন্ধ পায় বৈশম্পায়ন।

॥ ২ ॥

শিয়ালদা মেন স্টেশনের ছ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গেটের বাইরে ফরসা মতো একটা লোক খুব মাতব্বরি চালে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছিল। টিকিট নেওয়ার কালো কোট দুজন থাকা সত্ত্বেও ভিড়ের ঠেলায় যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে বেনোজলের মতো, কে কাকে টিকিট দেয়। এই লোকটা সেই ছিটকে আসা যাত্রীদের দু চারজনের দিকে হাত বাড়িয়ে টুকটাক টিকিট নিয়ে পকেটে ভরছে।

দার্জিলিং মেল লেটে আসছে। অনেকক্ষণ বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করল জয়। তার প্রথমে তেমন কিছু মনে হয়নি। ভেবেছিল কালো কোট খুলে রেলের টিকিটবাবুই টিকিট নিচ্ছে। খানিকক্ষণ দেখে-টেখে সন্দেহ হল, করাপশন।

জয়ের বড় জামাইবাবু বলেছিলেন, অন্যায় দেখলেই ফরম্যালি হলেও একটা প্রতিবাদ সবসময়ই করে রেখো। কাজ হোক বা না হোক বড় জামাইবাবু সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন। তাতে যে বড় জামাইবাবুর খুব ভাল হয়েছে তা নয়। বরং প্রোমোশন হয়নি, মেয়েরা যে যার ইচ্ছে মতো বিয়ে করেছে, তিন ছেলেই আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত, বড়দির সঙ্গেও বড় জামাইবাবুর বনিবনা নেই। তবু জয় বড় জামাইবাবুর এই একটা কথা মেনে চলার চেষ্টা করে।

দু দুটো লোকাল ট্রেনের পর প্ল্যাটফর্ম এখন ফাঁকা। করাপটেড লোকটা সাত নম্বরের বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছে।

'ও মশাই শুনুন। জয় লোকটাকে ডাকে।

লোকটা নিমীলিত চোখে চায়। চোখ দুখানা বড় বড়, ডাগর, মুখও ভদ্রলোকের মতো, রং ফরসা তবে গায়ের জামাপ্যান্ট ময়লা। লোকটা ঠোঁট থেকে একটা মাছিকে উড়িয়ে বলল, কিছু বলছেন?

আপনি কি টিকিট কালেক্টর?

আজ্ঞে না।

তবে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছেন যে!

লোকটা একথায় সুড়ুক করে কাছে সরে আসে, তখুনি এই সাত সকালেও লোকটার মুখ থেকে

ভক করে মদের গন্ধ পায় জয়। লোকটা গলাটা ছোট করে বলে, চুরি ছিনতাই করি না। টিকিটে চার আনা করে হয়। খারাপ কিছু করছি দাদা ? মনে কিছু করলেন ?

জয় কঠিন হওয়ার চেষ্টা করেও পারে না। সে ভারতবর্ষের একটি বড় পার্টির দক্ষিণ কলকাতার একজন মেম্বার। সে দুর্নীতি রুখতে অনেক কিছুই করতে পারে বলে তার ধারণা। যদিও এই রাজ্যে তার দলের কোমরের জোর তেমন নেই, তবু তামাম দেশে তো তার দলই এখন খেলছে। এই লোকটাকে ইচ্ছে করলেই সে ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একটু মায়া হল। বয়সও বেশি নয়। ত্রিশের নীচেই।

জয় বলল, মদ খেয়েছেন ?

একটু। সেও কাল রাতে। কিছু মনে করলেন দাদা ?

আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।

আজ্ঞে না। তবে কিনা পেটের দায়ে করতে হয়। কত লোকে আরও কত খারাপ কাজ করে। চারদিকে করাপশন অ্যান্ড করাপশন।

চার নম্বরে আর একটা লোকাল ঢুকতেই লোকটা সুট করে গেটের বাইরে গিয়ে গোলকিপারের মতো পজিশন নিয়ে নিল।

লোকটাকে ধরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা জয় দমন করল। করাপশন কোথায় নয় ? এই যে প্ল্যাটফর্মে ছানাপোনা নিয়ে কুঁদো কুঁদো সব মেয়েছেলে শুয়ে থাকে রাত্রিবেলা সেটাও বে-আইনি। আবার সকালে চাতাল ধোয়ার সময় ভিস্তিওলা যখন ওই ঘুমন্ত মেয়ে আর শিশুর গায়ে নির্বিকারে জল ছিটিয়ে উঠিয়ে দিতে লাগল তখন সেটাকেও খুব ন্যায় মনে হয়নি তার। মুশকিল হল, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তার কোনও বাঁধাবাঁধি ধারণা সে আজও করে উঠতে পারেনি। গোটা দেশটায় কী যে সব ঘটছে।

দলের কিছু ছেলে-ছোকরা মদনদাকে রিসিভ করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে জয় ভেড়েনি। মদনদার সঙ্গে তো তার ভিড়ের সম্পর্ক নয়। বহুকাল আগে হালতু থেকে পালবাজার অবধি মদনদা তাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে ডবল ক্যারি করেছিল। আর, তার সেজদির সঙ্গে মদনদার একটা সম্পর্ক তো ছিলই। সুতরাং জয়ের দাবি অন্যরকম। এম পি হয়েও মদনদা তার সঙ্গে ফাঁট দেখায় না কখনও। অবশ্য মদনদার ফাঁট বলতেও কিছু নেই।

লাউডস্পিকারে বার বার বলছে, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন দার্জিলিং মেল আসতে পারছে না। সোয়া সাতটায় আসার কথা, এখন বাজছে নটা। দাঁড়িয়ে আর পায়চারি করে করে জয়ের হাঁটু দুটো ধরে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হল বলে কিছু খেয়েও আসেনি। স্টেশনের খচ্চরের পেচ্ছাপের চেয়েও খারাপ এক কাপ চা খেয়েছে ত্রিশ পয়সায়। তার মধ্যে পনেরো পয়সাই ফেলা গেছে। ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক বা খচ্চরের ইয়ের মতো চা, এই সবকিছুর মধ্যেই এই দেশটার পচনশীলতা লক্ষ করা যায়। কিছুই ঠিকমতো চলছে না, কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। একজন এম পি সহ দার্জিলিং মেল আটকে আছে ডানকুনিতে, ভাবা যায় ?

টেকো হরি গোঁসাই এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মে টানা মারছিল। অধৈর্য হয়ে এবার বেরিয়ে এসে জয়কে বলল, গাড়ি এত লেট ! এরপর তো আমার অফিস কামাই হয়ে যাবে !

জয়ের মেজাজ খারাপ ছিল। একটু তেরিয়া হয়ে বলল, দেরির কথা রাখো। বারোটার আগে কোনও দিন দফতরে গেছ ?

হরি গোঁসাইকে রসিক মানুষ বলে সবাই জানে। ফিচেল হেসে বলে, তা বারোটার সময়েও তো যেতে হবে নাকি ? এখানেই ন'টা বাজল।

দেরি হয়ে থাকলে চলে যাও।

সে না হয় গেলাম। কিন্তু তা হলে বিশুকে মেডিকেলে ভর্তি করার কী হবে ?

করাপশন ! করাপশন ! মদনদাকে এই লোকগুলোই খারাপ করে ফেলবে। ভারী বিরক্ত হয় জয়। স্টেশনে যে ক'টা লোক এসেছে সব ক'টা ফেরেব্বাজ, মতলববাজ। মুখে জয় বিরক্তির রেশটা ধরে রেখেই বলল, ও কথা তো মদনদা মালদায় যাওয়ার আগেই হয়ে গেছে।

দূর পাগল ! এম পিদের মন হচ্ছে পদ্মপাতার মতো। কিছু থাকে না, গড়িয়ে পড়ে যায়। বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়।

ফের বললে চটে যাবে।

চটলেও ভাল। তাতে মনে দাগ থেকে যাবে। চ' চা খেয়ে আসি। ডানকুনি থেকে গাড়ি ছাড়লে চল্লিশ মিনিট লাগবে। সময় আছে।

স্টেশনের চা ? ও বাব্বা !

না, বাইরে থেকে খাব। চল, হ্যারিসন রোডে ঢুকে একটা ভাল দোকান আছে।

লাউডস্পিকারে গমগমে গলা বলে উঠল, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন...

দুজনে বেরিয়ে আসে।

হরিদা !

উঁ।

একটু আগে একটা লোককে ধরেছিলাম। প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছে। চার আনায় বেচবে। সারাদিন একটাই টিকিট কতবার যে হাতবদল হবে।

ও তো বহু পুরনো ব্যাপার।

লোকটাকে পুলিশে দিলে কেমন হত ?

তোর মাথা খারাপ ? ওদের সব সাঁট আছে। ধরিয়ে যদিও বা দিলি গ্যাং এসে মেরে পাট করে দিয়ে যাবে। যা কিছু হচ্ছে হোক, চোখ বুজে থাকবি।

জয় কথাটা মেনে নিতে পারে না। বলে, এরকম করে করেই তো আমরা দেশটার—

সর্বনাশ করছি। জয়ের কথাটা টেনে শেষ করে হরি গোঁসাই হাসে, উঠতি বয়সে ওরকম হয়।

বৃষ্টির জলে রাস্তায় থিকথিকে কাদা। তার ওপর খোঁড়াখুঁড়ির দরুন হাঁটা-চলাই দায়। হ্যারিসন রোডের চায়ের দোকানটায় পৌঁছতে গর্দিশ কিছু কম গেল না।

দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। মিনিট পাঁচ সাত দাঁড়িয়ে থেকে যদি বা বসার জায়গা পেল অতি কষ্টে, কিন্তু চা-ওয়ালা ছোকরারা পাত্তাই দেয় না। হরি গোঁসাই দুজনকে চায়ের কথা বলতে গেল, তারা অর্ধেক শুনেই অন্য কাজে ছুটে চলে গেল।

কিছু লোক আছে বুঝলে হরিদা, যাদের দেখলেই সবাই খাতির করতে থাকে। মদনদার কথাই ধরো, গঁড়ে বাজারে যেবার সত্যবাবুকে বাইরের দোকানিরা পেটাল, মদনদা গিয়ে দাঁড়াতেই সব জল।

পারসোনালিটি, বুঝলি !

সেই কথাই তো বলছি। আমরা রেশন অফিসে গেলে কেউ পাত্তা দেবে, বলো ? মদনদাকে দেখেছি, খুব কড়াকড়ি তখন, গিয়ে দু দিনে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিস থেকে মেজদাদের রেশন কার্ড বের করে দিল। আগে থেকে কেউ চেনাজানাও ছিল না, কিন্তু গিয়ে এমন খাতির করে নিল যে, সবাই কিছু করতে পারলে যেন বর্তে যায়।

ও হল অন্য ধাত। বিশুটাকে মেডিকেলে ভর্তি করাতে যদি কেউ পারে তো মদনদা।

এবার কেন যে খুব উদার গলায় জয় বলে, হয়ে যাবে। ভেবো না। তবে কথাটা ঠিক, আজকাল মদনদা খুব ভুলে যায়।

এম পি-দের ঠেলা তো জানিস না। সকাল থেকে মাছি পড়ে। ক'টা মনে রাখবে ?

জয় দূরের দিকে চেয়ে ভারী ভালবাসার গলায় বলল, কিন্তু আগে মদনদার সব মনে থাকত। এমন সব কথা মনে থাকত যা ভাবলে অবাক হতে হয়।

হরি গোঁসাই খপ করে এক চা-ওলা ছোকরার কব্জি চেপে ধরে বলল, আমাদের যে গাড়ির তাড়া, দু কাপ চা টপ করে দেবে ভাই ?

তাড়া তো সবার। ছোকরা হেসে বলে, শুধু চা ?

শুধু চা। একটু দুধ চিনি বেশি করে—

তা অত কথা শোনার সময় ছোকরার নেই, হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

জয় বলে, নীলু হাজরার খুনের কেসটা মনে আছে ? মদনদা সাক্ষী দিয়েছিল। খুনের সময় নীলুর জামার রংটা পর্যন্ত হুবহু বলে দিয়েছিল। মদনদার সাক্ষীতেই তো নব হাটির চৌদ্দ বছর মেয়াদ হল।

মুখটা চোখা করে হরি গোঁসাই বলে, খুনটা কিন্তু নব করেনি।

তবে কে করেছে ? তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ঝুঁকে বসল জয়।

হরি গোঁসাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাল মানুষের মতো বলে, সে-সব কথা যাকগে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। তারপর আরও এক পর্দা গলাটা নামিয়ে নিজেকেই নিজে যেন বলল, এখন বিশুটা মেডিকেলে চান্স পেলেই হয়।

চা এসে যায়। বেশ ভাল চা।

নোনতা বিস্কুট খাবি ? হরি গোঁসাই জিজ্ঞেস করে।

আনমনে চায়ে চুমুক দিয়ে জয় বলে, না। তুমি খাও।

দার্জিলিং মেল আট নম্বরে ঢুকল ঠিক পৌনে দশটায়। এর মধ্যে আরও কিছু লোক জুটে গেছে মদনদাকে রিসিভ করতে। জনা দুই রিপোর্টার, দু-চারজন মহাজন, আরও কিছু ছেলেছোকরা ক্যাডার।

শুধু একটা মাঝারি মাপের ভি আই পি স্যুটকেস হাতে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরা মদনদা ফার্স্ট ক্লাশ একটা কামরার দরজাতেই বিরক্তমুখে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল। ভিড়ের প্রথম হুড়োহুড়িটা কাটানোর জন্য একটু সরে দাঁড়াল। লোকগুলো গিয়ে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছে মদনদাকে। কে যেন একটা মালা পর্যন্ত পরিয়ে দিল।

দিক। ওসব বাইরের মাখামাখিই তো আর আসল নয়। মদনদার সঙ্গে সত্যিকারে ঘনিষ্ঠতা তো জয়ের। এক সাইকেলে তাকে ডবল ক্যারি করেছিল মদনদা। তারই সেজদির সঙ্গে ভাব ছিল। আর কারও সঙ্গে তো অত গভীর সম্পর্ক নয়। মদনদার বয়স পঁয়ত্রিশ হবে হয়তো টেনেমেনে। এখনও বেশ টান ফরসা টনটনে চেহারা। দেখলেই সম্ভ্রম জাগে।

ট্রেন লেট ছিল বলে ব্যস্ত এম পি মানুষটার সময়ে টান পড়েছে। ভিড় কাটিয়ে জোর কদমে এগুচ্ছে। ওই হরি গোঁসাইয়ের ছেলেটা দড়াম করে পায়ের ওপর পড়ে প্রণাম ঠুকল ! দেখো কাণ্ড ! আর একটু হলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যেত লোকটা।

কিন্তু মদনদা পড়ল না। মদনদারা পড়ে না অত সহজে। এমনকী অসন্তুষ্টও হল না। লোক নিয়ে কারবার, লোকের ওপর বিরক্ত হলে চলবে কেন।

জয় দেখল, সে পিছনে পড়ে থাকছে। মদনদা তাকে দেখতে পায়নি ! গা ঘষাঘষি সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু জানান দেওয়ার জন্য একবার বেশ জোর গলায় ডাকল, মদনদা !

মদনদা পিছু ফিরে দেখে একটু হাসল।

দেখেছে ! যাক, নিশ্চিন্তি। জয়ের সকালটা সার্থক।

॥ ৩ ॥

খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা মোটেই ভাল চোখে দেখে না মণীশ। কিন্তু সংকোচবশে শালা মদনকে কথাটা বলতেও পারে না। মণীশরা চিরকাল এঁটোকাঁটা, শুদ্ধাচার, বাথরুমে যাওয়ার অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন মেনে এসেছে। তার বাসার সবাই মানে।

খবরের কাগজটার জন্য অস্বস্তি বোধ করছিল মণীশ। সকালের দিকে অফিসের তাড়ায় ভাল করে পড়া হয় না, তাই বিকেলে এসে পড়ে। আজ আর খবরের কাগজটা পড়া যাবে না। এম পি শালাকে কিছু বলাও যায় না।

মণীশ খেতে বসেছে। একটু দেরিতেই অফিসে যাচ্ছে আজ। ডালের মুখে একটু আলু ভেজে দেবে বলে চিরু তাকে আস্তে খেতে বলেছে। আস্তেই খাচ্ছে সে, কিন্তু ভাজাটা সময়মতো পাবে বলে মনে হচ্ছে না। মদনকে যারা স্টেশনে রিসিভ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আট-দশজন

সঙ্গেই এসেছে। বাইরের ঘরে জোর গলা পাওয়া যাচ্ছে। চা না দেওয়াটা অভদ্রতা, তার ওপর এরা কেউই খুব এলেবেলে লোক নয়। চিরু এখন আলুভাজার কড়াই নামিয়ে চায়ের জল বসিয়েছে। সময় লাগবে।

আস্তে আস্তে খেয়েও মণীশের পাতের ডালভাত শেষ হয়ে এল। রান্নাঘর আর বাথরুমের মাঝামাঝি ছোট্ট এক চিলতে একটু ঢাকা জায়গায় অতিকষ্টে তিন ফুট একটা টেবিল আর দুটি চেয়ার পেতে তাদের খাওয়ার জায়গা। ডানদিকে একটা জানালা। জানালার পাশে গলি। সেদিক থেকে সূর্যালোকহীন স্যাঁতস্যাঁতে গলির সোঁদা গন্ধ আসে। জানালা দিয়ে সিনারি বলতে দেখা যায় শুধু পাশের বাড়ির দেয়াল এবং রেন পাইপ। ইদানীং রেইন পাইপ ঘেঁষে একটা অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছে। ভারী সবুজ, ভারী সতেজ। রোজ ওই সবুজটুকুর দিকে চেয়ে ভাত খায় মণীশ। আজ দেখছিল বড় বড় তিনটে পাতার আড়ালে আর একটা কচি পাতা উঠেছে।

আর একটু বোসো, হয়ে এল। চিরু শোয়ার ঘরে তোলা কাপ প্লেট আনতে যাওয়ার পথে বলে গেল।

মণীশ শেষ গ্রাসটার দিকে চেয়ে রইল। চিরু আবার ভাত দেবে জোর করে, কিন্তু আজ আর তার খেতে ইচ্ছে করছে না।

কাপ প্লেটের পাঁজা নিয়ে চিরু যখন ফের রান্নাঘরে ঢুকছে তখন মণীশ বলল, শোনো, আমার পেট ভরে গেছে। দেরিও হয়ে যাচ্ছে।

সামনের জিনিসটা না খেয়ে চলে যাবে ? বোসো না। হয়ে গেছে তো।

কেন ঝামেলায় জড়াচ্ছ ? থাক না, রাতেও তো খেতে পারব।

শুধু তো ডাল ভাত খেলে !

হোক না, ডালে ঝিঙে আর লাউ দিয়েছিলে যে। শুধু ডাল ভাতের দোষ কেটে গেছে।

এ কথায় চিরু একটু হাসল। রুক্ষ চুল, না-সাজা চেহারায় চিরুকে এই ক্লান্তিতে ভরা হাসি দিয়ে চেনা যায়। কুড়ি বছর ধরে মণীশের সব দুঃখের ভার বহন করছে। এই দু-ঘরের বাসার বাইরের পৃথিবীকে খুব একটা দেখেনি। ভাই এম পি হওয়ার পর একবার দিন দশেকের জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে দিল্লি গিয়েছিল। ব্যস।

রান্নাঘরে কাপ প্লেট ধুতে ধুতে চিরু বলে, বাসন্তীকে কখন বিস্কুট আনতে পাঠিয়েছি এখনও এল না।

আসবে। বলে শেষ গ্রাসটা মুখে দিয়ে মণীশ জল খেল।

আসবে তো। চা যে ঠাণ্ডা হবে ততক্ষণে। সরকারদের বাড়ির থেকে নাকি ভাঙানি দিচ্ছে। আজকাল কাজে একদম মন নেই। চলে গেলে কী যে করব। চিরুর গলায় অসহায়তা ফোটে বটে, কিন্তু রাগ বা বিদ্বেষ নেই।

বাসন্তী গেলেও লোক পাওয়া যাবে।

চিরু চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলে, এ চা-পাতাটার কত দাম গো ?

মদন আসবে বলে কাল একটু ভাল চা এনেছে মণীশ। বলল, ত্রিশ টাকা।

ভীষণ দাম।

পাঁচ বছর আগেও এই কোয়ালিটির চা ষোলো টাকায় কিনেছি।

দাম নিলেও গন্ধটা বেশ।

লোকজনের সামনে বাইরের ঘর দিয়ে খাবার আনাটা অভদ্রতা বলে চিরু বাসন্তীকে শিখিয়েছে, গলির জানালা দিয়ে খাবারের ঠোঙা গলিয়ে দিতে। মণীশ জলের গ্লাস রেখে যখন উঠতে যাচ্ছে তখন জানালা দিয়ে ঠোঙাসুদ্ধ কচি হাত ঢোকাল বাসন্তী, মামাবাবু, ধরো।

মণীশ বাঁ হাতে বিস্কুটের ঠোঙাটা নেয়। বলে, এসে গেছে।

চিরু বলে, আজ কি ফিরতে দেরি হবে ?

না। রোজ যেমন ফিরি। কেন ?

ভাবছিলাম, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে একবার দমদমে কণাকে গিয়ে খবর দিয়ে

আসতে পারবে কিনা।

কেন বলো তো ! হঠাৎ কণাকে কেন ?

মদনকে ওর সব কথা এসে বলুক। যদি মদন কিছু করতে পারে।

একজন এম পি কী কী পারে তা খুব ভাল করে জানা নেই মণীশের। তবে হয়তো অনেক কিছুই পারে। হুট করে কিছু না বলে সে একটু ভাবল, ভেবে বলল, এ তো অত্যন্ত পারসোনাল প্রবলেম চিরু। মদন কী করবে ?

আর কিছু না পারুক, সুভাষকে ভয় দেখাতে তো পারবে। কণা গত রবিবারে এসেও কত কান্নাকাটি করে গেল। বোম্বেতে বদলি হয়ে সেই যে চার মাস আগে গেছে সুভাষ, এখনও একবারটিও আসেনি। মাত্র তিনখানা চিঠি দিয়েছে। টাকা পাঠাচ্ছে খুব সামান্য। তার মানে তো বুঝতেই পারছ। ওখানে আবার কোনও মেয়েকে জুটিয়ে নিয়ে ফূর্তি করছে।

মণীশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, সুভাষ চিকিৎসার বাইরে। কারও কারও রক্তই ওরকম খারাপ। মদন ইন্টারফিয়ার করলে যদি আরও ক্ষেপে ওঠে তবে কণার ওপর টর্চার করবে।

টর্চার কি এখনই কম করছে ? কণার জন্য আমাদের কিছু করাও তো দরকার। মদনকে বলি, তারপর ও যা ভাল বুঝবে, করবে।

ঠিক আছে।

তা হলে যাবে ?

যাব।

গিয়ে বেশি দেরি কোরো না।

দমদম থেকে এই মনোহরপুকুর আসতে একটু সময় তো লাগবেই। চিন্তা কোরো না।

বাথরুম থেকে মদনের কাশির শব্দ আসছে। সঙ্গে জলের শব্দ। এবার বেরোবে। কিন্তু আজকের খবরের কাগজটা আর ভাল করে পড়া হবে না মণীশের।

মণীশ যখন পোশাক পরছে তখন মদন এসে ঘরে ঢুকল। কাঁধে তোয়ালে। হাতে জলের ছোপ লাগা খবরের কাগজ। পায়খানার কাপড়ও ছাড়েনি বোধহয়। ব্যস্ত এম পি, এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নষ্ট করার মতো সময় নেই।

জামাইবাবু কি অফিসে বেরোচ্ছেন ?

আর কী করি বলো ?

আমার অনারে আজ অফিসটা কামাই দিতে পারতেন।

কামাই দিলেও লাভ নেই। তোমাকে পাব কোথায় ? এক্ষুনি বাইরের ঘরের ভক্তরা তোমাকে দখল করে নেবে। তারপর প্রেস কনফারেনস আছে, রাইটার্স আছে, আরও কত কী !

মদনের চেহারাটা ভালই। লম্বা, একহারা, ফরসার দিকেই রং। মুখশ্রীতে একটু বেপরোয়াভাব আছে। একটু চাপা নিষ্ঠুরতাও। মদনের ভয়ডর বরাবরই কম। কোনও ব্যাপারেই লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। অবিশ্রাম কাজ করে যেতে পারে, সহজে ক্লান্ত হয় না। কাজ করতে করতে এযাবৎ বিয়ে করে উঠতে পারেনি। গায়ে একটা গুরু পাঞ্জাবি চড়াতে চড়াতে বলল, বাইরে হালদারের গাড়ি আছে। বলে দিচ্ছি, আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

প্রস্তাবটি লোভনীয়। এখন এই দেরিতে বেরিয়েও বাসে উঠতে দারুণ কষ্ট হবে মণীশের। তবু সে মাথা নেড়ে বলে, ওবলিগেশনে যাবে কেন ? আমাকে তো রোজই অফিসে যেতে হবে। রোজ তো হালদারের গাড়ি পাব না। তা ছাড়া অফিসের লোক গাড়ি দেখলে বলবে, এম পি শালার খুঁটির জোরে গাড়ি দাবড়াচ্ছি।

আপনাকে আর মানুষ করা গেল না।

চিরু চায়ের ট্রে হাতেই ঘরে ঢুকে বলে, মদন, তুই এখন কিছু খাবি না ?

মদন ভ্রূ কুঁচকে বলে, বাইরের ঘরে চা দিচ্ছিস নাকি ?

চিরু লজ্জা পেয়ে বলে, দিই একটু।

ডিসগাস্টিং। সারাদিন লোক এলে সারাদিনই চা দিবি নাকি ? ওসব ভদ্রতা খবরদার করতে যাবি

না। ওদের দরকারেই ওরা আসে, আতিথেয়তার কিছু নেই।
তুই চুপ কর তো। আমার মোটেই কষ্ট হয়নি।
কষ্টের কথা নয়। ফতুর হয়ে যাবি।
তোকে এখন খাবার দেব তো!
না, একটু বাদে ভাত খেয়ে বেরোব।
চিরু চলে যেতে মদন চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলে, খাঁদু বুঁচি সব কই ?
ইস্কুলে। মণীশ বলে, সারা সকাল তোমার জন্য হাঁ করে পথ চেয়েছিল। ট্রেন লেট বলে আর থাকতে পারল না।
ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকায় আটকে গেল গাড়ি। সকালে একটা ইমপরট্যান্ট এনগেজমেন্ট ছিল, রাখা গেল না।
মদন চারদিকে চেয়ে বলে, এ ঘরটায় কী করে যে এতকাল আছেন আপনারা। একে একতলা, তাতে ছোট ঘরে গাদা জিনিসপত্র। এতদিনে একটা বাড়ি করার মতো টাকা আপনার হয়েছে জামাইবাবু।
সতীনের ছেলেকে সবাই মোটা দেখে। টাকা হত, যদি রাখা যেত।
মদন মাথা নেড়ে বলে, আপনার কিছু হবে না জামাইবাবু।
যা বলেছ।
তবু আপনি ভীষণ হ্যাপি।
আবার সেই সতীনপো-এর বৃত্তান্ত! পরের সুখই সকলের চোখে পড়ে।
চুল আঁচড়ে মদন ঘাড়ে গলায় একটু পাউডার দিল। বলল, আর কিছু না করুন, এবার একটা টেলিফোন লাগান। নইলে আমার ভারী অসুবিধে।
ঠিক আছে, অ্যাপ্লাই করব।
আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করবখন।

॥ ৪ ॥

ভুলে যাওয়ার এক অতুলনীয় ক্ষমতা আছে মদনের। আবার মনে রাখার ক্ষমতাও তার তুলনারহিত। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে সে জীবনের ফালতু ঘটনা, মানুষ বা কথাকে ভুলে যেতে পারে। যা তার প্রয়োজন তা প্রখরভাবে মনে রাখে।
ফিটফাট হয়ে যখন সে বাইরের ঘরে ঢুকল তখন সকালের অনেক ঘটনাই ভুলে গেছে। আবার বেশ কিছু ঘটনা তার মনেও আছে।
মনে রাখার মধ্যে আছে দুজন সাংবাদিক। আগাগোড়া দুই রিপোর্টার তার সঙ্গে লেগে আছে।
ঘরে ঢুকেই সে বলল, শচী, বলো খবর কী ?
শচী লম্বা কালো রোগা এবং ধূর্ত। চারদিকে মিটমিটে চোখে চেয়ে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলে, খবর তো আপনার কাছে দাদা।
ঘরের কথাবার্তা থেমে গেছে। সকলে এম পি-র দিকে তাকিয়ে। প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।
মদন চারদিকের মনোযোগটাকে খুব উপভোগ করে। দরজার কাছে রোগা ও অল্পবয়সী জয় তার চা এখনও শেষ করতে পারেনি। এবার এক চুমুকে শেষ আধপেয়ালা মেরে দিল।
মদন বলল, গত জুলাইয়ে মনসুন সেশনে আমি পার্লামেন্টে একটা বিলের ওপর খুব গুরুতর একটা প্রশ্ন তুলি। দিল্লি, এলাহাবাদ, বোম্বের কাগজে সেটা ফার্স্ট পেজে ফ্ল্যাশ করে। তোমাদের কাগজে তার সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। কেন শচী! বাঙালি এম পি বলেই কি তোমাদের এরকম মনোভাব ?
শচী জিব কেটে বলে, ছি ছি। কে না জানে, আমরা বাঙালি লিডারদের সবচেয়ে বেশি কভারেজ

দিই।

আমাকে দাওনি। কভারেজ আমি চাইও না। দি ইসু ওয়াজ ইমপরট্যান্ট। সেটা অন্তত কভার করা উচিত ছিল।

এজেন্সি আমাদের খবর দেয়নি তা হলে।

নিশ্চয়ই দিয়েছিল। পি টি আই, ইউ এন আই সকলে কভার করেছে। দেয়নি আমাদের দিল্লির করেসপন্ডেন্ট। আই হেট হিজ গাটস। তবে সনাতন মুখার্জিকে আমি চিনি। ওয়ান ডে উই উইল হ্যাভ এ শো-ডাউন।

সনাতনদার হয়তো দোষ নেই! খবরটা নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, নিউজ ডেসকে বাদ হয়ে গেছে।

তাই বা কেন হবে? নিউজ ডেসক কি ঘাস খায়? খবরের ইমপরট্যান্স বোঝে না?

আমি জেনে আপনাকে বলব মদনদা।

মদন দেখেছে, কনফ্রনটেশন দিয়ে দিন শুরু করলে তার দিনটা ভালই যায়। এইজন্য সে সকালের দিকে একটা ঝগড়া বা চেঁচামেচি বাঁধিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আজ শচীকে ধমকে তার বউনি বোধহয় ভালই হল।

ভোটের সময় মদনের পক্ষে পাণ্ডা ছিল শ্রীমন্ত। এতক্ষণ বাইরের রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছিল দু-তিনজনে মিলে। মদন বাইরের ঘরে এসেছে টের পেয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে একধারে একটা গদিআঁটা বড় সোফা, দুটো ছোট সোফা, কয়েকটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের পলিথিনের চেয়ার। সবটাতেই ঠাসাঠাসি ভিড়।

শ্রীমন্ত এসে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে কানে কানে বলে, হালদারের সঙ্গে একটু কথা বলে যাবেন। সবার হয়ে গেলে। প্রাইভেট।

শ্রীমন্তের কথা মানতেই হয় মদনকে। শ্রীমন্ত তার ডান হাত। মদন নিচু গলায় বলে, ফালতু লোক কিছু কাটিয়ে দে।

হরিদা তার ছেলেকে মেডিকেলে ভর্তি করানোর কথা বলতে এসেছে। কাল আসতে বলে দিই?

দে।

আর জয়?

ও কী চায়?

কিছু বলেনি। তবে কিছু চায় নিশ্চয়ই।

কাটিয়ে দে।

তা হলে ওদের নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। দুপুরে কি প্রেস ক্লাবে আসতে হবে?

আসিস।

শ্রীমন্ত ওঠে। পেটানো বিশাল চওড়া তার শরীর। একবার তাকালেই তার পেশা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। সে গিয়ে দরজার ভিড়টাকে প্রায় কোলে নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

একটা চেনামুখের দিকে চেয়ে মদন হাসে, কী খবর?

আধবুড়ো সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোকটি কিছু তটস্থ হয়ে বলেন, রেল বোর্ডে আমার কেসটার কথা তুলবেন বলেছিলেন।

কাগজপত্র কিছু দিয়েছিলেন আমাকে?

দিয়েছিলাম। গত জানুয়ারিতে।

ওঃ, তা হলে হারিয়ে ফেলেছি। মাঝখানে ফিলিপিনস মালয়েশিয়া সব যেতে হয়েছিল ডেলিগেশনে। ফিরে এসে দেখি, ফাইলে অনেক কাগজপত্র নেই।

তা হলে?

একটা চিঠি করে দিয়ে দেবেন আমার কাছে। দেখব।

কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই বাঁ ধারের বুক কেসের কাছে দাঁড়ানো এক মহিলা বললেন, বাবা, আমার কথাটা একটু শুনে নেবে? বাড়িতে ছোট বাচ্চা রেখে এসেছি। দূরও অনেক, সেই বোড়াল।

বলুন।
আমি মন্টু হাটির মা।
ও। মণ্টু কে যেন ?
আমার ছেলে। ওই বড়। মেজো নব।
নব ?
নীলু হাজরার খুনের দায়ে যে ছেলে জেল খাটছে।
মদন একটু নড়ে বসে, ও, তা কী চাই আপনার ? নবর জন্য তো আর কিছু করার নেই।
তার বউ বাচ্চা সব আমার ঘাড়ে। মণ্টু এক পয়সাও দেয় না। নব জেলে। আমি কী করে চালাই ?
আর্নিং মেম্বার কেউ নেই ?
না। নবর বউ একটা সেলাই স্কুলে কাজ করে। কিছু পায়। তাতে হয় না।
আমাকে কী করতে বলেন ?
নবর অফিসে যদি ওর বউয়ের একটা চাকরি হয়।
কোন অফিস ?
বেহালায়। সি সি পি কারখানা। বউ অনেক ধরাধরি করেছে, হয়নি।
কী বলে ওরা ?
খুনের বউকে চাকরিতে নেবে না।
সি সি পি না কী বললেন ?
সি সি পিই হবে বোধহয়। তাই তো শুনি।
আচ্ছা, বাইরে শ্রীমন্ত আছে। ওকে ডেকে ডায়েরিতে নামটা লিখিয়ে যান। দেখব।
দেখো বাবা।
একটা কথা বলব মাসিমা ? নীলু হাজরা ছিল আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। আমরা সবাই ভালবাসতাম তাকে। ভারী ভাল ছেলে ছিল।
নব হাটির বিধবা মায়ের চেহারাটা খুব নিরীহ ধরনের নয়। বয়স হলেও ডাকসাইটে স্বভাবের ছাপ আছে। কথাবার্তায় কোনও জড়তা নেই, ভয়ডর নেই। যে কোনও জায়গা থেকে কাজ আদায় করে আনার ক্ষমতা রাখে কিন্তু মদনের এই শেষ কথাটায় বুড়ি একটু কেমনধারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সন্দিহান চোখে মদনের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তা হলে কি ওর বউয়ের জন্য একটু বলবে না বাবা ?
মদন হাসল, খুন তো করেছে নব, ওর বউ তো নয়। বলব। তবে আমি দিল্লি হলে যতটা পারতাম এখানে ততটা তো পারি না। তবু বলে দেখব। কারখানার মালিক কে জানেন ?
কানোয়ার না কী যেন।
এই যে লম্বা চওড়া ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওই শ্রীমন্ত। রাস্তায় আছে, একটু খুঁজে নিয়ে তার কাছে সব লিখিয়ে দিয়ে যান। আপনার বউমার নামও।
আচ্ছা।
প্রেস ক্লাব থেকে দুপুরে একটা ফোন করল মদন।
মাধব ?
আরে মদনা ? কোত্থেকে ?
মালদার ইনটিরিয়ারে বান দেখতে গিয়েছিলাম।
দেখলি ?
দেখলাম। মেলা জল।
ফি বছরই অক্রুর সংবাদ। এখানে জল, সেখানে জল, মরছে ভাসছে গৃহহারা হচ্ছে। তোরা করছিস কী ?
দিল্লিতে বসে মোচ তাওড়াচ্ছি। কী করার আছে ? ভেসে যাক, সব ভেসে যাক।

দে ভাসিয়ে তবে শালা, দে ভাসিয়ে। কোথায় উঠেছিস ?

আবার কোথায় উঠব। মনোহরপুকুর।

দিদির হাত ছাড়িয়ে আমার গাড্ডায় চলে আয়। কদিন আছিস ?

পুজোটা থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। হচ্ছে না। দিল্লি থেকে ডেকে পাঠিয়েছে, আবার এক ডেলিগেশনে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে।

ভ্যানতারা রাখ। তোর ডেলিগেশনও চিনি, তোর অস্ট্রেলিয়াও চিনি। কদিন আছিস তাই বল।

আমি নেই রে। পরশুদিন চলে যাচ্ছি।

তা হলে আজ চলে আয়।

পাগল ! আজ দিদি ত্রিশ টাকা কিলোর চিংড়ি আনিয়েছে।

তা হলে কাল ?

দেখি। ঝিনুক কেমন আছে ?

ঝিনুক ঠিক ঝিনুকের মতো আছে। ক্যাপটিভ ইন হার ওন শেল।

আমি বাবা তোদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমগুলো একদম বুঝি না। মানুষের খাওয়া পরার সমস্যা আছে, আধিব্যাধি আছে, দুঃখ টুঃখও আছে, তবে তোদের সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার।

তোর সব কিছু বোঝার দরকার কী ? তুই যেমন দেশ কি নেতা মদনকুমার হয়ে আছিস তাই থাক না।

মদন খুব হো হো করে হেসে বলে, ইয়েস, মদন ইজ দেশ কি ন্যাতা। মদনাকে খুব সমঝে চলবি, বুঝলি !

আর সমঝাতে হবে না বাবা। ন্যাতাদের খুব ভক্তি মান্যি করি। ভাত কাপড় না দিক, কিলটাও আবার না বসায়।

বটেই তো। মদন গম্ভীর হয়ে বলে। তারপর গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলে, আরে শোন। নব হাটির মা এসেছিল আজ। ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায়।

ওপাশ থেকে মাধবের সাড়াশব্দ কিছুক্ষণ পাওয়া গেল না। বেশ একটু ফাঁক দিয়ে আস্তে করে বলল, ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায় ? নবর বউ সেই গৌরী না ?

হ্যাঁ। মদন একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বলে, খুব টেঁটিয়া বুড়ি। নব জেলে যাওয়ায় ওর বউ বাচ্চা নিয়ে নাকি বুড়ি বিপদে পড়েছে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যা পারিস করিস। ওদের দোষ কী ?

পাগল নাকি ? অনেক ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার ?

পলিটিকস করতে গেলে সব দিক বিবেচনা করে ডিসিশন নিতে হয়।

তুই কি নবর বউকে চাকরি দেওয়ার মধ্যে পলিটিক্যাল গেইন খুঁজছিস নাকি ?

আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু প্লে ইট সেফ, দেখতে হবে মতলবখানা কী। আমাকে ফাঁসাতে চায় কি না।

ধুস শালা। খেতে পাচ্ছে না, তাই তোকে মাতব্বর ধরেছে। এর মধ্যে অন্য মতলবের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে ?

পাবলিকের মন সবসময়েই ভারী সরল। আমাদের বুদ্ধি একটু প্যাঁচালো।

এই যে একটু আগে বললি মানুষের মনের ঘোঁরপ্যাঁচ বুঝিস না !

একেবারেই যে বুঝি না তা নয়। একটু একটু বুঝি, তবে তোর বা ঝিনুকের কথা আলাদা, তোদের তো কোনও বাস্তব সমস্যা নেই। তোরা কুঁথে কুঁথে সমস্যা তৈরি করছিস।

আমাদের ঘোরতর একটা বাস্তব সমস্যা রয়েছে। আমাদের কোনও বাচ্চা নেই।

আঃ হাঃ, সে তো আমারও নেই।

তোর নেই কে বলল ?

তা হলে আছে বলছিস ?

থাকতেই পারে। লেজিটিমেট না তো ইললেজিটিমেট, বিয়ে তো করলি না স্রেফ ভয়ে। পাছে বউ এসে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার তৈরি করায় বাগড়া দেয়।

বিয়ের বয়স যায়নি ব্রাদার। নাউ আই অ্যাম এ মোর এলিজিবল ব্যাচেলর।

ধুস শালা। এম পি একটা পাত্তর নাকি ? আজ আছে, কাল নেই।

কেন, লোকের মুখে শুনিসনি, পাঁচ বছর এম পি থাকতে পারলে সাত পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে চলে যায়।

তা বটে। তা হলে কাল তোকে এক্সপেক্ট করছি!

দেখা যাক।

দেখা যাক নয়। আমি আর ঝিনুক কাল বাসায় থাকব তোর জন্য।

খুব চেষ্টা করব, না পারলে ফোন করব, তোর বাসার ফোন ঠিক আছে তো ?

কপালজোরে আছে। গত মাসেও পনেরো দিন বিকল ছিল, কালও যে থাকবে না তা বলা যায় না।

জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর কথাই আমাদের ভাবা উচিত।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তোর মতো গাড়লরা গদিতে বসলে কী করে মানুষ উজ্জ্বল দিক নিয়ে ভাববে ?

খুব হেসে মদন বলল, আচ্ছা, আজ এ পর্যন্ত।

বলে ফোন রেখে দেয়।

॥ ৫ ॥

বাবা আধো অন্ধকার সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে বসে আছেন। মুখটা অস্পষ্ট, গায়ে একটা সাদা হাফশার্ট, পরনে খাকি রংয়ের প্যান্ট। টেবিলে কনুই, হাতের তেলোয় থুতনির ভর। একটু কুঁজো হয়ে চুপ করে চেয়ে আছেন। ভারী নির্জন চারদিক। শুধু পাখিরা ডাকাডাকি করছিল খুব। আর ঝিঁঝি। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল ঝিনুক। সে তখন ছোট, বছর দশেকের মেয়ে। দৃশ্যটা আজও সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মনে আছে।

বরাবরই বাবা চুপচাপ মানুষ! কঠিন, কর্তব্যপরায়ণ, কম কথার মানুষ। চেহারাটা লম্বা, মজবুত হাড়ের চওড়া কাঠামো, কালো, কর্কশ মুখশ্রী। তবু বাবার তুল্য পুরুষ ঝিনুক কখনও দেখেনি।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে বাবার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল তার। কিন্তু সে স্পষ্টই দেখল, বাবা সেই ঘরে ঠিক বসে নেই। শুধু শরীরটা পড়ে আছে, আসল বাবা অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে চলে গেছে বুঝি।

ঝিনুক আস্তে আস্তে সাহস করে এগিয়ে গেল কাছে।

বাবা, তোমার কী হয়েছে ?

বাবা আস্তে হাতখানা বাড়িয়ে ঝিনুকের চুলগুলো এলো করে দিল, হাঁটুর কাছে বুক চেপে উর্ধ্বমুখে ঝিনুক বাবার অস্পষ্ট মুখ দেখছিল। ভারী দুঃখী মুখ।

বাবা, তোমার মন খারাপ ?

না তো। এই একটু ভাবছি।

কী ভাবছ ?

তোমাদের কথা।

কেন বাবা ?

এমনি। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের কথা ভাবি।

ব্যস, এর বেশি আর কথা হয়নি, তবু কত গভীর কত স্পষ্টভাবে দৃশ্যটা তার কালের চিহ্ন এঁকে রেখেছে আজও মনের মধ্যে!

তুমি বড্ড বেশি বাবা-বাবা করো ঝিনুক, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই একটু অনুযোগের সুরে

কথাটা বলেছিল মাধব। তেমন কিছু নয় তবু তৎক্ষণাৎ নতুন স্বামীকে মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল সে। কোনও জবাব দেয়নি, ঝগড়া করেনি।

ঝিনুক ভাবে, আমার বাবার মতো যে তোমরা কেউ নও!

পুরুষরা ঝিনুককে কী চোখে দেখে তা সে জানে। পথে ঘাটে যেসব পুরুষ তার দিকে তাকায় তাদের কাছে সে স্রেফ গোলাপি মাংস। মাধবের কাছে সে ভারী একঘেয়ে, বিরক্তিকর, খিটখিটে মেয়েমানুষ। তার যদি ছেলে থাকত তবে সব অন্যরকম হত, পুরুষমানুষের প্রতি এত ঘেন্না থাকত না।

ঘেন্না? না, তাই বা বলে কী করে? পুরুষমানুষকে ঘেন্না পেলে সে কি বাবাকে অত ভালবাসতে পারত?

বাবার কথা ভেবে আজ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ঝিনুকের।

উদাসিনী ঝিনুক তার বটুয়াটা দোলাতে দোলাতে ভারী আনমনে হাঁটছিল, একজনের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা, হয়তো এক্ষুনি, হয়তো একশো বছর পর। কিন্তু হবে, সে মানুষ কেমন হবে তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে তার, স্পষ্ট কিছু জানে না। তবে এটুকু জানে, তার অনেকখানিই থাকবে এক প্রদোষের অন্ধকারের মতো রহস্যে ঢাকা। খানিকটা চেনা যাবে, অনেকখানি থাকবে অচেনা।

গড়িয়াহাটা ব্রিজের একদম মাঝখানে অনেকটা উঁচুতে উঠে ঝিনুক একটু ধীর হল। এপাশ ওপাশ দিগন্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল। কত দূর! কত দূর! পৃথিবীর অন্ত নেই। দুরন্ত বাতাস এসে লাগছে নাকে মুখে। উজ্জ্বল আলো, নীল আকাশ। মানুষ পাছে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা-টত্যা কিছু করে সেই ভয়েই বোধহয় ব্রিজের মাঝ বরাবর দুধারের রেলিং-এর সঙ্গে মস্ত উঁচু জালের বেড়া। জালের ধারে দাঁড়িয়ে একটু দেখতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু রাস্তার লোকজন তাকাবে, ভাববে। ঝিনুক দাঁড়াল না। কিন্তু খুব ধীর পায়ে ঢালু বেয়ে নামতে লাগল। নীচে একটা নদী থাকলে এই ব্রিজটা আরও কত ভাল লাগত। ঢালুর মুখেই তার মনে পড়ল, মোগলসরাই! মোগলসরাই। সে এক অদ্ভুত ভাল জায়গা। সেইখানে থাকার সময় মাঝে মাঝে জিপ জোগাড় করে তারা পুরো পরিবার বোঝাই হয়ে যেত বারাণসী। মাঝপথে মস্ত ব্রিজ, নীচে গঙ্গা। বাবা সেখানে জিপ দাঁড় করাবেই। আর তখন ওই বয়সে ঝিনুক সেই ব্রিজ থেকে গঙ্গার প্রবহমানতার দিকে চেয়ে মূক হয়ে যেত ভয়ে বিস্ময়ে। শক্ত করে বাবার হাত ধরে থাকত সে। নইলে যে ভীষণভাবে গঙ্গা টানত তাকে। কেবলই মনে হত, অনিচ্ছে সত্ত্বেও হয়তো সে লাফিয়ে পড়বে। আজও উঁচু জায়গা থেকে নীচে জল দেখলে হাত পা কেমন সুলসুল করে তার। সম্মোহিত হয়ে যায়। মনে হয় জল তাকে ডাকে। জল কি প্রেমিক!

আপনমনে একটু হেসে ফেলে ঝিনুক। কী অদ্ভুত সে! জল কি প্রেমিক? একথাটা মাথায় এল কী করে? মনটা বড় উড়ে উড়ে থাকে আজকাল, কোথাও বসতে চায় না। বড্ড বেশি কবিতা পড়ছে বলে নাকি?

ব্রিজ থেকে নেমে ডান ধারে পঞ্চাননতলায় একটু ভিতর দিকে শুক্তির বাসা। অনেক ঘাটের জল খেয়ে কয়েক মাস হল এক কাঁড়ি টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে একতলার ছোট একটা বাসা নিয়েছে। বোন কাছাকাছি আসায় ঝিনুক প্রায়ই একবার টুঁ মেরে যায়। বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট শুক্তি জমাট সংসারী। দুটি ছেলের মা। অজস্র সমস্যায় কণ্টকিত। সবসময়েই মুখে একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভয় পাওয়া ভাব।

ঝিনুক ঘরে ঢুকতেই শুক্তি বলে উঠল, উঃ দিদি রে, ঝি-এর অভাবে মরে গেলাম। দে না একটা ভাল দেখে ঝি। আজও আমাদেরটা কামাই করেছে। এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, অ্যাতো বাসি জামা কাপড় জমে আছে, ঘর মোছা হয়নি, কী যে করি।

ডানার ভর ছেড়ে ঝিনুক মাটিতে নামল। জাগল। চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, একটুও টিপটপ থাকতে পারছিস না। কী যে করে রেখেছিস ঘরখানা।

ছেলে দুটো যে হাড় বজ্জাত। সারাদিন গোছাচ্ছি, সারাদিন লণ্ডভণ্ড করছে।

ঝিনুক সামনের ঘরে সোফা কাম বেডের বিছানায় বসে হাঁফ ছেড়ে বলল, ঠিক আছে, আমি গিয়ে পুনমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজকের মতো ঘরদোর সেরে দিয়ে যাক।

ও বাবা! চোখ বড় করে শুক্তি বলে, পুনমকে দিয়ে কী হবে। ও মুসলমান যে!

ঝিনুক আর একটু জেগে ওঠে। তাই তো, মনে ছিল না। মানুষের কতরকম সমস্যা থাকে, যা তার নেই। ঝিনুকের একটু চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শুক্তির অবস্থা দেখে আর খেতে চাইল না। উঠতে উঠতে বলল, আচ্ছা, দেখব।

শুক্তি বাইরের ঘরেই বঁটি পেতে আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছে। গলা একটু নামিয়ে বলল, এ বাসাও ছাড়তে হবে। পিছন দিকে রেল লাইনের আশে পাশে গুণ্ডা বদমাস ওয়াগন ব্রেকারদের আড্ডা। কালও একটা ছেলেকে তাড়া করে ওই ভিতর দিকে নিয়ে গেল। মেরেই ফেলেছে বোধ হয়, আর কী বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গালাগাল, শোনা যায় না।

ঝিনুক চোখ বড় করে চেয়ে থাকে। পৃথিবীতে এসব-ও ঘটে! কত কী ঘটে! মানুষ কতরকম ভাবে বেঁচে আছে। সে নিজে অবশ্য এতসব টেরও পায় না। বালিগঞ্জের অত্যন্ত নির্জন সুন্দর পাড়ায় চমৎকার ফ্ল্যাটে থাকে সে। নিজস্ব ফ্ল্যাট, কোনও দিন ছাড়তে হবে না। তার কাজের লোকের অভাব কদাচিৎ হয়, কারণ সে প্রচুর টাকা মাইনে দিতে পারে। তবে কি শুক্তির চেয়ে সে সুখী?

শুক্তির দিকে একটু চেয়ে থেকে নিজের সঙ্গে মেলাল সে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। এভাবে মেলানো যায় না। সুখ দুঃখের তুলনা কিছুতেই হয় না কখনও। শুক্তির বাসায় পা দিলেই তার এক ধরনের কষ্ট হয়, হাঁফ ধরে যায়। সে নিজে নিঃসন্তান আর শুক্তি দু'টি ছেলের মা বলে তার কখনও হিংসে হয় না। শুক্তির ছেলে দুটোকে সে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে তার শুধু মনে হয়, একটা ছেলে থাকলে বেশ হত।

ঝিনুক অনেকটা জেগেছে। একটু ভেবেচিন্তে বলে, এবার তোরা একটা ফ্ল্যাট কিনে নে না।

টাকা কই? ফ্ল্যাটের যা দাম! এই তো দেখ, দেড় ঘরের ফ্ল্যাটের জন্য মাসে থোক চারশো টাকার মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে কী থাকে বল! আমাদের ওসব হবে টবে না। চিরকাল ভাড়া বাড়িতেই পচে মরব।

বাদবাকি সময় অনেক কথা হল, কিন্তু ঝিনুক তখন মাটি ছেড়ে উড়েছে আবার, ভারী আনমনা।

শুধু উঠবার মুখে শুক্তি বলল, একটা খবর শুনেছিস দিদি?

কী রে?

নীলুকে যে খুন করেছিল, সেই নব গুণ্ডা নাকি জেল থেকে পালিয়েছে।

ঝিনুক খুব আনমনে বলে, তাই নাকি? বলেই হঠাৎ চমকে উঠল সে। নীলু! নীলুকে কে খুন করেছে?

তোর ভগ্নীপতি কোথা থেকে শুনে এসে কাল রাতে বলল।

ঝিনুকের ভারী মুশকিল। শত চেষ্টাতেও সে মনটাকে কোনও একটা জায়গায় রাখতে পারে না। কত কথা শোনে, ভুলে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে নব গুণ্ডার কথাও সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু হঠাৎ রুমঝুম নূপুর বাজিয়ে শরতের কিশোরী বৃষ্টি এল। দু মিনিট। একটা সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল ঝিনুক। আর তখনই ওই সাদা রোদে মাখামাখি এক অপরূপ রুপালি বৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকে মনে পড়ল তার। নব হাটি। নব হাটি কী অদ্ভুত নাম। লোকটা জেল থেকে ছাড়া পেল কেন? না, ছাড়া পায়নি তো! পালিয়েছে। তাই তো বলছিল শুক্তি! রুপোলি বৃষ্টির নাচ দেখে কেন কথাটা মনে হল? একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই! কিন্তু নবর কথা নয়, বার বার নীলু এসে হানা দিচ্ছে মনের মধ্যে, যেন এক পাগলা বাতাস। ঝিনুকের ভিতরে উড়ে যাচ্ছে কাগজের টুকরো, উড়ছে পর্দা, ভেঙে পড়ছে কাচের শার্সি। ওলট পালট। ওলট পালট।

বৃষ্টি থামল। মেঘভাঙা রোদ অজস্র গয়নার মতো পড়ে আছে চারপাশে। গলির মুখে এসে একটা রিকশা নিল ঝিনুক। নইলে চটি থেকে কাদা ছিটকে দামি শিফনের শাড়িটায় দাগ ধরাবে।

বাড়িতে ফিরে ঝিনুক বাইরের ঘরে পাখাটা চালিয়ে একটু বসে। এ তার বহুদিনের অভ্যাস।

সেন্টার টেবিলের নীচের থাকে একটা দামি সিগারেটের খালি প্যাকেট।

ঝিনুক ভ্রূ কোঁচকায়। মনে পড়ে না। কার প্যাকেট ? কে ফেলে গেল ? মাধব তো এ সিগারেট খায় না!

নিচু হয়ে প্যাকেটটা তুলে নেয় ঝিনুক। দু হাতে ধরে চেয়ে থাকে যত্নে। কোনও মানে হয় না। মনে পড়বে না।

কিন্তু চোখ তুলতেই মনে পড়ল। ঠিক এই সোফায় বসে কাল দুপুরে অনেক সিগারেট খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। কী অদ্ভুত ওর সেই বসে থাকা! ওর বউ শর্মিষ্ঠা গেছে পুজোর বাজার করতে! ওর ছোট ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। আর ও বাইরের ঘরে অদ্ভুত মুখ করে বসে আছে।

ঝিনুক সব জানে। সব জানে। বৈশম্পায়ন কেন আসে ফিরে ফিরে। ঈশ্বর

বার বার উঠি উঠি করছিল বৈশম্পায়ন। বাইরে গিয়ে ঘড়ি দেখছিল শর্মিষ্ঠা ফিরছে কি না। আসলে তো তা নয়। এই একা বাড়িতে ঝিনুকের মুখোমুখি বসে থাকা তার কাছে অস্বস্তিকর। বড় অস্বস্তিকর।

মনে মনে ভারী হাসে ঝিনুক। অত যদি লজ্জা তবে ফটো তুলেছিলে কেন ?

ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। এমনকী বৈশম্পায়নও জানে না যে, ঝিনুক জানে। বৈশম্পায়নের কাছে কথাটা কখনও বলেনি সে। স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে যেমন প্রথম পরিচয় এবং তারপর কিছু ঘনিষ্ঠতা হয় তার বেশি কিছুই করেনি ঝিনুক। কিন্তু তার এই একটা ঘটনার স্মৃতি আছে। বৈশম্পায়নকে এই তার প্রথম দেখা নয়, বৈশম্পায়নেরও নয় ঝিনুককে প্রথম দেখা।

শুকুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতে বলাই সিংহী লেন ধরে আমহার্স্ট স্ট্রিট পেরিয়ে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে যেত ঝিনুক। আর তখন ডান দিকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে রামমোহন রায় হোস্টেল থেকে কয়েকটা ছেলে রোজ লক্ষ করত তাকে।

ঝিনুক শুধু একজনকেই লক্ষ করেছে। অনুগত, বিশ্বাসী ভক্তের মতো, দোতলার এক জানালায় তার কামাই ছিল না কখনও। তবে সে মাঝে মাঝে নেমে আসত, পিছু নিত। বহু দূর ঘুরে উল্টো দিক দিয়ে এসে মুখোমুখি হত। তবে সাহসের অভাবে কখনও কথা বলেনি। সেই নীরব ভালবাসা কিশোরী ঝিনুকের সর্বাঙ্গে বকুলের মতো ঝরেছে তখন। এক বছর গড়িয়ে যাওয়ার মুখে একদিন ঝিনুক দোতলায় ছেলেটিকে খুঁজে পেল না। একটু অবাক হয়েছিল সে। ছেলেটা গেল কোথায় ?

ছেলেটা আসলে কোথাও যায়নি, শুধু জায়গা বদল করেছিল। নীচের তলায় হোস্টেলের কমনরুমে টুকটাক টেবিল টেনিসের আওয়াজ পেয়েছে ঝিনুক। সেই কমনরুমের খোলা জানালায় চোখের কাছে ক্যামেরা তুলে তাক করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা। ঝিনুক তাকাতেই শাটার টিপল। তারপর খুব ভয়-পাওয়া ক্ষীণ গলায় বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আর দেখা হবে না।

ঝিনুক জবাব দেয়নি। আজকালকার ছেলেমেয়ে হলে কবে লটরপটর করে ফেলত। কিন্তু তারা পারেনি। শুধু একটু মনখারাপ হয়েছিল ঝিনুকের। আর দেখা হবে না ?

অবশ্য না হলেই বা কী ? উঠতি বয়সের সুন্দরী ঝিনুক তার পরেও কত পুরুষের দৃষ্টিতে স্নান করেছে।

কিন্তু বৈশম্পায়ন ঠিক বলেনি। দেখা তো হল। কেউ কাউকে চেনা দিল না। কিন্তু চিনতে পারল ঠিকই। ঘটনাটা মনেই থাকত না ঝিনুকের, যদি সেদিন বৈশম্পায়ন ছবি না তুলত। বড় জানতে ইচ্ছে করে, সেই ছবিটা আজও বৈশম্পায়নের কাছে আছে কি না।

সিগারেটের প্যাকেটটা ঝিনুক আরও কিছুক্ষণ দেখল চেয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ট্র্যাশ বিন-এ ফেলে দিয়ে আসবার সময় শুনল, ফোন বাজছে।

ঝিনি ?

হ্যাঁ।

একটা খবর আছে।

কী খবর ?

মদনা এসেছে।

মদনাটা আবার কে ?

আরে মদনা, আমাদের মদনা। এম পি।

তাতে কী হল ?

না বলছিলাম, ওকে কাল খেতে বললে কেমন হয়।

সে তুমি বুঝবে। আমি কী বলব ?

না, না, মানে বাড়িতে তেমন কোনও ঝামেলা কোরো না। ভাবছিলাম, চীনে রেস্টুরেন্টের খাবার নিয়ে যাব।

ভয়টা তো খাবার নিয়ে নয়।

ও হো হো, তুমি যা পাজি হয়েছ না! আচ্ছা, এবার খুব ছোট একটা বোতল খোলা হবে।

সে তুমি খোলো গিয়ে। কাল আমি শুক্তির বাসায় গিয়ে বসে থাকব বিকেলে।

আরে, কী যে মুশকিল। এবার ঝামেলা হবে না, ঠিক দেখো। আরে, আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে। আগের মতো বেহদ্দ ছেলেমানুষ আছি নাকি ?

তোমার ফ্ল্যাট, তাতে তুমি যা খুশি করবে। আমার কী ? আমি থাকব না।

এই কি প্রেম ঝিনি ?

সেটাও তুমি বুঝে দ্যাখো।

এটা প্রেম নয়।

আমি তো প্রেম চাই না।

তা বটে। তুমি সত্যিই প্রেম চাও না। মাধবের একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা হলে ড্রাই হোক ?

সে তোমার খুশি।

বিয়ারে আপত্তি নেই তো! ওটা তো মদের ক্যাটাগোরিতে পড়ে না।

ওসব আমি জানি না। মদনার গলা জড়িয়ে ধরে তুমি বদনা বদনা খাও। আমি সং সেজে বসে থাকতে পারব না।

না হয় তুমিও একটু খাবে। স্বাদটা জেনে রাখা ভাল।

আমার স্বাদের দরকার নেই।

আচ্ছা তা হলে ড্রাই। এক্সট্রিমলি ড্রাই। ও কে ?

কী একটা জরুরি কথা বলা দরকার যেন মাধবকে। কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ বলা দরকার। ভীষণ দরকার।

শোনো, একটু ধরে থাকো। জরুরি কথা আছে।

মনে পড়ছে না ?

না। তবে পড়বে।

ধরে আছি। তুমি বরং কথাটা মনে করার চেষ্টা না করে বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে জল দাও। গুনগুন করে একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও। মনটাকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখো। তা হলে হঠাৎ মনে পড়বে।

আঃ, একটু চুপ করো না! এক্ষুনি মনে পড়বে।

চুপ করছি। কিন্তু তুমি একটু অন্য কথা ভাবো না ঝিনি! মনে করো আমরা সেই উশ্রী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছি। তুমি উঠতে ভয় পেয়েছিলে বলে ওঠা হল না। মনে পড়ে ?

মোটেই ভয় পাইনি। এক সাধু আমাদের উঠতে বারণ করেছিল।

ওই হল। সাধু ভয় দেখিয়েছিল, আর তুমি ভয় পেয়েছিলে।

সাধু ভয় দেখায়নি। সাবধান করেছিল।

এবার মনে পড়েছে ?

কী ?

জরুরি কথাটা ?

না, কিন্তু মনে পড়বে।

মনে করার চেষ্টা কোরো না। খবরদার। বরং আমাদের সেই বীভৎস মধুচন্দ্রিমার কথাটা মনে করো। নিছক বাঙালি বলে কিছু ছেলে সেবার সমুদ্রের ধারে আমাদের কী রকম হেকেল করেছিল। নতুন বউয়ের সামনে আমি একটু রুস্তম হতে গিয়ে কী রকম...

আঃ, চুপ করো না। ওসব কথা বলে আরও সব গুলিয়ে দিচ্ছ আমার। দাঁড়াও আসছি।

এই বলে ক্র্যাডলের পাশে রিসিভার রেখে দ্রুত পায়ে শোওয়ার ঘরে ঢোকে ঝিনুক। খুব ভাল সুগন্ধ মাখলে তার মন স্বচ্ছ হয়ে যায়। নিউ মার্কেট থেকে কেনা দুর্দান্ত একটা জার্মান সেন্ট আছে। ক্যাবিনেট খুলে বুকে সেইটে দুবার স্প্রে করে ঝিনুক। সম্মোহনের মতো গন্ধ। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

শিশি জায়গা মতো রেখে উঠে আসতে গিয়ে নীলুর ছবিটা চোখে পড়ল। ভাগ্যিস!

ফোন তুলে ঝিনুক বলে, নীলুকে যে খুন করেছিল তাকে মনে আছে ?

একটু চুপ করে থেকে মাধব যখন কথা বলল ফের, তখন সে অন্য মানুষ। এতটুকু রস-রসিকতা নেই গলায়। ধীর স্বরে বলল, আছে। কেন ?

তার নামটা কী ?

নব হাটি।

সেই নব জেল থেকে পালিয়েছে।

এবার এতক্ষণ চুপ করে থাকে মাধব যে, ঝিনুকের একবার সন্দেহ হয় ওপারে কেউ নেই।

শুনছ ?

শুনছি। তোমাকে কে বলল ?

শুক্তি।

শুক্তি জানল কী করে ?

ওকে বলেছে বিনায়ক।

বিনায়ক কার কাছে খবর পেল ?

অত শত জিজ্ঞেস করিনি। তবে মনে হল, খবরটা জরুরি। তোমাকে জানানো দরকার।

খবরটা খুবই জরুরি। ভীষণ জরুরি। তোমাকে ধন্যবাদ ঝিনি।

॥ ৬ ॥

কাল থেকে শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে বৈশম্পায়ন। ডাক্তার বলেছে, রেস্ট নিন। কিন্তু মনে অস্থিরতা থাকলে কী করে মানুষ বিশ্রাম করবে কে জানে।

কালীঝোরার ডাকবাংলো থেকে সেই কবে তিস্তার উপত্যকা দেখেছিল বৈশম্পায়ন! সেই উপত্যকা আর নদী কী করে আস্তে আস্তে হয়ে গেল মৃত্যুর উপত্যকা, মৃত্যু নদী! এত সুন্দর একটি নিসর্গ দৃশ্যকে মৃত্যুর রং মাখিয়েছে কে ? সে নিজেই কি ? নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে বৈশম্পায়ন।

আলিপুরদুয়ার কোর্টে সে বেশ মনের সুখে রাজত্ব করছিল। বাঁশবনে শেয়াল রাজা, বখেরা বাঁধল মানুষের ভাল করতে গিয়েই। বছুরে বন্যার পর সেবার গাঁ গঞ্জে যখন ভীষণ অসুখ বিসুখ দেখা দিল তখন সরকারি ডাক্তারদের অনেক বলে কয়েও সে গ্রামে যেতে রাজি করাতে পারেনি। নতুন চাকরিতে তখন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সে টগবগ করছে। একটা সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই সে ডাক্তারদের গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছিল। প্রথম রাউন্ডে জিতেই গিয়েছিল সে। ডাক্তাররা গ্রেফতার হল, জামিন পেল, তাদের বিরুদ্ধে কেস তৈরি করতে লাগল পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে গেল কলকাতায়। কাগজে খবর বেরোল। প্রতিক্রিয়াটা হল বিশাল রকমের। আলিপুরদুয়ারের ডাক্তাররা এই ঘটনার প্রতিবাদে রুগি দেখা বন্ধ করে দিল। সে এক বিশাল

হই-চই। পুরো ব্যাপারটাই তার হাতের বাইরে চলে গেল, যখন একটি বড় রাজনৈতিক দল লেগে গেল পিছনে। রোজই তার অফিসে আর বাড়িতে মিছিল আসতে লাগল। গদি ছাড়ো, গো ব্যাক ইত্যাদি ধ্বনি দিত তারা। দু দফায় আটচল্লিশ ঘণ্টা করে ঘেরাও থাকল সে। চিতু নামে একটা ছোকরা প্রায়দিনই মিছিলে বক্তৃতা দিতে উঠে যা খুশি বলত তার উদ্দেশে। তখন বৈশম্পায়নের পাশে পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, একটা লোকও তার পক্ষে নয়। কলকাতা থেকে বড় অফিসার তদন্তে এসে খুব সন্তোষ দেখালেন না বৈশম্পায়নের প্রতি। বৈশম্পায়ন একবার তার নিরাপত্তার কথা তুলেছিল। অফিসার বললেন, পুলিশ প্রোটেকশন তো আছে।

এ অবস্থায় পুলিশ কী করবে ? ওরা কো-অপারেট করছে না।

তা হলে কলকাতা চলে যান। ছুটি নিন।

তে-এঁটে, গোঁতো বৈশম্পায়ন তবু ছিল। তখন ডুমকি হবে, তাই শর্মিষ্ঠা ছিল কলকাতায় বাপের বাড়িতে। হঠাৎ টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, শর্মিষ্ঠা সিরিয়াস। কাম শার্প।

বৈশম্পায়ন টেলিগ্রাম পেয়ে পাগলের মতো কলকাতায় রওনা হচ্ছিল। বাধা পেল ঘেরাওয়ে।

চিতু মধ্যমণি। বৈশম্পায়ন টেলিগ্রামটা তাকে দেখিয়ে মিনতি করল, বড় বিপদ আমার। এ সময়টায় যদি কনসিডার করেন।

চিতু মৃদু হেসে বলল, এটা পুরো ফল্স টেলিগ্রাম। চালাকি করবেন না। এসব কায়দা অনেক পুরনো।

তখন শর্মিষ্ঠা ছিল ভীষণ প্রিয়, অকল্পনীয় আপন। সেই শর্মিষ্ঠা বাঁচে কি মরে ঠিক নেই, আর কতগুলো ইঁদুর তাকে আটকে রাখবে ? বৈশম্পায়ন মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। লাফিয়ে গিয়ে টুটি টিপে ধরেছিল চিতুর, তোকে আজ খুন করে ফেলব শুয়োরের বাচ্চা

হাসপাতালে যখন সংজ্ঞাহীনতা থেকে আধো-চেতনায় ফিরে আসছিল বৈশম্পায়ন তখনই সে জীবনে প্রথম শুনেছিল মৃত্যু-নদীর গান। চারদিকে হিম সাদা অনন্ত পাথর, নির্জন উপত্যকা আর উৎস ও মোহনাহীন এক নদী। সেই থেকে নদী সঙ্গে আছে। দপ করে চেতনা জুড়ে জেগে ওঠে। তখন সংসারের সব কিছুই অর্থ হারিয়ে ফেলে।

চিতু মিথ্যে বলেনি। টেলিগ্রামটা ফল্সই ছিল বটে। সে যখন আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তখন কলকাতার এক নারসিং হোমে নির্বিঘ্নে শর্মিষ্ঠা আট পাউন্ডের স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে প্রসব করেছে। ডুমকির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এল বৈশম্পায়নের জীবনে পরিবর্তন। ডুমকি লক্ষ্মীমন্ত ছেলে।

রাতে দুটো কামপোজ খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। তবু যে খুব ভাল ঘুম হয়েছে এমন নয়। শরীরে গভীর ক্লান্তি, মনে হাজার বছরের স্মৃতির ভার। ডাক্তার বলেছে স্নায়ুর অবসাদ, টেনশন, প্রেশার একটু কম।

কিন্তু আসলে তা তো নয়।

শর্মিষ্ঠা আজও বেরোচ্ছে পুজোর বাজার করতে। কাল একা একা তেমন সুবিধে করতে পারেনি। বুবুম থাকবে বাচ্চা ঝি সাবিত্রীর কাছে। বৈশম্পায়নও একটু একা হতে চাইছে। জীবনে একার জন্য একটু সময় করে নেওয়া যে কত প্রয়োজন।

শোওয়ার ঘরে কাপড় বদলাতে এসে শর্মিষ্ঠা বলে, আজ আর একদম সিগারেট খাবে না।

হুঁ। বালিশে মুখ ঢুকিয়ে রেখে বৈশম্পায়ন জবাব দেয়।

হুঁ নয়, একদম খাবে না।

আচ্ছা।

আমার যদি দেরি হয় তবে সাবিত্রী তোমাকে খেতে দেবে। খেয়ে নিয়ো।

আচ্ছা।

শর্মিষ্ঠা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখের প্রসাধন সেরে নিল। এবার শাড়ি পরবে। স্টিলের আলমারির দরজা ঘড়াম করে খুলে শাড়ি বাছতে বাছতে বলল, ঝিনুক একটু অন্যরকম। আমাদের মতো নয়। না ?

বৈশম্পায়ন জবাব দেয় না।

কাল অতক্ষণ ওদের বাড়িতে বসে থাকলাম ও কিন্তু একদম পাত্তা দিতে চাইছিল না! অথচ এক একদিন দেখলে এমন করে যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছে!

বৈশম্পায়ন এবারও জবাব দেয় না।

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ওদের সম্পর্ক কেমন গো?

কাদের?

ঝিনুক আর মাধববাবুর?

খুব ভাল। দুজন দুজনকে চোখে হারায়।

শর্মিষ্ঠা মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয় না।

নাই বা হল, তাতে ওদের কিছু যায় আসে না।

তুমি তো সব ভাল দেখো। আমার মনে হয় ওদের সম্পর্কটা খুব কোল্ড।

তুমি জানো না।

ওরা স্বামী স্ত্রী আলাদা খাটে শোয়। জানো?

জানি! ওটাই আজকালকার ফ্যাশন।

একসঙ্গে না শুলে আবার স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা কী? আমি তা কিছুতেই পারব না।

একসঙ্গে শোওয়াটাই কি ভালবাসা?

তা নয়। তবে ভালবাসা থাকলে আলাদা শোওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

তোমার সব অদ্ভুত যুক্তি। বৈশম্পায়ন একটু হাসে, খাট আলাদা বলেই কি মনও আলাদা?

শর্মিষ্ঠা রেগে গিয়ে বলে, তোমরা পুরুষরা কিছু বোঝো না। কেবল তত্ত্ব দিয়ে সব জিনিসকে বিচার করো। মানুষ তো থিয়োরি নয়। তার অনেক ব্যাপার আছে। আমি কাল পুনমের সঙ্গে কথা বলেও বুঝলাম, ওদের সম্পর্ক তেমন ভাল নয়।

গোয়েন্দাগিরি করছিলে?

একে গোয়েন্দাগিরি বলে না। ওদের ফ্ল্যাটটা অত সুন্দর, অত সাজানো, ওদের অত টাকা, দেখলে মনে হয় ভাগ্য যেন ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি ভাল তো ভাল নয়। তাই ভাবছিলাম কোথাও একটু গোলমাল আছেই।

তাই ঝিয়ের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলে?

খোঁজ আবার কী? কথা বলছিলাম। বলতে বলতে অনেক কথা ফাঁস হয়ে গেল।

কী কথা ফাঁস হল?

মাধববাবু নাকি আজকাল খুব মদ খায়।

বরাবরই খেত।

আজকাল বেশি খায়।

না, বরং ঝিনুকের শাসনে আজকাল কমিয়েছে।

তুমি জানো না।

আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।

শর্মিষ্ঠা আপস করে বলল, আচ্ছা সে না হয় মানলাম। কিন্তু ঝিনুক নাকি একদম বাসায় থাকতে চায় না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

তাতে কী?

বোঝো না কেন? অত সুন্দর ফ্ল্যাটেও ওর মন বসে না কেন এটা তো ভাববে?

ও বরাবরই উড়নচণ্ডী।

আচ্ছা বাবা। তুমি যে ঝিনুকের পক্ষ নেবে তা জানতাম। যা ড্যাব ড্যাব করে দেখছিলে ওকে।

বৈশম্পায়ন একটা ধমক দেয়, বাজে বোকো না। কাল আমার যা শরীরের অবস্থা ছিল তাতে মেরিলিন মনরোর দিকেও তাকানোর মেজাজ ছিল না।

শর্মিষ্ঠা সাবিত্রীকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একা হয়ে বৈশম্পায়ন উঠল। স্টিলের আলমারির মাথায় একটা অব্যবহৃত অ্যাটাচি কেস আছে তার। সব সময়ে চাবি দেওয়া থাকে। সেইটে নামিয়ে খুলল বৈশম্পায়ন। একটা পুরনো মনিব্যাগের খোপ থেকে সোয়া দুই ইঞ্চি বর্গ মাপের ফটোটা বের করে।

ঝিনুক! কী সুন্দর!

যে ভইগল্যান্ডার ক্যামেরায় ছবিটা তোলা সেটাও বহুকাল আগে চুরি হয়ে গেছে। ঝিনুক পরস্ত্রী।

ছবিটা তবু কত জীবন্ত! সাদা ফ্রক পরা ঝিনুক ডান হাতটা তুলে কোমরের বেল্টটা ঠিক করছে। বাঁ ধারে ঝুলছে বইয়ের ব্যাগ। বব করা চুলে রিবন বাঁধা। পিছনে লাহা বাড়ির দেয়ালে ইটের খাঁজে খাঁজে সকালের রোদ আর ছায়ার চৌখুপি। একটা অশ্বত্থ চারা। এই তো যেন গত কালকের কথা।

মেজদা!

একটু চমকে বৈশম্পায়ন তাকিয়ে দেখে, ঘরের দরজায় জয়। ভারী লজ্জা পেয়ে ছবিটা বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলতে গিয়ে আরও ধরা পড়ে যায় সে। জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে তার সবটুকু অপকর্ম লক্ষ করল। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

কী খবর? আজ অফিসে যাসনি?

তুমিও তো যাওনি।

আমার শরীরটা ভাল নেই।

পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা জয় ঘরে ঢুকে একটা মোড়ায় বসে বলে, কাল মদনদা এসেছে।

জানি।

কাল থেকে মদনদার সঙ্গে ঘুরছি। ওঃ, কত মিটিং, কত কনফারেন্স, আর কী সব লোক! জয়ের চোখে একটা সম্মোহিত ভাব!

জয় যে মদনের একজন চামচা তা বৈশম্পায়ন জানে এবং মোটেই ভাল চোখে দেখে না। একটু বিরক্ত হয়েই বলে, ওর পিছনে ঘুরছিস কেন?

মদনদাই বলল, জয় আমার সঙ্গে একটু থাক!

তাই থাকলি? তোর কাজকর্ম নেই?

কাজকর্ম আবার কী? অফিস তো? তা সেই অফিসের চাকরিও তো মদনদাই করে দিয়েছে। ও চাকরি যাবে না। মদনদার সঙ্গে ঘুরলে খুব তাড়াতাড়ি ফিল্ড ক্রিয়েট হয়।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, কীসের ফিল্ড?

পলিটিক্যাল ফিল্ড! গতকাল স্টেট সেক্রেটারির সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা হল। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের পার্টি আবার বেশ শক্ত হয়ে উঠছে। অবশ্য অপোজিশনও আছে। নিত্য ঘোষ মদনদার লিডারশিপ মানতে চাইছে না।

জয় হয়তো ভবিষ্যতে এম পি বা মিনিস্টার হতে চায়। ভেবে বৈশম্পায়ন একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাইদের মধ্যে এই জয়টাই সবচেয়ে গবেট। মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন নয়। তবু ওই হয়তো একদিন মন্ত্রীটন্ত্রী হয়ে বসবে। কিছুই অসম্ভব নয়। বৈশম্পায়ন কিছু বলার খুঁজে না পেয়ে গম্ভীর মুখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, ভাল।

তোমাকে বলতে এলাম, মদনদা তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চেয়েছে।

কেন?

বলল, কী দরকার আছে। বহুকাল দেখা হয় না। আজ বিকেলে কেয়াতলায় মাধবদার বাড়িতে রাত্রে তোমার খাওয়ার নেমন্তন্ন। ওখানে মদনদাও আসবে।

মাধবের বাড়িতে! বলে আবার ভ্রূ কোঁচকায় বৈশম্পায়ন। কিন্তু তার বুকের মধ্যে ধক ধক করে ধাক্কা লাগে। ঝিনুক! কী সুন্দর!

একটা খবর শুনেছ মেজদা?

কী খবর ?

নব হাদি জেল থেকে পালিয়েছে।

সামান্য চমকে উঠে বৈশম্পায়ন বলে, সেই ডেঞ্জারাস ছেলেটা না ? যে নীলুকে খুন করেছিল ?

হ্যাঁ, একসময় মদনদার হয়ে খুব খাটত। পরে বিট্রে করে।

কী করে পালাল ?

জেলখানার লোকদের হাত করেছিল বোধ হয়। মামলার সময় কোর্টেই বলেছিল, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেককে দেখে নেবে।

কাকে দেখে নেবে ?

যারা ওকে খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে। বলে জয় একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে বলে, কেউ কেউ বলে বটে যে, নব খুনটা করেনি। তবে আমি জানি, করেছিল।

তুই কী করে জানলি ?

মদনদা বলেছে।

মামলার সময় তুই কোর্টে যেতিস ?

রোজ। সব সওয়াল জবাব মনে আছে।

নব দোষ কবুল করেছিল ?

না। বার বার শুধু বলত, দোস্তকে দোস্ত কখনও খুন করতে পারে ? নীলু আমার জিগির দোস্ত ছিল।

বৈশম্পায়ন মুখ বিকৃত করে বলে, এ খুনটা না করলেও নব আরও বহু খুন করেছে। সে সবের জন্য ওর সাত বার ফাঁসি হওয়া উচিত।

জয় মাথা নেড়ে বলে, সে ঠিক কথা। কিন্তু নীলুর কেসটায় ওর খুব প্রেস্টিজে লেগেছিল। ও জজকে বলেছিল, আমার হাতে অনেক লাশ পড়েছে। সে সব কেসে আমাকে জেল দিন, ফাঁসি দিন, কোই বাত নেহি। কিন্তু নীলুর কেসে আমাকে ঝোলাবেন না। আমি আমার দোস্তকে খুন করিনি।

এখন নব জেল থেকে বেরিয়ে কি শোধ তুলবে নাকি ?

জয়ের মুখটা একটু বিবর্ণ দেখায়। তবে গলায় জোর এনে বলে, অতটা কি করবে ? কে জানে। তবে নব ক্ষেপে গেলে অনেক কিছু করতে পারে। আজ সকালে খবরটা শোনার পর থেকে মদনদাও একটু ভাবনায় পড়েছে। আর মজা দেখো, গতকালই নবর মা এসেছিল নবর বউয়ের জন্য মদনদার কাছে চাকরি চাইতে।

মদন কি চাকরি দেবে ?

মদনদা তো কাউকে না বলে না। চেষ্টা করবে বলে বুড়িকে কাটিয়ে দিয়েছে। পরে আমাকে বলেছে, নবর বউকে চাকরি দিলে পলিটিক্যাল রি-অ্যাকশন খারাপ হবে। কিন্তু আজ সকালে খবরটা পাওয়ার পর মদনদা ডিসিশন চেনজ করেছে।

চাকরি দেবে ?

চেষ্টা করবে।

রাতারাতি মত পাল্টে ফেলল ?

পাল্টানোই ভাল। নব বেরিয়েছে। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। জানের পরোয়া নেই তো।

মদন তা হলে ভয় পেয়েছে ?

না না। মদনদা অত ডরায় না। কত খুন জখম পার হয়ে এসেছে।

বৈশম্পায়ন মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তখন তো এম পি ছিল না।

জয় কথাটার অর্থ ধরতে পারল না। বলল, তা ছাড়া মদনদার নাগাল পাওয়া কি সোজা ? শ্রীমন্তদা আছে, আমরা আছি, ভি আই পি বলে কথা। চাইলেই পুলিশ এসে যাবে। দুদিন বাদেই যাচ্ছে দিল্লি হয়ে অস্ট্রেলিয়া। নব মদনদাকে পাবে কোথায় ?

বৈশম্পায়ন চিন্তিত মুখে বলে, শুধু মদনই তো নয়, আরও অনেকের ওপর নবর রাগ আছে।

সবচেয়ে বেশি রাগ মাধবদার ওপর। মাধবদার চোখের সামনেই তো খুনটা হয়। নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে তো মাধবদা মিথ্যে সাক্ষী দেবে না।

বৈশম্পায়ন মাধব আর নীলুর সম্পর্কটা জানে। কিন্তু সে কিছু বলল না। ব্যাপারটা মাধবও চাপা রাখতে চায়। বাইরের কেউ তেমন জানে না। বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে মামলায় তুইও ছিলি না?

না। আমি কোর্টে যেতাম।

নব তোকে চিনে রাখেনি তো?

জয় হাসে নব আমাকে এমনিতেই চেনে। তবে নীলু হাজরার ব্যাপারে নয়।

তবু সাবধানে থাকিস।

আমার কোনও ভয় নেই। আজ উঠি। তুমি কিন্তু বিকেল-বিকেল মাধবদার বাড়ি চলে যেয়ো।

জয় চলে গেলে বৈশম্পায়ন কিছুক্ষণ নব হাটি মাধব আর মদনের কথা ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁধ ভাঙা ঢেউয়ের মতো এল একটাই চিন্তা আজ আবার ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হবে।

একজন এম পির উচিত খুব ভোরবেলা উঠে সূর্যোদয় দেখা। একজন এম পির উচিত কিছুক্ষণ পাখির গান শোনা। একজন এম পির উচিত ভোরবেলা কিছুক্ষণ নিরুদ্বেগ চিত্তে বেড়ানো। গুনগুন করে একটু গানও তার করা উচিত। আর উচিত দিনের মধ্যে কিছুটা সময় একা একা থাকা এবং সেই সময় যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে একটু আত্ম-বিশ্লেষণ করা। একজন এম পির পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে কিছুক্ষণ তার ভুলে যাওয়া উচিত যে, সে একজন এম পি। যদি সে তা পারে তবে একজন এম পির উচিত সুযোগ পেলেই বাচ্চাদের মুখ ভেঙানো।

মদন সাধারণত সকালে উঠতে পারে না। অনেক রাত জেগে কিছু লেখাপড়া করা তার স্বভাব। বস্তুত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একমাত্র রাত বারোটার পর ছাড়া সে এসব করার সময় পায় না। ফলে ভোরবেলা উঠতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায় খুব।

আজ ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ঘুম ভেঙেই মদন একেবারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। রোজ ঘুম ভাঙার দেড় দুই মিনিটের মধ্যেই তার মনে পড়ে যায় যে, সে একজন এম পি। আজ তা পড়ল না। দিদির বাইরের ঘরের জানালা দিয়ে ভোরের একটু বাতাস আসছিল। কাছে পিঠে রুগ্‌ণ কিছু গাছপালা এখনও আছে। বাতাসে তারই নির্ভুল গন্ধ। রাতে কোনও সময়ে একটু বৃষ্টিও হয়ে গিয়ে থাকবে। ভেজা ভাবটা বাতাসে এখনও রয়ে গেছে। ফলে ভোরবেলাটি খুবই চমৎকার মনে হচ্ছিল মদনের।

সে উঠে টক করে বেসিনে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা মারল কিছুক্ষণ। চোখ কট করে উঠল জ্বালায়। এখনও শরীরে যথেষ্ট ঘুম দরকার। পায়ের দিকে সোফার ওপর কালকের ছেড়ে রাখা ধুতি আর পাঞ্জাবি অভ্যস্ত হাতে এক মিনিটে পরে নেয় মদন। সময় নেই। এই ভোরবেলাটা বৃথা যেতে দেওয়া যায় না।

দিদি, বলে একটা ডাক দিতেই চিরু সাড়া দেয়, কী রে? বেরোচ্ছিস নাকি?

পার্ক থেকে আসছি একটু ঘুরে। দরজাটা দিয়ে দাও। বলেই আর দাঁড়ায় না মদন। বেরিয়ে হন হন করে কালীঘাট পার্কের দিকে হাঁটতে থাকে।

আকাশে বাদলার মেঘ কেটে যাচ্ছে। ওই শুকতারা। মদন একটু চেয়ে দেখল। এবার দেরিতে বড় বেশি বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরে আর পুবে। ভেসে যাচ্ছে, সব ভেসে যাচ্ছে। প্রতিবারই ভাসে এবং তার জন্য কেউ কিছু করে না।

আমি একজন এম পি, এ কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল মদনের। নির্জন রাস্তায় সে একটু শব্দ করেই বলে ওঠে, দ্যাখ শালা মদনাকে দ্যাখ। শালা নাকি এম পি! হোঃ হোঃ!

সতীশ মুখার্জি রোডের পুরনো মসজিদের হাতায় গাছে গাছে পাখি ডাকছে। ডাকে রে পাখি, না ছাড়ে বাসা...খনার বচন না? বাকিটা মনে নেই মদনের। তবে ওইটুকু মনে আছে, ডাকে রে পাখি,

না ছাড়ে বাসা।

হ্যাঁ বৃষ্টি। খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবার। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমি কী করতে পারি ? মদনা তো ভগবান নয় বাপ, একজন বুরবক এম পি মাত্র। হ্যাঁ, মানছি এম পিরা অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু তা বলে বানভাসি দেশে ডাঙাজমি বের করার মতো এলেম তার নেই। তবে মদনা ফিল করে বাপ। ফিল করে। পাখিরা খুব ডাকছে। মদন একবার পুরনো মসজিদটার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখে নে শালারা এক আস্ত এম পিকে। তোরা হতভাগারা জামাকাপড় পরতে শিখলি না, পার্লামেন্ট বানাতে পারলি না, হোল লাইফ কেবল কিচমিচ !

মদন গুনগুন করে উ হু হু, উ হু হু করে গাইতে লাগল। তার গলায় সুর নেই। তার জন্য পরোয়াও করে না সে। উ হু হু, উ হু হু করেই যেতে থাকে।

ডান দিকে পার্ক। ঢুকতে গিয়ে মদন একটু দাঁড়ায়। শালারা গাছগুলো কেটেছে। বাচ্চাদের জন্য দোলনা ছিল, স্লিপ ছিল, সেগুলো লোপাট করেছে। ঘাসজমিতে টাক ফেলেছে। খানিক জায়গা কেটে নিয়ে রঙ্গশালা বানিয়েছে। কারও কিছু করার নেই। ভেসে যাক, সব ভেসে যাক।

মদন পার্কে ঢুকে পড়ে। ভোর ভোর হয়ে এসেছে। পার্কে কিছু ভুতুড়ে চেহারার আবছা লোক মর্নিং ওয়াক সেরে নিচ্ছে। মদন তাদের কক্ষপথে নিজেকে ভিড়িয়ে দেয়। উ হু হু গানটাও চলতে থাকে। এই ভোরবেলা পার্কে বেড়াতে তার বেশ আনন্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, খুব আনন্দ হচ্ছে। দারুণ আনন্দ। নিজেকে এম পি বলে একেবারেই মনে হচ্ছে না তার।

কিন্তু মনে না পড়ে উপায় আছে ? ব্যাটারা পড়িয়ে ছাড়ে। ক্যাংলা চেহারার টেকো একটা লোক গাদি খেলার মতো পথ আটকে একগাল হেসে বলল, দাদা মর্নিং ওয়াক-এ বেরিয়েছেন বুঝি ?

মদন চিনল। তবে নামটা মনে পড়ল না। বলল, এই একটু। তা কী খবর ?

আমাকে চিনতে পারছেন তো ! আমি হরি গোঁসাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। কী খবর ?

আজ্ঞে কালকে স্টেশনে যে সেই কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে ?

কোন কথাটা ?

আমার বিশুকে যদি একটু মেডিকেলে চান্স করে দেন।

মদন টেকো হরি গোঁসাইয়ের মাথার ওপর দিয়ে উদাস চোখে পুবের আকাশের দিকে চেয়ে বলে, কী সুন্দর দেখেছেন ?

ব্যস্ত হয়ে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে কোনটার কথা বলছেন ?

এই ভোরবেলাটা ?

আজ্ঞে তা আর বলতে ! খুব সুন্দর।

এই ভোরবেলায় আপনার মনটা উদাস হয়ে যায় না ?

খুব যায়। খুব যায়। আমাদের ওদিকটা তো প্রায় গ্রামের মতোই। সেখানে যা একখানা করে ভোর হয় না রোজ, কী বলব দাদা ! মনটাকে একদম বৈরাগী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। ফার্স্ট বাস ধরে আসতে আসতে আজও খুব উদাস লাগছিল।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তবু দেখুন বিশুরা আমাদের পিসু ছাড়ে না। উদাস হওয়ার স্কোপ থাকলেও কেউ আমরা উদাস হচ্ছি না, বৈরাগীও না।

হরি গোঁসাই মাথা চুলকে বলে, পিসু কথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদা। পিসু পোকা না কি ?

না, না। পিসু মানে পিছু। বিশুর সঙ্গে মিলে যায় বলে পিসু কথাটা বেরিয়ে গেল।

হরি গোঁসাই চিমটিটা ধরল না। গদগদ হয়ে বলল, আপনার পিসু ছাড়লে আমাদের চলবে কেন আমরা হচ্ছি একেবারে আনরিকগনাইজড জনসাধারণ। আমার কথাই ধরুন না। সারা জীবনে একজন মাত্র ভি আই পি-র কাছে কিছুটা ঘেঁষতে পেরেছি। সেই ভি আই পি হলেন আপনি। আত্মীয় স্বজনের কাছে বড় মুখ করে আপনার কথা কত বলি। অফিসেও একটু আধটু খাতির পাই।

এই পার্কে আমাকে ধরলেন কী করে ?

বাসায় গিয়েছিলাম। দিদি বলল, পার্কে এসেছেন।

মদন ধৈর্যশীল লোকটার মুখের দিকে চেয়ে ভোরের স্বচ্ছ হয়ে আসা আলোয় জনসাধারণকেই দেখতে পায়। এই সেই জনসাধারণ যাদের নিয়ে তার বহু কালের কারবার। এই সেই বিশুর বাব' যাদের পিছু পিছু একদিন সে ঘুরেছে, আর যারা এখন তার পিছু পিছু ঘোরে।

মদন একটা শ্বাস ফেলে বলে, শ্রীমন্তর কাছে একটা ডায়েরি আছে। তাতে—

তাতে লেখানো হয়ে গেছে। হেঁ হেঁ।

ঠিক আছে, দেখব'খন।

দেখবেন। সারা জীবন বড় দুঃখে কষ্টে কেটেছে। বিশুটা যদি ডাক্তার হয় তবে শেষ জীবনটা—

মদন হাসে। বাপদের ছেলেপুলে নিয়ে কত আশাই থাকে! গম্ভীর হয়ে বলে, ও আশা না করাই ভাল।

হরি গোঁসাই হঠাৎ নিভে গেল। মদন উদাস ভাবে চারদিকে চেয়ে হাঁটছে। পিছনে হরি গোঁসাই বলে, সে কথাটা অবশ্য ঠিক।

মদন প্রসঙ্গটা ভুলে গেছে। ভাল মানুষের মতো বলে, কোন কথাটা?

ধন্য আশা কুহকিনী।

ওঃ। হ্যাঁ—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ! মদন হরি গোঁসাইকে ভুলে গিয়ে উদাস পায়ে হাঁটতে থাকে। এখন আর খুব একটা আনন্দ হচ্ছে না তার। তবে ভালই লাগছে।

পিছন থেকে হরি গোঁসাই গলা খাঁকারি দিয়ে জানান দিল যে, সে আছে।

দাদার সঙ্গে যে আজ বড় শ্রীমন্ত নেই!

পাখিরা অনেকক্ষণ বাসা ছেড়েছে। এখন ঝোপে ঝাড়ে চিড়িক মিড়িক করে ঘুরছে তারা। সূর্য মসজিদ ছাড়িয়ে উঠে পড়ল প্রায়। কলকাতার সব ম্লান কুশ্রীতা প্রকট হল। দেখতে দেখতে মদন আনমনে জিজ্ঞেস করে, কে শ্রীমন্ত?

আপনার বডিগার্ডের কথা বলছিলাম। দিনকাল তো ভাল না। কালকের খবর শুনেছেন তো?

কীসের খবর? মদনের গলায় এখনও অন্যমনস্কতা।

নব হাটি জেল থেকে পালিয়েছে?

মদন এবার সচেতন হয়। কিন্তু ইচ্ছে করেই অন্যমনস্কতার মুখোশটা পরে থেকে বলে, কে নব হাটি?

দাদা সব ভুলে গেছেন। নব হাটি মানে যে লোকটা নীলুকে খুন করল। আর যার মা এসেছিল কাল আপনার কাছে ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চাইতে।

ওঃ! হ্যাঁ।

এ সময়টায় শ্রীমন্তকে একটু কাছে কাছে রাখবেন। নব লোক ভাল নয়। অবিশ্যি—

মদন উদাস গলায় জিজ্ঞেস করে, অবিশ্যি—

অবিশ্যি নবর এখন আর সেই তেজ নেই নিশ্চয়ই। পুলিশের তাড়া খেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা। তবু...

তবু?

তবু সাবধান থাকা ভাল। আমি কি আর একটুক্ষণ সঙ্গে থাকব দাদা?

নব যদি এসময়ে আসে তবে ঠেকাতে পারবেন?

টেকো হরি গোঁসাই অপ্রতিভ হেসে বলে, আজ্ঞে আমি ওসব লাইনের লোক তো নই। তবে চেঁচাতে পারব। খুব চেঁচাব—

পারবেন? তবে একটু চেঁচিয়ে শোনান তো! দেখি কেমন পারেন।

লজ্জা পেয়ে হরি গোঁসাই বলে, দাদা কী যে বলেন!

তা হলে কী করে বুঝব যে, চেঁচাতে পারেন?

হরি গোঁসাই মাথা নিচু করে লজ্জার গলায় বলে, পারি কিন্তু।

দেখি কেমন পারেন। চেঁচান, খুব জোরে চেঁচিয়ে বলুন, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন, খুন করে ফেললে! চেঁচান, চেঁচান। বলে মদন এক পা পিছিয়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল হরি গোঁসাইকে।

হরি গোঁসাই বলল, তা হলে বিশুর মেডিকেলে ভর্তি ব্যাপারটা হবে তো!

হবে, হবে। ওর বাপ হবে। নইলে কি আর বিশু আমার পিসু ছাড়বে? এখন চেঁচান দেখি!

হরি গোঁসাই থমকে দাঁড়িয়ে গেল! চোখ বুজে মাথায় আর বুকে বার কয়েক হাত ঠেকিয়ে কোনও দেব-দেবীকে প্রণাম করে নিল। তারপর বুক ভরে দম নিয়ে হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচাতে লাগল, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন করে ফেললে—এ—এ—এ—এ—এ—

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কাক ডাকতে লাগল, পাখিরা ঝোপ ছেড়ে প্রাণভয়ে উড়ল, প্রাতঃভ্রমণকারীরা সটাসট দৌড়ে গিয়ে রেলিং টপকাতে লাগল, সামনের এক বাড়িতে দড়াম করে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। হরি গোঁসাইয়ের যে এত আওয়াজ তা দেখলে বোঝাই যায় না।

মদন অবাক হয়ে বলল, বাঃ! আপনার গলা তো অ্যাপ্সেট।

বিনীত হাসি হেসে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে খুব জোর আওয়াজ হয়। একবার ভিড়ের ট্রেনে শুধু চেঁচিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলাম।

হুঁ। মদন গম্ভীর হয়ে বলে।

আর কি চেঁচাতে হবে দাদা?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না। এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার। যা চেঁচিয়েছেন।

আমি তা হলে আসি?

আসুন। একটু পা চালিয়েই আসুন গিয়ে।

বিশুর তা হলে?

পিসু পিসু থাকবে। বলে মদনও একটু পা চালিয়েই পার্ক থেকে বেরিয়ে আসে। কারণ, প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে ব্যাপারটা কী তা দেখতে। মদনকে একজন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে দাদা? খুন নাকি? মদন এমনভাবে মাথা নাড়ল যাতে 'হ্যাঁ'ও হয়, 'না'ও হয়।

একটু বাদে যখন সে জামাইবাবুর মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছিল তখন আর তার মুখে উদাসীনতা ছিল না। জামাইবাবু মনীশ অখণ্ড মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছে।

জামাইবাবু।

বলো ব্রাদার।

আপনার চেয়ে খবরের কাগজটা দেখা আমার বেশি দরকার। এবার ছাড়ুন।

তুমি তো এখন পায়খানায় যাবে।

তা গেলেই বা। খবরের কাগজ নিয়ে যাব।

যেয়ো। তার আগে যতটা পারি দেখে দিচ্ছি। তোমার ওটা ভারী ব্যাড হ্যাবিট।

কোনটা? খবরের কাগজ পড়াটা?

না, এই খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা।

ব্যাড হ্যাবিট কেন হবে? আমি বরাবর যাই। খবরের কাগজ না হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

দো ইউ আর অ্যান এম পি এবং তোমার সময়ও কম, তবু বলি এটা খুবই ব্যাড হ্যাবিট।

তা হোক। এবার ছাড়ুন।

ছাড়ছি। চা-টা খাও না।

চা ফিনিশ।

তবে চিরু না হয় আর এক কাপ করে দিক। ও চিরু! শুনছ!

কী অত মন দিয়ে পড়ছেন?

পড়ার কিছু নেই ব্রাদার। সব ছাতামাথায় ভর্তি কাগজ। সেই ছাতামাথাই দেখছি।

আমার প্রেস কনফারেন্সটা দিয়েছে ?

দিয়েছে একটুখানি। পাঁচের পাতার তলার দিকে।

হেডিং কী করেছে ?

মালদহের অবস্থা ভয়াবহ। তারপর কোলন দিয়ে তোমার নাম।

দূর! পলিটিক্যাল ব্যাপারগুলো দেয়নি তা হলে। আপনি যে কেন এত কিপটে!

কেন বলো তো? ত্রিশ টাকা কিলোর চা খাওয়াচ্ছি।

লোকে আরও দামি চা আমাকে খাওয়ায়। চায়ের খোঁটা দেবেন না। বলছি, মোটে একটা খবরের কাগজ রাখেন কেন ?

একটাই পড়ার সময় পাই না।

তা ছাড়া সেই একটাও আবার বাংলা। বাংলা কাগজে খবর কম থাকে জানেন না ?

তোমার দিদিও একটু পড়ে যে। ও তো ইংরিজি বোঝে না।

এবার থেকে দুটো করে রাখবেন। ইংরিজিটার দাম আমি প্রতি মাসে মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।

এম পি-দের প্রতিশ্রুতির দাম নেই, সবাই জানে। রিস্ক নেওয়াটা কি ঠিক হবে ?

চিরু চা নিয়ে এসে মণীশের দিকে চেয়ে বলে, বড় গলায় চায়ের হুকুম দেওয়ার দরকার ছিল না। আমি তো চা করছিলামই।

মণীশ এক গাল হেসে বলে, তা জানতাম। তবু শালার কাছে নিজেকে উদার প্রমাণ করার জন্যই ওটুকু করতে হল।

মদন মুখ গম্ভীর করে বলে, এই বয়সে আর কি নতুন করে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পালটাতে পারবেন ? আমি যে প্রথম থেকে জানি আপনি ক্রনিক মাইজার।

অথচ দেখো পাড়াপ্রতিবেশীরা সবাই আলোচনা করে, মণীশবাবু টাকা জমাতে জানেন না। কেবল খরচ করেন, কাছা খুলে খরচ করেন।

আপনার পাড়াপ্রতিবেশীরা স্বপ্ন দেখে। এবার খবরের কাগজটা ছাড়ুন।

বড্ড জ্বালাচ্ছ হে। যাও না, বাইরের ঘরে সেই কাকভোরে এসে সব বসে আছে, গিয়ে তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলে এসো না। ততক্ষণে...

ওরা বসে থাকার জন্যই এসেছে। তাড়া নেই।

তোমরা লিডাররা বাপু বড্ড গেরামভারী।

আমি গেরামভারী।

নয়তো কী ? লোকেরা বশংবদ হয়ে বসে থাকে, আর তোমরা পায়খানায় বসে খবরের কাগজ পড়ো।

লিডারদের নিয়মই তাই।

এই নাও ব্রাদার! বলে মণীশ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে এগিয়ে দেয়। যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণ শান্তিতে চাটুকু খেতে পারব না।

মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে বলে, জামাইবাবু।

উঁ।

আমি যদি মরে যাই তা হলে কী হবে বলুন তো ?

কেউ বিধবা হবে না।

আর কী হবে ?

আমার টেলিফোনটাও হবে না।

আঃ, কী হবে না তা জিজ্ঞেস করিনি। কী হবে তাই জানতে চাইছি।

আসলে তুমি মরবে না।

কী করে বুঝলেন ?

তোমারই বা মরার কথা মনে হচ্ছে কেন ? কোনওকালে তো এসব বলোনি। আমরা জানি তুমি হচ্ছ পজিটিভ লোক। এম পি-রা এমনিতেই একটু বেশিরকম আশাবাদী হয়। আজ হঠাৎ তোমার হল কী ?

মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে মৃদু হেসে বলে, মৃত্যুর একটা রোমান্টিক দিক আছে, তাই আজকাল মাঝে মাঝে ভাবি মরলে কেমন হয় ?

কিছু হয় না হে। মণীশ মাথা নাড়ে, মরার মধ্যে রোমান্টিক কিছু নেই, মহৎ কিছু নেই। একেবারে মোটা দাগের ক্যাবলা একটা ব্যাপার। আমাদের দেশে গবা পাগলা বলে একটা লোক ছিল। সে গাইত, মনু রে, বাপের খবর রাখলা না, হ্যায় যে মইরা ভ্যাটকাইয়া রইছে পাছায় পড়ছে জোছনা।

অশ্লীল ! অশ্লীল !

মোটেই নয়। মণীশ মাথা নাড়ে, একদম অশ্লীল নয়। পাছায় জোছনা পড়ার ব্যাপারটা বরং খুবই করুণ। মরা-টরার কথা হলেই আমার গানটা মনে পড়ে।

আপনি যা একখানা জিনিস না জামাইবাবু !

মণীশ উঠতে উঠতে বলে, তুমি পেপার দেখো, আমি বরং ততক্ষণে বাথরুমের দখল নিই গে। তুমি পত্রিকা হাতে ঢুকলে তো পাক্কা দেড় ঘণ্টা।

মণীশ বাথরুমে গেলে কিছুক্ষণ একা বসে আপন মনে ফুড়ুক ফুড়ুক করে হাসল মদন। দিনটা আজ ভালই যাবে। সকালে একটা চেঁচামেচি শুনেছে। বউনিটা ভালই বলতে হবে। তারপর এই জোছনার ব্যাপারটা। দুপুরে আজ রাইটার্সে দুজন মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং আছে। তখন যদি কথাটা মনে পড়ে যায় তা হলে ঠিক ফুড়ুক করে হেসে ফেলবে সে। বিকেলে আছে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। তখনও কি মনে পড়বে ?

পত্রিকায় কয়েদি পালানোর কোনও খবর নেই। বাংলা কাগজে এমনিতেই খবর কম থাকে, তার ওপর এসব খবরের এমনিতেই তেমন গুরুত্ব নেই। তবে যারা নবকে জানে তারাই বুঝবে খবরটা কতখানি গুরুতর।

বাইরের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে ভিতরের বারান্দায় উঁকি দিল শ্রীমন্ত, দাদা, আপনার বন্ধু এসেছে !

আমি জগবন্ধু। কে এসেছে ? নামটা কী ?

মাধব হাজরা। ওই যে গোল পার্কের কাছে—

আর বলতে হবে না। মাধব দুনিয়ায় একটাই হয়। আসতে বল।

মাধব বোধহয় বাইরের ঘরে ফিতে বাঁধা জুতো খুলতে খানিক সময় নিল। তারপর ভিতরের বারান্দায় আসতেই তার মুখে উদ্‌ভ্রান্তিটা প্রথম লক্ষ করে মদন।

তবু মদন সব সময়ে নিজে খোশ থাকতে এবং অন্যকে খোশ রাখতে চেষ্টা করে। হালকা গলায় বলল, মুর্গা পেয়েছিস ?

কীসের মুর্গা ?

তোর বাসায় আজ রাতে একটা আস্ত এম পির নেমন্তন্ন যে।

ওঃ ! আচ্ছা, মুর্গি হবে। কিন্তু খবর শুনেছিস ?

খবর শোনাই আমার কাজ। নব হাটি পালিয়েছে, এই খবর তো ? তা অত ঘাবড়ানোর কী আছে ? বোস।

মণীশের পরিত্যক্ত চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে মাধব। তারপর হাঁফ ধরা গলায় বলে, এটা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়।

এ কথায় সকালের হাসি খুশি ভাবটা মদনের মুখ থেকে মুছে গেল বটে, কিন্তু তার মুখে কোনও ভয় বা ভাবনা ফুটল না। মুখটা আস্তে আস্তে গম্ভীর ও নিষ্ঠুর হয়ে গেল। সে শুধু বলল, হুঁ।

মাধবের চেহারাখানা সুন্দর। দারুণ ফরসা, জোড়া ভ্রূ, খুব লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। সুন্দর ছেলেদের সুন্দর বউ জোটে না, সুন্দর মেয়েদের জোটে না সুন্দর বর। মাধবের বউ ঝিনুক কিন্তু সুন্দর।

দুজনই সুন্দর, দুজনের সংসার সুন্দর, ফ্ল্যাট সুন্দর। কিন্তু তবুও কোথায় যে ওদের খিঁচ তা আজও মদন বুঝতে পারল না।

মাধবের চেহারায় আজ তেমন জলুস নেই। সকালে দাড়ি কামায়নি, লম্বা চুলগুলো পাট করা নেই, মুখে বেশ উত্তেজিত ভাব, উৎকণ্ঠা। ডান হাতের মধ্যমায় গোমেদের আংটিটা বার বার ব্যস্ত আঙুলে ঘোরাচ্ছে। বলল, ইউ মাস্ট ডু সামথিং।

মদন ধীরে সুস্থে কাগজের শেষ পাতাটা উল্টে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, চা খাবি ?

চা ! যেন প্রস্তাবটায় কিছু অস্বাভাবিকতা আছে এমনভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল মাধব। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, হ্যাঁ খাব। দিদি কই ?

ঘরে। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করে দিচ্ছে। মাধব কিছুক্ষণ চুপ করে বসে একবার আংটি ঘোরায়, একবার চুলে আঙুল চালায়। হঠাৎ একটু ঝুঁকে বলল, পেপারে কিছু দিয়েছে ?

মদন চোখ তুলে বলে, কী দেবে ?

নবর ব্যাপারটা ?

মদন মাথা নেড়ে পত্রিকাটা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে বলে, একজন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদির পালানোর খবর তেমন কিছু গুরুতর নয়।

মাধব পিছন দিকে হেলে বসে কয়েক পলক চোখ বুজে থাকে। তারপর বলে, তা বটে। বাট ইট ইজ এ সিরিয়াস নিউজ ফর আস।

মদন মৃদু স্বরে বলে, আস নয়, বল মি। তুইই ভয় খেয়েছিস, আমি নয়।

মাধব চোখ খুলে মদনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, তোকে কি নব স্পেয়ার করবে ?

মদন মৃদু হেসে বলে, তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা ভাল, হোয়েদার আই উইল স্পেয়ার হিম।

মাধবের স্বাভাবিক চোখা চালাক ভাবটা আজ ছুটি নিয়েছে। তবু সে বলল, আমি তোর মতো হিরো নই। অ্যান্টিহিরো।

মদনের মুখে কথা ফুটল না। কিন্তু চাপা নিষ্ঠুরতাটা জ্বলজ্বল করতে লাগল। মাধব জানে, মদনের মধ্যে একটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা কী তা এত বছরেও বুঝতে পারল না। ছেলেবেলায় আসানসোলে কলিয়ারির এলাকায় তারা এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। লোকে বলত মদনমাধব। এত গলাগলি ছিল, তবু মদনের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত একটা ফাউ জিনিসটার জোরেই না ব্যাটা এম পি। আর সেই ফাউ জিনিসটা যা মাধবের নেই, সেটা এখন মদনের মুখে চোখে ঢেউ দিচ্ছে।

মাধব তার খড়খড়ে দাড়িওলা গাল চুলকোল। তারপর একটু মিয়োনো গলায় বলল, তুই কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নব জেল ভেঙে পালাল, এর মধ্যে একটু অদ্ভুত যোগাযোগ আছে না ? ব্যাপারটা ভেবে দেখেছিস ?

মদন মাথা নাড়ে, না। অত ভাববার সময় নেই। ভেবে লাভও নেই। গোটা দুই মুর্গা কিনে নিয়ে বাড়ি যা। ঝিনুককে ভাল করে রাঁধতে বলিস।

ঝিনুক গত বছর পাঁচেক রান্নাবান্না করেনি।

বলিস কী ?

ঝিনুক না রাঁধলেও আমরা না খেয়ে থাকি না। রান্নার লোক আছে, চিন্তা নেই।

তবে মুর্গা কিনে বাড়ি যা। একটু বেশি করে রান্না করতে বলিস। আমি তোদের না জানিয়েই বৈশম্পায়নকেও নেমন্তন্ন করে দিয়েছি।

বৈশম্পায়ন ! বলে একটু হাসে মাধব, কিন্তু কোনও মন্তব্য করে না।

মদন অবশ্য তীক্ষ্ণ চোখে হাসিটা দেখল। বলল, হাসলি কেন ? এনিথিং রং ?

না, নাথিং রং !

ওকে নেমন্তন্ন করায় তোরা অসুবিধেয় পড়বি না তো !

মাধব মাথা নেড়ে বলে, অসুবিধে তো তোকে নিয়ে। ঝিনুক বলে দিয়েছে ড্রিংক করলে বাড়ি থাকবে না।

হোঃ হোঃ করে হাসে মদন। তারপর গলা নামিয়ে বলে, ড্রিংক কি বাদ যাচ্ছে নাকি ?

না। তবে ছোট করে হবে।

ঝিনুক বাড়ি থাকবে ?

মাধব এবার খুব অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি হেসে বলে, বোধ হয় থাকবে। বৈশম্পায়ন আসছে জানলে থাকবেই মনে হয়।

তীক্ষ্ণধার চোখে মাধবের মুখটা দেখে নিচ্ছিল মদন। ঝুঁকে আস্তে করে বলল, ইজ দেয়ার এনি অ্যাফেয়ার ?

সিরিয়াস কিছু নয়। দুজনেই দুজনের প্রতি একটু সফ্ট। ব্যাপারটা আমি খুব এনজয় করি।

মদন হতাশার গলায় বলে, তোরা একেবারে হোপলেস। বউ অন্যের সঙ্গে প্রেম করলেও সেটা তোরা এনজয় করিস কী করে ?

আস্তে মদনা, আস্তে। মাধব গলা আর এক পর্দা নামিয়ে বলে, দুনিয়াটাই তো রঙ্গশালা। কে কার বউ ? কে কার প্রেমিকা ? আমি পজেসিভ নচারের লোক নই। আমি শুধু দেখি, শেষযৌবনা এক মহিলা মধ্যবয়স্ক একজনের প্রেমে পড়ে কেমন বয়ঃসন্ধির ছুকরি হয়ে যাচ্ছে। ঘ্যাম নাটক মাইরি।

সেই নাটকে তোর ভূমিকা কী ? পর্দা টানা ?

না। আমার ভূমিকা ছিল ভিলেনের। কিন্তু আমি মাইরি ফিলজফার হয়ে গেছি। তবে রেফারির মতো নজরও রাখছি। বাড়াবাড়ি দেখলেই ফাউল বা অফসাইড বলে চেঁচিয়ে বাঁশি বাজাব।

এই সময়ে শোওয়ার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে চিরু আসে। মাধবের দিকে চেয়ে বলে, বন্ধু এসেছে বলে তোর টিকি দেখা গেল। নইলে দিদি মরল কি বাঁচল সে খবরও তো নিস না।

মাধব এক গাল হেসে বলে, তোমার মরার কী ? দিব্যি গায়ে গতরে হয়েছ।

মোটা হয়েছি বলছিস ?

মোটা নয়, মোটা নয়। পরিপূর্ণ হয়েছ।

ফাজিল। চা খাবি ?

মদন একটু ধমক দিয়ে বলে, আরে তুই দুনিয়াসুদ্ধু লোককে চা খাওয়াতে গিয়ে যে পতিদেবতাটিকে ভাত খাইয়ে অফিসে পাঠাতে পারবি না।

না। না খেয়ে যাবে না, ডাল ভাত নেমে গেছে। সেই ভোর রাতে তুই যখন বেরোলি তখনই উঠে সব সেরে ফেলেছি।

মাধব একটা শ্বাস ফেলে বলে, তা হলে চিরুদি, গরিব ভাইকে একটু চা খাওয়াও।

তুই গরিব ? কেয়াতলায় ফ্ল্যাট কিনেছিস, তুই যদি গরিব তো আমরা কী ?

তোমরা সবাই শুধু আমার ফ্ল্যাটটাই দেখলে ! আর আমি যে দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছি।

তুই আবার শুকোলি কোথায় ? চিরু অবাক হয়ে বলে, বেশ তো চেহারাটা দেখাচ্ছে। একটু এলোমেলো অবশ্য। রাতে ঘুমোসনি নাকি ?

না, সে সব নয়। মাগ্না দেওয়ার সময় পাইনি।

ঝিনুক কেমন ? বেশি মোটা হয়ে যায়নি তো ?

না, না। রেগুলার যোগাসন করে, কম খায়, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজকর্ম নেই, মোটা হবে কেন ? ভাল আছে।

বউয়ের কথা উঠলেই তোরা অমন বেঁকিয়ে কথা বলিস কেন বল তো ? বউগুলো কি মানুষ নয় নাকি ?

বেঁকিয়ে বললাম কোথায় ? মাধব অবাক হওয়ার ভান করে।

ওই যে বললি, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজ করে না, আরও সব কী যেন !

তোমার মনটাই বাঁকা। একজন মহিলা নিজের শরীরের যত্ন নেয় এটা তো প্রশংসার কথাই। তুমি যে নাও না, তার জন্য আড়ালে আমরা তোমার নিন্দে করি।

চিরু হেসে ফেলে বলে, ইয়ারবাজ। বোস, চা করে আনি।

হ্যাঁ, যাও। রান্নাঘর ছাড়া তোমাকে কোথাও মানায় না।

সেটা তোর জামাইবাবুও খুব ভাল বুঝেছে।

এতক্ষণ মদন একটাও কথা বলেনি। কোনও কথা তার কানেও যায়নি। নিজের নখগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছিল।

মণীশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, যাও ওদার খবরের কাগজ নিয়ে আধবেলার জন্য ঢুকে পড়ো।

কোঁচকানো ভ্রূ সটান হল একটু হেসে মদন বলে অত সময় যদি হাতে থাকত জামাইবাবু। এক্ষুনি রাইটার্সে যেতে হবে।

মণীশ মাধবকে দেখে খুশি হয়ে বলে এই যে বাদার! মদন না এলে মাধবের দেখা পাওয়া যায় না আমাদের হয়েছে বিপদ। তোমার ফোন নম্বরটা চিরকুটে দিয়ে যেয়ো তো।

যাব, কিন্তু আপনি জন্মেও ফোন করবেন না, জানি।

আহা, কখন কী দরকার হয় তার কি ঠিক আছে? তবে পয়সা দিয়ে করতে একটু গায়ে লাগে আজকাল। ফোনের চার্জ যা বেড়েছে!

কেন, অফিস থেকে করবেন!

মণীশ ম্লান একটু হাসে, অফিস থেকে! অফিস থেকে প্রাইভেট ফোন করতে একটু কিন্তু কিন্তু লাগে।

মদন মাথা নেড়ে মাধবকে বলে, জামাইবাবু একটা হোপলেস কেস, বুঝলি মাধব? হি ইজ হেলপলেসলি অনেস্ট। এ রোগের চিকিৎসা নেই।

মাধব হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল, জামাইবাবুর অনেস্টি সম্পর্কে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা যে শুচিবায়ু হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

মণীশ খুব দুর্বলভাবে একটু হাসে।

॥ ৮ ॥

তুই ভয় পেয়েছিস? মদন জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্তর মুখ করুণ গম্ভীর। কোনও বিপদ বা ঝামেলা পাকালে শ্রীমন্তর মুখ ওইরকম হয়ে যায়। তাকাতে ভয় করে। সে মদনের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলে না। তবে কেয়ারফুল থাকা ভাল।

মদন আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল তা থাক। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই

শ্রীমন্ত মুখে কিছু বলল না। তবে মনে মনে বোধহয় মদনকে একটা খিস্তি দিল। তার কারণ নব জেল থেকে বেরিয়েও মদনের নাগাল পাবে না। তার আগেই চিড়িয়া ভেগে যাবে দিল্লি। তারপর বিদেশে। কলকাতার ঘূর্ণচক্করে নবর পাল্লা টানতে পড়ে থাকবে শ্রীমন্ত আর তার শাগরেদেরা। কাজটা খুব সহজ নয়। যারা নবকে চেনে তারাই জানে।

কথা হচ্ছিল একটা অ্যামবাসাডার গাড়িতে বসে। সকালবেলা। গাড়ি যাদবপুর পেরিয়ে বাঘাযতীনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সেই বোড়াল।

দিল্লিতে আমার জন্য একটা চেষ্টা করবে বলেছিলে মদনদা।

হবে। মদন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, এখানেও তো বেশ আছিস!

একে থাকা বলে। ভদ্রলোকের মতো থাকতে গেলে কলকাতায় কিছু হবে না। দিল্লিতে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কী করবি?

যা হোক। একটা দোকান, না হয় বাস বা ট্যাক্সির পারমিট।

ওখানে পারবি না। শক্ত কাজ। তবু যদি যেতে চাস তো চেষ্টা করব।

করো।

তুই একটু ভয় খেয়েছিস শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত জানে, মদনদা এই যে দিল্লি যাবে, গিয়েই ভুলে মেরে দেবে তার কথা। ভি আই পি-রা সব একরকম। মদনের ওপর নানা কারণেই একটু চটে আছে সে। লোকটা কথা দিয়ে কথা রাখে না। তার ওপর ভয়ের খোঁটা দেওয়া হচ্ছে। শ্রীমন্ত ঠাণ্ডা গলাতেই পাল্টি দিল, ভয় একটু তুমিও খেয়েছ মদনদা। নইলে এই সাত সকালে জরুরি কাজ ফেলে বোড়াল রওনা হতে না।

মদন হাসে। একটুও অপ্রতিভ বোধ করে না। বলে, কাল নবর মাকে কথা দিয়েছিলাম। কানোয়ারকে সকালে ফোন করতেই রাজি হয়ে গেল। খবরটা দিয়ে আসা কি খারাপ?

খারাপ বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, নবর মাকে তুমি কাটিয়ে দেওয়ার জন্য ওকথা বলেছ।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে, শত হলেও এক সময়ে নব আমার জন্য অনেক করেছে।

শ্রীমন্ত কথা বাড়াল না। কিছুদিন যাবৎ মদনদার সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না এটা সে নিজেই টের পাচ্ছে। মদনদাও কি আর টের পাচ্ছে না?

মদন একটা সিনেমা হলের হোর্ডিং দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে। মুখ ফিরিয়ে বলল, এ কথাটা যেন চাপা থাকে।

নবর বউয়ের চাকরি তো? ও নিয়ে ভেবো না।

দিল্লি সত্যিই যেতে চাস?

চাই। কলকাতায় কী হবে বলো। হুজ্জতি করা আমার রক্তে নেই। ওসব মেলা হয়েছে। এইবার সেটল করতে চাই।

তুই বি কম পাশ না?

টুকে মুকে। ওসব বিদ্যে ধোরো না। ধ্যাড়াব!

না, তোকে দিয়ে চাকরি হবে না সে আমি জানি!

চাকরিটাও রক্তে নেই কিনা। আমার বাপ পুরুত ছিল। মেলা যজমান। আমিও নাকি অনেকের কুলগুরু। রাস্তাঘাটে মাঝে মাঝে বেশ বুড়ো বয়স্ক মানুষও দুম করে পেন্নাম ঠুকে দেয়। কতক বাড়ি আছে যেখানে গেলে আমার জামাই আদর।

মদন হাসে, লাইনটা তো ভালই।

হ্যাঁ, ভাল না হলে আমার বাবা চিরকাল ও কাজ করবে কেন? চাকরি আমাদের বংশে কম লোকই করেছে।

নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলে হয়ে তুই খুনখারাপি করিস কী করে?

মাইরি মদনদা, ঠুকো না। খুনখারাপি আমার সয় না। একটু হাঁকডাকের লোক ছিলাম বটে বরাবর। কিন্তু এতটা হয়ে যাব ভাবিনি।

মদন শ্রীমন্তর হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলে, তুই একটু নরম আছিস।

আছি মদনদা। স্বীকার করছি।

নবর মতো তুই কেঠো মানুষ নোস।

তাও নই।

নবর সঙ্গে যদি পাল্লা টানতে হয়, পারবি?

শ্রীমন্ত একগাল হাসে, পারব। তাতে আটকাবে না। তবে আমি ওর মতো নীচে নামতে পারি না। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তো?

পারছি। আমার লোক নিয়েই কারবার। তোর মুশকিল হল, তুই যে ভদ্রলোক তা ভুলতে পারিস না। আর, কিছু লোক যে তোকে দেখলে প্রণাম করে সেটাও তোকে কাছা ধরে টানে মাঝে মাঝে।

শ্রীমন্ত হাসল। বলল সবই তো বোঝো দাদা।

আমি তোরটা বুঝি। কিন্তু তুই আমারটা বুঝিস না।

কেন বলছ ওকথা?

এই যে বললি, ভয় পেয়েছি বলেই নাকি আমি নবর বউয়ের চাকরি করে দিচ্ছি!

ওটা একটা ফালতু কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মদন চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে শ্রীমন্তরও বুকটা একটু গুড় গুড় করে ওঠে। তার গায়ে জোর আছে, পকেটে লোডেড রিভলভার আছে, সাহসও আছে, তবু সে জানে মদনদার মতো লোক তার মতো হাজারজনাকে নাচিয়ে বেড়াতে পারে। বে-খেয়ালে বেচাল বলে ফেলেছে।

শ্রীমন্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, মদনদা, রেগে আছ মাইরি ?

মদন জবাব দিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

বোড়ালে বড় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মদন নামল। শ্রীমন্ত নামতে যাচ্ছিল, মদন হাত তুলে বলে, না। তুই থাক।

শ্রীমন্ত অবাক হয়ে বলল, একা যাবে ?

একাই যেতে হবে।

তোমার কাছে আর্মস নেই।

তাতে কী ? আমি কোনওকালে আর্মস নিয়ে চলি না। ভয় নেই, আর্মস ছাড়াও আমার অন্য কিছু আছে সেটা তুই বুঝবি না।

কাজটা ঠিক করছ না মদনদা। নব এখন ফ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে একবার ঢুঁ দেবেই।

দূর বোকা ! নব তোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। ও জানে, পুলিশ ওর বাড়ির চারদিকে জাল পেতে আছে।

তা অবশ্য ঠিক। শ্রীমন্ত মাথা চুলকায়। একটু কেমন লাগে শ্রীমন্তর। মদনদা তাকে সঙ্গে নিচ্ছে না। মদনদা গম্ভীর। কোথাও একটা তাল কেটে যাচ্ছে।

ভয় নেই। বলে মদন একটা ভাঙাচোরা মেটে রাস্তা ধরে এগোতে থাকে।

এদিকে অনেক নিবিড় গাছপালা, পুকুর, ফাঁকা জমি। একেবারেই হদ্দ গ্রাম। বেশির ভাগ নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস বলে বাড়িঘরগুলোর তেমন বাহার নেই। ম্যাড়ম্যাড়ে, শ্রীহীন। মদনের খুব খারাপ লাগছিল না। সে একবার ঘড়ি দেখল। প্রায় এগারোটা। বেলা একটায় রাইটার্সে মিটিং। সময় আছে। তবু সে একটু পা চালিয়ে হাঁটে।

আধ মাইলের মতো হেঁটে একটা শ্রীহীন, ভারী গরিব চেহারার চালাঘরের সামনে উঠোনে পা দেয় মদন। নব টাকা কামাই করেছিল মন্দ নয়, কিন্তু ঘর সংসারের পিছনে কিছুই ঢালেনি। কেবল অন্য সব ফুর্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে। এই কাঠা তিনেক জমিও ওকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি। ঝোপজঙ্গলে ভরা এই তিন কাঠা এক মুসলমানকে ভোগা দিয়ে দখল করেছিল সে। সেই জমি আর চালা ঘরটাই এখন নবর আত্মীয়দের একমাত্র আশ্রয়।

মদন উঠোনে পা দিয়ে একবার ফিরে চাইল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা ঘাড়েগর্দানে চেহারার লোক তাকে দেখছে। গায়ে হাফ-হাতা নীল রঙা একটা শার্ট, পরনে ময়লা ধুতি। সাদা পোশাকের পুলিশকে চিনতে এক লহমাও লাগে না মদনের। সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। তারপর অনুচ্চ স্বরে ডাকে, গৌরী। গৌরী।

এত ভদ্র গলায় বোধহয় বহুকাল কেউ গৌরীকে ডাকেনি। খোলা দরজায় গৌরী এসে অবাক চোখে তাকায়।

গৌরী ফর্সা নয়। তবে ভারী মিঠে মোলায়েম একটা শ্যামলা রং ছিল তার। ছিল অফুরন্ত স্বাস্থ্যের শরীর। ছিল অকূল দুখানা চোখ। মুখে উপচে পড়ত শ্রী।

এখন তার কিছুই প্রায় নেই। শরীর শুকিয়ে অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। রং কালো হয়ে গেছে। এখনও শুধু চোখ দুখানা আছে। তাকালে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে আজও।

আমি মদনদা। চিনতে পারছ ?

গৌরীর শুকনো হাড্ডিসার মুখে একটু হাসি ফুটল। খুব অবিশ্বাসের হাসি। প্রথমটায় বুঝি কথা সরল না। তারপর মৃদু লাজুক স্বরে বলল, এলেন তা হলে ! আসুন।

বেশিক্ষণ বসার সময় নেই।

গৌরী হারিয়ে গিয়েছিল, এই কথায় হঠাৎ যেন ঝলসে উঠল পুরনো গৌরী। বলল, একটু বসে না গেলে লোককে কী করে বিশ্বাস করাব যে, একজন এম পি আমাদের বাড়িতে এসেছিল?

মদন মৃদু হেসে নামমাত্র দাওয়ায় উঠে চটি ছেড়ে রাখে। বলে, ঘরে নয়। এইখানেই একটা মাদুর-টাদুর পেতে দাও।

গৌরী বলে, না। এখানে আব্রু নেই। ঘরে আসুন। গরম লাগবে একটু তা আমি পাখার বাতাস দেব'খন।

অগত্যা মদন ঘরে ঢোকে। যেমনটি আশা করা যায়, ঘরটি ঠিক তেমনিই। বেড়ার গায়ে গুটি তিনেক ছোট জানলা বসানো। রোদে তাতা টিনের গরমে ভেপসে আছে ভিতরটা। দু ধারে দুটো সস্তা চৌকিতে অত্যন্ত নোংরা বিছানা। কয়েকটা ফুটপাথে কেনা র‍্যাকে রাজ্যের কৌটো-টোটো রাখা। তবে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আছে, লক্ষ করে মদন।

তোমার শাশুড়ি কই?

উনি একটা বিড়ির কারখানায় যান।

ছেলেমেয়ে?

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে।

লেখাপড়া করে না?

নাম লেখানো আছে ইস্কুলে। যায় বলে তো মনে হয় না।

তোমার কটি?

দুজন। বড়টা ছেলে। ছোটটা মেয়ে।

গৌরীর হাত পাখাটা নড়বড়ে। মচাৎ মচাৎ শব্দ হচ্ছে। মদন বলল, থাকগে। পাখা রেখে দাও।

গৌরী রাখল না। বলল, কেমন আছেন?

ভাল নেই গৌরী।

আপনি ভাল নেই? তবে আমরা কোথায় যাব!

তোমার শাশুড়ি গতকাল আমার কাছে গিয়েছিল।

জানি। আমি বারণ করেছিলাম, শোনেনি।

বারণ করেছিলে কেন?

গৌরী একটু উদাস হয়ে বলে, কী হবে গিয়ে? আমার জীবনে তো আর ভাল কিছু হবে না।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার চাকরিটা হয়ে গেছে।

কোথায়?

নবর কারখানায়।

খবরটা শুনে গৌরী খুশি হল না। বলল, ও।

কারখানায় ওদের অফিসও আছে। সেই অফিসে।

গৌরী জবাব দিল না। হাতপাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ হতে লাগল।

মদন একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, নবর কারখানায় কি তুমি চাকরি করতে চাও না?

গৌরী মৃদু স্বরে বলে, এই প্রশ্নটাই আপনার আগে করা উচিত ছিল মদনদা।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, কাল তোমার শাশুড়ি গিয়ে নবর কারখানায় তোমাকে একটা চাকরি দেওয়ার কথা বলল, তখনও ভেবে দেখিনি যে, তোমার কাছে চাকরিটা কতখানি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক আপনার বুদ্ধি এখনও লোপ পায়নি দেখছি। একটু দেরিতে হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।

মদন মাথা নেড়ে বলে, বুদ্ধির ধার কমেও যাচ্ছে। আগের চেয়ে মাথা এখন অনেক কম খেলে।

গৌরী একটু ক্লান্ত স্বরে বলে, নবর মাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, ওর কারখানায় আমার কাজ করা বিপজ্জনক। ওর শত্রু অনেক। তার ওপর ওর উল্টো ইউনিয়ন এখন কারখানা

দখল করেছে। ওখানে চাকরি করা কি সম্ভব! কিন্তু নবর মা তা মানতে চায় না।

কী বলে?

অনেক কিছু বলে। সব তো আপনাকে বলা যায় না। এমনকী বেশ্যাগিরি করেও টাকা আনতে বলে। আর শুনবেন?

মদন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, বুড়ি তার উপযুক্ত কথাই বলে। তাতে উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।

আমি উত্তেজিত হই না তো!

নবর সঙ্গে কি জেলখানায় মাঝে মাঝে দেখা করতে যাও?

না। ওর মা যায়। ছেলে মেয়েও কখনও সখনও যায়।

তুমি যাও না কেন?

কেন যাব?

মদন একটু হাসল, রাগটা কি নবর ওপর? না আমার ওপর?

আপনার ওপর রাগ করব! ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন!

ঠাট্টা করছ?

আপনি ঠাট্টা ইয়ার্কির অতীত হয়ে গেছেন মদনদা।

শোনো, তোমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন তো কম করিনি। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে যাই, এখানে আর থেকো না।

গৌরী অবাক হয়ে বলে, থাকব না? কেন?

কারণ আছে! তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?

গৌরী বিহ্বল মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। কোথায় যাব?

বাপের বাড়ি এখনও কি ম্যানেজ হয়নি?

না! কোনওকালে হবেও না।

তা হলে?

আমার যে কোনও জায়গা নেই, সে তো আপনি জানেন!

চিন্তিত মুখে মদন একটা হুঁ দিল। তারপর আরও খানিকক্ষণ ভেবে বলে, দূরে যেতে হলে পারবে?

কোথায়?

ধরো যদি দিল্লি যেতে হয়?

আমার জন্য আপনি এত ভাবছেন কেন? আমি বেশ আছি। এর চেয়ে বেশি বিপদ আর কী হবে?

একটু দ্বিধা করে মদন বলে, কাল নব জেল থেকে পালিয়েছে। জানো?

এতক্ষণ ভাঙা পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল মদনের। এখন হঠাৎ পাখার শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিস্তব্ধতাটা খুব বড় করে শোনা গেল।

অবশ্য কয়েক সেকেন্ড বাদেই আবার পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ দ্বিগুণ জোরে হতে লাগল। গৌরী বলল, আপনি ঘরে ভীষণ ঘেমে যাচ্ছেন। দাওয়াটাতেও রোদ পড়েছে।

আমার জন্যে ভেবো না। আমি এক্ষুনি চলে যাব। হাতে অনেক কাজ।

সে তো জানি। এত বড় দেশের দণ্ড-মুণ্ডের একজন কর্তা তো আপনিও।

তোমার মুখে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না গৌরী।

কেন মদনদা? আমি কি আলাদা কিছু?

আলাদাই তো ছিলে। এখন কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছ। কেবল কি ঠেস দিয়ে কথা বলতে হয়?

আমার আজকাল স্বাভাবিক কথা আসতে চায় না। মনটা খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে বোধ হয়। হওয়ারই কথা।

না গৌরী, আমাকে দেখলেই তোমার প্রতিহিংসা জেগে ওঠে।

প্রতিহিংসা কেন হবে ? কী যে বলেন, বলে গৌরী হঠাৎ হাত পাখাটা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কী শুনল, তারপর বলল, নবর মা আসছে।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, বুড়ি খুব খাণ্ডার না ?

গৌরীও হাসে, নবর মা তো, একটু তেজি তো হবেই।

তোমার সঙ্গে খুব লাগে ?

গৌরী মাথা নাড়ে, লাগে, তবে একতরফা। আমি জবাব দিই না।

সে কী ! মদন অবাক হয়ে বলে, জবাব দাও না কেন ? এক সময়ে তো তুমি দারুণ ভাল ঝগড়াটি ছিলে ! যাকে তাকে ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাতে।

গৌরী অবসন্ন মুখে বলে, আপনি তো আমার দোষ ছাড়া গুণ কখনও দেখেননি।

হাত নেড়ে মদন বলে, ওসব কথা রাখো। আমি তোমাকে ভাল চিনি। কথা হচ্ছে শাশুড়ির সঙ্গে একটু ঝগড়া টগড়া করো না কেন ? তাতে তো সময়টাও ভাল কাটে।

কী যে বলেন মদনদা। গৌরী বিরক্ত মুখে জবাব দেয়।

কেন, ঝগড়া কি খারাপ ?

সে আপনিই জানেন। আমার ভাল লাগে না।

বুড়ির মুখ কেমন ? খুব খারাপ কথা বলে ?

গৌরী হেসে ফেলে। বলে, কেমন আবার ! আস্তাকুঁড়।

তা হলে তো তোফা।

আপনি আবার ঝগড়া-প্রিয় হলেন কবে থেকে ?

আহা, পার্লামেন্টে তো আমরা ঝগড়াই করি। দারুণ ঝগড়া। তবে সেখানে গালাগাল চলে না, পয়েন্টে পয়েন্টে ল্যাঙ্গালেঙ্গি হয়। আমার অবশ্য ওরকম বাবু-ঝগড়া ভাল লাগে না। বহুকাল বস্তিমার্কা ঝগড়া শুনিনি, একটু শোনাবে ?

গৌরী ভ্রূকুটি করে তেতো গলায় বলে, আমি কি বস্তির মেয়ে ?

আরে না। তুমি আবার ঘুরিয়ে ধরলে। আমি নবর মার কথা বলছিলাম। একটু খুঁচিয়ে দিলে একেবারে ভাগীরথীর উৎস খুলে যাবে। দাও না একটু খুঁচিয়ে।

গৌরী উদাস হয়ে বলে, আপনি খোঁচান গিয়ে। আমি নিত্যি শুনছি। ওই আসছে। উল্টোদিকের বাড়ির বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ। কথা থেমেছে।

বুড়িকে খবরটা দেবে নাকি ?

কোন খবর ?

নব যে পালিয়েছে।

উদাস মুখে গৌরী বলে, আপনিই দিন।

তুমি এত উদাস ভাব দেখাচ্ছ কেন বলো তো ! নবকে খুঁজতে পুলিশ সব দিকে ঘুরছে। এ বাড়িও তাদের নজরবন্দি। নবকে ধরার জন্য দরকার হলে গুলিও চলবে। আমার নিজের ধারণা, নব মরতেও পারে।

তার আমি কী করব ?

নব মরলে তুমি বিধবা হবে, জানো না ?

খুব জানি। তবে আমার বিধবা হওয়ার আর বাকি কী ? বিয়ের দিন থেকেই তো আমি বিধবা।

নবর ওপর তোমার খুব রাগ।

রাগের স্টেজ পার হয়ে গেছে। এখন শুধু ঘেন্না।

তুমি যা পষ্টাপষ্টি কথা বলো ! কিন্তু নবর সঙ্গে তো তোমাকে কেউ ঝোলায়নি। তুমি নিজেই ঝুলেছ।

গৌরী একটু থতমত খেয়ে বলে, আমি ঝুলব কেন ? আমি নবকে কোনওকালে চাইনি তো !

মদন গম্ভীর হয়ে বলে, আমি তখন লিডার ছিলাম না গৌরী। এ পাড়ায় সে পাড়ায় একটু আধটু

সোশ্যাল ওয়ার্ক করতাম। নবর মতো ফেরোসাস গুণ্ডা বা নীলুর মতো ভাল ওয়ার্কারকে তখন আমার খুব দরকার হত। যদিও আমরা তিনজন ছিলাম তিনরকম, কিন্তু কাজ করতাম এক সঙ্গে। আর একটি জায়গায় আমাদের মিল ছিল। আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম।

গৌরীর মুখ সাদা দেখাচ্ছিল।

মদন একটু চোখের ইশারা করে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, বুড়ি কদ্দূর ? এল নাকি ?

গৌরী মাথা নেড়ে বলে, পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছে। এক্ষুনি আসবে।

মদন বলে, হ্যাঁ, আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম। তাই না ?

নীলুর কথা থাক। তবে আপনারা দুজন করতেন। মানছি।

কিন্তু তুমি নবকেই দেহ মন দিয়েছিলে, আমাদের পাত্তা দাওনি।

নবকে আমি মন দিইনি। খুব ক্ষীণ গলায় গৌরী বলল।

শুধু দেহ ?

সেটাও ও জোর করে নিত!

আর মনটা ? সেটা কাকে দিয়েছিলে ? আমাকে, না নীলুকে ?

তা জেনে কী হবে ? আপনি তো আগে কখনও জানতে চাননি।

তা ঠিক। তবে জানতে চাইতে হবে কেন বলো তো। মন দিলে তো এমনিতেই টের পাওয়ার কথা।

বহু মেয়েই আপনাকে মন দিয়েছিল, তাদের দিকে তাকানোর সময় আপনার ছিল না।

সময় ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে টেরও পেতাম না ভেবেছ ? শুধু তোমারটাই টের পাইনি কোনওদিন। তবে নীলু টের পেত কি না জানি না।

কান্নার আগে যেমন মুখ হয় গৌরীর মুখ এখন ঠিক সেইরকম। চোখ স্থির, লাল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবেগটাকে ঠেকাচ্ছে। পাখাটা রেখে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় দরজায় নবর মা উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে আবছায়াতেও বুড়ির নজর মদনকে চিনে ফেলেছে। চোখে ভারী অবাক ভাব। মুখখানা হাঁ করা।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, এই যে মাসি! আপনার বউমার চাকরির একটা খবর আছে। তাই দিতে এলাম।

নিজে এলে! কী ভাগ্যি! আমি ভাবছিলাম, বড় মানুষ, বোধহয় গরিবের কথা ভুলেই গেছ।

বুড়ির গলাটা টনটনে। স্বাভাবিক স্বরটাও সাত বাড়িতে শোনা যায়।

মদন বলল, নব আমার সাকরেদ ছিল। তার জন্য এটুকু করা কিছু না।

তা ঠিক। নবর মা এক গাল হেসে বলে, তা কাল থেকেই কি যাবে বউমা ?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না মাসি। চাকরি এখানে নয় দিল্লিতে।

দিল্লি ? ও বাবা, তা হলে এখানে কী হবে ?

এখানে আপনি তো রইলেন।

বুড়ি গলা জলে আঁকুপাকু খেতে থাকে। কথা ফোটে না মুখে। এই সময়ে বুড়ির পাশ কাটিয়ে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মদন চোখ টিপে বলে, চাকরি তো এখানেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নবর বউ করতে চাইছে না। বলে, নবর কারখানায় চাকরি করতে নাকি ঘেন্না করে।

বলল ? বুড়ির গলা সাত বাড়ি ছেড়ে সাতটা গাঁয়ে পৌঁছে যায়।

মদন উঠে পড়ে। ভাগীরথীর মুখ খুলে গেছে। এবার খেউড়ের বেনোজল নেমে আসবে। খুব ইচ্ছে ছিল মদনের, বসে থেকে শুনে যায়। কিন্তু ঘড়ি ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে। রাইটার্সে মিটিং। বিকেলে পার্টির জরুরি সভা।

মদন দাঁড়িয়ে বলল, আমি দিল্লি গিয়েই ব্যবস্থা করছি। নবর বউ যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়। সম্ভব হলে আজই।

গিয়ে কোথায় উঠবে ?

সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চলি।

বলে মদন বেরিয়ে আসে। রাস্তায় পড়ে কয়েক কদম গিয়ে একটু দাঁড়ায়। ওই শোনা যাচ্ছে সারা এলাকা মাৎ করে নবর মায়ের গলা চৌদুনে পৌঁছল... গেছো মাগি··· অমুকভাতারি···তমুক ভাতারি···

মদন আর দাঁড়াল না। মৃদু একটু হেসে হাঁটতে লাগল। লাগ ভেলকি লাগ ! নারদ নারদ !

॥ ৯ ॥

সময়ের একটু আগেই পৌঁছে গেল বৈশম্পায়ন। ভারী লজ্জা-লজ্জা করছিল তার। রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন, কিন্তু এখনও ভাল করে দিনের আলোটাও মরেনি।

কিন্তু না পৌঁছে উপায়ই বা কী ? কাল থেকে ঘরে শুয়ে শুয়ে শরীরে জড়তা এসে গেছে। আর মনটা পাগল-পাগল করছে কেয়াতলার এই বাড়িটার কথা ভেবে। উদ্দাম এক হাওয়া এসে পালে লাগছে বার বার। বন্দর ছাড়তে বলছে। ভেসে পড়ো। ভেসে পড়ো। সামনে অকূল দরিয়া। মৃত্যুশাসিত এই পৃথিবীতে মানুষের সময় বড় কম। লাভালাভ, ভোগ-উপভোগ সব সেরে নাও বেলাবেলি।

আজও দরজা খুলল কিশোরী ঝি পুনম। বাইরের ঘর আজ আরও পরিপাটি সাজানো। চন্দনের গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি জ্বলছে। অন্তত চার ডজন রজনীগন্ধা। ঘরে কেউ নেই।

ইতস্তত করে বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে, মাধব আসেনি ?

না, মামাবাবুর তো অফিস।

এ কথায় আরও লজ্জা পায় বৈশম্পায়ন।

বড্ড বেশি আগে আগে চলে এসেছে। এখন কিছু করার নেই। সে সোফার এক কোণে বসে সিগারেট ধরাল। ভিতরে ভিতরে একটা কামনা শেয়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করছে, উঁকি মারছে এদিক সেদিক।

কিন্তু এই নিরিবিলি ঘরটিতে বসে, ঠুলি পরানো আলোয় কিছুক্ষণ চারদিকের ভৌতিকতাকে অনুভব করতে করতেই দূর, বহু দূর থেকে মৃত্যু নদীর করুণ গান ভেসে এল। সাদা পাথর, বিশাল উপত্যকা, অন্তহীন নদী, অবিরল তার গান।

জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল আঙুল থেকে। নিচু হয়ে তুলবার সময় সে দুর্দান্ত সুগন্ধটা পেল বাতাসে। এই সব সুবাস মাখে একজন। মাত্র একজনই। সে ঘরে এসেছে নিঃশব্দে। সিগারেটটা কুড়োতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিল বৈশম্পায়ন।

সামনে সোফায় ততক্ষণে মুখোমুখি স্থির হয়ে বসেছে ঝিনুক।

বৈশম্পায়ন মুখ তুলে বলল, কী খবর ?

ঝিনুকের পরনে বেরোনোর পোশাক। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে চটি, চোখে ভ্রূকুটি।

ঝিনুক মৃদু কিন্তু রাগের গলায় বলে, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, সে কী ? কেন ?

কেন তা আপনাদের বোঝা উচিত।

বৈশম্পায়ন ঝিনুকের অসহনীয় সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে মনে মনে ভীষণ হতাশা বোধ করে। এত রূপ যার সে কি কখনও সহজলভ্য হতে পারে ? বড় দূর, বড় দুর্লভ ঝিনুক।

সে বলল, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই নাকি ?

আপনার জন্য ! ও মা, কী কথা বলে লোকটা ! আপনার জন্য বাড়ি থেকে পালাব কেন ?

বৈশম্পায়ন আবার লজ্জা পেয়ে বলে, তা হলে ?

বাড়ি থেকে পালাচ্ছি আপনার বন্ধুর জন্য। কাউকে খেতে বললেই কি সঙ্গে একটা ককটেলেরও অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে ? এত বিরক্তিকর। দেখবেন আয়োজনটা ?

বলে ঝিনুক উঠে লিভিংরুমে চলে যায়। একটু বাদে দু হাতে গোটা চারেক বড় বোতল নিয়ে আসে। বলে, শুধু এতেই শেষ নয়। আরও ছটা বিয়ারের বোতলও আছে। ফ্রিজে সব ঠাণ্ডা হচ্ছে। কার না মাথা গরম হয় বলুন তো ?

বৈশম্পায়ন স্কচ দেখে এবং বিয়ারের কথা শুনে শুকনো জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ঠিকই তো।

ঝিনুক ঝংকার দিয়ে বলে, আর ভাল মানুষ সাজতে হবে না। মদ দেখলেই আজকাল পুরুষগুলো এমন হ্যাংলামি করে। এতে আপনারা কী আনন্দ পান বলুন তো !

আনন্দ ! ওঃ, না ঠিক আনন্দ নয় বটে।

ঝিনুক ভীষণ জোর ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, একটুও আনন্দ নেই। মদ খেয়ে ভুল বকে, আনবিকামিং বিহেভ করে, তারপর বমি আছে, হুল্লোড় আছে। কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো। তবু গুচ্ছের পয়সা খরচ করে সেই অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চাই !

সেই জন্যই আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন ?

ঝিনুক পুনমকে ডেকে বোতলগুলো আবার ফ্রিজে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, বোতলের গা থেকে মেঝেয় জল পড়েছে, মুছে নিয়ে যা তো !

ঘর মুছে পুনম চলে যাওয়ার পর ঝিনুক বলল, আমার কথার একটুও দাম দেয় না। এম পি বন্ধু এসেছে তো কী হয়েছে ? তাই বলে বাড়িটাকে শুঁড়িখানা বানাতে হবে ? আর আজকালকার এম পি-রাই বা কীরকম ? যখন তখন তারা মদ খাবে কেন ?

মদের সপক্ষে কেউ বলার নেই দেখে বৈশম্পায়ন খানিক ভেবে এবং খানিক সাহস সঞ্চয় করে মৃদু করে বলল, ঠিক মদ খাওয়া নয়। স্টিমুল্যান্ট হিসেবে একটু খাওয়া তেমন খারাপ নয়। অনেক বড় বড় লিডারও খেতেন।

স্টিমুল্যান্ট ! বলে ঝিনুক ব্যঙ্গের হাসি হাসল। বলল, তা হলে তো বলার কিছুই ছিল না। আমি আপনার বন্ধুকেও চিনি, মদনকেও চিনি। মদ পেলে এমন হামলে পড়বে যে, দেখলে মনে হয় এটা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনও ইমপরট্যান্ট জিনিস নেই। হোটেল থেকে এক কাঁড়ি দামি খাবার নিয়ে আসবে, তার কিছুই শেষ পর্যন্ত খেতে পারবে না। বহুবার এরকম ঘটেছে।

তা হলে তো—বলে বৈশম্পায়ন সংশয় প্রকাশ করে।

সেই জন্যেই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। মাতালদের আমি দু চোখে দেখতে পারি না।

সব কথা যে বৈশম্পায়ন শুনতে পাচ্ছে বা বুঝতে পারছে তা নয়। সে চেয়ে আছে, বুঝবার চেষ্টাও করছে, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য থেকে একটা সম্মোহন ওর গায়ের সুগন্ধের মতোই বার বার উড়ে এসে আচ্ছন্ন করছে তাকে। ঝিনুক ! কী সুন্দর !

বৈশম্পায়ন সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে রেখে বলল, আপনি যদি বেরিয়ে যান তা হলে আমারও খালি বাড়িতে বসে থাকার মানে হয় না।

এই বলে বৈশম্পায়ন উঠতে যাচ্ছিল, ঝিনুক ভারী নরম মায়াবি গলায় বলল, আপনি তো ওদের মতো একস্ট্রোভার্ট নন, তবে আপনি খান কেন বলুন তো ! যারা সিরিয়াস মানুষ, যাদের মনের গভীরতা আছে তারা কেন এসব বাজে ফুর্তি করবে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন অপরাধী মুখ করে লাজুক গলায় বলে, আমার মদে কোনও নেশা নেই, তবে প্রেজুডিসও নেই।

নেশা মাধবেরও নেই। কিন্তু কোনও অকেশন পেলেই মদের চৌবাচ্চায় লাফিয়ে পড়বে। আজকাল লোকে এত মদ খায় কেন তা আমি একদম বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন সম্মোহনের আর একটা ঘোর কাটাল। ঝিনুক ! কী সুন্দর !

মৃত্যু-নদীর কলরোল কানে ভেসে আসছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে আয়ু। জীবনে সময় বড় কম। বড় কম। তুমি কি জানো, ঝিনুক, কিশোরী বয়স থেকে আমি তোমার প্রেমিক।

বৈশম্পায়ন যে হাসিটা হাসল তাও সম্মোহিতের হাসি। বলল, কেন যে খায় তা আমিও জানি না ! মদের দামও আজকাল ভীষণ, তবু তো খাচ্ছে।

ঝিনুক ভ্রূ কুঁচকে বলল, মদের দাম কি খুবই বেশি ?

খুব বেশি। প্রতি বছর বাজেটে ট্যাকস বসে আর দাম ওঠে।

ওই বোতলগুলোর দাম কত হবে জানেন ?

মাথা নেড়ে বৈশম্পায়ন বলে, আমার ঠিক আইডিয়া নেই। তবে পঞ্চাশ ষাট টাকা বা তারও বেশি।

চোখ কপালে তুলে ঝিনুক বলে, এককেটা বোতলের অত দাম ?

খুব কম করে ধরেও।

ইস্‌স! বলে ঝিনুক তার চমৎকার হাতখানা ছোট কপালে রেখে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

মদ খুবই একসপেনসিভ নেশা। বৈশম্পায়ন মৃদুস্বরে বলে, আপনি কি জানতেন না ?

ঝিনুক ভ্রূকুটি করে বৈশম্পায়নের দিকে চেয়ে বলে, আমার মদের দাম জানার কথা নাকি ?

বৈশম্পায়ন ঢোঁক গিলে বলে, ঠিক তা মিন করিনি। তবে আজকাল সবাই সব খবর রাখে।

ঝিনুক বিরক্ত গলায় বলে, আমি সকলের মতো নই।

বৈশম্পায়নের ভিতর থেকে কে যেন সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে, তা ঠিক। আপনি অন্যরকম।

ঝিনুক আবার ভ্রূকুটি করতে গিয়ে হেসে ফেলে বলে, আমি কীরকম বলুন তো ?

বৈশম্পায়নের ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মরে যায়। আর একটা সম্মোহনের ঢেউ এসে আচ্ছন্ন করে তাকে। ঝিনুক! কী সুন্দর! তুমি যেখান দিয়ে হেঁটে যাও সেই পথে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে থাকে। যেদিকে তাকাও, আলো হয়ে যায়। তোমার জন্যই সেতু বন্ধন। তোমার জন্যই ট্রয়ের যুদ্ধ। তোমার জন্যই বেঁচে থাকা মরে যাওয়া। তুমি কীরকম তা কি বলে শেষ করা যায় ? কথার অত ক্ষমতা নেই ঝিনুক।

ঝিনুক এই অসহায় লোকটিকে রেহাই দিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমি ভীষণ খারাপ, জানি।

না, না। বৈশম্পায়ন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

ঝিনুক উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার বন্ধুর ফিরতে দেরি হবে। অফিস থেকে বেরিয়ে কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাবে খাবার আনতে। আপনি কি ততক্ষণ একা বসে থাকতে চান ?

না। বৈশম্পায়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বরং একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন ?

বিশেষ কোথাও না।

ঝিনুক মৃদু একটু হাসে। বলে, তা হলে আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায় ?

আমার বোন থাকে কাছেই, গোলপার্কের ওদিকটায়। ওর জন্য একটা ঝি ঠিক করেছি, বলে আসি।

বৈশম্পায়ন এত সৌভাগ্যের কল্পনা করেনি। একটু অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে থেকে বলল, চলুন।

॥ ১০ ॥

গড়িয়া স্টেশনের খানিকটা আগেই চলন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরা থেকে একটা লোক লাইনের ধারে লাফিয়ে নামল। কাজটা খুব সহজ নয়। ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরায় নামবার সিঁড়ি নেই, পাটাতনও বেশ উঁচু আর লাইনের ধারে অতি সংকীর্ণ জায়গায় নুড়ি পাথর ছড়ানো, যমদূতের মতো গা-ঘেঁষা লোহার পোস্ট। কিন্তু লোকটা নামল অনায়াসে, যেন প্রতিদিন এইভাবে নামা তার অভ্যাস। কামরার কিছু লোক তাকে বহুক্ষণ লক্ষ করছিল, এখন তারা মুখ বের করে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে দেখছে। কেউ অবশ্য কিছু বলল না। তার চেহারাটাই এমন যে, লোকে কিছু বলতে সাহস পায় না, কাছে এগোতে চায় না।

ট্রেনটা এগিয়ে গিয়ে থামল। কয়েকশো গজ দূরেই স্টেশন। স্পষ্ট বিকেলের আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। বহু লোক। গিজগিজে ভিড়। সে এখন যতদূর সম্ভব ভিড় এড়াতে চায়।

নামবার সময় উপুড় হয়ে মাটিতে হাতের ভর দিয়েছিল সে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু হাতে ঘষাঘষি করে ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলল।

চারিদিকে শরতের ভারী সুন্দর এক বিকেল। বাঁয়ে গড়িয়ার বাজারে বোধহয় আজ হাট বসেছে। খালে একমাথা ভর ভরন্ত জল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গাছপালা গভীর সবুজ। মেঠো গন্ধ। অবারিত মুক্ত মাঠঘাটে অগাধ বাতাস। গরম না, ঠাণ্ডাও না লোকটা অবশ্য প্রকৃতির এই সাজগোজ লক্ষ করল না। তার সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখ চারদিকে ঝেঁটিয়ে পরিস্থিতিটা দেখে নিচ্ছিল। যা দেখল তাতে নিশ্চিন্ত হল সে। অবশ্য এই নিশ্চিন্ত অবস্থাটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। বহু চোখ তাকে খুঁজছে। খুঁজে পেলে যে আবার ধরে জেলে পুরবে, তা নাও হতে পারে। বেকায়দা দেখলেই গুলি চালাবে। তার অবস্থাটা খুব সুখের নয়। সুখে সে কোনওকালে ছিলও না। একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমোয়নি বড় হওয়ার পর থেকে। কোনও পথেই সাবধান না হয়ে হাঁটেনি কখনও। খুব ঘনিষ্ঠ লোককেও আগাপাশতলা বিশ্বাস করেনি।

ইশারা ছিল অনেক আগেই থেকেই। দিন পনেরো আগে একজন পলিটিক্যাল আড়কাঠি জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করে যায়। বেশি ধানাই পানাই করেনি, সোজা বলেছে, আমাদের হয়ে কাজ করবে ?

সে বরাবরই এ দলের বা সে দলের হয়ে কাজ করেছে। সুতরাং এ প্রশ্নের জবাব দিতে ভাবতে হয়নি, করব।

ব্যস, কথা ওইটুকুই। কিন্তু তার মধ্যেই ইশারাটা ছিল। পরশু বিকেলে একজন কয়েদির মারাত্মক পেট ব্যথা। তাকে পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে নেওয়ার সময় তার ডাক পড়ল স্ট্রেচার ধরতে। হাসপাতাল পর্যন্ত রুগির সঙ্গে ছিল সে। বেডে তুলে দিল। আর তারপরই দেখল, পালানোর জন্য কসরতের দরকার নেই। শুধু ইচ্ছে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সে পেচ্ছাপখানা হয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কয়েদির পোশাকটাই ছিল সবচেয়ে বেখাপ্পা জিনিস, কিন্তু কলকাতার লোক আজকাল এতরকম বিচিত্র পোশাক পরে যে, লোকে তেমন মাথা ঘামায় না।

লোকটার বুদ্ধি তেমন বেশি নয়, লোকটার মনে খুব একটা জটিলতা নেই, দুনিয়া সম্পর্কে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট এবং মোটা দাগের। তার বেশির ভাগ অনুভূতিই শারীরিক। যেমন যৌনতা এবং ক্ষুধাবোধ। তবে শরীরের ব্যথা-বেদনার বোধ তার খুবই কম। তার মানসিক অনুভূতি এক আঙুলে গোনা যায়। কোনও ফালতু দুঃখ-টুঃখ আর তার নেই। শুধু আছে একটা প্রচণ্ড একরোখা আগুনে রাগ, আছে ভয়ঙ্কর রকমের টাকার লোভ, দুনিয়ায় প্রায় কারও প্রতিই তার কোনও গভীর ভালবাসা নেই, মানুষকে খুন করতে তার দুঃখ হয় না বটে, কিন্তু খুন করার পর সে বহুক্ষণ খুব অস্থির থাকে, তার একটা পশুসুলভ ভয়ও আছে, কিন্তু সেটা খুব কমই সে টের পায়। তবে একটা অনুভূতি তার প্রখর, সে আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়।

পরশু রাতে কলকাতার ভিড়ে ছাড়া পেয়ে তার প্রথম জেগেছিল এক হিংস্র প্রচণ্ড কাম। সেই তাড়নায় তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। আজকাল দুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি পাল্টায়, দোস্তরা রং বদলে ফেলে, দল ভেঙে যায়। সে জেলখানায় থাকতে কী কী হয়ে গেছে তা না জানলে সে লাইনটা ধরতে পারবে না। লাইন ধরতে না পারলে বেরিয়েও লাভ নেই। খাবি খেয়ে মরতে হবে। তাই কোনও ঝুঁকি নেওয়া তার উচিত ছিল না। কিন্তু সেই কাম তাকে তাড়া করে আনল কসবা পর্যন্ত। নীতু বরাবর তার বাধ্য ছিল, বাঁধাও ছিল। সে নীলু হাজরার ফুঁকো খুনের মামলায় ঘানি টানতে যাওয়ার পর নীতু বিয়ে করেছে। বেশি দিন নয়, মাত্রই। নীতুকে নিয়ে মাঝে মাঝে থাকবে বলে সে রথতলার দিকে বস্তির যে ঘরটা ভাড়া নিয়ে রেখেছিল সেই ঘরেই সংসার পেতে বসেছে।

সেই সদ্য-পাতা সংসারে সে রাত নটার হানা দিল।

কী রে নীতু ! জমিয়ে নিয়েছিস ?

যে নীতু তাকে দেখলে গলে পড়ত সে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। অদ্ভুত এক নাকিসুরে

বলে উঠল, তুমি পালিয়েছ ! অ্যাঁ !

কেন, তাতে তোর অসুবিধে হল ?

বিয়ের জল পড়ে নীতুর রুক্ষ চেহারাটা কিছু ফিরেছে। বেড়ার সঙ্গে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ও এইমাত্র ম্যাচিস কিনতে মোড়ে গেল, এক্ষুনি আসবে।

লোকটা কে ?

তুমি চিনবে না।

কী করে ?

আটা চাকি আছে।

তা তুই ভয় পাচ্ছিস কেন ? কিছু খেতে মেতে দিবি ?

নীতু রুটি সেঁকছিল জনতা স্টোভে। ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। এ কথায় একটু সহজ হয়ে বলল, দিচ্ছি। বোসো। এই পোশাকে এলে, লোকে দেখেনি ?

দেখেছে।

পুলিশও দেখেছে তা হলে !

দেখলে দেখেছে। ভয় পাচ্ছিস ?

নীতু একটু হাসল। একেবারে মড়ার হাসি। মৃদুস্বরে বলল, পুলিশ এলে তো মুশকিল।

তোর মুশকিল কী ? মুশকিল তো আমার !

তোমার কথাই ভাবছি।

তোর লোকটার জামা প্যান্ট আছে কিছু ?

নীতু মুখ নিচু করে বলল, আছে, তবে তোমার গায়ে হবে না।

দেখি। বের কর।

নীতু খুব দ্বিধা আর অনিচ্ছের সঙ্গে ঘরের একধারে রাখা একটা সস্তা আলনা থেকে একটা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট নিয়ে আসে। লোকটা দেখে, দিব্যি ফিট করবে তাকে। কোমরটা একটু ঢিলে হতে পারে, ঝুল একটু বা বেশি। তা হোক, এই অবস্থায় ওটুকু কিছু না।

জামা প্যান্ট পাশে রেখে লোকটা মাটি ওঠা ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বসে বলল, দে।

নীতু খুব আস্তে ধীরে এবং অনিচ্ছের সঙ্গে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় রুটি আর কুমড়োর তরকারি বেড়ে দিয়ে বলে, ডাল আছে।

কাঁচা লঙ্কা দে, আর পেঁয়াজ থাকে তো পেয়াঁজ। হাতটা কোনওরকমে গ্লাসের জলে একটু ধুয়ে সে দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রথম কয়েক গ্রাস খাওয়ার পরই সচেতন হল। দরজার দিকে মুখ করেই বসেছিল, কিন্তু পাতের দিকে নজর থাকায় খেয়াল করেনি। দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে চেয়ে আছে।

চোখ তুলে সে লঘু স্বরে বলে, এসো নটবর। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

লোকটার চেহারা দেখলেই মালুম হয়, একে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, ঘাড়টা একটু তুলে কামানো, রোগা, তামাটে রং, মুখটা ভালমানুষের মতো। খেটে খাওয়া লোকের মতো মজবুত চেহারা। বয়স চল্লিশের কিছু নীচে হবে। সে চোখ পাকিয়ে তাকালে পেচ্ছাপ করে দেবে। লোকটা তাকে একটুক্ষণ দেখেই বুঝে গেছে। ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে বসল। নীতু টুঁ শব্দটি করল না।

কয়েক চোপাটে রুটি উড়িয়ে ভরপেট জল খেয়ে লোকটা উঠল। এবার আর একটা কাজ। নীতুকে চাই।'

চাই বটে কিন্তু সমস্যা এই ফালতু লোকটাকে নিয়ে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এ লোকটা ভিতু, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি ঘর থেকে একে বের করে দেওয়া যায় তবে বাইরে গিয়ে বস্তি আর পাড়ার লোক জুটিয়ে আনতে পারে। আর ঘরে থাকলে নীতুর অসুবিধে। শত হলেও এর সঙ্গেই তো সে ঘর করছে।

তবে এসব সমস্যা নিয়ে ফালতু মাথা ঘামাতেও সে রাজি নয়। এতকাল সে নীতুকে যেমন ইচ্ছে কাজে লাগিয়েছে। দু দিন চোখের আড়াল হয়েছিল, সেই ফাঁকে এই ট্রেচারি। সুতরাং নীতুর যদি কিছু অসুবিধে হয় তবে সেটা ওর পাওনা।

লোকটা তার হাফপ্যান্টে হাত মুছে বলল, তারপর কাপ্তান! কী খবর? নীতু তোমার দেখ-ভাল ঠিক মতো করছে তো?

লোকটা হাঁ করে চেয়েছিল। হাতে একটা বিড়ির বাণ্ডিল আর একটা দেশলাই তখনও ধরা। কথার জবাব দিতে গিয়ে দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, হ্যাঁ।

জেলখানার কামিজটা গা থেকে খুলে ফেলে সেইটে ঘুরিয়েই লোকটা একটু হাওয়া খেয়ে পরিস্থিতিটা ঠিক মতো বুঝে নিল। নীতু তাকে জানে, সুতরাং নীতু ঝামেলা করবে না। কিন্তু এই লোকটা করতে পারে। আর কিছু না হোক, ভয়ে চেঁচাতে পারে। এই ঘরটার সুবিধে যে, এটা কোনার ঘর। উত্তর দিকে আর ঘর নেই, উঠোন। কিন্তু দক্ষিণের ঘরে লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বস্তি জুড়েই নানারকম কথাবার্তা, চেঁচানি, চ্যাঁ ভ্যাঁ, চেঁচানোমাত্রই লোক জুটে যাবে।

লোকটা খুব ঠাণ্ডা গলায় নীতুর মানুষকে বলল, তুমি যাকে নিয়ে ঘর করছ সে আমার রাখা মেয়েমানুষ, তা জানো কাপ্তান?

লোকটা আবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, একটু আধটু শুনেছিলাম।

নীতু আসলে আমার মেয়েমানুষ। তুমি ফালতু লোক। তাই না?

লোকটা চোখ সরিয়ে নিয়ে ভয় খাওয়া গলায় বলে, আমি ঝামেলায় যেতে চাইনি। কিন্তু নীতু বলল—লোকটা থেমে যায়।

কী বলল? সে ধমক দেয়।

বলল আপনার অনেকদিনের মেয়াদ। ওকেও দেখাশোনার কেউ নেই। তাই—

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই কাপ্তান। আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন নীতুকে আমি ফেরত চাই। তুমি কী করবে?

আমি! বলে লোকটা অগাধ জলে পড়ে চারদিকে তাকাল।

এতক্ষণ নীতু কথা বলেনি। কিন্তু এইবার আটা মাখা হাত শব্দ করে ঝেড়ে বলল, নবদা, আমি ওকে বিয়ে করেছি। তুমি এখন ওসব কথা বোলো না।

তোরও বিয়ে হয় নীতু? ঘাঁটাপড়া মেয়েমানুষের বিয়ে? ওপরের ওই বাঁশ দেখছিস? ওর সঙ্গে তোর চুল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব। বলে সে নীতুর দিকে চেয়ে থাকে।

নীতু চোখ নামায় বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার ফোঁপানির শব্দ পাওয়া যায়।

নব নীতুর মানুষটার দিকে চেয়ে বলে, কী করবে কাপ্তান? যাবে? না থাকবে?

লোকটা নীতুর দিকে চেয়ে শুকনো মুখে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, নীতু ছাড়া কি আপনার চলবে না? আমরা অনেক ভেবেচিন্তে গুছিয়ে সংসার পেতেছিলাম।

ওসব বাত ছাড়ো। আজ রাতের মতো নীতুকে আমার চাই। তুমি বসে বসে দেখবে? না যাবে?

লোকটা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল। প্রাণের ভয় বড় ভয়। তবে তলানি সাহসটুকু উপুড় করে ঢেলে সে বলল, নীতুকে আমার খুব পছন্দ ছিল। ওকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে দাদা। বলতে বলতে তার চোখে টলটল করে জল ভরে এল।

নীতু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, তোমারও তো বউ আছে নবদা? গৌরীদিকে জিজ্ঞেস কোরো তো, পারে কিনা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে—

এ কথায় নব আর একটু গরম হল। চাপা হিংস্র গলায় বলল, মুখ ভেঙে দেব বেশি কথা বললে।

লোকটার সাহসের তলানি আরও কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট আছে দেখা গেল। সে বিড়ি আর দেশলাই বার বার এ হাত ও হাত করতে করতে বলল, নীতুকে কি আপনি বরাবরের জন্য চান দাদা? নাকি আজ রাতটা হলেই চলে?

লোকটা ব্যবসা জানে। নব কামিজটা দূরের আলনার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, অত সব ভেবে দেখিনি। এখন চাই, এটুকু বলতে পারি।

লোকটা শুকনো মুখে বলল, আমাদের একটা সিস্টেম না কী যেন বলে তাই তৈরি হয়ে গেছে তো! তাই বলছিলাম—

কী বলছিলে কাপ্তান?

বলছিলাম নীতুকে ছাড়া যদি আপনার না চলে তা হলে আজ রাতের মতো আমি বরং আমার এক পিসি আছে বাঘাযতীনে, তার কাছে গিয়ে থেকে আসি। কাল পরশু আমরা অন্য জায়গায় উঠে যাব।

এই সময় নীতু হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, না, তুমি যাবে না! কিছুতেই যাবে না! বলে উঠতে যাচ্ছিল নীতু।

নব তখন মারল। বেশি জোরে নয়, ডান পা সামান্য তুলে মাজার একটু ওপরে। নীতু আবার বসে পড়ল। কিন্তু চেঁচাল না। প্রাণের ভয়।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে বলল, মারবেন না। আমি যাচ্ছি নীতু। কাল বেলাবেলি চলে আসব। ভেবো না।

নীতু বিহুল মুখে বসে শূন্য চোখে চেয়েছিল। লোকটার কথায় একটু নড়ল। তারপর ধীরে আটা মাখার কানা উঁচু কলাই করা বাটিটা সরিয়ে রাখল।

নব লোকটার দিকে চেয়ে বলে, বাইরে গিয়ে কোনওরকম গোলমাল করবে না তো।

লোকটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। আমি তেমন মানুষ নই। আর নীতু তো আপনার হাতেই রইল।

লোকটা নিঃশব্দে চলে গেলে নব গিয়ে দরজা দিল। তারপর এক ঝটকায় নীতুকে তুলে আনল বিছানায়।

তবে এরকম কাঠের মতো শক্ত, বিস্বাদ মেয়েমানুষ সে জীবনে ভোগ করেনি।

রাতে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও দুবার নীতুর গায়ে হাত তুলতে হয়েছিল নবকে। তবে খবর বিশেষ কিছু পেল না। হয় নীতু খবর চেপে যাচ্ছিল, নয়তো জানেই না।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ লোকটা আবার এল। মুখ শুকনো, চোখ লাল, বার বার ঢোঁক গিলছে। নীতু নবর জন্য স্টোভ জ্বেলে দ্বিতীয় দফা চা করছিল। শক্ত মুখে একবার তাকাল লোকটার দিকে। কিছু বলল না। লোকটাও না।

শুধু নব খুব আদর দেখিয়ে বলল, কী খবর কাপ্তান? সারা রাত নীতুর কথা ভেবে মেয়েমানুষের মতো কান্নাকাটি করেছ নাকি? তুমি সতী বটে হে?

লোকটা তার দিকে চাইল না। মাথা নিচু করে উবু হয়ে ঘরের মাঝখানটায় বসে রইল।

লোকটার ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাল নব, লোকটার তোলা জলে স্নান করল, লোকটার পয়সায় কেনা চালের ভাত খেল, তারপর লোকটার জামা আর প্যান্ট পরে এবং লোকটার কাছ থেকেই গোটা ত্রিশেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নীতুটা অন্যের হয়ে গেছে। ওকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না ভেবে একটু গা জ্বালা করল তার। কিন্তু এসব গায়ে মাখার মতো সময় নেই। নীতু আর কাপ্তান আজই এ জায়গার পাট ওঠাবে ভেবে রওনা দেবার আগে বলে গেল, ঘরটা আমার নামে নেওয়া আছে হে কাপ্তান, বাড়িওলাকে আবার ছেড়ে দিয়ে যেয়ো না। একটা তালা লাগিয়ে মোড়ে মাস্তুর দোকানে আমার নাম করে চাবিটা রেখে যেয়ো।

পালালেই যে মুক্তি পাওয়া যাবে না তা জানে নব। কিছুদিন আগে যে পলিটিকসওয়ালা দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে পরশু দিনের ঘটনাটা দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। সকলের নাকের ডগার ওপর দিয়ে সে খুনের আসামি নইলে বেরিয়ে এল কী করে? পিছনে একটা মতলব কাজ করছে। সেই মতলবটা বুঝতে লাইন ধরতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একবার বেরিয়ে আসতে দিয়েছে বলেই যে পুলিশ জামাই-আদর করবে তা নয়। বিস্তর পুলিশ মতলবটার খবর জানে না।

দিনের বেলা লোকালয়ে তাই একটু গা ছম ছম করছিল নবর। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে

সেই পলিটিকসওয়ালার সঙ্গে মোলাকাত করতে হবে। কিন্তু লাইনটা জানে না নব। লাইনটা জানতে সে দু-চার জায়গায় টুঁ দিল। খুব সুবিধে হল না। তবে বিকেলের দিকে বালিগঞ্জে এক পাঞ্জাবির দোকানে রুটি তড়কা খেতে খেতে ক্ষীণভাবে মনে পড়ল, ওই পলিটিকসওয়ালা যে পার্টির লোক সেই পার্টির একটা ছোকরাকে সে চেনে। নাম জয়দ্রথ। তার দাদা এক ব্যাঙ্কের অফিসার, তারও একটা শক্ত যেন কী নাম ! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই একই গ্রুপের লোক মদনদাও। আর কে না জানে মদন ফোর টুয়েন্টি তাকে পুরো ফলস কেসে ঘানি গাছে জুড়ে দিয়েছিল !

লাইন থেকে নেমে ডান হাতে পিচ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নবর গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে।

জয়ের বাড়িটা খুঁজে বের করতে খুব সময় লাগল না নবর। জয় বাড়িতে নেই, তার মা বলল।

কখন আসবে জানেন ?

কী জানি বাবা। এম পি মদন কলকাতায় এসেছে, তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাদিন।

মদন এসেছে ! নবর গায়ের রোঁয়া আর একবার দাঁড়াল। গা-জ্বালা করল তার।

দুনিয়ার রং এ-বেলা ও-বেলা পাল্টে যায়। যারা তার পালানোর পথ করে দিয়েছে তাদের রং পালটাবে। কিন্তু একসময়ে যার হয়ে সে খুনখারাপি মারদাঙ্গা করেছে, বিস্তর ঝামেলা থেকে তাকে নিজের জান দিয়ে বাঁচিয়েছে তার বেইমানির শোধ নেওয়ার মওকা আর পাবে না।

নব বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা তেমাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

॥ ১১ ॥

প্রথম থেকেই মিটিংয়ে বেড়াল কুকুরের ডাক আর টেবিল চাপড়ানি চলছিল। কর্মী বৈঠকে এরকম মাঝে মাঝে হয়ও। কিন্তু আজকের মিটিংয়ের টেম্পো প্রথম থেকেই অ্যায়সা চড়ে ছিল যে, কারও কোনও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। দলের রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার থেকে শুরু করে জনা দশ-বারো নেতা পার্টি অফিসের বড় ঘরের মেঝেয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে শতরঞ্চিতে অসহায়ভাবে বসা। তার মধ্যে মদনদাও। সবাই কথা বলার চেষ্টা করে করে হেদিয়ে পড়েছে ! সেক্রেটারি বার তিন-চার চেষ্টা করেছিলেন, একবার একটা গোল করে পাকানো সিগারেটের প্যাকেট এসে তাঁর কপালে লাগল, সেই সঙ্গে চিৎকার, বসে পড়ো চাঁদু। সেক্রেটারি সেই যে বসে পড়েছেন আর ওঠেননি। ট্রেজারার একবার বাথরুমে যেতে চেয়েছিলেন, তিন-চারটে ষণ্ডা ছোকরা কাঁধ চেপে বসিয়ে দিল ওসব হবে না। গুরুপবাজির হিল্লে করে নাও আগে, তারপর হিসি টিসি।

জয় খুব ভিতরে সেঁধোতে পারেনি, দরজা দিয়ে ঢুকে প্রচণ্ড ভিড়ে দেয়ালে সেঁটে গেছে। পাশে হরি গোঁসাই, জয় ফিসফিস করে একবার বলল, বড় বড় নেতারা এভাবে হেকেল হচ্ছে, এ খুব অন্যায়।

হরি খিক করে হেসে বলে, চেপে যা। হচ্ছে হোক। একটু হওয়া দরকার।

মদনদা কোনও ইনিসিয়েটিভ নিচ্ছে না, দেখেছ ?

চালাক লোক। পাবলিকের চোখে ইমেজ রাখছে।

কিন্তু মদনদা দাঁড়ালে সব সমাধান হয়ে যাবে।

হলে এতক্ষণে মদনদা দাঁড়াত রে। তা নয়। কালকের ক্লোজডোর মিটিংয়ে বসে নেতারা এককাট্টা হতে পারেনি।

বিমর্ষ মুখে জয় বলল, আজকাল নেতারা একদম এককাট্টা হতে পারছে না হরিদা। কী হবে বলো তো ?

দল ভাঙবে। আবার কী ? বাঁ কোণে নিত্য ঘোষ বসে আছে কেমন বেড়ালের মতো মুখ করে দেখছিস ?

জয় একটা শ্বাস ফেলে বলল, দেখেছি। কিন্তু নিত্যদা আলাদা দল করতে চাইলেই কি হবে ? নিত্যদার যে সেই ইয়েটা—কী যেন বলে—সেইটে নেই।

কীয়েটা ?

ওই যে ! জয় সহজ ইংরিজি শব্দটা হাতড়াতে হাতড়াতে বলে, ওই যে ইনফ্লুয়েন্স না কী যেন !

তোর মাথা। এই মিটিংয়ে বারো আনাই নিত্য ঘোষের লোক !

সে বুঝেছি। কিন্তু কী করে হয় বলো তো হরিদা। নিত্যদা তিন বার অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে হেরে গেছে। ওকে কে পোঁছে ?

সবাই কি ভোটে জেতে ? জিতলেই যে তাকে সবাই পোঁছে এমনও নয়।

আমি বলছি হরিদা, একবার মদনদা যদি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে তা হলে—

কী বোঝাবে ?

এটা যে নিত্য ঘোষের চক্রান্ত সেই কথাটা।

বিপদ আছে রে।

কী বিপদ ?

তখন নিত্য ঘোষও উঠে দাঁড়িয়ে মদনদার আর একটা চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। ওরা কেউ কাউকে ঘাঁটাতে চাইছে না এখন। দল ভাগ হলে তখন কোমর বেঁধে লড়বে। এখন ক্যাডার কালেকশন।

মদনদার চক্রান্তের কথা নিত্য ঘোষ কী বলবে ? মদনদার আবার চক্রান্ত কী ? তুমি যে কী বলো হরিদা।

হরি গোঁসাই কী একটু বলার জন্য চুলবুল করেও সামলে গেল, বলার তো ট্যাকসো লাগে না। পাবলিকের সামনে একটা কিছু টক ঝাল বললেই পাবলিক খেয়ে নেয়। আর পলিটিকসওয়ালাদের কটা কথা সত্যি ? চক্রান্ত না থাকে তো বানিয়ে একটা বলে দেবে।

লোকে বিশ্বাস করবে না।

চেঁচামেচি বাড়ছিল। আগের দিকে খুব একটা ঠেলাঠেলি চলেছে। একটা ছোকরা কী একটা বলছিল চেঁচিয়ে, তিন-চারজন তাকে ধরে খুব ঝাঁকাচ্ছে। ধাক্কা মেরে মেরে ভিড় ঠেলে বের করে আনছে। হরি গোঁসাই আর জয় দুজনেই ছোকরাকে চিনল। মদনদার বডিগার্ড শ্রীমন্ত।

জয় উত্তেজিত হয়ে বলে, স্টেট আর সেন্ট্রাল লিডারদের সামনে কী হচ্ছে দেখো হরিদা !

কিছু করার নেই। দেখে যা। বলে হরি গোঁসাই জয়ের হাতে একটু চাপ দেয়।

এরপর কি পার্টি মিটিং-এও পুলিশ ডাকতে হবে নাকি ? প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকল না।

গলা উঁচুতে তুলিস না। লোকে তাকাচ্ছে। চাপা গলায় হরি গোঁসাই বলে।

মদনদা তবু কিছু করছে না, দেখেছ ?

কী করবে ? এতগুলো অ্যান্টি লোক।

সবাই অ্যান্টি ? পার্টি ভাগ হলে মদনদা কোনদিকে থাকবে তা জানো ?

হরি গোঁসাই ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানবে ? নিত্য ঘোষ ডিসিডেন্ট, একটু জানি। দিল্লির একটা ফ্যাকশন নিত্য ঘোষকে অ্যাপ্রুভ্যালও দিয়েছে। যে গ্রুপ স্ট্রং হবে মদনদা সেই দিকেই থাকবে মনে হয়।

জয় কথাটা শুনে খুশি হল না। একটু তেরিয়া হয়ে বলল, মদনদা কি সেই ধাঁচের লোক ? যেদিকে আগুন দেখবে সেদিকেই হাত সেঁকবে ?

দূর বোকা ! উল্টো বুঝেছিস। বলতে চেয়েছিলাম, মদনদা যেদিকে জয়েন করবে সেদিকটাই আলটিমেটলি স্ট্রং হবে। চল বাইরে গিয়ে শ্রীমন্তকে ধরি। ব্যাপারটা একটু বোঝা যাবে।

জয়ের ইচ্ছে ছিল না। সে এই মিটিংয়ের শেষটা দেখতে চায়। কিন্তু সামনের দিকে হুড়োহুড়ি বাড়ছে। ঠেলাঠেলি চলছে ভীষণ। দেখা যাচ্ছে না ভাল, তবে বোঝা যাচ্ছে সামনে আর একটা মারপিট লেগেছে। মদনদার কিছু হবে না তো ?

হরি গোঁসাইয়ের পিছু-পিছু জয় বেরিয়ে আসে।

পার্টি অফিসের সামনে বারান্দা। বারান্দার নীচে একটু বাঁধানো জায়গা। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বিস্তর চেনা অচেনা আধচেনা পার্টি ওয়ার্কার দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীমন্ত ভিড় ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই একটা জিপ। একটা লোক জিপের সামনের সিটের ওপর একটা খোলা ফার্স্ট এইড বকস থেকে তুলোয় কী একটা ওষুধ তুলে শ্রীমন্তর কব্জিতে লাগাচ্ছে।

শ্রীমন্ত! কী ব্যাপার? হরি গোঁসাই খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্ত একবার বাঘা-চোখে তাকায়। বাবারে, কী চোখ! লাল, জ্বলজ্বলে আগুনে। শ্রীমন্ত বিগড়োলে খুব গড়বড়, সবাই জানে। হরি গোঁসাই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

জিপের লোকটা শ্রীমন্তর হাতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, একটা সিকুইল খেয়ে নিস। এখন বাড়ি গিয়ে বসে থাক। সন্ধের পর যাব।

জিপের লোকটাকে জয় আবছা চেনে। কালো, পেটানো চেহারা, মাথায় টাক, বছর চল্লিশেক বয়স। পরনে খুব ঝা চকচকে প্যান্ট আর দামি হাওয়াই শার্ট। শ্রীমন্তর হাতে ব্যান্ডেজ করে দেওয়ার পর সে একবার খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চাউনিতে জয় আর হরি গোঁসাইকেও দেখল।

শ্রীমন্ত রাগে ফুঁসছে। গলার শিরা ফুলে আছে, চোখে সেই ক্ষ্যাপা দৃষ্টি। বলল, মা কালীর দিব্যি বলছি নদুয়াদা, হেলার লাশ আমি নামাব। না হলে নাম পাল্টে রেখো।

নদুয়া নামের লোকটা সাপের মতো একটা হিস্‌স্ শব্দ করে গালের পানটা একটু চিবিয়ে নিয়ে বলল, রিঅরগানাইজেশন হচ্ছে। তখন দেখা যাবে। এখন বাড়ি যা।

শ্রীমন্ত একবার পার্টি অফিসের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে।

পিছনে সঙ্গ ধরে হরি গোঁসাই। জয় এগোয় না। কয়েক পা সরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। নদুয়াকে সে চেনে। এর গোডাউন থেকে কয়েক বছর আগে বন্যার সময় মদনদা গম বের করেছিল। গমের মাপ নিয়ে খুব লেগেছিল মদনদার সঙ্গে। নদুয়া বলেছিল, রিলিফের জিনিস আর মাপব কী, ওরকম নিয়ম নেই। যে মাপ বলে দেব সেইটেই ঠিক মাপ। কিন্তু মদনদা ছাড়েনি। বলেছে সরকার যখন দাম দেবে তখন গুনে নেবেন না? তখন চোখ বুজে থাকবেন? শেষ পর্যন্ত দলের ছেলেরা গুদাম ঘেরাও করার ভয় দেখানোয় সব মাল মাপা হয়েছিল। বিস্তর কম ছিল ওজনে। এ সেই লোক। সম্পূর্ণ করাপটেড। তবে পলিটিক্যাল লাইন আছে, টাকা আছে, জিপ গাড়ি আছে, গুণ্ডা আছে। শিয়ালদার যে করাপটেড লোকটা যাত্রীদের কাছ থেকে ভড়কি দিয়ে টিকিট নিচ্ছিল তাকে ধমকানো যত সোজা একে ধমকানো তত সোজা নয়। লোকটা বুকে হাত রেখে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ রাখছে। জিপে ড্রাইভার বসা। প্রস্তুত। মনে হচ্ছে কাউকে তুলে নিয়েই হাওয়া হবে। কাকে তা অবশ্য জয় জানে না!

এত গোলমালে জয়ের মাথা ধরে গেছে; মনটা বড় ভার। মাত্রই সে বিভিন্ন জায়গায় পার্টির বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেতে শুরু করেছে। হিঙ্গলগঞ্জে দলের সংগঠনে তাকে পাঠানোর কথা হচ্ছিল। দু-চার বছর পরেই সে অ্যাসেমব্লির টিকিট পেয়ে যেত। মদনদার মতো করেই নিজেকে তৈরি করছিল সে। আয়না দেখে দেখে বক্তৃতা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে নানারকম একসপ্রেশন দেওয়া প্র্যাকটিস করছিল। গলার ওঠানামা, হাততালির জন্য ঠিক জায়গায় জুতসই আবেগকম্পিত ভাবালু কথা লাগিয়ে তুঙ্গে উঠে যাওয়া, এ সবই অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল তার। স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি কবার পিঠ চাপড়ে বলেছেন, তুমি বেশ তৈরি হচ্ছ। কিন্তু হঠাৎ এ হল কী? পার্টি যে ভাঙবে তা সে নিজে দু মাস আগেও কেন জানতে পারেনি?

হরি গোঁসাই ফিরে এসে বলল, চল।

শ্রীমন্তদার সঙ্গে কথা হল?

হল। চল, বলছি।

একটু এগিয়ে গিয়ে হরি গোঁসাই বলে, শ্রীমন্ত মদনদার কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

কেন?

তা বলল না। শুধু বলল, অনেক ব্যাপার আছে।

কবে ছাড়ল ? কালও তো আঠা হয়ে লেগে ছিল সঙ্গে !

কবে ছাড়ল জেনে কী হবে ? আজকাল হকে নকে এ ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জয় গম্ভীর মুখে একটু ভাবল। তারপর বলল, শ্রীমন্তদা ছাড়বে জানতাম।

কী করে জানলি ?

হাবভাব দেখে। কদিন আগে আমাকে একবার কথায় কথায় বলেছিল, মদনদার বেস ওয়ার্ক ভাল হচ্ছে না। স্টেট লিডাররা নাকি মদনদার ওপর খুশি নয়। তখনই সন্দেহ হয়েছিল, শ্রীমন্তদা গোপনে অন্য দিকে তাল দিচ্ছে। শ্রীমন্তকে যারা ম্যানহ্যান্ডেল করল তারা কারা জানো ? মদনদার লোক নয় কিন্তু।

না, মদনদার লোক হবে কেন ? হেলার নাম শুনলি না ? হেলা হচ্ছে নিত্য ঘোষের—

জানি জানি। ধৈর্য হারিয়ে জয় বলে, কিন্তু তাই বা হয় কী করে ? শ্রীমন্তদা মদনদাকে ছেড়ে দিলে আর একটা গ্রুপে তো তাকে ভিড়তে হবে ! সেই গ্রুপটা তো নিত্যদার। তা হলে নিত্যদার লোক ওকে মিটিং থেকে বের করে দেবে কেন ?

বুঝতে পারছি না। এখন বাড়ি চল।

গিয়ে ?

গিয়ে আবার কী ? এখন কেটে পড়াই ভাল।

মদনদা একা রইল যে ! যদি কিছু হয় ?

কিছু হবে না।

আমাদের দেখা উচিত।

দেখে লাভ নেই। মদনদাকে দেখার লোক আছে। চল।

হরি গোঁসাইয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জয় বলে, আমার মনে হয় কী জানো ? দলে ভাল লোক কেউ থাকবে না।

হরি গোঁসাই চিন্তিত মুখে বলে, তাই তো দেখছি। মদনদা যদি পাওয়ারে না থাকে তবে বিশুটাকে মেডিক্যালে দেওয়া হয়ে গেল। ওদিকে এই সময়ে নবটাও জেল থেকে বেরিয়েছে। কী যে হবে।

সারা পথ জয় সেই অতীতের সুদিনের কথা ভাবতে ভাবতে এল। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। তার মধ্যে রড ধরে তেড়াবেঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, সেই কবে পালবাজার অবধি একটা সাইকেলে ডবলক্যারি করেছিল তাকে মদনদা। একটা মিটিং সেরে ফিরছিল তারা। রডে বসে মদনদার শ্বাস নিজের ঘাড়ে টের পেতে পেতে, আর এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে বার বার মনে হয়েছিল, মদনদা একদিন খুব ওপরে উঠবে ! সেজদিকে খুব পছন্দ ছিল মদনদার। সেজদিরও মদনদাকে। বাড়িতে এলেই সেজদির সঙ্গে ছাদে গিয়ে পুটুর পুটুর কথা বলত। জয় টের পেয়ে আনন্দে কণ্টকিত হয়েছে কতবার। মদনদা যদি সেজদিকে বিয়ে করে তো কী দারুণ হয় ! হয়নি কেন তা জানে না জয়। একদিন এক পলিটেকনিক পাশ সরকারি চাকরের সঙ্গে সেজদির বিয়ে হয়ে গেল ! মদনদা তার বছর চারেক বাদে এম পি হয়।

বাস থেকে নেমে জয় আনমনে মোড়টা পেরিয়ে গলিতে ঢুকল। এ পাড়া দারুণ নির্জন। একধারে জলা, পুকুর জঙ্গল অন্য ধারে কিছু ছাড়া ছাড়া বাড়ি ঘর। তবে এরকম থাকবে না। নতুন প্ল্যানিং-এ চল্লিশ ফুট চওড়া রাস্তা হবে। জমজম করবে জায়গাটা।

ঝুপসি একটা গাছতলা থেকে সরু একটা শিস শোনা গেল। তারপর চাপা গলায় কে ডাকল, জয়দ্রথ !

কে ?

এদিকে শোন। ভয় নেই।

কে বলো তো ? জয় এগোতে সাহস পেল না। তবে দাঁড়াল।

আমি। বলে ছায়া থেকে রাস্তায় একটা লোক এগিয়ে আসে।

শরতের রোদ অল্প বেলাতেই মরে গেছে। চারদিকটা ঘোর ঘোর। বেশ ঠাহর করে চিনতে হয়। তবু এক নজরেই চিনল জয়।

নব ?

কসবায় পিলু নামে একটি নকশাল ছেলেকে খুন করেছিল নব। পিলুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে করতে, ঠোঁটে সেই সিগারেট নিয়েই আচমকা কোমর থেকে দোধার ছোরা টেনে এনে খুব স্নেহের সঙ্গে তলপেটটা ফাঁক করে দিল সাঁঝবেলায়। পিলু যখন মাটিতে পড়ে বুকফাটা চেঁচিয়ে উঠল তখন শান্তভাবে তার হাঁ মুখে হকিবুটসুদ্ধ পা চেপে ধরে সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিল নব। তারপর খুব হিসেব নিকেশ করে আর একবার ছোরা চালিয়ে পাঁজরার ফাঁক দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ফুঁড়ে দিল। তখনও সিগারেটটা জ্বলছে ঠোঁটে। পিলুরই দেওয়া সিগারেট। পিলু নিথর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সিগারেটটা জ্বলছে নবর ঠোঁটে। ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছিল হাসিম, তার কাছ থেকে জয়ের শোনা। নবর ওই 'ভয় নেই' কথাটাকে জয় তাই বিশ্বাস করে না।

এখনও নবর ঠোঁটে একটা সিগারেট জ্বলছে। সেটা নামিয়ে নব আর এক হাতে জয়ের একখানা হাত ধরে বলল, আড়ালে আয়। কথা আছে।

জয় জানে ভয় পেয়ে লাভ নেই, সাহস দেখিয়েও লাভ নেই। নব যা ভেবে এসেছে তাই করবে। এক ধরনের খারাপ রক্ত নিয়ে নবর মতো লোক দুনিয়ায় জন্মায়। যেখানে থাকে সেই জায়গা জ্বালিয়ে দেয়, যাদের সঙ্গে কাজ কারবার করে তাদের সুখ শান্তি বলে কিছু থাকে না।

গাছতলার ছায়ার জয়কে টেনে এনে নব বলে, বোস। ঘাস একটু ভেজা আছে।

জয় চারদিকে চেয়ে বলে, এ জায়গায় পরশু দিনও কেউটে সাপ বেরিয়েছে। এই গাছটার ফাঁপা শেকড়ের মধ্যে আস্তানা।

নব কথাটা কানে না তুলে বলে, শোন, কদিন আগে একজন লোক জেলখানায় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিল! নাম বলেছিল গোপাল বিশ্বাস চিনিস ?

চিনি।

কোথায় থাকে ?

ঠিকানা জানি না। পার্টি অফিসে আসে।

ঠিকানা জোগাড় করে আজই তার সঙ্গে লাইন করতে হবে। চল।

বলে নব আবার জয়ের হাতটা ধরে।

জয় দোনোমোনো করে বলে, এখনই ?

এখনই। বলে নব একটু হাসে।

জয় বলল, চলো।

॥ ১২ ॥

মদন আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছিল। ব্যাপারটা এমন মজার!

রাজ্য শাখার সেক্রেটারি মানুষটা ভাল। দলের কাজে মেতে থাকায় বিয়েটা পর্যন্ত করেননি। বিমর্ষ মুখে হলঘরের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে ছিলেন। মদনের দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু স্বরে বললেন, হাসছ ? হাসো, খুব হাসো। আজ হাসারই দিন। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মারধোর খেয়ে জেল খেটে চল্লিশ বছর ধরে যে স্যাক্রিফাইস করলাম তা কার জন্য ? ভেবে আমারও হাসিই আসার কথা, কিন্তু আসছে না কেন বলো তো ?

আপনার বয়স কত বলুন তো সুহৃদদা ? ষাট বাষট্টি হবে ?

পঁয়ষট্টি চলছে। কেন বলো তো ?

তা হলে এখনও বিয়ের বয়স আছে। এবার একটা বিয়ে করুন।

ইয়ার্কি করছ ? এটা কি ইয়ার্কির সময় ? ভারী হতাশা মাখানো মুখে সুহৃদ চৌধুরী বললেন।

বিয়ে না করলে কে আপনাকে দেখবে ?

যম দেখবে হে। আর কে দেখবে ? এই সব ছেলে ছোকরারা রাজনীতিতে ঢোকার পর থেকে যে ভূতের নৃত্য শুরু হয়েছে তা আর চোখে দেখা যায় না। শিশুপাল, সব শিশুপাল।

মদন হাসতেই থাকে, ফিক ফিক। সেক্রেটারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তাই ভাবছিলাম কার জন্য এই স্যাক্রিফাইস! বিয়াল্লিশে পুলিশ এমন মেরেছিল গোড়ালিতে, আজও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। জেলে থেকেই গ্যাসট্রিক। বনগ্রামের যে বাড়িটা পার্টির নামে লিখে দিয়েছিলাম বিশ বছর আগে, বাজার যাচাই করে দেখেছি সেটার দাম এখন লাখখানেক টাকা।

মদন হাসছিল ফিক ফিক।

হলঘরে তুমুল কাণ্ড হয়েই যাচ্ছে। এক ছোকরা আর একটা ষণ্ডামার্কের কাঁধে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার বাঁধানো ছবি নামিয়ে ঝপাৎ করে আছাড় মারল। কয়েকবারই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো এসে নেতাদের শতরঞ্চিতে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট তাঁর চটি দিয়ে সেগুলো নিভিয়েছেন। এবারও আর একটা জ্বলন্ত সিগারেট উড়ে এসে ট্রেজারারের কোঁচায় পড়ল। উনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কোঁচাটা টেনে নিলেন, প্রেসিডেন্ট হাতে চটি নিয়েই বসে আছেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সিগারেটটার মুখ ভোঁতা করে দিলেন এক বাড়ি মেরে। ট্রেজারার বললেন, শতরঞ্চিটা বাহাত্তর টাকায় কেনা সেই বিশ বছর আগে। আর কি এ দামে পাওয়া যাবে প্রকাশদা?

প্রেসিডেন্ট প্রকাশ চাটুজ্জে গম্ভীর মুখে বললেন, সবই গেল, আর শতরঞ্চি! তোমার যে বাথরুম পেয়েছিল তার কী করলে?

ট্রেজারার ব্যথিত মুখে বললেন, কী করব? চেপে বসে আছি। পুরনো ডায়াবেটিসের রুগি, বেশিক্ষণ চেপে রাখাও যাবে না। এক সময়ে হয়ে যাবে আপনা থেকেই। শতরঞ্চিটা—

মদন মৃদু স্বরে বলে, ভেসে যাক, ভেসে যাক, বেগটা ছেড়ে দিন।

ট্রেজারার বেদনায় নীল হয়ে বলেন, কী যে বলো ঠিক নেই। এই শতরঞ্চিতে কত বড় বড় নেতা বসে গেছেন জানো? তার ওপর এটা ত্রিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট, আধ ইঞ্চি পুরু। একবার ধোয়া হয়েছিল, চড়া রোদেই শুকোতে লেগেছিল পনেরো ষোলো দিন।

দু গোছা রজনীগন্ধা রাখা ছিল মাঝখানে। দুটো ছেলে এসে পটাপট তুলে নিয়ে গেল। দেখা গেল অদূরেই তিন-চারজন রজনীগন্ধার ডাঁটি বাগিয়ে ধরে তলোয়ার খেলছে।

কী হচ্ছে বলুন তো মদনদা! একজন মফস্বলের এম এল এ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

বলতে না বলতেই ফুলশূন্য দুটো ডাঁটি তীরবেগে উড়ে এসে পড়ল নেতাদের মাঝখানে। প্রবীণ সদস্য যদুবাবু হাত দিয়ে মুখ আড়াল না করলে তাঁর চশমায় লাগত।

জমেছে। মদন আপন মনে বলে উঠল।

নেতাদের মধ্যে একমাত্র নিত্য ঘোষই একটু আলাদা হয়ে বসে আছে। কথা বলছে না। একটার পর একটা পান মুখে দিচ্ছে। পিকদানির অভাবে একটা অ্যাশট্রেতে পিক ফেলছিল এতক্ষণ। সেই অ্যাশট্রেটাও ভরে এল প্রায়।

মদন শূন্য ফুলদানি দুটোর একটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নিত্যদা, এটাতে ফেলুন।

ট্রেজারার দেখতে পেয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, ওটা খাঁটি জয়পুরি জিনিস। বিশেষ অকেশনে বের করা হয়।

মদন ঠাণ্ডা গলায় বলে, কতক্ষণ থাকতে হবে তার ঠিক নেই। দেরি হলে নিত্যদার পানের পিক আপনার শতরঞ্চি ভাসাবে যে!

ট্রেজারার উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, কতক্ষণ থাকতে হবে মানে? মিটিং শেষ করে দিলেই চলে যাব।

মিটিং অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বেরোতে পারছি না।

ওরা কি আমাদের আটকে রেখেছে?

আটকেই রেখেছে।

ঘেরাও নাকি?

অনেকটা তাই।

ট্রেজারার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, ঘেরাও করে লাভ কী? আমরা সাতদিন বসে ডিসিশনে আসতে পারব না।

এই সময়ে সারা ঘরের হুলস্থুল হঠাৎ একটু মিইয়ে গেল। কয়েকটা ছেলে বেশ সুসংগঠিত ভাবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে কয়েকটা কাগজ, মুখ চোখ সিরিয়াস!

সবার আগে যে ছেলেটি, তার চেহারা খুবই চোখা চালাক, সপ্রতিভ। সে কাছে এসে নেতাদের দিকে চেয়ে নরম গলায় বলে, আপনারা যাঁরা আমাদের পক্ষে নন তাঁরা দয়া করে দল থেকে পদত্যাগ করুন। যাঁরা পদত্যাগ করবেন তাঁদের আমরা আটকাতে চাই না। যাঁরা দলে থেকেও আলাদা ফ্যাকশন করতে চান আমরা তাঁদের কনফ্রনট করব। আমাদের কাছে টাইপ করা পদত্যাগপত্র আছে। কার চাই বলুন!

কেউ কিছু বলতে চায় না। ভাবছে। দিল্লিতে দলে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সুতরাং এখানেও ভাঙবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ডামাডোলে কেউ আগে নিজের রং চেনাতে চায় না। অবশ্য নিজের রং যে কী তাও অনেকে বুঝতে পারছে না!

মদন হাত বাড়িয়ে বলল, আমাকে দাও একখানা।

আপনি পদত্যাগ করবেন মদনদা? ছেলেটা যেন ঠিক বিশ্বাস করছে না।

করব। কারণ আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। দাও। বলে ছোকরার হাত থেকে কাগজ নিয়ে মদন তলায় সই করে ফেরত দিল। দেখাদেখি ট্রেজারার, প্রেসিডেন্ট, গেঁয়ো এম এল এ এবং আরও কয়েকজন হাত বাড়াল।

পাশের দরজা দিয়ে টুক করে বেরিয়ে পড়ে মদন। পদত্যাগ করেছে বলেই বোধহয় কেউ আটকায় না। পিছন দিকে একটা সরু গলি আছে, সেইটে খুঁজতে একটু সময় লাগে। তারপর বড় রাস্তা।

চারদিকে মরা আলোর ভারী নরম একটা বিকেল। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস টানে মদন। বাইরে এসে সে এমনই মোহিত হয়ে পড়ে যে, লক্ষই করে না পার্টি অফিস থেকে একশো দেড়শো গজ দূরে একটা জিপ গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কালো ষণ্ডামার্কা টেকো একটা লোক ক্রূর চোখে তাকে দেখছে। হালদারের যে গাড়িতে সে এসেছে তা পার্টি অফিসের উল্টোদিকে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড় করানো। কিন্তু মদন গাড়িটার কাছে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই করে না। পার্টি অফিসের সামনে এখন অগুন্তি লোক। ওদিকে গেলেই ঘিরে ফেলবে। মদন কালীঘাটের ট্রাম ধরতে এসপ্লানেডের দিকে হাঁটতে থাকে।

ফুটপাথে থিকথিক করছে হকার, বে-আইনি দোকানপাট, ফুটপাথের বাসিন্দাদের সংসার। ট্যানা-পড়া এক মেয়েছেলে কাঠের জ্বালে তরকারির খোসা দিয়ে রান্না চাপিয়েছে। গন্ধে গা গুলোয়। বাস মোটর গাড়ির চলন্ত চাকা থেকে দু তিন হাত দূরেই হামা টানছে তার কোলের বাচ্চা।

রিজাইন করেছেন শুনলাম! একদম কানের কাছে মুখ এনে প্রেমিকার মতো মোলায়েম করে কে যেন জিজ্ঞেস করে।

মদন চোখের কোনা দিয়ে শচীনকে একটু মেপে নিয়ে বলল, ওই একরকম বলতে পারো।

তা হলে আপনারাই নতুন দল করবেন?

ঠিক নেই।

শচী শেয়ালের মতো হাসল, কথা দিচ্ছি দাদা, কাল আপনার স্টেটমেন্ট আমাদের কাগজের ফ্রন্ট-পেজে বেরোবে।

তোমাদের ফ্রন্ট পেজ কটা?

কী যে বলেন? শচী মাথা চুলকে হাসল, ফ্রন্ট পেজ একটাই, এবার আপনাকে আমরা বড় কভারেজ দেবই।

একটা সত্যি কথা বলবে শচী?

কী, বলুন দাদা!

তোমরা কার দলে?

আমাদের আবার দল কী?

মদন শান্ত স্বরেই বলে, কালকের কাগজে তোমরা আমার স্টেটমেন্ট ছাপবে ঠিকই, কিন্তু মাথার ওপর নিত্য ঘোষের বিবৃতি বসাবে। এ সবই আমি জানি। এখন নিত্য ঘোষের পালেই হাওয়া। তোমাদের দোষ নেই।

শচী এ নিয়ে কচলাল না। বলল, আপনাদের নতুন দলের কী নাম হবে ভেবেছেন ?

একটা কিছু হবে। অল ইন্ডিয়া বেসিসেই হবে। আমরা ডিসিশন নেওয়ার কে ?

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আপনি তো পার্টির অল ইন্ডিয়া লিডার। আমরা জানি হাই কমান্ডই আপনাকে হেস্তনেস্ত করতে দিল্লি থেকে এখানে পাঠিয়েছে। আমরা জানি আপনি মালদা মুর্শিদাবাদ বীরভূমের ক্যাডারদের সাপোর্ট পেয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে দল ভাগ হতে শুরু হয়ে গেছে। দিল্লি থেকে আপনি নিশ্চয়ই কিছু শুনে এসেছেন।

ধর্মতলার মোড়ে অফিস ভাঙা ভিড়ে দাঁড়িয়ে মদন তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল এবং শচীকে অফার না করেই নিজে একটা ধরাল। অভ্যাসবশে শচী হাত বাড়িয়েছিল। মাঝপথে হাতটা ফেরত নিয়ে বলল, আপনাদের ক্যাডাররাই কি মেজরিটি ?

জানি না।

শচী ভিড়ের মধ্যেই কানের কাছে মুখ এনে বলল, একটা কথা বলি দাদা। নিত্য ঘোষ যতই লাফাক, আপনি যেদিকে থাকবেন সেদিকেই পাল্লা ঝুঁকবে। আমরা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।

কত কথাই যে জানো তোমরা !

দেখে নেবেন। বলে দিলাম। বলে শচী আবার হাতটা বাড়ায়।

মদন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওর হাতে দিয়ে দেয়। বলে, কত কায়দাই যে জানো শচী। কিন্তু এবার নিজের পয়সায় সিগারেটটা খেতে শেখো, তাতে খানিকটা সেলফ রেসপেকট আসবে।

কথাটা গায়ে না মেখে শচী বলে, আপনি যে ফোরফ্রন্টে চলে এসেছেন তা সবাই টের পাচ্ছে। নইলে আপনি আসার পর এই গণ্ডগোলটা হল কেন ? নিত্য ঘোষ যেটা করছে সেটা পাওয়ার পলিটিকস। কিন্তু আলটিমেটলি—

কার্জন পার্কের ট্রাম গুমটি ছাড়িয়ে, রাজভবনের গাছপালার ডগার ওপর দিয়ে, রঞ্জি স্টেডিয়ামের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এসপ্লানেড ইস্টে আজও নিত্যকার মতো কারা ধরনা দিয়ে বসে আছে, সামনে পুলিশ ব্যারিকেড। একটা ফেরেব্বাজ কলমওয়ালা চোরাই কলম বেচার ভাবভঙ্গি করে কানের কাছে এসে বলে গেল, চাইনি-ই-জ।

মদন ভুলে গেল যে, সে এম পি বা পলিটিকসওয়ালা। হঠাৎ বলল, ফুচকা খাবে শচী ? ওই লেনিন স্ট্যাচুর নীচে একটা ফুচকাওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে। চলো।

বলতে বলতেই শচীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে রাস্তা পেরোয় মদন।

একজন ভি আই পি হয়ে কী যে করেন মদনদা ! হাত ছাড়িয়ে শচী হাসল, আর একটু হলে নীল রঙের অ্যামবাসাডারটার মুখে পড়ে যেতাম দুজনে।

পলিটিসিয়ান আর রিপোর্টাররা কখনও টাইমলি মরে না হে শচী। মরলে দেশটা সোনার দেশ হত। ওহে ফুচকাওলা, শুরু করো, শুরু করো ! জলদি !

॥ ১৩ ॥

দক্ষিণগামী বাসের দোতলায় এক ছোকরা হঠাৎ বলে উঠল, এই যে দাদারা ! এত তাড়াতাড়ি সব বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ? শুনেছেন কি, কাল রাতে লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে ? বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, তবু মরিবার হল তার সাধ। অথচ দেখুন কবি গেয়ে গেছেন, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। আজ নিজের জীবনের একটা গল্প বলব বলে আপনাদের কাছে এসেছি। গল্প নয়, ঘটনা, বুঝলেন দাদা, বেঁচে থাকার কোনও পথ না পেয়ে আমরা দুই ভাই ব্যবসা করতে

গিয়েছিলাম। বাঙালি ব্যবসা করতে জানে না এই বদনাম ঘোচাতে দাদা, শ্যামবাজারের মোড়ে আমি আর আমার দাদা একটা দোকান ঘর ভাড়া নিতে গেলাম। পেয়েও গেলাম একটা। কিন্তু দাদা, বাড়িওলা পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলামি চায়। সেই শুনে আমরা পালিয়ে আসি। কিন্তু বাঁচতে তো হবে! মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। তাই দাদা বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা দুই ভাই অল্প পুঁজি নিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করলাম। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই করতে গিয়ে আমরা তৈরি করেছি একটি ধূপকাঠি। এই বাসে আমাকে প্রায়ই দেখতে পান আপনারা। রেগুলার অনেকেই এই ধূপ ব্যবহার করেছেন। যাঁরা করেছেন তাঁদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। যাঁরা জানেন না তাঁরা জেনে রাখুন, একটি স্টিক জ্বলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, কাঠি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এক ঘণ্টা ঘরে তার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। আমার হাতে যে স্টিক জ্বলছে সেই একই স্টিক সব প্যাকেটে পাবেন। দোকানে বাজারে কিনতে যান, একটি প্যাকেটের দাম পড়বে পঁয়ত্রিশ পয়সা। কিন্তু বাসে কনশেসন রেটে এক প্যাকেট চার আনা, দু প্যাকেট আট আনা, চার প্যাকেট এক টাকা। এক টাকা! এক টাকা! এক টাকা। ...

মদনের নাকের ডগায় চারটে প্যাকেট ধরে বার কয়েক নাড়ে ছোকরা ; এক টাকা! এক টাকা!

মদন অলস চোখে চেয়ে বলে, গল্পটা পাল্টাও। এ পর্যন্ত দশজনের মুখে শুনেছি একই গল্প।

ছোকরা প্যাকেটগুলো ঝট করে টেনে নিয়ে পরের সিটের এক যাত্রীর নাকের ডগায় ধরল, এক টাকা! এক টাকা!

মদনের পাশের লোকটা খিক খিক করে হেসে বলল, বেশ বলেছেন এর পর লজেনসওয়ালা উঠেও একই গল্প ঝাড়বে। শুধু কি তাই। গুপিযন্ত্র নিয়ে এক বাচ্চা ছোকরা উঠে ধরবে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে। রোজ ওই 'বাবুর বাগানে' কাঁহাতক শোনা যায় বলুন দেখি! কিছু বলাও যায় না, দেশে বেকার সমস্যা। ভাবি, দুটো করে খাচ্ছে খাক। নেতারা তো আর এদের জন্য কিছু করবে না...

তা ঠিক, তা ঠিক। মদন তাড়াতাড়ি বলল এবং পলিটিকস এড়াতে দু স্টপেজ আগে নেমে পড়ল। হাজরার কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করল মাধবকে, একটু দেরি হবে রে!

সে বুঝতেই পারছি।

তুই একা একা স্কচ চালাচ্ছিস নাকি?

না মাইরি। একটা হেঁচকি তুলে মাধব বলে, ঝিনুক কেটে পড়েছে, জানিস!

চিরতরে নাকি?

বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে আনপ্রেডিকটেবল মহিলা। সঙ্গে বৈশম্পায়ন।

বলিস কী?

দে আর হেড অ্যান্ড ইয়ারস ইন লাভ।

দুস শালা! তুই খাচ্ছিস।

একটুখানি। এই মোটে খুললাম।

কত নম্বর বোতল?

এক নম্বর মাইরি বিশ্বাস কর।

তোকে বিশ্বাসের কী? গিয়ে যদি দেখি সব ফাঁক করেছ তা হলে—

আরে না না। অনেক আছে। চলে আয়।

অনেক নেই রে মাধব, অনেক নেই। তুই অন্তত হাফ পাঁইট সাফ করেছিস।

অতটা হবে না। কী জানিস, ঝিনুকটা তো আজ পালিয়ে গেল, দুঃখে দুঃখে খানিকটা খেয়ে ফেললাম।

পালিয়ে গেছে আর ইউ শিওর?

তা ছাড়া আর কী হবে? সঙ্গে বৈশম্পায়ন। দুইয়ে দুইয়ে চার।

তা হলে দুঃখের কী? সেলিব্রেট কর।

তাই করছি আসলে। দুঃখ প্লাস সেলিব্রেশন। তবে বড় একা লাগছে। চলে আয়। আর কত দেরি করবি ?

স্নান করে জামা কাপড় পাল্টেই আসছি।

॥ ১৪ ॥

গড়িয়াহাটে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দুজনে সূর্যাস্ত দেখল।

আপনার কোনও ডাকনাম নেই ? ঝিনুক আস্তে করে জিজ্ঞেস করে।

বৈশম্পায়ন ফিসফিস করে বলে, আছে। মন্টু।

আমার এক ভাইয়ের নামও মন্টু। ভারী মিষ্টি নাম।

আপনার ভাল লাগলেই ভাল।

কিন্তু আপনি ভারী অদ্ভুত। ওর কোনও বন্ধুই আমাকে আপনি করে বলে না। শুধু আপনি বলেন। কেন বলুন তো !

বৈশম্পায়ন একটু লাল হয়ে বলে, এমনি।

না। আমার ওসব আপনি আজ্ঞে ভাল লাগে না। বলুন তুমি ! বলুন শিগগির।

তু-তুমি।

শুধু তুমি বললেই হবে না। পুরো একটা বাক্য বলুন।

বলব ?

বলতেই তো বলছি।

ঝিনুক ! তুমি কী সুন্দর !

বাঃ, বেশ বলেছেন ! ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আবেগ ভরা গলায় বলে, কতকাল আমাকে কেউ সুন্দর কথা বলেনি। আমি যে সুন্দর সে কথা মনে করিয়ে দেয়নি।

মাধব ? মাধবও নয় ?

মাধব ! মাধব আমাকে একটুও ভালবাসে না। বউকে ভালবাসলে কেউ মদ খায় বলুন !

যুক্তিটা ঠিক বুঝতে পারে না বৈশম্পায়ন, তবে এ নিয়ে আর কথা বাড়াতেও সে আগ্রহ বোধ করে না। তার মুখ গরম, চোখ জ্বালা করছে, গা ঘামছে। অদ্ভুত এক ভালবাসাই এ সব ঘটাচ্ছে। সে ঢোঁক গিলে বলল, ঝিনুক, আমাদের তো খুব বেশি সময় নেই। একটা কথা বলে নেব ?

ঝিনুক খুব অবাক হয়ে ফিরে তাকায় বৈশম্পায়নের দিকে, সময় নেই ! কীসের সময় নেই বলুন তো !

আয়ুর সময় যে কেটে যাচ্ছে ঝিনুক। যৌবন যায়, বয়স যায়, লগ্ন যায়।

আপনি যে কী সুন্দর কথা বলেন ! আমিও ঠিক এসব কথাই ভাবি। আমরা বোধহয় খুব বেশিদিন বাঁচব না, না ? আমার তো এমনিতেই মাঝে মাঝে খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন ঝিনুক ?

কেবল মনে হয়, একদিন খুব বন্যা হয়ে আমরা সবাই ডুবে যাব। কিংবা কেউ আকাশ থেকে অ্যাটম বোমা ফেলবে। না হয় তো ওই যে কী একটা রোগ হচ্ছে বাঁকুড়ায়, এনকেফেলাইটিস না কী যেন, সেই রোগটা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়বে আর আমরা সবাই মাথায় রক্ত উঠে মরে যাব। এত ভয় নিয়ে বাঁচা যায়, বলুন তো ! তার ওপর গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যেতে পারে, ভূমিকম্প হতে পারে, গুণ্ডা বদমাশ ডাকাত এসে ঘরে ঢুকে খুন করে যেতে পারে, বলুন !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈশম্পায়ন বলে, তা ঠিক। তবে ওসব কিছু না হলেও এমনিতেই আমরা আস্তে আস্তে বয়স্ক বুড়ো হয়ে যাব ঝিনুক।

আপনার বয়স কত ?

বত্রিশ তেত্রিশ।

যা গম্ভীর হয়ে থাকেন, আপনাকে আরও বেশি দেখায়।

আমি আর মাধব এক বয়সী।

জানি জানি। আপনাকে আমি মোটেই বুড়ো বলিনি।

কিন্তু বুড়ো তো একদিন হব ঝিনুক। তুমি হবে, আমি হব, মাধব হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছ না ?

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, বয়স নিয়ে আর ভয় দেখাতে হবে না।

তুমি কি ভয় পাও ঝিনুক !

বুড়ো হতে, মরতে কে না ভয় পায় বলুন ! কিন্তু কী একটা কথা বলতে চাইছিলেন যে ! হাবিজাবি কথায় সেটা হারিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা হারিয়ে গেলেই হয়তো ভাল ছিল ঝিনুক। বলব ?

ঝিনুক মৃদু একটু লজ্জার পরাগে মাখা মুখটি মিষ্টি করে নামায়, তারপর মৃদুস্বরে বলে, বলুন না।

কিন্তু বলবে কী করে বৈশম্পায়ন ? খুব কাছ ঘেঁষে একটা পায়জামা পরা লোক কখন এসে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে পাছা চুলকোচ্ছে। কিছু লোকের কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব !

বৈশম্পায়ন একটু বিরক্তির গলায় বলে, চলো আর কয়েক পা দূরে গিয়ে দাঁড়াই।

কয়েক পা হেঁটে তারা লোকটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই যে একটা বাধা পড়ল এতেই মুডটা একদম নষ্ট হয়ে গেল বৈশম্পায়নের। সে অনেকক্ষণ রেলিং-এ ভর রেখে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অনেকদিন আগে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার দিয়ে শেষবারের মতো দেখা, বলাই সিংহী লেনে লাহা বাড়ির দেয়ালের পটভূমিতে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা সেই মেয়েটিকে তো আর কখনও পৃথিবীতে দেখা যাবে না। কিছুতেই ফিরবে না বয়স। কিছুতেই উজানে যাবে না তো নদী ! নদী শুধু বয়ে যেতে জানে একমুখে। তার কলধ্বনিতে শুধু মৃত্যুর গান। তার ফাঁকা শূন্য উপত্যকায় সাদা আর নিশ্চল হিম পাথরেরা পড়ে থাকে।

খুব হাওয়া দিচ্ছিল আজ। বজবজের একটা ট্রেন প্রায় নিঃশব্দে পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল।

বৈশম্পায়ন বলল, ঝিনুক ?

উঁ !

কী ভাবছ ?

কত কী ! এইমাত্র ইচ্ছে করছিল ওই ট্রেনটায় উঠে অনেক দূর চলে যাই।

কিন্তু ট্রেনটা তো বেশি দূর যাবে না। মাত্র বজবজ পর্যন্ত।

বজবজ কি সমুদ্রের কাছে ?

না। গঙ্গার কাছে।

সমুদ্রের কাছে কোনও ট্রেন যায় না ?

যাবে না কেন ! অনেক ট্রেন যায়। তুমি কি সমুদ্র দেখোনি ?

বহুবার। শুধু পুরীতেই গেছি পাঁচবার ; ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, বোম্বে, ঘরের কাছে দীঘা—

তবু যেতে ইচ্ছে করে ?

করে। কে যে আমার নাম ঝিনুক রেখেছিল ! আমার কেবলই মনে হয় সমুদ্রের কাছে আমার অনেক ঋণ !

তোমাকে ডাকে সমুদ্র, আর আমাকে ডাকে এক নদী।

তাই নাকি ?

তবে সে এক মৃত্যুর নদী। এক নির্জন উপত্যকা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চারদিকে সাদা পাথর। আর কী যে করুণ সেই নদীর গান !

ঝিনুক ছলছলে চোখ তুলে বলে, সত্যি ?

বৈশম্পায়ন একটু থমকাল। ঝিনুক যেভাবে চেয়ে আছে তাতে মনে হয় সে বৈশম্পায়নের নদীটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কা পরিণত-বুদ্ধির মহিলার পক্ষে যেটা খুব স্বাভাবিক নয় !

একটু থেমে বৈশম্পায়ন বলে, দুধারে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়। ভীষণ সাদা, শূন্য এক উপত্যকা,

সেইখানে এলোচুল বিছিয়ে নদী সারাদিন গুনগুন করে গায়। সাদা সাদা ঠাণ্ডা পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারদিকে। অদ্ভুত না ঝিনুক? শুনলে লোকে আমাকে পাগল ভাববে!

ঝিনুক মাথা নেড়ে বলে, মোটেই না।

বৈশম্পায়ন একটু হতাশ হয়। এত সহজে আর কেউ নদীটাকে মেনে নেবে এরকম আশা সে করেনি। সে বলল, তোমার অদ্ভুত লাগছে না?

না তো! এরকম হতেই পারে।

বৈশম্পায়ন খুবই অবাক হয়ে বলে, হতে পারে?

নীলু যখন মারা গেল তখন কিছুদিন আমারও মৃত্যুর হাওয়া লেগেছিল। বলে একটু আনমনা হয়ে গেল ঝিনুক। একটু চুপ করে থেকে গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলল, জানেন তো, নীলুকে আর আমাকে নিয়ে একটা বিচ্ছিরি কথা রটেছিল!

বৈশম্পায়ন একটু চমকে উঠে বলে, তাই নাকি?

খুব বিচ্ছিরি। যতদূর নোংরা হতে হয়। সেটা রটিয়েছিল আমার এক দূর সম্পর্কের ননদ।

কী রটিয়েছিল ঝিনুক?

ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, একজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়েকে জড়িয়ে যা রটানো যায়। অবশ্য নীলুর সঙ্গে আমার খুব বনত। বিয়ের পর নতুন নতুন শ্বশুরবাড়িতে কাউকেই তেমন ভাল লাগত না। একমাত্র নীলু, কী নরম, কী ভদ্র, কী বুদ্ধি! বেঁচে থাকলে নীলু সবাইকে ছাড়িয়ে যেত। এক এক সময়ে তো আমার মনে হত, নীলু একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রীও হবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নাড়ল, নীলু ছিল একসেপশনাল, আমি জানি।

তা হলেই বলুন! নীলুকে ভাল না বেসে পারা যায়? কিন্তু ভালবাসা মানেই কি খারাপ কিছু? আমি নীলুর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গেছি, ছবির একজিবিশন দেখেছি, সারা রাত ক্লাসিকাল গানের আসরে গান শুনেছি, এতে কি দোষ? অথচ—এতদিন বাদেও অভিমানে একবার ঠোঁট দুটো ফুলে উঠল ঝিনুকের। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো ভীষণ অদ্ভুত। আমাকে একদম সহ্য করতে পারত না, আমি সুন্দর বলে। আর নীলুকেও সহ্য করতে পারত না। কেন জানেন? নীলু ভীষণ ব্রাইট বলে। ওদের ধারণা ছিল নীলু সম্পর্কে সবাই নাকি বাড়িয়ে বলে।

মাধব নীলুকে খুব ভালবাসত। বৈশম্পায়ন বলে।

বাসত কি না কে বলবে! আসলে নীলুর যেটুকু সম্পর্ক ছিল বাড়ির সঙ্গে তা আমার জন্যেই। নইলে নীলুর তখন অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা। ও আমাকে প্রায়ই বলত, পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে শহরে ঘুরে বেড়াবে। বলত, দেশের প্রবলেমগুলো ধরতে হবে বউদি, অনেক মানুষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে, এই বুকের মধ্যে সব মানুষকে আমার টেনে নিতে ইচ্ছে করে।

বৈশম্পায়ন চুপ করে থাকে। প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর।

ঝিনুক রেলিং-এ আর একটু ঝুঁকে বলে, আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই নীলু খুন হল সন্ধেবেলায়। উঃ, সে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! তরতাজা, ছটফটে, ভীষণরকমের জ্যান্ত নীলু মরে গেছে, ভাবা যায়! তিনদিন আমি একদম বোবা হয়ে ছিলাম। কথা বলতে গেলে মুখ দিয়ে কেবল বুবু শব্দ বেরোত। তারপর থেকেই একটা মৃত্যুর হাওয়া এল। ঘরে বসে থাকতাম, মনে হত বাইরে হঠাৎ একটা হাওয়া ছেড়েছে। আর সেই হাওয়া কী যেন বলতে চাইছে আমাকে। দৌড়ে যেতাম বাইরে। ছাদে বসে আছি, হঠাৎ মনে হল আমার চারদিকে যেন বাতাসটা ভারী হয়ে ঘুরছে, কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। এক এক সময়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত, মনে হত, একটা হাওয়া এসে আমার দরজায় জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে, ডাকছে, বউদি! বউদি!

এ কি ভৌতিক কিছু ঝিনুক?

না, না, একদম তা নয়। আসলে আপনার ওই নদীর মতোই এও এক মৃত্যুর হাওয়া। বেঁচে থাকতে আর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে অত ভালবাসত নীলু, অথচ সে-ই তো মরে গেল! তাই বোধহয় ওই হাওয়াটা এসে আমাকে বলতে চাইত, তোমরা কেন বেঁচে আছ? তোমাদের বেঁচে

থাকার কী অধিকার ? যে পৃথিবীতে নীলু থাকতে পারল না, সেই পৃথিবীতে তোমরাই বা থাকবে কেন ? জানেন, সেই সময়ে আমার বেশ কয়েকবার সুইসাইড করতে ইচ্ছে হয়েছে।

বৈশম্পায়ন আস্তে জিজ্ঞেস করল, নীলু সম্পর্কে তুমি কি সবটুকু জানো ঝিনুক ?

ঝিনুক স্থির হয়ে সামনের নির্মীয়মাণ একটি ফ্ল্যাটবাড়ির কাঠামোর মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, নীলুর সবটুকু কে-ই বা জানে ! তবে ও মরে যাওয়ার পর আমার যখন ওরকম মানসিক অবস্থা, তখন একদিন খুব বিরক্ত হয়ে মাধব বলেছিল, নীলু ওর ভাই নয়।

বৈশম্পায়ন একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ঝিনুক জানে।

ঝিনুক মাথা নুইয়ে বলে, জানলাম নীলু ওদের বাড়িতে সেই ছোট্টবেলায় এসেছিল। চাকরের কাজ করত। বাপের পদবি জানা ছিল না বলে মাধবদের পদবি নেয়। একটু বড় হওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, সে অত্যন্ত মেধাবী আর বুদ্ধিমান তখন মাধবদের বাড়ির লোকেরা ওকে বাড়ির ছেলে হিসেবে পরিচয় দিত। পরে সে বাড়ির ছেলেই হয়ে ওঠে। মাধব আজও নীলুকে ভাই বলে মানে। এসব জানি মণ্টু।

॥ ১৫ ॥

দিদির বাসার সামনে ফুটপাথে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, টিনের স্যুটকেসটা পাশে নামানো।

মদনকে দেখে দু পা এগিয়ে এসে ম্লান একটু হেসে বলল, দু ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

ভিতরে গিয়েই তো বসতে পারতে।

ভিতরে অনেক লোক। জায়গা নেই। আমি আজই দিল্লি রওনা হচ্ছি।

গৌরীর আজ দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু মদন সে কথা জিজ্ঞেস করল না। গৌরী কেন পালাচ্ছে তা সে খানিকটা জানে। শুধু বলল, একা পারবে ?

পারব। গরিবরা সব পারে।

গিয়ে কোথায় উঠবে?

আমার এক দূর সম্পর্কের দিদি থাকে কলকাজীর কাছে। সেখানে উঠব।

বাচ্চারা ?

নিচ্ছি না। দিদির বাসায় কীরকম রিসেপশন পাব জানি না তো ! বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে অসুবিধে।

মা ছাড়া ওদের অসুবিধে হবে না ?

ওরা মাকে থোড়াই কেয়ার করে।

তোমার কষ্ট হবে না ?

গৌরী একটু হাসল, মানুষ তো ! একটু হবে ! তবে সেটা সহ্য করা যাবে। ওসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি এখন পালাতে চাই। পরে সুযোগ-সুবিধে বুঝে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যাব।

চারদিকে আজকাল খুব বউ পালাচ্ছে। খুব দুশ্চিন্তার কথা। মদন ফিচেল হাসি হেসে বলে, আর নবর জন্য মন কেমন করবে না ? নব যদি বাড়ি ফিরে দেখে, তুমি নেই, তা হলে ?

গৌরী কেমন বিবশ হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কার জন্য এতকাল মন কেমন করেছে তা কি এম পি সাহেব জানেন ?

না। কার জন্য গৌরী ?

দিল্লিতে গিয়ে বলব।

নবর কাছে আর কখনও ফিরে আসবে না গৌরী ?

নব আমার কে ? ওর কাছে ফিরে আসব কেন ?

নব যদি ভাবে তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছ ?

আমি কার সঙ্গে পালালাম তাতে ওর বড় বয়েই গেল '

তা ঠিক। তবে প্রেস্টিজের ব্যাপারও তো আছে। বউ পালালে কোন পুরুষ খুশি হয় ?

আমি তো চাকরি করতে যাচ্ছি। পালাচ্ছি কে বলল ?

তুমিই তো এইমাত্র বললে !

সে আপনার কাছে সত্যি কথাটা বললাম, ওর বাড়ির লোক অন্যরকম জানে।

মদন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে গেল।

গৌরী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কিচ্ছু জটিল হয়নি মদনদা। এটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আপনি চলে আসার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম।

মদন ফিচিক করে হেসে বলে, বুড়ি তোমাকে খুব ধোঁয়াচ্ছিল।

আপনিই তো দুষ্টুমি করে লাগিয়ে দিয়ে এলেন। তবে ওসব শুনতে শুনতে আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ সব অন্যরকম হয়ে গেল। পাষাণী অহল্যাকে জাগাতে রামচন্দ্র এলেন । আজ আপনি যেই গেলেন অমনি ভিতরে সব ঘুমন্ত বোধ জেগে উঠল। দুঃখ, অপমান, হতাশা, সেই সঙ্গে ভালভাবে বাঁচার ইচ্ছে। অন্ধকারে থেকে থেকে আলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ আলো দেখে বুঝতে পারলাম, কী অন্ধকারেই না পড়ে আছি।

আমি কি তোমার আলো গৌরী ? আবার রামচন্দ্রও ?

গৌরী এই প্রকাশ্য ফুটপাথে, চারদিকে চলন্ত লোকজনের ভিড়েও কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। আবেগে ঠোঁট কাঁপল, গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। কোনওক্রমে বলল, আলো ! আপনি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও আলো নেই।

এ কথায় খুব হোঃ হোঃ করে হাসতে ইচ্ছে করছিল মদনের। বদলে সে আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বলল, তোমার জীবনে আর একটা আলো ছিল গৌরী। আমি জানি।

গৌরীর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ থেকে স্বপ্নের ক্রিমটুকু কে মুছে নিল। একটা ঢোঁক গিলল সে। মাটির দিকে চেয়ে বলল, আপনি কখনও অতীতকে ভোলেন না কেন এম পি সাহেব ?

মদন তেতো একটু হেসে বলে, ভুলতে পারি না গৌরী। আমার যে কেন সব মনে থাকে ! আর তার জন্যই মাঝে মাঝে কষ্ট পাই।

গৌরী যখন মুখ তুলল তখন তার চোখ ছলছল করছে। একটু ধরা গলায় বলল, আপনি কি এখনও নীলুকে হিংসে করেন ? আমার জন্য ?

মদন গম্ভীর গলায় বলে, নীলুকে হিংসে করব কেন গৌরী ? নীলুর এমন কী ছিল যাকে হিংসে করা যায় ?

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, আমিও তো তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। নীলু কোনওদিন আমাকে ফিরেও দেখেনি। নীলুকে কেন আপনি হিংসে করবেন ?

মদন মাথা নেড়ে বলে, নীলুকে হিংসে করি না গৌরী, শুধু জীবনের সত্য দিকগুলির দিকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিতে চাই। তোমার জীবনের আলো ছিল নীলু। বিয়ে করার জন্য তাকে তুমি অনেক জ্বালিয়েছ। বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়েছ। নীলুর ওপর শোধ নিতেই কি তুমি নবর সঙ্গে ঝুলেছিলে ? নীলু অন্তত তাই বলত।

ওসব কথা থাক মদনদা। আজ থাক। নীলু তো বেঁচে নেই।

মদন একটু হাসল, আস্তে করে বলল, কিংবা হয়তো খুব বেশি বেঁচে আছে !

নীলুর জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে মদনদা, সে আমার আলো হবে কেন ?

মদন চুপ করে রইল। মুখটা গম্ভীর।

গৌরী হঠাৎ নিচু হয়ে তাকে একটা প্রণাম করে বলল, আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে। আমি আসি।

টিনের স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে গৌরী নিরাশ্রয় অসহায়ের মতো যখন রাস্তাটা পেরিয়ে গেল তখন মদনের ভারী কষ্ট হল গৌরীর জন্য।

এতক্ষণ এম্ পি ছিল না মদন, দিদির বাসার বাইরের ঘরে পা দিয়েই হল। কণা নামে একজন মহিলা বসে আছেন। স্বামী দুশ্চরিত্র। ঘ্যানর ঘ্যানর অনেক কথা শুনে যেতে হল তাকে। আশ্বাস দিল দিল্লি গিয়েই ব্যবস্থা করবে।

সারাক্ষণ ভারী ক্লান্ত লাগছে তার। স্কচের বোতল খুলে বসে আছে মাধব। গিয়ে এক্ষুনি ডুব দিতে হবে। সব ভুলে যেতে হবে, ভাসিয়ে দিতে হবে। সে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর জামা কাপড় পাল্টে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরল একটা।

সহদেব বিশ্বাস তার ওকালতির চেম্বারে চেয়ারে হাঁটু তুলে বসা, মাথায় টাক, মুখে ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি। খুব পসারের সময়েই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছে। এখন কালেভদ্রে উপরোধে বা পার্টির দরকারে কেস করে। তার চেয়ারের দুধারে কেঁদো বাঘের মতো দুই রুস্তম বসে আছে। তাদের গায়ের টি শার্ট ছিঁড়ে শরীরের মাসল ঠিকরে বেরোচ্ছে, মুগুরের মতো হাত, খোলা জামা দিয়ে বুকের ঘন লোম দেখা যাচ্ছে। দুজনেরই চোখ নবর দিকে স্থির। দুজনকেই চেনে নব। বেলেঘাটার বিখ্যাত মস্তান যমজ দুই ভাই কেলো আর বিশে। দিনকাল পাল্টে গেছে, এখন মস্তানরা লিডারদের দেখে, লিডাররা দেখে মস্তানদের। কিন্তু ফালতু ব্যাপারে নবর মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই। তিন জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে সে সহদেব বিশ্বাসের কাছে আসতে পেরেছে।

সহদেব মৃদু স্বরে কথা বলছিল। শোকতাপা মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো গলায়। নব অবশ্য সান্ত্বনা পাচ্ছে না। সহদেব বলল, এ সময়ে পলিটিক্যাল শেলটার দেওয়ার অনেক ঝুঁকি আছে হে নব। আজই পার্টির মিটিং-এ বিরাট ব্যাপার হয়ে গেছে। আজ হোক, কাল হোক, দল ভাঙছে। স্টেট সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, আরও অনেক লিডার রেজিগনেশন দিয়েছে। এখন আমরা রিস্ক নিতে চাই না।

রিস্ক কীসের ?

তুমি কনডেমনড খুনি। শেলটার দিলে হাজার রকমের প্রশ্ন উঠবে।

কিন্তু পুলিশ তা হলে আমাকে পালাতে দিল কেন ?

সহদেব বিচক্ষণ একটু হেসে বলে, কথাটা দুবার বললে, ওটা তোমার ভুল ধারণা। পুলিশ তোমাকে পালাতে দেয়নি। কোনও কারণে গার্ডরা অন্যমনস্ক ছিল। তুমি সেই সুযোগটাকেই মনে করছ গটআপ ব্যাপার।

নব কথা না বাড়িয়ে অধৈর্যভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি কী করব ?

গা ঢাকা দিয়ে থাকো যদি পারো।

কত দিন ?

যতদিন না ভাঙচুরটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে।

নিত্যদার কাছে গেলে কিছু হবে ?

নিত্যদা খুব ব্যস্ত। আজ রাতেই বোধহয় উনি পার্টির সেক্রেটারি হচ্ছেন। মিটিং চলছে। তোমাকে সময় দিতে পারবেন না।

আমার সঙ্গে পার্টির যে লোক দেখা করেছিল জেলখানায় যে বলেছিল—

সহদেব সহজে ধৈর্য হারায় না। এখনও হারাল না, মৃদু হাসি হেসে বলে, সে কেন দেখা করেছে তা সে-ই জানে। দল থেকে তাকে পাঠানো হয়নি।

নব টেবিলে ভর রেখে ঠাণ্ডা গলায় বলে, আপনি তো জানেন পলিটিক্যাল শেলটার না পেলে পুলিশ আমাকে কুকুরের মতো খুঁজে বের করবেই। এ বাজারে পলিটিক্যাল পার্টি ছাড়া কেউ আমাকে কোনও প্রোটেকশন দিতে পারবে না। আপনি এও তো জানেন সহদেবদা, আমি মাগনা প্রোটেকশন চাইছি না। কোনও শালা কখনও আমার জন্য মাগনা কিছু করেওনি। প্রোটেকশন দিলে কাজ করে দেব, দরকার হলে লাইফের রিস্ক নিয়েই।

কেলো আর বিশে তাকাতাকি করে নেয়। তারপর আবার নবর দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে।

সহদেব হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, সবই জানি। কিন্তু শেলটার বা প্রোটেকশন কোনওটাই

দেওয়া এখন সহজ নয়। আমাদের সময়টা খারাপ যাচ্ছে।

নব ধৈর্য হারাচ্ছিল। সে বেশিক্ষণ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। বেশি কথা বলার দমও তার নেই। একটু গরম হয়ে বলে, নীলু হাজরার কেসটায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল, আপনি জানেন ? নীলুকে আমি মারিনি।

কেলো আর বিশে আর একবার তাকাতাকি করে, চোখের কোণ দিয়ে সেটা লক্ষ করে নব।

সহদেব নির্বিকারভাবে জিজ্ঞেস করে, কে তোমাকে ফাঁসিয়েছিল ?

নাম বলে লাভ কী ? আপনার তো জানেন।

সহদেব বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তাতেও আমাদের কিছু করার নেই ।

নব একটু হেসে বলে, করার অনেক আছে, কিন্তু আপনারা করবেন না। ঠিক আছে, আমি আমার রাস্তা করে নেব।

বলে নব ওঠে। সহদেব নিজের হাতের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরা জয় তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে ক্লান্তি, চোখে ভয়। ইচ্ছে করলে সে নবর হাত এড়িয়ে এতক্ষণে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে এও জানে, পালিয়ে কোনও লাভ নেই। নব তাকে খুঁজে বের করবেই।

জয় বলল, কিছু হল ?

নব রক্তঝরা চোখে চেয়ে বলল, খানকির ছেলেরা ফোঁটা কেটে বোষ্টম সাজছে।

তোমার সঙ্গে জেলখানায় যে দেখা করেছিল তাকে তুমি ঠিক চেনো ?

আলবত। শালা কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল !

দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই পেছন থেকে কেলো বেরিয়ে এসে সোডার বোতল খোলার মতো শিসটানা গলায় ডাকল, নব।

নব ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ঘুরে দাঁড়ায়।

কেলো পাহাড়ের মতো দরজায় দাঁড়ানো। কোমরে হাত, এরকম বিশাল চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, শোন।

নব সতর্কভাবে কাছে এগিয়ে যায়, কী বলছ ?

কথা আছে। বলে নবর একটা হাত শক্ত করে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়।

ঘরে এখন সহদেব নেই। শুধু কেলো আর বিশে। বিশের হাতে খোলা ছ'ঘরা রিভলবার।

কেলো রুমাল দিয়ে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, একটা কাজ আছে। কিন্তু এর মধ্যে পার্টি নেই।

প্যাঁচ মেরো না। কেস করতে হবে তো ? বলো। কিন্তু তার আগে বলো, শেলটার দেবে কি না।

কেসটা কর। দেখা যাবে।

তোমাদের কথায় হবে না। আমাকে কোনও লিডারের সঙ্গে লাইন করে দাও।

লিডাররা এর মধ্যে নেই।

সহদেবদা নিজের মুখে বলুক তা হলে।

সহদেবদা বলবে না। আমরাই বলছি। রাজি থাকলে বল, না হয় তো কেটে পড়।

নব করাল চোখে দুই যমজ ভাইকে দেখে নিল । আপাতত তার কিছু করার নেই। তারা উভয়পক্ষই যে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় তাতে কেউ কাউকে ফালতু ভয় খেয়ে সময় বা শরীর নষ্ট করে না। কাটে কাটে পড়ে গেলে কে কার লাশ নামাবে তার কোনও ঠিক নেই। তবে নব একটু টাইট জায়গায় আছে বটে। সে বলল, ফালতু বাত ছাড়ো কেলোদা, কেস আমি করে দেব, সে তোমরা জানো। কিন্তু তারপর কী ?

কেলো নির্বিকারভাবে বলে, কেস হয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবি।

বাড়িতে লালবাজারের খোঁচড়েরা নেই ?

অন্য জায়গায় তোর ঠেক আছে ?

আছে।

তা হলে সেইখানেই চলে যা। পরশু পার্টি অফিসে দুপুরের পর দেখা করিস।

কিছু মালকরি ছাড়ো কেলোদা।

কেলো একটু হাসল, তুই মালকড়ি ছাড়া নড়বি না তা জানি। বোস, ব্যাপারটা বুঝে নে। সঙ্গের ছোকরাটা কে?

ফালতু।

কেলো একটু গম্ভীর মুখ করে মোটা আঙুল মুখে পুরে দাঁতের ফাঁক থেকে বোধহয় দুপুরের খাওয়া মাংসের আঁশ বের করে আনল। তারপর চোখ ছোট করে বলল, বিশে বলবে। শুনে নে।

॥ ১৬ ॥

অনেক দুঃখের কথা বলে কণা বিদায় নেওয়ার পর চিরু মণীশের কাছে এসে বলে, তোমার কি মনে হয়, মদন কিছু করতে পারবে কণার জন্য?

মণীশ নিবিষ্টমনে সিনথেটিক আঠা দিয়ে একটা ভাঙা কাপ জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিল ভিতরের বারান্দায়। বলল, একটা চরিত্রহীন মানুষকে চরিত্রবান করার সাধ্য তো আর ওর নেই। তবে ভয় দেখাতে পারে বটে। চাকরিরও ক্ষতি করতে পারে হয়তো।

তাতে কিছু হবে?

ঠোঁট উল্টে মণীশ বলে, আমার মনে হয় না। তা ছাড়া মদনও যে কিছু করবেই এমন ভাবছ কেন? হয়তো দিল্লি গিয়ে ভুলে যাবে। তেমন গা করছিল না।

একটু আনমনা ছিল, আমিও লক্ষ করেছি। ওদের পার্টিতে কী সব গোলমাল চলছে না?

তা চলছে। কাপটা জোড়া দিয়ে দুহাতে জোরসে চেপে ধরল মণীশ, তারপর ওই অবস্থাতেই বলল, শালাবাবু আজ একটু তরল জিনিস চালিয়ে আসবে। মাধবের বাড়িতে নেমন্তন্ন যখন।

কত মাথার কাজ করতে হয়, কত ঝামেলা ওর। একটু খায় খাক। কখনও মাতলামি করে না তো। চিরু ভালমানুষি গলায় বলে।

মণীশ কাপটাকে প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে। সিনথেটিক আঠার নিয়মে লেখা আছে, অ্যাপলাই ম্যাকসিমাম প্রেশার। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, আমি এক আধদিন খেয়ে এলে কী করবে?

এসো না! নতুন অভিজ্ঞতা হোক, আমিও মরার আগে নিজের চোখেই দেখে যাই। বলে চিরু চোখ পাকিয়ে তাকায়।

মণীশ মৃদু হেসে বলে, তোমার স্বামী না হয়ে যদি ভাই হতাম চিরু, অনেক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যেত।

চাপটা একটু বেশি হয়ে যাওয়াতেই বোধহয়, কাপের ভাঙা টুকরো দুটো পিছলে খুলে গেল। মণীশ বলল, এঃ। আজকাল কিছুই সহজে জোড়া লাগতে চায় না কেন বলো তো?

ওই ভাঙা কাপ জুড়ে আমার কোন শ্রাদ্ধে ভুজ্যি সাজাবে শুনি?

আহা, কত সময় দাড়ি-টাড়ি কামানোর জল নিতেও তো লাগে। থাক না জিনিসটা। এই কাপের এখন চুয়ান্ন টাকা ডজন।

বলে মণীশ আবার আঠা লাগিয়ে ভাঙা টুকরো দুটো জুড়তে থাকে।

চিরু বলে, এ হল পেতনামি। দিন দিন তোমার নজর ভারী ছোট হচ্ছে।

দিন দিন দেশের অবস্থাও খারাপ হচ্ছে যে। তোমার এম পি ভাইও কথাটা স্বীকার করে। বাজারহাট তো কখনও করলে না মিস্টার, তাই টেরও পেলে না।

চিরু যেন একটু রাগ করেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। স্টোভে ভাত ফুটছে, সেইদিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। ছেলেমেয়েরা শোওয়ার ঘরে গুনগুন করে পড়ছে। শব্দটা শুনতে শুনতে কত কী ভাবতে থাকে।

কাপটা অধ্যবসায়ের বলে জুড়তে পেরে যায় মণীশ। বেসিনে আঠা লাগানো হাত ধুয়ে লুঙ্গিতে

মুহূর্তে মুহূর্তে খুব সাবধানে রান্নাঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকে, চিরু।

চিরু ঠাণ্ডা গলায় বলে, বলো।

একটা কথা বলব ?

শুনতে পাচ্ছি। বললেই হয়।

তুমি কি রাগ করেছ ?

রাগ করা কি আমার সাজে ?

রাগের তো সাজগোজ লাগে না মিস্টার।

তবু বাঁদীদের রাগ তো মানায় না।

সেই পুরনো শব্দ। নতুন কিছু ভেবে বার করতে পারো না ?

আমার অত মাথা নেই, জানোই তো ?

মণীশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে, শুধু ইয়ার্কি করে এই গাঢ় মেঘ কাটানো যাবে না। চিরুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া চমৎকার তবু মাঝে মাঝে চিরুর একরকম গভীর অভিমান হয়। খুব সামান্য কারণেই হয়। সহজে ভাঙে না।

আবার যখন 'চিরু' বলে ডাকল মণীশ তখন তার গলার স্বর পাল্টে গেছে।

চিরু তবু তাকায় না। গোঁজ হয়ে স্টোভের দিকে চেয়ে থাকে।

মণীশ অত্যন্ত ঘন হয়ে ওঠা গভীর মৃদু স্বরে বলে, যা তোমাকে কখনও বলতে ইচ্ছে করে না আজ তার কয়েকটা কথা বলব ?

চিরুর মনোভাব বোঝা গেল না। কিন্তু সে জবাবও দিল না।

মণীশ মৃদু স্বরেই বলল, এত বয়স পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। না একটা বাড়িঘর, না স্থায়ী নিরাপত্তার কিছু, না কোনও শখ শৌখিনতার জিনিস। আশে পাশে সব বাড়িতেই যা যা আছে, তার কিছুই আমার নেই।

চিরু এবার বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলে, এসব কথা উঠছে কেন ?

উঠছে তোমার জন্য নয়। আমি আজকাল নিজেই ভেবে দেখি, অনেস্ট থাকার চেষ্টা করে আমি পাঁঠার মতো কাজ করলাম কি না। আমি আজ মরে গেলে কাল যে তোমাদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না।

চুপ করো।

মণীশ একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, এ রাগ বা অভিমান থেকে বলছি না চিরু। যা ফ্যাক্ট তাই বলছি। আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারি না, এই সমাজের সঙ্গে পাল্লা টেনে চলাই উচিত ছিল কি না।

চিরু নরম হয়েছে। জলচৌকিতে বসে মণীশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, তুমি অনেস্ট বলে আমি কখনও কিছু বলেছি ? না চেয়েছি ?

চাওনি। বলোনি। তবু মনে মনে তো মানুষের কত প্রত্যাশা থাকে। তেমন বেশি প্রত্যাশাও নয়। একটু জমি, ছোট বাড়ি, কিছু টাকা, কয়েকটা শৌখিন জিনিস।

চিরু অন্যমনস্ক হয়ে মৃদু স্বরে বলল, মাঝে মাঝে এসব নিয়েও ভাবি, কিন্তু তোমার ওপর রাগ করি না তাই বলে। এই যে কণা এসেছিল, আমার বাড়িঘর দেখেটেখে আজ বলল, তোর বর কাস্টমসের অফিসার, অথচ তোর ঘরে একটাও ফরেন জিনিস নেই। ভারী আশ্চর্য। একটা রেডিয়ো না, টেপ রেকর্ডার না, বিদেশি শাড়ি, সেন্ট, ঘড়ি কিচ্ছু না। অথচ পাবলিক কত ফরেন জিনিস কিনছে চারদিকে!

শুনে তোমার মন কীরকম হল ?

একটু খারাপ লাগল। কথাটা তো মিথ্যে নয়।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, মিথ্যে নয়। তাই ভাবি, অপদার্থতার আর এক নামই সততা কি না।

তা কেন হবে ? তবে মদনও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, জামাইবাবুর সততা আর শুচিবাইতে তফাত নেই। সৎ কেন থাকবে না ; তা বলে ভাঙা কাপ জোড়া লাগানোর মতো গরিবও তুমি

নও।

মণীশ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে হাসল, ও, ওই ব্যাপারটায় তুমি এত রেগে আছ ?

চিরু ছলছলে চোখ করে বলে, তোমাকে ওসব উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলে আমার এমন কষ্ট হয় !

আরে দূর ! কাপটা না হয় এক্ষুনি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি।

কাপটা তো বড় কথা নয়। মনটাকে ছুড়ে ফেলতে পারবে কি ?

মণীশ মলিন একটু হাসল। বলল, উঁচু দরের সাহিত্যের ডায়ালগ দিলে মিস্টার।

ইয়ার্কি কোরো না। আমি তোমাকে জব্দ করার জন্য কথাটা বলিনি। আজ আমার মনটা খারাপ।

বুঝেছি চিরু। মনটা আমারও ভাল নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, সংসার আমার কাছে আরও কিছু চেয়েছিল। মুখ ফুটে চায়নি ঠিকই কিন্তু প্রত্যাশা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সংসার যা চাইছে তা হয়তো আমার দেওয়াও উচিত। কিন্তু একটা ভ্রান্ত উচিত-অনুচিত সৎ-অসতের বোধ সব গোলমাল করে দেয়। বুঝি এর কোনও দাম নেই...

চিরুর আঁচল-চাপা অবরুদ্ধ কান্নার শব্দে থামে মণীশ। গলার কাছে তারও একটা কান্নার দলা ঠেকে আছে বহুদিন। কিন্তু সে তো পুরুষমানুষ ! তাই কাঁদল না। একটু হাসল মাত্র। কিন্তু ঠিক করোটির হাসির মতো লাবণ্যহীন দেখাল তার মুখশ্রী।

রান্নাঘরে চৌকাঠে দুই হাত রেখে সে ঝুঁকে পড়ল ভিতরে। চাপা গলায় বলল, বাচ্চারা শুনতে পাবে। কেঁদো না। কান্নার মতো কিছু তো হয়নি।

চিরু কান্না আর আক্রোশে চাপা গলায় ফেটে পড়ল, কথায় কথায় তুমি আজকাল মরার কথা বলো কেন ?

বলি আর কিছু করার নেই বলে চিরু। সৎ থাকার চেষ্টা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরের পয়সায় একটা পান খেতে গেলেও দুবার ভেবে দেখি, এর মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না। অথচ এই নিরন্তর সৎ থেকে থেকেও আজকাল কেমন সততার মধ্যে কোনও শক্তি পাই না।

তোমাকে কেউ অসৎ হতে বলেছে ?

মণীশ মাথা নাড়ে, বলেনি, অন্তত তুমি কোনওদিন বলোনি। সে কথা নয়। আমি বলছিলাম সততা, সচ্চরিত্র এগুলোই তো মানুষের শক্তির উৎস। তবু আজকাল আমি সততা থেকে কোনও জোর পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল করেছি। সৎ বলে সারাজীবন মানুষের ঠাট্টা বিদ্রূপ তো কম সহ্য করিনি। আগে গায়ে লাগত না। আজকাল লাগে।

সৎ থেকেও কেউ ভাল নেই ?

আছে নিশ্চয়ই। কে খুঁজে দেখেছে বলো ? আমার প্রশ্ন তাও নয়। আমি আজকাল সততা জিনিসটা কতদূর প্রয়োজন তাই নিয়ে ভাবি।

ইচ্ছে করলে মদন তোমাকে অনেক কিছু করে দিতে পারে। ওর অনেক ক্ষমতা। তোমাকে সততা বিসর্জন দিতে হবে না।

জানি চিরু। একজন এম পি যে অনেক কিছু পারে তা না বুঝবার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। ভেবে দেখো, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ও একটুখানি ছেলে। আমাদের বিয়ের পর ওর পৈতে হল। সেই শ্বশুরমশাইয়ের অনুরোধে পৈতেয় ওকে গায়ত্রীমন্ত্র দিয়েছিলাম আমি। বলতে কী আমিই ওর আচার্য। এখন ও হয়তো গলায় পৈতেই রাখে না, কিন্তু ব্যাপারটা আমি ভুলি কী করে ? সেই মদন এখন এম পি, হাজারজনা এসে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে, সবই জানি। কিন্তু উমেদারদের দলে নিজের নামটা লেখাতে রুচিতে বাধে।

চিরুর কান্না থেমেছে। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

তারপর বলল, আমি তোমাকে আর কখনও কিছু বলব না। বাইরের ঘরে সোফার নীচে বাসন্তী ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে দাও তো। একটু পোস্ত বেটে দেবে।

মণীশ নড়ল না। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আজ তোমার অভিমান ভাঙিয়ে মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না চিরু। বিবাহিত জীবনের এই প্রথম ফেইলিওর। আমাদের চোখের সামনে

মদন এক মস্ত প্রলোভনের মতো। কেবলই মনে হয়, হাতের মুঠোয় একজন ক্ষমতাবান এম পি, ইচ্ছে করলেই কত কাজ আদায় করে নিতে পারি। মনে হয় না চিরু ?

চিরু জবাব দিল না। হাতায় করে ভাত তুলে টিপে দেখল।

মণীশ বাইরের ঘরে এসে বাসন্তীকে ঠেলে তুলে দেয়।

জোড়া-দেওয়া কাপটা এখনও তার হাতে। বাতিটা নিভিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে সোফায়। পোষা বেড়ালের গায়ে লোকে যেমন হাত বোলায় তেমনি আদর করে সে কাপটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। একেবারে আস্ত কাপের মতো জোড়া মিলে গেছে। তবু ঠাহর করে আঙুল বোলালে জোড়ের জায়গাটা বোঝা যায়। খুব ঠাহর করলে, নইলে না।

সাবধানে মণীশ কাপটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

অন্ধকারে বসে মণীশ ভাবল, আজ রাতে যদি আমি মরে যাই তা হলে কি সংসার ভেসে যাবে ? আমার বাচ্চারা কোনওদিন দাঁড়াবে না ? পরের দয়ায় বাঁচতে হবে সবাইকে ? যদি তাই হয় তা হলেই বা কী করতে পারে মণীশ ? চিরু বা বাচ্চারা তারই বউবাচ্চা বটে, কিন্তু যতদিন বেঁচে আছে ততদিন। তারপর এই প্রকৃতি, এই দেশ, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও এই সমাজ থাকবে। কী হবে তা মণীশ জানে না, কী হবে তা স্থির করার মালিক সে তো নয়। তবে সে এটুকু বোঝে পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়। তাকে ছাড়াও চলবে হয়তো, কিন্তু চলবে। কোনও শূন্যস্থান অপূরণ থাকে না।

মণীশ জানে, মদন হচ্ছে তার হাতের নাগালে এক আশ্চর্য প্রদীপ, যাতে ঘষা মারলেই এক বিশাল দেনেওয়ালা দৈত্য এসে হাজির হবে। কোনওদিনই প্রদীপটাকে ঘষবে না মণীশ। কিন্তু সংসার চাইছে, সে প্রদীপটাকে ঘষুক। একটু ঘষুক।

মণীশ অন্ধকার ঘরে বসে ভাবল, আজ রাতে যদি মরে যাই ?

ভেবে একা একা একটু হাসল মণীশ। সেই করোটির হাসির মতো লাবণ্যহীন এক হাসি। আজ রাতে তার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

॥ ১৭ ॥

মাধব দরজা খুলতেই মদন প্রথম প্রশ্ন করল, ঝিনুক ফিরেছে ?

মাধব আধো-মাতাল গলায় বলল, আয়, আয়। ঝিনুক ? না, ঝিনুক ফিরবে না। ঝিনুক কেন ফিরবে বল তো ?

মাধব ঘরে ঢুকে দেখে, সেন্টার টেবিলের ওপর একটা বোতল খালি পড়ে আছে, আর একটার সিকিভাগও উড়ে গেছে।

বোস। খা। বলে মাধব একটা গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে বরফের বার থেকে চিমটে দিয়ে তুলে বরফ মেশাল। বলল, দেখ, কী সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছিল ঝিনুক। কত খুঁজে খুঁজে সব জিনিস কিনেছে, কত যত্নে সাজায়, ধোয় মোছে। কিন্তু তবু ঘর ভেঙে দেওয়া কী সোজা দেখলি ? এক মিনিটও লাগে না।

মদন গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আঃ বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঘর ভাঙা যে কত সোজা সে কি তুই আমাকে শেখাবি রে মাধব ? আমার চেয়ে ভাল তা আর কে জানে ? আজ আমি পার্টিতে রেজিগনেশন দিয়েছি, জানিস ?

দিলি ? অ্যাঁ !

দিলাম ! কেন দিতে হল জানিস ? আমার খুব খিদে পেয়েছিল বলে। বাচ্চা ছেলেরা ঘেরাও করেছিল, বেরোতে পারছিলাম না। ওরা বললে, রেজিগনেশন লেটারে সই করলে বেরোতে দেবে। আমি তাই দিয়ে দিলাম। অথচ এই পার্টির সঙ্গে কতকাল আছি ! শূন্য গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মদন বলে, দে।

অত তাড়াতাড়ি খাস না। হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিংক।

সো আর অল ড্রিংকস। কিন্তু অত সব প্রোটোকল মানার মেজাজ নেই রে। দে।

আগের বারের বরফের টুকরোগুলো গলবার সময় পায়নি মদনের গ্লাসে। তার ওপরেই আবার হুইস্কি ঢেলে দিল মাধব। মদন উঁকি মেরে দেখল, সেন্টার টেবিলের নীচের থাকে আরও দুটো বোতল বরফের ট্রেতে শোয়ানো। দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বলে, তুই তো বলেছিলি, ছোট করে হবে। কিন্তু এ যে দেখছি, পুরো শুঁড়িখানা খুলে বসেছিস।

ছোট করেই কথা ছিল। কিন্তু কথা কি রাখা যায়, বল ? কথা কি ছিল, এই বয়সে আমাকে একা ফেলে ঝিনি চলে যাবে ? বল, দুনিয়ায় কোনও কথা থাকে ?

মদন হাত বাড়িয়ে বলে, চিঠিটা দে।

মাধব একটু পিছন দিকে হেলে সভয়ে বলে, কীসের চিঠি ?

কেন, ঝিনুক কোনও চিঠি লিখে রেখে যায়নি ?

না তো ? চিঠি লিখবে কেন ? অ্যাঁ ! চিঠি লেখার কোনও মানে হয় ?

চিঠি লিখে রেখে যায়নি তো কী করে বুঝলি যে, ও পালিয়েছে ?

বোঝা যায়। দেখছিস না, ঘরদোর কেমন খাঁ খাঁ করছে। অবশ্য তুই ঠিক বুঝবি না। ঝিনির সঙ্গে থাকলে বুঝতিস। আমি তো ঘরে পা দিয়েই—

তোদের ঝিটাকে ডাক।

ঝি ? তাকে কেন ?

ডাক না।

ওঃ, জ্বালালি। পুনম। এই পুনম।

পুনম দৌড়ে আসে, মামাবাবু, ডাকছ ?

মদন জিজ্ঞেস করে, ঝিনুক কখন বেরিয়েছে ?

চারটে পাঁচটা হবে। তখনও রোদ ছিল।

কোথায় গেছে বলে যায়নি ?

জি। বোনের বাড়ি। কাছেই।

সঙ্গে কেউ ছিল ?

ওই এক মামাবাবু এসেছিল—কী যেন শক্ত নামটা—

বৈশম্পায়ন ?

জি। আর একটা নতুন কাজের মেয়েও ছিল।

কেন ?

বোনের বাড়ি মেয়েটাকে দেওয়ার কথা।

আচ্ছা, তুমি যাও। বলে মদন মাধবের দিকে চেয়ে বলে, একটি লাথি কষাব তোমাকে শালা।

মাধব মাথা নাড়ে, তুই বুঝবি না। ঝি, বোনের বাড়ি, সব ঠিক। কিন্তু তবে বাড়িটা এত খাঁ খাঁ করছে কেন ? তুই টের পাচ্ছিস না ?

খাঁ খাঁ নয়। বাড়িটা তোকে বলছে, খা খা আরও হুইস্কি খা।

দূর ! এ বাড়ির একটা অদ্ভুত বাতাবরণ আছে ! যাকে বলে অ্যাটমোসফিয়ার। আজ সেটা অ্যাবসেন্ট। ভীষণরকম ভাবে অ্যাবসেন্ট। আমি অনেক চেষ্টা করলাম খুঁজতে। অ্যাটমোসফিয়ারটা কিছুতেই রেসপন্ড করছে না। ইট ইজ নট হিয়ার।

মদন গ্লাস নামিয়ে বলল, দে।

এবারও তার প্রথমবারের বরফ গলার সময় পায়নি। মাধব চোখ বড় বড় করে বলে, এরকম টানতে কোথায় শিখলে গুরু ? আচ্ছা খা। আজ তোরও দুঃখের দিন। আজ থেকে তুইও তো আর এম পি নোস। শুধু মদনা।

চোখ ছোট করে চেয়ে মদন বলে, আমি মদনা সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি আর এম পি নই এ কথা তোকে কে বলল ?

কেন, এই যে বললি রেজিগনেশন দিয়েছিস ?

রেজিগনেশন দিয়েছি পার্টি থেকে, কিন্তু তাতে আমার পার্লামেন্টের মেমবারশিপ যায় না। আই

অ্যাম স্টিল ভেরি মাচ অ্যান এম পি।

মাধব খুব অবাক হয়ে বলে, ইউ আর স্টিল অ্যান এম পি? বাঃ বাঃ। হোঃ হোঃ, আফটার ইভন রেজিগনেশন ইউ স্টিল রিমেন এম পি! বাহবা।

দূর গাড়ল। সংবিধানে আটকায় না।

মাধব উচ্চ স্বরে বলে, আলবত আটকায়। আলবত আটকায়। নিশ্চয় আটকায়।

কোথায় আটকায়?

মাধব মিইয়ে গিয়ে বলে, কোথাও নিশ্চয়ই আটকায়। কিন্তু এক্ষুনি সেটা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আফ্‌টার অল আমার বউ পালিয়ে গেছে, এখন আমার মাথার ঠিক নেই।

কোথাও আটকায় না। আই অ্যাম স্টিল অ্যান এম পি।

মাধব চোখ বুজে মাথা নাড়ে। বলে, তুই এখনও এম পি কী করে? তা হলে এ ম্যান ক্যান বি ভেরি মাচ অ্যালাইভ আফটার হিজ ডেথ! অ্যাঁ। এ ডেড ম্যান মে বি কলড অ্যান অ্যালাইভ ম্যান! নাকি লজিকটা হচ্ছে না?

তীক্ষ্ণ কূট চোখে চেয়ে ছিল মদন। বলল, দেয়ার ইজ সাম ট্রুথ ইন ইট।

তার মানে?

মরার পরও কেউ কেউ বেঁচে থাকে। দে।

মাধব বোতলটা তুলে দেখে বলে, ফিনিশ? অ্যাঁ। তুই অত ধড়াধবড় খাস না। আর একটা খুলছি, এবার সোডা মিশিয়ে খা।

মদন গ্লাসটা এগিয়ে দেয়।

মাধব নতুন বোতল খুলে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বলে, কী বলছিলি? মড়া না জ্যান্ত, কী যেন।

বলছিলাম কেউ কেউ মরেও বেঁচে থাকে।

মাধব হঠাৎ সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, যাঃ মাইরি। এমনিতেই আমার ভীষণ ভূতের ভয়। তার ওপর ঝিনি নেই!

মদন এবার সত্যিই খুব আস্তে খায়। ছোট করে একটিমাত্র চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আর একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর বলে, তোর এত ভয় কবে থেকে মাধব? আর কীসেরই বা ভয়!

ভূত। মেলা ভূত চারদিকে।

কার ভূত রে মাধব?

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফার পিছন দিকে মাথা রেখে পড়ে থাকে। চোখ বোজা, আস্তে আস্তে কখন, কীভাবে তার চোখের কোল ভরে যায় জলে। ঠোঁট একটু কাঁপে। একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সে।

মাধব!

উঁ।

এটা তো শোকসভা নয় রে। কিছু বল। নইলে জমছে না।

মাধব বিড়বিড় করে বলে, তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি মানুষের লাশে...

দূর শালা মাতাল!

মদনা, একটা কথা বলবি? লিডার হতে গিয়ে তোকে মোট কটা খুন করাতে হয়েছে?

এবার সত্যি লাথি খাবি। যা বাথরুমে গিয়ে পেচ্ছাপ করে ঘাড়ে মুখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে আয়।

মাধব বেকুবের মতো অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, শোওয়ার ঘর থেকে নীলুর ছবিটা আমি সরিয়ে দিয়েছি।

মদন কিছু বলে না। কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্রূর চোখে চেয়ে থাকে।

মাধব রুমালে চোখ মুখে বলে, আফটার অল বাড়ির চাকরের ছবি শোওয়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না।

মদন গ্লাস তুলে ছোট চুমুক দেয়। চেয়ে থাকে স্থিরভাবে।

মাধব বলে, ঠিক করিনি ? বল ! আফটার অল হি ওয়াজ এ ডোমেস্টিক সারভেন্ট ! বাসন মাজত, ঘর ঝ্যাঁটাত, আমাদের পাত কুড়িয়ে খেত, আমাদের পুরনো জামা-কাপড় পরে বড় হয়েছিল। ঠিক করিনি ছবিটা সরিয়ে দিয়ে ? চুপ করে আছিস কেন ?

শুনছি। বলে যা।

নীলু যত যাই হোক, ছিল আসলে চাকর। এইটুকু—মাধব হাত দিয়ে একটা মাপ দেখিয়ে বলে—এইটুকু থাকতে এসেছিল। শীতকালে কুঁকড়ে শুয়ে থাকত পাপোশে। একদম পোষা কুকুরের মতো। এঁটোকাঁটা খেত। হি ওয়াজ এ সারভেন্ট ! সারভেন্ট !

চেঁচাচ্ছিস কেন ?

চেঁচাচ্ছি নাকি ? ও ! বলে মাধব চোখ বোজে। আবার চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। ঠোঁট নড়ে। তারপর বলে, চাকরের আস্পদ্দা ! অ্যাঁ, চাকরের এত বড় আস্পদ্দা !

গ্লাস নামিয়ে রেখে মদন তেতো মুখে বিরক্তির সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া হুস করে ছাড়ে। কিছু বলে না।

মাধব চোখ বুজেই বলে, আস্পদ্দা নয় ! তুইই বল ! হি ওয়াজ ক্লাইমবিং আপ দি ট্রি অফ সাকসেস লাইক এ মাংকি। যেটায় হাত দেয় সেটাতেই ব্রিলিয়ান্ট। পাড়ার এঁদো স্কুল থেকে কেমন ফার্স্ট ডিভিশন পেল। মাইরি, ভগবান কেন এত ছপ্পড় ফুঁড়ে দিল ওকে বল তো ! ভরাট গলায় যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত ঠিক মনে হত হেমন্ত। আর কী সাহস ! কী ইন্টিগ্রিটি ! মদনা, কথা বলছিস না কেন ? আমি কিছু ভুল বলছি ?

মদন গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে বলল, আর একটা কথা এখনও বলিসনি !

কী বল তো !

নীলু ছিল ঝিনুকের প্রেমিক। ভুলে গেছিস ?

হাঃ হাঃ, তাই ভুলি রে পাগল ?

তোর বউ বড্ড অন্যের প্রেমে পড়ে যায় !

হাঃ হাঃ। যা বলেছিস ! ঝিনি ভীষণ প্রেমে পড়তে ভালবাসে। ভীষণ। তবে—হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মাধব বলে—ঝিনি কখনও তোর প্রেমে পড়ল না কেন বল তো ! ইউ ওয়্যার দি মোস্ট এলিজিবল পসিবল লাভার। কিন্তু তোর প্রেমে পড়ল না কেন ! অ্যাঁ !

ঝিনুক তো তোর প্রেমেও কখনও পড়েনি !

হাঃ হাঃ ! দি জোক অফ দি ইয়ার। কিন্তু কথা হল—কী বলছিলাম বল তো ! হ্যাঁ, একটা চাকরের কথা। অজ্ঞাতকুলশীল। নিজের পদবিটা পর্যন্ত ছিল না, আমাদের পদবি ধার নিয়ে তবে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পেরেছিল।

মদন গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বলে, আজ তোকে নীলুতে পেয়েছে কেন বল তো !

মাধব আবার চোখে বোজে। তার অসাধারণ সুন্দর মুখশ্রী বার বার বিকৃত হয়ে যায় এক অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায়। চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। বলে, আজ নয়। সেই কবে থেকে নীলু আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শোওয়ার ঘরে নীলুর ছবিটা টাঙিয়েছিল ঝিনি। আমি কতবার বলেছি ওটা সরিয়ে দিতে। দেয়নি। মাধব একবার চোখ চেয়ে চারদিক দেখে নেয়, তারপর আবার চোখ বুজে বলে, রাত্রিবেলায়—বুঝলি—রাত্রিবেলায় রোজ নীলু ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে আসে। বুঝলি ! দ্যাট সারভেন্ট কামস আউট ! বাট হি ডাজনট বিহেভ লাইক এ সারভেন্ট ! হাঃ হি বিহেভস লাইক এ-এ...

মদন ধীর ও দীর্ঘ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে নিজেই বোতল থেকে ঢেলে নেয়।

মাধবের বোজা চোখ থেকে অবিরল জল ঝরছে। মাঝে মাঝে বিকট হেঁচকি তুলছে সে। ক্লান্ত মাথা সোফার কানায় রেখে দুর্দান্ত একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কিন্তু চাকরটার আস্পদ্দা আমি বহুবার রেজিস্ট করার চেষ্টা করেছি। আমার দোষ ছিল না। আই ট্রায়েড মাই বেস্ট। ও যখন কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি তখন একবার আমি ওকে দিয়ে আমার তিন জোড়া জুতো পালিশ করিয়েছি, আন্ডারওয়্যার কাচিয়েছি, ইভন একদিন দুদিন বাসন পর্যন্ত মেজে দিতে বাধ্য করেছি। আমি ওকে

ভুলতে দিতাম না যে, আফটার অল ও চাকর, অজ্ঞাতকুলশীল অ্যান্ড এ ননএনটিটি।

কিন্তু পারিসনি।

মাধব মাথা নাড়ল, না। ও তো সব হাসি মুখেই মেনে নিত। কোনও ফলস ভ্যানিটি ছিল না। একদিন ও আমাকে বলেছিল, তোমাদের বাড়িতে চাকর খেটে আমার একটা উপকার হয়েছে কি জানো ? আমার অহং বোধটা বাড়তে পারেনি। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল কমপ্লেক্স, চাকর খেটে আমার সেই কমপ্লেক্সগুলো কেটে গেছে।

মদনের একটুও নেশা হচ্ছে না। একটা তীক্ষ্ণধার অনুভূতি তাকে টান টান সচেতন রাখছে, নেশা ধরতে দিচ্ছে না। তবু হুইস্কির প্রতিক্রিয়া তো আছেই। তার সমস্ত শরীর অসহ্য গরম হয়ে উঠছে। জ্বালা করছে কান, নাক, চোখ, মুখ। সে উঠে পাখাটা পুরো বাড়িয়ে দিয়ে আসে।

মাধব তার হাতের সোডা মেশানো হুইস্কির গ্লাসে অনেকক্ষণ চুমুক দেয়নি। একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, অ্যান্ড দাস হি বিকেম ডেনজারাস। এক্সট্রিমলি ডেনজারাস ফর এনিবডিজ কমফোরট। ব্রিলিয়ান্ট বলে নয়, ব্রিলিয়ান্ট তো কত আছে।

তা হলে কেন ? মদন অনেকক্ষণ বাদে কথা বলল।

মাধব তাকায়। চোখ ঘোর লাল। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। বলে, রাতে মাঝে মাঝে ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে এসে নীলু সেই কথাটাই বলে। তোমরা আমাকে ভয় পেতে কেন জানো ? আমার কোনও কমপ্লেক্স ছিল না বলে, অহং ছিল না বলে। তোমরা বুঝতে পেরেছিলে, আমি সহজেই মানুষকে জয় করতে পারি। বলে, তোমার বউকেও আমি কত সহজে জয় করে নিয়েছিলাম দেখোনি! অথচ তোমার চেহারা কার্তিক ঠাকুরের মতো, আমার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর তুমি। তবু তোমার বউ কেন নীলুতে মজল ? কেন হদ্দমদ্দ মেয়েপুরুষ বালবাচ্চা সবাই নীলুতে মজত ? অ্যান্ড দাস নীলু ওয়াজ ইন দি মেকিং অফ এ লিডার। নীলু ওয়াজ এ ন্যাচারাল লিডার।

মদন মৃদু একটু হাসল। তারপর পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিয়ে খোলা বুকে ফুঁ দিতে লাগল জোরে জোরে।

দুচোখে অঝোর জলের ধারার ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল মাধব। হাতের গ্লাসটা এতক্ষণে শেষ করে ঠক করে নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে। তারপর চাপা তীব্র গলায় বলল, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন নীলু হ্যাড টু ডাই।

ঘরের থম ধরা বাতাসকে সামান্য শিউরে দিয়ে এই সময়ে কলিং বেল বেজে উঠল, টুং টাং টুং টাং টুং টাং...

খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে থেকে শব্দটা শোনে মাধব। তারপর অতি কষ্টে ওঠে। দরজা খোলার আগে সেফটি চেনটা আটকে নেয়। স্পাই হোল-এ চোখ রেখে দেখে জয়।

খুবই বিরক্ত হয় মাধব। দরজাটা ফাঁক করে বলে, কী চাই ?

মাধবদা, আমি জয়দ্রথ।

জানি। কী চাই ?

মদনা আছে ?

আছে। কেন বলো তো ? আমরা একটু বিজি আছি।

ভীষণ দরকার মাধবদা। কোশ্চেন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। আমাকে একটু ভিতরে আসতে দিন।

মাধব লক্ষ করে জয়ের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা।

মাধব চেনটা খুলে দিতেই দরজাটা হাট করে খুলে জয় চৌকাঠে দাঁড়ায়। উদ্‌ভ্রান্ত, ভয়ার্ত।

কী হয়েছে ? মাধব জিজ্ঞেস করে।

জয় শুধু বিড়বিড় করে বলে, মাধবদা! মাধবদা!

পিছন থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে জয় ছিটকে আসে ঘরের মধ্যে। দরজার চৌকাঠে নিঃশব্দে একটা লোক এসে দাঁড়ায়।

মাধব প্রথমটায় হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ তার অনিয়ন্ত্রিত স্বরযন্ত্র থেকে দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরোয়, ই—ই-ই-ই—

আমি সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি করব। সারাদিন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকব। সঙ্গে কাউকে রাখব না! সারাদিন ঢেউ আর ঢেউ, আর ওই আকাশ পর্যন্ত জল। বিশাল, বিপুল। মানুষ এত ছোট, এত অসম্পূর্ণ যে আমার আর কিছুতেই সংসারে থাকতে ইচ্ছে করে না।

তোমার ফ্ল্যাটটা কত সুন্দর ঝিনুক! কী নিশ্চিন্ত তোমার জীবন! তবু ভাল লাগে না?

আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। আমার জীবনে এক বিন্দু সুখ নেই। আমার ভালবাসার কেউ নেই যে! ঘড়িটা দেখুন তো, আমারটা বোধহয় বন্ধ হয়ে আছে!

সোয়া নটা ঝিনুক।

ইস, রাত হয়ে গেছে। এবার চলুন।

তোমাকে আজ কথাটা বলা হল না।

ঝিনুক ব্রিজের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বলে, কথাটা বললেই যদি ফুরিয়ে যায় তবে থাক না। আমিও আছি, আপনিও রইলেন।

বৈশম্পায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ব্রিজের ওপর পাশাপাশি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও ঝিনুক যতটা দূরে ছিল ততটাই দূরে রয়ে গেল।

শোনো ঝিনুক। আমার মনে হয়, কোনও পুরুষকেই তুমি কখনও ভালবাসোনি।

ঝিনুক আচমকা এই কথায় একটু থমকে দাঁড়ায়। ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, এতক্ষণ ধরে স্টাডি করে এই বুঝি মনে হল?

ঠিক বলিনি?

পুরুষরা যে কেন এত ভালবাসা-ভালবাসা করে মরে! বলে ঝিনুক একটা কপট শ্বাস ছাড়ে। পুরুষ বলতেই তার মনে পড়ে পোড়-খাওয়া শক্তসমর্থ লড়িয়ে একজন মানুষকে। খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট তার পরনে। গম্ভীর, শান্ত, মুখে অনেক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা গভীর হলকর্ষণের দাগ রেখে গেছে। আজও তার বাবাকে কোনও পুরুষই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। জীবনে আর একজন দুঃখী ও লড়িয়ে মানুষকে দেখেছিল ঝিনুক। নীলু। তারও মুখে ছিল ওই নির্বিকার লড়াইয়ের ছাপ। সুখ চায়নি, দুঃখেও নারাজ ছিল না, যে কখনও ভালবাসা-ভালবাসা করে মরেনি।

কিন্তু বৈশম্পায়ন তাকে কিছু বলতে চায়। সে কি ভালবাসার কথা? ঝিনুককে ভালবাসার কথা যে অনেকেই বলেছে! আসলে ভালবাসেনি কেউ। বৈশম্পায়ন কথাটা বলে ফেললে আর ওকে ভাল লাগবে না ঝিনুকের। তাই সে গোলপার্ক ছাড়িয়ে কেয়াতলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাড়িতে গিয়ে এখন কী দেখব বলুন তো! দুই মাতাল ব্যোম হয়ে বসে আছে। মানুষ যে কেন মদ খায়!

বৈশম্পায়ন জ্বলে যাচ্ছে। জীবনে সময় বেশি নয়। মাঝে মাঝে মৃত্যু নদীর গান এসে লাগে এরিয়েলে। ঝিনুকের ফটোগ্রাফ পুরনো হয়ে এল। সময়ের ঢেউ এসে একদিন ঝিনুকের ওই সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে যাবে। সময় নেই। একদম সময় নেই।

এইখানে অভিজাত কেয়াতলার জনবিরল রাস্তা। অনেক কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার ঝুপসি ছায়া। কিছু মনোরম অন্ধকার। এইখানে একবার দুঃসাহসী হতে ইচ্ছে হল বৈশম্পায়নের। দু পা আগে হাঁটছে ঝিনুক। সেই অসহনীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কেন মাতলা ওই সুগন্ধ মাখো তবে? কেন সাজো? কেন 'তুমি' বলে ডাকতে বললে? কেন? জ্বলন্ত বৈশম্পায়ন জ্বরগ্রস্তের মতো আচমকা হাত বাড়াল। পরমুহূর্তে সুগন্ধী, নরম ও অসহনীয় সুন্দর ঝিনুককে টেনে আনল বুকের মধ্যে।

ঝুপসি ছায়ার নীচে, বহু দূরের অস্পষ্ট ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝিনুকের অবাক দুখানা চোখের দিকে মাত্র একপলক চেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। তারপরই কাণ্ডজ্ঞানহীন তার ঠোঁট নেমে যেতে থাকে ঝিনুকের ঠোঁটের দিকে।

কিন্তু কোটি কোটি মাইলের সেই দূরত্ব কী করে পেরোবে বৈশম্পায়ন ? ঝিনুক বাধা দেয়নি, চেঁচায়নি, শুধু চেয়ে ছিল। কিন্তু সেই অবাক চোখের ভিতর থেকে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে মহাসমুদ্র। বৈশম্পায়ন দেখে, করাল বিশাল আদিগন্ত এক সমুদ্রের পাকানো ঢেউ গড়িয়ে আসছে চরাচর গ্রাস করতে। বিপুল গর্জনে ফিরে যাচ্ছে আবার। ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশে, নেমে যাচ্ছে পাতালে।

কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। সে সেই দূরত্ব অতিক্রম করার চেষ্টা আর করে না।

ফিস ফিস করে বৈশম্পায়ন বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

ঝিনুক খুব আস্তে, প্রায় বিনা আয়াসে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, চলুন। খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে।

আবার দুপা এগিয়ে ঝিনুক। দুপা পিছনে বৈশম্পায়ন। আলোছায়াময় এক অপরূপ নির্জনতা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। দুজনেই চুপচাপ। বৈশম্পায়ন কোনওদিনই আর সেই ফটো তোলার কথা বলতে পারবে না ঝিনুককে। ঝিনুক কোনওদিনই আর পারবে না বৈশম্পায়নকে মনে করিয়ে দিতে।

ঠিক সময়ে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পেরেছিল মদন। এক পাটা কাঠের মজবুত দরজা, পেতলের হুড়কো। সহজে ভাঙবে না।

অসহ্য গরমে ভেপে আছে বাথরুম। অসহ্য গরমে ভেপে ঘেমে গলে যাচ্ছে মদন। নেশা হয়নি, কিন্তু তা বলে হুইস্কি তার কাজ করতেও ছাড়ে না তো।

বেসিনে উপুড় হয়ে গলায় আঙুল দিল মদন। হড় হড় করে টাটকা হুইস্কির স্রোত নেমে গেল নল বেয়ে। মদন শাওয়ারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে তলায় দাঁড়ায়। বুলেটের মতো এক ঝাঁক ঠাণ্ডা জল নেমে আসে। সম্পূর্ণ পোশাক পরা অবস্থায় মদন দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তীব্র তীক্ষ্ণ জলকণার নির্দয় আক্রমণ সে সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে থাকে।

দেয়ালে মস্ত একটা চওড়া আয়না মুখোমুখি। সেটার গায়ে অজস্র জলের ছিটে গিয়ে লেগে আছে। তবু অস্পষ্ট নিজের প্রতিবিম্ব তাতে দেখতে পাচ্ছে মদন। খুবই অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। লোকসভার এক মাননীয় সদস্য শাওয়ারের তলায় জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তার মুখটা হাঁ হয়ে আছে। কয়েকবারই চেষ্টা করে দেখল মদন, হাঁ মুখটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না। যতবার বন্ধ করে ততবার দুর্বল চোয়ালের খিল আলগা হয়ে মুখ হাঁ হয়ে যায়।

বসবার ঘরে চোয়াল নিয়ে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে মাধবেরও। তবে সে যে হাঁ করে আছে তা সে বুঝতে পারছিল না। তাই সে হাঁ মুখ বন্ধ করার কোনও চেষ্টাও করেনি।

দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্বাসঘাতক জয় দাঁড়িয়ে। সন্দেহ নেই, ওরা বিশ্বাসঘাতকের বংশ। এক ভাই তার বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর এক ভাই ডেকে এনেছে তার নিয়তিকে।

নব পাপোশে তার চপ্পলজোড়া মুছে আসেনি। ধুলোটে চপ্পলের ছাপ পড়ল কার্পেটে। নব সোফার হাতলে একটা চপ্পলসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বলল, মাল খাচ্ছ ?

বলে নব হাত বাড়িয়ে একটা খালি বোতল তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, বাঃ। ফরেন জিনিস। বোতল কত করে নেয় বলো তো আজকাল।

মাধব হাতের পিঠ দিয়ে থুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল, তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। নবর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে সে একটু কমিয়ে বলল, আশি টাকা।

নব অবশ্য মদের দাম জানতে আসেনি। বোতলটা আবার জায়গামতো রেখে সে বলল, আমাকে দেখে ওরকম চেঁচালে কেন বলো তো মাধবদা ! ভয় খেয়েছিলে ? আমাকে তোমার ভয় কেন বলো তো ? কোনওদিন তো তোমার সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি ছিল না।

তোর সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি নেই নব।

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নব একটু হাসল, আগে ছিল না মাধবদা। কিন্তু এখন আছে।

তোর সঙ্গে খাড়াখাড়ি ! অ্যাঁ ! খুব হাসবার চেষ্টা করে মাধব। তোর সঙ্গে কীসের খাড়াখাড়ি রে ? কী যে বলিস।

মদনদা কোথায় বলো তো। লুকিয়েছে ?

মদন, ওঃ, তুই মদনকে খুঁজছিস ? মদন চলে গেছে ক-খ-ন।

মদনদার পাখা নেই মাধবদা। আর তোমার ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর দুসরা দরজাও নেই।

তা হলে কোথায় ? বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখ।

খুঁজতে হবে না। বলে নব সোফা থেকে পা নামায় এবং মাধব সোফার হাতলে ওর চটির ছাপ দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে। ঝিনুক থাকলে সোফায় দাগ দেখে এমন চেঁচাত।

নব সোফায় বসে বলল, আজ সারাদিন আরাম করে কোথাও বসিনি, জানো ?

বোস, বোস. ভাল করে বোস। একটু হুইস্কি খাবি ?

নব একটু হাসল, জেলখানায় আমাকে কী খাওয়াত জানো ?

মাধব ঢোঁক গিলল।

নব ক্রূর চোখে চেয়ে বলল, মাজাকি রাখো।

তোর সঙ্গে মাজাকি কী রে ? তুই আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু।

কে তোমার ভাইয়ের বন্ধু ?

কেন, তুই। তুই নীলুর বন্ধু না ?

তুমি সিধে কথার লোক নও মাধবদা। নীলু তোমার ভাই ছিল ? না চাকর ?

কী যে বলিস। সেই কবে ছেলেবেলায় ঘরের কাজ করত। কিন্তু আমরা ওকে কখনও চাকরের মতো ট্রিট করেছি, বল।

ফালতু বাত ছাড়ো মাধবদা। একটা সিধে কথা বলবে ? আরও তো মেলা লোক ছিল, তবু নীলুর কেসে আমাকে ফাঁসালে কেন ?

আমি কেন ফাঁসাব ? মার্ডারের সময় তুই ওর সঙ্গে ছিলি।

আলবাত ছিলাম। তাতে কী ? নীলু আমার দোস্ত ছিল, লিডার ছিল।

দুঃখের গলায় মাধব বলে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় নীলুকে বোধহয় তুই মারিসনি।

কথাটা গ্রাহ্য না করে নব ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমি আর নীলু তোমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। সন্ধেবেলা। বকুলতলার মোড় পার হওয়ার সময় বোম চার্জ হয়। কী হয়েছিল আমি জানি না, আমি ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাই। এক ঘণ্টা আমার জ্ঞান ছিল না।

এখনও হাঁ করে আছে মাধব। হাতের পিঠে থুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল। সোফায় মুখোমুখি নব। বেঁটে খাটো মজবুত চেহারা, জেলের ভাতেও চেহারা ভেঙে যায়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওর ঠাণ্ডা চোখ। তাকালেই গুড় গুড় করে বুক কাঁপে। মাধব বলল, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে নব, এখন কী করতে চাস তুই ? নীলুর জন্য আমাদের আর কী করার আছে বল।

যারা টিকিট কেটেছে তাদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। টিকিট না কাটলে নীলু ভি লিডার হত। আর শালা কে না জানে, লিডার হলে নীলু আর নীলু থাকত না। যেমন মদনদা নেই। যেমন কেউ নেই। অনেকক্ষণ ধরে তোমার শাওয়ারের জল পড়ে যাচ্ছে মাধবদা। বাথরুমে কে বলো তো ?

বাথরুমে জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে মদনেরও মনে হচ্ছিল, কিছু একটা হারিয়ে গেছে। চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন সে খালি হাতে যে কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। তার দিকে চেয়ে কেউ তাকে অমান্য করার সাহস পেত না কখনও।

আর একবার বমি করল মদন। হুইস্কির শেষ তলানিটুকুও তুলে দিল পেট থেকে। ঠাণ্ডা জলে এখন একটু শীত শীত করছে তার। তবু সে শাওয়ার বন্ধ করল না। মাথায় ডুগডুগি বাজিয়ে জল পড়ছে। জাগ্রত হচ্ছে বিবেক, আত্মসচেতনতা, প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, একটু উল্টোপাল্টা হয়ে অবশ্য।

কিন্তু কী যে হারিয়ে গেছে তা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে হারিয়েছে ঠিকই। নইলে এতক্ষণে সে দরজা খুলে নবর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত।

বাথরুমের দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে, মদনদা ! মদনদা !

মদন শাওয়ার বন্ধ করে দেয়, কে ?

আমি জয়।

ও। কী চাও ?

একবার বাইরে আসুন।

মদন মুখটা বিকৃত করে। তারপর বলে, আসছি।

স্নানের পর অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে মাথা। মদন বিশাল তোয়ালেটা টেনে নিয়ে মাথা আর গা মোছে। জামাকাপড় ভেজা, বাথরুমে বিকল্প কিছু পরারও নেই। মদন আবার মুখ বিকৃত করে।

তোয়ালে দিয়ে আয়নাটা মুছে সে নিজের মুখটা ভাল করে দেখে নেয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নব পলিটিক্যাল প্রোটেকশন পেয়ে গেছে। না হলে জেল-পালানো কয়েদি প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াত না, বা এত সহজে নাগাল পেত না মদনের। কারা নবকে প্রোটেকশন দিয়েছে তা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। তবে স্বচ্ছ মাথায় মদন বুঝতে পারছে, নবর নিশ্চয়ই আরও কিছু চাওয়ার আছে। চাওয়াই তো মানুষের সবচেয়ে সহজ রন্ধ্র।

মদন তোয়ালে জড়িয়ে নেয় কোমরে। একটু ফ্যাট হচ্ছে পেটে, এই সংকটের সময়েও লক্ষ করল সে। কমাতে হবে।

বাথরুমের দরজা খুলে মদন বাইরে পা দেয়। কাজটা হয়তো ঠিক হল না। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

ডাইনিং হলের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বসবার ঘরে সোফায় বসে বিবর্ণ হাঁফাচ্ছে মাধব। ছাইয়ের মতো সাদা মুখ নিয়ে জয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। সিংগল সোফায় নব। বুকটা একটু কেঁপে উঠল মদনের। কিন্তু মুখে তার ছায়া পড়ল না। পার্লামেন্ট অ্যাড্রেস করা গম্ভীর গমগমে গলায় হাঁক দিল, পুনম ! কফি।

ডাইনিং হলের দেয়ালের একটা খাঁজে স্টিরিও সহ রেকর্ড প্লেয়ার। রেকর্ড একটা চাপানোও আছে। মদন শিস দিতে দিতে গিয়ে সেইটে চালু করল। কী গান বাজবে তা জানে না সে। ঘষ্টানো একটু আওয়াজের পর হঠাৎ দেবব্রতর গলা তাকে জিজ্ঞেস করল, পুরনো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়...। মদন রসিক আছে। দুহাতের ঝাপটায় লম্বা চুল থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে সে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় সম্ভাব্য মৃত্যুর দিকেই। কিন্তু থমকায় না। অনেকদিন বাদে নবর সঙ্গে এই মুখোমুখি।

আঃ, বলে একটা আরামের আওয়াজ করে সোফায় বসে মদন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নবর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, খবর পেয়েছি।

নব কথা বলল না। ক্রূর কুটিল এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। (মোবা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়...)

মদন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, পার্টির সব খবর পেয়েছিস তো ?

কীসের খবর ? (আর মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়। আবার যদি দেখা তবে প্রাণের মাঝে আয়...)

নিত্য ঘোষ আলাদা দল করছে এখানে। তোকে প্রোটেকশন দিয়েছে, তাও জানি।

তুমি আমাকে ফাঁসিয়েছিলে, আর নিত্য ঘোষ আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। তোমার আর আমার সম্পর্কটা এখন একটু অন্যরকম মদনদা।

মদন হাত তুলে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে নবকে চুপ করিয়ে দেয়। তারপর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে নবর চোখে চোখ রেখে বলে, কাজ করতে চাস ? (আয় আর একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়...)

নব চেয়েই থাকে।

মৃদু হেসে মদন বলে, তোর বউকে চাকরি দিয়ে আজই দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছি। নইলে খামোকা পুলিশ গিয়ে মেয়েটার ওপর হুজ্জতি করত। তুইও যাবি ?

কোথায় ?

দিল্লি ?

রেকর্ড শেষ হয়ে স্টিরিওতে একটা ঘষটানির শব্দ বাজছে। বেজেই যাচ্ছে। আড়চোখে মদন লক্ষ করল কার কাছে আর্মস আছে বা নেই তা সে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পায়। নবর কাছে আছে। থাকারই কথা।

দিল্লি শব্দটা মদন আর নবর মাঝখানে লাট্টুর মতো ঘুরছে।

নবর একটা হাত জামার তলায়। কোথায় তা মদন আন্দাজে ধরে। কিন্তু ভাল করে তাকায় না।

দুজনের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে 'দিল্লি' শব্দটার দম ফুরিয়ে গেল। কোমর নেতিয়ে সেটা ঢলে পড়ছে। নব শব্দটাকে ক্যাচ করবে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

বিরক্ত মুখে মদন তার গমগমে গলা আর একটু তুলে হাঁক দিল, পুনম। কফি। তারপর যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে নবর দিকে তাকায় সে। তুই কি বিশ্বাস করিস না আমি কল্পতরু ? আমি কামধেনু ? সারা ভারতবর্ষে কটা এম পি আছে খুঁজে দেখে আয়। সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন আমি। আমি ঘুরিয়ে দিতে পারি তোর ভাগ্যের চাকা। মরা মানুষ জ্যান্ত করি রোজ। জ্যান্ত মানুষ মারি। আমি বললে নদী উজানে বয়, রাতের বেলা রোদ ওঠে। ক্যাচ কর নব, দিল্লি শব্দটা ক্যাচ কর। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে, দেখবি চল। দিল্লিতে আছে লালকেল্লা। আছে পার্লামেন্ট। আছে ইচ্ছাপূরণ। ক্যাচ কর নব।

ঘুরতে ঘুরতে দিল্লির লাট্টু যখন মাটি ছুঁই ছুঁই তখন নব হঠাৎ ক্যাচ করল, দিল্লিতে গিয়ে কী হবে ? খুব ঠাণ্ডা হিসেবি গলায় সে প্রশ্ন করে।

আর একটা সিগারেট ধরানোর সময় মদন ভাল করে লক্ষ করে, তার হাত কাঁপছে কি না। না, কাঁপছে না, এখনও সব ঠিক আছে। কেউ উঠে গিয়ে স্টিরিওটা বন্ধ করছে না। মদন—তোয়ালে পরা মদনই উঠে গিয়ে রেকর্ডটা পাল্টে দিয়ে এল। ভরাট একটা গলা গাইছে, সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুল না...বহোৎ আচ্ছা বহোৎ আচ্ছা বলে মনে মনে হাসল মদন।

সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে চিত হয়ে ওপরের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে মদন বলে, কী আর হবে ! এখানে থাকলেও কিছু হবে না। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসে মদন নবর দিকে তাকায়, আমি কখনও সঙ্গে আর্মস নিয়ে চলেছি, দেখেছিস ? (এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে ভুলো না...)

জামার তলায় নবর হাত একটু কঠিন হয়। ভ্রূর ছায়ায় তার চোখের মণি মারবেলের মতো স্থির।

মদন গলাটা বেস-এ নামিয়ে আনে। খুব আস্তের ওপর গলাটা রোল করিয়ে বলে, আমার আর্মস লাগে না। লাগে নাকি রে নব ? (সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো—আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো। আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমারি হাসির তুলনা...)

নব চুপ। কিন্তু এখনও কথাটা তোলা, দুলছে।

আর্মসের চেয়েও বেশি কিছু থাকলে আর্মসের দরকার পড়ে না। নিত্য ঘোষের কজন বডিগার্ড তা জানিস ?

ফালতু বাত ছাড়ো মদনদা। আমি জানতে চাই, নীলুকে কে মেরেছিল, আর কেন তোমরা আমাকে নীলুর কেসে ফাঁসিয়েছিলে ! ...(ভুলো না ভুলো না, ভুলো না...)

একটু ফ্যাকাশে মেরে গেল কি মুখটা, নিজের মুখ তো মানুষ এমনিতে দেখতে পায় না। মদন তাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। (এখন আমার বেলা নাহি আর..) গলাটাকে আর একটা পর্দায় বেঁধে উদাস আনমনা স্বরে বলে, দিল্লি থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, এলিমিনেট নিত্য ঘোষ। বলে একটু ফাঁক দিয়ে মদন গলার স্বরটা একদম খাদে ফেলে দিয়ে বলে, দি জব ইজ ডান। যে সব ভূতপ্রেত আজ নিত্য ঘোষের হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে কাল থেকে তারা ওর গলায় দাঁত বসাতে শুরু করবে।

দি জব ইজ পারফেকটলি ডান।

জামার তলায় নবর হাত একটু কি শ্লথ ? কিন্তু সেদিকে সরাসরি তাকায় না মদন। পিছন দিকে হেলে আধবোজা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে সে নিজের সিগারেটটাকে দেখে। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলাতেই বলে, তোর প্রোটেকশন নেই। কিন্তু সেটা তুই এখনও জানিস না।

কিন্তু ওসব কথায় কান দেয় না নব। ঠাণ্ডা গলাতে জিজ্ঞেস করে, দোস্তকে কি দোস্ত খুন করে মদনদা ? বলো তুমি ! আমি কি আমার দোস্তকে মেরেছি ?

শুনতে হয় না, সব কথা শুনতে হয় না। মদনও এক পরিচ্ছন্ন অন্যমনস্কতায় কথাটাকে পাশ কাটিয়ে উদাস গলায় বলে, শ্রীমন্তও ঠিক এই ভুলটা করল। ভাবল মদনের দিন শেষ, এবার নিত্য ঘোষ আসছে। তোকেও কেউ কি তাই বুঝিয়েছে নাকি রে নব ?

তুমি আমার কথাটার জবাব দিচ্ছ না মদনদা ?

মদন স্টিরিওর স্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে, বাঁধিনু যে রাখি পরানে তোমার সে রাখি খুলো না...

পুনম কফির ট্রে নিঃশব্দে রেখে চলে যায়। মদন কফির ওপর ঝুঁকে পড়ে। এ সময়ে ড্রিংকসের মাঝখানে হঠাৎ কফির এই আকস্মিক আগমন ঘটার কথা নয় ! তবু ঘটিয়েছে মদন। ডাইভারসন, একটু ডাইভারসন দরকার। একটু ফাঁক, একটু শ্বাস ফেলার অবসর, একটু ঝটিতি চিন্তার অবকাশ।

কফি ? বলে মদন নবর দিকে ভ্রূ তুলে তাকায়।

কফি শব্দটা আবার লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে দুজনের মাঝখানে, ক্যাচ করবে কি নব ? (এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার...)

জামার তলা থেকে হাতটা বের করে আনে নব। হাতটা ফাঁকা। সেই হাতটাই কফির কাপের দিকে এগিয়ে আসে।

স্টিরিও থেকে ঘষটানির শব্দ আসছে আবার। বিকৃত মুখ করে মদন ওঠে। আর একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে আসে। আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

হাসলে নবকে ভালই দেখায়। নব হাসল। স্বরটা নিচু করে বলল, নীলুর কথাটা তুমি তুলতে চাও না, না মদনদা ?

ঠিন করে প্লেটের ওপর চামচ রাখে মদন। আঃ বলে একটা আরামের শ্বাস ছাড়ে। গুন গুন করে গায়কের সঙ্গে গায়, চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ যত তুচ্ছ এ মানি...গাইতে গাইতে আড় চোখে নবকে এক পলক দেখে নেয়। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে। লালকেল্লা আছে। আছে প্রোটেকশন। কলকাতার পুলিশ নেই সেখানে। বাচ্চেলোক, দেখো দিল্লি, দিল্লি দেখো। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ...

শূন্য কফির কাপটা নিঃশব্দে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ায় নব, কথা দিচ্ছ মদনদা ?

দিচ্ছি।

তা হলে যাব দিল্লি ?

বিরক্তির ভঙ্গিতে হাত তুলে মদন গায়কের সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

নব নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

ভিতরে গান তখনও চলছে, চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি-ই...

বাইরে কেয়াতলায় ছায়াচ্ছন্ন পথে আর একটা ছায়া হঠাৎ সবল হয়। সে দিল্লির স্বপ্ন দেখছে তখন।

লেকের কাছ বরাবর পিছন থেকে টাকমাথার মস্ত কালো চেহারাটা হঠাৎ খুব কাছে চলে আসে তার। হাতে নাঙ্গা রিভলভার। লোকটা জানে, নব হারামি বিট্রে করেছে। লোকটার নিশানা খুবই ভাল, তা ছাড়া এত কাছ থেকে নিশানা ভুল হওয়ারও নয়।

অনেক দূরে যখন গুলির শব্দ হয়, তখন মাধবের বসবার ঘরে গানের শব্দ হঠাৎ চৌদুনে উঠে যায়। আনন্দধারা চারদিকে গমগম করতে থাকে। স্টিরিওর শব্দটা বাড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখের

ঘাম মুছতে মুছতে ডাইনিং-এর পর্দার ফাঁক দিয়ে মদনের দিকে একবার তাকায় মাধব। একটু হাসে। ছেলেবেলা থেকেই সে জানে মদনের মধ্যে বাড়তি কিছু জিনিস দেওয়া আছে। সেটা ফাউ। সকলের থাকে না।

ঝিনুক যখন ঘরে ঢুকল তখন মদন মাধবের পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসা। হাতে সোডা মেশানো পাতলা হুইস্কি। মাধব একটা ফ্রাই চিবোচ্ছে।

ঝিনি! বলে লাফিয়ে উঠল মাধব।

মদন চাপা গলায় ধমক দিল, মারব শালার পাছায় লাথ।

মাধব এক গাল হেসে বলল, দেখ মদন, দেখ! অ্যাটমসফিয়ারটা ফিরে এসেছে। আই অ্যাম ফিলিং ইট নাউ, ইট ইজ হিয়ার।

ঝিনুক ভ্রূ কুঁচকে বলল, আপনাদের ওসব গেলা হয়েছে তো। এবার দয়া করে খেতে বসুন।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল জয়। বৈশম্পায়ন এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, তোরও আসার কথা ছিল নাকি? সকালে বলিসনি তো।

জয় সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মদনের দিকে। একটু হেসে বলল, সে অনেক কথা।

মাধব ফ্রাইয়ের প্লেটটা মদনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, জয় আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে। বৈশম্পায়ন, ছোট করে একটা মেরে নে। স্কচ।

বৈশম্পায়ন জানে ঝিনুক কোটি কোটি মাইল দূরে। হয়তো নীহারিকার মতো দূরে। সে বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ছেড়ে বলে, ছোট নয়। বড় করে একটা দে।

ঝিনুক কথাটা শুনতে পেল না। কাপড় ছাড়তে শোওয়ার ঘরে ঢুকে সে দেয়ালে নীলুর ছবিটা দেখতে না পেয়ে অবাক। গেল কোথায় ছবিটা? নীলুর যে বেশি ছবি নেই! মাত্রই দু-তিনটে। চারদিকে হাতড়ে সে নীলুর ছবি খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল ছবিটা? ছবি ছাড়া স্মৃতি ছাড়া নীলুর যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বসবার ঘরে বৈশম্পায়ন গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক মেরে বলে, মদনা, কেমন আছিস?

মদন? মদনা যে মইরা ভ্যাটকাইয়া আছে, পাছায় পড়ছে জ্যোছনা। বলে ফিড়িক ফিড়িক হাসে মদন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে জয় ওদের হাসি-ঠাট্টা শুনতে পাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট করে কিছু শোনার মতো মানসিক অবস্থাও তার নয়। সে দেখছে একজন লিডারকে। লিডার হতে হয় তো এরকম! কী ঠাণ্ডা। কী সাহস। কী ব্যক্তিত্ব।

এই লোকটাই একদিন তাকে পালবাজার অবধি সাইকেলে ডবল ক্যারি করেছিল। এই মানুষের সঙ্গেই ছিল তার সেজদির গোপন প্রণয়। গর্বে তার বুক ভরে ওঠে।

রক্তের বিষ

কুকুরগুলো বাইরে খ্যাঁকাচ্ছে। সে এমন চ্যাংড়ামি যে মাথা গরম হয়ে যায়।

গগনচাঁদ উঠে একবার গ্যারাজ-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লাইটপোস্টের তলায় একটা ভিখারি মেয়ে তার দুটো বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসেছে। কাপড়ের আঁচল ফুটপাথে পেতে তার ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার জড়ো করেছে। কুকুরগুলো চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে লাগাতার।

গগনচাঁদ একটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল নিশানায় ছুড়ে কুকুরটার পাছায় লাগিয়ে দিল। কুকুরটার বীরত্ব ফুস করে উড়ে যায়, কেঁউ কেঁউ করতে করতে নেংচে সেটা পালায়। সঙ্গে আরগুলো। গগনচাঁদ ফের তার গ্যারাজ-ঘরে এসে বসে। রাত অনেক হল। গগনচাঁদের ভাত ফুটছে, তরকারির মশলা এখনও পেষা হয়নি।

মশলা পিষবার শিল-নোড়া গগনের নেই। আছে একটা হামানদিস্তা। তাইতেই সে হলুদ গুঁড়ো করে, ধনে-জিরে ছাতু করে ফেলে। একটা অসুবিধে এই যে হামানদিস্তায় একটা বিকট টংটং শব্দ ওঠে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। আর এই বিরক্তির ব্যাপারটা গগন খুব পছন্দ করে।

এখন রাত দশটা বাজে। গ্রীষ্মকাল। চারপাশেই লোকজন জেগে আছে। রেডিয়ো বাজছে, টুকরো-টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে, কে এক কলি গান গাইল, বাসন-কোসনের শব্দও হয়। গগন হামানদিস্তা নিয়ে হলুদ গুঁড়ো করতে বসে। আলু ঝিঙে আর পটল কাটা আছে, ঝোলটা হলেই হয়ে যায়।

গ্যারাজটায় গাড়ি থাকে না, গগন থাকে। গ্যারাজের ওপরে নিচু ছাদের একখানা ঘর আছে, সেটাতে বাড়িঅলা নরেশ মজুমদারের অফিসঘর। কয়েকখানা দোকান আছে তার কলেজস্ট্রিট মার্কেটে। নিজের ছেলেপুলে নেই, শালিদের দু'-তিনটে বাচ্চাকে এনে পালে-পোষে। তার বউ শোভারানি ভারী দজ্জাল মেয়েছেলে। শোভা মাঝে মাঝে ওপরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, শিল-নোড়া না থাকে তো বাজারের গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে ভরে বিক্রি হয়, না কি সেটা কারও চোখে পড়ে না। হাড়-হারামজাদা পাড়া-জ্বালানি গু-খেগোর ব্যাটারা সব জোটে এসে আমার কপালে!

সরাসরি কথা বন্ধ। বাড়িতে একটা মাত্র কল, বেলা ন'টা পর্যন্ত তাতে জল থাকে। জলের ভাগীদার অনেক। গ্যারাজে গগন। রাতে নরেশের কিছু কর্মচারী শোয় ওপরতলার মেজেনাইন ফ্লোরে। সব মিলিয়ে পাঁচজন। ভিতর-বাড়ির আরও চার ঘর ভাড়াটের ষোলো-সতেরোজন মিলে মেলাই লোক। একটা টিপকল আছে, কিন্তু সেটা এত বেশি ঝকাং ঝকাং হয় যে বছরে ন'মাস বিকল হয়ে থাকে। জল উঠলেও বালি মেশানো ময়লা জল উঠে আসে। তাই জলের হিসেব ওই একটা মাত্র কলে। অন্য ভাড়াটেদের অবশ্য ঘরে ঘরে কল আছে, কিন্তু মাথা-উঁচু কল বলে তাতে ডিমসুতোর মতো জল পড়ে। উঠোনের কলে তাই হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। একমাত্র নরেশের ঘরেই অঢেল জল। নিজের পাম্পে সে জল তুলে নেয়। কিন্তু সে জল কেউ পায় না, এমনকী তার কর্মচারীরাও নয়। গগনচাঁদ কিছু গম্ভীর মানুষ, উপরন্তু কলেজ আর তিনটে ক্লাবের ব্যায়ামশিক্ষক, তার বালতি কিছু বড় এবং ভারী। কাউকে সে নিজের আগে জল ভবতে দেয় না। নরেশ মাস আটেক আগে জলের বখেড়ায় গগনচাঁদকে বলেছিল, আপনার খুব তেল হয়েছে। তাতে গগনচাঁদ

তার গলাটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে চড় তুলে বলেছিল, এক থাপ্পড়ে তিন ঘণ্টা কাঁদাব। সেই থেকে কথা বন্ধ।

গগন গুঁড়োমশলা কিনতে যাবে কোন দুঃখে! ভেজাল আর ধুলোবালি মেশানো ওই অখাদ্য কেউ খায়? তা ছাড়া হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো করলে শরীরটাকে আরও কিছু খেলানো হয়। শরীর খেলাতে গগনের ক্লান্তি নেই।

গ্যারাজের দরজা মস্ত বড়। বাতাস এসে কেরোসিনের স্টোভে আগুনটাকে নাচায়। গগন উঠে গিয়ে টিনের পাল্লা ভেজিয়ে দিতে যাচ্ছিল। নজরে পড়ল আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে। গ্রীষ্মের শেষ, এবার বাদলা শুরু হবে। ঠান্ডা ভেজা একটা হাওয়া এল। গগন ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। অন্য ঋতু ততটা নয় যতটা এই বাদলা দিনগুলো তাকে জ্বালায়। গ্যারাজের ভিত নিচু, রাস্তার সমান-সমান। একটু বৃষ্টি হলেই কল কল করে ঘরে জল ঢুকে আসে। প্রায় সময়েই বিঘত-খানেক জলে ডুবে যায় ঘরটা। সামনের নর্দমার পচা জল। সেই সঙ্গে উচ্চিংড়ে, ব্যাং এবং কখনও-সখনও ঢোঁড়া সাপ এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। তা সে-সব কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ নিয়ে মাথা ঘামায় না গগন। ময়লা জলটাকেই তার যত ঘেন্না। দুটো কাঠের তাক করে নিয়েছে, তোরঙ্গটা তার ওপর তুলে রাখে, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে স্টোভ জ্বেলে চৌকিতে বসে সাহেবি কায়দায় রান্না করে গগন বর্ষাকালে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তাই আকাশে মেঘ দেখলে গগন খুশি হয় না।

এখনও হল না। কিন্তু আবার বর্ষা-বৃষ্টিকে সে ফেলতেও পারে না। এই কলকাতার শহরতলিতে বৃষ্টি যেমন তার না-পছন্দ, তেমনি আবার মুরাগাছা গাঁয়ে তার যে অল্প কিছু জমিজিরেত আছে সেখানে বৃষ্টি না হলে মুশকিল। না হোক বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মন ধান তো হয়ই। তার কিছু গগন বেচে দেয়, আর কিছু খোরাকি বাবদ লুকিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

মেঘ থেকে চোখ নামিয়েই দেখতে পায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর চৌহদ্দি ফুঁড়ে সুরেন খাঁড়া আসছে। সুরেন এক সময় খুব শরীর করেছিল। পেটের পেশি নাচিয়ে নাম কিনেছিল। এখন একটু মোটা হয়ে গেছে। তবু তার দশাসই চেহারাটা রাস্তায়-ঘাটে মানুষ দু'পলক ফিরে দেখে। সুরেন গুন্ডামি করে না বটে, কিন্তু এ তল্লাটে সে চ্যাংড়াদের জ্যাঠামশাই গোছের লোক। লরির ব্যাবসা আছে, আবার একটা ভাতের হোটেলও চালায়।

সুরেন রাস্তা থেকে গোঁত্তা-খাওয়া ঘুড়ির মতো ঢুকে এল গ্যারাজের দিকে।

বলল, কাল রাত থেকে লাশটা পড়ে আছে লাইন ধারে। এবার গন্ধ ছাড়বে।

গম্ভীর গগন বলল, হুঁ।

ছোকরাটা কে তা এখনও পর্যন্ত বোঝা গেল না। তুমি গিয়ে দেখে এসেছ নাকি?

না। শুনেছি।

ঘরে ঢুকে সুরেন চৌকির ওপর বসল। বলল, প্রথমে শুনেছিলাম খুন। গিয়ে দেখি তা নয়। কোনওখানে চোট-ফোট নেই। রাতের শেষ ডাউন গাড়িটাই টক্কর দিয়ে গেছে। কচি ছেলে, সতেরো-আঠারো হবে বয়স। বেশ ভাল পোশাক-টোশাক পরা, বড় চুল, জুলপি, গোঁপ সব আছে।

হুঁ।— গগন বলল।

হামানদিস্তার প্রবল শব্দ হচ্ছে। ভাত নেমে গেল, কড়া চাপিয়ে জিরে-ফোড়ন ছেড়ে দিয়েছে গগন। সঙ্গে একটা তেজপাতা। সাঁতলানো হয়ে গেলেই মশলার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে।

সুরেন খাঁড়ার খুব ঘাম হচ্ছে। টেরিলিনের প্যান্ট আর শার্ট পরা, খুব টাইট হয়েছে শরীরে। বুকের বোতাম খুলে দিয়ে বলল, বড্ড গুমোট গেছে আজ। বৃষ্টিটা যদি হয়!

হবে।— গগন বলে, হলে আর তোমার কী! দোতলা হাঁকড়েছ, টঙের ওপর বসে থাকবে

সুরেন ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল, তারপর সেটা গামছার মতো ব্যবহার

লাগল মুখে আর হাতে। ঘষে ঘষে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, তোমার ঘরে গরম বড় বেশি, ড্রেনের পচা গন্ধে থাক কী করে?

প্রথমে পেতাম গন্ধটা। এখন সয়ে গেছে, আর পাই না। চার সাড়ে চার বছর একটানা আছি।

তোমার ওপরতলার নরেশ মজুমদার তো আবার বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ঝিল রোডে। একতলা শেষ, দোতলারও ছাদ যখন-তখন ঢালাই হয়ে যাবে। এক বার ধরে পড়ো না, নীচের তলাকার একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দেবে সস্তায়।

গগন ভাতের ফেন-গালা সেরে ঝোলের জল ঢেলে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল, তা বললে বোধহয় দেয়। ওর বউ শোভারানি খুব পছন্দ করে কিনা আমাকে। একটু আগেও আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিল।

একদিন উঠে গিয়ে ঝাপড় মারবে একটা, আর রা কাটবে না।

গগন মাথা নেড়ে বলল, ফুঃ! একে মেয়েছেলে, তার ওপর বউ মানুষ।

বলে হাসে গগন। একটু গলা উঁচু করে, যেন ওপরতলায় জানান দেওয়ার জন্যই বলে, দিক না একটু গালমন্দ, আমার তো বেশ মিঠে লাগে। বুঝলে হে সুরেন, আদতে ও মাগি আমাকে পছন্দ করে, তাই ঝাল ঝেড়ে সেটা জানিয়ে দেয়। মেয়েমানুষের স্বভাব জানো তো, যা বলবে তার উলটোটা ভাববে।

বলেই একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে গগন। সুরেনও ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মুখে একটু হাসি দু'জনেরই। শোভারানির অবশ্য কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ওপরে কোনও বাচ্চা বুঝি স্কিপিং করছে, তারই ঢিপ ঢিপ শব্দ আসছে, আর মেঝেতে ঘুরন্ত দড়ির ঘষা লাগার শব্দ।

নরেশচন্দ্র বড় চতুর বাড়িঅলা। ভাড়াটে ওঠানোর দরকার পড়লেই সে অন্য কোনও বখেড়ায় না গিয়ে বউ শোভারানিকে টুইয়ে দেয়। শোভার মুখ হল আঁস্তাকুড়। সে তখন সেই ভাড়াটের উদ্দেশে আঁস্তাকুড়ের ঢাকনা খুলে আবর্জনা ঢালতে শুরু করে। সে-বাক্য যে শোনে তার কান দিয়ে তপ্ত সিসে ঢালার চেয়েও বেশি কষ্ট হয়। সে বাক্য শুনলে গতজন্মের পাপ কেটে যায় বুঝি। শোভারানি অবশ্য এমনি এমনি গাল পাড়ে না। নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরদোরে আপনজনের মতো যাতায়াত শুরু করে, বাটি বাটি রান্না-করা খাবার পাঠায়, দায়ে-দফায় গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। ওইভাবেই তাদের সংসারের হাল-চাল, গুপ্ত খবর সব বের করে আনে। কোন সংসারে না দুটো-চারটে গোপন ব্যাপার আছে! সেই সব খবরই গুপ্ত অস্ত্রের মতো শোভার ভাঁড়ারে মজুত থাকে। দরকার মতো কিছু রং-পালিশ করে এবং আরও কিছু বানানো কথা যোগ করে শোভা দিন-রাত চেঁচায়। ভাড়াটে পালানোর পথ পায় না। গগনও শোভার দম দেখে অবাক হয়ে বলে, এ তো হামিদা বানুর চেয়ে বেশি কলজের জোর দেখতে পাই!

একমাত্র গগনেরই কিছু তেমন জানে না শোভা। না জানলেও আটকায় না। যেদিন নরেশকে ঝাঁকি দিয়েছিল গগন, সেদিন শোভারানি একনাগাড়ে ঘণ্টা আষ্টেক গগনের তাবৎ পরিবারের শ্রাদ্ধ করেছিল। বেশ্যার ছেলে থেকে শুরু করে যত রকম বলা যায়। গগন গায়ে মাখেনি, তবে ক্লাবের ছেলেরা পরদিন সকালে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। ব্রজ দত্ত নামে সবচেয়ে মারকুট্টা যে চেলা আছে গগনের দোতলায় উঠে নরেশকে ডেকে শাসিয়ে দিয়ে যায়। মারত, কিন্তু গগন ওরকমধারা দুর্বলের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না বলে মারেনি। তাতে শোভারানির মুখে কুলুপ পড়ে যায়। কিন্তু রাগটা তো আর যায়নি। বিশেষত গগন তখনও ইচ্ছেমতো জল তোলে, কলে কোনও দিন জল না এলে নরেশের চাকরকে ডেকে ওপরতলা থেকে বালতি বালতি জল আনিয়ে নেয়। শোভা রাগ করে হয়তো, কিন্তু জল দিয়ে দেয়। ঝামেলা করে না।

ভেবে দেখলে গগন কিছু খারাপ নেই। কেবল ওই বর্ষাকালটাকেই যা তার ভয়।

লাশটার কথা ভাবছি, বুঝলে গগন!

কী ভাবছ?

এখনও নেয়নি। গন্ধ ছাড়বে।

নেবে'খন। সময় হলে ঠিক নেবে।

ছেলেটা এখানকার নয় বোধহয়। সারাদিনে কম করে দু'-চারশো লোক দেখে গেছে, কেউ চিনতে পারছে না।

এসেছিল বোধহয় অন্য কোথা থেকে। ক্যানিং ট্যানিং-এর ওদিককার হতে পারে।

সুরেন মাথা নেড়ে বলল, বেশ ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। কসরত করা চেহারা।

গগন একটু কৌতূহলী হয়ে বলে, ভাল শরীর?

বেশ ভাল। তৈরি।

আহা!— বলে শ্বাস ছেড়ে গগন বলে, অমন শরীর নষ্ট করল?

সুরেন খাঁড়া বলে, তাও তো এখনও চোখে দেখোনি, আহা-উহু করতে লাগলে।

ও সব চোখে দেখা আমার সহ্য হয় না। অপঘাত দেখলেই মাথা বিগড়ে যায়। গত মাঘ মাসে চেতলার দিদিমাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি রাজ্যের কলেজের মেয়ে হাতে বই-খাতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সব মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে, একটা খাট ঘিরে ভিড়, শুনলাম কলেজের প্রথম বছরের মেয়ে একটা। সে দেওয়ালির দিন সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি পরে বেরোতে যাচ্ছিল, আগুন লেগে তলার দিকটা পুড়ে যায়। ওইসব সিন্থেটিক কাপড়ও খুব ডেঞ্জারাস, বুঝলে সুরেন? ওতে আগুন লাগলে তেমন দাউ দাউ করে জ্বলবে না, কিন্তু ফাইবার গলে গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে যাবে, কেউ খুলতে পারবে না। মেয়েটারও তাই হয়েছিল, কয়েক মাস হাসপাতালে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। ভিড়-টিড় ডিঙিয়ে উঁকি মেরে দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো একটু শুকনো বটে, কিন্তু কী মরি মরি রূপ, কচি, ফরসা! ঢল ঢল করছে মুখখানা। বুকের মধ্যে কেমন যে করে উঠল!

সুরেন খাঁড়া বলে, ও রকম কত মরছে রোজ।

গগনচাঁদ ব্যাপারটা 'কত'-র মধ্যে ফেলতে চায় না, বলল, না হে, এ মেয়েটাকে সকলের সঙ্গে এক করবে না। কী বলব তোমাকে, বললে পাপ হবে কি না তাও জানি না, সেই মরা মেয়েটাকে দেখে আমার বুকে ভালবাসা জেগে উঠল। ভাবলাম, ও যদি এক্ষুনি বেঁচে ওঠে তো ওকে বিয়ে করি। সেই ছেলেবেলা থেকে অপঘাতে মৃত্যুর ওপর আমার বড় রাগ। কেন যে মানুষ অপঘাতে মরে!

সুরেন রুমালে ঘাড় গলা ঘষতে ঘষতে বলে, তোমার শরীরটাই হোঁতকা, মন বড্ড নরম। মনটা আর একটু শক্ত না করলে কি টিকতে পারবে? চারদিকের এত অপঘাত, মৃত্যু, অভাব— এ সব সইতে হবে না?

গগনচাঁদ একটু থমকে গিয়ে বলে, তোমাদের এক-এক সময়ে এক-এক রকমের কথা। কখনও বলছ গগনের মন নরম, কখনও বলছ গগনের মেজাজটা বড় গরম। ঠিক ঠিক ঠাওর পাও না নাকি!

সুরেন বলে, সে তত্ত্ব এখন থাক, আমি লাশটার কথা ভাবছি।

ভাবছ কেন?

ভাবছি ছেলেটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে কসরত করত। তুমি তো ব্যায়াম শেখাও, তা তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কি না তা গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি!

গগন ঝোল নামিয়ে এক ফুঁয়ে জনতা স্টোভ নিভিয়ে দিল। বলল, ও, তাই আগমন হয়েছে!

তাই।

কিন্তু ভাই, ও সব দেখলে আমার রাতের খাওয়া হবে না।

খেয়ে নিয়েই চলো, আমি ততক্ষণ বসি।

গগন মাথা নেড়ে বলে, তা-ও হয় না, খাওয়ার পর ও সব দেখলে আমার বমি হয়ে যেতে পারে।

সুরেন বলে, তুমি আচ্ছা লোক হে! বলছি তো তেমন ঘেন্নার দৃশ্য কিছু নয়, কাটা-ফাটা নেই, এক চামচে রক্তও দেখলাম না কোথাও। তেমন বীভৎস কিছু হলে না হয় কথা ছিল।

গগনের চেহারায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর শান্ত দৃঢ় ভাবটা থাকে সেটা এখন আর রইল না। হঠাৎ সে ঘামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল, কার না কার বেওয়ারিশ লাশ! তোমার তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন? ছেড়ে দাও, পুলিশ যা করার করবে।

সুরেন ভ্রু কুঁচকে গগনকে একটু দেখল। বলল, সে তো মুখ্যুও জানে। কিন্তু কথা হল, আমাদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটে গেল। অনেকের সন্দেহ, খুন। তা সে যা-ই হোক, ছেলেটাকে চেনা গেলে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিশ কত কী করবে তা তো জানি!

সুরেন এ অঞ্চলের প্রধান। গগন তা জানে। সে নিজে এখানে পাঁচ-সাত বছর আছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন কিছু নয়। এক গোটা পাঁচেক জিমনাশিয়ামের কিছু ব্যায়ামের শিক্ষানবিশ আর স্থানীয় কয়েকজন তার পরিচিত লোক। সুরেনের মতো সে এখানকার শিকড়-গাড়া লোক নয়। সুরেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালই, কিন্তু এও জানে, সুরেনের মতে মত না দিয়ে চললে বিস্তর ঝামেলা। সুরেনের টাকার জোর আছে, দলের জোর আছে, নিজেকে সে এ অঞ্চলের রাজা ভাবে। বিপদ সেখানেই, এ অঞ্চলে যা ঘটে সব তার নিজের দায় বলে মনে করে সুরেন। খেপে গেলে সে অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

গগন প্যান্ট পরল, জামা গায়ে গলিয়ে নিল। চপ্পলজোড়া পায়ে দিয়ে বলল, চলো।

খেলে না?

না। যদি রুচি থাকে তো এসেই যা হোক দুটো মুখে দেব। নইলে আজ আর খাওয়া হল না।

দুই

গতবার সন্তু একটা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। বেড়ালটা অবশ্য খুবই চোর ছিল, ছিনতাই করত, মাঝে মাঝে দু'-একটা ডাকাতিও করেছে। যেমন সন্তুর ছোট বোন দুধ খেতে পারে না, রোজ সকালে মারধরের ভয় দেখিয়ে দুধের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, আর তখন খুব অনিচ্ছায় সন্তুর বোন টুটু এক চুমুক করে খায় আর দশ মিনিট ধরে আগড়ম বাগড়ম বকে, খেলে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই করতে করতে এক ঘণ্টা। ততক্ষণে দুধ ঠান্ডা মেরে যায়, মাছি পড়ে। বেড়ালটা এ সবই জেনে তক্কে তক্কে থাকত। এক সময়ে দেখা যেত, প্রায় সকালেই সে গেলাস কাত করে মেঝেময় দুধ ছড়িয়ে চেটেপুটে খেয়ে গেছে। এটা চুরি। এ রকম চুরি সে হামেশাই করত, আর ছিনতাই করত আরও কৌশলে। পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ার সময়টা কী করে যে তার জানা থাকত কে বলবে! ঠিকঠাক খাওয়ার সময়ে হাজির থাকত সে। মুখোমুখি বসে চোখ বুজে ঘুমোনোর ভান করত, আর সুযোগ হলেই এর হাত থেকে, তার পাত থেকে মাছের টুকরো কেড়ে নিয়ে হাওয়া। ডাকাতি করত মা-মাসিদের ওপর। কেউ মাছ কুটছে, গয়লার কাছ থেকে দুধ নিচ্ছে, কি হরিণঘাটার বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছে, অমনি হুড়ুশ করে কোত্থেকে এসে বাঘের মাসি ঠিক বাঘের মতোই অ্যাও করে উঠত। দেখা গেছে মা-মাসির হাত থেকে মাছ কেড়ে নিতে তার বাধেনি, দুধের ডেকচিও সে ওলটাতে জানত মা-মাসির হাতের নাগালে গিয়ে। ও রকম বাঁদর বিড়াল আর একটাও ছিল না। বিশাল সেই হুলোটা অবশ্য পরিপাটি দাঁতে নখে ইঁদুরও মেরেছে অনেক। সিংহবাড়ির ছন্নছাড়া বাগানটার একাধিক হেলে আর জাতি সাপ তার হাতে প্রাণ দিয়ে শহিদ হয়েছে। গায়ে ছিল অনেক

আঁচড়-কামড়ের দাগ, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে প্রায়দিনই তার হাতাহাতি কামড়া-কামড়ি ছিল। কুকুররাও, কে জানে কেন, সমঝে চলত তাকে। রাস্তা-ঘাটে বেড়াল দেখলেই যেমন কুকুর হামলা করে, তেমন এই হুলোকে কেউ করত না। কে যেন বোধহয় রায়েদের বুড়ি মা-ই হবে, বেড়ালটার নাম দিয়েছিল গুন্ডা। সেই নামই হয়ে গেল। হুলো গুন্ডা এ পাড়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াত, ঢিল খেতে, গাল তো খেতই।

সন্তুকে দু'-একটা স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় যে স্কুলে সে পড়ত তা ছিল সাহেবি স্কুল, খুব আদব-কায়দা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। সেখানে ভরতি হওয়ার কিছু পরেই সন্তুর বাবা অধ্যাপক নানক চৌধুরীকে ডেকে স্কুলের রেকটর জানালেন, আপনার ছেলে মেন্টালি ডিরেঞ্জড। আপনারা ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমরা আর দু'মাস ট্রায়ালে রাখব, যদি ওর উন্নতি না হয় তো দুঃখের সঙ্গে টিসি দিতে বাধ্য হব।

নানক চৌধুরী আকাশ থেকে পড়লেন। আবার পড়লেনও না। কারণ তাঁর মনে বরাবরই একটা খটকা ছিল সন্তু সম্পর্কে। বয়সের তুলনায় সন্তু ছিল বেশি নিষ্ঠুর, কখনও কখনও মার খেলে হেসে ফেলে। এবং এমন সব দুষ্টুমি করে যার কোনও মানে হয় না। যেমন সে ছাদের আলসের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলের ভারী টবের একটা-দুটো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে নীচের রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। রাস্তায় হাজার লোক চলে। একবার একটা সন্তুর বয়সি ছেলেরই মাথায় একটা টব পড়ল। সে ছেলেটা দীর্ঘ দিন হাসপাতালে থেকে যখন ছাড়া পেল তখন বোধবুদ্ধিহীন জরদ্গব হয়ে গেছে। যেমন সে একবার সেফটি-পিন দিয়ে টিয়াপাখির একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল। টিয়ার চিৎকারে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, একটা চোখ থেকে অবিরল রক্ত পড়ছে লাল অশ্রুর মতো। আর পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে। সে কী অমানুষিক চিৎকার! খাঁচার গায়েই সেফটিপিনটা আটকে ছিল। আর একবার সে তার ছোট বোনকে বারান্দার এক ধারে দাঁড় করিয়ে জোরে গুলতি মারে। মরেই যেত মেয়েটা। বুকে লেগে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান। হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েকে ভাল করে আনতে হয়। তাই নানক চৌধুরী অবাক হলেও সামলে গেলেন। তবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না-গিয়ে সন্তুকে বাড়ি ফিরে একনাগাড়ে মিনিট পনেরো ধরে প্রচণ্ড মারলেন।

দু'মাস পর ঠিক কথামতোই টিসি দিয়ে দিল স্কুল। দ্বিতীয় স্কুলটি অত ভাল নয়। কিন্তু সেখানেও কিছু ডিসিপ্লিন ছিল, ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখা হত। দু'মাস পর সেখান থেকে চিঠি এল— আপনার ছেলে পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, তার জন্য আর পাঁচটা ছেলে নষ্ট হচ্ছে।

এক বছর বাদে সন্তু সেকেন্ড হয়ে ক্লাসে উঠল। কিন্তু প্রমোশনের সঙ্গে তাকে টিসি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অগত্যা পাড়ার কাছাকাছি একটা গোয়ালমার্কা স্কুলে ছেলেকে ভরতি করে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন নানক চৌধুরী। এই স্কুলে দুষ্টু ছেলের দঙ্গল, তার ওপর গরিব স্কুল বলে কাউকে সহজে তাড়িয়ে দেয় না। বিশেষত সন্তুর বেতন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে, এবং ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। নানক চৌধুরীকে এখন সন্তুর ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হয় না, তিনি নিজের লেখাপড়ায় মগ্ন থাকেন।

সন্তু ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলের ফুটবল টিমে সে অপরিহার্য খেলোয়াড়। তা ছাড়া সে একটা ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শেখে। গগনচাঁদ শেখায়। সন্তুর খুব ইচ্ছে সে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যায়াম করে। তাতে শরীরের পেশি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু গগন যন্ত্র ছুঁতেই দেয় না, বলে, ও সব করলে শরীর পাকিয়ে শক্ত জিংড়ে মেরে যাবে, বাড়বে না। গগন তাই ফ্রি হ্যান্ড করায় আর রাজ্যের যোগব্যায়াম, ব্রিদিং, স্কিপিং আর দৌড়। সন্তু অবশ্য সে কথা শোনে না। ফাঁক পেলেই রিং করে, প্যারালাল বার-এ ওঠে, ওজন তোলে, স্প্রিং টানে। গগন দেখলে ঝাপড় মারবে, কিংবা বকবে। তাই প্রায় সময়েই রাতের দিকে জিমনাশিয়ামে যখন গগন থাকে না, দু'-চারজন চাকুরে ব্যায়ামবীর এসে

কসরত করে আর নিজেদের চেহারা আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, তখন সন্তু এসে যন্ত্রপাতি নেড়ে ব্যায়াম করে।

গুন্ডা বেড়ালটাকে গতবার সন্তু ধরেছিল সিংহীদের বাগানে। বাগান বলতে আর কিছু নেই। কোমর-সমান উঁচু আগাছায় ভরে গেছে চারধার। একটা পাথরের ফোয়ারা ভেঙে ফেটে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা পামগাছের গায়ে বহু দূর পর্যন্ত লতা উঠেছে বেয়ে। সিংহীদের বাড়িতে কেউই থাকে না। বছর দেড়েক আগে বুড়ো নীলমাধব সিং মারা গেলেন। হাড়কিপটে লোক ছিলেন। অত বড় বাড়ির মালিক, তবু থাকতেন ঠিক চাকরবাকরের মতো, হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা, পায়ে রবারের চটি। একটা চাকর ছিল, সে-ই দেখাশোনা করত। নীলমাধবের একমাত্র ছেলে বিলেতে থাকে, আর কেউ নেই। অসুখ হলে লোকটা ডাক্তার ডাকতেন না, নিজেই হোমিয়োপ্যাথির বাক্স নিয়ে বসতেন। বাজার করতেন নিজের হাতে। যত সস্তা জিনিস এনে রান্না করে খেতেন। বাগানে কাশীর পেয়ারা, সফেদা, আঁশফল বা জামরুল পাড়তে বাচ্চা-কাচ্চা কেউ ঢুকলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। একটা সড়ালে কুকুর ছিল, ভারী তেজি, সেটাকেও লেলিয়ে দিতেন। ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করতেন বসে বসে। একটা বুড়ো হরিণ ছিল, সেটা বাগানে দড়ি-বাঁধা হয়ে চরে বেড়াত। নীলমাধব পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না তবে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে খুশি হতেন, অনেক পুরনো দিনের গল্প ফেঁদে বসতেন। এ অবশ্য নীলমাধবের পৈতৃক সম্পত্তি। নিঃসন্তান জ্যাঠা মারা গেলে দেখা যায় উইল করে তিনি নীলমাধবকেই সব দিয়ে গেছেন। লোকে বলে নীলমাধব এক তান্ত্রিকের সাহায্যে বাণ মেরে জ্যাঠাকে খুন করে সম্পত্তি পায়। লোকের ধারণা, নীলমাধব তাঁর স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এ সবই অবশ্য গুজব, কোনও প্রমাণ নেই। তবে কথা চলে আসছে।

সন্তু একবার নীলমাধবের হাতে ধরা পড়েছিল। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

চিরকালই জীবন্ত কোনও কিছু দেখলেই তাকে উত্ত্যক্ত করা সন্তুর স্বভাব, সে মানুষ বা জন্তু যা-ই হোক। তাদের একটা চাকর ছিল মহী। লোকটা চোখে বড় কম দেখত। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই সন্তু তাকে বরাবর—মহীদা, গাড়ি আসছে...এই বলে হাত ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিত। এবং মহী কয়েক বারই এভাবে বিপদে পড়েছে। সন্তু তাকে বার দুই নালার মধ্যেও ফেলে দেয়। এ রকমই ছিল তার স্বভাব। তখন সিংহীদের বাগানের বুড়ো হরিণটাকে সে প্রায়ই ঢিল মারত, সিংহীদের বাগানের ঘর-দেয়াল অনেক জায়গায় ভেঙে ফেটে গেছে। টপকানো সোজা। প্রায় দুপুরেই সন্তু দেয়াল টপকে আসত, বাগানে ঘুরত-টুরত, আর বাঁধা হরিণটাকে তাক করে গুলতি মারত। হরিণটার গায়ে চমৎকার কয়েকটা দাগ ছিল, সেই দাগগুলো লক্ষ্য করে গুলতি দিয়ে নিশানা অভ্যাস করত সে। আর তার লক্ষ্য ছিল, হরিণের কাজল-টানা চোখ। কখনও বা গাছের মতো দুটি প্রকাণ্ড শিংকেও লক্ষ্য করে ঢিল মারত সে। একবার হরিণটাকে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে বাগানের উত্তর দিকে একটা গহিন লতানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে দেয়।

সন্তু জানত না যে বুড়ো নীলমাধবের দূরবিন আছে। এবং প্রায়দিনই নীলমাধব দূরবিন দিয়ে তাকে খুঁজত। একটা দুষ্টু ছেলে যে হরিণকে ঢিল মারে সেটা তাঁর জানা ছিল। প্রিয় হরিণের গায়ে তিনি দাগ খুঁজে পেতেন।

হরিণকে লতাগাছে আটকে দেওয়ার পরদিনই সন্তু ধরা পড়ে। সন্তু রোজকার মতোই দুপুরে বাগানে ঢুকেছে, পকেটে গুলতি, চোখে শ্যেনদৃষ্টি। চার দিক রোদে খাঁ খাঁ করছে সিংহীবাগান। হরিণ চরছে। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গের ভিড়। শিরিষ গাছে একটা মৌচাক বাঁধছে মৌমাছিরা। বর্ষা তখনও পুরোপুরি আসেনি। চারধারে একপশলা বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরম।

সফেদা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সন্তু ফল দেখছিল। খয়েরি রঙের কী ফল ফলেছে গাছে। ভারে নুয়ে আছে গাছ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এক থোপা ফল ধরেও

ফেলেছিল সন্তু। সেই সময়ে পায়ের শব্দ পেল, আর খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক। তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তিন ধার থেকে তিনজন আসছে। এক দিক থেকে কুকুরটা, অন্য ধার থেকে চাকর, আর ঠিক সামনে একনলা বন্দুক হাতে নীলমাধব সিংহ। একটা লাফ দিয়ে সন্তু দৌড়েছিল। পারবে কেন? মস্ত সড়ালে কুকুরটাই তাকে পেল প্রথম। পায়ের ডিমে দাঁত বসিয়ে জন্তুটা ঘাসজঙ্গলে পেড়ে ফেলল তাকে। পা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কুকুরটা তার বুকের ওপর থাপ পেতে আধখানা শরীরের ভার দিয়ে চেপে রেখেছে। আর ধারালো ঘাসের টানে কেটে যাচ্ছে সন্তুর কানের চামড়া। ডলা ঘাসের অদ্ভুত গন্ধ আসছে নাকে। বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নীলমাধব বললেন, ওঠো। চাকরটা এসে ঘাড় চেপে ধরল। সন্তু কোনও কথাই বলতে পারছিল না।

বুড়ো নীলমাধব নিয়ে গেলেন সেই বিশাল বাড়ির ভিতরে। সেইখানে অত ভয়ভীতির মধ্যেও ভারী লজ্জা পেয়েছিল সন্তু দেয়ালে দেয়ালে সব প্রকাণ্ড মেমসাহেবের ন্যাংটো ছবি, আর বড় বড় উঁচু টুলে ওইরকমই ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথরের মূর্তি দেখে।

সব শেষে একটা হলঘর। সেইখানে এনে দাঁড় করালেন নীলমাধব। মুখে কথা নেই। সিলিং থেকে একটা দড়ি টাঙানো, দড়ির নীচের দিকে ফাঁস, অন্য প্রান্তটা সিলিং-এর আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে কাছেই ঝুলছে।

নীলমাধব বললেন, তোমার ফাঁসি হবে।

এই বলে নীলমাধব দড়িটা টেনেটুনে দেখতে লাগলেন। চাকরটাকে বললেন একটা টুল আনতে। কুকুরটা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সন্তু বুঝল এইভাবেই ফাঁসি হয়। কিছু করার নেই।

গলায় সেই ফাঁস পরে টুলের ওপর ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকেছিল সন্তু। চোখের পাতা ফেলেনি। অন্য প্রান্তের দড়িটা ধরে থেকে সেই এক ঘণ্টা নীলমাধব বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাটা খুব খারাপ লাগেনি সন্তুর। নীলমাধবের পূর্বপুরুষ কীভাবে বাঘ ভালুক এবং মানুষ মারতেন তারই নানা কাহিনি! শেষ দিকটায় সন্তুর হাই উঠছিল। আর তাই দেখে নীলমাধব ভারী অবাক হয়েছিলেন।

যাই হোক, এক ঘণ্টা পর নীলমাধব তাকে টুল থেকে নামিয়ে একটা চাবুক দিয়ে গোটা কয় সপাং সপাং মারলেন। বললেন, ফের যদি বাগানে দেখি তো পুঁতে রাখব মাটির নীচে।

এই ঘটনার পর নীলমাধব বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা মারা যায়। সড়ালে কুকুরটাকে নিয়ে কেটে পড়ে চাকরটা। নীলমাধবের পেয়ারের হুলো বেড়ালটাই অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বড়লোকের বেড়াল বলেই কি না কে জানে, তার মেজাজ অন্য সব বেড়ালের চেয়ে অনেক কড়া ধাতের। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, গুন্ডামি কোনওটাই আটকাত না।

কে একজন রটাল, নীলমাধব মরে গিয়ে বেড়ালটায় ভর করে আছেন।

বিলেত থেকে কলকাঠি নেড়ে নীলমাধবের ছেলে কী করে যেন বাড়ি বিক্রি করে দিল। শোনা যাচ্ছে, এখানে শিগগির সব বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠবে।

তা সে উঠুক গে। গতবারের কথা বলে নিই আগে। হুলো গুন্ডা বেড়ালকে সিংহীদের বাগানে তক্কে তক্কে থেকে একদিন পাকড়াও করে সন্তু। ডাকাবুকো ছেলে। বেড়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে সেই বাড়িটায় ঢুকে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে ছাড়াবাড়ির জানালা টপকে ভিতরে ঢুকতেই ফাঁসির হলঘরে আসে। সিলিং থেকে দড়ি টাঙানোর সাধ্য নেই। সে চেষ্টাও করেনি সন্তু।

একটা মোটা ভারী চেয়ারে দড়িটা কপিকলের মতো লাগিয়ে বেড়ালটাকে অন্য প্রান্তে বেঁধে সে বলল, তোমার ফাঁসি হবে। বলেই দড়ি টেনে দিল।

এ সময়ে এক বজ্রগম্ভীর গলা বলল, না, হবে না।

চমকে উঠে চার দিকে তাকিয়ে দেখল সন্তু। হাতের দড়ি সেই ফাঁকে টেনে নিয়ে গলায় দড়ি সমেত গুন্ডা পালিয়ে যায়।

কাকে দেখেছিল সন্তু তা খুবই রহস্যময়। সন্তু কিছু মনে করতে পারে না। সে চমকে উঠে চার

দিকে চেয়ে দেখছিল, এ সময় কে তাকে মাথার পিছন দিকে ভারী কোনও কিছু দিয়ে মারে। সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধের পর নানক চৌধুরী এক অচেনা লোকের টেলিফোন পেয়ে সিংহীদের বাড়িতে লোকজন নিয়ে গিয়ে সন্তুকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর দিন সাতেক সন্তু ব্রেন-ফিবারে ভোগে। তারপর ভাল হয়ে যায়। এবং এ ঘটনার পর গুন্ডাকেও এ লোকালয়ে আর দেখা যায়নি। একটা বেড়ালের কথা কে-ই বা মনে রাখে!

সন্তুর কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অলক্ষে তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে। সিংহদের বাড়িতে যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে বাস্তবিক তার শত্রু নাও হতে পারে। তার বাবা নানক চৌধুরী মানুষটা খুবই নির্বিকার প্রকৃতির লোক। ঘটনার পর নানক চৌধুরী থানা-পুলিশ করেনি। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছে। সন্তুকেও তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। এমনকী কে একজন যে নিজের নাম গোপন রেখে টেলিফোন করেছিল তারও খোঁজ করবার চেষ্টা করেনি। নানক চৌধুরী লোকটা ওইরকমই, প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি আর নগদ টাকা আছে। বিবাহসূত্রে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও সম্পত্তি পেয়েছে কারণ বড়লোক শ্বশুরের ছেলে ছিল না, মাত্র দুটি মেয়ে। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নানক চৌধুরীর শালি, অর্থাৎ সন্তুর মাসির ছেলেপুলে নেই। বয়স অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে তার সন্তান-সম্ভাবনা নেই। সেই শালি সন্তুকে দত্তক চেয়ে রেখেছে। সন্তুর মাসি যদি অন্য কাউকে দত্তক না নেয় তবে তার সম্পত্তিও হয়তো একদিন সন্তুই পাবে। মাসি সন্তুকে বড় ভালবাসে। সন্তুও জানে একমাত্র মাসি ছাড়া তাকে আর কেউ নিখাদ ভালবাসে না। যেমন মা। মা কোনও দিন সন্তুর সঙ্গে তার বোনকে কোথাও বেড়াতে পাঠায় না বা একা খেলতে দেয় না। তার সন্দেহ, সন্তু ছোটবোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। বাবা সন্তুর প্রতি খুবই উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে পেটানো ছাড়া সন্তুর অস্তিত্বই নেই তার কাছে। লোকটা সারা দিনই লেখাপড়া নিয়ে আছে। বই ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

সন্তুর সঙ্গী-সাথী প্রায় কেউই নেই। তার কারণ, প্রথমত সন্তু বন্ধুবান্ধব বেশি বরদাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে কাউকেই খুব একটা ভালবাসতে পারে না। তৃতীয়ত, সে যে ধরনের দুষ্টুমি করে সে ধরনের দুষ্টুমি খুব খারাপ ছেলেরাও করতে সাহস পায় না। সন্তু তাই একা। দু'-চারজন সঙ্গী তার কাছে আসে বটে, কিন্তু কেউই খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

কাল সন্ধেবেলা কিন্তু জিমনাশিয়াম থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময়ে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুর বয়স বছর ষোলোর বেশি নয়। সন্তুদের ইস্কুলেই পড়ত, পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রিকশা চালায়। তবে রিকশা চালানো ছাড়া তার আরও কারবার আছে। স্টেশনে, বাজারে, লাইনের ধারে সে প্রায়ই চুরি-ছিনতাই করে। কখনও ক্যানিং বা বারুইপুর থেকে চাল নিয়ে এসে কালোবাজারে বেচে। এই বয়সেই সে মদ খায় এবং খুব হুল্লোড়বাজি করে। সন্তুর সঙ্গে তার খুব একটা খাতির কখনও ছিল না। কিন্তু দেখা হলে তারা দু'জনে দু'জনকে 'কী রে, কেমন আছিস রে' বলে।

কাল কালু একটু অন্য রকম ছিল। সন্তু ওকে দূর থেকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই বুঝল, কালু মদ খেয়েছে। রিকশায় প্যাডল মেরে গান গাইতে গাইতে আসছে। চোখ দুটো চকচকে। সন্তুকে দেখেই রিকশা থামিয়ে বলল, উঠে পড়।

সন্তু ভ্রু কুঁচকে বলল, কোথায় যাব?

ওঠ না। তোকে একটা জিনিস দেখাব, এইমাত্র দেখে এলাম।

কৌতূহলী সন্তু উঠে পড়ল। কালু রিকশা ঘুরিয়ে পালবাজার পার হয়ে এক জায়গায় নিয়ে গেল তাকে। রিকশার বাতিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল, আয়।

তারপর খানিক দূর তারা নির্জনে পথহীন জমি ভেঙে রেল লাইনে উঠে এল। সেখানে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তার দাগ। আর-একটু দূরেই একটা ছেলে পড়ে আছে।

কালু বলল, এই মার্ডারটা আমার চোখের সামনে হয়েছে!

ছেলেটা কে?

চিনি না। তবে মার্ডারটা কে করেছে তা বলতে পারি।

কে?

কালু খুব ওস্তাদি হেসে বলল, যে পাঁচশো টাকা দেবে তাকে বলব। তোকে বলব কেন?

তিন

সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ রেল লাইনের ওপর উঠে এল। এ জায়গাটা অন্ধকার। লোকজন এখন আর কেউ নেই। সুরেন খাঁড়া টর্চ জ্বেলে চারিদিকে ফেলে বলল, হল কী? এইখানেই তো ছিল!

গগনচাঁদ ঘামছিল। অপঘাতের মড়া দেখতে তার খুবই অনিচ্ছা। বলতে কী রেলের উঁচু জমিটুকু সে প্রায় চোখ বুজেই পার হয়ে এসেছে। সুরেনের কথা শুনে চোখ খুলে বলল, নেই?

দেখছি না।

এই কথা বলতেই সামনের অন্ধকার থেকে কে একজন বলল, এই তো একটু আগেই ধাঙড়রা নিয়ে গেছে, পুলিশ এসেছিল।

সুরেন টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলল মুখের ওপর। লাইনের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করেছে কুলিরা। লাইন মেরামত হবে। সেই একটা গিটঠি পাথরের স্তূপের ওপর কালু বসে আছে।

সুরেন খাঁড়া বলে, তুই এখানে কী করছিস?

হাওয়া খাচ্ছি।— কালু উদাস উত্তর দেয়।

কখন নিয়ে গেল?

একটু আগে। ঘণ্টা দুয়েক হবে।

পুলিশ কিছু বলল?— সুরেন জিজ্ঞেস করে।

ফের টর্চটা জ্বালতেই দেখা গেল, কালুর পা লম্বা হয়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এসেছে। ভূতের পায়ের মতো, খুব রোগা পা। আর পায়ের পাতার কাছেই একটা দিশি মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙা।

কালু একটু নড়ে উঠে বলে, পুলিশ কিছু বলেনি। পুলিশ কখনও কিছু বলে না। কিন্তু আমি সব জানি।

কী জানিস?

কালু মাতাল গলায় একটু হেসে বলে, সব জানি।

সুরেন খাঁড়া একটু হেসে বলে, হাওয়া খাচ্ছিস, না আর কিছু?

কালু তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে, যা পাই খেয়ে দিই। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই আরাম। জায়গাটা ভরাট রাখা নিয়ে হচ্ছে কথা।

ইঃ, মস্ত ফিলজফার!

কালু ফের মাতাল গলায় হাসে।

পুলিশকে তুই কিছু বলেছিস?— সুরেন জিজ্ঞেস করে।

না। আমাকে কিছু তো জিজ্ঞেস করেনি। বলতে যাব কোন দুঃখে?

জিজ্ঞেস করলে কী বলতিস?

কী জানি!

শালা মাতাল!— সুরেন বলে।

মাথা নেড়ে কালু বলে, জাতে মাতাল হলে কী হয়, তালে ঠিক আছে সব। সব জানি।

ছেলেটা কে জানিস?

আগে জানতাম না। একটু আগে জানতে পারলাম।

কে?

বলব কেন? যে ছেলেটাকে খুন করেছে তাকেও জানি।

খুন!— একটু অবাক হয় সুরেন, খুন কী রে? সবাই বলছে রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মরেছে!

মাথা নেড়ে কালু বলে, সন্ধের আগে এইখানে খুন হয়। আমি নিজে চোখে দেখেছি। মাথায় প্রথমে ডান্ডা মারে, তখন ছেলেটা পড়ে যায়। তারপর গলায় কাপড় জড়িয়ে গলা টিপে মারে। আমি দেখেছি।

কে মারল?

বলব কেন? পাঁচশো টাকা পেলে বলব।

পুলিশ যখন ধরে নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে কথা বার করবে তখন কী করবি?

বলব না। যে খুন করেছে সে পাঁচশো টাকা দেয় তো কিছুতেই বলব না।

ঠিক জানিস তুই?

জানাজানি কী! দেখেছি।

বলবি না?

না।

গগনচাঁদ এতক্ষণ কথা বলেনি। এইখানে একটা মৃত্যু ঘটেছে, এই ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল, খুনের খবর চেপে রাখিস না। তোর বিপদ হবে।

আমার বিপদ আবার কী! আমি তো কিছু করিনি।— কালু বলল।

দেখেছিস তো!— সুরেন খাঁড়া বলে।

দেখলে কী?

দেখলে বলে দিতে হয়। খুনের খবর চাপতে নেই।— সুরেন নরম সুরে বলে।

কালু একটা হাই তুলে বলে, তা হলে দেখিনি।

শালা মাতাল!— সুরেন হেসে গগনচাঁদের দিকে তাকায়।

কালু একটু কর্কশ স্বরে বলে, বারবার মাতাল বলবেন না। সব শালাই মাল টানে আপনিও টানেন।

সুরেন একটা অস্ফুট শব্দ করল। ইদানীং সে বড় একটা হাঙ্গামা-হুজ্জত করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ গগনচাঁদ বাধা দেওয়ার আগেই অন্ধকারে দশাসই শরীরটা নিয়ে দুই লাফে এগিয়ে গেল। আলগা নুড়ি পাথর খসে গেল পায়ের তলায়। ঠাস করে একটা প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। কালু এক বার 'আউ' করে চেঁচিয়ে চুপ করে গেল। আলগা পাথরে পা হড়কে সুরেন পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কালুকে দেখা যাচ্ছিল না তবে সে-ও পড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। এই সময়ে কাছেই একটা বাজ ফেটে পড়ল। বাতাস এল এলোমেলো। বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় করে পড়ছে।

সুরেন টর্চটা জ্বালতে গিয়ে দেখে, আলো জ্বলছে না। একটা কাতর শব্দ আসে পাথরের স্তূপের ওধার থেকে। সুরেন একটা মাঝারি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। বলে, শালা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

কাতর শব্দটা থেমে যায়।

গগনচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ পায় সে। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। খুব দুর্যোগ আসবে। গ্যারাজঘরের অবস্থাটা কী হবে, ভাবছিল সে। বৃষ্টিতে তার বড় বিপদ।

সুরেন দাঁড়িয়ে নিজের ডান হাতের কনুইটা টিপে টিপে অনুভব করছে। বলে, শালা জোর লেগেছে। রক্ত পড়ছে।

আবার বিদ্যুৎ চমকায়। আবার। গগনচাঁদ দেখতে পায়, কালু লাইনের ধারে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা রেল লাইনের ওপরে পাতা। মুহুর্মুহু গাড়ি যায়। যে-কোনও মুহূর্তে ওর ডান হাতটা দু' ফালা করে বেরিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই খুব ক্ষীণ হলুদ একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর। বহু দূরে অন্ধকারের কপালে টিপের মতো একটা গোল হলুদ আলো স্থির হয়ে আছে। গাড়ি আসছে।

গগনচাঁদ কিছু ধীর-স্থির। টপ করে কোনও কাজ করে ফেলতে পারে না। সময় লাগে। এমনকী ভাবনা-চিন্তাতেও সে বড় ধীর। কখন কী করতে হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে।

তাই সে গাড়ির আলো দেখল, কালুর কথা ভাবল, কী করতে হবে তাও ভাবল! এভাবে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় কাটিয়ে সে ধীরে-সুস্থে পাথরের স্তূপটা পার হয়ে এল। গাড়িটা আর খুব দূরে নেই। সে নিচু হয়ে পাঁজাকোলা করে কালুকে সরিয়ে আনল লাইন থেকে খানিকটা দূরে। একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা গেছে লাইন ঘেঁষে। এখানে ঘাসজমি কিছু পরিষ্কার। সেখানে শুইয়ে দিল। এবং টের পেল মুষলধারে বৃষ্টির তোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চার দিকে। সব অস্পষ্ট। তাপদগ্ধ মাটি ভিজে এক রকম তাপ উঠেও চার দিকে অন্ধকার করে দিচ্ছে।

সুরেন খাঁড়া বলল, ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। চলো।

গগনচাঁদ কালুর বুক দেখল। এত বৃষ্টিতে বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় না। নাড়ি দেখল। নাড়ি চালু আছে।

গগনচাঁদ বৃষ্টির শব্দের ওপর গলা তুলে বলল, জ্ঞান নেই। এ অবস্থায় ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

প্রায় নিঃশব্দে বৈদ্যুতিক ট্রেনটা এল। চলে গেল। আবার দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। সুরেনের খেয়াল হল, গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়ে গেল। কালুর হাতটা ছিল আপ লাইনের ওপর। এ গাড়িটায় কালুর হাত কাটা যেত না।

সুরেনের গলায় এখনও রাগ। বলল, পড়ে থাক। অনেক দিন শালার খুব বাড় দেখছি। চলো, কাকভেজা হয়ে গেলাম।

গগনচাঁদ দেখল, বৃষ্টির জল পড়ায় কালু নড়াচড়া করছে। গগন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, তুমি যাও, স্টেশনের শেডের তলায় দাঁড়াও গিয়ে। আমি আর-একটু দেখে যাচ্ছি।

মাটি ফুঁড়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে যাচ্ছে এত তোড়। কোনও মানুষই দাঁড়াতে পারে না। চামড়া ফেটে যায়। সুরেন একটা বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, দেরি কোরো না।

বলে কোলকুঁজো হয়ে দৌড় মারল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় কালুর মাথার অন্ধকার কেটে গেছে। গগনচাঁদ অন্ধকারেই তাকে ঠাহর করে বগলের তলায় হাত দিয়ে তুলে বসাল। কালু বসে ফোঁপাচ্ছে।

গগন কালুর মুখ দেখতে পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া। গগন বলল, ওঠ!

কালু উঠল।

অল্প দূরেই একটা না-হওয়া বাড়ি! ভাড়া বাঁধা হয়েছে। একতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন দোতলা উঠছে। পিছল পথ বেয়ে কালুকে ধরে সেখানেই নিয়ে এল গগনচাঁদ।

গা মুছবার কিছু নেই। সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। গগন গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে মাথা আর মুখ মুছল। কালু উবু হয়ে বসে বমি করছে, একবার তাকিয়ে দেখল গগন। বমি করে নিজেই উঠে গিয়ে বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে কোষে ধরে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল।

তারপর ফের মেঝেয় বসে পড়ে বলল, শরীরে কি কিছু আছে নাকি! মাল খেয়ে আর গাঁজা টেনে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

গগনচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বলল, তোর রিকশা কোথায়?

সে আজ মাতু চালাচ্ছে। আমি ছুটি নিয়েছি আজকের দিনটা।

কেন?

মনে করেছিলাম আজ পাঁচশো টাকা পাব।

গগন চুপ করে থাকে। কালুটা বোকা। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

গগন বললে, যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এখানকার নয়?

কালু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেজা গায়ে বসে ছিল। প্রথমটায় উত্তর দিল না। তারপর বলল, বিড়ি-টিড়ি আছে?

আমি তো খাই না।

কালু ট্যাঁক হাতড়ে বলল, আমার ছিল। কিন্তু সব ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে।

ভেজা বিড়ি বের করে কালু অন্ধকারেই টিপে দেখল, ম্যাচিস থেকে এক কোষ জল বেরোল। সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা অস্পষ্ট খিস্তি করে কালু বলে, সুরেন শালার খুব তেল হয়েছে গগনদা, জানলে?

গগন অন্ধকারে কালুর দিকে চাইল। তেল কালুরও হয়েছে। আজকাল সকলেরই খুব তেল।

গগন বলল, ছেলেটা কি এখানকার?

কোন ছেলেটা?

যে খুন হল?

সে-সব বলতে পারব না।

কেন?

বলা বারণ।— কালু উদাস গলায় বলে।

গগনচাঁদ একটু চুপ করে থেকে একটা মিথ্যে কথা বলল, শোন একটু আগে সুরেন যখন তোকে মেরেছিল, তখন তুই অজ্ঞান হয়ে গেলি। তোর ডান হাতটা রেল লাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময় গাড়ি আসছিল। আমি তোকে সরিয়ে না আনলে ঠিক তোর হাতটা চলে যেত আজ।

কালু নড়ল না। কেবল বলল, মাইরি।

তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

কালু হঠাৎ আবার উদাস হয়ে গিয়ে বলল, তাতে কী হয়েছে? তুমি না সরালে একটা হাত চলে যেত। তা যেত তো যেত। এক-আধটা হাত-পা গেলেই কী থাকলেই কী!

গগনচাঁদ একটা রাগ চেপে গিয়ে বলল, দূর ব্যাটা, হাত-কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতিস তা হলে! রিকশা চালাত কে?

চালাতাম না। ভিক্ষে করে খেতাম। ভিক্ষেই ভাল, জানলে গগনদা। তোমাদের এলাকার রাস্তাঘাট যা তাতে রিকশা টানতে জান বেরিয়ে যায়। পোষায় না। শরীরেও কিছু নেই।

কথাটা বলবি না তা হলে?

কালু একটু চুপ করে থেকে বলল, পাঁচটা টাকা দাও।

গগন একটু অবাক হয়ে বলে, টাকা! টাকা কেন?

নইলে বলব না।

গগন একটু হেসে বলে, খুব টাকা চিনেছিস! কিন্তু এটা এমন কিছু খবর নয় রে। পুলিশের কাছে গেলেই জানা যায়।

তাই যাও না।

গগনেরও ইচ্ছে হয় এগিয়ে গিয়ে কালুর গলাটা টিপে ধরে। সুরেন যে ওকে মেরেছে সে কথা মনে করে গগন খুশিই হল। বলল, টাকা অত সস্তা নয়।

অনেকের কাছে সস্তা।

গগন মাথা নেড়ে বলে, তা বটে। কিন্তু আমার টাকা দামি।

কালু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, দিয়ো না।

গগন একটু ভেবে বলে, কিন্তু যদি পুলিশকে বলে দিই?

কী বলবে?

বলব খুনটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস।

বলো গে না, কে আটকাচ্ছে?

পুলিশ নিয়ে গিয়ে তোকে বাঁশডলা দেবে!

দিক।— কালু নির্বিকারভাবে বলে, এত ভয় দেখাচ্ছ কেন? যে মরেছে আর যে মেরেছে তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী? যে যার নিজের ধান্দায় কেটে পড়ো তো। কেবল তখন থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছ, তোমাদের এত খতেনে দরকার কী?

গগনচাঁদ ভেবে দেখল, সত্যিই তো। তার তো কিছু যায়-আসে না। কে কাকে খুন করেছে তাতে তার কী? সুরেন খাঁড়া এই ভরসন্ধ্যাবেলা তাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে না আনলে সে মড়া দেখতে আসতও না। যে মরল সে বিষয়ে একটা কৌতূহল ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। বিশেষত যখন শুনেছে যে মরা ছেলেটার শরীরটা কসরত করা। ভাল শরীরওয়ালা একটা ছেলে মরে গেছে শুনে মনটা খারাপ লাগে। কত কষ্টে এক-একটা শরীর বানাতে হয়। সেই আদরের শরীর কাটা-ছেঁড়া হয়ে যাবে! ভাবতে কেমন লাগে?

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনও অবিরল পড়ছে। আধখ্যাঁচড়া বাড়িটার জানালা-দরজার পাল্লা বসেনি, ফাঁক-ফোকরগুলি দিয়ে জলকণা উড়ে আসছে। বাতাস বেজায়। শীত ধরিয়ে দিল। এধার-ওধার বিস্তর বালি, নুড়িপাথর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিছু লোহার শিকও। একটা লোক ছাতা মাথায়, টর্চ হাতে উঠে এল রাস্তা থেকে। ছাতা বন্ধ করে টর্চটা এক বার ঘুরিয়ে ফেলল গগনচাঁদের দিকে, অন্যবার কালুর দিকে। একহাতে বাজারের থলি। গলাখাঁকারি দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘরের দরজায় টিনের অস্থায়ী ঝাঁপ লাগানো। লোকটা ঝাঁপের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। চৌকিদার হবে।

কালু উঠে বলল, দেখি, লোকটার কাছে একটা বিড়ি পাই কি না, বড্ড শীত ধরিয়ে দিচ্ছে!

কালু গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বলল, সুরেন শালা জোর মেরেছে, জানলে গগনদা? চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে, বিড়ি টানতে টের পেলাম। বসে বসে খায় তো সুরেন, তাই গা-গতরে খাসি, আমাদের মতো রিকশা টানলে গতরে তেল জমতে পারত না।

গগন গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ।

হঠাৎ উবু হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে টানতেই বোধহয় কালুর মেজাজটা ভাল হয়ে গেল। বলল, যে ছেলেটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চেনো গগনদা!

গগন বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ভাবসাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। স্টেশনে সুরেন অপেক্ষা করছে। যাওয়া দরকার। কালুর কথা শুনে বলল, চিনি?

হুঁ।

কে রে?

এক বান্ডিল বিড়ি কেনার পয়সা দেবে তো? আর একটা ম্যাচিস?

গগন হেসে বলে, খবরটার জন্য দেব না।

দিয়ো মাইরি।— কালু মিনতি করে, আজকের রোজগারটা এমনিতেই গেছে। বিড়ি আর ম্যাচিসও গচ্চা গেল।

গগন বলল, দেব।

কালু বলল, আগে দাও।

গগন দিল।

কালু বলে, ছেলেটা বেগমের ছেলে।

বেগম কে?

তোমার বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের শালি। নষ্ট মেয়েছেলে, বাপুজি নগরে থাকে।

ও।— বলে খানিকটা চমকে ওঠে গগন।

ছেলেটা তোমার আখড়ায় ব্যায়াম করত। সবাই ফলি বলে ডাকে। লোকে বলে, ও নাকি নরেশ মজুমদারেরই ছেলে।

জানি। এ সব কথা চাপা দেওয়ার জন্যই গগন তাড়াতাড়ি বলে, আর কী জানিস?

তেমন কিছু না। ছেলেটা বহুকাল হল পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। খুব পাজি বদমাশ ছেলে। ইদানীং ট্যাবলেট বেচতে আসত।

ট্যাবলেট! অবাক মানে গগন।

ট্যাবলেট, যা খেলে নেশা হয়! প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় খাওয়াত ছেলে-ছোকরাদের। তারপর নেশা জমে উঠলে পয়সা নিত। অনেককে নেশা ধরিয়েছে।

ড্রাগ নাকি?— গগন জিজ্ঞেস করে।

কী জানি কী! শুনেছি খুব সাংঘাতিক নেশা হয়।

গগন বলল, এ পাড়ায় যাতায়াত ছিল তো, ওকে কেউ চিনতে পারল না কেন?

কালু হেসে বলল, দিনমানে আসত না। রাতে আসত। তা ছাড়া অনেক দিন পাড়া ছেড়ে গেছে, কে আর মনে রাখে! আর চিনতে চায় ক'জন বলো! সবাই চিনি না চিনি না বলে এড়িয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট তো।

নরেশ মজুমদার খবর করেনি?

কে জানে? জানলে আসত ঠিকই, নিজের সন্তান তো। বোধহয় খুব ভাল করে খবর পায়নি।

বৃষ্টি ধরে এল। এখনও টিপটিপিয়ে পড়ছে। এই টিপটিপানিটা সহজে থামবে না, লাগাতার চলবে। রাতের দিকে ফের ঝেঁপে আসবে হয়তো।

গগন গলা নামিয়ে বলল, সত্যিই খুন হতে দেখেছিস? না কি গুল ঝাড়ছিস?

কালু হাতের একটা ঝাপট মেরে বলে, শুধু শুধু গল্প ফেঁদে লাভ কী! আমার মাথায় অত গল্প খেলে না!

ছেলেটাকে তুই চিনলি কী করে?— গগন জিজ্ঞেস করে।

কোন ছেলেটাকে?

যে খুন হয়েছে, ফলি।

প্রথমটায় চিনতে পারিনি। এক কেতরে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, একটু চেনা-চেনা লাগছিল বটে। পুলিশ যখন ধাঙড় এনে বডি চিত করল তখনই চিনতে পারলাম। নামটা অবশ্য ধরতে পারিনি তখনও। পুলিশের একটা লোকই তখন বলল, এ তো ফলি, অ্যাবসকন্ডার। তখন ঝড়াক করে সব মনে পড়ে গেল। ইদানীং নেশা-ভাং করে মাথাটাও গেছে আমার, সব মনে রাখতে পারি না।

গগন খুব ভেবে বলল, খুনের ব্যাপারটাও মনে না-রাখলে ভাল করতিস। যে খুন করেছে সে যদি টের পায় যে তুই সাক্ষী আছিস, তা হলে তোকে ধরবে!

ধরুক না। তাই তো চাইছি! পাঁচ কানে কথাটা তুলেছি কেন জানো? যাতে খুনির কাছে খবর পৌঁছয়!

পৌঁছলে কী হবে?

পাঁচশো টাকা পাব, আর খবরটা চেপে যাব।

ব্ল্যাকমেল করবি কালু?

কালু হাই তুলে বলে, আমি অত ইংরিজি জানি না।

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে, সাবধানে থাকিস।

কালু বলল, ফলিকে তুমি চিনতে পারলে?

গগন মাথা নেড়ে বলে, চিনেছি। আমার কাছে কিছুদিন ব্যায়াম শিখেছিল। লেগে থাকলে ভাল শরীর হত।

শরীর!— বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে কালু। বলে, শরীর দিয়ে কী হয় গগনদা? অত বড় চেহারা নিয়েও তো কিছু করতে পারল না। এক ঘা ডান্ডা খেয়ে ঢলে পড়ল। তারপর গলা টিপে...ফুঃ!

গগন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। তার মাথার মধ্যে বেগম শব্দটা ঘুরছিল। শোভারানির বোন বেগম। খুব সুন্দর না হলেও বেগমের চেহারায় কী যেন একটা আছে যা পুরুষকে টানে। এখন বেগমের বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারা এখনও চমৎকার যুবতীর মতো। শোনা যায় স্বামী আছে। কিন্তু সেই স্বামী বড় হাবাগোবা মানুষ। কোন একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি করে। বেগম তাকে ট্যাকে গুঁজে রাখে। আসলে বেগমের যে একজন স্বামী আছে এ খোঁজই অনেকে পায় না। তার বাইরের ঘরে অনেক ছোকরা ভদ্রলোক এসে সন্ধেবেলায় আড্ডা বসায়, তাসটাস খেলে, নেশার জিনিসও থাকে। লোকে বলে, ওইটেই বেগমের আসল ব্যাবসা। আড্ডার নলচে আড়াল করে সে ফুর্তির ব্যাবসা করে। তা বেগম থাকেও ভাল। দামি জামা-কাপড়, মূল্যবান গৃহসজ্জা, চাকর-বাকর, দাস-দাসী তো আছেই, ইদানীং একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড বিলিতি গাড়িও হয়েছে।

কয়েক বছর আগে নিঃসন্তান নরেশ আর শোভা বেগমের ছেলেকে পালবে পুষবে বলে নিয়ে আসে। বেগমও আপত্তি করেনি। তার যা ব্যবসা তাতে ছেলেপুলে কাছে থাকলে বড় ব্যাঘাত হয়। তাই ছোট্ট ফলিকে এনে তুলল নরেশ মজুমদার। লোকে বলাবলি করল যে, নরেশ আসলে নিজের জায়গা মতো নিয়ে এসেছে। হতেও পারে। বেগমের স্বামীর পৌরুষ সম্পর্কে কারওরই খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই।

ফলিকে এনে নরেশ ভাল ইস্কুলে ভরতি করে দেয়। ছেলেটার খেলাধুলোর প্রতি টান ছিল, তাই একদিন নরেশ তাকে গগনচাঁদের আখড়াতেও ভরতি করে দিল। কিছু ছেলে থাকে, যাদের শরীরের গঠনটাই চমৎকার। এ সব ছেলে অল্প কসরত করলেই শরীরের গুপ্ত এবং অপুষ্ট পেশিগুলি বেরিয়ে আসে। নিখুঁত শরীরের খুব অভাব দেশে। গগনচাঁদ তার ব্যায়ামের শিক্ষকতার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম মজবুত হাড় আর সুষম কাঠামোর শরীর পেল। এক নজর দেখেই গগনচাঁদ বলে দিয়েছিল, যদি খাটো তো তুমি একদিন মিস্টার ইউনিভার্স হবে।

তা হতও বোধহয় ফলি। কিছুকাল গগনচাঁদ তাকে যোগব্যায়াম আর ফ্রি-হ্যান্ড করায়। খুব ভোরে উঠে সে নিজে কেডস আর হাফপ্যান্ট পরে ফলিকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ত। পুরো চত্বরটা ঘুরে ঘুরে গায়ের ঘাম ঝরাত। তারপর ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আসন করাত। বিকেলে ফ্রি-হ্যান্ড। ফলি খানিকটা তৈরি হয়ে উঠতেই তাকে অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়েছিল গগন। খুব কড়া নজর রাখত, যাতে ফলির শরীরে কোনও পেশি শক্ত না হয়ে যায়। যাতে বাড় না বন্ধ হয়। ফলি নিজেও খাটত। আশ্চর্যের বিষয়, কসরত করা ছেলেদের মাথা মোটা হয়, প্রায়ই বুদ্ধি বা লেখাপড়ার দিকে খাঁকতি থাকে। মনটা হয় শরীরমুখী। ফলির সে রকম ছিল না। সে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। খরবুদ্ধি ছিল তার।

শোভারানি অবশ্য খুব সন্তুষ্ট ছিল না। প্রায়ই ওপরতলা থেকে তার গলা পাওয়া যেত, নরেশকে বকাবকি করছে, ওই গুন্ডাটার সঙ্গে থেকে ফলিটা গুন্ডা তৈরি হবে। কেন তুমি ওকে ওই গুন্ডার কাছে দিয়েছ?

ফলির শরীর সদ্য তৈরি হয়ে আসছিল। কত আর বয়স হবে তখন, বড়জোর ষোলো! বিশাল সুন্দর দেখনসই চেহারা নিয়ে পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াত তখন পাঁচজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত। আর সেইটেই ফলির কাল হল। সেই সময়ে সে পড়ল মেয়েছেলের পাল্লায়। প্রথমে গার্লস স্কুলের পথে একটি মেয়ে তাকে দেখে প্রেমে পড়ে। সেটার গর্দিশ কাটবার আগেই মুনশিবাড়ির বড় মেয়ে, যাকে স্বামী নেয় না, বয়সেও সে ফলির চেয়ে অন্তত চোদ্দো বছরের বড়, সেই মেয়েটা ফলিকে পটিয়ে নিল। সেখানেই শেষ নয়। এ বাড়ির ছোট বউ, সে বাড়ির ধুমসি মেয়ে, এ রকম ডজনখানেক মেয়েছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলি, মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই। সম্পর্কটা শারীরিক ছিল, কারণ অত মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে বস্তু থাকে না, প্রেম ইত্যাদি ভাবপ্রবণতার ব্যাপারকে ফক্কিকারি বলে মনে হয়।

গগনচাঁদ মেয়েছেলের ব্যাপারে কিছু বিরক্ত ছিল। সে নিজে মেয়েছেলের সঙ্গ পছন্দ করত না। মেয়েছেলে বড় নির্বোধ আর ঝগড়াটে জাত, এই ছিল গগনের ধারণা। এমন নয় যে তার কামবোধ বা মেয়েদের প্রতি লোভ নেই। সেসবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সারা দিন ধরে মেলামেশা এবং মেয়ে-শরীরের অতিরিক্ত সংস্পর্শ তার পছন্দ নয়। উপরন্তু তার কিছু নীতিবোধ এবং ধর্মভয়ও কাজ করে। প্রথমটায় যদিও ফলিকে এ নিয়ে কিছু বলেনি গগন। কিন্তু অবশেষে সেন্ট্রাল রোডের একটি কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর গগন আর থাকতে পারেনি। মেয়েটার দাদা আর এক প্রেমিক এ নিয়ে খুব তড়পায়। কিন্তু ফলিকে সরাসরি কিছু করার সাধ্য ছিল না। কারণ ফলির তখন একটা দল হয়েছে, উপরন্তু তার মাসি আর মেসোর টাকার জোর আছে। তাই সেই দাদা আর প্রেমিক দু'জনে এসে একদিন গগনকে ধরল। দাদার ইচ্ছে, ফলি মেয়েটিকে বিয়ে করে ঝামেলা মিটিয়ে দিক। আর প্রেমিকটির ইচ্ছে, ফলিকে আড়ংধোলাই দেওয়া হোক বা খুন করা হোক বা পুলিশের হাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু গগন ফলির অভিভাবক নয়। সে ফলিকে শাসন করার ক্ষমতাও রাখে না। সে মাত্র ব্যায়াম-শিক্ষক। তবু ফলিকে ডেকে গগন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ফলির গগনের প্রতি কিছু আনুগত্য ও ভালবাসা ছিল তখনও। কারণ গগন বাস্তবিক ফলিকে ভালবাসত। আর ভালবাসা জিনিসটা কে না টের পায়! কিন্তু ফলিরও কিছু ছিল না। মেয়েছেলেরা তার জন্য পাগল হলে সে কী-ই বা করতে পারে! যত মেয়ে তার সংস্পর্শে আসে সবাইকে তো একার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করাও কি ঠিক? এ সব কথা ফলি খোলসা করেই গগনকে বলেছিল।

গগন বুঝল এবং সে রাতারাতি ফলিকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ফলি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। তার ফলে শোভারানি গগনের শ্রাদ্ধ করল কিছুদিন। তার ধারণা, গগনই ফলিকে গুম করেছে। সেটা সত্যি না হলেও ফলির পালানোর পিছনে গগনের যে হাত ছিল তা মিথ্যে নয়। ফলি চলে যাওয়ায় পাড়া শান্ত হল। সেই কিশোরীটির পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিয়ে লোকলজ্জার ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল। যেসব মেয়ে বা মহিলা ফলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা কিছু মুষড়ে পড়ল। তবে অনেক স্বামী এবং অভিভাবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

ফলি কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে সে বেগম অর্থাৎ মায়ের আশ্রয়ে আর যায়নি। কেননা সেখানে গেলেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে লোকে বলে যে বেগমের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলত।

কিন্তু গগন আজ এই ভেবেই খুব বিস্ময়বোধ করছিল যে, ফলির মতো বিখ্যাত ছেলের মৃতদেহ দেখেও কেন কেউ শনাক্ত করতে পারল না! ঠিক কথা যে, ফলি বহু দিন হল এ এলাকা ছেড়ে গেছে, তবু তাকে না চিনবার কথা নয়। বিশেষত সুরেন খাঁড়ার তো নয়ই।

রেল লাইন ধরে হেঁটে এসে গগনচাঁদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। প্ল্যাটফর্মটা এখন প্রায় ফাঁকা। বুকিং অফিসের সামনে ফলওয়ালা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন সিগারেট টানছে। গগন কিছু অবাক হল। সুরেন খাঁড়া বড় একটা ধূমপান করে না।

তাকে দেখেই সুরেন এগিয়ে এসে বলল, কী হল?

গগন কিছু বিস্মিতভাবেই বলে, তুমি ফলিকে চিনতে পারোনি?

ফলি। কোন ফলি? কার কথা বলছ?

যে ছেলেটা মারা গেছে। আমাদের নরেশ মজুমদারের শালির ছেলে।

সুরেন একটু চুপ করে থেকে বলে, বেগমের সেই লুচ্চা ছেলেটা?

সে-ই। তোমার তো চেনা উচিত ছিল। তা ছাড়া তুমি যে বয়স বলেছিলে, ফলির বয়স তা নয়। কম করেও উনিশ-কুড়ি বা কিছু বেশিই হতে পারে।

সুরেন গম্ভীরভাবে বলল, চেনা কি সোজা? এই লম্বা চুল, মস্ত গোঁফ, মস্ত জুলপি, তা ছাড়া বহুকাল আগে দেখেছি, মনে ছিল না। তবে চেনা-চেনা ঠেকছিল বটে, তাই তো তোমাকে ধরে আনলাম। ও যে ফলি তা জানলে কী করে!

কালুর কাছ থেকে বের করলাম। বিড়ি-দেশলাইয়ের পয়সা দিতে হয়েছে।

সুরেন একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল, ব্যাটা বেঁচে আছে এখনও? থাপ্পড়টা তা হলে তেমন লাগেনি।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অত জোরে মারা তোমার উচিত হয়নি সুরেন। ওরা সব ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, জীবনশক্তি কম, বেমক্কা লাগলে হার্টফেল করতে পারে।

রাখো রাখো। বোতল বোতল বাংলা মদ সাফ করে গাঁজা টেনে রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আমার থাপ্পড়ে মরবে? এত সোজা নাকি! ওদের বেড়ালের জান।

গগনচাঁদ হেসে বলে, তুমি নিজের থাপ্পড়ের ওজনটা জানো না। সে যাক গে, কালু মরেনি। এখন দিব্যি উঠে বসেছে।

ভাল। মরলে ক্ষতি ছিল না।

গগন শুনে হাসল।

দু'জনে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে লাগল। কেউ কোনও কথা বলছে না।

চার

সন্তু একবার উঁকি মেরে তার বাবার ঘর দেখল। তার বাবা নানক চৌধুরী ইদানীং দাড়ি রাখছে। বড় পাগল লোক, কখন কী করে ঠিক নেই। এই হয়তো আধ হাত দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল হয়ে গেল। ফের একদিন গিয়ে দাড়ি কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে চলে এল। তবু নানক চৌধুরীকে নিয়ে কেউ বড় একটা হাসাহাসি করে না। সবাই সমঝে চলে। একে মহা পণ্ডিত লোক, তার ওপর রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ব্রজ দত্ত নামে মারকুট্টা ছেলেকেও একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল নানক চৌধুরী। কারণ ব্রজ দত্ত পাড়ার একটা পাগলা ল্যাংড়া লোককে ধরে মেরেছিল। সেই পাগলা আর ল্যাংড়া রমণী বোস নাকি বলে বেড়িয়েছিল যে ব্রজ দত্ত আর সাঙাতরা একরকম নেশা করে, তা মদের নয় কিন্তু মদের চেয়েও ঢের বেশি সাংঘাতিক।

সন্তু পরদা সরিয়ে উঁকি মেরে সাবধানে বাবাকে দেখে নেয়। ঘরটা অন্ধকার, কেবল টেবিল ল্যাম্পের ছোট্ট একটু আলো জ্বলছে, আর চৌধুরীর বড়সড় অন্ধকার ছায়ার শরীরটা ঝুঁকে আছে বইয়ের ওপর। পাড়ায় বোমা ফাটলেও নানক চৌধুরী এ সময়ে টের পায় না।

কালু আজ সন্তুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। কাল রাতে লাশ দেখে ফেরার পথে কালু বলেছিল, সন্তু, খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ভয় খাই যদি শালা খুনেটা জানতে পারে যে আমি দেখেছি, তো আমাকেও ফুটিয়ে দেবে। তাই তোকে সব বলব, কাল সিংহীদের বাগানে রাত আটটায় থাকবি।

সন্তু বলল, কাল কেন? আজই বল না!

কালু মাথা নেড়ে বলে, আজ নয়। আমি আগে ভেবে-টেবে ঠিক করি, মাথাটা ঠান্ডা হোক। আজ মাথাটা গোলমাল লাগছে।

সন্তু বলল, কত টাকা পাবি বললি?

পাঁচশো। তাতে ক'দিন ফুর্তি করা যাবে। রিকশা টানতে টানতে গতর ব্যথা। পাঁচশো টাকা পেলে পালবাজারে সবজির দোকানও দিতে পারি।

সন্তু ব্ল্যাকমেল ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই পরামর্শ দিল, পাঁচশো কেন? তুই এক হাজারও চাইতে পারিস।

দেবে না।

দেবে। খুনের কেস হলে আরও বেশি চাওয়া যায়।

দূর!— কালু ঠোঁট উলটে বলে, বেশি লোভ করলেই বিপদ। আজকাল আকছার খুন হয়। ক'জনকে ধরছে পুলিশ! আমাদের আশেপাশে অনেক খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মতো। খুনের কেসকে লোকে ভয় পায় না।

সন্তু কাল রাতে ভাল ঘুমোয়নি। বলতে কী সে কাল থেকে একটু অন্য রকম বোধ করছে। খুন সে কখনও দেখেনি বটে, কিন্তু বইতে খুনের ঘটনা পড়ে আর সিনেমায় খুন দেখে সে ইদানীং খুনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে। তার ওপর যদি সেই খুনের ঘটনার গোপন তথ্যের সঙ্গে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে তবে তো কথাই নেই।

রাত আটটা বাজতে চলল। দেয়াল-ঘড়িতে এখন পৌনে আটটা। এ সময়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। নানক চৌধুরী, তার বাবা, যাকে সে আড়ালে নানকু বলে উল্লেখ করে, সে যদি পায় তো একতরফা হাত চালাবে। নানক চৌধুরী ব্যায়ামবীর বা গুন্ডা-ষণ্ডাকে ভয় পায় না, তা ছেলের গায়ে হাত তুলতে তার আটকাবে কেন?

তবু যেতেই হবে। সেই ভয়ংকর গুপ্ত খবরটা কালু তাকে দিয়ে যাবে আজ।

সন্তু রবারসোলের জুতো পরে আর একটা দুই সেল টর্চবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিংহীদের বাড়ির বাগান ভাল জায়গা নয়। পোড়োবাড়ির মতো পড়ে আছে। সেখানে প্রচুর সাপখোপের আড্ডা।

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আজ মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। কাজেই সন্তু পড়ার ঘরের বাতিটা জ্বেলে একটা বই খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। মা যদি আসে তো ভাববে ছেলে পড়তে পড়তে উঠে বাথরুমে বা ছাদে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সন্তু রাস্তা পার হয়ে খানিক দূরে চলে আসে। সিংহীদের পাঁচিলটা কোথাও কোথাও ভাঙা। একটা ভাঙা জায়গা পেয়ে সন্তু অনায়াসে পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোয়। কালু এসে গেছে কি না দেখবার জন্য এধার-ওধার টর্চের আলো ফেলে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

শিরিষ গাছের তলায় এসে সন্তু দাঁড়ায়। দু'বার মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে অপেক্ষা করে। না, কালু এখনও আসেনি। বরং খবর পেয়ে মশারা আসতে শুরু করে ঝাঁক বেঁধে। হাঁটু, হাত, ঘাড় সব চুলকোনিতে জ্বালা ধরে যায়। সন্তু দু'-চারটে চড়চাপড় মেরে বসে গা চুলকোয়। কালু এখনও আসছে না।

চার দিক ভয়ংকর নির্জন আর নিস্তব্ধ। ওই প্রকাণ্ড পুরনো আর ভাঙা বাড়িটায় সন্তু গুন্ডাকে ফাঁসি দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মরেছে সিংহবুড়ো। তার ওপর গতকাল দেখা লাশটার কথাও মনে পড়ে তার। ছেলেটার বয়স বেশি নয়, একটা বেশ ভাল জামা ছিল গায়ে, আর একটা ভাল প্যান্ট। ছেলেটার চুল লম্বা ছিল, বড় জুলপি আর গোঁফ ছিল। ওইরকম বড় চুল আর জুলপি রাখার সাধ সন্তুর খুব হয়। কিন্তু তার বাবা নানক চৌধুরী সন্তুকে মাসান্তে এক বার পপুলার সেলুন ঘুরিয়ে আনে। সেখানকার চেনা নাপিত মাথা ক্রু-কাট করে দেয়।

সন্তুর যে ভয় করছিল তা নয়। তবে একটু ছমছমে ভাব। কী যেন একটা হবে। ঠিক বুঝতে পারছে না সন্তু, তবে মনে হচ্ছে অলক্ষে কে যেন একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি আস্তে করে দো-বোমার পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে। এখুনি জোর শব্দে একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ হবে।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে শব্দ ওঠে। সন্তু শিউরে উঠল। অবিকল নীলমাধবের সেই সড়ালে কুকুরটা যেমন জঙ্গল ভেঙে ধেয়ে আসত ঠিক তেমন শব্দ। সন্তুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। আকাশে মেঘ চেপে আছে। চার দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্তু কেবল প্যান্টের পকেট থেকে তার ছোট্ট ছুরিটা বের করে হাতে ধরে রইল। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল সে। হাত-পা ঠান্ডা মেরে আসছে, বুক কাঁপছে, তবু খুব ভয় সন্তু পায় না। পালানোর চিন্তাও সে করে না।

একটু বাদেই সে ছোট্ট কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো দেখতে পায়। রিকশার বাতি হাতে কালু আসছে। কিন্তু আসছে ঠিক বলা যায় না। কালু বাতিটা হাতে করে ভয়ংকর টলতে টলতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ মাতাল।

সন্তু টর্চটা জ্বেলে বলে, কালু, এদিকে।

কোন শালা রে!— কালু চেঁচাল।

আমি সন্তু।

কোন সন্তু?— বলে খুব খারাপ একটা খিস্তি দিল কালু।

সন্তু এগিয়ে কালুর হাত ধরে বলে, আস্তে। চেঁচালে লোক জেনে যাবে।

কালু বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলে, ওঃ, সন্তু!

হ্যাঁ।

আয়।

বলে কালু তার হাত ধরে টানতে টানতে পোড়ো বাড়ির বারান্দায় গিয়ে ওঠে। তারপর সটান মেঝেতে পড়ে গিয়ে বলে, আজ বেদম খেয়েছি মাইরি! নেশায় চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সন্তু পাশে বসে বলে, কী বলবি বলেছিলি?

কী বলব?— কালু ধমকে ওঠে।

বলেছিলি বলবি। সেই খুনের ব্যাপারটা।

কোন খুন? ফলির?

হ্যাঁ।

কালু হা হা করে হেসে বলে, আমি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি সন্তু, আর বলা যাবে না।

কে দিল?

যে খুনি সে।

লোকটা কে?

কালু ঝড়াক করে উঠে বসে বলে, তোকে বলব কেন?

বলবি না?

না। পাঁচশো টাকা কি ইয়ারকি মারতে নিয়েছি?

সন্তু খুব হতাশ হয়ে বলল, তুই বলেছিলি বলবি।

কালু মাথা নেড়ে বলে, পাঁচশো নগদ টাকা পেয়ে আজ অ্যাতো মাল খেয়েছি। আরও অনেক আছে, পালবাজারে সবজির দোকান দেব, নয়তো লন্ড্রি খুলব। দেখাবি?

বলে কালু তার জামার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে দেখায়। বলে, গোন তো, কত আছে। আমি বেহেড আছি এখন।

সন্তু গুনল। বাস্তবিক এখনও চারশো পঁচাশি টাকা আছে।

বলল, খুনি তোকে কিছু বলল না?

না! কী বলবে! বলল, কাউকে বলবি না, তা হলে তোকেও শেষ করে ফেলব।

পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল?

কালু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলে, দূর, পাঁচশো টাকা আর কী! এ রকম আরও কত ঝেঁকে নেব। সবে তো শুরু।

সন্তু উত্তেজিত হয়ে বলে, ব্ল্যাকমেল!

কালু চোখ ছোট করে বলে, আমি শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, আর তোমরা সব ভদ্রলোক, না?

ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয় রে। ব্ল্যাকমেল।

আমি ইংরিজি জানি না ভেবেছিস! রামগঙ্গা স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম ভুলে যাস না।

সন্তু এতক্ষণে হাসল। বলল, ব্ল্যাকমেল হল...

চুপ শালা। ফের কথা বলেছিস কি...

বলে কালু লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সন্তু কালুর হঠাৎ রাগ কেন বুঝতে না পেরে এক পা পেছিয়ে তেজি ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে বলল, এর আগে খিস্তি করেছিস, কিছু বলিনি। ফের গরম খাবি তো মুশকিল হবে।

কালু তার বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলল, আহা চাঁদু! গরম কে খাচ্ছে শুনি?

বলে ফের একটা নোংরা নর্দমার খিস্তি দেয়।

সন্তু হাত-পা নিশপিশ করে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করে আনে সে। বেশি বড় না হলেও, বোতাম টিপলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে আসে। সন্তুর এখনও পর্যন্ত এটা কোনও কাজে লাগেনি।

ফলাটা কেরোসিনের বাতিতেও লক-লক করে উঠল।

সন্তু বলল, দেব শালা ভরে।

দিবি?— কালু উঠে দাঁড়িয়ে পেটের ওপর থেকে জামাটা তুলে বলল, দে না!

বলে জিব ভেঙিয়ে দু' হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে।

সন্তুর মাথাটা গোলমেলে লাগছিল। গতবার সে একটা গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। শরীরের ভিতরটা আনচান করে ওঠে। সে একটা ঝটকায় কালুকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর উঠে বসে। তারপর সম্পূর্ণ অজান্তে ছুরিটা তোলে খুব উঁচুতে। তারপর বিদ্যুদ্‌বেগে হাতটা নেমে আসতে থাকে।

কালু কী কৌশল করল কে জানে! লহমায় সে শরীরের একটা মোচড় দিয়ে পাশ ফিরল। তারপর দুষ্টু ঘোড়া যেমন ঝাঁকি মেরে সওয়ারি ফেলে দেয় তেমনি সন্তুকে ঝেড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পাঁচ ইঞ্চি ফলাটা শানে লেগে ঠকাৎ করে পড়ে গেল।

কালু একটু দূরে গিয়ে ফের পড়ল। তারপর সব ভুলে ওয়াক তুলে বমি করল বারান্দা থেকে গলা বার করে।

বিস্মিত সন্তু বসে রইল হা করে! সর্বনাশ! আর-একটু হলেই সে কালুকে খুন করত! ভেবেই ভয়ংকর ভয় হয় সন্তুর।

কালু বমি করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে। মাথা লটপট করছে। অনেকক্ষণ দম নিয়ে পরে বলল, ছুরি চমকেছিস শালা, তুই মরবি।

সন্তু আস্তে করে বলে, তুই খিস্তি দিলি কেন?

কালুর কেরোসিনের বাতিটা এখনও মেঝের ওপর জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল, কালু হাসছে। একটা হাই তুলে বলে, ও সব আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাল দিলে কি গায়ে কারও ফোসকা পড়ে? আমাকেও তো কত লোক রোজ দু'বেলা গাল দেয়। তা বলে গগনদার মতো খুন করতে হবে নাকি।

সন্তু বিদ্যুৎ-স্পর্শে চমকে উঠল। গগনদা!

তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে টাকাটা কে দিয়েছে কালু?

বলব কেন?

আমি জানি। গগনদা।

দূর বে!

গগনদা খুন করেছে?

কালু মুখটা বেঁকিয়ে বলে, কোন শালা বলেছে?

তুই তো বললি।

কখন? নাঃ, আমি বলিনি।

সন্তু হেসে বলে, দাঁড়া, সবাইকে বলে দেব।

কী বলবি?

গগনদা তোকে টাকা দিয়েছে। গগনদা খুনি।

কালু প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুলে বুকটা চেপে ধরে বলে, টাকা! হ্যাঁ, টাকা গগনদা দিয়েছে। তবে গগনদা খুন করেনি!

সন্তু হেসে টর্চটা নিয়ে পিছু ফিরল। ধীরে-সুস্থে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে এল সে।

পাঁচ

অন্ধকার জিমনাশিয়ামে গগনচাঁদ বসে আছে। একা। অথর্বের মতো।

কিছুক্ষণ সে মেঘচাপা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের রং রক্তবর্ণ। কলকাতার আকাশে মেঘ থাকলে এ রকমই দেখায় রাত্রিবেলা।

এখন রাত অনেক। বোধহয় এগারোটা। কাল রাতে বৃষ্টির পর গ্যারাজ-ঘরটা জলে থইথই করছে। অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি জলে ডুবে আছে মেঝে। জলের ওপর ঘুরঘুরে পোকা ঘুরছে। কেঁচো আর শামুক বাইছে দেয়ালে। ও রকম ঘরে থাকতে আজ ইচ্ছে করছে না। মনটাও ভাল নেই।

অন্ধকার জিমনাশিয়ামের চারধারে এক বার তাকাল গগন। একটা মস্ত টিনের ঘর, চারধারে বেড়া। হাতের টর্চটা এক বার জ্বালল। সিলিং থেকে রিং ঝুলছে, অদূরে প্যারালাল বার, টানবার স্প্রিং, রোমান রিং, স্ল্যান্টিংবোর্ড কত কী! একজন দারোয়ান পাহারা দেয় দামি যন্ত্রপাতি। একটু আগে দারোয়ান এসে ঘুরে দেখে গেছে। মাস্টারজি মাঝে মাঝে এ রকম রাতে এসে বসে থাকে, দারোয়ান তা জানে। তবে গগনকে দেখে অবাক হয়নি। জিমনাশিয়ামের ছোট্ট উঠোনটার শেষে দারোয়ানের খুপরিতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। গগনের কাছে চাবি আছে, যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে যাবে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না গগনের। পচা জল, নর্দমার গন্ধ, পোকামাকড়। তবু থাকতে হয়। গ্যারাজ-ঘরটার ভাড়া মোটে ত্রিশ টাকা,

ইলেকট্রিকের জন্য আলাদা দিতে হয় না, তবে একটা মাত্র পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই। গগনের রোজগার এমন কিছু বেশি নয় যে লাটসাহেবি করে। এ অঞ্চলে বাড়িভাড়া এখন আগুন। একটা মাত্র ঘর ভাড়া করতে কত বার চেষ্টা-করেছে গগন, একশোর নীচে কেউ কথা বলে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, গগন একটু স্থিতু মানুষ, বেশি নড়াচড়া পছন্দ করে না। গ্যারাজ-ঘরটায় তার মন বসে গেছে। অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। গ্যারাজ-ঘরটায় বেশ আছে সে। শোভারানি বকাবকি করে, ভাড়াটেদের ক্যাচক্যাচ আছে, জলের অসুবিধে আছে, তবু খুব খারাপ লাগে না। কেবল বর্ষাকালটা বড্ড জ্বালায় এসে। তবু বর্ষা-বৃষ্টি হোক, না হলে মুরাগাছার জমি বুক ফাটিয়ে ফসল বের করে দেবে না। মানুষের এই এক বিপদ, বর্ষা বৃষ্টি গরম শীত সবই তাকে নিতে হয়, সবকিছুই তার কোনও-না-কোনওভাবে প্রয়োজন। কাউকেই ফেলা যায় না। এই যে অঞ্চলে এত মশা, গগন জানে এবং বিশ্বাসও করে যে, এইসব মশার উৎপত্তি এমনি এমনি হয়নি। হয়তো এদেরও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এই যে সাপখোপ বোলতা-বিছে, বাঘ-ভালুক— ভাল করে দেখলে বুঝি দেখা যাবে যে এদের কেউ ফেলনা নয়। সকলেই যে যার মতো এই জগতের কাজে লাগে।

গগন উঠে জিমনাশিয়ামের ভিতরে এল। মস্ত মস্ত গোটাকয় আয়না টাঙানো দেয়ালে। অন্ধকারেও সেগুলো একটু চকচক করে ওঠে। গগন টর্চ জ্বেলে আয়না দেখে। গত চার-পাঁচ বছরে এ সব আয়না তার কত চেলার প্রতিবিম্ব দেখিয়েছে। কোথায় চলে গেছে সব! আয়না কারও প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে না। এই পৃথিবীর মতোই তা নির্মম এবং নিরপেক্ষ। টর্চ জ্বেলে গগন চারিদিক দেখে। ওই রিং ধরে একদা ঝুল খেয়ে গ্রেট সার্কেল তৈরি করেছে ফলি। বুকে মস্ত চাঁই পাথর তুলেছে। বিম ব্যালান্স আর প্যারালাল বার-এ চমৎকার কাজ করত ছেলেটা। শরীর তৈরি করে সাজানো শরীরের প্রদর্শনী গগনের তেমন ভাল লাগে না। বরং সে চায় ভাল জিমন্যাস্ট তৈরি করতে, কি মুষ্টিযোদ্ধা, কি জুডো খেলোয়াড়। সেসব দিকে ফলি ছিল অসাধারণ। যেমন শরীর সাজানো ছিল থরে-বিথরে মাংসপেশিতে, তেমনি জিমন্যাস্টিকসেও সে ছিল পাকা। ফলিকে কিছুকাল জুডো আর বক্সিং শিখিয়েছিল গগন। টপাটপ শিখে ফেলত। সেই ফলি কোথায় চলে গেল।

ভূতের মতো একা একা গগন জিমনাশিয়ামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এধার-ওধার দেখে। মেঝেয় বারবেলের চাকা পড়ে আছে কয়েকটা। পায়ের ডগা দিয়ে একটা চাকা ঠং করে উলটে ফেলল সে। এক হাতে রিং ধরে একটু ঝুল খেল। প্যারালাল বার-এ উঠে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভাল লাগছে না। মনটা আজ ভাল নেই! ফলিকে কে মারল? কেন ফলি ও সব নেশার ব্যবসা করতে গেল?

আজ সন্ধেবেলা ফিরে এসে গ্যারাজ-ঘরে বসে সে অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠ থেকেছে। না, শোভারানিদের ঘর থেকে তেমন কোনও সন্দেহজনক শব্দ হয়নি! রাত ন'টায় নরেশও ফিরে এল। স্বাভাবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ওপর থেকে। তার মানে ওরা এখনও ফলির মৃত্যুসংবাদ পায়নি। বড় আশ্চর্য কথা! ফলিকে এখানে সবাই একসময়ে চিনত। তবু তার মৃতদেহ কেন কেউ শনাক্ত করতে পারেনি? কেবলমাত্র পুলিশ আর কালু ছাড়া। তাও পুলিশ বলেছে, ফলি অ্যাবসকন্ডার। ফলি ফেরারই বা ছিল কেন?

মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

গগনচাঁদের বুদ্ধি খুব তৎপর নয়! খুব দ্রুত ভাবনা-চিন্তা করা তার আসে না। সবসময়ে সে ধীরে চিন্তা করে। কিন্তু যা সে ভাবে তা সবসময়ে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি-তর্ক এবং গ্রহণ-বর্জনের পথ ধরে চলে। হুটহাট কিছু ভাবা তার আসে না। গগন বহুকাল ধরে নিরামিষ খায়। সম্ভবত নিরামিষ খেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু ধীর হয়ে যায়। নিরামিষ খাওয়ার পিছনে আবার গগনের একটা

ভাবপ্রবণতাও আছে। ছটফটে জ্যান্ত জীব, জালে বদ্ধ বাঁচার আকুলতা নিয়ে মরে যাওয়া মাছ কিংবা ডিমের মধ্যে অসহায় ভ্রূণ, এদের দেখে তার বড় মায়া হয়। আরও একটা কারণ হল, আমিষ খেলে মানুষের শরীরের স্বয়ং-উৎপন্ন বিষ টকসিন খুব বেড়ে যায়। টকসিন বাড়লে শরীরে কোনও রোগ হলে তা বড় জখম করে দিয়ে যায় শরীরকে। কেউ কেউ গগনকে বলেছে, নিরামিষভোজীরা খুব ধীরগতিসম্পন্ন, পেটমোটা। গগন তার উত্তরে তৃণভোজী হরিণ বা ঘোড়ার উল্লেখ করেছে, যারা ভীষণ জোরে ছোটে। তাদের পেটও মোটা নয়। নিরামিষ খেয়ে গগনের তাগদ কারও চেয়ে কম নয়। গতিবেগ এখনও বিদ্যুতের মতো। জুডো বা বক্সিং শিখতে আসে যারা তারা জানে গগন কত বড় শিক্ষক। তাও গগন খায় কী? প্রায় দিনই আধ সেরটাক ডাল আর সবজি-সেদ্ধ, কিছু কাঁচা সবজি, দু'-চারটে পেয়ারা বা সময়কালে কমলালেবু বা আম, আধ সের দুধ, সয়াবিন, কয়েকদানা ছোলা-বাদাম। তাও বড় বেশি নয়। শরীর আন্দাজে গগনের খাওয়া খুবই কম। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনও দিনই সে বেশি মাথা ঘামায় না। এইসব মিলিয়ে গগন। ধীরবুদ্ধি, শান্ত, অনুত্তেজিত, কোনও নেশাই তার নেই।

মেয়েমানুষের দোষ নেই, তবে আকর্ষণ থাকতে পারে।

যেমন বেগম। ফলি যখন গগনের কাছে কসরত করা শিখত, তখন বহুবার বেগম এসেছে জিমন্যাশিয়ামে। সে বেড়াতে আসত বোনের বাড়ি, সেই তক্কে জিমন্যাশিয়ামে ছেলেকে দেখে যেত। ব্যায়ামাগারটাই ছিল বলতে গেলে ফলির বাসস্থান।

গগনের আজও সন্দেহ হয়, শুধু ছেলেকে দেখতেই আসত কি না বেগম। বরং ছেলেকে দেখার চেয়ে ঢের বেশি চেয়ে দেখত গগনকে। তার তাকানো ছিল কী ভয়ংকর মাদকতায় মাখানো। বড় বড় চোখ, পটে-আঁকা চেহারা, গায়ের রং সত্যিকারের রাঙা। রোগা নয়, আবার কোথাও বাড়তি মাংস নেই। কী চমৎকার ফিগার! প্রথমটায় গগনের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু গগন বিভিন্ন ব্যায়ামকারীর কাছে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস শেখাচ্ছে, স্যান্ডো গেঞ্জি আর চাপা প্যান্ট পরা তার বিশাল দেহখানা নানা বিভঙ্গে বেঁকেছে, দুলছে বা ওজন তুলবার সময় থামের মতো দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে, এ সবই বেগম অপলক চোখে দেখেছে। বেগমের বয়স বোঝে কার সাধ্য! তাকে ফলির মা বলে মনে হত না, বরং বছর দু'-তিনেকের বড় বোন বলে মনে হত। ফলি একদিন বলেছিল, মা চমৎকার সব ব্যায়াম জানে, জানেন গগনদা! এখনও রোজ আসন করে।

বেগম প্রথমে ভাববাচ্যে কথা বলত। সরাসরি নয়, অথচ যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলত, কত দিন এখানে চাকরি করা হচ্ছে? কিংবা জিজ্ঞেস করত, জামাইবাবুর সঙ্গে কারও বুঝি খুব খটাখটি চলছে আজকাল। পরের দিকে বেগম সরাসরি কথা বলত। যেমন একদিন বলল, আপনার বয়স কত বলুন তো?

বিনীতভাবে গগন জবাব দিল, উনতিরিশ।

একদম বোঝা যায় না। বিয়ে করেছেন?

না।

কেন?

গগন হেসে বলে, খাওয়াব কী? আমারই পেট চলে না।

অত যার গুণ তার খাওয়ার অভাব!

তাই তো দেখছি।

আপনি ম্যাসাজ করতে জানেন?

জানি।

তা হলে আপনাকে কাজ দিতে পারি, করবেন?

গগন উদাসভাবে বলল, করতে পারি।

একটা অ্যাথলেটিক ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতে হবে। ওরা ভাল মাইনে দেয়।

গগন তখন বলল, আমার সময় কোথায়?

খুব হেসে বেগম বলল, তা হলে করবেন বললেন কেন? ওই ক্লাবে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। হোলটাইম জব। সময়ের অভাব হবে না। আর যদি ছুটকো-ছাটকা ম্যাসাজ করতে চান, পক্ষাঘাতের রুগি-টুগি, তাও দিতে পারি।

গগন বলল, ভেবে দেখব!

আসলে গগন ও সব করতে চায় না, সে চায় ছাত্র তৈরি করতে। ভাল শরীরবিদ, জিমন্যাস্ট, বক্সার, জুডো-বিশেষজ্ঞ। সে খেলোয়াড়দের পা বা রুগির গা ম্যাসাজ করতে যাবে কেন?

কিন্তু ওই যে সে ম্যাসাজ জানে ওটাই তার কাল হয়েছিল। কারণ একবার বেগম নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকায়। খবর এল, ম্যাসাজ দরকার। প্রথমে গগন যায়নি। সে কিছু আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বেগম ছাড়বে কেন? খবরের পর খবর পাঠাত। বিরক্ত হয়ে একদিন বাপুজি কলোনির বাড়িতে যেতে হয়েছিল গগনকে।

হেসে বলেছিল, খুব ব্যথা বুঝলেন।

গগন পা-খানা নেড়ে-চেড়ে বলল, কোথায়?

বেগম বলল, সব ব্যথা কি শরীরে? মন বলে কিছু নেই?

তারপর কী হয়েছিল তা আর গগন মনে করতে চায় না। তবে এটুকু বলা যায়, গগনের মেয়েমানুষে আকর্ষণ আছে, লোভ না থাক। বেগমের বেলা সেটুকু বোঝা গিয়েছিল। বলতে গেলে, তার জীবনের প্রথম মেয়েমানুষ ওই বেগম। কিছুকাল খুব ভালবেসেছিল বেগম তাকে। তারপর যা হয়! ও সব মেয়েদের একজনকে নিয়ে থাকলে চলে না! গগন তো তার ব্যবসার কাজে আসত না। বেগম তাই অন্য সব মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বেগমের দেহের সুন্দর ও ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে গগন সরে এল একদিন।

আয়নায় কোনও প্রতিচ্ছবি থাকে না। পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে, সব মুছে যায়। অবিকল আয়নার মতো।

ফলির কথাই ভাবছিল গগন। ফলি বেঁচে নেই। তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ফলি। মানুষ হিসেবে ফলি হয়তো ভাল ছিল না, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ফলি ছিল উৎকৃষ্ট। ও রকম চেলা গগন আর পায়নি।

অন্ধকার জিমন্যাশিয়ামে প্যারালাল বার-এর ওপর বসে গগনের দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এল। বিড়বিড় করে কী একটু বলল গগন। বোধহয় বলল, দূর শালা! জীবনটাই অদ্ভুত!

অনেক রাতে গগন যখন গ্যারাজ-ঘরে ফিরল তখন সে খুব অন্যমনস্ক ছিল। নইলে সে লক্ষ করত, এত রাতেও পাড়ার রাস্তায় কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। আশপাশের বাড়িগুলোয় আলোও জ্বলছে।

গগন যখন তালা খুলছে তখন একবার টের পেল এ বাড়ি সে বাড়ির জানালায় কারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল তাকে। নরেশ মজুমদারের ঘরে স্টিক-লাইট জ্বলছে। এত রাতে ও রকম হওয়ার কথা নয়। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এ সময় সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোয়। কেবল অদূরে একটা বাড়ির দোতলায় ননক চৌধুরীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে।

গগন ঘরে এসে প্রায় কিছুই খেল না। ঠান্ডা দুধটা চুমুক দিয়ে শুয়ে রইল। বাতি নেভাল না। ঘরে জল খেলছে, কোন পোকা-মাকড় রাতবিরেতে বিছানায় উঠে আসে। বর্ষাকালে প্রায় সময়েই সে বাতি জ্বেলে ঘুমোয়। নরেশ মজুমদারের মিটার উঠুক, তার কী!

ঘুম না এলে গগনচাঁদ জেগে থাকে। চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে থাকা স্বভাব নয়। আজও ঘুম এল

না, তাই চেয়ে থেকে কত কথা ভাবছিল গগন। ভিতর দিকে গ্যারেজ-ঘরের ছাদের সঙ্গে লাগানো, উঁচুতে একটা চার ফুট দরজা আছে। ওই দরজাটা সে আসবার পর থেকে বরাবর বন্ধ দেখেছে। সম্ভবত কোনও দিন ওই দরজা দিয়ে সহজে গ্যারাজে ঢোকা যাবে বলে ওটা করা হয়েছিল। বৃষ্টি-বাদলার দিনে ঘর থেকে নরেশ তার বউ নিয়ে সরাসরি গ্যারাজে আসতে পারত। এখন গ্যারাজে গাড়ি নেই, গগন আছে। তাই দরজাটা কড়াক্কড় করে বন্ধ। প্রায় সময়েই গগন দরজাটা দেখে। হয়তো কখনও ওই দরজা থেকে নেমে আসবার কাঠের সিঁড়ি ছিল। আজ তা নেই। গুপ্ত সুড়ঙ্গের মতো দরজাটাই আছে কেবল। রহস্যময়।

আশ্চর্য এই, আজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে গগন দরজাটার কথাই ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ খুব পুরনো একটা ছিটকিনি খোলার কষ্টকর শব্দ হল। তারপরই কে যেন হুড়কো খুলছে বলে মনে হল। সিলিং-এর দরজাটা বার দুই কেঁপে উঠল।

ভয়ংকর চমকে গেল গগনচাঁদ। বহুকাল এমন চমকায়নি। সে শোয়া অবস্থা থেকে ঝট করে উঠে বসল। প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকে আরও ভয়ংকর চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাটা আস্তে খুলে গেল। আর চার ফুট সেই দরজার ফ্রেমে দেখা গেল, শোভারানি একটা পাঁচ ব্যাটারির মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক চোখে চেয়ে ছিল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ বড়।

শোভারানি সামান্য হাঁফাচ্ছিল। বেগমের বোন বলে ওকে একদম মনে হয় না। শোভা কালো, মোটা, বেঁটে। মুখশ্রী হয়তো কোনও দিন কমনীয় ছিল, এখন পুরু চর্বিতে সব গোল হয়ে গেছে।

শোভারানি ঝুঁকে বলল, এই এলেন?

হুঁ।— বলে বটে গগন, কিন্তু সে ধাতস্থ হয়নি।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বাইরে।

ঘোরের মধ্যে উত্তর দেয় গগন। ওরা কি তবে ফলির খবরটা পেয়েছে! তাই হবে। নইলে এত রাতে গুপ্ত দরজা দিয়ে শোভা আসত না। শোভারানির মুখে অবশ্য কোনও শোকের চিহ্ন নেই। বরং একটা উদ্‌বেগ ও আকুলতার ভাব আছে।

শোভা বলল, লাইনের ধারে যে মারা গেছে কাল সে কে জানেন?

জানি।— একটু ইতস্তত করে গগন বলে।

সবাই বলছে ফলি। সত্যি নাকি?

লুকিয়ে লাভ নেই। বার্তা পৌঁছে গেছে। গগন তাই মাথা নাড়ল। তারপর কপালে হাত দিল একটু।

ফলিকে কে দেখেছে?

গগন বলল, পুলিশ দেখেছে। আর রিকশাওলা কালু।

ঠিক দেখেছে?— তীব্র চোখে চেয়ে শোভা জিজ্ঞেস করে।

তাই তো বলছে।— গগন ফের কপালে হাত দেয়।

শোভারানি ঠোঁট উলটে বলল, আপদ গেছে।

বলেই ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলল মেঝেয়। বলল, ঘরে জল ঢোকে দেখছি।

বর্ষাকালে ঢোকে রোজ।— গগন যান্ত্রিক উত্তর দেয়।

বলেননি তো কখনও!

গগন আস্তে করে বলে, বলার কী! সবাই জানে!

শোভা মাথা নেড়ে বলে, আমি জানতাম না।

গগন উত্তর দেয় না। শোভার কাছে এত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে সে ভীষণ ভালমানুষ হয়ে যাচ্ছিল।

শোভা টর্চটা নিভিয়ে বলল, শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

গগন উঠে বসে ঊর্ধ্বমুখে যেন কোনও স্বর্গীয় দেবীর কথা শুনছে, এমনভাবে উৎকর্ণ হয়ে ভক্তিভরে বসে থাকে। বলে, বলুন।

কালু একটা গুজব ছড়িয়েছে।

কী?

ফলিকে যে খুন করেছে তাকে নাকি ও দেখেছে।

গগন মাথা নেড়ে বলল, জানি।

কী জানেন?

কালু ও কথা আমাকেও বলেছে।

কে খুন করেছে তা বলেনি?— শোভা ঝুঁকে খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে।

গগন মাথা নাড়ে, না। ও পাঁচশো টাকা দাবি করবে খুনির কাছে। বলবে না।

শোভা হেসে বলে, সেই পাঁচশো টাকা কালু পেয়ে গেছে।

শোভারানির হাসি এবং শোকের অভাব দেখে গগন খুব অবাক হয়। ফলির মৃত্যুতে কি শোভার কিছু যায়-আসেনি? বোনপোটা মরে গেল, তবু ও কী-রকম যেন স্বাভাবিক।

গগন ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, কার কাছে পেয়েছে?

শোভা অদ্ভুত একটু হেসে বলল, ও বলছে, টাকা নাকি ওকে আপনি দিয়েছেন!

আমি! আমি টাকা দিয়েছি!

খুব আস্তে গগনের বুদ্ধি কাজ করে। প্রথমটায় সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কী। ভেবে ভেবে জোড়া দিতে লাগল। তাতে সময় গেল খানিক।

শোভা বলল, একটু আগে কালুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

গগন তেমনি দেবী-দর্শনের মতো ঊর্ধ্বমুখ হয়ে নীরব থাকে। বুঝতে সময় লাগে তার। তারপর হঠাৎ বলে, আমি ওকে টাকা দিইনি।

শোভা ঠোঁট ওলটাল। বলল, ও তো বলছে!

আর কী বলছে?

শোভা হেসে বলে, খুনির নামটাও বলেছে।

কে?

বলেই গগন বুঝতে পারে তার গলার স্বর তার নিজের ফাঁকা মাথার মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি তুলল, কে!

শোভা তীব্র চোখে চেয়ে থেকে বলল, ও আপনার নাম বলছে

আমি! আমার নাম! — বলে গগন মাথায় হাত দিয়ে বলে, না তো! ও মিথ্যে কথা বলছে।

শোভা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল, কালু মদ-গাঁজা খায়। ওর কথা কে বিশ্বাস করে, আহাম্মক ছাড়া! তবে ফলিকে কেউ খুন করে থাকলেও অন্যায় করেনি আমি তো সেজন্য জোড়াপাঁঠা মানসিক করে রেখেছি।

গগন উত্তর দিতে পারে না। মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে শুধু শোভার দিকে চেয়ে থাকে।

শোভা বলে, শুনুন যদি ফলিকে কেউ মেরে থাকে তো আমার দুঃখের কিছু নেই। আমার স্বামী কাঁদছেন! তাঁর বোধহয় কাঁদবারই কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সব ফলির নামে লিখে দেবেন। উইল নাকি করেও ছিলেন। আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। ফলির জন্ম ভাল নয়।

গগন উত্তর দিতে পারছিল না। তবু মাথা নাড়ল।

শোভা বলল, আপনি বা যে-কেউ ওকে খুন করে থাকলে ভাল কাজই হয়েছে। পেস্তা নামে যে বাচ্চা মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, সে এখনও আমার কাছে আসে। তার বোধহয় আর বিয়ে হবে না। ফলির গুণকীর্তির কথা কে না জানে! তবু আমার স্বামীকে কিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সম্ভবত পুলিশ ডেকে আজ রাতেই আপনাকে গ্রেফতার করাবেন।

আমাকে!

শোভা সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে, ও রকম ভ্যাবলার মতো করছেন কেন? এ সময়ে বুদ্ধি ঠিক না-রাখলে ঝামেলায় পড়বেন।

গগন হঠাৎ বলল, কী করব?

শোভা বলে, কী আর করবেন, পালাবেন!

গগন দিশাহারার মতো বলল, পালাব কেন?

সেটা বুঝতে আপনার সময় লাগবে। শরীরটাই বড়, বুদ্ধি ভীষণ কম। পুলিশে ধরলে আটক রাখবে, মামলা হবে, সে অনেক ব্যাপার। বরং পালিয়ে গেলে ভাববার সময় পাবেন।

কোথায় পালাব?

সেটা যেতে যেতে ভাববেন। এখন খুব বেশি সময় নেই। এইখান দিয়ে উঠে আসতে পারবেন?

গগন হাসল এবার। সে শরীরের কসরতে ওস্তাদ লোক। গ্যারাজ-ঘরের ছাদের দরজায় ওঠা তার কাছে কোনও ব্যাপার নয়। মাথা নেড়ে বলল, খুব।

তা হলে বাতিটা নিবিয়ে উঠে আসুন। এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভাল রাস্তা আছে। কেউ দেখবে না। দেয়াল টপকে ওদিকে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের কারখানার মাঠ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবেন। দেরি করবেন না। উঠে আসুন।

গগন বাতি নিভিয়ে দেয়। শোভা টর্চ জ্বেলে রাখে। গগন পোশাক পরে নেয়। দুটো-একটা টুকিটাকি দরকারি জিনিস ভরে নেয় ঝোলা ব্যাগে। তারপর হাতের ভর দিয়ে দরজায় উঠে পড়ে।

শোভা টর্চ জ্বেলে আগে আগে পথ দেখিয়ে দেয়। মেথরের আসবার রাস্তায় এলে শোভারানি তাকে বলে, এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। টাকা লাগবে?

গগন মাথা নাড়ে, না।

শোভা হেসে বলে, লাগবে। সদ্য সদ্য পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেছে, এখন তো হাত খালি!

গগন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তাকায়।

আর শোভারানি সেই মুহূর্তে তাকে প্রথম স্পর্শ করে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার প্যান্টের পকেটে বোধহয় কিছু টাকাই গুঁজে দেয়। খুব নরম স্বরে বলে, বেগম খারাপ। আমি খারাপ নই। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি খুন করেছেন। এখন যান। গ্যারাজ-ঘরের ভিতরটা আমি উঁচু করে দেব। সময়মতো ফিরে এসে দেখবেন ঘরটা অনেক ভাল হয়ে গেছে। আর জিনিসপত্র যা রইল তা আমি দেখে রাখব। এখন আসুন তো।

গগন মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে করে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের পাঁচিল টপকায়। মাঠ পেরোয়।

কয়েকটা টর্চবাতি ইতস্তত কাকে যেন খুঁজছে। গগন মাথা নিচু করে এগোয়। একটা বড় গাড়ি এসে থামল কাছেই কোথাও। গগন বাদবাকি পথটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। ফের পাঁচিল টপকে বড়রাস্তায় পড়ে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোনও যানবাহন নেই। কেবল একটা ট্যাক্সি সওয়ারি খালাস করে ধীরে ফিরে যাচ্ছে। গগন হাত তুলে সেটাকে থামায়। সচরাচর সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। পয়সার জন্যও বটে, তা ছাড়া বাবুয়ানি তার সয় না। আজ উঠে বসল। কারণ অবস্থাটা আজ গুরুতর। তা ছাড়া

শোভারানির দেওয়া বেশ কিছু টাকাও আছে পকেটে।

পৃথিবীটাকে ঠিক বুঝতে পারে না গগনচাঁদ। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেঘলা করে আসে। গ্যারাজ-ঘরে জল ওঠে আধ-হাঁটু। জীবনটা এ রকমই। মাঝে মাঝে বিনা কারণে এ রকম পালাতে হয়।

অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারে না গগন। তবু সেজন্য তার চিন্তা হয় না। এখন সে শোভারানির কথা ভাবে। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে তার।

ছয়

কালুকে পুলিশ তেমন কিছু করেনি। দু'-চারটে ঠোকনা যে না মেরেছে তা নয়, কিন্তু সে বলতে গেলে সিপাইদের আদর। পুলিশের আসল ধোলাই কেমন তা খানিকটা কালু জানে।

পুলিশের কাছে কালু কারও নাম বলেনি।

থানার বড়বাবু তাকে জিজ্ঞেস করল, তুই ফলিকে খুন হতে দেখেছিস?

কালু দম ধরে রেখে খানিক ভাবল। ভেবে দেখল, সে অনেককেই ঘটনাটা বলেছে, তাই এখানে মিছে কথা বললে নাহোক ধোলাই হবে। আর পুলিশ যদি মারে তো কোনও শালার কিছু করার নেই। তাই সে চোখ পিটপিট করে বড়বাবুর কোঁতকা চেহারাটা চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলল, দেখেছি।

সত্যি দেখেছিস, না কি নেশার ঘোরে বানিয়েছিস?

কালুর সেই তেজ আর নেই, যেমনটা সে সুরেন খাঁড়া, গগন আর সন্তুকে দেখিয়েছিল। পুলিশের সামনে কারই বা তেজ থাকে?

কালু মেঝেয় উবু হয়ে বসা অবস্থায় মাথা চুলকে বলল, নেশাও ছিল, তবে আবছা দেখেছি।

বড়বাবুর বুটসুদ্ধ মোটা একখানা পা তার কাঁকালে এসে লাগল এ সময়ে। খুব জোরে নয়, তবে কালু তাতেই টাল্লা খেয়ে হড়াত করে পড়ে গেল। একদাঁত হেসে সে আবার উঠে বসে।

বড়বাবুর মুখে হাসি নেই, ভ্রু কুঁচকে বলে, ঠিকসে বল।

অন্ধকার ছিল যে।

সেখানে তুই কী করছিলি?

সাঁজ-বাজারে একটা লোক তাড়ি আনে। রোজ যেয়ে তার কাছে বসি।

বড়বাবু পা ফের তুলে বলে, এটুকু বয়সেই মালের পাকা খদ্দের!

খাই মাঝে মাঝে, তাকত পাই না নাহলে।

এবারের লাথিটা আরও আস্তে এল। লাগল না তেমন।

বড়বাবু বলে, ঠিক করে বল কী করছিলি।

বড় একট' ভাঁড় নিয়ে লাইনের ধারে বসে খাচ্ছিলাম। এ সময় কতগুলো ছেলে এল লাইনের ওধারে। কী সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

কিছু শুনতে পাসনি?

না, খুব আস্তে বলছিল।

ঝগড়া-কাজিয়া বলে মনে হয়েছিল?

না। আপসে যেমন কথা হয় দোস্তদের মধ্যে।

তারপর?

ওরা আমাকে দেখেনি, জায়গাটা অন্ধকার।

ক'জন ছিল?

চার-পাঁচ জন হবে। তাদের একজন খুব লম্বা-চওড়া।

অন্ধকারে বুঝলি কী করে?

বললাম তো আবছা দেখা যাচ্ছিল।

লম্বা-চওড়া লোকটা কে? গগন?

কী জানি!

তবে লোককে বলছিস কেন যে গগনবাবু লাশ নামিয়েছে?

কালু অবাক হয়ে বলে, কখন বললাম?

বলিসনি?— বড়বাবু চোখ পাকিয়ে বলে।

মাইরি না।

এই সময়ে একটা সিপাই পাশ থেকে ঠোকনা মারে। খুব জোরে নয়, তবে তাতে কালুর ডান গালের চামড়া থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে গেল, আর কষের একটা দাঁতের গোড়া বুঝি নাড়া খেয়ে আরও খানিক রক্ত চলকে দিল। মুখের রক্ত ঢোক গিলে পেটে চালান দিয়েছিল কালু। থানায় ধরে আনার পর থেকে দাঁতে কুটো পড়েনি। পেট জ্বলছে।

বড়বাবু বলে, সব ঠিকঠাক করে বল।

কালু হাসবার চেষ্টা করে বলে, বলছি তো বড়বাবু, গগনদার কথা কাউকে বলিনি।

খুনটা কেমন করে হল?

সে খুব সাংঘাতিক। হঠাৎ দেখি সেই চার-পাঁচজনের মধ্যে একজনকে সেই জোয়ান লোকটা পিছন থেকে কী দিয়ে যেন মাথায় মারল।

জোরে মারল?

তেমন জোরে নয়, তবে ছেলেটা পড়ে গেল মাটিতে।

তারপর?

তারপর একটা তোয়ালে বা কাপড় কিছু একটা দিয়ে ছেলেটার গলা পেঁচিয়ে সেই জোয়ান লোকটা খুব চেপে ধরল।

কতক্ষণ?

খুব বেশিক্ষণ নয়, ভয়ে আমি শব্দ করিনি।

তারপর কী হল?

লোকগুলো চলে গেল।

তুই খুনিকে চিনতে পারিসনি?

মাইরি না।

তবে তোকে টাকা দিল কে?

টাকা!— কালু খুব অবাক হয়।

তোকে নাকি খুনি পাঁচশো টাকা দিয়েছে?

মাইরি না বড়বাবু—

কালু পা ধরতে যাচ্ছিল, এ সময়ে আর একটা বেতাল ঠোকনা খেয়ে পড়ে যায়। মাথার পিছনে বাঁ ধারে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলু ফুটে উঠল। ঝাঁ ঝাঁ করছিল ব্যথায়।

টাকা পাসনি?

কালু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছিল কোন শালা কথাটা ফাঁস করেছে! সন্তু জানে, আর রিকশাওয়ালা নিতাই তার দোস্ত, সে জানে। আর সুরেন, গগন এ রকম দু'-চারজনকে সে মুখে বলেছিল বটে যে টাকা পেলে খুনির নাম বলবে। এদের মধ্যেই কেউ ব্যাপারটা ফাঁস করেছে। কালুর সন্দেহ সন্তুকে। ও রকম হাড়বজ্জাত ছেলে হয় না।

না।— কালু চোখের জল মুছে বলে। পুলিশ অবশ্য তাকে ধরে এনে প্রায় উদোম করে সার্চ করেছে। টাকা পায়নি।

মারধর কালুর যে খুব লাগে তা নয়। কিন্তু এটা ঠিক তাকে কেউ গমের বস্তা বলে মনে করলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে হুজ্জত করার মুরোদ কারই বা থাকে?

বড়বাবু বললেন, দ্যাখ ত্যাঁদড়ামি করিস না, করলে মেরে পাট করে দেব। আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু রোজ এসে হাজিরা দিয়ে যাবি। সত্যি মিথ্যে কী কী বলেছিস তার সব আমরা টের পেয়ে যাব। এটা সত্যিই খুনের মামলা কি না, না কি তুই ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তুলেছিস, এ সব জানতে আমাদের বাকি থাকবে না। যদি শালা আমাদের ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকো তবে জন্মের মতো খতম হয়ে যাবে।

কালুকে এরপর প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কালু অবশ্য তাতে কিছু মনে করেনি। সে জানে সে একটা রিকশাওয়ালা মাত্র। কাজটা এতই ছোট যে দুনিয়ার কারও কাছে কিছু আশা করা যায় না। ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়বার সময়েই সে কেন যেন টের পেত যে তার জীবনটা খুব সুখের হবে না। গড়ফায় তার বাবার একটা টিনের ঘর ছিল, উঠোন নিয়ে মোট চার কাঠা জমি। উদ্বাস্তুদের জবর-দখল জায়গা। সেইখানে ছেলেবেলা থেকেই নানা অশান্তিতে বড় হয়েছে। বাবা রোজ মাকে দা বা কুড়ুল নিয়ে কাটতে যেত, দিদি বাসন্তী গিয়ে আটকাত। মা আর দিদি দু'জনেই ঝি-গিরি করে বেড়াত, বাবা ছিল কাঠের মিস্ত্রি, প্রায় দিনই কাজ জুটত না। তার ওপর লোকটার একটা ভয়ংকর অর্শের যন্ত্রণা ছিল যার জন্য বেশিক্ষণ উবু হয়ে বসে কাজ করতে পারত না, রোজগার যা হত তাতে দু'বেলা খাওয়া জুটে যেত মাত্র, তা সে যে-ধরনের খাবারই হোক! দিদি বাসন্তীর চরিত্র খারাপ নয় তবে বাসন্তী যার সঙ্গে বিয়ে বসল তার আগের পক্ষের বউ আর চার-চারটে ছেলেমেয়ে আছে। জেনেশুনেই করল। সে লোকটার আবার বাসন্তীকে নিয়ে সন্দেহবাতিক, কোথাও বেরোতে দেয় না। এইসব ছেলেবেলা থেকে দেখেছে কালু। বাবার মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে। অর্শ থেকেই খারাপ ঘা হয়ে গিয়ে থাকবে। রক্ত পড়ত দিনরাত। শেষদিকে ওই রক্তপাতেই দিন দিন ক্ষীণ হয়ে হয়ে একদিন রাতে ঘুমিয়ে সকালে আর ওঠেনি। মা এখনও ঝি খেটে বেড়ায়, ছোট বোন হেমন্তীও বেরোচ্ছে কাজে, ছোট ভাই ভুতু আর হাবু সন্ধ্যাবাজারে ডিম বেচে আর চুরি করে বেড়ায়। ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠে কালুকে থামতে হল। পড়তে ভাল লাগত না।

সেই থেকে কালুর সব দুঃখবোধ আর কান্না বিদায় নিয়েছে। কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে সে। মনে কিছু ভুরভুরি কাটে না। গাল খেলে গাল দেয়, মার খেলে উলটে মার দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যস, এই ভাবেই যতদিন বেঁচে থাকা যায়। কালু যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে শিখেছে তা হল টাকা। টাকার মতো কিছু হয় না।

সেলিমপুরে সওয়ারি ছেড়ে রিকশাওয়ালা মগন ফাঁড়ির উলটোদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বসে ছিল। যাদবপুরে ফিরবে, সওয়ারি পাওয়ার লোভে খানিক অপেক্ষা করছিল।

কালু গিয়ে মগনকে বলল, নিয়ে চলো দেখি মগনদা।

তোর গাড়ি কে খায়?

ছেড়ে এসেছি, পুলিশ ধরে আনল একটু আগে।

মগন ঝুঁকে বলল, পুলিশ। আই বাপ। কী হয়েছিল?

সে অনেক কথা, পরে কোনও সময়ে শুনো।

পেঁদিয়েছে তোকে?

ও শালার সম্বন্ধীর পুতেরা কাকে না প্যাঁদায়?

মগন রিকশার হুড তুলে দিয়ে বলল, চেপে বোস, শালারা আবার টের না পায় যে আমার গাড়িতে উঠেছিস!

মগন রিকশা ছেড়ে জোর হাঁকাল।

কালু কেতরে বসেছিল তার সিটে, মারধর নয়, আসলে খিদেয় পেট ব্যথা করছে। মদের ঝোঁকটা উবে গেছে কখন। এখন পেটে একটা চোঁ-ব্যথা। তবে তার মনটা এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে পুলিশের হাতে পড়েও সে কারও নাম বলেনি।

এইট-বি বাস স্ট্যান্ডে ছেড়ে দিয়ে মগন বলল, মালিককে তিন দিনের পয়সা দিইনি।

কালু দাঁত বের করে বলল, আমার এক হপ্তার বাকি। কাল থেকে গাড়ি দেবে না। তার ওপর পুলিশ লেগেছে।

দু'দিন জোর বৃষ্টি হলে ভাল সওয়ারি পাওয়া যায়।

ইচ্ছেমতো তো আর বৃষ্টি হবে না।

মগন গাড়ি মালিকের বাড়িতে তুলে রাখতে বিজয়গড় গেল।

কালু স্টেশন রোডের মুখে খানিক দাঁড়িয়ে আর-একটা রিকশা খুঁজল। পেল না, হাঁটতে লাগল। বাড়ি না গেলেও হয়। গরফা পর্যন্ত হাঁটতে ইচ্ছে করছে না খিদে পেটে।

স্টেশনের গায়ে একটা তেলেভাজার ঝোপড়ার দোকান আছে। সেটা চালায় বিশে, তার দোস্ত, সেখানে গেলে কিছু খাবার জুটতে পারে। শোওয়ার জায়গার অভাব নেই, স্টেশনে গামছা পেতে পড়ে থাকলেই হল।

বিশে জেগে ছিল, ঝোপড়ায় হারিকেন জ্বলছে। একটা বিদিকিচ্ছিরি কম দামের ট্রানজিস্টারে কোথাকার একটা পুরনো হিন্দি গান হচ্ছে।

তাকে দেখে বিশে দাঁতের বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল, পরশু মাল খাওয়াবি কথা ছিল।

কালু বলে, কাল খাওয়াব।

তোর শালা মুখ না ইয়ে।

বেশি মেজাজ লিস না বিশে, আমার কচকচে সাড়ে চারশো টাকা আছে।

যাঃ যাঃ।

কিছু পেটের ব্যবস্থা হবে?

বিশে বলল, শালা রোজ এসে জ্বালালে এবার ঝাপড় খাবি।

তা বলে বিশে ফিরিয়ে দেয় না। মুড়ি, ছোলাসেদ্ধ আর ঠান্ডা বেগুনি খাওয়ায়। তারপর দুই বন্ধুতে বিড়ি ধরিয়ে গিয়ে স্টেশনে শুয়ে পড়ে গল্পগাছা করতে থাকে। বিশের মা ঝোপড়া আগলে রাখে।

বিশে সব শুনে বলে, তুই শালা ঘুণচক্করে পড়বি। খুনখারাবি নিয়ে দিল্লাগি নয় দোস্ত। সত্যি কথা বল তো কাউকে দেখেছিলি?

স্টেশনের শক্ত মেঝের ওপর চট পেতে শোয়া কালু পাশ ফিরে বিশের দিকে চেয়ে বিড়িতে টান মেরে বলে, তুই লাশটা দেখেছিলি?

বিশে বলে, দেখব না কেন? লাইনের ধারে দিনভর পড়ে ছিল। অনেক বার গিয়ে দেখেছি।

চিনতে পেরেছিলি?

বিশে মাথা নেড়ে বলে, খুব। ফলি গুন্ডাকে কে না চেনে? এ সব জায়গাতেই আড্ডা ছিল। সব সময়ে ট্রেনে আসত আর ট্রেনেই চলে যেত।

ট্যাবলেট বেচতে আসত যে আমিও জানি। কিন্তু ট্রেনে আসত কেন বল তো?

মনে হয় পাড়ায় ঢুকতে ভয় পেত। বাসে-টাসে এলে তো বড় রাস্তা বা স্টেশন রোড ধরে আসতে হবে। ও সব জায়গায় ওর কোনও বিপদ ছিল মনে হয়।

কালু আর-একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, লুকিয়ে-চুরিয়ে আসত তা হলে!

বিশে গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু ফলিরও দল ছিল। সন্তোষপুর, পালবাজার, স্টেশন রোড এ সব

এলাকার বিস্তর মস্তান ছিল ওর দোস্ত। আমার দোকানে এসে ইট পেতে বসে কত দিন দিশি মাল আর তেলেভাজা খেয়েছে।

তুই তা হলে ভালই চিনতি?

বললাম তো।

তুই খুনটা নিজে চোখে দেখলি?

নিজের চোখে।

খুনিকেও চিনলি?

কালু হেসে বলে, নাম বলব না তা বলে। চিনলাম।

বিশে একটা আস্তে লাথি মারল কালুর পাছায়।

তারপর বলল, মালকড়ি ঝাঁকবি?

ঝেঁকেছি, কাল তোকে মাল খাওয়াব।

বিশে ঘুমোয়। কালুর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। গালটা ফুলে টনটনে ব্যথা হয়েছে। মাজাতেও ব্যথা বড় কম নয়। এপাশ-ওপাশ করে সে একটু কোঁকাতে থাকে।

শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কালু। উঠতে অনেক বেলা হল। দেখল, বিশে উঠে গেছে। স্টেশনে গিজগিজ করছে।

লাইন পার হয়ে কালু পাড়ায় ঢুকে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে।

দরজায় পা দিতে-না-দিতেই মা চেঁচিয়ে বলে, হারামজাদা বজ্জাত, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলি? কাল রাতে চারটে গুন্ডা এসে বাড়ি তছনছ করেছে। ছেলেদুটোকে ধরে কী হেনস্থা, যা বাড়ি থেকে দূর হয়ে! গুন্ডা বদমাশ কোথাকার!

সাত

নানক চৌধুরীর পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে পাড়ার অনেকখানি দেখা যায়।

ঘরে নানক চৌধুরী একাই থাকে। বাড়ির কারও সঙ্গেই হলাহলি-গলাগলি নেই, এমনকী স্ত্রীর সঙ্গেও না। নিজের ঘরে বইপত্র আর নানান পুরাদ্রব্যের সংগ্রহ নিয়ে তার দিন কেটে যায়। কাছেই একটি কলেজে নানক অধ্যাপনা করে। না-করলেও চলত, কারণ টাকার অভাব নেই।

টাকা থাকলে মানুষের নানা রকম বদ খেয়াল মাথা চাড়া দেয়। নানক চৌধুরী সেদিক দিয়ে কঠোর মানুষ। মদ-মেয়েমানুষ দূরের কথা নানক সুপুরিটা পর্যন্ত খায় না। পোশাকে বাবুয়ানি নেই, বিলাসব্যসন নেই। তবে খরচ আছে। জমানো টাকার অনেকটাই নানকের খরচ হয় হাজারটা পুরাদ্রব্য কিনতে গিয়ে। ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও নানক প্রত্নবিদ নয়। তাই সেসব জিনিস কিনতে গিয়ে সে ঠকেছেও বিস্তর। কেউ একটা পুরনো মূর্তি কি প্রাচীন মুদ্রা এনে হাজির করলেই নানক ঝটপট কিনে ফেলে। পরে দেখা যায় যে জিনিসটা ভুয়া। মাত্র দিন সাতেক আগে একটা হা-ঘরে লোক এসে মরচে-ধরা একটা ছুরি বেচে গেছে। ছুরিটা নাকি সিরাজদৌল্লার আমলের। প্রায় ন'শো টাকা দণ্ড দিয়ে সেটা রেখেছে নানক।

দেখলে নানককে বেশ বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। দাড়ি-গোঁফ থাকায় এখন তো তাকে রীতিমতো বুড়োই লাগে। কিন্তু সন্তু যদি তার বড় ছেলে হয়, তা হলে তার বয়স খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। নানকের হিসেবমতো তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশি।

রাত বারোটা নাগাদ নানক তার পশ্চিমধারের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকে পাড়ার বড়রাস্তা দেখা যায়। পাশের বাড়িটা নিচু একটা একতলা। তার পরেই নরেশের বাড়ির ভিতর দিকের উঠোন। উঠোনে আলো নেই বটে, তবে বাড়ির ভিতরকার আলোর কিছু আভা এসে উঠোনে

পড়েছে। লোকজন কাউকে দেখা যায় না। এত রাতে আলো বা লোকজন দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। তবে আজকের ব্যাপার আলাদা। ফলি নামে কে একটা ছেলে লাইনের ধারে মারা গেছে, তাকে নিয়ে নানা গুজব। কেউ বলছে খুন। একটা রিকশাওয়ালা খুনির নাম বলেছে গগন। এই নিয়ে পাড়ায় ভীষণ উত্তেজনা। প্রায় সবাই জেগে গুজগুজ ফুসফুস করছে।

গুজব নানকের পছন্দ নয়। সে জানে কংক্রিট ফ্যাক্ট ছাড়া কোনও ঘটনাই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাস্য নয়। তার নিজের বিষয় হল ইতিহাস, যা কিনা বারো আনাই কিংবদন্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই কেচ্ছাকাহিনি। তা ছাড়া ইতিহাস মানেই হচ্ছে রাজা বা রাজপরিবারের উত্থান-পতনের গল্প। তাই ইতিহাস সাবজেক্টটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না নানক। তার ইচ্ছে এমন ইতিহাস লেখা হোক যা সম্পূর্ণ সত্যমূলক এবং সমাজবিবর্তনের দলিল হয়ে থাকবে। ইতিহাস মানে গোটা সমাজের ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য প্রাচীন ইতিহাসগুলো সেদিক থেকে বড়ই খণ্ডিত।

নানক দাঁড়িয়ে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। চারদিককার পৃথিবী সম্পর্কে সে এখন কিছুটা উদাস এবং নিস্পৃহ। তার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থটি হল রবিনসন ক্রুশো। এই প্রায়-শিশুপাঠ্য বইটি যে কেন তার প্রিয় তা এক রহস্য। তবে নানক দেখেছে, যখনই তার মন খারাপ হয় বা অস্থিরতা আসে তখন রবিনসন ক্রুশো পড়লেই মনটা আবার ঠিক হয়ে যায়। শুনলে লোকে হাসবে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

আজ বিকেল থেকে নানকের মনটা খারাপ, তার প্রত্নবিদ বন্ধু অমলেন্দু এসেছিল, ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে, এ হল একেবারে ব্রিটিশ আমলের বস্তু। বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশি নয়। তবে একটু ঐতিহাসিক নকলে তৈরি হয়েছিল বটে। ন'-ন'শোটা টাকা গালে চড় দিয়ে নিয়ে গেছে হে!

নানক চৌধুরী তখন থেকেই রবিনসন ক্রুশো পড়ে গেছে। এখন মনটা অন্যমনস্ক। নানক চৌধুরী নিজেকে সেই নিরালা দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশো বলে ভাবতে ভারী ভালবাসে। সে যদি ও রকম জীবন পায় তবে ফ্রাইডের মতো কোনও সঙ্গীও জোটাবে না। এ রকম একা থাকবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে নানক হঠাৎ নরেশের বাড়ির উঠোনে টর্চের আলো দেখতে পায়। সেই সঙ্গে দুটো ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি হলেও চিনতে অসুবিধে নেই। বিপুল মোটা বেঁটে শোভারানিকে অন্ধকারেও চেনা যায়। আর গরিলার মতো হোঁতকা জোয়ান-জোয়ান চেহারার গগনকেও ভুল হওয়ার কথা নয়।

দু'জনে করছে কী ওখানে? কোনও লাভ-অ্যাফেয়ার নয় তো!

একটু বাদেই নানক দেখে গগন দেয়াল ডিঙোচ্ছে। শোভারানি টর্চ জ্বেলে ধরে আছে। গগন দেয়ালের ওপাশে নেমে না-যেতে যেতেই পুলিশের গাড়ির আওয়াজ রাস্তায় এসে থামে। ভারী বুটের শব্দ। কিছু টর্চের আলো এলোমেলো ঘুরতে থাকে।

তা হলে এই ব্যাপার!

নানক চৌধুরী লুঙ্গির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘর থেকে বেরোয়। নিজের ঘরে তালা দেওয়া তার পুরনো অভ্যাস। বাড়ির কারও বিনা প্রয়োজনে তার ঘরে ঢোকা নিষেধ। তালা দিয়ে নানক নীচে নেমে আসে। চাকরকে ডেকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় বেরোয়।

মুখোমুখি একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা। নানক বলে, কাউকে খুঁজছেন?

অফিসার বলে, হ্যাঁ। গগন নামে কাউকে চেনেন?

চিনি।

লোকটা ঘরে নেই। পালিয়েছে।

নানক বলে, হ্যাঁ। আমি পালাতে দেখেছি।

কোন দিকে?

পিছনের দেয়াল টপকে ল্যাবরেটারির মাঠ দিয়ে। এখন আর তাকে পাবেন না। বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

কখন গেল?

মিনিট দশ-পনেরো হবে। নরেশ মজুমদারের স্ত্রীও ছিল। পালাবার সময় টর্চ দেখাচ্ছিল।

আপনি কে?

নানক চৌধুরী প্রফেসর।

নানক চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে পুলিশ অফিসার খুব বেশি প্রভাবিত হননি। শুধু বললেন, পালিয়ে যাবে কোথায়?

এত রাতেও পাড়ার লোক মন্দ জমেনি চার দিকে। তা ছাড়া চারিদিকের বাড়ির জানালা বা বারান্দায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছে।

রাস্তার ভিড় থেকে সুরেন খাঁড়া এগিয়ে এসে একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, মদনদা, তোমরা একটা মাতাল আর চ্যাংড়া রিকশাওলার কথায় বিশ্বাস করে অ্যারেস্ট করতে এলে, এটা কেমন কথা?

পুলিশ অফিসারের নাম মদন। সুরেনের সঙ্গে এ অঞ্চলের সকলের খাতির। অফিসার একটু ভ্রূ কুঁচকে বলেন, অ্যারেস্ট করতে এসেছি বললে ভুল হবে। আসলে এসেছি এনকোয়ারিতে। তা তুমি কিছু জানো নাকি সুরেন?

কী আর জানব? শুধু বলে দিচ্ছি, কালুর কথায় নেচো না। ও মহা বদমাশ। গগনকে আমরা খুব ভাল চিনি। সে কখনও কোনও ঝঞ্ঝাটে থাকে না।

থাকে না তো পালাল কেন?

সে পালিয়েছে কে বলল! পালায়নি। হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে ভয় খেয়ে। মদনদা, তোমাদের কে না ভয় খায় বলো?

পুলিশ অফিসার একটু হেসে বললেন, আরও একজন এভিডেন্স দিয়েছে, শুধু কালুই নয়। গগনবাবুর ল্যান্ডলর্ড নরেশ মজুমদার। আবার এই প্রফেসর ভদ্রলোক বলেছেন, গগনের সঙ্গে একটু আগেই নাকি মিসেস মজুমদারকেও দেখা গেছে। তোমাদের এ পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার বেশ ঘোরালো দেখছি।

নরেশ মজুমদার এতক্ষণ নামেনি। এইবার নেমে আসতে সবাই তার চেহারা দেখে অবাক। রাস্তার বাতি, পুলিশের টর্চ আর বাড়ির আলোর জায়গাটা ফটফট করছে আলোয়। তাতে দেখা গেল নরেশ মজুমদারের চোখে-মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ। চুলগুলো এলোমেলো। গায়ে জামা-গেঞ্জি কিছুই নেই, পরনে একটা লুঙ্গি মাত্র।

নরেশ নেমে এসেই মদনবাবুকে হাতজোড় করে বলে, ভিতরে চলুন। আমার কিছু কথা আছে।

মদন সুরেনের দিকে ফিরে একটু চোখ টিপলেন। প্রকাশ্যে বললেন, সুরেন, তুমি তো পাড়ার মাথা, তা তুমিও না হয় চলো সঙ্গে।

নরেশ বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সুরেন খুব ডাঁটের সঙ্গে বলে, নরেশবাবু কথা আপনার যা-ই থাক, বিনা প্রমাণে আপনি গগনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেননি। কাল সন্ধেবেলা গগন জিমনাশিয়ামে ছিল, ত্রিশ-চল্লিশ জন তার সাক্ষী আছে।

নরেশ গম্ভীরমুখে বলে, সব কথা ভিতরে গিয়েই হোক। রাস্তা-ঘাটে সকলের সামনে এ সব বলা শোভন নয়। আসুন।

নরেশের পিছু পিছু সুরেন আর মদন ভিতরে ঢোকে।

নানক চৌধুরী ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তাকে ওরা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। অথচ একটা অতি গুরুতর ব্যাপারের সে প্রত্যক্ষদর্শী।

ঘরের এক ধারে একটা রিভলভিং চেয়ারে বেগম আধ-শোয়া হয়ে চোখ বুজে আছে, কপালে একটা জলপট্টি লাগানো, ডান হাতের দুটো আঙুলে কপালের দু'ধার চেপে ধরে আছে। তার কান্না শোনা যাচ্ছে না, তবে মাঝে মাঝে হেঁচকির মতো শব্দ উঠছে।

শোভারানি ভিতরের দরজায় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তার দু'চোখে বেড়ালের জ্বলন্ত দৃষ্টি।

নরেশ মজুমদার যখন তার অতিথিদের এনে ঘরে ঢুকল তখন শোভারানির ঠোঁটে একটা হাসি একটু ঝুল খেয়েই উড়ে গেল।

বেগম এক বার রক্তরাঙা চোখ মেলে তাকায়। আবার চোখ বুজে বসে থাকে।

নরেশ মজুমদার বেগমের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মদনের দিকে চেয়ে বলে, ওই হল ফলির মা, আমার শালি।

মদন গম্ভীরমুখে বলে, ও সব আমরা জানি।

নরেশ মজুমদার এ কথায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, এতক্ষণ আমি আমার শালির সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

মদন আর সুরেন দু'টি ভারী নরম সোফায় বসে। সুরেন বলে, অনেক রাত হয়েছে নরেশবাবু, কথাবার্তা চটপট সেরে ফেলুন।

নরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সুরেনের দিকে চেয়ে বলে, আপনি বলছিলেন গতকাল গগন সন্ধেবেলায় জিমনাশিয়ামে ছিল। আপনি কি ঠিক জানেন ছিল?

আলবত।— সুরেন ধমকে ওঠে।

নরেশ মাথা নেড়ে বলে, না সুরেনবাবু গগন সন্ধেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল না। সে সন্ধে সাতটার পর ব্যায়াম শেখাতে আসে। তারও সাক্ষী আছে।

সুরেন পা নাচিয়ে বলে, এ এলাকায় গগনকে সবাই চেনে নরেশবাবু। সে দেরি করে জিমনাশিয়ামে এলেও কিছু প্রমাণ হয় না। জিমনাশিয়ামে যাওয়ার আগে সে কোথায় ছিল সেইটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য? তার জবাবে বলি, যেখানেই থাক লুকিয়ে ছিল না। আপনি গগনের পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো।

এ কথা শুনে বেগম আবার তার রক্তরাঙা চোখ খুলে তাকাল। সোজা সুরেনের দিকে চেয়ে কান্নায় ভাঙা ও ভারী স্বরে বলল, গগনবাবু কাল সন্ধেবেলা কোথায় ছিলেন তা কি আপনার জানা আছে?

না।

তা হলে জামাইবাবুকে খামোকা চোখ রাঙাচ্ছেন কেন? যদি জানা থাকে তা হলে সেটাই বলুন।

মদন কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার বলল, ও সব কথা থাক। সাসপেক্ট কোথায় ছিল না-ছিল সেটা পরে হবে। আপাতত আমি জানতে চাই আপনারা কোনও ইনফর্মেশন দিতে চান কি না, আজেবাজে খবর দিয়ে আমাদের হ্যারাস করবেন না। কংক্রিট কিছু জানা থাকলে বলুন।

নরেশ মজুমদার বলল, ফলি কি খুন হয়েছে?

মদন গম্ভীর মুখে বলে, পোস্টমর্টেমের আগে কী করে তা বলা যাবে?

খুন বলে আপনাদের সন্দেহ হয় না?

আমরা সন্দেহ-টন্দেহ করতে ভালবাসি না। প্রমাণ চাই।

কিন্তু আই-উইটনেস তো আছে।

সুরেন ফের ধমকে ওঠে, উইটনেস আবার কী? একটা বেহেড মাতাল কী বলেছে না বলেছে সেটাই ধরতে হবে নাকি?

শোভারানি এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার সামান্য সুর করে নরেশকে বলল, তোমার অত দরদ কীসের বলো তো?

তুমি ভিতরে যাও।

কেন, তোমার হুকুমে নাকি?

নরেশ রেগে গিয়ে বলে, যাবে কি না!

যাব না। আমারও কথা আছে।

কী কথা?

তা পুলিশকে বলব।

মদন হাই তুলে বলল, দেখুন, এখনও কেসটা ম্যাচিওর করেনি। চিলে কান নেওয়ার বৃত্তান্ত। খুন না দুর্ঘটনা কেউ বলতে পারছে না। আপনারা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

নরেশ বলল, যদি খুনটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে?

কিন্তু খুনের তো কিছু কংক্রিট প্রমাণ বা মোটিভ থাকবে।

নরেশ বলল, আপনারা পুলিশের কুকুর আনলেন না কেন? আনলে ঠিক—

মদন হেসে উঠে বলে, কুকুরের চেয়ে মানুষ তো কিছু কম বুদ্ধি রাখে না। আপনার যা বলার বলুন না।

বেগম তার রিভলভিং চেয়ার আধপাক ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে, আমাদের তেমন কিছু বলার নেই। তবে আমাদের যা সন্দেহ হচ্ছে তা আপনাদের বলে রাখলাম। আপনারা কেসটা চট করে ছেড়ে দেবেন না বা অ্যাকসিডেন্ট বলে বিশ্বাস করবেন না।

ঠিক আছে। এ ছাড়া আর-কিছু বলবেন?

গগনবাবুকে আপনারা ধরতে গেলেন না?

কেন ধরব?— মদন অবাক হয়ে বলে।

ধরতেই তো এসেছিলেন!

মদন হেসে বলল, হুটহাট লোককে ধরে বেড়াই নাকি আমরা?

তা হলে কেন এসেছিলেন?

আপনার জামাইবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা ছাড়া কালুও কিছু কথা আমাদের কাছে বলেছে। আমরা তাই গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উনি তো পালিয়ে গেলেন। তাইতেই তো প্রমাণ হয় ওঁর দোষ কিছু-না-কিছু আছে।

সুরেন ঝেঁকে উঠে বলে, না, হয় না।

নরেশ বলে, কালু যে গগনকে দেখেছে নিজের চোখে সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?

এবার পুলিশ অফিসার মদন একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, নরেশবাবু, কালু কিন্তু কারও নাম বলেনি। আর গগনবাবু যে পালিয়েছেন সেও গট-আপ ব্যাপারটা হতে পারে। কারণ পাড়ার একজন বলছেন যে, একটু আগে আপনার স্ত্রীই নাকি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।

আট

ট্যাক্সিতে বসে গগন কিছুক্ষণ মাথা এলিয়ে চোখ বুজে রইল। মাথাটা বড্ড গরম, গা-ও গরম। মনের মধ্যে একটা ধাঁধা লেগে আছে।

গোলপার্কের কাছ বরাবর এসে ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবেন?

কোন চুলোয় যাবে তা গগনের মাথায় আসছিল না। কলকাতায় তার আত্মীয়স্বজন বা চেনাজানা

লোক হাতে গোনা যায়। কালীঘাটে এক পিসি থাকে। কিন্তু পিসির অবস্থা বেশি ভাল নয়। ছেলের বউয়ের সংসারে বিধবা পিসি কোল ঘেঁষে পড়ে থাকে, তার কথার দাম কেউ বড় একটা দেয় না। তা ছাড়া আপন পিসিও নয়, বাবার মামাতো বোন।

আর এক যাওয়া যায় ছটকুর কাছে। বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না বটে কিন্তু ছটকু একসময়ে গগনের সবচেয়ে গা-ঘেঁষা বন্ধু ছিল।

গগনের বন্ধু মানেই গায়ের জোরওলা, পেশিবহুল মানুষ। ছটকু ঠিক তা নয়। আড়ে-বহরে ছটকু খুব বেশি হবে না। সাড়ে পাঁচ ফুটিয়া পাতলা গড়নের ছিমছাম চেহারা। তবে কিনা ছটকু একসময়ে বালিগঞ্জ শাসন করত। আর সেটা করত বুদ্ধির জোরে। মারপিট করতে ছটকুকে কম লোকই দেখেছে। তবে দারুণ তেজি ছেলে, দরকার পড়লে দু'হাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে। ফেদার ওয়েটে ভাল বক্সার ছিল কলেজে পড়ার সময়। গগন যখন কলেজে পড়তে আসে ওই ছটকু ছিল তার ক্লাসের বন্ধু, পরে জিমনাশিয়ামে গায়ের ঘাম ঝরাতে গিয়ে পরিচয়টা আরও গাঢ় হয়।

বক্সিং ছটকু খুব বেশি দিন করেনি, কলেজের প্রথম দিকে খুব লড়ালড়ি করল কিছুদিন। ফোর্ট উইলিয়ামে এক কমপিটিশনে জিতেও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই পড়াশুনোর তাগিদে সে সব ছেড়ে ভাল ছাত্র হয়ে গেল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। ফার্স্টক্লাস পেল, এম এসসিতেও তাই। কিছুদিন বোম্বাই গিয়ে চাকরি করল। সেখান থেকে গেল বিলেত, বিলেতে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে কিছুদিন ভুগে ছ'মাস বাদে ফিরে এল। বলল, বিলেত কি আমাদের পোষায়! টাকাটাই গচ্চা।

ছটকু বড়লোকের ছেলে। তার বাবা সরকারি ঠিকাদার, জাহাজের মাল খালাস করার ব্যবসাও আছে। এলাহি বাড়ি, এলাহি টাকা। বিলেত থেকে ফিরে এসে ছটকু কলকাতায় চাকরি নেয়। গগন কিছুদিন আগে খবর পেয়েছে যে ছটকু চাকরি ছেড়ে ব্যাবসা করছে, খুব বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং বউয়ের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না।

কোনও মানুষই নিখাদ সুখে থাকে না। পৃষ্ঠব্রণ একটা না একটা থাকবেই। ভেবে গগন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ট্যাক্সিওলাকে বলল, ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস।

ছটকুদের বাড়িটা এত রাতেও জেগে আছে। পুরোটা জেগে আছে বললে ভুল হবে। দোতলা-তেতলার বেশির ভাগই অন্ধকার। তবু দু'-চারটে জানালায় আলো জ্বলছে। দোতলার বাঁ-দিকের কোণের ঘরটা ছটকুর। তাতে আলো দেখা যাচ্ছে। সদরটা খোলা। দুটো দারোয়ান বসে কথা কইছে।

গগন ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে সদরে উঠতেই দারোয়ানদের একজন বলে ওঠে, কাকে চাইছেন?

ছটকু আছে?

আছে।

একটু ডাকবে ওকে? বড় দরকার। বলো গগন এসেছে।

দেখি।— বলে দারোয়ান ভিতরে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করতে হল। হঠাৎই পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছটকু দরজায় দেখা দিয়ে অবাক হয়ে বলে, তুই কোত্থেকে রে?

কথা আছে। রাতের মতো একটু থাকতে দিবি?

হোল লাইফ থেকে যা না। আয় আয়।

গগন শ্বাস ফেলে বাঁচল। ছটকুর বউকে সে চেনে না। সে মহিলা কেমন হবে কে জানে! যেখানে মহিলারা সুবিধের নয় সেখানে থাকা বড় জ্বালা। তার ওপর ছটকুর সঙ্গে তার বউয়ের বনিবনা নেই বলে শুনেছে। তাই স্বস্তির মধ্যেও একটু কাঁটা বিঁধে রইল মনে। নিখাদ সুখ বলে তো কিছু নেই।

ছটকুর পিছু পিছু দোতলায় উঠে এল গগন। এ বাড়িতে সে আগেও এসেছে। বড়লোকদের বাড়ি

যেমন হয় তেমনি সাজানো। যেখানে কার্পেট পাতা নেই সেখানকার মেঝে এত তেলতেলে আর ঝকঝকে যে পা পিছলে যেতে পারে।

ছটকুর ঘর তিনটে। কোণেরটা শোওয়ার ঘর। ঢুকতেই বিশাল একটা বসবার ঘর। বাঁ দিকেরটা স্টাডি। বরাবর তিনখানা ঘর ছটকু একা ভোগ করেছে। এ সব দেখে নিজের গ্যারেজের ঘরখানার কথা ভাবলে গগনের হাসি পায়। মানুষে মানুষে অবস্থার পার্থক্য কী বিপুল আশমান-জমিন!

বসবার ঘরে মেঝে-ঢাকা পুরু উলের গালচে। গাঢ় খুনখারাপি রঙের। দারুণ সব সোফা আর কৌচ, বিশাল রেডিয়োগ্রাম, টি ভি সেট, বুককেস, কাচের শো-বকস। দরজায় পরদার বদলে লম্বা হয়ে ঝুলছে সুতোয় গাঁথা বড় বড় পুঁতির মালা।

ছটকু তাকে বসিয়ে একটা চাকা লাগানো পোর্টেবল রুম এয়ার-কন্ডিশনার কাছে টেনে এনে চালু করল। হিমঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল গগনের শরীরে। বড় ভাল হাওয়াটা।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা মেঝেয় রেখে গগন একটা আরামের 'আঃ' শব্দ করে চোখ বুজে থাকে। মুখোমুখি বসা ছটকু কিন্তু একটা প্রশ্নও করেনি। চুপ করে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল, সময় দিল গগনকে।

গগন খানিক বসে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারল যে এবার তার কিছু বলা উচিত। ছটকু কী ভাবছে?

গগন বলে, তোর বউ ঘুমিয়েছে?

কেন?— ছটকুর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

না, বলছিলাম কী পাশের ঘরে উনি এখন ঘুমিয়ে আছেন আর আমরা কথাবার্তা বলছি, এতে ওঁর ডিসটার্ব হতে পারে।

নিভন্ত পাইপটা আবার ধরিয়ে ছটকু মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোয়নি, একটু আগেই কথা হচ্ছিল।

গগন আড়চোখে দেখে পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। জোরালো আলো নয়, মিষ্টি একটা হলুদ আভার বাতি। শোওয়ার ঘরের দরজায় ফুটফুটে সাদা জালি পরদা ঝুলছে। ওপাশে যে মহিলা আছেন তিনি গগনকে কী চোখে দেখবেন সেইটাই সমস্যা।

গগন বলল, একটু বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি।

ছটকু হেসে বলে, গগ্, বিপদটা একটু নয়। একটু বিপদে পড়ে এত রাতে তুই আসিসনি।

বরাবরই ছটকু তাকে গগ্ বলে ডাকে। প্রথম জীবনে ছটকু তার নাম দিয়েছিল গগ্যাঁ। গগন থেকে গগ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত আঁকিয়ে গগ্যাঁর সঙ্গে নাম মিলিয়ে। পরে আর-এক আর্টিস্টের নামের সঙ্গে মিলিয়ে গগ্ বলে ডাকত। ছটকুর ওই স্বভাব, যে কারও নামই খানিকটা পালটে বা বিকৃত করে ডাকবে।

গগন রুমালে মুখ-গলা মুছে বলল, বিপদটা কঠিন বলে মনে হয় না। তবে আমার একজন হিতৈষিণী আমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছে।

হিতৈষিণীটি কে?

ল্যান্ডলর্ডের বউ। নাথিং রোমান্টিক।

অ। আর বিপদটা?

একটা খুনের ব্যাপার।

খুন!— বলে ভ্রু তোলে ছটকু।

গগনের হাসি আসে না, তবু দাঁত দেখিয়ে গগন বলে, খুন কি না জানি না। তবে কেউ কেউ বলছে খুন। আর তাতে আমাকে ফাঁসানোর একটা চেষ্টা হয়েছে।

ছটকু কী একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে সামলে গেল। কিছু একটা টের পেয়েছিল ছটকু। কারণ কথাটা গগন শেষ করার পরপরই শোয়ার ঘর থেকে একটি মেয়ে বাতাসে ভেসে আসবার মতো এ ঘরে এল। ভারী উদাসীন নিঃশব্দ আর অনায়াস হাঁটার ভঙ্গি।

এত সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গায়ের রং, তেমনি ফিগার আর মুখখানা। এইসব মুখের জন্য দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। লম্বাটে, পুরন্ত, ধারালো সুন্দর সেই মুখশ্রী, ভারী দু'খানা চোখের পাতা আধবোজা। অল্প একটু লালচে চুলের ঢল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনে একটা রোব।

ঘরে ঢুকে গগনের দিকে দু'-এক পলক নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে মেয়েটি। ঘরটা এক সুগন্ধে ভরে যায়।

ছটকু ওর দিকে পিছন ফিরে বসে ছিল। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, লীনা, এ আমার বন্ধু গগন চৌধুরী।

লীনা কথা বলল না। তবে একটু ভ্রু কুঁচকে বলল, নাইস টাইম ফর এ ফ্রেন্ড টু কল।

ছটকু সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলে, লিভ ইট।

লীনা বসবার ঘরের পিছনে বড় পরদার ওপাশে আড়ালে চলে যায়।

ছটকু আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, কী খাবি?

খাব?— গগন অবাক হয়ে বলে, খাব কী রে?

না খেয়ে থাকবি নাকি? না কি লজ্জাটজ্জা পাচ্ছিস?

বাস্তবিক গগন লজ্জা পাচ্ছিল। সঙ্গে আবার একটু ভয়ও। এইমাত্র ছটকুর বউ লীনা অ্যায়সা দারুণ অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বুলি ঝেড়েছে যে তাতেই গগন থমকে গেছে, ইংরিজিটা তো মেমসাহেবের মতো বলেই, তার ওপর মেজাজও সেই পরদায় বাঁধা। তাই গগন বড় ভিতু-সিতু হয়ে পড়েছে।

ছটকু একটু হাসল। বরাবর ছটকুর মাথা ক্ষুরের মতো ধারালো। টক করে অনেক কিছু বুঝে নেয়। গগনের ব্যাপারটাও বুঝে নিয়ে বলল, ঘাবড়াচ্ছিস? কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার ঘর এটা, আমিই মালিক। তোর কে কী করবে?

গগন বলে, আরে দূর! ও সব নয়। আমার খিদেও নেই।

অত বড় শরীরটায় খিদে নেই কী রে? দাঁড়া, ফ্রিজে কিছু আছে কি না লীনাকে দেখতে বলছি।

এই বলেই বেশ গলা ছেড়ে দাপটে হাঁক দিল ছটকু, লীনা! এই লীনা—

অত্যন্ত ভয়াবহ মুখে লীনা পরদা সরিয়ে দেখা দেয়। চুলের একটা ঝাপটা তার অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখে সাপের চাহনি, মাথাটা এক বার ঝাঁকিয়ে বলে, চেঁচিয়ে কি নিজেকে অ্যালার্ট করতে চাইছ? কী বলবে বলো।

ছটকু সুখে নেই তা গগন নিজের দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও বুঝতে পারে। মেয়েছেলেরা অ্যায়সা হারামি হয় আজকাল!

ছটকু গম্ভীর মুখে কিন্তু ঠান্ডা গলায় বলে, গগনকে কিছু খেতে দাও।

লীনা খুব অবাক হয়ে গগনের দিকে তাকায়। এত রাতে একটা উটকো লোক এসে খেতে চাইবে এটা যেন কল্পনার বাইরে।

গগন মিন মিন করে বলল, না, না, আমার কিছু লাগবে না।

লাগবে।— ছটকু ধমক দেয়।

লীনা অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে খুব চাপা সরু গলায় বলে, তা সেটা আমাকে হুকুম করছ কেন? বেল বাজালেই সামু আসবে। তাকে বলো।

বেলটা তুমিই না হয় বাজালে!

গগন না থাকলে লীনা আরও ঝামেলা করত। সেটা গগন ওর চোখের ঝাঁজালো কটাক্ষেই বুঝল। কিন্তু মুখে কিছু না-বলে দেয়ালের একটা বোতাম একবার টিপে দিয়ে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

ছটকু গগনের দিকে তাকিয়ে একটু যেন জয়ের হাসি হাসে। তবে হাসিটাতে বিষ মেশানো। আবার নিভে যাওয়া পাইপ ধরায়। বলে, বেশ আছি।

গগন একটু ঘামে। এয়ারকুলার যথেষ্ট ঠান্ডা হাওয়া দিয়ে তাকে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তবু গগন ঠান্ডা হচ্ছে না তেমন। পকেটে একগোছা নোট ভরে দিয়েছে শোভা। কেন দিয়েছে, কত দিয়েছে তা ভাববার বা দেখবার সময় পায়নি গগন। তবে দিয়েছে ঠিকই। এই টাকায় গগন বরং গিয়ে একটা হোটেলে উঠলে ভাল করত। এখানে এসে উপরি ঝামেলা পোয়াতে হত না। দুটো মানুষের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে তখন তার ফাঁপর অবস্থা।

ধোপদুরস্ত পায়জামা আর শার্ট পরা চাকর সামু এল। ছটকুর হুকুমে তক্ষুনি গিয়ে কোত্থেকে খাবার এনে ডাইনিং হলে সাজিয়ে দিল।

ছটকুর তাড়ায় গিয়ে খেতেও বসল গগন। বড়লোকের বাড়ি বটে কিন্তু এরা অখাদ্য ইংরেজি খানা খায়। এক পট সাদা মাংস দেখে সরিয়ে রাখল গগন। মাংস খায়ই না সে। দুটো চিজ স্যান্ডউইচ ছিল মস্ত মস্ত। একখানা কামড়ে তার তেমন ভাল লাগল না। তবে টমেটো, আর চিলি সস দিয়ে কোনওক্রমে গিলল সেটা। দ্বিতীয়টা ছুঁল না। এক বাটি সবজি দিয়ে রান্না ডাল ছিল, সেটা খেল চুমুক দিয়ে।

ছটকু উলটো দিকে বসে তার খাওয়া দেখছে। সামু সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়াল।

গগন বেসিনে হাত ধুয়ে বলল, তুই বুঝছিস না ছটকু, খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নয়।

ছটকু জবাব দেয় না। গগনকে নিয়ে ড্রয়িংরুম পার হয়ে স্টাডিতে ঢোকে। দরজা থেকেই ফিরে সামুকে হুকুম দেয়, এই সাহেবের বিছানা লাগিয়ে দাও স্পেয়ার রুমে।

স্টাডির দরজা বন্ধ করে ছটকু মস্ত সেকরেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিলবাতি জ্বলছিল বলে ঘরটা আবছা। দুটো এয়ারকুলার চালু আছে বলে বেশ ঠান্ডা। নিঝুমও বটে। এত নিস্তব্ধ ঘর গগন আর দেখেনি। মনে হয় খুব ভাল ভাবে সাউন্ডপ্রুফ করানো আছে। তা-ই হবে। দেয়ালে ছোট ছোট অজস্র ছিদ্র। রেডিয়ো স্টেশনের স্টুডিয়োতে গগন এ-রকম দেখেছে। একবার আকাশবাণীর বিদ্যার্থী মণ্ডলে সে স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলেছিল, তখন দেখেছে সাউন্ডপ্রুফ স্টুডিয়োর দেয়ালে এ রকম ফুটো থাকে। কথা বললে কোনও প্রতিধ্বনি হয় না।

এখানেও হল না। গগন বলল, তোকে খুব জ্বালাচ্ছি।

ছটকু মাথা নেড়ে বলল, না। বরং এসে আমাকে বাঁচালি। ওই ভ্যাম্পটার কাছ থেকে খানিকক্ষণ সরে থাকতে পারছি।

গগন চুপ করে থাকে। এ প্রসঙ্গটা কটু। না মন্তব্য করাই ভাল।

ছটকু বলল, এবার তোর কথা বল।

গগন কোনও ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করে না। ও জিনিসটাই তার নেই। যা করে বা বলে তা ভেবেচিন্তে গুছিয়ে। তাই খুব আস্তে আস্তে সে ঘটনাটা ছটকুর কাছে ভাঙতে লাগল।

খুব বেশি সময় লাগল না। মিনিট কুড়ি বড় জোর। ঘটনা তো বেশি নয়।

ছটকু যতক্ষণ শুনছিল ততক্ষণ তার দিকে তাকায়নি, মাথা নিচু করে ছিল। গগন থামতেই চোখ তুলে বলল, সব বলা হয়ে গেল? কিছু বাদ যায়নি তো?

না।— গগন বলে।

ছটকু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বলে, ঘটনার দিন খুনের সময়ে তুই কোথায় ছিলি?

গগন এটা ভেবে দেখেনি। তাই তো! কোথায় ছিল? অনেক ভেবে বলল, সন্ধের একটু পরে জিমনাশিয়ামে ছিলাম।

আর তার আগে?

একটু বোধহয় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম বাজারে।

কোন বাজারে?

গগন একটু চমক খেয়ে বলল, সাঁজবাজার।

সেটা তো স্পটের কাছেই।

গগনের গলা হঠাৎ শুকনো লাগছিল। নাড়ির গতি বাড়ল হঠাৎ। সে কেমন ভ্যাবলার মতো বলল, হ্যাঁ।

ছটকু একটু চিত হয়ে আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, আবার ভাল করে ভেবে দ্যাখ। কিছু একটা লুকোচ্ছিস।

না না।— গগন প্রায় আঁতকে ওঠে। আর তার পরেই নির্জীব হয়ে যায়।

বলে ফেল গগন।— ছটকু ছাদের দিকে চেয়ে বলে।

ঠান্ডা ঘরে হঠাৎ আরও ঠান্ডা হয়ে যায় গগন। উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে। বেগমের কথা সে ছটকুকে বলেনি। নিজের চরিত্রদোষের কথা কে-ই বা কবুল করতে যায় আগ বাড়িয়ে।

গগন কথা বলে না।

ছটকু পাইপ পরিষ্কার করতে করতে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বলে, তুই তো জানিস না, আমার হাতে এখন কোনও কাজ নেই। মানে বাবা আমাকে কোনও কাজ দিচ্ছে না, মোর অর লেস তাঁর একটা ধারণা হয়েছে যে আমি খুব অপদার্থ, বউয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করেই গোলমাল করছি। ফলে বাড়িতে এখন দারুণ অশান্তি, লীনা নাকি টের পেয়েছে যে আমি একজন বিগতযৌবনা ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের সঙ্গে শোয়া-বসা করে থাকি। বাড়িতে বলেওছে সে কথা।

গগন নড়ে বসে। সে সাহস পাচ্ছে।

পাইপে তামাক ভরে জ্বালিয়ে ছটকু বলে, কথাটা মিথ্যেও নয়। তবে কিনা সে মহিলাটির যৌবন এখনও যায়নি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, শরীরের সম্পর্ক হয়নি এমন নয়, তবে কোনও সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট নেই। প্রেম-ট্রেম তো নয়ই। জাস্ট এ সর্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ। উঁচু সমাজে খুব চলে এটা। নাক সিঁটকোবার কিছু নেই। তা ছাড়া বিয়ের পর মেয়েটির সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ইনি। কিন্তু লীনা সেটাকে ঘুলিয়ে তুলছে।

মেয়েটি কে?

তুই চিনবি না, পঞ্চাশের ডিকেডে ফিল্মে নামত। তেমন নাম-টাম করেনি। যা বলছিলাম, এ সব কারণে আমার অবস্থাটা খুব খারাপ ফ্যামিলিতে। অলমোস্ট জবলেস ভ্যাগাবন্ড, বউয়ের সঙ্গে শুই না। কিছুদিন মদ খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা আমার স্যুট করে না একদম। বদহজম আর অ্যাসিড হয়ে অসম্ভব কষ্ট পাই। একজন বন্ধু জুটে কিছুদিন ড্রাগের নেশা করাল, খুব জমেছিল নেশাটা, বাবা নার্সিংহোমে ভরতি করিয়ে কিওর করাল। শেষ পর্যন্ত দেখলাম সুকুমার রায়ের সেই অবস্থা। হাতে রইল পেনসিল। বউয়ের সঙ্গে বনে না, বাপের সঙ্গে বনে না, মদের সঙ্গে বা ড্রাগের সঙ্গেও বনে না, কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে।

বলে পাইপটা দেখিয়ে একটু হেসে চোখ টিপে বলে, এর মধ্যে যে টোব্যাকো রয়েছে, তাতে আছে অল্প গাঁজার মিশেল। গন্ধ পাচ্ছিস না?

না!

কিন্তু আছে। আজকাল নানা রকম নেশার এক্সপেরিমেন্ট করি। সময় কাটে না। বুঝলি গগন?

বুঝলাম।

তাই বলছিলাম তোর সব কথা আমাকে বল। তোকে নিয়ে আর তোর প্রবলেম নিয়ে একটু ভাবি। সময় কাটবে।

ছটকুকে গগন খুব চেনে। ও কুকুরের মতো বিশ্বাসী, কম্পিউটারের মতো মাথা ওর। ছটকুকে

বক্সিং অভ্যাস করতে দেখেছে গগন। অজস্র মার খেত, মারত। রোখ ছিল সাংঘাতিক। ভিতু নয়, লোভী নয়। ওকে বিশ্বাস করতে বাধা নেই।

কিন্তু গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হাই তুলে বলল, তোকে আমার সব কথা বললাম কেন জানিস? যাতে আমাকে তোর অবিশ্বাস না হয়। বিশ্বাস কর, আমার তোকে হেলপ করতে ইচ্ছে করছে।

গগন চোখ বুজে এক দমকায় বলে উঠল, ফলির মায়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

ঠান্ডা মুখে কথাটা শুনল ছটকু। একটু সময় ছাড় দিয়ে ঠান্ডা গলাতেই প্রশ্ন করে, ফলির মা কে?

ওঃ, সে একজন সোসাইটি লেডি।— গগন আবার চোখ বুজে বলে।

সোসাইটি লেডি? তার সঙ্গে তোর দেখা হল কোথায়?

হয়ে গেল।

হয়ে গেল মানে? তোর কাছ থেকে সে পাবে কী? সোসাইটি লেডি বলতে আমরা অন্য রকম বুঝি। একটু নাক-উঁচু স্বভাবের, সিউডো ইনটেলেক্ট-ওলা মহিলা। এরা জেনারেলি হাই ফ্যামিলির মেয়ে। যেমনটা একদিন লীনা হবে।

গগন নিজের হাতের ঘাম প্যান্টে মুছে বলে, এও অনেকটা সে রকম, তবে হাই ফ্যামিলির নয়, স্বামী সামান্য চাকরি করে।

খদ্দের ধরে পয়সা নেয় নাকি?

না বোধহয়। তবে প্রেজেন্টেশন নেয়, সুবিধে আদায় করে, ধারও নেয়।

ছটকু হেসে বলে, তা হলে হাফ-গেরস্ত বল। ও সব মেয়েকে আমরা তাই বলি। সোসাইটি লেডি অন্য রকম, যদিও জাত একই। তোর কাছ থেকে কী নিত?

কী নেবে? আমার আয় তো জানিস। চাইলেও দিতে পারতাম না। তবে চায়নি।

শুধু শরীর?

শুধু তাই।— গগন লজ্জা পেয়ে বলে।

ছটকু চিন্তিত হয়ে বলে, ও সব মেয়ে তো ভাল তেজি পুরুষ বড় একটা পায় না। যারা আসে তারা প্রায়ই বুড়ো-হাবড়া কামুক, নইলে নভিস। তাই তেমন পুরুষ পেলে বিনা পয়সায় নেয়। নিতান্ত শরীরের স্বার্থে। তারপর কী হল?

কিছুদিন পর ফলির মা বেগম আমাকে রিজেক্ট করে দেয়। গেলে আর খুশি হত না আগের মতো। আমি কিন্তু ওকে দারুণ ভালবেসে ফেলেছিলাম।

বুঝেছি।

মনে মনে বেগমের জন্য খুব ছটফট করেছি বহু দিন। এখনও করি। যাই হোক, ফলি যেদিন মারা যায় তার দিন দুই আগে বেগমের একটা চিঠি পাই। তাতে ও লিখেছিল, একটা বিশেষ দিনে সন্তোষপুরের একটা ঠিকানায় গিয়ে যেন দেখা করি ওর সঙ্গে। খুব জরুরি কথা, যেদিনের কথা লিখেছিল সেটা ছিল খুনের তারিখটাই।

বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

না। সে ঠিকানায় গিয়ে আমি বুড়বাক। সেখানে বউ-বাচ্চা নিয়ে এক প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার দিব্যি সংসার করছে। বেগমের কথা তারা জানে না।

বেগমের হাতের লেখা তুই চিনিস?

না।

তবে বুঝলি কী করে যে বেগম লিখেছিল?

অবিশ্বাসের তো কিছু ছিল না!

যাক গে। তারপর কী হল?

কী হবে? ওকে না পেয়ে ফিরে এলাম।

কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আসবার পথে?

গগন চুপ করে থাকে। বলা উচিত হবে কি? অথচ না-বললেই বা গগন পারে কী করে? এত দূর এগিয়ে আবার পিছোবে?

গগন চোখ বুজে বলে, ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

এ কথায় ছটকুও যেন চমকে যায়। তবে গলার স্বরটা খুবই ঠান্ডা রেখে বলে, কোথায়?

বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল। আমাকে দেখে উঠে আসে।

কথা যা হয়েছিল তা মিঠে বা মোলায়েম নয়। একসময়ে সে আমাকে একলব্যের মতো ভক্তি করত, কথায় প্রাণ দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেদিন সে হুট করে বেরিয়ে এসে আমার রাস্তা আটকে বলল, গগনদা, আপনার সঙ্গে কথা আছে। তার মুখ-চোখ দেখে আর গলার স্বর শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। একটু যে ভয়ও খাইনি তা নয়। বে-জায়গায় হঠাৎ ও রকম সিচুয়েশন হলে যা হয়। আমতা আমতা করছিলাম, কারণ মনে পাপ। আমি এসেছিলাম ওর মা'র চিঠি পেয়ে দেখা করতে, সেটা তো ভুলতে পারছি না। ও আমাকে একটা দোকানঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি বলল, আমার মা'র সঙ্গে আপনার খারাপ রিলেশন আছে আমি জানি, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক এ ভাষায় বলেনি, তবে সেন্সটা এই রকমই। তখন আর গগনদা বলে ডাকছিল না।

মারধর করার চেষ্টা করেছিল?

হ্যাঁ, দু'-চারটে কথা চালাচালি হল। আমি দুম করে বলে বসলাম, বেগম কি আমার জন্যই নষ্ট? ওর তো অনেক খদ্দের, খোঁজ নিয়ে দেখোগে। আমি আবার মিথ্যে কথাটথা বানিয়ে গুছিয়ে বলতে পারি না। বেগমের সঙ্গে আমার রিলেশনটা যে অন্য রকম যে কোনও লোক হলে তা দিব্যি বানিয়ে-ছানিয়ে বলত। আমি পারিনি। যা হোক, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেমক্কা একটা পিস্তল বের করল পকেট থেকে। ওর চোখ দুটো তখন পুরো খুনির। দোকানের পিছনের সেই জায়গাটা আবছা অন্ধকার মতো। সেই আবছায়ায় দু'-চারজন যে গা-ঢাকা দিয়ে দেখছে তা বুঝতে পারছিলাম। তাদেরই একজন এ সময়ে বলে উঠল, ফলি, চালাস না। স্টিল ভরে দে। ফলি তাতে দমেনি। পিস্তলটা তুলে বলল, তোমাকে এইখানে নাকখত দিতে হবে, থুতু চাটবে, জুতো কামড়ে ঘুরবে, তারপর তোমার পাছায় লাথি মারব। বুঝলাম খুন না-করলেও ফলি এবং তার বন্ধুরা আমাকে বেদম পেটাবে। তার আগে নানা রকম ভাবে অপমান করবে। ফলি আর আগের ফলি নেই।

তুই কী করলি?

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অতটা ভয় না পেলে আমি ফলিকে মারতাম না।

মেরেছিলি?

গগন অবাক হয়ে বলে, তুই কি বলিস, মারা উচিত হয়নি?

ছটকু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তা বলিনি। শুধু জানতে চাইছি।

গগন একটু অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে, আমিও ভেবে দেখেছি মারাটা উচিত হয়েছে কি না, কিন্তু আমার আর কী করার ছিল? বুঝি যে মায়ের নষ্টামির জন্য ছেলের অপমানবোধ হয়, হতেই পারে। কিন্তু ফলির মাকে তো আমি নষ্ট করিনি, কোনও দিনই আমি মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরি না, কিন্তু বেগম আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। তার জন্য ফলি খামোখা আমার উপর শোধ নেবে আর আমি দাঁড়িয়ে মার খাব নাকি? তা ছাড়া তখন প্রাণের ভয়।

কী করলি?

ফলি চোখেই দেখতে পেল না কী ওর মুখে গিয়ে লাগল, খুব কুইক ঝেড়েছিলাম ঘুষিটা। ফলি অ্যাই জোয়ান। সহজে কাবু হওয়ার মাল নয়, তার ওপর হাতে পিস্তল ছিল। কাজেই সে ছিল

নিশ্চিন্ত। আশেপাশে বন্ধুবান্ধবও রয়েছে। ভয় কী? তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় আচমকা ঘুসি খেয়েই টলে পড়ল সামারসল্ট হয়ে। আমি দুই লাফে বেরিয়ে বাজার ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসি।

তা হলে তোকে অনেকে দেখেছিল তখন।

দেখাই স্বাভাবিক। দোকানে লোক ছিল, বাজারে তো তখন গিজগিজ করছে।

কেউ তোর পিছু নেয়নি?

না।

তারপর কী করলি?

সোজা জিমনাশিয়ামে চলে যাই।

ছটকু আবার পাইপ ভরে বলে, রিকশাওয়ালা কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল গগন?

গগন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর যেন ছিপি খুলে সোডার বোতলের গ্যাস বের করে দেয়, আস্তে করে বলে, জানি না।

এমনিতেই শব্দহীন ঘর। তার ওপর যেন আরও ভারী এক নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ছটকু গগনের চোখে চোখ রেখে চোখাদৃষ্টিতে কী একটু দেখে নেয়। তারপর গম্ভীর মুখেই বলে, ঠিক বলছিস?

গগন ভাবছে, ছটকু শালা কি আমাকেই সন্দেহ করছে? করারই কথা অবশ্য। ঘটনা যা ঘটেছে তার সবকিছুই আঙুল তুলে তাকেই দেখাচ্ছে।

গগন ছটকুর চোখের দিকে আর না-তাকিয়ে বলে, আমি টাকা দিইনি। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্য হয়তো কখনও কালুকে টাকাটা দেব। যদি তাতে মেটে!

মিটবে না।— ছটকু বলে।

গগন বলে, বিশ্বাস কর, ফলিকে একটা ঘুসি মারা ছাড়া আর-কিছু করিনি। এক ঘুসিতে মরার ছেলে ফলি নয়। পরে আর-কেউ লাইনের ধারে ফলিকে মারে।

ছটকু খুব বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, দ্যাখ গগন, যে মানুষ জীবনে একটাও খুন করেছে তাকে চোখে দেখেই আমি চিনতে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ইনস্টিংট আছে। এ ব্যাপারে কখনও ভুল হয় না আমার। তুই যদিও কখনও ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় কাউকে খুন করে থাকিস, তবে তোকে প্রথম দেখেই বুঝতে পারতাম। কিন্তু এটা খুবই সত্যি কথা যে তোর চেহারায় খুনির সেই অবশ্যম্ভাবী ছাপটা নেই।

গগন নিশ্চিন্ত হল কি? বলা যায় না, তবে সে এবার কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে দম নিল। বলল, আমি যে খুন করিনি তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! কিন্তু লোকে কি তা বিশ্বাস করবে? সকলের তো আর তোর মতো ইনস্টিংট নেই।

ছটকু একটু হাসে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, ফলি যে লাইফ লিড করত তাতে যে-কোনও সময়ই তার খুন হওয়ার বিপদ ছিল। এ নিয়ে ভাবিস না। কাল থেকে আমি তোর ব্যাপারটা নিয়ে অ্যাকশনে নামব। সকালে ক'টায় উঠিস?

খুব ভোরে। চারটে-সাড়ে চারটে।

ছটকু একটু ভেবে বলে, আমি উঠি ছ'টায়, কিন্তু কাল থেকে আমি তোর মতো সকালে উঠব। মনে হচ্ছে, একটু একসারসাইজ দরকার। সকালে উঠে দৌড়োবি?

নয় কেন?

দৌড়ের পর দু'জনে একটু কসরতও করা যাবে, কী বলিস?

গগন হাসে। বলে, ঠিক আছে।

নয়

অনেক রাত পর্যন্ত বেগম অঝোরে কেঁদেছে পুত্রশোকে। নরেশ পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে আনে। বড় ডোজের সেডেটিভ ইনজেকশন দেওয়ার পর বেগম ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক বেলা অবধি সে ওঠেনি।

নরেশ সারারাত ঘুমোয়নি। কখনও কেঁদেছে, কখনও পায়চারি করেছে ঘরে বা ছাদে। শোভা তার তীব্র জ্বালা-ধরা দু'খানা চোখে দেখেছে সবই, সেও ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে বিছানায় গেছে, আবার উঠেছে, দেখেছে, তারপর আবার শুয়েছে। বিছানা খুব তেতে যাচ্ছিল বার বার। কী এক জ্বালায় তার নিজের শরীর আর শ্বাস এত গরম যে বিছানায় শরীর রাখতে পারছে না। সোফা কৌচে বসতে পারে না। নরেশের সঙ্গে মুখোমুখি কথাও হচ্ছিল না তার। দু'জনেই দু'জনকে এড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে শোভা গিয়ে ঘুমন্ত বেগমকে দেখেছে। চোখের কোলে এখনও জল বেগমের, চুল উসকোখুসকো, একটু বুড়োটে হয়ে গেছে মুখের শ্রী, তবু এখনও বেগম হাড়জ্বালানি সুন্দরী। শোভার ইচ্ছে করে ওকে বিষ দিয়ে মারতে। চিরকাল খোলাখুলি পুরুষদের নাচাল বেগম। কত মেয়েমানুষের স্বামী কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করেছে। নরেশ হল বেগমের ভেড়ার পালের একজন।

শেষরাতে যখন আকাশের তারা ফিকে হচ্ছে তখন শোভা আর থাকতে না পেরে ছাদের সিঁড়িতে গিয়ে নরেশকে ধরল।

তুমি ভেবেছটা কী, অ্যাঁ?

নরেশ তার দিকে খুব আনমনে চেয়ে রইল। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, তুমি বিছানায় যাও।

কেন যাব? তোমার হুকুমে?

আমার মন ভাল নেই। একা থাকতে দাও।

মন ভাল নেই কেন? ফলির জন্য?

নরেশ বলে, শোভা , তুমি মানুষ নও? ফলি কি তোমার কেউ নয়?

শোভা খুব খনখনে পেতনির হাসি হেসে বলে, ওমা! সে কথা কি বলতে আছে? ফলি যে আমার বুকের ধন, কোলের মানিক! লজ্জা করে না তোমার?

কী বলছ?

কী বলছি বুঝতে পারছ না, ন্যাকা!

পারছি না।

আমি জানতে চাই শালির ছেলের জন্য তোমার অত ভেঙে পড়ার কী? দয়া করে রহস্যটা বলবে, না কি আমার মুখ থেকে শুনবে?

নরেশ গুম হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, এ সময় রাগারাগি থাক, তুমি শুতে যাও।

আমি শোব না। সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে আগে শুনি, তারপর কী করব না করব তা আমি জানি।

আমার কিছু বলার নেই।

ফলি কার ছেলে, তাও ঠিক জানো না?

নরেশ চুপ করে থাকে।

শোভা আবার সেই পেতনির হাসি হেসে মোটা শরীরে হিল্লোল তুলে বলে, আমার গর্ভে হয়নি বটে কিন্তু বেগম হারামজাদির পেটে ফলি এসেছিল কী করে তা আজ স্বীকার হও না কেন?

তুমি যাবে?

জবাবটা এল অপ্রত্যাশিত একটা প্রচণ্ড চড় হয়ে।

মোটা হলেও শোভার হাজারটা ব্যামো। হার্ট খারাপ, প্রেসার বেশি, মেয়েমানুষি রোগও অনেক,

তা ছাড়া আরামে আয়েসে থেকে শরীর অকেজো। চড়টা লাগতেই চার ধাপ সিঁড়ি টপকে অত বড় লাশটা পড়ল সিঁড়ির মোড় ঘোরার চাতালে। বাড়ি কেঁপে গেল তার পড়ার শব্দে।

দশ

বাড়িতে ঢুকেই কালু বুঝতে পেরেছিল, জায়গাটা গরম আছে। তার মতো লোকের ঘরে ঢুকে মস্তানরা যখন হুটোপাটি করে গেছে তখন বুঝতে হবে কেস খারাপ।

মা প্রথম দিকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, একটু বাদে দম ফুরিয়ে ঘ্যাজর-ঘ্যাজর করতে লাগল।

সেদিকে মোটে কানই দিল না কালু। বলল, ফালতু বাত ছেড়ে কাজের কথাটা বলে লে দিকি। কী হয়েছে কী?

তোকে যমে নেয় না কেন বলবি?

অরুচি বলে নেয় না। কারা এসে হাল্লাক করে গেছে?

সে গিয়ে তোর পেয়ারের লোকদের জিজ্ঞেস কর গে। আমি কি সবাইকে চিনে রেখেছি? নাহ'ক হাবুকে আর ভুতুকে ধরে এই মার কি সেই মার! কেবল জিজ্ঞেস করে, কালু কোথা বল। আমি ঠেকাতে গেলাম তো আমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কনুই ছ'ড়ে এখনও রক্ত পড়ছে।

হাবু ভুতু কই?

তারা থানায় গেছে।

কালুর মাথাটা ঠিক নেই। বড্ড ঘোঁট পাকাচ্ছে চার দিকে। বলল, কাউকে চিনতে পারিসনি?

হাবু বলছিল একজন নাকি বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে সুরেন খাঁড়া না কে যেন!

কালু সময় নষ্ট করল না। সোজা উঠোনে গিয়ে কচুগাছের গোড়ার মাটি খামচে তুলে ফেলল। তলায় একটা প্লাস্টিকের খামে তার টাকা। সেটা তুলে পকেটে পুরে সে গিয়ে মাকে বলে, আমি পাতলা হচ্ছি। খুঁজিস না। বাড়িতে থাকলে শালারা আবার আসবে।

কী করেছিস বল! নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

চেঁচাস না। জানাজানি হলে আমিও যাব, তুইও যাবি।

ভয় পেয়ে মা চুপ করে যায়।

কালু অপথ-কুপথ ঘুরে স্টেশনে চলে আসে। বিশে গনগনে আঁচে বেগুনি ভাজছে। কালু গিয়ে সোজা সেখানে বসে পড়ে বলে, গাড্ডায় পড়ে গেলাম।

বিশে এক খদ্দেরকে বিদেয় করে বলে, আজ মাল খাওয়াবি বলেছিলি।

মাইরি খাওয়াব। আমাকে দু'-একদিন থাকতে দিবি?

বিশে হেসে বলে, থাকার জন্য স্টেশন আছে।

কালু মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক।

গাড্ডা কী?

বাড়িতে হামলা করছে শালারা।

কারা?

আছে।

রামরতন রিকশাওয়ালা চপ কিনতে এসে কালুকে দেখে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে বলে, অ্যাই শালা! তোকে নাকি শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়েছে?

কালুর মেজাজ ভাল নেই। উঠে সটাং করে এক চড় কষাল রামরতনের গালে। বলল, জল ভরে দেব শালা। গেলবারে গুপ্তর দোকানের মাল সরিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ি ঘোরোনি?

রামরতন বেশি ঘাঁটাল না। কালু একা নয়, বিশে আছে। বিশে মহা মারকুট্টা ছোকরা। স্টেশনের ভিখিরিদের দঙ্গলটা দরকার মতো বিশের পক্ষ নেয়। বিশে ওদের ভাজা বেসনের কুঁড়ো আর নিংড়ানো মুড়ি দিয়ে হাতে রাখে। তাই রামরতন গালে হাত বুলিয়ে বলল, খচছিস কেন? আমি শালা ভাল কথা বলতে গেলাম।

কালু আর বসল না। বিশেকে বলল, আমি সাঁজের পর আসব।

বিশে মাথা নাড়ে।

কালু স্টেশন রোড ধরে সোজা হাঁটা দেয়।

ঘুরে-ফিরে কোথাও যাওয়ার নেই দেখে সন্তুদের বাড়ির কাছে চলে আসে কালু। এসে দেখে নরেশবাবুদের বাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। দোতলা থেকে নরেশের মোটা গিন্নির চেঁচানি আসছে, সব জানি, সব জানি। ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলব তোমার চরিত্রের কথা।

সন্তু নীচের তলায় ছিল। কালুর এক ডাকে বেরিয়ে এসে বলল, চল। তোর সঙ্গে কথা আছে।

দু'জনে সিংহীদের বাগানে ঢুকে পড়ে।

সবেদা গাছটা ন্যাড়া করে ফল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। সেই গাছের তলায় বসে সন্তু গম্ভীর মুখে বলে, তুই এ রকম ডে-লাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

তাতে তোর বাবার কী?

মুখ খারাপ করিস না কালু।

কালু হেসে বলে, রং লিস না সন্তু। আমি কাউকে ভয় খাই না।

সন্তু কালুর দিকে ভ্রু কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে, যখন প্যাঁদানি খাবি তখন বুঝবি।

কালু বলল, ছোড় বে।

সন্তু চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, ঠিক আছে। তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।

আমার ভাল নিয়ে তোর মতো ভদ্দরলোকদের ভাবতে হবে না। আগে বল কী বলতে চেয়েছিলি।

সন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে। তুই পুলিশকে গগনদার নাম বলেছিস?

আমি বলব কেন?

তবে কে বলেছে?

তার আমি কী জানি? গগনদাকে ফাঁসিয়ে আমার কী লাভ?

কিন্তু সবাই জানে তুই গগনদার নাম বলেছিস। গগনদা কাল পালিয়ে গেছে।

কালু এটা জানত না। একটু থমকে গিয়ে একগাল হেসে বলে, লাগ ভেলকি লাগ। খুব জমে গেল মাইরি।

সন্তু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ কালু মুখ গম্ভীর করে বলল, সুরেন শালাকে আমার বাড়ি চেনাল কে বল তো?

তার আমি কী জানি!

জানিস না?

আমি জানব কী করে?

আমার বাড়িতে সুরেন গিয়ে হামলা করেছে কেন তা জানিস?

সন্তু স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু খুব তেজের গলায় বলে, ও সব আমার জানার কথা নয়।

সুরেন আমার কাছে কী চায় তাও জানিস না?

না।

এর আগেও সুরেন আমাকে একবার মেরেছে। শালা জানে না, কালু রিকশাওয়ালা হলেও মেড়া নয়। শালার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ও সব আমাকে বলছিস কেন?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ সুরেনকে আমার বাড়ির পাত্তা লাগিয়েছে। নইলে আমার বাড়ি চেনার কথা ওর নয়।

আমি ঠিকানা দিইনি।

কালু খুব হীন চোখে সন্তুর দিকে চেয়ে বলে, কাল তুই আমাকে ছোরা চমকেছিলি, মনে আছে?

সন্তু জবাব দেয় না। অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

কালু বলে, আমি কিছু ভুলি না।

সে তোকে মারার জন্য নয়। ভয় দেখানোর জন্য!

কালু হাত বাড়িয়ে বলে, ছুরিটা দেখি।

কাছে নেই।

কালু একেবারে আচমকা লাফিয়ে উঠে পটাং করে একটা লাথি লাগাল সন্তুর থুতনিতে। লাথিটা তেমন জোরালো হল না। কালুর শরীরে এখন আর তত তেজ বল নেই। সন্তু শালা ভাল খায়-দায়, গগনের কাছে ব্যায়াম শেখে। শক্ত জান, তবু আচমকা লাথি খেয়ে মুখ চেপে মাটি ধরে নিল।

কালু সময় নষ্ট করে না। পড়ে-থাকা সন্তুর প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে মালটা বের করে ফেলে। বিলিতি ছুরি, কল টিপলে ছ' ইঞ্চি ইস্পাত বেরিয়ে আসে পটাং করে।

সন্তু যখন উঠল তখন কালুর হাতে ফলাটা জমে গেছে। চকচক করছে রোদে। কালু বলল, দেখ শালা, আমার জানের পরোয়া নেই। দরকার হলে আমি লাশ ফেলব। ঠিক করে বল, সুরেনকে কে আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে।

দাঁত বসে গিয়ে সন্তুর ঠোঁট ফেটে হাঁ হয়ে আছে। অঝোর রক্ত। হাতের পিঠে ক্ষতস্থান মুছে নিজের রক্ত দেখল সন্তু। তারপর খুব ঠান্ডা চোখে চাইল কালুর দিকে!

কালু কখনও ছুরি চালায়নি, সন্তু জানে। এও জানে, কালুর শরীরে কিছু নেই। তবে রোখ আছে। হিসেব করতে কয়েক পলক সময় নিল সন্তু। গগনের কাছে সে বিস্তর প্যাঁচ শিখেছে।

সন্তু কী করল তা চোখে ভাল দেখতেও পেল না কালু। কিন্তু হঠাৎ টের পেল তার ছুরির হাতটা মুচড়ে ধরে সন্তু তাকে উপুড় করে ফেলেছে। পিঠে হাঁটু চেপে বসিয়ে মাথাটা ঠুকবার তাল করছে মাটিতে।

কালুর লাগে না। মারধর সে বিস্তর খেয়েছে। প্রায়ই খায়। মুহূর্তে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে পটাং করে শরীরটা ছুড়ে দিল উলটোবাগে। সন্তু ছিটকে গেল।

দু'জনেই উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে আসে পরস্পরের দিকে। কালুর হাতে আধলা ইট, সন্তুর হাতে ছুরি।

এগারো

খুব ভোরেই উঠে পড়তে হল গগনকে। ভোরে ওঠা তার অভ্যাস, তার ওপর এখন প্রবল দুশ্চিন্তা চলছে।

বাথরুমের কাজ শেষ করে এসে যখন বাসি বিছানাটা নিজেই গোচ্ছাচ্ছে, তখন ছটকুর ঘর থেকে অ্যালার্ম বাজার শব্দ এল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ছটকু ফিটফাট হয়ে এসে গগনের দরজায় টোকা মেরে ডাকে, গগ, উঠেছিস?

উঠেছি।

চল।

গগনের মন ভাল নেই। সকালে উঠে শরীর রক্ষার জন্য দৌড়ানো বা ব্যায়াম করার মতো মন এখন তার নয় তবু ছটকুর আগ্রহে যেতে হল।

বড়লোকি সব ব্যাপার। ছটকু তার ফিয়াট গাড়ি চালিয়ে ময়দানে এল। ঘড়িতে সোয়া চারটে। ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি রেখে দুই বন্ধুতে ধীরলয়ে দীর্ঘ দৌড় শুরু করে। পাশাপাশি।

গগন টের পায়, ছটকু নেশাভাং যাই করুক এখনও ওর প্রচণ্ড দম। প্রায় মাইল দুই দৌড়ের পর বরং গগনের কিছু হাঁফ ধরেছে, কিন্তু ছটকু একদম ফিট।

বাড়িতে ফিরে ছটকু গগনকে নিয়ে গেল তার জিমনাশিয়ামে। ছোটর মধ্যে এত ভাল জিমনাশিয়াম গগন চোখেও দেখেনি। প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি ঝা-চকচকে নতুন আর দামি। বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আনা।

ছটকু বলে, এ সব পড়েই থাকে বেশির ভাগ। আমি মাঝে মাঝে খেয়াল হলে ব্যায়াম করি।

দু'জনে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা নীরবে নিখুঁত ব্যায়াম করে যায়। গগন নিজে প্রশিক্ষক, কাজেই ব্যায়ামের খুঁটিনাটি সব তার জানা। কিন্তু সেও অবাক হয়ে যায় ছটকুর নিখুঁত ব্যায়াম দেখে। কোথাও কোনও খাঁকতি নেই।

ব্যায়ামের পর দু'জনেই গ্লাভস পরে কিছু সময় ঘুসোঘুসি করে। ছটকু খুবই ভাল লড়ে। ওর বাঁ হাতের ছোবল বিষে ভরা। গগন দুটো ভুতুড়ে ঘুসি খেয়ে গেল ছটকুর হাতে। বলল, তুই এখনও একটি বিচ্ছু আছিস। লড়া ছেড়ে দিলি কেন?

আরে দূর! লড়ে হবে কী?

কিন্তু এখনও তোর ঘুসিতে অনেক ব্যাপার আছে।

ছটকু গ্লাভস খুলে ফেলে উদাস মুখে বলে, কী জানিস! আসলে আমার জীবনটা তো হ্যাপি নয়। চারদিকটার ওপর আমার আক্রোশ। ঘরে একটা কালো সাপ পুষছি। কেউ আমাকে বোঝে না, আমার প্রতি কারও সিমপ্যাথি নেই। সেই সব দুঃখে, রাগ, আক্রোশ সব আমার ঘুসিতে বেরোয়।

গগন বুঝতে পারে। ছটকুর জন্য তার একটু মায়াও হয়। বড়লোকেরাও দুনিয়াতে সুখে থাকে না তা হলে!

গগনের চিন্তা ভাত-কাপড় নিয়ে। অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় তার দিন ক্ষয় হয় রোজ। সে লড়াই ছটকুর নেই। তবু ভগবান ওকেও তো সুখ দেননি।

এলাহি জলখাবারের আয়োজন টেবিলে সাজানো। বেশিরভাগই ইংলিশ খানা। হ্যাম অ্যান্ড এগ, পরিজ, টোস্ট, ফল। গগন মাছ-মাংস খায় না বলে তার জন্য অনেকখানি ছানা দেওয়া হয়েছে। আর বাদামের শরবত।

গগন খুব বেশি খায় না। পেট ভার করে খাওয়া তার ভীষণ অপছন্দ। ছটকুও বেশি খেল না। সাজানো খাবারের অধিকাংশই পড়ে রইল।

ছটকু তার পাইপ ধরিয়ে বলে, তুই তো জুডো শিখছিলি, না?

হ্যাঁ।

আমিও শিখেছিলাম লন্ডনে।

জানি।

জুডো শেখার সময় যে শপথ করানো হয়, তা মনে আছে গগ্‌?

আছে।

ছটকু হেসে বলে, নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরে ছাড়া কাউকে আঘাত করা যাবে না।

জানি।

আমার সে নিয়মটা প্রায়ই ভাঙতে ইচ্ছে করে। বুঝলি! আজকাল মাঝে মাঝে আমার মাথা ভিসুভিয়াস হয়ে যায়।

গগন ব্যাপারটা বুঝল না। চুপ করে রইল।

সামু খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে। আর একজন উর্দি পরা লোক কফির ট্রে নিয়ে এল।

গগন কফি বা চা খায় না। ছটকু কালো কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলে, কাল রাতে আই হ্যাড অ্যানাদার এনকাউন্টার উইথ হার।

গগন চোখ নামিয়ে নেয়। ছটকু এবং তার বউয়ের প্রসঙ্গটা বড় অপ্রীতিকর বলে তার মনে হয়। সে লক্ষ করেছে সকালে জলখাবারের টেবিলে ছটকুর বউ লীনা আসেনি। কিন্তু ভদ্রতায় বলে, আসা উচিত ছিল। তবে গগন নিজেকে খুব সামান্য মানুষ বলে মনে করে, তাই তার প্রতি কেউ তেমন সৌজন্য না দেখালেও সে কিছু মনে করে না।

কিন্তু ছটকুর বোধহয় ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। কফি আর পাইপে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে সে হঠাৎ বলল, দুনিয়ার কাউকেই ও মানুষ বলে মনে করে না। কাল রাতে আই হ্যাড টু বিট হার।

গগন ব্যথিত হয়ে মুখ তোলে। বলে, সে কী রে! মারলি?

মারতে হল। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। আই অ্যাম এ ফলেন গায়।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, আফটার অল মেয়েমানুষ তো!

তুই মেয়েমানুষ চিনিস না গগ্। চিনলে অত দয়া হত না তোর। মেয়েমানুষকে যারা অবলা বলে তারা অনভিজ্ঞ। ওদের মতো এত নিষ্ঠুর আর নেই।

গগন রাত্রিবেলা কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। তার ঘুম খুব চটকা। তার ওপর গতকাল সে ভাল ঘুমোয়নি। তবে কি ছটকুর ঘরটাও সাউন্ড-প্রুফ করা? কিন্তু তা হলে সকালে অ্যালার্মের আওয়াজ এল কী করে?

ছটকু অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, কিন্তু মেরেও লাভ হয় না। লীনা যেমন-কে-তেমনই থেকে যায়। তেমনি কোল্ড-ব্লাডেড, ক্রুয়েল, সেলফিশ, অ্যামবিশাস।

সামু সবই শুনছে। গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, চল। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া এখন আমার আর পথ নেই।

ছটকুর ফিয়াট গাড়িটা যখন প্রকাশ্য দিনের আলোয় পাড়ায় ঢুকছে তখন গগনের বুকটা একটু বেশি ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেছে।

ছটকু গগনের গ্যারাজ-ঘরের সামনেই গাড়িটা দাঁড় করাল। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে গগনের দিকে ফিরে একটু হেসে বলল, দ্যাখ গগ্, তুই আর আমি একসঙ্গে বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি। সুতরাং ঘাবড়াবি না। আমার মনে হয় না কেউ তোকে খামোখা ধরপাকড় করতে আসবে।

গগন গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, তা নয়। তবে আমার লজ্জা করছে। তুই এখানে এলি কেন?

এখান থেকেই কাজ শুরু করব বলে।

বেরোবার আগে ছটকু অনেকক্ষণ টেলিফোনে যাদবপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলেছে। নিজেদের প্রতিষ্ঠার জোরে ছটকু থানা-পুলিশের খাতির পায়। সকলের সঙ্গেই তার ভাল ভাবসাব।

টেলিফোনে কী কথা হয়েছে তা গগন শোনেনি। কথা বলার পর ছটকু তাকে সংক্ষেপে জানিয়েছে, যাদবপুর থানা থেকে যেটুকু জানবার জেনে গেছি। এখন তোর কোনও ভয় নেই।

গগনের তবু ভয় যায় না।

বেলা বেশি হয়নি। দশটা বোধহয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ চার দিক পোড়াচ্ছে। ছোট্ট গাড়িটা এর মধ্যেই তেতে ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গগনকে একটা রোদ-চশমা ধার দিয়েছে ছটকু। নিজেও একটা পরেছে। ছদ্মবেশ খুবই সামান্য। তবু হয়তো লোকের চোখ থেকে কিছুটা আড়াল করা যাবে নিজেকে।

নরেশের বাড়ির ওপরতলা থেকে শোভার প্রচণ্ড গলার শব্দ আসছে। বোধহয় সে নরেশেরই শ্রাদ্ধ করছিল, মায়ের পেটের বোন না হাতি! ঢ্যামনা কোথাকার! কার হুকুমে তুমি ওকে কোলে করে এনে এ বাড়িতে তুলেছ? বাড়ি আমার নামে।

জবাবে একজন পুরুষ বোধহয় কিছু বলল।

শোভার গলা তুঙ্গে উঠে যায়, বেশ করেছি তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। একশোবার দেব। নির্দোষ লোকের নামে খুনের নালিশ করেছ, তোমার নরক হবে না!...হ্যাঁ হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার ভাব আছে তো আছে...তোমার ভাব নেই কারও সঙ্গে? ঢলানি মাগিটার সঙ্গে তো লোককে দেখিয়েই শোয়া-বসা করো!

গাড়িটা লক করতে করতে ছটকু মৃদু হেসে চাপা গলায় বলল, অ্যানাদার লীনা।

দু'-চারজন লোক তাদের লক্ষ করছিল। আশপাশের জানলা দিয়ে প্রচুর উঁকিঝুঁকিও টের পায় গগন।

ছটকুর তাড়াহুড়ো নেই। ধীরেসুস্থে সে চার দিকে তাকিয়ে দেখে। পাইপ ধরায়। তারপর বলে, চল।

কোথায়?

নরেশের ঘরে। বেগমকে একটু ক্রস করা দরকার।

বেগম? সে এখানে থাকে না।— গগন বলে।

এখন আছে, চল।

গগনের বুক অসম্ভব কেঁপে ওঠে। পিছোনোর উপায় নেই। তবু বলল, তুই যা, আমি অপেক্ষা করি।

ছটকু ভ্রু কুঁচকে বলে, তাতে লাভ হবে না। বেগমের সামনে তোর প্রেজেন্স খুব দরকার। নইলে ও শকড হবে না। বেগমের লেখা সেই চিরকুটটা কি হারিয়ে ফেলেছিস?

গগন মনে করতে পারল না। বলল, কোথায় রেখেছি কে জানে।

কাঁধ বাঁকিয়ে ছটকু বলল, এমন কিছু এসেনশিয়াল নয়। তুই পিছনে আয়, আমি আগে উঠছি।

দোতলায় নরেশের বৈঠকখানার দরজা খোলাই রয়েছে। ভিতরের কোনও ঘর থেকে শোভার গলা আসছে, সবাইকে বলব ফলির আসল বাপ তুমি। ওই নষ্ট মেয়েটার সঙ্গে তোমার শোয়া-বসা।

ছটকু খুব হাসছে শুনে।

দু'বার কলিংবেল বাজানো সত্ত্বেও কেউ এল না। তিনবারের বার ঝি এসে খোটকা মুখ করে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, কী চাইছ?

ছটকু রোদ-চশমাটা এতক্ষণ খোলেনি। এবার খুলল। মুখটা ভয়ংকর গম্ভীর। চোখে ভীষণ ভ্রুকুটি। ছটকুর চোখ খুবই মারাত্মক। যখন রেগে যায় তখন তার দিকে তাকাতে হলে শক্ত কলজে চাই।

ঠান্ডা গলাতেই ছটকু নির্দ্বিধায় বলল, তোমার বাপকে চাইছি।

ঝিটা কেমনধারা হয়ে গেল। চোখেমুখে, স্পষ্টই ভয়। কথা বলল না, কিন্তু শুকনো মুখে চেয়ে রইল।

ছটকু প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল, যাও, গিয়ে নরেশবাবুকে ডেকে দাও।

ঝি চলে গেল। ছটকু নিঃসংকোচে বৈঠকখানায় ঢুকে একটা কৌচে গা এলিয়ে বসে গগনকে ডাকল, আয় গগ্‌।

গগন খুব সংকোচের সঙ্গে ঢুকল, যেন বাঘের ডেরায় ঢুকছে। গরমে এমনিতেই তার ঘাম হচ্ছিল। এখন হঠাৎ তার সারা গায়ে ফোয়ারার মতো ঘামের স্রোত নামছে। পোশাক ভিজে যাচ্ছে, চোখে জিভে নোনতা জল ঢুকছে।

অনেকক্ষণ বাদে নরেশ এল। ভিতরে শোভার চেঁচামেচি একটু থেমেছে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছে এখনও, তবে বকবকানির।

নরেশের পরনের লুঙ্গিটা উঁচু করে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খালি গা, চোখ লাল, চুল উসকোখুসকো, যেন এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছে।

ঘরে ঢুকেই নরেশ আচমকা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল। বিস্ময়ে বোবা। চোখ পটপটাং করে খুলে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে।

ছটকু উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকায় নরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লোহার হাতে চেপে ধরে বলল, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। বসুন।

ছটকুর কণ্ঠস্বরে কিছু ভদ্রতা থাকলেও আচরণে নেই। সে নরেশকে ধীরে টেনে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল।

নরেশ ঝেঁঝে উঠে বলল, হাত ধরছেন কেন?

ছটকু হেসে বলে, লাগল বুঝি?

নরেশ সে কথার জবাব না দিয়ে ছটকুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এ সব কী ব্যাপার?

প্রশ্নটা গগনকে করা। নরেশ ছটকুকে চেনে না।

গগন জবাব দেয় না।

ছটকু কৌচে এলিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে বলে, নরেশবাবু, গগনকে অ্যারেস্ট করতে আপনি পুলিশ ডেকেছিলেন?

নরেশ হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, একশোবার ডাকব, শালার গুন্ডার দল! ভেবেছ কী তোমরা? বাড়িতে ঢুকে গায়ের জোর দেখানো হচ্ছে? অ্যাঁ?

বলতে বলতে আচমকাই নরেশ বে-হেড হয়ে লাফিয়ে উঠে একটা জয়পুরি ফুলদানি তুলে তেড়ে এল গগনের দিকে, গুন্ডামির আর জায়গা পাওনি?

ছটকু হাত বাড়িয়ে নরেশের হাত টেনে ধরল এবং নিছক একটি ঝাঁকুনিতে তাকে নিস্তেজ করে আবার সোফায় বসিয়ে দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, মেইনলি আমরা বেগমের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, আপনার সঙ্গে নয়। তবে আপনাকেও দু'-একটা জরুরি কথা বলা দরকার। সেটা পরেও হতে পারবে। এখন বেগমকে ডেকে দিন।

নরেশ যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ংকর রাগী চোখে সে ছটকুকে দেখল, তারপর বলল, বেগমের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনারা বেরিয়ে যান।

ছটকু পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলে, বেয়াদপির সময় এটা নয়। গগন আমার বন্ধু। তাকে আপনি না-হক হ্যারাস করেছেন, পেছনে পুলিশ লাগিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে রসের কথা বলতে আসিনি। বেশি ত্যাঁদড়ামি করলে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যাব মেরে।

ছটকুর এই গলার স্বর গগনও চেনে না। খুবই ঠান্ডা গলা, কিন্তু তাতে ইস্পাতের মিশেল। যে শোনে সে জানে ছটকু প্রত্যেকটা কথাই মেপে বলছে। একটুও ভয় দেখাচ্ছে না। কিন্তু যা বলছে তা-ই করবে।

নরেশ এবার চোখ নামিয়ে বলল, বেগম ঘুমোচ্ছে।

ছটকু কিছু অধৈর্যের সঙ্গে বলল, তাকে তুলে দিন।

সে অসুস্থ। তার ছেলে মারা গেছে।

সেটা আমরা জানি। তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ভিতরের দরজার পরদা সরিয়ে হঠাৎ শোভা

ভিতরে আসে। তার চেহারাটা বড় কিম্ভূত দেখাচ্ছে। চুলগুলো পাগলির মতো উড়োখুড়ো, মুখ ফুলে রাবণের মা, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

গগনের দিকে চেয়ে বলল, আবার এসেছেন? ভাল চান তো পালান। নইলে ওই বদমাশ আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। জানেন না তো, ওর এখন পুত্রশোক।

নরেশ উঠে শোভার দিকে তেড়ে যায়। গগন আটকানোর জন্য উঠতে যাচ্ছিল। ছটকু হাত বাড়িয়ে ইশারা করায় থেমে গেল।

নরেশ তেড়ে গিয়ে শোভাকে মারল না বটে, কিন্তু জাপটে ধরে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে গেল। দরজাটা সপাটে বন্ধ হয়ে ছিটকিনি পড়ল ভিতর থেকে।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, ছটকু চল।

ছটকু না-নড়ে বলে, দাঁড়া।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্প বাদেই অন্য একটা দরজার পরদার আড়ালে একটা ফোঁপানির শব্দ উঠল, হিক্কা তোলার আওয়াজ। তীব্র হতাশার গলায় কোনও মহিলা বলে উঠলেন, সব গেল রে....

ঠিক তারপরেই পরদা সরিয়ে খানিকটা টলমলে পায়ে বেগম ঘরে ঢোকে। খুবই করুণ তার চেহারা। সুন্দরী বেগমকে কে যেন চোখের জল আর শোকের শুষ্কতা দিয়ে চটকে মেরেছে। সব রূপটুকু ধুয়ে তার চেহারায় বয়সের ভাঁটা ফুটে উঠেছে এখন।

বেগম তার দু'খানা বিভ্রান্ত চোখে গগনকে চেয়ে দেখল। যেন অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল, আমার ফলি কোথায় গেল?

ছটকু খুব নরম গলায় বলে, আপনি বসুন।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে-যাওয়া গলায় বেগম বলে ওঠে, হা ভগবান!

তারপর নিজের অজান্তেই বুঝি সোফায় বসে পড়ে বেগম। চোখ বুজে থাকে। চোখের পাতা ভিজিয়ে জলের ধারা নেমে আসে অঝোরে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে বেগম, শুধু থরথর করে তার রক্তহীন সাদা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ছটকু বলে, ফলির মৃত্যুতে গগনের কোনও হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।

বেগম তার রক্তবর্ণ চোখে চাইল। প্রথমে কিছু বলল না। সামলাতে সময় নিল।

কিন্তু সামলে নিলেও সে। আঁচলে চোখ মুছল। অনেকক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে বলল, সেদিন...কবে যেন?

গগন বলল, পরশু।

বেগম গগনের দিকে স্থির চোখে চায়। তারপর একটু শিউরে উঠে বলে, সেদিন ফলি সন্ধের পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। বলল, গগনদা আমাকে মেরেছে। আপনি কি ওকে সত্যিই মেরেছিলেন?

গগন চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। নইলে ও আমাকে মারত। ওর হাতে পিস্তল ছিল।

বেগম ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলে, জানি। ওর কাছে পিস্তল থাকত। ইদানীং ও খুব বিপদের জীবন কাটাত। আমি ওকে মানুষ করতে পারিনি, সে পাপের শাস্তি পেলাম গগনবাবু।

ছটকু নরম স্বরে বলে, কিন্তু ফলির মৃত্যুর পেছনকার ঘটনাটা আমাদের দরকার।

বেগম মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে, ফলি গগনবাবুকে মারবার জন্য প্ল্যান করেছিল। মারা মানে খুন নয়। উলটে ও নিজেই মার খায়। সন্ধেবেলা যখন আমার কাছে এল তখন ভীষণ ফুঁসছে, ও রকম রেগে যেতে ওকে আর কখনও দেখিনি।

ছটকু হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেনি সেদিন?

বেগম মুখটা নামিয়ে রেখেই বলল, হ্যাঁ। শুধু ঝগড়া নয়, আমাকেও ও মারে।

গগন অবাক হয়ে বলে, মেরেছে?

আমার ওপর ওর ভয়ংকর রাগ ছিল। যতটা ভালবাসত ততটাই ঘেন্না করত আমাকে। আমার সম্পর্কে ওর কানে কে যেন কিছু খারাপ গালগল্প বলে বিষ ঢেলেছে, সেই দিন ও আমার জবাবদিহি চায়, আমি ওকে যত শান্ত করতে চাই, ও তত রেগে ওঠে। অবশেষে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়, চড়-চাপড় মারে, গালাগাল করতে থাকে। হয়তো আরও মারত, পাড়ার লোক এসে ঠেকায়। তখন ও কার ওপর যেন শোধ নেবে বলে শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি তখন এত দিশেহারা যে ওকে আটকাতে পারিনি। পারলে—

ছটকু জিজ্ঞেস করে, ঝগড়া ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কোনও কথাবার্তা হয়নি?

না। সেদিন গগনবাবুর কাছে মার খেয়ে ফলি রাগে বেহেড হয়ে যায়। কেবল গগনবাবুর নামই করছিল। সেই থেকেই আমার সন্দেহ হতে থাকে—

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, ভুল সন্দেহ বেগম দেবী।

বেগম ছটকুর দিকে স্থির-চোখে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তা হলে ফলিকে কে মেরেছে?

সেটা অনুমানের ব্যাপার।

ছটকু গম্ভীর মুখে বলে। তারপর পাইপ ধরায়।

অনুমানটা কী?

তার আগে বলুন এ পাড়ায় ফলি আর কার কার কাছে যেত?

আমি তা জানি না। আমার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হত না। তবে শুনেছি আমার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে মাঝে মাঝে ধার করে টাকা নিত। কিন্তু বাড়িতে আসত না। গদিতে গিয়ে দেখা করত।

আর কেউ?

বেগম ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবে। তারপর বলে, না, আর কারও নাম কখনও বলেনি।

আচমকা ছটকু প্রশ্ন করে, আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আসেননি?

বেগম অবাক হয়ে বলে, স্বামী? তিনি তো কাজে...মানে বাইরে গেছেন।

তিনি ফলির মৃত্যু-সংবাদ জানেন?

শুনেছেন।

বাইরে কোথায় গেছেন?

বলে যাননি।

তাঁর কলেজের ঠিকানাটা দিতে পারেন?

বেগম একটু গম্ভীর মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তাঁকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। ওর শরীর খারাপ, তার ওপর এই ঘটনা।

ছটকু উঠে পড়ে। বলে, আপনার এই শোকে কিছু বলার নেই। শুধু অনুরোধ, গগনকে খামোকা ঝামেলায় জড়াবেন না। গগন ফলিকে মেরেছিল বটে, কিন্তু সে আত্মরক্ষার জন্য। ও খুনে নয়।

বেগম একবার গগনের দিকে তাকাল। কবে সেই ভালবাসা মরে গেছে। এখন আছে শুধু কিছু সন্দেহ আর আক্রোশ।

তবু গগন বেগমের চোখে চোখ রেখে কিছু খুঁজল কি?

বারো

মধ্য কলকাতার বিশাল কলেজবাড়ির ভিতরে ফলির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আর খোঁজখবর করতে হল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি থেকে বেয়ারা প্রায় ধরে আনল অ্যাপ্রন পরা বুড়ো মানুষটিকে।

বাঁ চোখের চশমার কাচ ফাটা, মুখে ক'দিনের বিজবিজে সাদা কাঁচা দাড়ি, মোটা গোঁফ ঠোঁট ঢেকে রেখেছে। ক্ষয়া ছোট চেহারা। চোখে সন্দেহের বা কৌতূহলের দৃষ্টি নেই। একটু ভিতু ভাব। পুত্রশোক অবশ্যই তাঁকে স্পর্শ করেনি। নিজেই প্রশ্ন করলেন, আপনারা আমাকে কেন খুঁজছেন?

এঁকে চেনেন?— বলে ছটকু গগনকে দেখিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র গগনকে খুব ঠাহর করে দেখে বলেন, দেখেছি। ফলিকে ব্যায়াম শেখাত।

ফলি মারা গেছে, জানেন?

জানি।— মহেন্দ্রর চোখে-মুখে অস্বস্তি।

আমরা ফলির বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

জানার কিছু নেই। অতি বখাটে ছেলে ছিল। মরেছে, তা সে নিজেরই দোষে।

শেষ কবে আপনার ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মহেন্দ্র ভেবে-টেবে বলেন, কবে যেন! পরশুই হবে।

কোনও কথা হয়নি?

যত দূর মনে পড়ে, ও খুব রেগেমেগে বাড়িতে এসেছিল। কোনও দিনই আমার সঙ্গে বনে না। ওর সঙ্গেও না, ওর মায়ের সঙ্গেও না। আমরা একটা অদ্ভুত পরিবার।

কোনও কথা হয়নি?

তেমন কিছু নয়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ফলি আমার ছেলে কি না তাও আমি জানি না। ওর মায়ের চরিত্র ভাল নয়।

করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। আশেপাশে বহু ছেলে-ছোকরার যাতায়াত। কেউ হয়তো কথাটা শুনে ফেলতে পারে ভেবে গগন বরং সিঁটিয়ে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু বেশ স্বাভাবিক গলাতেই বলেন, তাই ও ছেলের জন্য আমার তেমন দুঃখ নেই।

ছটকু হতাশ হয় না। আস্তে করে বলে, কিন্তু আমার এই বন্ধুকে ফলির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এ নির্দোষ।

মহেন্দ্র ফাটা কাচের চশমা দিয়ে গগনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব নির্দোষ কি?

ছটকু দৃঢ়স্বরে বলল, অন্তত খুনের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।

তা হবে। সে সব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।— মহেন্দ্র বললেন।

সংসারে বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা আর মূল্যহীনতায় ভুগে ভুগে মহেন্দ্র এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, আর কোনও ঘটনাকেই তেমন আমল দেন না। তাঁর মন এখন শক্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ায় আর কারও কাছ থেকেই কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

ছটকু বলল, আমরা আপনার সাহায্য চাই, করবেন?

মহেন্দ্র একটু হাসলেন। সামনের চার-পাঁচটা দাঁত নেই। হাসিটা ভৌতিক এবং শ্লেষে ভরা। বললেন, আমার কিছু করার নেই। ফলির মা শাস্তি পাচ্ছে, একমাত্র সেটাই সান্ত্বনা! প্রায়শ্চিত্ত যে এখনও করতে হয়, চন্দ্র-সূর্য যে বৃথা ওঠে না, সেটা জেনে বড় ভাল লাগছে।

ছটকু মহেন্দ্রবাবুর কাঁধ হাত বাড়িয়ে ধরে খুব নরম স্বরে বলে, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে সবই আমরা জানি। দরকার হলে আমার এই বন্ধু সাক্ষ্য দেবে, আপনার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নয়।

মানুষের দুর্বলতা কোথায় কোন সুপ্ত মনের কোণে থাকে কে জানে! কিন্তু ছটকু ঠিক জায়গায়

খোঁচাটা মেরেছে। মহেন্দ্রর চোখ হঠাৎ উৎসাহে চিকমিকিয়ে ওঠে। দু' পা হেঁটে মহেন্দ্র বলে, এখানে নয়। চলুন, একটা ঘর আছে।

ল্যাবরেটরির পাশেই একটা ছোট বসবার ঘর। ফাঁকা। সেখানে অনেক ক'টা কাঠের চেয়ার পড়ে আছে। তাতে ধুলোর আস্তরণ।

মহেন্দ্র গোটাতিনেক চেয়ার একটা ঝাড়নে পরিষ্কার করলেন। সবাই বসলে মহেন্দ্র বললেন, বেগমকে আমি জানি। তাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করি! তবে আমি শরীরের দিক থেকে খুব পটু ছিলাম না। বেগম বদমাইশি শুরু করল বিয়ের দু'-তিন বছরের মধ্যে। সবই টের পেতাম, তবে তাকে রেড-হ্যান্ডেড ধরতে পারিনি কখনও।

চেষ্টা করেছিলেন?— ছটকু স্বাভাবিক কৌতূহল দেখায় যেন।

না। ভয় করত। মনে হত, রেড-হ্যান্ডেড ধরলে মুখোমুখি ওর লাভারের সঙ্গে লড়াই লেগে যেতে পারে। তা ছাড়া চক্ষুলজ্জা।

অথচ ধরতে চান?

খুব চাই। কিন্তু ধরলেই বা কী করব? থানা-পুলিশ আদালতে যেতে পারব না। তা হলে লোকলজ্জা। নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারব না। কারণ শক্তি নেই। এমনকী দুটো কথা যে শোনাব, তাও বেগমের সঙ্গে গলার জোরে পেরে উঠব না। তাই ধরতে চাইলেও সেটা চাওয়াই থেকে যাবে।

এতকাল ধরে ব্যাপারটা সহ্য করলেন কী করে?

মানুষ সব পারে, পারতে হয়।

স্ত্রীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চান না?

মহেন্দ্র হেসে বললেন, শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন।

ভগবানের দেওয়া শাস্তিতে কি মানুষের মন ভরে?

আমার মতো দুর্বলের সেইটেই একমাত্র ভরসা।

ছটকু হেসে ফেলে। তারপর পাইপ ধরিয়ে বলে, মহেন্দ্রবাবু, আমি নিজে ভাল বক্সার। গায়ের জোরে এখনও যে-কোনও পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি। কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে আমি আজও এঁটে উঠতে পারিনি। আমি আপনার মতোই দুর্বল। কিন্তু সেটা মনের দুর্বলতা, শরীরের নয়। কাজেই আপনি শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল বলেই নিজেকে দুর্বল ভাববেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে গায়ের জোরের অভাবে প্রকৃত সাহসীদের কেউ দুর্বল ভাবেনি।

মহেন্দ্র যেন বহুকাল পর এক ভরসার কথা পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, কথাটা খুব ঠিক। আমার মনের জোর কম নেই। কিন্তু বেগমের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানেই ফালতু ঝামেলায় জড়ানো। নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু বরাবর নিজেকে ছোট ভেবেছেন!

মহেন্দ্র প্রসন্ন হেসেই বললেন, কী করা ঠিক হত বলুন তো।

চাবকানো।— পাইপে টান দিয়ে ধীরস্বরে ছটকু বলে।

ওটা পারতাম না।

এবার পারবেন।

মহেন্দ্র গগনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি সাক্ষী দেবেন?

গগনের কান-মুখ গরম হয়ে ওঠে। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছটকুর সব বেহায়া কাণ্ড!

ছটকুই বলে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এই গগনের ফিজিকাল রিলেশন ছিল।

গগন ভেবেছিল মহেন্দ্র এ কথা শুনে ফেটে পড়বে।

কিন্তু তার বদলে মহেন্দ্র চেয়ার আর-একটু কাছে টেনে এনে বিগলিতভাবে বললেন, তা হলে এই প্রথম আমি একটা প্রমাণ পাচ্ছি। একটু বলুন তো এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা!

গগন লজ্জা ভুলে ভীষণ অবাক হয়।

ছটকু সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে বলে, ও কী বলবে? ওর তো দায়িত্ব ছিল না। চেহারাটা ভাল বলে আপনার স্ত্রীই ওকে পিক-আপ করে।

মহেন্দ্র গগনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, চেহারাটা ভাল। আপনারা দু'জনেই ব্যায়াম করেন, না?

করি।— ছটকু জবাব দেয়।

আমারও খুব শখ ছিল। হয়নি। অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে গেলাম। আমার স্ত্রী কী রকম করত আপনার সঙ্গে?— গগনকে জিজ্ঞেস করেন মহেন্দ্র।

ছটকু গগনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, বল না।

গগন টের পায়, মহেন্দ্র খুবই কুৎসিত মনোরোগে ভুগছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেহ-সম্বন্ধ নেই, ঘৃণা আর রাগের সম্পর্ক। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তাঁর অবদমিত শারীরিক ক্ষুধা মেটেনি বলেই তা আজ বিকৃতভাবে তৃপ্তি খুঁজছে, স্ত্রীর প্রেমিকের কাছ থেকে তিনি সেই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিবরণ চান।

ছটকু আবার ঠেলা দিয়ে চোখের ইশারা করে বলে, বল না।

মহেন্দ্রও বলে ওঠেন, ও কি খুবই কামুক? বাঘিনীর মতো?

গগন অস্পষ্ট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

কামড়ে দিত আপনাকে? মারত?

হ্যাঁ।

ছটকু বাধা দিয়ে বলে, আর সব পরে শুনবেন মহেন্দ্রবাবু, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক। সেদিন ফলির সঙ্গে আপনার কী কথা হয়?

মহেন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তবে সে উত্তেজনা আনন্দের। চোখ চকচক করছে, মুখটা উজ্জ্বল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। উঠে গিয়ে ঘরের পাখাটা চালু করলেন। চারিদিকে ধুলো উড়তে লাগল বাতাসে।

মহেন্দ্র মুখোমুখি বসে বললেন, ফলি কোনও দিনই আমাকে পাত্তা দিত না। বুঝতেই পারছেন, মা যদি সম্মান না করে তার ছেলেমেয়েরাও কোনও দিন বাবাকে সম্মান করতে শেখে না। বেগম কোনও দিন আমাকে মানুষ বলেই মনে করেনি কিনা! তবে ফলি যখন খুব ছোট ছিল, তখন কিন্তু আমাকে ভীষণ ভালবাসত।

আপনি কি বরাবরই জানতেন যে, ফলি আপনার ছেলে নয়?

মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে ভৌতিক দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, ওই একটা বিষয়ে আমি আজও ডেফিনিট নই। ফলি যখন জন্মায় তখনও ওর মা'র সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। কাজেই কী করে বলি ও আমারই ছেলে নয়? তবে ওর চেহারা স্বভাব কিছুই আমার মতো ছিল না।

তারপর?

বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর ফলি জন্মায়। তখন বেগম খুব বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে। আমি তখন ঝিমিয়ে গেছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখন খুব খারাপ। ফলি সে সময়ে জন্মায়। তার আগে অবশ্য আমি গোপনে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, সন্তানের বাপ হওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। তাই ফলি জন্মানোর পর আমি তাকে নিজের ছেলে মনে করে খুব ভালবাসতাম। পরে ও বড় হলে বেগম ওর মন বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু তার ফলে বেগমেরও কিছু লাভ হয়নি। ফলি ওকেও দেখতে পারত না। এক ছাদের তলায় আমরা তিন শত্রু বসবাস করতাম।

ফলির সঙ্গে আপনার ঝগড়া হত?

না, কারও সঙ্গেই আমার মুখোমুখি ঝগড়া ছিল না। তবে মানুষ মানুষকে অপছন্দ করলে সেটা মুখে বলার দরকার হয় না, এমনিতেই বোঝা যায়।

তা ঠিক।

তবে ফলির সঙ্গে আমার কখনও-সখনও কথা হত। ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে হতই না।

সেদিন কী কথা হল?

আমি সন্ধের বেশ কিছু পরে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়িতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি চলছে। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেই শুনলাম ফলি তার মাকে খুব মেরেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। এর আগেও ফলি কয়েক বার ওর মাকে মারধর করেছে। বড় হয়ে মায়ের গুণের কথা শুনেছে তো! ছেলে হয়ে মায়ের বদমাইশি সহ্য করে কী করে? সে যাই হোক, গোলমাল দেখে আমি আর বাড়ির মধ্যে না ঢুকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু বাদে দেখি ফলি খুব জোরে হেঁটে আসছে। ওর মুখ-চোখ খুনির মতো। কী যেন হল আমার, ওকে ডাকলাম। ও থমকে দাঁড়াল। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি আমাকেও মারে। কিন্তু ও সব করল না। খুব ঠান্ডা গলায় বলল, নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো না? আমি তার জবাব দিলাম না। মনে মনে জানি, আমাকে মারতে হবে না। মা-ব্যাটায় নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে মরবে একদিন! যাক গে, ফলি আমাকে বলল, সিংহীদের বাগানে আমার সঙ্গে রাত আটটা নাগাদ দেখা কোরো! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। তবে রাত আটটার অনেক আগে।

বলে মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টি এমনিতে যতই নির্বিকার মনে হোক, ছটকু টের পেল মহেন্দ্র কিছু একটা বলতে চান। তাই সে নরম স্বরে বলল, কী দেখলেন সেখানে?

ফলির সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু আগে আগে পৌঁছে ভাবলাম, জায়গাটা ঘুরে দেখি। বুড়ো সিংহীর অনেক টাকা ছিল। কৃপণ লোক ছিলেন। আমার ধারণা, সিংহীবাড়ির কোনও গুপ্ত জায়গায় বিস্তর লুকোনো টাকাকড়ি বা সোনাদানা আছে। আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই গুপ্তধনের শখ। একটা টর্চ ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ঘরের দরজায় তালা ছিল। তবে একটা জানালার পাল্লা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি সেই পাল্লা খুলে দেখি, লোহার গরাদের একটা শিক ভাঙা। ঢোকা যায় দেখে ঢুকেই পড়লাম। ঘরে ঢুকে দেখি, ধুলোটুলো কিছু নেই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। এদিক-ওদিক ঘুরে একটা ভিতর দিকের ঘরে গিয়ে দেখি, খাটিয়ায় বিছানা পাতা রয়েছে। শতরঞ্চি, মোমবাতি, তাস, সিগারেটের অনেক প্যাকেট আর খালি মদের বোতল। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই গুন্ডা-বদমাশের আস্তানা। ভয় খেয়েও অবশ্য পালাইনি, ভাল করে চারধারের সবকিছু দেখে নিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ বাইরে কোথায় চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দোতলার সিঁড়ির তলায় গা-ঢাকা দিই। বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই ফলি আর কয়েকজন লোকের গলা পেলাম। খুব ঝগড়ার গলায় কথা হচ্ছিল। ফলি চিরকালের ডাকাবুকো। শুনলাম সে বলছে, গগনকে আজই খতম করব। তারপর তোদেরও ব্যবস্থা হবে। আমি তাদের কাউকেই দেখতে পাইনি। শুধু গলা শুনেছি।

কোনও স্বর চেনা মনে হয়নি?

না। ফলির গলা ছাড়া আর কারও গলা চিনতে পারিনি। তবে একজনের গলা খুব মোটা। যেন মাইক লাগিয়ে কথা বলছে। সে ফলিকে বলল, গগন তোর মা'র সঙ্গে লটগট করেছে, তাতে আমাদের কী? আমরা খুনখারাবির মধ্যে নেই। একজন বুড়ো মানুষের গলাও পেয়েছিলাম বলে মনে হয়। তবে সে যে কী বলেছিল তা ধরতে পারিনি।

আর কিছু?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, না, কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল। তারপর আমি আর সেখানে থাকবার সাহস পাইনি।

ফলি আপনাকে কী বলতে চেয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারেন?— নিভন্ত পাইপে আবার আগুন দিয়ে ছটকু বলে।

না। আপনাদের সঙ্গে পরে আবার কথা হতে পারে। এখন আমার কাজ আছে।— বলে মহেন্দ্র উঠে পড়লেন।

ছটকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ফলির জন্য আপনার কোনও শোক নেই?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, থাকার কথাও নয়। একে সে আমার ছেলে কি না তাই সন্দেহের বিষয়, তা ছাড়া অতি বদমাশ ছেলে।

তেরো

কী হয়েছিল তা কেউ বলতে পারবে না।

সন্তুর হাতে-মুখে রক্ত চটচট করছে। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। গোঙাতে গোঙাতে সে কয়েকবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওদিকে কালু নট নড়ন-চড়ন হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর।

সিংহীদের নির্জন বাগান। এখান থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনতে পায় না। সন্তু যখন শেষবার জ্ঞান ফিরে পেল তখন তার শরীর এত দুর্বল যে, বাগানটা হেঁটে পার হয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবাই যায় না। চোখে সে সবকিছু সাদা দেখছে। বমি আসছে বুক গুলিয়ে। ওঠার ক্ষমতা নেই। হাঁফ ধরে যাচ্ছে শুধু টানার পরিশ্রমে।

হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনওক্রমে বসে। তারপর বহু দিন বাদে তার চোখ দিয়ে হু-হু করে কান্নার জল নেমে আসে।

আর সেই কান্নার আবেগে আর-এক বার সে জ্ঞান হারায়।

জ্ঞান ফেরে আবার। তাকিয়ে দেখে সে একটা ঘরে শুয়ে আছে। তার মাথা-মুখ ভেজা।

চোখ খোলার পরই সে তার বাবাকে দেখতে পেল। দাড়িওলা সেই ভয়ংকর মুখ, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। দয়ামায়া রস-কষহীন এক মানুষ এই নানক চৌধুরী।

ঠান্ডা গলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কালুকে মেরেছ?

এ কথার জবাব সন্তুর মাথায় আসে না। কিন্তু খুব আবছা হলেও তার মনে পড়ে, কালুকে মারবার সুযোগ সে পায়নি। ছুরি নিয়ে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে কালুর ইটের ঘায়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তারপরও আবছা মনে পড়ে, কালু ছুটে এসে ইটটা তুলে তার মুখে মাথায় বার বার মেরেছে। তারপরও যদি সে কালুকে মেরে থাকে, তবে তা সজ্ঞানে নয়।

সন্তু বলল, মনে নেই।

নানক গম্ভীর হয়ে বলেন, কালুর পেটে আর বুকে ছুরির জখম। কাজটা ভাল করোনি।

এক ভয়ংকর আতঙ্কে সন্তু চোখ বুজল। খানিক বাদে আবার চোখ খুলল। সে শুয়ে আছে সিংহীদের বাড়িতে। এই ঘরেই একদা তাকে নীলমাধব মেরেছিল। এ বাড়িতেই সে একদিন গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিতে এসে এক রহস্যময় অচেনা লোকের হাতে মার খায়।

সন্তু ডাকল, বাবা!

তার গলাটা কেঁপে যায়।

নানক সামান্য ঝুঁকে বলেন, কী?

এ বাড়িতে কে থাকে?

কে থাকবে?— নানক অবাক হয়ে বলেন, কেউ থাকে না।

সন্তু অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। তেষ্টায় গলা শুকনো। জিভে ঠোঁট চেটে নিয়ে সে বলে, কেউ থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। একবার কে যেন এখানে আমার মাথায় পিছন থেকে লাঠি মেরেছিল।

নানক ঘটনাটা জানেন। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, জানি না।

সন্তু তার বাবার দিকে তাকায়। বাবার পাঞ্জাবির হাতায় রক্ত লেগে আছে। দাড়ির ডগাতেও তাই। তাকে বাগান থেকে তুলে আনবার সময় বোধহয় লেগেছে। তবু সন্তু তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে নানা কথা উঁকি মারে।

সন্তু হঠাৎ বলল, আমি কালুকে মারিনি।

তুমি ছাড়া কে?

তা জানি না। তবে আমি নই।

নানক চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, সে কথা এখন ভাববার দরকার নেই। ঘুমোও।

আমি বাড়ি যাব।

একটু পরে। এখন তোমাকে নিতে গেলে আরও ব্লিডিং হতে পারে।

সন্তু তার বাবার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বলে, মা'র কাছে যাব। আমাকে এখানে রেখেছেন কেন?

নানক গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি সময়মতো এসে না-পড়লে এতক্ষণ তুমি বাগানেই পড়ে থাকতে!

সন্তু উঠবার চেষ্টা করে বলে, কালু কি এখনও বাগানেই পড়ে আছে?

নানক ঠান্ডা গলায় বলেন, ও বোধহয় বেঁচে নেই।

কিন্তু আমি ওকে মারিনি। ও একটা মার্ডার কেস-এর ভাইটাল আই-উইটনেস।

এ সব কথা সন্তু ডিটেকটিভ বই পড়ে শিখেছে। সে জানে কালু মরে গেলে ফলির খুনের কিনারা হবে না।

নানক তার বুকে হাতের চাপ দিয়ে ফের শুইয়ে দিলেন। একটু কড়া গলায় বললেন, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শোনো, কালুর সঙ্গে যে তোমার আদৌ দেখা হয়েছে তা আর কাউকে বলতে যেয়ো না।

কেন?

নানক বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমার ভালর জন্যই বলছি। এইটুকু বয়সেই তুমি সব রকম অন্যায় করেছ। তুমি ইনকরিজিবল। কিন্তু তবু আমি চাই না, পুলিশ তোমাকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাক।

কিন্তু কালুকে আমি মারিনি।

সেটা আমি বিশ্বাস করি না, পুলিশও করবে না। কাজেই বেয়াদবি করে লাভ নেই। যা বলছি শোনো।

সন্তু আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে সে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

নানক বললেন, তুমি ছাড়া কেউ কালুকে মারেনি।

আমি নই।— সন্তু গোঁ ধরে বলে।

তুমিই। আমি ভাবছি তোমাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেব। এখানে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

সন্তু চুপ করে থাকে। কিন্তু তার মন নিশ্চুপ নয়। সেখানে অনেক কথার বুদ্বুদ উঠছে। সে খুব নতুন এক রকম চোখে তার বাবার দিকে তাকায়। তারপর এত ব্যথা আর যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষীণ একটু হাসে।

গগন আর ছটকু যখন সিংহীদের বাড়িতে ঢুকল তখন বিকেল যাই-যাই। এর আগে তারা আর-একটা মস্ত কাজ সেরে এসেছে। মৃত্যুপথের যাত্রী কালুকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে।

কালুর জ্ঞান ফেরেনি। ফেরার সম্ভাবনাও খুব কম। অক্সিজেন চলছে। ওই অবস্থাতেই ডাক্তাররা

তার ওপর অপারেশন চালিয়েছে। জানা গেছে তার ফুসফুস ফুটো হয়েছে, পেটের দুটো নাড়ি কাটা। বাঁচা-মরার সম্ভাবনা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

ছটকু পুলিশকে ঘটনাটা ফোনে জানিয়ে দিল। তারপর গগনকে নিয়ে বিকেলের দিকে সোজা আবার গাড়ি চালিয়ে সিংহীদের পোড়ো বাড়িতে।

ছটকু জানে। জেনে গেছে।

সদর দরজায় তালা ছিল, যেমন থাকে। ছটকু একটু চার দিক ঘুরে দেখল। পিছনের বাথরুমে মেথরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢোকে ছটকু। সঙ্গে গগন।

ভিতরে অন্ধকার জমেছে। এখানে-সেখানে কিছু পুরনো আধন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথুরে মূর্তি। শেষ রোদের কয়েকটা কাটাছেঁড়া রশ্মি পড়েছে হেথায়-হোথায়।

বেড়ালের পায়ে এগোয় ছটকু। এ ঘর থেকে সে ঘর।

অবশেষে ঘরটা খুঁজে পায় এবং চৌকাঠের বাইরে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভিতরে সন্তু ক্ষীণ একটু ব্যথার শব্দ করে বলে, আমি বাড়ি যাব বাবা।

যাবে। সময় হলেই যাবে।

ছটকু সামান্য গলাখাঁকারি দেয়।

অন্ধকার ঘরে নানকের ছায়ামূর্তি ভীষণ চমকে যায়।

ছটকু ঘরে ঢোকে। মাথা নেড়ে বলে, কাজটা ভাল হয়নি নানকবাবু।

নানক অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।

ছটকু গগনকে ডেকে বলে, তুই সন্তুকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে যা। ওকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।

গগন ঘরে ঢোকে। গরিলার মতো দুই হাতে সন্তুকে বুকে তুলে নেয়। নিজের ছাত্রদের প্রতি তার ভালবাসার সীমা নেই।

নানক কী একটু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

গগন সন্তুকে নিয়ে চলে গেলে ছটকু পাইপ ধরায়। তারপর নানকের দিকে চেয়ে বলে, আমি সবই জানি। কালু মরেনি।

নানক কথা বললেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ছটকু বলল, কিছু বলবেন?

নানক খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, আমার ছেলেটা মানুষ হল না।

আমরা অনেকেই তা হইনি। কালুকে কে মারল নানকবাবু?

বদমাশ এবং পাজিদের মরাই উচিত।

কিন্তু সে কাজ আপনি নিজের হাতে করতে গেলেন কেন?

নানক আস্তে করে বললেন, সন্তুর জন্য। ভেবেছিলাম সন্তুকে চিরকাল একটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখব। সেই ভয়ে ও ভাল হয়ে যাবে।

নিজের ছেলের স্বার্থে আর-একটা ছেলেকে মারতে হয়?

মাঝে মাঝে হয়।

ছটকু পাইপ টানল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল?

আমি। ভেবেছিলাম, কালুকে হাত করে গগনকে ফাঁসাব। ওর ব্যায়ামাগারটা তুলে দেওয়া দরকার। সেখান থেকে গুন্ডা বদমাশের সৃষ্টি হচ্ছে।

ছটকু হেসে বলে, আপনি সমাজের ভাল চান, ছেলের ভাল চান, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা কিছু অদ্ভুত।

বোধহয়।— শান্ত স্বরেই নানক বলেন।

ছটকু আবার হেসে বলে, আর ফলির ব্যাপারটা?

জটিল নয়। ওকে যে মেরেছে সে অন্যায় করেনি।

কিন্তু কে মেরেছে?

নানককে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু গলার স্বরে ঝাঁঝ ফুটল। বললেন, আপনি কে?

আমি গগনের বন্ধু। গগনকে খুনের মামলা থেকে বাঁচাতে চাই।

অ। তা বাঁচবে। গগন খুন করেনি।

সেটা জানি। করল কে?

আমিই করিয়েছি। ফলি এ পাড়ার ছেলেদের নষ্ট করছিল। ড্রাগের নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া আমার প্রতিবেশী নরেশ নজুমদারের বাড়িতে থাকার সময়ে সে এক কুমারীর সর্বনাশ করে। নানক একটু থেমে বললেন, আমি সমাজের ভাল চাই। রাষ্ট্র যা করছে না তা আমাকেই করতে হবে।

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, বুঝলাম।

বুঝলে ভাল।

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু যে-সব গুন্ডাকে টাকা খাইয়ে আপনি ফলিকে মারার কাজে লাগিয়েছিলেন তারাই কি ভাল? তাদের অবস্থা কী হবে?

তারাও মরবে।

কী করে?

তারা আমার টাকা খায়। এ বাড়িতে তাদের আড্ডা আমি মেইনটেন করি। একে একে সবাই যাবে। দুনিয়ায় খারাপ, লোচ্চা, বদমাশ একটাকেও বাঁচিয়ে রাখব না।

ছটকু নিঃশব্দে বসে রইল। মনটা দুঃখে ভরা।

বাইরে ক্ষীণ পুলিশের বুটের আওয়াজ শুনল সে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটকু উঠে দাঁড়ায়।

জীবন পাত্র

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতিযবিদ্যা জানুক, আর না-ই জানুক তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্থ আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহুলোক আমাকে বহু রকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনও-বা-নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থম ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-এর ভিতরদিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো-বাতাসহীন ঘর। জানালা-দরজা সবই আছে, তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরেজি বইও। পুরনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন. লাল, নীল আর কালো কালির দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার কাঠের তলাওলা শিক, তাতে বিস্তর পুরনো চিঠি। এ সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল খুব একটা হাসেন না, তবে মুখে একটু স্মিতভাব। আমার কোষ্ঠীর ছক আঁকা কাগজটা দেখছিলেন বাইফোকাল চশমা দিয়ে। মাথাটা নিচু, টাকের ওপর কয়েকটা চুল পাখার হাওয়ায় ঢেউ দিচ্ছে।

একটা বছর আট-নয়েকের ছেলে বুঝি টেবিল থেকে নরেনবাবুর অজান্তে একটা ডটপেন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে এসে সুট করে টেবিলের ওপর পেনটা ফেলে দিয়েই দেখি না-দেখি না ভাব করে চলে যাচ্ছিল । নরেনবাবু গম্ভীর মুখটা তুলে বললেন—এই শোন। ছেলেটা একটু ভয়ে-ভয়ে কাছে আসতেই বাঁ হাতটা দিয়ে কষিয়ে একটা চড় দিলেন গালে। বললেন—কতদিন বারণ করেছি, আমার টেবিলে জরুরি সব জিনিস থাকে, হাত দিবি না। অ্যাঁ, কতদিন বারণ করেছি?

চড় খেয়ে ছেলেটার বোধহয় মগজ নড়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারল না। ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভিতর দিকের দরজার কেলেকিষ্টি নোংরা পর্দাটা সরিয়ে চলে গেল । নরেনবাবু নির্বিকারভাবে আবার আমার ছক দেখতে লাগলেন। না, খুব নির্বিকারভাবে নয়, মাঝে মাঝে দেখছিলাম তিনি আড়চোখে ভিতর বাড়ির দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। ওদিক থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন বোধহয়। ছেলেকে চড় মারাটা বোধহয় তাঁর ভুলই হয়েছে।

ভুল যে হয়েছে সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেন্ড বাদেই। পর্দার ওপাশ থেকে আচমকা এক বিদ্রোহী গলা অত্যন্ত থমথমে স্বরে বলে উঠল—ব্যাপার কী, দাসুকে মেরেছ কেন? গালে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

নরেনবাবুর বাইফোকাল ঝলসে উঠল, গম্ভীর গলায় বললেন—শাসন করার দরকার ছিল, করেছি। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে নাকি! যাও, ভিতরে যাও।

—ইঃ, শাসন! সংসারের কুটোগাছটি নাড়ো না, ছেলেপুলে কোনটা পড়ল, কোনটা কাঁদল তার হদিস জানো না, শাসনের সময় বাপগিরি!

বাইফোকালটা পর্দার দিকেই ফোকাস করে মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন নরেনবাবু। আমি বাইরের লোক, তবু আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে বলেও তিনি খুব একটা সংকোচ বোধ করছেন, এমন মনে হল না। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমার টেবিলের জিনিস তোমাদের কতদিন হাত দিতে বারণ করেছি। এর একটা কাগজপত্র হারালে কী ক্ষতি হবে তা মুখ্যুরা বোঝে না। ফের যদি কখনও কেউ হাত দেয় তো হাত ভেঙে দেব।

—ইঃ, মুরোদ কত! গায়ে হাত দিয়ে দেখো ফের, ও সব ভণ্ডামির জিনিস নুড়ো জ্বেলে পোড়াব। হাবাগোবা সব লোক ধরে এনে দিনমান ধরে কুষ্ঠী না কপাল দেখে ঝুড়ি ঝুড়ি বানানো কথা বলে যাচ্ছে। জ্যোতিষে ক'পয়সা আসে শুনি? বেশির ভাগ লোকই তো ছোলাগাছি দেখিয়ে সরে পড়ে। কবে থেকে বলছি, মহিন্দির বুড়ো হয়ে দেশে চলে যাচ্ছে, তার কয়লার দোকানটা ধরে নাও, কানু পানু বসে আছে, তারা দেখবে'খন। তা সংসারের যাতে সুসার হয় তাতে আবার কবে উনি গা করলেন! আছেন কেবল তেজ দেখাতে!

বাইফোকালটা খুব হতাশভাবে নেমে পড়ল টেবিলে। নরেনবাবু শুধু বললেন—মেয়েমানুষ যদি সব বুঝত তা হলে দুনিয়াটা অনেক সুস্থ থাকত। বোকা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করার মতো অভিশাপ আর হয় না, যাও, তুমি ভিতরে যাও।

—আর তুমি বুঝি বুদ্ধির পাইকিরি নিয়ে বসে আছ! সংসারে মাসান্তে ক'টা টাকা ফেলে দিয়ে অমন ফুল-ফুল বাবুগিরি করে বেড়াতে পারলেই খুব বুদ্ধি হল, না! বোকা মেয়েছেলে! বোকা বলেই তোমার মতো আহাম্মকের ঘর করতে হয়। বুদ্ধিমতী হলে তিন লাথি মেরে সংসার ভেঙে চলে যেত।

বাইফোকালটা আরও নত হয়ে পড়ে। নরেনবাবুর এই বিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হই।

পর্দার ওপাশ থেকে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর সরে গেল। গৃহকর্ম রয়েছে। নরেনবাবু ছক থেকে মাথা তুলে আমাকে বললেন—রবিটা নীচস্থ রয়েছে। মঙ্গলটা পড়ল তৃতীয়ে। একমাত্র শনিটাই যা স্বক্ষেত্রে পঞ্চমে।

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এ সবই আমার জানা কথা। রবি নীচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন—কেতুটাই ডোবাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরে পড়ল কি না! বাঁদিকে কেতু ভাল নয়।

আমি হতাশ বোধ করতে থাকি।

উনি মাথা নেড়ে বললেন—কার্তিক মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আমারও তাই। রবিটা নীচে পড়ে থাকলে কী করে কী হবে!

—কিছু হবে না?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলেন—এখনই সব বলা যাবে না। আগে নবাংশটা দেখি। সময় লাগবে। আপনি বরং ও হপ্তায় আসুন। ততদিনে করে রাখব। তবে বিদেশযাত্রার একটা যোগ আছে। নবাংশটা না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচুবাবু আপনার কে হন?

—খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—অনেককাল দেখি না পাঁচুবাবুকে। আগে খুব আসতেন। উনি আমার প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট!

—উনিই আপনার কথা বলেছিলেন। বলতে গেলে উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন—বরাবর উনি লোক ধরে নিয়ে আসতেন আমার কাছে। ওঁর ধারণা ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হব। জ্যোতিষীর যে ধৈর্য স্থৈর্য দরকার, আর হিসেবের মাথা, সে সব আমার ছিলও। কিন্তু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছিলাম, আমার দাম্পত্য জীবনটা ভাল হবে না। হলও না। পুরুষমানুষের বউ যদি ঠিক না হয় তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এই যে রাস্তায় ঘাটে অতি সাধারণ সব মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনেকের ছক বিচার করলে দেখবেন, অনেকেরই বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা। কেউ নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক। বেশিরভাগেরই হয় না কেবল ওই বউয়ের জন্যই। বউ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। পাঁচুবাবুরও খুব আশা ছিল আমার ওপর। ওই সংসারের জন্যই হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল আর আসেন না কেন?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি—তাঁর আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। হাসপাতালে পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা।

নরেনবাবু বাইফোকাল খুলে রেখে চোখ দুটো ধুতির খুঁটে মুছলেন। আবার বাইফোকাল পরে নিয়ে বললেন—বয়সও হল। সত্তর-পঁচাত্তর তো হবেই।

—তা হবে।

—কোন হাসপাতালে?

—কবিরাজি হাসপাতাল, শ্যামবাজারে।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—চিনি।

আমি বলি—যাবেন নাকি একদিন দেখতে? খুব খুশি হবেন তা হলে। ওঁর তো কেউ নেই। চেনা লোক কেউ গেলে খুব খুশি হন।

নরেনবাবু উদাস হয়ে বলেন—আমার সময় কোথায়!

বলে একটু চুপ করে থাকেন উনি তারপর টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ কোষ্ঠীপত্রটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললেন—গিয়েই বা হবে কী? মরুণে মানুষকে দেখতে আমার ভাল লাগে না, মন খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি, ওঁকে খামোকা এখন দেখে মন খারাপ করার মানে হয় না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই ভাল। হয়েছে কী?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম—বুড়ো বয়সের নানা রোগ। ভীষণ খেতে ভালবাসতেন, সেই থেকে ডায়াবেটিস হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যানসারও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, তবে এখনও বেশ হাসিখুশি আছেন।

নরেনবাবু এই প্রথম একটু হাসলেন—পাঁচুবাবু বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ভাবি। কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে মরব। পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর সদানন্দ পুরুষ নই। একবার এই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন থেকে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন শোভাবাজার অবধি নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমন নিখুঁতি নাকি কোথাও হয় না। চাচার হোটেলে বহুবার মাংস খাইয়েছেন। নানান শখ শৌখিনতা ছিল তাঁর যা দেখে বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে রসে ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি বছর বয়সের পর ধর্মকর্মে মন দেব। খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও খুব পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়াতলা নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। কত সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই পাঁচুবাবু মৃত্যুশয্যায়। এ কি ভাবা যায়?

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কী, কলকাতা শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। সদানন্দ মানুষ। সংসারে কারও পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড রেভিনিউতে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার ছিল সস্তাগণ্ডা। পয়সার তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করেছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজ-এ কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশি খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন—নবাংশটা করে রাখবখন। কিন্তু আমি বলি কী, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখেছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি—বলছেন?

—বলছি।

একটা ছোট শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুত সদ্য সদ্য জীবনের দশ-দশটা বছর নষ্ট করে আমি এই সে দিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে কথা নরেনবাবুকে বলার কোনও মানে হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটে ছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরিবের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলো বালিতে গড়ায়, যা খুশি খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট

করে। সেসবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চারপাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালবাসাহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়, অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাথে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে না। ওই তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলেমেয়ের শোক বা কদাচিৎ সন্তান মারা গেলে মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনও।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে, আমাদের জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম, যে খিদে পেলেই খাবার এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটখাটো ব্যথা বেদনা, খিদে বা মারধোরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশি, মার নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল। উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ওই অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের আত্মসচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রাণাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোক চারিদিকে, খাওয়া-পরার কোনও ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দু বেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ওইটুকুই। সারাদিন বহুবার খিদে পেত, খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ি ছিল দলে, খুনখুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না । সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না। দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সি ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা আমরা তৈরি করে নিতাম। মাটির চাড়া ছুঁড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিনবার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়ি মুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই। সেই সব ভুলতে শিশুদের দেরি হয়নি। আমরা খুব চট করে রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রাণাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশিদিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যান্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্ববঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশি লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদ্বেগে তিনি আরও অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না । কার্যকর কিছুই হত না। আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা কাকিমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোট কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকিটে ট্রেনে, হাঁটাপথে কিংবা যেমন-তেমন ভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা-কাকাদের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, ওইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরও মুশকিলে পড়তে হবে। মেজোকাকা তাঁর পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটিমাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারের লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সী কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কী, সেই সময়ে একটা বড়সড় ছেলে আমাদের

ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারও বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম—দুটো পয়সা দেবেন? পয়াস পেলে কুপথ্য কিনে খেতাম। ছোটখাটো চুরি করতাম কখনও সখনও। লাউটা, মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। আমাদের বখে যাওয়ার ব্যাপারটা মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ করেছেন। মা দু-দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোটকাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভাল, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা কিছু পুরনো পড়ার বই বারবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা রিডিং পড়া যোগবিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম। ছোটকাকার বিষণ্ণতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম তখন সেই আত্মহননকারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটকাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা কমল, আরও কমল যখন আমার বড় দুই ভাই পরপর টাইফয়েড আর উদরিতে মারা যায়। এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু সেই খুনখুনে বুড়ি ঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা-বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম বাবা কন্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভাল না খারাপ এ সব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েক পদ রান্না হয়, একটু নতুন জামাকাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধহয় তাঁতি নষ্ট হল। সে ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণতর লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরি হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীনদরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া-পরার মধ্যে একরকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটকাকার কাছে শেখা সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলো নিয়েই আমার অনেকসময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর, প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা স্কুলে ভর্তি হতে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভর্তি করা হয়, যে ক্লাসে যার খুশি। নামকোবাস্তে একটা ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। আমি যেতেই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আমি কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাই। আমি বললাম সিক্সে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানশ্লেশন জিজ্ঞেস করলে আমি চটপট বলে দিই। একজন মাস্টারমশাই বললেন—বাঃ, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট! আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকে আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মতো মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্স্ট হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাস প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকত মাস্টারমশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনির পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুণ্ডামি, মারপিট, জবরদখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশি মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই উদ্বাস্তু পল্লীর সবচেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল, বখামির চূড়ান্ত একসময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লীর কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি আমার আর তিন ভাইবোনকেও

প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম—চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাসা করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছুদিনের মধ্যেই জমির স্বত্ব আমরা পেয়ে যাব। মাগনা জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায়?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন—দেখো, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্র পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তীরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাব? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভাল বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো? আমাদের কলোনিতে দু-চারজন ভাল লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভাল করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সংবর্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও বাড়ির ছেলে কালোবাজারি করে, অমুকের বউ পরপুরুষের সঙ্গ করে—এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা। প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কী করে! এই সব মরিয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁবার মতো কোনও বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে পারেনি। ভাল কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউ জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তার ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতামতের ঝড়ে আমরা আরও উদভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তার বুঝতে পারি না। তবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন পাল্টাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামাকাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষে জামাকাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ওই একবারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত; এর চেয়ে দূরের বস্তু অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হইচই করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েকদিন। তাঁর সেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এরকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই ছোটকাকার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন—প্রভাসটা ঠিক ছানুর মতো হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটকাকা কবে মরে গেছেন, তবু আমার ভিতরে ওই মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ওই সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালবাসা আমার শেষ হয়নি। আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কোমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, খিদের কথা বলতেন না, কখনও কোনও অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন। কখনও কখনও আমাদের পড়ানোর পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে আমাদের নিয়ে বসে থাকতেন। শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনও মানুষই তাঁর মতো অত অল্প আচরণের ভিতর দিয়ে অত শেখাতে পারেনি।

বি.এস-সি পর্যন্ত পাশ করতে আমার খুব কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ, আমরা ভাই-বোনেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশানি নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভাল ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লো প্রেসার ছিল, বেশি রাত জেগে পড়াশুনো

করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এ সব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম তার লেখাপড়ার মাথা নেই। বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইনালটাও যদি পাশ করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোটভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত আমার দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করাই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ওই রাগ ও বিরক্তি। মন ভাল থাকত না। আই এস-সি-র রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি. এস-সি-র অর্নাসটাই ছিল আশা-ভরসা। কিন্তু ফাইনালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সয় না। অনার্স ছেড়ে বিষণ্ণ চিত্তে পরীক্ষা দিয়ে দেদার নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাশ করলাম। এম. এস.-সি পড়া হল না। একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ডবলিউ. বি. সি-এস পরীক্ষা দিয়ে। তুমুল আনন্দিত হল আমার পরিবার। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে, সেই তুলনায় সরকারি চাকরিটুকু আমাকে কী আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়। এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারি চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানিতে প্রথম একটি চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারি চাকরি করি। গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য সচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা-বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কী! তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এতদূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনও জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশি হয়নি। কেবল ভাইটা খুশি হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ওরকম প্রচণ্ড মারধোর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানিতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে । তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম আমেরিকায়। মোটামুটি ভাল খেতাম, পরতাম, মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কী হবে? কেবল ভাল খাওয়া-পরার জন্য তো আমি এতদূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না । কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজারল্যান্ডে। ব্যল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচণ্ড অসাম্য। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকেরা বেশি অঙ্কের পে-প্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরির কারখানার কাজ আমি একা শিখব কী করে! আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি, কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দু বছর বাদে বিয়ে করি। তার

দেড় বছর বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর ততদিনে দশ-দশটা বছর পার হয়ে গেল। খবর পেয়েছি, বাবা-মা এখনও কোনওক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে যার রাস্তা দেখেছে। হতাশার ভরে আমি একদিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

অলকা

ভোরের প্রথম আলোটি পুবের জানালা দিয়ে এসে আমার জয়পুরি ফুলদানিটার ওপর পড়েছে। ফুলদানিতে কাল সন্ধের রজনীগন্ধা একগোছা। ফুল এখনও সতেজ। কালকের কয়েকটা কুঁড়ি আজ ফুটেছে। সাদা ফুলের ওপর ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে, জয়পুরি ফুলদানিটার গায়ে চিকমিক করে আলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই ফুলদানি, তাই আয়না থেকেও আলোর আভা এসে ওকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেছে। তিন আয়নার ড্রেসিং টেবিল ফুলদানি আর ফুলের তিনটে প্রতিবিম্ব বুকে ধরে আছে। একগোছা রজনীগন্ধা চারগোছা হয়ে কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে!

আমার বদ অভ্যাস, খুব ভোরে আমি উঠতে পারি না। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই এই এক অভ্যাস। কেউ ভোরে ওঠে না। আমাদের বাপের বাড়িতে সবার আগে উঠত আমার বুড়ি ঠাকুমা। ভোরে চারটেয় উঠে খুটুর-খাটুর করত, জপতপ করত। আর তারপর সাড়ে সাতটা বা আটটা নাগাদ আর সবাই। এ আমাদের ছেলেবেলার অভ্যাস। বিয়ে হওয়ার পর এই বদ অভ্যাস নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব রাত থাকতে উঠে ঘর-গেরস্থালির কাজ শুরু করে দিত। প্রথম প্রথম নতুন বউ-পনা দেখিয়ে আমিও ভোরে উঠতাম, কিন্তু তাতে শরীর বড় খারাপ হত। সারাদিন গা ম্যাজম্যাজ, ঘুম-ঘুম, অস্বস্তি। কপালক্রমে আমার বিয়ে হয়েছিল এক ধার্মিক পরিবারে। ধর্ম ব্যাপারটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য একটু লক্ষ্মীর পট, কালীর ছবি, বালগোপাল বা শিবলিঙ্গ দিয়ে একটা কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের সিংহাসন ছিল এবং তার সামনে ঠাকুমা রোজ একটু ফুল জল বাতাসাও দিত। কিন্তু ওইটুকুই। আমাদের আর কারও ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও উৎসাহ ছিল না। বড় জোর বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ত মা, শনিবারে কোনও-কোনওদিন লুট দেওয়া হত। কিন্তু এ সবই ছিল দায়সারা। আমাদের ঠাকুরঘরটাই ছিল শোওয়ার ঘর। সেই ঘরে সবাই জুতো পরেই ঢুকত আর ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ দিকে যে আলনা ছিল তার নীচের তাকে জুতো রাখত সবাই। বাবার গলায় পইতা বলে কোনও বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারওরই পইতে-টইতে হয়নি। আমাদের কুলগুরু বংশের শেষ গুরু ছিল কেশব ভট্টাচার্য। আমার বয়স যখন তেরো তখন কেশবের বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে লোকটা ছিল ডাকপিওন। মাঝেমধ্যে সে আমাদের বাড়ি এলে আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সে কুলগুরুর তোলা আদায় করতে বেরোত। যদিও তার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তার কাছে ঠাকুমার পর আর কেউ মন্ত্র নেয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাকে ভীষণ শ্রদ্ধাভক্তি করত, ওই পুঁচকে কেশবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের ধুলো নিত, নিজে উপোস থেকে সারাদিন রান্নাবান্না করে কেশবকে খাওয়াত, মোটা দক্ষিণা দিত, পালে-পার্বণে ধুতি-চাদর দেওয়া তো ছিলই। বলতে কী, কেশব বেশ সুপুরুষ ছিল। নাদুস-নুদুস চেহারা, ফরসা রং, চোখদুটো খুব বড় বড়। কিন্তু সে সাজতে জানত না, সাদামাটা ধুতি, ময়লা পিরান, খোঁচা দাড়ি নিয়ে আসত। সে এসে খুব তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমরা যদিও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সে কিছু মনে করত না। মান-অপমান বোধ তার খুবই কম ছিল। বরং সে মাঝে মাঝে ভ্যাবলার মতো হাসত। ধর্মের কথা সে জানতও না, বলতও না। সে এলেই আমার দাদা অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলত—ওই কেশবশালা এসেছে মাসকাবারি নিতে। ও কেশব, আজ আমাদের জামাকাপড় কেচে দিয়ে যাবি, বাসন মেজে দিয়ে যাবি। শুনলে ঠাকুমা রাগারাগি করত, কিন্তু কেশব নির্বিকার! সে বরং কখনও-সখনও এমন কথা বলত—দূর শালা, গুরুগিরির বড় ঝামেলা। সব জায়গায় লোক হুড়ো দেয়।

আমি বাসি কাপড় ছাড়তাম না, পায়খানার কাপড় পালটাতাম না, এঁটোর বিচার ছিল না। ভাত খেতে

বসে আমরা সবাই বরাবর বা হাতে জল খেয়েছি। বাবা শুয়োর, গোরুর মাংস খেতেন, হুইস্কি-টুইস্কি তো ছিলই। আমরা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের আদি বনেদি বাড়ি। সেইখানে জন্মে আমরা বড় হয়েছি। কোনও দিন অভাব টের পাইনি। যদিও আমাদের বংশগৌরব আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু আমাদের অসুবিধে ছিল না। বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অনেক টাকা সাধু ও অসাধু উপায়ে আয় করতেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানতেন না।

আমাদের পুরনো বাড়িটার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বার্ডস হাউস'। প্রকাণ্ড এজমালি বাড়িটায় যে আমাদের কত দূর ও নিকট সম্পর্কের শরিকেরা বাস করতেন তার আদমসুমারি হয়নি। শরিকের ঝগড়া তো ছিলই। কার ভেজা কাপড় কার গায়ে লাগল, কে তার সামনের বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে নতুন ঘর তুলবার চেষ্টা করছে, কে তার ভাগের জায়গায় বাচ্চাকে হিসি করিয়েছে—এইসব সমস্যা অহরহ সকলের মাথা গরম রাখত।

শোনা যায়, আমার বাবা যৌবন বয়সে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু গোটা ধর্মের প্রতি তাঁর এমন বিরাগ ছিল যে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট-ভজনাও তাঁর হয়ে ওঠেনি। আমাদের সেই বিশাল এজমালি বাড়িতে আমরা মোটামুটি একঘরে হয়েই ছিলাম, অন্য সবাই আমাদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত।

আমার একুশ বছর বয়েসের সময় বিয়ে হয়। বিয়ে হল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁরা শ্রীহট্ট জেলার লোক, চৈতন্যদেবের ভক্ত। আমার স্বামী যদিও খুব বড় চাকরি করতেন না, তবু তাঁদের পরিবারটা বেশ সচ্ছল ছিল। আমার স্বামী জয়দেব চক্রবর্তী স্মল স্কেল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রির অফিসার ছিলেন। ছোটখাটো চেহারা, বেজায় ভালমানুষ, তবে কখনও কখনও তাঁকে বদরাগি বলে মনে হত। স্বামী সম্পর্কে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছি, সেটা খুব ভাল লাগছে না। বরং বলি জয়দেব লোকটা ভালই ছিল। কিন্তু সে যতখানি সুপাত্র ছিল, তার চেয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে আমি আরও ভাল পাত্রী ছিলাম। চেহারার জন্য আমার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। কিছুকাল লোরেটোতে পড়েছি। কিন্তু আমার চরিত্রের সুনাম ছিল না বলে সেই স্কুল ছাড়তে হয়। পরে আমি একটা সাদামাটা স্কুল থেকে পাশ করি। তা হলেও আমি গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারতাম, নাচে-গানে ছিলাম চমৎকার, অভিনয়ে সুনাম ছিল। সোজা কথায়, গৃহকর্ম করে জীবন কাটানোর জন্য আমি তৈরি হইনি। তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই আমার নানারকম লঘু যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং লোরেটোতে পড়বার সময়ে আমি যখন ক্রিক রোতে এক মাসির বাড়িতে থাকতাম তখনই আমার কয়েকবার সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। আর, এজন্য কখনওই আমার কোনও অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ঢিলাঢালা নৈতিক পরিবেশে আমি মানুষ। আমার মা খুব উঁচু সমাজের মেয়ে, বাবাও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিক আদর্শবোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। কাজেই আমরা শরীরকে শরীর ভাবতেই শিখেছি, তার সঙ্গে, মন বা বিবেককে মেশাইনি। এমনকী আমার যৌবনপ্রাপ্তির পর বাবাও অনেক সময়ে আমাকে ফচকেমি করে জিজ্ঞেস করেছেন—কী রে মেয়ে, কটা ছেলের বুকে ছুরি মেরেছিস? অর্থাৎ আমরা খুবই উদার পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বড় দাদা, বাবা এবং মার সামনেই সিগারেট খেত। সে কিছু রোগা ছিল বলে বাবা প্রায়ই তাকে বলত—তুই মাঝে মাঝে বিয়ার খাস, তাতে শরীরটা অনেক ফিট থাকবে। উত্তরে আমার দাদা অভিজিৎ বলত—দূর, বিয়ার আমার পোষায় না, আমার প্রিয় ড্রিংক হচ্ছে হুইস্কি।

আমি সুন্দরী ছিলাম, নইলে ওই গোঁড়া পরিবারে আমার বিয়ে হত না। কিন্তু বিয়েটা যে কেন হয়েছিল সেটা আমি আজও ভেবে পাই না। প্রথম কথা, ওর চেয়ে ঢের ভাল বিয়ে হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, আমাদের দুই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির এত পার্থক্য যে বিয়ের প্রস্তাবই উঠতে পারে না। তবু হয়েছিল। একদিন কলকাতা থেকে বোধহয় কিছু মার্কেটিং করে দাদার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে ফিরছিলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। ট্রেন ফাঁকা, আর একটা ফাঁকা কামরায় জয়দেবের বাড়ির লোকজন—মা, পিসি, জ্যাঠা গোছের সবাই যাচ্ছে তারকেশ্বরে। আমি তাদের পাশেই বসেছিলাম। বিধবা পিসি আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আহা মা, বড় সুন্দর দেখতে গো তুমি! কোথায় থাকো বাছা?

এইভাবে পরিচয়। তারপর বলতে কী, তাদের বাড়ি থেকেই লোকজন এসে খোঁজখবর করল,

বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভাংচি দেওয়ার লোকও ছিল এজমালি বাড়ির শরিকদের মধ্যে। তারা গিয়ে পাত্রপক্ষকে গোপনে জানিয়ে এল যে বাবা খ্রিস্টান, আচার-বিচার মানে না, আমাদের চরিত্র খারাপ। কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাকে তাদের বড় বেশি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা ভেঙে গেলে অবশ্য ভালই হত। আমার মায়ের অনিচ্ছা ছিল, শুনেছি জয়েদেবের বাবারও আপত্তি ছিল। জয়েদেবের বাবা গুজবগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর বোন, অর্থাৎ জয়দেবের পিসিই তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। অন্য দিকে আমার বাবা হঠাৎ তাঁর হিসেবি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, যে নীতিহীনতা ও অনাদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন সেগুলি মেয়ের বিয়ের সময়ে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষত, আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই। তাই বাবা হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবে আমাকে বিয়েতে রাজি করালেন, দীর্ঘ আলোচনার পর। মায়েরও মত হল। এবং সে সময়েই মা আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন যে আমি সত্যিকারের কুমারী আছি কি না। তাঁর কোনও কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমি অবশ্য স্পষ্ট জবাব দিইনি। কিন্তু মায়েরা তো বোঝে।

জয়দেবকে আমি খুব নিরাসক্তভাবে বিয়ে করি। পাত্র আমার পছন্দ ছিল না। ছোটখাটো চেহারার পুরুষ এমনিতেই আমি দেখতে পারি না, তার ওপর তার আবার নানারকম নৈতিক গোঁড়ামি ছিল। সেগুলো আরও অসহ্য। যেমন, বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে সে শারীরিক দিক দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি। যেদিন হল, সেদিন মিলনের আগে সে আমার কুমারীত্ব পরীক্ষার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য কীভাবে পরীক্ষাটা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি তখন, পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু এটা কোন মেয়ে আজকাল সহ্য করবে?

পরীক্ষা করে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি কুমারী নই। আর আমিও তার বাতিক দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে এ লোকটা স্বামী হওয়ার উপযুক্তই নয়। কী করে যে ও আমার সঙ্গে, আমি ওর সঙ্গে ঘর করব সেটা বিয়ের পরেই আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুরবাড়িতে আমার নতুন নামকরণ হল, লতিকা। এটা ওদের বাড়ির নিয়ম, নতুন বউ এলে ওরা তার নাম পালটে নতুন নাম রাখে। এতে আমাদের আপত্তি ছিল। হুট বলতে কেন যে কেউ আমার জন্মাবধি নিজস্ব নামটা বাতিল করে দেবে! আমি যে নিজেকে বরাবর অলকা বলে জানি। অচেনা লতিকা আমি হতে যাব কোন দুঃখে? আমি খুব লাজুক মেয়ে নই, ভিতুও নই, তাই শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুনগুলোর বিরুদ্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। এটা ওরা ভাল চোখে দেখেনি। জয়দেবকে নাম বদলানোর ব্যাপারটা বলতেই ও খুব বিরস মুখে বলল—তোমার নামধাম বদলে ফেলাই ভাল।

—কেন? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার অতীতটা খুব ভাল নয় তো, তাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমার অতীত কি খারাপ?

—খুব।

—কী করে বুঝলে?

জয়দেব তার বোকা এবং ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বলল—যারা বোঝে তারা ঠিক বোঝে।

আমি কী বলব ওকে, কী বললে ওর চূড়ান্ত অপমান হয় তাই ভাবছিলাম। ও আমাকে বলল—কেন, তুমি কি জানো না?

—কী জানার কথা বলছ?

—তুমি যে খারাপ?

সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো আমার হুট করে চোখের জল আসে না। বরং সে সব পরিস্থিতিতে আমার একরকমের পুরুষের রাগের মতো রাগ হয়, থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করে।

অবশ্য জয়দেবকে আমি থাপ্পড় কষাইনি, শুধু বলেছি—না, আমি খারাপ বলে নিজেকে জানি না। বরং মানুষকে যারা সাদা মনে গ্রহণ করতে পারে না তাদেরই খারাপ বলে জানি।

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বলল—মানুষকে সাদা মনে গ্রহণ করব! কেন?

—কেন করবে না?

—কেন করব? মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বলে তা কি সব সময় সত্যি হয়?

—না-ই হল। ভালমন্দ মিশিয়েই মানুষ, মানুষ হওয়াটাই তার যোগ্যতা।

জয়দেব একটু হাসল। কিন্তু সে ঠিক হাসি নয়। বরং হাসির মুখোশে ঢাকা নিষ্ঠুরতা।

সে বলল—এই যে তুমি, তোমার কথাই যদি ধরা যায়, নিজের সম্পর্কে বলছ যে তুমি খারাপ নও। কিন্তু তোমার শরীর বলছে যে তা নয়।

—আমার শরীর কী বলেছে তোমার কানে কানে?

—বলেছে যে বিয়ের সময় তুমি কুমারী ছিলে না।

বললাম—গাধার মতো কথা বোলো না, তোমার মতো সন্দেহবাতিক যাদের তারা বিয়ে করে কোন মুখে?

জয়দেব মুখ কঠিন করে বলে—যাদের বাতিক নেই তারাই বোকা, যারা মানুষকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে তারাই অবিবেচক।

—তুমি কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী ছিলাম না! তুমি কি ডাক্তার না হঠযোগী?

জয়দেব বলে—ডাক্তার বা হঠযোগী হওয়ার দরকার হয় না। একটু সন্ধিৎসু হলেই চলে, আর একটু বুদ্ধিমান হলেই হয়। কেন, তুমি কি অস্বীকার করতে চাও?

—নিশ্চয়ই। তুমি পিশাচের মতো কথা বলছ।

—না। শোনো, শরীর পরীক্ষা করে সবই বোঝা যায়। তুমি হয়তো জানো না, আমি জানি।

—তুমি ছাই জানো। তুমি পাগল, তোমার বাড়িসুদ্ধ পাগল। আমার খুব ভুল বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছি।

জয়দেব রেগে গেল না। খুব রাগি মানুষ জয়দেব ছিল না। ওর রাগ খুব ঠাণ্ডা আর দৃঢ়।

ও বলল—বিয়ে যে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ কী। পিসিমার জন্যই হল। কিন্তু হয়ে যখন গেছেই তখন যতদূর সাকসেসফুল করা যায় সেটা দেখাই আমার লক্ষ্য।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, সন্দেহ দিয়ে শুরু হলে বিয়ে সাকসেসফুল হয় না। তার চেয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই ভাল।

জয়দেব এই প্রথম একটু ভয় পেল যেন, একটু চঞ্চল হয়ে বলল—এ তো সাহেব রাজত্ব নয় যে যখন-তখন বিয়ে ভাঙা যাবে!

—সে তোমরা বুঝবে না।

জয়দেব আমার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল—শোনো, সাহেবদের দেশে একটা মানুষের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের বিয়ে হয়, বিয়েটা সেখানে ব্যক্তিগত ঘটনা, তার সঙ্গে পরিবার বা সমাজের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে তো তা নয়।

—তত্ত্বকথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি অত বড় অপমানটা আমাকে না করতে তাও না হয় হত। আমি ও সব বুঝি না, বুঝবও না।

—তোমাকে একটু বুঝতেই হবে যে। বলতে গিয়ে জয়দেবের স্বর যথেষ্ট নরম হয়ে এল। তার মুখচোখে ভিতু-ভাবও একটু ফুটে উঠল কি?

আমি শুনতে চাইছিলাম না। উঠে চলে আসছি, জয়দেব তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ঝনাৎ করে নতুন চুড়ি-শাঁখায় ভরা হাতটা শব্দ করে উঠল। আমি হাত টেনে বললাম—ছেড়ে দাও।

সেও হাত ধরে রেখে বলল—একটু শোনো, দুটো কথা...

ও ছোটখাটো মানুষ, আমার হাত ধরে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট গায়ের জোরই ওর নেই। নেচে কুঁদে বরং আমার হয়েই সেই আধা-পুরুষটা দুহাতে আমার কোমর জাপটে ঝুলে পড়ল, বলল—যেয়ো না। শুনে যাও।

ওর পা থেকে কোমর অবধি মেঝেয় লুটোচ্ছে, ঊর্ধ্ব অঙ্গ ঝুলছে আমার কোমর ধরে, হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু আমার হাসি পায়নি। ওর ওই সর্বস্ব দিয়ে ঝুলে থাকা টানে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে আমি ওর মুখে থাবড়া দিলাম কয়েকটা। ও তবু ছাড়ল না। আমি টাল সামলাতে না পেরে থপ করে

বসে পড়লাম মেঝেতে। দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল, তখন ছুটির দিনের দুপুরবেলায় বাড়ির বেশির ভাগ লোকই ঘুমোচ্ছে, তবু কথাবার্তা শুনে কেউ কৌতূহলী হতে পারে তো! বিশেষ করে জয়দেব এ সব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। দিনের বেলায় সকলের সামনে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলত না। বিয়ের একমাসের মধ্যেও দুপুরবেলা কখনও শারীরিকভাবে মিলিত হয়নি। সে নাকি শাস্ত্রে বারণ আছে। অসহ্য! অবশ্য মিলিত হয়েও সে যে আমাকে সুখী করতে পারত এমন নয়।

যাই হোক, দুজনে এক অস্বাভাবিক কুস্তির প্যাঁচ কষে যখন বসে বা শুয়ে আছি তখন জয়দেব আমাকে এইভাবে ধরে থেকে বলল—রাগ করে বুদ্ধি হারিয়ো না। বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য হিসেবে মনে করি, তাতে দুই পরিবারের মান-মর্যাদাও জড়িত। তাই বলি হঠাৎ ডিভোর্সের কথা চিন্তা করে সব ভণ্ডুল কোরো না।

—আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আর চিন্তাই-বা কী, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

জয়দেব কোমর ধরে পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল—তাতে তোমার-আমার কারও সম্মান বাড়বে না। লোকে ছি ছি করবে।

সেই মুহূর্তে জয়দেবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। লোকটার কিছু দুর্জয় কুসংস্কার আর লোকলজ্জা আছে, যার জন্য ও আমার সব কলঙ্ককেও হজম করে যাবে। এটা বুঝে আমি আর একটু চাপ সৃষ্টি করার জন্য বললাম—তা হলে বলো, কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী নই।

জয়দেব ভীত চোখে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থেকেই হঠাৎ চোখ বুজে বলল—আমার ভুল হতে পারে অলকা।

—তার মানে?

—তার মানে কুমারীত্ব পরীক্ষার কোনও নিশ্চিত উপায় নেই।

—তবে বললে কেন?

—দেখলাম, তুমি স্বীকার করো কি না।

আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের জন্মগত কিছু বুদ্ধি তো থাকেই। এই বোকাটা কী করে ভাবল যে আমি স্বীকার করব? আমি বললাম—কী স্বীকার করব?

জয়দেব হঠাৎ খুব বদলে গিয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে নেই, সেই ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা ছিল প্রবল কামেচ্ছা। হঠাৎ ওই রাগারাগি থেকে শারীরিক টানাটানির ফলে পরস্পরের নৈকট্য, ঘন শ্বাস, দেহগন্ধ, স্পর্শবিদ্যুৎ—সব মিলেমিশে এক প্রবল চুম্বকের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। দেহ-অভিজ্ঞতা তো তখনও আমাদের নতুন, তাই সামলাতে পারল না জয়দেব। ঝগড়াটা শরীরের মিলন দিয়ে শেষ হল।

আবার হলও না।

প্রভাসরঞ্জন

সুইস এয়ারের যে উড়োজাহাজে আমি ফিরছিলাম তাতে খুব একটা ভিড় ছিল না। জানালার ধারে এক জার্মান বুড়ি, তার পাশে এক বুড়ো, পরের সিটটায় আমি। বুড়োর হাতে আর্থারাইটিসের ব্যথা, তাই বুড়ি বুড়োকে কফি কাপ ধরে ধরে খাইয়ে দিচ্ছিল, খাবার মুখে তুলে দিচ্ছিল। বুড়োর মুখে বোধহয় প্যারালাইসিসের ছোঁয়া আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুপ গড়িয়ে পড়ে, মাংসের টুকরো হঠাৎ করে কোলের ওপর পড়ে যায়। ন্যাপকিন তুলে বুড়ি বারবার মুখ মুছিয়ে দেয়, আর আমার দিকে অপ্রতিভ হাসি হেসে চেয়ে কেবলই ক্ষমা চায়। বুড়োর কাঠামোটা বিশাল, এক সময়ে যৌবনকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত বোধহয়। এখন বয়সে বড় জব্দ। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, খুব জোরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে। অনবরত সেই শব্দে প্রেশারাইজড আবহাওয়ার উড়োজাহাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমি জেগে উঠি। বিরক্ত হই। বুড়ো আমার দিকে একটু একটু অপরাধবোধ নিয়ে তাকায়। বুড়ো-বুড়িকে আমার খারাপ লাগছিল না। বেশ ভালবাসা দুজনের। আমার জার্মান বউ সিসি আমাকে

খুব ভালবাসত, যদি বিয়েটা টিকত আর আমরা এরকম বুড়ো হতাম, তবে কি তখনও আমার জন্য এতটা করত সে?

সিসির কথা একটু একটু ভাবছিলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জার্মান মেয়েদের মতো গায়েগতরে বিশাল ছিল না, বেশ একটু নরম-সরম ছোট মাপের চেহারা। রোগাটে, সাদাটে, ভাবালু। খুব ভুলো মন ছিল তার। সেইসব দেখে আমি ঝপাং করে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তো পড়লই, যৌবনকালে ওরা বড় বেশি প্রেমে পড়ে। পরিচয়ের পর প্রেম হওয়ারও আগে আমরা এক বিছানায় বিস্তর শুয়েছি। যাকে ফুর্তিবাজ বলে আমি ঠিক তা নই। বিদেশে মেয়েদের গা-দেখানো এবং গায়ে পড়ার প্রবণতা এত বেশি ছিল যে সেখানে তাদের জলের মতো ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমারও এরকম অভিজ্ঞতা কিছু ঘটেছিল। সিসি তাদের মধ্যেই একজন। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার জন্য ভূমিকা-টুমিকা করতে হয়নি। এবং কিছুকাল থেকে সরে পড়াতেও বাধা ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্টে আমার পনেরো দিনের ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার আগের দিন অবধি আমি সিসির একঘরের ছোট্ট বাসায় ছিলাম। থাকার খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছিল। ওকে আমার পছন্দও হচ্ছিল খুব। আসার দিন সকালে ঘুম থেকে ভাল করে ওঠার আগেই বিছানাতেই ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। ও খুব হেসে বলল—ঠিক এরকম ভঙ্গিতে আর কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমি জানি না। সিসি কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ খুশি। ওর জীবনে সেটাই প্রথম প্রস্তাব। সেই দিনই রেজিস্ট্রি করে আমি ব্যালে চলে আসি। দেড় মাস পর সিসিও এল, আমরা দুজনে বেশ একটু কষ্ট করে থাকতাম। কারণ, ও এসে প্রথম প্রথম চাকরি পায়নি। তার ওপর গর্ভবতী। চাকরি পেলেও করতে পারত না। ও তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, সঙ্গে আনুষঙ্গিক নানা অসুস্থতা। আমার বেতন খুব বেশি ছিল না, সিসির চিকিৎসা আর যত্নের জন্য পুরো টাকাটা বেরিয়ে যেত। মাস চারেক পর একটু সুস্থ হয়ে সে ফিরে গেল ফ্রাঙ্কফুর্টে, আবার কদিন পর এল। আমিও যেতাম। ব্যালেই অবশেষে সে চাকরি পায় আমার কোম্পানিতেই। যথাসময়ে আমাদের এক পুত্রসন্তান হয়। তার গায়ের রংটা আমার রং ঘেঁষা বটে, কিন্তু দুরন্ত ইউরোপীয় রক্ত শরীরে বইছে, বিশাল ছেলেটা জন্মেই জার্মানদের মতো গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ছেলেটা যখন মাস চার-পাঁচেকের হল তখন সে আমার অতি আদরের ধন। বড়সড় চেহারা, কান্নাকাটি নেই, আমার কোলে উঠলে খুব চেঁচাত আনন্দে। অবিকল কাকাতুয়ার মতো শব্দ করত সে উত্তেজনার সময়ে। টিভি দেখতে খুব পছন্দ করত, কী কারণে জানি না লাইটার বা দেশলাই জ্বাললে খুব ভয় পেত। এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই কাঁদো-কাঁদো মুখ হয়ে যেত। তার চার মাস বয়সে রং অনেক ময়লা হয়ে গেল, দাঁত উঠবার সময়ে বেশ রোগাও হয়ে গেল সে। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি, চকোলেট বা ক্যান্ডি পেলে মুখের নাল দিয়ে মাখামাখি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুষতে ভালবাসত। সে বেশ বড়সড় বাচ্চা ছিল, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে ভারতীয় সন্তান, মুখে সিসির আদল থাকা সত্ত্বেও।

তার যখন পাঁচ মাস বয়স তখনই সিসি আর আমি আলাদা হওয়ার মনস্থ করি। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল মর্মান্তিক, বাচ্চাটাকে ছেড়ে কী করে থাকব! সিসিও জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ভিন্ন জীবনের জন্য খুবই উদগ্রীব। আমার মতো নিস্পৃহ এবং কম আমুদে লোককে সে সহ্য করতে পারত না। যেমন আমি পারতাম না তার অতি উচ্ছল ও খানিকটা নীতিবিগর্হিত চলাফেরা। আমার ভিতরে এক তেমাথাওলা ভারতীয় গেঁয়ো বুড়োর বাস। সে কেবলই সতী-অসতী, ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি বিচার করে যায়। কতবার তার মুখে হাতচাপা দিতে গেছি, থামাতে পারিনি। অশান্তির শুরু সেখানেই! একসময়ে আমার এও মনে হয়েছিল, সিসি চলে গেলেই বাঁচি, দেশে ফিরে একজন বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকব।

কিন্তু ছেলেটাই মস্ত বাধা।

আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, আগেই বলেছি। সেটাও এই বিচ্ছেদের আর একটা কারণ। উপরন্তু সিসির বাবা মা বার্লিন থেকে তাকে ক্রমাগত চিঠি দিচ্ছিল ফিরে যাওয়ার জন্য। সিসি একটা মস্ত ভুল করেছে, তাদের ধারণা। সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকাল।

তারপর বিচ্ছেদ। ছেলের নাম রেখেছিলাম নীলাদ্রি। পরে সেই নাম সিসি বদলে দিয়েছিল কি না

জানি না! নীলুর জন্য আজও আমার মন বড় কেমন করে।

নীলু তার মার সঙ্গে জার্মানি ফিরে গেছে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না! দেখলে চিনবেও না তেমন করে। এতকাল ইউরোপে তবু তার কাছাকাছি ছিলাম। উড়োজাহাজ যখন উড়িয়ে আনছিল আমাকে পুবের দিকে তখন কেবল মনে হচ্ছিল, নীলুর কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি।

পাশের বুড়োটা আমার হাঁটুতে হাত রাখল হঠাৎ। তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি। তাকাতেই বুড়ো নাকের বাঁশি বাজিয়ে জড়ানো গলায় কী যেন বলে। আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই—হাইজ্যাক!

ততক্ষণে বুড়িও সটান উঠে বসেছে। বুড়িও বলল—হাইজ্যাকারস—।

আন্তর্জাতিক বিমানে আজকাল সবসময়েই হাইজ্যাকের ভয়। বিমানের দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে এই ভয় কিছুমাত্র কম নয়। কোথায় কোন গেরিলা বা লিবারেশন আন্দোলনের বিপ্লবী পিস্তল-বোমা নিয়ে উঠে বসে আছে কে জানে! মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই গভীর অসন্তোষ। দেশপ্রেমিক বা ভাড়াটে গেরিলা সর্বত্রই বিরাজ করছে। কখন কোন বিমানকে ভয় দেখিয়ে তারা অজানা ঠিকানায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ হিসেবে কতজনকে আটকে রাখে বা হত্যা করে তার কোনও ঠিক নেই। তাই আজকাল আন্তর্জাতিক বিমানে উঠলে অনেকেরই বুক একটু ধুকপুক করে।

তাই বুড়ো-বুড়ির চাপা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে সামনের তিন সারি দূরত্বে একজন আরবকে দেখতে পাই। অবশ্য সে আরব কি না তা বলা খুবই মুশকিল, তবে সে যে মধ্যপ্রাচ্যের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাল ও থুতনি জুড়ে চাপা দাড়ি। চমৎকার মোটা গোঁফ। বাচ্চা একটা হাতির মতো তার বিশাল চেহারা। তাকে কয়েকবারই টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি উড়োজাহাজে ওঠার পর থেকে। পেটের রোগ, বহুমূত্র বা বাতিক না থাকলে অতবার কেউ বাথরুমে যায় না। কিন্তু তখন তাকে সন্দেহ হয়নি। এখন দেখি, কাঁধে একটা এয়ার ব্যাগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে এক দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে এয়ার ব্যাগটা ঝুলছে ব্যাগের চেন খোলা, তার বাঁ হাতটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো। খুবই সম্ভব, সে ব্যাগের মধ্যে গুপ্ত গ্রেনেড বা পিস্তল ছুঁয়ে আছে, এবং পিছনের দিকে তার কোনও সহ-গেরিলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে—সব প্রস্তুত কি না।

একটু আগেই নীলুর কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল। ছেলেকে ইউরোপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমার পরিচয় তার জীবন থেকে মুছে যাবে, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যাব পরস্পরের কাছে। অথচ সে আমারই বীজ, আমার শরীর থেকে তার অস্তিত্বের জন্ম। এতখানি আমাদের আত্মিক সম্পর্ক, তবু সে আজ আমার কেউ না। খুবই শিশু অবস্থায় সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই বয়স পর্যন্ত তার হাবভাব, হাসা-কাঁদা, অবোধ শব্দ সবই আমার ভিতরে টেপ রেকর্ড করা আছে। স্মৃতির বোতাম টিপে দিলেই টেপ রেকর্ড বাজতে থাকে। সবই মনে পড়ে। আমার মাথার ভিতর থেকে একটা প্রোজেকটার মেশিন চোখের পর্দার ওপরে তার সব চলচ্চিত্র ফেলতে থাকে। ছেলেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, অধিকারবোধ ছাড়তে চায় না। নীলু আমার ছেলে—এই বাক্যটা ধ্রুবপদের মতো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা অসহায় ভালবাসা বাৎসল্য আমাকে খুবই উত্তেজিত এবং অবসন্ন করে দেয়। দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেও আমার জন্য কোল পেতে কেউ বসে নেই। আদরে-আহ্লাদে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকে আমাদের পরিবারে ভালবাসার চাষ কম দেখেছি। দুঃখে দারিদ্র্যে হতাশায় আধমরা মানুষ ছিলাম আমরা, পেটের ভাতই ছিল তখন ভালবাসার চরম নিদর্শন।

বাবা-মা বুড়ো হয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। প্রথম প্রথম আমি টাকা পাঠিয়েছি। বিয়ে করার পর তাও পাঠাতে পারিনি। কীভাবে সংসার চলে তা আমার জানা নেই, জানতেও চাইনি। ও সব জানতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই না জানারই চেষ্টা করেছি। বাবার চিঠিতে যে অংশ সংসারের দুঃখের বিবরণ থাকত সেই অংশ আমি বাদ দিয়ে পড়তাম। জানতাম, তাদের জন্য আমার আর কিছু করার নেই, খামোকা তবে তাদের দুঃখের কথা জেনে কী হবে।

এরোপ্লেনে বসে আমি সারাক্ষণ আমার দুটো জীবনের কথা ভাবছিলাম। স্বদেশে আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, বিদেশে আমার নানা আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা। এর ওপর নীলুর স্মৃতি। বিদেশিদের

মধ্যে এত বেশি সন্তানস্নেহ বোধহয় নেই। অন্তত আমার মতো পিপাসার্ত পিতৃহৃদয় আমি কারও দেখিনি। নিজের বাপ-মায়ের মধ্যেও পুত্রস্নেহের কোনও বাহুল্য প্রকাশ পেত না। তা হলে আমার এই প্রবল স্নেহ এল কোত্থেকে?

পরে আমি অনেক ভেবে এর একটা উত্তর খুঁজে পাই। আসলে স্বদেশে যারা আমার আপনজন তাদের কোনওদিনই আপন বলে মনে হয়নি। একমাত্র ছোটকাকাকে মনে হত। কেন মনে হত তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু যেই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে শুরু করি সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিদেশেও তাই। আমার ছেলেটিকে বুকে চেপে যখনই ভাবতে শুরু করি এই আমার নিজস্ব সন্তান, তখনই তার ছেড়ে যাওয়ার সময় হল।

আশ্চর্য এই, নীলাদ্রির মুখে আমার ছোটকাকার মুখের ছাপ ছিল। এও হতে পারে, স্নেহের দুর্বলতা থেকেই আমি তার মুখে কাকার আদল দেখতাম। পৃথিবীতে আমার প্রিয় জনের সংখ্যা খুব কম। বাবা-মার প্রতি আমার দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা খুব বেশি থাকার কথা নয়। শিশুকাল থেকে অভাব, আর সংসারের ভার কাঁধে বয়ে তাঁদের ওপর আমার বীতশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। মনে হত, আমার কোমরে শেকল দিয়ে সংসারটা কে যেন বেঁধে দিয়েছে, যার জন্য আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, অনার্স ছাড়তে হয়েছিল, জীবনের অনেক সার্থকতা আমাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আমার এক বিরূপ মনোভাবের জন্ম হয়। যখন বিদেশে সিসিকে বিয়ে করলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ভালবাসার আশ্রয় পেলাম। ভুল, খুবই ভুল সেটা। সে ভালবাসার শুরু দেহের প্রেম দিয়ে তার বিয়ে কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমাদের। শরীর জুড়োল তো ভালবাসা ফুরোল। আমরা কেবল শরীর দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসার চেষ্টা করেছি। পরস্পরের সান্নিধ্য রাখা ছিল সামাজিক কর্তব্যের মতো। সেখানে বিশাল ও ব্যাপ্ত কর্মময় জীবনে সিসিও যেমন ব্যস্ত, আমিও তেমনই ব্যস্ত তাই আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কারবশত আমি তার স্বাধীন চলাফেরা বা বহির্মুখিনতা খুব বেশি পছন্দ করতে পারতাম না। তাই সিসি নয়, নীলুই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। তার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তাই নীলু চলে গেলে সারা পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।

না বিদেশে, না স্বদেশে, কোথাও আমার কেউ নেই—এরকম একটা বোধ আমার বুকে পাথরের মতো জমে আছে। বিদেশে থাকার আনন্দ নেই, স্বদেশে ফেরার আনন্দ নেই। আমার মতো এমন উদ্বাস্তু কে আছে কোথায়। এরকম মনের অবস্থায় মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মরাটা জীবনে একবারই ঘটে, তাই সেই নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আমি কিছু বিলম্বিত করছিলাম। দেখা যাক, মরবার আগে কোথাও কোনও ভালবাসা বা প্রিয়ত্বের আলো চিড়িক দেয় কি না। তারপর আমার হাতের মুঠোয় মৃত্যু তো আছেই। এরকম মানসিকতা থেকে আমার মৃত্যুভয় কেটে গিয়েছিল। অন্তত কেটে গেছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আরব লোকটা যখন ওইরকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঘুরে তার সঙ্গীকে দেখছে আর আমার পাশের বুড়োটার একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা ঘামে ভেজা হাত এসে আমার কবজি পাকড়ে ধরল, আর বাঁশির মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন সে বারবার বলতে থাকল—'আইজ্যাক, 'আইজ্যাক', তখন অন্য অনেক যাত্রীও তন্দ্রা ভেঙে সচকিত হয়ে বসে পরিস্থিতি লক্ষ করছে। তাদের অনেকের মুখেই ভয়ের পাঁশুটে ভাব, তখনই আমিও হঠাৎ টের পেলাম, বাস্তবিক আমি আন্তরিকভাবে কোনওদিন মরতে চাইনি। মনে হল, জীবন কত সুন্দর ও বিশাল ছিল আমার। বয়স পড়ে আছে অঢেল। এখনও চেষ্টা করলে জীবনে কত কী করতে পারি।

আরব লোকটা তার প্রচণ্ড ঘন ভ্রূ দিয়ে ভ্রূকুটি করে 'আলিজা' কিংবা অনুরূপ একটা চাপা ধ্বনি করল। সম্ভবত কারও নাম। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। একটু আগেই ডিনার হয়ে গেছে, সেই অতি সুস্বাদু খাবারের স্বাদ এখনও জড়িয়ে আছে জিভে। সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তার রিমঝিম নেশা এখনও মাথায় রয়ে গেছে। সুন্দর একটা শারীরিক তৃপ্তির পর একটু আগে কফি শেষ করে সিগারেট খেয়েছি। সেইটাই কি জীবনের শেষ পানভোজন? কে জানে, কে বলবে?

ও পাশের বুড়িটা একটা ফোঁপানির শব্দ করল। সাহেব মেমরা কম কাঁদে। প্রকাশ্যে তো কখনওই

কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু বয়সের দোষে এবং ভয়বশত বুড়ি কাঁদছিল। কথা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম, তাদের ছেলেপুলে নেই, দুজনেরই আগে একবার করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই বিয়েটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—বলেছিল বুড়ি। বুড়োর গা একটা কম্বলে ভাল করে ঢেকে-ঢুকে দিচ্ছিল একটু আগে, তাতে আমিও সাহায্য করেছি। আমার জীবনে ভালবাসা নেই বলেই বোধহয় তাদের ওই ভালবাসা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই তো এরা দুনিয়ার আর কারও পরোয়া করে না, পরস্পরকে নিয়ে কেমন মেতে আছে। প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুতেই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। জীবনের একেবারে শেষভাগেও এই দুই অথর্ব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বেঁচে থাকাকে একরকম করে উপভোগ করছে দেখে আমার একটু ঈর্ষা-মেশানো আনন্দ হচ্ছিল।

আরব লোকটা কাকে ডাকল কে জানে! কিন্তু পেছন থেকে কোনও উত্তর এল না। আরবটা তখন তার সিট থেকে বেরিয়ে মাঝখানের প্যাসেজটায় দাঁড়াল, তখনও ব্যাগের মধ্যে হাত। খুব সম্ভবত সেই লুকানো হাতটা গ্রেনেডের সেফটি ফিউজ আলগা করছে আস্তে আস্তে। প্যাসেজে দাঁড়াতেই তার বিশাল চেহারাটা আরও বিশাল নজরে পড়ল। তার বাহুর ঘের বোধহয় আমার বুকের সমান হবে। বুকটা মাঠের মতো ধূ-ধূ করা বিরাট। ইচ্ছে করলে ও বোধহয় ঘুষি মেরেই পলকা প্লেনটাকে তুবড়ে দিতে পারে। কিন্তু আপাতত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখে ভ্রূকুটি। ডান হাতটা খানিকটা মুঠো পাকিয়ে আছে। যাত্রীরা সবাই দৃশ্যটা দেখছে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। কিন্তু অস্ফুট 'হাইজ্যাক' শব্দটা চারপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। ফিসফাস শব্দ হচ্ছে। একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে, তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পরিষ্কার ইটালিয়ান ভাষায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে—মরে গেলে আমাদের কি রোমে ফিরতে দেরি হবে?

আমাদের দমদমের বাড়িতে একদিন একটা কাক ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আর তাকে ঘিরে সারাদিন হাজারটা কাক চেঁচামেচি করেছিল। আমার ছোট ভাই দৃশ্যটা খুব করুণ চোখে দেখেছিল। পর দিন যখন আবার এঁটো কাঁটা কাক খেতে এসে উঠোনে নামছে তখন সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাককে দেখিয়ে বলল—দাদা, ওই কাকটা কাল মরে গিয়েছিল না রে?

সেই স্মৃতিটা মনে আসতেই এক ঘোর মায়ায় আমার বুক ভরে গেল। শিশুরা তো মৃত্যুকে জানে না! ওই মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমাকে যেন চাবুক মারল। নীলুর কথা মনে এল, ছোট ভাইটার কথা মনে এল। স্নেহমায়ায় বুক ভরে গেল। আর ওই তীব্র চেহারার আরব লোকটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আমার ভিতরে মৃত্যুভয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটাল যেন।

আরবটা এক পা, এক পা করে কয়েক পা এগিয়ে এল। দাঁড়াল। আবার এগোল। দাঁড়াল। সেই একই ভঙ্গিতে তার ডান হাত মুঠো পাকানো। বাঁ হাত ব্যাগের মধ্যে ভরা। একটু বাদেই কিছু একটা ঘটবে। লোকটার মুখে-চোখে এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়। মৃত্যুর প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন। সবরকম বিপদকে নিয়েই সে বেঁচে আছে।

আর তখন হঠাৎ আমার মানসিক একটা বিকলতা ঘটে গেল। হঠাৎ যেন এরোপ্লেনের মৃদু চাপা শব্দ, আর অতি ক্ষীণ থরথরানি থেমে গেল। আর আমি এক স্বপ্নময় দৃশ্যের মধ্যে ঢলে পড়লাম।

সেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত।

দেখি, একটা বিচিত্র দেশে আমি পৌঁছে গেছি। এখানে মাটির রং নীল, তার ওপর হলুদ সবুজ লাল গোলাপি, হরেক রকমের ঘন ঘাস গজিয়ে চারধারে যেন এক বিভিন্ন রঙের দাবার ছক তৈরি করে রেখেছে। এইসব রঙিন ঘাসের নিখুঁত চৌখুপির ধারে ধারে নাতিদীর্ঘ গাছে সম্পূর্ণ গোল রামধনু। ছবিতে যেমন সব কাল্পনিক পাখি দেখা যায়, তেমনই সব পাখি উড়ছে চারধারে। আকাশের রং উজ্জ্বল নীল, তাতে গোল গোল সুন্দর নানাবর্ণের মেঘ। তারাগুলো অনেক কাছে কাছে ফুটে আছে। আর প্রতিটি তারার মধ্যেই নাক মুখ চোখ আঁকা। আকাশের একধারে একধারে এত বড় একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় দিগন্তের প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। চারধারে ছোট ছোট টিলা রঙিন কাচ আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। রাস্তা দিয়ে পুতুলেরা হেঁটে যাচ্ছে। দুটো কুকুর অবিকল মানুষের ভাষায়

কথা বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গ্রোসারি শপ-এর সামনে একটা টেকো পুতুল একটা পাখির সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। তিনজন পরী উড়ে উড়ে রামধনুগুলোয় আরও ভাল করে রং দিয়ে দিচ্ছে। একটা খেলনা মোটরগাড়ি মোরগের ডাকের মতো ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেল। চারধারে কী এক অপরিসীম শান্তি, এক মৃত্যুহীন নিরাপদ শাশ্বত জগৎ!

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, নীলুর জন্য যে সব ছবির বই কিনে দিয়েছিলাম আমি, তারই কোনওটার মধ্যেই এই ছবিটা ছিল। আমি সেইরকমই একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি হঠাৎ ডুকরে বলে উঠলাম—নীলু!

আরব লোকটা সেই মুহূর্তেই আবার ডাকল—আলিজা!

এবার পিছন থেকে একটা শব্দ হল। তারপর একটা লম্বা, সুন্দরপানা মেয়ে উঠে এল কোথা থেকে। তারও অবিকল মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা। সে এসে এই বিশাল লোকটায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এই মেয়েটাই কি ওর সহ-গেরিলা?

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অলকা

এই সকালবেলায় আমার ঘরখানা চমৎকার দেখাচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের হল সকালবেলা। আমি খুব ভোরে উঠতে পারি না বলে আমার একরকম দুঃখ আছে। তবে মাঝে মাঝে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরময় সকালের রোদ দেখি। কী সুন্দর লাগে ভোরের একটা আলাদা গন্ধ! লক্ষ করে দেখেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মানুষকে সবচেয়ে ভাল দেখায়।

পার্ক সার্কাসের এই ফ্ল্যাটটা প্রথমে ভাড়া করেছিল আমাদের এক মাসতুতো দাদা। আমার বিয়ের ছ মাস পর আমি আর জয়দেব হনিমুন করতে যাই শিলঙে। বুদ্ধিটা কার ছিল কে জানে। জয়দেবদের পরিবারে হনিমুনের চল ছিল না। কিন্তু আজকাল বাঙালি সমাজে হনিমুনের চল হয়েছে। আমার মনে হয় জয়দেবই আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পরিবার থেকে কিছুদিন আমাকে নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিল। সেইটেই হল কাল।

শিলঙে আমরা একটি হোটেলের ঘরে দুটো ঝগড়াটে বেড়ালের মতো দিনরাত ফোঁসফোঁস করতাম। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

জয়দেব হয়তো বলল—এক গ্লাস জল দাও তো!

আমার প্রেস্টিজে লাগল, বললাম—গড়িয়ে খাও, নয়তো বেয়ারাকে বলো।

—তুমি তো আমার বউ, এটুকু করলে তো দোষ হয় না।

—বউ মানে তো ঝি নয়।

একদিন একটা মেয়েকে দেখে জয়দেব বলল—দেখ, মেয়েটি কী সুন্দর!

স্বামী কোনও যুবতীকে সুন্দর দেখলে স্ত্রীর একটু হিংসে হওয়ার কথা, আমার হল না। বললাম—বেশ সুন্দর!

—আলাপ করব?

—করো না! তবে তুমি তো তেমন স্মার্ট নও, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কথা বলো।

জয়দেব অবশ্য গেল না কথা বলতে। চেরাপুঞ্জি দেখতে গিয়েও খুব তুচ্ছ কারণে একচোট ঝগড়া হল। জয়দেব বলল—চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় এটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি রিসেন্টলি একটা বিদেশি ম্যাগাজিনে পড়েছি আর একটা কোনও জায়গায় যেন এর চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়।

চেরাপুঞ্জিতে না হয়ে অন্য কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেই-বা আমার ক্ষতি কী? কিন্তু যেহেতু জয়দেব বলছে, সেই হেতু আমার কথাটা ভাল লাগেনি, মনে হয়েছিল ও একটু পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করছে।

আমি বললাম—আন্দাজে বোলো না।

—না অলকা, আমি পড়েছি।

—মিথ্যে কথা। চেরাপুঞ্জিতেই বেশি বৃষ্টি হয়।

জয়দেব রেগে বলে—আমি বলছি আমি পড়েছি।

—পড়লেও ভুল পড়েছ। আমরা ছেলেবেলা থেকেই চেরাপুঞ্জিকে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির জায়গা বলে জানি।

—ভুল জানো।

—তুমি ভুল পড়েছ।

এইভাবেও আমাদের ঝগড়া হত।

শিলং বা চেরাপুঞ্জির দোষ নেই, ভূগোল বই বা বিদেশি ম্যাগাজিনও দায়ী নয়। আমরা দুজনেই টেলিফোনে দুটো রং নাম্বার পেয়ে অচেনা লোককে চেনা ঠাওরাবার অভিনয় করছি।

শিলং থেকে দুজনেই কিছু রোগা হয়ে ফিরে এলাম। শ্বশুরবাড়িতে কিছুকাল থেকে শরীর আরও খারাপ হল। লোকে ভাবল বোধহয় মা হতে চলেছি। ডাক্তার দেখে বলল—না, পেটে ফাংগাস হয়েছে।

শরীর সারাতে বাপের বাড়ি গেলাম। মাসখানেক পর জয়দেব নিতে এল। গেলাম না। জয়দেব তখন গ্রামে ঘুরে কটেজ আর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য কী সব কাজ করে বেড়ায়। বাড়িতে খুব একটা থাকে না। শুনলাম, প্রাচীন মন্দিরের ওপর থিসিস লিখছে ডকটরেট করার জন্য। আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই না শুনে রাগ করে বলল—আমি কুড়ি দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরলাম, তুমি এ সময়ে যাবে না আমার কাছে?

আমি প্লেটে করে আচার খাচ্ছিলাম, জিভে টকাস টকাস শব্দ করে বললাম—আমাকে দিয়ে তোমার কী হবে? বউগিরি করতে আমার ভাল লাগে না।

জয়দেব আমার আচার খাওয়া দেখছিল। ওই সিরিয়াস অবস্থাতেও ওর মুখ রসস্থ হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঝোল টেনে বলল—বউ গিরি কথাটা কি ভাল।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—ভাল না মন্দ কে জানে! আমার তো তাই মনে হয়।

জয়দেব হাল না ছেড়ে বলল—তুমি কি আমাকে একটুও সহ্য করতে পারো না?

—পারতে পারি। যদি তুমি আলাদা থাকো।

—আলাদা থাকলে কী হবে?

—আমি আলাদা বাসায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। তোমাদের বাড়ির অত লোকের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তুমি আলাদা বাসা করে খবর দিয়ো। যাব।

—এই কি শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—আমার বাড়ির লোক তোমার কী ক্ষতি করেছে?

—তা জানি না। তবে যদি আমাকে চাও তো বাড়ি ছাড়তে হবে।

জয়দেব ভাবল। ফিরে গেল। মনে হল, কথাটা সে ভেবে দেখবে।

কিন্তু জয়দেবকে আমি তখনও ঠিক চিনতে পারিনি। বাড়ি ছাড়বার ছেলে জয়দেব ছিল না। কদিন পর তার একটা পরিষ্কার চিঠি এল। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে লিখে পাঠিয়েছে—অলকা, বিয়ে ভাঙার জন্য যা করতে হয় তা তুমি করতে পারো। আমি ইনিশিয়েটিভ নেব না। বিয়ে ভাঙা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু তুমি যদি চাও তো দাবি ছেড়ে দেব।

চিঠিটা পেয়ে যে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম তা নয়। কোথায় যেন আমার মেয়ে-মানুষি অহঙ্কারে একটু ঘা লাগল। যত যাই হোক, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই তো মেয়েরা আর কুমারী রইল না। এই বাংলাদেশে কুমারী যে নয়, সে একা হলে বড় মুশকিল।

এই চিঠি এলে আমাদের পরিবারেও হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাবা যত প্রগতিপন্থী হোন, মা যত আধুনিকা হোন, মেয়ে বিয়ে ভেঙে স্বামী ছেড়ে চলে আসবে, এটা তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে

পারেননি।

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—চল অলকা, আজই তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসি।

মাও বাবার সঙ্গে একমত। আমার ঠাকুমা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। দাদাও খুশি নয়।

অথচ আমি-ই বা কেন শ্বশুরবাড়ি যাব?

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া লাগল। আমি স্পষ্ট বললাম, যদি জয়দেব বাড়ি থেকে আলাদা হয় একমাত্র তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।

বাড়ির লোকজন আমার মতে মত দিল না। জোর করতে লাগল। আমি প্রায় একবস্ত্রে মাসির বাড়ি চলে এলাম।

মাসিও বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়েছে একসময়ে। সব রকম আধুনিকতায় শিক্ষিত করেছে, তবু দেখা গেল আমার এই বিয়ে-ভাঙার ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। বলল—দূর মুখপুড়ি, স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়াই করিস, বিয়ে ভাঙতে যাস না। এ দেশে যারা বিয়ে ভাঙে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়, হুট করে এই কম বয়সে ও সব করিস না।

মাসির সঙ্গেও বনল না। অথচ কেন জানি না মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে, জয়দেব বা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

আমার আর এক মাসির ছেলে অসীমদা তখন বিলেত যাচ্ছে। বউ-বাচ্চা নিয়েই চলে যাবে। পাঁচ-সাত বছর ফিরবে না। তার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকবে এমন কথা হচ্ছিল। কলকাতায় বাসা পাওয়া প্রচণ্ড সমস্যা বলে তারা ফ্ল্যাটটা ছাড়তে চাইছিল না। তখন আমি অসীমদাকে বললাম—ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দাও।

অসীমদা খুশি হয়ে বলল—তবে তো ভালই হল। কতগুলো দামি ফার্নিচার রয়েছে, তুই আর জয়দেব থাকলে ভালই হবে।

জয়দেব থাকবে না, আমি একা থাকব—এটা আর অসীমদার কাছে ভাঙলাম না।

ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল সেদিন বিকেলে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করলাম। জীবনে এই প্রথম একা থাকা। একদম একা। একটু ভয়-ভয় করছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আনন্দও হচ্ছিল। একা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কী যে আনন্দ!

বাড়ি থেকে মা বাবা আত্মীয়স্বজনরা এসে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক জ্বালাতন করল, আমি জেদবশত গেলাম না। বাড়িতে ফিরে গেলেই ক্রমাগত আমার ওপর নানাদিক থেকে চাপ সৃষ্টি হবে। অনেক ঠেস-দেওয়া বাঁকা কথা, অনেক চোরা-চাউনি আর মুচকি হাসি সইতে হবে। তার চেয়ে বেশ আছি। ফিরে গেলাম না বলে সকলেরই রাগ, মা তো মুখের ওপরে বলেই গেল—তুমি বদমাশ হয়ে গেছ। নষ্টামি করার জন্যেই একটা ফ্ল্যাটে একা থাকবার অত শখ।

ব্যাপারটা তা নয়। বিয়ের আগে যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষদের প্রতি আমার এক ধরনের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, কেন জানি না, জন্মেছে।

একা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে চাকরি চাই। কলকাতায় চাকরির বাজার তো তেমন সুখের নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে এক চেনা সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাড়িতে বাচ্চা রাখার কাজ পেলাম। ইংরিজিতে বলে বেবি সিটার। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। স্ত্রী ডাক্তার। তারা মানুষ বেশ ভাল। বালিগঞ্জ প্লেসে তাদের বাড়িতে সকাল আটটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সাত আর তিন বছরের দুটো ছেলেমেয়েকে সামলে রাখতাম। দুপুরের খাবার দিত আর দুশো টাকা মাইনে। সাত বছরের ছেলেটা কনভেন্টে পড়তে যেত। তাই তাকে বেশি আগলাবার দরকার পড়ত না। তিন বছরের মেয়েটাকে সারাদিন ঘড়ি ধরে সাজাতাম, খাওয়াতাম, গল্প বলে ঘুম পাড়াতাম। বেশ লাগত। অসম্ভব মিষ্টি আর দুষ্টু মেয়েটা, সাতদিনেই সে আমার বড় বেশি ন্যাওটা হয়ে গেল। তার কচি মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ দিত একটা কথা—আমার যদি এরকম একটা মেয়ে থাকত।

যে সব বাচ্চার মা চাকরি করে তাদের যে কী দুরবস্থা হয় তা এই দুটো বাচ্চাকে দেখেই বুঝতাম। দুজনেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, অভিমানী, আর নিষ্ঠুরও ছিল। প্রথমে গিয়েই আমি বাচ্চাদুটোর মধ্যে কেমন ভয়-মেশানো সন্দেহ-মেশানো একরকমের দৃষ্টি দেখেছিলাম চোখে। সারাদিন

ওরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করত মনে মনে। ডাক্তার মায়ের ফিরতে রাত হত। তখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েও জেগে জেগে 'মা' বলে ডেকে ফের ঘুমোত। অন্য কোনও বাচ্চা দেখলেই মেয়েটা তাকে গিয়ে মারত, খিমচে দিত, চোখে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করত। সব সময়ে সে যেন তার প্রতি এক অজানা অন্যায়ের শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বড় কষ্ট হত আমার।

মাস তিনেকের মধ্যেই আমি বাচ্চা দুটোর আসল মা হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমি তাদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে কী করতাম সেই ভেবে মায়ের মতো সব হাবভাব করি, বায়না রাখি, শাসন করি। ওরা তাই আমার মধ্যে হারানো মা কিংবা নতুন মা খুঁজে পেল। নিজেদের মার জন্য খুব বেশি অস্থির হত না। বরং আমি সন্ধেবেলা চলে আসবার জন্য তৈরি হলে মেয়েটা ভয়ংকর কান্নাকাটি করত। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে আসা মুশকিল হয়ে উঠল। এইভাবেই জড়িয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা রোহিতাশ্ব চৌধুরী একদিন আমাকে বললেন—অলকা, আপনি তো খুবই শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের মেয়ে, এ কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। যদি বলেন তো আপনার জন্য একটা ভদ্রগোছের চাকরি দেখি।

তাই হল। এ কথার মাস দুয়েকের মধ্যে আমি একটা বাঙালি বড় ফার্মে টাইপিস্ট-ক্লার্কের চাকরি পেলাম। বাচ্চাদের জন্য মনটা খুব ফাঁকা লাগত। ওরা আর একজন বেবি সিটার রেখেছে জেনে মনটাও খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি ওদের, এটা-সেটা কিনে দিই। কিন্তু মাতৃত্বের এক অসম্ভব ক্ষুধা বুকের মধ্যে কেবলই ছটফট করে।

জয়দেবের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের কোনও সক্রিয় চেষ্টা আমি করিনি। সে বড় হাঙ্গামা। উকিলের কাছে যাও, সাক্ষী জোগাড় করো। তা ছাড়া আমার অভিযোগ-বা কী হবে জয়দেবের বিরুদ্ধে? তাই ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আলাদা আছি বেশ চলে যাচ্ছে, আর কেন মামলার হাঙ্গামায় যাওয়া? জয়দেব তো আমাকে চিমটি দিচ্ছে না!

যুবতী মেয়ে। একা থাকি। আমার কি কোনও বিপদ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। অসীমদার ফ্ল্যাটে একটা ফোন ছিল, তাতে কিছুদিন একটি ভিতু ছোকরা আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করার চেষ্টা করে। আমি ফোন তুলেই গলা চিনেই ফোন ছেড়ে দিতাম। তিন মাস পর সে হাল ছেড়ে দেয়। ওপরতলার এক মহিলার ফ্ল্যাটে মদ আর জুয়ার আড্ডা বসত। একবার সেখানকার এক মাতাল আমার ঘরের কড়া নেড়েছিল, আমি দরজা খুললে সে আমাকে ধরবারও চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা মাতলামি। পরে সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

এরকম দু-একটি ছোটখাটো ঘটনা বাদ দিলে আমার জীবন ছিল বেশ নিরাপদ। আমি একা থাকি না দোকা থাকি সেটাও তো সবাই জানত না। কলকাতায় কে কাকে চেনে!

তবে আমি যে-ফার্মে চাকরি করতাম সেই ফার্মের একটি উজ্জ্বল সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলে আমার প্রতি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দু-একবার রেস্টুরেন্টে গেছি, বেড়িয়েছি এদিক-ওদিক। কিন্তু কী জানি তার প্রতি আমার কখনও কেন আগ্রহ জাগল না!

তবে সে একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

প্রভাসরঞ্জন

আমার জীবন শুরু হয়েছে কয়েকবার। শৈশবে যে-জীবন শুরু করেছিলাম দেশভাগের পর তা শেষ হয়ে যায়। নতুন এক রুক্ষ ভিখিরির স্নেহহীন জীবন শুরু করেছিলাম। মধ্যে যৌবনে বিদেশে গেলাম নতুন আর একরকম জীবন শুরু করতে।

কতবার কতভাবে শুরু হল, আবার শেষও হয়ে গেল। এখনও আয়ু অনেকটা পড়ে আছে, কতবার আরও নিজের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে হবে কে জানে?

ফেরার সময়ে সেই এরোপ্লেনেই যেমন, গেরিলারা যদি প্লেন হাইজ্যাক করে নিয়ে যেত, যদি মুক্তিপণ হিসেবে বন্দি করত আমাদের এবং যদি প্রতি ছ ঘণ্টা অন্তর এক-একজন যাত্রীকে গুলি করে

মেরে ফেলত তাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি হিসেবে? না, সে সব কিছুই হয়নি। না হলেও সেই কয়েকটা মুহূর্তের আকণ্ঠ মৃত্যুভয় আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল।

সেই রূপসী তরুণীটি দৈত্যকার লোকটির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কী বলছিল তা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। চোখের পলক না ফেলে হাঁ করে চেয়ে দেখছি দৃশ্যটা, আমার পাশে বসা বুড়োর নাকে বাঁশির শব্দ হচ্ছে, বুড়ি অস্পষ্ট স্বরে কেঁদে কী যেন বলছে বুড়োকে। প্লেনসুদ্ধ যাত্রীরা আতঙ্কে চেয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। লোকটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুখানায় বাদামি আগুন ঝলসাচ্ছে। তারা দুজন চারদিকে যাত্রীদের চোখকে গ্রাহ্য করছে না, যেন আর কেউ যে উপস্থিত আছে এ তারা জানেই না।

মেয়েটা খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেলে দৈত্য লোকটার চোখ-মুখ হঠাৎ খুব নরম হয়ে গেল। দুটো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মতো হাতে লোকটা সেই পলকা মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর চকাস চকাস করে চুমু খেতে লাগল।

ঠিক এরকমটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ডানদিকে একটা লোক হেসে উঠল। পাশের বুড়ি বুড়োকে বলছে—ও গড, হি উইল ব্রেক দ্য গার্লস ব্যাক। পিছন থেকে একটা হাততালির শব্দ আসে। একজন বলে ওঠে—হ্যাপি এন্ডিং। পিছনের ইটালিয়ান বাচ্চাটা বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে—ওরা কখন মারবে? চুমু খাওয়ার পর?

দুজন সুন্দরী হোসটেস এতক্ষণ সামনের দিকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল এদিকে চেয়ে। এবার তারা প্রাণ পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসে। দৈত্যটির পিঠে টোকা দিয়ে একজন জার্মান ভাষায় বলে—ইচ্ছে হলে আপনি বসতে পারেন। সামনের দিকে একটা টুইন সিট আছে।

লোকটা মেয়েটাকে খানিক নিষ্পিষ্ট করে মুখ তুলে বলে—ড্রিঙ্ক আনো, আমার তেষ্টা পেয়েছে।

পিছনে যেখানে আলিজা বসেছিল তার পাশের সিটে একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ ছিল। তাকে কেউ লক্ষ করিনি এতক্ষণ। সবাই ঘাড় ঘোরাচ্ছে দেখে আমিও পিছু ফিরে ছেলেটাকে দেখতে পাই। একটা বাদামি শার্ট গায়ে, গলার টাইটা আলগা, মুখটা অসম্ভব লাল, দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সে এই প্রেমের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না, অসম্ভব রেগে গেছে এবং এক্ষুনি সে একটা কিছু করবে।

কী সে করত জানি না, তবে দৈত্যকায় লোকটির বুকে সেঁটে থেকেই মেয়েটা একবার পিছু ফিরে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল তাকে! সে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

দৈত্য লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে আরও সামনের দিকে কোথাও গিয়ে বসল।

আমি হোসটেসকে ডেকে একটু ড্রিংকস চাইলাম। আর সেটি পরিবেশনের সময়ে জিজ্ঞেস করতেই সুন্দরী হোসটেসটি মৃদু স্বরে বলল—লাভ ট্র্যাংগল।

কিন্তু একটু বাদে পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে নিচু স্বরে কী যেন বলল অনেকটা সময় ধরে। তারপর দেখি, তরুণী হোসটেস ছাইরঙা এক আতঙ্কিত মুখে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বেতার-ঘরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হোসটেসের মুখের ভাব অনেকেই লক্ষ করেনি। তাই বেশির ভাগ লোক নিশ্চিন্তে বসে আছে। আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বেইরুটে প্লেন থামতে দরজা খুলে কয়েকজন বিশালদেহী যাত্রী উঠল। তাদের চেহারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। উঠে মুহূর্তের মধ্যে তারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল চোখের পলকে দেখি তাদের হাতে হাতে উঠে এসেছে এল.এম.জি. কারবাইন, থমপসন অটোম্যাটিক। চারজন সেই দৈত্যের মতো লোকটা আর তার বিস্মিত বান্ধবীকে ঘিরে ফেলল। দুজন গিয়ে ধরল পিছনের ছেলেটিকে।

বাচ্চা হাতির মতো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইল। রাগে তার মুখ টকটকে লাল। চেঁচিয়ে সে তার দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন গালাগাল করছিল পিছনের ছেলেটিকে। আর সেই ছেলেটিও কী যেন জবাব দিচ্ছে বেপরোয়া মুখে।

ছদ্মবেশী আর্মড গার্ড তিনজনকেই নামিয়ে নিয়ে গেল মেশিনগান আর অটোম্যাটিকের নল গায়ে ঠেকিয়ে। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে সার্চ করা হল প্লেন। গুঞ্জন শোনা গেল, ওই তিনজনই ছিল গেরিলা।

বেইরুটের পর তারা প্লেন হাইজ্যাক করত। প্রেমের ত্রিকোণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কী হত বলা মুশকিল। প্রেমে ব্যর্থ পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে তাদের সব গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল।

গেরিলাদের ক্ষেত্রে এরকম বড় একটা হয় না, আমি জানি। সর্বত্রই আমি মৃত্যুপণ গেরিলাদের লক্ষ করে দেখেছি। প্রেম তাদের কাছে কোনও সমস্যাই নয়। আমার এখনও মনে হয় ওরা গেরিলা ছিল না। পিছনের ছেলেটি নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দিয়ে ইচ্ছে করেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা কী তা আমি আজও জানি না। কিন্তু প্লেন বেইরুট থেকে উড়লে মনে হয়েছিল, আমরা আবার জীবন ফিরে পেলাম। আমি যে-জীবন ফিরে পেলাম সেটা কেনন? সে-জীবন শেষ হলেই-বা কী ক্ষতি ছিল?

দমদমের দরিদ্র বাড়িটিতে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন আমার বাবা-মা যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই একটা বিয়ে করেছে। আমার ভাই, ভ্রতৃবধূও যথাসাধ্য খুশির ভাব দেখাল। ভাইয়ের সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কিছু লোভনীয় জিনিস এনেছিলাম। সেগুলো বাড়ির লোকদের বিলিয়ে দিলাম। সবাই অসম্ভব খুশি হল তাতে। একেই তারা ভাল জিনিস চোখে দেখেছে কম, তার উপরে এত সব হরেক রকম মহার্ঘ দ্রব্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এই উত্তেজনা বাড়াতে আমার বোনেরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা আর স্বামী নিয়ে চলে এল বেড়াতে। খুবই হতাশ হই তাদের দেখে। দুই ভগ্নিপতির মধ্যে একজনকে দেখলেই মনে হয় লোফার। অন্যজন কিছুটা ভদ্রলোক আর সুপুরুষ হলেও নির্বোধ। কারওরই সংসারের অবস্থা ভাল নয়। মা আমাকে চুপি চুপি জানাল, ছোট জামাই নাকি গুণ্ডামি, চুরি, ছিনতাই করে। বড়জন একটা প্রাইভেট ফার্মে কেয়ারটেকার।

এরা সব এক জায়গায় জুটতে খুব হট্টগোল হল। ঝগড়াঝাঁটিও প্রায়ই লেগে যায় দেখলাম। একদিন বাবা খুব গম্ভীরভাবে আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বললেন—শোনো বাবা প্রভাস, তোমার ছোট ভাই আর তার বউ এখন চায় আমি আর তোমার মা আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আপনি আর মা যাবেন কেন? এ বাড়ি তো আপনার, দরকার হলে ওরা চলে যাবে।

—সে সব আইনের কথা শুনছে কে? আমাদের বুড়ো বয়সে আব তেমন তেজ নেই যে গলাবাজি করে গায়ের জোরে দখল রাখব। তার উপর নিজের সন্তান যদি শত্রুতা করে, তবে আর কী করার আছে? ওরা দুজনে মিলে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে দিন-রাত। তোমার মা অবশ্য ওদের দিকে টেনে চলেন, কিন্তু তাতেও সুরাহা হবার নয়। যদিও-বা তোমার মাকে ওরা আশ্রয় দেয় আমাকে থাকতে দেবে না।

কথাটা শুনে আমি ভয়ঙ্কর রেগে যেতে পারি। হঠাৎ কেন যেন নিজের ছেলেবেলার কথা আদ্যন্ত মনে পড়ে! ভাবি, আমাদের নিষ্ঠুর ছেলেবেলা আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কী শেখাবে! আমার ভাই তার নিজের জীবন ও পরিবেশ থেকে সেই শিক্ষাটাই নিয়েছে। ওর বউও খুব উঁচু পরিবারের মেয়ে নয়। কথায় কথায় মা একদিন বলে ফেলেছিলেন, বউমার মা নাকি ঝিগিরি করত। তবে আগে ওরা ভদ্রলোক ছিল, অবস্থার ফেরে এই দশা। সে যাই হোক, আমার ভাইয়ের বউ নিমি খুব খোঁপায় চোপায় মেয়ে। টকাটক কথা বলে, মেজাজ দেখাতে ভয় পায় না, কাউকে তোয়াক্কার ভাব নেই। এ ধরনের মেয়েরা সহজেই স্বামীকে বশ করতে পারে। মা-বাবাকে আলাদা করার প্রস্তাবটি হয়তো তার মাথাতেই প্রথম এসে থাকবে। যথাসময়ে আমার ভাই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

বাবাকে বললাম—বোঝাপড়া করে নিন। আমিও বলব'খন।

বাবা বললেন—এ বাড়ির অর্ধেক স্বত্ব তোমারও। আমি বলি কী, তুমি যখন এসেই গেছ ভাল সময়ে, তখন বাড়িটা ভাগ করে নাও। আমি তোমার ভাগে থাকব, তোমার মা না হয় তাঁর ছোট ছেলের কাছে ইচ্ছে হলে থাকবেন।

শুনেই আমার গা রি-রি করে ওঠে। এই ঘিঞ্জি কলোনির তিন কাঠা জায়গায় দীনদরিদ্র একটুখানি দরমার বাড়ি—এর আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা! তার উপর এখানে স্থায়ী ভাবে থাকার ইচ্ছেও আমার কখনওই হয়নি। নিজের আত্মীয়স্বজন আমার এখন আর সহ্য হয় না।

আমি বললাম—ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছে হয় না। এইটুকু জায়গা ভাগ করলে থাকবে কী?

বাবা বলেন—তবে বাবা, তুমি আলাদা কোথাও বাড়ি করো, বুড়ো বয়সে আমি গিয়ে তোমার কাছে শান্তিতে মরি।

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলি—বরাবরই কি আপনাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে না কি? একটা জীবন সংসারের পিছনে অপচয় করেছি। এখনও কি আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না?

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন—তোমাকে কোন কাজে কবে বাধা দিলাম বলো তো! ঠিক কথা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, কিন্তু অত ভাল সরকারি চাকরি ছেড়ে বিদেশে গেলে, আমরা তো বাধা দিইনি। এত বছর তো আমরা তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আর তোমরা ছাড়া আমাদের অভিভাবক কে আছে।

আমার নিষ্ঠুর মন এখন আর সহজে গলে না। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, আচ্ছা, সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ভাগ করে দেব, আপনারা আমার ভাগেই থাকবেন। কিন্তু আমি এ বাড়িতে থাকব না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাসায় খুব ভাল লাগে না। কারণ, এখানে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই, সারা পৃথিবীতে কেউ নেই, একমাত্র নীলু ছাড়া। বোন ভগ্নিপতিরা চলে গেল, তবু বাড়িতে গণ্ডগোল থামে না। প্রায় সারাদিনই সুহাসের বউ নিমি-বাবাকে বকাবকি করে। মা খুব একটা পালটা ঝগড়া করে না, কিন্তু ছেড়েও দেয় না। বাবা মাঝে মাঝে লাঠি হাতে তেড়ে ছেলের বউকে মারতে যায়। অমনি নিমি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে ই-ইঃ মারবে! মারুক তো দেখি! বলে চেঁচায়। বাবা ভয়ে পিছিয়ে আসে, আর নিমি তখন এক নাগাড়ে যাচ্ছেতাই বলে যায়। আমি যে বিদেশ-ফেরতা ভাসুর বাড়িতে আছি তা গ্রাহ্য করে না। ঝিয়ের মেয়েই বটে। সুহাস কোথায় কাজ করে তা আমি এখনও ভাল জানি না; তবে যা-ই করে, তা যে খুব উঁচু ধরনের কাজ নয় তা ওর আচার-আচরণ থেকেই বোঝা যায়। ওর সহকর্মীরা যে নিচুতলার লোক তা সুহাসের কথা শুনলেও টের পাই। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে ফেলে। একটু আড়াল হয়ে বিড়ি টানে দেখি। বউকে নিয়ে সপ্তাহে দুবার নাইট শো দেখতে যায়।

বাড়ির খাওয়াদাওয়া অত্যন্ত নিচু মানের। আমি এসে অবধি বাড়িতে বেশ কিছু সংসার খরচ দিয়েছি, তবু খাওয়ার মান ওঠেনি তেমন। তবে মাঝে মাঝে আমার মুখরক্ষা করতে মুরগি রান্না হয়। প্রথম দিন আমাকে খাওয়ার সময়ে কাঁটা-চামচ দেওয়া হয়েছিল দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। বাইরে বাইরে খামোকা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও যাওয়ার ঠিক থাকে না। চাকরি-বাকরি করব, না ব্যবসা করব, তা নিয়ে ভাবি না। বেশ একটা ছুটি-ছুটি মনের ভাব নিয়ে আছি।

বিদেশে আমার যে টাকা জমেছিল তা নেহাত কম নয়। এ দেশের মুদ্রামানে প্রায় লাখ চারেক টাকা। তাই এখনই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

পাঁচুদার সঙ্গে খাতির ছিল। তার খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রলোক মরতে চলেছেন।

অলকা

উঠে পড়লাম।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঝি সরস্বতী আজ আসবে কি না বুঝতে পারছি না। এত বেলা তো সে কখনও করে না! আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এক রিকশাওলার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার কাছে একশোটা টাকা চেয়েছিল। দেব কোত্থেকে? আমার বাড়তি টাকা যা আছে তা বড় অল্পে অল্পে জমানো। দিই কী করে?

দাঁত মেজে এক কাপ চা করে খেলাম। বিছানা তুলতে ইচ্ছে করছে না। থাকগে, কে-ই-বা আসছে দেখতে! সরস্বতী যদি আসে তো তুলবেখন। সকালের চা করা, বিছানা তোলা এসব ও-ই করে।

আমি খবরের কাগজ রাখি না। ছোট্ট একটুখানি একটা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো আছে। সেটাই আমার

সঙ্গী। অবশ্য এ ফ্ল্যাটে মস্ত একটা রেডিয়োগ্রাম আছে অসীমদার, কিন্তু সেটার যন্ত্রপাতিতে মরচে, চলে না। আমার ট্রানজিস্টার সেটটারও ব্যাটারি ডাউন। চেরা আওয়াজ আসে। রেডিয়োটা চালিয়ে একটা ফ্যাসফেসে কথিকা হচ্ছে শুনে, বন্ধ করে দিলাম।

আজ ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনগুলোই আমার অসহ্য। সময় কাটতে চায় না। শ্রীরামপুরের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু গেলেই অশান্তি। মাসির বাড়িতেও যাওয়া হয় না। রোহিতাশ্ব চৌধুরীর বাড়িতে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে আজকাল, ওদের বাড়িতে বেবি সিটারের চাকরি করেছি বলেই বুঝি এক হীনম্মন্যতা কাজ করে।

মুশকিল হল, আমার বাসাতেও কেউ আসে না। আজ রোববারে কেউ কি আসবে? আসবে না, তার কারণ আমাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। আমার তেমন বন্ধুবান্ধবও নেই। মাঝে মাঝে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এখনও বর্ষা নামেনি এ বছর। গরমকালটা বড় বেশিদিন চলছে। এইসব ভয়ংকর রোদের দিনে ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও হতে চায় না। একা ঘরে সারা দিনটা কাটাবই-বা কী করে?

জানালা-দরজা খোলা। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমি বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে বসে একটু ফিটফাট করে নিই নিজেকে। চুল আঁচড়াই, মুখে অল্প একটু পাউডার মাখি, কপালের একটা ব্রণ টিপে শাঁস বের করি। বেশ চেহারাটা আমার। লম্বা টান সতেজ শরীর, গায়ে চর্বি খুব সামান্য, মুখখানা লম্বা ধাঁচের, পুরু কিন্তু ভরন্ত ঠোঁট, দীর্ঘ চোখ। নাকটা একটু ছোট কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ের রঙে জেল্লা আছে।

অনেককাল নাচি না। আজ একটু ইচ্ছে হল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু পা কাঁপিয়ে নিলাম। তারপর কয়েকটা সহজ মুদ্রা করে নিয়ে ধীরে ধীরে নাচতে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারি শরীর আর আগের মতো হালকা নেই। বেশ কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে, দমও টপ করে ফুরিয়ে গেল। হাঁপিয়ে বসে পড়লাম। তাতেও হল না। পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম মেঝেয়। ঠাণ্ডা মেঝে, বুক জুড়িয়ে গেল। শুয়ে থেকে হঠাৎ মনে হল আজ কেউ আসবে। অনেককাল কেউ আসে না। আজ আসবে। ভাবতে ভাবতে ঝিমধরা মাথায় কখন যে তন্দ্রা এল! সরস্বতী আসেনি, হরিণঘাটা ডিপো থেকে দুধের বোতল আনা হল না। একটু আনাজপাতি, মাছ বা ডিম কিছু আনিয়ে রাখা দরকার ছিল। তাও হল না। সকালের জলখাবার বলতে কিছু খাইনি এখনও, খিদে পেয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতেও তন্দ্রা এল। কী আলিস্যি আর অবসাদ যে শরীরটার মধ্যে। বয়স হচ্ছে নাকি! মাগো!

খুব বেশিক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকা হল না। পিয়ানোর হালকা শব্দ তুলে কলিং বেল পিং আওয়াজ করল। সদর দরজাটা ভেজানো আছে, সরস্বতী হলে বেল না বাজিয়ে হুড়ুম দুড়ুম করে ঢুকে পড়ত। এ সরস্বতী নয়, অন্য কেউ।

দরজা খুলে একটু খুশিই হই। আমার অফিসের সেই স্মার্ট ও সুপুরুষ যুবক সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। যদিও সুকুমারকে আমি সেই অর্থে ভালবাসি না, তবু ওর সঙ্গ তো খারাপ নয়। জানি না বাপু আমাদের মনের মধ্যে কী পাপ আছে। পাপ একটু-আধটু আছে নিশ্চয়ই। নইলে সুকুমারের ওই দুর্দান্ত বিশাল জোয়ান চেহারা আর হাসির জবাব রঙ্গ-রসিকতায় ভরা কথাবার্তা আমার এত ভাল লাগে কেন। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' করে বলি, সেটাও পাঁচজনের সামনে নয়, দুজনে একা হলে তবেই। তা হলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটু পাপ-টাপের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বাইরের ঘরে বসে ও তেমনি হাসি মুখে বলল—তোমাকে একটু বিরহী বিরহী দেখাচ্ছে অলি।

ওর হাসিটা যেন একটু কেমন। মানুষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে মাঝে মাঝে ও রকম হাসি হাসে। ওর মতো চটপটে বুদ্ধিমান ছেলের নার্ভাস হওয়ার কথা নয়।

আমি বললাম—বিরহ নয় বিরাগ। বোসো, আজ আমার ঝি আসেনি; নিজেকেই চা করতে হবে।

ও বিরস মুখ করে বলে—ও, আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় আজ ভাত খাব দুপুরে। কিন্তু ঝি যখন আসেনি—

কথাটা আমার কানে ভাল শোনাল না। ভাত খাবে কেন? এ প্রস্তাবটা কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না।

আমি বললাম—আমি নিজে কতদিন না রেঁধে শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিই! আজও অরন্ধন।

সুকুমার নড়েচড়ে বসে বলল—এসে তোমার ডিসটার্ব করছি না তো?

—মোটেই নয়। আজ আমার খুব একা লাগছিল।

—আমারও।

—মনে হচ্ছিল কেউ আসবে।

সুকুমারের মুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বলে—কে আসবে বলে ভেবেছিলে? আমি?

—না। বিশেষ কারও কথা নয়। যে কেউ।

—আমার কথা তুমি ভাবো না অলি?

পুরুষমানুষদের এই এক দোষ। তারা চায় মেয়েরা সব সময় তাদের কথা ভাবুক। বড় জ্বালা। জয়দেবও বোধহয় তাই চাইত।

আমি একটু হেসে বললাম—ভাবব না কেন? তবে আমার ভাবনা খুব ভাসা ভাসা। গভীর নয়।

সুকুমারের স্মার্টনেস আজ যে কোথায় গেল। সে আজ একদম বেকুব বনে গেছে। মুখের রং অন্যরকম, চোখ অন্যরকম। আমি বাতাসে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আজ সুকুমার খুব ভাল পোশাক পরে এসেছে। সাদা রঙের ওপর নীল রঙের নকশা করা পাতলা টেরিভয়েলের ছাঁদাওয়ালা জামা, খুব সুন্দর ধূসর রঙের প্যান্ট পরা, পায়ে ঝকঝকে মোকাসিন। হাতে এই ছুটির দিনেও একটা পাতলা ভি আই পি স্যুটকেস। রুমালে মুখ মুছে বলল—আমি হঠাৎ এলাম বলে কিছু মনে করো না।

আমি হেসে বললাম—তুমি এর আগেও একবার এসেছিলে, তখনও কিছু মনে করার ছিল না। মনে করব কেন?

সুকুমার ভাল করে কথা বলতে পারছে না আজ। আমার দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেও না। বলল—ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

—কেন, খারাপের কী? সদ্য একটা লিফট পেয়েছ!

সুকুমার ব্যথিত হয়ে বলে—সবসময়ে টাকার পয়েন্টে লোকের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। সে সব নয়। আমার মনটা ভাল নেই।

—কেন?

—তোমার সেটা বোঝা উচিত।

আমি এ ব্যাপারে খানিকটা নিষ্ঠুর। সুকুমার কী বলতে চায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এসব প্রস্তাবকে গ্রহণ বা গ্রাহ্য করা আমার সম্ভব নয়। বললাম—তোমার প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন? আমার ভাববার মতো নিজস্ব প্রবলেম অনেক আছে।

—অলি, তুমি কিন্তু সেলফ সেন্টারড।

—সবাই তাই। তুমিও কি নিজের স্বার্থ থেকেই সব বিচার করো না?

সুকুমার সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। ওর হাত বশে নেই। বলল—সেটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে হ্যাপি নও এটা নিয়েও আমি ভাবি।

আমি হেসে বললাম—সেটা ভাবতে না, যদি আমার ওপর তোমার লোভ না থাকত।

—লোভ! বলে আঁতকে উঠল সুকুমার। বলল—লোভ অলি? লোভ কথাটা কত অশ্লীল তুমি জান? লোভের কথা বললে কেন?

—তবে কী বলব, প্রেম? ভালবাসা?

সুকুমার অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে—আমি তো তাই ভাবতাম।

মাথা নেড়ে বললাম—পুরুষমানুষ আমি কম দেখিনি। লোভ কথাটাই তাদের সম্বন্ধে ঠিক কথা। পুরুষেরা মেয়েদের চায় বটে, কিন্তু সে চাওয়া খিদের খাবার বা নেশার সিগারেটের মতো।

—তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা। বলে সুকুমার হাসে একটু। বলে—সে থাকগে। তর্ক করে কি কিছু প্রমাণ করা যায়? বরং যদি আমাকে একটা চানস দিতে অলি, দেখতে মিথ্যে বলিনি।

—চা করে আনব?

—আনো।

চা খেয়ে সুকুমার নিজের হাতের তেলোর দিকে নতমুখে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ।

আমার একটু মায়া হল। ও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এত বড় চেহারা, এত ভাল দেখতে, তবু নরম গলায় বললাম—কী বলবে বলো।

—কী বলব, বলার নেই।

—শুধু বসে থাকবে?

—না, উঠে যাব। এক্ষুনি।

—সে তো যাবেই জানি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ তুমি কী একটা বলতে এসেছিলে।

সুকুমার হঠাৎ তার যাবতীয় নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মরিয়া হয়ে খাড়া উঠে বসল। আমার দিকে সোজা অকপট চোখে চেয়ে বলল—শোনো অলি, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি মনে মনে, পারিনি।

এ সব কথা শুনলে আমার হাই ওঠে। অবাস্তব কথা সব, একবিন্দু বিষয়বুদ্ধি নেই এ সব আবেগের মধ্যে। আমি এঁটো কাপ তুলে নিয়ে চলে আসি। বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একা। ভাল লাগে না।

হঠাৎ সুকুমার ঘরের বাইরের থেকে ভিতরে চলে এল, খুব কাছে পিছনের দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দু কাঁধ আলতো হাতে ধরে অল্প কাঁপা গলায় আর গরম শ্বাসের সঙ্গে বলল—অলি, এর চেয়ে সত্যি কথা জীবনে বলিনি কাউকে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। কিছুই ভাল লাগছে না, তাই আজ দীঘা যাওয়ার টিকিট কেটে এনেছি।

—যাও ঘুরে এসো। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক রোগ সেরে যায়, এটাও হয়তো যাবে।

—রোগ! কীসের রোগ! আমার কোনও রোগ নেই।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে হিলহিল করে। সেই দিকে চেয়ে থেকে বললাম—কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নাও, তোমার হাত ভীষণ গরম।

এ সব সময় যা হয়, তাই হল। অপমানিত পুরুষ যেমন জোর খাটায়, তেমনি সুকুমারও আমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

হটাৎ সরস্বতীর ভৌতিক গলা চেঁচিয়ে উঠল—উরেব্বাস, এ কী গো!

সুকুমার প্রায় স্ট্রোকের মুরগির মতো অবশ হয়ে টলতে টলতে সরে গেল। সরস্বতী দরজায় দাঁড়িয়ে।

লজ্জায় মরে গিয়ে বললাম—এই হচ্ছে তোমাদের দাদাবাবু। ফেরাতে এসেছে।

জয়দেব আর আমার বিয়ে ভাঙার ব্যাপার সরস্বতী জানে। তাই সে বুঝল সুকুমারই হচ্ছে সেই জয়দেব। খুব হাসিমুখে বলল—তা হলে এত দিনে বাবুর মতি ফিরেছে, ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে!

আমি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম—দেরি করলে যে বড়! সারা সকাল আমি কিছু খাইনি জানো!

—কী করব দিদি, টাকার জোগাড় করতে সেই মোমিনপুর গিয়েছিলাম কুসমীর কাকার কাছে। সে পানের দোকান করে। পয়সা আছে। দয়া-ভিক্ষে করতে পাঁচশোটা টাকা দেবে বলেছে।

আমি বললাম—কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারো তো। বোকো না।

—দাদাবাবুর জন্য মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেব নাকি? দাও তা হলে পয়সা। চায়ের জল চড়িয়ে দোকান থেকে আসি।

কঠিন গলায় বললাম—না।

বসবার ঘরের ঠিক মাঝখানটায় সম্পূর্ণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। ভাল পোশাক, চমৎকার চেহারা, তবু কী অসহায় আর বোকা যে দেখাচ্ছে!

আমি হেসেই বললাম—মাথা ঠাণ্ডা রেখো, বুঝলে? আমারও তো কিছু নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে।

—সে জানি।

—ছাই জানো। আমার স্বামী লোকটা খুব খারাপ নয়। অন্তত লোকে তাকে খারাপ বলে না। তবু তাকে আমার পছন্দ হয়নি বলেই তার সঙ্গে থাকিনি। তুমি কি ভাবো আমি একা থাকি বলে খুব সহজে

বশ করে নেওয়া যাবে আমাকে?

—তুমি কখনওই আমাকে বুঝলে না অলি। বোধহয় ভালবাসা তুমি বুঝতেই পারো না। থাকগে, যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দিয়ো।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—এখন কি সোজা দীঘায় যাবে।

সুকুমার হতাশ গলায় বলল—দীঘায় একা যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না।

—তা হলে?

—ইচ্ছে ছিল তোমাকেও নিয়ে যাব। দুটো কটেজ বুক করে রেখেছি, সরকারি বাসে দুটো টিকিট কেটে রেখেছি। কিন্তু সে সব ক্যানসেল করতে হবে।

ওর দুঃসাহস দেখে আমি হতবাক। বলে কী! আমাকে নিয়ে দীঘা যেতে চেয়েছিল?

কিন্তু এ বিস্ময়টা আমার বেশিক্ষণ থাকল না। ওরকম পাগলামির অবস্থায় মানুষ অনেক বেহিসেবি কাজ করে। বললাম—আমাকে দীঘায় নিয়ে কী করতে তুমি?

সুকুমার মনোরুগির মতো হাসল একটু। বলল—আমাকে বিশ্বাস কোরো না অলি। আমার মাথার ঠিক নেই। কত কী ভেবে রেখেছি, কত কী করতে পারি এখনও!

আমি মাথা নেড়ে বললাম—এ সব ভাল নয়। তুমি আমার ক্ষতি ছাড়া কিছু করতে পারো না আর।

—বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ। আমি নিজেকেও আর বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—দাঁড়াও, এক্ষুনি চলে যেয়ো না।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, তুমি একটা বিপদ করবে। বসে একটু বিশ্রাম করো। আর বরং দুপুরে এখানেই খেয়ে যাও।

সুকুমার বসল।

সুকুমার প্রায়ই এর ওর হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে। আসলে ও হাত দেখার কিছুই জানে না, কেবল ব্লাফ মারে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বানায় বেশ চমৎকার। নতুন ধরনের কথা বলে। কাউকে হয়তো বলে, শীতকালটায় আপনি খুব বিষণ্ণ থাকেন। আমাদের অফিসের বড়কর্তাকে একবার বলেছিল—সামনের মাসে আপনাকে চশমার পাওয়ার পালটাতে হবে, একটা দাঁত তোলাবেন ফেব্রুয়ারি মাসে। এই রকম সব। অফিসের মেয়েদের হাত দেখে এমন সব কথা বলে যে মেয়েরা পালাতে পারলে বাঁচে। একবার আমার হাত দেখে সুকুমার বলেছিল—শুনুন মহিলা, আপনার একটা মুশকিল হল আপনি সকলের সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করতে ভালবাসেন। স্নেহ-মায়া আপনার কিছু বেশি। কিন্তু তার ফলে লোকের সব সময়ে মনে হয় যে আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন বা প্রেমে পড়েছেন। একটু রূঢ় ব্যবহার করতে শিখুন, ভাল থাকবেন।

কী ভীষণ মিথ্যে কথা, আবার কী ভীষণ সত্যিও! সুকুমারের ওই ভুয়ো ভবিষ্যদ্বাণী তার নিজের সম্পর্কে কেমন খেটে গেল।

স্নেহবশে মায়ায় ওকে আমি দুপুরে খেয়ে যেতে বললাম। আসলে ওই ছুতোয় ওকে একটুক্ষণ আটকে রাখার জন্য। নইলে ওর যেরকম মনের অবস্থা দেখছি, হয়তো রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে। আর সেই আটকে রাখাটাই বুঝি ভুল হল। সুকুমার ভাবল, আমার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছি।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুকুমার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরাল। সরস্বতী চলে গেছে, কাল সকালে ফের আসবে। যাওয়ার আগে সে সুকুমারের সঙ্গে কিছু তরল রসিকতাও করে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম সুকুমার এখন চলে যাক। সুকুমার গেল না। সারা বেলা আমাদের খুব একটা কথা হয়নি। আমি রান্নাঘরে রেঁধেছি, সুকুমার বাইরের ঘরে বসে বইপত্র পড়েছে।

দুপুরে রোদ আর গরমের ঝাঁঝ আসে বলে দরজা-জানালা সরস্বতী যাওয়ার আগেই বন্ধ করে দিয়ে যায়। বেশ অন্ধকার আবছায়ায় সুকুমারের সিগারেট জ্বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটির দিনে আত্মীয়স্বজন কেউ যদি হুট করে চলে আসে, তো আমার কোনও সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু

সুকুমারকে কী করে চলে যেতে বলি?

মুখোমুখি বসেছিলাম। বললাম—তুমি কি বিশ্রাম করবে, না যাবে এক্ষুনি?

সুকুমার আয়েসের স্বরে বলল—এই গরমে বের করে দেবে নাকি?

—তা বলিনি—বলে অস্বস্তিতে চুপ করে থাকি। ভেবে-চিন্তে বললাম—তা হলে এ ঘরে বিশ্রাম নাও। আমি ও ঘরে যাই।

শোওয়ার ঘরে এসে কাঁটা হয়ে একটু শুতে-না-শুতেই আবছা একটা মূর্তি এসে হঠাৎ জাপটে ধরল আমাকে। সুকুমার। আমি প্রতিমুহূর্তে এই ভয় পাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস গরম, গা গরম, উন্মাদের মতো আশ্লেষ। ও খুনে গলায় বলল—তোমাকে মেরে ফেলব অলি, যদি রাজি না হও আমাকে বিয়ে করতে।

আমার কোনও কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না আমার কিল, ঘুষি, আঁচড়, কামড়।

হঠাৎ বহুকাল নিস্তব্ধতার পর বিপদসঙ্কেতের মতো টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে সুকুমার একটু থমকাল। আমি নিজেকে সামলে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললাম—হ্যালো।

একটা গম্ভীর গলা বলল—আপনার ঘরে কে রয়েছে?

এত ভয় পেয়েছিলাম যে রিসিভার হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে বলছেন?

উত্তর এল—ওই লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিন।

টেলিফোনটা কেটে গেল আচমকা!

প্রভাসরঞ্জন

সকাল থেকেই আজ মেজাজে আছি। কোনও খুশখবর নেই, মন ভাল থাকার কোনও কারণও দেখছি না, তবু কেন মনটা নবাবি করছে?

ওই রকম হয় মাঝে মাঝে। বেঁচে থাকাটাকে যখন শবদেহ বহনের মতো কষ্টকর লাগে সব সময়ে, তখন মাঝেমধ্যে বুঝি প্রাকৃতিক নিয়মে মরবার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার ছদ্ম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে এক বিন্দু খুশি মিশিয়ে দেন জীবনে। তখন বুঝতে হয় যে কঠিন দিন আসছে।

সে যাকগে। অতীতের চিন্তা আর ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে এখনকার খুশির মেজাজটাকে নষ্ট করার মানেই হয় না। দীর্ঘদিন ইউরোপে থেকে শিখেছি, বর্তমানটাকে যতদূর সম্ভব উপভোগ করাটাই আসল। যে সময় চলে গেছে বা যে সময় আসেনি, তার কথা চিন্তা করা এক মস্ত অসুখের কারণ। যদি আমুদে হতে চাও তো সে চিন্তা ছাড়ো।

প্রায় এক মাস হয়ে গেল দমদমের বাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে চলে এসেছি। স্থায়ীভাবে এসেছি এ কথা বলা যায় না। মা-বাবাকে সেরকম কিছু বলে আসিনি। তবে দমদমে বাড়িতে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সেখানে বড্ড বেশি অশান্তি। আমার ভ্রাতৃবধূটি বাড়িটাকে নরক করে তুলেছে।

একদিন বীভৎস ঝগড়ার পর আমি ভাইকে ডেকে বললাম—পাড়ার পাঁচজনকে ডাকো, বাড়ি ভাগ হোক।

তাতে সুহাসের আপত্তি। সে বলে—ভাগাভাগি কীসের!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—বাবা চাইছেন তোমার-আমার মধ্যে ভাগ করে দিতে।

সে বলল—তুমি তো আর এখানে থাকবে না! চলেই যাবে অন্য কোথাও। তবে ভাগ করব কেন?

সুহাসের বউও তেড়ে এল—আপনার কোনও দাবি নেই। আপনি তো বাইরের লোক হয়ে গেছেন। আমরা থাকি, বাড়িতে আমাদের স্বত্ব বেশি।

কথাটা অযৌক্তিক, কিন্তু এত জোর দিয়ে বলল যে আমি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমার মাও, কেন জানি না, বাড়ি ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। কেবল বাবা ভাগাভাগি চাইছেন, এবং খুব মরিয়া হয়ে চাইছেন। কাজেই ফের ঝগড়া লেগে গেল।

নিমি আমাকে স্পষ্ট বলল—আপনার তো চরিত্র খারাপ। বিদেশে কী সব করে বেড়িয়েছেন তা কি

আমরা টের পাইনি?

সুহাস নিমির পক্ষ নিয়ে বলে—তোমাকে তো ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এসে ঘাড়ে পড়েছ। বেশি স্বত্ব-টত্ব দেখিয়ো না, খারাপ হয়ে যাবে। এ পাড়ায় এখনও আমার এক ডাকে দুশো লোক চলে আসবে।

সুহাসের কথা শুনে খুব অবাক হই না। এরকমটাই আশা করছিলাম এতদিন। আর ও কথাটা ঠিক, এ পাড়ায় ওর বেশ হাঁক-ডাক আছে।

এ রকম কুৎসিত পরিস্থিতিতেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। ঝগড়া, মারামারি, পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি এ সবই আমাকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করেছে বহুবার।

ভয়টয়ও বড় একটা হল না। শুধু ঠাণ্ডা গলায় সুহাসকে বললাম—বাড়ি ভাগ ঠেকাতে পারবে না। দরকার-হলে আমি পুলিশকে খবর দেব, বলব যে তুমি আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সুহাস আর তার বউ ঝগড়ার চোটে প্রায় নাচতে লাগল। সুহাস তড়পায়, পেছন থেকে নিমি তাকে সাহস দেয়। শক্তিদায়িনী নারী কাকে বলে জানলাম! দুজনেই দিগ্বিদিকশূন্য, কাপড়-চোপড় গা থেকে খসে পড়ছে প্রায়।

এ বাড়ি ভাগ করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝলাম। ভীমরুল চাক বেঁধেছে, ঢিল মারলে রক্ষে নেই। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম—দেখছেন তো ওদের অ্যাটিচুড। বাড়ি ভাগ কী করে হবে?

বাবা অসহায়ভাবে বললেন—তুমি আলাদা বাসা করো।

সেই পুরনো কথা। বিরক্ত হয়ে বলি—সেটা সম্ভব নয়। আলাদা বাসা করলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আমার একা থাকা দরকার।

বাবা চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন—বাবা প্রভাস, আমি সারা জীবন কখনও সুখে থাকিনি। গত জন্মের দোষ ছিল বোধহয়। তা এখন কী করতে বলো আমাকে? গলায় দড়ি দেব?

আমি কিছু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বাবা বললেন—তুমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছ দেখে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বিশ্বাস ছিল, তুমি আমাকে ফেলবে না। কিন্তু এখন—

আমি বললাম—তার চেয়ে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে—

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—কোনও আশ্রম-টাশ্রমে যদি বন্দোবস্ত হয়, তা হলে?

বাবা মাথা নাড়লেন। চোখে বুঝি জল এসেছিল, সেটা মুছে নিয়ে বললেন—বুঝেছি। আপত্তি কী? তাই না হয় দেখো।

বাবাকে ভরসা দিয়ে বললাম—টাকা যা লাগে আমি কষ্ট করে হলেও দেবখন।

—সে জানি। দিয়ো। তোমরা না দিলে গতি কী?

যোগাযোগ করে নানা মুরুব্বি ধরে বাবার জন্য কাশীতে একটা বন্দোবস্ত হল। মাসখানেক আগে বাবা একখানা তোরঙ্গ আর শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

মার জন্য খুব চিন্তা নেই। মা যেন কীভাবে এই সংসার প্রোথিত বৃক্ষের মতো রয়েই গেল। সাধারণত শাশুড়ির সঙ্গে বউদের অবনিবনা দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে উল্টো নিয়ম দেখি। তার মানে এই নয় যে নিমিতে আর মাতে ঝগড়া হয় না। বরং খুবই হয়। কিন্তু সুহাসের বুঝি মায়ের প্রতি একটু টান আছে। বাড়িতে ঢুকেই বিকট একটা 'মা' ডাক দেয় রোজ। আর একটা ব্যাপার হল, এ সংসারে হাজারো কাজে মা জান বেটে দেয়। বিনি মাগনা কেবল খোরাকি দিয়ে এমন বিশ্বস্ত ঝি-ই-বা নিমি কোথায় পাবে? তাই ঝগড়াঝাঁটি হলে, মাকে ফেলতে চায় না। মায়েরও আবার সুহাসের ওপর টান বেশি। এ সব টানের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। সবচেয়ে অপদার্থ ছেলেটাকেই মা কেন ভালবাসে তা বিশ্লেষণ করা বৃথা।

বাড়ির এই পরিস্থিতিতে যখন আমি বাড়ি ছাড়ব-ছাড়ব ভাবছি, সেই সময়ে মুমূর্ষ পাঁচুদা একদিন আমাকে বললেন—তোর যখন বনছে না তখন আমার বাসাটায় গিয়ে থাক না কদিন। তালাবন্ধ পড়ে আছে।

বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে। শোনার পর অপেক্ষা করিনি। সে রাতটা ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই

পাঁচুদার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি।

ব্যাচেলার মানুষ পাঁচুদা। ঘরে রান্নাবান্নার সব বন্দোবস্ত রয়েছে। আসবাবপত্রও কিছু কম নেই। সারাজীবন নিজের শখ শৌখিনতার পিছনে অজস্র টাকাপয়সা ঢেলে গেছেন। টাকাপয়সা জমাননি বড় একটা। ঠকবাজেরাও লুটেপুটে নিয়েছে। ফ্ল্যাটে এসে শুনলাম ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। অথচ বাথরুমে গিজার, ঘরের মেঝেয় কার্পেট, রান্নাঘরে মিনি রেফ্রিজারেটার—কী নেই?

হাসপাতালে দেখা করতে গেলে পাঁচুদা বললেন—যদি আমি বেঁচে যাই তো আলাদা কথা, নইলে ওই ফ্ল্যাট তোকেই দিয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্রসুদ্ধু।

আমি বললাম—অত কিছু বলার দরকার নেই পাঁচুদা। আপনি মরছেন না শিগগির। আপাতত কিছুদিন থাকার জায়গা পেলেই আমার যথেষ্ট।

বাড়িওলাকে ছ'মাসের ভাড়া আমাকে শোধ করতে হল। লোকটা গণ্ডগোল শুরু করেছিল। টাকাপয়সা খরচ হল বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা থাকার জায়গা পেয়ে বড় খুশি লাগল। দমদমের নরক থেকে তো দূরে আছি।

জ্যোতিষ নরেনবাবু কিন্তু মাস দুয়েক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মাসখানেকের মধ্যে বাসস্থানের পরিবর্তন।

লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

সারাদিন প্রায়ই কাজ থাকে না। রান্নাবান্না করি, খাই। দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলের দিকে নরেনবাবু কিংবা পাঁচুদার ওখানে যাই। বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। নিরালা, নির্জন সময় কাটে। বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

এ বাড়ির দোতলা থেকে প্রায়ই একটা মেয়েকে নামতে উঠতে দেখি। চেহারাটা বেশ। বিয়ের বয়স হয়েছে তো বটেই, একটু বেশিই হয়েছে বুঝি। মাথায় সিঁদুর দেখি না। খুব সাজগোজ করে অফিসে যায়। তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না বড় একটা। মেয়েটা আমার মতোই একা কি?

ভেবে ভেবে একটু কেমন হয়ে গেল মনটা, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে আমার মেয়েদের সম্পর্কে বাঙালিসুলভ লজ্জা-সঙ্কোচ হয় না। আবার কাউকে দুদিন দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতাও নেই আমার। বরং মেয়েদের ব্যাপারে আমি এখন অতিশয় হিসেবি।

নীচের তলায় পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বড় একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। অল্প ক' দিনেই আমার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে। তাঁর বউকে বউদি বলে ডাকি। মাঝেমধ্যে মাংস বা মাছ পাঠিয়ে দেন, কফি করে ডেকে নিয়ে খাওয়ান। দুজনেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম মধু মল্লিক। নিজের কাজে তাঁর বেশ সুনাম আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান অনেকবার ঘুরে এসেছেন। নিজের কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। আর সেই কারণেই তাঁকে অনবরত বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। গত কয়েক মাসে দেখলাম, মধু মল্লিক একবার দিল্লি-বম্বে, একবার অরুণাচল প্রদেশ একবার ওড়িশা ঘুরে এলেন। তা ছাড়া দিন-রাত অফিসের গাড়িতে শহর চক্কর মারা তো আছেই। বলেন—ভাই, এই চাকরি করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দুদিন ঘরে থাকতে হলে হাঁপিয়ে পড়ি। তাই ভয় হয়, রিটায়ার করলে এক হপ্তাও বাঁচব না।

বউদি সারাদিনই প্রায় একা। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে যথাক্রমে চোদ্দো, বারো ও তিন বছরের। ছোটটি ছেলে, বড় দুটি মেয়ে। মেয়ে দুজন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মডার্ন স্কুলে। নাচ গান শেখে, একজন ওরিগামি শেখে, অন্যজন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। বেশ ব্যস্ত তারা। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বউদি খানিকটা নিঃসঙ্গ। আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসেন। বেশ একটা মা-মা ভাব তাঁর মধ্যে। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা। মুখে সর্বদা পান আর হাসি।

সে যাকগে। বউদির একটা সময় কাটানোর শখ আছে। স্বামী খবরের কাগজের রিপোর্টার, বউ পাড়ার যাবতীয় খবরের সংবাদ সংস্থা। পরিচয় হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমি এ পাড়ার যাবতীয় খবর জেনে গেছি। তার মধ্যে একটা খবরই কেবল বউদি ভাল করে জানেন না। সে হল ওপর তলার ওই মেয়েটির খবর।

দুঃখ করে বললেন—অলকার বড্ড ডাঁট, বুঝলেন। অসীমবাবুরা যেমন সোশ্যাল মানুষ ছিলেন, বোনটি ঠিক তেমন আনসোশ্যাল। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজেকে নিয়ে ওরকম থাকে কী

করে?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই একা থাকতে ভালবাসে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বউদি হেসে বলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন বলেই মেয়েদের একা থাকায় দোষ দেখেন না।

সে অবশ্য ঠিক। আমাকে স্বীকার করতে হয়।

বউদি বললেন—একা কি আর সাধ করে আছে! স্বামী নেয় না, সে এক কথা। আবার শুনি মা-বাপের সঙ্গেও বনিবনা নেই।

—দেখতে কিন্তু বেশ।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাকটা চাপা। রংও এমন কিছু ফরসা নয়।

হাসলাম। মেয়েদের ওই এক দোষ! কাউকে সুন্দর দেখতে চায় না। একটু না একটু খুঁত বের করবেই।

বউদি বললেন—ওকে যে কেন সবাই এত সুন্দর দেখে বুঝি না। আমাদের কর্তাটিও প্রথম ওকে দেখে মূৰ্ছা যেতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মেয়েটি কেমন?

বউদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—ভাল আর কী! এসব মেয়েরা আর কত ভাল হবে? তবু মিথ্যে কথা বলব না। এ বাড়িতে তেমন কিছু দেখিনি ওর। একা একা চুপচাপ থাকে। কারও দিকে লক্ষ করে না। বরং তিনতলার অবাঙালি পরিবারটা ভীষণ বাজে।

তবু অলকা সম্পর্কে খুব বেশি জানা গেল না। ওর স্বামী কে, কেন তার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, সে সব জানা থাকলে বেশ হত।

মধু মল্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেন—ও মশাই, চাকরি-বাকরি চান না কি কিছু? আপনার তো বিদেশের টেকনোলজি জানা আছে।

আমি বললাম—কারখানার চাকরি করা আর পোষাবে না। ব্যবসা কিছু করতে পারি।

উনি তখন বললেন—জার্নালিজম করবেন? আপাতত একটা ফিচার লেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

রাজি হলাম। টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্য। গোটা দুই ফিচার লেখার বরাত পেয়ে ক'দিন বেশ ছোটাছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। প্রথম ফিচারটা ছিল কলকাতার হোটেলের ব্যবসার ওপর, দ্বিতীয় ফিচার ছিল যে সব ইন্ডাস্ট্রি এদেশে নেই সেগুলোর ওপর।

প্রথম ফিচারটির মালমশলা সংগ্রহ করতে সারা কলকাতা চার-পাঁচদিন দাবড়ে বেড়াতে হল। তারপর একদিন বসে মধু মল্লিকের টাইপরাইটার নিয়ে এসে লেখা শুরু করলাম। গরম পড়েছে বড্ড। পাখা চালিয়ে ঘরের দরজা খুলে হাট করে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে, একজন বেশ লম্বা চওড়া লোককে ওপরতলায় উঠতে দেখলাম। প্রথমটায় কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু একটু বাদেই বউদি এসে এক কাপ চা রেখে বললেন—ভাই প্রভাসবাবু, একটু আগে একটা লোক—বেশ সুন্দর চেহারা, অলকার ঘরে ঢুকেছে।

আমি বললাম—ভাই-টাই কেউ হবে।

—না মশাই, ভাই-টাই নয়।

—তবে?

—সেইটেই রহস্য।

—ওর স্বামী নয় তো?

—না না, স্বামীদের হাবভাব অন্যরকম। এ লোকটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। প্রেমে পড়েছে এমন চেহারা।

—যে খুশি হোগ গে। আমি অবহেলাভরে বললাম।

বউদি বিরসমুখে বললেন—ভাবসাব ভাল নয়। একা অসহায় পেয়ে মেয়েটাকে যদি কিছু করে! আমাদের কর্তা থাকলে ঠিক ইন্টারফিয়ার করত। ওর খুব সাহস।

আমি পাত্তা দিলাম না। বউদি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে লেখাটা তৈরি করছিলাম।

প্রথম ফিচার বেরোবে খবরের কাগজে, একটু যত্ন নিয়ে কাজ করাই ভাল।

দুপুর বেলায় যখন খাচ্ছি, তখন বউদি এসে শেষতম বুলেটিন দিলেন—লোকটা এখনও নীচে নামেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাতে কী?

বউদি হঠাৎ লাজুক স্বরে বললেন—ওপরতলায় একটা হুটোপাটির আওয়াজও পাচ্ছি।

আমি টেলিফোন তুলে নম্বরটা ডায়াল করলাম। বউদি অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারপর হেসে কুটিপাটি।

অলকা

লন্ড্রিওয়ালা আমার একটি শাড়ি হারিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ। লন্ড্রিওয়ালা অবশ্য বলেছে—পাওয়া যাবে, ভাববেন না। কিন্তু আমার ভরসা নেই। আজ সকালে গিয়ে লোকটাকে খুব বকাবকি করেছিলাম। প্রথমটা তেমন রা করেনি। তারপর হঠাৎ কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করল। বলল—সব লন্ড্রিতেই ওরকম হয়। আমাদের নিয়ম যা আছে, ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ ত্রিশ টাকা। আমি ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারেন।

আমি অবাক, বলে কী! ধোলাই তো মোটে তিন টাকার, তার দশগুণ হয় ত্রিশ টাকা। কিন্তু আমার চাঁদেরি শাড়িটার দাম পড়েছিল একশো নব্বই, জয়দেব একটা একজিবিশন থেকে কিনে দেয়। খুব বেশি শাড়িটাড়ি জয়দেব আমাকে কিনে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু যে কখানা কিনে দিয়েছিল তার কোনওটাই খেলো ছিল না। এ সব ব্যাপারে ওর রুচিবোধ ছিল দারুণ ভাল।

শাড়িটার জন্য রাগে-দুঃখে আমি পাগল-পাগল। বললাম—ইয়ার্কি করছেন নাকি? দুশো টাকার শাড়ির ক্ষতিপূরণ ত্রিশটাকা? আমি ক্ষতিপূরণ চাই না, শাড়ি খুঁজে দিন।

লন্ড্রিওয়ালাও মেজাজ দেখাল-হারানো শাড়ির দাম সবাই বাড়িয়ে বলে। ও সব আমাদের জানা আছে। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, শাড়ি পাওয়া যাবে না। যা করবার করতে পারেন, যান।

শেষের ওই 'যান' কথাটাই আমাকে ভীষণ অবাক আর কাহিল করে দিল। লন্ড্রিওয়ালা লোকটার চেহারা ভীষণ লম্বা, কালো, গুণ্ডার মতো, বয়সেও ছোকরা। কয়েকদিন কাচিয়েছি এ দোকানে, খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, এই ইতর লোকটাই বুঝি দুনিয়ার সেরা শয়তান। আমারই বা কী করার আছে? কী অসহায় আমরা! 'যান' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাগে, দুঃখে ফেটে পড়ে আমি বললাম—যান মানে। কেন যাব? আপনি যে কাপড়টা চুরি করে নেননি তার প্রমাণ কী? ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলেই যদি অমন দামি একখানা কাপড় হাতিয়ে নেওয়া যায়—!

লোকটা বুক চিতিয়ে বলল—অ্যাঃ,দামি কাপড়! আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, বুঝলেন! দামি জিনিস অনেক দেখেছি, ফালতু পার্টি নই।

দোকানের দু-একজন কর্মচারী মালিকের পক্ষে সায় দিয়ে কথা বলছে। খুব অসহায় লাগছিল আমার। এ সময় একজন জোরালো পুরুষ-সঙ্গীর বড় দরকার হয় মেয়েদের।

একথা ভাবতে-না-ভাবতেই হঠাৎ যেন দৈববলে একজন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এলেন দোকানে। বেশ ভদ্র চেহারা, তবে কিছু রোগাভোগা। চোখেমুখেও বেশ দুঃখী বিনয়ী ভাব।

লোকটা দোকানে ঢুকে কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে মাথা নিচু করে বলল—ট্রাবলটা কী?

শোনাবার লোক পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। অবিরল ধারায় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

লোকটা শুনল। কথার মাঝখানে মাথাও নাড়ল! দোকানদার বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু লোকটা তাকে পাত্তা দিল না। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেটুনে একটা শ্বাস ফেলে বলল—হুঁ।

লোকটাকে আমার চেনা-চেনা ঠেকছিল প্রথম থেকেই। কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু তখন শাড়ি হারানোর দুঃখ আর লন্ড্রিওয়ালার অপমানে মাথাটা গুলিয়ে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

লোকটা লন্ড্রিওয়ালার দিকে একটু ঝুঁকে খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিস করে কী যেন বলল। লন্ড্রিওয়ালা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, দেখলাম।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন লন্ড্রিওয়ালার বন্ধু, আবার আমারও শুভানুধ্যায়ী।

খানিকক্ষণ ওইসব ফিসফাস কথাবার্তার পর হঠাৎ লন্ড্রিওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি, একটা শেষ কথা বলে দেব? আমি একশোটা টাকা দিতে পারি খুব জোর।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যদিও আমার শাড়িটার দাম অনেক বেশি, তা হলেও সেটা তো অনেকদিন পরেছি। তা ছাড়া ত্রিশ টাকার জায়গায় একশো টাকা শুনে একটা চমক লেগে গেল। তবু বেজার মুখ করে বললাম—তাও অনেক কম। তবু ঠিক আছে।

লন্ড্রিওয়ালা টাকা নিয়ে কোনও গোলমাল করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার টেনে টাকা বের করে দিল। রসিদ সই করে দিলে লন্ড্রিওয়ালা লোকটিকে বলল—প্রভাসবাবু, আপনিও সাক্ষী হিসেবে একটা সই করে দিন।

লোকটা সই করলে আমি নামটা দেখলাম। প্রভাসরঞ্জন। কোনও পদবি লিখল না।

বেরিয়ে আসার সময় প্রভাসরঞ্জনও এল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ। এই সকালের দিকেই সারা দিনের অসহনীয় গরমের আন্দাজ দিচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম। এখন অফিস যাব, তাই ট্রাম রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে প্রভাসবাবুকে বললাম—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে লোকটা টাকাটা দিত না।

প্রভাসবাবু মৃদু হেসে বললেন—আপনি কি টাকাটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। প্রশ্নটার মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে। বললাম—না। কেন বলুন তো!

—একটা শাড়ির সঙ্গে কত কী স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। শাড়ির দামটা তো বড় নয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম—তাই। তা ছাড়া শাড়িটাও বড় ভাল ছিল।

প্রভাস মাথা নেড়ে বলেন—বুঝেছি। ও টাকা দিয়ে আর একটা ওরকম শাড়ি কিনবেন?

—কিনতে পারি। কিন্তু একরকম শাড়ি তো আর পাওয়া যায় না। দেখা যাক।

'প্রভাসরঞ্জন আমার সঙ্গে ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—শাড়িটা আপনাকে কে দিয়েছিল?

এবার আমি একটু বিরক্ত হই। গায়েপড়া লোক আমার দুচোখের বিষ। বললাম—ওটা আমার খুব পারসোনাল ব্যাপার।

প্রভাসরঞ্জন আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে বললেন—আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারি।

করেছিস না হয় একটু উপকার, তা বলে পিছু নেওয়ার কী? পুরুষগুলো এমন বোকা হয়, কী বলব! তবু ভদ্রতা তো আর আমাদের ছাড়ে না। আমার আবার ওই এক দোষ, সকলের সঙ্গে প্রশ্রয়ের একটু সুরে কথা বলে ফেলি। তা ছাড়া, লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর আন্দাজটা সত্যিই হতে পারে-বা।

বললাম—কী আন্দাজ করলেন?

প্রভাসরঞ্জন মৃদু স্বরে বললেন—আপনার স্বামী।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম মনে মনে। কপালে বা সিঁথিতে আমি সিঁদুর দিই না। সম্পূর্ণ কুমারীর চেহারা আমার। তা ছাড়া যে এলাকায় আছি সেখানকার কেউ আমাকে চেনে না। এই লোকটা জানল কী করে যে আমার একজন স্বামী আছে?

এবার একটু কঠিন স্বরে কথা বলাটা একান্ত দরকার। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

বললাম—আমার স্বামীর খবর আপনাকে কে দিল? আমার স্বামী-টামী কেউ নেই।

লোকটা অবাক হয়ে বলে—নেই! তা হলে তো আমার আন্দাজ ভুল হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ! এরকম অকারণ আন্দাজ করে করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পুরুষমানুষদের কত কাজ

থাকে। পরের ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায়।

প্রভাসরঞ্জন কিন্তু অপমান বোধ করলেন না। বড্ড গরম আর রোদে ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। একটা টার্কিশ রুমালে ঘাড় গলা মুছলেন। পরনে একটা পাজামা আর নীল শার্ট। শার্টের কাটছাঁট বিদেশি। বাঁ হাতে বড়সড় দামি ঘড়ি। চেহারা দেখে সচ্ছল মনে হয়।

অপমান গায়ে না মেখে প্রভাসরঞ্জন বললেন—আমি আপনার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকি। আপনি তো ঠিক চিনবেন না আমাকে। পাঁচুবাবু নামে যে বুড়ো ভদ্রলোক হাসপাতালে গেছেন আমি তাঁরই ফ্ল্যাটে—

আমি হাসলাম। বললাম—ও, ভালই তো। আমি অবশ্য ও বাড়ির কারও সঙ্গে বড় একটা মিশি না।

—ভুল করেন।

—কেন?

—মেশেন না বলেই আপনাকে নিয়ে লোক খুব চিন্তা-ভাবনা করে, নানা গুজব রটায়।

আমি তা জানি। রটাবেই, বাঙালির স্বভাব যাবে কোথায়? বললাম—আমি ভুল করি না, ঠিকই করি। ওদের সঙ্গে মিশতে রুচিতে বাধে।

প্রভাসরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—সেটা হয়তো ঠিকই। তবে আমি অন্য ধাতুতে গড়া, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

উনি কার সঙ্গে মিশেছেন, কেন মিশেছেন সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। পার্ক সার্কাসের ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে আমি সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে থাকি। একটা কাক বুঝি ডানা ভেঙে কোনও খন্দে পড়েছে, তাকে ঘিরে হাজারটা কাকের চেঁচামেচি। কান ঝালাপালা করে দিল। তবু কাকের মতো এত সামাজিক পাখি আর দেখিনি। ওদের একজনের কিছু হলে সবাই দল বেঁধে দুঃখ জানাতে আসে। মানুষের মধ্যে কাকের এই ভালটুকুও নেই।

ট্রামের কোনও শব্দ পাচ্ছি না। বললাম—তাই নাকি?

এই 'তাই নাকি' কথাটা এত দেরি করে বললাম যে প্রভাসরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন—কিছু বললেন?

আমি বললাম—কিছু না।

প্রভাসরঞ্জন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। রোদ, গরম সব উপেক্ষা করে। আজকাল প্রায়ই পুরুষেরা আমার প্রেমে পড়ে যায়। এঁর সম্পর্কেও আমার সে ভয় হচ্ছে। বেচারা!

একটু ভদ্রতা করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম—লন্ড্রিওয়ালা কি আপনার চেনা?

—না তো! বলে ফের বিস্ময় দেখালেন উনি।

আমি বলি—আপনার কথায় লোকটা তা হলে ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল কেন?

—ওঃ! সেও এক মজা। ওর দোকানে আমিও কাচাতে-টাচাতে দিই, সেই সুবাদে একটু চেনা। একবার একটি প্যান্টের পকেটে ভুলে আমার পাসপোর্টটা চলে গিয়েছিল। সেইটে দেখে ও হঠাৎ আমাকে সমীহ করতে শুরু করে।

—পাসপোর্ট! আপনি বিদেশে ছিলেন নাকি?

—এখনও কি নেই? গোটা পৃথিবীটাই আমার বিদেশ।

ট্রাম কেন এখনও আসছে না এই ভেবে আমি কিছু অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, এ লোকটা পাগল। এর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকি ভাবতেও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রভাসরঞ্জন হাতের মস্ত ঘড়িটা দেখে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—আপনার ট্রাম তো এখনও এল না। অফিস ক'টায়?

আমি বললাম—দশটায়। তবে দশ-পনেরো মিনিট দেরি করলে কিছু হবে না।

ব্যথিত হয়ে প্রভাসরঞ্জন বলল—ওটা ঠিক নয়। দশ-পনেরো মিনিট দেরি যে কী ভীষণ হতে পারে।

আমি হেসে বললাম—কী আর হবে! সকলেরই একটু দেরি হয়। ট্রাম বাসে সময়মতো ওঠাও তো মুশকিল।

হুঁ। প্রভাসরঞ্জন বললেন—তার মানে কোথাও কেউ একজন দেরি করছে, সেই থেকেই দেরিটা

সকলের মধ্যেই চারিয়ে যাচ্ছে। ধরুন একজন স্টার্টার বাস ছাড়তে দেরি করল, ড্রাইভারও একটা পান খেতে গিয়ে দু মিনিট পিছোল, বাস দেরি করে ছাড়ল, সেই বাস-ভর্তি অফিসের লোকেরও হয়ে গেল দেরি। এই রকম আর কী। একজনের দেরি দেখেই অন্যেরা দেরি করা শিখে নেয়।

আমি হাসছিলাম।

উনি বললেন—কী করে অবস্থাটা পালটে দেওয়া যায় বলুন তো।

—পালটানো যায় না। ওই বুঝি আমার ট্রাম এল—

—হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভিড়, উঠতে পারবেন না।

ভিড় ঠিকই। ট্রাম বাসের একটু দেরি হলেই প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে আমার অভ্যাস আছে।

—চলি। বলেই ট্রামের দিকেই এগোই।

প্রভাসরঞ্জন হঠাৎ আমার পিছন থেকে অনুচ্চ স্বরে বললেন—সেদিন দুপুরে কে একটা লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিল বলুন তো, আপনার স্বামী।

কথাটা শুনে আমি আর ঘাড় ফেরালাম না; শুনিনি ভান করে ভিড়ের ট্রামে ধাক্কাধাক্কি করে উঠে গেলাম ঠিক।

আমার কোনওদিনই তেমন ঘাম হয় না, ইসিনোফিলিয়া আছে বলে প্রায় সময়ই বরং আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীত করে ওঠে। কিন্তু আজ আমি অবিরল ঘামছিলাম। সারাদিন বড় বেশি অন্যমনস্কও রইলাম আমি। মনে হচ্ছে, লন্ড্রিতে ওই লোকটার আসা, গায়ে পড়ে উপকার করা আর তার পরের এত সব সংলাপ এ সবই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। এতদিন আমার জীবনটা যত নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন ছিল এখন যে আর ততটা নয় তা বুঝতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরা বা এই লোকটা অন্তত আমার বিয়ের খবর রাখে।

সাতদিন কেটে গেছে, প্রভাসরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বা নামবার মুখে পাঁচুবাবুর বাইরের ঘরে থেকে খুব টাইপ রাইটারের আওয়াজ পাই। দরজা ভেজানো থাকে, কাউকে দেখা যায় না। আমিও তো আমার সিঁড়ির গোড়ায় বেশিক্ষণ থাকি না। বরং ভূতের ভয়ে কোনও জায়গা দিয়ে যেতে যেমন গা ছমছম করে, তেমনি একটা ভাব টের পাই। তাই সিঁড়ির মুখটা খুব হালকা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে পক্ষিণীর মতো উড়ে যাই।

আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি আজকাল। বাইরের দরজাটায় সব সময় ল্যাচকিতে চাবি দিয়ে রাখি। স্পাই হোল দিয়ে না দেখে আর নাম ধাম জিজ্ঞেস না করে বড় একটা দরজা খুলি না। অবশ্য আমার ঘরে আসবেই-বা কে?

একদিন আমার দাদা অভিজিৎ এল। সে বরাবর রোগা দুর্বল যুবক, শীত গ্রীষ্মে গলায় একটা সুতির কম্ফর্টার থাকবেই। ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারে না, সারা বছর তার সর্দি থাকে। ডাক্তার বলেছে এ রোগ সারার নয়।

সকালবেলায় দাদা এসে ঘরে পা দিয়েই ঝগড়া শুরু করল—এ তুই শুরু করেছিস কী বল তো! আমাদের পরিবারটা মডার্ন বটে, কিন্তু তুই যে সব লিমিট ছাড়িয়ে গেলি!

রাগ করে বললাম—ও কথা বলছিস কেন? একা থাকি বলে যত খারাপ সন্দেহ, না?

—বটেই তো। জয়দেবের সঙ্গে না থাকিস আমরা তো রয়েছি। এ দেশের সমাজে একা থাকে কোন মেয়ে?

—আমি থাকব।

—না, থাকবি না। তোর ঝাটি-পাটি যা আছে গুছিয়ে নে, আমি ট্যাকসি ডাকি।

নিজের বাড়ির কোনও লোককেই আজকাল আমার সহ্য হয় না। ওরা আমাকে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে শেখায়নি। সেটা আজকাল আমি বড় টের পাই। চারদিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দেখি তখনই আমার মনে হয়, আমারই যেন কী একটা ছিল না, হয়তো সইবার শক্তি বহনের ক্ষমতা, যা না থাকলে বিবাহিত জীবন বলে কিছু হয় না।

আমি দাদার জন্য চা করতে গিয়ে মনটাকে শক্ত করলাম খুব।

ফিরে এসে বললাম—জয়দেব বা আর কারও সঙ্গে আমি থাকব না।

—জয়দেবেরই বা দোষটা কী?

—যাই হোক। সব কি তোকে বলতে হবে নাকি?

কথায় কথায় ঝগড়া লেগে গেল। দাদা খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। এই সময় ফোনটা আবার বাজল। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার কানে তুলতেই সেই ধীর গম্ভীর গলায় বলল—আপনার ঘরে লোকটা কে?

আমি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম আসুন না প্রভাসবাবু একটু হেলপ করবেন। এ লোকটা আমার দাদা, বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

টেলিফোনে গলাটা শুনেই আজ আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি। কথা কটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে হাসি শোনা গেল। প্রভাসরঞ্জন বললেন—বড্ড মুশকিল হল দেখছি! চিনে ফেললেন! দাদা কী বলছেন?

—ফিরে যেতে।

—তাই যান না। জয়দেববাবুর তো কোনও দোষ নেই।

—আপনি সেটা জানলেন কী করে?

—খোঁজ নিয়েছি। ইনফ্যাক্ট আমি জয়দেববাবুর সঙ্গেও দেখা করেছি ক'দিন আগে।

—মিথ্যে কথা।

—না, মিথ্যে নয়। আমি এখন একটা ডেইলি নিউজ পেপারের স্পেশাল রিপোর্টার। মধু মল্লিক যে কাগজে কাজ করেন।

—তাতে কী?

—সেই কাগজের তরফ থেকে স্মল স্কেল আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রির একটা সার্ভে করেছিলাম। জয়দেববাবু ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।

—আমার কথা উঠল কী করে?

—উঠে পড়ল কথায় কথায়।

দাদা এসে এ ঘরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফোনের কথা শুনছে। একবার চোখের ইশারা করে জিজ্ঞেস করল—কে?

আমি হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে ফোনে বললাম—না, আপনিই আমার কথা তুলেছিলেন।

—তাই না হয় হল, ক্ষতি কী?

—ক্ষতি অনেক। তার আগে বলুন, আপনার এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট কেন?

প্রভাসরঞ্জন কিছু গাঢ় গলায় ইংরিজিতে বললেন—বিকজ আই হ্যাভ অলসো লস্ট সাম অফ মাই হিউম্যান পজেশনস।

ফোন কেটে গেল।

দাদা বলল—কে রে?

—একজন চেনা লোক।

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল—চেনা লোক! বাঃ, বেশ। চেনার পরিধি এখন পুরুষমহলে বাড়ছে তা হলে।

আমি ছোট্ট করে বললাম—বাড়লে তোর কী?

—আমার অনেক কিছু। সে থাকগে, একি লোকটা তোকে কী বলছিল?

আমি হঠাৎ আক্রোশে রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বললাম—তোরা কেউ কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না!

দরজার কাছ থেকে প্রভাসরঞ্জন বললেন—শান্তিতে কি এখনই আছেন? যান তো, একটু চা করে এনে খাওয়ান।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম লোকটার সাহস দেখে।

পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কি পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।

ব্যাচেলারদের বেশি বয়েসে কিছু-না-কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তা-ই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সাকড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতন তো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থ ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।

আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদায়ের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশি হতাম, যখন-তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।

এসব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারে আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কঙ্কালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেইসব পাপের কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি—প্রভাসরঞ্জন, পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খ্রিস্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।

আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন—যা যা জ্যাঠা ছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোতাম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।

ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে। ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কঙ্কালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেমন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দি ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।

পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়। আর দু-এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনও কাজে লাগল না। জীবনের দশ দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানি প্রতিনিধি দল এল। বেঁটে বেঁটে চেহারার হাস্যমুখ, বুদ্ধির আলোজ্বলা ছোট ছোট চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানিদের চেহারা ধাঁ করে পালটে গেল। পরনের স্যুট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন-কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালিঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভাল করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না। ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পরপর সাত দিন একনাগাড়ে তার কারখানাটিকে জরিপ করতে লাগল। শেষ দিকে ওদের চলাফেরা, যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তা শুনে হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ কারখানায় এতকাল থেকেও যে সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।

জাপানিরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন

ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনও অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং দামে অনেক সস্তা। এমনকী ওরা সুইস যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।

এ ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার দল সুইজারল্যান্ড যায়। ব্যল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল। স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।

ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ কারখানার একজন স্কিলড লেবার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আলগা আলগা ভালবাসা দেখালেন। মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারো যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যা-ই দেখাই তা-ই দেখেই বলেন—ওঃ, ভেরি গুড। হাউ নাইস! ইস ইট! যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এত বড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?

তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মতো খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে-কোনও ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। আমি হাতে-কলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনও ভারী কম্প্রেসর মেশিনের যে-কোনও কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকর হতে পারে।

কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যার অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়, যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।

এখন টাইপ রাইটারের খটখটানির মধ্যে একরকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।

মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন—কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপারে আপনার ফিচারটা সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসবাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশি কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এদেশের ইনকাম স্টেবল করা যাবে না। আপনি কি এ কথা মানেন?

আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশি হলাম। বললাম—কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায় এ আমি স্বীকার করি। তা ছাড়া এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক ওইসব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।

—লিখুন না একবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন। কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ ব্যাপারে! কুটির এবং ছোট ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল ছাপাবে। আমাকে সে জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারি লোকদের সঙ্গে দেখা করা। সেই সূত্রেই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারী দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালমানুষ! ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম—আমার বউ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।

জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন—আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বউ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাব কখনও ভাবিনি।

পরিচয় বেরিয়ে পড়তে যখন অলকার খবর দিলাম তখন জয়দেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল—ও কি আবার বিয়ে করবে?

—না, না।

—ওকে বলবেন, মেয়েদের দুবার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারে মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনও সমাজ বা পরিবারের পারসপেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবে না। যদি ভাবত তা হলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দুচোখের বিষ!

সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবেই তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।

আমি বললাম—আপনি কি এখনও অলকাকে ভালবাসেন?

কেমন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল—তাতে কী যায় আসে! ও তো আর আমাকে ভালবাসে না!

আমি চিন্তা করে বললাম—দেখুন, ভালবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস করে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালবাসার চেষ্টা থেকেই ভালবাসা আসে।

—সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও নেই?

আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।

কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

একদিন অনেক রাত অবধি টাইপ মেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোররাতে এসে ঘুম ভাঙাল সুহাস।

দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশি হই না, বললাম—কী রে, কী চাস?

—মার খুব অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। কী করব।

শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!

কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়েছিলাম, সুহাস বলল—কিছু টাকা দাও।

—টাকা দেব? অবাক হয়ে বলি—টাকা দেব সেটা বড় কথা কী। আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক তো।

বলে আমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনোমনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল—তুমি বিশ্রাম নাও না! এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি ব্যস্ত মানুষ, দু-চারদিন পরে যেয়ো।

ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। আবোল-তাবোল বকছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নয়। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম—তোর মুখে সত্যি কথা-টথা আসে তো ঠিক?

—বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?

—মার অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?

—তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।

—ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাব।

দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস 'এই একটু আসছি' বলে কথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।

আমি গিয়ে মার কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল, ওরা বলে তুই

নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস! কোনও এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?

আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি—তোমার কী হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ!

—হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভাল না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা করে না তেমন।

—সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।

মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে—ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই বোধহয় এই ফিকির করেছিল।

রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এককাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল—দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম! খুব ব্যস্ত শুনি!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—সুহাস কোথায় গেল বউমা?

—এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ও আসবে না, আমি জানি। বউমা, তুমি মার কাপড়চোপড় যা আছে গুছিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাব।

মা শুনে কেমন ধারা হয়ে গিয়ে বলল—সে কী কথা বলিস! এখন আমি কোথায় যাব?

আমি চড়া গলায় বললাম—যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছ!

অমনি নিমি ঘর থেকে তেড়ে এসে বলল—বেশি বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তিরও অনেক জানি!

দুচার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চারদিকে।

আমি মাকে বললাম—মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।

বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন মন্দ গেল না। মা রান্না বান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকের সবাই মার দেখাশুনা করে। এমনকী অলকা পর্যন্ত খোঁজ খবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া জানা পরিবেশে থেকে মার অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ ভাব। মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।

দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল—প্রভাস, একবার বরং দমদম থেকে ঘুরে আসি।

গম্ভীর হয়ে বলি—কেন?

মা ভয় খেয়ে বলে—সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আমি বললাম—মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বলো তো! মারে নাকি?

মা শ্বাস ফেলে বলে—অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশি কথা কী?

—তবু যেতে চাও?

—ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ওই যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।

—কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।

আমি বললাম—বাবার কাছে যাবে মা? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই।

—যাব বই কী! যাবখন। শীতটা আসুক।

বুঝলাম, এ জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মার মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার বংশধরেরা মার রক্তের স্রোত নিজের দিকে টেনে নিয়েছে! আর ফেরানো যাবে না।

মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম।

এই ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না। কাজের চাপও ক্রমশ বাড়ছে। হঠাৎ একদিন সাত সকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।

অলকা

মেঘৈর্মেদুরম্বরম। কাল রাত থেকে বৃষ্টি ছাড়েনি। যেমন ভয়ঙ্কর তেজে কাল রাত ন'টায় বৃষ্টি এল প্রায় ঠিক তেমনি তেজে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়ল। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কলকাতা ভেসে যাবে।

একটা গোটা ফ্লাটে সম্পূর্ণ একা থাকতে আমার যে ভয়-ভয় করে তা মিথ্যে নয়। শোয়ার আগে বারবার দরজা জানালার ছিটকিনি দেখি, খাটের তলা, আলমারির পেছনে এবং আর যে সব জায়গায় চোর-বদমাশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা ভাল করে না দেখে শুই না। ভূতের ভয় ছেলেবেলা থেকেই ছিল না, তবে বড় হওয়ার পর কখনও কখনও কী যেন একটা ভূত-ভূত ভয়ের ভাব হয়। বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি নামে। কাল সারা রাতের অঝোর বৃষ্টিতে বারবার জানালার শার্সিতে টোকা পড়েছে বৃষ্টির আঙুলে, দরজা ঠেলেছে উন্মত্ত বাতাস। ঝোড়ো বৃষ্টিতে কলকাতার ট্রামবাস ডুবে গেল বুঝি! শহরটা বোধহয় একতলা সমান জলের তলায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমন বাদলা বহুকাল দেখিনি।

ঘুম ভেঙে একবার উঠে দেখি, রাত দুটো। শীত-শীত করছিল। বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ কেন গা ছমছম করল! একটু শিউরে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে বাতি না নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালানো থাকায় ভয়-ভয় ভাবটা কমল বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। কোনওখানে মানুষের জেগে থাকার কোনও শব্দ হচ্ছে না। কুকুরের ডাক, বেড়ালের আওয়াজ কিছু নেই। ঘনঘোর মেঘ ডেকে ওঠে কেবল, বৃষ্টির জোর বেড়ে যায়, চারিদিক লণ্ডভণ্ড হতে থাকে। শুয়ে থেকে বুঝতে পারছিলাম, পৃথিবীতে একা হওয়ার মধ্যে কোনও সুখ নেই। একা মানুষ বড় নিস্তেজ, মিয়োনো।

নরম বালিশ বারবার মাথার তাপে গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ উল্টে দিচ্ছি বারবার। বর্ষাকালের সোঁদা স্যাঁতা এক গন্ধ উঠেছে বিছানা থেকে। কিছুতেই রাত কাটছে না।

এইভাবে রাত আড়াইটেয় বড় অসহ্য হয়ে উঠে বসলাম। বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল কারও সঙ্গে একটু কথা বলতে, কারও কথা শুনতে। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ নেই।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির দিকে জানালার শার্সির পাল্লা আছে, অন্যগুলোয় কাঠের পাল্লা। শার্সিতে চোখ রেখে দেখি ভূতের দেশের অন্ধকার চারদিক। নীচের রাস্তায় পরপর আলোগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র জ্বলছে এখনও। সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তায় হাঁটুজল। জলে প্রবল বৃষ্টির টগবগানি। আকাশ একবার দুবার চমকায়, গম্ভীর মেঘধ্বনি হয়। বড় একা লাগে।

আমার পরনে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাক। গায়ে কেবল ব্লাউজ, পরনে সায়া। রাতে এত বেশি গায়ে রাখতে পারি না। ঘরের বাতি জ্বালা রেখে এ পোশাকে জানালায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কিন্তু ওই নিশুত রাতে কে আর দেখবে। আর মনটাও বড় অস্থির তখন। ঠাণ্ডা শার্সিতে গাল চেপে ধরে বিবশার মতো বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে জগৎসংসারের ওপর এক গভীর অভিমান জেগে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল—তোমাদের কাছে আমার আদর পাওনা ছিল। কেন তোমরা কেউ কখনও আমাকে ভালবাসলে না? বলো কেন...?

কখনও কেঁদেছি আপনভোলা হয়ে। কাঁদছি আর কাঁদছি। আর কাকে উদ্দেশ করে যেন বিড়বিড় করে বলছি—এবার একদিন বিষ খেয়ে মরব, দেখো।

এ কথা বিশেষ কারও উদ্দেশ করে বলা তা সঠিক আমিও জানি না। তবে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতে যখন চারদিকের সব নাগরিকতা মুছে গিয়ে অভ্যন্তরের বন্যতা বেরিয়ে আসে, যখন মনে হয় এইসব ঝড়বৃষ্টির মতো কোনও অঘটনের ভিতর দিয়েই আমাকে সৃষ্টি করেছিল কেউ, তখন আর কাউকে নয়,

কেবল এই জন্মের ওপরেই বড় অভিমান হয়।

একা, বড় একা।

শার্সির কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি। সাজানো ঘর-দোর ফেলে অসীমদা কেন বিদেশে চলে গেছে তার পরিবার নিয়ে। হয়তো ফিরবে, হয়তো কোনওদিনই ফিরবে না। এই যে আলমারি, খাটপালঙ্ক, রেডিয়োগ্রাম, নষ্ট ফ্রিজ, টেলিফোন, এরা কারও অপেক্ষায় নেই, এরা কারও নয়। তবু মানুষ কত যত্নে এইসব জমিয়ে তোলে। কান্না পাচ্ছিল। টেলিফোনের সামনে বসে বিড়বিড় করে বললাম—কোনও মানুষকে জাগানো দরকার, আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ রাতে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি বড় একা।

টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকি। কোনও বিশেষ নম্বর ধরে নয়, এমনি আবোল-তাবোল যে নম্বর মনে আসছে সেই ঘরে আঙুল দিয়ে ডিস্ক ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম। প্রথমবার অনেকক্ষণ ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। আমার ভয় করছিল শেষ পর্যন্ত কেউ কি ফোন ধরবে না?

তৃতীয়বার রিং হতে দু মিনিট বাদে একটি মেয়ের ঘুম-গলা ভেসে এল—

—আমি অলকা।

—অলকা। কোন অলকা? এটা ফোর সিক্স ডবল থ্রি...

আমি বললাম—শুনুন, রং নাম্বার হয়নি, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

অবাক মেয়েটি বলল—কী কথা?

আমি বললাম—আপনার কে কে আছে? স্বামী।

—আমার বিয়ে হয়নি।

—মা? বাবা? ভাইবোন?

—বাবা আছেন। এক ভাই। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো। এত রাতে এসব কী প্রশ্ন?

—আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে। আপনার নাম কী?

ওপাশের মেয়েটি অবশ্যই খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। অন্য কেউ হলে ফোন রেখে দিত। এ কিন্তু জবাব দিল। বলল—আমার নাম মায়া দাস।

—কী করেন?

—কলেজে পড়াই। কিন্তু আমার এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনি কে বলুন তো!

—আমি অলকা। আমি একটা ফ্ল্যাটে একা থাকি। আজ রাতে বড় ঝড়-বাদল, আমার ভাল লাগছে না।

—সেই জন্য? আমার ফোন নম্বর আপনি জানলেন কী করে?

—জানি না তো। এখনও জানি না। আন্দাজে ছ'টা নম্বর ডায়াল করছিলাম, নম্বরগুলো মনেই নেই এখন। আপনি রাগ করলেন?

—না, রাগ নয়। আমাকে অনেক খাতা দেখতে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড।

—তা হলে ঘুমোন।

—শুনুন, আপনি আমার চেনা কেউ নন তো? ফোনে মজা করার জন্য পরিচয় গোপন রেখে...

—না না। সেসব নয়। আমি আসলে চাইছি, কিছু লোক আমার মতোই জেগে থাকুক আজকের রাতে। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি ছাড়া সারা কলকাতায় বুঝি আর কেউ জেগে নেই।

ওপাশে বোধহয় মেয়েটির বাবা জেগে গেছেন। এক গম্ভীর পুরুষের স্বর শুনতে পেলাম—কে রে মায়া? কোনও অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

মায়া বোধহয় মাউথপিসে হাত চাপা দিল। কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর মায়া বলল—আপনার নাম—ঠিকনা কিছু বলবেন?

—কেন?

—বাবা বলছেন, আপনার কোনও বিপদ ঘটে থাকলে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিপদ কিছু নেই। শুধু ভয় আছে। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করবেন না।

—আমার বাবা ডি এস পি। কোনও ভয় করবেন না।

ঠিক এই সময়ে মায়ার বাবা ফোন তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো, আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

—পার্ক সার্কাস। খুব অসহায় গলায় বললাম।

—বাড়িতে একা আছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন, বাড়ির লোকজন কোথায় গেল?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি একাই থাকি।

মায়ার বাবা একটু গলা ঝেড়ে বললেন—ও। বয়স কত?

—বেশি নয়। একুশ-বাইশ।

—কী করেন।

—একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি।

—ঠিকানাটা বলুন।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। নার্ভাসও লাগছে খুব। এতটা নাটক না করলেও হত। ঠিকানা দিলে ডি এস পি সাহেব হয়তো থানায় ফোন করে দেবেন, পুলিশ খোঁজ নিতে আসবে। কত কী হতে পারে।

ঝুঁকি না নিয়ে বললাম—কাকাবাবু, মাপ করবেন। অনেক বিরক্ত করেছি।

উনি বললেন—শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনও বিপদে পড়েছেন, কিন্তু বলতে সংকোচ করছেন। আমি অ্যাকটিভ পুলিশের লোক, নিঃসংকোচে বলতে পারেন। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওঁর এই সহৃদয়তা আমার ভাল লাগছিল। কিন্তু কী করব, আমার যে পুলিশের কোনও দরকার নেই। এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে আমি মানুষের জেগে-থাকার শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়তো এটা ভীষণ ছেলেমানুষি। এইভাবে ফোন করে লোককে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। তবু আর তো কোনও উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক বারবার 'হ্যালো হ্যালো' করছেন সাড়া না পেয়ে। আমার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। আস্তে আস্তে বলতে হল—না কাকাবাবু, কোনও বিপদ নয়। কেবল ভয়। এখন ভয়টা কেটে গেছে। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

বাকি রাতটা আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিতে দিতে বারবার ডি এস পি ভদ্রলোকের সাহায্য করা, প্রোটেক্ট করার কথাটা মনে পড়ছিল। আমাকে কেউ রক্ষা করুক, ত্রাণ করুক এ আমার অসহ্য। আমি কি অসহায়, অবলা?

ঠিক এই কারণেই প্রভাসরঞ্জন বাবুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যেমন অপছন্দ আমার সুকুমারকে। এমনকী উপরওয়ালার ভূমিকা নেওয়ার একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয় জয়দেবকেও আমি নিতে পারিনি স্বামী হিসেবে। জয়দেবের অবশ্য আরও অনেকগুলো খাঁকতি ছিল।

সকালেও বৃষ্টি ছাড়েনি। এ বৃষ্টিতে ঝি আসবে না জানি। কাজেই সকালে উঠে ঘরদোর সারতে হল নিজেকেই। এক অসম্ভব একটানা প্রবল বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। আমার ফ্ল্যাট থেকে রাস্তার কোনও গাড়িঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, নীচের হাঁটুজলে কিছু গরিব ঘরের ছেলে চেঁচাচ্ছে আর বল খেলছে। কয়েকবার রিকশার ঘন্টির শব্দ হল। কাদের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে ঘরে।

চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজ এইমাত্র খানিকটা কমে গেল। ধরবে। অফিসে যাওয়াটা কি আজ ঠিক হবে? না গেলেও ভাল লাগে না। একা ঘরে সারাদিন। কী করি?

বেলা নটায় উঠে স্নান সেরে নিলাম। ভেজা চুল আজ আর শুকাবে না। কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি, স্নান না করলে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব থাকত। কিন্তু স্নান করেই বুঝলাম, হুট করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। গলাটা ভার, চোখে জল আসছে, নাকে সুড়সুড়, তালুটা শুকনো-শুকনো। ছাতা হাতে অফিসে বেরোলাম তবু শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ির নীচেই প্রভাসরঞ্জন দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার জল দেখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—যাবেন কী করে? যা জল!

—যেতে হবে যেমন করে হোক।

—ট্রাম-বাসও পাবেন না। দুটো-একটা যা চলছে তাতে অসম্ভব ভিড়। আমি একটু আগে বেরিয়ে দেখে এসেছি।

একটু ইতস্তত করছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় তো যাওয়াও হল না, জল ভেঙে ঠাণ্ডাও লেগে গেল হয়তো।

প্রভাসরঞ্জন বললেন—খুব জরুরি কাজ নাকি?

—জরুরি। একটা ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি আমার কাছে রয়ে গেছে।

—রেনি ডে-তে কি আর অফিসের কাজকর্ম হবে?

—হবে।

এই বলে রাস্তাঘাট একটু দেখে নিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় পা দিতে-না-দিতেই একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে রোদ দেখা দিল। কী মিষ্টি রোদ! গোড়ালিডুবু জল ভেঙে, শাড়ি সামলে কষ্টে এগোতে থাকি। ঠাণ্ডা জলে পা দিতেই শরীর একটা শীতের কাঁপনি দিচ্ছে। দিক। গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে নেব। ট্যাবলেট ক্যাপসুলের যুগে অত ভয়ের কিছু নেই।

ভাগ্য ভাল, ডিপোর কাছ বরাবর যেতে-না-যেতেই লেডিজ স্পেশাল পেয়ে পেলাম।

অফিসে এসেই বেয়ারাকে দিয়েই গোটা দশেক ট্যাবলেট আনিয়ে দুটো খেয়ে ফেললাম। তারপর চা। শরীরটা খারাপই লাগছে। সর্দি হবে।

গামবুট আর বর্ষাতিতে সেজে সুকুমার আজ বেশ দেরিতে অফিসে এল। ও আবার ম্যানেজমেন্টকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। অফিসে ঢুকেই ধরাচূড়া ছেড়ে সোজা আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল—দুটো সিনেমার টিকিট আছে। যাবে? ইংরিজি ছবি।

আমি ওর বিশাল স্বাস্থ্যের চেহারাটা দেখলাম খানিক। এর আগে ওর সঙ্গে কয়েকবারই সিনেমায় গেছি। তখন সংকোচ ছিল না। সেদিন আমার ফ্ল্যাটে সেই কাণ্ড ঘটানোর পর থেকে ও আর বড় একটা কাছে ঘেঁষেনি এতদিন। লজ্জায় লজ্জায় দূরে দূরে থাকত। আজ আবার মুখোমুখি হল।

বললাম—আজ শরীর ভাল নেই।

—কী হয়েছে?

—সর্দি।

—ওতে কিছু হবে না। চলো, ঠেসে মাংস খেয়ে নেবে। মাংস খেলে সর্দি জব্দ হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম—আর সুকুমার জব্দ হবে কীসে?

সুকুমার দু পলক আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ গলায় বলল—মাংসে। যদি সেই সঙ্গে হৃদয় পাওয়া যায় তো আরও ভাল।

একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছে। বললাম—এত দাবিদাওয়া কীসের বলো তো! বেশ তো আছি। তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।

—আমি আমার মতো নেই।

এটা অফিস, এসব কথাও বিপজ্জনক। তাই মুখ নিচু করে বললাম—এসব কথা থাক সুকুমার।

—থাক। তবে এসব কথা আবার উঠবে, মনে রেখো।

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। পুরুষেরা অসম্ভব দখলদার এক জাত।

দুটো সিনেমার লাল টিকিট বের করে সুকুমার আমার সামনেই ছিঁড়ল কুটিকুটি করে। আমার টেবলের উপর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো কাগজ জড়ো করে রেখে বলল—জানতাম তুমি যেতে চাইবে না। কিন্তু আমারও তো একটা সুযোগ দরকার।

অফিসে আজ কাজকর্মের মন্দা। লোকজন বেশি আসেনি। বেশ বেলা করে দু-চারজন এসেছে বটে, তবু বড্ড ফাঁকা ঠেকছে অফিস। নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে বাধা নেই। সত্যি বলতে কী, আমার কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল।

বললাম—সুযোগ মানে কিন্তু দখল করা নয়। আমি কারও সম্পত্তি হতে পারিনি, কোনওদিন পারবও না।

—তা হলে আমাকেই তোমার সম্পত্তি করে নাও না। চিরকাল তোমার হুকুমমতো চললেই তো হল।

হাসলাম। ছেলেমানুষ!

বললাম—ওরকম নেতানো নির্জীব পুরুষও মেয়েদের পছন্দ নয়।

—তা হলে কী হবে?

—কিছু হবে না।

—কীসের বাধা অলকা? তোমার স্বামীর কথা ভাবছ?

মাথা নেড়ে বললাম—না। তবে সেটাও ভাবা উচিত। এখনও তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

—করে নাও।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বললাম—সে অনেক ঝামেলা, দরকারও দেখি না। কিছুদিন গেলেই সে নিজেই মামলা করবে। আমি কোর্টে যাব না, এক্সপার্টি হয়ে ওকে ডিক্রি করে দেব।

—সেটা অনিশ্চিত ব্যবস্থা অলকা। উনি যদি মামলা না করেন?

—বয়ে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে—তুমি অত আলগা থেকো না। কেন নিজেকে নষ্ট করছ? আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি!

কী থেকে কী হয়ে গেল মনের মধ্যে।

মেঘভাঙা অপরূপ রোদের ঝরনা বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। অফিসঘরে গনগন করছে আলোর আভা। দুদিন মনমরা বৃষ্টির পর কী ভাল এই রোদ্দুর! কাল রাতের সেই একা থাকা ভয়ংকর ছবি মিথ্যে মনে হয়। আবার সেই বাসায় আজকেও আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। যদি রাতে বৃষ্টি আসে ফের, রাতে আবার ঘুম ভেঙে ভূতে-পাওয়া মাথা নিয়ে বসে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, ঠিক। প্রোটেক্টার না হোক, আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে না হলে বাঁচব কী করে?

সুকুমার দেখতে বেশ। তা ছাড়া বড় সরল, সোজা ছেলে! কখনও ওকে খারাপ লাগেনি। আজ অপরাহ্ণের আলোয় অফিসঘরে বসে মুখোমুখি ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ কী হয়ে গেল। ভাবলাম—কী হবে এত বাছবিচার করে! নিজেকে নিয়ে আর কত বেঁচে থাকা!

বললাম—শোনো সুকুমার, আমি ডির্ভোস চাই।

—চাও? ও লাফিয়ে ওঠে।

—চাই। আমার স্বামীও চায়। হয়তো ডিভোর্স পেতে কিছু সময় লাগবে।

—তারপর কী করবে অলকা?

—তারপর করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে সুকুমার। এক দুরন্ত অধৈর্য অনুভব করে বলি।

—অলকা, যদি আমরা এক্ষুনি বিয়ে করি, তা হলে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থাকি। বুকের মধ্যে নানা ভয়, দ্বিধা, সংস্কার ছায়া ফেলে যায়।

তারপর বলি—কয়েকটা দিন সময় দাও।

—দিলাম। কতদিন বলো তো

—দেখি।

একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেল সুকুমারকে! একটু হয়তো কিন্তু রইল, দ্বিধা রইল, তবু ওটুকু কিছু নয়। সেসব দ্বিধা, ভয় ভেঙে সুকুমার ঠিক সাঁতরে আসবে কাছে।

রাতটা মাসির বাড়িতে গিয়ে কাটালাম। জ্বর এল রাতে। তিনটে দিন বাড়ির বার হওয়া গেল না। অল্প জ্বরেই কত যে ভুল বকলাম ঘোরের মধ্যে!

চারদিনের দিন ফের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। মাসি আজকাল আর আটকে রাখে না, যেতে চাইলে এককথায় ছেড়ে দেয়। ঢিলে বলগা মেয়েকে সকলেরই ভয়।

দোতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা জানালা হাট করে খুলে বন্ধ বাতাস তাড়াই। ধুলো-ময়লা পরিষ্কার

করি। রবিবার। তাড়া নেই।

চায়ের জল চাপিয়ে এলোচুলের জট ছাড়াতে একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।

কলিং বেল বাজল। এ সময়ে কেউ আসে না। একমাত্র সুকুমার আসতে পারে। তার তর সইছে না।

কাঁপা বুক নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেও সাপ দেখে পিছিয়ে আসার অবস্থা। চৌকাঠের ওপারে জয়দেব দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কথা ফোটে না কারও মুখে। জয়দেবের চেহারা রোদে পোড়া, তামাটে, কিছু রোগা হয়েছে। মাথার চুল এত ছোট যেন মনে হয় কদিন আগে ন্যাড়া হয়েছে। পরনে ধুতি আর ক্রিমরঙা সুতির শার্ট। কিন্তু ধুতিটা এমনভাবে পরেছে যে মনে হয় পাশের ফ্ল্যাট থেকে এল। বাইরে বেরোবার পোশাক নয়।

চৌকাঠের বাইরে থেকে জয়দেব এক পাও ভিতরে আসার চেষ্টা করল না। দাঁড়িয়ে থেকে বলল—তুমি এখানে থাকো সে খবর সদ্য পেয়েছি।

—কী চাও?

খুব সাধারণ আলাপচারির গলায় জয়দেব বলল—কিছু চাই না অলকা। তোমার কাছে ডিভোর্সে মত দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার কোনও উত্তর দাওনি। তোমার কি মত আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বলি—দরজার বাইরে থেকে অত জোরে ওসব কথা বলছ কেন? ভিতরে এসো।

জয়দেব এল। কোনওদিকে তাকাল না, ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ করল না। খুবই কুণ্ঠিত পায়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল—আমি নীচের তলায় প্রভাসবাবুর বাসায় উঠেছি কাল এসে।

প্রভাসের সঙ্গে জয়দেবের চেনা আছে জানতাম। তাই চমকালাম না। দরজা বন্ধ করে এসে জয়দেবের মুখোমুখি বসে বললাম—আমি খুব তাড়াতাড়ি ডির্ভোস চাই।

জয়দেব মুখখানা করুণ করে বলল—তাড়াতাড়ি চাইলেই তো হয় না। কোর্ট থেকে এ সব কেসে বড় দেরি করে। তাড়াতাড়ি চাইলে আরও আগে জানালে না কেন? কবে কেস ফাইল করা যেত!

আমি মাথা নিচু করে বলি—শোনো, ডিভোর্স পেতে দেরি হোক বা না হোক, আমরা তো একটা এগ্রিমেন্টে আসতে পারি।

—কী এগ্রিমেন্ট?

—ধরো, আমরা কাউকে কোনও অবস্থাতেই দাবি করব না। পরস্পরের কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব না।

—তার জন্য এগ্রিমেন্ট লাগে না অলকা। জয়দেব বলল—আমরা সেই রকমই আছি। কথার স্বর শুনেই বোঝা যায়, জয়দেবের মন এখন অনেক গভীর হয়েছে। জীবনে কোনও একটা সত্য বস্তুর সন্ধান না পেলে মানুষ এত গভীর থেকে কথা বলতে পারে না। তাই আমি ওর মুখের দিকে কয়েকবার তাকালাম। ও আমাকে দেখছিল না। চোখ তুলে দেওয়ালের মাঝারি উচ্চতায় চেয়েছিল। সেই অবস্থায় চেয়ে থেকেই বলল—তুমি একটি ছেলেকে পছন্দ করো শুনেছি। তাকে বিয়ে করার জন্যই কি এত তাড়া?

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি—না তো। আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

—সুকুমার না কী যেন নাম, শুনছিলাম। তোমার অফিসের।

—ওঃ! বাস্তবিক আমার সুকুমারের মুখটা এখন মনে পড়ল। বললাম—পছন্দ নয়। তবে ওই একরকম।

—ভাল।

—তুমি ডিভোর্স চাইছ কেন? বিয়ে করবে? বললাম।

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল—বিয়ে আর না। মুক্তি চাইছি, নইলে বড় কষ্ট হয়।

—কষ্ট কীসের?

—ওই একটা অধিকারবোধ থাকে তো পুরুষের। সেইটে মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে একরকম শান্তি।

—ও।

—আচ্ছা—বলে জয়দেব কুণ্ঠিত পায়ে উঠল। উকিলের চিঠি দেব। তুমি কি অ্যালিম চাও?

—সেটা কী?

—খোরপোষ।

—না, না! চমকে উঠে বলি।

—আচ্ছা তা হলে—

—আচ্ছা। বললাম।

দরজা খুলে জয়দেব চলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওর পায়ের শব্দ যখন নামছে তখন আমি ঘরের মধ্যে চুলের জটে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছি। কত ভাবনা! সে যেন এক আলো-আঁধারের মধ্যে ডুবে বসে থাকা। উঠলাম না, রাঁধলাম না, খেলাম না। শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ের আঙুল হৃৎপিণ্ডে টোকা মারল। নড়ে উঠল বুকের বাতাস। সচেতন ভীতগ্রস্ততায় টের পাই—আমি কাউকেই ভালবাসি না। কাউকে নয়। কেবলমাত্র নিজেকে। আমি কোনওদিন কাউকে ভালবাসতে পারব না।

কী করে বেঁচে থাকব আমি?

পৃথিবীতে কত দুর্যোগের বর্ষা নামবে কতবার! কত একা কাটবে দিন! কাউকে ভাল না বেসে আমি থাকব কী করে?

বিকেল কাটল। নীচের তলা থেকে অহঙ্কারী জয়দেব একবারও এল না খোঁজ করতে। সুকুমার টেলিফোনও করল না। বড় অভিমানে ভরে গেল বুক। সারাদিন খাইনি, স্নান করিনি, কে তার খোঁজ রাখে!

সন্ধে হল, রাত গড়িয়ে গেল গভীরের দিকে।

শরীর দুর্বল। মাথা ফাঁকা। মনটায় তদগত একটা আচ্ছন্নতা। ভূতে পেয়েছে আমাকে। উঠে গিয়ে ছারপোকা মারবার অমোঘ ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসলাম। চিরকুটে লিখে রাখলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

লিখে বিছানায় শুয়ে আস্তে শিশির মুখ খুলে ঠোঁটের কাছে এনে পৃথিবীকে বললাম—ভালবাসা ছাড়া কী করে বাঁচি বলো! বাঁচা যায়? ক্ষমা করো।

ঠিক এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল মৃদু সেতারের মতো। উঠলাম না। শিশিটা উপুড় করে দিলাম গলার মধ্যে।

হায়! ফাঁকা শিশি প্রেমহীন হৃদয়ের মতো চেয়ে রইল আমার শূন্য হৃদয়ের দিকে। এক ফোঁটা বিষও ঢালতে পারল না সে। অমৃতও না।

উঠে টেলিফোনটা যখন ধরছি তখন কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল, টেলিফোনে যেন জয়দেবের গলার স্বর শুনতে পাই।

অসুখের পরে

বাতাসে আজ কিছু মিশে আছে। রহস্যময় গোপন কোনও শিহরন ? কোনও আনন্দের খবর ? কোনও সুগন্ধ ? কোনও মধুর অশ্রুত শব্দের কম্পন ? হেমন্তের সকালে ভিতরের বারান্দায় টিয়া পাখি অস্ফুট কিছু কথা বলতে চাইছে। ভোরের আলোটিতে আজ কিছু গাঢ় হলুদের কাঁচা রং।

শিয়রের মস্ত জানালার খড়খড়ির একটি পাটি ভাঙা। পুবের তেরছা রোদ একফালি এসে পড়ে আছে মেঝেয়, যে মেঝে প্রায় একশো বছরের পুরনো। মস্ত উঁচু সিলিঙে খেলা করছে রোদের আভা। বিমের খাঁজে চতুর পায়ে ঘুরছে ফিরছে বন্দনার পোষা পায়রারা।

বন্দনার আজ আর অসুখ নেই। তিন দিন হল জ্বর ছেড়ে গেছে। শরীরটা ঠাণ্ডা, বড় বেশি ঠাণ্ডা হয়ে আছে তার। একটুও জোর নেই গায়ে। তবু এমন ভাল দিনটা কি বয়ে যেতে দেওয়া যায় ?

তাদের ঘরগুলো বড্ড বড় বড়। কী বিরাট তার পালঙ্কখানা ! কত উঁচু। এই পালঙ্কে তার দাদু শুত, তারও আগে হয়তো শুত দাদুরও দাদু। এই পালঙ্কেরও কত যে বয়স ! এতকালের জিনিস, তবু পাথরের মতো নিরেট। বন্দনা উঠে বসল। পালঙ্কের অন্য পাশে মা ছিল শুয়ে। ভোরবেলা উঠে গেছে। এ সময়ে মা ঠাকুরঘরের কাজ সারে। তারপর রান্নাঘরে যায়।

বসে বন্দনা আগে তার এলোমেলো চুল দুর্বল হাত দুটি দিয়ে ধরল মুঠো করে। তার অনেক চুল। চুলের ভারে মাথাটা যেন টলমল করে। যেমন ঘেঁস তেমনি লম্বা। খোঁপা বাঁধলে মস্ত খোঁপা হয় তার।

একটু কষ্ট করেই এলো খোঁপায় চুলগুলোকে সামাল দিল সে। তারপর নামবার চেষ্টা করল। পালঙ্ক থেকে নামা খুব সহজ নয়, বিশেষ করে দুর্বল শরীরে। পালঙ্কটা বড্ড উঁচু বলে নামা-ওঠার জন্য একটা জলচৌকি থাকে। বন্দনা সেটা দেখতে পেল না। বোধহয় অন্য ধারে রয়েছে। পালঙ্কটা পার হয়ে ওপাশ দিয়ে নামবে কি না একটু ভাবল বন্দনা। এই পালঙ্ক তার ছেলেবেলার সাথী। রেলিং বেয়ে, ছত্রি বেয়ে কত খেলা করেছে। আজ কি পারবে না একটু লাফ দিয়ে নামতে ? দুর্বল হাঁটু কি বইতে পারবে তাকে। গত পনেরো দিন সে বিছানা থেকে খুব কমই নেমেছে। বিছানায় বেডপ্যান, বিছানায় স্পঞ্জ, বিছানাতেই খাওয়া। বিছানা তাকে খেয়ে ফেলেছিল একেবারে।

আস্তে তার ফর্সা ডান পাখানা মেঝের দিকে বাড়িয়ে দিল বন্দনা। পাখানা শূন্যে দুলছে। মেঝে নাগালের অনেক বাইরে। দুর্বল হাতে খাটের বাজু চেপে ধরে খুব সাবধানে কোমর অবধি ঝুলিয়ে দিল বন্দনা। তারপর ঝুপ করে নামল। টলোমলো দুটি পা তাকে ধরে রাখতে পারছিল না প্রায়। খাটে ভর দিয়ে সে যখন দাঁড়াল তখন মুখে একটা হাসি ফুটল তার।

বন্দনার পরনে একখানা ভারী কাপড়ের নাইটি। গুটিয়ে গিয়েছিল, ঠিকঠাক করে নিল বন্দনা। মেঝে থেকে পাথুরে শীতলতা শরীর বেয়ে উঠে আসছে। একটু শীত করছে তার। শিয়রের কাছে ভাঁজ করা টমেটো রঙের পশমের চাদর রাখা আছে। বন্দনা সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল।

তার চেহারা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে ? উত্তর দিকে মেঝে থেকে প্রায় সিলিং অবধি বিশাল মেহগনি কাঠের আলমারির গায়ে খুব বিরাট আয়না লাগানো। আয়নার পারা কিছু উঠে গেছে। তার সামনে এসে দাঁড়াল বন্দনা। নিজেকে তার একটুও পছন্দ হল না দেখে।

বিবর্ণ রক্তহীন পাঁশুটে মুখ। বরাবরই সে একটু রোগা। এখন কঙ্কালসার হয়েছে তার শরীর। গলাটা কত সরু হয়ে গেছে আরও। ঝ্যালঝ্যাল করছে গায়ের পোশাক।

বন্দনা তার দুটি হাওয়াই চটি পরে নিল। ধীর পায়ে সে এসে দাঁড়াল ভিতরের বারান্দায়। তাদের পুরনো আমলের বাড়ির সবকিছুই বড় বড়। এই বারান্দায় একসময়ে দুশো লোক পংক্তিভোজনে বসত। আজকাল পংক্তিভোজন হয় না। বারান্দার সামনের দিকে ওপর থেকে

অনেকটা জুড়ে কাঠের আবডাল, তার নীচে রঙিন কাচ। বুক সমান লোহার মজবুত রেলিং। বারান্দায় কয়েকটা খাঁচা দুলছে। আগে অনেকগুলো খাঁচা ছিল। আজকাল নেই। মোট চারটে খাঁচার মধ্যে দুটিতে দুটি পাখি আছে। একটায় টিয়া, অন্যটায় একটা বুলবুলি। আর দুটো খাঁচা উত্তরের শিরশিরে হাওয়ায় দুলছে।

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে টিয়াকে একটু দেখল বন্দনা। খাঁচার মধ্যে পাখি দেখতে তার ভাল লাগে না। বিলু পাখি পোষে। কিন্তু বিলু বড় হচ্ছে, এখন আর পাখির দিকে মন নেই তেমন। বিলু এখন ক্রিকেট খেলতে যায়, ফুটবল খেলতে যায় বিলুর এখন অনেক পড়াশোনার চাপ।

বুকসমান রেলিঙের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বন্দনা নীচের বাঁধানো উঠোনটা দেখল। ভাঙা শান, কোনও কচু গাছের ঝোপ, ঘাস, আগাছা। উঠোনের মাঝখানে বাঁধা তারে কয়েকটা কাপড় শুকোচ্ছে। উঠোনের ওপাশে কাছারি-ঘর। অবশ্য এখন আর নায়েব গোমস্তা কেউ নেই। ওখানে এখন মদনকাকা থাকে। কাছারি-ঘর ছাড়িয়ে একটা বাগানের মতো আছে। তারপর ভাঙা দেউড়ি।

এ বাড়ির মধ্যে এখনও একশো বছরের পুরনো বাতাস। এখনও তাদের ছায়া-ছায়া ঘরগুলোতে গুনগুন করে বেড়ায় কত ইতিহাস। দেয়ালে দেয়ালে এখনও সোনালি ধাতব ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেন্টিং। তাদের পূর্বপুরুষেরা ছবির চোখ মেলে চিত্রার্পিত চেয়ে থাকে।

ঘুরে দাঁড়ালেই দেখা যাবে দেয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটা লেনিনের একখানা ছবি। ধুলোটে ময়লা পড়েছে ছবিতে, বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু মা কখনও ওই ছবি খুলতে দেয়নি কাউকে। ছবিটা লাগিয়েছিল বন্দনার দাদা প্রদীপ। দাদা আর নেই।

আজ হেমন্তের এই সকালে বন্দনা টের পাচ্ছে, তার চারদিককার আবহে একটা চোরা আনন্দের স্রোত। কেন ? সে কি অসুখ থেকে উঠেছে বলে ?

বন্দনা লেনিনের ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। ওই ছবিটার দিকে তাকালে তার দাদার কথা মনে পড়ে। একটু কষ্ট হয়।

ঘর থেকে মা ডাকল, বন্দনা, কোথায় গেলি দুর্বল শরীরে ?

এই তো মা আমি ! বারান্দায়।

তার ফর্সা গোলগাল মা বেরিয়ে এল বারান্দায়, ওমা, তুই উঠে এসেছিস ?

আজকের দিনটা কী ভাল, না মা ?

আয় ফলের রস এনেছি।

এখানে এনে দাও।

ফলের রস বন্দনার ভাল লাগে না। তার কিছুই খেতে ভাল লাগে না। মায়ের ভয়ে খায়। তার মা দুঃখী মানুষ।

কিন্তু আজ দুঃখের দিন নয়। কী সুন্দর একটা দিন যে বন্দনাকে উপহার দিয়েছে এই পৃথিবী। আজ যেন স্বপ্নের আলো, স্বপ্নের বাতাস। আজ যেন কিছুই সত্যি নয়, সব রূপকথা।

সাদা পাথরের ভারী গেলাসে চুমুক দিয়ে সে ফলের রসেও একটা আলাদা স্বাদ পেয়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট তিনটে চুমুকের পর সে মুখ তুলে বলল, আজ আমগাছ তলায় একটু বসব মা ?

মা তার দিকে চেয়ে বলে, আজ থাক না। দোতলা একতলা করতে কষ্ট হবে।

না মা, কষ্ট হবে না। কতদিন ঘরে পড়ে আছি বলো তো !

তা হলে দাঁড়া, বাহাদুরকে বলি ইজিচেয়ারটা পেতে দিতে।

একটু সাজবে কি বন্দনা ? আজ যেন কয়েদখানা থেকে মুক্তি। অসুখের চেয়ে খারাপ কয়েদখানা আর কী আছে ?

আয়নার সামনে নিজের পাঁশুটে চেহারাটার মুখোমুখি ফের দাঁড়ায় সে। খড়ি-ওঠা মুখে একটু ক্রিম ঘসতেই মুখের রুগ্‌ণতার রেখাগুলি ফুটে উঠল ভীষণ। কেন যে সে এত রোগা ! এই শরীরে অসুখ হলে শরীর যেন হাওয়ায় নুয়ে পড়তে চায়।

এ শরীরে রং-চং মানাবে না বলে খুব হালকা গোলাপি রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরে নিল

সে। চুল আঁচড়াল। তারপর পশমের টমেটো রঙা শালটা জড়িয়ে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড হলঘর পেরিয়ে দরদালানে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল সে। পাথরে বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি, লোহার কারুকাজ করা রেলিং। আজ মনে হচ্ছে, কতদূর নেমে গেছে সিঁড়ি, সে কি পারবে এত সিঁড়ি ভাঙতে ? মাঝ-সিঁড়ির চাতালে মস্ত শার্সি দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। বাইরের আলোয় যেন নেমন্তন্নের চিঠি। এসো, এসো, আজ তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। আজ তোমার দিন।

পিছনের বাগানে কিছু পরিচর্যা আছে। বুড়ো মালি গোপাল এখন থুত্থুড়ে হয়ে গেছে। তার বাঁকা কোমর সোজা হতে চায় না, হাত কাঁপে, কানে শুনতে পায় না, চোখেও ছানি। তবু সে পিছনে একটুখানি জায়গায় মায়ের পুজোর জন্য ফুল ফোটায়। বাকি অনেকটা জমি ফাঁকা পড়ে আছে, আগাছা আর ঘাসের জঙ্গল। ঘের-দেয়াল দু জায়গায় ভেঙে গেছে বলে আজকাল গোরু মোষ ঢোকে, চলে আসে পথবাসী কুকুর। গোপালের বাগানের জন্য ছোট্ট একটু চৌখুপি জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে মা। এর বেশি গোপাল আর পারে না।

সেই চৌখুপি জায়গার মুখোমুখি পুরনো আমগাছের ছায়ায় ইজিচেয়ার পাতা হয়েছে।

উৎসবের বাড়িতে গেলে যেমন সবাই আসুন বসুন করে আজ বন্দনা বাইরে পা দেওয়ামাত্র যেন নিঃশব্দে চারদিকে একটা অভ্যর্থনা হতে লাগল তার। খোলা বাতাস তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল। রোদ জাপটে ধরল তাকে আদরে। কতদিন পর তার এই একটুখানি বাইরে আসা।

এ তার আজন্ম চেনা বাগান, চেনা গাছ। এই বাড়ির মতো এত প্রিয় জায়গা এ পৃথিবীতে কোথাও নেই তার। এ বাড়ি ছেড়ে সে কোনওদিন কোথাও যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কত মায়ায় যে মেখে আছে বাড়িটা। মেঘলা দিন বা গ্রীষ্মের দুপুরে, শীতের সন্ধে বা নিশুত রাতে এ বাড়িটা নানারকম রূপ ধরে।

বাড়িটা অবশ্য এখন আর সুন্দর নেই। ছাদের গম্বুজগুলো ভেঙে পড়ে গেছে, নোনা আর শ্যাওলা ধরেছে দেয়ালে, অশ্বত্থের চারা উঁকি দিচ্ছে এখানে সেখানে। কতকাল মেরামত হয়নি, কলি ফেরানো হয়নি। তবু আজও এই গম্ভীর বাড়ি চারদিকটাকে যেন শাসনে রাখে। লোকে এখনও ভক্তি শ্রদ্ধা করে এসব বাড়িকে। মলি বলে, তোদের বাড়িটা ফিউডাল হলেও বেশ কমফোর্টেবল। স্পেস একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টর। আমাদের বাড়িতে স্পেস নেই বলেই যত গণ্ডগোল। যত ঘেঁষাঘেষি হবে, মানুষে মানুষে, তত বেশি ক্ল্যাশ হবে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারবে না। স্পেস একটা মস্ত বড় সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর। সেদিক দিয়ে তোদের বাড়িটা দারুণ ভাল। বিগ হাউস, বিগ স্পেস, আইসোলেশন। গুড। ভেরি গুড। আমি ছেলেবেলা থেকে একটা আলাদা ঘরে একা থাকার স্বপ্ন দেখি। কী রকম ক্রাউডেড বাড়িতে আমরা থাকি বল তো। ওরকমভাবে থাকলে মানুষের ইমাজিনেশন মরে যায়, গুড কোয়ালিটিজ নষ্ট হয়ে যায়, সবচেয়ে বেশি হয় মেন্টাল ডিস্ট্যাবিলাইজেশন।

বন্দনা কথাটা কি স্বীকার করে ? সে কখনও মলির মতো ক্রাউডেড বাড়িতে থাকেনি। তাদের বাড়িতে মানুষ খুব কম। তবু এ বাড়িতে কি অশান্তির অভাব ? এই চুপচাপ বাড়ির ভিতরেও নিঃশব্দে ছিঁড়ে যায় কত বাঁধন, নিশুত রাতে কত চোখের জলে ভিজে যায় বালিশ, বুকের ভিতর কত তুষের আগুন জেগে থাকে ধিকিধিকি। এই গম্ভীর শান্ত বাড়ির বাইরে থেকে কি তা বোঝা যায় ?

আজ দুঃখের দিন নয়। আজ এই রোদে হাওয়ায় বসে থাকতে বন্দনার কী ভালই না লাগছে, উড়ে যাচ্ছে দিন। নীল আকাশে সাদা হাঁসের মতো ভেসে যাচ্ছে হালকা পাখায়। আনন্দে দম নিতে মাঝে মাঝে কষ্ট হচ্ছে তার। বুকের ভিতরটা ডগমগ করছে। এমন দিনে কি দুঃখের কথা ভাবতে হয়।

বাহাদুর দুধের গেলাস নিয়ে এল।

টক করে খেয়ে নাও তো খুকুমণি।

কাচের গেলাসে সাদা দুধ, ওপরে আর নীচে দুটো চিনেমাটির প্লেট—দৃশ্যটা দেখলেই বন্দনার জিব থেকে পেট অবধি বিস্বাদে ভরে যায়। দুধের চেয়ে খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আর কী আছে ? তবু রোজ খেতে হয়।

বাহাদুর তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে, নাক টিপে খেয়ে নাও। হারা দিব।

আগে দাও। বলে হাতখানা পাতে বন্দনা।

মা ওপর থেকে দেখছে কিন্তু। বলে বাহাদুর বাঁ হাতে গেলাসটা ধরে ডান হাতে গায়ের খাটো হাতাহীন মোটা কাপড়ের সবুজ জামার ঝুল-পকেট থেকে কয়েকটা ভাজা কচি হর্তুকি বের করে তার হাতে দিল।

খেজুরের বিচির মতো সরু আর ছোট এই হর্তুকি বালিতে ভেজে কৌটোয় ভরে, দেশ থেকে নিয়ে আসে বাহাদুর। খেতে যে খুব ভাল লাগে বন্দনার তা নয়। কিন্তু বিস্বাদ কিছু খাওয়ার পর হারা চিবোলে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়। মুচমুচে কষ-কষ জিনিসটার ওই একটা উপকার আছে।

কোনও কিছুই সে তাড়াতাড়ি খেতে পারে না। আস্তে খায়, অনিচ্ছের সঙ্গে খায়। বাহাদুর সামনে উবু হয়ে বসে বলল, আজও জোর মারপিট লাগবে।

কার সঙ্গে?

বাবুর সঙ্গে ল্যাংড়ার। দোকান পসার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সকালে বাজারে গিয়ে শুনে এলাম।

আজ মারপিট হবে? কেন মারপিট হবে আজ? এমন সুন্দর একটা দিনে কোনও খারাপ ঘটনা কি ঘটতে পারে? রোদে হাওয়ায় এই যে উজ্জ্বল একটা ভাল দিন এল আজ, এ কি বৃথা হয়ে যাবে?

তাদের বাড়ির পিছনের দিকে দেয়ালের ওপাশে ভীষণ নোংরা একটা গরিব পাড়া আছে। শোনা যায় তারা একসময়ে এ বাড়ির প্রজা ছিল। ঘিঞ্জি অলিগলি আর খাপরা বা টালির ঘর, দু-চারটে পাকা বাড়ি, কাঁচা নর্দমা, মাইকের আওয়াজ আর ঝগড়া—এই সব নিয়ে ওই পাড়া। ওখানেই ল্যাংড়া নামে খোঁড়া একটা ছেলে থাকে। ভীষণ গুণ্ডা। আর বাবু হল সুবিমল স্যারের দলের ছেলে। সেও গুণ্ডা, তবে লেখাপড়া জানে। সে দক্ষিণের পাড়ায় থাকে। তার বাবা পঞ্চানন সেন দুঁদে উকিল। বন্দনার বোকা দাদা প্রদীপ সুবিমল স্যার আর বাবুর পাল্লায় পড়েই পলিটিক্স করতে গিয়েছিল।

ভাজা হর্তুকি খাওয়ার পর জল খেলে জিবটা মিষ্টি মিষ্টি লাগে। কিন্তু বাহাদুরকে এখন জলের কথা বলার মানেই হয় না। বাহাদুর একটু তফাতে ঘাসের ওপর আঁট করে বসেছে।

ল্যাংড়া শালা গত সপ্তাহে দুটো পাম্প মেশিন চুরি করে এনেছে। তোলা তুলছে। কোমরে আজকাল রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

করুণ গলায় বন্দনা বলল, আজ ওসব কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না বাহাদুর। আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

মাকে বলেছি, পিছনের দেওয়ালটা সারিয়ে নিতে। ল্যাংড়া খচ্চর একদিন ঢুকে ওইখানে জামগাছের তলায় দলবল নিয়ে মদ খাচ্ছিল। তোমার তখন জ্বর।

ও মাগো! কী সাহস!

ও শালার খুব বুকের পাটা।

মদ খাচ্ছিল? তোমরা কিছু বললে না?

কে কী বলবে? আমি গিয়ে বললাম, এখানে ঢুকেছিস কেন? বলল, তাতে তোর বাবার কী রে শালা? ফোট। আমি বললাম, হীরেনবাবুকে বলে দিলে তুলে নিয়ে যাবে। তাতে তেড়ে এল। তবে আর বেশিক্ষণ বসেনি।

হীরেনকাকুকে বলেছ নাকি?

আরে না। পুলিশওলাদের তো জানো। এরও খায়, ওরও খায়। হীরেনবাবু যদি তুলেও নিয়ে যায় ল্যাংড়া একদিন বেরিয়ে আসবেই। তার আগে ওর দলবল হামলা চালাবে। আমাদের কে আছে বলো! ঝুটঝামেলা না করে দেয়ালটা গেঁথে দিলেই হয়। কত টাকারই বা মামলা?

দুধটার বিস্বাদ আর টের পাচ্ছিল না বন্দনা। তার সুন্দর দিনটা শেষ অবধি হাই হয়ে যাবে? তাদের এই স্বপ্নের বাড়ির মধ্যে কি ঢুকে পড়বে ওই বিচ্ছিরি বাইরেটা? এ বাড়ির মধ্যে তাদের একটা শান্ত, স্নিগ্ধ জগৎ। হয়তো অনেক চোরা-অন্ধকার আছে, তবু বাইরে থেকে এসে বাড়িতে ঢুকলেই একশো-দেড়শো বছরের পুরনো গন্ধ, পুরনো বাতাস, পুরনো আবহের রূপকথা যেন বুকে তুলে নেয়।

বাহাদুর একটু উদাস হয়ে সামনের দিকে চেয়েছিল। পঞ্চাশের ওপরে বয়স। বাড়ি উত্তরপ্রদেশের এক পাহাড়ি গ্রামে। বন্দনার জন্মের আগে থেকেই সে এ বাড়িতে আছে। মাঝে মাঝে দেশে যায়। তার খুব ইচ্ছে,গোরু আর মোষ কিনে দুধের ব্যবসা করে। কিন্তু তত টাকা আজও জমাতে পারেনি। তার দেশে বড় টানাটানি।

দুধটা শেষ করে গেলাসটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল বন্দনা।

তোমার দেশের গল্প করো না বাহাদুর।

এখন নয়। কাজ আছে। রাতে হবে।

গল্প কিছুই নয়। একটা পাহাড়ি গ্রাম, পাশে একটা ঝরনা বয়ে গেছে। সেখানে ছাগল চরে বেড়ায়, মকাই ধান গম হয়। গরিব লোকেরা কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকে। এই হল গল্প। তবু বন্দনা যেন গ্রামটা স্পষ্ট দেখতে পায়। পাথর গেঁথে তোলা ঘর, ওপরে টিন বা টালির ছাউনি। নিরিবিলি, নিশ্চুপ, তার মধ্যেই হয়তো একটা মোরগ ডেকে ওঠে। পাখিরা কলরব করে উড়ে যায়। ঝরনায় জল খেতে আসে ভীরু পায়ে হরিণেরা। গম পেষাইয়ের শব্দ ওঠে জাঁতায়। ফুল ফোটে। হাওয়া বয়। সন্ধের পর শীতের রাতে আগুন ঘিরে বসে গল্প করে গাঁয়ের লোকেরা। সেই গাঁয়ে কোনও বাইরের লোক যায় না। শুধু তারা থাকে তাদের নিয়েই। এই গাঁয়ের তেমন কোনও লোমহর্ষক গল্পও নেই। বাহাদুর শুধু মন্থর গলায় দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে যায়। বন্দনার কী যে ভাল লাগে!

বন্দনার খুব ইচ্ছে করে একটা পাহাড়ি গাঁয়ে গিয়ে থাকে। বন্দনা তেমন কোথাও যায়নি কখনও। পাহাড়ে খুব কম। একবার দার্জিলিং গিয়েছিল। তখন থেকে পাহাড়ের কথা তার খুব মনে হয়।

বাবা একটু ঘরকুনো মানুষ ছিল বলে তাদের কোথাও তেমন বেড়াতে যাওয়া হয়নি। শুধু ঘরকুনো নয়, ভীষণ ভিতুও। বাবা মেঘনাদ চৌধুরির নামটা যেমন বীরত্বব্যঞ্জক, স্বভাবটা ঠিক তার উল্টো। তবে বাবা একজন কবির মতো মানুষ। দুখানি মায়াবী চোখ দিয়ে অবিরল বিশ্রী পৃথিবীর ওপর নানা কল্পনার ছবি এঁকে যেত। বন্দনা ছিল বাবার প্রাণ। পৃথিবীতে এত ভালবাসা কি আর হয়? বন্দনা বাবাকে কত ভালবাসত?

বাবা জিজ্ঞেস করলে বন্দনা বলত, আকাশের মতো।

বাবার সঙ্গে খাওয়া, বাবার বুক ঘেঁসে শোওয়া, বাবার সঙ্গে সর্বক্ষণ। গায়ের গন্ধটা অবধি কী মিষ্টিই না লাগত! কত কী ভুলে যেত বাবা! গায়ে উল্টো গেঞ্জি, দু পায়ে দুরকম চটি, নুন আনতে বললে চিনি আনা। বাবার ভুলের গল্পের শেষ নেই! একজন কবির মতো মানুষ। অন্যমনস্ক, মাথায় চিন্তা এবং দুশ্চিন্তার বাসা, মুখে সবসময়ে একটা অপ্রস্তুত হাসি। বাবার ফুলের বাগানের শখ ছিল, আর গানের। কোনওটাই বাবা নিজে পারত না। কিন্তু বাবার সময়ে পিছনের বিস্তৃত বাগানে হাজারো রকমের ফুলের চাষ হত, আর মাঝে মাঝে গায়ক গায়িকাকে ডেকে এনে ছোট্ট গানের আসর বসাত। বেশির ভাগই রবীন্দ্রসঙ্গীত।

বাবার কোলের কাছটিতে বসে মুগ্ধ হয়ে গান শুনতে শুনতেই একদিন তার ভিতরকার ঘুমন্ত সুর গুনগুন করে জেগে উঠেছিল।

আগের দিন সন্ধেবেলা বাবুপাড়ার মণিকাদি গান গেয়ে গেছেন, একটা গান কিছুতেই ছাড়ছিল না বন্দনাকে। রাতে ঘুমের মধ্যেও গানটা হয়েছিল তার বুকের মধ্যে। গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা সবচেয়ে ভাল লাগত, চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি, আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি....

পরদিন সকালে ইস্কুলে যাওয়ার আগে স্নান করবে বলে মাথায় তেল ঘসতে ঘসতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গাইছিল বন্দনা।

বাবা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, মাগো, তোমার গলায় যে সরস্বতী ভর করে আছেন!

সেদিনই মণিকাদির কাছে নিয়ে গেল বাবা, মণিকা, তুমি ওকে শেখাও। মাত্র আট বছর বয়স, পারবে।

বন্দনা পেরেছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে স্কুলের ফাংশনের বাঁধা গায়িকা। নানা ছোটখাটো অনুষ্ঠানে ডাক আসতে লাগল। বাবা নিয়ে যেতে লাগল নানা জায়গায়। রেডিওর শিশুমহলে গেয়ে এল একবার।

সেই থেকে গানে গানে ভরে উঠতে লাগল জীবন। গানের হ্যাপাও ছিল কম নয়। তেরো বছর বয়সেই বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল মধুবাবুর বাড়ি থেকে। ছেলে ডাক্তারি পড়ে। প্রেমপত্র আসতে লাগল অনেক। রাস্তায়-ঘাটে ছেলেদের চোখ তাকে গিলে খেতে লাগল। সে এমন কিছু সুন্দরী নয়, তবুও। সে এদের কারও প্রেমে পড়েনি কখনও। কিন্তু কেন যে একজনের কথা ভাবলেই আজও তার ভিতরটা আলো হয়ে যায়। অথচ সে তো গরিব এক পুরুতের ছেলে। তার বেশি কিছু নয়। শিশুকালে সে একবার পুতুলের বিয়ের নেমন্তন্নে ডেকে অতীশকে বলেছিল, তোমার সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হবে, না অতীশদা ?

অতীশ জিভ কেটে বলেছিল, তাই হয় খুকি ? তোমরা আমাদের অন্নদাতা। মনিব।

প্রেমপত্র পেলেই ছুটে এসে চিঠিটা বাবাকে দিত বন্দনা, দেখ বাবা কী সব লিখেছে !

দু-একটা চিঠিতে অসভ্য কথা থাকত বটে, কিন্তু বেশির ভাগই ছিল আবেগের কথায় ভরা। আবেগের চোটে বানানের ঠিক থাকত না, বাক্যেও নানা গণ্ডগোল থেকে যেত। বাবা আবার সেগুলো লাল কালিতে কারেকশন করে নিজের কাছে রেখে দিত।

সবচেয়ে ভাল চিঠিটা লিখেছিল বিকু। তাতে ইংরিজিতে একটা কথা লেখা ছিল, লাভার্স অ্যাট ফার্স্ট সাইট, ইন লাভ ফরএভার। পরে বন্দনা জানতে পেরেছে ওটা ফ্রাঙ্ক সিনাট্রার একটা বিখ্যাত গানের লাইন।

এইসব চিঠিপত্র নিয়ে বাবার সঙ্গে তার আলোচনা এবং হাসাহাসি হত। বাবা বলত আমার তিনটে স্টাম্প। তিনটেকেই গার্ড দিয়ে খেলতে হয়। তুই হচ্ছিস আমার মিডল স্টাম্প। সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট।

মিডল স্টাম্পই বটে। দাদা আর ভাইয়ের মাঝখানে সে। তার ওপর সে আবার মেয়ে। বাবার চোখের মণি। বুকের ধন।

সন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়া ছিল তার দোষ। ছিল কেন, আজও আছে। কেউ তুলতে পারত না খাওয়ার সময়ে। বাবা এসে তুলত, বুকের ধন, বুকের ধন, ওঠো।

ঘুমচোখে তুলে বাবা নিজের হাতে গরাস মেখে খাইয়ে দিত। বাবার হাতে ছিল মায়া। সেই হাতের গরাসটা অবধি স্বাদে ভরে থাকত।

কোম্পানির কাগজ, শেয়ার আর ডিভিডেন্ড এসব কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে বন্দনা। আসলে এই তিনটে শব্দ থেকেই তাদের ভাতকাপড়ের জোগাড় হত। মেঘনাদ চৌধুরীর কোম্পানির কাগজ ছিল। অর্থাৎ শেয়ার। আর ফাটকা খেলার নেশাও ছিল। চাকরি করেনি কখনও। আজও তাদের চলে ওই কোম্পানির কাগজে। অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে আরও। আরও।

বিজু একবার বলেছিল, তোদের বাড়ির দেওয়ালগুলো অত মোটা মোটা কেন বল তো ? শুনেছি রাজা জমিদারেরা আগের দিনে শত্রুদের মেরে দেওয়ালে গেঁথে ফেলত। তাই নাকি ?

বন্দনা খুব হেসেছিল।

ফচকে মেয়ে বিজু বলল, যদি তা না হয় তবে নিশ্চয়ই দেওয়ালের ভিতরে গুপ্তধন আছে।

আহা ! তা যদি হত ! দেওয়াল ভাঙলেই যদি ঝরঝর করে ঝরে পড়ত মোহর !

মায়ের কাছে আজকাল কিছু চায় না বন্দনা। চাইলেই মায়ের মুখখানা শুকিয়ে যায়। বন্দনা চায় না, কিন্তু বিলু চায়। ফুটবল খেলার বুট, সাইকেল, এয়ারগান, দামি কলম, প্যান্ট বা শার্ট। বিলু তো মায়ের মুখ লক্ষ করে না। তার তত সময় নেই। সে হুট করে আসে, হুট করে বেরিয়ে যায়। এখন বাইরের জগৎ তাকে অনেক বেশি টানে।

দাদাকেও টেনেছিল। প্রদীপ একটু বোকা ছিল। আর খুব গোঁয়ার। পঞ্চানন সেনের ছেলে বাবু ছিল ওর খুব কাছের লোক। পঞ্চানন সেনের মেলা টাকা আর মেলা ছেলেপুলে। বাবু বোধহয় তাঁর সাত নম্বর সন্তান। বেশ ভদ্র চেহারা, কথাবার্তায় প্রবল আত্মবিশ্বাস, কিন্তু অহঙ্কার নেই। বাবু

মানুষের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে রুদ্রমূর্তি ধরে তাণ্ডব লাগিয়ে দিতে পারে। বাবু ছিল প্রদীপের হিরো। ছেলেবেলা থেকে সে বাবুর সাগরেদি করে এসেছে।

বাবুর হিরো হলেন সুবিমল স্যার। তাঁর কথায় গোটা এলাকা ওঠে বসে। সুবিমল স্যার একেবারে সাধুসন্নিসির মতো মানুষ। তাঁর ধ্যানজ্ঞান হল পার্টি। বিয়ে করেননি, পৈতৃক বাড়ির বাইরের দিককার একখানা ছোট্ট ঘরে ছোট্ট একটা তক্তপোশে দিনরাত বসে থাকেন। সামনে বিড়ির বান্ডিল, দেশলাই আর ছাই বা বিড়ির টুকরো ফেলার জন্য মাটির ভাঁড়। গাদা গাদা কাগজপত্র চারদিকে ছড়ানো। ঘরে সর্বদাই পার্টির ছেলে ছোকরাদের ভিড়। ঘড়ি ঘড়ি চা আসে সেখানে। দু বেলা দু মুঠো খাওয়া ছাড়া ভিতর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। অথচ ভিতর বাড়িতে ভরভরন্ত সংসার। দুই ভাই, ভাইয়ের বউ এবং ছেলেমেয়েরা, সুবিমল স্যারের মা এখনও বেঁচে! সুবিমল স্যারও হিরো, তবে অন্য ধরনের। তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সরল জীবন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—এরও কি ভক্ত নেই? সুবিমল স্যারের অনেক ভক্ত। তিনি কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর। ক্লাস খুব কমই নেন। সবাই সমীহ করে চলে।

প্রদীপ বাবুর সঙ্গে সেখানে গিয়ে জুটল। যারা নেতা হতে পারে না তারা নেতাদের খিদমদগার হয়। প্রদীপ ছিল তাই। বোকা ছিল বলে তার পড়াশুনোয় উন্নতি হয়নি। রাজনীতিতেও নয়। সে পার্টির আদর্শ ভাল করে বুঝতও না। সে শুধু ছিল বাবু আর সুবিমল স্যারের অন্ধ ভক্ত। ও বাড়িতেই পড়ে থাকত বেশির ভাগ সময়। চা এনে দিত, পোস্টার লিখত, ইস্তাহার বিলি করত আর বিপ্লব-বিপ্লব করে মাথা গরম করত। ইলেকশন ক্যাম্পেনের সময় প্রদীপ রাত জেগে দেওয়ালে লিখছিল। নির্দোষ কাজ। মাঝরাতে বিপক্ষের ছেলেরা এসে দেওয়ালের দখল নিয়ে ঝগড়া বাধায়। তারপর হাতাহাতি মারপিট। তার জের চলল দু-তিন দিন ধরে। দ্বিতীয় দিন রাতে সুবিমল স্যারের বাড়ি থেকে গভীর রাতে ফেরার সময় রথতলার মোড়ে তাদের বিপক্ষের দল ঘিরে ফেলল। গোলমালে অন্যগুলো পালাল, বোকা প্রদীপ পারল না। বুকে ছোরা খেয়ে মরে গেল। না, একজন পালায়নি। সে হল অতীশ। প্রদীপকে বাঁচাতে পারেনি বটে, কিন্তু ছিল।

মৃত্যু যে এত সহজ তা জানাই ছিল না বন্দনার। এই জানল। পরদিন ওই জায়গাটায় শহিদ বেদি তৈরি হল। লেখা হল কমরেড প্রদীপ চৌধুরি অমর রহে। পার্টির ছেলেরা এসে বাবাকে কত সান্ত্বনা দিল।

বাবার অফস্টাম্প উপড়ে গেল সেদিন। কবির মতো মানুষটির টানা টানা মায়াবী দুখানি চোখে পৃথিবীর সব স্বপ্নের রং মুছে গেল। এ যে কঠোর বাস্তব। এ যে রক্তে রাঙা ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নিজের সন্তান। দিশেহারা বাবা কেবল ছোটাছুটি করতে লাগল। ঘরে, বারান্দায়, রাস্তায়, এর ওর তার বাড়ি। একবার বন্দুক নিয়েও বেরিয়ে পড়েছিল। মা কয়েকদিনের জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বন্দনা আর বিলু এত ভয় আর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল যে, তারা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল।

শহিদ বেদিটা আর নেই। ইট আর সিমেন্টের কাঁচা বেদি কবেই লোপাট হয়ে গেছে। প্রদীপ নেই, মানুষের মনে তার স্মৃতিও নেই। শুধু এ বাড়িতে কয়েকজন মানুষের কাছে প্রদীপ আজও বেঁচে আছে স্মৃতি হয়ে।

মাকে প্রথম দুঃখটা দিয়ে গেল দাদা। এ বাড়িতে বন্দনার জন্মের পর প্রথম শোক। তার আশ্চর্য অভিঘাত এবং প্রতিক্রিয়া যেন ঝনঝন করে বাজত তাদের অস্তিত্বে।

প্রদীপের মৃত্যুর পর হীরেনবাবুর যাতায়াত শুরু হয়। এনকোয়ারি। এনকোয়ারির পর এনকোয়ারি। বুলু নামে একটা ছেলে প্রদীপকে মেরেছিল। সে ফেরার হয়ে যায়। মাঝখানে শুধু জেরার জবাব দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেল তারা। বুলু ধরা পড়ল না। লোকে বলত, পুলিশ ওকে ধরবেই না। সাঁট আছে।

বুলু ছেলেটা যে কে তা আজও জানে না বন্দনা। শুনেছে, সে একটা বস্তিবাসী ছেলে। মস্তান। তার বাপের একটা তেলেভাজার দোকান আছে বাজারে। আসলে সেখানে দেশি মদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য চাট তৈরি হয়। শুধু বাহাদুর মদ খায় বলে দোকানটা চেনে।

হীরেনবাবু বাপটাকে অ্যারেস্ট করেছিল। পরে ছেড়ে দেয়। তার তো কোনও দোষ ছিল না।

মাকে দ্বিতীয় দুঃখটা দিল বাবা। প্রদীপের মৃত্যুর দুবছর বাদে যখন শোকটা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, যখন বাবার চোখে মায়াবী দৃষ্টিটা ফের ফিরে এসেছে এবং মা যখন সংসারের কাজে মন দিয়েছে ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। পৃথিবীতে কতই না আশ্চর্য ঘটনা ঘটে!

রমা মাসি তার মায়ের আপন পিসতুতো বোন। অন্তত পনেরো ষোলো বছরের ছোট। দেখতে ভারী মিষ্টি। ডান চোখের নীচে একটা জরুল থাকায় মুখখানা যেন আরও সুন্দর দেখাত। রংটা চাপা ছিল বটে, কিন্তু রমাকে কেন যেন ওই রংই মানাত।

বিশু কবিরাজ হাঁপানির ওষুধ দেয়। খুব নাম। রমা মাসির হাঁপানি সারাতে মধ্যপ্রদেশ থেকে তার মা তাকে পাঠিয়েছিল এখানে। সেই সূত্রে রমা এ বাড়িতে দু মাস ছিল।

কবে কী হয়েছিল কে বলবে? এই প্রকাণ্ড বাড়ির আনাচে কানাচে কবে যে বাবার সঙ্গে রমা মাসির হৃদয় বিনিময় হল! বন্দনা অন্তত জানে না।

দুজনে অবশ্য ঠাট্টা-ইয়ার্কি হত খুব। খাওয়ার টেবিলে, বাগানে। মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া হত সবাই একসঙ্গে। যেমন সব হয়।

একদিন গভীর রাতে ঘুমচোখে বন্দনা শুনেছিল মা আর বাবাতে কথা হচ্ছে।

মা বলল, কথাটার জবাব দেবে? না কি?

একথার কি জবাব হয়?

তার মানে মনে পাপ আছে।

পাপের কথা বলছ কেন? তোমার মনেই পাপ আছে।

আমি কি ভুল দেখেছি?

ভুল ছাড়া কী? তোমাকে সন্দেহ বাইতে ধরেছে।

সন্দেহ?

সন্দেহ ছাড়া কী?

আমার চোখে তো ছানি পড়েনি! তুমি অন্ধকারে বারান্দায় ওর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলে। খুব ঘেঁসে। তখন আমার নীচের তলায় রান্নাঘরে থাকার কথা। বন্দনা মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছিল। বিলু ফেরেনি। ঠিক বলছি?

একবার তো বললে! শুনেছি।

তুমি তো ভাবনি যে, আমি এসে পড়ব!

এলে তো কী হল? আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, হাওয়া খাচ্ছিলাম। ও এসে পাশে দাঁড়াল। গল্প করছিলাম।

তা বলে অত ঘেঁসে?

তাতে কী? অন্ধকারে যত ঘেঁসে মনে হয়েছে ততটা নয়। তফাত ছিল। তুমি কি আমাকে চরিত্রহীন মনে করো?

আগে তো কখনও করিনি।

মেয়েদের ওইটেই দোষ। স্বামীদের অকারণে সন্দেহ করে। বাবা একটু হাসবার চেষ্টা করেছিল এসময়ে। হাসিটা ফোটেনি।

মা একটু চুপ করে থেকে বলল, ওকে আমি চিনি, ঢলানি মেয়ে। পুরুষ-চাটা। তা বলে তুমি তো আর সস্তা নও। হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। তুমি কালই ওর ফেরত যাওয়ার টিকিট কিনে এনো। ওকে আর এখানে রাখব না।

তাই হবে।

সারা রাত বারবার ঘুম চটে গেল বন্দনার। বুকের মধ্যে একটা ভয়-ভয়, একটা ব্যথা, একটা অস্বস্তি। বাবা আর মায়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি খুব কম হয়। মা শান্ত ও সংসারমুখী মানুষ, বাবা উদাসীন ও অন্যমনস্ক। মা যদিও বা কখনও কখনও ঝগড়া করে বাবা একদমই নয়। ফলে ঝগড়া হয় না, একতরফা হয়ে যায়।

সেই রাতে মা বাবার ওইসব কথাবার্তার পর কেউই এসে আর প্রকাণ্ড পালঙ্কের বিছানায় শুল না! মা আর বাবার মাঝখানে শোয় বন্দনা, বাবার দিকে একটু বেশি ঘেঁসে। সেই রাতে বাকি রাতটুকু একাই শুয়ে থাকল সে। একা লাগছিল, ফাঁকা লাগছিল, কান্না পাচ্ছিল। রমা মাসিকে মনে হচ্ছিল, রাক্ষুসি। কেন এল এ-বাড়িতে? না এলেই তো ভাল ছিল!

অথচ আশ্চর্য এই, সেই রাতের আগে অবধি রমা মাসির মতো এমন চমৎকার বন্ধু আর পায়নি বন্দনা। গল্পে, গানে, খুনসুটি আর হাসিতে তাদের দুজনের চমৎকার সময় কাটত। সকালে উঠেই সে গিয়ে পুবের ঘরে রমা মাসির বিছানায় ঢুকে যেত। ভোরবেলা শুয়ে শুয়েই কত গল্প হত। স্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা দুজনে সব সময় লেগে লেগে থাকত।

রমা মাসির বুকের ভিতরে একটা সাঁই সাঁই শব্দ হত প্রায় সবসময়। কখনও মৃদু, কখনও জোরালো। গ্রীষ্মকালেও গলায় কম্ফর্টার। ঠাণ্ডা জল ছুঁতেই পারত না। পায়ে বারো মাস মোজা। মুখখানায় একটা করুণ ভাব থাকত সবসময়ে।

বিশু কবিরাজ চিকিৎসা শুরু করার পর রমা মাসির হাঁপের রোগ অনেকটা কমে গিয়েছিল। চেহারার উন্নতি হয়েছিল অনেক। রমা মাসির গানের গলাখানা ছিল চমৎকার। কিন্তু হাঁপানির জন্য গাইতে পারত না। টান কমে যাওয়ার পর এক একদিন গাইত। কী সুরেলা গলা

মা আর বাবাতে যে রাতে ওইসব কথা হল তার পর দিন সকালে বন্দনা রোজকার মতো মাসির কাছে গেল না। তার চোখে সেই সকালে ছিল অন্ধকার। মটকা মেরে অনেকক্ষণ পড়ে রইল বিছানায়। বেশ বেলা অবধি। কেউ তাকে ডাকতে এল না।

আটটার সময় এল রমা মাসি।

ওমা! তুই এখনও শুয়ে আছিস? কেন রে? শরীর খারাপ নাকি?

রমার করুণ মুখের দিকে চেয়ে সে কিছুতেই ভাবতে পারল না যে, এ একটা রাক্ষুসি। রমা মাসির অসহায় মুখখানা দেখলেই এমন মায়া হয়!

রমা মাসি তার পাশটিতে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ওঠ। অনেক বেলা হয়েছে।

মাসি, তুমি কবে ফিরে যাবে?

রমা একটু চুপ করে থেকে বলল, এবার যাব। অনেকটা তো ভাল হয়ে গেছি। কেন বল তো! আমি গেলে তোর মন খারাপ লাগবে, না?

হ্যাঁ মাসি। তবে তোমারও তো মা-বাবার জন্য মন কেমন করে, তাই না?

মাসি আবার একটু চুপ করে থেকে বলে, করে।

আমি তো মা-বাবা ছাড়া থাকতেই পারি না।

রমা মাসি করুণ একটু হেসে বলল, সবাই কি তোদের মতো সুখী? আমাদের কিন্তু তোদের মতো এত ভাব-ভালবাসা নেই।

ওমা! কেন মাসি?

আমরা পাঁচ বোন, পাঁচটা গলগ্রহ। আমাদের আদর করবে কে?

যাঃ, কী যে বলো।

ঠিকই বলি। আমরা পাঁচ বোন কী করে হলাম জানিস? বাবা ছেলে-ছেলে করে পাগল, প্রত্যেকবার ছেলে চায় আর আমরা একটা একটা করে মেয়ে জন্মাতে থাকি। আমরা হলাম বাবার পাঁচটা হতাশা।

সেই সকালে রমা মাসিকে মন থেকে অপছন্দ করার চেষ্টা করেছিল বন্দনা, কিন্তু ঘেন্নাটা আসতে চাইছিল না।

রমা মাসি তদগত হয়ে জানালার বাইরের দিকে চেয়ে ছলছল চোখ করে বলল, তোদের বাড়িতে কী ভাল আছি বল তো। আমাদের বাড়িতে তো এত আদর নেই। বাবার সামান্য চাকরি। ছোট বাসা। আমরা পাঁচ-পাঁচটা বোন বেড়ে উঠছি। না রে, তোদের মতো আমরা নই। আমাদের মধ্যে ভালবাসা খুব কম। আমার তো একটুও ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।

ব্যগ্র হয়ে বন্দনা বলল, না না মাসি, ওরকম বোলো না। তুমি ফিরে যাও।

রমা হেসে ফেলল। বলল, তাড়াতে চাস নাকি ?

না মাসি, মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে নেই। ওঁদেরও নিশ্চয়ই তোমাকে ছেড়ে কষ্ট হচ্ছে!

কে জানে ? কষ্ট কেন হবে ? কষ্টের কী আছে ?

নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছ না।

রমা তবু মাথা নেড়ে বলল, আমাদের সংসার যদি দেখতিস তা হলে ওকথা বলতিস না। আমরা পাঁচটা বোন ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছি। আদর কে করবে বল ! মা রোগা-ভোগা মানুষ, বাবা তো উদয়াস্ত ব্যস্ত। তার ওপর প্রায় রাত্রেই দেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফেরে। কী সব অসভ্য গালাগাল করে মাকে। আগে মারধরও করত। আমরাও বাবার হাতে অনেক মার খেয়েছি। এখন মারে না, কিন্তু গালাগাল করে। তুই যেমন সুন্দর বাড়িতে, সুন্দর সংসারে বড় হচ্ছিস, আমাদের ঠিক তার উল্টো।

তোমার বাবা মদ খায় ?

খায়। দুঃখেই খায় হয়তো। অভাব-কষ্টে মাথাটা ঠিক রাখতে পারে না। পাঁচটা মেয়ে এখন গলার কাঁটা। মদ খেলে সেই চাপা দুঃখ আর রাগ বেরিয়ে আসে।

তোমার তো তা হলে খুব কষ্ট মাসি।

সে কষ্টের কথা তুই ভাবতেও পারবি না। আমার একটুও ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না।

তোমাদের পাঁচ বোনে ভাব নেই ?

আছে। আমরা তো সমান দুঃখী, তাই আছে একটু, ঝগড়াও হয় মাঝে মাঝে।

রমার জন্য কষ্ট হওয়ার চেয়ে বন্দনার দুশ্চিন্তাই হয়েছিল বেশি। মাসি যে ফিরে যেতে চাইছে না। যদি ফিরে না যায় তা হলে তো এ বাড়িতে আরও অশান্তি দেখা দেবে।

দুদিন বাদে ফের গভীর রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে বাবার স্পর্শ না পেয়ে জেগে গেল বন্দনা। তখন শুনল বারান্দায় মায়ে আর বাবায় কথা হচ্ছে।

মা বলল, তুমি মাঝরাতে উঠে কোথায় যাচ্ছিলে ?

বাবা অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিলাম মানে ? ঘরে গরম লাগছে, ঘুম আসছে না। তাই একটু বারান্দায় এসেছি।

গরম লাগলে তো পাখা খুলে দেওয়া যায়, জানালা ফাঁক করে দেওয়া যায়, উঠে বারান্দায় আসার দরকার ছিল কি ?

বন্দনার বাবা একজন কবির মতো মানুষ। উদাসীন, আনমনা। বাবা কখনও গুছিয়ে বলতে পারে না। সামান্য কারণেই ভীষণ ঘাবড়ে যায়। মায়ের কঠিন শীতল গলায় ওই প্রশ্নের জবাবে বাবা তোতলাতে লাগল, আমি তো একটু খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম, কী দোষ হল তাতে ?

খোলা হাওয়ায় দাঁড়ানো না কী সে তুমিই জানো। কোনও দিন তো তোমাকে মাঝরাতে উঠতে দেখি না। গরম তো আগেও পড়ত। আজকাল হঠাৎ মুক্তবায়ুর দরকার বাড়ছে কেন ?

তুমি কি কিছু একটা বলতে চাইছ ?

চাইছি। তোমার মতলবটা কী ?

আমার কোনও মতলব নেই। তুমি আমাকে এত অপমান কোরো না। আমার মরতে ইচ্ছে করছে।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পুরুষমানুষকে যে বিশ্বাস করে সে বোকা, আমি ও পাপ বিদেয় করতে চাই। তুমি রমার টিকিট কেটেছ ?

বাবা স্তিমিত গলায় বলল, শুধু টিকিট কাটলেই কি হয় ? সঙ্গে কে যাবে ? মধ্যপ্রদেশ অবধি একটা বয়সের মেয়ে কি একা যেতে পারে ? আগে চলনদার ঠিক করতে হবে।

মা একটু চুপ করে থেকে বলে, বাহাদুর দেশে যেতে চাইছে। ও সঙ্গে যাক। রমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে দেশে চলে যাবে।

ঠিক আছে। বাহাদুরকে বলে রাজি করাও, আমি টিকিটের জোগাড় দেখছি।

কাল থেকে তুমি বন্দনাকে নিয়ে এ ঘরে থাকবে। আমি রাতে রমার ঘরে শোব। ও ঘরে একটা

বাড়তি চৌকি আছে।

বাবা অসহায় গলায় বলল, তোমার যা খুশি করো। সামান্য বারান্দায় আসা নিয়ে যে এত কথা উঠতে পারে জানা ছিল না।

বারান্দায় আসা নিয়ে কথা উঠছে না। বারান্দার ওই কোণে একজন ঢলানি থাকেন। ভাবছি, দুজনে ইশারা ইঙ্গিত হয়ে ছিল কি না।

বাবা শুধু অনুতাপ ভরা গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ!

ছিঃ ছিঃ তো আমার বলার কথা।

তুমি বলতে পারছ এসব কথা? তোমার মন সায় দিচ্ছে?

নইলে বলছি কী করে?

এতকাল আমার সঙ্গে ঘর করার পর আমাকে তুমি এই চিনলে?

ঘটনা ঘটলে তবে তো মানুষকে চেনা যায়! তোমাকে নতুন করে এই তো চিনছি। নিজের ওপর তোমার কোনও কন্ট্রোল নেই। তোমাকে ভূতে পেয়েছে।

আর বোলো না, আমার বড্ড গ্লানি হচ্ছে।

বাবা কি কেঁদে ফেলল? গলাটা কেঁপে হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। তার বাবা একজন কবির মতো মানুষ। বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, দুর্বলচিত্ত, ব্যক্তিত্বহীন।

বড্ড কষ্ট হয়েছিল বন্দনার। উঠে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, তুমি কেঁদো না বাবা, তুমি কাঁদলে আমারও যে কান্না পায়।

তারপর মা আর বাবা এসে তার দু পাশে শুয়ে পড়ল। যেন দুটি ঠাণ্ডা পাথর তার দু দিকে। সে যে জেগে আছে তা বুঝতে না দেওয়ার জন্য মড়ার মতো পড়ে রইল বন্দনা। জলতেষ্টা পেয়েছিল, বাথরুম পেয়েছিল, কিন্তু সব চেপে রাখল সে।

পর দিন সকালটা খুব মনে আছে বন্দনার, একটা থমথমে গম্ভীর সকাল। বাবা ঘুম থেকে উঠেই কী একটা ছুতোয় বেরিয়ে গেছে। একটু বেলায় মা একতলার রান্নাঘর থেকে দোতলায় উঠে এল। তখন সামনের বারান্দায় একা চুপ করে বসে ছিল রমা। পাশেই পড়ার ঘরে বন্দনা। বই খুলে খারাপ মন নিয়ে বসে আছে। পড়বার ভান করছে, পড়ছে না। বিলুর সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে যায় বলে বিলুর পড়ার ঘর একতলায়। দোতলাটা সুতরাং নিরিবিলি।

মা বারান্দায় গিয়ে পিছন থেকে বলল, রমা, তুই সব গোছগাছ করে রাখিস। দু একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবি।

রমা মাসি যেন চমকে উঠে পিছন ফিরে চেয়ে দিদিকে দেখল। মুখখানা ছাইরঙা হয়ে গেল যেন। অবাক গলায় বলল, ফিরে যাব?

ফিরে যাবি না তো কী? এখানে কি পাকাপাকিভাবে থাকতে এসেছিস?

মায়ের গলার চড়া আওয়াজ শুনে রমা আরও একটু অবাক হল। বলল, তা তো বলিনি রেণুদি। ফিরে যাওয়ার কথা আগে বলোনি তো, হঠাৎ বললে বলে বললাম।

হঠাৎ আবার কী? দু মাস তো হয়ে গেছে। রোগও সেরেছে। এখন এখানে বসে থাকার মানেই হয় না। যা, সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নে। তোর জামাইবাবু টিকিট কাটবার ব্যবস্থা করছে।

কার সঙ্গে যাব?

বাহাদুর তোকে পৌঁছে দিয়ে দেশে যাবে।

বাহাদুর! বলে চুপ করে রইল রমা।

বাহাদুর পুরনো বিশ্বাসী লোক। তার ওপর ভরসা করা যায়

আমি থাকলাম বলে তোমাদের বুঝি অসুবিধে হল রেণুদি?

তা সুবিধে-অসুবিধে তো আছেই।

রমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সাদা-হয়ে-যাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল। বলল, কাল রাতে আমার খুব জ্বর এসেছে রেণুদি। আমার শরীরটা আজ একটুও ভাল নেই তুমি আজই যেতে বলছ না তো!

কত জ্বর তোর ?

মাপিনি। তবে কাঁপুনি দিয়ে মাঝরাতে জ্বর এল। অনেক জ্বর।

ঠিক আছে। ডাক্তার এসে দেখুক।

ডাক্তার লাগবে না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়। আমার তো পচা শরীর, ঠাণ্ডা লাগলেই বিছানা নিতে হয়। একটু শুয়ে থাকলেই হবে। তুমি ভেবো না, আমি ঠিক গুছিয়ে নেব।

মা গম্ভীর মুখ করে বলল, না, ডাক্তার আসবে। তুই ঘরে যা। আমি ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি।

এ বাড়ির পুরনো ডাক্তার সলিল দাশগুপ্ত এলেন। রুগি দেখে বললেন, টেম্পারেচার তো নেই দেখছি। শরীরটা একটু উইক। টনসিল আছে নাকি ?

রমা মাসি করুণ গলায় বলল, জ্বর কিন্তু এসেছিল ডাক্তারবাবু। বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে করে বলছি না।

দাশগুপ্ত হেসে বললেন, অবিশ্বাস করছে কে ? জ্বর আসতেই পারে। তবে এখন নেই।

মা কঠিন গলায় বলল, জ্বর নানারকম আছে। সব কি আর ধরা যায় !

রমা করুণ গলায় বার বার বলতে লাগল, না রেণুদি, বিশ্বাস করো, আমার সত্যিই জ্বর এসেছিল। অনেক জ্বর।

মা কঠিন গলায় বলল, ঠিক আছে। ওষুধ খাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে চলে গেলেন। মা ফিরে গেল রান্নাঘরে। বন্দনা পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরের পাশেই রমা মাসির ঘর। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ। পড়ার ঘর থেকে বন্দনা শুনতে পাচ্ছিল, রমা মাসি খুব কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, হেঁচকি তুলে।

বাড়িটা বড্ড থমথমে হয়ে গেল।

দুপুরে উদভ্রান্ত চেহারায় বাবা ফিরতেই মা বলল, কোথায় গিয়েছিলে ?

কাজ ছিল।

কী কাজ ?

ছিল।

রমার টিকিটের কী হল ?

ব্যবস্থা করে এসেছি।

কবেকার টিকিট ? কাকে কাটতে দিয়েছ ?

কেদারকে।

কেদার দত্ত নামে বাবার এক বন্ধু আছে রেলে কাজ করে। তাদের টিকিট সে-ই কেটে দেয়।

মা জিজ্ঞেস করল, কবেকার টিকিট ?

যবেকার পায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মা আর কিছু বলল না। কিন্তু বাড়িটা থমথম করতে লাগল। স্কুল থেকে ফিরে বন্দনা দেখল, নিজের ঘরে শুয়ে আছে রমা মাসি। সারা দিন খায়নি। তার বাবা কোথায় ফের বেরিয়ে গেছে। বন্দনার বন্ধুর সংখ্যা বরাবরই কম। এ বাড়ির নানারকম বিধিনিষেধ থাকায় সে যখন-তখন বেরোতেও পারে না। তার একমাত্র স্বাধীনতা বাগান আর ছাদ। সেদিন সে একটু ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে ছাদে উঠে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, পড়ন্ত শীতের শেষবেলায় পশ্চিম দিগন্তের আশ্চর্য বিষণ্ণ সূর্যাস্ত। মাথার ওপর মস্ত আকাশ জুড়ে নেমে আসছে আগ্রাসী অন্ধকার।

কী হয়েছে তা সে ভাল জানত না তখনও। নিষিদ্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট হয়নি। শুধু বুঝতে পারছে রমা মাসি আর বাবাকে নিয়ে একটা কিছু ঘুলিয়ে পাকিয়ে উঠছে। কী হবে এখন ? ভেবে একা একা কাঁদল বন্দনা। বাবাও সারা দিন খায়নি। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাবা ফিরল সন্ধে পার করে। গলা অবধি মদ খেয়ে এসেছে। চুর মাতাল। কোনও দিন জ্ঞানবয়সে বাবাকে মদ খেতে দেখেনি বন্দনা। কী যে হয়েছিল সেদিন ! মনে কষ্ট হলে কি মানুষ মদ খায় ?

তবে তার বাবা চেঁচামেচি করেনি, অসংলগ্ন কথাও বলেনি। টলতে টলতে এল, উঠোনেই

তিনবার পড়ে গেল দড়াম দড়াম করে। সিঁড়ি বেয়ে উঠল হামাগুড়ি দিয়ে। তাতেও পড়ে গেল। পরে বাহাদুর আর মদনকাকা এসে ধরে তুলে বড় খাটে শুইয়ে দিল বাবাকে। তারপর বিছানা আর মেঝে ভাসিয়ে বমি করল বাবা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোনোর আগে ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় শুধু একবার বলল, যদি গলায় দড়ি দেয় তা হলে কী হবে ? সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে না হাজতে ?

সেদিন তাকে বাবার কাছে শুতে দেয়নি মা। সে আর মা শুল বিলুর ঘরে। আলাদা খাটে বিলু। সে আর মা একসঙ্গে।

বন্দনার ঘুম আসছিল না ভাল করে। বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছে ঘুম। তার মধ্যেই টের পেল, মা বার বার উঠে বারান্দায় যাচ্ছে। রমা মাসির ঘর থেকে গোঙানির মতো শব্দ আসছিল মাঝে মাঝে। মা বোধহয় কেন গোঙাচ্ছে দেখতে যাচ্ছিল। কিংবা বাবা ও ঘরে যায় কি না।

পরদিন সকালে বিলু তাকে বলল, এ বাড়িতে কী সব হচ্ছে রে দিদি ?

বিলু কিছু জানে না। তার তো বাইরের জগৎ নিয়েই বেশি কাটে। বন্দনা গম্ভীর হয়ে বলে, কী আবার হবে ? কিছু হয়নি।

বাবা নাকি কাল মদ খেয়ে এসেছে ?

তোকে কে বলল ?

আমি নীচের তলায় মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছিলাম তো, নিজের চোখে দেখেছি। কী হচ্ছে রে ? ফুলুদি যেন কী সব বলছিল। রমা মাসিকে নিয়ে নাকি কী সব গোলমাল হয়েছে।

ফুলুদি এ বাড়ির কাজের মেয়ে। ঠিকে। সেও পুরনো লোক। একটু বোকা হলেও খুব কাজের এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের দুই ভাইবোনের ওপর সুযোগ পেলে খবরদারি করতে ছাড়ে না।

বন্দনা ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে কী হচ্ছে। তোর অত জেনে কী হবে ?

বিলু গম্ভীর হয়ে বলল, এ বাড়িতে কেউ আমাকে কিছু বলতে চায় না। এটা খুব খারাপ নিয়ম। রমা মাসি নাকি চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ। গেলে বাঁচি।

কিন্তু রমা মাসি তো খুব ভাল। আমাকে কত গল্প বলে।

ছাই ভাল।

রমা মাসি সকালে উঠল। শরীর অসম্ভব দুর্বল। তাই নিয়েই বাক্স গোছাতে বসল। খোলা দরজা দিয়ে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিল বন্দনা। গোছানোর মতো তেমন কিছু আনেনি মাসি। সামান্যই কখানা কাপড়চোপড়। তবে মা বেশ কয়েকখানা শাড়ি দিয়েছিল মাসিকে। সেগুলো মাসি সরিয়ে সাজিয়ে রাখল বিছানায়, বাক্সে ভরল না।

বেলা দশটা নাগাদ মা ওপরে উঠে এল। সোজা গিয়ে রমা মাসির ঘরের দরজায় দাঁড়াল। বলল, খাবি আয়। না খেয়ে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। তুই উপোস করছিস আর উনি মাতাল হয়ে ফিরছেন। প্রেমের জ্বালা তো দেখছি সাঙ্ঘাতিক।

রমা মাসি বসে ছিল মেঝেতে। পাশেই খাট। মাসি মাথাটা বিছানায় নামিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল, কেন অমন করে বলছ রেণুদি ? আমি কী করেছি ?

মা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, কী করেছিস তাও কি বলে দিতে হবে ? সর্বনাশী ! যা করেছিস তা রাক্ষুসি ছাড়া কেউ করে ? এখন দয়া করে এখানে দেহত্যাগ কোরো না। আত্মহত্যা করতে হলে নিজের জায়গায় গিয়ে কোরো। এখন উঠে দয়া করে দুটি গেলো, আর আমাকে রেহাই দাও।

দৃশ্যটা আজও ভোলেনি বন্দনা। রমা মাসি চোখের জলে ভাসা মুখখানি তুলে বিকৃত গলায় বলল, খাব রেণুদি, না খেয়ে যাব কোথায় ? চলো, যাচ্ছি।

নীচের খাওয়ার ঘরে মায়ের পিছু পিছু দুর্বল ধীর পায়ে নেমে গেল রমা মাসি। পিছনে চুপি চুপি বন্দনাও ! একটু দূর থেকে, দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বন্দনা দেখল, রমা মাসি প্রাণপণে রুটি গিলবার চেষ্টা করছে, কাঁদছে, জলের গেলাস মুখে তুলছে। বিষম খাচ্ছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল মাসির। দুই গাল ফুলে আছে রুটির দলায়। গিলতে পারছে না। তবু কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। শেষ অবধি পারল না। বেদম কাশি, বিষম, বমি সব একসঙ্গে ঘটল।

মাসি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে চেয়ার-সমেত।

বন্দনা ভয়ে পালিয়ে এল।

পরে শুনেছে, মা ওই অবস্থায় মাসিকে রুটি বেলার বেলন দিয়ে বেদম মেরেছিল। ফুলুদির সামনে। ফুলুদিই পরে বলে, ওভাবে মারা ঠিক হয়নি মায়ের। ওভাবে কেউ মারে?

রমা মাসি অবশ্য মরেনি। শব্দ পেয়ে বাহাদুর দৌড়ে এসে মাসিকে তুলল। চোখেমুখে জল দিল। আঙুল দিয়ে মুখ থেকে রুটির দলা বের করল। তারপর ধরে ধরে দোতলায় এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। শূন্য দৃষ্টি কাকে বলে সেই প্রথম দেখেছিল বন্দনা। মাসি শুয়ে আছে খাটে। নিস্পন্দ। শুধু চোখ দুটি খোলা। সেই চোখে পলকও পড়ছে না, অথচ কিছুই যেন দেখতেও পাচ্ছে না।

আজও সেইসব দিনের কথা ভাবলে রমা মাসির জন্য কষ্ট হয় বন্দনার। অপরাধ যতই হোক, শাস্তি দেখতে কারই বা ভাল লাগে!

বাবা উঠল অনেক বেলায়। চোখ মুখ ফোলা, কেমন, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। ঘুম থেকে উঠেই তাকে ডাকল বাবা, বন্দনা মা, কোথায় তুমি?

বন্দনা ছুটে গিয়েছিল, এই তো বাপি।

তার বাবা চারদিকে পাগলের মতো চেয়ে দেখছিল। বলল, আমার কেমন লাগছে। একটু জল দেবে?

রাতে কেউ খাটের পাশে টুলে কাল জল রাখেনি। বন্দনা জল এনে দিতেই বাবা মস্ত কাঁসার গেলাসটা প্রায় এক চুমুকে খালি করে দিয়ে বলল, আমার কি জ্বর? গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো!

গায়ে হাত দিয়ে বন্দনা চমকে গেল। বাবার খুব জ্বর। বলল, হ্যাঁ বাপি।

আমার খুব শীত করছে।

তা হলে শোও বাপি, আমি গায়ে ঢাকা দিয়ে দিই।

না না। আমাকে এখনই স্নান করতে হবে।

জ্বর-গায়ে স্নান করবে?

হ্যাঁ মা। আমার গা বড় ঘিন ঘিন করছে।

তা হলে যে তোমার জ্বর আরও বাড়বে!

না, কিছু হবে না। এই বলে বাবা গিয়ে কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বন্দনা শুনতে পেল বাবা মগের পর মগ জল ঢালছে গায়ে। পাগলের মতো। দরজায় অনেকবার ধাক্কা দিল বন্দনা, বাবা, আর নয়।

বাবা শুনল না। অনেকক্ষণ বাদে যখন বাবা গা মুছে বেরিয়ে এল তখন শীতে চড়াইপাখির মতো কাঁপছে। ছোট দুই হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে এল বন্দনা। গায়ে ঢাকা দিল। বলল, কেন স্নান করলে বাবা? তোমার যে জ্বর!

বড্ড ঘিন ঘিন করে যে! বড্ড ঘিন ঘিন।

বিকেলে যখন জ্বর মাত্রাছাড়া হল তখন ডাক্তার দাশগুপ্ত এলেন। বললেন, এ তো সাঙ্ঘাতিক কনজেশন দেখছি বুকে! নিউমোনিয়ায় না দাঁড়িয়ে যায়।

নিউমোনিয়াই দাঁড়াল শেষ অবধি।

অন্য ঘরে তখন রমা মাসি দিনের পর দিন চুপ করে শুয়ে বসে থাকছিল। কেদার দত্ত টিকিট নিয়ে আর এল না। কয়েকদিন পর মাসিকে নীচের একটা এঁদো ঘরে চালান দিল মা। বলল, ওপরে এসো না। নীচেই থেকো। আর ঘরের দরজা আটকে রাখবে সব সময়ে।

মাসি নীরবে এই নিয়ম মেনে নিল।

মা একটা পোস্টকার্ড লিখল মধ্যপ্রদেশে।

কয়েকদিন বাদে রমা মাসির মায়ের কাছ থেকে জবাব এল মা রেণু, রমাকে নিয়ে কি তোদের খুব অসুবিধা হচ্ছে? রমা বড় শান্ত মেয়ে। তোর পিসেমশাই ছুটি পেলেই গিয়ে নিয়ে আসবে। চিন্তা করিস না।

বাবার অসুখ সারল একদিন। কিন্তু সারল না বাড়ির থমথমে ভাবটা। কয়েকটি মাত্র প্রাণীর বাস, তবু একজন যেন অন্যদের থেকে কত দূর।

মা একদিন মধ্যরাতে ফের বাবাকে ধরল, তোমার কেদার দত্তের কী হল ? টিকিট নিয়ে এল না তো ?

হয়তো ভুলে গেছে।

আর কত মিথ্যে কথা বলবে বলো তো ?

মিথ্যে কথা ! বলে বাবা কেমন তটস্থ হয়ে পড়ল।

মিথ্যে নয় ? কেদার দত্তের কাছে তুমি যাওইনি কখনও।

যাইনি !

ডাইনির পাল্লায় পড়লে মানুষের কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে ? ও তো তোমাকে খেতে এসেছে। তোমাকে খাবে, এ সংসার উড়িয়ে-পুড়িয়ে খাক করবে।

বাবা চুপ করে রইল। অন্ধকারে বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না বন্দনা। কিন্তু তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। তার বাবা একজন অসহায় মানুষ। কবির মতো মানুষ।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এক মধ্যরাতে, মা আর বাবার কথাবার্তা সেদিন ঘুম ভেঙে শুনে ফেলেছিল বন্দনা। সেই ঘটনার মাস দুই বাদে একদিন সত্যিই মাসির টিকিট কাটা হল। বাহাদুর তৈরি হল সঙ্গে যাবে বলে।

তখন সন্ধেবেলা, রাত সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে হবে বলে মাসি কাপড় পরে তৈরি হল। ভাতও খেয়ে নিল। হঠাৎ বাবা মাকে বলল, রেণু, তুমি ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো।

কেন ?

নইলে খারাপ দেখাবে।

দেখাক।

নইলে আমাকে যেতে হয়।

তুমিই যাও।

যাব ? তোমার তো ফের সন্দেহ হবে।

সন্দেহ ! সন্দেহের কিছু নেই। তোমরা দুজনেই পাপী। যাও তোমার তো চুলকুনি আছে।

কী যে বলো। শুনলে ও কী মনে করবে ?

কী আবার মনে করবে ? ওর মনে করার ভয় করি নাকি ? যা সত্যি তাই বলছি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলল, চলেই তো যাচ্ছে। সব ভুলে যাও। বড় সামান্য কারণেই এত কাণ্ড হয়ে গেল।

আমার কাছে কারণটা সামান্য নয়।

বাবা হতাশ হয়ে বলল, তুলে দিয়ে আসি। নইলে কথা থাকবে।

যাও, কিন্তু আবার ট্রেনে চড়ে বোসো না। তোমার যা অবস্থা দেখছি।

এইসব ঠেস-দেওয়া কথার পরও কিন্তু বাবা গিয়েছিল স্টেশনে। গিয়েছিল, কিন্তু ফেরেনি, আজও ফেরেনি।

রাত নটার পর বাহাদুর ফিরে এসে বলল, দিদিমণি তো হাওয়া।

মা চেঁচিয়ে উঠে বলল, তার মানে ?

কিছু বুঝলাম না।

কী বুঝলে না ?

গাড়িতে ওঠার পর বাবু আমাকে বললেন, ওরে রাস্তার খাবার দিতে ভুলে গেছে, একটা পাঁউরুটি নিয়ে আয় দিদিমণির জন্য, আমি পাঁউরুটি আনতে গেছি, এক মিনিট হবে, এসে দেখি দিদিমণি নেই, বাবুও নেই। সুটকেসও নেই। একজন প্যাসেনজার বলল, ওরা পিছনের দরজা দিয়ে নেমে গেছে।

সে কী ?

আমি একটু ভাবনা করে নেমে পড়লাম, ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই।

মা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে উবু হয়ে বসে পড়ল, শুধু বলল, এও হয় ? হতে পারে ?

বাহাদুর তার মালপত্র রেখে মদনকাকাকে নিয়ে ফের স্টেশন-চত্বর খুঁজতে গেল, যদি কোথাও পাওয়া যায়।

চিরকুটটা পাওয়া গেল শোওয়ার ঘরের কাশ্মীরি গোল টেবিলটার ওপর। একটা কাচের গেলাসে চাপা দেওয়া একসারসাইজ বুকের একটা রুল-টানা পাতায় শুধু লেখা, আমাদের খুঁজো না, পাবে না।

কিন্তু ঘটনার প্রথম ধাক্কাটা সামলে মা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বাঘিনীর মতো তার চেহারা, দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বলতে লাগল, এত সহজে ছেড়ে দেব ? এত সহজে ভেঙে দিয়ে যাবে আমার সংসার ?

সুতরাং পাড়া প্রতিবেশী এল, পুলিশ এল, দু-একজন নেতাও এলেন। তাঁদের মধ্যে সুবিমল স্যার। প্রদীপের মৃত্যুর পর থেকে সুবিমল স্যারকে একদমই পছন্দ করত না মা, নাম শুনলেই রেগে যেত। কিন্তু এ ঘটনার পর সুবিমল স্যার খুবই কাজে লাগলেন। তাঁর দলের ছেলেরা সারা শহরে তোলপাড় করে বেড়াল দুজনের খোঁজে। সারা শহরে ঢি ঢি। তারা ভাই বোন স্কুলে অবধি যেতে পারত না লজ্জায়।

সেইসব দিন খুব মনে আছে বন্দনার। বাইরের এইসব ঘটনাবলি তাকে আরও ভয় পাইয়ে দিত, সে গুটিয়ে যেত নিজের মধ্যে। বুকটা কী ভীষণ টনটন করত বাবার জন্য। তার ভাল মানুষ, কবির মতো বাবার এ কী হল ? এখন সে কী করে থাকবে বাবা ছাড়া ?

মাঝরাতে একদিন ঘুম থেকে তাকে ঠেলে তুলে মা বলল, রাক্ষুসি, ঘুমের মধ্যে কার নাম করছিলি ?

অবাক বন্দনা ভয় খেয়ে বলল, কার মা ?

খবরদার ও নাম আর উচ্চারণ করবি না, বাবা ! কীসের বাবা রে ? জন্ম দিলেই বুঝি বাবা হয় ? এত সহজ !

এই বকুনির অর্থ কিছুই বোঝেনি সে। শুধু বুঝল সে ঘুমের মধ্যে বাবাকে ডেকেছিল।

মাসির কথাও কি মনে হত না তার ? খুব হত। দুঃখী, রোগা মেয়েটা সেই যে সকালে মায়ের তাড়া খেয়ে গিয়ে গোগ্রাসে রুটি খাচ্ছিল, সেই দৃশ্য কি ভোলা যায় ? মাসিকে তো একসময়ে সে ভীষণ ভালবাসত। দু একদিন গল্প করতে করতে এক খাটে ঘুমিয়েও পড়েছে প্রথম প্রথম। মাসির প্রথম আসার পর কী আনন্দেই তাদের কাটত। এই মস্ত বাড়িটায় একজন নতুন এলে তাদের এমনিতেই ভাল লাগে। তার ওপর মাসির মতো অমন মিশুকে মিষ্টি মানুষ। তারপর কী যে হয়ে গেল।

আজ অবধি মাসিকে পুরোপুরি ঘেন্না করতে পারে না বন্দনা। কিছুতেই পারে না। আর বাবাকে সে আজও অন্ধের মতো ভালবাসে। তবু দুজনকে একসঙ্গে ভাবলে তার কষ্ট হয়। কেন এরকম করল বাবা ?

দিন সাতেক বাদে রমা মাসির মা এল আর এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। বাবা আসতে পারল না, তার নাকি ছুটি নেই। সেই দিদা এসে অনেক কান্নাকাটি করল, রেণু, তোর সর্বনাশ করল আমার পেটের মেয়ে। গলায় দড়ি দিলেও কি এ জ্বালা জুড়োবে ?

মা কাঁদতে কাঁদতে আর ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, সে শুধু আমার সর্বনাশই করেনি ফুলপিসি, একটা গোটা সংসার ছারখার করে দিয়ে গেছে। আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরের সমাজে মুখ দেখানোর উপায় রইল না। কেন যে সর্বনাশীকে এ বাড়িতে পাঠাতে গেলে !

দিদাও হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার জ্বালা যদি বুঝতিস রেণু ! একটা পাঁড় মাতালের ঘর করি, ঘাড়ের ওপর পাঁচটা সোমত্থ মেয়ে। কী সুখে আছি বল ! তার ওপর এই মেয়ে মুখে চুনকালি দিয়ে গেল। গলায় দড়ি জুটল না ওর ?

সারাদিন ধরে থেকে থেকে এইসব বিলাপ। ব[illegible]টিকে আগে কখনও দেখেনি। রোগাভোগা মানুষ, সরল সোজাও বটে। দিদাকে তার খারাপ মানুষ মনে হয়নি। রমা মাসির সেজদি ক্ষমাও খুব ভাল। দেখতে রমার মতো নয়। একটু মোটাসোটা আহ্লাদি চেহারা। তবে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, মুখখানা দুঃখে ভার।

বন্দনাকে বলেছিল, আমাদের বোনে বোনে খুব ভাব ছিল। রমা সবচেয়ে নরম মনের মেয়ে। হ্যাঁ রে, কেন এরকম হল ? রমা তো এরকম ছিল না।

বন্দনা কান্না চেপে বলেছিল, আমি জানি না মাসি।

জামাইবাবুকে তো আমি কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি উনিও খুব ভাল মানুষ।

আমার বাবা খুব ভাল।

ক্ষমা মাসির সঙ্গে তার তেমন ভাব হল না বটে, কিন্তু বন্দনার এই মাসিটিকে খুব খারাপ লাগল না। তার ওপর একটা লজ্জার ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তারা খুব মনমরা।

হীরেনবাবু তখন প্রায় রোজ বিকেলের দিকে আসতেন এবং মেঘনাদকে শিগগিরই অ্যারেস্ট করে আনবেন বলে তড়পাতেন। তাঁকে চা-বিস্কুট আর জর্দা পান দেওয়া হত। তিনি মাঝে মাঝেই মাকে জিজ্ঞেস করতেন, মেঘনাদবাবু নগদ টাকা কত নিয়ে গেছে বলে আপনার মনে হয় ? গয়না টয়না নেয়নি তো !

বন্দনার খুব রাগ হত শুনে। তার বাবা কি চোর ?

দিদা একদিন হীরেনবাবুকে বলল, জামাই আমার হিরের টুকরো ছেলে। ওর কোনও দোষ নেই। আপনি আমার মেয়েটাকে চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে এনে ফেলুন। আমি ও পাপের বোঝা নিয়ে ফিরে যাই। রেণুর সংসারটা বাঁচুক। ওর মুখের দিকে যে চাইতে পারি না।

হীরেনবাবু বিজ্ঞের মতো হেসে বলেছিলেন, ব্যাপারটা যদি অত সহজ হত তা হলে তো কথাই ছিল না, অ্যারেস্ট করতে হলে দুজনকেই করতে হবে। বাইগ্যামির চার্জে।

ফুলদিদা আর ক্ষমা মাসি প্রায় মাস খানেক ছিল। দুজনেই বেশ সরল আর ভালমানুষ গোছের। তারা অষ্টপ্রহর মাকে সান্ত্বনা দিত আর রমা মাসির নিন্দে করত।

কিন্তু রমা মাসির একার দোষ বলে মনে হত না বন্দনার। রমা মাসি তো খারাপ ছিল না। কিন্তু সংসারে বোধহয় অদৃশ্য ভূত কিছু আছে। তারাই ঘাড়ে এসে চাপে কখনও সখনও।

দিদা আর মাসি চলে যাওয়ার পর একদিন কেদারকাকু এসে খবরটা দিলেন, মেঘনাদ বড় আত্মগ্লানির মধ্যে আছে বউঠান। ছেলে মেয়ের জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে। আপনার কথাও খুব বলছে।

মা খুব শান্ত গলায় বলল, উনি কোথায় আছেন ?

প্রথমটায় আমার কোয়ার্টারেই গিয়ে উঠেছিল। পরে একটা বাসা ঠিক করে উঠে যায়। তবে রোজই আসে। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। কেন যে এ কাজ করল। সবই ভবিতব্য।

আজ সকালের ঝলমলে রোদে চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছে আনন্দে। আজ পুরনো দুঃখের কথা ভাবতে নেই। শুধু সুখ বা দুঃখের সময় বন্দনার মনে হয় এখন বাবা থাকলে বেশ হত। বুকের ভিতরটা টনটন করে তখন।

পায়রারা চক্কর খাচ্ছে মাথার ওপর। এ বাড়ির পোষা পায়রা। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। আকাশের গায়ে যেন এক অঞ্জলি ফুল।

এরকম কত ঐশ্বর্য দিয়ে যে পৃথিবীটা সাজানো ! একটা ফুলের দিকে চেয়ে থাকলেও আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তাকে দেখতে শেখাত বাবা। বাবার চোখ ছিল কবির মতো। স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। বাবা বলত, এ পৃথিবীর রূপের যেন শেষ নেই। জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে, তাতে ঝিরিঝিরি নিমের ছায়া, ভাল করে দেখিস, কী অদ্ভুত সুন্দর। নিবিষ্ট হয়ে নিবিড়ভাবে দেখতে হয়।

বাবা ছিল এক কবির মতো মানুষ, বাবা কি আজও সেরকম আছে ? কে জানে। রমা মাসিকে নিয়ে সেই যে চলে গেল বাবা, গেল তো গেলই।

॥ দুই ॥

বাঁশের সাঁকোটার মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অতীশ। তার মাথায় এক বস্তা বেগুন। সে বি-কম পাশ। দিন চারেক আগে সকালে দৌড়োনোর সময় তার ডান কুঁচকিতে একটা টান ধরেছিল। অন্য কেউ হলে বসে যেত। সে বসেনি। নিজেকে চালু রেখেছে। বসলে তার চলবে না। কিন্তু ব্যথাটা আজও সাঙ্ঘাতিক আছে। ডান পায়ে বেশি ভর দিতে পারে না। এমন চিড়িক দেয় যে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি টের পাইয়ে ছাড়ে। বেশি ব্যথায় একটা অবশ ভাব হয়, আর মাংসপেশি শক্ত হয়ে গুটলি পাকিয়ে থাকে। এসব নিয়েই চলা।

বাঁশের সাঁকোটা পার হওয়া খুব সহজ নয়। দুখানা বাঁশ পাশাপাশি ফেলা, একধারে বাঁ পাশে একখানা নড়বড়ে রেলিং। পরান আগেই বলে রেখেছে, ধরার বাঁশটায় বেশি ভর দেবেন না। ওটা শুধু টাল সামলানোর জন্য।

আসার সময়ে ভাবনা হয়নি। তরতর করে পেরিয়ে এসেছে। তখন মাথায় পঁচিশ কেজির বেগুনের বস্তা ছিল না। এখন সেটা টলমল করছে মাথায়। তার ওপর পায়ে হাওয়াই চটি। গত রাত্তিরের বৃষ্টিতে গাঁ-গঞ্জে কাদা ঘুলিয়ে উঠেছে। গোড়ালি অবধি এঁটেল মাটিতে মাখামাখি। জামা প্যান্টের পিছনে, মাথা অবধি হাওয়াই চটির চাঁটিতে ছিটকে উঠেছে কাদা। এখন সেই পিছল হাওয়াই চটি পায়ে সাঁকো পেরোনোর অগ্নিপরীক্ষা।

পরান পিছনেই। ঘাড়ে শ্বাস ফেলে বলল, আপনি পেরে উঠবেন না। দাঁড়ান, আমার বস্তাটা ওপারে রেখে এসে আপনারটা পার করে দিই।

অতীশ পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি পারলে আমি পারব না কেন ?

সবাই কি সব পারে ?

জীবন-সংগ্রাম কাকে বলে জানো ? এই সংগ্রামটা নিজেই করতে হয়। সব জায়গায় তো আর পরানচন্দ্র দাসকে পাওয়া যাবে না।

পরানের পায়েও হাওয়াই চটি, লুঙ্গিটা অর্ধেক ভাঁজ করে ওপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে বলে বাঁকা ঠ্যাংদুটো দেখা যাচ্ছে। গায়ে একটা হাওয়াই শার্ট। পরান বেঁটে এবং খাটিয়ে পিটিয়ে লোক। হাসল। বলল, বেগুন নিয়ে যদি পড়েন তো বেগুনও গেল, আপনিও গেলেন। আমার অভ্যাস আছে। একটু দাঁড়ান।

এই বলে পরান অতীশকে ডিঙিয়ে সাঁকোতে উঠে পড়ল। ওপাশ থেকে বিড়ি মুখে একটা লোক সাঁকোতে উঠতে গিয়ে পরানকে দেখে সরে দাঁড়াল।

অতীশ নিবিড় চোখে পরানকে লক্ষ করছিল। কায়দাটা কি খুব কঠিন ? বাঁশে একটা মচমচ শব্দ হচ্ছে, একটু একটু দেবেও যাচ্ছে। পরান একটা আলতো হাত বাঁশের রেলিঙে রেখে পা দুটো সামান্য ঘসটে ঘসটে পেরিয়ে যাচ্ছে। ওর বস্তায় ত্রিশ কেজির মতো বেগুন।

অতীশ দেরি করল না। ঠাকুর স্মরণ করে অবিকল ওই কায়দায় সাঁকোতে উঠে পড়ল। বাঁশের সাঁকোতে একটা মচাক করে জোর শব্দ হল। একটু কাঁপল কি ? পরান নয়, ওপাশের লোকটা হঠাৎ হেঁকে বলল, দাঁড়াও বাপু, দুজনের ভর সইবে না। আক্কেল নেই তোমার ?

আড়চোখে খালের দিকে চাইল অতীশ। ছোট খাল। জল কম, কিন্তু কাদা থিকথিক করছে। পড়লে গলা অবধি গেঁথে যাবে।

সাঁকোর ওপর দু কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অতীশ। পরান ওপারে পা দিতেই সেও ধীরে ধীরে পা ঘসটে ঘসটে এগোতে থাকে। বাঁ হাতে আলতো করে রেলিং ধরা। পারবে না ? এসব না শিখলে তার চলবে কেন ?

ওপার থেকে পরান বলল, কথা শুনলেন না তো ! পারবেন কি ? নইলে বলুন, আসি।

না। পারব।

পারার জন্য যেটা দরকার সেটা হল অখণ্ড মনোযোগ। পা যাতে বেচাল না পড়ে আর শরীর যাতে হেলে না যায়। ডান কুঁচকিটা ঠিক থাকলে কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু টাটানিটা যেন বাড়ল

সাঁকোর মাঝবরাবর এসে। অবশ লাগছে, দুর্বল লাগছে ব্যথার জায়গাটা। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে বলল, যতই কামড়াও আমি ছাড়ছি না। তুমি ব্যাটা আমার চাকর, যা বলব শুনতে হবে।

ডান কুঁচকি এই ধমকে ভয় পেল বলে মনে হয় না। তবে অতীশ মাঝ-সাঁকো থেকে সামান্য ঢালে সাবধানে পা রাখল। বড় নড়বড় করছে সাঁকোটা, এত ওজন তার যেন সওয়ার কথা নয়।

হড়বড় করবেন না, ধীরে সুস্থে আসুন। নীচের বাঁশে দড়ির বাঁধন আছে, বাঁশের গিট আছে, সেগুলোর ওপর পা রাখুন। পা একটু আড়া ফেলবেন। দুই বাঁশের মাঝখানে পা ফেললে বাঁশ ফাঁক হয়ে পা ঢুকে যেতে পারে। পুরনো বাঁধন তো, তার ওপর মাথায় অত ওজন।

পরান বরাবরই একটু বেশি বকবক করে। এসব কি আর সে জানে না ? প্রাণের দায়েই জানে। প্রাণের দায়ই তো যত আবিষ্কারের মূল।

ঢালের মুখে ডান পা একটু পিছলে গেল হঠাৎ। বুকটা কেঁপে উঠে মাথা অন্ধকার হয়ে গেল তার। এই রে ! গেলাম !

কিন্তু পাটা একটা বড় বাঁধনের দড়িতে আটকাল। বস্তাটা একটু দুলে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দোলটা সামাল দিল অতীশ। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল। শালার ডান কুঁচকি কুকুরের মতো কামড়াচ্ছে। জায়গাটা ফুলে উঠল নাকি ?

একেবারে শেষ দিকটায় পরান এগিয়ে এসে বস্তাটা ধরল।

অতীশ একটু রেগে গেল। অযাচিত সাহায্য সে পছন্দ করে না। বলল, ধরলে কেন ? পেরিয়েই তো এসেছিলাম।

পরান অতীশকে চেনে। একটু ভয়ও খায়। বলল, একেবারে শেষ সময়ে মাঝে মাঝে ভরাডুবি হয় যে।

ইংলিশ চ্যানেল পেরোনোর সময় কোনও সাঁতারুকে স্পর্শ করা বারণ। করলেই সেই সাঁতারু ডিসকোয়ালিফায়েড। এইরকমই শুনেছে অতীশ। তার মনে হল, এই সাঁকো পেরোনোতেও সে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গেল পরানের জন্য।

পরান তার বস্তাটা নামিয়ে রেখেছিল। তুলতে গিয়েও থেমে বলল, আপনি বড্ড ঘামছেন। একটু জিরিয়ে নেবেন নাকি ?

অতীশ টের পাচ্ছে তার ডান পা থরথর করে কাঁপছে। কুঁচকির ব্যথার জায়গাটা জ্বলছে লঙ্কাবাটার মতো। আর মাইলটাক বয়ে আনা বেগুনের বস্তার ভারে কাঁধ ছিঁড়ে পড়ছে। তবু বলল, আমার জিরোনোর দরকার নেই।

পরান বলল, আরে, তাড়া কীসের ? গাড়ি সেই ছটায়। একটু বিড়ি টেনে নিই। দিন বস্তাটা ধরে নামাই। পট করে ফেলবেন না যেন। চোট লাগলে বেগুন দরকচা মেরে যায়।

বস্তাটা নামিয়ে ঘাসজমির ওপর রাখল অতীশ। তারপর চারদিকে চাইল। বেশ জায়গাটা। উঁচু মেটে রাস্তার দুধারে পতিত বুনো জমি। বসতি নেই। গাছপালা আর এবড়ো খেবড়ো জমি।

লোকটা খাল পেরিয়ে ওধারে চলে গেছে। চেয়ে দেখছিল অতীশ। ওপাশে আবাদ। কত লোক কত ভাবে বেঁচে আছে।

পরান পথের ধারে হেলানো বাবলা গাছের গোড়ার ওপর বসে বিড়ি ধরিয়েছে। বিড়ি ধরানোটা অছিলা। এই ফাঁকে অতীশকে একটু জিরেন দিতে চায়। ও কি ভাবে অতীশ কমজোরি, পরেসান ? এইটেই অতীশ সহ্য করতে পারে না। সে কি ওর করুণার পাত্র ?

পরান বিড়ি খেতে খেতে বলল, এ আপনার পোষাবে না বাপু। এই গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে গিয়ে পাবেন ক পহা ? বরং পুরুতগিরিতে লাভ।

পরানের কথায় কান না দিলেও চলে। পরান হচ্ছে নীচের তলার লোক। ওর সমস্যা কম। দেহখানি পাত করে ওকে খেতে হয়। ভদ্রলোকদের গতর খাটাতে দেখলে ও ফুট কাটবেই।

অতীশের রিক্সা গত এক সপ্তাহ নেই। পুজোপাটেরও বরাত নেই। সংসারটা চলে কীসে ? পরান বলল, ভুবনডাঙার বেগুন এনে বেচলে কেজিতে দু টাকা চার আনা করে লাভ। তাই আসা।

পরানের সঙ্গে তার তফাত হল, পরানের রাস্তাটা সিধে। সে গাঁয়ে গঞ্জে বন্দোবস্ত করে আসে।

হপ্তায় হপ্তায় গিয়ে মাল খরিদ করে আনে। তারপর বেচে। তার ওইতেই হয় বা চলে যায় বা চালিয়ে নিতে হয়। আর অতীশের হচ্ছে দু নৌকো সামাল দিয়ে চলা। তারা বামুন, গরিব। অথচ ভদ্রলোকও। সে যে বি-কম পাশ এটা আর এক ফ্যাকড়া। তাই পরানের মতো তার রাস্তা তত সরল নয়।

অতুলবাবুর মেয়ে শিখা গাড়ি চালাচ্ছিল। স্টেশনে একটা ট্রিপ মেরে সওয়ারি নিয়ে ফিরছিল অতীশ। সে ঠিক জানে শিখা লাইসেন্স পেলেও হাত এখনও ঠিক হয়নি। চালপট্টির মধ্যে সরু রাস্তায় শিখার গাড়ির বনেট তার বাঁ দিকের চাকায় লেগে রিক্সা উল্টে দিল। শিখা বাচ্চা মেয়ে, তার দোষ দেয় না অতীশ। কিন্তু দোষ বাড়ির লোকের, কেন ওইটুকু মেয়ের হাতে গাড়ি ছেড়ে দেয়? রিক্সাটা গেল ভোগে! সওয়ারি একটা যুবক ছেলে, অ্যাকসিডেন্টের সময় চটপট লাফ মেরে নেমে গিয়েছিল। তার লাগেনি। হই-হই হল বটে, কিন্তু অতুলবাবুর মেয়ে বলে কথা! তার সাত খুন মাপ।

রিক্সা ভাঙায় মনোজবাবু রেগে আগুন। রিক্সা বন্ধ হয়ে গেল। পরান বলেছিল, যান না, অতুলবাবুর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়ান। ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু দিলেও দিতে পারে।

ওসব করে কী হবে? দু পাঁচটা কটু কথা বলবে বোধহয়। দয়া করে যা দেবে তাতে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। থাকগে।

বামুন তো, বুদ্ধি আর কত হবে? আমরা হলে আদায় করে ছাড়তাম।

ওইটেই মুশকিল। সে পরান নয়, আবার পরানের চেয়ে উঁচুও নয় পয়সার দিক দিয়ে।

দু পুরুষ ধরে ভাঙনটা শুরু হয়েছে। বাবাই প্রথম ভদ্রলোকের মুখোশটা খুলে বাজারে আলুর স্টল খুলেছিল। আলুর বিক্রি বারো মাস। দরও বাঁধা। আয়ও বাঁধা। গলায় পৈতে নিয়ে তার বাবা পঁচিশ বছর আলু বেচছে, আবার পালপার্বণে পুজোও করে আসছে। তাতে সংসারের সুসার কিছু হয়নি। তারা খোলার ঘরে ভাড়া থাকে। কোনওরকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

অতীশের বড় দুই দিদির কারও চাকরি হয়নি। ঘরে বসে পোশাক তৈরি করে বিক্রি করে। ছোট এক ভাই আর বোন স্কুলে পড়ে।

স্কুলে কলেজে অতীশ ভাল দৌড়বাজ বলে নাম করেছিল। ক্লাস থ্রি থেকে সব ফ্ল্যাট রেসে ফার্স্ট। ফিনফিনে পাতলা শরীরে সে যে এত ভাল দৌড়োয় তা তাকে দেখলে বিশ্বাস হয় না। অতীশের খুব ইচ্ছে ছিল, দৌড়ে নাম করবে, চাকরি পাবে। কিন্তু হল কী অনেক ঘোরাঘুরি করেও সে কলকাতার কোনও অ্যাথলেটিক ক্লাবে ঢুকতে পারল না। কেউ পাত্তাই দেয় না তাকে। মহকুমা আর জেলাস্তরে কিছু নাম হয়েছিল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তবে সে চেষ্টা ছাড়েনি। এখনও সে ভোররাতে উঠে দৌড়োয়, প্র্যাকটিস বজায় রাখে। দিন সাতেক আগে স্ট্যামিনা বাড়ানোর জন্য সে একটা রেললাইনের টুকরো দড়ি দিয়ে কোমরের সঙ্গে বেঁধে সেটাকে হেঁচড়ে দৌড়োনোর চেষ্টা করেছিল। বেহিসেবি আন্দাজের ফল যা হয়। লোহাটা ছিল দারুণ ভারী। দৌড়োতে গিয়ে খিঁচ লেগে যায়।

কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কুঁচকির ব্যথাটা কমানোর চেষ্টা করল অতীশ। ব্যথা কমল বলে মনে হয় না। তবে ঘাড়ে বোঝা নেই বলে একটু আরাম লাগছে।

বিড়ি শেষ করে পরান বলে, চলুন, রওনা হই। এখন না বেরোলে গাড়ি পাব না।

ঠিক আছে। চলো।

বস্তাটা ধরে মাথায় তুলে দেব কি? না কি সম্মানে লাগবে?

সম্মানে লাগবে।

তা হলে নিজেই তুলে ফেলুন।

বোঝাটা নামানোর পর ঘাড়ের টনটনানিটা টের পেতে শুরু করেছে অতীশ। এর আগেও অন্যান্য আবাদ থেকে বার কয়েক সবজি নিয়ে গেছে। তবে ব্যাপারটা তার এখনও অভ্যাস হয়নি। পরান বলে, ধীরে ধীরে ঘাড় শক্ত হয়ে যাবেখন। বামুনের ঘাড় এমনিতেই শক্ত। সহজে নুইতে চায় না।

অতীশ ক্রমশ বুঝতে পারছে ব্রাহ্মণত্ব আর বজায় রাখা যাচ্ছে না। বাবা মেলা বামনাই শিখিয়েছিল তাকে। যজমানি বামুন বলে কথা। কিন্তু সে সব যেতে বসেছে পেটের দায়ে।

বস্তাটা প্রথমে হাঁটুর চাড়ে পেট বরাবর, তারপর দুহাতের ঝাঁকিতে মাথায় তুলতেই ভারী টালমাটাল খেয়ে যায় অতীশ। ঘাড়ে মচাক করে একটা শব্দ হল নাকি ? সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল।

পরান অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তার বোঝাটি মাথায় তুলে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে। বলল, মাঝবরাবর হয়নি, ডানধারে কেতরে আছে। একটা ঝাঁকি মেরে একটু বাঁয়ে নিন। নইলে কষ্ট হবে।

ব্যালান্স রাখাই কষ্ট। বস্তাটায় ঝাঁকি মেরে মাঝবরাবর করার চেষ্টা করল সে। বিড়ে নেয়নি বলে মাথায় বেগুনের বোঁটা খোঁচা মারছে। বিড়েটা নিল না লজ্জায়। প্রেস্টিজে লেগেছিল। মাথায় বিড়ে নেয় তো কুলিরা। সে কেন নেবে ?

পরান বলেছিল, বিড়ে না নিলে মাথায় চোট হয়ে যেতে পারে।

কুঁচকির কষ্টের সঙ্গে ঘাড়ের কষ্টটাও যোগ হল। পরান আগে হাঁটছে এবার, পিছনে অতীশ। অনেক কিছু পারতে হবে তাকে এখন। অনেক কষ্ট সইতে হবে। মানুষ সব পারে। কত শক্ত শক্ত কাজ করছে। স্টেশনের কুলিরা এর তিন ডবল মাল টানে অহরহ।

কুঁচকিটা এবার যাবে। ডান হাঁটু মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে ব্যথায়।

যদি সুবল মহাজন ঠিকঠাক দাম দেয় তবে মায়ের হাতে গোটা চল্লিশেক টাকা দিতে পারবে আজ। পঁচিশ কেজির মাল থেকে যদি ছাপ্পান্ন টাকা চার আনা লাভ হয় তবে খরচ খরচা বাদ দিয়ে ওরকমই থাকবে। কিন্তু ঠিকঠাক কত থাকবে তা বলা কঠিন।

বাঁ ধারের মাঠে নামতে হবে। সাবধানে নামবেন, জায়গাটা বড্ড গড়ানে। পিছলও আছে।

দুর্গম-গিরি কান্তার মরু নয়, তবু তার মধ্যেই যে কত ফাঁদ পাতা দেখে অবাক হতে হয়। উঁচু পথ থেকে মাঠে নামবার জায়গাটা এমন খাড়াই যে, দেখলে ভয় করে। সরু একটা আঁকাবাঁকা নালার মতো। হাল্কা পায়ে নামা কঠিন নয়। কিন্তু বেজুত কুঁচকি, টনটনে ঘাড় আর বেগুনের বোঝা নিয়ে নামা আর এক কথা। আজ যেন সবটাই তার কাছে শক্ত লাগছে।

পরান নেমে গিয়ে দাঁড়াল। পিছু ফিরে দেখছে তাকে। কী দেখছে ? ফুল প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা ভদ্রলোকের ছেলেটা ছোটলোক হওয়ার কী প্রাণপাত চেষ্টা করছে দেখ। এ কোনওদিন ভদ্রলোকও হবে না, ভাল করে ছোটলোকও হতে পারবে না।

জন্মাবধি অতীশ ধার্মিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। পুজোপাঠ ইত্যাদির মধ্যেই তার জন্ম। বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলেবেলা থেকে পুরুতের কাজে পাকা হয়েছে। ওই ঈশ্বরবিশ্বাস আজও মাঝে মাঝে তার কাজে লাগে। এই যেমন এখন। সে ওই বিচ্ছিরি নালার মতো সর্পিল পথটা দিয়ে নেমে পড়ার আগে চোখ বুজে একবার ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে নিল। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করতে হয় অন্ধের মতো। বুদ্ধি বিবেচনা আত্মশক্তি তখন কোনও কাজেই লাগে না। তখন ওই বিশ্বাসটার দরকার হয়। কিন্তু জীবনে যত ঘসটানি খাচ্ছে অতীশ তত যেন বিশ্বাসটার রং চটে যাচ্ছে।

বেগুনের বস্তার ঠেলায় আর মাধ্যাকর্ষণের টানে নামাটা হল হড়হড় করে। টাল রাখা কঠিন। কুঁচকির সঙ্গে ডান হাঁটুও সঙ্গতে নেমে পড়েছে। ব্যথাটা আর এক জায়গায় নেই, গোটা পা-ই যেন গিলে ফেলছে ব্যথার কুমির।

তবু পড়ল না অতীশ। দৈব আর পুরুষকার দুটোই বোধ হয় খানিক খানিক কাজ করল। মাঠে নেমে পড়ার পর সে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বলল, চল।

পরান আর কথা বাড়াল না। সামনে সামনে হাঁটতে লাগল। গত কালের বৃষ্টিতে ক্ষেতে কাদা জমে আছে। আলপথও খুব নিরাপদ নয়। তবে ক্ষেতের চেয়ে শুকনো।

আগে পরান পিছনে অতীশ। চলেছে। তেপান্তরের মাঠ ফুরোচ্ছে না। বোধ হয় ফুরোবেও না ইহজীবনে। পরান এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে অতীশ। তার ডান পা আর যেতে রাজি নয়। টাটিয়ে উঠছে। ফুলে উঠছে কুঁচকি। ভাবনাচিন্তা ছেড়ে দিয়েছে অতীশ। চলছে একটা ঘোরের মধ্যে। শরীর নয়, একটা ইচ্ছাশক্তি আর অহংবোধই চালিয়ে নিচ্ছে তাকে।

শিখার গাড়ি যখন তার রিক্সাকে পিছন থেকে এসে মারল তখন ছিটকে পড়েছিল অতীশ। সেই পড়ে যাওয়াটা খুব মনে আছে তার। রিক্সা চালাচ্ছে নিশ্চিন্তমনে, আচমকা একটা পেল্লায় ধাক্কায় খানিকটা ওপরে উঠে গদাম করে পড়ে যাচ্ছিল সে, তার সঙ্গে রিক্সাটাও খানিক লাফিয়ে উঠল, তারপর পড়ল তার ওপরেই। তখন কিছুই করার ছিল না অতীশের। হাত পা বোধ বুদ্ধি সব যেন অকেজো হয়ে গেল। তখন সে যেন এই বেগুনের বস্তাটার মতোই এক জড় পদার্থ। ভাগ্যের মার যখন আসে তখন মানুষের কি কিছু করার থাকে ? ডান কনুই, মাথা, কোমর কেটে ছড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যতটা হওয়ার কথা ততটা হয়নি।

কথাটা হল, এক একটা সময়ে মানুষের কিছুই করার থাকে না। শত বুদ্ধিমান, বিদ্বান, কেওকেটা মানুষও তখন গাড়ল-বুদ্ধু-ভ্যাবাচ্যাকা।

শিখা নেমে এল গাড়ি থেকে। একটু অপ্রস্তুত। তবু বলতে ছাড়ল না, হর্ন দিয়েছি, শুনতে পাওনি ?

তা শুনেছিল হয়তো। চালপট্টিতে হর্নের অভাব কী ? থিক থিক করছে রিক্সা, টেম্পো, লরি। কোন হর্নটা শুনবে সে ? জবাবটা মুখে এল না, মাথাটা বড্ড গোলমাল ঠেকছিল তখন। লোক জমেছিল মেলা। দুচারজন অতীশের পক্ষ নিলেও বেশির ভাগই অতুলবাবুর মেয়ের দিকে। হর্ন দেওয়া হয়েছিল, সুতরাং দোষ কী ?

অতীশ ভাবে, গাড়িতে যেমন হর্ন থাকে, তেমনি ব্রেকও তো থাকে ! একটায় কাজ না হলে আর একটা দিয়ে লোককে বাঁচানো যায়। মেয়েটা আনাড়ি ড্রাইভার, সে কথা কে শুনবে ? ভাঙা রিক্সা যখন টেনে তুলছে অতীশ, তখন অতুলবাবুর মেয়ে গাড়িতে ফের স্টার্ট দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল।

ঘটনাটা বড্ড মনে আছে তার। ভোলা যাচ্ছে না। মনোজবাবু রাগ করে রিক্সা কেড়ে নিলেন। সেই থেকে একরকম ঘর-বসা অবস্থা তার।

তেপান্তরের মাঠ পেরোচ্ছে দুজন। সামনে শুধু ধু-ধু ন্যাড়া ক্ষেত। সামনে আরও এগিয়ে গেছে পরান। দূরত্বটা কি বেড়ে যাচ্ছে ? হেরে যাচ্ছে নাকি সে ? জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়ছে ? কিন্তু তা হলে তার চলবে কী করে ? খুঁড়িয়ে, লেংচে, হিঁচড়ে তাকে বজায় রাখতে হবে গতি।

বড্ড ঘাম হচ্ছে তার। শরৎকাল শেষ হয়ে এল। তেমন গরম কিছু নেই। পরানচন্দ্রেরও তেমন ঘাম হচ্ছে না। মাঠের ওপর দিয়ে ফুরফুরে হাওয়াও বয়ে যাচ্ছে। তবু এত ঘামছে কেন সে ?

দূরে ওই কি রেলবাঁধ দেখা যাচ্ছে ? খেলনাবাড়ির মতো স্টেশন কি ওই ঝোপজঙ্গলে ঢাকা ? পরানচন্দ্র এবার দাঁড়াল। তারপর ফিরল তার দিকে।

কেমন বুঝছেন ?

ভাল। তুমি এগোও।

ডান কনুইয়ের কাছ বরাবর একটু শিরশির করছিল। আড়চোখে চেয়ে দেখল, একটা শুঁয়োপোকা বাইছে। বাঁ হাতের আঙুলে শুঁয়োটাকে চেঁছে ফেলে দিল সে। এবার চুলকুনি শুরু হবে। না, আর পারা যায় না যে !

তবু পেরেও যায় মানুষ। কামড়ে থাকলে মানুষ না পারে কী ? অতীশও পারল। তবে কিনা যখন রেলবাঁধে উঠে স্টেশনের চত্বরে এসে বস্তাখানা নামাল তখন তার মাথাটা একদম ভোম্বল হয়ে গেছে, ঠিক যেমন শিখার গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে হয়েছিল সেদিন।

পরান প্ল্যাটফর্মের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি ধরাচ্ছিল। বলল, এলেন তা হলে ?

অতীশ জবাব দিল না। ডান পাটা সামনে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে থেবড়ে বসে গেল পরানের পাশে।

জল খাবেন তো বাইরের টিপকলে খেয়ে আসুন। এখনও সময় আছে।

জলের কথায় সচকিত হল অতীশ। তাই তো ! তার যে বুক পেট সব তেষ্টায় শুকিয়ে আছে ! শরীরের নানা অস্বস্তির মধ্যে তেষ্টাটা আলাদা করে চিনতে পারছিল না এতক্ষণ।

সে উঠল। বড় কষ্ট উঠতে। দাঁড়াতে গেলেই ডান পাটা বেইমানি করে যাচ্ছে। নেংচে খুঁড়িয়ে

সে স্টেশনের বাইরে এসে টিউবওয়েলটা দেখতে পেল। যখন জল খাচ্ছিল তখন কলকল শব্দ করে পেটের মধ্যে খোঁদলে জল নেমে যাওয়ার শব্দ পেল। বড্ড খালি ছিল পেটটা।

জল খেয়ে ফিরে এসে দেখে পরান দার্শনিকের মতো মুখ করে চুপচাপ বসে আছে। বিড়িটা শেষ হয়েছে।

আপনার কথাই ভাবছিলাম।

অতীশ একটু হাসল, কী ভাবলে ?

ভাবছিলাম, আপনি মেলা কষ্ট করছেন। এতে মজুরি পোষাবে না। আমাদের পুষিয়ে যায় কেন জানেন ? আমরা এইসবের মধ্যেই জন্মেছি। শরীর যে খাটাতে হবে তা জন্ম থেকেই জানি। আপনার তো তা নয়। কোথায় ভদ্রলোকের ছেলে চাকরিবাকরি করবেন, তা নয়, এই উঞ্ছবৃত্তি।

অতীশ ঠ্যাংটার কথা ভাবছিল। ডান পা গুরুতর রকমের বেচাল। এই অবস্থায় শালাকে লাই দিলে মাথায় উঠবে। কিন্তু শাসনেই বা রাখা যায় কী করে তা বুঝতে পারছে না।

আপনার পায়ে হয়েছেটা কী ?

অতীশ অবহেলার ভাব করে ঠোঁট উল্টে বলল, দৌড়োতে গিয়ে টান লেগেছে। ঠিক হয়ে যাবে।

পরান উঠে পড়ল। বস্তাটা দাঁড় করিয়ে বলল, উঠুন। গাড়ি আসছে।

সন্ধের মুখে নিজেদের স্টেশনে নেমেই অতীশ বুঝতে পারল, একটা কিছু পাকিয়েছে। স্টেশন চত্বরটা বড্ড থমথমে।

কী হল পরান ?

কিছু একটা হবে। দোকানপাট বন্ধ মনে হচ্ছে।

বাইরে একটাও রিক্সা নেই। এ সময়ে মেলা রিক্সা থাকবার কথা। রিক্সা থাকলে অতীশের সুবিধে হত। তার পয়সা লাগত না। এ শহরের অধিকাংশ রিক্সাওলাই তার বন্ধু।

একটু দমে গেল সে। ফের বস্তা মাথায় নিয়ে বাজার অবধি ল্যাংচাতে হবে।

পুলিশের গাড়ি গেল, দেখলেন ?

দেখলাম।

বাবু আর ল্যাংড়ার মধ্যে লেগে গেল নাকি ?

তা লাগতে পারে। চলো।

বাজারে মালটা গস্ত করা গেল না। বাজার বন্ধ। বাবু আর ল্যাংড়ার দলে বোমাবাজি হয়েছে। ছোরাছুরি চলেছে, পাইপগান আর রিভলভারও বেরিয়েছিল। সব দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাপারিরা। একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে।

এ সবই বাজারে এসে শোনা গেল। কয়েকজন বাজারের চত্বরে কুপি জ্বালিয়ে বসে তাস খেলছিল। তারাই বলল।

ভাগ্য ভাল যে বেগুনের বস্তাটা বাড়ি অবধি টেনে নিতে হল না। বাজারের চৌকিদারকে বলে মহাজনের দোকানের সামনে রেখে বাড়ি ফিরল অতীশ। টাকাটা আজ পেলে ভাল হত।

বাড়ির পিছন দিকটায় তাদের পাড়া। ল্যাংড়ার ঠেক। বড় রাস্তা থেকে বড় বাড়ির মস্ত নিরেট দেওয়াল ঘেঁসে সরু গলি দিয়ে ঢুকতে হয়। গলির এক পাশে বড় বাড়ির দেওয়াল, অন্য পাশে গরিবগুর্বোদের খোলার ঘর। কুলিকামিন, ঠেলাওয়ালা রিক্সাওলাদের বাস।

অন্যান্য দিনের তুলনায় পাড়াটা আজ অন্ধকার আর নিঃঝুম। মানুষ ভয় পেয়েছে। আজকাল মানুষ সহজেই ভয় পায়। ঠ্যাং টেনে টেনে হাঁটছে অতীশ। ব্যথা বাড়ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু যেই একটায় ব্যথা বা চোট হল তখনই সেটা যেন জানান দিতে থাকে। এই এখন যেমন ব্যথা-বেদনার ভিতর দিয়ে তার ডান পা জানান দিচ্ছে, ওহে, আমি তোমার ডান পা ! বুঝলে ? আমি তোমার ডান পা ! খুব তো ভুলে থাকো আমায়, এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ তো !

অতীশ বিড়বিড় করে, পাচ্ছি বাবা, খুব পাচ্ছি। এখন বাড়ি অবধি কোনওক্রমে বয়ে দাও

আমাকে। তারপর ফিরেন।

কথাটা মিথ্যে। কারণ আগামী কাল প্রগতি সংঘের স্পোর্টস। বরাবর ওরা ভাল প্রাইজ দেয়। এবারও ভি আই পি সুটকেস, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, হাতঘড়ি, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি প্রাইজ আছে। বিধান ভৌমিকের চিট ফান্ডের কাঁচা পয়সা প্রগতি সংঘের ভোল পাল্টে দিয়েছে। বিধান এবার সেক্রেটারি। তা ছাড়া বাবু মল্লিক আছে। গত বছর যে বিরাট ফাংশন করেছিল তাতে বোম্বে থেকে ফিল্ম আর্টিস্ট আর গায়ক-গায়িকাদের উড়িয়ে এনেছিল। অনেক টাকার কামাই। সেইসব টাকার একটা অংশ প্রগতি সংঘের পিছনে কাজ করছে। প্রগতি সংঘ এখন শুধু এই শহর বা মহকুমা নয়, গোটা জেলারই সবচেয়ে বড় ক্লাব।

অতীশের প্রাইজ দরকার। স্কুল কলেজে যত প্রাইজ সে পেয়েছে তার প্রায় সবই বেচে দিতে পেরেছে সে। কাপ-মেডেলগুলো তেমন বিক্রি হয় না, হলেও খুব নামমাত্র দামে। তবে অন্য সব জিনিস বেচলে কিছু পয়সা আসে। আজ রাতে পায়ে একটু সেঁকতাপ দিতে হবে। একটু মালিশ লাগাবে। সকালে একটু প্র্যাকটিস। তারপর দুপুরেই নামতে হবে ট্র্যাকে। সে এ তল্লাটের নাম-করা দৌড়বাজ, সে পুরুত, সে একজন কায়িক শ্রমিক এবং একজন কমার্স গ্র্যাজুয়েট। তবু নিজেকে তার একটা বিস্ময়ের বস্তু মনে হয় না। মনে হয়, এরকম হতেই পারে।

এই ফিরলে গুরু ? বলে অন্ধকারে একটা ছোকরা একটু গা ঘেঁসে এল।

নির্বিকার অতীশ বলল, হ্যাঁ।

খুব ঝাড়পিট হয়ে গেল আজ। রাস্তায় পুলিশ দেখলে না ?

হ্যাঁ।

সাত আটজনকে তুলে নিয়ে গেছে। ল্যাংড়া হাপিস।

ও।

ল্যাংচাচ্ছ কেন ? কী হয়েছে ?

ও কিছু নয়। একটু টান লেগেছে শিরায়।

ছেলেটা বিশু। বন্ধুমতো, একটু চামচাগিরিও করে তার। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাবু ঠিক এন্ট্রি নিয়ে নেবে, বুঝলে ? আজ বড় বাড়ির অন্দরের গেট অবধি এসে গিয়েছিল। বহুত বোমাবাজি হয়েছে। ল্যাংড়া শেষ অবধি চাল বেয়ে বেয়ে দক্ষিণের খালধারে নেমে পালিয়ে যায়।

এসব অতীশকে স্পর্শ করে না। এসব যেন অন্য জগতের খবর। ওই জগতের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। তার জগৎ খুব ছোট সংকীর্ণ এই গলিটার মতোই। সে জানে অনেক ব্যথা বেদনা বাধা সয়ে তাকে গতি বজায় রাখতে হবে। আজ রাতে ব্যথাটা যদি কমে ভাল, নইলে কাল এই বিষব্যথা নিয়েই তাকে দৌড়ে নামতে হবে। হাততালি নয়, জয়ধ্বনি নয়। তাকে একটা দামি প্রাইজ পেতেই হবে। সকালে আদায় করতে হবে বেগুনের টাকা। তার অনেক কাজ। বাবু আর ল্যাংড়ার কাজিয়ায় তার কোনও কৌতূহল নেই।

তবে ল্যাংড়া ইস্কুলে অতীশের সঙ্গে এক‌ক্লাসে পড়ত। ভীষণ ভাব ছিল দুজনে। প্রায় সময়েই গলাগলি করে ফিরত। একসঙ্গে খেলে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়। একটা তফাত ছিল। রেগে গেলে ল্যাংড়া খারাপ গালাগাল দিত লোককে। অতীশের মুখে খারাপ কথা আসত না। দিনরাত পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি শুনে আসছে অতীশ জন্মাবধি। আজ অবধি শালা কথাটাও উচ্চারণ করতে তার সংকোচ হয়। ল্যাংড়া জলের মতো ওসব বলত। সিক্সে দুবার ফেল করে পড়া ছেড়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার অন্য লাইনে উত্থান হতে লাগল। তখন কালো গুণ্ডার যুগ। চোলাই আর জুয়ার ঠেক তো ছিলই তার। এইসব বস্তিতে যে সব ছোটখাটো মেশিনপত্র নিয়ে নানা ব্যবসা করে লোক তাদের কাছ থেকে তোলা নিত। বড় কালীপুজো করত, যেমন গুণ্ডারা করেই থাকে। ল্যাংড়া কিছুদিন কালোর সাকরেদি করেছিল। কিন্তু বড় হওয়ার ইচ্ছে তার বরাবর। কী কারণে কে জানে, কালোর সাকরেদ পন্টুকে টিউবওয়েলের ধারে এক রাতে খুন করল ল্যাংড়া তুচ্ছ কারণই হবে। হয়তো খুনটা ছিল আত্মপ্রকাশের ঘোষণা। দিন তিনেক দু পক্ষের বিচ্ছিন্ন মারপিট চলল। তারপর কালো বেগতিক বুঝে পাড়া ছেড়ে পালাল। ল্যাংড়া লিডার হয়ে গেল।

কালো ছমাস বাদে এল। মস্তানি করতে নয়, বোধহয় পেটের তাগিদে। আর বউ বাচ্চার টানে। ল্যাংড়া ভরসন্ধেবেলা ল্যাম্পপোস্টের নীচে তার গলায় ড্যাগার ঠেকিয়ে কথা আদায় করল। নিজের লেদ মেশিন আর কেরোসিনের দোকান ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা গলাতে পারবে না। কালো রাজি হয়ে গেল।

এসব ঘটনায় অবশ্য কোনও অভিনবত্ব নেই। গুণ্ডাদের উত্থান পতন এভাবেই সর্বত্র হয়ে থাকে। হয়তো এতটা শান্তিপূর্ণভাবে নয়, হয়তো দু-চারটে খুনজখম হয়। ল্যাংড়া শুধু পাড়াই দখল করেনি, সে এখন শহরটাই দখল করতে চাইছে। হয়ে উঠতে চাইছে হিরো। খানিকটা হয়েছেও। নইলে অপরূপা দিদিমণির মতো এম এ বিটি সুন্দরী মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে ?

গতবছর বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় খুব ঝামেলা হয়েছিল। প্রতিবারই হয়। মেয়েরা পরীক্ষায় বসলেই তাদের যত ভক্ত প্রেমিক, হবু প্রেমিক তাদের সাহায্য করতে এসে জোটে। প্রেমিকাদের ইমপ্রেস করতে অনেক দুঃসাহসী কাণ্ডও করে তারা। দেয়াল টপকে লাইন বেয়ে উঠে নকল সাপ্লাই, খাতা বাইরে এনে প্রশ্নের উত্তর লিখে ফের দিয়ে আসা ইত্যাদি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জ্বালাতন হয়ে শেষে শান্তিরক্ষার জন্য ল্যাংড়াকে ডেকে এনেছিল। ল্যাংড়ার বীরত্ব, চেহারা এবং হয়তো আরও কিছু অপরূপা দিদিমণিকে একেবারে বিহ্বল করে ফেলল। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের অপরূপা ল্যাংড়ার চেয়ে বছর তিন চারের বড়। ভাল ঘরের মেয়ে। বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড, দাদা বাইরে কোথায় যেন প্রফেসর। শোনা যাচ্ছে, অপরূপা আজকাল ল্যাংড়াকে পড়াচ্ছে, সৎপথে আনার চেষ্টা করছে। বিয়েও খুব শিগগিরই।

এসব ঘটে যায় সিনেমার ছবির মতো। অতীশের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। চারপাশে কত কী ঘটে যাচ্ছে, সেসবের মাঝখান দিয়ে তার জীবনটা চলেছে ঠিক যেন একটা সরু গলির মতো।

বিশু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আজ দিদিমণি বাবুকে খুব রগড়ে দিয়েছে, বুঝলে ?

তাই নাকি ?

বোমবাজির আগে বাবু যখন বড় রাস্তায় পজিশন নিচ্ছিল তখন অপরূপা দিদিমণি রিক্সা করে এসে নামল। তখনই লেগে গেল। বাবু নাকি বলেছিল আপনি একজন শিক্ষিতা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে ওরকম একটা নোংরা অশিক্ষিত গুণ্ডার সঙ্গে কী করে মেলামেশা করেন। দিদিমণি বহুত বিগড়ে গিয়ে চিল্লামিল্লি করতে লাগল, আপনি না মার্কসিস্ট ! শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে বেড়ান ! কোন লজ্জায় বলেন ?

প্রেমট্রেম নিয়ে মাথা ঘামায় না অতীশ। তবে তার মনে হল, প্রেম ব্যাপারটা হয়তো এরকমই।

বিশু বলল, অপরূপা দিদিমণি মেয়েছেলে না হয়ে পুরুষ হলে বহুত বড়া রুস্তম হত, বুঝলে গুরু ? ল্যাংড়া লাগত না ওর কাছে। যখন বোমবাজি শুরু হল তখনও বেঁটে ছাতা নিয়ে বাবুকে তেড়ে মারতে যাচ্ছিল। তারপর কী করেছে জানো ? থানায় গিয়ে বড়বাবুকে পর্যন্ত আঁখ দেখিয়েছে। বলেছে, বাবুর এগেনস্টে যদি কেস না লেখেন তো আমি চিফ মিনিস্টার আর প্রাইম মিনিস্টারকে জানাব। তারপরই তো পুলিশ নামল। নইলে ল্যাংড়ার যা অবস্থা করেছিল একদম কেরাসিন। বাবু আজই পাড়া দখল করে নিত।

পাড়া কে দখল করল না-করল তাতেও অতীশের কিছু যায় আসে না। বাবুদা লেখাপড়া জানা, ভদ্র ছেলে। এ পাড়ায় ঘর নিয়ে সে একসময়ে মার্কসবাদের ক্লাস নিত। তখন অতীশও তার ক্লাসে নিয়মিত গেছে। অনেক নতুন কথা শিখিয়েছিল বাবুদা। অধিকাংশই অবশ্য অতীশের এখন মনে নেই। শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, যৌথ খামার, শ্রমিক আর কৃষকের অধিকার ইত্যাদি। পরে পার্টির গুরুতর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মার্কসবাদের পাঠশালাটা উঠে যায়। সে পুরুতের ছেলে এবং পুজো আচ্চা করে বেড়ায় বলে বাবুদা কখনও টিটকিরি দেয়নি। বরং খুব আন্তরিকভাবেই বলত, পুজো করছ ? ভাল করে করো। ওর মধ্যে কিছু আছে কি না খুঁজে দেখো ভাল করে। আমার কী মনে হয় জানো ? ভগবানের চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হল সমাজে নিজের স্থানটা আবিষ্কার করা।

নিজের স্থানটা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি অতীশ। যখন রিক্সা চালায় তখন ভাড়া নিয়ে

কত হেটোমেটো লোকও কত অপমান করে, মারতে আসে, গাল দেয়। আবার যখন কোনও বাড়িতে পুজো করতে যায়, তখন কত বুড়িধুড়িও মাটিতে পড়ে পায়ের ধুলো নেয়। সবজির পাইকার তাকে জিনিসের ন্যায্য দাম দিতে গড়িমসি করে, আবার ভিক্টরি স্ট্যান্ডে যখন দাঁড়ায় তখন কত হাততালি পায় সে। সুতরাং এ সমাজে তার স্থানটা কোথায় তা স্থির করবে কী করে সে ?

বিশু বলল, বাবু হুজ্জুতটা কেন করছে জানো ?

না। কেন ?

কিছুদিন আগে সুবিমল স্যার ল্যাংড়াকে ডেকে পাঠিয়ে বলে, তুই পার্টিতে চলে আয়, তা হলে পার্টি তোকে দেখবে। ল্যাংড়া মুখের ওপর না বলতে পারেনি। কিন্তু পরে বলে পাঠিয়েছে পার্টিতে যাবে না। স্বাধীনভাবে থাকবে। শালা বুদ্ধু আছে। পার্টির সঙ্গে লাগলে উড়ে যাবে একদিন। আজ পালিয়ে বেঁচে গেছে, কিন্তু রোজ তো আর লাক ফেবার করবে না, কী বলো গুরু ? বাবু ওকে ঠিক একদিন ফুটিয়ে দেবে। পার্টিতে গেলে দোতলা বাড়ি আর মোটরবাইক দুটোই হয়ে যেত।

ল্যাংড়ার আপাতত দুটো স্বপ্ন। একটা দোতলা বাড়ি করবে, আর একটা হোন্ডা মোটরবাইক কিনবে। পাড়ার সবাই সে কথা জানে। তার মানে এ নয় যে, এ দুটো হলেই ল্যাংড়া ভাল ছেলে হয়ে যাবে। তা নয়। আপাতত এ দুটো স্বপ্ন দেখছে, পরে আরও স্বপ্নের আমদানি হবে। অতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বেকারির যুগে মস্তানিও একটা ভাল প্রফেশন। ল্যাংড়াকে আর চাকরির ভাবনা ভাবতে হয় না, ভাত রুটির চিন্তা নেই।

খড়কাটা কলের পাশেই মদন দাসের খুপরির সামনে মাতাল মদনকে পেটাচ্ছিল তার লায়েক ছেলে পানু। পেটানোটা যেন জুতমতো হয় তার জন্য মদনের বউ নবীনা আর মেয়ে সুমনা তার দুটো হাত দুদিকে দিয়ে চেপে ধরে আছে। পিছন থেকে কোমর ধরে আছে ছেলে নয়ন। মদনের মুখ থেকে যেসব গালাগাল বেরোচ্ছে তার চেয়ে খারাপ কথা পৃথিবীতে আর অল্পই আছে। আগে মদনই মাতাল হয়ে ফিরে বাড়িসুদ্ধ লোককে পেটাত আর গাল দিত। আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। ব্যাপারটা অতীশের খারাপ লাগে না। এ যেন অতীতের দেনা শোধ হচ্ছে। বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গেছে দৃশ্য দেখতে । চোখ ভিডিও ক্যামেরা কাম টেপ রেকর্ডার। হাবিব তনবীরের নাটক পয়সা খরচা করে দেখতে যাওয়ার দরকার কি ?

বিশু এখানেই কেটে গেল। অতীশ দাঁড়াল না। এগোতে লাগল। এই যে হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু এক একটা যখন বিগড়োয় তখন সেটাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুতর ভি আই পি। কুঁচকির সঙ্গে একটা সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধে নামার চেষ্টা করছে অতীশ। হচ্ছে না। রবি ঠাকুরকে একবার কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল। সেই অসহ্য ব্যথা ভুলবার জন্য রবি ঠাকুর শরীর থেকে মনকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। ফলে আর ব্যথা টেরই পেলেন না। মনকে শক্ত করতে পারলে হয়তো হয়। অতীশ মনে মনে জপ করতে লাগল, এটা আমার কুঁচকি নয়, এটা আমার কুঁচকি নয়....

একটু কমপ্রেস আর গরম চুন-হলুদ দিয়ে রাখবে আজ রাতে। দরকার হলে কাল স্পোর্টসের আগে একটা ব্যথার ইনজেকশন নিয়ে নেবে। তারপর ব্যথা দুনিয়ে যদি বিছানায় পড়ে থাকতে হয় দেখি আচ্ছা।

বাড়ি ফেরা কথাটাই ক্রমে অর্থহীন হয়ে আসছে অতীশের জীবনে। বাড়ি একটা ঠেক মাত্র। অনেকটা রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতো। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার জন্য গাড়ি বদল করা মাত্র। তাদের একখানা মাত্র ঘর, সাতটি প্রাণী, একটা চৌকি আছে, তাতে বাবা শোয়। আর বাদবাকি মেঝেতে মাদুর পেতে। তাতেও জায়গা হয় না। অতীশ রাতে শুতে যায় ইস্কুলবাড়ির বারান্দায়। তাদের কলঘর নেই, বারোয়ারি পায়খানা, স্নানের জন্য দূরের পুকুর অথবা রাস্তার কল। তবু বাড়ি ফেরার একটা নিয়ম চালু আছে। জানান দিয়ে যাওয়া যে, আমি আছি।

মেঝেতে মাদুরের ওপর উপুড় করা একটা কৌটোর মাথায় হ্যারিকেন বসানো। সেই আলোয় ভাগ বসিয়েছে পাঁচ জন, বড়দি কুরুশ কাঠিতে অর্ডারি লেস বুনছে, ছোড়দি একটা সোয়েটারে ডিজাইন তুলছে, দুই ভাইবোন পড়ছে, মা চাল বাছছে, বাবা বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শোওয়া।

তাকে দেখে মা একটা শ্বাস ফেলল। বোধহয় অনেকক্ষণ ওই উদ্বেগের শ্বাসটি বুকে চেপে রেখেছিল।

কোথায় ছিলি ?

গাঁয়ে গিয়েছিলাম।

বড় বাড়ি থেকে বাহাদুর এই নিয়ে তিনবার এল খোঁজ করতে।

কী ব্যাপারে ?

বন্দনার অসুখ সেরেছে, আজ তাই নারায়ণপুজো। কর্তামা সকাল থেকে উপোস। তোর বাবার জ্বর, যেতে পারছে না। তাড়াতাড়ি যা।

মেদুর শব্দটার অর্থ খুব ভাল করে জানে না অতীশ। তবে তার বুকের ভিতরটা যেন মেদুর হয়ে গেল। একটা খাঁ খাঁ মরুভূমির মতো শুখা প্রান্তরে এ বুঝি মেঘের ছায়া, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত। দ্বিরুক্তি না করে সে হাতমুখ ধুয়ে পুজোর কাপড় পরে নামাবলী চাপিয়ে নারায়ণশিলা নিয়ে রওনা হল।

বড় বাড়িতে আসতে হলে আগে বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে দেউড়ি দিয়ে ঢুকতে হত। আজকাল পিছনের ঘের-পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়েই ঢোকা যায়। আর ঢুকলেই অন্য জগৎ। স্বপ্নের মাখামাখি। উষর মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মতোই কি ? চারদিককার ক্ষিন্ন ক্ষুব্ধ, দরিদ্র পটভূমিতে এ এক দূরের জগৎ। দোতলার ঘরে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা জাপানি পুতুলের সারি যেমন অবাক চোখে দেখত অতীশ, এ যেন সেরকমই কিছু। এখানে যেন ধুলো ঢোকে না, ময়লা ঢোকে না, নোংরা কথা ঢোকে না, মতবাদ ঢোকে না। বড় বাড়ি যেন এখনও কাচের আড়ালে জাপানি পুতুল।

তা অবশ্য নয়। বড় বাড়ি ভাঙছে। অবস্থা পড়ে যাচ্ছে। সবই জানে অতীশ। তবু আজও বড় বাড়িতে এলে তার বুকের ভিতরটা মেদুর হয়ে যায়। মন নরম হয়ে আসে।

কুল-পুরোহিত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার পর মেঘনাদ চৌধুরির বাবা হরিদেব চৌধুরি অতীশের বাবা রাখাল ভট্টাচার্যকে সামান্য মাসোহারায় পুরোহিত নিযুক্ত করেন। রাখাল ভট্টাচার্য অন্য দিকে তেমন কাজের লোক নন, কিন্তু পুজোপাঠ ভালই জানতেন। বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন জগদ্ধাত্রী। রোজ রাখাল ভট্টাচার্য পুজো করতে আসতেন। অতীশ যখন সবে হাঁটতে শিখেছে তখন সেও বাবার সঙ্গে আসত। সেই বিস্ময়ের বুঝি তুলনা নেই। বস্তির নোংরা অপরিসর অন্ধকার ঘর থেকে যেন রূপকথার জগতে আসা। কত বড় বাগান, কী সুন্দর সিঁড়ি, কত বড় বড় ঘর, আলমারিতে সাজানো কত জিনিস। বাবা পুজো করত আর অতীশ গুটগুট করে হেঁটে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াত।

একদিন সে ছাদে উঠে গিয়েছিল একা। উঠেই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ। কত বড় আকাশটা ! অথচ কত কাছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তখন বিকেল। সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় চারদিক যে কী অপরূপ হয়েছিল সেদিন।

হরিদেব চৌধুরি সন্ধের পর ছাদে গিয়ে বসতেন। তাঁর জন্য একটা ডেক-চেয়ার পাতা ছিল ছাদে। অতীশ একসময়ে সেই বিশাল ডেকচেয়ারে উঠে বসল। তারপর আকাশ দেখতে দেখতে গভীর ঘুম। তাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল সেদিন। তাকে খুঁজে বের করেছিল প্রদীপদা। সেই থেকে প্রদীপদার সঙ্গে ভাব। যেখানেই প্রদীপদা সেখানেই সে। প্রদীপদা বাঁখারি দিয়ে ধনুক বানাত, পেয়ারার ডাল কেটে বানাত গুলতি, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিত। সব কাজে সাহায্যকারী ছিল সে। প্রদীপদা যখন পার্টি করতে গেল তখনও সে ছিল সঙ্গে।

বাবুদা একবার তাকে বুঝিয়েছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা এত সূক্ষ্ম আর এত চালাকিতে ভরা যে তা বুঝে ওঠাই কঠিন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওই সম্পর্কই ধ্বংস করে দিতে থাকে মানুষের মূল্যবান মেরুদণ্ড।

কথাটা উঠেছিল একটা বিশেষ কারণে। প্রদীপদা আর বাবুদার মধ্যে পার্টিতে একটা খাড়াখাড়ি

চলছিল। সুবিমল স্যার প্রদীপদাকে একটু বিশেষ পছন্দ করতেন বলেই বোধহয়। প্রদীপদা খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল না, পলিটিক্সও হয়তো ভাল বুঝত না। কিন্তু সে যা করত তা প্রাণ দিয়ে করত। একটা জান-কবুল ভাব ছিল। সুবিমল স্যারের পক্ষপাত বোধহয় সেই কারণেই। সেই সময়ে বাবু একদিন অতীশকে পাকড়াও করে বলেছিল, তুই কি ওর চাকর যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াস ? তোর বাবা ওদের কর্মচারী হতে পারেন, তুই তো নোস।

একটু তর্ক করার চেষ্টা করেছিল অতীশ। পারেনি। বাবুদার কাছে তখন সে মার্ক্সবাদের পাঠ নেয়, পারবে কেন ? মুখে না পারলেও মনে মনে সে জানত, বাবুদার ব্যাখ্যাটা ভুল। তার সঙ্গে প্রদীপদার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই থেকে মনে একটা ধন্দের সঞ্চার হল অতীশের, কে জানে হয়তো বাবুদাই ঠিক বলছে। মনের গভীর অভ্যন্তরে হয়তো এখনও সামন্ত প্রভুর প্রতি আনুগত্যের ধারা রয়ে গেছে। এবং একথাও ঠিক, সে প্রদীপদার এক নম্বর আজ্ঞাবহ। বরাবর প্রদীপদা যা বলেছে তাই করে এসেছে। কেন করেছে ? এই দাস্যভাব কোথা থেকে এল ?

নানা মতবাদের প্রভাবে মানুষের স্থির চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। হরেক রকম ব্যাখ্যা আর অপব্যাখ্যায় তৈরি হয় কূট সন্দেহ। আর সন্দেহ ঢুকে গেলেই অনেক সহজ জিনিসও জটিল হয়ে ওঠে। কথাটা কানে ঢোকার পর থেকেই সে একটা অসহ্য অস্থিরতায় ভুগেছে। পরদিন ভোরবেলা প্র্যাকটিসের সময় সে এত জোরে দৌড়েছিল যেমনটি আর কখনও দৌড়োয়নি। বোধহয় মাইল দশেকের বেশিই হবে। পরেশ পালের ইটভাঁটি ছাড়িয়ে সেই লোহাদিঘি পর্যন্ত।

বাগানটা পার হতে আজ সময় নিল অতীশ। বুকে অনেক মেদুরতা। আতা গাছটার নীচে বসে আজকাল তিনতাস খেলে ল্যাংড়া আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। ওইখানে শিশু বন্দনা বসে পুতুল খেলত শীতের রোদে। অতীশ কতবার তার পুতুলের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়েছে। মিছে নেমন্তন্ন অবশ্য। কাঁকর দিয়ে তরকারি। পাথরকুচি পাতার লুচি। কাদামাটি দিয়ে পায়েস। একটু বড় হয়ে বন্দনা যখন গান গাইত, তবলায় ঠেকা দিতে ডাক পড়ত তার। বড় বাড়ির আলমারিতে সাজানো জাপানি পুতুলের মতোই দেখতে ছিল মেয়েটা। মুখে স্বপ্ন মাখানো। কী অবাক দৃষ্টি ছিল চোখে ! তখন বালিকা-বয়স, তখনও শ্রেণীচেতনা আসেনি। তখনও গরিব বলে চিনতে পারেনি অতীশকে। কর্মচারী বলে চিনতে পারেনি। তখন বায়না করত। পেনসিল এনে দাও, গ্যাস-বেলুন এনে দাও, রথ সাজিয়ে দাও, একটু বড় হয়ে যখন গরিব আর কর্মচারী বলে বুঝতে শিখল তখন ফরমাশ করত। উল এনে দাও, ট্রেসিং পেপার নিয়ে এসো, ডলির বাড়ি থেকে নজরুলের স্বরলিপিটা এনে দিয়ে যাও। বায়না আর ফরমাশের মধ্যে তফাত হল।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা আর কাটিয়ে উঠতে পারল না তারা। এখনও বড় বাড়ির হুকুম হলে তারা সব করতে পারে। মেঘনাদ চৌধুরি তার শালিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাসোহারা উঠে গেছে। তবু এক অদৃশ্য নিয়মে এরা এখনও তাদের প্রভুই। এইসব সামন্ত প্রভুর স্বরূপ চিনিয়ে দিতেই তো বাবুদা মার্কসবাদের পাঠশালা খুলেছিল। অতীশ শিখেওছিল অনেক, কিন্তু তাতে কাজ বিশেষ হয়নি। আজও বড় বাড়িতে ঢুকতে ঘাড় নুয়ে পড়ে। স্মৃতি খারাপ জিনিস, শ্লথ করে দেয় মানুষকে, ব্যাহত হয় গতি, তবু বড় বাড়িতে ঢুকলেই দামাল সব স্মৃতি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাগানটা খুব আস্তে আস্তে পার হল অতীশ।

সামন্ততান্ত্রিক সিঁড়িটার গোড়ায় এসে ঊর্ধ্বমুখ হল সে। কেন যে এত উঁচু উঁচু বাড়ি বানাত সে আমলের লোকেরা ! একতলা থেকে দোতলায় উঠতেই যেন হাজারটা সিঁড়ি। গুনতিতে হাজার না হলেও টাটানো কুঁচকি নিয়ে উঠতে হাজারটারই পেরাসনি পড়ে যাবে।

বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়। এত রোগা, সাদা আর বিষণ্ণ হয়ে গেছে এ যেন বাস্তবের বন্দনা নয়, অনেকটাই বিমূর্ত, তাকে দেখেই বন্দনা ঝঙ্কার দিল, এতক্ষণে আসার সময় হল ! মা সকাল থেকে উপোস করে বসে আছে। কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে তোমার ! মা, ওমা, দেখ শাঁখ বাজাবে না উলু দেবে। তোমার পূজনীয় পুরুত ঠাকুর এসে গেছে।

বাকি সিঁড়ি কটা নিজেকে হিঁচড়ে টেনে তুলতে দম বেরিয়ে গেল অতীশের। উঠে খানিকক্ষণ হাঁফ সামলাল। কাল স্পোর্টসের মাঠে এই কুঁচকি তাকে কতটা বহন করবে কে জানে !

বড় বাড়ির পুজোর ঘরটি চমৎকার। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো মেঝে, মস্ত কাঠের সিংহাসনে বিগ্রহ বসানো, সামনে পঞ্চপ্রদীপ, ধূপ। স্থলপদ্ম আর শিউলির গন্ধে ম ম করছে চারদিক। পুরুতের জন্য মস্ত পশমের আসন পাতা।

তার ভিতরে দুজন লোক ঢুকে বসে আছে। রাখাল ভট্টাচার্য আর কার্ল মার্কস। যখন মার্কসবাদের পাঠশালায় পাঠ নিত তখন থেকেই তার ভিতরে এই দুজনের ধুন্ধুমার লড়াই। কখনও এ ওকে ঠেসে ধরে, কখনও ও একে পেড়ে ফেলে। মাঝে মাঝে লড়াই এমন তুঙ্গে ওঠে যে কে কোন জন তা চেনাই যায় না। কেউ হয়তো কার্ল ভট্টাচার্য হয়ে যায়, কেউ হয়ে যায় রাখাল মার্কস। এই দুজনের পাল্লায় পড়ে সে হয়েছে একটি বকচ্ছপ। আস্তিক না নাস্তিক তা বোঝা দুস্কর।

আচমন সেরে সে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, যজ্ঞ হবে নাকি কর্তামা ?

কর্তামা পাটায় চন্দন ঘষতে ঘষতে বললেন, হবে না মানে ?

হবে ? ডোবালে। বসতেই কুঁচকি আর এক দফা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। এই প্রবল অস্বস্তি নিয়ে কতক্ষণ টানা যায় ?

এই দুর্দিনেও পাড়া ঝেঁটিয়ে বুড়োবুড়ি এসে জুটেছে। মস্ত ঠাকুরঘরে দেয়াল ঘেঁসে সার সার আসনে তারা বসা। সব ক জোড়া চোখ তার দিকে। পুজোয় ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।

এই কি তোদের পুরুত নাকি রে বন্দনা ? এ মা, এ তো বাচ্চা ছেলে। পারবে ?

পারে তো ! পুরুতেরই ছেলে।

তবু ভাই, পুরুত একটু বয়স্ক না হলে যেন মানায় না।

খুব সাবধানে মুখটা একটু ফিরিয়ে কোনাচে চোখে মেয়েটাকে একবার দেখে নিল অতীশ। শ্যামলা রং, কিন্তু মুখখানা ভারী সুশ্রী। চোখ দুটো একটু কেমন যেন। যেন এক জোড়া সাপ হঠাৎ বেরিয়ে এসে ছোবল দিল।

অতীশ উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল।

রাখাল ভট্টাচার্য সংস্কৃত শিখেছিলেন টোলে। উচ্চারণটি নিখুঁত। অতীশ শিখেছে রাখাল ভট্টাচার্যের কাছে। সংস্কৃত মন্ত্রের একটা গুণ হল, উচ্চারণ ঠিক হলে আর কণ্ঠস্বরে সঠিক সুরের একটা দোল লাগাতে পারলে আজও হিপ্নোটিক। শুধু গরিব কেন, বড়লোকেরও আফিং।

আফিংটা ক্রিয়া করছে নাকি ? ঘরটা হঠাৎ চুপ মেরে গেল ! গলাটা উঁচুতেই তুলেছে অতীশ। রাখাল ভট্টাচার্য এইরকমই শিখিয়েছে তাকে। মন্ত্র উচ্চগ্রামে পাঠ করতে হয়, তাতে বাড়ির সর্বত্র মন্ত্রের শব্দ পৌঁছয়, তাতে বায়ু পরিশ্রুত হয়, জীবাণু নাশ হয়, অমঙ্গল দূর হয়। মন্ত্রের অত শক্তি আছে কি না জানে না অতীশ। আছে কি নেই বিচার করার সে কে ? তার কাজ হল করে যাওয়া। ভাল যদি কিছু হয় তো হোক।

যজ্ঞ শেষ করে শান্তিজল ছিটিয়ে অতীশ উঠল। ঘোষাল ঠাকুমা ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এসে এক গাল হেসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কী পুজোটাই করলি দাদা আজ ! স্বচক্ষে দেখলুম ঠাকুর যেন নেমে এসে সিংহাসনে বসে হাসছেন।

বটে ঠাকুমা ? বলে অতীশ একটু হাসল।

তোর ওপর কি আজ ভর হয়েছিল দাদা ?

তা হয়তো হবে। কত কী ভর করে মাথায়।

ও দাদা, তুই বি কম পাশ এত ভাল পুরুত, ভদ্রলোকের ছেলে, তার ওপর বামুন, রিক্সা চালানোটা ছেড়ে দে না কেন দাদা ! ও কি তোকে মানায় ?

রিক্সা চালানোর কথা উঠলেই মুশকিল। কর্তামা নিজেও একদিন না জেনে তার রিক্সায় উঠেছিলেন। ভাড়া দেওয়ার সময় মুখের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠলেন, তুই ! তুই রিক্সা চালাচ্ছিস ?

শ্রমের মর্যাদার কথা এঁদের বুঝিয়ে লাভ নেই। এঁরা বুঝবেন না। তাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। কর্তামা রাগের চোটে কেঁদেই ফেললেন প্রায়। তুই না আমাদের পুরুত ! ছিঃ ছিঃ, তোর রুচিটা কী রে ?

তার এক সহপাঠিনী অনুকাও না জেনে তার রিক্সায় উঠেছিল। মাঝপথে হঠাৎ অতীশ রিক্সা চালাচ্ছে টের পেয়ে চলন্ত রিক্সা থেকে লাফিয়ে পড়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে কুমড়ো গড়াগড়ি।

তবু তো বেগুনের বস্তার কথা এরা জানে না।

ঘোষাল ঠাকুমা তার ডান হাতখানা ধরে আছে এখনও, ওসব তোর সইবে না রে ভাই। ছেড়ে দে।

ঘোষাল ঠাকুমা তার তেরো বছরের নাতনি সুচরিতার সঙ্গে অতীশের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। তার মায়ের কাছে প্রস্তাব গেছে। মা হেসে বলেছে, আপনার নাতনিকে আমার ছেলে খাওয়াবে কী মাসিমা ? ছেলে আগে দাঁড়াক।

ঘোষাল ঠাকুমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতীশ দাঁড়াবেই।

দাঁড়াতেই চাইছে অতীশ, তার মতো আরও বহু ছেলে ছোকরাও দাঁড়াতে চাইছে। দাঁড়াতে গিয়েই যত ঠেলাঠেলি আর হুড়োহুড়ি। পলিটিক্স করে বাবুদা দাঁড়িয়ে গেল, মস্তানি করে ল্যাংড়া। অতীশ কি পারবে ? যে গলিপথ সে অতিক্রম করছে তার শেষে জয়মাল্য নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, অতীশ জানে।

কর্তামা পেতলের গামলায় সিন্নি মাখতে মাখতে মুখ তুলে বললেন, কী কাণ্ড হয়েছে জানিস ? তোদের ওই ল্যাংড়া দলবল নিয়ে আমাদের বাগানের ভিতরে ঢুকে দেয়াল টপকে বাইরে বোমা মারছিল। উল্টে বাইরের ছেলেরাও ভেতরে বোমা ফেলেছে। কী কাণ্ড বাবা, ভয়ে দরজা জানালা এঁটে ঘরে বন্ধ হয়ে ছিলাম। গোপালটা বাগানেই থাকে। বুড়ো মানুষ, হার্টফেল হয়ে মারা যেতে পারত। মদন তাকে ভিতরবাড়িতে টেনে আনতে গিয়েছিল, এই বড় ছোরা নিয়ে মদনকে এমন তাড়া করেছে যে পালানোর পথ পায় না।

অতীশ চুপ করে রইল। এরকমই হওয়ার কথা।

কর্তামা করুণ মুখ করে বললেন, সন্ধেবেলা হীরেন দারোগা এসে কথা শুনিয়ে গেল। আমরা নাকি ষণ্ডাগুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। ঘটনা পুলিশকে জানাচ্ছি না। আমাদের বাড়িতে নাকি বোমা মজুত রাখা হয়। আজ আমি ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি বিক্রি করে দেব। শাওলরাম মাড়োয়ারি কিনতে চাইছে। ছেলে মেয়ে রাজি ছিল না বলে মত দিইনি। আজ ঠিক করে ফেলেছি। এত বড় বাড়ি ঝাড়পোঁছে কষ্ট, ট্যাক্সও গুনতে হয় একগাদা। আমাদের এত বড় বাড়ির দরকার কী বল !

দেয়ালটা সারালে হয় না কর্তামা ?

সে চেষ্টাও কি করিনি। মিস্ত্রি বলল, দেয়াল ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, ভাঙা জায়গায় গাঁথনি দিলে দেয়ালসুদ্ধু পড়ে যাবে। মেরামত করতে হলে চল্লিশ ফুট দেয়াল ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথতে হবে। তার অনেক খরচ।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নাইলনের ব্যাগে ভরে অতীশ যখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে তখন মেয়েটা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে ডাকল, শুনুন !

অতীশ মুখ তুলে শ্যামলা মেয়েটিকে দেখতে পেল। ছিপছিপে চেহারা। চোখ দুখানা এত জিয়ন্ত যে তাকালেই একটা সম্মোহনের মতো ভাব হয়।

কিছু বলছেন ?

আপনার সংস্কৃত উচ্চারণ কিন্তু খুব সুন্দর।

ও। তা হবে।

আপনি বোধহয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের একটু নকল করেন, তাই না ?

অতীশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তা হবে।

তবু বেশ সুন্দর। আমি দীপ্তি। বন্দনার পিসতুতো দিদি।

ও। অতীশ আর তা হবে বলল না। বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল অবশ্য।

আমি খুব বিচ্ছু মেয়ে। ভাব করলে টের পেতেন। কিন্তু আপনি যা গোমড়ামুখো, ভাব বোধ হয় হবে না।

আমি বড় সামান্য মানুষ। আমার সঙ্গে ভাব করে কী হবে ? ভাব হয় সমানে সমানে।

তাই বুঝি। আমি কিন্তু জমিদার-বাড়ির কেউ নই। সামান্য একজন অধ্যাপকের মেয়ে। আমার অত প্রেজুডিস নেই। আপনি কি নিজেকে খুব ছোট ভাবেন ?

নিজেকে যে কী ভাবে অতীশ তা কি সে নিজেই জানে! কথাটার জবাব না দিয়ে সে একটু হাসল।

আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। কিন্তু আসতে না আসতেই কী কাণ্ড! শহরটা যে একটু ঘুরে দেখব তার উপায় নেই। আপনি আমাকে শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন ?

আমি ?

নয় কেন ? আমার তো আর সঙ্গী নেই। বন্দনা সবে জ্বর থেকে উঠেছে, বিলু ছেলেমানুষ, মামিমার শরীর ভাল নয়। কে আমার সঙ্গী হবে বলুন তো! দেখাবেন প্লিজ ?

কীসে ঘুরবেন ? হেঁটে ?

কেন, আপনার রিক্সায়!

মেয়েটা অপমান করতে চাইছে কি না বুঝবার জন্য অতীশ চকিতে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটার মুখে একটু রসিকতা নেই। একটু ঝুঁকে চাপা আন্তরিক গলায় বলল, আপনি রিক্সা চালান জেনে আমি ভীষণ ইমপ্রেসড। মুভ্‌ড্‌। এরকম সাহস কারও দেখিনি। আমি আপনার সঙ্গেই ঘুরতে চাই। রিক্সা চালিয়ে আপনি এই সমাজকে শিক্ষিত করছেন। আপনাকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

অতীশের হাসি পাচ্ছিল। এত শক্ত কথা সে ভাবেনি। বলল, আচ্ছা।

কালকেই। সকালে যখনই আপনার সময় হবে। প্লিজ!

বাড়ি ফিরে যখন কুঁচকিতে গরম চুন-হলুদ লাগাচ্ছিল তখন অতীশ মাকে জিজ্ঞেস করল, ও বাড়ির দীপ্তিকে চেনো ?

কে দীপ্তি ? বন্দনার সেই পিসতুতো বোনটা নাকি ?

হ্যাঁ।

বড়দি সেলাই করতে করতে বলল, পাজির পা-ঝাড়া।

মা বলল, স্বামীটা তো ওর জ্বালাতেই বিষ খেয়ে মরল। একটা দু বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা। স্বামী এক কাঁড়ি টাকা রেখে গেছে। পায়ের ওপর পা তুলে খাচ্ছে।

অতীশ অবাক হয়ে বলল, বিধবা ? কই, দেখে মনে হল না তো!

মা একটু বিষ মেশানো গলায় বলে, মনে হবে কী করে ? ডেঁড়েমুশে মাছ মাংস খাচ্ছে, রংচঙে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেন্ট পাউডার লিপস্টিক মাখছে, কুমারী না বিধবা তা বোঝার জো আছে।

বড়দি দাঁতে একটা সুতো কেটে বলল, চরিত্রও খারাপ।

মেয়েদের এই একটা দোষ। কারও কথা উঠলেই তার দোষ ধরে নিন্দেমন্দ শুরু করে দেবে। এ বাড়িতে সেটা খুবই হয়ে থাকে। মা আর দিদিদের প্রিয় পাসটাইম।

মা বলল, হঠাৎ ওর কথা কেন ?

অতীশ গম্ভীর গলায় বলল, আলাপ হল।

বড়দি বলল, তবে মেয়েটার গুণও আছে। নাচ গান জানে, লেখাপড়া জানে। কলেজে পড়ায়।

মা বলল, অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন।

ব্যাগটা উপুড় করল মা। তারপর জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে থেকে বলল, এই দিল ? চাল তো আধ কেজিও হবে না। এই নাকি ভুজ্যি ? কাঁচা পেঁপে, ছটা আলু, উচ্ছে, দুটো বেগুন, আর দশটা টাকা মোটে দক্ষিণা! বড় বাড়ির নজর নিচু হয়ে যাচ্ছে। আগে কত দিত।

বড়দি বলল, কর্তামা আর পারে না। ওদের আয় কী বলো তো!

নেই-নেই করেও আছে বাবা। পুরনো জমিদারদের কত কী লুকোনো থাকে।

কর্তামার নেই মা। তার দরাজ হাত। থাকলে কি বাড়ি বিক্রি করার কথা ভাবত ?

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যখন অনেক রাতে খাটিয়া নিয়ে ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় শুতে যাচ্ছিল অতীশ, তখনও ওই দুটো চোখ বার বার ছোবল দিচ্ছিল তাকে। একটা মৃদু বিষ নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। একটা ফিকে জ্যোৎস্না উঠেছে আজ। চারদিক ভুতুড়ে। শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। মাঝরাতে দূরে বোমার শব্দ শুনতে পেল, পুলিশের জিপ আর ভ্যান দ্রুত চলে গেল, কোথায় একটা সমবেত চিৎকার উঠল।

প্রদীপদা খুন হল রথতলার তেমাথায়। রাত তখন দেড়টা বা দুটো। তারা চারজন ছিল। প্রদীপদা, সে, দলের আর দুটো ছেলে। রথতলার তেমাথার কাছ বরাবর সুনসান রাস্তায় আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে আট দশ জন ছেলে দৌড়ে এল বাঁ দিক থেকে। মুখে কালিঝুলি মাখা। হাতে রড, চপার, ড্যাগার। আত্মরক্ষার জৈব তাগিদের বশেই তাদের দলের দুটো ছেলে ছিটকে পালিয়ে গেল। প্রদীপ—গোঁয়ার প্রদীপ পালাল না। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, অ্যাই, কী হচ্ছে ? কী চাও তোমরা ?

ব্যস, ওইটুকুই বলতে পেরেছিল প্রদীপ। পরমুহূর্তেই ঘিরে ফেলেছিল আততায়ীরা। চার-পাঁচ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে শরীরে স্তম্ভন টের পেয়েছিল অতীশ। পালায়নি, কিন্তু সেটা বীরত্বের জন্য নয়। ভয় আর বিস্ময়ে তার শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন দৌড়ে এসেছিল তেমনি দৌড়ে আবার অন্ধকারে পালিয়ে গেল ওরা। অতীশ খুব ধীরে, সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল প্রদীপের কাছে। প্রদীপের শরীর থেকে প্রাণটা তখনও বেরোয়নি। খিঁচুনির মতো হচ্ছে। শরীরটা চমকে চমকে উঠছে। গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা গার্গলের মতো শব্দ হচ্ছিল। রক্তে স্নান করছিল প্রদীপ। ওই রক্তের মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করছিল অতীশ, প্রদীপদা ! প্রদীপদা !

একবার চোখ মেলেছিল প্রদীপ। কিন্তু সে চোখ কিছু দেখতে পেল না। তারপর ধীরে ধীরে খিঁচুনি কমে এল। শরীরটা নিথর হয়ে গেল।

গোটা মৃত্যুদৃশ্যটা প্রায় নিষ্পলক অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিল অতীশ। এইভাবে মানুষ মরে !

দলের ছেলেরা এল একটু বাদে। তুমুল চিৎকার করছিল তারা। রাগে, আক্রোশে। প্রদীপদাকে কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তখন ঘাড় লটকে গেছে, হাতপাগুলো ঝুলছে অসহায়ের মতো, শরীরে প্রাণের লেশটুকু নেই।

বাবুদা তাকে ধরে তুলে নিয়ে এল সুবিমল স্যারের বাড়িতে। বলল, কী হয়েছিল সব বল।

প্রথমটায় কথাই এল না তার মুখে। জিভ শুকিয়ে গেছে, ভাষা মনে পড়ছে না। তাকে জল খাওয়ানো হল, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল। তারপর বলতে পারল হেঁচকি আর কান্না মিশিয়ে।

পুলিশ তাকে জেরায় জেরায় জেরবার করে ছেড়েছিল। কর্তামা তাকে জর্জরিত করেছিলেন বিলাপে, তুই ছিলি, তবু বাঁচাতে পারলি না ওকে ? কীসের বন্ধু তুই ? কেমন বন্ধু ?... ওরে, সেই সময়ে কি একবার মা বলে ডেকেছিল ? জল চেয়েছিল ? নিরীহ মানুষ কর্তাবাবু পর্যন্ত বন্দুক নিয়ে খুনিকে মারবেন বলে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কাকে মারবেন তিনি ? আততায়ী কি একজন ? পরে পুলিশ তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বন্দুক নিয়ে যায়।

সেই ঘটনার পর পলিটিকস থেকে সরে এল অতীশ। তারপর থেকেই সে একা হয়ে গেল। সংকীর্ণ করে নিল নিজের জীবন-যাপনকে। পলিটিকস সে সত্যিকারের করেওনি কখনও। শুধু প্রদীপদার সঙ্গে লেগে থাকত বলে যেটুকু করা। তখন মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, সেই বয়সে বুঝতও না কিছু।

পাড়ার মধ্যে একটা হুটোপাটির শব্দ পাওয়া গেল। একদল ছেলে দৌড়ে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে। একটা কুকুর কেঁদে উঠল শাঁখের মতো শব্দ তুলে। একটা টর্চ জ্বলে উঠল কোথায় যেন। নিবে গেল ফের।

কাল সকালে উঠে একটু দৌড় প্র্যাকটিস করতে হবে। তারপর বেগুনের দাম তুলতে হবে। বাবার জ্বর না ছাড়লে আলুর দোকানে বসতে হবে। দুপুরে প্রগতি সংঘের স্পোর্টসে নামতে হবে। আর... আর... দীপ্তিকে রিক্সায় চাপিয়ে শহর দেখাতে হবে।

কাছেপিঠে দুম দুম করে উপর্যুপরি দুটো বোমা ফাটল। একটা মস্ত হাই তুলল অতীশ। ঘুম

পাচ্ছে। ইস্কুলবাড়ির খোলা বারান্দায় আজকাল গভীর রাতে বেশ ঠাণ্ডা লাগে। ভোর রাতে রীতিমতো শীত করে। গায়ে চাদরটা টেনে সে শুয়ে পড়ল।

দুখানা মায়াবী, রহস্যময় চোখ তার দুচোখে চেয়ে রইল। ওই চোখ দুখানাই তাকে পৌঁছে দিল ঘুমের দরজায়। ঘুমের মধ্যেও যেন চেয়ে রইল তার দিকে। পলকহীন, হিপ্নোটিক।

॥ তিন ॥

তাদের একটা খোকা হয়েছে। তারা খুব কষ্টে আছে, অভাবের কষ্ট, মনের কষ্ট, ছেলেমেয়ের জন্য মন-কেমন করা। যদি ফিরে আসতে চায় তবে রেণু কি কিছু মনে করবে ? এটুকু কি মেনে নিতে পারবে না ? তারা না হয় নীচের তলায় স্টোর রুমে থাকবে, মুখ দেখাবে না। রমার হাঁফানি আবার বেড়েছে, কে জানে বাঁচবে কি না, ছোট খোকাটারও বড্ড অসুখ হয় ঘুরে ঘুরে। রেণু কি পারবে রমাকে একটু মেনে নিতে ? জীবনের তো আর খুব বেশি বাকি নেই। কে কতদিনই বা আর বাঁচবে ? আয়ু তো ফুরিয়েই আসছে। রেণু কি পারবে না সেই কথা ভেবে ক্ষমা করে নিতে ?

পাছে ডাকে চিঠি মারা যায় এবং পাছে ডাকের চিঠির জবাব মা না দেয় এবং পাছে নিজের ঠিকানা রেণুকে জানাতে হয় সেই জন্যই চিঠিটা মেঘনাদ পাঠিয়েছেন দীপ্তির হাতে।

চিঠিটা নিয়ে মা গভীর রাতে বিছানায় এল। তাকে ডেকে বলল, পড়।

বন্দনা অবাক হয়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, কার চিঠি মা ?

তোর বাবার।

বাবা ! গলায় যেন একটা আনন্দের ঝাপটা লাগল। বাবা চিঠি দিয়েছে ! এর চেয়ে বড় খবর আর কী হতে পারে ? চিঠিটা খুলল বন্দনা, তারপর ধীরে ধীরে পড়ল। প্রত্যেকটা শব্দ দুবার তিনবার করে। এ তার বাবার হাতের লেখা। এ চিঠিতে বাবার স্পর্শ আছে। আনন্দ আর বিষাদের একটা উথালপাথাল হচ্ছিল বুকের মধ্যে। চিঠি পড়তে পড়তে চোখ ভরে জল এল। বাবাকে কত কাল দেখে না বন্দনা ! মা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। কিন্তু চেয়ে থাকা আর দেখা তো এক জিনিস নয়। মায়ের দু চোখও ভেসে যাচ্ছিল জলে।

কত বড় অপমান বল তো ? রমাকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে থাকতে চাইছে ! আমার চোখের ওপর ! আমার নাকের ডগায় ! এমন নির্লজ্জও হয় মানুষ !

কেঁদো না মা। কেঁদো না। বাবা তো লিখেইছে, খুব কষ্টে আছে।

কষ্টে তো থাকবেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে না ! বিনা দোষে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল, ছেলেমেয়ে দুটোর কথা পর্যন্ত ভাবল না একবার। প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছিল যে নিজের মুরোদ কতটুকু তা অবধি মনে ছিল না। এখন তো কষ্ট পাবেই।

বাবাকে তুমি কী লিখবে মা ?

কী লিখব ? কিচ্ছু লিখব না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক। এ চিঠির আমি কোনও জবাব দেব না। ঠিকানাটা পর্যন্ত জানানোর সাহস হয়নি। পাছে আমি পুলিশ লেলিয়ে দিই। এই তো মুরোদ।

দীপ্তিদি বাবার ঠিকানা জানে না মা ?

বলছে তো জানে না। সত্যি বলছে কি না কে জানে। হয়তো জানে, বলতে চাইছে না। ও হয়তো বারণ করে দিয়েছে।

দীপ্তিদি কি চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছে মা ?

তাই তো মনে হচ্ছে, নইলে হুট করে আসবে কেন ? এতদিন তো খোঁজখবরও নেয়নি। চিঠিটা হাতে দেওয়ার আগে অনেক নাটক আর ন্যাকামি করে নিল। রাতের খাওয়ার পর ওর ঘরে ডেকে নিয়ে 'কিছু মনে কোরো না মামি, রাগ কোরো না মামি' এইসব বলে খুব মামার দুর্দশার ইতিহাস শোনাল। মামার খাওয়া জোটে না, রোগা হয়ে গেছে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে, বাজারে অনেক দেনা, এইসব। মামা নাকি আমাদের জন্য দিনরাত কাঁদে, বোনের কাছে গিয়ে দুঃখের কথা বলে।

কত কী। এইসব ভূমিকা করে চিঠিটা বের করে দিল।

মায়ের কঠোর মুখখানার দিকে চেয়ে বুক শুকিয়ে গেল বন্দনার। তার মা কাঁদছে বটে, কিন্তু কাঁদছে ঘেন্নায়, আক্রোশে, অপমানে। বাবাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না মা। কিন্তু বন্দনার বুকটা ব্যথিয়ে উঠছে বাবার কষ্টের কথা জেনে। তার ভাবে ভোলা, কবির মতো মানুষ বাবা যে কখনও কোনও কষ্ট সহ্য করতে পারত না!

দীপ্তিকে কী বলেছে জানিস?

কী মা?

বলেছে চিঠিটা পড়ার সময় আমার মুখের ভাব কেমন হয় তা যেন ভাল করে লক্ষ করে। দীপ্তিই হাসতে হাসতে বলছিল। আরও বলল, মামা তোমাকে এত ভয় পায় যে তোমার কথা উঠলেই কেমন যেন ফ্যাকাসে আর নার্ভাস হয়ে যায়। এসব ন্যাকামির কথা শুনলে কার না গা জ্বলে যায় বল তো!

বন্দনা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, বাবা তো তোমাকে একটু ভয় পায় মা।

ছাই পায়। ভয় পেলে আমার নাকের ডগায় রমার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে পারত?

বন্দনা তার দুর্বল দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবাকে ছাড়া কত দিন কেটে গেল আমাদের বলো তো! বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। যদি সত্যিই না খেতে পেয়ে বাবা মরে যায় তখন কী হবে মা?

তার আমি কী করব? যদি এসে সত্যিই হাজির হয় তা হলে তো তাড়াতে পারব না। এ বাড়ি-ঘর তো তারই। আমি কে? যদি সত্যিই আসে তা হলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

দীপ্তিদিকে তুমি কিছু বলেছ মা?

এখনও বলিনি। কাল বলে দেব, ওর মামা ইচ্ছে করলে আসতে পারে। বিষয়-সম্পত্তির মালিক তো সে-ই। তবে যদি আসে তা হলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

কোথায় যাবে মা?

এ শহরে থাকার অনেক জায়গা আছে।

বন্দনা চুপ করে রইল। তারা কেউই অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারল না। ছুটছাট বোমার আওয়াজ শুনল। পুলিশের জিপ কতবার টহল দিল পাড়ায়। মাঝে মাঝে বিকট চেঁচামেচি হচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দনা খুব নরম সতর্ক গলায় ডাকল, মা।

কী?

ধরা গলায় বন্দনা বলল, বাবার জন্য আমার মন বড্ড কেমন করছে মা। বাবাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওই সর্বনাশীকে কেন যে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম! দীপ্তি বলছিল, রমার নাকি শরীর খুব খারাপ। হাঁফানিতে যদি মরত তা হলেও হাড় জুড়োত। কিন্তু শুনতে পাই হাঁফানির রুগিরা নাকি অনেককাল বাঁচে।

রমা মাসির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্দনার। কী করুণ আর সুন্দর মুখখানা! রমা মাসি মরে গেলে কি খুশি হবে বন্দনা? একটুও না। রমা মাসি বেঁচে থাকুক, বাবা ফিরে আসুক, মা আর বাবার মিলমিশ হয়ে যাক— হয় না এরকম? ভগবান ইচ্ছে করলে হয় না?

মা বলল, তার ওপর আবার বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে। ঘেন্নায় মরে যাই। লজ্জা শরমের যদি বালাই থাকত। ফিরে তো আসতে চাইছে, এসে পাঁচজনকে মুখ দেখাবে কোন লজ্জায়? লোকে ছি-ছি করবে না? গায়ে থুথু দেবে না?

বন্দনার কাছে তার বাবা যা, মায়ের কাছে তো বাবা তা নয়। বাবা শত অপরাধ করে থাকলেও বন্দনার বুক ভরে আছে বাবার প্রতি ভালবাসায়। বাবার অপরাধ তার কাছে ক্ষমার যোগ্য মনে হয়। মায়ের কাছে তো তা নয়। তার মতো করে বাবাকে কেন যে ভালবাসতে পারে না মা সেইটেই বুঝতে পারে না বন্দনা।

অন্য পাশ ফিরে সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। বাবার জন্য বড় ভার হয়ে আছে বুক। বাবা

খেতে পায় না, বাবা বড় কষ্টে আছে। তার চোখ ভেসে যায় জলে।

মাও যে ঘুমোতে পারছে না তা টের পায় বন্দনা। মা ছটফট করছে। এপাশ ওপাশ করছে। উঠে উঠে জল খাচ্ছে।

মা আর বাবার কি আর কোনওদিন মিলমিশ হবে না ভগবান ?

দীপ্তি অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। ভোরবেলা দুবার তার ঘরে গিয়ে ফিরে এল বন্দনা। আটটা নাগাদ যখন দীপ্তি উঠে ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছে তখন গিয়ে বন্দনা তাকে ধরল।

আমাকে বাবার কথা একটু বলবে দীপ্তিদি ?

দীপ্তি খুব সুন্দর করে হাসল। বলল, আয়, বোস। তোকে মামি কিছু বলেছে বুঝি ?

হ্যাঁ। বাবার চিঠি পড়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবা বুঝি তোমাদের বাড়ি যায় ?

আগে যেত না। মামা তো লাজুক মানুষ। একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলায় খুব লজ্জায় ছিল। তবে ইদানীং যায়।

বাবার কি খুব কষ্ট দীপ্তিদি ?

দীপ্তির মুখখানা উদাস হয়ে গেল। বলল, কষ্ট ! সে কষ্ট তোরা ভাবতেই পারবি না। হাওড়ার একটা বিচ্ছিরি বস্তির মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া করে আছে। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে। বাথরুম নেই, কল নেই। রাস্তার কলে গিয়ে চান করতে হয়। বারোয়ারি পায়খানা। একদম নরক। যে ঘরে থাকে সেখানেই তোলা উনুনে রান্নাবান্না। মামাকে দেখলে চিনতে পারবি না, এত রোগা হয়ে গেছে। মাথার চুল প্রায় সবই উঠে গেছে। একটা লোহার কারখানায় কী যেন সামান্য একটা চাকরি করে, উদয়াস্ত খাটায় তারা। কী যে অবস্থা, দেখলে চোখে জল আসে।

শুনতে শুনতেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল বন্দনা। বলল, আরও বলো দীপ্তিদি।

কেন শুনতে চাস ? যত শুনবি তত কষ্ট। অমন একটা সুখী শৌখিন মানুষের যে কী দুর্দশা হয়েছে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

কাঁদতে কাঁদতে বন্দনা বলল আমাদের কথা বলে না ?

বলে না আবার ! তোদের কথা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদে।

বন্দনার হিক্কা উঠছিল। বলল, আমাকে ঠিকানাটা দেবে দীপ্তিদি ?

ঠিকানা ! সেই বস্তির কি ঠিকানা-ফিকানা আছে ? থাকলেও ঘরের নম্বর-টম্বর তো জানি না। একদিন মামা আমাকে আর মাকে নিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার মুখেভাত হল তো, আয়োজন টায়োজন কিছু করেনি। একটু পায়েস রেঁধে মুখে ছোঁয়াল। সেদিনই মাকে আর আমাকে নিয়ে গিয়েছিল জোর করে। বলল, আমার তো আর এখানে স্বজন কেউ নেই, তোরাই চল। তাই গিয়েছিলাম। গিয়ে মনে হল, না এলেই ভাল হত। বাচ্চাটাও হয়েছে ডিগডিগে রোগা। এত দুর্বল যে জোরে কাঁদতে অবধি পারে না।

বন্দনা আকুল হয়ে বলল, কী হবে বলো তো দীপ্তিদি ?

পেস্ট মাখানো ব্রাশটা হাতে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দীপ্তি। তারপর বলল, মামি বোধহয় রাজি হবে না, না ?

মা বলছে বাবা এ বাড়িতে এলে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

সে তো ঠিক কথাই। এ তো আর আগের যুগ নয় যে, পুরুষমানুষরা দুটো-তিনটে বউ নিয়ে একসঙ্গে থাকবে। মামাকে আমি সে কথা বলেওছি। একজনকে ডিভোর্স করো।

বাবা কী বলল ?

মামা কাউকে ত্যাগ করতে পারবে না। বড্ড নরম মনের মানুষ তো, একটু সেকেলেও।

বন্দনা ধরা গলায় বলল, আমার বাবা বড্ড ভাল। কিন্তু বুদ্ধি নেই। ওই রমা মাসিই তো সব গণ্ডগোল করে দিল।

দীপ্তি বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর তাই মনে হয় ? আমার কিন্তু রমাকে খারাপ লাগেনি। খুব নরম সরম, খুব ভিতু আর ভদ্র। সে বারবার বলছিল, ডিভোর্স করলে আমাকেই করুক। আমাদের তো তেমন করে বিয়েও হয়নি। কালীঘাটের বিয়ে, ওটা না মানলেও হয়। কিন্তু রেণুদি

তো ওঁর সত্যিকারের বউ। আমি রাক্ষসী, রেণুদির সর্বনাশ করেছি।

রমা মাসিকেই কেন ডিভোর্স করুক না বাবা।

দীপ্তি করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেটা কি খুব নিষ্ঠুরতা হবে না ? রমা কোথায় যাবে বল তো ! বাপের বাড়িতে গেলে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। আর তো ওর কেউ নেই। মামা ত্যাগ করলে ওকে ভিক্ষে করতে হবে। নইলে সুইসাইড।

বন্দনা একটু শিউরে উঠল। না, সে ওসব চায় না। রমা মাসিকে তার কখনও খারাপ লাগত না। শুধু বাবার সঙ্গে ওরকম হল বলে—

দীপ্তি বলল, মামা কিছুতেই রমাকে ছাড়তে পারবে না। দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে। অত অভাব, অমানুষিক কষ্ট, তবু ভালবাসে। এ যুগে এরকমটা ভাবাই যায় না।

এই ভালবাসার কথা শুনে বন্দনার একটুও ভাল লাগল না। বাবা কেন রমা মাসিকে এত ভালবাসছে ? বাবার তো ভালবাসার কথা মাকে।

দীপ্তি বাথরুমে গেলে বন্দনা এল পড়ার ঘরে। অস্থির। এ ঘরে বিলু শোয়। এখনও ঘুমোচ্ছে পড়ে।

এই বিলু, ওঠ ! উঠবি না ?

কয়েকবার নাড়া খেয়ে বিলু উঠল।

কী রে দিদি ? তুই কাঁদছিস কেন ?

তোর বাবার কথা মনে হয় না ?

বিলু অবাক হয়ে বলে, কেন হবে না ? বাবার কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি। বাবা এখন খেতে পায় না জানিস ? খুব কষ্টে আছে।

কে বলল ?

বাবার চিঠি এসেছে। দীপ্তিদি সব জানে।

বিলু ঘুম-ভাঙা চোখে একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। ছেলে বলেই বোধহয় বিলু খানিকটা ভুলে থাকতে পারে। তার আছে বাইরের জগৎ, আছে খেলা, আছে নানা কৌতূহল। বন্দনার ততটা নয়। অসুখে পড়ে থেকে সে সারাক্ষণ বাবার কথা ভেবেছে। তার অসুখ হলে বরাবর বাবা এসে বিছানায় সারাক্ষণ পাশে বসে থাকত। বড় নরম মনের মানুষ।

বিলু হঠাৎ বলল, বাবা কী চাকরি করে ?

একটা কারখানায় কী যেন করে। সামান্য কাজ।

বিলু আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তোকে কাঁদতে দেখে আমি ভেবেছিলাম বাবা বুঝি মরেটরে গেছে।

যাঃ। কী যে বলিস !

বিলুও উঠে কলঘরে গেল। পড়ার টেবিলে চুপ করে বসে রইল বন্দনা। তার সামনে সমস্যাটা যেন একবোঝা জট-পাকানো উল। তাতে গিঁট, ফাঁস, জড়িয়ে মড়িয়ে একশা। বাবা, মা, রমা মাসি এই তিনজন মিলে কী যে একটা পাকিয়ে তুলল !

বাবুদা এল সাড়ে আটটা নাগাদ। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। পরনে ধুতি আর সাদা শার্ট। বাবুদাকে প্যান্ট ট্যান্ট পরতে কখনও দেখেনি বন্দনা। মুখখানা সর্বদাই ভদ্রতায় মাখা। সবসময়ে নরম গলায় কথা বলে। কথাবার্তায় শিক্ষা আর রুচির ছাপ আছে। বাবুদা একা নয়, সঙ্গে কয়েকটা ছেলে। এ বাড়ির আজকাল আর আগল নেই। বাবুদা সোজা ওপরে উঠে এল।

বন্দনা দরদালানে লেনিনের ছবিটার নীচেই একটা চেয়ারে বসে একখানা শরৎ রচনাবলী পড়ার চেষ্টা করছিল। আজ মন বসছে না। মনটা বড্ড উড়ুউড়ু। মনটা বড় খারাপ। নইলে আজও সোনালি মিঠে রোদ উঠেছে। আজও সুন্দর দিনটি। শুধু বন্দনার চোখই সুন্দর দেখছে না কিছু।

বাবুদাকে দেখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে। বাবুদা বলল, উঠতে হবে না। বোসো। তুমি খুব ভুগে উঠলে, না ?

হ্যাঁ। আমার টাইফয়েড হয়েছিল।

খুব রোগা হয়ে গেছ।

হ্যাঁ।

মাসিমা কোথায় ?

বাবুদাকে দেখলে বা কথাবার্তা শুনলে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে, গতকাল এই বাবুদাই দলবল নিয়ে ল্যাংড়াকে টিট করতে এসেছিল। কেউ বিশ্বাস করবে না এই বাবুদা কাল ওরকম সাঙ্ঘাতিক বোমাবাজি করে গেছে।

বন্দনা বলল, আপনি বসুন, মাকে ডাকছি।

মা রান্নাঘরে জলখাবারের তদারকি করছিল। মুখখানা ভার, বিষণ্ণ। সারা রাত মা ঘুমোয়নি, জানে বন্দনা।

মা, বাবুদা এসেছে। তোমাকে ডাকছে।

মা বিরক্ত হল। বলল, কী চায় বাবু ?

তা জানি না।

মা আঁচলে হাতটা মুছতে মুছতে বলল, যা, যাচ্ছি।

মা আসতেই বাবুদা চেয়ার ছেড়ে বিনয়ী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

কেমন আছেন মাসিমা ?

আমি ভাল নেই। বড় অশান্তিতে আছি। কিছু বলবে ?

হ্যাঁ মাসিমা। কাল ল্যাংড়া আর তার দলের ছেলেরা ও বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে আমাদের ওপর বোমা মেরেছে।

জানি।

ও নাকি এখানে একটা ডেরা করেছে ?

তা করেছে।

আমাদের সেটা কেন জানাননি মাসিমা ? জানালে আমরা কবে ওকে সরিয়ে দিতাম।

কাকে বারণ করব বলো তো ? আজকাল আমার বাগানে কত লোক সারাদিন ঢোকে। নারকেল পেড়ে নিয়ে যায়, গাছ থেকে ফল নিয়ে যায়, ফুল নিয়ে যায়। এমনকী আজকাল ছাগলও বেঁধে রেখে যায় দেখছি। দেয়াল সারালে হয়তো হয়। কিন্তু তার অনেক খরচ। মিস্ত্রিরা বলে গেছে ত্রিশ ফুট দেয়াল ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথতে হবে।

সেটা পরের কথা। ল্যাংড়া যাতে এখানে ঢুকতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আপনি পারমিশন দিলে আমাদের দলের কয়েকটা ছেলে পালা করে পাহারা দেবে। তারা ভাল ছেলে।

মা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, পাহারা দেবে ?

আপনার আপত্তি থাকলে নয়। আপনাদের পিছনের দিকের ফাঁকা গোয়ালঘরটায় বসেই বোধহয় ওরা বোমা বাঁধে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ বাড়ি কি রক্ষা হবে বাবু ? বড্ড ভয় পাচ্ছি।

আমাদের জানালে এত কাণ্ড ঘটত না।

বড় বাড়ির অবস্থা কি আর তোমরা জানো না। দুটো নাবালক ছেলেমেয়ে, বুড়ো মালি, বাহাদুর আর মদনকে নিয়ে থাকি। আমাদের সহায়-সম্বল তো কিছু নেই। কাল কিন্তু বাইরে থেকেও বাড়ির ভিতরে বোমা পড়েছে।

জানি মাসিমা। কাজটা উচিত হয়নি। আমি ক্ষমা চাইছি। তা হলে অনুমতি দিচ্ছেন ?

তোমার দলের ছেলেরা আবার অশান্তি করবে না তো ? ধরো যদি ল্যাংড়া ঢুকতে চায় তবে তারা হয়তো মারদাঙ্গা করবে।

না মাসিমা। ল্যাংড়া বাড়াবাড়ি করলে তারা গিয়ে শুধু আমাদের খবর দেবে।

তাতে যদি আমাদের ওপর ল্যাংড়ার আক্রোশ হয় ?

অত ভয় পাবেন না মাসিমা। গুণ্ডাবাজি খতম করার চেষ্টাই তো আমরা করছি। ল্যাংড়া ভয়

পেয়ে পালিয়েছে। সে তেমন কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই।

দেখো বাবা, আমি কিন্তু খুব অসহায় মানুষ।

অসহায় কেন মাসিমা ? আমরা তো আছি। আমরা সবাই প্রদীপের বন্ধু। প্রদীপের মতো সাহসী ছেলে কটা হয় ? আপনি একজন সাহসী সৈনিকের মা।

মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। আঁচলে চোখ চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিক আছে।

বাবু যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন মা তাকে আবার ডাকল, বাবু, শোনো।

কী মাসিমা ?

আমাকে সস্তায় একটা বাসার খোঁজ দিতে পারো ?

বাসা ? কেন মাসিমা ?

আমার বড় দরকার। একখানা ঘর হলেও চলবে। কিন্তু ভাড়া বেশি যেন না হয়। তুমি তো অনেককে চেনো, একটু খোঁজ নেবে ?

ঠিক আছে।

খুব তাড়াতাড়িই চাই কিন্তু।

দেখব মাসিমা।

বাবু চলে যাওয়ার পর বন্দনা অবাক হয়ে বলল, কার জন্য বাসা খুঁজছ মা ? কে থাকবে ?

আমরা থাকব। তুই, আমি আর বিলু।

কেন মা ?

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি তোর বাবাকে একটা চিঠি লিখব। বলব চলে আসুক সে। তার বাড়িঘর বুঝে নিক। সুখে থাকুক। আমি তার পথের কাঁটা, সরে যাব।

এত তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেললে মা ? বাবা তো লিখেছে আমাদের জন্যও তার মন কেমন করে। তাই আসতে চাইছে।

তুই কিচ্ছু বুঝিসনি। আসল কথা, নিজের বাড়ির দখল চাইছে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লিখলেও আসল কথা হল তাই।

বন্দনা কী করে মাকে বোঝাবে যে, বাবা মোটেই বাড়ির দখল চায়নি। বাবা চেয়েছে এ বাড়ির এক কোণে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে ভিখিরির মতো একটু আশ্রয়। তার বাবা একটা গর্হিত অন্যায় করে ফেলেছে ঠিকই, তবু বাবা একজন চমৎকার মানুষ। একজন কবির মতো মানুষ। একজন নরম ও উদাসী মানুষ।

মা সে কথা বুঝল না। বলল, তাকে তোরা আর কতটুকু চিনিস ? আমি চিনি হাড়ে হাড়ে। চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে থাকতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে। এখন সে এসে নতুন বউ, নতুন ছেলে নিয়ে সুখের সংসার পাতুক। আমরা বিদেয় হয়ে যাব।

কিন্তু বন্দনার এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এ বাড়ির মধ্যে কত পুরনো বাতাস, কত অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা, কত স্বপ্নের মতো ব্যাপার আছে! এ বাড়ি ছেড়ে গিয়ে কি সে বাঁচবে ?

সকাল নটায় একটা রিক্সা এসে সামনের উঠোনে থেমে পঁক পঁক করে হর্ন দিচ্ছিল। শরৎ রচনাবলী রেখে বন্দনা গিয়ে ঝুঁকে দেখে অবাক। রিক্সায় অতীশ সিটে বসে আছে। উর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে বারান্দার দিকে। দেখে বন্দনার ভিতরটা জ্বলে গেল।

কী চাও !

অতীশ গম্ভীর মুখে বলল, তোমার কলকাতার দিদি আসতে বলেছিল। শহর দেখবে।

তোমার রিক্সায় ?

হ্যাঁ।

রাগে এত গরম হয়ে গেল তার মাথা যে সে কিছুই বলতে পারল না। খানিকক্ষণ জ্বালাভরা চোখে অতীশের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, তুমি না একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিলে ?

হ্যাঁ।
তবু চালাচ্ছ ?
গাড়ি চালালে একটা দুটো অ্যাকসিডেন্ট হয়ই।
এত অপমান লাগছিল বন্দনার যে, বলার নয়। সে উঠে দীপ্তির ঘরে গেল।
এই দীপ্তিদি।
দীপ্তি একটা হলুদ জমি, কালো টেম্পল পাড়ের শাড়ি পরছিল যত্ন করে। স্নান করে এসেছে। ভেজা চুল এলানো রয়েছে পিঠের ওপর। হাসিমুখে বলল, কী রে ?
তুমি অতীশদাকে রিক্সার কথা বলেছ ?
হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে গেল দীপ্তির। চোখ উজ্জ্বল হল। বলল, কী সাঙ্ঘাতিক ছেলে বল তো !
সাঙ্ঘাতিকটা আবার কীসের দেখলে ?
বি-কম পাশ, ওরকম ভাল চেহারা, কী ভাল সংস্কৃত উচ্চারণ, ভাল অ্যাথলিট, সেই ছেলে রিক্সা চালায়, এটা একটা দারুণ ব্যাপার নয় ?
আমার তো রাগ হয়।
আমার শ্রদ্ধা হয়। ও ছেলে যখন রিক্সা চালায় তখন সেইসঙ্গে এই সমাজকে যেন অপমান করে। যে দেশ ওরকম একটা ছেলের দাম দিতে পারে না, সে দেশকে এভাবেই অপমান করা উচিত।
বন্দনা এসব তত্ত্ব বোঝে না। তবে অতীশ রিক্সা চালালে তার ভীষণ লজ্জা করে। সে কুঁকড়ে যায়।
প্লিজ দীপ্তিদি, তুমি ওর রিক্সায় উঠো না। আমি বাহাদুরকে পাঠিয়ে অন্য রিক্সা আনিয়ে দিচ্ছি।
দীপ্তি অবাক হয়ে বলে, ও মা ! কেন রে ? তুই কি ভাবিস আমার বেড়ানোর খুব শখ হয়েছে ? তোদের অখাদ্য শহর দেখার একটুও ইচ্ছে আমার নেই। আমি ওর রিক্সায় উঠতে চেয়েছি, সেটা একটা থ্রিলিং এক্সপেরিয়েন্স হবে বলে। ও চালাবে, আমি বসে বসে দেখব রাস্তায় ভদ্রলোকদের মুখগুলো কেমন হয়ে যায়।
কাঁদো-কাঁদো মুখে বন্দনা বলল, কিন্তু ও তো রিক্সাওলা নয় দীপ্তিদি ! ওরা যে ভদ্রলোক ! ও অমন বিচ্ছিরি লোক বলেই রিক্সা চালায়।
তুই অমন অস্থির হচ্ছিস কেন ? ওর প্রতিবাদটা বুঝতে পারছিস না ? টের পাস না যে এটা ওর বিদ্রোহ ? ভদ্রতার মুখোশ টেনে খুলে দিতেই তো চাইছে ও। আমি এরকম সাহসী ছেলে দেখিনি।
বন্দনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে দৌড় পায়ে বেরিয়ে এল। দুর্বল শরীর সইল না, বারান্দায় এসে সে উবু হয়ে বসে পড়ল মুখ ঢেকে। নীচে অতীশের রিক্সা যেন তাকে ঠাট্টা করতেই হর্ন দিচ্ছে। পঁক পঁক।
দীপ্তির ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে বন্দনার। দীপ্তিদি যেন কী !
সে হামাগুড়ি দিয়ে রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেল।
নীচে অতীশ তার রিক্সায় বসে আছে। সেদিকে চেয়ে থেকে বন্দনা মনে মনেই বলল, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।
অতীশ হঠাৎ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বলে, তোমার দিদিকে তাড়াতাড়ি করতে বলো। মাত্র দু ঘণ্টার কড়ারে রিক্সা এনেছি। বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে গণেশকে রিক্সা ফেরত দিতে হবে।
রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে রইল বন্দনা। তার রাগ হচ্ছে, তার অপমান লাগছে। আজকের দিনটা তার ভাল যাচ্ছে না। শুয়ে শুয়েই সে শুনতে পেল দীপ্তিদির হালকা চটির শব্দ চটুল গতিতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। রিক্সা দুবার হর্ন দিল, পঁক পঁক।
ঘরের মধ্যে কান্না পাচ্ছে বন্দনার। হাঁফ ধরে যাচ্ছে, আজ কী ভীষণ খারাপ একটা দিন।
শরৎশেষের সকালবেলায় চমৎকার একটা সোনালি আলো পাঠালেন ভগবান। সেই আলোর সঙ্গে পাঠালেন শিরশিরে উত্তুরে হাওয়া। আলো হাওয়ায় মাখামাখি হয়ে চারদিকে নানা কাণ্ড ঘটতে

লাগল। বাগানে গাছের ছায়ায় বেতের চেয়ারে বসে বন্দনা দেখছিল। মনে মনে নানা কথা, নানা উল্টোপাল্টা চিন্তা। বাবার চিঠিটা সে কতবার পড়েছে তার ঠিক নেই। শরৎ রচনাবলীর মধ্যে যত্ন করে রাখা চিঠিটা আবার বের করল। সস্তা খাম, এক্সারসাইজ বুক থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া পাতায় ডট পেন দিয়ে লেখা। চিঠিটার চেহারাই এমন গরিবের মতো যে, কষ্ট হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে মাকে লেখা বাবার এই চিঠির ভিতর দিয়েই সে এই অকরুণ পৃথিবীকে খানিকটা বুঝে নিচ্ছিল।

বাবার চিঠিটা আর একবার খুলে পড়তে যাচ্ছিল বন্দনা, এমন সময়ে হঠাৎ সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে একটা ছেলে উঠে দাঁড়াল। এমন চমকে গিয়েছিল বন্দনা।

এঃ, তুই যে একদম শুঁটকি মেরে গেছিস! কী হল তোর?

বন্দনার বুকটা ধকধক করছিল, বলল, এমন চমকে দিয়েছিস!

অবু, অর্থাৎ অবিনশ্বর অতুলবাবুর ছেলে, শিখার ভাই এবং তারই সমবয়সী। শিখাদের বাড়িতে তারা একসঙ্গে কত ক্যারম লেখেছে! অবু বেশ লম্বা চওড়া, নবীন দাসের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করে।

তোর কি অসুখ ফসুখ কিছু করেছিল নাকি রে বন্দনা?

টাইফয়েড।

তাই অত রোগা হয়ে গেছিস। তোকে চেনাই যাচ্ছে না। রোজ ছোলা ভেজানো খা, আর এক গ্লাস করে ঘোল, আর দু চামচ ব্র্যান্ডি মেশানো দুধ, দেখবি তাকৎ এসে যাবে।

তোর মতো হোঁতকা না হলেও আমার চলবে।

আমি হোঁতকা নাকি? আমি হলাম মাসকুলার। বাইসেপ দেখবি?

মা গো! ওসব কিলবিলে মাস্‌ল দেখলে আমার বিচ্ছিরি লাগে। বোস না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

আরে, বসবার জন্য কি এসেছি নাকি? তোদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছি।

পাহারা দিচ্ছিস! তার মানে?

তোদের বাড়িতে নাকি ল্যাংড়া একটা ঠেক করেছে! সেই জন্যই বাবুদা পাঠাল পাহারা দিতে। ল্যাংড়া অবশ্য পালিয়ে গেছে। তবু যদি আসে।

বন্দনা হেসে ফেলল, তুই একা পাহারা দিচ্ছিস! ইস, কী আমার বীর রে!

অবু একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমি একা নই। বিশ্বজিৎ আর অমল নামে দুটো ছেলেও আছে। ওদের রিভলভার আছে। আমি হচ্ছি মেসেনজার। কিছু হলে দৌড়ে গিয়ে খবর দিতে হবে বাবুদাকে।

বন্দনা ভয় পেয়ে বলল, রিভলভার! রিভলভার কেন বল তো!

অবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ভয় পেলি নাকি? আরে দূর, আজকাল রিভলভার টিভলভার হাতে হাতে ঘোরে। কোনও ব্যাপারই নয়। আজকাল রিভলভার হল খেলনা। আসল জিনিস হল স্টেনগান, এ কে ফর্টি সেভেন, এইসব।

তুই খুব পেকেছিস কিন্তু অবু।

অবু হি হি করে হাসল। সবে গোঁফের রেখা উঠেছে, ফর্সা, গোল মুখের অবু এখন কত ছেলেমানুষ। বলল, আজ তা হলে তুই কলসি রেসে নামছিস না?

বন্দনা লজ্জায় রাঙা হল। বরাবর সে প্রগতি সংঘের স্পোর্টসে কলসি মাথায় দৌড়ে নাম দেয়। আজ অবধি একবারও পারেনি। তার মাথা থেকে কলসি পড়বে কি পড়বেই। সে লজ্জায় হাসতে লাগল, যাঃ।

তোর ঠ্যাং দুটো খুব সরু সরু তো, তাই তোর ব্যালান্স নেই। ললিতাদি যোগ ব্যায়ামের ক্লাস খুলেছে। ভর্তি হবি? দুদিনে চেহারা ফিরিয়ে দেবে।

যাঃ। ব্যায়াম জিনিসটা এত বাজে আর একঘেয়ে।

আর শুঁটকি হয়ে থাকা বুঝি ভাল?

শুঁটকি আছি বেশ আছি, তোর তাতে কী? আজকাল রোগা হওয়াই ফ্যাশন, জানিস?

তা বলে তোর মতো রোগা নয়। তুই তো বারো মাস ভুগিস। আজ জ্বর, কাল সর্দি, স্কিপিং করলে পারিস।

ওসব আমার ভাল লাগে না। ক্যারম খেলবি অবু ?

অবু তার কবজির ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে বলল, ক্যারম খেলব কী রে ? আমি এখন অন ডিউটি রয়েছি না ! আমি এখন ব্ল্যাক ক্যাট। কম্যান্ডো। তোদের সিকিউরিটি গার্ড।

ল্যাংড়াকে দেখলেই তো পালাবি।

অবু হি হি করে হাসল। তারপর বলল, ল্যাংড়া তোদের বাড়িতে ঢুকে কী করে বল তো ! বোমা ফোমা বাঁধে নাকি ?

ঠোঁট উল্টে বন্দনা বলে, কে জানে কী করে ! আমাদের বাড়িটা তো এখন খোলা হাট।

জানিস তো আজ অপরূপা দিদিমণি বস্তিতে মিটিং করবে ! সবাইকে নাকি ডেকে ডেকে বলবে ল্যাংড়াকে সাপোর্ট করার জন্য। ল্যাংড়া নাকি পাড়ার লোকের উপকার করে বেড়ায়, পাড়ার জুয়ার ঠেক নাকি সেই ভেঙেছে, ল্যাংড়ার জন্যই মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশানে বাবুদাদের ক্যান্ডিডেট বিধুবাবু জিততে পারেনি। অপরূপাদি সবাইকে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। আমরা নাম দিয়েছি ল্যাংড়া বাঁচাও আন্দোলন।

বন্দনা করুণ মুখ করে বলল, কিন্তু অপরূপাদি দারুণ পড়াত। এত সুন্দর সুন্দর গল্প বলত ক্লাসে।

আরে সে তো আমিও জানি। দিদিও তো পড়ত ওর কাছে। কিন্তু ল্যাংড়ার সঙ্গে অ্যাফেয়ারের পর অপরূপাদি একদম ভোগে চলে গেছে। ল্যাংড়াকে পার্টিতে ঢুকতে দিচ্ছে না কে জানিস তো অপরূপাদি। আরে, আজকাল পার্টির শেল্টার না পেলে কেউ কি কিছু করতে পারে ? ল্যাংড়া যদি মরে তবে অপরূপাদিই কিন্তু রেস্‌পনসিবল।

বন্দনা চোখ পাকিয়ে বলল, তুই এত পেকেছিস কবে থেকে রে ? খুব পার্টি করে বেড়ানো হচ্ছে ?

আরে না। পার্টি ফার্টি তারাই করে যাদের হাতে মেলা সময় আছে। আমার বলে হেভি পড়ার চাপ, তার ওপর বডি বিল্ডিং, সময় কোথায় ? তবে বাবুদা বা সুবিমল স্যার বললে মাঝে মাঝে ফ্যাক খেটে দিই। বাবাকে তো জানিস, পার্টি করলে পুঁতে ফেলবে।

তা হলে করিস কেন ?

সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে কিছু কিছু করি। পলিটিকস নয় বাবা। তোদের বাড়ি পাহারা দেওয়াটাও তো একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক, নাকি ? আফটার অল তোরা একসময়ে আমাদের জমিদার ছিলি। একটা দায়িত্ব আছে।

নাঃ, তুই সত্যিই খুব পেকেছিস।

অবু হি হি করে হাসল।

তোর ভয় করে না অবু ?

কীসের ভয় ?

জানিস তো, আমার দাদার কী হয়েছিল !

জানব না কেন ? স্যাড ব্যাপার।

পিছন দিকে একটু দূরে একটা কর্কশ লাউড স্পিকারে মাইক টেস্টিং শুরু হতেই কথা থামিয়ে উৎকর্ণ হল অবু। তারপর বলল, ওই বোধহয় অপরূপাদির মিটিং শুরু হল। যাই, শুনে আসি। ইন্টাররেস্টিং ব্যাপার হবে।

অবু হালকা পায়ে বাগানটা পার হয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে বেরিয়ে গেল। গাছের ছায়ায় একা ঝুম হয়ে বসে রইল বন্দনা। হাতে বাবার চিঠি। মাথার মধ্যে কত চিন্তা ভেসে ভেসে ছায়া ফেলে যাচ্ছে। আজ তার মনে হল, পৃথিবীতে তাদের মতো দুঃখী মানুষ আর কেউ নেই।

সে শুনতে পাচ্ছিল, বহু দূরে একটা বিচ্ছিরি লাউড স্পিকারে অপরূপা দিদিমণি চিৎকার করে একটা ভাষণ দিচ্ছে। কী বলছে তা এত দূর থেকে শোনা গেল না। ল্যাংড়াকে বন্দনা পছন্দ করে না ঠিকই, তবু অপরূপা দিদিমণি যে ওর জন্য এত বিপদ মাথায় নিয়েও একটা লড়াই করছে এটা খুব

ভাল লাগে বন্দনার। সে নিজে তো কারও জন্য কখনও লড়াই করেনি। তার তো কোনও লড়াই নেই। 'ল্যাংড়া বাঁচাও আন্দোলন' বলে অপরূপাদিকে ঠাট্টা করে গেল বটে অবু, কিন্তু ঠাট্টা শুনে বন্দনার একটুও হাসি পায়নি। অপরূপাদিকে নিয়ে ঠাট্টা করার সে কে?

তার পোষা কয়েকটা কবুতর ছাদ থেকে নেমে এল ঝটপট করতে করতে। তারপর তার চেয়ার ঘিরে গুড়গুড় শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনটা যেন একটু ভাল হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফের অনেক কথার ছায়া এসে পড়ল মনের ওপর।

দীপ্তিদিকে তার কেন আর একটুও ভাল লাগছে না? এই মস্ত ফাঁকা বাড়িটায় তারা তিনটি মোটে প্রাণী। সে, বিলু আর মা। সারাদিন তারা নানা বিষণ্ণতায় ডুবে থাকে। তাই কেউ এলে ভীষণ আনন্দ হয় বন্দনার। তাকে আর ছাড়তেই চায় না। ঠিক যে রকম হয়েছিল রমা মাসির বেলায়। রমা মাসিকে চোখের আড়াল করত না সে! তারপর একদিন এমন হল যখন রমা মাসি ফিরে গেলে সে বাঁচে। শেষে রমা মাসি গেল বটে, কিন্তু নিয়ে গেল তার জীবনের সব আনন্দ, সব আলো, সব উল্লাস। কাল যখন দীপ্তিদি এল, তখন কী যে আনন্দ হয়েছিল বন্দনার। আজ মনে হচ্ছে, দীপ্তিদি চলে গেলেই ভাল। ওকে আর একটুও ভাল লাগছে না তার। বিধবা হয়েও মাছ-মাংস খায়, একাদশী অম্বুবাচী করে না, পুরুষদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে বেড়ায়। অতীশ কি এত সব জানে? জানে কি যে, দীপ্তিদির জন্যই তার বর আত্মহত্যা করেছিল? নিশ্চয়ই জানে না, জানলে এত মেশামেশি করত কখনও?

দীপ্তিদি আজ সকালে নিজের ঘরে খুব গুনগুন করে গান গাইছিল। খুশিতে মুখখানা খুব ডগোমগো। কীসের এত আনন্দ ওর? একজন বিধবার কি এত আনন্দ করা উচিত? বিশেষ করে যে বাড়িতে এত দুঃখ, এত শোকতাপ?

॥ চার ॥

টুপি মাথায় একটা লোক চেঁচিয়ে বলছিল, লাস্ট ল্যাপ! লাস্ট ল্যাপ! কথাটা অতীশের কানে ঢুকল, কিন্তু বোধে পৌঁছোল না। শেষ ল্যাপ বলে কিছু কি আছে? সামনে অফুরান মাঠ। চুনের দাগ যেন দূর পাল্লার রেল-লাইনের মতো অনন্তে প্রসারিত। ইনজেকশনের ক্রিয়া অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। তার কুঁচকিতে এখন কুমিরের কামড়। চিবিয়ে খাচ্ছে হাড়গোড়, মাংস, মজ্জা, আগুন জ্বলছে ব্যথার। আগের ল্যাপে সে ডিঙিয়েছে সুকুমার আর আজিজুলকে। তিন চার ফুট আগে দৌড়োচ্ছে গৌরাঙ্গ, আরও আগে নবেন্দু। অসম্ভব! অসম্ভব! এই দৌড়টা সে পারবে না।

কিন্তু সেই মানুষ পারে, যে কিছুতেই হার মানে না। আগের তিনটে রেস সে জিতেছে। তখন ইনজেকশনের ক্রিয়াটা ছিল, পাল্লাও কম। একশো, দুশো আর চারশো মিটার। চারশো মিটারের পর অনেকগুলো অন্য আইটেম ছিল। যত সময় গেল তত কমে গেল ওষুধের ক্রিয়া। ডাক্তার অমল দত্ত অবশ্য তাকে বলেছিলেন, এই পা নিয়ে দৌড়োবি? পাগল নাকি? তোর পায়ের অবস্থা ভাল নয়। স্ট্রেন পড়লে পারমানেন্টলি বসে যাবি।

কথাটা কানে তোলেনি সে। কাকুতি মিনতি করেছিল। ডাক্তার দত্ত একটু ভেবে বলেছিলেন, স্পোর্টসের ঠিক আগে আসিস। দিয়ে দেব।

পার্মানেন্টলি বসে যাওয়ার কথা শুনেও ভয় পায়নি অতীশ। ভয় পাওয়ার নেইও কিছু। এই দুটো পা তাকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু দুটো পাকে কী দিতে পেরেছে সে? পেটে পুষ্টিকর খাবার যায় না, যথেষ্ট বিশ্রাম নেই, যথোচিত ম্যাসাজ হয় না, এমনকী একজোড়া ভদ্রস্থ রানিং স্পাইক অবধি নেই। তবু অযত্নের দুখানা পা তার হাত ভরে দিয়েছে প্রাইজে। আর পা দুটোকে বেশি খাটাবে না অতীশ। বয়সও হচ্ছে। হাঁটাচলা বজায় থাকলে, আলু বেগুনের বোঝা বইতে পারলেই যথেষ্ট।

ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ করে মাঠের ওপর কয়েকজোড়া ক্লান্ত ভারী পা পড়ছে, উঠছে, পড়ছে উঠছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো। পাঁচ হাজার মিটারের শেষ ল্যাপ এক মারাত্মক ব্যাপার। দীর্ঘ দৌড়ের শেষে এসে জেতার ইচ্ছে উবে যায়, দিকশূন্য ও উদভ্রান্ত লাগে, বুক দমের জন্য আকুলি ব্যাকুলি

করে, হাত পা মাথা সব যেন চলে যায় ভূতের হেফাজতে। নিজেকে নিজে বলে মনে হয় না। অতীশের মাথা থেকে পায়ের তলা অবধি ঘামছে। গায়ের শার্ট ভিজে লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে। চোখ ধোঁয়া ধোঁয়া। বুদ্ধি কাজ করছে না। ধৈর্য থাকছে না, মনের জোর বলে কিচ্ছু নেই। কত দূর অবধি চলে গেছে চুনের দাগে চিহ্নিত ট্র্যাক! এই দৌড়টা মারতে পারলে সে হবে ওভার-অল চ্যাম্পিয়ন। চ্যাম্পিয়নকে আজ দেওয়া হবে একটা সাদা কালো টিভি। সেটা বেচলে হাজার বারোশো টাকা চলে আসবে হাতে। সুমিত ব্রাদার্সের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

তার অগ্রবর্তী দুজন দৌড়বাজের অবস্থাও তারই মতো। ঘাড় লটপট করছে। পা টানছে না, স্পিড বলে কিছু নেই। শুধু একটু ইচ্ছের ইনজিন টেনে নিচ্ছে তাদের।

মিউনিসিপ্যালিটির মাঠ ভাল নয়। একটা গর্তে বাঁ পাটা পড়তেই টাল খেল শরীরটা। পড়লে আর উঠতে পারবে না অতীশ। কী বলছিল লোকটা? লাস্ট ল্যাপ! সর্বনাশ! লাস্ট ল্যাপ! অতীশ কি পারবে না? ধোঁয়াটে মাথায় একটা লোকের চেহারা মনশ্চক্ষে দেখতে পেল অতীশ। না, লোকটাকে সে কখনও দেখেনি। তার ছবিও না। তবু দেখল। কোন অলিম্পিকে যেন ম্যারাথন দৌড়োচ্ছিল লোকটা। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে, মচকে গেছে পা। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তবু দৌড়ে যাচ্ছিল সে। প্রাইজের আশা ছিল না, শুধু দৌড়টা শেষ করতে চেয়েছিল। দৌড় শেষ করাই ছিল আসল কথা। শেষ অবধি সকলের পরে সে যখন স্টেডিয়ামে ঢুকল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। স্টেডিয়ামের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লোকটা শুধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে শেষ করছে দৌড়। সমস্ত স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়াল তার সম্মানে। করতালিতে ফেটে পড়ল চারদিক। বিজয়ী সে নয়, তবু এক অপরাজেয় মানব। কোনও মেডেলই পায়নি সে, তবু সে লক্ষ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল মানুষের আবহমানকালের সংগ্রামের ইচ্ছাকে।

পারব না? আমি পারব না? ভগবান! অতীশের সঙ্গে গৌরাঙ্গের দূরত্ব বাড়েনি। একই আছে এখনও। কিন্তু গৌরাঙ্গর কুঁচকিতে ব্যথা নেই। দূরত্বটা থেকেই যাবে।

একটা বাঁক আসছে। অতীশ বুক ভরে একটা দম নেওয়ার চেষ্টা করল। বুক হাফরের মতো শব্দ করে উঠল হঠাৎ। দুটো পায়ে নবতর শক্তি সঞ্চার করার জন্য অতীশ তার পা দুখানার উদ্দেশে বলতে লাগল, কাম অন! কাম অন বয়েজ! কাম অন...

একটা ছায়ার মতো গৌরাঙ্গকে নিজের পাশাপাশি দেখতে পেল অতীশ। তারপর ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে শুধু নবেন্দু।

আর কতখানি বাকি? চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না অতীশ। চারপাশটা কেমন যেন ছায়া-ছায়া, যেন ওয়াশের ছবির মতো আবছা! চোখে নেমে আসছে কপালের অবিরল ঘাম। একটা তীব্র, অসহনীয় ব্যথার গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে। এ ছাড়া শরীর-বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে তার। শুধু টেনে নিচ্ছে নিজেকে, হিঁচড়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রোগ ও জরাগ্রস্ত মানুষ যেভাবে প্রায় শবদেহের মতো নিজের অস্তিত্বকে আমৃত্যু টানে। কিন্তু শরীর কীসের জন্য, যদি তার কাছ থেকে আদায় না করা যায় অস্তিত্বের সুফল?

বহু দূরে সে ট্র্যাকের ওপর একটা টানা আবছা লাল ফিতে আর কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল। ওই কি শেষ সীমানা? নবেন্দু এখনও প্রায় চার পাঁচ ফুট আগে। এতটা গ্যাপ! অসম্ভব! অসম্ভব!

কে যেন অতীশের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, পারব! পারতেই হবে। কাম অন বয়েজ। কাম অন...

মাধ্যাকর্ষণ বড় প্রবল। তাকে টেনে নিতে চাইছে ভূমিশয্যা। তার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে জলে ডুব দিয়ে বসে থাকতে। ইচ্ছে করছে লেবুপাতা দিয়ে মাখা পান্তাভাত খেতে। তার ইচ্ছে করছে পৃথিবীর সব প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে।

সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য? জাগল অতীশ। দেখল। নবেন্দু কি আরও একটু এগিয়ে গেছে? নবেন্দুকে না সে আগেরবার অনেক পিছনে ফেলে জিতেছিল?

কাম অন বয়েজ! কাম অন!

দুটো পা লোহার মতো ভারী। শব্দ হচ্ছে ধপ ধপ। যেন হাতির পা। গোদা পা। তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না তারা।

নবেন্দু একবার ঘাড় ঘোরাল। তাকে দেখে নিল।

ভুল। মারাত্মক ভুল। ঘাড় ঘোরাতে নেই কখনও। অন্তত শেষ ল্যাপে নয়। দুটো কদম যোগ করে নিল অতীশ। গ্যাপ কমে গেছে। আর একটু... আর একটু...

গ্যাপ কমছে। কমছে।

কাম অন বয়েজ...

শরীরের একটা উথাল পাথাল তুলল অতীশ। দৌড়োচ্ছে না, যেন নিজেকে ছুড়ে দিচ্ছে সামনে। ঢেউয়ের মতো।

নবেন্দু দ্বিতীয় ভুল করল, আবার ফিরে তাকিয়ে। তার চোখে বিস্ময়। হাঁটুতে হাঁটুতে লেগে একবার ভারসাম্য হারাতে হারাতে সোজা হল নবেন্দু।

অতীশ মনে মনে বলল, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

একটা ঝটকায় তারা পাশাপাশি। কারা চিৎকার করছে মাঠের বাইরে থেকে? কাদের মিলিত কণ্ঠ জয়ধ্বনির মতো তার নাম ধরে ডাকছে, অতীশ! অতীশ!

শেষ কয়েক পা অতীশ দৌড়োল একশো মিটারের দৌড়ের মতো। প্রাণ বাজি রেখে।

লাল ফিতে বুক দিয়ে ছুঁয়ে সে একবার দুহাত ওপরে তুলবার চেষ্টা করল। তারপর সেই দুই হাতে একটা অবলম্বন খুঁজতে খুঁজতে চোখ ভরা অন্ধকার নিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাঠে। সে জিতেছে!

চোখে মুখে জলের ঝাপটা খেয়ে দু মিনিট বাদে তার জ্ঞান ফিরল। আরও দশ মিনিট বাদে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে উঠল সে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে। চারদিক ফেটে পড়ছে উল্লাসে। সে জানে, সে অলিম্পিক জেতেনি, বিশ্বরেকর্ড করেনি। ভারতবর্ষের এক ছোট্ট অখ্যাত শহরে জেলাওয়ারি একটা প্রতিযোগিতায় জিতেছে মাত্র। তার নাম ছোট্ট করেও বেরোবে না খবরের কাগজে। তার এই কৃতিত্বের কথা দর্শকরা দু দিন বাদেই ভুলে যাবে। হয়তো এই জয়ের দাম দিতে চিরকালের মতো বসে যাবে তার ডান পা। তবু নিজের ভিতরে সে এক নবীকরণ টের পেল। বারবার নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে তার এই ছোট বেঁচে থাকা যে বড় নিরর্থক হয়ে যায়!

হর্ষধ্বনি ও হাততালি, পিঠ চাপড়ানি আর হ্যান্ডশেক এ সবই অতি উত্তেজক জিনিস। তার চেয়েও মারাত্মক কিশোরী ও যুবতীদের চোখে ক্ষণেকের বিহ্বল ও সম্মোহিত চাহনি। যদিও এসবই অস্থায়ী, তবু সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারে না অতীশ। এই খেলার মাঠ থেকেই তার চোখের সামনে কতগুলো প্রেম হল, তাদের বেশ কয়েকটা বিয়ে অবধি গড়িয়ে গেল। মানুষ যখন হঠাৎ করে লাইমলাইটে চলে আসে তখন সাবধান না হলে মুশকিল। এ সবই অতীশ জানে। মাত্র এক বছর আগে এই মাঠেই এরকমই স্পোর্টসের দিনে শিখা তার প্রেমে পড়েছিল। ভি আই পিদের জন্য সাজানো চেয়ারে বসে হাঁ করে তার দৌড় দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে গেল, বিবশ হয়ে পড়ল। তারপরই ওদের কাজের মেয়ে ময়নার মারফত চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল অতীশের কাছে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এখানে সেখানে দেখা করতে বলত। অতুলবাবুর মেয়ে বলে কথা, তাকে অপমান করলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তার ঠিক কী? তাই দু একটা চিঠির জবাব ময়নার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল অতীশ। তাতে খুব বিনয়ের সঙ্গে সে জানিয়েছিল যে, সে মোটেই শিখার উপযুক্ত নয়। সে অত্যন্ত গরিব ও নাচার.. ইত্যাদি। দেখা-সাক্ষাতেও এসব কথাই সে বলত। কিন্তু শিখার তখন জ্বর-বিকারের মতো অবস্থা। দুনিয়া এক দিকে, অতীশ অন্য দিকে। শিখা তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। অতীশ পালিয়েছিল ঠিকই, তবে শিখাকে নিয়ে নয়, শিখার হাত থেকে। হাওড়ার কাছে একটা গ্রামে তার মামার বাড়িতে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। বাঁচোয়া এই যে, খেলার মাঠের এইসব সম্মোহন আর বিহ্বলতা বেশিক্ষণ থাকে না। বড্ড অস্থায়ী। চিতু নামে ডাক্তারি পাশ করা একটি ছেলে শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলল। বেঁচে গেল অতীশ। তবু তার সেই অ্যাকসিডেন্টটার কথা খুব মনে হয়। চালপট্টিতে শিখার গাড়ির ধাক্কায় সে

চিতপটাং হয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য বড় চোট হয়নি। সেদিনকার আর সব চোট তুচ্ছ মনে হয়, যখন মনে পড়ে, সেদিন শিখা তাকে চিনতে পারেনি।

দুটো একটা এরকম কেস কাটিয়ে উঠেছে অতীশ। আজ সারা সকাল আর এক জোড়া মুগ্ধ ও বিহ্বল চোখ তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। এ চোখজোড়া দীপ্তির। অতীশের চেয়ে অন্তত পাঁচ সাত বছরের বড় এবং বিধবা এবং সন্তানের মা। আজকাল অবশ্য ওসব কেউ মানছে না। সব দিকেই শুধু "বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও" স্লোগান। কিন্তু বাঁধ ভাঙার দুটো বাধা আছে। মার্কসবাদের পাঠশালায় নৈতিকতার একটা শিক্ষা ছিল। ফস্টিনস্টি জিনিসটা মার্কসবাদে গৃহীত নয়। অন্য দিকে তার পারিবারিক ধারাটাও ওরকমই কিছু একটা তার মধ্যে সঞ্চারিত করে থাকবে।

রিক্সা চালানোটা যে একটা ভীষণ বীরত্বের ব্যাপার এবং অতীশ রিক্সা চালিয়ে যে এই অন্তঃসারশূন্য সভ্যতাকে চাবুক মারছে, সভ্যতার মুখোশ টেনে খুলে ফেলছে—এসব শক্ত কথা তার কস্মিনকালেও মনে আসেনি। তার বাড়ির কেউ পছন্দ না করলেও অতীশ রিক্সা চালিয়েছে বসে না থেকে কিছু একটা করার তাগিদে। সেটা যে এরকম একটা মহান ব্যাপার তা দীপ্তিই আজ তাকে শিখিয়েছে। শহর দেখতে দেখতে তাকে একবার দীপ্তির সঙ্গে শহরের সবচেয়ে ভাল রেস্তোরাঁয় বসে গল্পও করতে হয়েছে। তখন দুখানা চোখের সব সম্মোহন উজাড় করে দিয়েছে দীপ্তি। কলকাতার মেয়ে তো, ওদের সব ব্যাপারে তাড়াহুড়া। মোটে সময় দিতে চায় না কিছুতে।

বলল, আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন। ওখানে অনেক স্কোপ। আমার ফ্ল্যাটটাও মস্ত বড়, দেড় হাজার স্কোয়ার ফুট। স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।

আর একটা শিথিল মুহূর্ত এল দুপুরবেলায় নির্জন নদীর ধারে কাছারির ঘাটে দাঁড়িয়ে। বটের ঝিরঝিরে ছায়া, নীচে ঘাট, ঘাটে ডিঙি নৌকো বাঁধা, জলের কুচি কুচি ঢেউয়ে রোদের হিলিবিলি। খপ করে তার হাতটা নিজের নরম কবোষ্ণ হাতে ধরে ফেলে দীপ্তি বলল, আপনাকে আমার এত ভাল লাগছে কেন বলুন তো। এই শোনো, এখন থেকে তোমাকে আমি তুমি বলব। তুমিও বলবে তো !

মফস্বলি মাথায় এসব সহজে ঢুকতে চায় না। এ যেন সিনেমা বা উপন্যাস। সত্যি নয়। ভদ্রতাবশে হাতটা ছাড়াতেও পারেনি অতীশ। খেয়ার মাঝি বুড়ো মৈনুদ্দিন তার খোড়ো ঘরের দরজায় বসে দৃশ্যটা দেখছিল।

দীপ্তি ধরা গলায় বলল, আমার কিছুরই অভাব নেই, জানো ? আমার হাজব্যান্ড প্রচুর রোজগার করত। ব্যবসা ছিল, শেয়ার কেনার নেশাও ছিল। ব্যাঙ্কে আমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পচছে। বছরে কত টাকা ডিভিডেন্ড পাই ভাবতেও পারবে না। অভাব কীসের জানো ? আমার ভালবাসার একটা লোক নেই। এমন একজন যার জন্য প্রাণপাত করে কিছু করতে ইচ্ছে করে। যাকে ঘিরে লতিয়ে ওঠা যায়। মেয়েদের তো লতার সঙ্গেই তুলনা করা হয়, না ?

মৈনুদ্দিন ঠিক এ সময়টায় গলা খাঁকারি দিয়েছিল। গলার দোষ হতে পারে, আওয়াজ দেওয়াও হতে পারে।

চলো, নৌকোয় একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে ?

তা গেল অতীশ। মরা নদীতে চর পড়ে গেছে অনেকটা। ওপাশের সরু ধারাটায় কিছু গভীরতা আছে, এপাশে হাঁটুজল। মৈনুদ্দিন চরটা পাক মেরে ওপাশের শ্মশানঘাট অবধি নিয়ে গেল। দীপ্তি মুগ্ধ, স্বপ্নাতুর। ডিঙির হেলদোলে বারবার মুখোমুখি বসা অতীশের হাত চেপে ধরছিল। ওর গা থেকে নানা ধরনের সুগন্ধি আসছিল তখন। অতীশ হলফ করে বলতে পারবে না যে, তার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু ভিতরে হচ্ছিল অন্যরকম। সেখানে যেন তুফানে পড়া নৌকো বাঁচাতে "সামাল সামাল" বলে গলদঘর্ম হচ্ছে দুই পাকা মাঝি। মার্কস আর রাখাল ভট্টাচার্য।

কাছারির ঘাটে যখন এসে নৌকো ভিড়ল তখন দীপ্তি একটু একটু মাতাল। অতীশের হাত জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে উঠে এল ভাঙা পাড় বেয়ে। বটগাছের ঝিরঝিরে ছায়ায় তার দুখানা চোখ তুলে শুভদৃষ্টির কনের মতো অতীশের দিকে স্বপ্নাতুর চেখে বলল, কী ভাল লাগল, না ?

অতীশ ভেবেছিল, এই অস্থায়ী সম্মোহনটা কেটে যাবে। সে রিক্সাটা টেনে এনে সামনে দাঁড়

করিয়ে বলল, এবার যেতে হবে।

দীপ্তি মাথা নেড়ে মিষ্টি হেসে বলল, না। এখনই না। একটু বোসো তো আমার পাশে।

অতীশ একটু গাঁইগুঁই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত ধরে টানলে সে কী করতে পারে? রিক্সা বড্ড ঘেঁস জায়গা। দুজনকে খুব চেপে ধরল একসঙ্গে।

দীপ্তি একটু হাসির ঝিলিক তুলে তার দিকে তাকাল। তাকাতেও পারে বটে মহিলা। তাকিয়ে তাকিয়েই খুনখারাবি করে দিতে পারে। অতীশ তো আর পাথর নয়। মার্কস এবং রাখাল ভট্টাচার্য দুজনেই সাধ্যমতো লড়েছেন। কিন্তু তাঁরা বুড়ো মানুষ, কটাক্ষের ধারে কচুকাটা হওয়ার জোগাড়। দুই বুড়ো হেদিয়ে পড়েছেন তখন। আর সেইসময়ে ডাইনির শ্বাসের মতো সর্পিল সব অদ্ভুত বাতাস আসছিল নদীর জল ছুঁয়ে। আর তখন রোদের আলোয় সঞ্চারিত হচ্ছিল ভুতুড়ে রং। আর দীপ্তির গা থেকে মদির এক গন্ধ আসছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে, দ্বিপ্রহরে, লোকলজ্জা ভুলে বসে ছিল অতীশ। ভগবানের দিব্যি, তার খারাপ লাগছিল না। ওইভাবে বসে থাকাটার কোনও কারণ নেই, প্রয়োজন নেই, তবু কেন যে ভাল লাগছিল তা কে বলবে?

কাছাকাছি মুখ, দীপ্তি তার গালে শ্বাস ফেলে বলল, তোমার এত গুণ, কেন যে মফস্বল শহরে পড়ে আছ! এখানে তোমার কিছু হবে না। তোমার কলকাতায় যাওয়া উচিত।

কলকাতায় গেলে তার কী হবে তা অতীশ বুঝতে পারল না। তবে সে প্রতিবাদও করল না। মার্কসবাদের শিক্ষা তাকে টাকাওলা লোকদের ঘৃণা করতেই প্ররোচিত করেছে। কিন্তু কার্যত তা পেরে ওঠেনি অতীশ। বরং টাকাওলা মানুষজনকে সে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই একটু সমীহ করতে থাকে। দীপ্তির প্রতিও তার সমীহের ভাবটা এসে পড়ছিল। তার সঙ্গে ছিল একটা শরীরী উত্তেজনা। আরও ছিল, একটু মোহময় ভাব। আরও কিছু থাকতে পারে। অত জটিল, সূক্ষ্ম ব্যাপার সে বুঝতে পারে না।

তুমি আমার কথাটার এখনও জবাব দাওনি।

অতীশ ভাবছিল। বটের ছায়ায় রিক্সার সিটে দীপ্তির পাশে বসে থেকে পরিষ্কার মাথায় কিছু ভাবা অসম্ভব। তবু প্রস্তাবটা তার মন্দ লাগেনি। কলকাতায় গেলে কী হবে তা সে জানে না। তবে অনেক সম্ভাবনা খুলে যেতে পারে। সে বলল, ভেবে দেখব।

বেশি ভাবতে গেলে কিছু হয় না, জানো? এটা ভাববার যুগ নয়। কুইক ডিসিশনের যুগ। চটপট ঠিক করে ফেলতে হয়। ভাবতে গেলে করাটা আর হয়ে ওঠে না।

মাত্র কাল রাতে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয়। আর আজ সকালের মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের আলাপে যে এতটা হতে পারে তা কী করে বিশ্বাস করবে অতীশ? কুইক ডিসিশনের যুগই হবে এটা। মফস্বল শহরে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যুগটা কেমন তা বুঝতে পারেনি এতদিন। যুগটা যদি এতটাই এগিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে এত পিছন থেকে দৌড়ে যুগটাকে কি ধরতে পারবে সে?

আজ তার মাথা কিছুটা বিভ্রান্ত। কোন এক রহস্যময় কারণে বয়সে বড়, বিধবা, সন্তানবতী এক মহিলা তাকে টানছে। বড্ড টান।

বিশু ভ্যানগাড়িটা ডেকে নিয়ে এল। বলল, চলো গুরু, মাল গস্ত করতে হবে।

মাঠটা ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে আসছে। রোদ মরে সন্ধে নামতে আর দেরি নেই। বিস্তর গাড়ি জড়ো হয়েছিল। এক একটা গাড়িতে ভি আই পিরা একে একে মাঠ ছেড়ে যাচ্ছে। ম্যারাপের একটু পশ্চিমে আতা গাছটার তলায় পায়ের কাছে সাজানো চারটে ব্রিফকেস, একটা টিভি বাক্স আর হাতে একটা মস্ত খাবারের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতীশ। হাততালি, হর্ষধ্বনি থেমে গেছে, বিহ্বল ও সম্মোহিত যুবতী ও কিশোরীরা রওনা হয়ে গেছে যে যার বাড়িতে। একটু ফেকলু লাগছে নিজেকে এখন। সে বলল, চল।

বিশু মাল তুলে ফেলল গাড়িতে। বলল, কুঁচকির খবর কি?

দড়ির মতো ফুলে আছে। ইলেকট্রিক শকের মতো ব্যথা।

পা-টা কি ভোগে চলে যাবে গুরু?

যায় যাবে। উদাস গলায় বলল অতীশ।

আফসোস কি বাত।

ভ্যানগাড়ির পেছনদিকে দুজনে দুধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় ভ্যানগাড়ি ঝকাং ঝকাং করে লাফাচ্ছে। তাতে কুঁচকির ব্যথা ঝিলিক মেরে উঠছে মাথা অবধি।

মেয়েছেলেটা কে গুরু ?

কোন মেয়েছেলেটা ?

যাকে আজ খুব ঘোরালে।

ব্যথায় মুখটা একটু বিকৃত করে অতীশ বলল, সওয়ারি।

ফেস কাটিংটা ভাল। বলে বিশু চুপ করে গেল।

ছোট শহর, এখানে সবাই সব জেনে যায়। লুকোছাপা করার উপায় থাকে না। কলকাতা এরকম নয়। যা খুশি করো, কেউ গায়ে মাখবে না। অতীশ একটু গুম মেরে রইল। ফেস কাটিংটা ভাল—একথা বলার মানে কী ?

সুমিত ব্রাদার্স ভাল পার্টি। মাল গস্ত করে দু হাজার টাকা পেয়ে গেল অতীশ। সকালে বেগুনের দাম তুলেছে পাইকারের কাছ থেকে। আজকের দিনটা ভালই। কতটা ভাল তার আরও হিসেব নিকেশ আছে।

সবটা টাকার হিসেব তো নয়। আজকের দিনটা যেন একটা মাল্টি ভিটামিন ক্যাপসুল। একটাই দিন, কিন্তু তার মধ্যে যেন অনেকগুলো দিনের ঘটনাবলি কেউ ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অতীশের মাথা এত নিতে পারছে না। একটু টলমল করছে। শুধু বারবার বিশুর কথাটা ঘুরে ফিরে টোকা মারছে মাথায়, ফেস কাটিংটা ভাল। তার মানে কি, তাকে আর দীপ্তিকে নিয়ে গালগল্প ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ? ফেস কাটিংটা ভাল এ কথার ভিতর কি চাপা ইঙ্গিত আছে ? ও কি বলতে চাইছে, চালিয়ে যাও গুরু, মালটা খারাপ নয় ?

খাবারের বাক্সটা দুজনে ভাগাভাগি করে খেল ইস্কুলের ফাঁকা মাঠে জ্যোৎস্নায় বসে। দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ, দুটো সন্দেশ, একটা ফিস ফ্রাই আর দুটো কলা। সব শেষে যখন কলাটা খাচ্ছে দুজনে সেই সময়ে পর পর দুটো বোমার শব্দ হল কাছেপিঠে।

বিশু কান খাড়া করে শুনে বলল, আজ লাগবে।

অতীশ শুধু বলল, হুঁ।

কলার খোসাটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিশু বলল, ল্যাংড়া আজ এন্ট্রি নেবে। বুঝলে ! আজ বিকেলে পুলিশ পিকেট উঠে গেছে। এই মওকা।

॥ পাঁচ ॥

চোখের ওই বিহ্বল দৃষ্টি, মুখের ওই সম্মোহিত ভাব এসবই চেনে বন্দনা। কী ভাবে চেনে তা সে বলতে পারে না। হয়তো রমা মাসির মুখেও এরকম দেখে থাকবে দুপুরে যখন দীপ্তিকে নামিয়ে দিয়ে গেল অতীশ তখনও দোতলার বারান্দায় রেলিঙের পাশে শানের ওপর পাথরের মতো বসে ছিল বন্দনা। অতীশ একবার ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বারান্দার দিকে তাকাল। তাকে দেখতে পায়নি। তারপর রিক্সার মুখ ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল। দীপ্তি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। রোদে ঘুরে মুখখানা লাল। কপালে একটু ঘাম। কিন্তু ক্লান্তি নয়, সারা শরীর যেন ডগমগ করছে আনন্দে। তখনই বন্দনা দীপ্তির চোখে সেই বিহ্বলতা দেখতে পেল।

বুকের ভিতরটা যেন নিবে গেল বন্দনার। বিকল হয়ে গেল হাত পা। স্থবির হয়ে গেল শরীর।

কী রে এখানে বসে আছিস যে !

দীপ্তি যে হাসিটা হাসল সেই হাসিই অনেক খবর দিয়ে দিল বন্দনাকে। সে বলল, এমনিই।

আজ কত ঘুরলাম ! তুই সঙ্গে গেলে বেশ হত !

বন্দনা অবাক হয়ে বলল, আমি সঙ্গে গেলে... ?

কথাটা শেষ করল না সে। একটা প্রশ্নের মতো ঝুলিয়ে রাখল। অতীশকে সামনে পেলে সে

ওর জামা খিমচে ধরত এখন, বলত, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক ! বিচ্ছিরি লোক ! বিচ্ছিরি লোক !

দীপ্তি নিজের ঘরে পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে গুনগুন করে গান গাইছিল। আর বারান্দায় বসে অসহায়ের মতো কান্না সামলানোর চেষ্টা করছিল বন্দনা। পৃথিবীটা যে কেন এত খারাপ !

পিছনের বাগানে গাছতলায় তার পুতুলের সংসারে কতবার মিছে নেমন্তন্ন খেতে এসেছে একটি কিশোর। যার চোখ মুখ ছিল ভারী সহজ ও সরল, দুটো চোখে ছিল বিস্ময়ভরা লাজুক চাহনি। তখন কোঁচা দুলিয়ে খাটো ধুতি পরত অতীশ, গায়ে ছিল জামা। সংকোচ ছিল, লজ্জা ছিল। কত শাসন করেছে তাকে বন্দনা। বাগানে তখন অনেক বেশি গাছপালা, ঝোপঝাড় ছিল। অনেকে এসে জুটত তখন। রাজ্যের ছেলেমেয়ে মিলে চোর-চোর খেলত। তার মনে আছে অতীশকে একবার ধরে এনে চোর সাজিয়েছিল তারা। অতীশের সে কী হাসি। কাউকেই সে ছুঁতে পারছিল না। দৌড়ে দৌড়ে হয়রান হল। বন্দনার তখন মায়া হয়েছিল। কামিনী ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে হাত বাড়িয়ে বলল, এই নাও, আমাকে ছুঁয়ে দাও তো অতীশদা। অতীশ চমকে উঠে বলে, তাই কি হয় খুকি ? তুমি বড় বাড়ির মেয়ে, তুমি কেন চোর হবে ? বন্দনা তখন দৌড়ে গিয়ে অতীশকে ছুঁয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, এইবার ? বন্দনা চোর সাজল, কিন্তু আর সবাই পালালেও অতীশ এসে সামনে দাঁড়াল বোকার মতো, এই নাও খুকি, আমাকে ছুঁয়ে দাও তো ! এত দৌড়ঝাঁপ তোমার সহ্য হবে না। এত রাগ হয়েছিল তখন অতীশের ওপর।

আজ চোখে জল আসতে চায় কেন যে !

তার বাবার পিছু পিছু অতীশ টুকটুক করে শান্ত পায়ে হেঁটে আসত। বাবার পাশে চুপ করে বসে পুজো করা দেখত। কখনও ঘুরে ঘুরে তাদের এঘর ওঘরে সাজানো জিনিস দেখে বেড়াত। মা কখনও কিছু খাবার দিলে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠত খুশিতে। কত যত্ন করে খেত ! খিদে ছিল, কিন্তু লোভ ছিল না কখনও। বন্দনা যখন গান গাইতে শুরু করে তখন তো অতীশ বেশ বড়টি হয়েছে। চুপ করে বসে গান শুনত। একটু আধটু তবলা বাজাতে শিখেছিল, ঠেকা দিত।

তাদের কত ফাইফরমাশ যে খেটে দিত অতীশ তার ইয়ত্তা নেই। ওই উঁচু উঁচু নারকোল গাছে উঠে কাঁদি কাঁদি নারকোল পেড়ে দিত আর বন্দনার তখন কী ভয় করত ! অত উঁচু থেকে যদি পড়ে যায় ! সে চিৎকার করতে থাকত, ও অতীশদা ! নেমে এসো না ! পড়ে যাবে যে !

না না পড়ব না খুকি। আমি কত গাছ বেয়ে বেড়াই !

একদিন বন্দনা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কেন আমাদের এত ফাইফরমাশ খাটো?

অতীশ অবাক হয়ে বলেছিল, তাতে কী ? তোমরা ব্রাহ্মণ জমিদার ! আমাদের অন্নদাতা, মনিব।

এমন ভারিক্কি চালে বলেছিল যে বন্দনা হেসে বাঁচে না।

আজ হাসি পায় না বন্দনার। একটুও হাসি পায় না।

খাওয়ার পর নিজের ঘরে চুপ করে শুয়েছিল বন্দনা। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। মনটা অন্ধকার।

দীপ্তি এসে বলল, কী রে ঘুমোচ্ছিস ?

না দীপ্তিদি, দুপুরে আমি ঘুমোতে পারি না।

তা হলে বসে একটু গল্প করি।

মুখে জোর করে হাসি টেনে উঠে বসল বন্দনা।

ঘরে রোদের কয়েকটা চৌখুপি এসে মেঝের ওপর পড়ে আছে। পায়রা ডাকছে। কাকের ডাকে খাঁ খাঁ হয়ে যাচ্ছে অপরাহ্ণ।

দীপ্তি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, ছেলেটা এত ইন্টারেস্টিং যে আমি ঠিক করেছি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব।

বন্দনা অবাক হয়ে বলে, নিয়ে যাবে ? নিয়ে কী করবে দীপ্তিদি ?

কী করব তা এখনও ঠিক করিনি। ছেলেটার অনেক গুণ। আজ শুনলাম ও নাকি ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ , কল সারাইয়ের কাজ, মোটর মেকানিকের কাজ সবই একটু আধটু জানে। টাইপ-শর্টহ্যান্ডও শিখেছিল। এত শিখেও মফস্বলে ওর তো কিছু হল না। ভাবছি কলকাতায় নিয়ে

নিয়ে ওকে একটা কোনও ট্রেনিং দেওয়াব। এখানে তো কোনও স্কোপ নেই। খেটে মরবে, পেট ভরবে না।

শুধু পরোপকার ? আর কিছু নয় ? বন্দনা বড় বড় চোখ করে দীপ্তির মুখটা দেখছিল। সেই মুখে না-বলা অনেক ভাব খেলা করছে। বারবার যেন নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পাচ্ছে। এ লক্ষণ সে চেনে।

দীপ্তি বলল, অমল তো আমার কোনও অভাব রেখে যায়নি। ভাবছি, যদি একটা ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তবে টাকাটা সার্থক হবে।

আজ তোমরা কোথায় কোথায় গিয়েছিলে দীপ্তিদি ?

ওঃ, আজ সারা শহরটা পাগলের মতো ঘুরেছি। নদীর ধারটা দারুণ ভাল। নৌকোতেও চড়লাম একটু।

বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। সেই শ্বাসটা তার বুকের মধ্যে একটু ব্যথা হয়ে থম ধরে রইল।

তুমি কি তোমার সঙ্গেই অতীশদাকে নিয়ে যাচ্ছ ?

না। আমি কাল ফিরে যাব। অতীশ যাবে আরও এক মাস বাদে। একটু গুছিয়ে নিয়ে যাবে।

খুব সরলভাবে বন্দনা জিজ্ঞেস করল, অতীশদা কোথায় থাকবে ?

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে দীপ্তি বলল, এখনও ঠিক করিনি। বন্ডেল রোডে তো আমার আরও একটা ফ্ল্যাট পড়ে আছে। ভাড়া দিইনি। ওখানে অমলের কম্পিউটার আর আরও সব কী যেন আছে। তালাবন্ধ পড়ে থাকে। সেখানেই থাকতে পারবে।

তোমার অনেক টাকা, না দীপ্তিদি ?

দীপ্তি একটু উদাস হয়ে বলল, টাকা ! তা হয়তো আছে। অমলের তো টাকার নেশা ছিল। কিন্তু টাকা দিয়ে কী হবে বল, মানুষটাই তো থাকল না।

মানুষকে ধরে রাখা যে কত কঠিন তা বন্দনার মতো আর কে জানে ? কেউ মরে যায়, কেউ চলে যায়। কী যে একা আর ফাঁকা লাগে তার ! চোখ ভরে জল আসছিল তার।

গল্প করতে এসেছিল দীপ্তি। কিন্তু কেন যেন তাল কেটে গেল। জমল না। যাই রে, কাল সকালেই গাড়ি, গুছিয়ে নিই। বলে দীপ্তি হঠাৎ উঠে গেল।

বিকেলে তার মা গলদঘর্ম হয়ে একটা চিঠির মুসাবিদা করছিল। লেখা-টেখার অভ্যাস নেই। বন্দনাকে ডেকে বলল, ওরে দেখ তো, ভুলভাল লিখেছি কি না। কতকাল কিছু লিখিনি, বানানই ভুলে গেছি। একটু দেখে দে তো মা।

বন্দনা লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি বাবাকে লিখছ, আমার কি সে চিঠি পড়া উচিত ?

আহা, এ কি আর সেই চিঠি নাকি ? এ চিঠির মধ্যে গোপন কথা আর কী থাকবে ! পড়ে দেখ।

বন্দনা পড়ল। বেশি বড় চিঠি নয়। সম্বোধনে এখনও শ্রীচরণেষু লিখতে ভোলেনি মা। লিখেছে, তোমার বাড়িতে তুমি আসতে চাও আমি বারণ করার কে। বরং তোমার বাড়িতে আমিই তো অনধিকারীর মতো বাস করছি। আমি অন্য বাড়ি দেখছি, শিগগিরই ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে যাব। তোমার পথে আর কোনও কাঁটা থাকবে না। শাওলরাম মাড়োয়ারি এ বাড়ি কিনতে চাইছে। যদি তাকে বাড়ি বিক্রি করো তা হলে তোমার বড় দুটি ছেলে-মেয়ের জন্য কিছু রেখো। ওদের তো ভবিষ্যৎ আছে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে আবার চোখে জল এল বন্দনার। তার বাবা আর মায়ের মধ্যে কত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, এখন কত দূরের হয়ে গেছে দুজনে। কেন যে এমন হয় !

ভুলভাল নেই তো।

না মা।

পাঠাব এ চিঠি ?

পাঠাও।

পশ্চিমে দিগন্তে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল আজ তখন ছাদের ওপর থেকে আকুল চোখে চেয়ে ছিল

বন্দনা। তার মনে হচ্ছিল এই যে সূর্য অস্ত গেল আজ, আর উঠবে না কখনও। এর পর থেকে অনন্ত রাত্রি। শুধু অন্ধকার।

সন্ধের অন্ধকার যখন বিশাল পাখা মেলে অতিকায় এক কালো পাখির মতো নেমে আসছে, যখন গাছে গাছে পাখিদের তীব্র কলরব, পায়রারা ঝটপট করে নেমে আসছে ছাদে, ঠিক তখনই দু দুটো বোমা ফাটল পরপর।

আশ্চর্য এই—আজ ওই বিকট শব্দে একটুও চমকাল না বন্দনা। তার কোনও ভয় করল না। বরং ছাদ থেকে ঝুঁকে সে দেখার চেষ্টা করছিল, বোমা দুটো কোথায় ফাটল। বাগানের পিছন দিকে ধোঁয়া উঠছে নাকি?

পিছনের বাগানের একটা ঝোপ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল অবু। ওপরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, এই বন্দনা!

কী রে?

ঘরে যা। ল্যাংড়া অ্যাটাক করছে।

তার মানে?

ঘরে পালা।

বন্দনা একটু হাসল। বলল, এই তোর সাহস?

আমি যাচ্ছি খবর দিতে। ঘরে যা।

বন্দনা ঘরে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। দেওয়ালের ওপাশে গলিতে একটা দৌড়োদৌড়ি হচ্ছে। কে যেন ঢিল মেরে ল্যাম্প পোস্টের বাল্‌ব্‌ ভেঙে দিল। অবু দৌড়ে চলে গেল সদরের দিকে। বাইরে থেকে আরও দুটো বোমা এসে পড়ল পিছনের বাগানে। বাইরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, এই শালা, জানে মেরে দেব..

ধীরে, ধীরে সন্ধ্যার ভারী বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ছাদ থেকেই সে শুনতে পেল, তাদের দোতলায় দুড়দাড় করে জানালা দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মা চিৎকার করল, ওরে বাহাদুর! বিলু! বিলু কোথায়?

বিলু নীচের ঘরে আছে মা। পড়ছে।

আর বন্দনা?

দেখতে পাইনি।

সর্বনাশ! দেখ কোথায় গেল রোগা মেয়েটা!

দীপ্তিদি তার ঘর থেকে বেরোল বোধহয়। আতঙ্কিত গলায় বলল, এ জায়গায় তোমবা কেমন করে থাকো মামি! রোজ এরকম হয় নাকি?

আর বোলো না বাছা। কী যে ষণ্ডামি-গুণ্ডামি শুরু হয়েছে আজকাল। ভয়ে মরি। বন্দনা কি তোমার ঘরে?

না তো মামি!

তা হলে কোথায় গেল?

ছাদে যায়নি তো?

বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন তাকে ঘরে যেতে হবে। ঘরে যেতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। জানালা দরজা বন্ধ করে দম চেপে থাকা তার পক্ষে এখন অসম্ভব। সে মরেই যাবে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আজ কী তিথি জানে না সে। মস্ত চাঁদ দেখে মনে হয়, পূর্ণিমার কাছাকাছি। এখন কি ঘরে যেতে ইচ্ছে করে?

বাহাদুরের পায়ের শব্দ উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। বন্দনার আর ছেলেমানুষির বয়স নেই। তবু সে হঠাৎ ছাদের দক্ষিণ কোণে রাখা আলকাতরার পিপেটার পিছনে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল। বাহাদুর ছাদে এসে চারদিকটা দেখে নিয়ে ফের দৌড়ে নীচে চলে গেল।

না মা, ছাদে তো দিদিমণি নেই!

ওমা! কী সব্বোনেশে কথা! মেয়েটা তা হলে গেল কোথায়?

দীপ্তি বলল, অমন অস্থির হোয়ো না মামি, আমি দেখছি। কোনও বান্ধবীর বাড়িতে যায়নি তো!

আমাকে না বলে তো কোথাও যায় না!

পিপের আড়াল থেকে উঠে রেলিঙে ফের ভর দিয়ে দাঁড়ায় বন্দনা। শালটা আনেনি। তার শীত করছে। ঠাণ্ডা লাগবে কি? লাগুক! তার একটুও আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

শাওলরাম মাড়োয়ারি এ বাড়ির দাম দিতে চেয়েছে চৌদ্দ লাখ টাকা। চৌদ্দ লাখ শুনে মা সে কী খুশি! শাওলরামের সামনেই বলে ফেলল, আমি রাজি আছি শাওলরামজি। আপনি ব্যবস্থা করুন। উনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমাকে দিয়ে রেখেছেন।

কথাটা সত্যি। বাবা চলে যাওয়ার পর তার খোলা দেরাজে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা পাওয়া গিয়েছিল। তার মায়ের বা তাদের যেন কষ্ট না হয় তার জন্য তার ভাল বাবা সর্বস্বই প্রায় সঁপে দিয়ে গিয়েছিল মায়ের হাতে।

বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা আগেই হয়ে যেত। কিন্তু মদনকাকা শাওলরামের দর শুনে মাকে এসে বলল, বউদি, আপনার কি মাথাটা খারাপ হল?

কেন মদন, দরটা তো খারাপ নয়। চৌদ্দ লাখ তো অনেক টাকা!

এ বাড়ির চৌহদ্দির মাপ চার বিঘার ওপর, পাঁচ বিঘার কাছাকাছি। এখন শহরের এ জায়গায় লাখ টাকা করে কাঠা যাচ্ছে। শুধু জমির দামই তো কোটি টাকার কাছাকাছি!

শুনে মার চোখ কপালে উঠল, বলো কি মদন? এক কোটি?

বাড়ির দামটা ধরলে আরও দশ লাখ উঠবে। বাড়ির দাম বেশিই হত। কিন্তু পুরনো বাড়ি শাওলরাম রাখবে না। ভেঙে মালপত্র বেচবে। তা বেচলেও কম হবে না। বার্মা সেগুনের কাঠ আর মার্বেলের দামই তো কত উঠবে।

মা একটু হতাশ হয়ে বলল, অত কি দেবে? তবু শাওলরাম একটা দর দিয়েছে। আর তো কেউ দরও দিচ্ছে না।

কেউ কিনতে আসছে না, কারণ শাওলরাম সবাইকে টিপে রেখেছে। আপনাকে চৌদ্দ লাখ দেবে, আরও পনেরো বিশ লাখ টাকা অন্যদের খাওয়াবে। ওসব চালাকি তো আমরা জানি। আপনি চেপে বসে থাকুন। শাওলরামই দর বাড়াবে।

কথাটা শুনে মায়ের ভরসা হল না। বলল, অত টাকা কেউ দেবে না মদন।

এক লপ্তে না হল, ভাগে ভাগে বিক্রি করবেন না হয়। তাতে অনেক বেশি টাকা পাবেন।

কে ওসব করবে? আমার কি কেউ আছে?

এই বলে মা একটু কান্নাকাটি করল। যাই হোক, এইসব কথাবার্তার পর বাড়ি বিক্রি পিছিয়ে গিয়েছিল। দু মাস বাদে শাওলরাম এসে ফের তাগাদা দিতে লাগল। এ বার আরও দু লাখ বেশি দর দিতে রাজি হল, যেন খুব ঠকা হয়ে যাচ্ছে এমন মুখের ভাব করে। আরও দুমাস বাদে হীরেনবাবু আর অতুলবাবুর মধ্যস্থতায় শাওলরাম বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠল। বলে গেল, এ দর আর বাড়বে না।

এসব এক মাস আগেকার কথা। বন্দনার এত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, সেই মন খারাপই যেন জ্বর হয়ে দেখা দিল।

এই বাড়িটার পরতে পরতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে যেন রেণু-রেণু হয়ে ছড়িয়ে আছে। এত মায়া যে, এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না। কিন্তু বাবা যখন রমা মাসিকে নিয়ে আসবে তখন তো মা থাকবে না এ বাড়িতে। মাকে ছেড়ে সেও তো থাকতে পারবে না। কী যে হবে! তার চেয়ে এই তিনতলার ছাদ থেকে যদি আজ সে লাফিয়ে পড়ে মরে যায় তাও ভাল। শরীরে নয়, অশরীরী হয়ে এই বাড়িতেই হয়তো ঘুরে ঘুরে বেড়াবে সে।

বাগানে একটা টর্চের ঝিলিক দেখা গেল। দশ বারোটা ছেলেকে জ্যোৎস্নার মধ্যে ছুটতে দেখতে পেল বন্দনা। কে যেন চেঁচিয়ে বলল, দেয়ালের আড়ালে প্রোটেকশন নিয়ে চালাস।

দুটো ছেলেকে দেয়ালের ওপরে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল বন্দনা। হাতে কিছু একটা অস্ত্রশস্ত্র আছে। বাইরের গলিটা এখন নিঃঝুম।

ফট করে একটা শব্দ হল কোথায় যেন। বন্দনা শিহরিত হয়ে টের পেল ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলে তার মাথার ওপর দিয়ে কী যেন একটা উড়ে গেল। দেয়াল থেকে দুটো ছেলেই লাফিয়ে নেমে পড়ল এদিকে। কে যেন বলল, গুলি চালাচ্ছে শালা। জোর বেঁচে গেছি।

তবু ভয় করল না বন্দনার। জ্যোৎস্নায় স্নান করতে করতে সে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। রেলিঙের ওপর তার দুখানা আলগোছ হাত। সটান হয়ে স্পষ্ট হয়ে সে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ মায়ের গলা শুনতে পায় বন্দনা, ওরে আমার মেয়েটা...

বন্দনা নড়ল না। আজ রাতে তার খুব মরতে ইচ্ছে করছে।

তাদের বাগানে আরও কয়েকটা ছেলে ঢুকে পড়েছে। ধুতি আর শার্ট পরা বাবুদাকে সে এই ম্লান জ্যোৎস্নার আলোতেও চিনতে পারল। বাবুদা বলল, সবাই এখানে ঢুকলে হবে না। বড় রাস্তা দিয়ে গলির দুটো মুখ দিয়ে ঢুকতে হবে। কালকের মতো।

আদেশ পেয়েই কয়েকজন ফিরে দৌড়ে গেল সদরের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরই বাইরের গলিতে প্রচণ্ড শব্দে চার-পাঁচটা বোমা ফাটল। সেই সঙ্গে গুলির আওয়াজ। আরও দুটো ভ্রমরের গুঞ্জন খুব কাছ দিয়েই উড়ে গেল বন্দনার।

তবু একটুও ভয় করল না তার। পাথরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পৃথিবীর কোনও ঘটনাই তাকে আজ আর স্পর্শ করছে না যেন। তার খুব হালকা লাগছে। তার ভেসে পড়তে ইচ্ছে করছে হাওয়ায়।

তাদের সদর দরজার কড়া ধরে কে যেন জোর নাড়া দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে একটা তীব্র চিৎকার কর্তামা ! কর্তামা !

মা সভয়ে চিৎকার করে ওঠে, কে ? কে রে ? কী হয়েছে রে ?

অতীশের আর্তস্বর শোনা গেল, কর্তামা, ছাদে বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে নামিয়ে আনুন। বাইরে গুলি চলছে।

বন্দনা ছাদে ? কে বলল তোকে ?

আমি দেখেছি কর্তামা। ও পিছন দিকেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকেই গুলি চলছে। ওকে নামিয়ে আনুন।

বন্দনার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা রাগের স্রোত বয়ে গেল। সে ছুটে উল্টো দিকের রেলিঙে এসে ঝুঁকে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, বেশ করেছি দাঁড়িয়ে আছি। তাতে তোমার কী ? তোমার কী ?

উঠোনের দিকটায় সরে গেল অতীশ। ল্যাংচাচ্ছে। ওপর দিকে চেয়ে বলল কী করছ তুমি ওখানে ?

আমি মরব। তোমার তাতে কী ?

অতীশ হতভম্ব হয়ে বলল, মরবে কেন ? নেমে এসো।

আমার মরতে ইচ্ছে হয়েছে। তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

জ্যোৎস্নায় ঊর্ধ্বমুখ হয়ে অতীশ অসহায় গলায় বলল, ওসব বলতে নেই। বেঁচে থাকতে মানুষ কত কষ্ট করে জানো না ? নেমে এসো।

নামব না। যাও, কী করবে ? তুমি লোভী। টাকার জন্য সব করতে পারো তুমি। দীপ্তিদির সঙ্গে পর্যন্ত...

সিঁড়ি দিয়ে মা আর বাহাদুর উঠে আসছিল দ্রুত। আর সময় নেই। ওরা ধরে নিয়ে যাবে। বন্দনা আরও ঝুঁকে পড়ল নীচের দিকে, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি লোক।

অতীশ খুব ভালমানুষের মতো গলায় বলল, হ্যাঁ, তা তো জানি। অনেকদিন ধরে জানি। আমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

কী করছিস সর্বনাশী। কী করছিস ? বলতে বলতে মা এসে ধরল তাকে।

বাহাদুর মুখে আফশোসের শব্দ করে বলল, পড়েই যেতে যে আর একটু হলে।

বন্দনা নেমে এল। একটু ঘোর-ঘোর অবস্থা তার। যেন পুরো চৈতন্য নেই। যেন খানিকটা স্বপ্নাচ্ছন্ন। খানিকটা জাগা।

মা চাপা স্বরে বলল, গা যে বেশ গরম। ছাদে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলি রে অসভ্য মেয়ে

অনেকক্ষণ মা।

কেন?

আমার মন ভাল নেই মা, আমার মন ভাল নেই।

রাতে জ্বর বাড়ল বন্দনার। বুকে একটু ব্যথা, কাশি, সর্দি, হাঁচি, আর বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বোমার শব্দ। গুলির শব্দ। যেমন দেওয়ালির দিন শোনা যায়, অবিকল তেমনি।

বন্দনার জ্বর উঠল একশো চারে। বিকারের ঘোরে সে দেখছে, ফুটফুটে শীতের সকালে তাদের শান্ত বাগানে গাছের ছায়ায় বসে সে পুতুল খেলছে। আজ পুতুলের বিয়ে। পুরুতমশাই কখন আসেন তার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

মধ্যরাতে পুলিশের গাড়ি ঢুকল পাড়ায়। প্রথম টিয়ার গ্যাস। তারপর গুলি। বাড়ি ঘর ভরে গেল বারুদের গন্ধে।

ভোররাতে পিছনের বস্তির টিউবওয়েলের ধারে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল ল্যাংড়া। পুলিশের শক্তিশালী রাইফেলের গুলি তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে গেছে, বুকে মস্ত ফুটো দিয়ে রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে রাস্তা ভাসিয়ে দিল।

পরদিন নির্বিকার সূর্য ফের উঠল আকাশে। ততক্ষণে কোলাহল থেমে গেছে। মোট চারটে ডেডবডি তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। সকাল আটটার ট্রেন ধরবে বলে রওনা হয়ে গেল দীপ্তি। বাহাদুর তাকে রিক্সা ডেকে তুলে দিয়ে এসে বলল, ল্যাংড়া সাফ হয়ে গেছে মা। বাঁচা গেল।

মদনকাকা তার হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে এসে বন্দনার নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ দেখে বলল এ যে খুব জ্বর!

হ্যাঁ। একশো চার। মা বলল।

নাড়ির অবস্থাও ভাল বুঝছি না। জ্বর বিকারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। নিউমোনিয়া হওয়াও আশ্চর্য নয়। অ্যালোপ্যাথিই ভাল বউঠান। টাইফয়েডের পর শরীর কাঁচা থাকে।

ঘোরের মধ্যেই চোখ মেলে বন্দনা জিজ্ঞেস করল, ও কি চলে গেছে?

মা ঝুঁকে বলল, কে? কার কথা বলছিস? দীপ্তি? সে এই তো গেল। গিয়ে নাকি কলেজ করবে।

ডাক্তার ডেকো না মা, আমি আর ভাল হতে চাই না।

ও কী কথা? চুপ করে শুয়ে থাক।

কে মারা গেছে মা?

ও ল্যাংড়া।

আর?

আর কে জানি না। মোট চারজন।

উঃ।

কী হল?

খবর নাও কে মারা গেল আর।

ওসব ষণ্ডা-গুণ্ডাদের খবরে আমাদের কী দরকার? মরেছে বাঁচা গেছে।

উঃ মা, খবর নাও।

নিচ্ছি মা নিচ্ছি। ও বাহাদুর খবর নে তো কে কে মারা গেছে।

একটু বাদে মা এসে বলল, ল্যাংড়া, কুচো, ভোলা আর বিশু। কারা এরা তাও জানি না বাবা। তবে ভোলার মা বছরটাক আগে আমাদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করত। বেচারা।

বন্দনা অস্ফুট গলায় বলল, কত শুদ্ধ ছিলে তুমি, কত পবিত্র ছিলে! এঁটোকাঁটা হয়ে গেলে? আমার তো মোটে সতেরো বছর বয়স....এখনও কত দিন বাঁচতে হবে বলো তো! একা! কী ভীষণ একা।

মা বলল, মনটা ভাল নেই মা, আমাদের অতীশটাকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে!

বন্দনা কথাটা শুনতে পেল না। এক ঘুমঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তখন।

মা বলল, পুলিশ নিয়ে তো বড্ড মারে। বোকা ছেলেটা। পুলিশের হাত থেকে নাকি বন্দুক কেড়ে নিতে গিয়েছিল।

চার দিন বাদে জ্বর ছাড়ল বন্দনার। একগাদা অ্যান্টিব্যায়োটিক খেয়ে শরীর আরও দুর্বল। আরও দুদিন বাদে হঠাৎ তাদের উঠোনে একটা রিক্সা এসে থামল ঠিক দুপুরবেলায়। একজন রোগা বুড়ো মানুষ একখানা ছোট ব্যাগ হাতে খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল। গায়ে একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি, পরনে আধময়লা ধুতি, পায়ে হাওয়াই চটি। বারান্দায় তার চেয়ারে বসে ছিল বন্দনা। বুড়ো মানুষটিকে দোতলায় বিনা নোটিশে উঠে আসতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে ছিল বন্দনা। কোনও আত্মীয় কি ? চেনা ?

মানুষটি তার দিকে কেমন এক বিমূঢ় চোখে চেয়ে ছিল। পলক পড়ছে না। একটাও কথা নেই মুখে। পরাজিত বিধ্বস্ত একজন মানুষ।

বন্দনাও চেয়ে ছিল। গুড়গুড় গুড়গুড় করে পায়রা ডাকছে সিলিঙে। কেমন যেন করছে বুকের মধ্যে বন্দনার।

ঠিক এই সময়ে মা বেরিয়ে এসে বারান্দায় পা দিল। তারপর থমকে দাঁড়াল।

বুড়ো মানুষটি কাঁপছিল থরথর করে। হাত থেকে স্খলিত ব্যাগটা পড়ে গেল শানে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এলে তা হলে !

বুড়ো মানুষটি কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। একবার হাঁ করল। তারপর মুখ বুজে ফেলল। চোখের কোলে জল।

রেণু ! বলে লোকটা আর পারল না। উবু হয়ে বসে পড়ল হঠাৎ। তারপর দুই হাতে মুখ ঢাকল। কাঁদল বোধহয়।

লোকটা কে তা বুঝতে পারে বন্দনা, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। এই কি তার সেই বাবা, যে কিনা একজন কবির মতো মানুষ। শৌখিন আনমনা, কল্পনায় ডুবে থাকা। যে বাবা তাকে শিখিয়েছিল ছোট ছোট নানা জিনিসের মধ্যে রূপের সন্ধান। বাইরের দুনিয়া নরখাদক বাঘের মতো বাবাকে চিবিয়ে খেয়েছে। না, সবটা নয়। অর্ধেক ফেরত দিয়েছে বুঝি। প্রেতলোক থেকে যেন বাবার এই আগমন।

বন্দনা উঠল না, দৌড়ে গেল না, চিৎকার করল না আনন্দে, উদ্বেল হল না, শুধু চেয়ে রইল। দেখল, মা গিয়ে বাবাকে হাত ধরে তুলছে। বলল, এসো, বোসো। এ তোমারই বাড়িঘর। অত লজ্জা পাচ্ছ কেন ?

একটা ময়লা রুমাল পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে বাবা নাক আর চোখ মুছল। দ্বিতীয়বার বলল, রেণু।

বলো। কী বলবে ?

বন্দনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরে চলে এল। এ কোন বাবাকে ফেরত দিল পৃথিবী ? এ কেমন ফেরত পাওয়া ? তার বুকের ভিতরে যে একটা পাথরের মতো স্তব্ধতা। মানুষ এত পাল্টে যায়।

ঘর থেকেই সে শুনতে পেল, মা বলছে, বোসো চেয়ারে। একটু জিরিয়ে নাও। কথা পরে হবে।

বাবা বসল। বলল, একটু জল দেবে ?

মা জল নিতে ঘরে এসে বলল, বাবাকে প্রণাম করতে হয়। শত হলেও গুরুজন।

বন্দনা নড়ল না। চুপ করে বসে রইল। পাথর হয়ে।

জল খেয়ে বাবা আরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ওরকম চিঠি লিখলে কেন রেণু ?

কেন, আমি কি খারাপ কিছু লিখেছি ?

এ বাড়ি ছেড়ে তুমি কেন যাবে ?

নইলে উপায় কী ?
আমি বলতে এসেছি, তুমি থাকো। আমি তো কাটিয়েই দিয়েছি আয়ু। বাকিটা কেটে যাবে।
তা কেন ? কষ্ট করার তো দরকার নেই। রমাকে নিয়ে আসোনি ?
না। সে আসতে বড় ভয় পায়।
ভয় কীসের ? সে তো এখন সুয়োরানি। আমি দুয়ো।
বাবা একটা খুব বড়, বুক খালি করা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকল।
মা বলল, খাবে তো ?
খাব ! বলে বাবা যেন খুব অবাক হয়ে গেল।
মা বলল, ভাত খেয়ে এসেছ কি ?
নাঃ।
দুপুরে এখানেই তো খাবে। আর কোথায় যাবে ?
বাবা আর একটা খুব বড় শ্বাস ফেলে বলল, এ চেয়ারে বন্দনা বসে ছিল না ?
হ্যাঁ।
আমাকে চিনতে পারেনি। না ? কত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছি দেখ ! অথচ এখন আমার চুয়ান্ন বছর বয়স ! গত দু বছরে কী হয়ে গেল !
প্রেমের মাশুল দিতে হচ্ছে তো ! বুড়ো বয়সের প্রেম তার হ্যাপা কি কম ?
আমাকে তোমাদের বড্ড ঘেন্না হয়, না ? আমার নিজেরই হয়, তোমাদের হবে না-ই বা কেন ?
ঘেন্না পিত্তির কথা এখন থাক। চান করে ভাত খেয়ে একটু জিরোও। তারপর কথা হবে।
বাবা কথাটা কানেই তুলল না। বলল, স্টেশনে নামলাম, রিক্সা করে এত দূর এলাম, এর মধ্যে একটা লোকও আমাকে চিনতে পারেনি, জানো ? স্টেশনের রেলবাবু না, রিক্সাওলা না, রাস্তার কেউ না। এমন কী মদনের সঙ্গে দেখা হল নীচে, সেও পারল না। মেয়েটা পর্যন্ত পারেনি। শুধু তুমিই দেখলাম, একবারে চিনলে।
আমার না চিনে উপায় আছে !
বিলু কি বাড়িতে নেই ?
স্কুলে গেছে।
তবে বুঝি তার সঙ্গে দেখা হল না।
ওমা ! কেন হবে না ?
আমি চারটের গাড়িতে ফিরে যাব।
তা হলে এলে কেন ?
দীপ্তির মুখে শুনলাম তুমি বাসা ভাড়া করে চলে যাবে বলে তোড়জোড় করছ। তাই ছুটে আসতে হল। তুমি ও কাজ কোরো না। তোমরাই থাকবে এখানে। বড্ড কষ্টে ছিলাম বলে তোমাকে ওরকম একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিটা পাঠিয়ে মনে হল, কাজটা ঠিক করিনি। সত্যিই তো, ওরকম কি হয় ? তোমার যে তাতে অপমান হয় তা আমার মাথায় খেলেনি।
শুধু এইটুকু বলতে এলে ?
হ্যাঁ। আর শেষবারের মতো তোমাদের একটু দেখে গেলাম। আর আসব না।
তোমার শরীরের যা অবস্থা দেখছি, ধকল সইবে তো ! তেমন জরুরি কাজ না থাকলে আজ বরং থেকেই যাও। নিজের অধিকারেই থাকতে পারবে। এত বছর ঘর করলে আমার সঙ্গে; একটা রাত এ বাড়িতে থাকলে আর কী ক্ষতি হবে ?
থাকাটা কি ভাল দেখাবে রেণু ?
ভাল দেখাবে কি না তা জানি না। তোমার শরীর ভাল দেখছি না বলে বলছি।
মেয়েটা বোধহয় চিনতে চাইল না, না ? যাক রেণু, আমি বরং ফিরে যাই। বিলুটাকে দেখে গেলে হত। ওরা সব ভাল আছে তো !
আছে। যেমন রেখে গেছ তেমনই আছে।

আর একটু জল দাও। খেয়ে উঠে পড়ি। আড়াইটেয় একটা গাড়ি আছে। ধরতে পারলে সন্ধেবেলায় কলকাতায় পৌঁছে যাব।

আবার জল নিতে মা ঘরে এল। বন্দনা তখনও খাটে বসে। একদম পাথরের মতো।

একবার দেখা করবি না ? একটু চোখের দেখা দেখতে এসেছে। যা না কাছে। শরীরের যা অবস্থা দেখছি, লক্ষণ ভাল নয়।

বন্দনা তবু নড়ল না।

বাবা জল খেল। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। বোধহয় ক্লান্তি। বোধহয় প্রত্যাশা।

মা বলল, এ বাড়ির নাকি এখন অনেক দাম। মদন সেদিন হিসেব করে বলল, এক কোটি টাকার ওপর। শাওলরাম মাড়োয়ারি কুড়ি লাখ টাকা দিতে চাইছে। আর একটু বেশি দাম উঠলে বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ারই ইচ্ছে আমার। তুমি কী বলো ?

তোমাকে তো ওকালতনামা দিয়েই রেখেছি। তোমার ইচ্ছে হলে বেচে দিয়ো। বাড়ি দিয়ে কী হবে ?

চাও তো তোমাকে কিছু দেব। কষ্টে আছ।

এই প্রথম বাবা একটু হাসল। বলল, না, আর দরকার নেই।

দরকার নেই কেন ? খুব নাকি অভাব !

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, সে একটা দিনই গেছে। খুব কষ্টের দিন। কিন্তু সয়েও যায় রেণু। এখন দেখছি, আমার আর অভাবটা তেমন বোধ হয় না। খিদে সহ্য হয়, রোগভোগ সহ্য হয়, অপমানও বেশ হজম করতে পারি। টাকা পয়সার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। না রেণু, বাড়ি বেচে টাকা-পয়সা হাতে রেখো। তোমার লাগবে।

মত দিচ্ছ ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। মত দিয়েই রেখেছি। আসি গিয়ে ?

দুটো সন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

বাবা উঠতে গিয়েও বসে পড়ল, দাও তা হলে।

সন্দেশ নিতে মা ঘরে এসে বন্দনার দিকে চেয়ে বলল, অন্তত সন্দেশটা নিজের হাতে দাও না বাবাকে। খুশি হবে।

ও লোকটা আমার বাবা নয় মা।

ও কী কথা ? ছিঃ। ওরকম বলতে নেই।

আমার বাবা তো এরকম ছিল না মা।

মা ফ্রিজ থেকে সন্দেশ বের করে প্লেটে সাজাতে সাজাতে বলল, চিরদিন কি কারও সমান যায় ? শুনেছিস তো অভাবে কষ্টে আছে। চেহারা ভেঙে গেছে, অকালবার্ধক্য এসেছে। তা বলে কি বাবা বলে স্বীকার করবি না ?

বন্দনা গোঁ ধরে চুপ করে রইল।

বাবা সন্দেশ খেল। ফের জল খেল। বলল, কম খেলেই আজকাল ভাল থাকি। বুঝলে ? এই যে দুটো সন্দেশ পেটে গেল এই-ই এক বেলার পক্ষে যথেষ্ট। উঠলাম, কী বলো ?

কী আর বলব। বিলুর তো ফিরতে দেরি আছে।

থাক থাক। না দেখাও ভাল। দেখলে মায়া বাড়ে কিনা।

মেয়ে সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।

থাক থাক। ওকে ওর মতো থাকতে দাও। বড় হচ্ছে, একটা মতামত আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে বাবার খুব সময় লাগছিল। বন্দনা উঠে বারান্দায় এল। তারপর রেলিঙের ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল। একটু বাদেই বাবাকে দেখতে পেল সে, জীর্ণ শীর্ণ একজন মানুষ রোগা দুর্বল পায়ে ধীরে ধীরে উঠোনটা পেরোচ্ছে। পেরোতে পেরোতে একবার মুখ ফিরিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। এই তাকানোটা ওই মুখ ফেরানোটাই যেন তীব্র মোচড়ে বুক ভেঙে দিল বন্দনার। বাবা শেষবারের মতো চলে যাচ্ছে। আর আসবে না। উঠোনটা পেরোলেই তাদের সঙ্গে সব বন্ধন ছিঁড়ে

যাবে। কেন মুখ ফেরাল বাবা ? কেন ?

বন্দনা হঠাৎ নিজের অজান্তেই অনুচ্চ স্বরে ডাকল, বাবা ! একটু দাঁড়াও।

বাবা ভাল শুনতে পায়নি। যেতে যেতেই আর একবার মুখটা ফেরাল, তাকাল। তারপর ভুল শুনেছে মনে করে চলে যাচ্ছিল।

বন্দনা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচে। তারপর ছুট-পায়ে গিয়ে দেউড়ির কাছে মানুষটার পথ আটকে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ তুমি এই রোদে ? না খেয়ে ? বলতে বলতে বহু কালের সমস্ত কান্না, জমে থাকা যত দুঃখ উথাল-পাথাল হয়ে উঠে এল তার বুক থেকে।

॥ ছয় ॥

পরান বলল, পারবেন ?

পারব। পারতেই হবে।

সামনে এক অফুরান মাঠ। এবড়ো খেবড়ো চষা জমি। স্টেশন যে কত দূর ! একমাস হয়ে গেছে, তবু অতীশের সর্বাঙ্গ আজও ব্যথিয়ে আছে। পুলিশ তার প্রত্যেকটা জয়েন্ট ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কনুই, হাঁটু, মেরুদণ্ডের তলার দিকটা। মারতে মারতে যেন নেশা ধরে গিয়েছিল ওদের। তবু চেঁচায়নি অতীশ। একটুও যন্ত্রণার শব্দ বেরোয়নি মুখ দিয়ে। কেবল দৃশ্যটা মনে পড়ছিল। হাবু মণ্ডলের ঘরের পাশে সে আর বিশু দাঁড়িয়ে। রাত তখন সোয়া একটা হবে। বোমবাজির শেষ খেলটা খেলছিল বাবু আর ল্যাংড়ার দল। বড় বাড়ির দুর্ধারের গলি দিয়ে বাবুর দল ঢুকে আসছিল। ল্যাংড়া লিড দিচ্ছিল বস্তির দু কোনা আটকে। কার জিত, কার হার তখনও বোঝা যাচ্ছিল না। আচমকা একটা চিৎকার শোনা গিয়েছিল, রিট্রিট !

ওই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গলির দুধার থেকে বাবুর দলের ছেলেরা পিছিয়ে যেতে লাগল। তারপর হাওয়া হয়ে গেল।

বিশু চাপা গলায় বলল, এর মানে কী জানো তো গুরু ? পুলিশ নামছে।

প্রথমে কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল এসে পড়ল গলির মধ্যে। তার পিছনে বুটের আওয়াজ। ল্যাংড়ার দলের ঝানু ছেলেরা চটপট বেরিয়ে এসে টিয়ার গ্যাসের শেলগুলো পটাপট বড় বাড়ির দেয়ালের ওধারে ফেলে দিল। তারপর গা-ঢাকা দিল। তারপর আড়াল থেকে মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে এসেই বোমা মেরে পালিয়ে যাচ্ছিল অলিগলির মধ্যে। পুলিশের সঙ্গে এরকম লুকোচুরি খেলার অভ্যাস এদের আছে।

পুলিশ ঢুকছিল দুধার দিয়েই। কিছু এল বড় বাড়ির ভিতর দিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে গলে। এখনও ফায়ারিং অর্ডার দেওয়া হয়নি। তবু বিশু বলল, চলো গুরু, সরে পড়া যাক।

হাবু মণ্ডলের পাশের গলিতে ঢুকে তারা নিশ্চিন্তেই এগোচ্ছিল। কোনও বিপদ ছিল না।

আচমকাই একজন সাব ইন্সপেক্টর আর কনস্টেবল ঢুকে এল গলিতে। কিছু বোঝাই গেল না। দুম করে একটা শব্দ হতেই বিশু যেন ছিটকে শূন্যে উঠে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ এক অসহনীয় ছটফটানি। তারপর নিথরও। অতীশ আমূল বিস্ময়ে তার জীবনের দ্বিতীয় মৃত্যু-দৃশ্যটা দেখল। কিন্তু এবার আর সেই স্তম্ভন ছিল না, সেই ভয়টাও নয়। একটা পাগলা রাগে ক্ষিপ্তের মতো সে গলির মুখে ছুটে গেল। সাব ইন্সপেক্টরের হাতে খোলা রিভলভার, কনস্টেবলের হাতে রাইফেল। তাকে ফুঁড়ে দিতে পারত।

কেন মারলেন কেন মারলেন ? কী করেছে ও ? কেন গুলি করলেন ? বলতে বলতে সে কনস্টেবলটার ওপরে গিয়ে পড়েছিল। একটা লাথি মেরে কনস্টেবলটাকে ফেলে দিয়ে রাইফেলটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিল সে।

সাব ইন্সপেক্টর কমল রায় গৌরাঙ্গর দাদা। চেনা লোক। শুধু তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, কী করছ ? যাও বাড়ি যাও। গো হোম !

কিন্তু ততক্ষণে বাহিনীটা এসে গেছে। কমল রায় চিৎকার করে তাদের আটকানোর একটা চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তখন আশেপাশে বৃষ্টির মতো বোমা ফেলছে ল্যাংড়ার দল। কমল রায় অন্য দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। আর তখন পুলিশের বুট আর রাইফেলের কুঁদোয় পাট পাট হয়ে গেল অতীশ। তাকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় অর্ধচেতন অবস্থায়। লক আপে তার প্রবল জ্বর এসেছিল।

তিন দিন পর হীরেনবাবু তাকে বললেন, ওরে বাবা, পুলিশ কি লোকের নাম-ঠিকানা জেনে তবে গুলি চালাবে ? পুলিশকে গুলি চালাতে হয় অন্ধের মতো। টু হুম ইট মে কনসার্ন। বুঝেছ ? তোমার বন্ধু মারা গেছে, কিন্তু ইচ্ছে করে তো আর মারেনি বাবা। তুমি একজন স্পোর্টসম্যান, জেলার চ্যাম্পিয়ন। তোমার এগেনস্টে কেস দিচ্ছি না। বাড়ি যাও।

রিক্ত অবসন্ন অতীশ টলতে টলতে বাড়ি ফিরে এল। শরীরের ব্যথা নয়, তার মন-জুড়ে এক বিষের জ্বালা। বিশু নিরীহ ছিল, বিশু ছিল পাড়ার গেজেট, তেমন কোনও দোষও ছিল না ওর। গত একমাস ধরে ক্ষণে ক্ষণে শুধু বিশুর কথা মনে পড়ে।

পরান গাছতলায় বসে বিড়ি টেনে নিচ্ছিল। বলল, কেন যে এত কষ্ট করছেন ! দুদিন পর তো কলকাতাতেই চলে যাবেন। সেখানে চাকরি বাকরি করবেন, ভাল থাকবেন, ভদ্রলোক বনে যাবেন। তবে আর এ কষ্টটা করা কেন ?

অতীশ দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি সব কিছু পারতে চাই। বুঝলে !

আপনি শক্ত লোক। পুলিশের ওরকম মার খেলে অন্যে তিন মাস হাসপাতালে পড়ে থাকত। চলুন, গাড়ির সময় হয়ে আসছে। রাস্তা এখনও অনেক।

চল্লিশ কেজি নতুন আলুর বস্তাটা গাছের গোড়ায় দাঁড় করানো। অতীশ উঠল। তারপর বস্তাটা জাপটে কাঁধে তুলে ফেলল। তার পর দুহাতে একটা সাপটা টানে মাথায়।

সাবাস ! বলে বাহবা দিল পরান।

পরানের কাছেই শেখা। অতীশ বলল, চলো।

ব্যথা বেদনার শরীর, মাথার ওপর গন্ধমাদনের ভার, সামনে অফুরান পথ। এই মেহনতের ভিতর দিয়েই একটা মোচন হয় অতীশের। ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করে শরীর, রগে রগে ছড়িয়ে পড়ে অবসন্নতা, তবু ওই নিষ্পেষণের ভিতর দিয়েই নিজের ভিতরে আর একটা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে সে।

আগে পরান, পিছনে সে। একটু দুলকি চালে দ্রুত পায়ে হাঁটছে তারা। অনেকটা ছোটার মতো। ধীরে ধীরে যত কোমল ও সূক্ষ্ম বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। একটা চেতনা আর জেদ কাজ করে শুধু।

শীতকাল, তবু স্টেশন অবধি আসতেই ঘামে জামা আর প্যান্ট ভিজে সপসপে হয়ে গেল।

পরান বস্তাটা নামিয়ে তার ওপর বসে বিড়ি ধরাতে যাচ্ছিল। অতীশ বলল, পরিশ্রমের পর ওসব খেতে নেই। বুকের বারোটা বাজবে।

আমাদের ওসব সয়ে গেছে।

নিজের বস্তার ওপর উদাসভাবে বসে থাকে অতীশ। আজকাল তার কিছু ভাল লাগে না। কিছু একটা হয়ে উঠতেও ইচ্ছে করে না। থানা থেকে যেদিন ছেড়ে দিল সেদিন অতীশ তার ভাঙা শরীর নিয়েও গিয়েছিল বিশুদের বাড়িতে। বিশুর মা দৌড়ে এসে তাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে বলছিল, ও অতীশ, তুই তো সঙ্গে ছিলি ! তুই তো মরলি না, আমার ছেলেটা মরল কেন রে ?

বার বার ওই কথা, তুই তো মরলি না, তবে আমার ছেলেটা কেন মরল ? কথাটা কানে বড় বাজে আজও। কান থেকে কথাটা কিছুতেই তাড়াতে পারে না অতীশ।

মার-খাওয়া, থ্যাঁতলানো একটা শরীর, সর্বাঙ্গে বীভৎস কালশিটে, কাটা ছেঁড়া নিয়ে চার দিনের দিন ডাক্তার অমল দত্তের কাছে গিয়েছিল সে। অমলদা তাকে দেখে অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে বলেছিল, এই শরীর নিয়ে তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস কী করে ? তুই তো হসপিট্যাল কেস !

জ্বালা-ধরা দুই চোখে হঠাৎ জল এল তার। বলল, তবু তো বেঁচে আছি।

তুই বেঁচেও আছিস কি? এভাবে ওপেন উন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ালে সেপটিক হয়ে মরবি যে! এক্স-রেটা করাস, গোড়ালিটা যা ফুলেছে, মনে হচ্ছে ফ্র্যাকচার।

ক্ষতগুলো ব্যান্ডেজ মেরে, টেটভ্যাক দিয়ে অমলদা একটা প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, সব ব্যাপারে হিরো হতে চাস না, বুঝলি? ওষুধগুলো ঠিকমতো খাস। আর সোজা বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক।

একটু হাসল অতীশ। তার আবার বাড়ি, আবার বিছানা। ঘরে তার জায়গাই হয় না। ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় সে শোয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে সেসব কথা জানানোর মানেই হয় না।

শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই। আবার সেই শরীর যখন অকেজো, অশক্ত হয়ে পড়ে তখন হয়ে ওঠে মস্ত ভারী একটা বোঝার মতো। আহত, থ্যাঁতলানো শরীরটা টেনে টেনে তবু দুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াল অতীশ। শরীরের ভার আর এক অক্ষম রাগ তাকে এমন তিরিক্ষি করে তুলেছিল যে, বাড়ির লোক অবধি তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়নি।

পাঁচ পাঁচটা নির্লজ্জ শহিদ বেদি তৈরি হল পাড়ায়। পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে শহরে বন্‌ধ হল একদিন। তাতে যে মানুষের কী উপকার হল তা কে জানে! তবু মানুষ এরকমই সব অর্থহীন কাজ করে।

একটা ডাউন গাড়ি গেল। পরান বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলল, আজ আপ গাড়িটা লেট করছে।

অতীশ শুধু বলল, হুঁ।

কী ভাবছেন এত বসে বসে?

কত কথা ভাবি।

ডাউন গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। আপ গাড়ির জন্য দু-চারজন লোক বসে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য অস্তে যাচ্ছে চষা মাঠের ওদিকটায়। বড্ড খুনখারাপি রং হয়েছে আকাশে। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া লেগে হঠাৎ ঘামে ভেজা শরীরে একটু শীত করে উঠল অতীশের।

মাথার ওপরে জ্যোৎস্না আর চারদিকে বারুদের গন্ধ, বোমা ফাটছে গুলি চলছে, আর ছাদ থেকে ঝুঁকে বন্দনা বলছে, আমি মরলে তোমার কী? তুমি বিচ্ছিরি লোক। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি লোক! দৃশ্যটা এত ঘটনাবলির ভিতর থেকে যেন আলাদা হয়ে বড্ড মনকে উদাস করে দেয়। একদিন তেমাথার কমল স্টোর্সের কাছে সকালের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল অতীশ, একটা রিক্সায় বন্দনা কলেজে যাচ্ছিল। গায়ে একটা কমলা রঙের শাল জড়ানো, মুখখানা পাণ্ডুর, চোখ দুখানা বিষণ্ণতায় ভরা। যেন মানুষ নয়। যেন খুব ফিনফিনে খুব নরম জিনিস দিয়ে তৈরি একটা পুতুল। কী সুন্দর। তাকে দেখতে পায়নি, ভারী আনমনা ছিল। রিক্সাটি যখন দূরে চলে যাচ্ছে তখন অতীশ বিড়বিড় করে বলেছিল, তাই কি হয় খুকি? তাই কি হয়? তুমি হলে আমাদের মনিব, অন্নদাতা।

একটা বিষণ্ণ ঘন্টির শব্দ চারদিকটাকে মথিত করতে থাকে হঠাৎ। পরাণ বলল, গাড়ি আসছে।

দিন পাঁচ-ছয় আগে একদিন রাতে বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কর্তাবাবু ফিরেছেন, জানিস?

অতীশ অবাক হয়ে বলে, সে কী?

কী রোগা হয়ে গেছেন, চেনা যায় না। সঙ্গে ছোট বউ আর ছেলেও এসেছে। এখন এখানেই থাকবে।

একসঙ্গে?

তাই তো শুনছি। বড় গিন্নির সঙ্গে নাকি রফা হয়েছে। খবর পেয়ে তোর বাবা গিয়েছিল দেখা করতে। কর্তাবাবুর বলে কী হাউ-হাউ কান্না। অনেক দিন বাদে নিজের বাড়িতে ফিরে নিজেকে সামলাতে পারছেন না। ছোট বউটা নাকি বড় গিন্নির ভয়ে একতলার সিঁড়িতে ছেলে কোলে করে বসে ছিল। বড় গিন্নির আপন পিসতুতো বোন হলে কী হয়, ছেড়ে কথা কওয়ার মানুষ বড় গিন্নি নয়। ক'দিন পরেই লাগবে।

বড়দি সেলাই করতে করতে বলল, তার ওপর আবার বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে, হুঃ। কত লোক আসছে রঙ্গ দেখতে! কী লজ্জা, কী ঘেন্না বাব্বাঃ!

ফাকা ট্রেনে বসে পরান আবার বিড়ি ধরিয়ে বলল, আজ যে খুব ভাবিত দেখছি আপনাকে। বলি হলটা কী ?

অতীশ একটু হাসল। কিছু বলল না। আজকাল সে ভাবে। আজকাল সে খুব ভাবে।

স্টেশনে আলুর বস্তাটা নামিয়ে রিক্সায় তুলল অতীশ। পরান বলল, আলুর ব্যবসাই যদি করবেন তো বড় করে করুন। আমাদের মতো ছোট ব্যাপারি হয়ে থাকলে আর কপয়সা হবে! তারকেশ্বর, বাঁকড়ো, বর্ধমানের দিকে চলে যান, ট্রাক ভর্তি মাল নিয়ে আসুন, পকেটে টাকা ঝনঝন করবে।

অতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বন্দনা সেদিন তাকে লোভী বলেছিল। বলেছিল, টাকার জন্য তুমি সব পারো। অতীশ কি তাই পারে ? অতীশ কি ততটাই লোভী ?

বাজারে পাইকারের কাছে আলুর বস্তা গস্ত করে টাকাগুলো প্যান্টের পকেটে ভরল অতীশ। পকেটে হাত রেখে টাকাগুলো কিছুক্ষণ খামচে ধরে রইল। লোভী ? সে কি লোভী ? তুমি তো জানো না খুকি, এক একটা কথা কত গভীরে বিঁধে থাকে!

খুব কি পাপ হবে ? পাপ পুণ্য বলে কিছু আছে কি না সেই সিদ্ধান্তে আসতে পারে না অতীশ। তবু তিনটে ডাইনির মতো তার পথ আটকে দাঁড়াতে চায় তিনটে জিনিস। বয়সে বড়, বিধবা আর ছেলের মা। এই তিন ডাইনি তার পথ আটকায় বটে, কিন্তু তবু তার ইচ্ছে করে ওসব গায়ে না মাখতে। দীপ্তি একজন ঝলমলে মেয়ে, জিয়ন্ত, কত হাসিখুশি। মস্ত একটা চিঠি দিয়েছে সে। পাছে অতীশের বাড়ির কেউ খুলে পড়ে সেইজন্য ইংরিজিতে লেখা। ম্যানেজমেন্ট কোর্সে অতীশকে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে আছে। কম্পিউটার ট্রেনিং-ও। পুরনো সংস্কার গায়ে না মাখলেই হয়। কিছু স্মৃতির ধুলো শুধু গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে অতীশকে। পারবে না ?

আজকাল অতীশ খুব ভাবে। ভাবতে ভাবতে পকেটের টাকাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে পথ হাঁটে।

॥ সাত ॥

দুপুরবেলা চুপি চুপি নীচে নেমে এল বন্দনা। একতলার পশ্চিমের ঘরটাই সবচেয়ে অন্ধকার আর ড্যাম্প। এই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে রমা মাসি। কিছুতেই ওপরের ঘরে যেতে রাজি হয়নি। প্রথমদিন এসে শুধু মাকে একটা প্রণাম করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। মা ধমক দিয়েছিল, চুপ কর!

ধমক খেয়ে চুপও করেছিল রমা মাসি। তারপর সেই যে এই ঘরে ছেলে নিয়ে ঢুকল, আর বেরোয় না। কাউকে মুখ দেখায় না।

দরজায় টোকা দিল বন্দনা।

রমা মাসির ভীত গলা বলে উঠল, কে ?

আমি মাসি। দরজা খোলো।

দরজা খুলে বিহ্বল মাসি হাসবে না কাঁদবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। দুটো বিপরীত ভাব মানুষের মুখে আর কখনও এরকম খেলা করতে দেখেনি বন্দনা। সে মাসিকে দুহাতে ধরে বলল, কেঁদো না, তোমার ছেলেটাকে চলো তো দেখি। আমি ভীষণ বাচ্চা ভালবাসি।

আয়।

রোগা বাচ্চাটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে মশারির মধ্যে।

খুব শীত পড়েছে মাসি, ওকে রোদে নিয়ে তেল মাখাও না ?

ঘরেই মাখাই।

কেন মাসি ? ঘরের বাইরে যেতে ভয় পাও কেন ?

রমা মৃদু গলায় বলল, কত ক্ষতি করে দিলাম তোদের! আমার জন্যই তো এত সব হয়ে গেল! মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

ওসব ভুলে যাও।

রমা হঠাৎ তার দুটো হাত ধরে বলল, তোর জন্যই আমরা এখানে ফের আসতে পারলাম। রেণুদিকে তুই-ই রাজি করিয়েছিস। তুই এত ভাল কী বলব তোকে ? যদি এখানে না আসতাম তা হলে আমরা আর বেঁচেই থাকতে পারতাম না। তোর জন্যই—

ওসব বলতে নেই মাসি। আমার মা একটু রাগী ঠিকই, কিন্তু মা ভীষণ ভালও তো!

খুব ভাল রে! কিন্তু রেণুদির কী সর্বনাশটাই না আমি করলাম!

শোনো মাসি, একটু ওপরে টোপরে যেও, ঘোরাফেরা কোরো, নইলে সম্পর্কটা সহজ হবে না।

সাহস পাই না যে রে!

মা তোমাদের ওপর রেগে নেই কিন্তু।

কী করে বুঝলি ?

মাকে আমি খুব বুঝি। বাইরের রাগ একটু আছে হয়তো, কিন্তু ভিতরে রাগ নেই।

আমার বড্ড ভয় করে রেণুদিকে।

রাত্রিবেলা মায়ের পাশে শুয়ে বন্দনা হঠাৎ বলল, মা, তুমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো ?

হঠাৎ ওকথা কেন ?

এমনি। বলো না করো কি না ?

করব না কেন ? চিরকাল শুনে আসছি মানুষ মরে আবার জন্মায়।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি রমা মাসির ছেলেটাকে দেখেছ মা ?

মা একটা বিরক্তির শব্দ করে বলল, প্রবৃত্তি হয়নি।

বন্দনা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক দাদার মতো দেখতে।

মা হঠাৎ নিথর হয়ে গেল। তারপর বলল, কে বলেছে ?

কে বলবে মা! আমারই মনে হয়েছে।

তুই ওই বয়সের প্রদীপকে তো দেখিসনি!

না তো। কিন্তু একটা আদল আসে।

বাজে কথা। ঘুমো।

বন্দনা ঘুমোল। কিন্তু পরদিন ভারী অন্যমনস্ক রইল মা। তার পরদিন গিয়ে হানা দিল রমার ঘরে।

দু দিন বাদে ছেলেটা মায়ের কোলে কোলে ঘুরতে লাগল।

এই ছলনাটুকু করতে খারাপ লাগল না বন্দনার। এই ফাঁকা ভুতুড়ে বাড়িটায় একটু জনসমাগম হয়েছে। একটু প্রাণের স্পর্শ লেগেছে। এটুকু নষ্ট হোক, সে চায়নি।

বাবা বড্ড বুড়িয়ে গেছে। মুখে কেবল মরার কথা। আমি আর বেশি দিন নয় রে। আমার হয়ে এসেছে।

বাঁচতও না বাবা। সেদিন দুপুরে এসে চলে যাওয়ার সময় বন্দনা গিয়ে যদি না আটকাত তা হলে বাবা বোধহয় পথেই পড়ে মারা যেত সেদিন। বন্দনা জোর করে ধরে নিয়ে এল। স্নান করতে পাঠাল, ভাত খাওয়াল। যেতে দিল না সেদিন। আর রাতে মায়ের কাছে কেঁদে পড়ল সে, ও মা, বাবাকে এখানে আসতে দাও।

মা বলল, আসুক না। আসতে তো বলছিই। আমি থাকব না।

কেন মা ? আমরাও কেন থাকি না এখানে ?

তা কি হয় ? আমার আত্মসম্মান নেই ?

রমা মাসি তো খারাপ মানুষ নয় মা, সে তো কখনও তোমার অবাধ্যতা করেনি। এক ধারে এক কোণে পড়ে থাকবে। এত বড় বাড়ি, তুমি টেরও পাবে না।

শুনে মা খুব রাগ করল। বলল, এত কাণ্ডের পরও একথা বলতে পারলি তুই ? ওদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকব! কেন, আমার কি ভিক্ষেও জুটবে না ?

বন্দনা মায়ের পা ধরেছিল, ওরকম বোলো না মা। বাবার কী অবস্থা দেখছ না ? এ অবস্থায় ফেলে তুমি কোথায় যাবে ?

আমাকে ফেলে যায়নি তোর বাবা ?

তার শাস্তি তো পেয়েছে মা।

সারা রাত মায়ের সঙ্গে তার টানাপোড়েন চলল। ভোর রাতের দিকে মা ধীরে ধীরে নরম হয়ে এল। কাঁদল। তারপর বলল, তোদের মুখ চেয়ে না হয় সেই ব্যবস্থা মেনে নিলাম। কিন্তু লোকে তো হাসবে।

এখন লোকে হাসে না মা। লোকের তত সময় নেই।

কিন্তু রমা নীচের তলা থেকে ওপরে উঠতে পারবে না কখনও। মনে রাখিস।

কথাটা মা নিজেই মনে রাখেনি। দশ দিনের মাথায় রমা মাসিকে দিব্যি দোতলায় ডেকে আনল মা। বলল, আমি ছেলেটাকে দেখছি, তুই রান্নার দিকটা সামলে নে।

চমকে উঠে রমা মাসি যেন কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে বলল, যাচ্ছি রেণুদি।

শাওলরাম মাড়োয়ারি এই সেদিনও এসে বাবার কাছে খানিকক্ষণ বসে থেকে গেছে। তার একটাই কথা, চৌধুরী সাহেব, বিশ লাখ দর তুলে বসে আছি। কিছু একটা বলুন।

বাবা হয়তো রাজি হয়ে যেত। বিষয়বুদ্ধি বলতে বাবার তো কিচ্ছু নেই। বন্দনা বাবাকে বলে রেখেছে, এ বাড়ি ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না বাবা। এ বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

বাবা তার দিকে চেয়ে হেসে বলেছে, আমারও তাই ইচ্ছে। শেষ কটা দিন এ বাড়িতেই কাটাই।

তুমি একটা কাজ করবে বাবা ? বস্তির দিককার খানিকটা জমি বিক্রি করে দাও। বাকিটা আমাদের থাক।

পরদিনই মদনকাকা আর বাহাদুর মিলে ফিতে টেনে পিছনের দিককার জমিটা মাপজোক করল। মদনকাকা বাবাকে এসে বলল, বিঘে দুই হেসে খেলে বের করা যাবে। দু বিঘের অনেক দাম। পিছনের জমি বলে দাম কিছু কম হবে। তাও ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ ধরে রাখুন। শাওলরাম দিনে দুপুরে ডাকাতির চেষ্টা করছে।

তাদের বাড়ির ভোল পাল্টাচ্ছে আস্তে আস্তে। মরা বাড়িটা জেগে উঠছে। একটু প্রাণের স্পর্শ লাগছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু বন্দনার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইশলের মতো দীর্ঘ টানা বাঁশির মতো কী যেন বেজে যায়। একমাস পার হয়ে গেছে। অতীশ কলকাতায় চলে গেল বোধহয় ! কবে গেল ? বলেও গেল না ?

মা ! ও মা ! ছেলে ফিরে পেয়ে সব ভুলে গেলে যে ! বাবা ফিরে এল, এবার নারায়ণপুজো দেবে না ?

তাই তো ! কত দিন পুজোপাঠ নেই। বাহাদুরকে দিয়ে ভট্‌চাযমশাইকে খবর পাঠা তো।

বাহাদুরকে ভট্‌চাযমশাইয়ের কাছে পাঠাল বন্দনা। কিন্তু মনে মনে বলল, হে ঠাকুর, ভট্‌চাযমশাইয়ের যেন কাল জ্বর হয়। যেন অতীশ আসে। তার যেন কলকাতায় যাওয়া না হয়ে থাকে ...

এক মাসের জায়গায় দেড় মাস পেরিয়ে গেছে, অতীশের থাকার কথা নয়। এই ভেবে বন্দনার বুকটা ধুক ধুক করতে লাগল অনিশ্চয়তায়।

পরদিন সন্ধেবেলা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল বন্দনা। কে আসবে ? কে আসবে ? কে আসবে ? হে ঠাকুর ...

গায়ে নামাবলি জড়ানো পুরুত ঠাকুর যখন তার লাজুক মুখটা নামিয়ে নম্র পায়ে উঠে আসছিল সিঁড়ি বেয়ে তখন যে কেন আনন্দে হার্টফেল হল না বন্দনার কে বলবে ? তার খুব হাততালি দিয়ে হো হো করে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল। ইচ্ছে হল ছাদে গিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তে। ইচ্ছে হল আজ ঘুমের মধ্যে মরে যেতে।

যতক্ষণ পুজো করল অতীশ, বন্দনার দুটো চোখের পলক পড়ল না। ঠাকুর আজ তার দুটো চোখ ভরে দিচ্ছেন। আর কিছু চায় না বন্দনা। আর কিছু নয়। শুধু মাঝে মাঝে যেন দু চোখ ভরে দেখতে পায়।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল পিছনের বাগান। কুয়াশায় মাখামাখি। নতমুখে বাগানটা পেরোচ্ছিল অতীশ। আতা গাছটার তলায় কে যেন বসে আছে! অতীশ থমকে দাঁড়াল।

কলকাতায় কবে যাচ্ছ?

অতীশ একটু হাসল, এখানে বসে থাকতে হয় বুঝি খুকি? ঠাণ্ডা লাগবে না?

কথার জবাব দাওনি।

যাচ্ছি না। তিনটে ডাইনি যেতে দিচ্ছে না।

ডাইনি! সে আবার কী?

আছে। তুমি বুঝবে না। ঘরে যাও ঠাণ্ডা লাগবে।

আমি মরব।

ওরকম বলতে নেই।

আমি মরলে তোমার কী?

সে কি বোঝাতে পারি?

তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

জানি খুকি, জানি।

শোনো, আমাদের পিছনের দু বিঘে জমি বিক্রি হবে। বাবার তো একটুও বুদ্ধি নেই। কে আমাদের এত সব কাজ করে দেবে বলো? তুমি ভার নেবে? বাবা বলেছে টেন পারসেন্ট কমিশন।

অতীশ একটু হাসল। বলল, আমি বড় লোভী, না খুকি?

বন্দনা ভ্রূ কুঁচকে বলল, লোভীই তো!

তারা আর কোনও কথা বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। তারা বলল না, কিন্তু তাদের হয়ে আজ রাতের জ্যোৎস্না, একটু কুয়াশা আর পুরনো এই বাড়ির প্রাচীন এক হাওয়া কত কথা কয়ে গেল। কত কথা উঠে এল মাটির গভীর থেকে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ল। তাদের চারদিকে সেইসব কথা উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। গুনগুন, গুনগুন।

ছায়াময়ী

ধৃতির রিভলভার নেই কিন্তু হননেচ্ছা আছে। এই ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে তার জীবনে তেমন কোনও মহিলার আগমন ঘটল না, তা বলে কি তার হৃদয়ে নারীপ্রেম নেই? ঈশ্বর বা ধর্মে তার কোনও বিশ্বাসই নেই, তবু সে জানে যে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। একজন বা একাধিক জ্যোতিষী তাকে ওই সতর্কবাণী শুনিয়েছে।

রাত দুটো। তবু এখন টেলিপ্রিন্টার চলছে ঝড়ের বেগে। চিফ সাব-এডিটর উমেশ সিংহ প্রেসে নেমে গেছেন খবরের কাগজের পাতা সাজাতে। দেওয়ার মতো নতুন খবর কিছু নেই আজ। বাকি তিনজন সাব-এডিটরের একজন বাড়ি চলে গেছে, দু'জন ঘুমোচ্ছে। ধৃতি একা বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পায়জামা। টেলিপ্রিন্টারের খবর সে অনেকক্ষণ দেখছে না। কাগজ লম্বা হয়ে মেশিন থেকে বেরিয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছে। এবার একটু দেখতে হয়।

ধৃতি উঠে জল দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নেয়। তারপর মেশিনের কাছে আসে। মাদ্রাজে আমের ফলন কম হল এবার, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, যুগোশ্লাভিয়া ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রশংসা করেছে, ইজরায়েলের নিন্দা করছে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র। কোনও খবরই যাওয়ার নয়। একটা ছোট্ট খবর কাগজের লেজের দিকে আটকে আছে। প্লেন ক্র্যাশে ব্যাঙ্গালোরে দু'জন শিক্ষার্থী পাইলট নিহত। যাবে কি খবরটা? ইন্টারকম টেলিফোন তুলে বলল, উমেশদা, একটা ছোট প্লেন ক্র্যাশের খবর আছে। দেব?

কোথায়?

ব্যাঙ্গালোর।

ক'জন মারা গেছে?

দু'জন।

রেখে দাও। আজ আর জায়গা নেই। এমনিতেই বহু খবর বাদ গেল। ত্রিশ কলম বিজ্ঞাপন।

আচ্ছা।

ধৃতি বসে থাকে চুপ করে। অনুভব করে তার ভিতর হননেচ্ছা আছে, প্রেম আছে, আর আছে সুপ্ত সন্ন্যাস। বয়স হয়ে গেল ত্রিশের কাছাকাছি। ত্রিশ কি খুব বেশি বয়স?

টেলিফোন বেজে ওঠে। এত রাতে সাধারণত প্রেস থেকেই ফোন আসে। উমেশদা হয়তো কোনও হেডিং পালটে দিতে বলবে বা কোনও খবর ছাঁট-কাট করতে ডেকে পাঠাবে। তাই ধৃতি গিয়ে ইন্টারকম রিসিভারটা তুলে নেয়। তখনই ভুল বুঝতে পারে। এটা নয়, অন্য টেলিফোনটা বাজছে। বাইরের কল।

দ্বিতীয় রিসিভারটা তুলেই সে বলে, নিউজ।

ওপাশে অপারেটারের গলা পাওয়া যায়, এলাহাবাদ থেকে পি পি ট্রাঙ্ককল। ধৃতি রায়কে চাইছে।

রাত দুটোর সময় মাথা খুব ভাল কাজ করার কথা নয়। তাই এলাহাবাদ থেকে তার ট্রাঙ্ককল শুনেও সে তেমন চমকায় না। একটু উৎকর্ণ হয় মাত্র। তার তেমন কোনও নিকট আত্মীয়স্বজন নেই, স্ত্রী বা পুত্রকন্যা নেই, তেমন কোনও প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। কাজেই দুঃসংবাদ পাওয়ার কোনও ভয়ও নেই তার।

এলাহাবাদি কণ্ঠটি খুবই ক্ষীণ শোনা গেল, হ্যালো! আমি ধৃতি রায়ের সঙ্গে—

ধৃতি রায় বলছি।

মাত্র তিন মিনিট সময়, কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন।

বলা যাবে না। শুধু বলে রাখি, আমি টুপুর মা। টুপুকে ওরা মেরে ফেলেছে, বুঝলেন? খবরটা আপনার কাগজে ছাপবেন কিন্তু! শুনুন, সবাই এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিচ্ছে। প্লিজ, বিশ্বাস করবেন না। আপনি লিখবেন টুপু খুন হয়েছে।

অধৈর্য ধৃতি বলে, কিন্তু টুপু কে?

আমার মেয়ে।

আপনি কে?

আমি টুপুর মা।

আপনি আমাকে চেনেন?

চিনি। আপনি খবরের কাগজে কাজ করেন। মাঝে মাঝে আপনার নামে লেখা বেরোয় কাগজে। নামে চিনি।

আমি যে নাইট শিফটে আছি তা জানলেন কী করে?

আজ বিকেলে আপনার অফিসে আর একবার ট্রাঙ্ককল করি, তখন অফিস থেকে বলেছে।

শুনুন, আপনার মুখের খবর তো আমরা ছাপতে পারি না, আপনি বরং ওখানে আমাদের যে করেসপন্ডেন্ট আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

না, না। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না। টুপুকে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন।

ধৃতি বুঝতে পারে এলাহাবাদি পুরো পাগল। সে তাই গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, তা হলে বরং ঘটনাটা আদ্যোপান্ত লিখে ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

ছাপবেন তো?

দেখা যাক।

না, দেখা যাক নয়। ছাপতেই হবে। টুপু যে খুন হয়েছে সেটা সকলের জানা দরকার। খবরের সঙ্গে ওর একটা ছবিও পাঠাব। দেখবেন টুপু কী সুন্দর ছিল! অদ্ভুত সুন্দর। ওর নামই ছিল মিস এলাহাবাদ।

তাই নাকি?

পড়াশুনোতেও ভাল ছিল।

অপারেটর তিন মিনিটের ওয়ার্নিং দিতেই ধৃতি বলল, আচ্ছা ছাড়ছি।

ছাপবেন কিন্তু।

ধৃতির কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ফোন ছেড়ে সে উঠে মেশিন দেখতে থাকে। বাণিজ্য-মন্ত্রীর বিশাল এক বিবৃতি আসছে পার্টের পর পার্ট। এরা যে কী সাংঘাতিক বেশি কথা বলতে পারে! আর কখনও নতুন কথা বলে না।

টেবিলের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। ধৃতি আর মেশিন পাহারা না দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। সিগারেট শেষ হলেই চোখ বুজবে।

চোখের দুটো পাতা চুম্বকের টানে জুড়ে আসছে ক্রমে। মাথার দিকে অল্প দূরেই টেলিপ্রিন্টার ঝোড়ো শব্দ তুলে যাচ্ছে। রিপোর্টারদের ঘরে নিস্ফল টেলিফোন বেজে বেজে এক সময়ে থেমে গেল। মাথার ওপরকার বাতিগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে সহদেব বেয়ারা। আবছা অন্ধকারে হলঘর ভরে গেল।

সিগারেট ফেলে ফিরে শুল ধৃতি। উমেশদা প্রেস থেকে কাগজ ছেড়ে উঠে এল, আধো ঘুমের মধ্যেও টের পেল সে।

অনেকদিন আগে স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছিল ধৃতি। তখন ব্যাঙ্কের অল্পবয়সি কর্মীদের কয়েকজন তাকে ধরল, আপনি ধৃতি রায়? খবরের কাগজে ফিচার লেখেন আপনিই তো?

সেই থেকে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। স্টেট ব্যাঙ্কের ওপরতলায় কমন রুম আছে। সেখানে আজকাল বিকেলের দিকে অবসর পেলে এসে টেবিল টেনিস খেলে।

আজও খেলছিল। টেবিল টেনিস সে ভালই খেলে। ইদানীং সে জাপানি কায়দায় পেন হোল্ড গ্রিপে খেলার অভ্যাস করছে। এতে একটা অসুবিধে যে ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না। বাঁ দিকে বল পড়লে হয় কোনওক্রমে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয়তো বাঁ দিকে সরে গিয়ে বলটাকে ডানদিকে নিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হয়। তবে এই কলম ধরার কায়দায় ব্যাট ধরলে মারগুলো হয় ছিটেগুলির মতো জোরালো। সে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য খেলে না, এমনিতেই খেলে। কিন্তু ধৃতি যা-ই করে তাতেই তার অখণ্ড মনোযোগ।

আর এই মনোযোগের গুণেই সে যখনই যা করে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেয় সে যে কয়েকটা ফিচার লিখেছে তার সবগুলোই ভালভাবে উতরে যায়। তার ফলে বাজারে সে সাংবাদিক হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। নাম বলতেই অনেকে চিনে ফেলে। অবশ্য এর এক জ্বালাও আছে।

যেমন স্টেট ব্যাঙ্কে যে নতুন এক টেকো ভদ্রলোক এসেছেন সেই ভদ্রলোকটি তাকে আজকাল ভারী জ্বালায়। নাম অভয় মিত্র, খুবই রোগা, ছোট্ট, ক্ষয়া একটি মানুষ। গায়ের রং ময়লা। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, কিন্তু এর মধ্যেই অসম্ভব বুড়িয়ে রসকষহীন হয়ে গেছে চেহারা। চোখদুটোতে একটা জুলজুলে সন্দিহান দৃষ্টি। অভয় মিত্র তার নাম শুনেই প্রথম দিনই গম্ভীর হয়ে বলেছিল, দেশে যত অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে তার বিহিত করুন। আপনারাই পারেন।

কে না জানে যে এ দেশে প্রচুর অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে! আর এও সকলেরই জানা কথা যে কিছু করার নেই।

কিন্তু অভয় মিত্র ধৃতিকে ছাড়েন না। দেখা হলেই ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকেন, আপনারা কী করছেন বলুন তো? দেশটা যে গেল!

ধৃতি খুবই ধৈর্যশীল, সহজে রাগে না। কিন্তু বিরক্ত হয়। বিরক্তি চেপে রেখে ধৃতি বলে, আমার কাগজ আমাকে মাইনে দেয় বটে, কিন্তু দেশকে দেখার দায়িত্ব দেয়নি অভয়বাবু। দিলেও কিছু তেমন করার ছিল না। খবরের কাগজ আর কতটুকু করতে পারে?

অভয় হাল ছাড়েন না। বলেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখুন। শয়তানদের মুখোশ খুলে দিন।

অভয় মিত্রের ধারণা খুবই সহজ ও সরল। তিনি জানেন কিছু মুখোশ-পরা লোক আড়াল থেকে দেশটার সর্বনাশ করছে। শোষণ করছে, অত্যাচার করছে, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, কালো টাকা জমানো থেকে সব রকম দুষ্কর্মই করছে একদল লোক।

তারা কারা?— একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ধৃতি।

তারাই দেশের শত্রু। আমি আপনাকে অনেকগুলো কেস বলতে পারি।

শুনব'খন একদিন।

এইভাবে এড়িয়েছে ধৃতি।

আজও টেবিল টেনিস খেলার দর্শকের আসনে অভয় মিত্র বসা। তিনি কোনওদিনই খেলেন না। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে বসে থাকেন। ধৃতি স্টেট ব্যাঙ্কের সবচেয়ে মারকুটে খেলোয়াড় সুব্রতকে এক গেমে হারিয়ে এসে চেয়ারে বসে দম নিচ্ছিল।

অভয় মিত্র বললেন, আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি ইন্টেলেকচুয়ালরা সি আই এ-র টাকা খায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে নির্বিকার ভাবে বলল, খায়।

সে কথা আপনারা কাগজে লেখেন না কেন?

আমিও খাই যে।— বলে ধৃতি হাসল।

না না, ইয়ারকির কথা নয়। আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলি। ময়নাগুড়িতে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার গেল একবার। অতি সৎ লোক। কিন্তু কন্ট্রাক্টররা তাকে কিছুতেই ঘুষ না দিয়ে ছাড়বে না। তাদের ধারণা ঘুষ না নিলে ছোকরা সব ফাঁস করে দেবে। যখন কিছুতেই নিল না তখন একদিন দুম করে ছেলেটাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হল। এ ব্যাপারটাকে আপনি কী মনে করেন?

খুব খারাপ।

ভীষণ খারাপ ব্যাপার নয় কি?

ভীষণ।

এইসব চক্রান্তের পিছনে কারা আছে সে তো আপনি ভালই জানেন।

এইসব চক্রান্ত ফাঁস করে দিন।

দেব। সময় আসুক।

সময় এসেছে, বুঝলেন! সময় এসে গেছে। ইন্ডিয়া আর চায়নার বর্ডারে এখন প্রচণ্ড মবিলাইজেশন শুরু হয়ে গেছে।

বটে? খবর পাইনি তো!

খবর আপনারা ঠিকই পান, কিন্তু সেগুলো চেপে দেন। আপনাকে আরও জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজির রেগুলার টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। নেতাজি সন্ন্যাস ছেড়ে আসতে চাইছেন না। কিন্তু হয়তো তাঁকে আসতেই হবে শেষ পর্যন্ত। আপনারাও জানেন যে নেতাজি বেঁচে আছেন, কিন্তু খবরটা ছাপেন না।

ধৃতি বিরক্ত হয় না। মুখ গম্ভীর করে বলে, তা অবশ্য ঠিক। সব খবর কি ছাপা যায়?

কিন্তু মুখোশ একদিন খুলে যাবেই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে।

ধৃতির সময় নেই। আবার নাইট শিফট। ঘড়ি দেখে সে উঠে পড়ে। ধৃতি আগে থাকত একটা মেসে। তার বন্ধু জয় নতুন একটা ফ্ল্যাট কিনল বিস্তর টাকার ঝুঁকি নিয়ে। প্রথমেই থোক ত্রিশ হাজার দিতে হয়েছিল, তারপর মাসে মাসে সাড়ে চারশো করে গুনে যেতে হচ্ছে। চাকরিটা জয় কিছু খারাপ করে না। সে বিলেতফেরত এঞ্জিনিয়ার, কলকাতার একটা এ-গ্রেড ফার্মে আছে। হাজার তিনেক টাকা পায়। কাট-ছাঁট করে আরও কিছু কম হাতে আসে।

জয়ের বয়স ধৃতির মতোই। বন্ধুত্বও খুব বেশি দিনের নয়। তৃতীয় এক বন্ধুর সূত্রে ওলিম্পিয়া রেস্টুরেন্টে ভাব হয়ে গিয়েছিল। পরে খুব জমে যায়।

জয় একদিন এসে বলল, একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। একটা ঘর আছে, তুমি থাকবে?

একটু দোনা-মোনা করেছিল ধৃতি। মেসের মতো অগাধ স্বাধীনতা তো বাড়িতে পাবে না।

দ্বিধাটা বুঝে নিয়ে জয় বলল, আরে আমার হাউসহোল্ড কি আর পাঁচজনের মতো নাকি! ইউ উইল বি ফ্রি অ্যাজ লাইট অ্যান্ড এয়ার। মান্থলি ইনস্টলমেন্টটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে ভাই, একা বিয়ার করতে পারছি না। তুমি যদি শেয়ার করো তা হলে আমি বেঁচে যাই।

ওরা ব্যাচেলর সাবটেনান্ট খুঁজছে। ধৃতির চেয়ে ভাল লোক আর কাকে পাবে? ধৃতির আত্মীয়স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধবী নেই। ফলে হুটহাট লোকজন আসবে না।

ধৃতি রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে সে জয়ের একডালিয়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে আছে। দু'তলায়

দক্ষিণ-পূর্বমুখী চমৎকার আস্তানা। সামনের দিকের বেডরুমটা ধৃতি নিয়েছে। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকে। খাওয়া-দাওয়া থাকলে ধৃতির বাঁধা নেমন্তন্ন থাকে। ধৃতি প্রতি মাসে দু'শো টাকা করে দেয়।

ধৃতি যখন ফিরল তখন প্রায় সাতটা বাজে। নাইট শিফট শুরু হবে ন'টায়। সময় আছে।

কলিং-বেল টিপতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। সামনের সিটিং-কাম-ডাইনিং হলের মাঝখানের বিশাল টানা পরদাটা সরানো। খাওয়ার টেবিলের ওপর প্লেটে পেঁয়াজ কুচি করছিল পরমা। আর আঁচলে চোখ মুছছিল।

পরমা দারুণ সুন্দরী। ইদানীং সামান্য কিছু বেশি মেদ জমে গেছে, নইলে সচরাচর এত সুন্দরী দেখাই যায় না। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে পরমা অত্যন্ত সচেতন। কখনও তাকে না-সাজা অবস্থায় ঘরেও দেখেনি ধৃতি। যখনই দেখে তখনই পরমার মুখে মৃদু বা অতিরিক্ত প্রসাধন, চোখে কাজল, ঠোঁটে কখনও হালকা কখনও গাঢ় লিপস্টিক, পরনে সব সময়ে ঝলমলে শাড়ি। তেইশ-চব্বিশের বেশি বয়স নয়।

ধৃতি শিস দিতে দিতে দরজা দিয়ে ঢুকেই বলল, পরমা, কাঁদছ?

কাঁদব না? পেঁয়াজ কাটতে গেলে সবারই কান্না আসে।

আমার চিঠি-ফিটি কিছু এল শেষ ডাকে?

কে চিঠি দেবে বাবা! রোজ কেবল চিঠি!

চিঠি দেওয়ার লোক আছে।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, সে সব তো আজে-বাজে লোকের চিঠি। কে লেখা ছাপাতে চায়, কে খবর ছাপাতে চায়, কে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। ওসব কি চিঠি নাকি? আপনি প্রেমপত্র পান না কেন বলুন তো?

ধৃতি নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে বলে, দেখো ভাই বন্ধুপত্নী, যাদের পারসোনালিটি থাকে তাদের সকলেই ভয় পায়। আমাকে প্রেমপত্র দিতে কোনও মেয়ে সাহস পায় না।

ইস্! বেশি বকবেন না। নিজে একটি ভিতুর ডিম। মেয়ে দেখলে তো খাটের তলায় লুকোন।

কবে লুকিয়েছি?

জানা আছে।

ঠোঁট ওলটালে পরমাকে বড় সুন্দর লাগে। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। ধৃতি তাই স্থির চেয়ে থাকে একটু। মৃদু একটু মুগ্ধতার হাসি তার মুখে।

কোন মেয়ে না পুরুষের দৃষ্টির সরলার্থ করতে পারে! পরমা বরং তা আরও বেশি পারে। কেন না সুন্দরী বলে সে ছেলেবেলা থেকেই বহু পুরুষের নজর পেয়ে আসছে।

ধৃতি বলল, পরমা তোমার কেন একটা ছোট বোন নেই বলো তো?

থাকলে বিয়ে করতেন?

আহা, বিয়ের কথাটা ফস করে তোলা কেন? অন্তত প্রেমটা তো করা যেত।

প্রেম করতে কলজের জোর চাই সাংবাদিক মশাই। যত সস্তা ভাবছেন অত নয়।

বিয়ের আগে তুমি ক'টা প্রেম করেছ? কমিয়ে বোলো না, ঠিক করে বলো তো!

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, অনেক। কতবার তো বলেছি।

কোনওবারই সঠিক সংখ্যাটা বলোনি।

হিসেব নেই যে।

সেই সব রোমিওদের সঙ্গে এখন আর দেখা হয় না?

একেবারে হয় না তা নয়।— বলে পরমা একটু চোখ পাকিয়ে মৃদু হাসে।

তাদের এখন অবস্থা কী?

প্রথম-প্রথম অক্সিজেন কোরামিন দিতে হত, এখন সব সেরে উঠছে।

ধৃতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, বাস্তবিক, একজন সুন্দরী মেয়ে যে কত পুরুষের সর্বনাশ করতে পারে!

পুরুষরা তো সর্বনাশই ভালবাসে।

শিস দিতে দিতে ধৃতি ঘরে ঢোকে। পরমা বাইরে থেকে বলে, চা চাই নাকি?

দেবে?

খেলে দেব না কেন? আহা, কী কথা!

দাও তা হলে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট-ফিস্কুট দিয়ো না আবার! আমি নেকেড চা ভালবাসি।

পরমা অত্যন্ত দুষ্টু একটা জবাব দিল, অত নেকেড ভালবাসতে হবে না।

ঘরে একা ধৃতি একটু হাসল।

তার ঘরটা অগোছালো বটে কিন্তু দামি জিনিসের অভাব নেই। একটা স্টিলের হাফ-সেকরেটারিয়েট টেবিল জানলার পাশে, টেবিলের সামনে রিভলভিং চেয়ার, তার সিঙ্গল খাটে ফোম রবারের তোষক। মহার্ঘ্য বুককেস। একটা চারহাজারি স্টিরিয়ো গ্রামোফোন, একটা ছোট্ট জাপানি রেডিয়ো। যা রোজগার তার সবটাই কেবলমাত্র নিজের জন্য খরচ করতে পারে সে।

নিকট-আত্মীয় বলতে এক দাদা আর দিদি আছে তার। দাদা বেনারসে রেলের বুকিং ক্লার্ক। দিদি স্বামী-পুত্র নিয়ে দিল্লি প্রবাসিনী। সারা বছর ভাই-বোনে কোনও যোগাযোগ নেই। বিজয়া বা নববর্ষে বড়জোর একটা পোস্টকার্ড আসে, একটা যায়। তাও সব বছর নয়। আত্মীয়তার বন্ধন বা দায় নেই বলে ধৃতির খারাপ লাগে না। বেশ আছে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, যেবার সে অফিসের কাজে দিল্লি যায়। দিদির বাড়িতে ওঠেনি, অফিস হোটেল-খরচ দিয়েছিল। দেখা হয়েছিল এক বেলার জন্য। ধৃতি দেখেছিল দিদি নিজের সংসারের সঙ্গে কী গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। ভাই বলে ধৃতিকে আদরের ত্রুটি করেনি, তবু ধৃতির নিজেকে পর মনে হয়েছিল। দাদা অবশ্য সে তুলনায় আরও পর। দিদি সেবার একটা দামি প্যান্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, ভাইয়ের হাত ধরে বিদায়ের সময়ে কেঁদেও ফেলে। কিন্তু দাদা সেরকম নয়। বছরখানেক আগে বেনারসে দাদার ছেলের পৈতে উপলক্ষ্যে গিয়ে ধৃতি প্রথম বুঝতে পারে যে না এলেই ভাল হত। দাদা তার সঙ্গে তেমন করে কথাই বলেনি, আর বউদি নানাভাবে তাকে শুনিয়েছে তোমার দাদার একার হাতে সংসার, কেউ তো আর সাহায্য করার নেই। খোঁজই নেয় না কেউ। এসব খোঁটা দেওয়া ধৃতির ভাল লাগে না। সে নিজে একসময়ে দাদার পয়সায় খেয়েছে পরেছে ঠিকই, কিন্তু বউদি যখন বলল, তোমার দাদা তো সকলের জন্যই করেছে, এখন তার জন্য কেউ যদি না করে তবে তো বলতেই হয় মানুষ অকৃতজ্ঞ, তখন ধৃতির ভারী ঘেন্না ধরে ভিখিরিপনা দেখে। কলকাতায় এসে সে দু'মাসে হাজারখানেক টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়।

পরমা নিজেই চা নিয়ে আসে। ধৃতি লক্ষ করে অল্প সময়ের মধ্যেই পরমা শাড়ি পালটেছে। কতবার যে দিনের মধ্যে শাড়ি পালটায় পরমা।

ধৃতি বিছানায় চিতপাত হয়ে পড়েছিল। পরমা বিছানার ওপর এক টুকরো পিসবোর্ডে চায়ের কাপ রেখে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বলল, আজ নাইট শোতে সিনেমায় যাচ্ছি।

জয়কে খুব ধসাচ্ছ ভাই বন্ধুপত্নী।

আহা, সিনেমায় গেলে বুঝি ধসানো হয়?

শুধু সিনেমা? ফি হপ্তায় যে শাড়ি কিনছ। টি ভি কেনার বায়না ধরেছ। সব জানি। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলেও খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে প্রায়ই। পরমা তার প্রিয় মুদ্রাদোষে ঠোঁট উলটে বলে, আমরা তো আর আপনার মতো রসকষহীন হাড়কঞ্জুস নই।

আমি কঞ্জুস?

নয় তো কী? খরচের ভয়ে তো বিয়েই করছেন না। পাছে প্রেমিকাকে সিনেমা দেখাতে কি হোটেলে খাওয়াতে হয় সেই ভয়েই বোধহয় প্রেমেও অরুচি হচ্ছে।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে চায়ে চুমুক মেরে ধৃতি বলল, তোমাদের বিবাহিতদের যা কাণ্ড-কারখানা দেখছি এরপর আহাম্মক ছাড়া কে বিয়ে করতে যায়?

মারব থাপ্পড়, কী কাণ্ড দেখলেন শুনি?

রোজ তো তোমাদের দু'জনে খটামটি লেগে যায়।

আহা, সে হাঁড়ি-কলসি এক জায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি হয়ই। তা ছাড়া ওসব ছাড়া প্রেম জমে নাকি? একঘেয়ে হয়ে যায়।

যা-ই বলো ভাই, জয়টার জন্য আমার কষ্ট হয়।

পরমা থমথমে মুখ করে বলে, বললেন তো? আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি। একটা চিঠি এসেছে আপনার। নীল খামে। কিছুতেই সেটা দেব না।

মাইরি?— বলে ধৃতি উঠতে চেষ্টা করে।

পরমা লঘু পায়ে দরজা পেরিয়ে ছুটে চলে যায়। ধৃতি একটু উঠতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ওঠে না। চা খেতে থাকে আস্তে আস্তে।

হলঘরে জয়ের গলা পাওয়া যায়, ওঃ, যা একখানা কাণ্ড হয়ে গেল আজ! এই পরমা, শোনো না!

পরমা কোনওদিনই জয়ের ডাকে সাড়া দেয় না। স্বামীরা আজকালকার মেয়েদের কাছে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন। পরমা কোনও জবাব দিল না।

এই পরমা!— জয় ডাকে।

ভারী বিরক্তির গলায় পরমা বলে, অত চেঁচাচ্ছ কেন বলো তো! এখন যেতে পারছি না।

ডোন্ট শো মি বিজিনেস। কাম হিয়ার। গিভ মি এ—

আঃ! কী যে কোরো। দাঁড়াও, ধৃতিকে ডাকছি, এসে দেখে যাক।

ওঃ, ধৃতি দেখে কী করবে? হি ইজ ভারচুয়ালি সেক্সলেস। ওর কোনও রি-অ্যাকশন নেই।

পরমা চেঁচিয়ে ডাকল, ধৃতিবাবু! এই ধৃতি রায়!

ধৃতি শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ স্বরে ঘর থেকেই জবাব দেয়, ভাই, তোমাদের বসন্ত-উৎসবে আমাকে ডেকো না। আমি কোকিল নই, কাক।

পরমা পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বলে, একজন বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করা পুরুষের কর্তব্য। আপনাদের শিভালরি কোথায় গেল বলুন তো?

অগাধ জলে। পরমা, আমাদের সব ভেসে গেছে। নারী প্রগতির এই যুগে পুরুষ নাসবন্দি অপদার্থ মাত্র।

পরদার ওপাশে ঝটাপটির শব্দ হয়। আসলে ওটা জয়ের প্রেম নয়, টিকলিং। ধৃতি নির্বিকার ভাবে ধোঁয়ার রিং করার চেষ্টা করতে থাকে শুয়ে শুয়ে। সে জানে জয় সুব্রতর বোনের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করেছে সম্প্রতি। জানে বলে ধৃতির এক ধরনের নির্বিকার ভাব আসে। একটু বাদে জয় ঘরে এল। তার পরনে পাজামা, কাঁধে তোয়ালে। হাতে এক গ্লাস ফ্রিজের ঠান্ডা জল। এসে চেয়ারে বসে বলল, দিন দিন ডামি হয়ে যাচ্ছি মাইরি।

মানে?

মানে আর কী? কোথাও আমার কোনও ওপিনিয়ন অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে না। না ঘরে, না বাইরে। কোম্পানি আগ্রার কাছে তাদের প্রোডাকশন তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমাকে যেতে হবে সাইট আর আদার ফেসিলিটিজ দেখতে। এ নিয়ে আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দু' ঘণ্টা মুখের ফেকো তুলে

বকলাম। কী মাল মাইরি! আসানসোলে কারখানা খোলবার লেটার অফ ইনডেন্ট পেয়ে গেছে, তবু সেখানে করবে না, আগ্রায় যাবে। হেডস্ট্রং যাকে বলে!

কবে যাচ্ছিস?

ঠিক নেই এখনও। মে বি নেক্সট মান্থ, মে বি নেক্সট উইক, ইভন টুমোরো।

ঘুরে আয়। সেকেন্ড হানিমুন হয়ে যাবে।

আর হানিমুন! ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে লালবাতি জ্বলছে। এই ফ্ল্যাটটা না বেচে দিতে হয়। আজকাল যে যত বড় চাকরি করে তার তত মানিটারি ওবলিগেশন। হ্যাঁ রে, তোরা ট্যাকসেশন নিয়ে কি কিছুই লিখবি না? খোদ অ্যামেরিকায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টের বেশি ট্যাকসেশন নেই। আর এই ভুখা দেশে কেন এরকম আনহাইজনিক ট্যাকসেশন।

কে জানে!

এটা নিয়ে কিন্তু লেখা দরকার। একটা তিন হাজারি মাস মাইনের লোক আজকাল পুরো প্রলেটারিয়েট। আর ওদিকে যত ট্যাক্স রেট বাড়ছে তত বাড়ছে ট্যাক্স ক্রাইম আর হ্যাজার্ডস।

ধৃতি চিত থেকে উপুড় হয়ে বলল, তুই তো এই ফ্ল্যাটটা তোর কোম্পানিকে লিজ দিয়েছিস। তারাই তো ভাড়া গুনছে।

না করে কী করব? টাকা আসবে কোত্থেকে? আমার একমাত্র ট্যাক্স-ফ্রি ইনকাম কোনটা জানিস? তোর দেওয়া মাসে মাসে দুশো টাকা।

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। বাস্তবিকই বড় চাকুরেরা আজকাল সুখে নেই।

জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ, ঠান্ডা জল খেল।

ধৃতি বলল, তোর বউ আমার একটা চিঠি চুরি করেছে। মেয়েদের নিন্দে করেছিলাম বলে পানিশমেন্ট।

নিন্দে করেছিস? সর্বনাশ। সে তো সাপের লেজে পা।

ওপাশের হলঘর থেকে পরমা চেঁচিয়ে বলে, খবরদার সাপের সঙ্গে তুলনা দেবে না বলে দিচ্ছি। আমরা কি সাপ?

সাপ কি খারাপ?— জয় প্রশ্ন করে উঁচু স্বরে।

পরমা ঘরে ঢুকে আসে। হাতে এক কোষ জল। সেটা সজোরে জয়ের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, সাপ ভাল কি না নিজে জানো না?

ধৃতি বালিশে মুখ গুঁজে বলে, আচ্ছা বাবা, আমিই না হয় সাপ। জয় ভেড়া, আর পরমা সিংহী।

সিংহী না হাতি। পরমার সরোষ উত্তর।

তবে হাতিই। দ্যাট ইজ ফাইনাল।— ধৃতি বলে।

জয় হেসে বলে, হাতি বলছে কেন জানো তো! তোমার যে একটু ফ্যাট হয়েছে তাইতেই ওর চোখ টাটায়। ওর গায়ে এক মগ জল ঢেলে দাও।

পরমা 'ঠিক বলেছ' বলে দৌড়ে গেল জল আনতে।

জয় এক প্যাকেট আবদাল্লা সিগারেট ধৃতির বিছানায় ছুড়ে দিয়ে বলল, এটা তোর জন্য। রাখ।

ধৃতি পরম আলস্যে পাশ ফিরে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলে, কোথায় পেলি? ফরেনের মাল দেখছি।

অফিসে একজন ক্লায়েন্ট চার প্যাকেট প্রেজেন্ট করে গেল। সদ্য ফরেন থেকে এসেছে।

ধৃতি একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানে।

জয় বলে, একটু গার্ড নে, পরমা বোধহয় সত্যিই জল আনছে।

মাইরি!— বলে ধৃতি লাফিয়ে ওঠে।

পরমা একটা লাল প্লাস্টিকের মগ হাতে ঘরে ঢুকেই ছুটে আসে। ধৃতি জাপানি ছাতাটা খুলে সামনে ধরতেই পরমা হেসে উঠে বলে, আহা, কী বুদ্ধি।

বলতে বলতে পরমা মগ থেকে জল হাতের আঁজলায় তুলে ওপর বাগে ছিটিয়ে দেয়, নানা কায়দায় ধৃতি ছাতা এদিক ওদিক করে জল আটকাতে আটকাতে বলে, আমি কী করেছি বলো তো?

হাতি বললেন কেন?

মোটেই বলিনি। তুমি বলেছ।

ইস্! আপনিই বলেছেন।

মাপ চাইছি।

কান ধরুন।

ধৃতি ছাতা ফেলে কান ধরে দাঁড়ায়।

পরমা মগ রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, মেয়েদের সম্মান করতে কবে যে শিখবেন আপনারা!

কেন, খুব সম্মান করি তো।

করলে জাতটা উদ্ধার পেয়ে যেত।

জয় মৃদু হাসছিল। বলল, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না পরমা। ধৃতি এক নম্বরের উওম্যান-হেটার! নারী প্রগতির বিরোধী। আড়ালে ও মেয়েদের নামে যা তা বলে। ও যদি কখনও প্রাইম মিনিস্টার হয় তবে নাকি স্লোগান দেবে, মেয়েরা রান্নাঘরে ফিরে যাও।

বটে?— পরমা চোখ বড় করে তাকায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, মাইরি না। আমি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখতেও যাই।

পরমা শ্বাস ফেলে বলে, আমি অবশ্য মেয়েদের ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি না। কিন্তু মেয়েদের লিবার্টিকে সাপোর্ট করি।

তোমরা তো ভাই লিবারেটেড। কেউ আজকাল মেয়েদের বাঁধে না। ছাড়া মেয়েরা কেমন চারদিকে পাখি প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ফের? ছাড়া মেয়ে মানে?

মানে যারা লিবারেটেড।

সন্দেহের চোখে চেয়ে পরমা বলে, ব্যাড সেনসে বলছেন না তো?

আরে না।

জয় বলে, ব্যাড সেনসেই বলছে। ওকে ছেড়ো না।

পরমা জয়ের দিকে চেয়ে বলে, তুমি ফুট কাটছ কেন বলো তো?

আমাকে খেপিয়ে দিয়ে বিনি পয়সায় মজা দেখতে চাইছ?

ধৃতি কথাটা লুফে নিয়ে বলে, একজ্যাক্টলি। এবার জয়কেও একটু শাসন করো পরমা, বর বলে অতটা খাতির কোরো না।

কে খাতির করছে?— বলে ধৃতিকে একটা ধমক দিয়ে পরমা জয়কে বলে, আমি জোকার নাকি?

জয় খুব বিষণ্ণ হয়ে বলে, যার জন্য করি ভাল সে-ই বলে চোর!

থাক, আর সাধু সাজতে হবে না।

তুমি নারীরত্ন।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে, ডিকশনারি কিংবা বঙ্কিমের বই খুললেই ওসব শব্দ জানা যায়। কমপ্লিমেন্ট দিতেও পারো না বুদ্ধু কোথাকার!

তোমার দিকে চাইলে আমার যে কথা হারিয়ে যায়। আত্মহারা হয়ে পড়ি।

খুব সন্তর্পণে ধৃতি বলল, পরমা সুন্দরী।
পরমা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এটা আবার কবে থেকে?
এইমাত্র মনে এল। ভাল না?
ভেবে দেখি।
বলছিলাম পরমা সুন্দরী, আজকের ডাকে আমার কি কোনও চিঠি এসেছে?
এসেছে, কিন্তু দেব না।
না না, চাইছি না, এলেই হল। আমার যে চিঠি আসছে তার মানে হল এখনও লোকে আমাকে ভুলে যাচ্ছে না, আমি যে বেঁচে আছি তা এখনও কিছু লোক জানে, আর কষ্ট করে যে চিঠি লিখছে তার অর্থ হল আমার মতো অপদার্থকেও লোকের কিছু জানানোর আছে, বুঝলে? চিঠি আসাটাই ইম্পর্ট্যান্ট। চিঠিটা নয়।
ওঃ, খুব ফিলজফার! আচ্ছা দেব না চিঠি!
চাইনি তো। চাইছিও না।— ধৃতি বলে।
চাইছে না আবার! ভিতরে ভিতরে ছটফটাচ্ছে! কে চিঠি দিয়েছে বলুন তো? মেয়েলি হাতের লেখা আমি ঠিক চিনি।
হয়তো দিদি।— ধৃতি বলে।
না, দিদি নয়, খামের বাঁ দিকে চিঠি যে দিয়েছে তার নাম-ঠিকানা আছে।
তাই বলো!— ধৃতি একগাল হেসে বলে, আমি ভাবছি, পরমার এত বুদ্ধি কবে থেকে হল যে হাতের লেখা দেখে মেয়ে না ছেলে বুঝে ফেলবে!
শুনলে পরমা?— জয় ফের খোঁচায়।
পরমা বলে, আমি কালা নই।
তোমাকে বোকা বলছে।
বোকা নয়।— ধৃতি বলে, আমি বলতে চাইছি পরমা কুটিল নয়, পরমা সরল ও নিষ্পাপ।
হয়েছে! এই নিন চিঠি। আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।
বিছানার ওপর একটা খাম ফেলে দিয়ে পরমা চলে যায়।
ধৃতি ঘড়ি দেখে। সময় আছে। চিঠিটা নিয়ে বিছানায় ফের চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ে।
খামের ওপর বাঁ-ধারে লেখা, টুম্পা চৌধুরী। নামের নীচে মধ্য কলকাতার ঠিকানা।
ধৃতি টুম্পা নামে কাউকে মনে করতে পারল না। চিঠি বেশি বড়ও নয়। খুলে দেখল কয়েক ছত্র লেখা— শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার দাদা আপনার সঙ্গে পড়ত। দাদার নাম অশোক চৌধুরী। মনে আছে? একটা দরকারে এই চিঠি লিখছি। আমি একটা ডেফিসিট গ্র্যান্টের স্কুলে কাজ করি। আমাদের বিল্ডিং-এর জন্য একটা গ্র্যান্ট দরকার। আমরা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু ধরা-করা ছাড়া তো এসব হয় না। আপনার সঙ্গে তো মিনিস্টারের জানাশোনা আছে। আমি সামনের সপ্তাহে আপনার অফিসে বা বাসায় গিয়ে দেখা করব। প্রণাম জানবেন।—টুম্পা চৌধুরী।
টুম্পা মেয়েটা দেখতে কেমন হবে তা ভাবতে ভাবতে ধৃতি উঠে পোশাক পরতে থাকে। জয় চেয়ারে বসে থেকে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে।
ধৃতি মেয়েদের অপছন্দ করে না। তবে কিনা তার কিছু বাছাবাছি আছে। মেয়ে মাত্রই তাকে আকর্ষণ করে না। এই যেমন পরমা। এত অসহনীয় সুন্দরী, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব-সাব তবু পরমার প্রতি কখনও দুর্বলতা বোধ করে না ধৃতি। অর্থাৎ পরমার চেহারা বা স্বভাবে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যা ধৃতির কাছে ওকে কাম্য করে তোলেনি।
এসব বলার মতো কথা নয়। শুধু মনের মধ্যেই এসব কথা চিরকাল থেকে যায়। পরমা বন্ধুপত্নী এবং পরস্ত্রী। কাজেই কোনও রকমেই কাম্য নয়। কিন্তু সে হল বাইরের সামাজিক ব্যাপার। মানুষের

মনের মধ্যে তো সমাজ নেই। সেখানে যে রাষ্ট্রের শাসন সেখানে নীতি নিয়ম নেই, অনুশাসন নেই, আছে কেবল মোটা দাগের কামনা, বাসনা, লোভ, ভয়।

২

টুপুর ছবি দেখলেন? কেমন? সুন্দরী নয়? টুপু ছিল মিস এলাহাবাদ। টুপুর কথা আপনাকে কিন্তু লিখতেই হবে।

বিশাল চিঠি। তাতে টুপুর খুন হওয়ার নানা সম্ভব ও অসম্ভব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। টুপু ছিল নিষ্পাপ, পবিত্র, স্বর্গীয় একটি মেয়ে।

চিঠিটা রেখে ধৃতি বরং ফোটোটাই দেখে। মিথ্যে নয় যে মেয়েটি সুন্দরী। এবং মিস এলাহাবাদ হলেও কোনও আপত্তির কারণ নেই। লম্বাটে ছাঁদের মুখ, বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে কথা ফুটে আছে। কী অসম্ভব সুন্দর টসটসে ঠোঁট দু'খানা! অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাশ থেকে অমিত উঁকি দিয়ে বলে, আরে! কার ছবি দেখছেন? দেখি দেখি!

ধৃতি ছবিটা অমিতের হাতে দিয়ে বলে, পাত্রীর মা ছবিটা পাঠিয়েছে।

বেশ দেখতে। একে বিয়ে করুন।

ধৃতি হেসে বলে, বিয়ে করা শক্ত।

কেন?

মেয়েটা এখন অনেক দূরে। সেখানে জ্যান্ত যাওয়া যায় না।

মরে গেছে?

তাই তো জানিয়েছে।

তবে যে বললেন পাত্রী।

পাত্রী মানে কি বিয়ের পাত্রী? পাত্রীর অর্থ এখানে একটি ঘটনার পাত্রী। মেয়েটা খুন হয়েছে।

ওঃ! দেখতে ভারী ভাল ছিল মেয়েটা!

ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, কিন্তু পাস্ট টেনস।

আপনাকে ছবি পাঠিয়েছে কেন?

কত পাগল আছে।

নিউজ এডিটর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত পায়ে চলে যেতে যেতেও হঠাৎ থমকে ধৃতির সামনে ঘুরে এসে বললেন, এ সপ্তাহে আপনার ইভনিং শিফ্‌ট চলছে তো?

হ্যাঁ।

কালকের মধ্যে একটা ফিচার লিখে দিতে পারবেন?

কী নিয়ে?

ম্যারেজ ল অ্যামেন্ডমেন্ট।

লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে?

আরে না, না। তাহলে আপনাকে বলা হত না। আপনি শুধু সোস্যাল ইমপ্যাক্টটার ওপর লিখবেন। কিন্তু কাল চাই।

ধৃতি মাথা নাড়ল।

এখন ইমারজেনসি চলছে। খবরের ওপর কড়া সেনসর। বস্তুত দেওয়ার মতো কোনও খবর নেই। তাই এত ফিচারের তাগিদ। টেলিপ্রিন্টারে যাও বা খবর আসে তার অর্ধেক যায় সেনসরে। ট্রেনে ডাকাতি হওয়ার খবরটাও নিজের ইচ্ছেয় ছাপা যায় না।

ধৃতি উঠে লাইব্রেরিতে চলে আসে। লাইব্রেরিয়ান অতি সুপুরুষ জয়ন্ত সেন। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে, দেখলে ত্রিশও মনে হয় না। চমৎকার গোছানো মানুষ। লাইব্রেরিটা ঝকঝক তকতক করছে।

জয়ন্ত গম্ভীর মানুষ, চট করে কথা বলেন না, একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে একটা মস্ত পুরনো বই দেখতে থাকেন।

ধৃতি উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলে, দাদা, ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট ল নিয়ে লিখতে হবে।

জয়ন্ত এবার মৃদু একটু হাসলেন। বই থেকে মুখ তুলে বললেন, ফিচার?

হ্যাঁ।

জয়ন্ত মস্ত টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলেন, হাতটা দেখি।

জয়ন্তর ওই এক বাতিক। হাত দেখা আর কোষ্ঠী বিচার। গত শীতে কলকাতা আর ব্যাঙ্গালোর টেস্ট ম্যাচের ফলাফল আশ্চর্যজনক নিখুঁত বলে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা দারুণ কথা বলে দেন। রিপোর্টার সুশীল সান্যালকে গত বছর জুন মাসে হঠাৎ একদিন ডেকে বললেন, কিছু টাকা-পয়সা হাতে রাখো। তোমার দরকার হবে। আর এই হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছ, ফুর্তি লুটছ, তাও কিছুদিন বন্ধ। চুপটি করে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক তাই হয়েছিল। সুশীলবাবুর পেটে টিউমার ধরা পড়ল পরের মাসে। অপারেশনের পর পাক্কা তিন মাস বিছানায় শোওয়া। টাকা গেল জলের মতো। জয়ন্ত সেনকে তাই সবাই কিছু খাতির করে। এমনিতে মানুষটি বেশি কথা বলেন না বটে কিন্তু বাতিক চাড়া দিলে অ্যাসট্রোলজি নিয়ে অনেক কথা বলতে পারেন।

ধৃতির হাতটা দেখে তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, কোষ্ঠী আছে?

ছিল। এখন নেই।

হারিয়ে ফেলেছেন?

আমার কিছু থাকে না। আমি হলাম নাগা সাধু। ভূত-ভবিষ্যৎও নেই।

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, হাতের রেখা তো তা বলছে না।

কী বলছে তবে?

ভূত ছিল, ভবিষ্যৎও আছে।

ধৃতি একটু নড়ে বসে বলে, কী রকম?

জয়ন্ত হাতটা ছেড়ে নির্বিকার ভাবে বললেন, দুম করে কি বলা যায়। তবে খুব ইন্টারেস্টিং হাত।

ধৃতি কায়দাটা বুঝতে পারে। খুব আগ্রহ নিয়ে হাতটা দেখে একটু রহস্য জাগানো কথা বলেই যে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন ওর পিছনে ছোট একটি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে। ধৃতি যে হাত দেখায় বিশ্বাসী নয় তা বুঝে তিনি ওই চাল দিলেন। দেখতে চাইছেন এবার ধৃতি নিজেই আগ্রহ দেখায় কি না।

ধৃতি আগ্রহ দেখায় না। আবার বলে, কিন্তু আমার ল-এর কি হবে?

হবে। আমার কাছে কাটিং আছে।— বলে জয়ন্ত আবার মৃদু হেসে যোগ করলেন, কেবল আমার কাছেই সব থাকে।

সেটা জানি বলেই তো আসা।

কলিং-বেলে বেয়ারা ডেকে কাটিং বের করে দিতে বললেন জয়ন্ত।

রিডিং-এর ফাঁকা টেবিলে বসে বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিং থেকে ধৃতি অ্যামেন্ডমেন্ট ল সম্পর্কে তথ্য টুকে নিচ্ছিল প্যাডে। এসব অবশ্য খুব কাজে লাগবে না। তাকে ঘুরে ঘুরে কিছু মতামত নিতে হবে। সাক্ষাৎকার না হলে ব্যাপারটা সুপাঠ্য হবে না। আইন শুকনো জিনিস, কিন্তু মানুষ কেবল আইন মানা জীব নয়।

নতুন সংশোধিত আইনে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে ভারী সহজলভ্য। মামলা করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেপারেশন পাওয়া যাবে। আগে আইন ছিল, ডিভোর্সের পর কেউ এক বছর বিয়ে করতে পারবে না, নতুন আইনে সে সময় কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হচ্ছে। এসব ভাল না মন্দ তা ধৃতি জানে না। ডিভোর্স সহজলভ্য হলে কী হয় তা সে বোঝে না। তবে এটা বোঝে যে ডিভোর্সের কথা মনে রেখে কেউ বিয়ে করে না।

জয়ন্ত উঠে বাইরে যাচ্ছিলেন। টেবিলের সামনে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বললেন, পেয়েছেন সবকিছু?

ধৃতি মুখ তুলে হেসে বললে, এভরিথিং।

চলুন চা খেয়ে আসি। ফিরে এসে লিখবেন।

ধৃতি উঠে পড়ে। শিফটে এখনও কাজ তেমন শুরু হয়নি। সন্ধের আগে বড় খবর তেমন কিছু আসে না। তাছাড়া খবরও নেই। প্রতিদিনই ব্যানার করবার মতো খবরের অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। আজ কোনটা লিড হেডিং হবে সেটা প্রতিদিন মাথা ঘামিয়ে বের করতে হয়। সারাদিন টেলিপ্রিন্টার আর টেলেক্স বর্ণহীন গন্ধহীন জোলো খবরের রাশি উগরে দিচ্ছে। কাজেই খবর লিখবার জন্য এক্ষুনি তাকে ডেস্কে যেতে হবে না।

ধৃতি ক্যান্টিনের দিকে জয়ন্তর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে, আপনি মানুষের মুখ দেখে কিছু বলতে পারেন?

জয়ন্ত বলেন, মুখ দেখে অনেকে বলে শুনেছি। আমি তেমন কিছু পারি না। তবে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে না পারলেও ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু বলা যায়।

ফোটো দেখে বলতে পারেন?

ফোটো প্রাণহীন বস্তু, তবু তা থেকেও আন্দাজ করা সম্ভব। কেন বলুন তো?

ক্যান্টিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসার পর ধৃতি হঠাৎ খুব কিছু না ভেবে-চিন্তে টুপুর ফোটোটা বের করে জয়ন্তকে দেখিয়ে বলে, বলুন তো কেমন মেয়ে?

জয়ন্ত চায়ে চুমুক দিয়ে ফোটোটা হাতে নিয়ে বলেন, তাই বলুন। এতদিনে তাহলে বিয়ের ফুল ফুটতে যাচ্ছে! তবে ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যাপার হলে ফোটোর চেয়ে কোষ্ঠী অনেক সেফ। মেয়েটার কোষ্ঠী নেই?

ধৃতি ঠোঁট উলটে বলে, মেয়েটিই নেই।

সে কী!— বলে জয়ন্ত ছবিটা আর একবার দেখে ধৃতির দিকে তাকিয়ে বলেন, তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক জেনে কী হবে? মারা গেছে কবে?

তা জানি না। তবে বলতে পারি খুন হয়েছে।

খুন! ও বাবাঃ, পুলিশ কেস তাহলে!— বলে জয়ন্ত ছবিটা ফেরত দিতে হাত বাড়িয়ে বললেন, তাহলে আর কিছু বলার নেই।

আছে।— ধৃতি বলে, ধরুন, মেয়েটার চরিত্রে এমন কী আছে যাতে খুন হতে পারে, তা ছবি থেকে আন্দাজ করা যায় না?

জয়ন্ত গম্ভীর চোখে চেয়ে বলেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

কেউ না।

পরিচিতা তো। প্রেম-ট্রেম ছিল নাকি?

আরে না দাদা, চিনতামই না।

তবে অত ইন্টারেস্ট কেন? পুলিশ যা করবার করবে।

পুলিশ তার কাজ করবে। আমার ইন্টারেস্ট মেয়েটির জন্য নয়।

তবে?

অ্যাসট্রোলজির জন্য।

ছবিটা আবার নিয়ে জয়ন্ত তাঁর প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পকেট থেকে বের করে চোখে আঁটলেন। তাতেও হল না। একটা খুদে আতস কাচ বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ছবিটা। চা ঠান্ডা হয়ে গেল। প্রায় আট-দশ মিনিট বাদে জয়ন্ত আতস কাচ আর চশমা রেখে ছবিটা দু' আঙুলে ধরে নাড়তে নাড়তে চিন্তিত মুখে প্রশ্নটা করলেন, মেয়েটা খুন হয়েছে কে বলল?

ওর মা।

তিনি আপনার কে হন?

কেউ না। চিনিই না। একটা ফোন-কলে প্রথম খবর পাই। আজ একটা চিঠিও এসেছে। দেখুন না।— বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দেয়।

জয়ন্ত খুব আলগা ভাবে চিঠিটা পড়লেন না। পড়লেন খুব মন দিয়ে। অনেক সময় নিয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট চলে গেল।

তারপর মুখ তুলে বললেন, আমি মুখ দেখে তেমন কিছু বলতে পারি না বটে, কিন্তু আমার একটা ফিলিং হচ্ছে যে মেয়েটা মরেনি।

বলেন কী?

জয়ন্ত আবার চা আনালেন। গম্ভীর মুখে বসে চা খেতে খেতে চিন্তা করে বললেন, আপনি জ্যোতিষবিদ্যা মানেন না?

না। মানে, তেমন মানি না।

বুঝেছি। কিন্তু মানেন না কেন? যেহেতু সেকেন্ডহ্যান্ড নলেজ তাই না?

তাই।

তবে আপনাকে যুক্তিবাদী বলতে হয়। না?

হ্যাঁ।

কিন্তু আসলে আপনি যুক্তিবাদী নন, আপনার মনন বৈজ্ঞানিক সুলভ নয়।

কেন?

একটা ফোন-কল, একটা চিঠি আর একটা ফোটো— মাত্র এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে আপনি কী করে বিশ্বাস করছেন যে মেয়েটা খুন হয়েছে?

তবে কি হয়নি?

না। আমার মন বলছে শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ।

কী করে বললেন?

বলছি তো আমার ধারণা।

কোনও লজিক্যাল বেস নেই ধারণাটার?

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললেন, আপনি আচ্ছা লোক মশাই। মেয়েটা যে মরে গেছে, আপনার সে ধারণাটারও তো কোনও লজিক্যাল বেস নেই। আপনাকে একজন জানিয়েছে যে টুপু মারা গেছে বা খুন হয়েছে। আপনি সেটাই ধ্রুব বলে বিশ্বাস করছেন।

জয়ন্ত সেন ছবিটার দিকে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আপন মনে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, খুব সেনসিটিভ, অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল, মনের শক্তি বেশ কম, অন্যের দ্বারা চালিত হতে ভালবাসে।

কে?— ধৃতি চমকে প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত ছবিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে, আপনার টুপু সুন্দরী।

আমার হতে যাবে কেন?

দেখি আপনার হাতটা আর একটু।— বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ধৃতির ডান হাতটা টেনে নিলেন।

ফোটোগ্রাফার সৌরীন এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি খেয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে টেবিলের ধারে এসে বলে, আমার হাতটা দেখবেন না জয়ন্তদা?

পরে।— জয়ন্তর গম্ভীর উত্তর।

অনেকদিন ধরে ঝোলাচ্ছেন। ধৃতিবাবু, কী খবর?

ভাল।

সৌরীন হঠাৎ ঝুঁকে ছবিটা দেখে বলে, বাঃ, দারুণ ছবিটা তুলেছে তো! ফোটোগ্রাফার কে?

ধৃতি হাসল। সৌরীন পেশাদার ফোটোগ্রাফার, তাই মেয়েটার চেয়ে ফোটোর সৌন্দর্যই তার কাছে বেশি গুরুতর।

ধৃতি বলে, মেয়েটা কেমন?

ভাল।— সৌরীন বলে, তবে ফ্রন্ট ফেস যতটা ভাল প্রোফাইল ততটা ভাল কি না কে জানে। মেয়েটা কে?

চিনবেন না।— ধৃতি বলল।

সৌরীন চলে গেলে জয়ন্ত ধৃতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, হুঁ।

হুঁ মানে?

মানে অনেক ব্যাপার আছে। আপনার বয়স এখন কত?

উনত্রিশ বোধহয়। কম বেশি হতে পারে।

একটা ট্র্যানজিশন আসছে।

কী রকম?

তা হুট করে বলি কেমন করে?

কবে?

শিগগিরই।

ধৃতি অবশ্য এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। সারা জীবনে সে কখনও ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। যা কিছু হয়েছে বা করেছে সে, তা সবই নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে।

ধৃতি বলল, খারাপ নয় তো?

হয়তো খারাপ। হয়তো ভাল।

ধৃতি হাসল। বলল, এবার আসুন ডিম খাই। আমি খাওয়াচ্ছি।

দু'জনে ওমলেট খেতে লাগল। খেতে খেতে ধৃতি বলে, জয়ন্তদা, আপনি টুপুর কেসটা যত সিরিয়াসলি দেখছেন ততটা কিছু নয়।

তাই নাকি?— নিস্পৃহ জবাব জয়ন্তর।

ওর মা চাইছে খবরটা কাগজে বেরোক।

খবরদার বের করবেন না।

আরে মশাই, আমি ইচ্ছে করলেই কি বের করতে পারব নাকি? কাগজ তো আমার ইচ্ছেয় হাবিজাবি খবর ছাপাবে না।

তা হলেও আপনি কোনও ইনিশিয়েটিভ নেবেন না। মেয়েটার মা ফোনে আপনাকে কী বলেছিল?

এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল করেছিল। রাত তখন দুটো-আড়াইটে। শুধু বলছিল টুপুকে খুন করা হয়েছে, আপনি খবরটা ছাপবেন।

চিঠিটা কবে এল?

আজ।

দেখি।— বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর চিঠি ফেরত দিয়ে জয়ন্ত হেসে বললেন, আপনি মশাই দিনকানা লোক।

কেন?

চিঠিটা ভাল করে দেখেছেন?

দেখেছি তো।

কিছুই দেখেননি। চিঠির ওপর এলাহাবাদের ডেটলাইন। কিন্তু খামের ওপর কলকাতা উনত্রিশ ডাকঘরের শিলমোহর, সেটা লক্ষ করেছেন?

ধৃতি একটা চমক খেয়ে তাড়াতাড়ি খামটা দেখে। খুবই স্পষ্ট ছাপ। ভুল নেই।

ধৃতি বলে, তাই তো!

জয়ন্ত বলেন, এবার টেলিফোনটার কথা বলুন তো।

সেটা এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককলই ছিল।

কী করে বুঝলেন?

অপারেটার বলল যে।

অপারেটারের গলা আপনি চেনেন?

না।

তবে?

তবে কী?

অপারেটার সেজে যে-কেউ ফোনে বলতে পারে এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককলে আপনাকে ডাকা হচ্ছে। অফিসের অপারেটারও সেটা ধরতে পারবে না।

সেটা ঠিক।

আমার সন্দেহ সেই ফোন-কলটা কলকাতা থেকেই এসেছিল।

ধৃতি হঠাৎ হেসে উঠে বলে, কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছিল বলছেন?

জোক কি না জানি না, তবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ। আপনি তো ভোঁতা মানুষ নন, তবে মিসলেড হলেন কী করে? এবার থেকে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলবেন।

ধৃতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ফের।

৩

ধৃতি মদের ভক্ত নয়। কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদ খেলেই তার নানারকম শারীরিক অসুবিধে হতে থাকে। কখনও আধকপালে মাথা ধরা, কখনও পেটে প্রচণ্ড গ্যাস জমে, কখনও দমফোট হয়ে হাঁসফাঁস লাগে। কাজেই পারতপক্ষে সে মদ ছোঁয় না।

অফিস থেকে আজ একটু আগে আগে কেটে পড়ার তালে ছিল সে। ছ'টায় ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে গ্যারি কুপারের একটা ফিল্ম দেখাবে। ধৃতি কার্ড পায়। প্রায়ই ছবি দেখা তার হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ ছবিটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তার।

আজ চিফ সাব-এডিটার তারাপদবাবু কাজে বসেছেন। বয়স্ক লোক এবং প্রচণ্ড কাজপাগল। কোন খবরের কতটা ওজন তা তাঁর মতো কেউ বোঝে না।

ধৃতি গিয়ে বলল, তারাপদদা, আজ একটু আগে আগে চলে যাব।

যাবে?— বলে তারাপদবাবু মুখ তুলে একটু হেসে ফের বললেন, তোমার আর কী? কর্তারা ফিচার লেখাচ্ছেন তোমাকে দিয়ে। তুমি হলে যাকে বলে ইম্পর্ট্যান্ট লোক।

এটা অবশ্য ঠেস-দেওয়া কথা। কিন্তু তারাপদবাবুর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ বড় একটা নেই। ভালমানুষ রসিক লোক। তাই কথাটার মধ্যে বিষ নেই।

ধৃতি হেসে বলে, ইম্পর্ট্যান্ট নয় তারাদা, আমি হচ্ছি আসলে ইম্পোটেন্ট।

তারাপদবাবু মুখখানা খুব কেজো মানুষের মতো গম্ভীর করে পিন আঁটা একটা মোটাসোটা খবরের কপি ধৃতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এ খবরটা করে দিয়ে চলে যাও। এটা কাল লিড হতে পারে। বেশি বড় কোরো না।

ঘড়িতে চারটে বাজে। কপি লিখতে ধৃতির আধঘণ্টার বেশি লাগবে না। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধৃতি নিজের টেবিলে কপিটা চাপা দিয়ে রেখে সিনেমার ডিপার্টমেন্টে আড্ডা মারতে গেল।

কালীবাবু চুলে কলপ দিয়ে থাকেন। চেহারাখানা জমিদার-জমিদার ধরনের। ভারী শৌখিন লোক। এক সময়ে সিনেমায় নেমেছিলেন, পরে কিছুদিন ডিরেকশন দিলেন। তিন-চারটে ছবি ফ্লপ করার পর হলেন সিনেমার সাংবাদিক। এখন এ পত্রিকার সিনেমার পাতা এডিট করেন।

ধৃতিকে দেখে বলেন, কী ভায়া, হাতে নাকি একটা ভাল মেয়েছেলে আছে! থাকলে দাও না, সিনেমায় নামিয়ে দিই। বাংলা ছবিতে নায়িকার দুর্ভিক্ষ চলছে দেখছ তো!

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, ভাল মেয়ে! আমার হাতে কোত্থেকে মেয়ে থাকবে কালীদা?

কেন, এই তো সৌরীন বলছিল তুমি নাকি একটা ঘ্যাম মেয়েছেলের ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ!

ওঃ!— বলে ধৃতি বসে।

দাও না মেয়েটার ঠিকানা। তোমার রিলেটিভ হলেও ক্ষতি নেই। আজকাল লাইন অনেক পরিষ্কার, কারও চরিত্র নষ্ট হয় না।

সেজন্য নয়। অন্য অসুবিধে আছে।

কেন লেজে খেলাচ্ছ ভাই?

সৌরীন কিছু জানে না। শুধু ছবিটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে এসে আপনাকে বলেছে।

অসুবিধেটা কী?

যতদূর শুনছি মেয়েটা বেঁচে নেই।

ধৃতি দ্বিধায় পড়ে যায়। জয়ন্ত সেন বার বার বলেছিলেন, শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ। সে কথাটা মনে পড়ে যায়।

ধৃতি বলল, ঠিক চিনি না। তবে জানি। মরার খবরটা অবশ্য উড়ো খবর।

কালীবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, সুন্দরী মেয়েরা মরবে কেন?

সেটাই তো প্রবলেম।

মোটেই কাজটা ভাল নয়। সুন্দরী মেয়েদের মরা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে বলে, এ মেয়েটাকে নিয়ে একটি মিস্ট্রি দেখা দিয়েছে। জয়ন্তদা ছবিটা দেখে বললেন, মেয়েটা নাকি মরেনি। অথচ আমার কাছে খবর আছে—

দেখি ছবিটা। আছে?— বলে হাত বাড়ায় কালীবাবু।

ছবিটা আজকাল ধৃতির সঙ্গেই থাকে। কেন থাকে তা বলা মুশকিল। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে ধৃতি এই ছবিটার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সব সময়ে তার মনে হয় এ ছবিটা খুব মারাত্মক একটা দলিল। কালীবাবু ছবিটা নিয়ে দেখলেন। সিনেমা লাইনের অভ্যস্ত প্রবীণ চোখ। উলটে-পালটে দেখে ছবিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে বলেন, মেয়েটার নাম-ঠিকানা দিতে পারো?

নাম টুপু। ঠিকানা মুখস্থ নেই, তবে আছে বাড়িতে। এলাহাবাদের মেয়ে।

ও। একটু দূর হয়ে গেল, নইলে আজই বাড়িতে হানা দিতাম গিয়ে।

কেমন বুঝছেন ছবিটা?

খুব ভাল। তবে সিঙ্গল ফোটোগ্রাফ নয়।

তার মানে?

মানে এটা একটি জোড়ার ছবি। এর পাশে আর কেউ ছিল। কিন্তু নেগেটিভ থেকে আলাদা করে শুধু মেয়েটার ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে।

ধৃতি অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলেন?

কালীবাবু হেসে বলেন, যা বলছি তা হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বলে ধরে নিতে পারো। ছবিটা আবার ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ধৃতি ছবিটা ফের নেয়। এ পর্যন্ত অসংখ্য বার দেখেছে তবু বুঝতে পারেনি তো।

কালীবাবু বুঝিয়ে দেন, এই ডান পাশে মেয়েটার হাত ঘেঁষে একটু সাদা জমি দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ। ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড।

তোমার মাথা।

তবে কী ওটা?

ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে লাইট অ্যাশ কালার, এই সাদাটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা। ভাল করে দ্যাখো, দেখছ?

হ্যাঁ।

মানুষের কাঁধের ঢালু বুঝতে পারো না? সাদার ওপর অংশটা একটু বেঁকে গেছে দেখছ?

হ্যাঁ।

অর্থাৎ মেয়েটির পাশে সাদা বা লাইট রঙের কোনও জামা পরা এক রোমিও ছিল। এ ছবিটায় তাকে বাদ রাখা হয়েছে। মেয়েটাকে তুমি একদম চেনো না?

না।

তবে এ ছবিটা এল কোথা থেকে?

এল।

খোঁজ নাও। এ মেয়েটা ফিল্মে এলে হইচই পড়ে যাবে।

খোঁজ নিতে তো এলাহাবাদ যেতে হয়!

যাবে। আমি ফিনান্স করব।

ধৃতির ফের মনে পড়ে, চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসেনি, এসেছে কলকাতা থেকে। মনে পড়ে, জয়ন্ত সেন বলেছিলেন, ট্রাঙ্ককলটা স্রেফ ধোঁকাবাজি হতে পারে।

ধৃতি নড়ে চড়ে বসে বলে, আচ্ছা কালীদা, আপনার কি মনে হয় মেয়েটা বেঁচে আছে?

কালীবাবু ছবিটা ফের দেখছিলেন হাতে নিয়ে। পুরু চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চেয়ে বললেন, থাকাই উচিত। মরবে কেন হে?

ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেন? মানে কোনও ফিলিং হয়?

খুব হয়? একটাই ফিলিং হয়।— বলে কালীবাবু বদমাশের মতো হেসে বলেন, সেক্স জেগে ওঠে।

দূর! কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় না?

তুমি একটা বুদ্ধু। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে আনক্যানি ফিলিং হতে যাবে কোন দুঃখে?

যাই, কপি পড়ে আছে।— বলে ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল।

আরে বসো বসো। চা খাও। রাগ করলে নাকি? আমি আবার একটু পষ্ট কথা বলি তো?— বলে কালীবাবু ধৃতিকে বসিয়ে টেলিফোনে ক্যান্টিনকে চা পাঠাতে বলেন।

ধৃতি সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে বলে, আপনারা আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললেন দেখছি।

কী রকম?

আমাকে মেয়েটার মা জানিয়েছিল যে, টুপু মরে গেছে। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর জয়ন্তবাবু ছবিটা দেখে বললেন তাঁর মনে হচ্ছে যে মেয়েটা বেঁচে আছে।

বটে!

তাঁর কথা উড়িয়েও দিতে পারছি না। তার কারণ হল চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসার কথা, কিন্তু এসেছে কলকাতা থেকে।

ভারী রহস্যময় ব্যাপার তো।

আরও রহস্য হল যে আপনি আবার মেয়েটার পাশে এক অদৃশ্য রোমিওকে আবিষ্কার করলেন। তার মানে আরও জট পাকাল। মেয়েটার মা চেয়েছিল আমি মৃত্যু-সংবাদটা কাগজে বের করে দিই।

খবরদার ওসব কোরো না।

কেন?

সুন্দরীরা মরে না। তারা অমর। স্ত্রীলিঙ্গে বোধহয় অমরা বা অমরী কিছু একটা হবে।

সে যাই হোক, খবর বের করার এক্তিয়ার আমার নেই। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমি বেশ ফাঁপড়ে পড়ে যাচ্ছি ক্রমে।

ফাঁপরের কী আছে? খোঁজ নাও। তবে পুলিশ কেস হলে গা বাঁচিয়ে সরে এসো। ছবিটার মধ্যে একটু বদ গন্ধ আছে।

তার অর্থ?

অর্থাৎ মেয়েটা খুব ইনোসেন্ট নয়। চোখ-মুখ যত সুন্দরই হোক, এর মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট দুষ্টুমি আছে। অ্যাডভেনচারাস টাইপ। পাশের ছোকরাটিকে দেখতে পেলে হত। যাক গে, তুমি গা বাঁচিয়ে চলবে।

ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল। কালীবাবু হাত তুলে থামিয়ে ফের বললেন, সিনেমায় নামাটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। ভেবো না যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি তাকে সিনেমায় নামাবার জন্য পাগল হই।

বুঝলাম।

কালীবাবু একটু হেসে বলেন, আসলে জয়ন্তই আমাকে ব্যাপারটা বলছিল গতকাল। তখন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে একটু ওয়ার্নিং দিই।

ওয়ার্নিং কেন?

তুমি কাঁচা বয়সের ছেলে, কোথায় কোন ঘুণচক্করে পড়ে যাবে। মেয়েছেলে জাতটা যখন ভাল থাকে ভাল, যখন খারাপ হয় তখন হাড়বজ্জাত।

তাই বলুন। জানতেন।

জানতাম। আর এও বলি যে টুপুর মা ফের তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

তা করবে।

তুমি একটু রসের কথা-টথা বোলো। সিমপ্যাথি দেখাবে খুব। যদি দেখা করতে চায় তো রাজি হয়ে যেয়ো।

আচ্ছা।

ধৃতি উঠল।

৪

বুধবার জয় গেল দিল্লি। স্বভাবতই একা বাড়িতে ধৃতি আর পরমার থাকা সম্ভব নয়। ধৃতির যাওয়ার জায়গা নেই তেমন। পরমার আছে। তাই পরমা গেল বাপের বাড়ি। সেই সঙ্গে ছুঁড়ি ঝিটাকেও নিয়ে গেল। গোটা ফ্ল্যাটে ধৃতি একা।

অবশ্য ধৃতি আর কতটুকুই বা ফ্ল্যাটে থাকে! তার আছে অফিস, আড্ডা, ফিচার লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়ানো। রাতে নাইট ডিউটি নেই বলে শুধু সেই সময়টুকু সে ফ্ল্যাটে থাকে।

রাত ন'টা নাগাদ ধৃতি অফিসে একটা বড় পলিটিক্যাল কপি লেখা শেষ করল। খুব পরিশ্রম গেছে। এইবার ছুটি। চলে যাওয়ার আগে সে এর ওর তার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে রোজই। আজ বুড়ো ডেপুটি নিউজ এডিটার মদনবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল।

ঠিক এইসময়ে চিফ সাব-এডিটার ডেকে বললেন, তোমার ফোন হে!

ধৃতি 'হ্যালো' শুনেই কেঁপে ওঠে একটু। টুপুর মা।

বলুন।— ধৃতি বলে।

চিঠি তো পেয়েছেন!

পেয়েছি!

ছবিটা দেখলেন?

হুঁ।

কেমন?

টুপু খুবই সুন্দরী।

আপনাকে তো বলেইছিলাম যে টুপুকে সবাই মিস এলাহাবাদ বলত। আমার টুপু ছিল সাংঘাতিক সুন্দরী।

হুঁ।

খবরটা কবে ছাপা হবে?

ধৃতি একটু ইতস্তত করে বলে, দেখুন এসব খবর ছাপার এক্তিয়ার তো আমাদের নেই।

আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

না পারি না।

দোহাই! প্লিজ! আমার টুপু আপনাদের কাছে কিছুই না জানি। কিন্তু ওর খবরটা ছাপা হলে আমি বড় শান্তি পাব। মায়ের ব্যথা তো বোঝেন না আপনারা!

শুনুন। প্রথম কথা, টুপু যদি নামকরা কেউ হত তবে খবরটা ছাপা সহজ হয়ে যেত। যদি খুনের কেস আদালতে উঠত তাও অসুবিধে হত না। কিন্তু শুধু অ্যাসাম্পশনের ওপর তো আমরা কিছু করতে পারি না।

দু'-চার লাইনও নয়?

না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরটা ছাপতে পারেন। কিন্তু তাতে খুনের উল্লেখ থাকলে চলবে না।

কিন্তু আমি যে সবাইকে টুপুর খুনের খবরটাই জানাতে চাই।

তাহলে আপনি পুলিশের থ্রুতে প্রসিড করুন। যদি মামলা হয় তাহলে আমি খবরটা ছেপে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। আর নইলে খুনের যথেষ্ট এভিডেন্স চাই। এলাহাবাদের লোকাল কাগজে কি খবরটা বেরিয়েছিল?

না।

তবে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে কিছু জানাননি?

জানিয়েছি, কিন্তু তারা কোনও গা করছে না।

কেন?

তারা এটাকে খুন বলে মনে করছে না যে। তারা লাশ চায়।

লাশ! কেন, লাশ পাওয়া যায়নি?

না। কী করে যাবে? টুপুকে যে একটা পাহাড়ি নদীতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কোথায়?

টুপুর মা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেন, কোথায় তা আমি ঠিক জানি না।

তাহলে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? সাক্ষী আছে?

ন্ ন্ নাঃ।

তবে কী করে জানলেন?

ওরা কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে যায় আরও অনেক জায়গায়। সবশেষে ঘটনাটা ঘটে মাইথনে।

মাইথনে?

খুব নির্জন জায়গা। ওরা ফরেস্ট বাংলোতে থাকত।

কারা? টুপু আর কে?

ওঃ, সে ঠিক জানি না।

না জানলে কী করে হবে? টুপু কার সঙ্গে গিয়েছিল তা আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত।

কী করে নেব? আমি অনাথা বিধবা। টুপুর তো বাবা নেই, ভাইবোন নেই। টুপু একটিমাত্র। তবে আমাদের টাকা আছে। অনেক টাকা। খবরটা ছাপানোর জন্য যদি টাকা খরচ করতে হয় তো আমি পিছুপা হব না। বুঝলেন? টুপুই যখন নেই তখন এত টাকা আমার কোন কাজে লাগবে? আমি আপনাকে খবরটা ছাপানোর জন্য হাজার টাকা দিতে পারি। রাজি?

না।— ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে, টাকা থাকলে আপনি বরং তা সৎ কাজেই ব্যয় করুন, খবরটা ছাপা গেলে আমি এমনিতেই ছাপতাম।

কিছুতেই ছাপা যাবে না?

ধৃতি হঠাৎ প্রশ্ন করে, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

টুপুর মা খানিক নিস্তব্ধ থেকে বললেন, কেন বলুন তো?

এলাহাবাদ থেকে কি?

আবার খানিক চুপচাপ থাকার পর টুপুর মা বলেন, না।

তবে কি কলকাতা থেকে?

হ্যাঁ। আমি কাল কলকাতায় এসেছি।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনার চিঠিটাও কিন্তু কলকাতা থেকে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও চিঠিতে ডেটলাইন ছিল এলাহাবাদের।

টুপুর মা লজ্জার স্বরে বলেন, সে একটা কাণ্ড। আমার একজন চেনা লোককে চিঠিটা ডাকে দিতে দিই। সে সেইদিনই কলকাতা যাচ্ছিল। তাই একেবারে কলকাতায় গিয়ে ডাকে দিয়েছে। কিছু মনে করেছিলেন বোধহয়!

না, মনে কী করব? এরকম হতেই পারে।

আপনি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন?

বিব্রত ধৃতি বলে, না না।

আমি কলকাতায় এসেছিলাম টুপুর ব্যাপারেই। টুপু কলকাতায় কোথায় ছিল তা আমি জানি না।

কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ নিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

টুপু কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল?

কেন, বলিনি আপনাকে সে কথা?

না।

টুপুর মা একটু হেসে বললেন, ওমা। আমারই ভুল তবে। যা হোক, আজকাল আমার মেমরিটা একদম গেছে। হ্যাঁ, টুপু তো পালিয়েই এসেছিল। টুপু যত সুন্দরী ছিল ততটা শান্ত বা বাধ্য ছিল না। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ।

ও। তা পালাল কেন?

আমি যা বারণ করতাম তাই করব এই ছিল স্বভাব টুপুর। ও খানিকটা ছেলের মতো মানুষ হয়েছিল তো। সাইকেল, সাঁতার, গাড়ি চালানো, বন্দুক ছোঁড়া সব জানত।

খুব চৌখস মেয়ে তো!

খুব। একস্ট্রা-অর্ডিনারি যাকে বলা যায়।

পালাল কেন তা তো বললেন না।

টুপুর যে বিয়ের ঠিক হয়েছিল!

টুপু বিয়েতে রাজি ছিল না বুঝি?

না। ও বলত আর একটু বয়স হলে সে মাদার টেরেসার আশ্রমে বা সৎসঙ্গ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবে। সারা জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে।

কেন?

ও পুরুষদের পছন্দ করত না। না, কথাটা ভুল বলা হল। আসলে ও কখনও তেমন পুরুষ দেখেনি যাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করা যায়। সব পুরুষমানুষকেই ও খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। বলত, এদের কাউকে বিয়ে করা যায় না।

কিন্তু পালানোর ব্যাপারটা তো বললেন না?

বলছি। আমরা ওর বিয়ে ঠিক করি একজন ব্রিলিয়ান্ট অ্যামেরিকা ফেরত মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দারুণ ছেলে। টুপুর আপত্তি আমরা শুনিনি।

কেন?

শুনিনি তার কারণ চট করে এরকম ভাল পাত্র কি পাওয়া যায়, বলুন? যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব, দেদার টাকা রোজগার করে, হাই পোজিশনে চাকরি করছে।

তারপর?

আশীর্বাদের আগের দিন টুপু একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গেল। কাউকে, এমনকী আমাকে পর্যন্ত জানিয়ে যায়নি।

সঙ্গে কেউ যায়নি?

কী করে বলব?

কলকাতায় গিয়েছিল কী করে জানলেন?

সেখান থেকে আর একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখে, আমি খুব ফুর্তিতে আছি। এবার বেড়াতে যাব দার্জিলিং, নেতারহাট, মাইথন, আরও কয়েকটা জায়গার নাম লেখে। সব মনে নেই।

কিন্তু মারা যাওয়ার ব্যাপারটা?

ওঃ হ্যাঁ। মাইথন থেকে ওর শেষ চিঠি। তাতে ও খুব মন খারাপের কথা লিখেছিল। জানিয়েছিল যে কে বা কারা ওর পিছু নিয়েছে। তারা ওর ভাল করতে চায় না, ক্ষতি করতে চায়।

তারপর?

তারপর আর কোনও খবর নেই। তবে আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখি যে টুপু উঁচু থেকে জলের

মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আপনি কখনও মাইথনে গেছেন?

গেছি।

আমি যাইনি। জায়গাটা কেমন?

সুন্দর।

সেখানে পাহাড় আছে?

আছে। তবে ছোট পাহাড়।

টুপুও তাই লিখেছিল। সেখানে কী একটা বিখ্যাত মন্দির আছে না?

আছে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির।

সেখানে সেই মন্দিরে ঢোকবার গলিতে নাকি কারা টুপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শাসিয়েছিল যে মেরে ফেলবে।

কিন্তু কেন?

সে তো জানি না। টুপুর মতো মেয়ের কি শত্রু থাকতে পারে? তবু ছিল, জানেন। আর টুপু যে খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের ছিল।

বুঝলাম। কিন্তু টুপুর সঙ্গে কেউ ছিল না?

হয়তো ছিল। তাদের কথা টুপু লিখত না।

কলকাতায় আপনাদের আত্মীয়স্বজন নেই?

আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে। তবে আমার দিককার কোনও আত্মীয় এদিকে থাকে না। আমার বাপের বাড়ি গোরক্ষপুরে, তিন পুরুষের বাস।

টুপু কি তার বাপের বাড়িতে উঠেছিল?

টুপুর মা হেসে বললেন, টুপুর বাপের বাড়ি বলতে অবশ্য এলাহাবাদের বাড়িই বোঝায়। তবে এখানে আমার স্বামীর খুড়তুতো ভাই-টাই আছেন। বাড়ির একটা অংশ অবশ্য আমাদের। সে অংশ তালা দেওয়া থাকে, আমরা কলকাতায় এলে সেখানেই উঠি। কিন্তু টুপু এ বাড়িতে আসেনি।

ধৃতি এতক্ষণ পরে টের পেল যে, সে খামোখা এত কথা বলছে বা শুনছে। শুনে তার কোনও লাভ নেই। টুপুর ব্যাপারে তার করারও কিছু নেই।

ধৃতি বলল, সবই বুঝলাম। কিন্তু সিমপ্যাথি জানানো ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন?

শুনুন। দয়া করে আপনার বাসার ঠিকানাটা দেবেন?

কেন?

বিরক্ত হবেন না। ঠিকানাটা থাকলে আমি যদি দরকারে পড়ি তাহলে কন্ট্যাক্ট করতে পারব। আমি কলকাতার কিছুই চিনি না। আমার দেওররাও খুব সিমপ্যাথেটিক নয়। আমি আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য পেলে খুব উপকৃত হব। অবশ্য যদি কখনও দরকার হয়। নইলে এমনিতে বিরক্ত করব না।

একটু দ্বিধা করেও ধৃতি ঠিকানা বলল।

আপনার বাসায় ফোন নেই?

না।

আচ্ছা, ছাড়ছি।

ভদ্রমহিলা ফোন রাখলেন। ধৃতি হাঁফ ছাড়ল।

৫

পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে দামি ডিনার খেল ধৃতি। মাঝে মাঝে খায়। বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। যতদিন এরকম একা আছে ততদিন আমিরি করে নিতে পারবে।

বিয়ে ধৃতি করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের কথা ভাবতে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু ভয় পায়। সে একটু প্রাচীনপন্থী। আজকালকার মেয়েদের হাব-ভাব আর চলাফেরা দেখে তার ভয় লাগে। এরা তো ঠিক বউ হতে পারবে না। বড়জোর কম্প্যানিয়ন হতে পারে, আর বেড-ফ্রেন্ড।

ট্যাক্সি ছেড়ে ধৃতি ফ্ল্যাটে উঠে এল। দরজা ভাল করে বন্ধ করল। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে টেবিলের সামনে বসে সিগারেট ধরাল। এখন রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকবে। কয়েকটা থ্রিলার কেনা আছে। পড়বে। তার আগে একটু কিছু লিখবে। এই একা নিশুত রাতে জেগে থাকা তার বড় প্রিয়। এইটুকু একেবারে তার নিজস্ব সময়।

শৌখিন রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে চিঠির বাক্সটা দেখে আসেনি।

আবার উঠে নীচে এল ধৃতি। চিঠি পেতে সে ভীষণ ভালবাসে। রোজ চিঠি এলে কত ভাল হয়।

চিঠি ছিল। দুটো। দুটোই খাম। একটার ওপর দিদির হাতের লেখা ঠিকানা। বোধহয় দীর্ঘকাল পর মনে পড়েছে ভাইকে। আর একটা খামে কোনও ডাকটিকিট নেই, হাতের লেখা অচেনা।

নিজের ঘরে এসে ধৃতি দিদির চিঠিটা প্রথমে খুলল। ভাইয়ের জন্য দিদি একটি পাত্রী দেখেছে। চিঠির সঙ্গে পাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ফোটোও আছে। দেখল ধৃতি। মন্দ নয়। তবে একটু আপস্টার্ট চেহারা। দিল্লিতে বি এ পড়ে। বাবা সরকারি অফিসার।

ধৃতি অন্য চিঠিটা খুলল। সাদা কাগজে লেখা— একা বাসায় ভূতের ভয় পাচ্ছেন না তো! ভূত না হলেও পেতনিরা কিন্তু আছে। সাবধান। আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে গেছি। যা অন্যমনস্ক আপনি, হয়তো লক্ষই করেননি। ফ্রিজে একটা চমৎকার খাবার রেখে যাচ্ছি। খাবেন। মেয়েরা কিন্তু খারাপ হয় না, পুরুষগুলোই খারাপ। চিঠিটা লেটারবক্সে রেখে যাচ্ছি যাতে চট করে নজরে পড়ে।— পরমা। পুঃ পরশু হয়তো আবার আসব। দুপুরে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

ধৃতি উঠে গিয়ে ডাইনিং হলে ফ্রিজ খুলল।

কথা ছিল এ ক'দিন ফ্রিজ বন্ধ থাকবে। ছিলও তাই। পরমা আজ চালিয়ে রেখে গেছে। একটা কাচের বাটিতে ক্ষীরের মতো কী একটা জিনিস। ঠান্ডা বস্তুটা মুখে ঠেকিয়ে ধৃতি দেখে পায়েস। তাতে কমলালেবুর গন্ধ। কাল খাবে।

ফ্রিজ বন্ধ করে ধৃতি হলঘর যখন পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ খেয়াল হল বাইরের দরজাটি কি সে বন্ধ করেছে? এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ঘোরাতেই বেকুব হয়ে বুঝল, সত্যিই বন্ধ ছিল না দরজাটা।

সকালে উঠে ধৃতি টের পায় সারা রাত ঘুমের মধ্যে সে কেবলই টুপুর কথা ভেবেছে। খুবই আশ্চর্য কথা।

টুপুর কথা সে ভাববে কেন? টুপু কে! টুপুকে সে তো চোখেও দেখেনি। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। নিজের কোনও দুর্বলতা বা মানসিক শ্লথভার ধরা পড়লে ধৃতি খুশি হয় না।

টুপু বা টুপুর মা'র সমস্যা নিয়ে তার ভাববার কিছু নেই। ঘটনাটার মধ্যে হয়তো কিছু রহস্য আছে। তা থাক। সে রহস্য না জানলেও তার চলবে। টুপুর মা কি পাগল? হলেই বা তার তাতে কী?

টুপু কি বেঁচে আছে? টুপু কি সত্যিই বেঁচে নেই? এসব জানবার বা এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। ধৃতি স্বপ্ন-দেখা মানুষ নয়, কল্পনার ঘোড়া ছাড়তেও সে পটু নয় তেমন।

তবু কাল সারা রাত, ঘুমের মধ্যে সে কেন টুপুর কথা ভেবেছে?

দাঁত মেজে ধৃতি নিজেই চা তৈরি করে খেল। পত্রিকাটা বারান্দা থেকে এনে খুলে বসল। খবর কিছুই নেই। তবু যথাসম্ভব সে যখন খবরগুলো পড়ে দেখছে তখনও টের পেল বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে তার নানা চিন্তা-ভাবনা ঢুকে যাচ্ছে।

এবং ফের টুপুর কথাই ভাবছে সে। জ্বালাতন।

পত্রিকা ফেলে রেখে সিগারেট ধরিয়ে নিজের এই অদ্ভুত মানসিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করতে থাকে ধৃতি। কিন্তু বিশ্লেষণ করে কিছুই পায় না। টুপুর সঙ্গে তার সম্পর্ক মাত্র একটি ফোটোর ভিতর দিয়ে। সে ফোটোটাও খুব নির্দোষ নয়। আর টুপুর মা টেলিফোনে এবং চিঠিতে টুপুর সম্বন্ধে যা লিখেছে সেইটুকু মাত্র তার জানা। অবশ্য এগুলো যোগ-বিয়োগ করে নিয়ে একটা রক্তমাংসের মেয়েকে কল্পনা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু ততদূর কল্পনাপ্রবণ তো ধৃতি এতকাল ছিল না!

অন্যমনস্কতার মধ্যে সে কখন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে, ফ্রিজ থেকে পরমার রেখে যাওয়া পায়েস বের করে খেয়েছে, আবার চা করেছে। ফের সিগারেটও ধরিয়েছে।

বিকেলের শিফটে ডিউটি। সারাটা দিনের অবকাশ পড়ে আছে। কাজ নেই বলে ধৃতি বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসল। চমৎকার বারান্দাটা। নীচে রাস্তা। সারাদিন বসে বসে লোক চলাচল দেখা যায়।

দেখছিল ধৃতি। কিন্তু আবার দেখছিলও না। তার কেবলই মনে হয়, টুপুর মা যা বলছে তার সবটা সত্যি নয়। টুপু যে মারা গেছেই তার কোনও প্রমাণ নেই। সেটা হয়তো কল্পনা বা গুজব। টুপু বেঁচে আছে ঠিকই। একটা কথা কাল টুপুর মাকে জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে, টুপুর ফোটোতে তার পাশে কে ছিল, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

ধৃতির অবকাশ যে অখণ্ড তা নয়। সেই ফিচারটা সে এখনও লিখে উঠতে পারেনি। প্রায় দু' সপ্তাহ আগে অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর তাকে ডেকে পণপ্রথা নিয়ে আর একটা ফিচার লিখতে বলেছেন। দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া ছিল। বিভিন্ন বাড়ির গিন্নি, কলেজ-ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী, সমাজের নানা স্তরের মানুষজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। সে কাজ পড়ে আছে ধৃতির। এক অবান্তর চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতদিন তেমন প্রকট ছিল না, কিন্তু কাল বহুক্ষণ টুপুর মা-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকেই তার মাথাটা অশরীরী বা নিরুদ্দেশ টুপুর হেপাজতে চলে গেছে।

আজ সময় আছে। ধৃতি টুপুর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সাজপোশাক করে বেরিয়ে পড়ল।

প্রফেসরদের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে পুলক নিমীলিত চোখে আধশোয়া হয়ে চুরুট টানছে, এমন দৃশ্যই দেখবে বলে আশা করেছিল ধৃতি। হুবহু মিলে গেল। প্রফেসরদের চাকরিটা আলসেমিতে ভরা। সপ্তাহে তিন-চারদিন ক্লাস থাকে, বছরে লম্বা লম্বা গোটা দুই-তিন ছুটি, আলসে না হয়ে উপায় কী? এই পুলক যে একসময়ে ফুটবলের ভাল লেফট আউট ছিল তা আজকের মোটাসোটা চেহারাটা দেখে মালুম হয় না। মুখে সর্বদা স্নিগ্ধ হাসি, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত চাউনি, হাঁটাচলায় আয়েসি মন্থরতা।

ধৃতিকে দেখে সোজা হওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল, আরে! আজই কি তোমার আসবার কথা ছিল নাকি? স্টুডেন্টরা তো বোধহয় কী একটা সেমিনারে গেল!

ধৃতি একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, আজই আসবার কথা ছিল না ঠিকই। তবে এসে যখন গেছি তখন দু'-চারজনকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। ইন্টারভিউটা আজ না নিলেই নয়।

দেখছি, তুমি বোসো।— বলে পুলক দু' মনি শরীর টেনে তুলল। রমেশ নামক কোনও বেয়ারাকে ডাকতে ডাকতে করিডোরে বেরিয়ে গেল।

পুলকদের কমপারেটিভ লিটারেচারে ছাত্র নগণ্য, ছাত্রীই বেশি। এসব ছাত্রীরাও আবার অধিকাংশই বড়লোকের মেয়ে। পণপ্রথাকে এরা কোন দৃষ্টিতে দেখে তা ধৃতির অজানা নয়। চোখা

চালাক আলট্রা স্মার্ট এসব মেয়েদের পেট থেকে কথা বের করাও মুশকিল। কিছুতেই সহজ সরলভাবে অকপট সত্যকে স্বীকার করবে না। ধৃতি তাই মনে মনে তৈরি হচ্ছিল।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশের চেষ্টায় পুলক একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে জনা ছয়েক মেয়ে ও একটি ছেলেকে জুটিয়ে দিল। ছটির মধ্যে চারটি মেয়েই দারুণ সুন্দরী। বাকি দু'জনের একজন একটু বয়স্কা এবং বিবাহিতা, অন্যটি সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কালো আভরণহীন রূপটানহীন চেহারাটায় এক ধরনের ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

ধৃতি আজকাল মেয়েদের লজ্জা পায় না, আগে পেত। সুন্দরীদের ছেড়ে সে কালো মেয়েটিকেই প্রথম প্রশ্ন করে, আপনার বিয়েতে যদি পাত্রপক্ষ পণ চান তাহলে আপনার রিঅ্যাকশন কী হবে?

আমি কালো বলে বলছেন?

তা নয়, বরং আপনাকেই সবার আগে নজরে পড়ল বলে।

মেয়েটি কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে বলে, প্রথমত আমার বিয়ে নেগোশিয়েট করে হবে না, আমি নিজেই আমার মেট বেছে নেব, পণের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নটাকে অত পারসোনেলি নেবেন না। আমি পণপ্রথা সম্পর্কে আপনার মত জানতে চাইছি।

ছেলেরা পণ চাইলে মেয়েদেরও কিছু কন্ডিশন থাকবে।

কী রকম কন্ডিশন?

বাবা-মা'র সঙ্গে থাকা চলবে না, সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, ঘরের কাজে হেলপ করতে হবে, উইক এন্ডে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, রান্না এবং ঘরের সব কাজের জন্য লোক রাখতে হবে, স্বামীর পুরো রোজগারের ওপর স্ত্রীর কন্ট্রোল থাকবে...এরকম অনেক কিছু।

সুন্দরীদের মধ্যে একজন ভারী সুরেলা গলায় বলে ওঠে, অলকা আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে।

ধৃতি লিখতে লিখতে মুখ তুলে হেসে বলে, তাহলে আপনিই বলুন।

আমি! ওঃ, পণপ্রথা শুনলে এমন হাসি পায় না!— বলে মেয়েটি বাস্তবিকই হাতে মুখ ঢেকে হেসে ওঠে। সঙ্গে অন্যরাও।

ধৃতি একটু অপেক্ষা করে। হাসি থামলে মৃদু স্বরে বলে, ব্যাপারটা অবশ্য হাসির নয়।

মেয়েটি একটু গলা তুলে বলে, সিস্টেমটা ভীষণ প্রিমিটিভ।

আধুনিক সমাজেও বিস্তর প্রিমিটিভনেস রয়ে গেছে যে।

তা জানি। সেই জন্যই তো হাসি পায়।

এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে আপনি কী করতে চান?

কেউ পণ-টন চাইলে আমি তাকে বলব, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে।

বিবাহিতা মহিলাটি উসখুস করছিলেন। এবার বললেন, না না, শুনুন। আমি বিবাহিতা এবং একটি মেয়ের মা। আমি জানি সিস্টেমটা প্রিমিটিভ এবং হাস্যকর। তবু বলি, এই ইভিলটাকে ওভাবে ট্যাকল করা যাবে না। আমার মেয়েটার কথাই ধরুন। ভীষণ সিরিয়াস টাইপের, খুব একটা স্মার্টও নয়। নিজের বর নিজে জোগাড় করতে পারবে না। এখন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যদি আমি একটা ভাল পাত্র পাই এবং সেক্ষেত্রে যদি কিছু পণের দাবি থাকেও তবে সেটা অন্যায় জেনেই মেয়ের স্বার্থে হয়তো আমি মেনে নেব।

সুন্দরী মেয়েটা বলল, তুমি শুধু নিজের মেয়ের কথা ভাবছ নীতাদি!

মেয়ের মা হ' আগে, তুইও বুঝবি।

ধৃতি প্রসঙ্গ পালটে আর একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে, পণপ্রথা ভীষণ খারাপ তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা টিফলিশ প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা আপনাকে করব?

খুব শক্ত প্রশ্ন নয় তো?

পুলক পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরবে চুরুট টেনে যাচ্ছিল। এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে

বলল, তুমি একটি আস্ত বিচ্ছু ইন্দ্রাণী। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি তোমার চেয়েও বিচ্ছু। ওয়াচ ইয়োর স্টেপ।

ইন্দ্রাণী উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলে, কংগ্র্যাটস মিস্টার বিচ্ছু। বলুন প্রশ্নটা কী।

ধৃতি খুব অকপটে মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল। এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেনি। লক্ষ করে এখন হাঁ হওয়ার জোগাড়। ছবির টুপুর সঙ্গে আশ্চর্য মিল। কিন্তু গল্পে যা ঘটে, জীবনে তা ঘটে খুবই কদাচিৎ। এ মেয়েটির আসল টুপু হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, ধৃতি তাও জানে। সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা লক্ষ করেছি পাত্রপক্ষ আজকাল যতটা দাবিদাওয়া করে তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি থাকে স্বয়ং পাত্রীর।

তাই নাকি?

মেয়েরা আজকাল বাবা-মায়ের কাছ থেকে নানা কৌশলে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। পণপ্রথার চেয়ে সেটা কি ভাল?

ইন্দ্রাণীর মুখ হঠাৎ ভীষণরকম গম্ভীর ও রক্তাভ হয়ে উঠল। মাথায় একটা ঝাপটা খেলিয়ে বলল, কে বলেছে ওকথা? মোটেই মেয়েরা বাপের কাছ থেকে আদায় করে না। মিথ্যে কথা।

ধৃতি নরম গলায় বলে, রাগ করবেন না। এগুলো সবই জরুরি প্রশ্ন, আপনাকে অপ্রতিভ করার জন্য প্রশ্নটা করিনি।

বিবাহিতা মহিলাটি আগাগোড়া উসখুস করছিলেন, এখন হঠাৎ বলে উঠলেন, ইন্দ্রাণী যাই বলুক আমি জানি কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েরা আজকাল বড্ড ওরকম হয়েছে।

এককথায় ইন্দ্রাণী চটল। বলল, মোটেই না নীতাদি। তোমার এক্সপেরিয়েন্স অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা এই জেনারেশনের মেয়েরা মোটেই ওরকম নই। বরং আমরা মেয়েরা যতটা মা-বাবার দুঃখ বুঝি ততটা এ যুগের ছেলেরা বোঝে না।

নীতা বললেন, সেকথাও অস্বীকার করছি না।

তাহলে? আজকালকার ছেলেরা তো বিয়ে করেই বাবা-মাকে আলাদা করে দেয়। দেয় না বলো?

নীতা হেসে বললেন, সে তো ঠিকই, কিন্তু এ যুগের ছেলেরা বিয়ে করে কাকে সেটা আগে বল, তোর মতো একালের মেয়েদেরই তো।

তা তো করেই।

সেই মেয়েরাই তো বউ হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দেয়।

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলে, ওটা একপেশে কথা হল। সবসময়ে বউরাই পরামর্শ দেয় না, ছেলেরা নিজেরাই ডিসিশন নেয়। তোমার ডিফেক্ট কী জানো? ওভার সিমপ্লিফিকেশন।

ধৃতি বিপদে পড়ে চুপ করে ছিল। এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। পণপ্রথা নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ইন্দ্রাণী তার উজ্জ্বল ও সুন্দর মুখখানা হঠাৎ ধৃতির দিকে ফিরিয়ে ঝাঝালো গলায় বলল, এবার বলুন তো রিপোর্টারমশাই, নিজের বিয়ের সময় আপনি কী করবেন?

আমি!— ধৃতি একটু অবাক হল। তারপর এক গাল হেসে বলল, আমার বিয়ে তো কবে হয়ে গেছে। আমি ইনসিডেন্টালি তিন ছেলেমেয়ের বাপ।

ইন্দ্রাণীর চোখে আচমকাই একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কিন্তু টক করে মাথাটা নুইয়ে নিল সে। তারপর ফের নিপাট ভালমানুষের মতো মুখটা তুলে বলল, আপনি পণ নেননি?

ধৃতি খুব লাজুকভাবে চোখ নামিয়ে বলল, সামান্য চাকরি, তাই পণও সামান্যই নিয়েছিলাম হাজার পাঁচেক।

এই স্বীকারোক্তিতে সকলে একটু চুপ মেরে গেল। কিন্তু একটা নিঃশব্দ ছিছিক্কার স্পষ্ট টের পাচ্ছিল ধৃতি।

হঠাৎ পুলক হেসে ওঠায় অ্যাটমসফিয়ারটা মার খেয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বলল, ইয়ারকি মারছেন, না?

কেন?

আপনি মোটেই বিয়ে করেননি।

আমার বিয়েটা ফ্যাক্টর নয়। আপনি এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।

ইন্দ্রাণী বলল. জবাব দিইনি কে বলল? আমরা মোটেই ওরকম নই।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল ধৃতি কিন্তু তেমন কোনও লাভ হল না। বারবার তর্ক লেগে যেতে লাগল। শেষে ঝগড়ার উপক্রম।

অবশেষে ইন্টারভিউ শেষ করে ধৃতি উঠে পড়ল। যেটুকু জানা গেছে তাই যথেষ্ট।

পুলক নিয়ে গিয়ে কফি খাওয়াল। নিজে থেকে যেচে বলল, ইন্দ্রাণী মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগল?

খারাপ কী?

শি ইজ ইন্টারেস্টিং। পরে ওর কথা তোমাকে বলব। শি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং।

ধৃতি ফিরে এল বাসায়।

৬

টুপুর খোঁজ যদি ধৃতিকে করতেই হয় তবে তার কিছু সহায়-সম্বল দরকার। তামাম কলকাতা, মাইথন, এলাহাবাদ বা ভারতবর্ষের সমগ্র জনবসতির মধ্যে কোথায় টুপু লুকিয়ে আছে তা একা খুঁজে দেখা ধৃতির পক্ষে অসম্ভব। টুপু মরে গেছে কি না তাও বোধহয় সঠিক জানা যাবে না। মাইথনের পুলিশের কাছে কোনও রেকর্ড না থাকারই সম্ভাবনা।

এক দুপুরে ধৃতি টুপু সংক্রান্ত চিঠি ও ফোটো বের করে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বসল। টেলিফোনে টুপুর মা'র সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে লিখল ডায়েরিতে। জয়ন্ত সেন আর কালীবাবুর সঙ্গে যা সব কথাবার্তা হয়েছে তাও বাদ দিল না। পুরো একখানা কেস হিস্ট্রি তৈরি করছিল সে। মাঝপথে কলিংবেল বাজল এবং রসভঙ্গ করে উদয় হলেন পরমা। সঙ্গে বাচ্চা ঝি।

ইস্! কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কানটাও গেছে দেখছি।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, কতক্ষণ জ্বালাবে বলো তো! ঘরের কাজ কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে কেটে পড়ো। আমার জরুরি লেখা আছে।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে চোখ গোল করে বলে, বলি এ ফ্ল্যাটটা আমার না আর কারও? আমারই ফ্ল্যাট থেকে আমাকেই কিনা সরে পড়তে বলা হচ্ছে! মগের রাজত্ব নাকি?

ফ্ল্যাট তোমার হতে পারে কিন্তু আমারও প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে।

ইঃ প্রাইভেসি! ব্যাচেলরদের আবার প্রাইভেসি কী? তারা হবে সরল, দরজা জানালা খোলা ঘরের মতো, আকাশের মতো, শিশুর মতো।

থাক থাক। তুমি যে কবিতা লিখতে তা জানি।

খারাপও লিখতাম না। বিয়ে হয়েই সর্বনাশ হয়ে গেল। কবিতা উবে গেল, প্রেম উবে গেল।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও।

তার মানে?

কিছু বলিনি।

পরমা চোখ এড়িয়ে বলল, আমার অ্যাবসেনসে ঘরে কাউকে ঢোকাননি তো! ছেলেরা চরিত্রহীন হয়!

বলতে বলতে পরমা ধৃতিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘরের পর্দা সরাল। পরমুহূর্তেই 'ওম্মা!' বলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ধৃতি বুঝল সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন টুপুর ফোটো লুকোনোর চেষ্টা বৃথা। তাই সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর ও ভ্রূকুটিকুটিল করে নিজের ঘরে এল।

পরমা খাটের ওপর সাজানো কাগজপত্র আর ফোটো আঠামাখানো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শ্বাস ফেলে বলল, চরিত্রহীন! আগাপাশতলা চরিত্রহীন!

কে?

পরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, প্রায় আমার মতোই সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন, আর সে খবরটা একবার জানাননি পর্যন্ত!

তোমার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

ইস্। আসুক না একবার কাছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। সাহস আছে?

আস্তে পরমা, কেউ শুনলে হাসবে।

কে আছে এখানে শুনি! আর হাসবারই বা কী আছে?

উদাস ভাবে ধৃতি বলে, পাখি-টাখিও তো আসে জানালায়, বাতাসও তো আসে, তারাই শুনে হাসবে।

চোখ পাকিয়ে পরমা বলে, হাসবে কেন?

তোমার চ্যালেঞ্জ-এর কথা শুনে। মেয়েটা কে জানো?

কে? সেটাই তো জানতে চাইছি।

মিস ক্যালকাটা ছিল, এখন মিস ইন্ডিয়া। হয়তো মিস ইউনিভার্স হয়ে যাবে।

ইল্লি। অত সোজা নয়। এবারের মিস ক্যালকাটা রুমা চ্যাটার্জি আমার বান্ধবীর বোন।

তুমি একজন সাংবাদিককে সংবাদ দিচ্ছ?

পরমা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা হার মানলাম। রুমা গতবার হয়েছিল।

এ এবার হয়েছে।

সত্যি?

সত্যি।

নাম কী?

টুপু।

যাঃ, টুপু একটা নাম নাকি? ডাকনাম হতে পারে। পোশাকি নাম কী?

তোমার বয়স কত হল পরমা?

আহা, বয়সের কথা ওঠে কীসে?

ওঠে হে ওঠে, ইউ আর নট কিপিং উইথ দা টাইম। তোমার আমলে পোশাকি নাম আর ডাকনাম আলাদা ছিল। আজকাল ও সিস্টেম নেই। এখন ছেলেমেয়েদের একটাই নাম থাকে। পল্টু, ঝন্টু, পুসি, টুপু, রুণু, নিনা...

থাক থাক, নামের লিস্টি শুনতে চাই না। মেয়েটার সঙ্গে আপনার রিলেশন কী?

পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীর সঙ্গে আমার একটা রিলেশন। দাতা এবং গ্রহীতার।

তার মানে?

অর্থাৎ তারা সৌন্দর্য বিতরণ করে এবং আমি তা আকণ্ঠ পান করি।

আর কিছু না?

ধৃতি মাথা নেড়ে করুণ মুখ করে বলে, তোমার চেহারাখানা একেবারে ফেলনা নয় বটে, কেউ কেউ সুন্দরী বলে তোমাকে ভুলও করে মানছি, কিন্তু আজ অবধি বোধহয় ভুল করেও তোমাকে কেউ বুদ্ধিমতী বলেনি!

পরমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এ মা, কী সব অপমান করছে রে মুখের ওপর!

ভাই বন্ধুপত্নী, দুঃখ কোরো না, সুন্দরীদের বুদ্ধিমতী না হলেও চলে। কিন্তু এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, একজন যৎসামান্য বেতনের সাব-এডিটরের সঙ্গে মিস ক্যালকাটার দেবী ও ভক্ত ছাড়া আর কোনও রিলেশন হতে পারে না।

খুব পারে। নইলে ফোটোটা আপনার কাছে এল কী করে?

সে অনেক কথা। আগে তোমার ওই বাহনটিকে এক কাপ জমাটি কফি বানাতে বলো।

বলছি। আগে একটু শুনি।

আগে নয়, পরে। যাও।

উঃ!— বলে পরমা গেল।

পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বলল, কফি আসছে, বলুন।

মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগছে?

মন্দ কী?

না না, ওরকম ভাসা-ভাসা করে নয়। বেশ ফিল করে বলো। ছবিটার দিকে তাকাও, অনুভব করো, তারপর বলো।

নাকটা কি একটু চাপা?

তাই মনে হচ্ছে?

ফোটোতে বোঝা যায় না অবশ্য। ঠোঁটদুটো কিন্তু বাপু, বেশ পুরু।

আগে কহো আর।

আর মোটামুটি চলে।

হেসে ফেলে বলে, বাস্তবিক মেয়েরা পারেও।

তার মানে?

এত সুন্দর একটা মেয়ের এতগুলো খুঁত বের করতে কোনও পুরুষ পারত না।

পরমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ইঃ পুরুষ! পুরুষদের আবার চোখ আছে নাকি? মেয়ে দেখলেই হ্যাংলার মতো হামলে পড়ে।

সব পুরুষই হ্যাংলা নয় হে বন্ধুপত্নী। এত পুরুষের মাথা খেয়েছ তবু পুরুষদের এখনও ঠিকমতো চেনোনি।

চেনার দরকার নেই। এবার বলুন তো ফোটোটা সত্যিই কার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, আগে আমার কথা একটু-আধটু বিশ্বাস করতে, আজকাল বিশ্বাস করাটা একদম ছেড়ে দিয়েছ।

আপনাকে বিশ্বাস! ও বাবা, তার চেয়ে কেউটে সাপ বেশি বিশ্বাসী! যা পাজি হয়েছেন আজকাল।

তা বলে সাপখোপের সঙ্গে তুলনা দেবে?

দেবই তো। সব সময় আমাকে টিজ করেন কেন?

মুখ দেখে তো মনে হয় টিজিংটা তোমার কিছু খারাপ লাগে না।

লাগে না ঠিকই, তা বলে সবসময়ে নিশ্চয়ই পছন্দ করি না। যেমন এখন করছি না। একটা সিরিয়াস প্রশ্ন কেবলই ইয়ারকি মেরে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বলে পরমা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা কটাক্ষ করল।

ধৃতি নিজের বুকে দু'হাত চেপে ধরে বলল, মর গয়া। ওরকম করে কটাক্ষ কোরো না মাইরি। আমার এখনও বিয়ে হয়নি, মেয়েদের কটাক্ষ সামাল দেওয়ার মতো ইমিউনিটি নেই আমার।

খুব আছে। কটাক্ষ কিছু কম পড়ছে বলে মনে তো হয় না। আগে মেয়েদের ছবি ঘরে আসত না, আজকাল আসছে।

আরে ভাই, মেয়েটার ফোটো নয়। মিস ক্যালকাটা অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া। এর ওপর একটা ফিচার হচ্ছে আমাদের কাগজে। আমাকেই এর ইন্টারভিউ নিতে হবে। তাই...

পরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ যদি মিস ইন্ডিয়া হয়ে থাকে তবে তো খেঁদি-পেঁচিদের যুগ এল।

কফি এসে যেতে দু'জনেই একটু ক্ষান্ত দিল কিছুক্ষণ। কিন্তু পরমা চেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে খুব দুষ্টু চোখে লক্ষ করছিল ধৃতিকে। ধৃতি বলল, তুমি কফি খেলে না?

আমি তো আপনার আর আপনার বন্ধুর মতো নেশাখোর নই।

উদাস ধৃতি বলল, খেলে পারতে। কফিতে বুদ্ধি খোলে। বিরহের জ্বালাও কমে যায়।

আপনার মাথা। যাই বাবা, ঘরদোর সেরে আবার ফিরে যেতে হবে।

পরমা উঠল এবং দরজার কাছ বরাবর গিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, আচ্ছা, একটা কথা বলব?

বলে ফেলো।

এই যে আমার স্বামী দিল্লি গেছে বলে আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে, এটার কোনও অর্থ হয়?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

পরমা বেশ তেজের গলায় বলে, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। সব বুঝেও অমন না বোঝার ভান করেন কেন বলুন তো! আমি বলছি, রজত এখানে নেই বলে আমার এই ফ্ল্যাটে থাকা চলছে না কেন?

ধৃতি অকপট চোখে পরমার দিকে চেয়ে বোকা সেজে বলে, আমি আছি বলে।

আপনি থাকলেই বা কী? আমরা দু'জনেই থাকতে পারতাম। দিব্যি আড্ডা দিতাম, রান্না করতাম, বেড়াতাম।

ও বাবা, তুমি যে ভারী সাহসিনী হয়ে উঠেছ।

না না, ইয়ারকি নয়। আজকাল খুব নারীমুক্তি আন্দোলন-টন হচ্ছে শুনি, কিন্তু মেয়েদের এত শুচিবায়ু থাকলে সেটা হবে কী করে? পুরুষ মানেই ভক্ষক আর মেয়ে মানেই ভক্ষ্য বস্তু, এরকম ধারণাটা পালটানো যায় না?

ধৃতি পরমার সামনে এই বোধহয় প্রথম সত্যিকারের অস্বস্তি আর অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা খুব বেশি গভীর নয়। ভাববার দরকারও পড়েনি। কিন্তু পরমার প্রশ্নটি ভীষণ জরুরি বলেই তার মনে হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পণ লাগে, মেয়েরা একা সর্বত্র যেতে পারে না, মেয়েদের জীবনে অনেক বারণ।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পুরুষরা এখনও পুরোপুরি পশুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরমা। যেদিন পারবে সেদিন তোমরা অনেক বেশি ফ্রিডম পাবে।

পরমা মাথা নেড়ে বলল, পুরুষদের খামোখা পশু ভাবতে যাব কেন? বড়জোর তারা ডমিন্যান্ট, কিন্তু পশু নয়। আমার বাবা পুরুষ, আমার ভাই পুরুষ, আমার স্বামী পুরুষ। আমার পুরুষ ওয়েল উইশারেরও অভাব নেই। তাদের আমি পশুর দলে ভাবতে পারি না।

আলোচনাটা বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে পরমা।

পরমা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক পর্দা নিচু গলায় বলল, আমি সত্যিই বাপের বাড়িতে থাকতে ভালবাসি না। আপনার সঙ্গে আড্ডা মারাটাও আমার বেশ প্রিয়। কিন্তু তবু দেখুন,

আপনার মতো একজন নিরীহ পুরুষের সঙ্গ বর্জন করার জন্য আমাকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটা মেয়েদের পক্ষে অপমান নয়?

ধৃতি হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষেও। আমার ভয়ে যে তুমি পালিয়ে আছ এটা তো আমার পক্ষে সম্মানের নয়।

পরমা হঠাৎ ধৃতিকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল, আমি ভাবছি আজ আর বাপের বাড়ি যাব না। এখানেই থাকব। রাজি?

ধৃতি একটু হাসল। হাত দুটো উলটে দিয়ে বলল, আপকো মর্জি। আমি বারণ করার কে পরমা? এ তো তোমারই ফ্ল্যাট।

ওসব বলে দায়িত্ব এড়াবেন না। এটা কার ফ্ল্যাট সেটা এ প্রসঙ্গে বড় কথা নয়। আসল কথা হল আমি একজন যুবতী, আপনি একজন পুরুষ। আমরা এই ফ্ল্যাটে থাকলে আপনি কী মনে করবেন?

ধৃতি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, কিছু মনে করব না। কলকাতায় এরকম কতজনকে থাকতে হচ্ছে। কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি অত ভাবছ কেন?

ভাবছি আপনার জন্যই। রজত দিল্লি যাওয়ার আগে এই ব্যবস্থাটা করে গেছে। বিলেতে আমেরিকায় ঘুরে এসেও কেন যে ওর শুচিবায়ু কাটেনি তা কে বলবে? অথচ এতে করে খামোখা আপনাকে অপমান করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অপমান আমারও।

ধৃতি স্মিতমুখে বলল, রজতটা একটু সেকেলে। কিন্তু আমার মনে হয় ও বিশেষ তলিয়ে ভাবেনি।

ভাবা উচিত ছিল।

সকলেরই কি অত ভাবাভাবি আসে?

আপনার বন্ধুর না এলেও আমার আসে। তাই ঠিক করেছি থাকব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, থেকে যাও তা হলে।

খুশি মনে মত দিলেন তো!

দিচ্ছি। শুধু একটু কম টিকটিক করবে।

আমি কি বেশি টিকটিক করি?

না, না, তা বলছি না, তোমার টিকটিক করাটাও শুনতে ভারী ভাল। তবে কিনা—

বুঝেছি।—বলে পরমা রাগ করে বা রাগের ভান করে চলে গেল।

ধৃতি তাকে বেশি ঘাঁটাল না, বরং পণপ্রথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে রাখতে লাগল। তার ভাগ্য ভাল যে, প্রথম শ্রেণির একটি দৈনিক পত্রিকায় সে চাকরি করে এবং সাব-এডিটর হয়েও স্বনামে নানারকম ফিচার লেখার সুযোগ পায়। প্রাপ্ত এইসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ওপরে ওঠার পথ খোলা। সে লেখে ভাল, নামও আছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার পাঠকদের স্মৃতি খুবই কম। বারবার নামটা তাদের চোখে না পড়লে তারা তাকে মনেও রাখবে না। তবে ধৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখে এবং মোটামুটি সত্য ও তথ্যের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করে।

পরমা রাত্তিরে চমৎকার ডিনার খাওয়াল। আলুর দম, ডাল, পাঁপড় ভাজা আর স্যালাড। টুকটাক কথা হল। তবে ধৃতি অন্যমনস্ক ছিল, পরমাও।

রাত্রিবেলা ধৃতি একটা বই নিয়ে কাত হল বিছানায়। রোজকার অভ্যাস, কিছু না পড়লে ঘুম আসতে চায় না, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পড়তে পড়তেই শুনতে পেল, পরমা তার ঘরের দরজা সন্তর্পণে ভেজাল এবং আরও সন্তর্পণে ছিটকিনি দিল। একটু হাসল ধৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরমা জানতে পারলে কি দুঃখিত হবে যে ধৃতি কখনওই পরমার প্রতি কোনও দৈহিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করে না? পরমা খুব সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ধৃতি সবসময়ে সবরকম সুন্দরী মেয়ের দিকে

আকৃষ্ট হয় না। তার একটু বাছাবাছি আছে। অনেক সময় আবার কালো কুচ্ছিত মেয়ের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে।

সকালে পুলিশ এল।

আতঙ্কিত পরমা দৌড়ে এসে ঢুকল ধৃতির ঘরে। বিস্ফারিত চোখ, চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, কোথায় কী করে এসেছেন বলুন তো! এত সকালে পুলিশ কেন?

ধৃতি খুব নিবিষ্টমনে খবরের কাগজ পড়ছিল। চোখ তুলে বলল, গত সাত দিনে মোটে তিনটে খুন আর চারটে ডাকাতি করাতে পেরেছি। এত কম অপরাধে তো পুলিশের টনক নড়ার কথা নয়। যাক গে, আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

বলে ধৃতি উঠল।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, সবসময়ে ইয়ার্কি একদিন আপনার বেরোবে।

হ্যাঁ, যেদিন পালে বাঘ পড়বে।

বলে ধৃতি একটু হাসল। পুলিশ কেন এসেছে তা ধৃতি জানে। প্রধানমন্ত্রীর চা-চক্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। অল্প সময়ে সঠিক ঠিকানায় আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য লালবাজারের পুলিশকে সেই ভার দেওয়া হয়।

ধৃতি পিয়োন বুক-এ সই করে আমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে ফেলে রাখল। একটু অবহেলার ভঙ্গি। একটা চেয়ার টেনে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আর একবার একটু গরম জল খাওয়াও পরমা। আগের বারেরটা জমেনি।

দিচ্ছি।—বলে পরমা কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ।

ধৃতি আড়চোখে লক্ষ করছিল পরমাকে। বলল, ওটা আসলে ওয়ারেন্ট।

পরমা উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলল, ইস্, কী লাকি আপনি! প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্ন! ভাবতেই পারছি না।

ধৃতি উদাস মুখে বলল, অত উচ্ছ্বাসের কিছু নেই। ভি আই পি-দের সঙ্গ খুব সুখপ্রদ নয়, অনেক বায়নাক্কা আছে।

পরমা বলল, তবু তো কাছ থেকে দেখতে পাবেন, কথাও বলবেন! আচ্ছা, আমি যদি সঙ্গে যাই?

কী পরিচয়ে যাবে?

পরমা চোখ পাকিয়ে বলে, পরিচয় আবার কী? এমনি যাব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঢুকতে দেবে কেন? বউ হলেও না হয় কথা ছিল।

পরমা মুখ টিপে হেসে বলল, যদি তাই সেজেই যাই?

তোমার খুব উন্নতি হয়েছে পরমা।

তার মানে?

তুমি আর আগের মতো সেকেলে নেই। বেশ আধুনিক হয়েছ। আমার বউ সেজে রাজভবনে অবধি যেতে চাইছ।

আহা, তাতে দোষ কী?

রজত শুনলে মূর্ছা যাবে।

পরমা মুখোমুখি বসে বলল, কোন ড্রেসটা পরে যাবেন?

ড্রেস? ও একটা পরলেই হল।

মাথা নেড়ে পরমা বলে, না, যা খুশি পরে গেলেই চলবে নাকি? চকোলেট রঙের সেই বুশ শার্ট আর সাদা প্যান্ট— বুঝলেন?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, ও বাবা, তুমি আমার পোশাকেরও খবর রাখো দেখছি।

রাখব না কেন? ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি, তাই খবর রাখতে হয়।

ধৃতি খুব হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলে বলল, আজ তুমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছ না যে, আমাকে কোন প্রেসটা দিলে ভাল হয়। একটু আগে আমার বউ সাজতে চাইছিলে, এখন আবার বলছ ছোট ভাই। এরপর কি ভাসুর না মামাশ্বশুর?

পরমা লজ্জা পেয়ে বলে, যা বলেছি মনে থাকে যেন। সাদা প্যান্ট আর চকোলেট বুশ শার্ট।

ঠিক আছে।

প্রাইম মিনিস্টারকে কী জিজ্ঞেস করবেন?

করব কিছু একটা।

এখনও ঠিক করেননি?

প্রশ্ন করার স্কোপ কতটা পাওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় উনি বলবেন, আমাদের শুনে যেতে হবে।

তবু কিছু প্রশ্ন ঠিক করে রাখা ভাল।

ধৃতি কফি খেয়ে চিন্তিতভাবে উঠে দাড়ি কামাল, স্নান করল, খেল। তারপর পরমার কথামতো পোশাক পরে বাইরের ঘরে এল। বলল, এই যে পরমা, দেখো।

পরমা খাচ্ছিল, মুখ তুলে দেখে বলল, বাঃ, এই তো স্মার্ট দেখাচ্ছে।

এমনিতে দেখায় না?

যা ক্যাবলা আপনি!

আমি ক্যাবলা?

তাছাড়া কী?—বলে পরমা হাসল। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল, আজ আর বাইরে খেয়ে আসবেন না। আমি রেঁধে রাখব।

রোজ খাওয়ালে যে রজতটা ফতুর হয়ে যাবে।

যতদিন ও না আসছে ততদিন ওর বরাদ্দ খাবারটাই আপনাকে খাওয়াচ্ছি।

ধৃতি হাসল। বলল, ভাগ্যিস রজতের আর সব শূন্যস্থানও আমাকে পূরণ করতে হচ্ছে না।

বলেই টুক করে বেরিয়ে দরজা টেনে দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সে।

৭

ধৃতি অফিসে এসেই শুনল, ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চা-চক্রের রিপোর্টিং তাকেই করতে হবে। সে নিজেও যে আমন্ত্রিত এ কথাটা জেনে চিফ সাব এডিটর বঙ্কুবাবু বিশেষ খুশি হলেন না। বললেন, সবই কপাল রে ভাই। আমি পঁচিশ বছর এ চেয়ারে পশ্চাদ্দেশ ঘষে যাচ্ছি, কিছুই হয়নি।

ধৃতি জবাব দিল না। মনে মনে একটু দুঃখ রইল, কপাল যে তার ভাল এ কথা সে নিজেও অস্বীকার করে না। মাত্র কিছুদিন হল সে এ চাকরি পেয়েছে। সাব এডিটর হিসেবেই। তবু তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফিচার লিখতে দেওয়া হয় এবং গুরুতর ঘটনার রিপোর্টিং-এ পাঠানো হয়। ধৃতিকে যে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে অফিস তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ অফিসে ভাল ফিচার-লেখক এবং ঝানু রিপোর্টারের অভাব নেই।

প্রধানমন্ত্রী ময়দানে মিটিং সেরে রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বসবেন সন্ধে সাড়ে-ছ'টায়। এখনও তিনটে বাজেনি। ধৃতি সুতরাং আড্ডা মারতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সম্প্রতি কয়েকজন ট্রেনি জার্নালিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে। মোট চারজন। তারা প্রত্যেকেই স্কুল কলেজে দুর্দান্ত ছাত্র ছিল। বুধাদিত্য হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিল হিউম্যানিটিজে। নকশাল আন্দোলনে নেমে পড়ায় পরবর্তী রেজাল্ট তেমন ভাল নয়। রমেন স্টার পাওয়া ছেলে। এম এ-তে ইকনমিকস-এ প্রথম শ্রেণি। তুষার হায়ার সেকেন্ডারির সায়েন্স স্ট্রিমে শতকরা আটাত্তর নম্বর পেয়ে স্ট্যান্ড করেছিল। বি এসসি ফিজিক্স অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস। এম এসসি করছে। দেবাশিস দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষায় শতকরা একাশি পেয়ে পাশ করেছিল। বি এ এম এ-তে তেমন কিছু করতে পারেনি। চারজনের গায়েই স্কুল কলেজের গন্ধ, কারও ভাল করে দাড়ি গোঁফ পোক্ত হয়নি।

এদের মধ্যে রমেনকে একটু বেশি পছন্দ করে ধৃতি। ছেলেটি যেমন চালাক তেমনি গভীর। কথা কম বলে এবং সবসময়ে ওর মুখে একটা আনন্দময় উজ্জ্বলতা থাকে।

ধৃতি আজ রমেনকে একা টেবিলে কাজ করতে দেখে সামনে গিয়ে বসল।

কী হে ব্রাদার, কী হচ্ছে?

একটা রিপোর্ট লিখছি। কৃষিমন্ত্রীর ব্রিফিং।

ও বাবা. অতটা লিখছ কেন? অত বড় রিপোর্ট যাবে নাকি? ডেসকে গেলেই হয় ফেলে রাখবে, না হলে কেটে ছেঁটে সাত লাইন ছাপবে।

রমেন করুণ মুখে বলে, তা হলে না লিখলেই তো ভাল হত।

মন্ত্রীদের ব্রিফিং মানেই তো কিছু খোঁড়া অজুহাত। ওসব ছেপে আজকাল কেউ কাগজের মূল্যবান স্পেস নষ্ট করে না। খুব ছোট করে লেখো, নইলে বাদ চলে যাবে।

এই অবধি আমার মোটে চারটে খবর বেরিয়েছে। অথচ পঞ্চাশ-ষাটটা লিখতে হয়েছে।

এরকমই হয়। তবু তো তোমরা ফুল টাইম রিপোর্টার। যারা মফস্সলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাদের অবস্থা কত করুণ ভেবে দেখো। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে কত খবর লিখে পাঠাচ্ছে, বছরে বেরোয় একটা কি দুটো।

তা হলে আমাদের কভারেজে পাঠানোই বা কেন?

নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে যখন পাকাপোক্ত হবে, স্কুপ করতে শিখবে তখন তোমাকে নিয়েই হবে টানাটানি। যদি মানসিকতা তৈরি করে নিতে পারো তা হলে জার্নালিজম দারুণ কেরিয়ার।

তা জানি। আর সেইজন্যই লেগে আছি। আপনি কি আজ পি এম-এর রাজভবনের মিটিং কভার করছেন?

হুঁ। আমি অবশ্য আলাদা ইনভিটেশনও পেয়েছি।

রমেন একটু হেসে বলে, আশ্চর্যের বিষয় হল, আমিও পেয়েছি।

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তুমিও পেয়েছ! বলোনি তো!

চান্স পাইনি। আজ সকালেই লালবাজার থেকে বাড়িতে এসে দিয়ে গেল। আসলে কী জানেন, আমি একসময়ে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করতাম, কবিতাও লিখতাম, সেই সূত্র ধরে আমাকেও ডেকেছে।

এখন লেখো না?

লিখি। অল্প স্বল্প। গত মাসেই দেশ-এ আমার কবিতা ছিল।

বটে।—ধৃতি খুশি হয়ে বলে, মনে পড়েছে। আমি দেশ খুলেই আগে কবিতার পাতা পড়ে ফেলি। রমেন সেন তুমিই তা হলে!

অত অবাক হবেন না। আমার মতো কবি বাংলাদেশে কয়েক হাজার আছে।

তা থাক না। কবি কয়েক হাজার আছে বলেই কি তোমার দাম কমে যাবে?

ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর নিয়ম তো তাই বলে। কবিতার ডিমান্ড নেই, কিন্তু সাপ্লাই অঢেল। প্রাইস ফল করতে বাধ্য।

ইকনমিকসের নিয়ম কি আর্টে প্রযোজ্য?

খানিকটা তো বটেই। কবিতা লিখি বলে ক'জন আমাকে চেনে?

ধৃতি একটু হেসে বলে, একটা মনের মতো কবিতা লিখে তুমি যে আনন্দ পাও তা অকবিরা ক'জন পায়?

রমেনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হল। উষ্ণ কণ্ঠে বলল, কবিতা লিখে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। এত আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই।

তবে! দামটা সেইদিক দিয়ে বিচার কোরো। খ্যাতি বা অর্থ দিয়ে তা মাপাই যায় না। যাক গে, যাচ্ছ তো রাজভবনে?

যাব। বড্ড ভয় করে। কী হবে গিয়ে?

চলোই না। আর কিছু না হোক, রাজভবনের ইন্টিরিয়রটা তো দেখা হবে।

তা বটে। ঠিক আছে, যাব।

কাগজ কলম নিয়ে যেয়ো। যা দেখবে বা শুনবে তার নোট নিয়ো।

আমি নোট নেব কেন? কী হবে? রিপোর্ট তো করবেন আপনি।

তাতে কী? আমি যা মিস করব তুমি হয়তো তা করবে না। দু'জনের রিপোর্ট মিলিয়ে নিয়ে করলে জিনিসটা ভাল দাঁড়াবে।

মাথা নেড়ে রমেন বলল, ঠিক আছে।

ডেসক থেকে বিমান হাত উঁচু করে ডাকল, ধৃতি! এই ধৃতি! তোর টেলিফোন।

ধৃতি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, ধৃতি বলছি।

আমি বলছি।

কে বলছেন?

গলা শুনে চিনতে পারছেন না? আমি টুপুর মা।

ধৃতি একটু স্তব্ধ থেকে বলল, আপনি এখনও কলকাতায় আছেন?

মাইথন থেকে ঘুরে এলাম।

সেখানে কোনও খবর পেলেন?

না। কেউ কিছু বলতে চায় না। তবে আমার মনে হয় ওরা সবাই জানে যে টুপু খুন হয়েছিল!

ওরা মানে কারা?

ওখানকার লোকেরা।

কী বলছে তারা?

কিছুই বলছে না, আমি অনেককে টুপুর কথা জিজ্ঞেস করেছি।

শুনুন, আপনি এলাহাবাদে ফিরে যান। এভাবে ঘুরে ঘুরে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

একেবারে যে পারিনি তা নয়। একজন বুড়ো লোক স্বীকার করেছে যে সে টুপুকে বা টুপুর মতো একটি মেয়েকে দেখেছে।

টুপুর মতো মেয়ে কি আর নেই? ভুলও তো হতে পারে!

পারেই তো। সেইজন্য আমি ফিফটি পারসেন্ট ধরছি। টুপুর ঘাড়ের দিকে বাঁ ধারে একটা জরুল আছে। সেটাই ওর আইডেনটিটি মার্ক। বুড়োটাকে সেই জরুলের কথা বলেছিলাম। সে বলল, হ্যাঁ, ওরকম জরুল সেও মেয়েটির ঘাড়ে দেখেছে। এতটা মিলে যাওয়ার পরও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিই কী করে বলুন!

তা বটে।

টুপুর সঙ্গে একজন লোককেও দেখেছে বুড়োটা। খুব দশাসই চেহারা। বিশাল লম্বা। লোকটা নাকি টুপুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল।

বুড়োটা কে?

একজন ফুলওয়ালা। টুপু লোকটার কাছ থেকে ফুল কিনেছিল।

ধৃতি একটু ঘামছিল উত্তেজনায়, ভয়ে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নির্বিকার রেখে সে বলল, ঠিক আছে, শুনে রাখলাম। কিন্তু আমি একজন সামান্য সাব-এডিটর। টুপুর ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারছি না। যা করার পুলিশই করবে।

টেলিফোনে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। টুপুর মা বলল, এখন তো ইমার্জেন্সি চলছে, তাই পুলিশ খুব এলার্ট। কিন্তু কেন যেন টুপুর ব্যাপারে তারা তেমন ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না। এমনকী খুনটা পর্যন্ত বিশ্বাস করছে না।

বিশ্বাস করাটা নির্ভর করে এভিডেন্সের ওপর। আপনি আপনার মেয়ের খুনের কোনও এভিডেন্সই যে দিতে পারছেন না।

মায়ের মন সব টের পায়।

কিন্তু পুলিশ তো আর মা নয়?

ঠিক আছে, আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। কিন্তু কখনও-সখনও দরকার হলে ফোন করব। বিরক্ত হবেন না তো!

না, বিরক্ত হব কেন?

আমি খবরের কাগজের অফিস কখনও দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একদিন যদি আপনার অফিসে গিয়ে হাজির হই তো দেখাবেন? যদি অসুবিধে না থাকে?

নিশ্চয়ই। কবে আসবেন?

এ যাত্রায় হবে না। এলাহাবাদে আমার অনেক সম্পত্তি। সব পরের ভরসায় ফেলে এসেছি। শিগগিরই ফিরতে হচ্ছে। তবে আমি প্রায়ই কলকাতায় আসি।

বেশ তো, যখন সুবিধে হবে আসবেন।

বিরক্ত হবেন না তো!

না, এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আজ ছাড়ি তা হলে?

আপনার বুঝি খুব কাজ অফিসে?

কাজ না করলে মাইনে দেবে কেন বলুন?

আজ আপনার কী কাজ?

আজ প্রাইম মিনিস্টারের একটা মিটিং কভার করতে হবে।

ওমা! প্রাইম মিনিস্টার? আপনারা কত ভাগ্যবান! কোথায় মিটিং বলুন তো।

রাজভবনে।

ইস্, কী দারুণ! আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবেন?

বলব হয়তো।

ভয় করবে না?

ভয় কীসের? পি এম নিজেই তো মিটিং ডেকেছেন। আমাদের কথা শুনবার জন্যই।

কী বলবেন?

ঠিক করিনি। কথা জুগিয়ে যাবে।

একটা কথা পি এমকে বলবেন?

কী কথা?

বলবেন এ দেশে মেয়েদের বড় কষ্ট।

উনি নিজেও তো মেয়ে। উনি কি আর ভারতবর্ষের মেয়েদের কথা জানেন না?

জানেন। উনি সব জানেন। এ দেশের মেয়েরা ওঁর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছে। তবু আপনি তো পুরুষ মানুষ, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের কষ্টের কথা শুনলে উনি খুশি হবেন।

ওঁকে খুশি করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়।

টুপুর মা একটু চুপ করে থেকে বলে, তা ঠিক। তবে কী জানেন, ওঁকে খুশি করতে কেউ চায় না, সবাই শুধু ওঁর দোষটাই দেখে। পি এম একজন মহিলা বলেই কি আপনারা পুরুষেরা ওঁকে সহ্য করতে পারেন না?

তা কেন? পি এম মহিলা না পুরুষ সেটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। আমরা দেখব ওঁর কাজ।

আমার মনে হয় পুরুষেরা ওঁকে হিংসে করে।

তা হলে পি এম পুরুষদের ভোটই পেতেন না। আপনি ভুল করছেন। এ দেশের লোকেরা ইন্দিরা গাঁধীকে মায়ের মতোই দেখে।

বলছেন! কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। দেশটা একটু ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন।

তা অবশ্য ঠিক। আমি দেশের কতটুকুই বা দেখেছি! কলকাতা আর এলাহাবাদ। আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, না?

খুব না হলেও কিছু ঘুরেছি, আর লোকের সঙ্গেও মিশি। আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারি।

জানেন আমাদের এলাহাবাদের হাইকোর্টেই ওঁর মামলাটা হচ্ছিল, আমরা তখন প্রায়ই কোর্টে যেতাম। কী থ্রিলিং! তারপর উনি যখন হেরে গেলেন, কী মন খারাপ!

হতেই পারে। আপনি খুব ইন্দিরা-ভক্ত।

তা বলতে পারেন। আমি ওঁর ভীষণ ভক্ত। আপনি নন?

আমি! আমার কারও ভক্ত হলে চলে না।

ইন্দিরা এলাহাবাদের মেয়ে জানেন তো! আমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের আনন্দ ভবন বেশি দূরেও নয়। ছাদে উঠলে দেখা যায়। আপনি তো গেছেন এলাহাবাদে, তাই না?

হ্যাঁ, তবে খুব ভাল করে শহরটা দেখিনি।

এবার গেলে দেখে আসবেন। খুব সুন্দর শহর।

আচ্ছা দেখব।

আর একটা কথা।

বলুন।

আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের।

তেমন কিছু নয়।

বলছিলাম কী, আমাকে দয়া করে পাগল ভাববেন না।

ভেবেছি নাকি?

হয়তো ভেবেছেন। ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। সেই এলাহাবাদ থেকে মাঝরাতে ট্রাঙ্ককল করা, তারপর মাঝে মাঝেই এইভাবে টেলিফোনে উত্যক্ত করা, তার ওপর টুপুর ঘটনা নিয়ে উটকো দায় চাপানো, আমি জানি আমার আচরণ খুব অদ্ভুত হচ্ছে। তবু আমি কিন্তু পাগল নই।

আপনি যা করেছেন তা স্বাভাবিক অবস্থায় তো করেননি।

ঠিক তাই। শোকে তাপে অস্থির হয়ে কী করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

আমি আপনাকে পাগল ভাবিনি। কিন্তু আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। টুপুর বাবা কোথায়?

ওমা! বলিনি আপনাকে?

বলেছিলেন। তবে বোধহয় ভুলে গেছি।

আমার স্বামী বেঁচে থেকেও নেই।

তার মানে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপুর মা বলে, মানে বুঝে আর কাজ নেই। আমার স্বামী ভাল লোক নন। তবে বড়লোকের ছেলে, তাই তাঁকে সবই মানিয়ে যায়।

তিনি এখন কোথায়?

যতদূর জানি বম্বেতে। একটি কচি মেয়ের সঙ্গে থাকেন।

তিনি বেঁচে থাকতে আপনি তাঁর সম্পত্তি পেলেন কী করে?

তাঁর সম্পত্তি পেলাম শাশুড়ি সেইরকম বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছিলেন বলেই। তাছাড়া আমার বাপের বাড়িও খুব ফেলনা ছিল না। সেদিক থেকেও কিছু পেয়েছি।

মাপ করবেন, এসব প্রশ্ন করা বোধহয় ঠিক হল না।

টুপুর মা একটু হাসলেন, আমাকে যে-কোনও প্রশ্নই করতে পারেন। আমার আর অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। শোকে তাপে জ্বালায় আমি এখন কেমন একরকম হয়ে গেছি। আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। ছাড়ছি।

আচ্ছা।

ধৃতি টেলিফোন রেখে দিল। তার ভ্রূ একটু কোঁচকানো। মুখ চিন্তান্বিত।

নিউজ এডিটর ডেসকের সামনে দিয়ে একপাক ঘুরে যাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ধৃতি, আজ তো তুমি পি এম-এর রাজভবন মিটিং কভার করবে।

হ্যাঁ।

কোনও পলিটিক্যাল ইস্যু তুলো না কিন্তু। মোটামুটি ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রবলেমের ওপর প্রশ্ন করতে পারো। ইমার্জেন্সি নিয়েও কিছু বলতে যেয়ো না।

না, ওসব বলব না।

আমাদের কাগজের ওপর রুলিং পার্টি খুব সন্তুষ্ট নয়। টেক-ওভারের কথাও উঠেছিল। সাবধানে এগিয়ো।

ঠিক আছে।

ইয়ং রাইটারদের কাকে কাকে চেনো?

কয়েকজনকে চিনি।

তা হলে তো ভালই। পি এমকে কী জিজ্ঞেস করবে বলে ঠিক করেছ?

ধৃতি মৃদু হেসে বলে, দেখি।

প্রধানমন্ত্রীকে ধৃতির অনেক কথা জিজ্ঞেস করার আছে। যেমন, আপনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভালই করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনী মামলায় হেরে যাওয়ার পর করলেন কেন? এতে আপনার ইমেজ নষ্ট হল না? কিংবা বিরোধীরা কোনও রাজ্যে সরকার গড়লেই কেন্দ্র তার পিছনে লাগে কেন? কেনই বা নানা উপায়ে সেই সরকারকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে? আপনার কি মনে হয় না যে এতে সেই রাজ্যের ভোটাররা অপমানিত বোধ করতে থাকে এবং ফলে দ্বিগুণ সম্ভাবনা থেকে যায় ফের ওই রাজ্যে বিরোধীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার? কিংবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যখন আপনার ভাবমূর্তি অতি উজ্জ্বল, যখন স্বতস্ফূর্ত ভোটের বন্যায় আপনি অনায়াসে ভেসে যেতে পারতেন তখন বাহাত্তরের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক রিগিং হয় তার কোনও দরকার ছিল কি? আপনি এমনিতেই বিপুল ভোট পেতেন, তবু রিগিং করে এখানকার ভোটারদের অকারণে চটিয়ে দেওয়া কি অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়? কিংবা আপনি যেমন ব্যক্তিত্বে, ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে অতীব উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত মানুষ, আপনার

আশেপাশে বা কাছাকাছি তেমন একজনও নেই কেন? আপনার দলের সকলেই কেন আপনারই মুখাপেক্ষী, আপনারই করুণাভিক্ষু? কেন আপনার দলে তৈরি হচ্ছে না পরবর্তী নেতৃবৃন্দের সেকেন্ড লাইন অফ লিডারশিপ?

কিন্তু এসব প্রশ্ন করা যাবে না। ধৃতি জানে, এই জরুরি অবস্থায় এসব প্রশ্ন করা বিপজ্জনক। তাছাড়া এই চা-চক্রটি নিতান্তই বুদ্ধিজীবীদের। এখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক কথাই উঠতে পারে।

নিউজ এডিটর বললেন, একটু সাবধানে প্রশ্ন-টশ্ন কোরো। আর ওয়াচ কোরো কোন কবি সাহিত্যিক কী জিজ্ঞেস করেন।

ধৃতি একটু হেসে বলে, কবি সাহিত্যিকদের আমি জানি। তারা খুব সেয়ানা লোক। কোনও বিপজ্জনক প্রশ্ন তারা করবে না।

সে তো জানি। তবু ওয়াচ কোরো। আর দরকার হলে গাড়ি নিয়ে যেয়ো। মোটর ভেহিকেলসে তোমার নামে গাড়ি বুক করা আছে।

দরকার নেই।

নেই? তা হলে ঠিক আছে।

মোটর ভেহিকিলসের গাড়ি নেওয়ার ঝক্কি অনেক। এই অফিসের সবচেয়ে কুখ্যাত বিভাগ হচ্ছে ওই মোটর ভেহিকিলস, গাড়ি মানেই চুরি। পার্টস, পেট্রল, টায়ার। এই কারণে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলি তিতিবিরক্ত হয়ে নিজস্ব মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট তুলেই দিচ্ছে। দিয়ে বাইরের গাড়ি ভাড়া করে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃতি কয়েকবারই অফিসের কাজে গাড়ি নিয়েছে। নিতে গিয়ে দেখেছে গাড়ির ইনচার্জ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে, দয়া করার মতো গাড়ি দেয়, গাড়ির ড্রাইভারও ভদ্র ব্যবহার করে না, সব জায়গায় যেতে চায় না। বলতে গেলে মহাভারত। তাই ধৃতি অফিসের গাড়ি পারতপক্ষে নেয় না। আজও নেবে না।

পাঁচটার পর ধৃতি আর রমেন বেরোল।

রাজভবনের ফটকে কড়া পাহারা। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কার্ড দেখাতেই ফটকের পুলিশ অফিসার উলটেপালটে দেখে বলল, যান।

দু'জনে ভিতরে ঢুকতেই আবার পুলিশ ধরল এবং আবার কার্ড দেখাতে হল। এবং আবার এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মিলল।

রমেন নিচুস্বরে বলল, ধৃতিদা!

বলো।

বেশ ভয় ভয় করছে।

কেন বলো তো!

আপনার করছে না?

নাঃ। এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভয় কীসের? আমিও গণ তিনিও গণ।

রমেন একটু হেসে বলে, পুলিশ তা মনে করে না।

তা অবশ্য ঠিক। তবে সিকিউরিটির ব্যবস্থা স্টেট গভর্নমেন্টই করেছে। পি এম-এর কিছু হলে সরকারের বদনাম।

রমেন মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, রাজভবনের ভিতরের এই রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন তা জানেন?

এমনি। পেবলের রাস্তা আরও কত জায়গায় আছে। বেশ লাগে।

রমেন মাথা নেড়ে বলল, না। এর একটা অন্য কারণও আছে।

তাই নাকি?

আমার কাকা পুলিশে চাকরি করতেন। বিগ অফিসার ছিলেন। নাম বললেই হয়তো চিনে ফেলবেন, তাই আপাতত নাম বলছি না। যখন চৌ এন লাই কলকাতায় এসে রাজভবনে ছিলেন তখন কাকা ছিলেন তাঁর সিকিউরিটি ইনচার্জ। তিনিই কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের রাজভবনের রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন।

তোমার কাকা কী বলেছিলেন?

আপনার মতোই সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন। চৌ এন লাই খুব মজার হাসি হেসে বলেছিলেন, মোটেই তা নয়। নুড়িপাথরের ওপর গাড়ি চললে শব্দ হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে লাটসাহেবদের সিকিউরিটির জন্যই ওই ব্যবস্থা। তারপর চৌন এন লাই কাকাকে একটা গাড়ির শব্দ শোনালেন। শুনিয়ে বললেন, নাউ ইউ সি দ্যাট অন এ পেবল রোড দি সাউন্ড অফ এ কার কামিং অর গোয়িং ক্যানট বি সাপ্রেসড!

ধৃতি হেসে বলল, তাই হবে। সাহেবদের খুব বুদ্ধি ছিল।

চৌ এন লাইয়েরও কম ছিল না। আমার কাকা পুলিশ হয়েও যেটা বুঝতে পারেননি উনি ঠিক পেরেছিলেন।

সিঁড়ির মুখে আর এক দফা বাধা ডিঙিয়ে যখন লাউঞ্জে ঢুকল তারা, তখন সেখানে ভীরু ও সংকুচিত মুখে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ও আর্টিস্ট জড়ো হয়েছে। রাজভবনের কালো প্রাচীন লিফটের সামনে বেশ একখানা ছোটখাটো ভিড়। এদের অনেককেই ধৃতি চেনে, রমেনও।

কয়েক ব্যাচ লিফট-বাহিত হয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার পরই ধৃতি আর রমেনের পালা এল। লিফটম্যান সাফ জানিয়ে দিল, দোতলায় মিটিং বটে কিন্তু লিফট খারাপ বলে দোতলায় থামছে না। তিনতলায় উঠে দোতলায় নামতে হবে।

ধৃতি লিফটের ব্যাপারটা মনে মনে নোট করল। খরচের ওপর এখন কড়া সেনসর। কাজেই রাজভবনের লিফট ত্রুটিযুক্ত এ খবরটা লেখা হলেও ছাপা যাবে কি না এতে ঘোর সন্দেহ।

তিনতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দু'জনে কিছু আতান্তরে পড়ে গেল। লিফটের সামনে সংকীর্ণ করিডোরে নেমে কোনদিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে সকলেই গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খেতেও কেউ সাহস করছে না। ফিসফাস কথা বলছে শুধু।

সেই ভিড়ে ধৃতি আর রমেনও দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন সকলেই খানিকটা উসখুস করছে তখনই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং তরুণ এক মিলিটারি অফিসার করিডোরে ঢুকেই হাত নেড়ে সবাইকে প্রায় গোরু তাড়ানোর মতো করে নিয়ে তুলল দক্ষিণের প্রকাণ্ড বারান্দায়।

বারান্দার পরেই একখানা হলঘর। তাতে মস্ত মস্ত টেবিল পাতা। টেবিলে খাবার সাজানো থরে থরে। উর্দিপরা বেয়ারা ছাড়া সে ঘরে কেউ নেই। বোঝা গেল এই ঘরেই ইন্দিরার সঙ্গে তারা সবাই চা খাবে। তবে আপাতত প্রবেশাধিকার নেই। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় কয়েকজন সিগারেট ধরাল। কে এসে চুপি চুপি খবর দিল। ময়দানের মিটিং শেষ হয়েছে। ইন্দিরা রাজভবনে রওনা হয়েছেন। সকলেই কেমন যেন উদ্বিগ্ন, অসহজ, অপ্রতিভ। যারা জড়ো হয়েছে তারা সবাই কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক বটে, কিন্তু সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। রাজভবনে আসা বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাদের জীবনে খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়। তার ওপর জরুরি অবস্থার একটা গা ছমছমে ব্যাপার তো আছেই।

খুবই আকস্মিকভাবে একটা চঞ্চলতা বয়ে গেল ভিড়ের ভিতর দিয়ে।

এলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। স্মার্ট চেহারা, মুখে সপ্রতিভ হাসি, হাতজোড়।

বললেন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন তো! আসুন আসুন, এ ঘরে আসুন।

আবহাওয়াটা কিছু সহজ হয়ে গেল। হাত পায়ে সাড় এল যেন সকলের।

হলঘরে ঢুকে ভাল করে থিতু হওয়ার আগেই ধৃতি অবিশ্বাসের চোখে দেখল, ইন্দিরা ঘরে ঢুকছেন।

সে কখনও ইন্দিরা গাঁধীকে এত কাছ থেকে দেখেনি। দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। ছবিতে যেরকম দেখায় মোটেই সেরকম নন ইন্দিরা। ছোটখাটো ছিপছিপে কিশোরীপ্রতিম তাঁর শরীরের গঠন। গায়ের রং বিশুদ্ধ গোলাপি। মুখে সামান্য পথশ্রমের ছাপ আছে। কিন্তু হাসিটি অমলিন।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকেই আবহাওয়াটা আরও সহজ করে দিলেন। ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। সঙ্গে ঘুরছেন রাজ্যপাল ডায়াসের পত্নী।

ধৃতি প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ ইন্দিরা তার মুখোমুখি এসে গেলেন।

ধৃতি চিন্তা না করেই হঠাৎ ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডাম, আপনি কবিতা গল্প উপন্যাস পড়েন?

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইন্দিরা বললেন, সময় তো আমার খুব কমই হাতে থাকে। তবু পড়ি। আমি পড়তে ভালবাসি।

কীরকম লেখা আপনার ভাল লাগে?

একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, হতাশাব্যঞ্জক কিছুই আমার পছন্দ নয়, জীবনের অস্তিবাচক দিক নিয়ে লেখা আমি পছন্দ করি।

মহান ট্র্যাজেডিগুলো আপনার কেমন লাগে?

যা মহান তা তো ভাল বলেই মহান।

আর সুযোগ হল না। আর একজন এসে মৃদু ঠেলায় সরিয়ে দিল ধৃতিকে।

ধৃতি সরে এল।

ইন্দিরা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। থাক করা প্লেট থেকে একটা-দুটো তুলে দিলেন অভ্যাগতদের হাতে। ধৃতি সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন যে ইন্দিরার হাত থেকে প্লেট নিতে পারল। প্লেটটা নিয়েই সে মৃদু স্বরে বলল, ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমি আপনার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দরী মহিলা জীবনে দেখিনি। সুন্দরীরা সাধারণত বোকা হয়।

ইন্দিরা তার এই দুঃসাহসিক মন্তব্যে রাগ করলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, জীবনে কোনও লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

চমৎকার কথা। ধৃতি মনে মনে কথাটা টুকে রাখল।

রাজভবনের জলখাবার কেমন তা সাংবাদিক হিসেবেই লক্ষ করছিল ধৃতি। খুব যে উঁচুমানের তা নয়। মোটামুটি খেয়ে নেওয়া যায়। খারাপ নয়, এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। তবে ইন্দিরা গাঁধীও এই খাবার মুখে দিচ্ছেন, এইটুকুই যা বলার কথা।

রমেন একটা প্যাস্ট্রি কামড়ে ধৃতিকে নিচু স্বরে বলল, পি এম-কে আমার হয়ে একটা প্রশ্ন করবেন?

কী প্রশ্ন?

উনি কবিতা পড়েন কি না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমি অলরেডি অনেক বাচালতা করে ফেলেছি। এবার তুমি করো।

ও বাবা, আমার ভয় করে।

ভয়! ইন্দিরাজিকে ভয়ের কী?

আপনার গাটস আছে, আমার নেই।

গাটস নয়। আমি জানি ইন্দিরাজি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। ওঁর একটা দারুণ কালচারাল

ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যা পলিটিক্যাল দলবাজিতে মার খায়নি। উনি হিউমার বোঝেন, আর্ট ভালবাসেন, সৌন্দর্যবোধ আছে, যা পলিটিক্সওয়ালাদের অধিকাংশেরই নেই। এই মানুষকে যদি ভয় পেতে হয় তো পাবে ওঁর প্রতিপক্ষরা, আমরা পাব কেন?

আপনি কি একটু ইন্দিরা-ভক্ত, ধৃতিদা?

আমি তো পলিটিক্স বুঝি না, কিন্তু মানুষ হিসেবে এই মহিলাকে আমার দারুণ ভাল লাগে। তবে তোমার প্রশ্নের জবাবে আমিই বলে দিতে পারি, ইন্দিরাজি কবিতা না ভালবেসেই পারেন না। ওঁকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পড়ে গেল দু'জন। মুখ্যমন্ত্রী রায় সকলকেই বদান্যভাবে স্মিতহাসি বিতরণ করছিলেন। ধৃতির দিকে চেয়ে সেই হাসিমাখা মুখেই বললেন, চা খেয়েই হলঘরে চলে যাবেন, কেমন?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

হলঘরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গ্যালারির মতো। ডায়াসে পাঁচখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ইন্দিরা, রাজ্যপাল ডায়াস ও তাঁর স্ত্রী, সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধিজীবীরা একে একে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। নাম, কী লেখেন বা আঁকেন ইত্যাদি। ইংরিজি বা হিন্দিতে। ধৃতি দ্রুত নোট নিতে নিতেই নিজের পালা এলে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে নিল।

ধৃতি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। প্রত্যেকেই আড়ষ্ট, নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত এবং কেউই আজকের আলোচনায় প্রাধান্য চায় না। সবকিছুরই মূলে রয়েছে ইমার্জেন্সি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যা একটি অভূতপূর্ব জুজুর ভয়। ইউ পি-তে নাসবন্দির কথা শোনা যাচ্ছে, দিল্লিতে বস্তি এবং বসত উচ্ছেদের কথা কানাকানি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস সঞ্জয় গাঁধী ও তাঁর অত্যুৎসাহী সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীরাও ভীত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা ততোধিক। বিরোধী নেতাদের অনেকেই কারাগারে, ঠোঁটকাটা কতিপয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও অনুরূপ রাজরোষের শিকার। আর সবকিছুর মূলে যিনি, সেই অখণ্ড কর্তৃত্বময়ী নারী এখন ধৃতির চোখের সামনে ওই বসে আছেন। কিন্তু ধৃতি কিছুতেই মহিলাকে অপছন্দ করতে পারছিল না। একটু অস্বস্তি তারও আছে ঠিকই, কিন্তু এই মহিলার মানবিক আকর্ষণটাও তো কম নয়। এঁকে সে ডাইনি ভাববে কী করে?

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পর দু'-চারজন উঠে একে একে ভয়ে ভয়ে দু'-চার কথা বলল। তেমন কোনও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। কেউ বলল, লেখক ও কবিদের জন্য একটা স্টুডিয়ো করে দেওয়া হোক। কারও প্রস্তাব, সরকার তাদের গ্রন্থ প্রকাশে কিছু সাহায্য করুক। এইরকম সব এলেবেলে কথা।

ইন্দিরা সাধ্যমতো জবাব দিলেন। কিছু জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীও। তবে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না।

সবশেষে ইন্দিরা দু'-চারটে কথা খুব শান্ত গলায় বললেন। প্রধান কথাটা হল, এখন নিরাশার সময় নয়। নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। শিল্পে বা সাহিত্যেও কিছু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত এবং কিছু স্বতঃপ্রণোদিত দায়িত্ববোধও।

সবাই খুশি। তেমন কোনও ওপর-চাপান দেননি ইন্দিরা, শাসন করেননি, ভয় দেখাননি। স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল সবাই। জরুরি অবস্থায় শুধু একটু সামলে লিখতে বা আঁকতে হবে।

ধৃতি জানে, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশেরই কোনও রাজনৈতিক বোধ বা দলগত পক্ষপাতিত্ব নেই। রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতার চাষ তাঁরা বেশিরভাগই করেন না। একমাত্র বামপন্থী

লেখক কবি বা শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় তেমন বেশি নন।

তাছাড়া বামপন্থী বা মার্কসীয় সাহিত্য বাংলায় তেমন সফলও হয়নি। সুতরাং তাঁদের কথা না ধরলেও হয়। বাদবাকিরা রাজনীতিমুক্ত বুদ্ধিজীবী। রাজনীতির দলীয় কোন্দল থেকে তাঁদের বাস বহুদূরে। সেটা ভাল না মন্দ সে বিচার ভিন্ন। তবে এই জরুরি অবস্থার দরুন তাঁরা কেউ আতঙ্কিত নন। কিন্তু অস্বস্তি একটা থাকেই। সেই অস্বস্তি ইন্দিরা আজ কাটিয়ে দিলেন।

অফিসে এসে রিপোর্ট লিখতে ধৃতির ন'টা বেজে গেল। কপিটা নিউজ এডিটরের টেবিলে গিয়ে রেখে সে বলল, শরীরটা ভাল লাগছে না। যাচ্ছি।

শরীর ভাল নেই তো অফিসের গাড়ি নিয়ে যাও। বলে দিচ্ছি।

না, চলে যেতে পারব।

তা হলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দেখছি। রিপোর্টটা আপনি যতক্ষণ পড়বেন ততক্ষণ অপেক্ষা করব কি?

না, তার দরকার নেই। কিছু অদলবদল দরকার হলে আমিই করে নিতে পারব। সেনসর থেকে আগে ঘুরে আসুক তো।

ধৃতি বেরিয়ে এল। কাউকে সঙ্গে নিল না। রাস্তায় একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। আর ট্যাকসিতে বসেই বুঝতে পারল তার প্রবল জ্বর আসছে। জ্বরের এই লক্ষণ ধৃতি খুব ভাল চেনে। ছাত্রাবস্থা থেকেই হোটেলে মেসে এবং রেস্তোরাঁয় আজেবাজে খেয়ে তার পেটে একটা বায়ুর উপসর্গ দেখা দিয়েছে। যখনই উপসর্গটা দেখা দেয় তখনই তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে যায় একশো তিন চার ডিগ্রি। এক ডাক্তার বন্ধু একবার বলেছিল, তোর জ্বর হলে পেটের চিকিৎসা করাবি, জ্বর সেরে যাবে।

এ জ্বরটা সেই জ্বর কি না বুঝতে পারছিল না সে। তবে যখন বাসার সামনে এসে নামল তখন সে টলছে এবং চোখে ঘোর দেখছে।

নিতান্তই ইচ্ছাশক্তির জোরে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে চেষ্টা করল। থেমে থেমে, দম নিয়ে নিয়ে। পরমা বাসায় আছে তো! যদি না থাকে তবে একটু বিপাকে পড়তে হবে তাকে।

দোতলা অবধি উঠে তিনতলার সিঁড়িতে পা রেখে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধৃতি। মাথাটা বড্ড টলমল করছে।

কী হয়েছে আপনার?

ধৃতি আবছা দেখল, একটা মেয়ে, চেনা মুখ। এই ফ্ল্যাটবাড়িরই কোনও ফ্ল্যাটে থাকে। বেশ চেহারাখানা, বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি ঘন এবং গাঢ় শ্বাস ফেলছিল, শরীরটা বাস্তবিকই যে কতটা খারাপ তা এতক্ষণ সে টের পায়নি, এবার পাচ্ছে, তবু মর্যাদা বজায় রাখতে বলল, আমি পারব।

আপনার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

পারব। ও কিছু নয়।

সত্যিই পারবেন? আমার দাদা আর বাবা ঘরে আছে, তাদের ডাকি? ধরে নিয়ে ওপরে দিয়ে আসবে।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, পারব, একটু রেস্ট নিয়ে নিই তা হলেই হবে।

তবে আমাদের ফ্ল্যাটে বসে রেস্ট নিন। আমি পরমাদিকে খবর পাঠাচ্ছি।

সহৃদয় পুরুষ এবং সহৃদয়া মহিলার সংখ্যা আজকাল খুব কমে গেছে। আজকাল ফুটপাথে পড়ে-থাকা মানুষের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দায়িত্ব নিতে সকলেই ভয় পায়। মেয়েটির আন্তরিকতা তাই বেশ লাগছিল ধৃতির। সে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু দু' ধাপ সিঁড়ি নামতে গিয়েই মাথাটা একটা চক্কর দিয়ে ভোম হয়ে গেল। তারপরই চোখের

সামনে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। ধৃতি একবার হাত বাড়াল শেষ চেষ্টায় কিছু ধরে পতনটা সামলানোর জন্য। কিন্তু কোথাই। নিজের শরীরের ধমাস করে শানে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনতে পেল ধৃতি। তারপর আর জ্ঞান রইল না।

যখন চোখ চাইল তখন পরমা তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগ।

ধৃতি চোখ মেলতেই পরমা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে? একটু ভাল?

ধৃতি পূর্বাপর ঘটনাটা মনে করতে পারল না। শুধু মনে পড়ল, সিঁড়ির ধাপে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। শরীরটা আগে থেকেই দুর্বল লাগছিল তার। শরীরে জ্বর। কিন্তু এই জ্বর তার হয় পেটের গোলমাল থেকে। দীর্ঘকাল মেসে হোটেলে খেয়ে তার একটা বিশ্রী রকমের অম্বলের অসুখ হয়। এখনও পুরোপুরি সারেনি। সেই চোরা অম্বল থেকে পেটে গ্যাস জমে মাঝে মাঝে জ্বর হয় তার। আর এই অবস্থায় শরীর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।

ধৃতি পরমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ, না?

ভয় হবে না! কীভাবে পড়ে গিয়েছিলেন! ওরা সব ধরাধরি করে যখন নিয়ে এল তখন তো আমি সেই দৃশ্য দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার এসে বলে গেল, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

ধৃতি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, ভয় পেয়ো না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়।

জ্বর হতেই পারে। কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কেন?

ধৃতি ফের একটু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই মেয়েটাকে দেখেই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

যাঃ! ইয়ারকি হচ্ছে?

কেন, মেয়েটা সুন্দর নয়?

সুন্দর নয় তো বলিনি। তবে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয় মোটেই। পৃথাকে আপনি বহুবার দেখেছেন।

ধৃতির আর ইয়ারকি দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

শুনছেন? ডাক্তার আপনাকে গরম দুধবার্লি খাইয়ে দিতে বলে গেছেন।

দুধ-বার্লি আমি জীবনে খাইনি। ওয়াক।

অসুখ হলে লোকে তবে কী খায়?

ও আমি পারব না।

না খেলে দুর্বল লাগবে না?

পি এম-এর পার্টিতে খেয়েছি। খিদে নেই।

কী খাওয়াল ওখানে?

অনেক কিছু।

পি এম-কে দেখলেন?

দেখলাম।

আপনি ভাগ্যবান। আমাকে দেখালেন না তো? আচ্ছা আপনি ঘুমোন। একটু বাদে তুলে খাওয়াব।

ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে আর ডেকো না পরমা। একটানা কিছুক্ষণ ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাই কি হয়? খেতে হবে।

হবেই?

না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন।

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে ওপরে এনেছিল, না?

প্রায় সেইরকম? কেন বলুন তো।

আমিও বুঝতে পারছি না হঠাৎ একটা সুন্দর মেয়ের সামনে গাড়লের মতো আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন। বিশেষ করে মেয়েটা যখন ওদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

পরমা সামান্য হেসে বলে, অজ্ঞান কি কেউ ইচ্ছে করে হয়?

ইচ্ছাশক্তিও এক মস্ত শক্তি। ইচ্ছাশক্তি খাটাতে পারলে আমি কিছুতেই অজ্ঞান হতাম না।

এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কেউ তো আর কিছু বলেনি।

বলার দরকারও নেই। আমি শুধু ভাবছি আমার ইচ্ছাশক্তি এত কম কেন।

মোটেই কম নয়। আজ আপনার খুব ধকল গেছে। সেইজন্য।

ধৃতি একটু গুম হয়ে থেকে বলে, আচ্ছা কী খাওয়াবে খাইয়ে দাও। শোনো তোমাদের রাত্রে রুটি হয়নি?

হচ্ছে।

তাই দু'খানা নিয়ে এসো। সঙ্গে ডাল-ফাল যা হোক কিছু।

শঙ্কিত গলায় পরমা বলে, রুটি খেলে খারাপ হবে না তো?

আরে না। বার্লি-ফার্লি আমি কখনও খাই না। দুধও চুমুক দিয়ে খেতে পারি না। রুটিই আনো।

পরমা উঠে গেল।

ধৃতি চেয়ে রইল সিলিং-এর দিকে। বড় আলো নেভানো। ঘরে একটা কমজোরি বালবের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মাত্র। ধৃতি চেয়ে রইল। স্মরণকালের মধ্যে সে কখনও অজ্ঞান হয়নি। শরীর শত খারাপ হলেও না। তবে আজ তার এটা কী হল? ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হচ্ছে না তো তার? জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না তো?

নিজেকে নিয়ে ধৃতির চিন্তার শেষ নেই।

পরমা রুটি নিয়ে এল। দু'খানার বদলে ছ'খানা। ডাল, তরকারি, আলুভাজা, মাংস অবধি।

ও বাবা, এ যে ভোজের আয়োজন।

রুটিতে ঘি মাখিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ। আমার বারোটা তুমিই বাজাবে।

ওমা, আমি বারোটা বাজাব কী করে?

জ্বোরো রুগিকে কেউ ঘি খাওয়ায়?

রুটি শুকনো কেউ খায়?

ধৃতি একটু হাসল। পরমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। গ্রে ম্যাটার ওর মাথায় খুবই কম। তবে পরমা মেয়েটা বড় ভাল মানুষ। ধৃতি তাই খেতে শুরু করে দিল। কিন্তু বিস্বাদ মুখে তেমন কিছুই খেয়ে উঠতে পারল না। পরমার অনেক তাগিদ সত্ত্বেও না।

ওষুধ খেয়ে সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জ্বর-যন্ত্রণায় কাতর শরীরে নিপাট নিশ্ছিদ্র ঘুম হয় না। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘুমের চটকা ভেঙে চোখ চেয়েই সে পিপাসায় 'ওঃ' বলে শব্দ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন কাছে এল। একটা সুন্দর গন্ধ পেল ধৃতি। ঘুমজড়ানো চোখে অবাক হয়ে দেখল, পরমা।

তুমি! তুমি জেগে আছ কেন?

ওমা! আপনার এত জ্বর আর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোব?

ধৃতি ম্লান একটু হেসে বলে, বন্ধুপত্নী, তুমি বড়ই সরলা।

সরলা! হোয়াট ডু ইউ মিন? বোকা নয় তো।

বোকা ছাড়া আর কী বলা যায় বলো তো তোমাকে। একেই তো পর-পুরুষের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বসবাস করছ। তার ওপর আবার এক ঘরে এবং এত রাতে।

তাতে কী হয়েছে বলুন তো।

এখনও কিছু হয়নি বটে, তবে হতে কতক্ষণ। কথাটা বাইরে জানাজানি হলে যা একখানা নিন্দে হবে দেখো।

ঠোঁট উলটে পরমা বলে, হোক্ গে। তা বলে একশো চার জ্বরের একজন রুগিকে একা ঘরে ফেলে রাখতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, একটু জল দাও।

পরমা জল দেয় এবং ধৃতি শোয়ার পর তার কপালে জলে ভেজা ঠান্ডা করতলটি রেখে নরম স্বরে বলে, ঘুমোন, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার কাছে থাকব।

থাকার দরকার নেই। এবার গিয়ে ঘুমোও।

জ্বরটা আর একটু কমুক। তারপর যাব।

এত ভাবছ কেন বলো তো!

কী জানি কেন, তবে কারও অসুখ করলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। আপনাকে তো দেখার কেউ নেই।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তারও এ কথাটা মনে হয়। তার বাস্তবিকই কেউ নেই। দাদা দিদি এরা থেকেও অনাত্মীয়। তবে বয়সের গুণে এবং কাজকর্মের মধ্যে থাকার দরুন আত্মীয়হীনতা তাকে তেমন উদ্বিগ্ন করে না। বরং কেউ না থাকায় সে অনেকটাই স্বাধীন। তবু এইরকম অসুখ-বিসুখের সময় বা হঠাৎ ডিপ্রেশন এলে একাকিত্বটা সে বড় টের পায়।

পরমা কপালে একটা জলপটি লাগাল। বলল, মাথাটা একটু ধুয়ে দিতে পারলে হত।

এত রাতে আর ঝামেলায় যেয়ো না। আমি অনেকটা ভাল ফিল করছি।

একশো চার জ্বরে কেমন ভাল ফিল করে লোকে তা জানি।

তুমি সত্যিই জেগে থাকবে নাকি?

থাকব তো বলেছি।

ধৃতি পরমার দিকে তাকাল। আবছা আলোয় এক অদ্ভুত রহস্যময় সৌন্দর্য ভর করেছে পরমার শরীরে। এলো চুলে ঘেরা মুখখানা যে কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ধৃতি পরমার প্রতি কখনওই কোনও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি। আজও করল না। কিন্তু মেয়েটার প্রতি সে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত মায়া আর ভালবাসা টের পাচ্ছিল। জ্বরতপ্ত দু'খানা হাতে পরমার হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে ধৃতি বলল, তোমার মনটা যেন চিরকাল এরকমই থাকে পরমা। তুমি বড় ভাল।

হঠাৎ পরমার মুখখানা তার মুখের খুব কাছাকাছি সরে এল।

গাঢ়স্বরে পরমা বলল, আর কমপ্লিমেন্ট দিতে হবে না। এখন ঘুমোন।

ধৃতি ঘুমোল। এক ঘুমে ভোর।

জ্বরটা ছাড়লেও দিন দুই বেরোতে পারেনি ধৃতি। তিনদিনের দিন অফিসে গেল।

ফোনটা এল চারটে নাগাদ।

এ ক'দিন অফিসে আসেননি কেন? আমি রোজ আপনাকে ফোন করেছি।

ধৃতি একটু শিহরিত হল গলাটা শুনে। বলল, আমার জ্বর ছিল।

আপনার গলার স্বরটা একটু উইক শোনাচ্ছে বটে। যাই হোক, সেদিন পি এম-এর সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউয়ের রিপোর্ট কাগজে পড়েছি। বেশ লিখেছেন। কিন্তু আপনারা কেউই পি এম-কে তেমন অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি।

পি এম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁকে রংফুটে ফেলা কি সহজ?

তা বটে।

আপনি এখনও এলাহাবাদে ফিরে যাননি?

না। রোজই যাব যাব করি। কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে যায়। আবার ভাবি, গিয়েই বা কী হবে। টুপু নেই, ফাঁকা বাড়িতে একা একা সময়ও কাটে না ওখানে।

এখানে কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন?

এখানে! ও বাবাঃ, কলকাতায় কি সময় কাটানোর অসুবিধে? ছবির একজিবিশনে যাই, ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনি, থিয়েটার দেখি, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যাই, আর ঘুরে বেড়ানো বা মার্কেটিং তো আছেই।

হ্যাঁ, কলকাতা বেশ ইন্টারেস্টিং শহর।

আপনারও কি কলকাতা ভাল লাগে?

লাগে বোধহয়, ঠিক বুঝতে পারি না।

বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

আমার! আমার প্রায় কেউই নেই। এক বন্ধুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকি।

ওমা। বলেননি তো কখনও?

এটা বলার মতো কোনও খবর তো নয়।

আপনার মা বাবা নেই?

না।

ভাই বোন?

আছে, তবে না থাকার মতোই।

আপনি তা হলে খুব একা?

হ্যাঁ।

ঠিক আমার মতোই।

আপনার একাকিত্ব অন্যরকম। আমার অন্যরকম।

আচ্ছা, একটা প্রস্তাব দিলে কি রাগ করবেন?

রাগ করব কেন?

আমাদের বাড়িতে আজ বা কাল একবার আসুন না।

কী হবে এসে? টুপুর ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, কারওরই কিছু করার নেই বোধহয়। কিন্তু তাতে কী? আমি আপনার একটু সঙ্গ চাই। রাজি হবেন না?

না, রাজি হতে বাধা নেই। আচ্ছা যাব'খন।

ওরকম ভাসা-ভাসা বলা মানেই এড়িয়ে যাওয়া। আপনি কাল বিকেলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব।

কখন?

চারটে।

বিকেলে যে আমার অফিস।

কখন ছুটি হয় আপনার?

রাত ন'টা।

তা হলে সকালে আসুন। এখানেই দুপুরে খেয়ে অফিসে যাবেন।

ধৃতি হেসে ফেলে বলে, চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করে ফেলছেন। আমি কেমন লোক তাও তো জানেন না।

ওপাশে একটু হাসি শোনা গেল। টুপুর মা একটু বেশ তরল স্বরেই বলল, বরং বলুন না যে, আমি আপনার অচেনা বলেই ভয়টা বরং আপনার।

ধৃতি বলে, আমি ভবঘুরে লোক, আত্মীয়হীন, আমার বিশেষ ভয়ের কিছু নেই। পুরুষদের বেলায় বিপদ কম। মহিলাদের কথা আলাদা।

আপনার কিছুই তেমন জানি না বটে, চাক্ষুষও দেখিনি, কিন্তু পত্র-পত্রিকায় আপনার ফিচার পড়ে জানি যে আপনি খুব সৎ মানুষ।

ফিচার পড়ে? বাঃ, ফিচার থেকে কিছু বুঝি বোঝা যায়?

যায়। আপনি না বুঝলেও আমি বুঝি। ভুল আমার কমই হয়। আরও একটা কথা বলি। আপনার মতোই আমিও কিন্তু একা। আমার কেউ নেই বলতে গেলে। একা থাকি বলেই আমার নিরাপত্তার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। সামান্য কারণে অহেতুক ভয় বা সংকোচ করলে আমার চলে না। এবার বলুন আসবেন?

ঠিক আছে, যাব।

সকালেই তো?

খুব সকালে নয়। এগারোটা নাগাদ।

ঠিক আছে। ঠিকানাটা বলছি, টুকে নিন।

ঠিকানা নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর ধৃতি ভাবতে লাগল কাজটা ঠিক হল কি না, না, ঠিক হল না। তবে এই ভদ্রমহিলা আড়াল থেকে তাকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে আসছেন কিছুদিন হল। টুপু নামে এক ছায়াময়ীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক পরোক্ষ রহস্য। হয়তো মুখোমুখি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে সেই রহস্যের কুয়াশা খানিকটা কাটবে। তাই ধৃতি এই ঝুঁকিটুকু নিল। বিপদে যদি বা পড়ে তার তেমন ভয়ের কিছু নেই। বিপদ তেমন আছে বলেও মনে হচ্ছে না তার।

একটু অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে দিনটা কাটল ধৃতির। পত্রিকায় ফিচার লিখলে প্রচুর চিঠি আসে। ধৃতিরও এসেছে। মোট সাতখানা। সেগুলো অন্যদিন যেমন আগ্রহ নিয়ে পড়ে ধৃতি, আজ সেরকম আগ্রহ ছিল না। কয়েকটা খবর লিখল, আড্ডা মারল, চা খেল বারকয়েক, সবই অন্যমনস্কতার মধ্যে। শরীরটাও দুর্বল।

একটু আগেভাগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল ধৃতি। সাড়ে আটটায় ঘরে ফিরে এসে দেখে, পরমা দারুণ সেজে ডাইনিং টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে।

কী পরমা? তোমার পতিদেবটি ফিরেছে নাকি?

না তো! হঠাৎ কী দেখে মনে হল?

তোমার সাজ আর ব্যস্ততা দেখে।

খুব ডিটেকশন শিখেছেন।

তবে আজ এত সাজের কী হল?

বাঃ, সাজটাই বা কী করেছি! মুগার শাড়িটা অনেককাল পরি না, একটু পরেছি, তাই আবার একজনের চোখ কটকট করছে।

আহা, অত ঝলমলে জিনিস চোখে একটু লাগবেই। ব্যাপারটা একটু খুলে বললেই তো হয়। কেসটা কী?

পরমা খোঁপার মাথাটা ঠিক করতে করতে বলল, ফ্ল্যাটবাড়ি হল একটা কমিউনিটি, জানেন তো!

জানব না কেন, বুদ্ধু নাকি? ছ'মাস আগেই কলকাতার এই ফ্ল্যাটবাড়ির নিয়ো কমিউনিটি নিয়ে ফিচার লিখেছিলাম।

জানি। পড়েওছি। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে চলতে হয়। আজ দোতলায় দোলাদের ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। ওদের মেয়ের জন্মদিন।

খুব খাওয়াল?

প্রচুর। মুরগি, গলদা, ভেটকি ফ্রাই, ফিশ রোল, লুচি, ফ্রায়েড রাইস, পায়েস...

রোখকে ভাই। তুমি ক্যালোরি হিসেব করে খাও না নাকি?

তার মানে?

ওরকম গান্ডেপিন্ডে খেলে যে দু'দিনেই হাতির মতো হয়ে যাবে।

আহা, আমার ফিগার নিয়ে ভেবে ভেবে তো চোখে ঘুম নেই। আমি অত বোকা নই মশাই, একখানা মুরগির ঠ্যাং দু'ঘণ্টা ধরে চিবিয়ে এসেছি মাত্র।

রোল খাওনি?

আধখানা।

গলদা ছেড়ে দিলে? চল্লিশ টাকা কিলো যাচ্ছে।

ওই একটু।

দইটা কেমন ছিল?

দই। না, দই করেনি তো। আইসক্রিম।

কেমন ছিল?

বাঃ, আইসক্রিম আবার কেমন হবে? ভালই।

মিষ্টির আইটেম করেনি তা হলে। ছ্যাঁচড়া আছে।

মোটেই না। তিনরকম সন্দেশ ছিল মশাই।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, না। তোমার ফিগার কিছুতেই রাখতে পারবে না পরমা। এত যে কেন খাও।

নজর দেবেন না বলছি।

দিচ্ছি না। কেউ আর দেবেও না।

খুব হয়েছে। দোলা আপনার জন্যও চর্বচোষ্য পাঠিয়েছে। এতক্ষণ ঘরে সেগুলো নিচু আঁচে রেখে বসে আছি। দয়া করে এবার গিলুন।

আমার জন্য। আমার জন্য পাঠাবে কেন? তারা কি আমাকে চেনে?

এমনিতে চেনে না। তবে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে মনে করে হঠাৎ চিনতে শুরু করেছে। যান তো, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।

ধৃতি হাত-মুখ ধুয়ে এল বটে, কিন্তু মুখে এক বিচ্ছিরি অরুচি জ্বরের পর থেকেই তার খাওয়ার আনন্দকে মাটি করে দিয়েছে। টেবিলে বসে বিপুল আয়োজনের দিকে চেয়ে সে শিউরে উঠে বলল, এক কাজ করো পরমা, মুরগি আর লুচি বাদে সব সরিয়ে নাও। ফ্রিজে রেখে দাও, পরে খাওয়া যাবে।

অরুচি হচ্ছে, না?

ভীষণ। খাবার দেখলেই এলার্জি হয় যেন।

কী করি বলুন তো আপনাকে নিয়ে!

আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা আছে ভবিষ্যতে। বুঝবে।

এখনই কি বুঝছি না নাকি?

বলে পরমা সযত্নে তাকে খাবার বেড়ে দিল। একটা বাটিতে খানিকটা চাটনি দিয়ে বলল, এটা মুখে দিয়ে দিয়ে খাবেন, রুচি হবে।

খেতে খেতে ধৃতি বলল, একটা মুশকিল হয়েছে পরমা।

কী মুশকিল?

টুপুর মা নেমন্তন্ন করেছে কাল।

কে টুপুর মা?

ওই যে সেদিন সুন্দর মেয়েটার ফোটো দেখলে, মনে নেই?

ওঃ, তা সে তো মরে গেছে।
বটেই তো, কিন্তু তার মা তো মরেনি!
নেমন্তন্নটা কীসের?
বোধহয় একটু আলাপ করতে চান।
আলাপও নেই?
নাঃ, শুধু ফোনে কথা হত।
কী বলতে চায় মহিলা?
তা কী করে বলব? হয়তো টুপুর কথা।
বেচারা।
যাব কি না ভাবছি।
যাবেন না কেন?
একটু ভয়-ভয় করছে। অচেনা বাড়ি, অচেনা ফ্যামিলি...
তাতে কী, আলাপ হলেই অচেনা কেটে গিয়ে চেনা হয়ে যাবে। আপনি অত ভিতু কেন?
আমি খুব ভিতু বুঝি?
ভিতু নন? আমার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন।
ধৃতি চোখদুটো একটু বুজে রেখে খুব নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোচটি কে বলো তো!
কোচ। কীসের কোচ?
তোমাকে এইসব আধুনিক কথাবার্তার ট্রেনিং দিচ্ছে কে?
কেন? আমার বুঝি কথা আসে না?
খুব আসে, হাড়ে-হাড়ে আসে, কিন্তু ভাই বন্ধুপত্নী, তুমি তো এত প্রগতিশীলা ছিলে না এতদিন!
হচ্ছি। আপনার পাল্লায় পড়ে। সে যাক গে, সব সময়ে অত ইয়ারকি ভাল নয়। ভদ্রমহিলা ডাকল কেন সেটা ভেবে দেখা ভাল।
আমি বলি কী পরমা, মেয়েছেলের কেস যখন তুমিও সঙ্গে চলো।
আমি! ওমা, আমাকে তো নেমন্তন্ন করেনি!
গুলি মারো নেমন্তন্ন।
তা হলে কী বলে গিয়ে দাঁড়াব? একটা কিছু পরিচয় তো চাই।
বউ বলেই চালিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি যে ব্যাচেলর তা ভদ্রমহিলা জানেন।
ইস্, ওঁর বউ সাজতে বয়ে গেছে।
একটা কাজ করা যাক পরমা, গিয়ে দু'জনে আগে হাজির হই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।
পরমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ইচ্ছে করছে না এমন নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। গিয়ে দেখেই আসুন না।
ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, তাই হবে। বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ।
পরমা কিছুক্ষণ ধৃতির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, রাত হয়েছে। রোগা শরীরে আর জেগে থাকতে হবে না। শুয়ে পড়ুন গে। শুয়ে শুয়ে ভাবুন।
ধৃতি উঠল।

এত নিরস্ত্র এবং এত অসহায় ধৃতি এর আগে কদাচিৎ বোধ করেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও অকারণ দুর্বলতা বা ভয়-ভীতি নেই। কিন্তু এই এলাহাবাদি ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা রহস্যময়তার বোধ জমেছে ধৃতির। মহিলার কথাবার্তায় উলটোপালটা ব্যাপার আছে, মানসিক ভারসাম্যও হয়তো নেই। একটু যেন বেশি গায়ে-পড়া। তাছাড়া এলাহাবাদের ট্রাঙ্ককল, চিঠিতে পোস্ট অফিসের ছাপ এবং টুপুর ছবি এর সব ক'টাই সন্দেহজনক। কাজেই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হতে আজ ধৃতির খুব কিন্তু-কিন্তু লাগছিল।

সকালে ধৃতি চা খেল তিন কাপ।

পরমা বলল, চায়ের কেজি কত তা মশাইয়ের জানা আছে?

কেন, চা-টা তো সেদিন আমিই কিনে আনলাম। লপচুর হাফ কেজি।

ও, আপনার পয়সায় কেনাটা বুঝি কেনা নয়?

মাইরি, তুমি জ্বালাতেও পারো।

আর শুধু চা কিনলেই তো হবে না। দুধ চিনি এসবও লাগে।

পরেরবার চিনি দুধ ছাড়াই দিয়ো।

আর দিচ্ছিই না। চিনি দুধ লিকার কোনওটাই পাচ্ছেন না আপনি।

আজ নার্ভ শক্ত রাখতে হবে পরমা। আজ এক রহস্যময়ীর সঙ্গে রহস্যময় সাক্ষাৎকার।

আহা, রহস্যের রস তো খুব। মাঝবয়সি আধপাগল এক মহিলা, তার আবার রহস্য কীসের? খুব যে রহস্যের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে।

স্বপ্ন নয় হে, স্বপ্ন হলে তো বাঁচতাম। কী কুক্ষণেই যে নেমন্তন্নটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম।

আবার ফোন করুন না, নেমন্তন্ন ক্যানসেল করে দিন। ভিতুর ডিমদের এইসব কাজ করতে যাওয়াই ঠিক নয়। এখন দয়া করে আসুন, রোগা শরীরে খালিপেটে চা না গিলে একটু খাবার খেয়ে উদ্ধার করুন।

তোমার ব্রেকফাস্টের মেনু কী?

লুচি আর আলুভাজা।

কুকিং মিডিয়াম কি বনস্পতি নাকি?

কেন? গাওয়া ঘি চাই নাকি? গরিবের বাড়ি এটা, মনে থাকে না কেন? এখনও ফ্ল্যাটের দাম শোধ হয়নি।

ধৃতি ওঠার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ছেলেবেলায় কখনও এই অখাদ্যটা কারও বাড়িতে তেমন ঢুকতে দেখিনি। বনস্পতি হল পোস্ট-পার্টিশন বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সিনেমা। কে ওটা আবিষ্কার করেছে জানো?

না। গরিবের কোনও বন্ধু হবে।

তার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

আর বনস্পতির নিন্দে করতে হবে না। আমাদের পেটে সব সয়।

ছাই সয়। সাক্ষাৎ বিষ।

আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। রুগি মানুষকে বনস্পতি খাওয়াব আমি তেমন আহাম্মক নই। ময়দায় ঘিয়ের ময়েন দিয়ে বাদাম তেলে ভাজা হচ্ছে। ভয় নেই, আসুন।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, এর চেয়ে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট ভাল ছিল পরমা। টোস্ট, ডিম, কফি।

কাল থেকে তাই হবে। খাটুনিও কম।

ধৃতি উঠল, খেল। তারপর দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে স্নান করে প্রস্তুত হতে লাগল।

পরমা হঠাৎ উড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, কী ড্রেস পরে যাচ্ছেন দেখি! এ মা! ওই সাদা শার্ট আর ভুসকো প্যান্ট! আপনার রুচি-টুচি সব যাচ্ছে কোথায় বলুন তো!

কেন, এই তো বেশ। তা হলে কী পরব?

সেই নেভি ব্লু প্যান্টটা কোথায়?

আছে।

আর মাল্টি কালার স্ট্রাইপ শার্ট?

আছে বোধহয়।

ওই দুটো পরে যান।

অগত্যা ধৃতি তাই পরল। পরমা দেখে-টেখে বলল, মন্দ দেখাচ্ছে না। রুগ্ন ভাবটা আর চোখে পড়বে না বোধহয়।

ধৃতির পোশাকের দিকে মন ছিল না। মনে উদ্‌বেগ, অস্বস্তি। রওনা হওয়ার সময় পরমা দরজার কাছে এসে বলল, অফিসে গিয়ে একবার ফোন করবেন। লালিদের ফ্ল্যাটে আমি ফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

কেন পরমা, ফোন করব কেন?

একটু অ্যাংজাইটি হচ্ছে।

এই যে এতক্ষণ আমাকে সাহস দিচ্ছিলে!

ভয়ের কিছু নেই জানি, কিন্তু আপনার ভয় দেখে ভয় হচ্ছে। করবেন তো ফোন? তিনটে পনেরো মিনিটে।

আচ্ছা। তা হলে আমার জন্য তুমি ভাবো?

যা নাবালক! ভাবতে হয়।

ধৃতি একটু হালকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টুপুর মায়ের ঠিকানা খুব জটিল নয়। বড়লোকদের পাড়ায় বাস। সুতরাং খুঁজতে অসুবিধে হল না।

ট্যাকসি থেকে নেমে ধৃতি কিছুক্ষণ হাঁ করে বাড়িটা দেখল। বিশাল এবং পুরনো বাড়ি। জরার চিহ্ন থাকলেও জীর্ণ নয় মোটেই। সামনেই বিশাল ফটক। ফটকের ওপাশ থেকেই অন্তত দশ গজ চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু প্রকাণ্ড বারান্দায়। বারান্দায় মস্ত গোলাকার থামের বাহার। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু এখনকার পাঁচতলাকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে বসে আছে।

ফটকে প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক দারোয়ান মোতায়েন দেখে ধৃতি আরও ঘাবড়ে গেল।

দারোয়ান ধৃতিকে ট্যাকসি থেকে নামতে দেখেছে। উপরন্তু ওর পোশাক-আশাক এবং চেহারাটা বোধহয় দারোয়ানের খুব খারাপ লাগল না। ধৃতি সামনে যেতেই টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম গোছের ভঙ্গি করে ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে চাইছেন?

টুপুর মা। মানে—

দারোয়ান গেটটা হড়াস করে খুলে দিয়ে বলল, যান।

ধৃতি অবাক হল। যাবে, কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়িটা দেখে তো মনে হচ্ছে সাতমহলা। এর কোন মহল্লায় কে থাকে তা কে জানে?

ধৃতি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার কেমন যেন এই দুপুরেও গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে খুব তীক্ষ্ণ নজরে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে ধৃতি দেখল, একখানা হলঘরের মতো প্রকাণ্ড জায়গা। সবটাই মার্বেলের মেঝে। বারান্দার তিনদিকেই প্রকাণ্ড তিনটে কাঠের ভারী পাল্লার দরজা। দু'পাশের দরজা বন্ধ, শুধু সামনেরটা খোলা।

ধৃতি পায়ে পায়ে এগোল।

দরজার মুখে দ্বিধান্বিত ধৃতি দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম পুরনো জমিদারি কায়দার বাড়ি ধৃতি দূর থেকে দেখেছে অনেক, তবে কখনও ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি। এইসব বাড়িতেই কি একদা ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বাইজি নাচত আর উঠত ঝনাঝন মোহরের প্যালা ফেলার শব্দ? এইসব বাড়িরই অন্দরমহলে কি গভীর রাত অবধি স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে থেকে অবিরল অশ্রুমোচন করত অন্তঃপুরিকারা? চাষির গ্রাস কেড়ে নিয়েই কি একদা গড়ে ওঠেনি এইসব ইমারত? এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ঢুকে আছে পাপ আর অভিশাপ?

বাইরের ঘরটা বিশাল। এতই বিশাল যে তাতে একটা বাস্কেটবলের কোর্ট বসানো যায়। সিলিং প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে। কিন্তু আসবাব তেমন কিছু নেই। কয়েকটা পুরনো প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। ঘরের মাঝখানে একটা নিচু তক্তপোশে সাদা চাদর পাতা, কয়েকটা কাঠের চেয়ার, মেঝেয় ফাটল, দাগ। দেয়ালে অনেক জায়গায় মেরামতির তাপ্পি। তবু বোঝা যায়, এ বাড়ির সুদিন অতীত হলেও একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়নি।

ধৃতি কড়া নাড়ল না বা কাউকে ডাকার চেষ্টা করল না। কারণ ধারে-কাছে কেউ নেই। ঘরটা ফাঁকা। ছাদের কাছ বরাবর কড়ি-বরগায় পায়রারা বকবক করছে। কিন্তু ধৃতির মনে হচ্ছিল, ঘর ফাঁকা হলেও কেউ কোনও এক রন্ধ্র-পথে বা ঘুলঘুলি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকে ঠিকই লক্ষ করছে। এমন মনে করার কারণ নেই, অনুভূতি বলে একটা জিনিস তো আছেই।

ধৃতি সাহসী নয়, আবার খুব ভিতুও নয়। মাঝামাঝি। তার বুক একটু দুরুদুরু করছিল ঠিকই, তবে সেটা অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশ বলে। কয়েক বছর আগে এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে গিয়ে সে একটা ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেই বাড়ির এক সন্দিগ্ধ ও খিটকেলে বুড়ো তাকে বাইরের ঘরে ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রেখে বিস্তর জেরা করে এবং নানাবিধ প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়। ধৃতি সেই থেকে অচেনা বাড়িতে ঢুকতে একটু অস্বস্তি বোধ করে আসছে।

প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। যাতায়াতকারী কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু ধৃতি একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ক্ষীণ হলেও নির্ভুল শব্দ। কাছেপিঠে কোথাও, হলঘরের আশেপাশের কোনও ঘরে কারা যেন টেবিল টেনিস খেলছে।

বুকপকেটের আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে একবার দেখে নেয় ধৃতি। সে এক মস্ত খবরের কাগজের সাব-এডিটর। এই পরিচয়-পত্রখানা যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশে কাজে লাগে। রেলের রিজার্ভেশনে, থানায়, বাইরের রিপোর্টিং-এ। এ বাড়িতে কেউ তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তুললে কাজে লাগাতে পারে।

ধৃতি ভিতরে ঢুকল এবং শব্দটির অনুসরণ করে বাঁদিকে এগোল। হলঘরের পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বাটে। সবুজ বোর্ডের দু'পাশে একটি কিশোর ও একটি কিশোরী অখণ্ড মনোযোগে টেবিল-টেনিস খেলছে। মেয়েটির পরনে লাল শার্ট এবং জিনসের শর্টস। ছেলেটির পরনেও জিনসের শর্টস, গায়ে হলুদ টি-শার্ট। দু'জনেরই নীল কেডস্। মেয়েটির চুল স্টেপিং করে কাটা। ছেলেটির চুল লম্বা। দু'জনের বয়সই পনেরো-ষোলোর মধ্যে।

ধৃতি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে প্রথম লক্ষ করল মেয়েটিই। একটা মারের পর বল কুড়িয়ে সোজা হয়েই থমকে গেল। তারপর রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল, হুম ডু-ইয়া ওয়ান্ট?

কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে শেখা হেঁচকি তোলা ইংরিজি নয়। রীতিমতো মার্কিন অ্যাকসেন্ট।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

মেয়েটা ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, আছে বোধহয়। দোতলায়। পিছন দিকে সিঁড়ি আছে। গিয়ে দেখুন।

ধৃতি তবু দ্বিধার সঙ্গে বলল, ভিতরে কি খবর না দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?

মেয়েটি সার্ভ করার জন্য হাতের স্থির তোলায় বলটা রেখে বাঘিনীর মতো খাপ পেতে শরীরটাকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছেড়ে দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল। সেই অবস্থাতেই ধৃতির দিকে একঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, উড শি মাইন্ড? নো প্রবলেম। শি ইজ আ বিট গা-গা। গো অ্যাহেড। আপস্টেয়ার্স, ফাস্ট রাইট হ্যান্ড রুম। নোবডি উইল মাইন্ড। নান মাইন্ডস হিয়ার। নান হ্যাজ এনিথিং লাইক মাইন্ড।

ধৃতি একসঙ্গে মেয়েটির মুখে এত কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এত কথার মানেই হয় না। তার মনে হল, এরা দুটি ভাইবোন কোনও সমৃদ্ধ দেশে, হয়তো আমেরিকায় থাকে। এ দেশে এসেছে ছুটি কাটাতে এবং সময়টা খুব ভাল কাটাচ্ছে না। নিজেদের বাড়ি কি এটা ওদের? হলে বলতে হবে, নিজেদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে ওরা মোটেই খুশি নয়। সেই বিরক্তিটাই তার কাছে প্রকাশ করল।

বেশ খোলা হাতে টপ স্পিন সার্ভ করল মেয়েটি। ছেলেটি পেন হোল্ড গ্রিপ-এ খেলছে। পিছনে দু'পা সরে গিয়ে সপাটে স্ম্যাশ করল। মেয়েটি টেবিল থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে স্ম্যাশটা তুলে দিল টেবিলে...

ধৃতির হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল এদের এলেম দেখে। তবে সে র‍্যালিটা দাঁড়িয়ে দেখল। মেয়েটাই তুখোড়। বারবার ছেলেটার ব্যাক হ্যান্ডে ফেলছে বল। পেন হোল্ড গ্রিপ-এ ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না বলে ছেলেটিকে হাত ঘুরিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হচ্ছিল। মেয়েটা পয়েন্ট নিয়ে নিল।

ধৃতি এটুকু দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে সিঁড়ি আছে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে যেতে হবে তা মেয়েটা বলে দেয়নি। ধৃতি হলঘরটা পার হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি মারতেই পুরনো চওড়া পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দেখতে পায়। বাড়িটা খুবই নির্জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু সাহস সঞ্চয় করতেই হবে। নইলে এতটা এসে ফিরে গেলে সে নিজের কাছেই নিজে কাপুরুষ থেকে যাবে চিরকাল।

সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল ধৃতি। এবং ওপরে উঠে মুখোমুখি হঠাৎ একজন দাসী গোছের মহিলাকে দেখতে পেল সে। হাতে একটা জলের বালতি।

ধৃতি খুব নরম গলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

ঝি খুব যেন অবাক হয়েছে এমন মুখ করে বলল, কার মা?

টুপুর মা। আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ঝি-টার অবাক ভাব গেল না। বলল, আসতে বলেছিলেন? ওমা! সে কী গো?

এই উক্তির পর কী বলা যায় তা ধৃতির মাথায় এল না। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

ঝি-টা একটু হেসে বলল, আসতে বলবে কী? সে তো পাগল।

গা-গা বলতে নীচের মেয়েটা তা হলে বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু পাগল কেন হবে টুপুর মা? একটু ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু খুব পাগল কি?

কোন ঘরটা বলুন তো?— ধৃতি জিজ্ঞেস করে।

ওই তো দরজা। ঠেলে ঢুকে যান।

ধৃতির হাত-পা ঠান্ডা আর অবশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ নয় তো? কিন্তু সামান্য একটু রোখও আছে ধৃতির। যে কোনও ঘটনারই শেষ দেখতে ভালবাসে।

দ্বিধা ঝেড়ে সে ডান দিকের দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড ঘর। খুব উঁচু সিলিং। মেঝে থেকে জানালা। ঘরের মধ্যে এক বিশাল পালঙ্ক, কয়েকটা পুরনো আমলের আসবাব, অর্গান, ডেস্ক, চেয়ার, বুকশেলফ, আলনা, থ্রি পিস আয়নার ড্রেসিং টেবিল, আরও কত কী।

খাটের বিছানায় এক প্রৌঢ়া রোগা-ভোগা চেহারার মহিলা শুয়ে আছেন। চোখ বোজা। গলা পর্যন্ত টানা লেপ। বালিশে কাঁচা-পাকা চুলের ঢল। একসময়ে সুন্দরী ছিলেন, এখনও বোঝা যায়।

ধৃতি শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করল যাতে উনি চোখ মেলেন।

মেললেন এবং ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, কে?

আমি ধৃতি। ধৃতি রায়।

ধৃতি রায়! কে বলো তো তুমি?

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

না তো! হ্যারিকেনটা উসকে দাও তো। তোমাকে দেখি।

এখন তো দিনের আলো।

কোথায় আলো? আলো আবার কবে ছিল? তোমার সাঁইথিয়ায় বাড়ি ছিল না?

না।

টুপুর মা উঠে বসেছেন। চোখে খর অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কার খোঁজে এসেছেন?

আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন ফোনে। মনে নেই?

ও তাই বলো। তা বোসো বোসো। আমি খুব ফোনের শব্দ পাই, বুঝলে! কেন পাই বলো তো! এত ফোন কে কাকে করে জানো?

না।

টুপুর মা'র পরনে থান, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে প্রাচীন সব আঁকিবুকি। টুপুর মা'র যে গলা ধৃতি টেলিফোনে শুনেছে এঁর গলা মোটেই তেমন নয়।

তুমি কে বললে?

ধৃতি রায়। আমি খবরের কাগজে লিখি।

খবরের কাগজ! এখন পুরনো খবরের কাগজ কত করে কিলো যাচ্ছে বলো তো! আমাকে সেদিন একটা কাগজওয়ালা খুব ঠকিয়ে গেছে।

জানি না।

তোমার দাঁড়িপাল্লা কোথায়? বস্তা কোথায়?

আমি কাগজওয়ালা নই।

শিশি-বোতল নেবে? অনেক আছে।

ধৃতি ফাঁপড়ে পড়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সন্দেহের লেশ নেই, সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভুলে পা দিয়েছে। তবু মরিয়া হয়ে সে বলল, আপনি আমাকে ফোন করে টুপুর খবর দিয়েছিলেন, মনে নেই? এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ককল।

টুপুর মা অন্যদিকে চেয়ে বললেন, সে কথাই তো বলছি তোমাকে বাগদি বউ, অত ঘ্যানাতে নেই। পুরুষমানুষ কি ঘ্যানানি ভালবাসে?

ধৃতি একটু একটু ঘামছে।

আচমকাই সে আয়নায় দেখল, দরজাটা সাবধানে ফাঁক করে ঝি-টা উঁকি দিল।

শুনছেন?

ধৃতি ফিরে চেয়ে বলল, কী?

উনি কি আপনার কেউ হন?

না। চেনাও নয়। ফোন পেয়ে এসেছি।

আপনি একটু বাইরে আসুন। মেজ গিন্নিমা ডাকছেন।

ধৃতি হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ল। টুপুর মা তাকে আর আমল না দিয়ে ফের গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়ল।

সাবধানে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঝি বলল, ওই ঘর, চলে যান।

মেজ গিন্নিমা কে?

উনিই কর্ত্রী। যান না।

ধৃতি এগোল। এ ঘরের দরজা খোলা এবং সে ঘরে ঢোকার আগেই পর্দা সরিয়ে একজন অত্যন্ত ফরসা ও মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আসুন ভাই, ভিতরে আসুন।

ঘরটা বেশ আধুনিক কায়দায় সাজানো। যদিও প্রকাণ্ড, সোফা সেট আছে, দেয়ালে যামিনী রায় আছে।

তাকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো! টুপুর মা নাকি আপনাকে ডেকে এনেছে? কী কাণ্ড।

ধৃতি থমথমে মুখ করে বলল, কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে আপনি শুনতে চাইলে ব্যাপারটা ডিটেলসে বলতে পারি।

বলুন না। আগে একটু চা খেয়ে নিন, কেমন?

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। একটু বাদে চা এল, একটু সন্দেশের জলখাবারও।

ধৃতি শুধু চা নিল, তারপর মিনিট পনেরো ধরে আদ্যোপান্ত বলে গেল ঘটনাটা।

ভদ্রমহিলা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। কোনও উঃ, আঃ, আহা, তাই নাকি, ওমা এসব বললেন না। সব শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার আশ্চর্য লাগছে কী জানেন?

কী বলুন তো?

টুপুর ঘটনাটা মোটেই মিথ্যে নয়। এরকমই ঘটেছিল। তবে তা ঘটেছিল বছর সাতেক আগে। সেই থেকে টুপুর মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। এখন আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি। যতদিন বাঁচবেন ওরকমই থাকবেন। তবে গল্পটার শেষটাই রহস্য। আপনাকে যে ফোন করত সে আর যেই হোক টুপুর মা নয়।

তা হলে কে?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, উনি ঘর থেকেই বেরোন না। ফোন করতে জানেনও না বোধহয়। তবে যেই করুক সে আমাদের অনেক খবর রাখে।

টুপু কি সত্যিই মারা গেছে?

মাথা নেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলা অসম্ভব। পুলিশও কোনও হদিশ পায়নি। কোথায় যে গেল মেয়েটা।

কিছু মাইন্ড করবেন না, উনি মানে টুপুর মা আপনার কে হন?

আমার বড় জা। ওঁরা তিন ভাই। বড় জন নেই, ছোট অর্থাৎ আমার দেওর আমেরিকায় থাকে। ওখানকারই সিটিজেন। ছুটি কাটাতে এসেছে। দু'ভাই মিলে আজ মাছ ধরতে গেছে ব্যান্ডেলে।

নীচের তলায় যে দুটি ছেলেমেয়েকে টেবিল টেনিস খেলতে দেখলাম ওরা কারা? আপনার দেওরের ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ।— বলে মেজগিন্নি একটু তেড়চা হেসে বললেন, একেবারে সাহেব-মেম। এ দেশের কিছুই পছন্দ নয়। কেবল নাক সিঁটকে থাকে সবসময়।

আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

মেয়ে শান্তিনিকেতনে। ছেলে দু'টি। দু'জনেই বাঙ্গালোরে ডাক্তারি পড়ে।

বাঙ্গালোরে কেন?

আমরা ওখানেই থাকতাম। আমার হাজব্যান্ডের তখন ওখানে একটা পার্টনারশিপের ব্যাবসা

ছিল। উনি একটু খেয়ালি। হঠাৎ 'ভাল লাগছে না' বলে নিজের শেয়ার বেচে চলে এলেন। ছেলেরা হস্টেলে থাকে।

আর কেউ নেই এ বাড়িতে?

মেজগিন্নি খুব অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, টুপুর মা সেজে ফোন করার মতো কেউ তো এ বাড়িতে আছে বলে মনে হয় না!

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, না, ঠিক তা বলিনি। আমি ব্যাপারটায় নিজেকে জড়াতেও চাইছিলাম না। বুঝতে পারছি না ঘটনার মানে কী?

হয়তো কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো আপনার পরিচিতা কেউ। তবে আশ্চর্যের কথা হল, টুপু সম্পর্কে সে কিছু জানে। যাক গে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখে গেলেন, এখন ঘটনাটা ভুলে যেতে চেষ্টা করুন।

মেজগিন্নিকে ধৃতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোলগাল ফরসা, জমিদারগিন্নি ধরনের চেহারা। বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। চোখে মুখে বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি খুব হতাশা বোধ করে উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা, আজ চলি।

আসুন ভাই। আপনার খবরের কাগজের লেখা আমিও কিন্তু পড়েছি। আপনি তো ফেমাস লোক।

ধৃতি ক্লিষ্ট একটু হাসল।

ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তার রিপোর্টটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আবার কখনও ইচ্ছে হলে আসবেন।

আচ্ছা।

ধৃতি একা ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ক্লান্ত লাগছে। হতাশ লাগছে। সে একটা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সেটা যে কী তা স্পষ্ট নয়। তার বদলে যা দেখল তা বিকট।

ধৃতি যখন মাঝ-সিঁড়িতে তখন তলা থেকে দুদ্দাড় করে সেই কিশোরী মেয়েটি উঠে আসছিল, পথ দিতে একটু সরে দাঁড়াল ধৃতি। মেয়েটা উঠতে উঠতে তাকে দেখে থমকে গেল। মুখে জবজব করছে ঘাম। একটু লালচে মুখ।

ডিড ইয়া মিট হার?

হ্যাঁ।

মেয়েটা হঠাৎ একটু হাসল। সুন্দর মুখশ্রী যেন আরও ফুটফুটে হয়ে উঠল।

পাগলি নয়?

ধৃতিও একটু হাসল। বলল, তাই তো মনে হল।

আপনি কি কোনও রিলেটিভ?

না! পরিচিত।

টেক হার সামহোয়ার। নার্সিংহোম বা মেন্টাল হোম কোথাও নিয়ে গেলেই তো হয়। জেঠু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, তাই দেওয়া উচিত। আচ্ছা, এ বাড়ির ফোনটা কোন ঘরে?

জেঠুর ঘরে। ফোন করবেন? আসুন না আমার সঙ্গে।

না। তার দরকার নেই। ভাবছিলাম ফোন করলে টুপুর মাকে পাওয়া যাবে কি না। আচ্ছা নম্বরটা কত?

মেয়েটা নম্বর বলল। ধৃতি মনে মনে দু'-একবার আউড়ে মুখস্থ করে নিল।

মেয়েটা বলল, বাই।

তারপর উঠে গেল দ্রুত পায়ে।

বাই।–– বলে ধৃতি নেমে এল নীচে। মনটা বিস্বাদে ভরে গেছে। হতাশা এবং গ্লানি বোধ করছে সে। কেন যে, কে জানে! এতটা আশাহত হওয়ার মতো কিছু নয়। ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই হয়। পারছে না। তার মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জোক নয়, ভিতরে আর একটা কিছু আছে। সেটা সে ধরতে পারল না।

মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হয়েই ধৃতি যখন বেরোতে যাচ্ছিল তখন দেখল, হলঘরে সেই ঝি-টা মেঝে মুছছে উবু হয়ে বসে। তাকে দেখে কৌতূহলভরে একটু চেয়ে রইল।

ধৃতি তাকে উপেক্ষা করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, একজন যে বসে আছে আপনার জন্য।

ধৃতি চমকে উঠে বলল, কে?

ঝি ফিক করে হেসে বলল, বাঃ বুড়োকর্তা আছে না?

সে আবার কে?

সে-ই তো সব। দেখা করবেন না?

বুড়ো মানুষ, খিটখিটে নন তো?

না গো, তবে খুব বকবক করেন। নতুন মানুষ পেলে তো কথাই নেই। ওইদিকে ঘর। চলে যান।

হলঘরের ডানপ্রান্তে একটা ভেজানো কপাট দেখা যাচ্ছিল। মরিয়া ধৃতি পায়ে পায়ে গিয়ে দরজায় শব্দ করল।

এসো, চলে এসো। এভরিবডি অলওয়েজ ওয়েলকম।

ধৃতি দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। লম্বাটে এবং বেশ বড়সড় ঘরখানা। দক্ষিণের জানালা দরজা খোলা বলে ধপ ধপ করছে আলো। একখানা মজবুত ও ভারী চৌকির ওপর সাদা বিছানা পাতা। দরজার পাশেই একখানা ডেক চেয়ার। তাতে সাদা দাড়িওয়ালা এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারার মানুষ বসে আছেন। পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে একটা সুতির গেঞ্জির ওপর একটা উলের গেঞ্জি। শরীরের কাঠামোটা প্রকাণ্ড। বোঝা যায় একসময়ে খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এখনও শরীরে মেদের সঞ্চার নেই। বয়স আশি বা তার ওপর। কিন্তু চোখে গোল রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমার ভিতরে দুটি চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ এবং কৌতুকে ভরা।

মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার পাতা। সেটা দেখিয়ে বললেন, বোসো। এ বাড়িতে নতুন কেউ এলেই আমি তাকে ডেকে পাঠাই। কিছু মনে করোনি তো?

ধৃতি বসল এবং মাথা নেড়ে বলল, না।

কার কাছে এসেছিলে?

ধৃতি হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমি একটা ভুল খবর পেয়ে এসেছিলাম। যার কাছে এসেছিলাম আসলে তার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই।

একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন! কার কাছে এসেছিলে বলো তো?

টুপুর মা। ওই নাম নিয়ে কে যেন আমাকে অফিসে প্রায়ই টেলিফোন করত। কালও টেলিফোনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই জন্যই আসা।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে গেলেন। সামনের শূন্যে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ স্বপ্নাতুর ও ভাসা-ভাসা হয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমাকে কি সে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল?

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সেইরকমই। তবে সেটা বড় কথা নয়।

বুড়োকর্তা তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই দুপুরের খাওয়া খেয়ে আসোনি?

আপনি খাওয়ার ব্যাপারটা বড় করে দেখছেন কেন? ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

বুড়োকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে একটু বুঝতে দাও। বুড়ো হলে মগজে ধোঁয়া জমে যায়

বটে, তবু অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। তোমার নাম কী? কী করো?

ধৃতি বলল।

বুড়োকর্তা মাথা ওপর নীচে দুলিয়ে বললেন, জানি। তোমার লেখা আমি পড়েছি। খবরের কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়া আমার রোজকার কাজ।

ধৃতি বিনয়ে একটু মাথা নোয়াল। তারপর বলল, আপনি অযথা এই ঘটনাটা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হবেন না। কেউ একটু আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেয়েছিল।

রসিকতা!— বলে বুড়োকর্তা একটু অবাক হলেন যেন। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, এমনও হতে পারে যে সে কোনও একটি সত্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। নইলে একটি মেয়ে তোমাকে বারবার ফোন করবে কেন?

সেটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

তাছাড়া সে সবটাই কিন্তু মিথ্যে বলেনি। আমার নাতনি টুপুর সত্যিই কোনও ট্রেস নেই কয়েক বছর। আমরা ধরে নিয়েছি যে সে মারা গেছে। সম্ভবত খুন হয়েছে। এগুলো তো মিথ্যে নয়।

সম্ভবত সে ঘটনাটা জানে।

তা তো জানেই। কিন্তু কে হতে পারে সেটাই ভাবছি।

হয়তো আপনাদের চেনা কেউ।

তোমার কি আজ কোনও জরুরি কাজ আছে?

কেন বলুন তো?

যদি সংকোচ বোধ না করো তবে আমার সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও। যে-ই তোমাকে নিমন্ত্রণ করুক সে এ বাড়িকে জড়িয়েই তো করেছে। নিমন্ত্রণটা অন্তত সত্যিকারের হোক। আমার রান্না আলাদা হয়, আলাদা ব্রাহ্মণ পাচক রাঁধে, আমি ওদের সঙ্গে খাই না। এ ঘরেই সব ব্যবস্থা হবে।

আমার একদম খিদে নেই।

তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ এবং এ বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইছ বলে খিদে টের পাচ্ছ না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার মনে হয়, তোমাকে যে এতদূর টেনে এনেছে তার কোনও পজিটিভ উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আমি তোমাকে কিছু সাহায্যও করতে পারব, যদি অবশ্য টুপুর রহস্য ভেদ করতে আগ্রহ বোধ করো।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমার আগ্রহ নেই। টুপুর কেসটা মনে হয় ক্লোজড চ্যাপ্টার। আর পুলিশই যখন কিছু পারেনি তখন আমার কিছু করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি ডিটেকটিভ নই।

বুড়োকর্তা খুব সমঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, ঠিক কথা। অর্বাচীনের মতো দুম করে অন্য কারও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ভাল নয়। তবে এই বুড়ো মানুষটার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে দুপুরবেলা তোমার সঙ্গে বসে দু'টি খেতে, তা হলে তোমার আপত্তি হবে কেন?

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, একটিমাত্র কারণে। যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সে একটা ফ্রড। আমি সেই নিমন্ত্রণ মানতে পারি না।

ফ্রড!— বুড়োকর্তা আবার অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ঘটনাটা আমাকে আর একটু ডিটেলসে বলতে পারো? যদি বিব্রত বোধ না করো?

ধৃতি আবার একটু দম নিল। তারপর সেই নাইট ডিউটির রাত থেকে শুরু করে সব ঘটনাই বলে গেল। বুড়োকর্তা চুপ করে শুনলেন। সবটা শুনে তারপর মুখ খুললেন।

ফোটোটা তোমার কাছে আছে?

আছে।

দেখাতে পারো?

ধৃতির ব্যাগে ফোটোটা প্রায় সবসময়েই থাকে। সে বের করে বুড়োকর্তার হাতে দিল।

উনি একপলক তাকিয়েই বললেন, টুপুই। কোনও সন্দেহ নেই।

ফোটোটা ফেরত নিয়ে ধৃতি বলে, এই ফোটো কার হাতে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বুড়োকর্তা হাত উলটে অসহায় ভাব করে বললেন, কে বলতে পারে তা? চিঠিটা দেখাতো পারো?

পারি।— বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দিল।

বুড়োকর্তা চিঠিটা দেখলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর পড়লেন। ফের মাথা নেড়ে বললেন, হাতের লেখা কার কেমন তা আমি জানি না। সুতরাং এ বাড়ির কেউ লিখে থাকলেও আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

ধৃতি মৃদু হেসে বলল, চিনেই বা লাভ কী? ব্যাপারটা সিরিয়াসলি না ধরলেই হয়।

তা বটে। তবে তুমি যত সহজে উড়িয়ে দিতে পারছ আমার পক্ষে তা অত সহজ নয়। ঘটনাটা তো এই বংশেরই। টুপুর সমস্যার কোনও সমাধানও তো হয়নি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই চিঠি আর ফোটো আপনিই রেখে দিন বরং।

লাভ কী? আমি বুড়ো, অক্ষম। আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব? বরং তোমার কাছেই থাক। তুমি হয়তো বা কোনওদিন কোনও সূত্র পেয়ে যেতে পারো।

বলছেন যখন থাক। কিন্তু আমার মনে হয় এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

এবার খেতে দিতে বলি?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। আমি খাব না। প্লিজ, আমাকে আপনি জোর করবেন না।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম রয়ে রইলেন ফের। তারপর দাড়ি গোঁফের ফাঁকে চমৎকার একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ, যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বুড়োর কাছে এসো। তোমাকে আমার বেশ লাগল।

৯

অফিসে এসে ধৃতি আজ বহুক্ষণ আনমনা রইল। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়াল। তারপর ফের এসে বসে রইল টেলিফোনটার কাছে।

উমেশবাবু টেলিপ্রিন্টারের কপি কাটতে কাটতে তলচোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, আজ যেন একটু বিরহী-বিরহী দেখাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী?

বিরহই। বউ বাপের বাড়ি গেছে।

হুঁ। বাপের বাড়ি থেকে টোপর পরে গিয়ে নিজে টেনে আনো গে না! বিয়ে করতে মুরোদ লাগে বুঝলে! এত টাকা মাইনে পাও তবু বিয়ে করার সাহস হয় না কেন? পণপ্রথার ওপর খুব তো গরম গরম ফিচার ছাড়ছ, নিজে একটা অবলা জীবকে উদ্ধার করে দেখাও না! আমি যখন বিয়ে করি তখন চাকরি ছিল না, বাপের হোটেলে খেতাম। প্রথম চাকরি হল আটাশ টাকা মাইনেয়, বুঝলে...

কথার মাঝখানেই ফোন বাজল।

উমেশবাবু 'হ্যালো' বলেই ফোনটা ধৃতির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, নাও, বাপের বাড়ি থেকেই বোধহয় করছে ফোন।

ধৃতি একটু কেঁপে উঠল। বুকটা দুরুদুরু করল। ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, হ্যালো।

ওপাশে সেই কণ্ঠস্বর। একটু কোমল। একটু বিষণ্ণতর।

আপনি না খেয়েই চলে গেলেন।

আপনার লজ্জা করে না?

শুনুন, প্লিজ। রাগ করবেন না।

রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

জানি। আমার চেয়ে বেশি সে কথা আর কে জানে? তবু পায়ে পড়ি। রাগ করবেন না।

তা হলে আপনার পরিচয় দিন।

সেটা এখনই সম্ভব নয়। তবে আমি টুপুর মা নই।

তবে কি আপনি টুপু?

উঃ, কী যে সব বলছেন না! আপনার টেবিলের লোক নিশ্চয়ই শুনছে আর হাঁ করে চেয়ে আছে!

উমেশবাবু ঠিক হাঁ করে চেয়ে ছিলেন না। তবে স্বভাবসিদ্ধ তলচোখের চাউনিটা ধৃতির দিকেই নিবদ্ধ রেখেছেন। ধৃতি গলা আরও নামিয়ে বলল, পরিচয় না দিলে আর কোনও কথা নেই।

আপনি সবই জানতে পারবেন। শুধু একটু যদি সময় দেন।

ধৃতি দৃঢ় গলায় বলে, আর নয়। সময় এবং প্রশ্রয় আমি অনেক দিয়েছি আপনাকে। আজ রীতিমতো অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আপনি এতটা কেন করলেন? আমি তো কোনও ক্ষতি করিনি আপনার!

না। আপনার মতো ভদ্রলোক হয় না। আমি কাণ্ডটা করেছি শুধু টুপুর মায়ের অবস্থাটা আপনি নিজের চোখে দেখবেন বলে।

তাতে কী লাভ? আমি তো কিছু করতে পারব না।

আপনি কি জানেন যে টুপুর মায়ের অনেক সম্পত্তি?

না। আপনার মুখে শুনেছি মাত্র।

বিশ্বাস করুন, সম্পত্তি জিনিসটা খুবই খারাপ। টুপু ছিল সেই সম্পত্তির ওয়ারিশান।

তা হবে। শুনে আমার লাভ কী?

আপনার লাভ না হলেই কি কিছু নয়? ধৈর্য ধরে একটু শুনবেন তো!

শুনছি।

টুপুর মৃত্যুসংবাদ আমি রটাতে চেয়েছিলাম টুপুর জন্যেই। আমার বিশ্বাস টুপু বেঁচে আছে। কিন্তু ওর আত্মীয়রা ওকে বেঁচে থাকতে দিতে চায় না। মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে ও নিরাপদ। কেউ আর ওকে মারতে চাইবে না।

কেন? টুপুর মৃত্যুতে তাদের কী লাভ?

টুপু বেঁচে থাকলে ওদের চলবে কী করে? অত বড় বাড়ি দেখলেন, কিন্তু ফোঁপড়া। কিছু নেই ওদের। পুরো সংসার চলছে টুপুদের টাকায়।

এত কথা আমাকে বলছেন কেন?

তা জানি না। বোধহয় কাউকে জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি।

তা হলে আইনের আশ্রয় নিন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পুলিশেও যেতে পারেন।

আমি কে যে সেসব করতে যাব?

তবে আমিই বা কে?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, তা অবিশ্যি সত্যি। আপনাকে আজ হয়রান করা আমার হয়তো উচিত হয়নি, আপনি রেগে আছেন।

তা আছি।

আপনার অফিসে টেলিফোনের ডাইরেক্ট লাইন নেই? থাকলে দিন না। পি বি এক্স লাইনে তো কোনও কথাই গোপন থাকে না।

আর কী বলার আছে আপনার?

প্লিজ, দিন। আর টেলিফোনের কাছে থাকুন দয়া করে। আমি এক্ষুনি রিং করব।

ধৃতি রিপোর্টিং-এর একটা নম্বর দিল এবং ফোনটা রেখে রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাতে গজরাতে টেলিফোনটার কাছে গিয়ে বসল। এখন রিপোর্টিং ফাঁকা। প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে।

ফোনটা বাজতেই লাইন ধরল ধৃতি, হ্যাঁ বলুন।

আপনিই তো?

তবে আর কে হবে?

একটু হাসি শোনা গেল, না মানে ভীষণ ভয় করে। কী করছি কে জানে!

মজা করছেন। আর কী?

মোটেই না। রেগে আছেন বলে আপনি আমার সমস্যা বুঝতে চাইছেন না।

আপনি কে আগে বলুন। তারপর অন্য কথা।

বলব। একটু ধৈর্য ধরুন। আগে আর দু'-একটা কথা বলার আছে।

বলে ফেলুন, কিন্তু প্লিজ আর গল্প ফেঁদে বসবেন না।

টুপু একটু অন্যরকম ছিল। খুব ভাল মেয়ে নয়। অনেক অ্যাফেয়ার ছিল তার।

বিরক্ত হয়ে ধৃতি বলে, এরকম কথা আগেও শুনেছি।

আর একটু শুনুন। প্লিজ।

সংক্ষেপে বলুন।

টুপু অবশেষে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছেলেটা বাজে। কিন্তু টুপুও ভাল নয়। ছেলেটার রোজগারপাতি কিছু ছিল না। তবে খুব হ্যান্ডসাম ছিল, আর সেইটেই একমাত্র তার প্লাস পয়েন্ট। রূপনারায়ণপুরে তারা কিছুদিন ঘরভাড়া করেছিল। তারপর ছেলেটা পালায়। টুপুর তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। চেহারা সুন্দর বলে আবার একজন জুটে যায়। এ বড় কন্ট্রাক্টর। বিবাহিত। ক্রমে টুপু গাঁজা, মদ, ড্রাগের নেশা করতে থাকে। একসময়ে তার জীবনে একটা গভীর জটিল অন্ধকার নেমে আসে। সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল একবার। পারেনি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে এখনও বেঁচে আছে জানলেন কী করে?

জানি না। অনুমান করি।

অনুমানের কোনও বেস নেই?

আছে। টুপু এখনও রূপনারায়ণপুরে আছে বলে খবর পেয়েছি।

আপনি কি তাকে উদ্ধার করতে চান?

যদি চাই, তা হলে সেটা খুব অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে কি?

হচ্ছে। কারণ এসব মেয়েরা বড় একটা ফেরে না। মূল উপড়ে ফেললে কি গাছ বাঁচে?

যদি টুপুর অনুশোচনা এসে থাকে?

ধৃতি একটু হাসল, অনুশোচনা জিনিসটা ভাল। কিন্তু ফেরার পথটাও যে বন্ধ। সংসার তো তার জন্য কোল পেতে বসে নেই। সে এখন কীরকম জীবন কাটাচ্ছে তার খবর রাখেন?

খুব লোনলি।

পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই?

না। টুপুকে এখন সবাই ভয় পায়। তার রূপ গেছে, টাকা নেই, নেশা করে করে কেমন যেন বেকুবের মতোও হয়ে গেছে।

তার চলে কী করে?

যেভাবে চলে তাকে ঠিক চলা বলে না বোধহয়। ধরুন একরকম ভিক্ষে করেই চলে।

ভিক্ষে?

শুনেছি সে একটা নাচগানের স্কুল করছে।

কীরকম স্কুল? চালু?

সে সেই স্কুলে চাকরি করে। নাচ গান শেখায়, সামান্য মাইনে।

তবে তো সে ভালই আছে।

না, মোটেই ভাল নেই। সে ফিরতে চায়।

ফিরতে বাধা কী?

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোথায় সে ফিরবে?

কেন? নিজেদের এলাহাবাদের বাড়িতে?

সে বাড়ি আর ওদের দখলে নেই। বিক্রি হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়িতে আত্মীয়রা তাকে ঢুকতেই দেবে না। তার বিয়ে করারও আর চান্স নেই। তবু সে মাঝে মাঝে ফিরতে চায়। কোথায় তা বুঝতে পারে না।

আমি কী করতে পারি বলুন?

আমার অনুরোধ আপনি একবার ওকে দেখে আসুন।

আপনি কি পাগল? টুপুকে দেখতে যাব কেন?

আপনি তো হিউম্যান স্টোরি খুঁজে বেড়ান। টুপুর ঘটনা কি হিউম্যান স্টোরি নয়?

মোটেই নয়। একটা বেহেড বেলেল্লা মেয়ের অধঃপাতে যাওয়ার গপ্পো, তাও যদি সত্যি হয়ে থাকে। আমি এখনও টুপুর গল্প বিশ্বাস করি না। করলেও ইন্টারেস্টেড নই।

আমি যদি সঙ্গে যাই?

আপনি কে?

সেইটেই তো বলতে চাইছি না। তবে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

কাল কেন? আজই নয় কেন?

প্লিজ, কাল। আমি অফিসেই আসব। তিনটেয়। কাল দেরি করবেন না, লক্ষ্মীটি।

ফোন কেটে গেল।

টেবিলে ফিরে আসতেই উমেশবাবু একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, কেসটা কী হে?

আছে একটা কেস। তবে প্রেমঘটিত নয়।

মেয়েছেলের ব্যাপারে বেশি থেকো না। বরং একটা দেখেশুনে ঝুলে পড়ো। ল্যাঠা চুকে যাক। বাঙালির শেষ সম্বল বউয়ের আঁচল।

ধৃতি খুব কষ্টে মুখে একটু হাসি আনল। মনটা একদম হাসছে না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখল, পরমা বাপের বাড়ি গেছে। ডাইনিং টেবিলে একটা চিরকুট: ফোন করে করে অফিসের লাইন পেলাম না। চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। বাবার শরীর ভীষণ খারাপ। প্রেশার হাই। ফ্রিজে রান্নাবান্না আছে, গরম করে খেয়ে নেবেন। পরমা। পুঃ বাবার প্রেশারটা ডিপ্লোম্যাটিকও হতে পারে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে এক ফ্ল্যাটে আছে, এটা বোধহয় পছন্দ নয়। আপনি যে ভেজিটেবল তা তো আর সবাই জানে না! ওখানে কী হল? টুপুর মা কী বলল জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

রাতটা কোনওক্রমে কাটাল ধৃতি। কিছুক্ষণ হাক্সলি পড়ল, কিছুক্ষণ গীতা। ঘুমিয়ে অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে ভারী ভ্যাবলা লাগল নিজেকে।

যখন মুখ ধুচ্ছে তখন কলিংবেল। তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুলে দেখে ফুটফুটে এক যুবতী দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ।

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, আমি নন্দিনী। পরমা বউদি আপনাকে সকালের চা-টা দিতে বলে গেছে।

আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

ওই তো উলটোদিকে। একদিন আসবেন।

আচ্ছা।

কাপটা থাক। পরে আমাদের কাজের মেয়ে নিয়ে যাবে।

ধৃতি সকালবেলাটা খবরের কাগজ পড়ে কাটাল। তারপর সাজগোজ করে হাতে সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়ল। অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেবে।

অফিসেও সময় বড় একটা কাটছিল না। তিনটেয় মেয়েটা আসবে। অন্তত আসার কথা। একটু ভয়-ভয় করছে ধৃতির। সে বুঝতে পারছে একটা জালে জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

তিনটের সময় রিসেপশনে নেমে এল ধৃতি। অপেক্ষা করতে লাগল।

কেউ এল না। ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে সোয়া তিন, সাড়ে তিন ছুঁই-ছুঁই। ধৃতি যখন হাল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আচমকা রিসেপশন কাউন্টারে একটি মেয়ের গলা বলে উঠল, ধৃতি রায় কি আছেন?

মেয়েটা লম্বাটে, রোগাটে, এক বেণীতে বাঁধা চুল। ফরসা? হ্যাঁ, বেশ ফরসা। মুখশ্রী এক কথায় চমৎকার। তবে না, এ আর যেই হোক, টুপু নয়।

রিসেপশনিস্ট কিছু বলার আগেই ধৃতি এগিয়ে গিয়ে বলল, আমিই ধৃতি রায়।

মেয়েটি ধৃতির দিকে চাইল। চমকাল না, বিস্মিত হল না, কোনও রি-অ্যাকশন দেখা গেল না চোখে। তবে একটু ক্ষীণ হাসল।

ধৃতি কাউন্টার পেরিয়ে কাছে গিয়ে বলল, এখানে বসে কথা বলবেন, না বাইরে কোথাও?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? আমি তো অণিমা।

অণিমা?

চিনতে পারছেন না? লক্ষ্মণ কুণ্ডু আমার দাদা। আপনার বন্ধু লক্ষ্মণ।

ধৃতি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তাই তো! এ তো অণিমা। উত্তেজনায় সে চিনতেই পারেনি।

কী চাস তুই?

আমি স্বদেশি আমলের একটা পিরিয়ডের ওপর রিসার্চ করছি। লাইব্রেরিতে পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখব। একটু বলে দেবেন?

ধৃতি বিরক্তি চেপে ফোন তুলে লাইব্রেরিয়ানকে বলে দিল। অণিমা চলে গেলে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর রাগে হতাশায় প্রায় ফেটে পড়তে পড়তে উঠে এল নিউজ রুমে। কে তার সঙ্গে এই লাগাতার রসিকতা করে যাচ্ছে? কেনই বা? সে কি খেলার পুতুল?

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর নিজেকে ডুবিয়ে দিল কাজে। কপির পর কপি লিখতে লাগল। সঙ্গে চা আর সিগারেট। রাগে মাথা গরম, গায়ে জ্বালা।

কিন্তু সারাক্ষণ রূপনারায়ণপুর নামটা ঘোরাফেরা করছে মনের মধ্যে। গুনগুন করে উঠছে।

ধৃতি রূপনারায়ণপুর গিয়েছিল একবার মাত্র। একজন পলাতক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতা ধরা পড়েছিল রূপনারায়ণপুরে। সেটা কভার করতে। তখন অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। কারও কথা বিশেষ করে মনে নেই। কিন্তু নামটা গুনগুন করছে। রূপনারায়ণপুর! রূপনারায়ণপুর।

তিনদিন বাদে ইনল্যান্ডে চিঠিটা পেল ধৃতি।

"খুব রাগ করে আছেন তো! থাকুন গে। রাগটুকু আমার কথা সারা জীবন আপনাকে বারবার মনে পড়িয়ে দেবে। আপাতত এটুকুই যা আমার লাভ।

"টুপুর কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করেছি। আসলে তা নিজেরই কথা। আমিই টুপু। যা বলেছি তার একবিন্দু মিথ্যে নয়। দেখা করার কথা ছিল। পারলাম না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন।

একবার শিকড় উপড়ে ফেললে গাছ কি বাঁচে? বাঁচলেও আগের মতো আর হয় না।

"রূপনারায়ণপুরে আপনাকে যখন দেখেছিলাম তখন ভীষণ ভাল লেগেছিল। কৌতূহলী, উদ্যমী, সত্যানুসন্ধানী এক সাংবাদিক। উজ্জ্বল, ধারালো, স্ট্রেটকাট। তখন থেকেই আপনার কথা খুব মনে হয়। ভেবেছিলাম, আপনার কাছে একবার এসে সব বলব।

"এলামও, কিন্তু সোজা গিয়ে হাজির হতে পারলাম না। কেমন বুক কাঁপছিল, ভয় করছিল। জীবনে কখনও তো সত্যিকারের প্রেমে পড়িনি। এই বোধহয় প্রথম। কিংবা অন্য এক আকর্ষণ। নানারকম ছলছুতো করলাম। কিন্তু তাতে আড়াল বাড়ল, ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর।

"মরেই গেছি যখন আর বেঁচে উঠবার আকাঙ্ক্ষা কেন? এর কোনও মানে হয় না। নিজে নষ্ট হয়েছি, আপনাকেও নষ্ট করে দেব হয়তো। সুন্দর মুখের অসাধ্যি কী আছে?

"নেশার কথা যা বলেছি তার সবটা সত্যি নয়। হ্যাস খেয়েছি, মদও। নেশা করিনি। কিন্তু অভ্যাস আছে। আর বিয়ের ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা অত ব্যাখ্যা করে হবেই বা কী?

"সেদিন তিনটের সময় গিয়েছিলাম কিন্তু। রিসেপশনের এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। খুব ভিড় ছিল। আপনি আমাকে লক্ষ করেননি। চিনতেও পারতেন না। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ চোখ ভরে আপনাকে দেখলাম। খুব উদ্‌বিগ্ন, রাগী; উত্তেজিত। মনে মনে হাসছিলাম। আর বুকের মধ্যে সে কী দপদপানি।

"পায়ে পড়ি, মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করবেন। আর কিছু চাই না।

"কাছে আসতে পারলাম না, সে আমারই ক্ষতি। আপনার কিছুই হারায়নি। এ দুঃসহ জীবন বহন করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে একটা স্বপ্ন অন্তত চাই। মিথ্যে হোক, তবু চাই। আপনাকে স্বপ্ন করে নিলাম।

"রাগিয়েছি, ভাবিয়েছি, হয়রান করেছি বলে একটুও দুঃখিত নই। বেশ করেছি। আবার যে হাত গুটিয়ে নিলাম, নিজেকে সরিয়ে নিলাম সেইটেই কি কম?

"ভাল থাকবেন।

"কী জানাব আপনাকে বলুন তো? ভালবাসা? প্রণাম? শুভেচ্ছা? যাঃ সবটাই ভারী কৃত্রিম। তার চেয়ে কিছু জানালাম না। জানানোর কী আছে?

"আসি।"

ধৃতি একবার পড়ল। দু'বার। চিঠিটা সে ফেলে দিতে পারত দুমড়ে মুচড়ে। পারল না।

তবে দিনটা তার আজ ভাল গেল না। বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। চিঠিটা তাকে আরও বহুবার পড়তে হবে সে জানে। গভীর রাত্রে, শীতে বা বৃষ্টিতে, দুঃখে বা আনন্দে, একটা মানুষ যে কত সাবলীলভাবে চিঠি হয়ে যায়!

ক্ষয়

॥ রুকু ॥

রুকু, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব?

বলবে? বলতে পারো। কিন্তু আমার নিজেরই অনেক প্রবলেম দয়ী।

দয়ী একটু হাসল টেলিফোনে। বলল, তোমার প্রবলেমের কথা আর একদিন হবে রুকু। সেদিন আমার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদো। কিন্তু আজ আমারটা শোনো। ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম।

রুকু খুব সাবধানি গলায় বলে, শোনো দয়ী, যদি বলতেই হয় তবে রেখে-ঢেকে বোলো। এই টেলিফোন কিন্তু ডাইরেকট নয়। ইচ্ছে করলে অপারেটর শুনতে পারে। তা ছাড়া আমার তো এক্সক্লুসিভ টেলিফোন নেই। যার টেবিলে টেলিফোন সে এইমাত্র বাইরে গেল, যখন তখন এসে পড়তে পারে।

এগুলোই কি তোমার প্রবলেম রুকু?

এগুলোও। তবে আরও আছে। অনেক। গরিবদের যে কতরকম থাকে।

বাজে বোকো না। তুমি এক কাঁড়ি টাকা মাইনে পাও, আমি জানি।

আমার পে-স্লিপটা তোমাকে একদিন দেখাব। দেখো, সেখানেও কত প্রবলেম।

ইয়ার্কি বন্ধ করে একটু শুনবে? খুব জরুরি কথা।

শুনছি।

তুমি মলয়কে একটু বুঝিয়ে বলবে যে, ও যা চাইছে তা হয় না।

কী হয় না দয়ী?

তুমি জানো না বুঝি? মলয় তোমাকে কিছু বলেনি?

মলয়ের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না প্রায়। কী হয়েছে?

ও আমাকে নিয়ে ভাবছে। অ্যান্ড হি ইজ সিরিয়াস।

একটু খুলে বলো। কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমিই তো খোলাখুলি কথা বলতে বারণ করলে।

আই উইথড্র।

অপারেটর শুনছে না তো!

শুনুকগে। বলো।

মলয় ইজ বিয়িং প্রিমিটিভ।

তার মানে?

ও বোধহয় বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছে।

রুকু একটু চুপ করে থাকে, তারপর শান্ত ব্যথিত স্বরে বলে, ও।

শোনো রুকু, অত নিরাসক্তভাবে ব্যাপারটা নিয়ো না। একটু সিরিয়াস হও। ও বোধহয় সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছে। আগের মতো হাসিখুশি ইয়ারবাজ নেই, দেখা হলেই গম্ভীর হয়ে যায়। ভাল করে তাকায় না।

সেটা কি প্রেমের লক্ষণ দয়ী? বরং উলটোটাই তো।

তোমাকে বলেছে।

তবে?

ও আমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে যে আজকাল। তাতে সব সেই বিয়ে-টিয়ের মতো সেকেলে বিষয় থাকে। আমি একটারও জবাব দিইনি।

দাওনি কেন?

বাঃ, চিঠি চালাচালির কী আছে বলো। প্রায়ই তো দেখা হচ্ছে। আমি একদিন ওর চিঠির প্রসঙ্গ তুলেছিলুম, ও গম্ভীরভাবে বলল চিঠির জবাব চিঠিতেই নাকি দিতে হবে। কী বোকামি বলো তো?

তুমি তো ওকে পছন্দই করতে দয়ী?

সে তো অনেককেই করি।

তুমি ওর সঙ্গে ধলভূমগড় বেড়াতে গিয়েছিলে। একবার কোনও ডাক-বাংলোয় ছিলেও দু'-একদিন।

এখন বুঝি অপারেটর শুনছে না রুকু? টেবিলের ভদ্রলোক বুঝি ফিরে আসেনি? শোনো রুকু, জ্যাঠামশাইয়ের মতো কথা বোলো না। কোথাও বেড়াতে যাওয়া কিংবা এক সঙ্গে দু'-একদিন কাটানো মানেই কি প্রেম?

মানে তো জানি না দয়ী। ঠিক মানে হয়তো তুমি জানো। তবে ওরকমই একটা ভুল অর্থ সকলেই করে নিতে পারে।

তুমিও প্রিমিটিভ রুকু।

আমি কেবল লজিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে লজিক্যাল হতে যাওয়াটা পৃথিবীর পয়লা নম্বরের বোকামি।

তোমার লজিকটা তোমার পার্সোনাল। নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি অন্যের ওপর খাটানো কি ঠিক?

বাদ দাও। মাপ চাইছি। এবার যা বলছিলে বলো।

তুমি সিরিয়াস হ'চ্ছো না রুকু। মলয় আমার বন্ধু, তুমি যেমন বন্ধু। তোমাদের কাউকে বিয়ে করার মানে একটা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। ওরকমভাবে ভাবিনি তো তোমাদের কোনওদিন। মলয় সেটা বুঝতে চাইছে না। কী সুন্দর হুল্লোড়বাজ মজাদার ছেলেটা এখন কেমন প্যাঁচামুখো, গম্ভীর আর আনইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে। ইদানীং তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি?

রুকু শান্তস্বরে বলে, গত সপ্তাহে ও আমাকে মোটর-বাইকের পিছনে বসিয়ে ব্যান্ডেল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

কোনও কথা হয়নি আমাকে নিয়ে?

না। ও আমাকে দিল্লি রোডে মোটর-বাইক চালানোর তালিম দিয়েছিল অনেকক্ষণ। আমি কিছুতেই শিখব না, কিন্তু ও শেখাবেই। আমি ওকে বললাম, মোটর-বাইক চালাতে শিখে আমার কোনও লাভ নেই, কেননা কোনওদিনই মোটর-বাইক কেনার মতো পয়সা আমার হবে না। কিন্তু ওকে তো জানো।

জানি বলেই ভাবছি। তোমরা কি ওকে ভয় পাও রুকু?

হয়তো পাই।

কেন, ও কনডেমড খুনি বলে?

আস্তে দয়ী। এসব কথা টেলিফোনে কেন?

আমার কথাটার জবাব দাও।

সম্ভবত সেটাও একটা কারণ।

আমি কিন্তু সেই কারণে চিন্তিত নই। বরং ওটাই আমার কাছে ওর যা কিছু অ্যাট্রাকশন। ও যা করেছে তা পলিটিক্যাল কারণে।

আমাদের অফিসের টেলিফোন অপারেটাররা মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দেয়। আজ দিচ্ছে না কেন জানো?

ইয়ার্কি মেরো না রুকু, কেন?

কাটছে না, কারণ অনেক স্কুপ নিউজ পেয়ে যাচ্ছে।

টেবিলের ভদ্রলোক ফিরে আসেনি তো?

এখনও নয়।

শোনো রুকু, মলয়কে তুমি একটু বোঝাবে?

ও বুঝবে কেন? মলয়কে কোনওদিন কেউ কিছু বোঝাতে পারেনি।

তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ?

না দয়ী। আমি বাস্তব অসুবিধার কথা বলছি। আমার চেয়ে মলয়ের আই কিউ বেশি, বুদ্ধি বেশি, যুক্তির ধার বেশি, মলয় আমার চেয়ে ঢের বেশি সফল। ওর তিনশো সি সি-র হোন্ডা মোটর-বাইক আছে, আমার যা জন্মেও হবে না। এমনকী ওর যে আর একটা অ্যাডেড অ্যাট্রাকশনের কথা তুমি বলেছিলে তাও আমার নেই। ছেলেবেলায় আমি কৌতূহলবশে একটা কুকুরছানাকে আছাড় দিয়েছিলাম। সেটা মরে যায় তক্ষুনি। সেই অপরাধবোধ আমার আজও আছে।

তুমি সব মানুষকেই একটু বাড়িয়ে দ্যাখো রুকু। ওটা কিন্তু ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেকস। মলয় তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান হলে আমার জন্য পাগল হত না।

পাগল এখনও হয়েছে কি?

আমি ফাইন্যালি রিফিউজ করলে হবে। পুরুষদের আমি চিনি।

রিফিউজ করলে মলয় পাগল হবে এমন নরম ছেলে ও নয় দয়ী। তুমি ভুল ভাবছ।

কিন্তু রিফিউজ করাটাও ভারি অস্বস্তিকর রুকু। এতদিনের বন্ধু, এত মেলামেশা, মুখের ওপর কি বলা যায়? আমি রিফিউজ করলে ওর কিছু করার নেই জানি। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছি না। আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ও এমন কমপ্লেকস করে তুলেছে যে, আমি সব সময়ে নিজেকে নিয়ে লজ্জায় আছি। আমি চাই তুমি মিডিয়েটার হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও। ওকে বোলো আমরা যথেষ্ট অ্যাডালট হয়েছি, ছেলেমানুষী আমাদের মানায় না।

আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললে দয়ী। মিডিয়েটার হওয়ার মতো আর কাউকে পেলে না?

তোমার মতো ঠান্ডা মেজাজের লোক আর কেউ নেই। তোমাকে কোনওদিন রাগতে দেখিনি, উত্তেজিত হতে দেখিনি, তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করো না, কাউকে অপমান করো না। তোমার চেয়ে ভাল মিডিয়েটার কোথায় পাবো? মলয়কে যদি কেউ বোঝাতে পারে তবে সে তুমিই।

টেলিফোনে রুকু হঠাৎ চাপা স্বরে বলে, টেবিলের লোকটি এসে গেছে দয়ী। সে আবার আমার বস।

আচ্ছা, ছাড়ছি। কিন্তু একটা কথা বলি, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস! আমি গত তিনদিনে কয়েকবার তোমাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমাদের টু-থ্রি লাইন অফিস টাইমে এত বিজি থাকে যে একদিনও লাইন পাইনি। আজই পেলাম।

আমি বুঝেছি দয়ী। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।

ফোন রেখে রুক্মিণীকুমার তার দূরের টেবিলে গিয়ে বসল।

ভাগ্যক্রমে তার টেবিলটা জানালার ধারেই। কাচের বন্ধ শার্সির ওপাশে অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। আজ বাড়ি ফিরতে বহুত ঝামেলা হবে। কলকাতার বৃষ্টি মানেই অনিশ্চয়তা, ভয়। তবু রুকু

আজ অনেকক্ষণ বৃষ্টি দেখল। দেখতে দেখতেই ক্যানটিন থেকে দিয়ে-যাওয়া পনেরো পয়সার চা খেল দু'বার, কলিগদের সঙ্গে খুব ভাসাভাসা অন্যমনস্ক আড্ডা দিল। বৃষ্টি দেখে সবাই পালাচ্ছে সুটসাট করে। রুকু বসে রইল। অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে মরা আলোর দিন, ভেজা, স্যাঁতানো এক শহর। বাইরে যেতে ইচ্ছে করল না।

রুক্মিণী অনেকক্ষণ মলয় আর দয়াময়ীর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু মনটা বার বার অন্য সব দিকে ঘুরে যাচ্ছে। দয়াময়ীর তো আসলে কোনও সমস্যা নেই। তার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বাপের মস্ত কারবার। তার সব সমস্যাই তাই ভাবের ঘরে। তাকে নিয়ে ভাববে কেন রুকু? তবে মলয়ের কাছে একবার সে যাবে। বলবে, তুই না ছিলি পুরো নকশাল! কত লাশ ফেলেছিস! সেই তুই প্রেমের বাজারে হোঁচট খেলে সেটা বড় আফসোস কি বাত।

কতকাল কারও প্রেমে পড়েনি রুকু! সময় পেল কোথায়? হায়ার সেকেন্ডারির পর থেকেই টুইশানি করে পড়তে হত। এখনও অফিসের পর তাকে বাঁধা কোচিং-এ যেতে হয় সপ্তাহে তিনদিন। বড়বাজারে এক চেনা লোকের কাছ থেকে সস্তায় টেরিলিন-টেরিকটন কিনে দোকানে দোকানে বেচে বেড়ানোর একটা পুরোনো ব্যাবসাও আছে তার। সেটা এখন ছোট ভাই দেখছে। আছে জীবনবীমা আর পিয়ারলেসের এজেনসি। আগ্রাসী অভাব রয়েছে রুকুর। তারা তিন ভাই প্রাণপাত করে সংসারটা সামাল দিচ্ছিল। মেজোভাই মাত্র বাইশ বছর বয়সে পাড়ার একটা মেয়েকে হুট করে বিয়ে করে সরে পড়ল। এখন সে আর কুড়ি বছর বয়সের ছোটভাই সংসার চালায়। চার-চারটে আইবুড়ো বোনের কথা ভাবলে রুকু বরাদ্দের বেশি এক কাপও চা খেতে ভরসা পায় না। বাবা বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠাতে পারে না, কিন্তু জমি আঁকড়ে পড়ে আছে।

তবু এইসব রুকুকে বেশি স্পর্শ করে না। জন্মাবধি সে অভাবে মানুষ। ভাগ্যক্রমে তার পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল হত। যে কো-এডুকেশন কলেজে সে পড়ত সেখানে সে একগাদা বড়লোক বন্ধু আর বান্ধবী পেয়ে যায়। মলয় আর দয়ীও তাদের মধ্যে। কিন্তু মনে মনে রুকু জানে ওরা বন্ধু হলেও এক গোত্রের মানুষ নয়।

ভাগ্যই রুকুকে দেখেছে। এই বেসরকারি অফিসে হাজার খানেক টাকা মাইনের চাকরিটাও ভাগ্যই। তবু রুকু কখনও নিশ্চিত বোধ করে না, স্বস্তি পায় না। সে কোনও আশার কথা ভাবে না, স্বপ্ন দেখে না। সে কোনও মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা হওয়ার কথা ভাবতে ভয় পায়।

তবু প্রেম নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। ভাবতে ভাবতে আজকাল পুরো ব্যাপারটাই ভারী কাল্পনিক বলে মনে হয়। আগের দিনে মানুষের মন এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকতে ভালবাসত। মন বন্ধক দেওয়ার সেই ভাবের ঘরে চুরিকেই মানুষ প্রেম বলে সিলমোহর মেরে দিয়েছিল।

তখনও পাকিস্তান থেকে মা বা ভাইবোনেরা কেউ আসেনি, কুচবিহারে মেজো মাসির বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করত রুকু। সেই সময়ে একদিন বৈরাগী দিঘিতে স্নান করতে যাওয়ার সময় লাটিমদের বাড়ি থেকে ওদের বুড়ি ঠাকুমা ডাক দিয়ে বলল, ও ভাই রুক্মিণী, আমার দেয়ালে একটা পেরেক পুঁতে দিয়ে যা। বৈশাখ মাসই হবে সেটা। নতুন একটা বাংলা ক্যালেন্ডার টাঙাতে গিয়ে বুড়ো মানুষ নাজেহাল হচ্ছে। ক্যালেন্ডারের পেরেক পুঁততে গিয়ে রুকুও নাজেহাল হল কম নয়। তবলা ঠোকার ছোটো হাতুড়ি দিয়ে গজালের মতো বড় পেরেক গাঁথা কি সহজ কাজ! হাতুড়ি পিছলে গিয়ে আঙুল থেঁতলে দেয় বার বার। যা হোক, সেটা তো ঘটনা নয়। ঘটনা ঘটল পেরেক পোঁতার ব্যাপারটা জমে ওঠার পর। লাটিমের ছোড়দি তাপসী ঘরে আসার পর। বয়সে তাপসী হয়তো রুকুর চেয়ে বড়ই ছিল, না হলে সমান সমান! মুখশ্রী বা ফিগার কি খুব সুন্দর ছিল তাপসীর? তা রুকু আজ বলতে পারবে না। কিন্তু সেই প্রথম একটা মেয়েকে দেখে তার মনে হল একটা ঢেউ এসে যেন টলিয়ে দিল তাকে। সে ঢেউ সব কার্যকারণকে লুপ্ত করে দেয়, এক অবুঝ আবেগে মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে, বাচাল বা বোবা করে দেয়। হয়তো সেটাই প্রেম। অর্থাৎ

যুক্তিশীল নির্বুদ্ধিতা। তাপসী বলল, এঃ মা, আমার হাতুড়িটা বুঝি গেল শেষ হয়ে। লাজুক রুকু বলল, হাতুড়ির কিছু হয়নি।

মেয়েটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে তার পেরেক ঠোকা দেখল। আর তখন আরও বেশিবার আঙুল থেতলে যেতে লাগল রুকুর।

তাপসী হাসছিল মাঝে মাঝে। বলল, আমাদের বাড়িতে আর বড় হাতুড়ি নেই।

এতেই হবে।— বলল রুকু।

হচ্ছে কোথায়? পেরেকের মাথায় লাগছেই না।

একটু সময় নেবে।

তুমি বুঝি স্নানে যাচ্ছিলে? দেরি হয়ে যাবে না?

আজ ছুটির দিন। দেরি হলে কিছু হবে না।

দেশের বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

মা বাবা ভাই বোন।

বোন ক'জন?

চারজন।

সবাই তোমার ছোট? আর ভাই?

সবাই ছোট।

তোমার বয়স কত?

সতেরো হবে বোধহয়।

বোধহয় কেন? ঠিক জানো না?

আমি হিসেব রাখি না।

বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগে না?

আগে লাগত। এখন সয়ে গেছে।

মাসি খুব ভালবাসে বুঝি?

বাসে।

তোমার ডাকনাম তো রুকু, ভাল নাম কী?

রুক্মিণীকুমার।

বেশ নাম তো। এরকম নাম আজকাল শোনা যায় না। বলো তো বঙ্কিমের কোন উপন্যাসে এই নাম আছে?

রাধারানী।

ও বাবা, তুমি তো অনেক পড়েছ! মোটেই গাঁইয়া নও।

পাকিস্তানেও আমরা শহরেই থাকি। গাঁয়ে নয়।

কোন শহর?

ময়মনসিং।

কুচবিহারের মতো এমন ভাল শহর?

এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না, তবে এর চেয়ে অনেক বড়।

আমাদের কুচবিহারের মতো এত ভাল শহর কোথাও নেই, তা জানো? এত নিট অ্যান্ড ক্লিন শহর দেখেছ কখনও?

এইরকম সব কথা হয়েছিল সেদিন। অনেক কথা। খুব কথা বলতে ভালবাসত তাপসী। খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। একই ক্লাসে পড়ত তারা। রুকু জেংকিনস স্কুলে, তাপসী সুনীতি অ্যাকাডেমিতে। স্কুলের সেটা শেষ বছর। তখন উপর্যুপরি ঢেউ আসত। ঢেউয়ে টালমাটাল হয়ে

যেত রুকু। একা শুয়ে যখন ভাবত তখন টের পেত তার বুকের মধ্যে কাঁকড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। তেমনি তীক্ষ্ণ অনুভূতি, জ্বালা। মাঝে মাঝে ধক করে ওঠে বুক আনন্দে। এক-একদিন হোঃ হোঃ খুশির হররায় পাগল হয়ে যায় মাথা।

খুব বেশিদিন নয়। পরিচয় হওয়ার মাত্র দু'মাসের মাথায় একটা ভুখা মিছিল বেরোল শহরে। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট। রাজনীতির নেতারা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ফ্ল্যাগ-হাতে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই মিছিলে। সাগরদিঘির সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। মিছিল থামবে কি এগোবে তা কেউ বলে দেয়নি। সুতরাং মিছিল ধীরে ধীরে এগোল। কী কারণে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল তা কোনওদিনই জানতে পারেনি কেউ সঠিকভাবে। সেই মিছিল এগিয়ে গেলেই বা সরকারের কী ক্ষতি হত? সাগরদিঘির শান্ত, নিরালা রাস্তার ওপর মোট চারজন গুলি খেয়ে মরে গেল। আর কী আশ্চর্য! সেই চারজনের মধ্যে একজন তাপসী।

খবর পেয়ে শহর ভেঙে পড়েছিল সেখানে। পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল রুকুও। দেখল, তাপসীর নতুন যৌবনে ফুটে ওঠা একটি স্তন বিদীর্ণ করে পাঁজর ফাটিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। একটা গুলিতে অত বড় ক্ষত হতে পারে তা জানা ছিল না রুকুর। ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

তাপসী কোনওদিন রাজনীতি করেনি, মিছিল-টিছিলেও যায়নি। সেবার জোর করে স্কুল থেকে কয়েকজন বড় মেয়ে তাদের কয়েক জনকে ধরে নিয়ে যায়।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাপসী মরে যাওয়ার পর রুকুর কয়েকদিন কাটল মানসিক অন্ধকারে। ভিতরে একটা দিশেহারা নিরালম্ব ভাব। সেটা কি গভীর শোক? নাকি সেই গুলির ক্ষত দেখে বিস্ময়মিশ্রিত ভয়? আজও ভাবলে হাসি পায়, তাপসীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন সে সন্ধের পর একা থাকতে ভয় পেত। মনে হত, তাপসীর ভূত এসে দেখা দেবে। তবে কী করে সে বলবে যে তাপসীর প্রতি তার ভালবাসা ছিল?

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন বাদে তাপসীর মা এসে একদিন মাসির কাছে বলেছিল, আর তো কিছু মনে হয় না, শুধু ভাবি মেয়েটা মরার সময়ে কত না জানি ব্যথা পাচ্ছিল, হয়তো মা বলে ডেকেছিল কতবার। ওই শেষ সময়টায় ওর কাছে তো কেউ ছিল না, কে জানে তখন তেষ্টা পেয়েছিল কি না, খিদে পেয়েছিল কি না!

শুনে ভারী ছিছিক্কার বেজেছিল রুকুর মনে। কই, সে তো কখনও মায়ের মতো তাপসীর মৃত্যুযন্ত্রণার কথা ভাবেনি! ভাবেনি তো, শেষ সময়ে ওর জলতেষ্টা পেয়েছিল কি না! পিচের রাস্তায় এক ভিড় লোকের মধ্যে, জলজ্যান্ত দিনের আলোয় নিজের রক্তে মেখে এক বুক ক্ষতের যন্ত্রণায় হাঁফাতে হাঁফাতে মৃত্যুর মধ্যে একা ডুবে যেতে কেমন লেগেছিল তাপসীর, তা কখনও অনুভব করার চেষ্টাও করেনি রুকু। না করলে ভালবাসা কী করে হল?

বার বার ঘটনাটা ভাঁজে ভাঁজে খুলে ভেবে দেখেছে রুকু। আজও সন্দেহ রয়ে গেছে, তাপসীকে সে ভালবেসেছিল কি না। মন বলে, বেসেছিল। যুক্তি বলে, না। তাপসী যদি আজও বেঁচে থাকত তবে কী হত? নিশ্চিত বলা যায়, রুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হত না।

কারণ রুকুর বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাপসীর বিয়ের বয়স হয়ে যেত। তাছাড়া, সমানবয়সি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে বাধা আসত। কে জানে হয়তো তাপসীই রাজি হত না। আর যদি অঘটনক্রমে বিয়ে হতই তবে তাপসীকে আজ কেমন লাগত রুকুর? হয়তো ভাল নয়, হয়তো একঘেয়ে, হয়তো মনকষাকষি। এসবই তো হয়। রুকু জানে।

জুডিসিয়াল এনকোয়ারি বসল ল্যান্সডাউন হলে। রোজই সেই শুনানিতে যেত রুকু। বার বার তাপসীর নাম উঠত। রুকুর অল্পবয়সি মন চাইত, কঠোর প্রতিশোধ। কিন্তু সেই তদন্তে কিছুই হল না, কেউ শাস্তি পেল না। পুলিশের বড় অফিসারকে শুধু বদলি করে দেওয়া হল।

রুকুর জীবনে প্রেম বলতে এটুকুই। এটুকুই সে বহুবার ভেবেছে, বিশ্লেষণ করেছে গবেষণা

করেছে। রুকুর স্মৃতিশক্তি প্রখর বলে কোনও খুঁটিনাটিই সে ভুলে যায় না। আজও তাপসীর সেই সতেরো বছরের চেহারাটা মনে আছে হুবহু। যত কথা হয়েছে তার সঙ্গে সবই প্রায় আজও মুখস্থ আছে রুকুর। আরও দিন গেলে পাছে ভুলে যায় সেই ভয়ে লিখেও রেখেছে একটা পুরনো ডায়েরিতে। মাঝে মাঝে বের করে পড়ে।

বাইরে এখনও অঝোর বৃষ্টি। আবছা হয়ে এল কলকাতা। কিন্তু আর বসে থাকার মানে হয় না। রুকু উঠল।

॥ দয়ী ॥

আর পাঁচজনের যেমন শান্তশিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক বাবা থাকে, দয়াময়ীর সেরকম নয়। তার বাবা বসন্ত দস্তিদার একসময়ে বাগমারির একচ্ছত্র গুন্ডা ছিল। আজও অনেকে বসন্তবাবুকে বে-খেয়ালে বসনগুন্ডা বলে ফেলে। কিংবা ট্যারা বসন। আটষট্টি-উনসত্তর সাল পর্যন্ত বাগমারি শাসন করেছিল বসন্ত দস্তিদার। তারপর হঠাৎ তার দল ভেঙে সফি আর কালো নামে দুই ভাই আলাদা হয়ে দল করল। দিনরাত দুই পক্ষে বোমবাজি আর লাঠি ছোরা চলত। বসন্ত দস্তিদার টের পেল, শুধু কালো আর সফিই না, নতুন গোঁফ-ওঠা একদল স্কুল-কলেজের ছোকরাও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পুলিশের খাতায় তাদের নাম নেই, কেউ চুরি-ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙার মামলাতেও থাকে না। এরা শুধু শ্রেণিশত্রু খতম করতে চায় এবং তাদের লিস্টে বসন্তেরও নাম আছে।

বসন্তের তখন বয়স হয়েছে, টাকাও হয়েছে। ঝুট-ঝামেলায় না থেকে সে টালিগঞ্জের গলফ ক্লাবে একটা পুরনো বাড়ি কিনে উঠে এল। ভোল পালটে গেল।

বাবার এই পুরো ইতিহাসটাই জানে দয়াময়ী। তার বাবা আজও নিছক ভদ্রলোক নয়। এক সময়ে অসাধারণ সুপুরুষ ছিল, লম্বা জোরালো ফরসা চেহারা। এখন চেহারায় কিছু মেদসঞ্চার হলেও বসন্ত ইচ্ছে করলে চার-পাঁচ জোয়ানের মোকাবিলা করতে পারে। এখনও সঙ্গে রিভলবার থাকে বাবার। মুখ দিয়ে অনর্গল খিস্তি বেরোয়। রেগে গেলে এখনও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। নিজে গুন্ডামি না করলেও এই অঞ্চলেও তার একটা দল তৈরি হয়েছে। তাদের দাপট কম নয়। বসন্তের সঙ্গে পুলিশ-দারোগা, এম-এল-এ, মিনিস্টারদের বেশ খাতির। পাঁচ-সাতখানা ট্যাক্সি, দুটো মিনিবাস আর গোটা দশেক লরি আছে তার। এখন টাকা রোজগার করাই তার একমাত্র নেশা।

দয়াময়ীরা তিন বোন, দুই ভাই। তিন বোন বড়, ভাইয়েরা ছোট। বোনদের মধ্যে দয়াময়ী মেজো। বড় মৃন্ময়ী সেই বাগমারিতে থাকতে বয়োধর্মে বাবার দলের এক ছোকরা মস্তানের সঙ্গে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সাতদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তে তারা ধরা পড়ে, বিনা পাশপোর্টে যশোরে যাওয়ার চেষ্টা করায়। তারা জানত এ দেশে থাকলে বসন্ত গুন্ডার হাত থেকে রেহাই নেই। রেহাই পায়ওনি শেষ পর্যন্ত। বসন্তই সীমান্ত পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়েছিল দু'জনকে। তার কয়েকদিন বাদেই উলটোডিঙির রেললাইনে সেই ছোকরা প্রেমিকের কাটা মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃন্ময়ীর অতীত ইতিহাস চেপে রেখে পরে তার বিয়ে দেওয়া হয় এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়িতে সবই জানাজানি হয়ে যায়। তারা মৃন্ময়ীর ওপর বাইরে থেকে কোনও নির্যাতন করেনি ঠিকই, কিন্তু স্বামী তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

দয়াময়ী জানে, বাবা এখন আর আগের মতো নেই। এখন দয়াময়ী কাউকে বিয়ে করতে চাইলে বাবা আপত্তি করবে না। এখন বসন্ত ছেলেমেয়েদের কোনও ব্যাপারেই বাধা দেয় না। দয়াময়ীরা খুবই স্বাধীন এবং খানিকটা স্বেচ্ছাচারীও। মৃন্ময়ী ছাড়া তারা আর সব ভাইবোনই পড়াশুনো করেছে

ইংরিজি মিডিয়ামের স্কুলে, ভাল কলেজে। তারা চৌকস, চালাক, স্বার্থসচেতন। মৃন্ময়ীর মতো ভুল তারা করবে না।

সেই মৃন্ময়ী এখন দাঁড়িয়ে আছে সাততলার ফ্ল্যাটের উত্তর দিকের ব্যালকনিতে। সদর দরজা খোলা। বাচ্চা চাকরটা স্কুল-ফেরত বাবুনকে খেতে দিচ্ছে ডাইনিং টেবিলে। দয়ী ঘরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখল। একটা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটের মধ্যে নিজেকে কী করে আঁটিয়ে নেয় মানুষ কে জানে! দয়ী কোনওদিন কারও ঘরকন্না করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাবুন মুখ তুলে হাসল, হাই দয়ী আন্টি।

দয়ী চোখ টিপে বলে, হাই।

মৃন্ময়ীর এলোচুলে শুকনো ঝোড়ো বাতাস লাগছে। ভারী আনমনে তাকিয়ে আছে বাইরে। দয়ী নিঃশব্দে গিয়ে পাশে দাঁড়াল। বলল, কী গরম আজ!

মৃন্ময়ী মুখ ফিরিয়ে হাসল, এই এলি? কখন থেকে তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সাততলায় বড্ড বাতাস। দয়ীর গলা আর বুকের ঘামে বাতাস লাগতেই শিরশির করে উঠল গা। বলল, বিশুকে ফ্রিজ থেকে জল দিতে বল তো।

ঠান্ডা খাস না। আমি মিশিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময়ী চলে গেল।

একবার দিদির দিকে ফিরে তাকায় দয়াময়ী। সবই স্বাভাবিক মৃন্ময়ীর। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে, ওর জীবনে কোনও সুখ নেই।

কিংবা সুখের ধারণা হয়তো দয়াময়ীর ভিন্ন রকমের। কার মনে সুখ আছে, কার মনে দুঃখ, তা কে জানে বাবা! তবে মৃন্ময়ী সুখে নেই মনে করে যাওয়া-আসার পথে মাঝে মাঝে চলে আসে দয়াময়ী। এসে দেখতে পায় এই ফ্ল্যাটের ছিমছাম সংসারে অবধারিত এক জেনারেশন গ্যাপ। তার সঙ্গে মৃন্ময়ীর। মৃন্ময়ীর সঙ্গে তার ছেলে বাবুনের। মৃন্ময়ীর কোনও বোধ, ধারণা, বিশ্বাস বা জ্ঞানগম্যির সঙ্গেই মেলে না দয়াময়ীর। তবু তাদের ভাইবোনদের মধ্যে যদি কারও সঙ্গে কিছু ভালবাসা থেকে থাকে দয়ীর তবে তা আছে এই দিদির সঙ্গেই। মৃন্ময়ী তার চেয়ে বছর পাঁচেক বা তারও বেশি বড়। মাঝখানে আরও দুটো বোন হয়েছিল, বাঁচেনি।

মৃন্ময়ী ঠান্ডা আর সাদা জল খুব নিপুণভাবে মিশিয়ে এনেছে। কষে একটা পোকা দাঁত আছে দয়ীর। খুব ঠান্ডা খেলে চিনচিন ব্যথা করে। এখন সেই ব্যথাটা তেমন হল না। গলা বুক ঠান্ডায় জ্বলে গেল না। অথচ ঠান্ডা হল। খুব ছোট ছোট চুমুকে জলটা খেতে খেতে দয়ী বলে, তুই কী করে যে পারিস!

কী পারি?

বড্ড বাতাস। এত বাতাসে চেঁচিয়ে না বললে কিছু শোনা যায় না। কিন্তু দয়াময়ীর চেঁচাতে ইচ্ছে হল না বলে জবাব দিল না। অদূরের গড়িয়াহাটার দিকে চেয়ে রইল।

মৃন্ময়ী রেলিং দিয়ে ঝুঁকে নীচের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে বলে, কতক্ষণ ধরে তোর গাড়িটা দেখতে পাব বলে দাঁড়িয়ে আছি। কই, দেখতে পেলাম না তো! আজ গাড়ি আনিসনি?

দয়াময়ী তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, ওই তো নীল ফিয়াটটা।

রং করালি বুঝি? আগে তো সবুজ ছিল।

দয়াময়ীর মনটা করুণ হয়ে যায়। মৃন্ময়ী যখন যুবতী তখন বসন গুন্ডার টাকা হয়নি এত। মৃন্ময়ী তাই নিজের গাড়ি চালিয়ে দাবড়ে বেড়ানোর আনন্দ ভোগ করেনি কখনও। যার সঙ্গে বিয়ে হল তার টাকা আছে বটে, ভালবাসা নেই। তবু মৃন্ময়ী কখনও ভাইবোনকে হিংসে করে না; বরং তারা গাড়ি চালায়, বড়লোকের মতো থাকে আর স্বাধীনতা ভোগ করে বলে মৃন্ময়ীর একটু গৌরববোধ আছে।

দয়ী কথার জবাব না দিয়ে বলল, তোর অতিথি কখন আসবে?

বিকেলে।

মুরগি আনিয়ে রেখেছিস?

মাথা নেড়ে মৃন্ময়ী বলে, তোর জামাইবাবু কাল নিউ মার্কেট থেকে এনে রেখেছে। জ্যান্ত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি জ্যান্ত পাখি কাটতে পারি না, বড্ড মায়া হয়। বিশু বলছে সেও পারবে না। তুই কি পারবি?

ভ্রু কুঁচকে দয়ী বলে, পারব না কেন? আমার অত মায়াদয়া নেই। খেতে যখন পারব তখন কাটবার বেলায় কেন ঘোমটা টানা বাবা, চল দেখি কেমন মুরগি।

মৃন্ময়ীর পিছু পিছু রান্নাঘরে আসে দয়াময়ী। ধামাটা খুব সাবধানে ফাঁক করে উঁকি মেরে দ্যাখে। অন্তত গোটা পাঁচেক মুরগিছানা কুক কুক করে ওঠে মুক্তির অপেক্ষায়।

দয়াময়ী ধামা ফেলে ওপরে ভারী নোড়া ফের চাপা দিয়ে বলে, এ বেলা কী রেঁধেছিস বল তো! বড্ড খিদে পেয়েছে।

কেউ খেতে চাইলে মৃন্ময়ী খুশি হয়। উজ্জ্বল মুখে বলে, চল খাবি। ভাল চিংড়ি আছে। গলদা।

বাবুন ডাইনিং টেবিলে নেই। উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছে উইকলি টেস্টের জন্য তৈরি হতে। দয়ীকে ভাত বেড়ে দিতে দিতে মৃন্ময়ী বলে, বাবুনের যে কত পড়া! ছেলেটা নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। আমি বলি একটু বিশ্রাম কর। তা শোনে না।

দয়ী তাকাল। মা ছেলের সম্পর্কটা জানে সে। এ বাড়িতে মৃন্ময়ীর কোনও মতামত নেই, কোনও কর্তৃত্ব নেই। বাবুন কখনও মৃন্ময়ীকে পাত্তা দেয় না।

মৃন্ময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, বাবুন সেই বাবা-ভক্তই হল। আগে ভাবতাম, অন্তত বাবুনটা আমার দিক নেবে। কিন্তু এখন কেমন একটা নতুন হাওয়া এসেছে। বেশির ভাগ বাচ্চা-কাচ্চাই এখন মায়ের চেয়ে বাপের বেশি ভক্ত।

এসব তত্ত্ব জানার ইচ্ছে দয়ীর নেই। তাদের বাড়িতে কেউই তেমন বাপ-ভক্ত নয়। একটু ঠাট্টা করার জন্যই দয়াময়ী হঠাৎ বলল, তুইও কি তাই?

আচমকা মৃন্ময়ীর মুখ থেকে রক্তের রং সরে গেল। কিছুটা স্থির হয়ে গেল সে। কোনও জবাব দিল না।

দয়ী চোখ সরিয়ে নেয়। এই একটা প্রসঙ্গেই মৃন্ময়ীর যত অস্বাভাবিকতা। আজও বাবার সামনে গেলে বা বাবার প্রসঙ্গ উঠলেও মৃন্ময়ী কেমন একরকম হয়ে যায়। মৃন্ময়ীকে যদি কেউ কখনও বলে, তোমার বাবা তোমাকে এই সাততলার বারান্দা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে বলেছে, মৃন্ময়ী ঠিক এমনি সাদা মুখে, শুকনো চোখে একবার চারদিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখবে, তারপর নিয়তির নির্দেশে চালিত হওয়ার মতো গিয়ে ঠিক লাফিয়ে পড়বে।

দয়াময়ী গম্ভীর হয়ে গেল। বিরক্তির সঙ্গে বলল, বাবাকে তোর এত ভয় কেন বল তো! আমরা তো কেউ ভয় পাই না। ইন ফ্যাক্ট বাবাই আমাদের সমীহ করে চলে।

মৃন্ময়ী জবাব না দিয়ে উঠে গেল। রান্নাঘরে খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরে এসে বসল চোরের মতো। খুব চাপা স্বরে ফিসফিস করার মতো বলল, আমি সবাইকে ভয় পাই। তোর জামাইবাবুকে, বাবুনকে, বাবাকেও।

দয়ী দিদির দিকে চেয়ে দেখল। মনটা রাগ আর বিরক্তিতে ভরা। এই মেয়েটার ওপর সবাই এত নির্যাতন করে কেন? বয়সের দোষে বোকা মৃন্ময়ী যখন ছোকরা গুন্ডাটার সঙ্গে পালিয়েছিল তখন থেকেই তার লাগাতার নির্যাতনের শুরু। পালিয়ে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে তারা ভয়ংকর বসন গুন্ডার হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ছায়া দেখেও চমকে উঠত। মরিয়া হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানে। মাফিয়াদের মতোই অমোঘ ট্যারা বসনের দল সেইখানে সীমান্ত পুলিশের হেফাজতে যখন তাদের নাগাল পেল তখনই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মৃন্ময়ী। পরে রেল লাইনের ধারে তার

প্রেমিকের কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ তাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ট্যারা বসন। বলেছিল, দেখে রাখ। ভবিষ্যতে মনে রাখিস। সেই লজ্জা আর ভয় ভুলবার আগেই এক চকচকে ভদ্রঘরে বিয়ে হয়ে গেল মৃন্ময়ীর। যখন পেটে বাবুন এল তখনই একদিন তার স্বামী সরিৎ তার অতীতের সেই লজ্জার কথা জানতে পারে। বসন্ত দস্তিদারের শত্রুর অভাব নেই, তাদেরই কেউ জানিয়েছিল। মৃন্ময়ী ভয়ে লজ্জায় আর-একদফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। যেন কেউ তাকে সম্পূর্ণ ন্যাংটো করে ফ্লাড লাইটের সামনে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিছুই গোপন নেই। লজ্জার সেটাই শেষ নয়। সরিৎ রাগে দুঃখে তার সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, আত্মীয়দের কাছে বলে দিয়েছিল সেইসব কথা। তারপরও মৃন্ময়ী যে পাগল হয়ে যায়নি সেইটেই যথেষ্ট। আজও মৃন্ময়ী এক অস্বাভাবিক অবস্থায় বড় অনাদরের জীবন যাপন করে যাচ্ছে। অবিরল নিরাবরণ অবস্থায় পাদপ্রদীপের আলোয় দর্শকদের সামনে সে দাঁড়িয়ে। আজ আর লজ্জা নেই, তবে এক হীনমন্যতায় ডুবে সে নিজের সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে ক্রমে। বয়ঃসন্ধির সেই বোবা ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, বাবার ভয়ংকর চেহারা আজও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাকে নিরন্তর লজ্জা ও অনাদরের যন্ত্রণা দেয় তার স্বামী আর ছেলে।

মৃন্ময়ীকে এই গহ্বর থেকে কোনওদিনই বোধহয় আর টেনে তোলা যাবে না।

সেই ঘটনাটার কথা সঙ্কোচবশে কখনও দিদিকে জিজ্ঞেস করেনি দয়ী। তখন দয়ী খুব ছোট। দিদিকে ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একটা তালাদেওয়া ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকত সারা দিন। কাঁদত না, গোঙানোর মতো একরকম বোবা শব্দ করত। সারা গায়ে মারের দাগ। চুল ছেঁড়া, ঠোঁট রক্তাক্ত। বিভীষিকার মতো দিন গেছে সেসব।

আজ দয়ী কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বলল, দিদি, একটা কথা বলবি? লাটুকে তুই কেমন বাসতিস?

লাটু! লাটুটা আবার কে?— মৃন্ময়ী ভারী অবাক হয়।

সেই যে। যার সঙ্গে তুই চলে গিয়েছিলি!

মৃন্ময়ীর বিস্মিত মুখ হঠাৎ-স্মৃতিতে সিঁদুরে হয়ে গেল। দিশেহারার মতো চারদিকে একবার তাকাল, বোকার মতো হাসল, শ্বাস ফেলল। তারপর মাথা নিচু করে বলল, খুব তেজি ছিল। বেঁচে থাকলে বাবাকে হয়তো ও-ই জব্দ করত একদিন।

খুব তেজি?

সাংঘাতিক। বিশ বছরও বয়স হবে না, তার মধ্যেই পাঁচ-ছ'টা খুন করেছিল।

তোর খুনিকে পছন্দ হল কেন?

ওই বয়সটাই ওরকম। মনে করতাম, খুনটা খুব বাহাদুরির কাজ।

তাকে খুব ভালবাসতিস?

আমি?

বলে চমকে ওঠে মৃন্ময়ী। ভয় পেয়ে মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলে, আমি নয়। ওই তো আমাকে সব বলত। বিয়ে করি চলো, বসনদাকে বলি চলো।

তুই কিছু বলিসনি?

আমি বারণ করতাম। জানি তো, শুনতে পেলে বাবা মেরে ফেলবে।

তারপর?

কিন্তু ও খুব তেজি ছিল। ভীষণ সাহস। বলত, বসনদা রাজি না-হলেও কুছ পরোয়া নেই। চলো, ভাগব। সেই সাহস দেখেই আমি কেমন যেন সাহসী হয়েছিলাম। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু বুঝেছিলাম, বাবার হাত থেকে বাঁচব না। সব জায়গায় বাবার লোক। ও আমাকে কালীঘাটে নিয়ে যায় বিয়ে করবে বলে। বাবা তো ভীষণ বুদ্ধিমান। বাবা ঠিক জানত আমরা কালীঘাটে যাব। সেখানে নারায়ণ

নামে বাবার একজন লোক আমাদের ধরে। ট্যাক্সি করে যখন আমাদের বাগমারি নিয়ে যাচ্ছিল তখন মানিকতলা ব্রিজ পেরিয়ে নির্জন একটা রাস্তায় লাটু নারায়ণদাকে মারল। ট্যাক্সির মধ্যে। অনেকক্ষণ ধরে তক্কে তক্কে ছিল। কিন্তু নারায়ণদাও তো কম নয়। সেই সময়টা সামনে ঝুঁকে ট্যাক্সির ড্রাইভারকে রাস্তা চেনাচ্ছিল, লাটু আচমকা পিঠে ছোরা ঢুকিয়ে দিল। আমার কোল ভরে গেল রক্তে। দু'হাতে রক্ত। কী গরম! লাটু একটুও ঘাবড়ায়নি। নারায়ণদার লাশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে সেই ট্যাক্সি করেই আমরা পালাই। একটা বস্তিতে দু'দিন, কসবায় এক রাত্রি, এক বন্ধুর বাড়িতে এক রাত্রি কাটে। স্ট্র্যান্ড রোডে মস্ত মস্ত যেসব কংক্রিটের পাইপ আছে, তার মধ্যেও ভিখিরিদের সঙ্গে এক রাত্রি কাটিয়েছি। বাবা তখন তুলকালাম করছে আমাদের খোঁজে। লাটু কখনও ভয় পেত না তাতে। তাই খুব সাহস পেতাম। লাটু যেরকম ছিল সেরকমটা এখন দেখি না।

তার মানে তুই লাটুকে ভালবাসতিস দিদি।

না না!

আর্তস্বরে বলে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপরই নিজের গলার স্বরে চমকে ওঠে। চারদিকে চায়।

মৃন্ময়ীর স্বরটা কিছু ওপরে উঠেছিল। কাশ্মীরী কাঠের নকশা করা পারটিশনের ওপাশ থেকে বাবুন মুখ বাড়িয়ে বিরক্ত গলায় বলে, দয়ী আন্টি, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? এনিথিং রং?

নাথিং ডার্লিং!— দয়ী বিস্ময়ের ভান করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, জাস্ট টকিং ওভার সাম ফানি থিংস।

মৃন্ময়ী বাবুনের দিকে চেয়ে ছিল। ভয়ে সম্মোহিত তার দৃষ্টি।

বাবুন টেবিল থেকে একটা চিংড়িমাছ তুলে নিয়ে চলে যায়। দয়ী সামান্য খেয়ে উঠে পড়ে। কাজ আছে।

জওহরলাল নেহরু চিকেন রয়্যাল খেতেন। রান্নাটা কলেজের এক বান্ধবীর কছে শিখেছিল দয়ী। মাঝে মাঝে রাঁধে। পরশুদিন মৃন্ময়ী টেলিফোন করেছিল। তার কোনও এক মাসতুতো না পিসতুতো দেওর বারো বছর ফিলাডেলফিয়ায় থেকে সদ্য এসেছে। মাত্র পাঁচ মাসের ছুটি তার। এর মধ্যেই সে পাত্রী দেখে পছন্দ করে বিয়ে সেরে বউ নিয়ে আবার ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাবে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে নেমন্তন্ন করে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছে খুব।

মৃন্ময়ী ফোনে বলেছিল, তোর সেই চিকেন রয়্যাল ওকে খাওয়াতে চাই।

দয়ী বলল, ওসব করতে যাবি কেন? বিদেশে ওরা ওসব কত খায়। তুই বরং শুক্তো মাছের ঝোল দিয়ে খাওয়া।

মৃন্ময়ী তাতে রাজি নয়। বলল, তা হয় না। তোকে আসতেই হবে। চিকেনও রাঁধতে হবে।

কেন? আমাকে আসতেই হবে কেন?

সব কথার অত খতেন নিস কেন? বলছি আসবি।

মনে মনে হেসেছিল দয়ী। মৃন্ময়ীর দেওরভায়া পাত্রী দেখতে আমেরিকা থেকে এতদূর এসেছে সেটা সে ভুলে যায়নি। তবে দয়ীর একবার পরীক্ষাটা দিতে আপত্তি নেই। যদি লোকটাকে তার পছন্দ হয় এবং তাকেও লোকটার, তবে ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে ঘরসংসার করতে দোষ কী? শুনেছে লোকটা সেখানে বহু টাকা রোজগার করে, একটা বাড়ি আর দু'-দুটো গাড়ি আছে। দোষের মধ্যে বয়সটা ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। হিসেবে দয়ীর চেয়ে দশ-এগারো বছরের বড়। তা হোক।

খেয়ে উঠে দয়ী আঁচল কোমরে বেঁধে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে মুরগি কাটতে বসল। সঙ্গে বাবুন। বাইরে থেকে মৃন্ময়ী দরজায় টোকা দিয়ে বলে, এগুলোকে বেশি কষ্ট দিস না দয়ী। টপ করে কেটে ফ্যাল।

একটা মস্ত ভোজালি হাতে বাবুন পাশেই দাঁড়িয়ে খুব তড়পাচ্ছিল, আই অলসো ক্যান ডু ইট আন্টি। গিভ মি ওয়ান।

বাবুন ভুল করে ধামা তুলতেই মুরগির ছানাগুলো কুক-কুক করে ডাকতে ডাকতে উল্টোপাল্টা দৌড় লাগাল উর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু বন্ধ ঘর থেকে পালানোর পথ না পেয়ে দেয়ালে দরজার গ্যাস সিলিন্ডারে ধাক্কা খেয়ে ছটফটিয়ে ঘুরছে, একটাকে ধরে ফেলেছিল দয়ী। মস্ত ধারালো বঁটিতে গলাটা চোখের পলকে ছিন্ন করে দিল সে। টিপে ধরে রইল নলি, যাতে খুব বেশি রক্ত না পড়ে। তবু পড়ল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়ে পড়ল সাদা মেঝেয়।

বাবুনের মুখ সাদা হয়ে গেছে দৃশ্যটা দেখে। তবু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে বলল, ইউ আর এ ব্র্যান্ডেড কাটথ্রোট দয়ী আন্টি!

রিয়েলি?— বলে দয়ী ভ্রু তুলে হাসে। তারপর বলে, তুই বোকার মতো ধামাটা হড়াস করে তুলে ফেললি কেন রে? আমি হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে ধরে বের করতাম। নাউ হেলপ মি টু ক্যাচ দেম।

ঝটাপটি করে দু'জনে মিলে আরও পাঁচটা মুরগি ধরল। ভীষণ চেঁচাচ্ছিল মুরগিগুলো। চোখের সামনে বন্ধুদের রক্তমাখা লাশ দেখে কিছু বুঝে নিয়েছিল তারা। ছ' নম্বরটায় সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ছিল। একটা তাকের ওপর উঠে বসেছিল সেটা। বাবুন আলু ছুঁড়ে সেটাকে ওড়াল তো বসল গিয়ে আলোর শেডের ওপর। আলু ছুঁড়তে গিয়ে বালবটা ভাঙল বাবুন। কাচে হাত কাটল দয়ী। ঘেমে চুমে একাকার হল। মুরগিটা কোঁক-কোঁক করে আতঙ্কিত চিৎকারে ঘর ভরে দিল, তারপর প্রাণভয়ে ঘুরতে লাগল চারপাশে।

বাবুন ফ্যাকাসে মুখে বলে, লিভ ইট আন্টি। লেট ইউ গো।

দয়া বলে, লাভ নেই রে বাবুন। আমরা ছেড়ে দিলেও আর কেউ ধরে খাবে। কিপটে বাপের পয়সা নষ্ট করবি কেন? আয় ধরে ফেলি।

ড্যাড ইজ নো মাইজার।— বাবুন বলে।

হি ইজ।

বলে একটা জলচৌকির ওপর উঠে খুব সাবধানে কাপপ্লেটের র‍্যাকের ওপর বসে থাকা মুরগিটার দিকে হাত বাড়ায় দয়ী।

পিছন থেকে বাবুন মৃদু স্বরে বলে, ইউ হ্যাভ এ নাইস ফিগার আন্টি। থার্টি সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স।

হাসতে গিয়ে মুরগিটা উড়ে পালাল। দয়ী বলে, খুব পাকা হয়েছিস বাবুন। স্কুলে এসব শেখাচ্ছে বুঝি!

সিওর। উই ইভন ডেট দি গার্লস।

মাই গড!

মুরগিটা গ্যাস সিলিন্ডারের পিছনে লুকোতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ল। নড়তে পারল না। দয়ী হাত বাড়িয়ে ঠ্যাং ধরে টেনে আনল সেটাকে। বলল, আমরা যখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তাম তখন এত পাকা ছিলাম না।

আই নো ইউ হ্যাড এ বানচ অফ লাভারস।

মারব থাপ্পড়।— বলে হাসিমুখেই দয়ী মুরগিটার গলা নামিয়ে দিল।

কাট থ্রোট।— বাবুন বলে।

দরজায় টোকা দিয়ে মৃন্ময়ী সভয়ে বলে, কী করছিস তোরা ভিতরে? কী ভাঙলি ও বাবুন? মুরগিগুলো অমন চেঁচাচ্ছিল কেন রে? আমি বাথরুমে পর্যন্ত থাকতে পারছিলাম না চেঁচানিতে।

বাবুন মৃদুস্বরে বলে, শি ইজ এ মেন্টাল কেস।

দয়ী বলে, ওরকম বলতে নেই বাবুন।

শি হ্যাড অলসো এ লাভার ইউ নো। এ ব্যাড গাই।

দয়ী স্তম্ভিত হয়ে যায়। জামাইবাবু কি ছেলের কাছেও মৃন্ময়ীর অতীত ঘটনা খুলে বলেছে! লজ্জায় লাল হয়ে গেল সে। কঠিন চোখে বাবুনের দিকে চেয়ে বলে, হু টোল্ড ইউ?

বাবুন চাউনি দেখে একটু ভয় পেয়ে অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলে, আই নো। এভরিওয়ান নোজ।

দয়ী বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে বলল, আয় দিদি, হয়ে গেছে।

মৃন্ময়ী দরজার কাছ থেকেই দৃশ্যটা দেখে শিউরে ওঠে। ভাঙা ডানা, ছেঁড়া পালক, রক্ত মাখামাখি। ছ'টা বিচ্ছিন্ন মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে একধারে, অন্য ধারে স্তূপাকার মুরগির শবদেহ। মৃন্ময়ী বলল, আহা রে! কষ্ট দিসনি তো ওগুলোকে দয়ী?

কষ্ট কী? মরে বেঁচেছে।

বাবুন তার ছুরি বন্ধ করে পড়ার টেবিলে ফিরে গেছে।

দয়ী মুরগির পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, বাবুনটাকে তোরা কি শাসন করিস না দিদি? ও কীসব যেন বলছিল!

মৃন্ময়ী তার ভেজা এলোচুলে গামছার ঝটকা দিচ্ছিল দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে। থেমে গিয়ে বলল, কী বলছিল?

তোর লাভারের কথা।

মৃন্ময়ী উদাস মুখে বলে, সবাই বলে, ও-ই বা বলবে না কেন?

দয়াময়ী মুখ তুলে কঠিন স্বরে বলে, না, বলবে না। বললে ওর মুখ থেঁতো করে দিবি। তোর ভয় কীসের?

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, পেটে ধরলে তো হয় না, বাবুন তো আমার নয়। ওর বাবার।

দয়ী কথা বাড়ায় না। অনেক কাজ।

বিকেল হয়ে আসতে না আসতেই মৃন্ময়ী তাড়া দেয়, রান্না তাড়াতাড়ি শেষ কর। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আয়। আমি শাড়ি বের করে রেখেছি।

আমি সাজব না দিদি। রান্না করতে ডেকেছিলি, করে দিয়ে গেলাম।

শুধু তাই বুঝি? বোকা কোথাকার!— মৃন্ময়ী খুব ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে, কত ভাল ছেলে জানিস না তো! এরকম আর কপালে জুটবে না।

জুটে দরকার নেই।

বলে বটে দয়ী, আবার সাজেও।

বেলা থাকতেই সরিৎ অফিস থেকে ফিরল। মোটা-সোটা নাড়ুগোপালের মতো চেহারা, কিন্তু কঠিন এক বোকা ব্যক্তিত্ব। দেখলেই মনে হয় এ লোকটা তেমন বুদ্ধিমান নয়, তবে জেদি এবং গোঁয়ার। সব সময়ে মুখে একটা অহংকারী গম্ভীর ভাব। হাসি ঠাট্টা করে না, গল্প জমাতে বা আড্ডা মারতে ভালবাসে না, গান গায় না, বই পড়ে না। তার সব মনোযোগ ছেলের ওপর। অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধোয়ার আগেই ছেলের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে, সেদিনকার স্কুলের পড়া দ্যাখে। বিকেল হলে ছেলেকে খেলতে নিয়ে যায় পার্কে। রাত্রিবেলা ফের ছেলেকে পড়াতে বসে। এ জীবনে আর কোনও আনন্দ বা অবকাশের তোয়াক্কা করে না। মৃন্ময়ীর সঙ্গে কদাচিৎ কেউ তাকে কথা বলতে শুনেছে। তবে এও সত্য যে, মৃন্ময়ী সম্পর্কে নোংরা কৌতূহলেরও তার অভাব নেই। এখনও সে মৃন্ময়ী সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়, অতীতের আরও কোনও গুপ্ত ইতিহাস আছে কি না জানার চেষ্টা করে। লোকটাকে আদপেই পছন্দ করে না দয়ী।

সরিৎ ঘরে ঢুকে তোম্বা মুখ করে অবজ্ঞার চোখে একবার দয়ীকে দেখে বলে, কখন এলে?

দয়ী বলল, অনেকক্ষণ।

ভাল।— বলে সরিৎ শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

সরিতের চলে যাওয়ার দিকে একরকম ঘৃণা ও আক্রোশভরা চোখে চেয়ে রইল দয়ী।

॥ সরিৎ ॥

বাবুন আজকাল স্কুলের সাপ্তাহিক পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করছে। খাতায় কোনওখানে একটুও দাগ পড়ে না। তার স্কুলটি খুবই ভাল, কলকাতার একেবারে শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির একটি। সেখানে ছেলে ভর্তি করতে লোককে মাথা কুটতে হয়। সেখানকার বেশির ভাগ ছেলেই ব্রিলিয়ান্ট। তাদের মধ্যেও বাবুন আলাদা রকমের ব্রিলিয়ান্ট। স্কুলের কর্তৃপক্ষ তার দিকে বিশেষ নজর রাখছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সে কোনও দারুণ ঘটনা ঘটাতে পারে।

সরিৎ খুব মন দিয়ে বাবুনের স্কুলের খাতাপত্র দেখল। দু'-একটা প্রশ্ন করল। ছেলের সঙ্গে সে কখনও বাংলায় কথা বলে না। বাপ আর ছেলে কেবল ইংরিজিতেই বাক্যালাপ করে। তাতে অভ্যাস ভাল থাকে। তা বলে বাবুন বাংলায় কাঁচা নয়। খাতা দেখে গভীর তৃপ্তির একটা শ্বাস ফেলে বাবুনের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল। তখন বাবুন আস্তে করে ইংরিজিতে বলল, আজ মা কাঁদছিল দয়ী আন্টির কাছে।

সরিৎ খুব নিচু গম্ভীর গলায় বলল, কেন?

ঠিক শুনতে পাইনি। বোধহয় বলছিল সবাইকে সে ভয় পায়।

সেটাই পাওয়া উচিত।

দয়ী আন্টি মায়ের পক্ষে।

আমি জানি।

আন্টি বলছিল আমাকে নাকি মারা উচিত।

সাহস থাকে তো মারুক না। বাড়ি থেকে দু'জনকেই বের করে দেব।

সরিৎ রাগে ফুঁসে ওঠে। সমস্ত শরীর জ্বলে যায় তার। এত সাহস কোত্থেকে পায় এরা? এরা তো কোনও দিক দিয়েই তার বা বাবুনের সমকক্ষ নয়। মার্কামারা গুন্ডার মেয়ে। একটা এক মস্তানের সঙ্গে ভেগেছিল, অন্যটা পুরুষ নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। দয়ীর ইতিহাস বেশ কিছুটা জানে সরিৎ। ওদের পাড়ার একটা ছেলে সরিতের ডিপার্টমেন্টে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। মাঝে মাঝে সে অনেক খবর দেয়। আগে ভয়ে মুখ খুলত না। কিন্তু তার ভয় ভেঙে দিয়ে মুখ খুলিয়েছে সরিৎই।

গা গরম হয়ে আছে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, তার ওপর রাগ। সরিৎ বাথরুমে আজ অনেকক্ষণ শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করল। স্নান করতে করতেই ক্ষীণ কলিং বেলের আওয়াজ পেল। বিনয় এল বুঝি!

দয়ীকে আজ এ বাড়িতে ডেকে পাঠানোর মূলে যে একটা ষড়যন্ত্র আছে তা সরিৎ আন্দাজ করেছে। পরশু মৃন্ময়ী যখন টেলিফোন করছিল দয়ীকে তখন বাবুন সবটা শোনে এবং পরে বাবাকে বলে দেয়।

তখনই সরিৎ বলেছিল, চিকেন রয়্যাল মাই ফুট। দে হ্যাভ আদার মোটিভস।

এমনকী বিনয়কে নেমন্তন্ন করার ইচ্ছেও সরিতের ছিল না। সে সামাজিক ভদ্রতা সৌজন্যর ধার ধারে না। বরং বাইরের কোনও লোক বাড়িতে এলে সে বিরক্তি আর অস্বস্তি বোধ করে। সে চায় সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে থাকতে। এই উটকো ঝামেলা জুটিয়েছে মৃন্ময়ী। একদিন বলল, বিনয়কে আমাদেরও নেমন্তন্ন করা উচিত। প্রেস্টিজের ব্যাপার।

মৃন্ময়ী সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। তবে আকাশ বাতাসকে উদ্দেশ করে যা বলার বলে।

শুনে প্রথমে পাত্তা দেয়নি সরিৎ। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে, মৃন্ময়ী কিছু অন্যায় বলেনি। বিনয় মৃন্ময়ীর জন্য দামি সিনথেটিক শাড়ি আর সেন্ট এনেছে আমেরিকা থেকে, বাবুনকে ভিউ মাস্টার আর সরিৎকে স্যুটের কাপড় দিয়েছে। বিনয় তার পিসতুতো ভাই হলেও তাদের পরিবারেরই মানুষ। পিসিমা ছেলে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা, বাবা তাকে নিজের পরিবারে এনে রাখেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতাবশে বিনয় এটুকু দিতেও পারে। কিন্তু সরিৎ আর একটা কথাও ভেবেছে। তার ইচ্ছে স্কুলের পড়া শেষ করেই বাবুনকে বিদেশ পাঠিয়ে দেবে। বিনয়ের সঙ্গে একটা এ ধরনের কথাও হয়েছে। সুতরাং বিনয়কে একদিন নেমন্তন্ন খাওয়ালে মন্দ হয় না। বাবুন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও কিছুর ওপর তার তেমন আকর্ষণ নেই। তার যা কিছু স্বার্থ তা বাবুনকে ঘিরে। বাবুনের জন্য সে সব কিছু করতে পারে।

আর একটুক্ষণ জলের ধারার নীচে দাঁড়ালে ভাল লাগত। কিন্তু দেরি করতে মন সরল না। ওদিকে এতক্ষণে বিনয়ের সঙ্গে দয়ীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই মৃন্ময়ী। কিছু বলা যায় না, এলেমদার মেয়ে দয়ী হয়তো প্রথম দর্শনটাই কাজে লাগিয়ে দেবে। ব্যাপারটায় বাধা দেওয়া খুব জরুরি। মৃন্ময়ীর বাড়ি থেকে কোনও মেয়েই আর তাদের বাড়ির বউ করে আনা ঠিক নয়।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে সরিৎ বাইরের ঘরে এসে একটু অবাক হয়। বিনয় সোফায় বসে কেবল মৃন্ময়ীর সঙ্গে কথা বলছে। দয়ী কাছে-পিঠে নেই।

বিনয় তার বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, তুমি তো এমনিতে স্মোক করো না। এটা একটা খেয়ে দেখবে নাকি? নরম টোব্যাকো।

খুব শখ হলে এক আধটা কখনও-কখনও খায় সরিৎ। তবে ধোঁয়াটা কখনও গেলে না। তাছাড়া ছেলের সামনে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে তার ভারী সঙ্কোচ। তবু আজ একটা ধরাল। বলল, পাত্রী পছন্দ করেছিস?

কই পাত্রী? কত দেখলাম।

একজনও পাশমার্ক পেল না?

খুঁজে দাও না। আমার তো বেশি সময়ও নেই।

মৃন্ময়ী সরিতের সামনে খুবই অপ্রতিভভাবে বসে ছিল। হঠাৎ বলল, পাত্রী ঠিক পাবে। চিন্তা কোরো না।

হাতে আছে নাকি?— বিনয় জিজ্ঞেস করে। তারপর বলে, রোজ দু'-দশটা করে চুল পেকে উঠছে। থাকলে আর বেশি দেরি কোরো না বউদি। এটাই ইন্ডিয়ান মেয়েদের শেষ চান্স। এখানে পছন্দমতো না পেলে ফিরে গিয়ে একজন আমেরিকানকেই বিয়ে করব।

না না!— খুব সিরিয়াস গলায় প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপর সরল মনে বলে দেয়, আমার মেজো বোনকে দেখে যাও। খারাপ লাগবে না।

কই সে?— জিজ্ঞেস করে বিনয়।

আছে। আজ ওর হাতের রান্নাই তো খাবে।

বিনয় অবাক হয় না। বোধহয় নিমন্ত্রণের ছলে এরকম আরও বেশ কয়েকবার তাকে পাত্রী দেখতে হয়েছে। দুটো পা সামনে টান করে মেলে দিয়ে পিছনে হেলে বসে বলে, যাক বাবা বাঁচা গেল। তোমার বোন তো, সে নিশ্চয়ই তোমার মতো ভাল স্বভাবের হবে। না দেখেই ফিফটি পারসেন্ট পছন্দ করছি। এবার ডাকো।

চা নিয়ে আসছে। এই দয়ী।— বলে ডাক দিয়ে উঠে যায় মৃন্ময়ী।

বিশ-বাইশ বছর বয়সে অনেক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে প্রথম জার্মানিতে গিয়েছিল বিনয়।

দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ শিখেছে সেখানে। তারপর সুযোগ বুঝে চলে গেছে আমেরিকায়। সাত ঘাটের জল খেয়ে এখন সে প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত। মেদহীন রুক্ষ চেহারা, চালচলনে খুব চটপটে, প্রচণ্ড সময়নিষ্ঠ, সরল ও সৎ। জীবনে কোনও কাজে ফাঁকি দেয়নি বিনয়। মস্ত কোনও ডিগ্রি নেই, কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করার মহার্ঘ্যতম অভিজ্ঞতা আছে। সরিৎ নিজে ইঞ্জিনিয়ার, সে অভিজ্ঞতার মূল্য বোঝে। সাহেবরা আরও বোঝে। এই খাঁটি ছেলেটির গলার দয়ীকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলা এমনিতেই সহজে ফুরোতে চায় না, তার ওপর সাততলায় যেন আরও কিছুক্ষণ আলোর রেশ থেকে যায়। সাড়ে ছ'টা বেজে যাওয়ার পরও ঘরের আলো জ্বালাবার তেমন দরকার পড়ছে না। কিন্তু মৃন্ময়ী আলো জ্বালল। দপদপ করে লাফিয়ে জ্বলে ওঠে দু'-দুটো স্টিক লাইট আর একটা একশো পাওয়ারের বালব।

অপ্রতিভ হাসিমুখে মৃন্ময়ী বলে, এই আমার বোন দয়াময়ী।

ট্রে হাতে দয়াময়ী এগিয়ে আসে লঘু পায়ে। খুব যে সেজেছে তা নয়। চালাক মেয়ে, সাজতে জানে। হালকার ওপর প্রসাধনের সামান্যতম প্রলেপ দিয়েছে মাত্র। পরনে তাঁদের সাদা খোলের শাড়ি। কিন্তু শাড়িটার নকশাওয়ালা পাড় এতই চওড়া যে জমি প্রায় ছাড়ই পায়নি। তাছাড়া আছে সুন্দর মস্ত মস্ত বুটির কাজ। ব্লাউজটা খুবই তুচ্ছ একটা ন্যাকড়া মাত্র। এত ছড়িয়ে কাটা যে পুরো কাঁধ, পিঠ এবং স্তনের ঢেউ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। আদুড় রয়েছে পেটের অনেকটা অংশ। দেখে চোখ সরিয়ে নেয় সরিৎ। সিগারেটে মৃদু টান দেয় এবং আনাড়ির মতো ধোঁয়া ছাড়ে।

দয়াময়ীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল বিনয়। দু'হাত জড়ো করে খুব গভীর আন্তরিকতায় ভরা নমস্কার জানিয়ে বলে, ভারী খুশি হলাম পরিচয় হয়ে।

দয়ী খুব চমৎকার একটা স্মার্ট হাসি হেসে বলে, ওটা তো গ্ল্যাড টু মিট ইউ-এর অনুবাদ। আমাকে দেখে খুশি হওয়ার কিচ্ছু নেই। আমি একদম খারাপ। জামাইবাবুর কাছে হয়তো আমার অনেক নিন্দা শুনবেন।

কথাটা বলে একঝলক তাকায় দয়ী। সেই দৃষ্টিটা বুলেটের মতো লাগে সরিতের বুকে। এটা কি দয়ীর খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ? খুবই চালাক মেয়ে। মৃন্ময়ীর মতো বোকা আর সরল নয়। ও আঁচ করে নিয়েছে, জামাইবাবু এ বিয়ে আটকানোর চেষ্টা করবে।

বিনয় মৃদু হাসছিল। বলল, বুধোদার মুখে বড় একটা নিন্দে শুনিনি কারও। তাছাড়া আপনি তো অনিন্দ্য।

সরিতের ভিতরে মৃদু দহন শুরু হয়। খুব ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা। খুব আনাড়ির মতো আর একবার ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে করেই বলে, আমিও তাই বলি। ওর নিন্দে করবে কে? দয়ীর কত অ্যাডমায়ারার!

বিনয় হাসিমুখে দয়ীকে বলে, আপনার অ্যাডমায়ারারদের লিস্টে আজ থেকে আমাকেও ধরে রাখুন।

সরিৎ চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্ট্র্যাটিজিটা ভেবে নিল। তারপর আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল, দয়ীর অ্যাডমায়ারারদের মধ্যে হাজার রকমের ভ্যারাইটিও আছে। প্রায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্র, অধ্যাপক, রাজনীতির মস্তান, পাড়ার গুন্ডা, বুড়ো কামুক, কে নয়? ও প্রায় কাউকেই হতাশ করে না।

বলে কথাটার প্রতিক্রিয়া দয়ীর মুখে খুঁজে দ্যাখে সরিৎ। দয়ী তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাতে ভয় নেই, অপ্রতিভতা নেই, আছে ভীষণ রকমের একটা ঘেন্না। সরিৎ আপনমনে হাসল। খুশি হল সে। এরকমটাই সে চায়।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তির হাওয়া বইছে। বিনয় যতদূর সম্ভব নির্বিকার মুখে আস্তে করে বলে, বাবুনকে দেখছি না।

ডাইনিং টেবিলের পাশে কাঠের পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী। প্রবল হতাশায় নীচের ঠোঁট ওপরের দাঁতে কামড়ে ধরছে মাঝে মাঝে। সে আজকাল রাগ করতে ভয় পায়। তার আছে কেবল হতাশা।

দয়ী সবশেষে নিজের কাপে চা ছেঁকে নিচ্ছিল মাথা নিচু করে। বিনয়ের কথার জবাবে বলল, বাবুন বোধ হয় ছাদে। দাঁড়ান, ডেকে আনছি।

তার দরকার কী? খেলছে খেলুক। চলুন বরং আমরাই একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি। গরমে বসতে ইচ্ছে করছে না এখানে।— বলে বিনয় একটু নড়ে বসে।

এই কথায় সরিৎ নিজের ভিতরে একটা পরাজয় টের পায়। ওরা ছাদে যাবে? তার মানে তো অনেকখানি। সে একবার দয়ীর দিকে তাকায়। দয়ীও ঠোঁটে ধরে থাকা পেয়ালার কানার ওপর দিয়ে একঝলক তাকায় সরিতের দিকে। সেই চোখে জয়ের ঝিকিমিকি।

যেন কিছুই ঘটেনি এমন শান্তস্বরে সরিৎ বলল, দয়ী, তোমার সেই অ্যাডমায়ারারটির কী যেন নাম! মলয় না? ওঃ বিনয়, সে ছেলেটা দয়ীর জন্য যা পাগল না! যে কাউকে খুন করতে পারে ছোকরা। ছেলেটা কিলার টাইপেরই। নকশাল ছিল। ছোকরার দোষও নেই। দয়ীর সঙ্গে নাকি ডাকবাংলো-টাংলোয় রাত-টাতও কাটিয়েছে। কাজেই এখন তার অধিকারবোধ জন্মেছে।

সিনেমা থিয়েটারে যেমন ফ্রিজ শট বা দৃশ্যের চলন হয়েছে আজকাল, সরিৎ লক্ষ করল, ঘরের তিনটে প্রাণী তেমনি নিথর শিলীভূত হয়ে গেল।

সেই অনড় দৃশ্যের মধ্যে প্রথম নড়ল বিনয়। আস্তে করে বলল, বুধোদা ইউ শুড নট...

কথাটা শেষ করল না বিনয়। সরিৎ আর একটা সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, আমি জাস্ট সিচুয়েশনটা জানিয়ে রাখছি। আমি কিছু ভুল বলিনি তো দয়ী?— বলে সরিৎ দয়ীর দিকে তাকায়।

দয়ীর হাত সামান্য কাঁপছে। চলকাচ্ছে কাপের চা। বুদ্ধিমতী দয়ী কাপটা রেখে দিল টি-পয়ে।

তারপরই হঠাৎ হাসিমুখ তুলে বিনয়কে বলল, ছাদে যাওয়ার কথা ছিল যে! যাবেন না?

বিনয় ধেয়ে-পেয়ে উঠে পড়ে। বলে, নিশ্চয়ই।

দয়ী চিমটি কাটা হাসি হেসে বলে, এ ঘরটা বড্ডই গরম।

দু'জনে প্রায় ঘরবন্দি পাখির মতো হঠাৎ একটু ফোকর পেয়ে প্রাণপণ পাখা ঝাপটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সরিৎ জানে, আজ রাতে দয়ী কাঁদবে। মেয়েরা অপমানিত হলে কাঁদে, দোষ ধরা পড়লে কাঁদে। ও কাঁদবে।

সরিৎ তৃপ্ত মনে চায়ের তলানি শেষ করে পট থেকে আরও এক কাপ ঢেলে নেয়। চা-টা এবার ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু লিকার আরও গাঢ়, চনমনে।

ঘরে যে আর কেউ আছে তা গ্রাহ্যই করেনি সে। কিন্তু না থেকেও মৃন্ময়ী আজ ছিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বলল, দয়ীর অত খবর তুমি জানলে কী করে?

সরিৎ তার স্ত্রীর দিকে পারতপক্ষে তাকায় না। তার সামনেই বিশাল দেওয়ালজোড়া দরজাটা খোলা। বাইরে আকাশে তখনও খানিকটা পাঁশুটে আলো। সে তাই দেখছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, প্রমাণ আছে।

মৃন্ময়ী অবাক হয়ে বলে, কীসের প্রমাণ? দয়ী আমার মতো নয়।

তোমরা সবাই সমান। এখন বেশি কথা বোলো না, আমার ভাল লাগছে না।

মৃন্ময়ী হয়তো ভয় পেল, তবু আজ ছাড়ল না। দয়ীর পরিত্যক্ত সোফায় বসে বলে, বিয়েটা তো ভেঙেই দিলে, তাহলে আর বলতে দোষ কী?

সরিৎ বহুকাল বাদে মৃন্ময়ীর দিকে একবার তাকায়। পরমুহূর্তেই ফিরিয়ে নেয় চোখ। আজকাল তার কী যে হয়েছে, কারো চোখেই দু' দণ্ড চোখ রাখতে পারে না। আপনা থেকেই চোখ ফিরে

আসে। সরিৎ অন্যদিকে তাকিয়ে টবের মানিপ্ল্যান্ট দেখতে দেখতে বলে, মলয়ের লেখা একটা চিঠি আমার হাতে এসেছে।

মৃন্ময়ী বলল, কী করে এল?

তাতে তোমার দরকার কী? এসেছে যেভাবেই হোক।

মৃন্ময়ী একটুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, মলয়কে আমি চিনি। দয়ীর বন্ধু। আজকাল বন্ধুদের মধ্যে ওসব হয় না।

সবই হয়।

চিঠিটা আমাকে দেখাবে?

সরিতের এবার বুঝি একটু লজ্জা করে। বলে, দেখার কিছু নেই। যা বলেছি তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারো।

মৃন্ময়ী খুব নিবিড় চোখে লক্ষ করছে সরিৎকে। বলে, অবিশ্বাস করিনি। শুধু দেখতে চাইছি। একটা কারণ আছে।

কী কারণ?

ক'দিন আগে বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বাবুন সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। তখন পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করে পড়ছিল দেখেছি। আমি কিছু বুঝতে পারিনি তখন। মলয়ের চিঠি কি বাবুনই তোমাকে এনে দিয়েছে?

সরিৎ আর একবার স্ত্রীর দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু এবার তাকাতেই পারল না। তবে গলায় প্রচণ্ড ঝাঁঝ তুলে বলল, দিলে কী করবে? মারবে?

তা কেন? বাবুনকে মারব সে সাধ্যি কি আমার আছে?

সাধ্যি না থাকাই মঙ্গল। দয়ীকেও সেটা বুঝিয়ে দিয়ো। ও নাকি আজ বাবুনকে মারার কথা তোমাকে বলছিল। ওকে বলে দিও ওর বাপ যত বড় গুন্ডাই হোক আমার বাবুনের গায়ে যদি কেউ হাত তোলে তার হাতখানা আমি কেটে দেব।

মৃন্ময়ী খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এ কথার কোনও জবাব দিল না। সরিতের হঠাৎ চাগিয়ে-ওঠা রাগটা পড়ে যাওয়ার জন্য সময় দিল। তারপর বলল, বাবুনকে কেউ মারবে না। এখন বলো তো, চিঠিটা কি বাবুন তোমাকে চুরি করে এনে দিয়েছিল?

চুরি করতে যাবে কেন? সাম হাউ অর আদার চিঠিটা ওর হাতে এসে গিয়েছিল, ও পকেটে করে নিয়ে এসে আমাকে দেয়।

অন্যের চিঠি জেনেও সেটা আনা কি বাবুনের উচিত হয়েছে?

সে বিচার আমি করব। বাবুন কিছু অন্যায় করেনি। চিঠিটা সে আমার হাতেই এনে দিয়েছে।

তা হোক, তবু সেটা অন্যায়। তুমিই বা দয়ীর চিঠি পড়তে গেলে কেন? কেন বাবুনকে শাসন করলে না?

সরিৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে, দয়ী যা করে বেড়াচ্ছে সেটা বেশি অন্যায়, না চিঠি পড়াটা বেশি অন্যায়? এই বাজে ক্যারেকটারের মেয়েটাকে আমার ভাইয়ের গলায় ঝোলাতে চাইছ, সেটাও কি অন্যায় নয়?

সরিতের চিৎকারে মৃন্ময়ী মিইয়ে গেল। সরিৎ লাল হয়ে যাচ্ছে রাগে, ঠোঁটে ফেনা জমছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মৃন্ময়ী। তারপর আস্তে করেই বলল, দয়ীর কথা নাই বা ভাবলে। ও খারাপ ভাল যাই হোক, তোমার বা বাবুনের দিকটা তো ভাববে! ও কেন চিঠিটা পড়ল? কত বাজে কথা থাকে প্রেম ভালবাসার চিঠিতে! ও সেগুলো পড়েছে ভাবতেই যে গা ঘিনঘিন করে।

অন্য হাতে টর্চ। একেবারে কাছাকাছি এসে ছোকরা আমাকে দেখে হয়তো থমকে গিয়েছিল। দপ করে টর্চের আলো মুখে ফেলে মুখটা চিনে নিয়েই একদম পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করলাম। ফাঁকা মাঠে গুলির শব্দটা প্রায় শোনাই গেল না। ছোকরা কোঁস করে একটা শব্দ করে কুঁকড়ে পড়ে গেল। আর দেখার কিছু ছিল না। মুখ ফেরাতেই দেখি আমার পিঠ ঘেষে দয়ী দাঁড়িয়ে আছে। স্থির-চোখে কিছুক্ষণ ছোকরার মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানি দেখল, তারপর আমার দিকে মুখ ফেরাল। শান্ত মুখ, চোখে সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টি। আমার ভয় ছিল, দয়ী হয়তো চেঁচামেচি করবে, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাবে। আশ্চর্য, তার কিছুই হল না। আমি স্পট থেকে কখনও দৌড়ে পালাই না। তাতে বেশি বিপদ ঘটে। খুব স্বাভাবিক চালে একটু ঘুরপথ হয়ে আমরা বড় রাস্তায় উঠলাম এবং যেন বেড়িয়ে ফিরছি ঠিক এমনভাবে বাজারের ভিতর দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। পথে একটা চায়ের দোকানে বসে চাও খেলাম। কপাল ভাল বলতে হবে। খুনটা নিয়ে হই-চই হলেও আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি। করার কারণও ছিল না। গিধনিতেও তখন দু' দঙ্গলে ঝগড়াঝাঁটি মারপিট চলছিল কী নিয়ে। সন্দেহ গিয়ে পড়ল বোধহয় সেই ছোকরার উলটো দলের ওপর। সে যাকগে। সেই রাতে দয়ী আমাকে শরীর দিয়েছিল। কিন্তু আমার সেদিন একরত্তি ইচ্ছেও ছিল না। মনটা ভার ছিল। এই প্রথম আমি নন-পলিটিক্যাল কারণে, কেবলমাত্র একটা মেয়েকে খুশি করতে একজনকে মারলাম। কিন্তু দয়ীর হল উলটোরকম। সেই রাতের মতো খুশি, আনন্দিত এবং উত্তেজিত দয়ীকে আমি আর কখনও দেখিনি। মনে মনে সেইদিনই ঠিক করি, দয়ীর পুরো সাইকোলজিটা আমাকে জানতে হবে। সারাজীবন ধরে বিশ্লেষণ করে, গবেষণা করে আমি দেখব দয়ীর জেনারেশনের মেয়েরা কতখানি নষ্ট হয়ে গেছে। রুকু, দয়ীকে আমার ছাড়া চলে না। আমার কাছে ওর অনেক ঋণ। আমি ওকে ভালবাসি বা না বাসি দয়ীকে আমি অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি। ব্যাপারটা হয়তো তুই ঠিক বুঝতে পারবি না। ইউ আর এ ব্র্যান্ডেড রোমান্টিক মাস্টারবেটার।

এবার রুকু আর ততটা অপমান বোধ করল না। কানটা লাল হল, মাথা নুয়ে এল ঠিকই, তবু মনে হল, মলয় তাকে এরকম অপমান করার অধিকার রাখে।

॥ রুকু ॥

রাতে রুকুর ভাল ঘুম হল না। শেষ রাতে সে একেবারেই জেগে গেল। এই এজমালি বাড়িতে ছাদে ওঠা বারণ, বারান্দা নেই। ফলে বাইরেটা দেখতে হলে সদর খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়।

ঘামে ভেজা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রুকু। মাথাটা বড্ড গরম। পাগলের মাথায় যেমন হাজারও ছেঁড়া টুকরো স্মৃতি ও কথা ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে বেড়ায় তার মাথাটাও আজ অমনি। আধো-ঘুমে বারবার একটা সুরে বাঁধা গানের লাইন ঘুরে বেড়াচ্ছিল মাথায়— ধুলায় হয়েছে ধূলি। ধুলায় হয়েছে ধূলি। কোন গানের লাইন তাও ঠিক মনে নেই। এখন জেগেও সে টের পাচ্ছে, প্রচণ্ড একটা বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত তার মাথা ভাঙা রেকর্ডে পিন আটকে যাওয়ার মতো গানের সেই কলিটা জপ করছে, ধুলায় হয়েছে ধূলি।

মলয়ের মতো রুকুর কোনও যৌন-জীবন নেই। সে কখনও মেয়ে-মানুষের স্বাদ পায়নি। বরাবরই সে ভিতু, লাজুক। কলকাতায় এসে তার মেয়ে বন্ধু জুটেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কারও খুবই ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। কিন্তু কী এক আশ্চর্যজনক কারণে তার ব্যক্তিগত যৌনক্ষুধাকে আজও অধিকার করে আছে সেই কবেকার সামান্য একটি মৃত মেয়ে তাপসী। এই অস্বাভাবিকতার কোনও ব্যাখ্যাও সে খুঁজে পায় না। কিন্তু বুঝতে পারে, এটা এক ঘোর বিকৃতি। বুদ্ধিমান মলয় সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

নিজেকে নিয়ে আজ ভারী মুশকিল হল রুকুর। এই ভোরের পরিষ্কার সুন্দর পরিবেশে সদর খুলে সে রাস্তায় পায়চারি করতে করতে কেবলই চাইছে রুকুর সঙ্গে সহাবস্থান ছিন্ন করতে। নিজেকে সে সহ্য করতে পারছে না মোটেই। বড্ড ছোট লাগছে, তুচ্ছ লাগছে, হাস্যকর মনে হচ্ছে।

সকাল হলে রুকু যখন দাড়ি কামাতে বসল তখন ছোট আয়নায় আজ বড় শীর্ণ ও লাবণ্যহীন দেখল নিজেকে। চোখ কোটরাগত, গাল বসা, দৃষ্টিতে দীপ্তি নেই।

কিছুই ভাল লাগল না আজ।

অফিসে এসে সে ফোন করল দয়ীকে।

দয়ী, আমি রুকু।

বলো।

মলয়ের সঙ্গে দেখা করেছি।

দয়ী খুব সিরিয়াস গলায় বলল, মলয় কিছু বলল?

সে অনেক কথা। এ কাজটার ভার আমাকে দিয়ে তুমি ভাল করোনি। মলয় কাল আমাকে খুব অপমান করেছে।

তোমাকে? তোমাকে অপমান করবে কেন? তুমি তো কিছু করোনি!

রুকু আচমকা জিজ্ঞেস করে, তুমি কোনওদিন মলয়ের সঙ্গে গিধনি গিয়েছিলে দয়ী?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় দয়ী বোধহয় একটু থতমত খায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, শুধু গিধনি কেন, আরও অনেক জায়গায় গেছি।

রুকু সামান্য ধৈর্য হারায়। বিরক্তির স্বরে বলে, কথাটা এড়িয়ে যেয়ো না দয়ী। তুমি যে মলয়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় গেছ সে আমি জানি, তুমিও বহুবার বলেছ। তবু আমি পার্টিকুলারলি গিধনির কথাটা জানতে চাই।

দয়ী সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোনও কারণে রেগে আছ রুকু? তোমাকে আমি কখনও রাগতে দেখিনি, মাইরি বলছি।

রুকু একটু লজ্জা পায়। গলা নামিয়ে বলে, রেগেছি কে বলল?

গলা শুনে মনে হচ্ছিল। মলয় কি তোমাকে খুব অপমান করেছে? দেখা হলে ওকে বলব তো।

কিছু বোলো না দয়ী, প্লিজ।— কাতর স্বরে বলে রুকু।

দয়ী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি গিধনির কথা কী জানতে চাইছিলে?

রুকু সতর্কভাবে তার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। ফোনের কাছাকাছি কেউ নেই। কেউ শুনছে না। একটু চাপা গলায় সে বলে, গিধনিতে তোমাকে খুশি করার জন্য মলয় একটা মার্ডার করেছিল দয়ী, মনে পড়ে?

মার্ডার!— দয়ী আকাশ থেকে পড়া গলায় বলে ওঠে, মার্ডার? কী বলছ তুমি?

রুকু একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর মিনমিন করে বলে, সেখানে শালবনে নাকি তোমাদের সঙ্গে একদল ছেলের গণ্ডগোল হয়েছিল?

দয়ী অবাক গলায় বলে, তা তো হয়েছিলই। ছেলেগুলো আমাকে আওয়াজ দেওয়ায় ঝগড়া লাগে। আমি একটা ছেলেকে চটিপেটা করেছিলাম। ওরা আমাদের ঘিরে ধরেছিল।

তারপর কী হয়েছিল দয়ী?

কী আবার হবে! সেই রাত্রে অপমানে আমি খুব কেঁদেছিলাম।

মলয়কে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলোনি?

বলেছি। তাতে কী ?

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় মলয় কি ছেলেদের সর্দারকে গুলি করে মারেনি?

স্নান করে খেয়ে অফিসে বেরোনোর সময়ে সে আকাশের পশ্চিম ধারে পিঙ্গল ঝোড়ো মেঘ দেখতে পেল। বাতাস কিছু জোরালো, খুব ধুলো উড়ছে। কয়েকদিনই পর পর বৃষ্টি হয়ে গেছে কলকাতায়। যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে অর্থাৎ গ্রামে-গঞ্জে তেমন হচ্ছে না।

ভ্রু কুঁচকে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে তাদের বড় গ্যারাজে ঢুকে মোটর-সাইকেলটা হিঁচড়ে বের করল। প্রচণ্ড ভারী আর বিপুল চেহারার এই জগদ্দলটা যে প্রাণ পেলে কী ভীষণ গতিতে ছুটতে পারে তার ধারণাই অনেকের নেই; মোটর-সাইকেলে স্টার্টারে পা রেখেই সে প্রশান্ত আত্মতৃপ্তি বোধ করে।

ঝোড়ো হাওয়া আসছে, বৃষ্টির গন্ধে মাখামাখি বাতাস। পারবে কি সে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেরিটিবাজারের অফিসঘরে পৌঁছোতে?

ক্র্যাশ হেলমেটটা মাথায় এঁটে নিয়ে স্টার্টারে লাথি মারে মলয়। খিদিরপুরের ঘিঞ্জি পেরিয়ে রেসকোর্সের গা ঘেঁষে অর্ধবৃত্তাকার চওড়া ফাঁকা রাস্তার ওপর হোন্ডা পৃথিবীর সব গতিকে যেন ছাড়িয়ে গেল। আইনস্টাইন বলেছেন, আলোর গতি প্রাপ্ত হলে যে-কোনও বস্তুই পর্যবসিত হয়। মলয় তেমনি এই বিদ্যুতের গতিতে যেতে যেতে তড়িতায়ত হয়ে গেল। সে আর তার মোটর-সাইকেল দু'য়ে মিলে যেন একটিই প্রাণ এক সত্তা। অবশ্য কলকাতার রাস্তায় গতির সুখ বড়ই ক্ষণিক। ডালহৌসি ঘুরে লালবাজার স্ট্রিট দিয়ে এসে সে ধরল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট। নাজ সিনেমার কাছাকাছি বাঁ হাতের গলিতে খানিক গিয়ে এক মস্ত পুরনো বাড়ি। ভিতরে এক বাঁধানো চত্বর ঘিরে বড় বড় টিনের গুদামঘর। সামনের দিকে পাঁচতলা বাড়ির তেতলায় তার অফিসঘর চত্বরে মোটর-সাইকেল রেখে ওপরে ওঠে মলয়।

সে না থাকলে অফিস সামলাবার দায়িত্ব পুণ্যর।

তাকে দেখে পুণ্যর সদাবিষণ্ণ মুখে ভাব একটুও বদলাল না। রোগা কালো ছোটখাটো নিরীহ পুণ্য লোহার চেয়ারে পা তুলে বসেছিল। মলয়কে দেখে শুধু পা দুটো নামিয়ে বসল।

মলয় জিজ্ঞেস করে, সব খবর ভাল তো?

হুঁ।

কে কে এসেছিল লিস্ট করে রেখেছ?

হুঁ।

দেখি।

পুণ্য একটা বাঁধানো একসারসাইজ বুক এগিয়ে দেয়। মলয় দেখতে থাকে। শেষ পৃষ্ঠায় নামের বদলে ছোট একটু লেখা: তোর সঙ্গে দরকার ছিল। আজ বিকেলে অফিসে থাকিস। রুকু।

মলয় তার হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে সস্তায় কেনা রিভলভিং চেয়ারে বসল। বলল, জল।

বশংবদ পুণ্য নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বারান্দায় রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনে কাচের গ্লাসে। জল খেয়ে মলয় বারোয়ারি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বসে এবং পুণ্যর দিকে কয়েকপলক তাকায়। কী করে পুণ্য এক হাতে গ্লাস ধরে সেই হাতেই জল গড়িয়ে আনে তা কখনও দেখেনি মলয়। তবে দরকার হলে মানুষ সবই পারে। কিছুকাল আগেও সে দেখেছিল কনুই থেকে দু' হাত কাটা একটা লোক দূরপাল্লার ট্রেনে সোডা লেমনেড ফেরি করছে। মস্ত ভারী লেমনেড বোঝাই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে চলন্ত গাড়ির এ কামরা থেকে ও কামরায় অনায়াসে যাতায়াত করত, ওই দুটো ঠুঁটো হাতেই বোতলের ঢাকনা খুলে স্ট্র ভরে লেমনেডের বোতল ধরত খদ্দেরের মুখের সামনে, পয়সা গুনে নিয়ে গেঁজেতে ভরে রাখত। পুণ্যর তো তবু একটামাত্র হাত নেই।

যে-সব গাঁয়ের ছেলে ভাল করে না বুঝেই পলিটিকসে নেমেছিল, পুণ্য তাদের একজন। খড়্গপুর-কাঁথি রাস্তায় নারায়ণগড়ে তার বাড়ি। বেশ ভাল ছবি আঁকত, তবলা বাজানোর হাত ছিল,

কমার্স স্ট্রিমে সেকেন্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কাঁথি কলেজে ভর্তিও হয়েছিল সে। একদিন ভাবের বশে দশক মুক্তির আন্দোলনে নেমে পড়ল। প্রতিপক্ষের বোমায় ডান হাতটা উড়ে যাওয়ার পর থামল এবং টের পেল, ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেছে তার ছবি আঁকা, তবলা বাজানো, লেখাপড়া এবং রাজনীতি। ক্ষত শুকিয়ে ওঠার পরও বেশ কয়েক মাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল পুণ্য। বেশ কয়েক বছর আগে আহত পুণ্যকে কাঁথি হাসপাতালে দেখে এসেছিল মলয়। পরে যখন সার আর কীটনাশকের ব্যবসাদার হয়ে সে আবার নারায়ণগড়ে যায় তখন দেখে, আধপাগলা পুণ্য বসে থাকে সারাদিন রাস্তার ধারের এক চায়ের দোকানের বেঞ্চে। কথা বলে না, বিড়বিড় করে আর লোক দেখলেই মাথা নিচু করে মুখ লুকোয়।

মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলেই মলয় গলে পড়ে না বা বিমর্ষ হয় না। তার মন অত নরম তো নয়ই, বরং সে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বোমা মেরে কমিয়ে ফেলারই পক্ষপাতী। পুণ্যর অবস্থা দেখে তার মোটেই দুঃখটুঃখ হয়নি। তবে তার কেমন মনে হয়েছিল আধ-পাগলা লোকেরা বড় একটা অসৎ হয় না। তাই পুণ্যকে তুলে আনল মলয়। একশো টাকা মাইনে দিত। এমনিতে পুণ্য তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। হিসেবে ভুল করে, অনেক কথা ভুলে যায়, অন্যমনস্ক থাকে। তবে পুণ্যর ধ্যানজ্ঞান এই অফিসটাই। একদিন সে মলয়কে বলল, আপনাদের বেয়ারাটাকে ছাড়িয়ে দিন না, জল চা আমিই দিতে পারব। মাইনে কিছু বেশি দিতে হবে। মলয়ের তাতে আপত্তি হয়নি। আগে বাইরে থেকে চা আসত। পুণ্য এখন সে পাট তুলে দিয়ে একটা জনতা স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম কিনে নিয়েছে। বাইরের দিককার বারান্দার কোণে একটু টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গা করে এক হাতে দিব্যি চা বানায়। তার জন্য আলাদা পয়সা নেয়। মলয়ের কোনও আপত্তি নেই। এই অফিসেই চব্বিশ ঘণ্টা থাকে পুণ্য। লোহার আলমারির পিছনে চটে জড়ানো তার একটা বিছানা আছে। রাতে হাফ সেক্রেটারিয়েটের ওপর বিছানাটা পেতে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে। দুশো টাকার মতো আয় করে। তা থেকে অর্ধেক বাড়িতে পাঠায়। অপদার্থ পুণ্যর এটাই ঢের সাফল্য।

নামের লিস্ট ধরে ধরে মলয় কয়েকটা টেলিফোন করে। বেশির ভাগই কাজ-কারবারের কথা। সবশেষে ফোনটা করল রুকুকে। বার চারেক ডায়াল করার পর পেল।

রুকু, তুই এসেছিলি?

হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল।

কী দরকার?

গিয়ে বলব।

বিকেলে আমি হয়তো অফিসে থাকব না। দিন সাতেক ছিলাম না, অনেকগুলো অর্ডার পিছিয়ে আছে।

কিন্তু টেলিফোনে তো বলা যাবে না।

কথাটা কী নিয়ে তা তো বলবি?

দয়ী।

দৈ? কীসের দৈ?

দয়ী দয়ী। দয়াময়ী।

ওঃ। দয়ীর আবার কী হল?

সেটাই তো বলতে আসব।

ধ্যাৎ। সিরিয়াস কিছু থাকলে বল। মেয়েছেলে নিয়ে কথা বলার কী আছে! ইজ এনিথিং রং?

একটু দ্বিধা করে রুকু বলে, তেমন কিছু নয়। আমি আসছি আজ। তুই থাকিস।

বলছি তো, থাকার অসুবিধে আছে।

রুকু একটু হাসল। বলল, অসুবিধে হলেও বোধহয় তোকে থাকতেই হবে। বাইরের দিকে চেয়ে দ্যাখ কী ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে।

বাস্তবিকই মলয় চোখ তুলে দেখল বাইরে পাঁশুটে আলো। ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে এইমাত্র বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি এল। মলয় বলল, ইডিয়েট। বৃষ্টি হলে আমি না হয় বেরোতে পারব না, কিন্তু তুই-ই বা বেরোবি কী করে? আমার অফিসে তোকে তো আসতে হবে।

রুকু একটু চুপ করে থেকে বলে, সেটাও কথা। তবু তুই থাকিস। দয়ী আমাকে ওর পক্ষের উকিল হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। মক্কেলকে ফেরাতে পারিনি।

কিন্তু মামলাটা কীসের?

গিয়ে বলব। জানিস তো অফিসের টেলিফোন খুব সেফ নয়।

জ্বালালি। আচ্ছা আয়।

বলে ফোন রাখল মলয়। বস্তুত বন্ধুদের মধ্যে রুকু তার সবচেয়ে প্রিয়। তার প্রিয় হওয়ার মতো কোনও কারণ রুকুর নেই। কোনও বিষয়েই তাদের মেলে না। রুকু শান্ত, চিন্তাশীল, রাজনীতি থেকে শত হাত দূরের লোক, হীনমন্যতায় ভোগে। তবু প্রিয়। বোধহয় অসহায় বলেই প্রিয়।

ঝড়বৃষ্টির দামাল ঝাপটা থেকে ঘর বাঁচাতে পুণ্য গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করল। ঘরের পাখাটা মলয় না বলতেই চালিয়ে দিল। কিন্তু পাখা ঘুরল না। কারেন্ট নেই। কিন্তু সেটা লক্ষ করল না মলয়।

মলয় ভ্রু কুঁচকে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে। আজ আর কাজ কিছু হবে না। বৃষ্টিতে কোনও পার্টিই আসবে না। একঘেয়ে অফিসঘরে বন্দি থাকার মতো শাস্তি তার কাছে আর কিছু নেই।

না বলতেই খুব বিনীত ভঙ্গিতে চা করে নিয়ে এল পুণ্য। মলয় ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকায়। পুণ্যর সঙ্গে আড্ডা মারার চেষ্টা বৃথা। কথা বললে অর্ধেকের জবাব দেয় না, বাকি অর্ধেকের জবাব দেয় হুঁ হ্যাঁ না করে। বেশ বোকাও আছে পুণ্য, তার ওপর পাগল। মলয় কথা বলার চেষ্টা করে না ওর সঙ্গে, শুধু কী করতে হবে তা বলে দেয়। পুণ্য সব সময়েই আদেশটা পালন করে। ও শুধু হুকুম তামিল করতে জানে।

মলয় চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আলোটা জ্বালিয়ে দাও।

জ্বালানোই আছে। কারেন্ট নেই। পুণ্য মাথা নিচু করে বলে।

এই ঝড়বৃষ্টির দুপুরে আর কেউ না আসুক, যে মারোয়াড়ি ছোকরা তার ব্যবসায় টাকা খাটাতে চাইছে সেই সইকুমার এসে হাজির। বর্ষাতিটা দরজার কোনায় টাঙিয়ে ঘরে এল। 'হাই' বলে মারকিন কায়দায় উইশ করে চেয়ার টেনে বসল। খুবই দামি ঝকঝকে হাওয়াই শার্ট আর ট্রাউজারস পরনে। বৃষ্টিতে একটু ভিজেছে। সইকুমার বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাই জানে, কিন্তু কথা বলে ইংরিজিতে। কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েরা যেমন বদহজমের মতো গোল্লা গোল্লা ইংরিজিতে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে কথা বলে তেমনি তার ইংরিজি। বলা বাহুল্য, সইকুমারও মধ্য কলকাতার এক নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছিল। তবে পরবর্তীকালে সে কয়েকবার বিদেশেও ঘুরে এসেছে। সে প্যারিস আর টোকিয়োর মেয়েমানুষদের কথা বলতে ভালবাসে।

সইকুমার বসেই বলল, আই ওয়েন্ট টু ব্যান্ডেল লাস্ট উইক। গট এ গুড সাইট ফর ইয়োর ল্যাবরেটরি। এ লিটল ওভার ফিফটিন থাউস্যান্ড অ্যান্ড এক্সপেনসেস।

মলয় কথা বলল না। তাকিয়ে রইল।

সইকুমার টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে মলয়ের দিকে খুব বন্ধুর মতো তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। তারপর বলে, ইউ আর গেটিং কোয়াইট বিগ অর্ডার্স। হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক সাম এফিসিয়েন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টস? দ্যাট হাফ উইট অব ইয়োরস, দ্যাট বাস্টার্ড পুণ্য ইজ গুড ফর নাথিং। আই কেম

লাস্ট ইভনিং টু আস্ক অ্যাবাউট ইউ অ্যান্ড দ্যাট ইডিয়ট অফ এ ম্যান জাস্ট কেপট মাম।

ইংলিশ মিডিয়ামের কৃপায় গোল্লা ইংরিজিতে মলয়ও একসময়েও কথা বলতে ভালবাসত। তারপর গাঁ গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষিবাসীর সঙ্গে কথা বলে বলে সে রোগটা গেছে। সে পরিষ্কার বাংলায় বলল, দ্যাখো সইকুমার, পুণ্য কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, ইংরিজি বোঝে। একদিন তোমার না থেঁতো করে দেবে।

সরি সরি। নো হার্ড ফিলিং!— বলে সইকুমার সোজা হয়ে বসে। ফরসা টকটকে তার রং, ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন তরুণ। খুবই স্মার্ট। হেসে বলল, নাউ টু বিজনেস। ব্যান্ডেলের সাইটটা কবে দেখতে যাবেন?

মলয় উদাস হয়ে বলে, তাড়া কী?

তাড়া আছে। ব্যান্ডেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেলটের মধ্যে। ওখানে জমি বেশিদিন পড়ে থাকবে না। ইন ফ্যাক্ট জায়গাটা আমার এত পছন্দ হয়েছে যে, আমি ফাইভ থাউস্যান্ড অ্যাডভান্সও করে এসেছি।

এই সব বদান্যতার পিছনে কী কূটকৌশল আছে তা নিজে ব্যাবসাদারের ছেলে হয়েও ঠিক বুঝতে পারছে না মলয়। দিনকাল যত এগোচ্ছে ততই মানুষ নানারকম নতুন প্যাঁচ বের করছে মাথা থেকে। সইকুমার নিজে টাকা ঢেলে তাকে প্রোডাকশনে নামাতে চায়, সেটা নিশ্চয়ই তাকে শিল্পপতি বানানোর জন্য নয়। পুরো ফিনান্সটা থাকবে ওর হাতে, মলয় হবে শিখণ্ডী— এরকমটাই ভেবেছে কি সইকুমার! নাকি মলয় নিজে থেকে প্রোডাকশনে নেমে একটা কিছু করে বসে সেই ভয়ে সইকুমার সেফটি ভালভ হিসেবে নিজে ওর ভিতরে ঢুকে বসতে চাইছে?

ভাবতে ভাবতে মলয় বলল, জায়গাটা তো আমার পছন্দ নাও হতে পারে।

কোনও ডিফিকালটি নেই। পছন্দ না হলে ছেড়ে দেব। ফাইভ থাউস্যান্ড ইজ নাথিং। না হয় তো জায়গাটা কিনে ফের বেচে দেওয়া যাবে। কাস্টমারের কমতি নেই। আজকাল লোক সব কিছু কেনে। জমি, বাড়ি, এনি সর্টস অব গুডস। বিজনেসম্যানরা বেচতে বেচতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

মলয় হাসল না, কিন্তু মজা পেল। চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক্রেতাদের ভিড় দিনরাত সেও তো দেখছে। বাজার গরম। সে বলল, এখনও আমি কিছু ঠিক করিনি সইকুমার। এজেন্সির জন্যই মেলা খাটতে হচ্ছে। প্রোডাকশনে গেলে আরও খাটুনি।

পয়সার জন্য খাটতে তো হবেই। কিন্তু প্রোডাকশনে আমি আছি, আপনার চিন্তা কি? এক্সপেরিয়েন্সড লোক রেখে দেব। এ লিমিটেড কোম্পানি ওয়ান্স এস্টাব্লিশড গোজ অন ইটসেলফ।

তারপর কী হবে সইকুমার? লিমিটেড কোম্পানি হবে, নিজে থেকে চলবে, প্রোডাকশন হবে, মাল বিক্রি হবে, কিন্তু তারপর কী হবে?

সইকুমার হাসল। ঝকঝকে দাঁত। বলল, ইট গোজ বিগার অ্যান্ড বিগার।

তারপর?

মার্কেট পেয়ে যাবেন, প্রোডাকশন বাড়তে থাকবে, এর মধ্যে কোনও তারপর নেই। এজেন্সির চেয়ে প্রোডাকশনের ইজ্জত বেশি।

মলয় তা জানে। তবু মনশ্চক্ষে সে একটা দাবার ছক দেখতে পায়। প্রতিপক্ষ খুব ভাল মানুষের মতো আপাততুচ্ছ চাল দিচ্ছে। সেই চাল কতটা বিপজ্জনক তা তাকে ভেবে দেখতে হবে। সইকুমারকে সোজাসুজি না বলতেও সে পারছে না। কারণ, ইচ্ছে করলে ও নিজের টাকাতেই প্রোডাকশনে নামতে পারে। কিন্তু যেহেতু মলয়কে টানতে চাইছে সেইজন্যই মলয়ের লোভ এবং সন্দেহ।

নিঃশব্দে পুণ্য এসে সইকুমারকে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

সইকুমার তার ডান হাতের ঢিলা ব্যান্ডে বাঁধা মস্ত ঘড়িটার দিকে চাইল। বিদঘুটে ঘড়ি।

ডায়ালের মধ্যে ছোট ছোট আরও গোটা কয়েক ডায়াল। একগুচ্ছের টাকা গেছে। সইকুমার বলল, দি ওয়েদার ইজ হেল। আজ গাড়ি নিয়ে ফেঁসে যাব।

চা খেয়ে সইকুমার উঠল। বলল, তা হলে ব্যান্ডেল কবে যাবেন? গাড়িতে ম্যাকসিমাম ওয়ান আওয়ারস জার্নি। একটু আউটিংও হবে। হাউ অ্যাবাউট নেক্সট সানডে?

দেখছি। আমি তোমাকে ফোনে জানাব।

সইকুমার চলে গেলে মলয় ধৈর্যভরে টেলিফোন করে করে বিভিন্ন কোম্পানিতে নতুন মালের অর্ডার দিল। বাঁকুড়ার বহু এজেন্ট তার হাতে এসে গেছে। সঙ্গে করে সে প্রায় দু' লাখ টাকার অর্ডার এনেছে, অনেক কাজ। আবহাওয়া এরকম না হলে সে নিজে গিয়ে কয়েকটা সাপ্লায়ারের সঙ্গে দেখা করত। বাইরে ঝড় কমেছে বটে, কিন্তু চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। দরজার কাচে জল জমে আছে। অন্ধকার এবং বদ্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গরম আটকে আছে ঘরের মধ্যে। আগে বৃষ্টিকে সে বৃষ্টি হিসেবেই দেখত। আকাশ থেকে জল পড়ছে আজকাল রোদ বা বৃষ্টির সঙ্গে চাষবাস এবং তার নিজের ব্যাবসাকে জড়িয়ে সে হিসেব করে।

চিঠিপত্রের একটা ছোটখাটো ডাঁই জমেছে। মলয় আবছা আলোয় কয়েকটা খুলে দেখল। ভাল পড়া যায় না। তাই আর চেষ্টা করল না। বসে বসে রুকুর কথা ভাবতে লাগল। রুকুর এমন কী জরুরি দরকার?

ভাবতে ভাবতে পাঁচ মিনিটও যায়নি, রুকু এসে হাজির। ছাতাটা মুড়ে দরজায় ঠেসান দিয়ে রাখতেই সেটা থেকে অঝোর জল ঝরে পড়তে থাকে। রুকুর জামাকাপড়ও সপসপে ভেজা। ছাতায় বৃষ্টি তেমন আটকায়নি বোঝা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই বলল, আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না দেখছি। রাস্তায় গোড়ালি সমান জল জমে গেছে। ট্র্যাফিক জ্যাম। ট্রাম বন্ধ।

মলয় স্থির চোখে চেয়ে দেখছিল রুকুকে। কোনও কথা বলল না। বৃষ্টিতে কলকাতার কী দুর্দশা হতে পারে তা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে?

রুকু এক গাল হেসে বলল, সারা পথ ভিজতে ভিজতে এলাম, আর যেই তোর অফিসের দোরগোড়ায় এসেছি অমনি বৃষ্টি থামল।

থেমেছে!— বলে লাফিয়ে ওঠে মলয়। গিয়ে এক ঝটকায় বারান্দার দরজা খুলে ফেলে। হা হা করে ঠান্ডা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে ঘরে ঢোকে। দু'-একটা জলকণাও সঙ্গে আসে বটে, তবে বৃষ্টি বাস্তবিকই থেমেছে।

মলয় ঘড়ি দেখে বলল, এখনও সময় আছে। দু'-একটা অফিসে ঢুঁ মারতে পারা যায়। তোর কথাটা চটপট সেরে ফেল।

রুকু দুঃখিত মুখ করে বলে, পুরনো বন্ধুকে এভাবে ঘাড়ধাক্কা দিতে হয়! দয়ী ঠিকই বলে, তুই আর আগের মতো নেই।

আগের মতোই চিরকাল যারা থেকে যায় তারা ইম্যাচুয়োরড। আমার কাজ-কারবার সবার আগে, তারপর সময় থাকলে ফ্রেন্ডশিপ। এখন গা তোল তো বাপ।

কোথায় যাবি?

চল তো।

রুকু ওঠে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাঁ হাতে কিছু দূর হেঁটে মলয় তাকে একটা দেড় তলার রেস্তরাঁয় নিয়ে আসে। টেরিটিবাজারে এমন চমৎকার ছিমছাম রেস্তরাঁ আছে তা যারা না জানে তারা ভাবতেও পারবে না।

মলয় টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে বলল, বল এবার।

রুকু কোনও ভণিতা করার সময় পেল না। চিরকালই মলয় কাঠখোট্টা গোছের। সোজা কথা বলতে এবং শুনতে পছন্দ করে। রুকু তাই চোখ বুজে বলে ফেলল, তুই দয়ীর পিছনে লেগেছিস কেন?

তোকে কি দয়ী একথা বলেছে?

বলেছে এবং বলছে। প্রায় রোজই টেলিফোন করে।

কী বলছে?

বলছে তুই ওকে বিয়ে করতে চাস। ও রাজি নয়।

তুই কি ওর সেভিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছিস? আমি ওকে বিয়ে করতে চাইলে তুই ঠেকাতে পারবি?

রুকু সামান্য অবাক হয়ে বলে, এটা গুহামানবদের যুগ নয় মলয়। নেগোশিয়েশনের যুগ। গা-জোয়ারি করছিস কেন? চাইলে বিয়ে করবি। তাতে কী? কিন্তু দয়ীরও তো মতামত আছে!

এবার মলয় সামান্য হাসল। টেবিলের কাছে একটা বেয়ারা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আলুর চপ, ঘুগনি আর চায়ের কথা বলে মলয় কিছুক্ষণ পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে সোজা হয়ে রুকুর দিকে চেয়ে বলল, সারাদিন দয়ীর কথা আমি পাঁচ মিনিটও ভাবি না। আমি কস্মিনকালেও দয়ীর প্রেমে পড়িনি। তবু আমি মনে করি দয়ীর আমাকেই বিয়ে করা উচিত।

কেন?

কারণ দয়ী আমার সঙ্গে একাধিকবার শুয়েছে।

শুনে রুকু কিছুক্ষণ কথাটার নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বলল, সেটাই কি যথেষ্ট কারণ?

সেটাই একমাত্র কারণ রুকু।

দয়ী তো এই কারণকে আমল দিচ্ছে না।

দেওয়া উচিত। শরীরটা তো ফ্যালনা নয় যে শরীরের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিতে হবে।

রুকু করুণ একটু হেসে বলল, দয়ী তোকে শরীর হয়তো দিয়েছে, কিন্তু মন বলেও তো একটা কথা আছে!

মলয় মাথা নেড়ে বলে, মন বলে দয়ীর কিছু নেই। দয়ী কেন, দয়ীর জেনারেশনের কারও নেই। ওসব বস্তা-পচা শব্দ। ইউজলেস। আমি যদি দয়ীকে বিয়ে করি তবে সেটা ওরই সৌভাগ্য।

রুকু মোলায়েম স্বরে বলে, তুই হঠাৎ দয়ীর জন্য খেপে গেলি কেন বল তো!

খেপেছি কে বলল?

তুই নাকি ওকে প্রেমপত্র লিখিস? আর তাতে নাকি সব ভাবের কথা থাকে!

মলয় মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, প্রেমপত্র লিখি বটে তবে কথাগুলো আমার নয়। চৌরঙ্গীর এক বুকস্টল থেকে 'ফেমাস লাভ লেটার্স' নামে একটা বই কিনেছিলাম। সেটা থেকে অনুবাদ করে দিই। প্রেমপত্র লেখার এলেম আমার কই? সময়ও পাই না।

রুকুর হাসি পেল না। গম্ভীর মুখে বলল, দয়ীকে ছেড়ে দে না মলয়। বেচারা এ বিয়ে চাইছে না। রিসেন্টলি ও নাকি একজন স্যুটেবল লোককে পেয়ে গেছে। সে বিয়ে করে দয়ীকে আমেরিকা নিয়ে যাবে। কিন্তু দয়ীর ভয়, তুই নাকি ঠিক সেই সময়ে বাগড়া দিবি। আফটার অল তুই যে ঘ্যাম নকশাল ছিলি সেটা ও ভুলতে পারছে না।

নকশাল ইজ এ ডেড পাস্ট। ওসব কথা ওঠে না। নকশাল ছাড়া কি ভয়ংকর লোক নেই? আমি নকশাল না হলেও ওর সুবিধে হত না।

তুই কী করতে চাস?

কিছু করব তো বটেই। তবে সেটা যে কী তা এখনও ঠিক করিনি। দয়ীকে কিডন্যাপ করলে কেমন হয়?

ইয়ার্কি মারিস না। কিডন্যাপ করলে পুলিশ-কেস।

বেয়ারা চপ আর ঘুগনি রেখে গেল। দারুণ ভাল গন্ধ ছাড়ছে। রুকু আর মলয় খেতে লাগল। খেতে খেতেই মলয় মুখ তুলে বলল, আমার চেহারাটা কেমন রে?

রুকু এক ঝলক চেয়ে দেখে গম্ভীর মুখেই বলে, চোঁয়াড়ের মতো। ইয়েট খানিকটা অ্যাপিল আছে।

অ্যাপিলটা কীসের? সেক্স?

ননা!

তবে?

খুব শক্তপোক্ত চেহারা। বোধহয় তোর মতো মানুষের ওপর মেয়েরা নির্ভর করতে পারে।

তবে দয়ী নির্ভর করতে চাইছে না কেন?

দয়ীও যে খুব শক্ত মেয়ে। ও চায় এমন পুরুষ যে ওর ওপরই নির্ভর করে।

ভ্রূ কুঁচকে মলয় বলে, তা হলে আমাদের ম্যাচ করে না বলছিস?

বোধ হয় না।

তা হলে আমেরিকা থেকে দয়ীর ভাল পাত্তর এসেছে!

তাই তো বলছে।

খামোখা একটা গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল মলয়। বলল, দয়ী আমাকে চায় না কেন জানিস?

আমাকে খুব একটা ভেঙে কিছু বলেনি। তবে বলছিল বন্ধুকে কি বিয়ে করা যায়!

সেটা কোনও কথা নয়। আমি একটা জিনিস মানি। ও যখন আমাকে শরীরটা দিয়েছে তখন বাকিটাও দেওয়া উচিত।

রুকু সহজে বিরক্ত হয় না। এবার হল। বলল, শরীরের কথা বার বার তুলছিস কেন? দয়ী হয়তো তোকে ছাড়াও আর কাউকে শরীর দিয়েছে। তা বলে সবাইকে বিয়ে করতে হবে নাকি?

খুব চোখা নজরে রুকুকে দেখল মলয়। তারপর বলল, তোর ধৈর্য কমে যাচ্ছে রুকু। আগের মতো তোর সহনশীলতা নেই।

রুকু লজ্জা পেল। তবে স্বীকার করল না।

বলল, তুই অত শরীর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

মলয় স্থির চোখে চেয়ে বলে, তোর একটা সুবিধে আছে রুকু। তোর শরীর লাগে না। তুই বোধহয় এখনও সেই কবেকার গুলি খেয়ে মরা তাপসীকে ভেবে মাসটারবেট করে যাচ্ছিস।

এই অপমানে রুকুর মুখের সুস্বাদু ঘুগনি ছাইয়ের মতো বিস্বাদ হয়ে গেল। চামচটা নামিয়ে রেখে কিছু সময় মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর প্রবল মানসিক চেষ্টায় মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মলয় সামান্য তেরছা হাসি হেসে বলল, কথাটা উড়িয়ে দিস না। মাসটারবেট যারা করে তাদের চেহারায় লাবণ্য থাকে না, চোখ গর্তে ঢুকে যায়, এবং ক্রমে ক্রমে তাদের চিন্তাশক্তি, নার্ভের জোর আর মানসিক ভারসাম্য কমে আসে। তোর মধ্যে সব ক'টা লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি।

রুকু সাদা মুখে মড়ার মতো হাসে একটু। কথাটা অপমানকরই শুধু নয়, সত্যও। তাই তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায় উপর্যুপরি গুলি খেয়ে। কোনও কথাই আসে না মুখে।

মলয় তেমনি শান্ত, নিরুদ্বেগ, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলে, আমি তোকে থরোলি জানি রুকু। তোর বোর্ডিং-এ এক বিছানায় আমি অনেক রাত কাটিয়েছি। তোকে খামোকা অপমান করার জন্য তাপসীর কথা তুলিনি। আমি জানি তুই এখনও সেই মরা মেয়েটাকে নিয়ে ঘুমোতে যাস। আমি ষোলো বছর বয়স থেকে রক্তমাংসের তরতাজা মেয়েমানুষ ঘাঁটছি। আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই। তবু আমি দয়ীকে বিয়ে করার কথা কেন ভাবছি জানিস?

রুকু নিজের ভিতরের শূন্যতায় ডুবে বসেছিল। একটা কথাও তার কানে ঢুকছিল না। তবু মলয় কিছু জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পেরে মুখ তুলল।

মলয় বলে, বেশ কয়েক বছর আগে দয়ী আমার দারুণ অ্যাডমায়ারার ছিল। তখন আমি বিপ্লবী ছাত্রনেতা। দয়ী প্রায়ই বলত, তোমার মতো ভয়ংকর পুরুষকেই আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কিছু মনে করিস না, দয়ীর হয়তো খানিকটা ফাদার অবসেশনও ছিল। ওর বাবা ছিল ফোর্থ গ্রেড গুন্ডা। যাই হোক, সে সময়ে একদিন দয়ী খুব সাহস করে আমাকে বলল, চলো বাইরে কোথাও ক'দিন বেরিয়ে আসি। আমি ইঙ্গিতটা বুঝলাম। দয়ী শরীরের সম্পর্ক চাইছে! আনইউজুয়াল কিছু নয়। ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে গিধনি নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমার এক বন্ধু রেলে চাকরি করে। প্রায়ই যেতাম। রেল কোয়ার্টারের দু'-একটা সব সময়েই খালি পড়ে থাকে। কোনও অসুবিধে ছিল না, একদিন দয়ীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে উঠলাম। কিন্তু প্রথম দিনই শালবনে বেড়াতে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেল। কয়েকটা ছেলে-ছোকরা আমাদের পিছনে লেগেছিল একটু। সেটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কলকাতায় এরকম তো কত হচ্ছে। আমি মাইন্ড করিনি। ওরা তেমন খারাপ কিছু বলেওনি। একজন বলে উঠেছিল, দ্যাখ দ্যাখ, কলকাতার মাল দ্যাখ। শালা গিধনিতে মজা লুটতে এসেছে। কিন্তু দয়ী ব্যাপারটা উড়িয়ে না দিয়ে ভীষণ ফুঁসে উঠল। ফিরে দাঁড়িয়ে ইডিয়েট, গ্রাম্য, কোনওদিন মহিলা দ্যাখেনি, ব্লান্ট হেডেড ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে লাগল। ছেলেগুলোও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ওটা ওদেরই তো জায়গা। তারাও রুখে উঠে বলতে লাগল, কেরদানি বের করে দেব, গিধনিতে মজা করতে আর আসতে হবে না। কলকাতার ফুটানি কলকাতায় গিয়ে দেখাবেন। আমি মাঝখানে পড়ে থামানোর চেষ্টা করি, কিন্তু দয়ী ছাড়বার পাত্রী নয়। যে ছোকরাটা দু' কদম এগিয়ে এসে বেশি তেজ দেখাচ্ছিল, দয়ী ছুটে গিয়ে পায়ের স্লিপার খুলে তার গালে ঠাস করে বসিয়ে দিল। তারপর যা হয়। ছোকরারা আমাদের ঘিরে ফেলল চোখের পলকে। কিল ঘুসি লাথি চলতে লাগল সমানে। আমি এসব ছোটখাটো ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করি না। তবু দয়ীর সম্মান রাখতে অনিচ্ছের সঙ্গেও লড়তে হল। ছেলেগুলো কিছুক্ষণ খামচাখামচি করে হাঁফাতে থাকে। তারপর শাসায়। আমি তখন তাদের গায়ে-টায়ে হাত বুলিয়ে ঠান্ডা করি। ব্যাপারটা মিটেও যায়। কিন্তু সেই থেকে দয়ী বেঁকে বসল। সেই রাত্রেই আমাদের প্রথম একসঙ্গে শোওয়ার কথা। কিন্তু দয়ী কিছুতেই রাজি নয়। কেবল কাঁদে আর বলে, ওই বদমাশরা আমার শরীরের লজ্জার জায়গায় হাত দিয়েছে, মেরেছে, আর তুমি ওদের তোয়াজ করলে! তুমি কি পুরুষ মানুষ? আমি এতদিন তোমাকে নিয়ে অন্য স্বপ্ন দেখতুম। সারা রাত চোখের জল আর খোঁচানো কথা দিয়ে দয়ী আমাকে যথেষ্ট তাতিয়ে তুলল। এ কথা সত্যি যে, আমি পলিটিকসের জন্য কয়েকটা খুন করেছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও কারণে মানুষকে মেরে ফেলার কথা আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু সেই রাতে দয়ী শরীর দেয়নি বলে কামে ব্যর্থ হয়ে আমি খেপে উঠেছিলাম। দয়ী আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, ছোকরাদের পালের গোদাকে ফিনিশ করব। পরদিন একটু খোঁজ নিতেই ছোকরার পাত্তা মিলল। পশ্চিমধারে মস্ত একটা মাঠের গায়ে নির্জন জায়গায় তার বাড়ি। সন্ধের মুখে একটু গা ঢাকা দিয়ে দয়ী আর আমি গিয়ে বাড়ির কাছাকাছি ঝোপ জঙ্গলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর দয়ীর তখন কী উত্তেজনা! বার বার আমার হাত চেপে ধরছে, এমনকী চুমুও খাচ্ছে। কখনও পাগলের ˙.তো হাসছে, কখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটু পরেই একটা খুন করতে হবে ভেবে আমি দয়ীর দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না। তবু আমার একটা চোখ সারাক্ষণ দয়ীকে লক্ষ করছিল। আমার মন বলছিল, এ খুনটা কেবলমাত্র দয়ীর শরীরের জন্যই আমাকে করতে হচ্ছে না তো! যদি তাই হয় তবে দয়ীর শরীরের জন্য আমাকে অনেকটাই মূল্য দিতে হল। ভাববার বেশি সময় ছিল না। আচমকা দেখলাম, নির্জন মাঠের পথ ধরে একা হেঁটে আসছে একটা ছেলে। খুবই আবছা দেখাচ্ছিল তাকে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম। এক হাতে রিভলভার,

সরিতের একটু লজ্জা করছিল। ভিতরে বেলুন চোপসানোর মতো একটা ক্লান্তিকর হতাশা। এদিকটা সে কখনও ভেবে দ্যাখেনি। চিঠিটা পেয়ে একটা মস্ত যুদ্ধাস্ত্র পেয়ে যাওয়ার আনন্দে সরিৎ সেটা নিয়ে সোজা এক ফোটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে ছ'খানা ফোটোটাস্ট কপি করায়। চিঠিখানা সযত্নে রেখে দেয় স্টিলের আলমারিতে। ইচ্ছে ছিল দয়ী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে এগুলোকে সে কাজে লাগাবে।

সরিৎ কোনও জবাব দিল না দেখে মৃন্ময়ী বলে, তুমিও কাজটা পুরুষের মতো করোনি।

সরিৎ ধমকে উঠল না বটে কিন্তু বিষ মেশানো শ্লেষের হাসি হেসে বলল, তাই নাকি? তোমাদের রক্তে যে দোষ রয়েছে সেটা বললেই বুঝি পুরুষত্বের অপমান হবে?

মৃন্ময়ী আর কথা বলল না, উঠে চলে গেল।

বাইরে অন্ধকার ঘনাল। ঘরটা হয়ে উঠল আরও উজ্জ্বল। সরিৎ বিনয়ের রেখে-যাওয়া প্যাকেট থেকে অনভ্যাসের হাতে আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। ছাদে ওরা কী করছে?— ভ্রু কুঁচকে ভাবতে থাকে সরিৎ।

॥ মলয় ॥

যেখানেই কিম্ভূত মোটর-সাইকেলটা দাঁড় করায় মলয় সেইখানেই লোকের ভিড় জমে যায়। এত বিশাল চেহারা আর জটিল যন্ত্রপাতিওলা মোটর-সাইকেল কলকাতার লোক খুব বেশি দেখেনি।

হরিয়ানার এক সম্পন্ন চাষি-ঘরের ছেলে এই যন্তরটা কিনে এনেছিল আমেরিকা থেকে। তাদের জমিতে একর প্রতি যে গমের ফলন হয় তা নাকি বিশ্বরেকর্ড। সেই সূত্রেই সে সারা পৃথিবী চষে বেড়ায় বছরভোর। অফিসের কাজে দিল্লিতে গিয়ে ছোকরার সঙ্গে এক হোটেলে ভাব জমে গেল মলয়ের। কথায় কথায় ছোকরা জানাল, সে আর কয়েক দিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চাষিদের গমের চাষ শেখাতে যাচ্ছে। অনেকদিনের প্রোগ্রাম। কাজেই মোটর-সাইকেলটা তার কোনও কাজে লাগবে না এখন। তার ইচ্ছে আরও আধুনিক, আরও বেশি শক্তির একটা যন্ত্র কেনা। শুনে মলয় তক্ষুনি রফা করে ফেলল। ট্র্যাভেলারস চেক ভাঙিয়ে কিনে ফেলল বিকট যানটা। আনকোরা নতুন জিনিস নয়, তা ছাড়া হরিয়ানার চাষি ছোকরা জোরে চালাতে গিয়ে বারকয়েক অ্যাকসিডেন্ট করায় মোটর-সাইকেলটা তুবড়ে-তাবড়েও গেছে অনেকটা। তবু এই জাহাজের মতো বিশাল যন্ত্রযানটির এখনও যা আছে তা তাক ধরিয়ে দেওয়ার মতো।

অফিসটা মলয়ের নিজের। তার বাবার মস্ত একটা রঙের কারবার আছে। অঢেল পয়সা। মলয়দের সাত ভাইয়ের মধ্যে চার ভাই বাবার ব্যাবসায় খাটছে। বাকি তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন রেলের ডাক্তার, মলয় হচ্ছে ছ' নম্বর। পরের ভাই সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র। বাবার ব্যাবসাকে মলয় বরাবর বলে, এ রং বিজনেস। কলেজে পড়ার সময় নকশাল রাজনীতিতে মেতে যাওয়ার ফলে মলয়ের লেখাপড়া খুব বেশি দূর এগোয়নি। বি এসসির শেষ বছরে সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয়। পড়ে পরীক্ষা দিলে একটা দারুণ রেজাল্ট করতে পারত। পড়াশুনোর মতো তাদের আন্দোলনটাও হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায়। তখন মলয়ের হাতে অনেক রক্তের দাগ এবং ভিতরে অতৃপ্ত ফোঁসফোঁসানি। পিছনে পুলিশ এবং প্রতিপক্ষের নজর ঘুরে বেড়ায় সব সময়। তাই কিছুদিন একদম একা চুপচাপ নিজেদের খিদিরপুরের বাড়ির চিলেকোঠায় অন্তরীণ হয়ে রইল সে। তারপর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সার এবং কীটনাশকের ব্যাবসা খুলে বসল।

ব্যাবসার যে এ রকম রবরবা হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রথমে দুটো-তিনটে অনামী কোম্পানির ডিলারশিপ নিয়ে বসেছিল, পরে নামীদামি বহু কোম্পানি তাকে এজেন্সি গছানোর জন্য

ঝুলোঝুলি শুরু করে। বড় বড় কোম্পানি এখন এজেন্ট আর ডিলারদের টি ভি সেট থেকে শুরু করে দামি দামি গিফট আর প্রাইজ দিচ্ছে। প্রচুর কমিশন। টাকায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মলয়। আজকাল প্রায়ই তাকে দূর-দূরান্তে গ্রামে-গঞ্জে চলে যেতে হয়। কেবল কলকাতায় বসে বসে মাল বেচে যাওয়ার পাত্র সে নয়। মলয় জানে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষিদের সঠিক প্রয়োজনগুলো বোঝা যায়, বোঝা যায় কোন সার বা কোন কীটনাশক কেমন কাজ দিচ্ছে। কোনটার চাহিদা বেশি বা কোনটার চাহিদা বাড়ানো উচিত। এই সব মার্কেট রিসার্চ করা থাকলে লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হওয়া কঠিন নয়। তা ছাড়া ব্যক্তিগত জানাশুনো আর বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে অঢেল সুবিধে। তার ইচ্ছে আছে কয়েকটা কীটনাশক সে নিজেই তৈরি করবে, বানাবে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি। প্রোডাকশন হাতে থাকলে বাজারটা হাতের মুঠোয় চলে আসে। কিন্তু এই প্রোডাকশনে নামার কথাটা সে মনে মনে ভাবতে না ভাবতেই একজন ছোকরা মারোয়াড়ি ঘোরাফেরা শুরু করেছে। সে টাকা খাটাতে চায়। মলয় ল্যাবরেটরি বানালে সে টাকা দেবে। তা ছাড়া, ডিলারশিপেও সে টাকা ঢালতে ইচ্ছুক। চাই কি গোটা ব্যাবসাটাই মোটা টাকায় কিনে নিতে পারে। মলয় এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আজকাল খুব চিন্তিত। গোটা কলকাতাটাই এখন মারোয়াড়ি আর বেশ কিছু অবাঙালি ব্যাবসাদারদের হাতে। বাঙালির যে ব্যাবসাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেটাই প্রায় অবিশ্বাস্য দাম হেঁকে কিনে নেয় কেউ না কেউ। কিনে যে ব্যাবসাটাকে হাতে রাখে সব সময় তাও নয়। অনেক সময়েই বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ তারা অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতাকে গলা টিপে নিকেশ করে। মলয় ছেলেটাকে সাফ জবাব দেয়নি বটে, কিন্তু তার মনটা খাট্টা হয়ে আছে। আগে মারোয়াড়িরা মদ-মাংস খেত না, আজকালকার নব্য মারোয়াড়িরা সব খায়। এই ছোকরা একদিন মলয়কে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় অনেক টাকা ওড়াল, প্রচণ্ড মাতাল হয়ে গেল এবং তারপর মলয়কে সোজাসুজি বলল, তোমরা তো বুদ্ধুর জাত। বাঙালি বলতেই আমরা বুঝি বোকা লোক। যে টাকা কামাতে পারে না সে আবার চালাক কীসের?

হক কথা। মলয়ের রক্ত গরম হলেও কথাটা সে মনে রেখেছে। এখন তার ধ্যান জ্ঞান একটাই— টাকা কামাতে হবে। তাদের পরিবারের প্রায় সকলেরই ব্যাবসার ধাত। মলয় ব্যাবসাটা ভালই বোঝে। তাই খুব অল্প সময়ে কোনও রকম লোকসান না খেয়ে সে দু' হাতে টাকা কামাই করেছে এবং করছে। চমৎকার গুড উইল দাঁড়িয়ে গেছে বাজারে। স্থায়ী ক্রেতার সংখ্যা এখন অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। আগে চাষের মরশুমেই যা কিছু ব্যাবসা হত, অন্য সময়টা মন্দা। আজকাল আধুনিক কৃষির কল্যাণে সারা বছরই প্রায় কাজ হচ্ছে। মলয়ের তাই মন্দা সময় বলে কিছু নেই।

কিন্তু সব সময়েই এই একঘেয়ে ব্যাবসা এবং টাকা রোজগার করে যাওয়া মলয়ের কাছে প্রচণ্ড বিরক্তিকর। তার ভিতরে একটা রোখা চোখা তেজি অবাধ্য মলয় রয়েছে। সেই মলয় সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করার কাজে নেমে এক নদী রক্ত ঝরিয়েছিল। এই টাকা আয়কারী মলয়ের সঙ্গে তার আজও খটাখটি। মলয় তাই সব সময়েই কেমন রাগ নিয়ে থাকে, অল্পেই ফুঁসে ওঠে। সে মারকুট্টা, বদমেজাজি এবং অনেকটাই বেপরোয়া। বন্ধুরা তাকে ভয় খায়। খদ্দেররা তাকে সমঝে চলে।

এই খর ধুন্ধুমার গ্রীষ্মকালে বাঁকুড়ার সোনামুখীতে সাত সাতটা দিন কাটিয়ে এল মলয়। গায়ের চামড়া এ ক'দিনেই রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে, কিছু রোগাও হয়ে গেছে সে। বড় চুল রুখু হয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছে। সকালে স্নানের সময় কলঘরের আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখল সে। কিন্তু চেহারা নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। বরাবরই টান টান ধারালো ইস্পাতের মতো চেহারা তার। মুখখানা হয়তো নিটোল নয়, কিন্তু হনুর বড় হাড়, ভাঙা গাল এবং একটু বসা সত্ত্বেও সে অতীব আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ। লোকে তাকে দেখলেই বোঝে, এ লোকটা জোর খাটাতে জানে। খুবই আত্মবিশ্বাসময় তার চলাফেরা, হাবভাব। কথাবার্তায় সে অহংকার প্রকাশ করে না, কিন্তু তার মর্যাদাবোধ যে টনটনে এটা সবাই বুঝে নেয়। কথা খুব কমই বলে, ঠাট্টা বা রসিকতা বেশি পছন্দ নয়।

দয়ী হঠাৎ হাসতে থাকে। বলে, তোমাকে বোকা পেয়ে গুল ঝেড়েছে মলয়। গুলি করবে কী? ওর কাছে তো আর্মস ছিল না। তা ছাড়া আমরা সেখানে নতুন জায়গায় গেছি, কিছুই তেমন জানি না। মার্ডার কি অত সোজা রুকু? পুরো গুল।

সত্যি বলছ?

তুমি কী করে ভাবলে আমাকে খুশি করতে মলয় খুন করতে যাবে? মলয় কি অত বোকা? আমি ছাড়াও ওর তখন ডজনখানেক বান্ধবী ছিল। কাউকেই কোনওদিন খুশি করার দায়িত্ব নেয়নি মলয়। বরং আমরাই ওকে খুশি করতে চাইতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, গিধনিতে মলয় কাউকে খুন করেনি।

রুকু লক্ষ করে, যার টেবিলে ফোন সেই পালবাবু বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। মস্ত হলঘরটা পার হতে যেটুকু দেরি। সে তড়িঘড়ি চাপা-স্বরে বলে, ফোনে আর বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না দয়ী, অসুবিধে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল।

পরে হবে দয়ী।

রুকু ফোন রেখে নিজের টেবিলে ফিরে আসে এবং চুপ করে বসে থাকে। সে কতদূর নির্বোধ তা ভেবে থই পাচ্ছিল না। মলয় যে তাকে মাস্টারবেশনের কথা তুলে লজ্জা দিয়েছিল তা আসলে একটা অতিশয় কূটবুদ্ধির চালাকি। কথাটা তুললে রুকু যে সংকুচিত হয়ে নিজের ভিতরে লজ্জায় গুটিয়ে যাবে তা খুব ভালভাবে জেনেই মলয় চালটা দিয়েছে। আর তারপর এমনভাবে গিধনির খুনের বানানো গল্পটা ঝেড়েছে যা রুকু সেই মানসিক অবস্থায় বিশ্লেষণ করে দেখেনি। ইংরিজিতে যাকে বলে কট ইন দি রং ফুট। কিন্তু খুনের ঘটনাটা বলার পিছনে মলয়ের আর কোনও কূটবুদ্ধি কাজ করছে তা ভেবে পায় না রুকু। তাই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে। মলয় কাল বলেছিল দয়ীদের জেনারেশন কতদূর নষ্ট হয়ে গেছে তা সে জানতে চায়। কথাটা ভেবে আজ হাসি পাচ্ছে রুকুর। মলয় কোনওদিনই মেয়েদের নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বরং একসময়ে এ নিয়ে রুকুই লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিত। তার ছিল মফস্‌সলের গেঁয়ো মানসিকতা। মেয়েদের শরীরের পবিত্রতা ছিল তার অতিশয় শ্রদ্ধার জিনিস। মলয় কি সেটারই পালটি দিল কাল? ওটা কি নিছক রুকুকে ঠাট্টা করার জন্যই বলা?

বেলা পাঁচটা পর্যন্ত রহস্যটা রহস্যই থেকে গেল।

অফিস থেকে বেরোবার মুখে জানলা দিয়ে আজও বাইরে বর্ষার মেঘ দেখতে পায় রুকু। আজও বৃষ্টি হবে। বড় বেশি দেরিও নেই। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তাতে বৃষ্টির গন্ধ মাখা। অফিসের পর আজকাল রুকুর কোথাও যাওয়ার নেই। তার বন্ধুরা বেশিরভাগই বড়সড় চাকরি করে। কারও হাতে ফালতু সময় নেই। রুকু নিজেও আড্ডা দেওয়ার সময় পায় না। চাকরি ছাড়াও টিউশানি আছে। তবু আজ তার একটু হালকা সময় কাটানোর বড় ইচ্ছে হচ্ছিল। দীর্ঘদিন বিরামহীন কাজ ও একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি মাথাটাকে ভার করে রেখেছে। আর সে কিছুতেই মলয়ের অপমানটাকে ভুলতে পারছে না। বারবার একটা আয়না কে যেন তার মুখের সামনে তুলে ধরছে, আর সে নিজের কোটরগত চোখ, ভাঙা চোয়াল, লাবণ্যহীন শুষ্ক মুখশ্রী দেখছে। তার বোধহয় কিছু ভিটামিন-টিন খাওয়ার দরকার। আর দরকার বিশ্রী আত্মমৈথুনের পুরনো অভ্যাস থেকে মুক্তি। সংসারের দায়িত্বের কথা ভেবে এতকাল সে বিয়ের কথায় কান পাতেনি। আজ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে ভাবছিল, বিয়ে করলে কেমন হবে? ভাবছিল, মা সন্তোষপুরে যে উকিলের মেয়েটির কথা প্রায়ই বলে, তাকে একবার গিয়ে দেখে আসবে। পছন্দ হলে এবার বিয়ের সম্মতি দিয়ে দেবে। ভাল হোক, মন্দ হোক, জীবনের একটা খাত বদল এবার দরকার।

অফিসের বড় দরজার মুখেই সে থমকে গিয়ে এক গাল হাসল, বলল, তুমি?

মাস দুই দয়ীর সঙ্গে দেখা হয়নি। ফোনে কথা হয়েছে মাত্র। দয়ী এই দুই মাসে কিছু রোগা হয়েছে। নাকি এই রুগ্নতাকেই স্লিমনেস বলে আজকাল? খুবই সাধারণ ম্যাটম্যাটে রঙের একটা বাদামি তাঁতের শাড়ি পরনে, সাদা ব্লাউজ। মুখে কোনওদিনই তেমন প্রসাধন মাখে না দয়ী। আজ প্রসাধনহীন মুখখানা বেশ ঘামতেলে মাখা। একটু হেসে বলল, কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তোমাকে চমকে দেব বলে।

চমকে একটু দিয়েছ ঠিকই। জানিয়ে রাখলে অফিস থেকে কিছু আগে বেরিয়ে আসতাম।

দয়ী মুখ টিপে একটু হেসে বলল, কিংবা জানালে হয়তো আমাকে এড়ানোর জন্য অফিস থেকে আগে ভাগেই কেটে পড়তে। তুমি যা ভিতু!

না, না। লজ্জা!— বলে একটু হাসে রুকু।

ফুটপাথ ঘেঁষে দয়ীর ফিয়াট দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে দয়ী বলল, ওঠো।

চুপি চুপি একটু আরামের শ্বাস ছাড়ে রুকু। আজকের দিনটা অন্তত বাসের ভিড়ে চিংড়ি লাদাই হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। দয়ী লিফট দেবে।

পাশে ড্রাইভিং সিটে বসে দয়ী গাড়ি চালু করে বলে, তোমাকে আমার পার্সোনাল প্রবলেমের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ভাল কাজ করিনি রুকু। কাল মলয় তোমাকে কেন অপমান করল খুব জানতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য খুব সেনসিটিভ ব্যাপার হলে বোলো না।

রুকুর মুখ চোখ লজ্জায় নরম হয়ে যায়। সে চোখ নিচু করে কোলের ওপর নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে।

দয়ী ময়দানের দিকে গাড়ি চালায়। আড়চোখে একবার রুকুর মুখের ভাব লক্ষ করে বলে, তোমাকে মলয় কতটুকু অপমান করেছে জানি না। কিন্তু আমাকে ওর কাছে বহুবার হাজারো অপমান সইতে হয়েছে। আমার বাবার পাস্ট হিস্টরি খুব ভাল নয়, জানো তো! কথায় কথায় ও আমার বাবা তুলে যাচ্ছেতাই সব কথা বলে। তোমাকে তো আমার লুকোনোর কিছু নেই রুকু। আমি সতীত্ব-টতীত্ব মানি না। স্কুল লাইফ থেকেই ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রিলি মিশি। সেই জন্যও মলয়ের রাগ। ও যখন নিজে আমার সঙ্গে লাইফ এনজয় করেছে তখনও আমাকে প্রস-ট্রস বলে গালাগাল করেছে। মাইথনে গিয়ে একবার আমাকে মলয় মেরেছিল। তখন ওকে ভালবাসতাম বলে সব সহ্য করেছি। ইন ফ্যাক্ট তখন ও আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই আমি রাজি হয়ে যেতাম। কিন্তু আফটার অল দিজ ইয়ারস আমি এখন অনেক ম্যাচিওরড। আমি জানি মলয় কেমন লোক।— বলে চুপ করে থাকে দয়ী।

মলয় কেমন লোক দয়ী?— রুকু জিজ্ঞেস করে।

রেস্টলেস, ক্রুয়েল অ্যান্ড রেকলেস। খুব শিগগিরই একদিন ওর পাগলামি দেখা দেবে। পলিটিকস ছেড়ে দিয়েছে বটে কিন্তু সেই সব আক্রোশ আর রাগ এখনও জমে আছে ওর ভিতর। ও আমাকে বিয়ে করতে চায় কেন জানো?

বোধহয় তোমাকে নিয়ে ওর কিছু এক্সপেরিমেন্ট এখনও বাকি।

ঠিক তাই। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন ওর বিষের থলিতে যত বিষ জমা হয়ে টনটন করে তা উজাড় করার জন্য ঠিক আমার মতো একজনকে ওর দরকার। ও আমার বাবার ইতিহাস জানে, আমার সমস্ত দুর্বলতাকে জানে। ও জানে কতভাবে আমাকে নির্যাতন আর অপমান করা যায়।

রুকু একটু হাসল। বলল, কত করুণ ছবি আঁকছ দয়ী! কিন্তু আমি জানি মেয়েরা মোটেই অত অসহায় নয়। খুব সাদামাটা নিরীহ মেয়েও কিন্তু আর কিছু না পারুক স্বামীকে শাসনে রাখতে জানে। সে তুলনায় তুমি তো অনেক বেশি অ্যাডভান্সড মেয়ে।

দয়ী রঞ্জি স্টেডিয়াম পেরিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল। গাড়িটা ফুরফুরে হাওয়ায় দাঁড় করিয়ে বলল, মিথ্যে বলোনি। কিন্তু মলয় অ্যাভারেজ পুরুষদের মতো তো নয়। ও অনেক বেশি হিংস্র,

অনেক বেশি ঠান্ডা রক্তের মানুষ। ও কত অকপটে হাসিমুখে আমাকে বেশ্যা বলে গাল দেয় তা তুমি জানো না। মাইথনে সেবার আমাদের প্রচণ্ড ঝগড়া হলে আমি রেগে গিয়ে ওকে বলেছিলাম তুমি আসলে হোমোসেকসুয়াল, তাই মেয়েদের নিয়ে তোমার সুখ হয় না। তাইতে ভীষণ রেগে গিয়ে ও আমাকে প্রচণ্ড মেরেছিল। পরে ভেবে দেখেছি, কথাটা আমি রাগের মাথায় হয়তো খুব মিথ্যে বলিনি। মে বি হি ইজ হোমোসেকসুয়াল। নইলে অত খেপে উঠবে কেন কথাটা শুনে?

রুকুর ভিতরে টিকটিক করে কিছু নড়ে উঠল। কাল মলয় তাকে খুব লজ্জা দিয়েছিল, আজ মলয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে; কিন্তু অস্ত্রটা কোনওদিনই ব্যবহার করতে পারবে না রুকু। সে কাউকে সামনা সামনি অপমান করতে পেরে ওঠে না। শুধু চিন্তিতভাবে বসে রইল সে। দয়ী আর মলয়ের অপবিত্র কাম ও ঘৃণার সম্পর্কের কথা ভাবতে লাগল!

দয়ী তাকে কনুইয়ের একটা ছোট্ট ঠেলা দিয়ে বলল, কোনও কথা বলছ না কেন রুকু?

রুকু ম্লান হেসে বলে, কী বলব বলো তো! আমি অনেকটাই গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এই আধুনিক মানসিকতা কিছু বুঝতে পারি না। কেনই বা তুমি মলয়কে শরীর দিতে যাও, আর কেনই বা মলয় তোমাকে ঘেন্না করে, এসব খুব রহস্যময় আমার কাছে।

দয়ী একটু ধৈর্য হারিয়ে বলে, অত বোকা সেজো না রুকু। শরীরের ব্যাপারে কোনও রহস্য নেই। শরীর তো কোনও দর্শন নয়, কোনও ধর্মটর্মও নয়, তার কোনও গভীরতা নেই। নিতান্তই পেটের খিদের মতো একটা মোটা দাগের ব্যাপার। তার আবার রহস্যই কী, শুচিবাইয়েরই বা কী?

রুকু মাথা নেড়ে বলে, তুমি হয়তো জানো না দয়ী, তোমার প্রবলেমটাও শরীর নিয়েই। শরীরের গভীরতা না থাক, হ্যাজার্ডস আছে। মলয় আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, শরীরের জন্যই ও তোমাকে ছাড়তে নারাজ।

মিথ্যে কথা রুকু। যে ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে তার কখনও একটা বিশেষ মেয়ের জন্য পাগল হওয়ার কারণ নেই। সে যেমন তোমাকে গিধনির খুনের গল্প বানিয়ে বলেছে এটাও তেমনি আর একটা বানানো কথা।

রুকু বিষণ্ণভাবে বলে, কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই দয়ী। তোমার জন্য মলয়কে খুন করতে তো আমি পেরে উঠব না।

দয়ী গম্ভীর মুখ করে বলল, খুনের প্রশ্ন ওঠে না।

তবে তুমি ওকে নিয়ে অত ভাবছ কেন দয়ী? ও ভাংচি দেবে ভয়ে?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, ভাংচি-টাংচি সেকেলে ব্যাপার। যে লোকটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে সে অনেক বেশি মডার্ন। আমার জামাইবাবুর সম্পর্কে ভাই। তার সঙ্গে যাতে আমার বিয়েটা না হয় সেজন্য জামাইবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কোনও কাজ হয়নি। আমাকে লেখা মলয়ের একটা চিঠি পর্যন্ত জামাইবাবু তাকে দেখিয়েছেন। লোকটা তাতেও দমেনি। বিয়ে সে আমাকে করবেই।

তবে আটকাচ্ছে কোথায় দয়ী?

দয়ী অবাক হয়ে বলে, কোথাও আটকাচ্ছে না তো! বিয়েটাও খুব নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষদের আমি খুব চিনি রুকু। লোকটা বিয়ে করবে বটে কিন্তু তার কমপ্লেকস শুরু হবে বিয়ের পর থেকে। মলয়ের ব্যাপারটা সে খুব ভালভাবে জানে না। একটা প্রেমপত্র থেকে খুব বেশি কিছু আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। স্পোর্টসম্যানের মতো সে তাই এখন ব্যাপারটা গায়ে মাখছে না। কিন্তু বিয়ের পর সামান্য খটাখটি লাগলেই তার মনে নানারকম কমপ্লেকস দেখা দেবে। জানতে চাইবে মলয়ের সঙ্গে আমার কতদূর কী হয়েছিল। লোকটা এমনিতে ভাল, কিন্তু ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। কোনও কিছুকেই সাবলিমেট করতে জানে না।

রুকু নিজের কপাল টিপে ধরে বলে, ওঃ দয়ী, আমার বোকা মাথায় এই সব শক্ত কথা একদম ঢুকছে না। সরল করে বলো।

দয়ী হাসল। বলল, সোজা কথায় লোকটাকে বিয়ে করতে আমার ভয় হচ্ছে। আমেরিকা তো এখানে নয়। সেই দূর দেশে যদি কখনও আমার কান্না পায় তবে সম্পূর্ণ একা একা কাঁদতে হবে। কাউকে কিছু বলার থাকবে না। আমার বড় ভয় করছে রুকু।

রুকু মহান গলায় বলে, তার জন্য তুমিই দায়ী দয়ী। এখন কী করতে চাও?

সেইজন্যই তোমার কাছে আসা। বলো তো কী খবর? আজও বিনয়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ক্যালকাটা ক্লাবে ওর এক বন্ধু পার্টি দিচ্ছে। রোজই আমরা একটু একটু করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসছি। এই সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

রুকু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবে। তারপর বলে, ভবিষ্যতে কী হবে তা কেই বা জানে? আমি বলি তুমি বরং লোকটাকে বিয়ে করে আমেরিকাতেই চলে যাও। হয়তো লোকটা সবই ক্ষমা করে নেবে।

দয়ী মাথা নেড়ে ঝুঁকে স্টিয়ারিং হুইলে মাথাটা নামিয়ে রাখে। মৃদুস্বরে বলে, জামাইবাবুও ওর কানে অনেক বিষ ঢেলেছে তো। যতদূর খবর পেয়েছি জামাইবাবু মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিনয়ের মুখোমুখি ওকে দাঁড় করাবে। অবশ্য তাতেও বিয়ে আটকাবে না আমি জানি। বিনয় অসম্ভব গোঁয়ার। কিন্তু বিষটা থেকে যাবে যে রুকু।

॥ দয়ী ॥

বিনয় খুব সামান্যই মদ খায়। সিগারেটেও তার তেমন নেশা নেই। তার আসল নেশা হল কাজ। পার্টি শেষ হল রাত দশটা নাগাদ। পার্টিতে আজ তেমন হুল্লোড় ছিল না, লোকজনও ছিল কম। মদের ঢল নামেনি, মাতলামির বাড়াবাড়ি হয়নি। যে আজ পার্টি দিয়েছিল বিনয়ের সেই বন্ধু অজিত ঘোষ দয়ীর হাতে এক গ্লাস শেরি ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটাতে একটা বা দুটো চুমুক হয়তো দিয়েছিল দয়ী, এমন সময় বিনয় খুব নিরীহভাবে কাছে এসে তার কানে অস্ফুট কী একটু বলে হাত থেকে সুকৌশলে গ্লাসটা নিয়ে এক গ্লাস সফট ড্রিংক ধরিয়ে দিয়ে গেল। অবাক হলেও দয়ী প্রতিবাদও করেনি। সামান্য একটু অপমান অবশ্য বোধ করেছিল সে। কচি খুকি তো সে নয় যে, অন্য কেউ তাকে ইচ্ছেমতো চালাবে। মনটা বিরূপ ছিল বলেই বাদবাকি সময়টা সে পার্টির আনন্দটুকু মোটেই উপভোগ করেনি। দায়সারা কথাবার্তা বলল, একটা মাত্র মুরগির ঠ্যাং নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিল।

পার্টি শেষ হলে দয়ীর গাড়িতেই এসে উঠল বিনয়। ওঠার কথা নয়। কারণ বিনয় দয়ীর উলটোদিকে থাকে। নর্থে। বিনয় খুব নরম গলায় বলল, অনেকটা রাত হয়েছে। এত রাত্রে তোমাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়। আমি তোমার বাড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরব।

দয়ী ভ্রূ কুঁচকে বলল, আমার বেশি রাতে ফেরা অভ্যাস আছে।

কথাটা বলে দয়ী অপেক্ষা করল। কিন্তু বিনয় গাড়ি থেকে নামার লক্ষণ দেখাল না। দয়ী তাই গাড়ি চালু করে বলে, কলকাতা শহরে কিন্তু ইচ্ছেমতো ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

বাস আছে।— বিনয় শান্ত স্বরে বলে, না হয় কিছু একটা ঠিক জুটে যাবে।

আমার কোনও পাহারাদারের দরকার নেই। একা আমি বেশ চলতে পারি।

বিনয়ের মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্যও নেই। কথা একটু কম বলে। চুপচাপ নির্লজ্জের মতো বসে রয়েছে। দয়ী ভবানীপুর পর্যন্ত চলে এল বিনা সংলাপে। তারপর বিনয় হঠাৎ বলল, আমি পিউরিটান নই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেউ মদ খেলে আমার ভাল লাগে না। তুমি কিছু মাইন্ড করলে নাকি?

দয়ী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ভাল মন্দ বুঝবার বয়স আমার হয়েছে।

বিনয় মৃদুস্বরে বলে, আই অ্যাম সরি। আমি ভাবলাম, অতটা শেরি খেয়ে গাড়ি চালাতে তোমার কষ্ট হবে। তাছাড়া এই গরমে কোনওরকম অ্যালকোহলই শরীরের পক্ষে স্বস্তিকর নয়।

আমি মোটেই অতটা খেতাম না। গাড়ি চালাতে হবে সেটা কি আমার খেয়াল ছিল না?-ভদ্রলোক দিলেন, ভদ্রতা করে নিতে হয় বলে নিলাম। খেতাম না।

ব্যাপারটা ভুলে যাও দয়ী। আমার ভুল হয়েছিল।

দয়ী কিছুটা স্বস্তিবোধ করে। লোকটাকে তার কখনও খারাপ লাগেনি। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সে বলল, সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে গেলে আগে থেকেই একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকা ভাল বিনয়।

বিনয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, আগে থেকে কখনও কোনও বোঝাপড়া হয় না। বোঝাপড়ার জন্যই তো একসঙ্গে থাকা।

দয়ী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি ডোমিনেটিং হাজব্যান্ড পছন্দ করি না।

বিনয় সামান্য হাসল। বলল, আমাকে গত দশদিনে কি তোমার তাই মনে হল?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। আমি আমার কথা বলছি।

বলার মতো কিছু তো ঘটেনি। শেরির গ্লাসটাকে তুমি এখনও ভোলোনি দেখছি।

দয়ী থমথমে গলায় বলল, পার্টিতে কেউ কেউ হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। তারা ধরে নিয়েছে, তুমি আমাকে নভিস হিসেবে গাইডেন্স দিচ্ছ।

ওরকম আর হবে না, কথা দিচ্ছি।

দয়ী হঠাৎ কালীঘাট পার্কের কাছে গাড়ি পার্ক করল। মুখ ফিরিয়ে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার সবকিছুই মেনে নিচ্ছ কেন বলো তো?

বিনয় একটু থতমত খেয়ে বলে, সেটা কি দোষের?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, দোষের নয়। বরং খুবই উদারতার পরিচয়। কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন আছে বিনয়। আমার জামাইবাবু কি তোমাকে আমার সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা বলেনি?

বিনয় ভ্রু কুঁচকে চিন্তান্বিত মুখে খুব ধীর হাতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, ওটা নিয়ে তুমি অনর্থক চিন্তা কোরো না। বুধোদা আগে যেমন ছিল এখন আর তেমন নেই। টোটাল ফ্রাস্ট্রেশন থেকে মানুষ কতটা অন্যরকম হয়ে যায় তা আমি জীবনে কম দেখিনি। তাই বুধোদার কথার আমি মূল্য দিই না।

কথাটা বলে বিনয় অকপটে দয়ীর দিকে তাকায় এবং অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে বলে, বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট। তোমার বয়সকে তো কিছুটা কনসেশন দিতেই হবে। বুধোদা সেটা না মানলেও আমি মানি।

দয়ী বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ওটা মার্কিন মানসিকতার কথা।

বিনয় ধীর স্বরে বলে, ধরতে গেলে আমি তো একজন মার্কিনই।

বলে সে খুব সুন্দর হাসি হাসে। বিশুদ্ধ আনন্দের হাসি।

দয়ী চোখ নামায় না। স্থির দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলে, দিদির কাছে শুনলাম জামাইবাবু নাকি মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তার সঙ্গে তোমার একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি কি মলয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

বিনয়ও চোখ সরাল না। বলল, দেখা করা বা না করায় কোনও অর্থ নেই। তুমি না চাইলে দেখা করব না। চাইলে করব। কিন্তু দেখা করলেও আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

সে আমি জানি। কিন্তু তুমি একথা মনে কোরো না যে, আমি বিয়ের জন্য বা আমেরিকায় যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছি। আমার কাছে ওগুলো কোনও ফ্যাক্টর নয়।

আমি তা মনে করি না।

দয়ী কী যে বলতে চাইছে তা সে নিজেই ভাল বুঝতে পারছিল না। মাথাটায় কেমন ওলট-পালট। বুকে কেমন রাগ আর অভিমানের ঝড়। সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে সে চুপ করে বসে রইল। সহজে কখনও তার কান্না আসে না। আজ আসছিল। প্রাণপণে সে কান্নাটাকে চাপবার চেষ্টা করছিল।

বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিবিষ্টমনে প্রায় অন্ধকার পার্কটার দিকে চেয়ে ছিল বিনয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, পার্কে ওরা কারা বসে আছে বলো তো? অনেকগুলো কাপল দেখছি। প্রেমিক-প্রেমিকা নাকি?

দয়ী মৃদু একটু হুঁ দিল।

বিনয় বলল, এত রাত পর্যন্ত কী অত কথা ওদের?

দয়ী হেসে বলে, তুমি তো প্রেমে পড়োনি। পড়লে বুঝতে।

বিনয় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, সে কথা ঠিক। তবে কিনা আমেরিকায় এত ফালতু সময় কারও হাতেই থাকে না। কলকাতায় তোমরা বড় বেশি সময় নষ্ট করো দেখেছি। পাঁচটা মিনিট সময়ও যে কত মূল্যবান তা কলকাতার লোক বুঝবেই না।

গত দশদিনে বিনয় এই প্রথম আমেরিকার কথা তুলল। অন্যসব বাঙালি ছেলে বিদেশ ঘুরে এসে যে বিদেশি গল্পের ঝুড়ি খুলে বসে বিনয় সেরকম নয় মোটেই। আমেরিকা নিয়ে দয়ীকে সে কোনওদিনই জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

বিনয় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে, সময়ের মূল্য তুমিও খুব একটা বোঝো না দয়ী। গাড়ি দাঁড় করিয়ে খামোখা রাত বাড়াচ্ছো।

দয়ী গাড়ি চালু করল। বলল, তুমি সত্যিই আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে?

আর একটু যাই। ফাঁড়িতে নামিয়ে দিও।

মলয়ের সঙ্গে তোমার কবে দেখা হবে?

বিনয় শব্দ করে হাসল। বলল, অবসেশনটা কাটিয়ে ওঠো দয়ী। দেখা হলেও কিছু নয়, না হলেও কিছু নয়।

আমাকে তবে তুমি বিয়ে করবেই?

তুমি রাজি থাকলে।

কোনও কিছুতেই আটকাবে না?

বিনয় মৃদু হেসে বলে, আমি অদৃষ্টবাদী। আটকাবে না তা কী করে বলি? কত অঘটন আছে।

কেন তুমি আমাকেই বিয়ে করতে চাও? তুমি তো আমার প্রেমে পড়োনি।

বিনয় মাথা নেড়ে বলে, না। প্রেমে পড়া অ্যাডোলেসেন্ট মানসিকতা। আমি তা কাটিয়ে উঠেছি। তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হল কমপ্যাটিবিলিটি। এই বয়সে অনেক ডেবিট ক্রেডিট কষে তবে বিয়ের মতো গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আমাকে নিয়ে তুমি হিসেব নিকেশ করছ?

হুঁ। রেজাল্টটা খারাপ নাও হতে পারে।

তুমি কীরকম মেয়ে চেয়েছিলে?

তোমার মতো।

ভেঙে বলো।

ধরো, যে-মেয়ে অচেনা পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে, অতি দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে, যে মোটামুটি বুদ্ধিমতী এবং সাহসী।

আর কিছু নয়?

বিনয় হেসে বলে, বয়স যখন অল্প ছিল তখন আরও অনেক বেশি চাইতাম। দারুণ সুন্দরী, বিমুগ্ধ

প্রেমিকা, কট্টর সতী। অভিজ্ঞতা বাড়ার পর আর স্বপ্ন দেখি না।

তুমি কখনও কারও প্রেমে পড়োনি?

একাধিকবার।— বলে কৌতুকে মিটমিটে চোখে বিনয় দয়ীর দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু এসব আজ কী জিজ্ঞেস করছ তুমি দয়ী? আজ কি তুমি খুব নার্ভাস? এসব তো তোমার প্রশ্ন নয়।

দয়ী দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। বাস্তবিক আজ তার মাথা বড় ওলট-পালট। বুকে অভিমানের ঝড়। আজ সে কিছুই তার নিজের মতো করছে না। এক অচেনা দয়ী আজ তার মাথায় ভর করেছে।

গাড়িতে নেমে গেল বিনয়। রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফুটপাথে। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে ট্যাক্সির জন্য। ততক্ষণ দয়ীও গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল। ওপাশ থেকে বিনয় মাঝে মাঝে মৃদু হেসে হাত নাড়ছিল, এপাশ থেকে দয়ীও। কলকাতার এইসব মধ্যবিত্ত পাড়ায় এত রাতে দৃশ্যটা খুব নিরাপদ নয়। লোকে তাকাচ্ছিল, লক্ষ রাখছিল। অবশেষে বিনয় একটা ট্যাক্সি ধরতে পারল।

বাড়িতে ফিরতে রাত হলে দয়ীকে কিছু বলার কেউ নেই। ট্যারা বসন এখন পারতপক্ষে ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি হতে চায় না। দয়ীর মা ছিল বড়লোকের ঘরে শিক্ষিতা মেয়ে। একটা অশিক্ষিত গুন্ডার প্রেমে পড়ার মাশুল দিচ্ছে সারাজীবন। অনেক চুরি, ডাকাতি, লোক ঠকানো, জুয়া, রক্তপাত দেখে কেমন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে গেছে। এখন তার কিছু শুচিবাই এবং পুজোআর্চার বাতিক হয়েছে। মা নিজের মনে থাকে। কারও তেমন কোনও খবর নেয় না।

গ্যারাজে গাড়ি রেখে বাড়ি ঢুকতেই দয়ী দেখল, বৈঠকখানায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। বেশ একটু উঁচু স্বরে কথাবার্তা হচ্ছে ভিতরে। একটা গলা বাবার, অন্যটা সরিতের।

বহুকাল সরিৎ এ বাড়িতে আসে না। আজ কেন এসেছে সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না দয়ীর। সরিতের বা বাবার মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না দয়ীর। সে চুপি চুপি দোতলায় উঠে যেতে পারত। কিন্তু হল না পোষা অ্যালসেশিয়ানটার জন্য। দোতলার বারান্দা থেকে সেটা 'হাউফ হাউফ' করে প্রচণ্ড ধমক চমক শুরু করল।

বৈঠকখানা থেকে বাবার বুলেটের মতো স্বর ছিটকে এল, কে?

গেটে দারোয়ান থাকে, বাড়িতে কুকুর আছে, প্রচুর লোকজন, তবু ট্যারা বসন এখনও সন্দিহান, সতর্ক। এসব লোক জীবনে কখনও নিশ্চিন্তে সময় কাটাতে পারে না।

দয়ী খুব উদাস গলায় জবাব দিল, আমি দয়ী।

অ।— ট্যারা বসন যেন নিশ্চিন্ত হল। সরিতের গলা শোনা গেল, ওকে ডাকুন না। ডেকে সামনা-সামনি জেনে নিন।

ট্যারা বসন মৃদু স্বরে বলে, থাকগে। যেতে দাও। কাল সকালে বললেই হবে।

সরিৎ হঠাৎ ধমকে উঠে বলল, ইট মে বি টু লেট দেন। আপনার ছেলেমেয়েরা কে কী করবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের পরিবার ইনভলভ্ড হলে আমি ছেড়ে কথা বলব না।

সিঁড়ির গোড়ায় দয়ী একটু দাঁড়াল। একবার ভাবল, ওপরে উঠে যাবে। তারপর খুব ঘেন্না হল পালিয়ে যেতে। সে আস্তে অত্যন্ত সতেজ পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় বৈঠকখানার পরদাটা সরিয়ে ঢুকল।

কীভাবে সাজালে ভাল হবে তা বুঝতে না পেরে ট্যারা বসন বৈঠকখানাটাকে প্রায় একটা জাদুঘর বানিয়ে তুলেছে। বিশাল বিশাল কয়েকটা সোফা, মেঝেয় লাল নীল ফুলকাটা কার্পেট, সামনের দেয়ালে একটা হরিণের মাথার নীচে একটা ঢালের সঙ্গে দুটো ক্রশ করা তরোয়াল, পাশে ছোট্ট মাদুরের ওপর যামিনী রায়ের ঢঙে আঁকা ছবি, রবি ঠাকুরের কাস্টিং, অন্য দেয়ালে শিলং থেকে আনা ঘর সাজানো তিরধনুক, অন্তত গোটা ছয়েক ক্যালেন্ডার, ভোজালি, ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মূর্তি

দেয়াল কুলুঙ্গিতে একটা গণেশ, ঢাউস বুককেসে রাজ্যের ইংরিজি বাংলা বই। ঘরে একই সঙ্গে চিনে লণ্ঠন, মস্ত ঘোমটার মতো ঢাকনা পর়ানো স্ট্যান্ডওলা আলো, স্টিক লাইট এবং মার্কারি ল্যাম্পের ব্যবস্থা। আছে পেতলের বিশাল ফুলদানি, পাথরের ন্যাংটো পরি, একটা কাশ্মীরি কাঠের জালিকাটা পার্টিশন পর্যন্ত। কী ভেবে বৈঠকখানার এক কোণে একটা নীলচে রঙের হাল-ফ্যাশানের মুখ ধোওয়ার বেসিন পর্যন্ত লাগিয়েছে বসন। পারতপক্ষে এ ঘরে দয়ী বা তার ভাইবোনেরা ঢোকে না। তাদের আলাদা আড্ডাঘর আছে। এ ঘরে সভা শোভন করে বসনই বসে রোজ।

আগে চেককাটা লুঙ্গি পরত, আজকাল সাদা পায়জামা পরার অভ্যাস করেছে ট্যারা বসন। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি লেপটে আছে। একটু আগেও বোধহয় লোডশেডিং ছিল। ঘরে নেভানো মোমের পোড়া গন্ধ। ট্যারা বসনের মলমলের পাঞ্জাবি এখনও ঘামে ভেজা। খোলা বুকে সোনার চেনে আঁটা বাঘের নখ। টকটকে লালচে ফরসা রং, মাথায় চুল পাতলা, মজবুত চেহারা। এখনও চোখের নজর যেন উড়ন্ত ছুরির মতো এসে বেঁধে। খুব গম্ভীরভাবে দয়ীর দিকে চাইল।

দয়ী কোনওদিনই বাপকে গ্রাহ্য করে না, আজও করল না। ট্যারা বসনের ডানদিকের মস্ত সোফায় সরিৎ বসা। তার চোখমুখ থমথম কছে। দয়ীর দিকে একবার চেয়েই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে পেছনে হেলে ডোন্টকেয়ার ভঙ্গিতে মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগল। ঠোঁটে একটু বিদ্রূপের হাসি।

দয়ী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেও প্রথমটায় কথা বলতে পারল না। রাগে শরীর কাঁপছিল। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল মাথা। বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ সরিতের দিকে চেয়ে রইল। তারপর পাড়া-জানানো তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমি কাউকে বিয়ে করতে চাই না। আপনি যান, গিয়ে আপনার ভাইয়ের কান বসে বসে ভারী করুন গে। এতদিন তো তাই করছিলেন, সুবিধে হয়নি বুঝে কি আজ এ বাড়িতে হানা দিয়েছেন?

সরিৎ বোধহয় এতটা আশা করেনি। দয়ীর চিল-চেঁচানি শুনে বোধহয় খানিকটা নার্ভাস হয়ে গেল। তোম্বা মুখ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

কিন্তু দয়ীর মাথার ঠিক নেই। সে প্রাণপণে চিৎকার করে বলছিল, লজ্জা করে না আপনার? দিদিকে সারাটা জীবন স্লো পয়জন করে যাচ্ছেন। নিজের ছেলেকে দিয়ে আমার গোপন চিঠি চুরি করাচ্ছেন। মেয়েমানুষের মতো চুকলি করে বেড়াচ্ছেন। আপনি কি ভাবেন আপনার ভাইয়ের মতো পাত্র আর হয় না, আর আমি জলে পড়েছি? আমাদের ভাল-মন্দ বোঝবার জন্য আমার বাবা মা আছে, আপনি গার্জিয়ানি ফলাতে আসেন কেন? মর‍্যালিটি গিয়ে নিজের ছেলেকে শেখান আর বউকে গিয়ে বীরত্ব দেখান।

বলতে বলতে দয়ী উদভ্রান্তের মতো গিয়ে সেন্টার টেবিল থেকে পেতলের ছাইদানিটা তুলে নিল হাতে। তারপর সেটা মাথার ওপর তুলে আক্রোশে বীভৎস চেরা গলায় চেঁচাল, যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান। নইলে শেষ করে ফেলব।

চারদিক থেকে পায়ের শব্দ ছুটে আসছিল, টের পায়নি দয়ী। মুহূর্তে ঘর ভিড়ে ভিড়াক্কার। বহুকাল বাদে ট্যারা বসন তার শারীরিক সক্ষমতার পরিচয় দিল এক লাফে উঠে দয়ীর হাত থেকে দ্রুত হাতে অ্যাশট্রেটা ছিনিয়ে নিয়ে। তারপর জামাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, এইসব লুল্লুভুল্লু আমার ভাল লাগে না। রাত হয়েছে, তুমি বাড়ি যাও।

সরিৎ গুম হয়ে বসে অপমানটা হজম করার চেষ্টা করছিল।

বাড়ির লোকেরা দয়ীকে টেনে নিয়ে গেল অন্দরমহলে। ভারী ক্লান্তবোধ করছিল দয়ী। ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মাথাটা আজ বড় ওলট-পালট। আজ দয়ী আর দয়ী নেই।

শিউলির গন্ধ

১। পারিজাত

হে দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞ ভারতবাসী, তোমরা আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার একান্ত আপনার জন্য। আমি তোমাদেরই লোক। আমি যখন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতাম তখন যেমন, এখন দারিদ্র্যসীমার কিছু ওপরে বাস করার সময়েও তেমনই আমি তোমাদেরই লোক হয়ে গেছি। দারিদ্র্যসীমা হল একটা রেললাইনের মতো। মাঝখানে উঁচু রেলবাঁধ, তার দু'ধারেই লোকালয়। ওধারে তোমরা, এধারে আমরা। তবু আমি সেই রেলবাঁধ পেরিয়ে মাঝে-মাঝেই গিয়ে দেখে আসি ওপারের ভারতবর্ষকে। দারিদ্র্যসীমার নীচেকার ওই ভারতবর্ষই তো আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, কৈশোরের চারণভূমি, যৌবনের উপবন। দারিদ্র্যসীমা বা রেলের ওই বাঁধটা এমন কিছু পাকাপোক্ত বাধাও নয়। এ ধারের লোক প্রায়ই ওধারে যায়, ও ধারের লোক আসে এধারে। কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না। দারিদ্র্যসীমার নীচেকার ওই ভারতবর্ষে এখনও আমার বিস্তর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু রয়ে গেছে।

বন্ধুগণ, ভারতবর্ষ ঠিক কয় ভাগে বিভক্ত তা আমি জানি না। তবে গুণেনবাবু জানেন। তিনি এ বিষয়ে যে গবেষণাগ্রন্থটি রচনা করছেন তা শিগগিরই থিসিস হিসেবে পাঠাবেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে ধর্ম, অর্থনীতি ও ভাষার দিক দিয়ে অন্তত চোদ্দোটি ভাগ করা যায়। শুধু তা-ই নয়, বেসরকারি ভাবে সেই ভাগ হয়েও গেছে, শুধু সরকারিভাবে তা স্বীকার করা হয় না।

স্বীকার আমিও করি না। আমার রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি মনে পড়ে। ওই যে কবিতাটি যার মধ্যে আছে "এক দেহে হল লীন।" আমার ছাই কিছুই ভাল মনে থাকে না । তবু আমি এক দেহে লীন হওয়ার তত্ত্বটা খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু তা নিয়ে গুণেনবাবুর সঙ্গে তর্ক করতেও আমি যাই না।

তাঁর সব কথা মেনে নিই বলে গুণেনবাবু যে খুশি হন তা মোটেই নয়। উনি সর্বদাই কিছু-না-কিছু নিয়ে তর্ক এবং তাতে জয়লাভ করতে ভালবাসেন। বলতে কী এইটেই ওঁর হবি। সারাদিন উনি প্রতিপক্ষ খোঁজেন এবং যে কোনও লোকের সঙ্গেই যে কোনও বিষয়ে একটা তর্ক বাধানোর চেষ্টা করেন। ওঁর ভিতরে তর্কের বিষদাঁত সর্বদাই শুলশুল করে। গুণেনবাবুর সঙ্গে আমার তর্ক না করার আর একটা কারণ হল, তাঁর বোন অসীমার সঙ্গে আমার বিয়ের একটা কথা চলছে। অসীমা রোগা, কালো এবং অসুন্দরী হলে কী হয়, সে একটা ভাল জাতের কো-এডুকেশন স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস, ডবল এম এ এবং বি এড-এ ফার্স্ট ক্লাস।

অসীমা একদিন আমার ঘরে একখানা বই ফেলে যায়। ইস্কুলের পাঠ্য বাংলা বই। তাতে আমি রবীন্দ্রনাথের সেই "এক দেহে হল লীন" কবিতাটি পেয়ে যাই। সেইদিনই গুণেনবাবুকে কবিতাটি শুনিয়ে বে-খেয়ালে বলে ফেলেছিলাম আপনি ভারতবর্ষকে যে চোদ্দোটা ভাগে বিভক্ত করেছেনতা আসলে ইমাজিনেশন।

তর্কের গন্ধ এবং প্রতিপক্ষ পেয়ে গুণেনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হল, তিনি খুব ঠান্ডা গলায় শুরু

করলেন, ইমাজিনেশন? ইমাজিনেশন? আপনি কি জানেন বিষুবরেখাও ইমাজিনেশন! হায়ার ম্যাথম্যাটিকসও ইমাজিনেশন! আপেক্ষিক তত্ত্বও ইমাজিনেশন! যারা এইসব ইমাজিন করেছে তারা কি ঘাস খায়?

বন্ধুগণ, এই ঘাস খাওয়ার কথায় আমি ভিতরে ভিতরে লজ্জা ও হীনমন্যতায় অধোবদন হয়ে যাই। কারণ আমাকে একবার বাস্তবিকই ঘাস খেতে হয়েছিল। তখন আমি দারিদ্র্যসীমার নীচে, অনেক নীচে বাস করতাম। আমার বাবা ছিলেন পোস্ট অফিসের সামান্য স্ট্যাম্প ভেন্ডর। তার ওপর দুরন্ত এক হাঁপানি রোগে এমন কাহিল যে বছরের ছ'মাস বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। সেবার ভারী বর্ষায় আমাদের এলাকাটা বানে ভাসছে। জলে ভিজে আমরা স্যাঁতা ও সাদা হয়ে গেছি। টানা তিন দিন আমাদের ভদ্রগোছের কোনও খাওয়া জোটেনি। একদিন মা আমাদের গমের সঙ্গে মিহি করে কুঁচোনো ঘাস ও অন্যান্য লতাপাতা লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে দেয়। খুব আনন্দের সঙ্গে না হলেও আমরা ভাইবোনেরা তা বেশ পেট ভরেই খেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ঘাস খাওয়ার ফলে আমার মগজ তৃণভোজীদের মতো হয়ে গেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

ঘাস খাওয়ার সেই স্মৃতি আমাকে এতটাই অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ করে তুলল যে, গুণেনবাবুর যাবতীয় যুক্তিতর্কে আমি কেবল হুঁ দিয়ে গেলাম। উনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন।

আমার প্রতিবেশী জহরবাবু প্রায়ই বলেন, আপনার অতীতের সেইসব সাফারিংস নিয়ে একটা বই লিখুন না। এসব লোকের জানা দরকার। ইস্কুলেও পাঠ্য হতে পারে।

আমি বিনীতভাবে চুপ করে থাকি। জীবনী লেখার মতো বয়স বা সফলতা আমি এখনও অর্জন করিনি। তবু জহরবাবু কেন আমাকে জীবনী লেখার কথা বলেন তা আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। উনি জানেন, নিজের অতীত জীবনের দারিদ্র্য সম্পর্কে আমার একটা রোমান্টিক ভাবাবেগ আছে। আমি কত কষ্ট করেছি সেটা লোককে আমি জানাতে ভালবাসি। দ্বিতীয় আর একটা কারণ হল, আমি ইচ্ছে করলে ওঁর মেজো মেয়ের একটা চাকরি অসীমাদের স্কুলে করে দিতে পারি। কারণ আমি ওই স্কুলের সেক্রেটারি।

জহরবাবু তাই আমার কাছে যাতায়াত বজায় রাখেন। কিন্তু মুশকিল হল জহরবাবু যথেষ্ট কথা জানেন না, বেশিক্ষণ বাক্যালাপ চালানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর এবং তেল দেওয়ার সঠিক পদ্ধতিও তিনি শেখেননি। তবু আমাকে ভিজিয়ে রাখার জন্য তিনি আমার কাছেই আমাকে একজন মহৎ মানুষ বলে প্রতিপন্ন করা চেষ্টা করে যান। তাঁর মতে দরিদ্র অবস্থা থেকে আমার এই উন্নতি যুদ্ধজয়ের মতো। আজকালকার যুগে এরকমটা নাকি দেখা যায় না।

কেন দেখা যায় না? আমি একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম।

বলাবাহুল্য জহরবাবু জবাবটা খুঁজে পাননি।

কিন্তু গুণেনবাবু কাছেই ছিলেন। তিনি বললেন, জহরবাবু ঠিকই বলেছেন। আজকালকার যুগে হতদরিদ্র অবস্থা থেকে কেউই কোটিপতি হতে পারে না। এখানকার অরগানাইজড ক্যাপিট্যাল এমন একটা সিস্টেম তৈরি করেছে যে, আগের দিনের মতো পঞ্চাশ টাকার ক্যাপিট্যাল নিয়ে ব্যাবসা শুরু করে নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের গুণে পাঁচ কোটি টাকার মালিক হওয়া এখন অসম্ভব। ছোট ব্যবসায়ীদের উন্নতিরও একটা অদৃশ্য এবং অঘোষিত সিলিং আছে। তার ওপরে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সব চ্যানেলেই রোড ব্লক আছে।

জহরবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, সেইজন্যই বলছিলাম, পারিজাতবাবু অসামান্য লোক। এই অরগানাইজড ক্যাপিট্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে উনি সামান্য অবস্থা থেকে কত বড় হতে পেরেছেন। এ যুগে দেখা যায় না।

গুণেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, পারিজাতের কথা আলাদা। ওকে কখনও অরগানাইজড

ক্যাপিটালকে ফেস করতে হয়নি। ও এমন কিছু বড়ও হয়নি।

গুণেনবাবু অবশ্য তাঁর মন্তব্যটিকে আর ব্যাখ্যা করলেন না। বরং হবু ভগ্নিপতি সম্পর্কে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলার লজ্জায় তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিলেন।

জহরবাবু বোকা-বোকা মুখ করে বসে ছিলেন। আমি বোকা নই। আমার জানা আছে, বাইরে আমার সম্পর্কে নানা ধরনের গুজব জন্ম নেয় এবং বিস্তার লাভ করে।জহরবাবুর কানেও সেইসব গুজব গিয়ে থাকবে। উনি হয়তো সেগুলি বিশ্বাসও করেন। কিন্তু তবু আমাকে একজন মহৎ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা ছাড়া ওঁর আপাতত অন্য উপায় নেই।

আমি ওঁকে আমার দরিদ্র জীবনের একটা গল্প শোনালাম। সে একটা করুণ পায়জামার গল্প। বহুদিন বাদে পুজোর সময় বাবা আমাদের ভাইবোনকে নতুন জামাকাপড় দিলেন একবার। তেমন কিছুই না। ভাইরা পেলাম খুব মোটা কাপড়ের একটা পায়জামা। বোনেরা পেল মোটা ছিটকাপড়ের ফ্রক। সে কী আনন্দ আমাদের। পায়জামা দেখি, শুঁকি, সারাদিন শতেকবার খুলি, আবার ভাঁজ করে রাখি।

সাদামাটা এই গল্পটা শুনে জহরবাবুর চোখ ছলছল করতে লাগল। খুবই কোমল-হৃদয় মানুষ বলতে হবে। ফিসফিস করে বললেন, লিখে ফেলুন, এসব লিখে ফেলুন, একটা মহৎ জীবনীগ্রন্থ হবে।

কিন্তু আমি বুঝি না, দারিদ্র্যের কথা লিখে কী লাভ? দারিদ্র্য জিনিসটা কেমন তা আমার জীবনী পড়েই বা কেন জানতে হবে লোককে? তারা কি জানে না? জহরবাবু নিজেও ভালই জানেন। কারণ ওই দারিদ্র্যসীমার খুব কাছেই ওঁর বাস। মেজো মেয়েটার চাকরি না হলে গ্রাসাচ্ছাদনের খুবই অসুবিধে দেখা দেবে। তবু উনি এমনভাবে আমার কাছে দারিদ্র্যের কথা জানতে চান যেন সেটা কোন দূরের অচেনা রাক্ষসপুরীর গল্প।

অবশ্য জহরবাবুকে দোষ দিই না। আমি নিজেও আমার অতীত দারিদ্র্যের কথা লোকের কাছে গল্প করতে ভালবাসি। জহরবাবুর মতো দু'-চারজন লোক তা শোনেন এবং নানারকম সহানুভূতি প্রকাশ করেন। আমার পুরুষকারেরও প্রশংসা করেন কেউ কেউ।

কিন্তু নিন্দুক এবং রটনাকারীরও অভাব নেই। আমার সম্পর্কে অনেকরকম গল্প ও গুজব প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাজবাড়ির আলমারির গল্প।

এক সময় একটা শহরে আমি ছিলাম। সেটা ছিল এক করদ রাজ্যের রাজধানী। ছোটখাটো ছিমছাম শহর। রাজাদের সেই আগেকার রবরবা নেই। ক্রমে ক্রমে অবস্থা পড়তে পড়তে এমন তলানিতে এসে ঠেকল যে, রাজবাড়ি থেকে নানারকম পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে দেওয়া হতে লাগল।

লোকে বলে, আমি নাকি জলের দরে রাজার একটা পুরনো কাঠের আলমারি কিনে নিই। বহুকাল খোলা হয় না এবং চাবিও বেপাত্তা বলে আলমারির ভিতরে কী আছে তা আর দেখে নেওয়ার সময় বা সুযোগ রাজার হয়নি। সেই বন্ধ আলমারির ভিতর নাকি আমি কয়েক লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর বাসন পেয়ে যাই। ফলে অরগানাইজড ক্যাপিটালের সমস্ত অবরোধ পার হয়ে রাতারাতি পুঁজিপতিদের এলাকায় ঢুকে যেতে আমার কোনও অসুবিধেই হয়নি।

বলাবাহুল্য এ গল্প আদপেই সত্য নয়। রাজবাড়ি থেকে একটা বিলিতি ওক কাঠের আলমারি আমি কিনেছিলাম বটে, কিন্তু তার ভিতরে তেমন সাংঘাতিক কিছু ছিল না। কিন্তু সেকথা আমি বললেই বা লোকে বিশ্বাস করবে কেন? লোকে বিশ্বাস করে সেটাই যেটা তারা বিশ্বাস করতে চায়। সুতরাং আমার সম্পর্কে প্রচলিত গুজবগুলির প্রতিবাদ আমি কখনও করি না। বরং আমার চারদিকে

যে অবাস্তব রহস্যময় একটা কল্পকুহেলি গড়ে উঠেছে সেটাকে আমি গড়ে উঠতে দিচ্ছি।

আজকাল বিকেলের দিকে প্রায়ই অসীমা আমার বাড়িতে আসে। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়। অসীমাদের পরিবার খুবই রক্ষণশীল। বিয়ের আগে মেলামেশার ব্যাপারটা তারা আদপেই পছন্দ করে না। কিন্তু সময়টা সেই পুরনো আমলে বসে নেই। সব রীতিনীতি ও মূল্যবোধই পাল্টে গেছে। সুতরাং অসীমা আসে এবং তার বাড়ির লোক দেখি-না দেখি-না ভাব করে থাকে।

তবে একথাও ঠিক যে, অসীমা আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য মোটেই আসে না। তার আসার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু সে যখন আসে তার আসাটা আমি রোজ লক্ষ করি।

আমার বাড়ির সামনে অনেকটাই জমি ছাড় দেওয়া আছে। সিংহবাবুরা একসময়ে এই জমিতে খুব সুন্দর বাগান করেছিলেন। কিন্তু সাজানো বাগান আমি ভালবাসি না। বরং একটা বন্য ধরনের অনিয়মিত এবং অসজ্জিত গাছপালা আমার বেশি পছন্দ। সেইজন্য বাগানে আমি মালি লাগাইনি। যত্রতত্র গাছ গজাচ্ছে এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছে। একটা লাল মোরামের স্নিগ্ধ পথ ফটক থেকে বাঁকা হয়ে এসেছে বাড়ির সদর পর্যন্ত। এই পথটির দু'ধারে বেঁটে বেঁটে লিচু আর কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি। চমৎকার ছায়া পড়ে থাকে পথে। লতানে গোলাপগাছও মেলা। খুব ফুল ফোটে। এই চমৎকার পথটি দিয়ে বিকেলের দিকে, প্রায় সন্ধের কাছাকাছি সময়ে ক্লান্ত অসীমা যখন আসতে থাকে তখন তাকে লক্ষ করতে আমার বেশ ভাল লাগে। না, ওই পথ আর ছায়া আর গাছপালার চালচিত্রে অসুন্দরী যে অপরূপ হয়ে ওঠে তা নয়। বরং তাকে আরও রোগা আরও কালো, আরও লাবণ্যহীন দেখায়। খুব রোগা বলেই বোধহয় ইদানীং একটু কুঁজোমতোও হয়ে গেছে সে। কড়া মেজাজের দিদিমণি বলে তার মুখচোখেও একটা অতিরিক্ত রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। সে খোঁপা বাঁধে এবং সাদা খোলের শাড়ি পরে। হাতে একটা ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনও গয়না নেই। তার মতে পুরুষরা ডিসিপ্লিন মানে না, বোকার মতো কথা বলে এবং প্রায় সময়েই অসভ্যের মতো আচরণ করে। পুরুষদের প্রতি সেই বিরাগও তার মুখে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। এই কুৎসিত, লাবণ্যহীন অসীমাকে তবু আমি লক্ষ করি। খুব লক্ষ করি।

আমি থাকি নীচের তলায় সামনের দিককার ডানহাতি ঘরখানায়। মাঝারি মাপের ঘরখানা মোটামুটি একটা অফিসের ধাঁচে সাজানো। মাঝখানে একটা বড় ডেস্ক ও চেয়ার, ফাইল ক্যাবিনেট, টাইপরাইটার, টেলিফোন ইত্যাদি। ঘরের এক কোণে একটা লম্বা সরু চৌকিতে বিছানা পাতা থাকে। আমি রাতে প্রায় সময়েই ওই বিছানায় শুই। কারণ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করার পর প্রায়দিনই আমার আর ভিতর-বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে না।

অসীমা এই ঘরেই এসে আমার মুখোমুখি বসে। ছোট্ট একটা রুমালে মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মোছে। প্রথমেই আমরা কথা শুরু করি না। আমার বা অসীমার কারওরই তেমন কোনও প্রগল্‌ভতা নেই। তাছাড়া কথা বলার অসুবিধেও থাকে। আমার টাইপিস্ট ছেলেটি সন্ধে সাতটার আগে ছুটি পায় না। বিকেলের দিকে অনেক পার্টিও আসে। সুতরাং অসীমাকে অপেক্ষা করতে হয়।

প্রায়দিনই আমরা কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে বাগানে বসি। সিংহবাবুদের শখ ছিল। বাগানে তাঁরা চমৎকার কয়েকটা বেঞ্চি বসিয়ে গেছেন। কোনও কোনও বেঞ্চির চারধারে ঘনবদ্ধ কুঞ্জবন। প্রেম করার আদর্শ জায়গা।

আমরা এরকম একটা কুঞ্জবনেই গিয়ে বসি। খুব সাদামাটা ভাবেই আমাদের কথা শুরু হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, অডিটে আর কোনও কিছু ধরা পড়ল?

হ্যাঁ। ফারনিচার অ্যাকাউন্ট, বুক পারচেজ, রিনোভেশন সবটাতেই গণ্ডগোল।

ইস্কুলে নিশ্চয়ই বেশ উত্তেজনা!

হ্যাঁ।

কী রিঅ্যাকশন দেখলে?

খুব ডিসটার্ব বোধ করছেন সবাই।

আমি একটুও চিন্তিত হই না। বলি, আর কী খবর?

কমলাদি খুব ডেসপারেট হয়ে উঠছে।

কীরকম?

অধরবাবু আজ স্কুলে এসেছিলেন।

বলো কী? দিনের বেলায়?

তাই তো দেখলাম। কী বিশ্রী ব্যাপার বলো তো!

কেন এসেছিল?

নিজে থেকে আসেনি। দপ্তরির কাছে শুনলাম কমলাদিই নাকি তাকে চিরকুট দিয়ে অধরবাবুর কাছে পাঠিয়েছিল।

কেন, তা জানতে পারোনি?

না, তবে সেকেন্ড পিরিয়ড থেকে ফোর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত অধরবাবু কমলাদির চেম্বারে ছিলেন। বোধহয় গারজিয়ানস মিটিং নিয়ে কথা হচ্ছিল।

আমি একটু ভাবলাম। কমলা সেন অসীমাদের হেডমিসট্রেস। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স এবং এখনও কুমারী। অধরবাবু এই শহরের মোটামুটি নামকরা একজন ঠিকাদার। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বিবাহিত এবং চার-পাঁচটি ছেলেপুলের বাবা। এঁদের দু'জনের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক বহুকাল ধরে চালু আছে বলে গুজব। তবে সম্পর্কটা দেহগত না শুধুই ভাবগত সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নয়। কমলা সেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক, তাঁর আমলে স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রেজাল্টও দারুণ। কাজেই তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচার যা-ই থাক সেটা তেমন গুরুত্ব পায় না। অপরপক্ষে অধরবাবু অত্যন্ত ডাকাবুকো লোক। শোনা যায় তিনিও দারিদ্র্যসীমার তলা থেকে উঠে এসেছেন। একসময়ে ভাল খেলোয়াড় এবং দুর্দান্ত গুন্ডা ছিলেন। তাঁর একটা বেশ বড়সড় দল আছে। অধরবাবুর দানধ্যান এবং পরোপকারেরও যথেষ্ট সুনাম। কমলা সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যে রকমই হোক সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার মতো লোকবল ও অর্থবলের অভাব তাঁর নেই।

কিন্তু এরকম একটা অনৈতিক ব্যাপারকে চলতে দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করিনি। জনসাধারণের ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাপারটা তাদের গোচরে আনতে আমি প্রথমে শহরে কয়েকটা পোস্টার দিই। তাতে একটু গুঞ্জন উঠলে পরে অভিভাবকদের একটা মিটিং ধারণ করে। অভিভাবকদের মিটিং-এ দু'জন রাজনৈতিক নেতাও ভাষণ দেন। বিস্ময়ের কথা হল, কমলা সেন তাঁর বিরুদ্ধে রটনাটাকে অস্বীকার করেননি। স্বীকারও করেননি। অর্থাৎ তিনি মুখ খুলতে চাননি।

আমি বললাম, নজর রেখো।

রাখছি। তবে, কমলাদি খুব রেগে আছেন।

তাই নাকি?

অসীমা একটা ক্লান্তির বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, আমার সঙ্গে আজ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে।

কেন?

আমি অডিটারদের কাছে রোজ যাই এবং কথা বলি বলে।

তাতে দোষ কী?

দোষ তো নেই-ই। কিন্তু উনি ঝগড়া করার একটা পয়েন্ট খুঁজছিলেন।

আমি একটু হাসলাম। বললাম, কিছু বললে ছেড়ে দিয়ো না।

আমি উচিত কথা বলতে ছাড়ি না।

খুব ভাল।—আমি উদার গলায় বলি।

অসীমা একটু চুপ করে থেকে সামান্য বুঝি-বা বিষণ্ণ গলায় বলল, কিন্তু আমি কমলাদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করায় কলিগরা কেউ খুশি হয়নি।

না হওয়ারই কথা। কমলা সেন সম্পর্কে প্রচার যাই থাকুক, উনি অসম্ভব জনপ্রিয়। সহকর্মীরা ওঁকে বড় বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সুতরাং অসীমা উচিত কথা বললেও সেটা ওদের কাছে অনুচিত শোনাবে। তাই আমি অসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, খুশি হয়নি কী করে বুঝলে?

সবাই অ্যাভয়েড করছিল আমাকে।

আমি কুঞ্জবনের আলো-আঁধার অসীমার শুষ্ক রুক্ষ মুখখানা লক্ষ করছিলাম। বোধহয় সুন্দরের মতো কুৎসিতের মধ্যেও একধরনের আকর্ষণ আছে। আসলে হয়তো সেটা বিকর্ষণই। জটিল এক মানসিক প্রক্রিয়ায় সেইটেই আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমি অসীমার মধ্যে সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যের অভাব লক্ষ করছিলাম না। আমি বরং ওর মুখে অতি সম্প্রতি যে গভীর ক্লান্তির ছাপ পড়েছে তার কারণটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম।

অসীমা তার স্কুলটিকে বোধহয় ভালবাসে। খুব গভীরভাবেই বাসে। এই স্কুলে কোনও কারচুপি বা হিসেবের গোলমাল ধরা পড়লে সে নিশ্চয়ই খুশি হয় না। কিন্তু তার কিছু করারও নেই। সম্ভবত খুব শিগগিরই সে এই স্কুলের হেডমিসট্রেস হবে। এবং তা হবে কমলা সেনকে সরিয়েই। একসময়ে কমলা সেন সম্পর্কে অসীমার অন্ধ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। আজ নেই। এই সবের মূলে হয়তো আমার অবদানের কথাই সে ভাবে। আর তাই তার ক্লান্তি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

আমি বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অসীমাও তা জানে। তাই জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বাদে শুধু বলল, স্কুলে আমি খুব আনপপুলার হয়ে গেছি।

কেন, ছাত্রছাত্রীরাও কি তোমাকে অপছন্দ করে?

তাই তো মনে হয়।

কেউ ওদের উসকে দিচ্ছে না তো?

কী করে বলব?

খোঁজ নাও। যদি দেখো দিচ্ছে তাহলে আমাকে জানিয়ো।

অসীমা খুব করুণ বোবা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। সে দৃষ্টির ভাষা আমি পড়তে পারলাম না। তবু মনে হল, অসীমার চোখ আমাকে বলছে, ক্ষ্যামা দাও, আর আমার ভাল তোমাকে করতে হবে না।

ছাত্রছাত্রীদের কাছে অসীমা কেন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে তা আমি বলতে পারব না। তবে সে কোনওকালেই ওদের তেমন প্রিয় দিদিমণি ছিল না। সবাই তাকে ভয় করত এবং মেনে চলত, এই যা।

আকাশ মেঘলা করেছে। কুঞ্জবন আঁধার হয়ে এল। আমি ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, চলো, উঠি।

চলো।

এইভাবেই রোজ আমাদের প্রেমপর্ব শেষ হয়। আমরা উঠে পড়ি এবং যে যার কাজে চলে যাই। অসীমা সম্ভবত এইরকম উত্তাপহীন প্রেমই পছন্দ করে। সে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করছে। ফলে তার একটা কঠোর নীতিবোধ জন্ম নিয়েছে। তাকে স্পর্শ করলে বা আরও ঘনিষ্ঠ কিছু করতে গেলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করবে। আমি জানি বিয়ের পরেও এই সংকোচ কাটাতে তার সময় নেবে। আমারও তাড়া নেই। অসীমাই তো আমার জীবনে প্রথম মহিলা নয়। এমনকী সে আমার প্রথম স্ত্রীও হবে না।

এর আগে আমি আর একবার বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সেই স্ত্রী মণিমালা আত্মহত্যা করে।

২। অভিজিৎ

বেশিদিন বেঁচে থাকলে মানুষকে ভারী একা হয়ে যেতে হয়। সমান বয়সের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদি-বা খুঁজে পাওয়া যায় তো যোগাযোগ হয় না।

আমার দাদুকে দেখে সেইটে খুব স্পষ্টভাবে বুঝলাম আমি।

আমার ঠাকুমা অবশ্য দীর্ঘদিন বেঁচে দাদুকে সঙ্গ দিয়ে গেছেন। তবু শেষ অবধি বয়সের কমপিটিশনে তিনি পেরে ওঠেননি। বছর পাঁচ-ছয় আগে আশি বছর পার হওয়ার বেশ কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। দাদু নব্বই পেরিয়েছেন। খুব বহাল তবিয়তে আছেন বলা যায় না কিন্তু আছেন।

আমাদের বাড়িটা খুবই খাঁ খাঁ করে আজকাল। বাসযোগ্য দু'খানা ঘর আছে। পাকা ভিত, ইটের দেওয়াল, ওপরে টিনের চাল। আর উঠোনের দু'দিকে আর-দুটো মাটির ঘর। ঠিকমতো লেপা পোঁছা এবং মেরামতি না হলে মাটির ঘর টিঁকিয়ে রাখা যায় না। এখানে-সেখানে খোঁদল দেখা দেয়, মেঝেয় বড় বড় গর্ত হতে থাকে, রোদে জলে ক্রমাগত সংকোচন-প্রসারণের ফলে ফাটল ধরে। আমাদের মেটে ঘর দু'খানার দুর্দশা চোখে দেখলে কষ্ট হয়। ওরই একখানা ঘরে আমি চব্বিশ বছর আগে ভূমিষ্ঠ হই।

পাকা ঘর দু'খানা নিয়ে দাদুর বাস। যত রাজ্যের বাজে জিনিসে ঘরদুটো ঠাসা। পুরনো কৌটো, শিশি, খবরের কাগজ, ভাঙা একখানা সাইকেল, কিছু ঘুণে ধরা তক্তা, অকাজের বাঁশের খুঁটি। দাদু কিছুই ফেলে দেননি। বরাবরই তাঁর সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁক। তবু সঞ্চয়ের মতো বাড়তি কিছুই তিনি হাতের কাছে পাননি কোনওদিন। যা পেরেছেন রেখেছেন। বাড়িতে মোট এগারোটা নারকোল গাছে সারা বছর অফুরন্ত ফলন। কে খাবে? দাদু নারকোল বেচে দেন। বাঁধা লোক আছে। সে এসে নারকোল ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ছোবড়াগুলো দাদু বস্তা-বোঝাই করে সঞ্চয়ের ঘরে তুলে রাখেন। তাঁর খুব ইচ্ছে রেলে বোঝাই করে আমরা ছোবড়াগুলো কলকাতায় নিয়ে যাই। নারকোলের ছোবড়া নিশ্চয়ই গৃহস্থের কোনও-না-কোনও কাজে লাগে। এ বাড়িতেই একসময়ে ছোবড়ার কত কদর ছিল। গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হত, সন্ধেবেলায় ধূপ জ্বালানো হত, দড়িদড়াও তৈরি হয়েছে একসময়ে। ওই একই মানসিকতার দরুন দাদু গত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর যাবতীয় পুরনো জুতো জমিয়ে রেখেছেন। অব্যবহার্য রকমের ছেঁড়া, বেঁকে যাওয়া সেইসব জুতো কোনওদিনই কারও কাজে আসবে না। তবু আছে।

স্মৃতি তাঁর সঙ্গে বড় লুকোচুরি খেলে আজকাল। সেও এই বয়সেরই গুণে। আর যেটা হয়, কেমন যেন আপনজনদের প্রতি ঠিক আগেকার মতো বুকছেঁড়া টান ভালবাসা থাকে না। বয়সের ইঁদুর এসে মায়ামোহের সুতোগুলো কুটকুট করে কেটে দিয়ে যায়। গাঁয়ের বাড়িতে দাদু এখন একা। নির্ভেজাল একা। তবু তাঁর কোনও হাহাকার নেই। ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনিদের কেউ এলে খুব যে খুশি হন তা নয়। এলে আসুক। গেলে যাক।

এক মাঝবয়সি মেয়েছেলে আসে রোজ। ঝাঁটপাট দেয়। বিছানা তোলে, পেচ্ছাপের কৌটো ধুয়ে দেয়। সে-ই রান্না করে দিয়ে যায় একবেলা। দুপুরে তার যুবতী মেয়ে এসে বাসন মাজে। সন্ধেবেলা দাদু নিজেই উঠোনে কাঠকুটো জ্বেলে দুধ গরম করে নেন। খই দুধ খেয়ে শুয়ে থাকেন। বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এইভাবে।

নকশাল আন্দোলনের সময় আমাকে একবার পালিয়ে আসতে হয়েছিল দাদুর কাছে। তখন

থেকেই আমি তাঁর জীবনযাপনের ধারাটা ভাল করে জানতে থাকি।

সেবার আমাকে দাদুর কাছে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। ঠাকুমা তখনও বেঁচে ছিলেন। অনেকদিন আমি কলকাতায় ফিরছি না দেখে দাদু আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। আমি পরীক্ষায় ফেল করিনি তো? কোনও মেয়ের সঙ্গে লটঘট করে আসিনি তো? ঠাকুমা ধমক দিতেন, নাতিটা এসেছে, অত খতেন কীসের?

আমি দাদুকে আন্দোলনের সোজা কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কেন আন্দোলনটা হচ্ছে বা কেন হওয়া দরকার। দাদু সেসব বোঝেননি। আসলে সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গে তিনি আর ওতপ্রোত জড়িত নন। কোথায় একটা পার্থক্য ঘটেই গেছে। যেন জেটির থেকে তফাত হওয়া স্টিমার। দেশ কাল আত্মীয়তা সময় সবই এক অস্পষ্টতায় মাখা।

যদিও এই বাড়িতেই আমার জন্ম এবং এই গ্রামটাই আমার জন্মভূমি, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে এটা আমাদের দেশ নয়। এই বাড়ি ছিল গণি মিয়ার। আমরা ঢাকা জেলার লোক। দেশভাগের পর আমাদের ঢাকার গাঁয়ের বাড়ির সঙ্গে গণি মিয়ার এই বাড়ি দাদু বদল করে নেন। পাড়াগাঁয়ে বসতি স্থাপনে দাদুর ছেলেমেয়েদের আপত্তি ছিল। কিন্তু দাদু শহরে যেতে চাননি। ভূমি এবং আশ্রয়ের সংজ্ঞা তাঁর কাছে আলাদা। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এটা তোমাদের দেশের বাড়ি হিসেবে রইল। তোমরা পালে-পার্বণে আসবে।

সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছিল কি না বলতে পারি না। ছেলেমেয়েরা একে একে বড় হল এবং একে একে চলে গেল। পালে-পার্বণেও বড় একটা কেউ আসে না। দাদু আজ একা বটে, কিন্তু খুব অসুখী তো নন।

জায়গাটা গ্রামের মতো হলেও শহর থেকে খুব দূরে নয়। শহরের স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মাত্র দু'মাইলের মতো বাসে বা রিকশায় আসতে হয়। তারপর কিছুটা হাঁটাপথ। রাস্তাটা যে খুব ক্লান্তিকর তা নয়। অন্তত বছরে এক-আধবার আসতে খারাপ লাগে না। শহরের ভিড়ভাট্টা ছেড়ে প্রকৃতির নির্জনতায় পা দিলে, খারাপ লাগবেই বা কেন?

তবে প্রকৃতি ক্রমে নিকেশ হয়ে আসছে। বাস যেখানে থামে সেই বড় রাস্তায় আগে দোকানপাট তেমন ছিল না। আজকাল হয়েছে। এক-আধটা নয়। সারি সারি বেড়া আর টিনের ঘরে হরেক পসরা। বসতিও বাড়ছে। নির্জনতা সরে যাচ্ছে। গ্রামকে ত্রাণ করতে এগিয়ে আসছে শহরের থাবা। হাঁটা পথটুকু আগে এত নির্জন ছিল যে, দিনের বেলাতেও গা ছমছম করত। এখন কাঁচা রাস্তাটা পাকা হয়েছে। পাকা বাড়ি উঠেছে কয়েকটা। একটা ইস্কুল এবং দুটো সরকারি দফতর বসে গেছে। সুতরাং পুরনো দিনের তুলনায় বেশ জমজমাট অবস্থা বলতে হবে।

আমাদের কিছু চাষের জমি ছিল। নতুন ধান উঠলে বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। কিন্তু ক্রমে ফসলের খেত নিয়ে বড় গণ্ডগোল দেখা দেয়। ধানকাটা নিয়ে মারপিট, জোর করে ফসল কাটা বা চুরি এমন একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল যা দাদুর পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল। কাজেই উনি জমি বেচে দিলেন। মোট তিন বিঘা জমি নিয়ে আমাদের বাড়ি। এখন ওই তিন বিঘাই সম্বল। কিছু মরশুমি সবজির চাষ হয় মাত্র। শুনতে পাচ্ছি আমাদের ওই তিন বিঘা জমি কেনার জন্যও লোক ঘোরাঘুরি করছে। শহর খুব এগিয়ে আসছে।

আমি পৌঁছলাম ঠিক দুপুরবেলা। তখন দাদুর দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশের নীচে একটা গাঢ় ছায়া পড়ে আছে চারধারে। হাওয়া নেই। এখানে-সেখানে জল জমে আছে। রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকবার পথটায় ভীষণ কাদা। জোড়া জোড়া ইট পাতা হয়েছিল সেই কবে। আজও বর্ষায় বাড়ি ঢুকতে সেই পুরনো ইটে পা ফেলে যেতে হয়। সাবধানে ইটের ওপর পা ফেলে টাল সামলাতে সামলাতে বাড়িতে ঢুকবার সময় দেখলাম দাদু সামনের দাওয়ায় কাঠের চেয়ারটায় বসে খুব সন্দিহান চোখে আমাকে দেখছেন।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, খেয়ে এসেছ তো?

তাঁর উদ্বেগের কারণটা বুঝি। রান্নার লোক চলে গেছে। বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই যে রেঁধে দেবে। এ সময়ে উটকো লোক এলে তাঁর ঝামেলা।

বললাম, পারুলদের বাড়িতে খেয়ে নেব।

নিশ্চিন্ত হয়ে মুখের হরতুকিটা এ গাল থেকে ও গালে নিলেন। কারও কথা জিজ্ঞেস করলেন না, কলকাতার খবর জানতে চাইলেন না। যেন-বা সেসবের আর প্রয়োজন নেই। তিনি নিরুদ্বেগ ও নির্বিকার থাকতে চান। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, ক'দিন থাকবে?

আমি বললাম, দেখি।

কুয়োর জলে অঢেল স্নান করে আমি পারুলদের বাড়ি খেতে গেলাম।

আগে থেকে খবর দেওয়ার কোনও দরকার হয় না পারুলদের বাড়িতে। কিছু মুখ ফুটে বলতেও হয় না। অসময়ে গিয়ে হাজির হলেই আপনা থেকেই সব টরেটক্কা হয়ে যায়।

বলাই বাহুল্য পারুল আমার বাল্যসখী এবং প্রেমিকা। আমার বাল্যকাল তো বেশি দূরে ফেলে আসিনি। আমার বয়স মাত্র চব্বিশ। পারুলেরও ওরকমই।

প্রেম কীরকম তা আমি জানি না। পারুলের সঙ্গে আমার সত্যিই প্রেম ছিল কি না তা আজ সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। অনেক তর্ক, অনেক বিচার এসে পড়ে। আমি তেমনভাবে কোনওদিন ওর অঙ্গ স্পর্শ করিনি, চুমু খাইনি, ভালবাসার একটি কথাও বলিনি। ইচ্ছেও হয়নি কখনও। তবে প্রেম বলি কী করে? যখন ওর বিয়ে হয়ে যায় তখন খুব ফাঁকা ঠেকেছিল কয়েকদিন। শুধু সেটুকুই কি প্রেম?

প্রথম কবে দু'জনের দেখা তা বলতে পারব না। বোধহয় তখন দু'জনেই হামা দিই, বিছানায় হিসি করি এবং পরস্পরের সামনে উদোম হতে লজ্জা বোধ করি না। আমরা এক দঙ্গল ছেলেপুলে ঝাঁক বেঁধে এক সঙ্গে বড় হয়েছি। তার ভিতর থেকে আমি আর পারুল কী করে যে আলাদা দু'জন হয়ে উঠি সেও স্পষ্ট মনে নেই। তবে খুব শুদ্ধ ও সুন্দর ছিল আমাদের সম্পর্ক। আমি ওদের বাড়ি গেলে পারুল খুশি হত, ও এলে আমি। নিঃশব্দে দুটি হৃদয়ের স্রোত পাশাপাশি বইছিল। জল একটু চলকালেই হয়ে যেত একাকার।

স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়েই আমি কলকাতায় দৌড়ালাম। পারুল রয়ে গেল। আমার কাছে আজও পারুলের বিস্তর চিঠি জমে আছে। ভুল বানান, খারাপ হাতের লেখা, তবু নিজের হৃদয়কে সে প্রকাশ করত ঠিকই। লিখত কলকাতা বুঝি খুব ভাল? আর আমি খারাপ? যেন কলকাতার সঙ্গেই ছিল তার অসম লড়াই।

ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর তাঁর শ্রাদ্ধে যখন আমরা আসি তখনই শেষবারের মতো কুমারী পারুলের সঙ্গে দেখা।

একদিন আমতলায় খড়ের গাদির পিছনে নিরিবিলি কথা হল।

পারুল বলল, আমি তোমার ওপর রাগ করেছি।

কেন?

করেছি ইচ্ছে হয়েছে। আসতে চাও না কেন এখানে?

এখানে এসে কী হবে? আমি পড়ছি যে কলকাতায়।

আর কত পড়বে?

অনেক পড়া।

আমি বুঝি কেবল হাঁ করে বসে থাকব?

আমি কী করব বলো তো?

এত লম্বা হয়েছ কেন? তোমাকে চেনাই যায় না।

লম্বা হওয়ারই তো কথা।

তা বলে এতটা ভাল নয়। ভীষণ অন্যরকম হয়ে গেছ।

মানুষ তো বয়স হলে বদলে যায়।

আমি বদলেছি?

খুব।

কীরকম বদলেছি?

তুমিও লম্বা হয়েছ।

সুন্দর হইনি তো?

বাঃ, তুমি তো দেখতে ভালই।

তোমার চেহারাটা খুব চালাক-চালাক হয়ে গেছে কেন বলো তো!

তবে কি বোকা-বোকা হওয়ার কথা ছিল?

তা নয়।— বলে একটু লজ্জা পেল পারুল। যুবতী বয়সের একটা চটক প্রায় সব মেয়েরই থাকে। পারুলেরও আছে। কিন্তু তা বলে পারুলকে সুন্দর বললে ভুল হবে। যদি কলকাতায় না হয়ে এই গ্রামেই থাকতাম তাহলে পারুলকে আরও অনেক বেশি সুন্দর মনে হত। কিন্তু আমি যে শহরে নিত্যদিন বহু সত্যিকারের সুন্দর মেয়ে দেখি।

অবশ্য শুধু সৌন্দর্যটাই কোনও বড় কথা নয়। পারুল বড় ভাল মেয়ে। শান্ত, ধীর, লাজুক, বুদ্ধিমতী। তার হৃদয়টি নরম। আজকাল মনে হয়, তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখীই হতাম। কিন্তু আমাকে বিয়ের জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, যদি আদপেই করি। পারুল ততদিন অপেক্ষা করতে পারত না। তার বয়স হয়ে যাচ্ছিল।

তবু আশা করেছিল পারুল। খুব আশা করেছিল। কিন্তু আমি কোনও অসম্ভব প্রস্তাব তো করতে পারি না। আমাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয়। আমার তখন মাত্র আঠারো-উনিশ বছর বয়স। স্বপ্ন দেখার পক্ষে সুন্দর বয়স, কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার মতো বয়স সেটা নয়। তার ওপর বর্ণ আলাদা। সেটা নিয়েও কিছু ঝামেলা হতে পারত। শহরে বাস করার ফলে আমার বাস্তব বুদ্ধি কিছু বেড়ে থাকবে।

পারুলদের অবস্থা বেশ ভাল। ওরা জাতে গোপ। বংশগত বৃত্তি ওরা কখনও ছাড়েনি। বাড়ির পিছন দিকে সেই আমতলার ধারেই মস্ত উঠোন ঘিরে টানা গোশালা। অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা গোরু মোষ। দুধ বিক্রি তো আছেই, উপরন্তু শহরের বাজারে এবং রেল স্টেশনে রমরম করে চলছে দুটো মিষ্টির দোকান। আমাদের মতো ওরাও এসেছিল তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে। কিছু কষ্টেও পড়েছিল বটে, কিন্তু সামলে গেছে। এখনও ওদের বাড়িতে ঢুকলে সচ্ছলতার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মস্ত জমি নিয়ে বসত। অন্তত গোটা তিনেক একতলা এবং দোতলা কোঠাবাড়ি। একান্নবর্তী পরিবার অবশ্য ভাঙছে ভিতরে ভিতরে। তবে বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না।

পারুলের মাকে আমি ফুলমাসি বলে ডাকি। ফরসা গোলগাল আহ্লাদি চেহারা। একটু বেঁটে। খবর পেয়েই বেরিয়ে এসে বললেন, আয়। কালও তোদের কথা ভাবছিলাম।

কী ভাবছিলে?

এমনি ভাবছিলাম না। রাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম তোর মাকে নিয়ে। শানুদি ভাল আছে তো?

আছে। স্বপ্নের কোনও মানে হয় না কিন্তু।

সে হয়তো হয় না। তবে মনটা কেমন করে যেন।

পারুল কি শ্বশুরবাড়ি?

তাছাড়া আর কোথায়?

বারফট্টাই নেই বলে এদের ঘরে আসবাবপত্র বেশি থাকে না। যা আছে তাও তেমন চেকনাইদার নয়। সাদামাটা সাবেকি খাট, চৌকি, চেয়ার, আলমারি, দেয়াল-আয়না, সস্তা বুক-র‍্যাক।

পারুলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দু'বাড়ির সকলেই জানত। ফুলমাসির সমর্থনও ছিল। সম্ভাব্য জামাই হিসেবে উনি আমাকে একটু বাড়াবাড়ি রকমের যত্নআত্তি করতেন। সেই অভ্যাসটা আজও যায়নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ বড় রকমের আয়োজন করে ফেললেন।

আমি মৃদু হেসে বললাম, ফুলমাসি, যাদের ভাল করে খাওয়া জোটে না তাদের ভাল খাইয়ে অভ্যাস খারাপ করে দেওয়াটা খুব অন্যায়।

খুব পাকা হয়েছিস, অ্যাঁ? পেট ভরে খা তো।

পেট ভরে খাব না কেন? আমার তো চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। তবে ডাল ভাত বা তেঁতুল পান্তা দিলেও পেট ভরেই খেতাম, এত আয়োজন করার দরকার ছিল না।

আচ্ছা, এর পর পান্তাই দেব। এখন খা। তুই নাকি শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে চাকরি পেয়েছিস?

কে বললে?

পারুলের বাবা বলছিল।

গণেশকাকা? গণেশকাকাই তো আমাকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে লোক নেবে খবর দিয়ে।

তুই ওর চিঠি পেয়ে এসেছিস? দেখ কাণ্ড! আমাকে বলল অভির চাকরি হয়েই গেছে।

না গো মাসি। শহরে নেমেই আগে স্টেশনের কাছের দোকানটায় গিয়ে গণেশকাকার সঙ্গে দেখা করেছি। শুনলাম দু'জন লোক নেবে, অ্যাপলিক্যান্ট ছ'শোরও বেশি।

বলিস কী?

গণেশকাকা আমাকে চিঠি লিখে আনিয়ে এখন ভারী অস্বস্তিতে পড়েছেন।

তোর কি তাহলে হবে না?

হওয়ার কথা তো নয়। তবে গণেশকাকা একজনকে মুরুব্বি ধরেছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস। অসীমা না কী যেন নাম।

ও, সেই শুঁটকি! ওকে ধরলে কি কাজ হবে? ওর বরটা বরং করে দিতে পারে।

ও বাবা, আমি অত ধরাধরিতে নেই।

তা সে তুই কেন ধরতে যাবি! যে তোকে আনিয়েছে সেই ধরবে।

শুঁটকির বরটা কে?

ফুলমাসি মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, বর আসলে নয়। বিয়ের কথা চলছে। লোকটা ভাল নয়। আগের বউটাকে গলা টিপে মেরেছে।

তবে তো শাহেনশা লোক।

লোক খারাপ, তবে চাকরিটা করে দিতে পারে।

কলকাতা ছেড়ে আসার ইচ্ছে আমার খুব একটা নেই। সেখানে কর্মহীন দিন আমার অকাজে কাটে বটে, কিন্তু রোজ মনে হয়, চারদিকে এই যে এক অন্তহীন শহর, এত অফিসবাড়ি, এত দোকানপাট, এত ব্যাবসা-বাণিজ্য, হয়তো একদিন এ শহর দুম করে একটা সিংহদুয়ার খুলে দেবে সৌভাগ্যের। কলকাতায় কত ভিখিরি রাজা বনে গেছে। কলকাতায় থাকলে এই সুখস্বপ্নটা দেখতে পারি। কিন্তু মফস্সল শহরে স্বপ্নের কোনও সুযোগ নেই। মনমরা, চোখবোজা হয়ে পড়ে আছে লক্ষ্মীছাড়া এইসব শহর। এদের রসকষ সব টেনে নিয়েছে কলকাতা। এগুলো শুধু বকলমে শহর। মানুষ আর বসতি বাড়ছে বটে, কিন্তু বাড়ছে না অর্থনীতি। তাই এখানে মাস্টারির চাকরিতে আমার তেমন আগ্রহ নেই। হলে ভাল, না হলে ফের স্বপ্ন দেখার শহরে ফিরে যাব।

আমি তাই ফুলমাসিকে বললাম, অত কিছু করতে হবে না। লোকটাকে নিশ্চয়ই আরও অনেক

ক্যান্ডিডেট ধরাধরি করছে। তারা হয়তো স্থানীয় লোক। চাকরি তাদেরই কারও হয়ে যাবে। আমাকে দেবে না। খামোকা এর জন্য একটা বাজে লোককে ধরাধরি করতে গিয়ে গণেশকাকা নিজের প্রেস্টিজ নষ্ট করবেন কেন?

বাজে লোক তো ঠিকই। কিন্তু ভাল লোকই বা পাচ্ছিস কোথায়! সব জায়গায় খারাপ লোকগুলোই মাথার ওপর বসে আছে।

সেই জন্যই আমাদের হচ্ছে না। হবেও না।

নাই যদি হয় তবে পারুলের বাবাকে আমি খুব বকব। খামোকা তোকে ভরসা দিয়ে টেনে আনল কেন?

সে তো তুমি সবকিছুর জন্যই সবসময়ে গণেশকাকাকে বকো। তোমাদের কোনও গাই এঁড়ে বিয়োলেও নাকি গণেশকাকার দোষ হয়।

ফুলমাসি একটু হেসে করুণ গলায় বললেন, তা আমি আর কাকে বকব? আর কেউ তো আমার বকুনিকে পাত্তা দেয় না।

সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর। তাই না? মেয়েদের একটা দোষ কী জানো ফুলমাসি? যত রাগ আর ঝাল ঝাড়বার জন্য তারা স্বামী বেচারাকে ঠিক করে রাখে। আমার মাকেও তো দেখেছি। একবার কোনও বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে ঝড় বৃষ্টিতে মা আটকে পড়েছিল। ফিরতে খুব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হল। বাড়িতে পা দিয়েই বাবাকে নিয়ে পড়ল, সব তোমার দোষ। আমরা তো অবাক। ঝড়-বৃষ্টি বাবা নামায়নি, সিনেমাতেও বাবা সঙ্গে যায়নি, তবে বাবার দোষ মা কী করে বের করবে! আমরা খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে ঝগড়া শুনতে লাগলাম। আশ্চর্য কী জানো? মা কিন্তু ঠিক মিলিয়ে দিল। গোঁজামিল অবশ্য, কিন্তু ওই ঝড়-বৃষ্টি, দেরি হওয়া সব কিছুর দায়ভাগ বাবার কাঁধে চাপান দিয়েও ছিল। বাবাও তেমন উচ্চবাচ্য করল না।

ফুলমাসি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, আর পুরুষরাই ছেড়ে কথা কয় কিনা। রামকৃষ্ণ ঠাকুর নাকি মাঝে মাঝে ফোঁস করার কথা বলেছেন। তা সেইটে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়ে আজকাল সর্বদাই কেবল ফোঁস ফোঁস করে যাচ্ছেন।

হাসাহাসি দিয়ে খাওয়াটা শেষ হল।

আজকাল হাসি বড় একটা আসতে চায় না। চব্বিশ বছর বয়সেই আমি কি একটু বেশি গোমড়ামুখো হয়ে গেছি?

বাড়ি ফিরতেই দাদু জিজ্ঞেস করলেন, খেলে?

হ্যাঁ।

কী রান্না করেছিল?

ইলিশ মাছ।

দাদুর স্তিমিত চোখ একটু চকচক করে উঠল, ইলিশ ওঠে বুঝি বাজারে?

তা আমি কী করে বলব? ওঠে নিশ্চয়ই, নইলে ওরা পেল কোথা থেকে?

দাদু মাথা নেড়ে বললেন, এখানকার বাজারে ওঠে না। গণেশ শহর থেকে আনে।

কেন, তুমি খাবে? খেলে বোলো, এনে দেব।

না, এখানকার ইলিশ খেতে মাটি-মাটি লাগে। দেশের ইলিশের মতো স্বাদ না। ইলিশের ডিমভাজা করেছিল নাকি?

না।

ইলিশের ডিমভাজা একটা অপূর্ব জিনিস। মুখের হরতুকিটা এ গাল ও গাল করতে করতে দাদু মনে মনে বহু বছরের পথ উজিয়ে ফিরে যাচ্ছেন দেশে। ভজালী নৌকোর পালে আজ হাওয়া লেগেছে। চোখদুটো কেমন ঘোলাটে, আনমনা।

দুপুরে আমার ঘুম হয় না। পশ্চিমের ঘরের চৌকিতে শুয়ে বুক বরাবর জানলা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়েছিলাম।

একটা নারকেল গাছ ঝুপসি মাথা নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে। ভারী একা দেখাচ্ছে তাকে। কালো মেঘের একটা ঘনঘোর স্তর থমথমিয়ে উঠছে দিগন্তে। নিজেকে ভারী দুঃখী, ভারী কাতর বলে মনে হয়।

বাইরে একটা সাইকেল এসে থামল। শব্দ পেলাম। দাদুর সঙ্গে কে একজন কথা বলছে। আস্তে বললেও শোনা যাচ্ছিল।

আগন্তুক বলল, কিছু ঠিক করলেন নাকি দাদা?

কী আর ঠিক করব বলো।

পনেরো হাজার নগদ আগাম দিয়ে দিচ্ছি। লেখাপড়া থাকবে। আপনি যতদিন বাঁচবেন এই ঘর দু'খানা, উঠোন আর কুয়োতলায় আমরা হাত দেব না। আপনি মরার পর আমরা পুরোটা দখল নেব।

দাদু একটু চটে উঠে বললেন, রোজ এসে আমাকে মরার কথা বলো কেন?

লোকটা বোধহয় একটু থতমত খেয়ে বলে, আজ্ঞে না। মরার কথা ঠিক বলি না। থাকুন না বেঁচে যতদিন খুশি। তবে মরতে তো একদিন সকালেই হবে। তখনকার কথা বলছিলাম আর কী।

তোমার হাবভাব দেখে মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি মরার জন্য হুড়ো দিচ্ছ।

কী যে বলেন দাদা! এই বয়সেও আপনার চমৎকার স্বাস্থ্য। অনেকদিন বাঁচবেন।

এ জমি নিয়ে তোমরা করবে কী?

আজ্ঞে সে পারিজাতবাবু জানেন। করবেন কিছুমিছু। এক লপ্তে একটু বেশি জমি তো পাওয়া মুশকিল।

দাদু বললেন, আমি শুনেছি এদিকে নাকি সরকারের তরফ থেকে কী সব উন্নতি-টুন্নতি হবে। তাই এখন আর কেউ জমি বেচছে না। দাম বাড়ার আশায় চেপে বসে আছে।

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, সে এদিকে না। রাস্তার ওধারটায় শুনেছি সরকারের কী সব করার প্ল্যান আছে।

দাদু এই বয়সেও কূটনৈতিক বুদ্ধি হারাননি। বললেন, তা ওদিকটা হলে কি আর এদিকটাও বাকি থাকবে?

তা বলতে পারি না। তবে দু'-চার হাজার টাকা বেশি দাম দিতে বোধহয় পারিজাতবাবু পিছোবেন না। কিন্তু আপনি তো দরই বলছেন না।

দাঁড়াও, আগে বেচব কি না ভেবে দেখি।

সে তো অনেকদিন ধরে বলছি আপনাকে। একটু ভেবে ঠিক করে ফেলুন।

দাদু বোধহয় হরতুকির টুকরোটাকে আবার অন্য গালে নিলেন। তারপর বললেন, ব্যাপার কী জানো, এ জমিটুকু বেচে দিলে আমার ছেলেগুলো আর নাতি-নাতনিদের আর দেশের বাড়ি বলে কিছু থাকবে না।

সে তো এমনিতেও নেই। তারা সব কলকাতায় বসে ঠ্যাং নাচাচ্ছে, আর আপনি বুড়ো মানুষ একলাটি পড়ে আছেন এখানে। আপনি চোখ বুজলে তো এখানে ভূতের নেত্য হবে।

দাদু হতাশ গলায় বললেন, নাঃ, তুমি দেখছি আমাকে না মেরেই ছাড়বে না। লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, মরার কথা বলিনি, বাস্তব অবস্থাটা বোঝাতে চাইছিলাম।

দাদু বললেন, বাস্তব অবস্থাটা আমিও কি আর বুঝি না? এ বাড়িতে আর কেউ না থাক গাছপালাগুলো তো আছে। সেগুলোর মায়াই কি কম! চট করে বেহাত হতে দিই কী করে?

গাছপালায় কেউ হাত দেবে না। যেমন আছে তেমনই থাকবে না হয়।

সে তুমি এখন বলছ। জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই অন্যরকম। যে টাকা ফেলে জমি কিনছে সে

কি আর বুড়ো মানুষের মুখ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? পারিজাত অত ভাল মানুষ নয়।

আচ্ছা, বায়নানামাটা অন্তত করে রাখতে দিন।

তুমি বরং সামনের শুক্কুরবার এসো।

কতবার তো ঘুরে আসতে বললেন। আমিও এসে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি। শুক্কুরবার কিন্তু দাদা কথা দিতে হবে।

এত তাড়া কীসের বলো তো! একটু রয়ে বয়ে হোক না।

লোকটা বলল, দেরি করলে আবার সব কেটে যাবে যে। জমি আপনার নামে। কিন্তু আপনার অবর্তমানে আপনার তিন ছেলে আর দুই মেয়ে ওয়ারিশান। তখন আবার সকলে এককাট্টা না হলে জমি হস্তান্তর হবে না। ঝামেলাও বিস্তর।

দাদু এবার একটু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, শুক্কুরবার অবধি আমি বর্তমানই থাকব।

লোকটা শশব্যস্ত বলল, না, না, সে তো ঠিকই। তাহলে ওই পাকা কথা বলে ধরে নিচ্ছি। শুক্কুরবার না হয় বায়নার টাকাটাও নিয়ে আসব।

আবার সাইকেলের শব্দ পেয়ে আমি ঘাড় উঁচু করে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। মুখটা দেখা গেল না। তবে বেশ দশাসই চেহারা।

উঠে দাদুর কাছে এসে বসলাম সামনের বারান্দায়।

লোকটা কেন এসেছিল দাদু? বাড়িটা কি তুমি বেচে দেবে?

দাদু একটু বিব্রতভাবে বললেন, না বেচেই বা কী হবে?

আমার এখানে একটা চাকরি হওয়ার কথা চলছে। যদি হয় তবে আমার ইচ্ছে ছিল এ বাড়িতে থেকেই চাকরি করি।

চাকরি? কীসের চাকরি?

মাস্টারি।

ও।— বলে দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেন, সত্যিই থাকবি নাকি?

যদি চাকরি পাই।

দাদু যেন কথাটায় বেশি ভরসা পেলেন না। বললেন, রোজই লোক আসে। তবে আমি কাউকে কথা দিইনি।

বিকেলে পারুলদের বাড়ি থেকে একটা সাইকেল চেয়ে নিয়ে শহরে রওনা হলাম। আজ বিকেলেই অসীমা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করার কথা। গণেশকাকা নিয়ে যাবেন।

পথে ঝিরঝিরে একটু বৃষ্টি হয়ে গেল। ভিজলাম। আকাশ জমাট মেঘে থম ধরে আছে। রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে পারে।

গণেশকাকার দোকানে সাইকেল রেখে দু'জনে রিকশা নিলাম। যেতে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের গাঁয়ের ওদিকে স্যাটেলাইট টাউনশিপ হচ্ছে বলে কিছু শুনেছেন?

গণেশকাকা বললেন, কত কিছুই তো হবো-হবো হয়। দেখা যাক শেষ অবধি। তবে শুনেছি হচ্ছে।

আজ একজন লোক আমাদের বাড়িটা কিনবার জন্য এসেছিল।

কে বল তো!

তা জানি না। শুনলাম পারিজাতবাবুর লোক।

গণেশকাকা সরল সোজা মানুষ। নামটা শুনেই জিব কেটে বললেন, ও বাবা, সেই তো স্কুলের সেক্রেটারি।

শুনে বুকটা হঠাৎ দমে গেল। বললাম, লোকটা কেমন?

ভাল তো কেউ বলে না। তবে টাকা আছে, ক্ষমতা আছে। আজকাল ওসব যার আছে সেই ভাল।

এ লোকটাই কি তার বউকে খুন করেছিল?

লোকে তো তাই বলে। তোকে কে বলল?

ফুলমাসি।

গণেশকাকা একটু চুপ করে থেকে বলল, পারিজাত অনেকদিন ধরেই তোদের বাড়ি কিনতে চাইছে। তোর দাদু অবশ্য রাজি হয়নি।

আমার মনটা খারাপ লাগছিল। স্কুলের চাকরিটা আমার হবে না জানি। তবু তো আশার বিরুদ্ধেও মানুষ আশা করে। এখন পারিজাতবাবু যদি জানতে পারেন যে জমিটা আমাদের এবং আমরা বেচতে রাজি নই তবে হয়তো চটে যাবেন, আর আমার চাকরিটাও হবে না।

বিচিত্র এই কার্যকারণের কথা ভাবতে ভাবতে আমি বললাম, অসীমা দিদিমণির কি চাকরির ব্যাপারে সত্যিই হাত আছে?

দেখাই যাক না।

পারিজাতবাবু লোকটা কে? আগে নাম শুনিনি তো!

এখানকার লোক নয়। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

অসীমা দিদিমণির জন্য তাঁদের বাইরের ঘরে আমাদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। উনি এখনও ফেরেননি। আমার হাই উঠছিল। গণেশকাকা কেমন যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে জবুথবু হয়ে বসেছিলেন। যেন এইসব শিক্ষিতজনের ঘরবাড়ি আসবাবপত্রকেও সমীহ করতে হয়।

গণেশকাকাকে আমি কাকা ডাকি, অথচ তার বউকে মাসি। কেন ডাকি তা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। কোনও সূত্র পেলাম না। ছেলেবেলা থেকেই ডেকে আসছি, এইমাত্র। পারুলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে অবশ্য সম্পর্ক এবং ডাক পালটে যেত। ফুলমাসিকে মা বলে ডাকতে অসুবিধে হত না, কিন্তু গণেশকাকাকে গাল ভরে বাবা ডাকতে পারতাম না নিশ্চয়ই। পারুলের শ্বশুরবাড়ি এই শহরেই। আমি কখনও যাইনি। কালেভদ্রে দেশের বাড়িতে এলেও আমি পারুলের শ্বশুরবাড়িতে যাই না ভয়ে। যদি ওরা কিছু মনে করে?

এইসব ভাবতে ভাবতেই অসীমা দিদিমণি ঘরে ঢুকলেন। তটস্থ গণেশকাকা উঠে হাত কচলাতে লাগলেন। মুখে একটু নীরব হেঁ-হেঁ ভাব।

অসীমা দিদিমণির মতো এরকম বিষণ্ণ চেহারার মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। চেহারাটা রুক্ষ এবং শুকনো। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ওঁর চোখমুখ যেন গভীর হতাশা, গভীর ক্লান্তি এবং ব্যর্থতার গ্লানিতে মাখা। একটুও হাসির চিহ্ন নেই কোথাও।

আমার পরিচয় পেয়ে গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আমাকে নয়, উনি মনের মধ্যে অন্য কোনও দৃশ্য দেখছেন।

৩। পারিজাত

লোকটা চেঁচাচ্ছে ফটকের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, গলায় প্রগাঢ় মাতলামি। আমার ঘর থেকে অত দূরের চেঁচানি শোনা যায় বটে, কিন্তু ভাল বোঝা যায় না। তবে আমি জানি, লোকটা আমাকে গালাগাল দিচ্ছে। খুবই অশ্লীল, অসাংবিধানিক ভাষায়। ওর কথায় কান বা গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। কারণ আমার ধারণা, যে কোনও গরিব দেশেই এরকম দৃশ্য হামেশাই দেখা যায়। কিছু লোকের বদ্ধমূল ধারণা, তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অন্য কিছু লোক দায়ী। এদের যত রাগ সব সেই অন্যদের

বিরুদ্ধে। যারা জোট বেঁধে মিছিলে সামিল হয়ে অন্যের বিরুদ্ধে তারস্বরে নালিশ জানায় তারাও এরকমই। দারিদ্র্যসীমা নামক যে রেলবাঁধটা আমি দেখতে পাই এরা হচ্ছে তার ওপারের লোক।

অরিন্দমবাবু একটু সচকিত হয়ে বললেন, বাইরে একটা লোক খুব চেঁচাচ্ছে না?

আমি বিনীতভাবে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী বলছে বলুন তো?

আমি সত্য গোপন না করে আরও বিনীতভাবে বলি, আমাকে গালগাল দিচ্ছে।

আপনাকে। কেন?

ওর ধারণা ওর দুর্ভাগ্যের জন্য আমিই দায়ী।

সে কী! আপনি ওর কী করেছেন?

আমি নাটকীয়ভাবে একটু চুপ করে থাকি। গল্পটা খুবই সাধারণ এবং এরকম ঘটনা আকছার ঘটছেও। অক্ষয় নামে ওই লোকটির একটি ছোট্ট ওয়ার্কশপ ছিল। বেশিরভাগই গ্যাস আর ইলেকট্রিক ওয়েলডিং-এর কাজ হত তাতে। লাভ মন্দ হত না একসময়ে। কিন্তু লোকটা দুর্দান্ত মালখোর, তেমনি সাংঘাতিক মেয়েমানুষের প্রতি লোভ। খালপাড়ের এক সেয়ানা ছুঁড়ি অক্ষয়ের রসকষ টেনে নিচ্ছিল। এসব লোকের যা হয়, হঠাৎ একদিন নগদ টাকায় টান পড়ে। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেই অবস্থায় একদিন কারখানাটা আমাকে বিশ হাজারে বেচে দেয়, দাম যে খুব খারাপ পেয়েছে তা নয়। কিন্তু মুশকিল হল, টাকাটা নিয়েই ফুঁকে দিয়েছে। এদিকে আমার লক্ষ্মীমন্ত হাতে পড়ে কারখানাটা এখন দিব্যি চলছে। সাত-আটজন লোক খাটে। লোকটার সেই থেকে রাগ। কিন্তু আমি ওর ওপর রাগ করতে পারি না। মূর্খ, অজ্ঞ, দরিদ্র ভারতবাসীরই ও একজন।

ঘটনাটা যতদূর সম্ভব নিরলঙ্কার এবং সরলভাবে আমি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দমবাবুকে শোনালাম।

উনি একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, স্ট্রেঞ্জ। কিন্তু লোকটা এরকম চেঁচায় আর আপনিও সহ্য করে যান? স্টেপ নেন না কেন?

আমি বিনীতভাবে চুপ করে থাকি। অরিন্দমবাবুর মাথা নিশ্চয়ই অতি পরিষ্কার এবং ঝকঝকে। নইলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতেন না। আমার মাথা তত পরিষ্কার নয়। অনেক কুটিলতা-জটিলতার রাস্তা আমাকে পেরোতে হয়। তবে পাবলিসিটির ব্যাপারটা আমি অরিন্দমবাবুর চেয়ে ভাল বুঝি। ওই যে অক্ষয় চেঁচায় এবং আমি ওকে তাড়িয়ে দিই না এটাও লোকে লক্ষ করে। চেঁচাতে চেঁচাতে, গালাগাল দিতে দিতে অক্ষয় একসময় ক্লান্ত হয়ে চলে যায়, লোকেও রোজ শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা আর অক্ষয়ের কথায় গুরুত্ব দেয় না, বরং আমি যে অক্ষয়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিই না এটাই ক্রমে ক্রমে গুরুত্ব পেতে থাকে। উপরন্তু অক্ষয়ের কোনও গালাগালিই আমাকে স্পর্শ করে না। আমি যখন দারিদ্র্যসীমার ওপাশে ছিলাম তখন এর চেয়ে বহুগুণ খারাপ গালাগাল আমি নিত্যদিন শুনেছি।

আমি অরিন্দমবাবুকে তাঁর জিপগাড়িতে তুলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যাই এবং অক্ষয়ের মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে সামনে দেখে অক্ষয়ের উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে যায়। সে সোল্লাসে লাফাতে লাফাতে বলতে থাকে, এই সেই হারামির বাচ্চা, এই সেই শুয়োরের বাচ্চা, এই ব্যাটা খানকির পুত আমার কারখানা হাতিয়ে নিয়েছে, আমার বউকে বিধবা করেছে...ইত্যাদি। শেষ কথাটা অবশ্য ডাহা মিথ্যে। অক্ষয়ের বউ বহুদিন আগে মারা গেছে, কাজেই তার বউয়ের বিধবা হওয়ার প্রশ্ন আসে না। যদি বউ বেঁচে থাকতও তাহলেই বা অক্ষয় বেঁচে থাকতে কীভাবে তাকে আমি বিধবা করতাম সেটা আমার মাথায় এল না।

অক্ষয়ের এই আস্ফালন ও গালমন্দ কিন্তু বাস্তবিকই আমি উপভোগ করি। ভিতরে ভিতরে আমার একধরনের শিহরণ হতে থাকে। পৃথিবীকে আমি কতখানি ডিসটার্ব করতে পেরেছি অক্ষয়

তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। দারিদ্র্যসীমার ওপাশে থাকার সময় আমি প্রায়ই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতাম না। আমরা আছি কি নেই তা নিয়ে বহুবার সংশয় দেখা দিত। আমাদের বাঁচা বা মরা কোনওটাই টের পেত না বিশ্ববাসী, আমাদের খিদে লজ্জা ভয় সবই ছিল আমাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই যখন অক্ষয় বা তার মতো কেউ আমাকে গালমন্দ করে, আমার বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, লোকজনকে ধরে ধরে আমার কুৎসা গেয়ে বেড়ায় তখন আমি আমার ব্যাপক অস্তিত্বটাকে টের পাই। আমার অস্তিত্ব চারদিকে নাড়াচাড়া ফেলছে, আমাকে ঘিরে ঘটছে ঘটনাবলী। আমি আর উপেক্ষার বস্তু নই। আমি যে আছি তো লোকে টের পাচ্ছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। গাঢ় মেঘ ছিল আকাশে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আমি ঘরে ফিরে আসি।

চতুর্ভুজের সাইকেল এসে থামল বাইরে। ভেজা গা বারান্দায় একটু ঝেড়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে বলল, বাঁকা বাঁশ আজও সোজা হল না।

আমি বললাম, বুড়ো যদি রাজি না হয়েই থাকে তবে তুমি আর শিগগির ওর কাছে যেয়ো না, বরং তার যে ছেলে কলকাতায় থাকে তার পাত্তা লাগাও। শুনেছি তার অবস্থা ভাল নয়। ভাল দাম পাওয়া যাবে শুনলে সেই এসে বুড়োকে রাজি করাবে।

চতুর্ভুজ একটু হতাশার গলায় বলল, সরকার যে ওদিকে ডেভেলপমেন্ট করবে তা বুড়ো জেনে গেছে।

আমি শান্ত স্বরেই বললাম, এসব খবর কি আর চাপা থাকে? কেউ না কেউ রটাবেই।

চতুর্ভুজ যে ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগছে তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। অথচ জমিটা ও কিনবে না, কিনব আমি। তবে ওর দুঃখ কীসের? আমার মনে হয়, অন্য লোকে যদি লটারি পায় তবে মানুষ যে সব সময়ে তাকে হিংসে করে তা নয়। অনেক সময়ে মানুষ সেই লোকটার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে এক ধরনের আত্মরতি করতে থাকে। এও হল তাই। এ জমি কিনে আমি যদি মোটারকম একটা দাঁও মারতে পারি তবে চতুর্ভুজ খুশি হবে।

কিন্তু মোটারকম দাঁও মারার ব্যাপারটা এখনও অনিশ্চিত। গভর্নমেন্ট যে ঠিক ওই জায়গাতেই ডেভেলপমেন্ট করবে তা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়নি। তবে এই অঞ্চলে কিছু কৃষিনির্ভর, শিল্প বা অ্যাগ্রো ইনডাসট্রি গড়ে তোলার একটা কথা চলছে। মউডুবির বঙ্কিম গাঙ্গুলির জমিটা কিনতে পারলেও সেটা আমার পক্ষে একটা জুয়া খেলার সামিলই হবে। যদি শেষ অবধি ওদিকে ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে টাকাগুলো আটকে রইল। তবে অরিন্দমবাবু এবং অন্যান্য জানবুঝওলা অফিসাররা আমাকে গোপনে জানিয়েছেন, মউডুবিই সেই চিহ্নিত জায়গা।

আমি সহজে হতাশ হই না। কারণ আমি বড় হয়েছি এক মস্ত অন্ধকার বুকের মধ্যে নিয়ে। আমার জীবনটাও নানারকম জুয়া খেলার সাফল্যের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আচমকাই চতুর্ভুজকে জিজ্ঞেস করলাম, নারকোল ডিহাইড্রেট করা যায় না?

চতুর্ভুজ ক্যাবলার মতো মুখ করে বলল, তা তো জানি না।

মউডুবিতে খুব নারকোল হয়।

তা হয়। তবে লোকে টাটকা নারকোল পেলে কি আর নারকোলের গুঁড়ো কিনবে?

আমি টপ করে বললাম, আদাও তো বাজারে টাটকা পাওয়া যায় তবে আদার গুঁড়ো বিক্রি হয় কেন?

চতুর্ভুজ অবাক হয়ে বলে, হয় নাকি?

না হলে বললাম কেন? গুঁড়ো নারকোলের অনেকগুলো প্লাস পয়েন্ট আছে। আজকালকার বউ-ঝিরা ঘরের কাজ বেশি করতে চায় না। নারকোল কোরানোও এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। ডিহাইড্রেটেড নারকোল পেলে তারা খুশিই হবে। তাছাড়া উত্তর ভারতের একটা মস্ত এলাকায়

নারকোল হয় না। দক্ষিণ ভারত বা এদিক থেকে যা যায় তার দাম সাঙ্ঘাতিক। সুতরাং ডিহাইড্রেটেড নারকোলের বাজার আছে। অবশ্য যদি করা যায়।

চতুর্ভুজ এ কথাতেও বেশ উত্তেজিত হয় এবং বোধহয় স্বপ্ন দেখতে থাকে। যদিও ডিহাইড্রেটেড নারকোল বেচে আমি আরও বড়লোক হলেও তার এক পয়সা লাভ নেই। তবু সে আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে একটা গোলাপি ভাবীকালের কথা ভাবতে থাকে, তার চোখেমুখে একটা সশ্রদ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব ফুটে ওঠে। সে বলে, মউডুবিতে এক সাহেবের একটা পেল্লায় নারকোলবাগান আছে। ইজারা নেওয়ার চেষ্টা করব?

দাঁড়াও, আগে খোঁজ নিই নারকোলের ডিহাইড্রেশন সম্ভব কি না।

চতুর্ভুজ সে কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলে, বঙ্কিম গাঙ্গুলিরও মেলা নারকোল গাছ। ফাঁকা জমিতে কেরালার কিছু জলদি জাতের আরও চারা লাগিয়ে দিলে পাঁচ বছরের মধ্যে ফলন পেয়ে যাবেন।

আমি তাকে আর থামানোর চেষ্টা করি না। গরিবের তো স্বপ্নই সম্বল, হোক না তা অন্যকে নিয়ে। চতুর্ভুজ নারকোল গাছের বাই-প্রোডাক্টগুলোর কথাও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দড়ি, পাপোশ, হুঁকোর খোলো, পুতুল, অ্যাশট্রে, ছাইদানি, আরও কত কী।

আজ একটু দেরি করে অসীমা এল। দেরি হওয়ারই কথা। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের খুব জরুরি একটা মিটিং হয়ে গেল স্কুলে আজ। প্রসঙ্গ ছিল, করাপশন। স্কুলের বেশ কিছু টাকা নয়-ছয় হয়েছে, হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না, অডিটার অসন্তুষ্ট। এ সবই আমি আগে থেকে জানতাম।

আজ সন্ধে হয়ে গেছে এবং বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কাজেই আজ আমাদের কুঞ্জবনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অসীমা তার বেঁটে ছাতাটা দরজার পাশে রেখে আধভেজা শরীরে ঘরে ঢুকতেই চতুর্ভুজ সবেগে বেরিয়ে গেল। প্রেমিক-প্রেমিকাকে ডিস্টার্ব করতে নেই।

অসীমার মুখ চোখের চেহারা আজ আরও খারাপ। ওর ভিতরকার সব আলোই যেন নিভে গেছে। উপমাটা কারও কারও অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু আমি মানুষকে মাঝে মাঝে বাড়ি হিসেবেও দেখি। এক-একটা মানুষকে দেখে মনে হয়, সব ঘরে আলো জ্বলছে, জানলা দরজা খোলা, পর্দা উড়ছে হাওয়ায়, এইসব মানুষেরা হা হা করে হাসে, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, এদের জীবনে দুঃখ বড় ক্ষণস্থায়ী। কিছু কিছু মানুষের দু'-একটা ঘরে আলো জ্বলে, বেশিরভাগ জানালা কবাটটাই থাকে বন্ধ। আর কিছু মানুষ জন্মদুঃখী। ওদের বড়জোর বাথরুমে একটুখানি আলো জ্বলে। জানান দেয় যে, লোকটা আছে। অসীমার আলোর জোর নেই, জানালা কপাট সবই প্রায় বন্ধ। তবু এক চিলতে কপাটের ফাঁক দিয়ে একটু যে আলো দেখা যেত তাও যেন কে আজ এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছে।

সে বসলে আমি জিজ্ঞেস করি, আজ মিটিং-এ কী হল?

অসীমা মাথা নেড়ে বলল, কিছু হয়নি। খুব গণ্ডগোল হয়ে মিটিং ভেঙে গেল।

সেরকমই কথা। তবু আমি মুখখানা নির্বিকার রেখে বললাম, কী নিয়ে গণ্ডগোল?

কমলাদি তোমার এগেনস্টে চার্জ আনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কয়েকজন কমলাদির এগেনস্টে কথা বলতে শুরু করে দিল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

অস্বাভাবিক কেন?

টিচাররা এতকাল কেউ কমলাদির বিরুদ্ধে একটিও কথা বলত না, দু'-একজন ছাড়া। আজ অনেকেই দেখলাম কমলাদির বিরুদ্ধে। তবে তারা যা বলছিল তা আমাদের আজকের এজেন্ডায় ছিল না।

আজ তো করাপশান নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তোমাদের।

হ্যাঁ, স্কুল ফান্ড এবং অডিট রিপোর্ট নিয়ে সে আলোচনা ভন্ডুল হয়ে গেছে।

কমলাদির রি-অ্যাকশন কী?

প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর যখন ওঁর বিরুদ্ধে খোলাখুলি বলতে লাগল কয়েকজন তখন একদম পাথরের মতো চুপ করে গেলেন। সারাক্ষণ একটিও কথা বলেননি।

আমি অসীমার মুখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম। বুঝতে পারছি, অসীমা আজকের মিটিং ভন্ডুল হওয়ায় খুশি হয়নি। কমলা সেন জব্দ হওয়াতেও আহ্লাদিত হয়নি। অথচ হওয়া উচিত ছিল। আমার মন বলছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই কমলা সেনকে রেজিগনেশন দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অসীমার হেডমিসট্রেস হওয়া আটকানোর কেউ নেই। তবু অসীমা খুশি নয়। আশ্চর্য।

আমি মৃদু স্নেহসিক্ত স্বরে বললাম, তোমার কি শরীর ভাল নেই অসীমা?

কেন বলো তো!

তোমাকে ভাল দেখছি না।

মনটা ভাল নেই। স্কুলটার কী হবে তাই ভাবছি।

কী আর হবে, উঠে যাবে না। ভয় নেই।

তা নয়। কমলাদি চলে গেলে স্কুলটার আর সেই গুডউইল থাকবে না। এই স্কুলের জন্য উনি একসময়ে নিজে বাহান্ন ভরি সোনার গয়না দিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা তো জানো।

জানি।

স্কুল স্কুল করে পাগল। এখনও ঘুরে ঘুরে দেখেন কোথাও ঝুল জমছে কি না, কোথাও ঘাস বড় হয়েছে কি না, কোনও বেঞ্চির পেরেক উঠে আছে কি না। ওঁর মতো এরকম আর কে করবে?

আমি নিরীহ মুখ করে বললাম, পৃথিবীতে কেউ তো অপরিহার্য নয়।

অসীমা আমার দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু লক্ষ করলাম ওর দৃষ্টি আমাকে ভেদ করে বহু দূরের এক আভাসিত রহস্যময় অন্ধকারকেই দেখছে বুঝি।

আমি জানি কথা ও নীরবতা এই দুইয়ের আনুপাতিক ও যথাযোগ্য সংমিশ্রণের দ্বারাই মানুষকে প্রভাবিত করতে হয়। কেবল কথা বলে গেলেই হয় না, আবার শুধু চুপ করে থাকলেও হয় না। কখন কথা বলতে হবে এবং কখন নয় তা বোঝা চাই।

পরিস্থিতি বিচার করে আমি বুঝলাম, এখন চুপ করে থাকাটা ঠিক হবে না। তাই আমি খুব মোলায়েম গলায় বললাম, একসময়ে পণ্ডিত নেহরু যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন আমরা ভাবতাম নেহরু মারা গেলে বুঝি দেশ অচল হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হয়নি। রাশিয়ায় স্ট্যালিনের পরও দেশ চলেছে, মাওকে ছাড়াও চলছে চিন।

অসীমার দৃষ্টি দূর দর্শন থেকে নিবৃত্ত হল না। তবে সে মৃদুকণ্ঠে বলল, কমলাদির জায়গায় আমি হেডমিসট্রেস হলে কেউ আমাকে পছন্দ করবে না।

কথাটা নির্মম সত্যি। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলাম। মুখটা একটু হাসি-হাসি করে বললাম, কমলাদির অবদান তো কম নয়। এতকাল তিনিই তো একচ্ছত্র আধিপত্য করেছেন। কিন্তু আমরা যেমন নেহরুর পর ইন্দিরা গাঁধীকে মেনে নিয়েছি, তেমনি তোমাকেও সবাই একদিন মেনে নেবে।

তুলনাটা অসীমাকে স্পর্শ করল না। খুব সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। সহজে ওকে প্রভাবিত করা যায় না। একটু ধরা গলায় বলল, স্কুলকে আমিও ভালবাসি। কিন্তু কমলাদি অন্যরকম। স্কুলটাই ওঁর প্রাণ। আমার তো মনে হয় চাকরি ছাড়লে উনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

আমি একটু কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে গম্ভীর হয়ে বললাম, আমাদের তো কিছু করার নেই।

জানি।— বলে চুপ করে রইল অসীমা।

আমি অসীমার মনোভাব যে সঠিক বুঝি তাও নয়। কমলা সেন চাকরি ছেড়ে দিলে অসীমা হেডমিস্ট্রেস হবে, কিন্তু ওই লোভনীয় পদ ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ওকে আকর্ষণ করে না। কেন করে না তা ভেবে আমি বিস্মিত হতে পারতাম। কিন্তু আমার বিস্ময়বোধটা বিচিত্র ধরনের মানুষ দেখে দেখে লুপ্ত হয়ে গেছে। বিচিত্র, বহুমুখী ও বিটকেল চরিত্রের লোকে দুনিয়াটা

ভরা। একজন বিচিত্র মানুষের কথা আমি জানি। খুবই বিচিত্র চরিত্রের লোক। গাঁয়ের কয়েকজন কামার্ত পুরুষ একবার একজন সুন্দরী যুবতীর প্রতি লোভ করেছিল। মেয়েটা যেখানে যেত সেই পথেরই আশেপাশে ঘাপটি মেরে থাকত তারা। মেয়েটা ভ্রুক্ষেপও করত না। লোকগুলো নানা রকম ফাঁদ পেতে পেতে যখন হয়রান হয়ে পড়ল তখন সেই বিচিত্র লোকটি একদিন এসে জুটল তাদের দলে। জিজ্ঞেস করল, তোদের মতলবখানা কী বল তো? লোকগুলো কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ঠাকুর ভাই, ওই মেয়েটা যে আমাদের পাত্তাই দেয় না, তার একটা ব্যবস্থা করে দাও। তুমি তো শুনি বিস্তর লোকের হরেকরকম সমস্যার সমাধান করে বেড়াও। আমাদের এটুকু করে দাও দেখি। লোকটা বলল, এ আর কথা কী! মেয়েটা পুকুর থেকে কলসিতে জল ভরে ফিরছিল। লোকটা গিয়ে পিছন থেকে ডাক দিল, মা, ওমা। কেমন আছিস মা? মেয়েটা ওই মা ডাকে এমন উজ্জ্বল, এমন আলোকিত, এত লজ্জারুণ হয়ে উঠল যে, বহুগুণ সুন্দর দেখাল তাকে। মিষ্টি হেসে বলল, ভাল আছি বাবা, তুমিও ভাল থেকো। লোকটা একগাল হেসে কামার্ত সেই লোকগুলোর কাছে এসে বলল, দেখলি! ভারী সোজা মেয়েদের বশ করা। একবার মা যদি ডেকে ফেলতে পারিস তাহলেই কেল্লা ফতে। মেয়েটাও বশ হল, ভিতরকার শত্রুটাও বশ হল। এরপর থেকে সেই লোকটা রোজ সেই লোকগুলোকে তাড়া দিত, ডাক, মেয়েটাকে মা বলে ডাক। ডেকেই দেখ না, কী হয়। তা সেই লোকগুলো অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ডেকেই বসল, মা। আর সেই মা ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে ভূতটা নেমে গেল।

বলতে কী, এইসব বিচিত্র ও বিটকেল লোককে আমি ভয় খাই। কাঁধ থেকে ভূত নামানো আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং কাঁধে কিছু কিছু ভূত সর্বদা বসে ঠ্যাং দোলাতে থাকুক। তাতে দুনিয়াটা অনেক স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী হয়। হেডমিসট্রেস হওয়ার সম্ভাবনায় অসীমার আনন্দ না হওয়াটা আমার চোখে ভূতের অভাব বলেই ঠেকল। তবু আমি বিস্মিত হলাম না। কারণ এরকম আমার দেখা আছে।

অত্যন্ত সৌহার্দ্যের গলায় আমি বললাম, কমলা সেন যতই এফিসিয়েন্ট হোক অসীমা, একটি স্কুলের হেডমিসট্রেসের পক্ষে চরিত্রটা মস্ত বড় কথা।

অসীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উঠল।

বলতে কী, আজ আমাদের প্রেমপর্বটা বেশ দীর্ঘক্ষণই চলেছে। অন্যান্য দিন এতক্ষণ আমরা প্রেম করি না।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষাকালের ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। সহজে থামবে না, তাই অসীমাকে যেতে নিষেধ করে লাভ নেই। এই বৃষ্টিতে ওর তেমন কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

অসীমা ছাতা খুলে বারান্দা থেকে নামতে গিয়েও কী ভেবে ফিরে এল।

শোনো।

বলো।

আমাদের স্কুলে ম্যাথমেটিকসের ভ্যাকেনসিতে কি ক্যান্ডিডেট ঠিক হয়ে গেছে?

মোটামুটি। কেন বলো তো?

আমাকে একজন খুব ধরেছে একটা ছেলেকে ওই চাকরিটা দেওয়ার জন্য।

ছেলেটা কে?

তুমি চিনবে না। কলকাতায় থাকে।

আমরা তো ঠিকই করেছি, লোকাল ক্যানডিডেটকে প্রেফারেনস দেব।

এই ছেলেটিও লোকাল। মউডুবিতে বাড়ি।

ওর হয়ে কে তোমাকে ধরেছে?

সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গণেশবাবু। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ছেলেটা আমার কাছে এসেছিল। খুব স্মার্ট আর সিরিয়াস ছেলে।

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম। জহরবাবুর মেয়েও অঙ্কে অনার্স। গতকাল রাতে আমি একরকম ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে, জহরবাবুর মেয়েকেই এই চাকরিতে বহাল করা হবে। এখন অসীমার ক্যানডিডেট আবার গোলমাল পাকাল।

বললাম, ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিও তো একবার। দেখব। মউডুবিতে বাড়ি বলছ? কোন বাড়ির ছেলে?

অত খোঁজ নিইনি। কেন বলো তো?

এমনি। অঙ্কের পোস্টটার জন্য জহরবাবুর মেয়েও ক্যানডিডেট। বি এসসি বি এড।

জানি।

এই ছেলেটার কোয়ালিফিকেশন কী?

অঙ্কে অনার্স, তবে বি এড নয়।

তা হলে তো মুশকিল।

অসীমা একটু ধৈর্যহারা গলায় বলল, তোমাকে অত ভাবনা করতে হবে না। যদি পারো দেখো। চাকরি দিতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। ছেলেটাকে আমি ভাল করে চিনিও না। তবে একবার দেখেই বেশ ভাল লেগেছিল, এই যা। খুব স্পিরিটেড ছেলে।

আমি চুপ করে রইলাম। স্পিরিটেড ছেলেদের সম্পর্কে আমার কোনও দুর্বলতা নেই। কোনও মানুষের বাড়তি স্পিরিট থাকলে অন্যদের ভারী মুশকিল। বাড়তি স্পিরিট যাদের থাকে তারা সর্বদাই সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ব্যাপারে অন্যদের গুঁতিয়ে ফেরে। কাছাকাছি কোনও স্পিরিটেড লোক থাকলে বরং সাধারণ মানুষের কাজকর্মের অসুবিধেই বেশি।

অসীমা চলে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ আমার চেয়ারে বসে রইলাম। বাইরে বৃষ্টির তেজ বাড়ল। হুংকার দিয়ে একটা বাতাসও বয়ে গেল সেইসঙ্গে। আরও মেঘ নিয়ে এল বুঝি। এক ঘন ছেদহীন আদিম বৃষ্টিতে ছেয়ে গেল চারধার। বৃষ্টির দুটো দিক আছে। একটা তার সৌন্দর্যের দিক, যা নিয়ে মেঘদূত বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা সত্যজিৎ রায়ের ছবি, অন্যদিকে বন্যা, দুর্গতি এবং তথা অর্থনীতি। আমি দ্বিতীয় দিকটা নিয়েই ভাবি। এবারের বর্ষার চেহারা তেমন ভাল নয়।

এফ সি আইকে আমার তিনটে গুদাম ভাড়া দেওয়া আছে। ম্যানেজার শুভ্রাংশু সেন আমার বন্ধু-লোক। ফুড করপোরেশনে নতুন ঢুকেছে। বৃষ্টিটার আদিম হিংস্রতা টের পেয়েই আমি তাঁকে ফোন করি।

কী করছেন সেন সাহেব?

শুভ্রাংশু কিছু একটা খাচ্ছে। পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম। ইলিশ ভাজা কি? হতে পারে। আজ বিকেলেই দুটো ইলিশ আমি নিজেই পাঠিয়েছি। দুটোর দরকার ছিল না। শুভ্রাংশুরা মোটে সাড়ে তিনজন লোক। স্বামী স্ত্রী আর একটা পাঁচ আর একটা সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা। চিবোতে চিবোতেই শুভ্রাংশু বলে, এই ঘরে বসে হাল্লাগুল্লা হচ্ছে আর কী। বৃষ্টির দিন, কিছু করার নেই।

হাল্লাগুল্লাটা কী জিনিস?

শুভ্রাংশুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বলে, এই গ্যাঞ্জাম আর কী। বাচ্চারা আর আমি মিলে মিসেসকে একটু টিজ করছিলাম।

ইলিশটা কেমন ছিল?

দারুণ! দারুণ! মিসেস ভাজছেন আর আমরা খাচ্ছি। খেতে খেতেই হাল্লাগুল্লা হচ্ছে। মিসেস আবার ইলিশের গন্ধ সইতে পারেন না। নাকে ওডিকোলোন মাখানো রুমাল চাপা দিয়ে ভাজছেন।

বলেন কী? মিসেস সেন ইলিশ পছন্দ করেন না জানতাম না তো!

চূড়ান্ত বেরসিক আর কী! ইলিশ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিউলি ফুল এসব যার ভাল না লাগে সে মানুষ নয়, পাথর।

আমি সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, চিংড়ি কেমন বাসেন উনি?

বাসেন। চিংড়িটা বাসেন। তবে সে আমরাও বাসি মশাই।

ঠিক আছে। আর একটা কথা, আপনার মিসেস কেন মাছ ভাজছেন? আপনাদের তো একজন রাঁধুনি আছে।

আছে। কিন্তু সে দেশে গেছে। আর একবার দেশে গেলে ওরা একেবারেই যায়।

খুব অসুবিধে তো তা হলে!

আর বলেন কেন? মিসেস একদম ফরটি নাইন।

আমি একটু হেসে বললাম, আমার ইটের ভাঁটি থেকে একটা কামিনকে পাঠিয়ে দেবোখন কাল।

পাঠাবেন? আঃ, বাঁচলাম।

গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, সেনসাহেব, গোডাউনে স্টক কেমন?

কেন বলুন তো! যতদূর জানি, ভালই।

এবারকার বর্ষাটা আমার ভাল লাগছে না। যদি ফ্লাড হয় তবে দু'বছর আগেকার মতো জায়গাটা ফের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। সেবার টানা কুড়ি দিন কোনও সাপলাই আসতে পারেনি।

হ্যাঁ, জানি।

এবারও যদি সেই বৃত্তান্ত হয়, তা হলে? সেবার গোডাউন লুট হয়েছিল।

শুভ্রাংশু একটু চিন্তিত গলায় বলে, আমাদের সিকিউরিটি খুব ভাল নয়। এমনিতেও খুচখাচ চুরিচামারি হচ্ছে। কী করা যায় বলুন তো!

আমি বিনীতভাবে বললাম, দেশের সব গুদাম থেকেই অল্পবিস্তর চুরি হয়, এমনকী ডিফেন্সের গুদাম থেকেও। ওটা কথা নয়। কথা হল লুট নিয়ে।

শুভ্রাংশু চিন্তিতভাবে বলে, আগের লুটটা আমার আমলে হয়নি। তখন মিস্টার রায় ছিলেন। ঘটনার ডিটেলস জানি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি জানি।

এখানকার লোকেরা কি একটু হোসটাইল ধরনের?

আমি হাসলাম। বললাম, সাধারণ মানুষেরা কখনওই হোসটাইল নয় সেন সাহেব। তবে তাদের হোসটাইল করে তোলা যায়। এখানে এমন কয়েকজন লোক আছে যারা কাজটা খুব সুন্দর পারে।

তারা কারা?

জানলেই বা তাদের আপনি কী করবেন?

কোনও স্টেপ নেওয়া যায় না?

আমি নিরেট গলায় বললাম, না। কারণ তারা নেতা বা নেতা-স্থানীয় লোক।

ওঃ!— খুব হতাশ শোনাল শুভ্রাংশুর গলা। বলল, তা হলে অবশ্য কিছু করার নেই।

না। কিছু করার নেই সেন সাহেব। সরকারি মাল জনসাধারণ লুট করবে, এতে কার কী করার আছে? তবে ঘটনাটা যদি ঘটেই যায় তা হলে আপনাকে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে, চাকরির ক্ষেত্রেও কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টে একটা দাগ থেকে যাবে। আপনি ইয়ং ম্যান।

কিন্তু কিছু করারও তো নেই। আরও ফোর্স চেয়ে পাঠাতে পারি।

তাতে লাভ হবে না।

সেটা জানি। আর কী করব?

ভাবুন সেন সাহেব, ভাবুন, দুর্যোগ আসছে। ডার্ক ডেজ আর অ্যাহেড।

শুভ্রাংশু হতাশ গলায় বলল, এঃ, সন্ধেটাই মাটি করে দিলেন মশাই। দিব্যি হাল্লাগুল্লা করছিলাম। কেন ঝামেলা মাচালেন বলুন তো?

বৃহত্তর ঝামেলা অ্যাভয়েড করার জন্য।

কিন্তু অ্যাভয়েড করব কী করে তা তো বললেন না।

অত উতলা হবেন না। অনেক 'কিন্তু' আছে। ধরুন বন্যা যদি না হয় বা নেতারা যদি ভুখা জনসাধারণকে না খ্যাপায় তা হলে ঝামেলা হবে না। আমি শুধু বৃষ্টির রকমটা দেখে আগাম আপনাকে সাবধান করে দিলাম।

এমনিতেই তো ফুড ব্যাপারটা সাংঘাতিক সেনসিটিভ। তার ওপর ফ্লাড-প্রোন এরিয়া। নাঃ, আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন, ইলিশটার কোনও টেস্ট পাচ্ছি না আর।

দোষ ইলিশের নয় সেন সাহেব। দোষ আপনার মনের। অত সহজে ঘাবড়ে যান কেন?

ঘাবড়ে যাই সাধে নয়। আমি এফ সি আই-এর লোক নই। সেনট্রাল অ্যাকাউনটসে দিব্যি দশটা-পাঁচটা নিরাপদ চাকরি করতাম। দুম করে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় সিলেকটেড হওয়ার পর ফুডে ঠেলে দিল। বিচ্ছিরি ডিপার্টমেন্ট। রোজ ঘেরাও, রোজ লেবার ট্রাবল। অফিসটা একেবারে নরক। ক্লাস ফোর স্টাফদের পর্যন্ত ধমকানো যায় না। তার ওপর যদি গুদাম লুট হয় তো সোনায় সোহাগা। আপনার কী মনে হয়, ফ্লাড কি হবেই?

বৃষ্টির ধরনটা তো সেইরকমই। দুটো নদীর জল ডেনজার লেভেলের ওপরে উঠেছে।

ফ্লাড জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই।

আমি আবেগমথিত গলায় বললাম, ফ্লাডের আপনি কী জানেন সেনসাহেব? আমার কত কী ভেসে গেছে বন্যায়। খরায় জ্বলে গেছে কত কী। তখন আমারও সব লুটপাট করতে ইচ্ছে করত। আমি, আমরা বড় গরিব ছিলাম।

জানি। আপনার মুখেই শুনেছি।

সেইজন্যই বৃষ্টি দেখলে আমার মেঘদূতের কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে, আমার হাঁপানির রুগি বাবাকে যতবার কাঁথাকানি দিয়ে ঢাকতে যাচ্ছেন মা, ততবার দেখছেন, সব ভেজা। সপসপে ভেজা। ঘরের মধ্যে অবাধ ঘোলা জল, তাতে কেঁচো, ব্যাং, ঢোঁড়া সাপ, উচ্চিংড়ে, কত কী। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি সেন সাহেব?

না, শুনছি। ভারী প্যাথেটিক।

ভীষণ। আপনার কি কখনও লুটপাট করার ইচ্ছে হয়েছে সেন সাহেব?

না, কখনও নয়।

স্বাভাবিক। আপনি তো কখনও দারিদ্র্যসীমার ওপাশে থাকেননি। ওপাশে যারা থাকে তাদের মধ্যে সর্বদাই ওরকম একটা ইচ্ছে কাজ করে। তবে ভয় পাবেন না। সাধারণত দারিদ্র্যসীমার নীচেকার মানুষেরা নিরীহ, বোকা, সংহতিহীন এবং ভিতু। দাদা বা নেতা গোছের কেউ এসে যদি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে বিশেষ একটি লক্ষ্যে চালনা করে তা হলেই বিপদ।

সে তো বটেই।— খুব পাঁশুটে গলায় শুভ্রাংশু বলে।

আমি মোলায়েম গলায় বললাম, জনসাধারণকে ভয়ের কিছু নেই সেন সাহেব, শুধু দাদা বা নেতাদের দিকে নজর রাখুন।

সেই কাজটাই কি খুব সোজা?

না। কোনও কাজই বড় সোজা নয় সেনসাহেব। আমি শুধু সাবধান করে দিচ্ছি। আর কিছু করার নেই আমার। তবে আমার আরও দুটো গুদাম আছে। যদি বিপদ বোঝেন তা হলে নতুন স্টক যা আসবে তা আমার গুদামে তুলে দেবেন।

কোনও রিস্ক নেই তো!

আমি একটু হেসে বললাম, সব কাজেই রিস্ক থাকে সেনসাহেব। তবু যদি রিস্ক অ্যাভয়েড করতে চান তা হলে না হয় আমার লোকজন আর লরি দিয়ে আমি মাল খালাস করিয়ে আনব।

আচ্ছা। ভেবে দেখি।

টেলিফোনটা আমি নামিয়ে রাখি। শুভ্রাংশুকে টেলিফোনে কথাটা বলার উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্টভাবে আমিও জানি না। তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আমার মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর কাজ করে যায়। সেই ক্যালকুলেটর কখনও ভুল করেছে বলে নজির নেই। আমার মন বলছে এবারও আবার এই শহরে এবং আশেপাশে বন্যা হবে। অজস্র মানুষ এসে জড়ো হবে শহরে। ভরে যাবে ইস্কুলবাড়ি, কলেজ, কাছারি, অফিস। যথারীতি রিলিফ আসবে দেরীতে। লোকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠবে পুঞ্জীভূত ক্রোধ। কেউ একজন সেই বারুদে খুব দক্ষতার সঙ্গে একটি দেশলাই কাঠির আগুন ধরিয়ে দেবে। গত বছরের আগের বছর এই কাজটি করেছিল অধর।

স্পিরিটেড বলতে যা বোঝায় অধরও অনেকটা তা-ই। কমলা সেনের সঙ্গে তার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটি বাদ দিলে তার আর কোনও রন্ধ্র বা দুর্বলতা নেই। অধরকে তাই আমি কিছুটা ভয় পাই। আমার ধারণা অধর আমাকে ছোবল দেওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছে। বন্যা হলে সে সুযোগ অধর পেয়েও যাবে। এই অঞ্চলে রিলিফের চাল ও গম সাধারণত আমাকেই সাপলাই দিতে দেওয়া হয়। মোটামুটি পাকা চুক্তি। আমার নিজস্ব দুটো গুদাম আছে শহরের এক ধারে। আমার ধারণা অধর এবার সেখানে চড়াও হবে। জনতার ঢেউয়ে ভেসে যাবে দুটো গুদাম। যাক, তাতে ক্ষতি নেই। তার আগেই আমি গুদামের মাল সরিয়ে নেব। তা বলে দরিদ্র, মূর্খ, বঞ্চিত ভারতবাসীকে হতাশও করব না আমি। তারা যদি লুট করে তো করবে। তবে লুট করবে সরকারি জিনিস যা লুট করার অসাংবিধানিক অধিকার তাদের আছে।

জানালা দিয়ে আমি আরও খানিকক্ষণ বৃষ্টি দেখলাম। চমৎকার বৃষ্টি, হিংস্র, আদিম, ভয়ংকর।

সিংহীবাবুদের এই বাড়িটা বেশ বড়সড়। এর স্থাপত্যে নানা জায়গায় বেশ কারুকাজ আছে। অবশ্য সময়ের খাজনাও দিতে হয়েছে বাড়িটাকে। মেঝে ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়। দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে কয়েকটা ঘরে। দোতলায় দুটো ঘরে জল চোঁয়ায়। আমি সেগুলো মেরামত করিনি। কারণ এই প্রকাণ্ড বাড়িটায় থাকি মাত্র আমরা দু'টি ভাইবোন এবং কয়েকজন দাসদাসী ও দুটো কুকুর, আর আছে হাঁস, মুরগি, খাঁচার পাখি ও গোটা দুই জারসি গরু। অন্যান্য বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা কেউ সুখে, কেউ দুঃখে আছে। আমার দু'টি ভাই কলকাতা এবং দিল্লিতে চাকরি করে। সম্পর্ক খুব ক্ষীণ, নেই বললেই হয়।

আমার বোন রুমা যদিও আমার কাছেই থাকে তবু তার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। প্রায়ই সে কলকাতায় খোঁপা বাঁধতে বা চুল ছাঁটতে বা ফাংশন করতে চলে যায়। যতদূর জানি সে সাইকেল, স্কুটার এবং মোটরগাড়ি চালাতে পারে। স্কুলে পড়ার সময় সে জিমনাস্টিকস করত। ভাল গান গাইতে এবং নাচতেও পারত। দেখতে সে মোটামুটি ভাল, মুখশ্রী তেমন সুন্দর না হলেও ফিগার অসাধারণ। ইদানীং সে কারাটে বা ওই জাতীয় কিছু শিখছে বলে শুনেছি। অতিরিক্ত শরীরচর্চার ফলেই বোধহয় সে তেমন মস্তিষ্কের চর্চা করতে পারেনি। কম্পার্টমেন্টাল হায়ার সেকেন্ডারি টপকেই সে মোটামুটি লেখাপড়া শেষ করে। তারপর সে মন দেয় পুরুষজাতির প্রতি। বলতে নেই পুরুষজাতির মধ্যে প্রবেশ করেই রুমা একটা ঝড় তুলেছিল, তার জনপ্রিয়তায় আমিও চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং তাকে ঠারেঠোরে বোঝাতে থাকি যে, মহিলারা সাধারণত একগামিনীই হয়ে থাকে। বহুগামিনী হওয়া মেয়েদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্যাপারটা রুমাও বুঝতে পারত। তবে কোন পুরুষটি তার উপযুক্ত হবে তা বেছে বার করতে হিমশিম খাচ্ছিল সে। শাড়ির দোকানে ঢুকলে মেয়েদের যে অবস্থা হয় আর কি। কোনওটাই পছন্দ হয় না বা একসঙ্গে অনেকগুলো হয়।

গন্ধর্ব নামটা জনগণের কেমন লাগে আমি জানি না। কিন্তু এই নামের লোকদের আমি সন্দেহের চোখে দেখি। গন্ধর্ব নামটার মধ্যেই একটা ধোঁকাবাজি আছে বলে আমার ধারণা। অবশ্য এ নামের একটা লোককেই আজ অবধি আমি চিনি। রুমা অনেক বেছেগুছে এই গন্ধর্বকেই বিয়ে করেছিল।

নামটা যেমনই হোক, গন্ধর্ব ছেলেটা বোধহয় তেমন খারাপ নয়। রোগা, ফরসা ও সুদর্শন এই ছেলেটি ছিল অধ্যাপক। ছিল কেন, এখনও আছে। জাতি হিসেবে অধ্যাপকদেরও আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। দেদার ছুটি ভোগ করে করে এরা অল্প দিনেই ভীষণ কুঁড়ে হয়ে পড়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা জিনিসটা একদম হারিয়ে ফেলে। বইপোকা হওয়ার ফলে এদের অধিকাংশেরই বাস্তববুদ্ধি কিছু কম হয়ে থাকে। গন্ধর্বর মধ্যে অধ্যাপকোচিত সব অপগুণই ছিল। ফলে বিয়ের দু'বছরের মাথায় রুমা তাকে ডিভোর্স করে আমার কাছে ফিরে আসে। শোকে গন্ধর্ব মদ ধরে। মাতাল অবস্থাতেই সে একদিন আমার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, দাদা আমাকে বাঁচান। রুমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

রুমাকে আমি জানি। আমাকে সে সামান্যতমও সমীহ করে না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে গেলেই সে আমার দিকে অত্যন্ত শীতল ও কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। রুমা দাদা হিসেবে আমাকে স্বীকার করলেও মানুষ হিসেবে সে আমাকে শ্রদ্ধা করে না তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই। সম্ভবত রুমা আমার উত্থানের গোপন ইতিহাসটিও জানে। তাই রুমাকে আমি ঘাঁটাতে সাহস পাই না। গন্ধর্বর কাতর আবেদনে সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আমি তাকে একটি সুপরামর্শ দিয়ে বলি, গন্ধর্ব, রুমা একটু ফিজিক সেনট্রিক। যাকে শরীর-সর্বস্ব বলা যায় আর কি। হুট করে তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছে বটে ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু আমি জানি, ওর বিয়ে করা উচিত ছিল কোনও ব্যায়ামবীরকে। যদি রুমার মন পেতে চাও তবে ব্যায়াম করতে থাকো। তোমার বয়স এমন কিছু হয়নি, এখন শুরু করলেও পারবে।

বাস্তবিকই গন্ধর্ব ব্যায়াম শুরু করে দেয়। একটা জিমনাসিয়ামে ভর্তি হয়ে সে বছর দুই একতানমনপ্রাণে শরীরচর্চা করে যেতে থাকে। ফলও পায় হাতে হাতে। দু'বছর বাদে তার ঘাড়ে গর্দানে দিব্যি পেশীবহুল স্বাস্থ্য হয়। ততদিনে অবশ্য রুমার আরও বহু গুণগ্রাহী জুটে গেছে। যে কোনওদিন সে দ্বিতীয় স্বামী নির্বাচন করে বসবে, সেইসময়ে একদিন আমারই প্ররোচনায় গন্ধর্ব এসে হাজির হয় এবং প্রায় জোর করেই রুমাকে তুলে নিয়ে যায়।

আমার ধারণা গন্ধর্বর সেই জোর খাটানোর ব্যাপারটা রুমা বেশ উপভোগ করেছিল। তাই বিশেষ চেঁচামেচি করেনি, সুড়সুড় করেই চলে গিয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় দফার বিয়েটা টিকল মাত্র বছরখানেক। গন্ধর্বকে আবার ডিভোর্স করার মামলা ঠুকে ফিরে এসে রুমা আমাকে বলল, গন্ধর্ব ভীষণ আনকালচার্ড, একটা জংলি, ব্রুট।

আমি অবাক হলেও, মুখে কিছু বলার সাহস পেলাম না।

গন্ধর্ব একদিন অপরাধী মুখ করে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দাদা, আজকাল আমার শরীরের সবরকম খিদে বেড়ে গেছে। গায়ের জোরও হয়েছে সাংঘাতিক। ফাইনার সেনসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আমার এই শারীরিক তেজ রুমা ঠিক সহ্য করতে পারছিল না। এবার কী করব বলুন!

আমি বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, সব কিছুরই একটা প্রোপোরশন রাখতে হয় গন্ধর্ব। শরীরটা তোমার সাংঘাতিক হয়েছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দিকগুলো ডেভেলপ করেনি। আমার অ্যাডভাইস হল, একটু-আধটু নাচ আর গান শেখো। তাতে স্ট্রেংথের সঙ্গে পেলবতা যুক্ত হবে। বজ্রের কাঠিন্যের সঙ্গে যোগ হবে ফুলের কোমলতা।

বছরখানেক যাবৎ গন্ধর্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নাচ ও গান শিখছে। কী হবে তা জানি না। তবে খবর রাখি, নাচ-গানেও গন্ধর্ব খারাপ করছে না।

আমি সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠলাম। পারতপক্ষে আমি দোতলায় আসি না। শুধু দোতলায় খাওয়ার সময় ছাড়া। এই অঞ্চলটা রুমার। আসানসোল না কোথায় যেন ফাংশন করে আজ সকালেই রুমা ফিরেছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। খবরটা পেয়েছি মাত্র।

খুব পা টিপে টিপেই আমি ওপরে উঠলাম। রুমা হয়তো বিশ্রাম-টিশ্রাম করছে। সাড়া শব্দ করা ঠিক নয়।

খাওয়ার ঘরে ঢুকতেই কিন্তু রুমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা বাংলা সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে বসে বসে। আমার দিকে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। আমার ভিতরটা সংকুচিত হয়ে গেল হঠাৎ।

আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে খেতে বসি এবং ঘরের অন্য জিনিস দেখতে থাকি। টেবিলের দু'ধারে দু'জনে বসলেও রুমার সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্ব বহু যোজনের।

রুমা সশব্দে সাপ্তাহিকটা টেবিলে আছড়ে ফেলে বলল, অসহ্য!

আমি বললাম, কী?

রুমা আমার দিকে চেয়ে তেতো গলায় বলে, তুমি ধারণা করতে পারো, গন্ধর্ব ফাংশনে গান গাইছে?

আমি যথেষ্ট অবাক হয়ে বলি, তাই নাকি?

তা নয় তো কী? আসানসোলে গিয়েছি ফাংশনে। দেখি মূর্তিমান হাজির। মুখটা খুব গম্ভীর। তখনও বুঝতে পারিনি। ফাংশনের শুরুতেই দু'-একজন আর্টিস্টের পর শুনি গন্ধর্বর নাম অ্যানাউনস করা হচ্ছে।

আমি সাগ্রহে বলি, তারপর?

তারপর আর কী শুনতে চাও? দেখি দিব্যি এসে স্টেজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে লাগল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, কেমন গাইছে?

রুমা কটকট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জানি না।

রাগ করছিস কেন? কেমন গাইল?

রুমা একটা হাই তুলে ক্লান্তিসূচক দু'-একটা শব্দ করে বলল, খুব খারাপ গাইছিল না। কিন্তু হঠাৎ ও গান ধরল কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না।

হুঁঃ!— বলে রুমা টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল।

৪। অভিজিৎ

রিকশায় ফিরতে ফিরতে গণেশকাকা আমাকে স্তোকবাক্য শোনাচ্ছিলেন, ইস্কুলে একটা গণ্ডগোল চলছে। পুরনো হেডমিসট্রেস নাকি রিজাইন করবে। যদি করে তবে হেডমিসট্রেস হবেন অসীমা দিদিমণি। চাকরিটা তোরই হবে। পারিজাতবাবু হচ্ছেন অসীমা দিদিমণির হাতের মুঠোর লোক। ওঁর সঙ্গে বিয়ে কিনা।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, অসীমা দিদিমণির বিয়ে নাকি?

হ্যাঁ। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলাম। অসীমা দিদিমণি দেখতে ভাল নয়, বড্ড রোগাও। বিয়ের ব্যাপারে সেটা হয়তো কোনও বাধা হবে না। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখে যে গভীর বিষণ্ণতা সেটা ওর হবু স্বামী সহ্য করবে কী করে!

আমি গণেশকাকাকে বললাম, চাকরি হলে হল, আপনি বেশি ধরাধরি করতে যাবেন না।

গণেশকাকার এই দোষটা আছে। দোকানদারি করে করে কেমন যেন আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। সকলের সঙ্গেই বড্ড বেশি হাত কচলে কথা বলেন। সরকারি অফিসার-টফিসারদের একেবারে দেবতার মতো খাতির দেন। এতটা বিনয় ব্যক্তিত্বহীনতারই

নামান্তর। আর এত সব তেল-টেল দিয়ে চাকরি পেতেও আমার ঘেন্না করে।

গণেশকাকা বললেন, আরে যুগটাই তো পড়েছে ওরকম। ধরাধরি না করলে কি কিছু হয়? ধরাধরি, ঘুষ এসবই তো আজকাল আইন হয়ে গেছে।

আমি সন্দিহান হয়ে বললাম, ঘুষও দিচ্ছেন নাকি?

গণেশকাকা অপ্রতিভ হেসে বললেন, আরে না, না। ঘুষ দিতে হয়নি। মাঝে মাঝে একটু দই কি মিষ্টি দিয়ে পয়সা নিইনি আর কি।

কবে দিয়েছেন?

গণেশকাকার একটা সুবিধে, কথা চেপে রাখতে পারেন না। খুব লজ্জা পেয়ে মাথাটাথা চুলকে বললেন, গতকালই দু'সের দই আর পঁচিশটা রসগোল্লা পাঠিয়েছিলাম।

অসীমাদি নিলেন?

নিয়েছে। তবে বলেছে দাম নিতে হবে। তা সে দেখা যাবেখন। তোর চাকরিটা যদি হয়ে যায় তো ওটুকু খরচ কি আর গায়ে লাগবে?

আমি একটু হেসে বললাম, আমাকে এখানে চাকরিতে ঢুকিয়ে আপনার লাভ কী?

গণেশকাকা এ কথার জবাব দিলেন না। বললেন, পারিজাতবাবুকে হাত করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু লোকটা মহা ধুরন্ধর।

আমি আর কথা বললাম না। দোকানে নেমে সাইকেলটা নিয়ে শহরে চক্কর দিতে বেরিয়ে পড়লাম। গণেশকাকা মিষ্টি খেয়ে যেতে বললেন। খেলাম না।

এ শহর আমার অনেক দিনের চেনা। রাস্তাগুলো সরু এবং ভাঙা। মলিন ও জীর্ণ সব বাড়িঘর। কোথাও বেশ ঘন কচুবন, আগাছা বা জঙ্গল। সরকারি দফতর কয়েকটা হয়েছে বটে, আর কিছু সরকারি কোয়ার্টার। আর তেমন কোনও উন্নতি বা পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যদি চাকরি পাই তা হলে এই শহরে এসে চাকরি করতে আমার কেমন লাগবে? কেমন লাগবে মউডুবিতে দাদুর কাছে থাকতে? বোধহয় খুব ভাল লাগবে না।

শহর ছাড়িয়ে আমি গাঁয়ের পথ ধরলাম। জলভারনত মেঘ গুমগুম করছে। চড়াৎ চড়াৎ করে আকাশ ঝলসে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। আমি সাইকেলের স্পিড বাড়িয়ে দিলাম। বহুকাল সাইকেল চালিয়ে অভ্যাস নেই। রাস্তাও খারাপ। পায়ের ডিম আর কুঁচকিতে টান লাগছে। তবু বৃষ্টিকে হারিয়ে পৌঁছে গেলাম বাড়িতে। আমি দাওয়ায় উঠতে না উঠতেই ঝপাং করে নেমে এল বিস্ফোরিত মেঘ থেকে জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি।

দাদু দরজা খুলে দিলেন মুখে বিরক্তি নিয়ে।

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এখানে কেরোসিন পাওয়া যায় না। বাতিটাতি বেশি জ্বেলো না। রাতেও কি ও-বাড়ি খাবে?

আমি সামান্য একটু ভিজেছি। রুমালে মাথা মুছতে মুছতে বললাম, এখন তো সবে সন্ধে। দেখা যাক।

পারুলের মা এসেছিল। বলে গেল তুমি এলেই যেন পাঠিয়ে দিই।

আচ্ছা। দুপুরে একটু ঘুম হয়েছে?

আমার? না, আমার আর ঘুম কই?

জামাকাপড় পাল্টে আমি চৌকিতে বসি। টিনের চালে বৃষ্টির কান ঝালাপালা শব্দ। এক সময়ে হয়তো এই শব্দ আমার প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন নেই। এখন ভয় করে। মনে হয়, বুঝি সব ভেঙে পড়ে যাবে।

একটু চায়ের জন্য ভিতরটা আঁকুপাঁকু করছে। কিন্তু দাদুর চায়ের কোনও পাট নেই। পারুলদের বাড়ি গেলে হয়। কিন্তু এই বৃষ্টিতে বেরোলেই ভিজে যাব।

চুপচাপ শুয়ে চোখ বুজে রইলাম। চোখ বুজতেই অসীমা দিদিমণির মুখটা মনে পড়ল। কীসের এত দুঃখ ভদ্রমহিলার? যে লোকটা ওকে বিয়ে করবে সেই পারিজাতই বা কেমন লোক? শুনেছি, লোকটার মেলা টাকা, অনেক ক্ষমতা! সে কেন একে বিয়ে করতে চায়?

হঠাৎ চড়াক করে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের ভিটে কিনতে যে লোকটা এসেছিল সে না পারিজাতবাবুরই লোক।

আমি উঠে দাদুর ঘরে গেলাম।

দাদু একটা কাঁথা চাপা দিয়ে বসে আছেন। ঘরটা অন্ধকার। একটা সরু মোম জ্বলছে কুলুঙ্গিতে। সেই আলোয় দাদু একটা কাগজের পুরিয়া খুলে কী যেন দেখার চেষ্টা করছেন মন দিয়ে।

আচ্ছা দাদু, এই জমিটা যে কিনতে চায় তার নাম পারিজাত না?

হ্যাঁ। কেন?

লোকটা শিবপ্রসাদ স্কুলের সেক্রেটারি।

তা হবে।

সেই স্কুলেই আমার চাকরি হওয়ার কথা চলছে।

দাদু তার পুরিয়া থেকে চোখ না তুলেই বলেন, তাই নাকি? চাকরি কি হয়ে গেছে?

না, কথা চলছে।

দাদু পুরিয়াটার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে বললেন, আগের দিনে আর কোনও চাকরি না হোক মাস্টারিটা পাওয়া যেত। আজকাল শুনি, মাস্টারি পেতেও নাকি অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

তুমি কি জমিটা ওকে বেচবে বলে কথা দিয়েছ?

না। তুমিই তো বিকেলে বলে গেলে, এখানে থেকে মাস্টারি করতে তোমার সুবিধে হবে।

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলি, বলেছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না যে, পারিজাতবাবুই সেক্রেটারি।

দাদু পুরিয়া থেকে চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তাতে তফাতটা কী হল?

ভাবছিলাম পারিজাতবাবুর সঙ্গে একটা ডিল করা যায় কি না।

কীসের ডিল?

ধরো যদি বলা যায় যে, জমিটা তুমি ওঁকেই বেচবে যদি চাকরিটা আমার হয়।

দাদুর চোখে মোমবাতির আলোতেও সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলাম। বললেন, তাতে আমার লাভ কী? তোমাকে চাকরি দিলে ও কি বাজার-দরে জমি কিনবে ভেবেছ? এক মোচড়ে দাম অর্ধেকে নামিয়ে দেবে।

তা বটে।— আমি হতাশ গলায় বলি।

পারিজাতকে তুমি চেনো না। বরং কাউকে মুরুব্বি ধরো।

ধরাধরি করতে পারব না। তার চেয়ে বিজনেস ডিল করা অনেক সম্মানজনক।

মাইনে কত দেবে খোঁজ করেছ?

না। তবে আজকাল মাস্টারির মাইনে খারাপ নয়।

কত শুনি।

সাত-আটশো হবে।

দাদু চোখ কপালে তুলে বলেন, বলো কী! মাস্টাররা তো তা হলে জাতে উঠে গেছে।

তা উঠেছে। কিন্তু টাকার দাম পড়ে গেছে দাদু।

দাদু একটু চুপ করে থেকে গালের হরতুকি মাড়িতে চিবোলেন। লালায় অনেকক্ষণ ভিজে হরতুকিটার এতক্ষণে কাদার মতো নরম হয়ে যাওয়ার কথা। চিবোতে চিবোতে বললেন, জমি বেচলে তোমার চাকরি হবে। এ বড় অদ্ভুত ব্যবস্থা। চাকরি না হয় হল, কিন্তু আমি থাকব কোথায়?

বাসা ভাড়া নেব।

ফের ভাড়া বাসা? জন্মে ভাড়াটে থাকিনি বাপু, এই শেষ বয়সে পারব না।

ওরা তো বলেছে, আপনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন ঘরটুকু আর কুয়োতলা নেবে না।

সেটা কথার কথা। একবার রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে তখন কে কার কড়ি ধারে? লোক-লস্কর নিয়ে এসে পাঁজাকোলা করে তুলে বের করে দিলেই বা মারে কে?

লোকটা কি খারাপ নাকি?

ভাল লোক আর কোথায় পাবে একালে? সব পাজি।

আমি একটু দমে গেলাম। বললাম, চাকরি একটা আমার দরকার দাদু। বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ।

খারাপ তো হবেই। পেটের ভাতের যোগাড় রেখে তার পরই বাবুগিরি করতে তোমাদের কলকাতায় যাওয়া উচিত ছিল। তা তো করলে না। আমি একা মানুষ, জমি-জিরেত সামলাতে পারলাম না। লোকবল থাকলে আজ খেতের ধান কটা গোলায় তোলা যেত।

পুরনো তর্ক। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে একসময়ে আমি একটা উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে একটা জিনিস শিখেছি। ভূমির সঙ্গে, কর্ষণের সঙ্গে যে-মানুষের গভীর সংযোগ নেই সে কখনও দেশকে ভালবাসতে পারে না।

মউডুবিকে এখন আর গ্রাম বলা ঠিক হবে না। শহরের কাছ-ঘেঁষা গঞ্জ। কিন্তু আমি এমন এমন লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম দেখেছি যেখানে পানীয় জল নেই, ডাক্তার ওষুধ হেলথ সেন্টার নেই, রাস্তা নেই, খাবার নেই। কিছু লোক ধুঁকছে আর ধুঁকছে। অথচ, গোটা দেশটারই শক্তির উৎস ওই গ্রাম, ওইসব কৃষিক্ষেত্র ও গোচারণভূমি। কিন্তু এই আজব রাজনীতির দেশের শাসকরা যে ডালে বসে আছে সেই ডালটিই বে-খেয়ালে কেটে ফেলছে।

আমি আর দেশোদ্ধারের কথা ভাবি না। এখন আমার সম্মানজনক শর্তে একটা চাকরি চাই।

কড়ে আঙুলের চেয়েও সরু এবং মাত্র দু'আঙুল লম্বা একটা মোম আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, জ্বেলে নাও গে। বর্ষার দিন, পোকামাকড় ঘরে ঢোকে। একটু দেখেশুনে নিয়ো ঘরখানা। কেউ থাকেও না, সাপখোপ বাসা করেছে কি না তাই বা কে জানে!

ঘরে এসে মোমটা না জ্বালিয়ে আমি অন্ধকারেই বসে রইলাম। বাইরের মাঠে জল জমে গেছে, বৃষ্টির শব্দ থেকেই বুঝতে পারছি। প্রবল স্বরে ব্যাং ডাকছে। রাত সাড়ে ন'টার দিকে বৃষ্টি থেমে গেল এবং গণেশকাকা লণ্ঠন হাতে আমাকে নিতে এলেন।

চল, তোর মাসি ভাত নিয়ে বসে আছে।

আমি একটু রাগ করে বললাম, রোজ কি দু'বেলাই ও-বাড়ি পাত পাড়তে হবে নাকি?

সে তোর মাসির সঙ্গে বোঝ গিয়ে।

জল ভেঙে ছপ ছপ করে হাঁটতে হাঁটতে গণেশকাকা মৃদু স্বরে বললেন, একটা খবর আছে।

কী খবর?

দোকান থেকে আসবার সময় অসীমা দিদিমণির বাড়ি হয়ে এলাম।

আবার গেলেন কেন?

সন্ধেবেলায় যে দু'জনে কথা হয় রোজ।

কাদের কথা হয়?

অসীমা দিদিমণি আর পারিজাতবাবুর।

ও। আমাকে নিয়েও কথা হয়েছে নাকি?

হয়েছে। তবে জহরবাবুর মেয়ে প্রতিমাও ওই পোস্টের একজন ক্যানডিডেট। প্রতিমাকেই প্রায় সিলেক্ট করে রেখেছিলেন পারিজাতবাবু। অসীমা দিদিমণি তোর কথা বলাতে উনি ভেবে দেখবেন বলেছেন।

তা হলে ভেবে দেখতে থাকুন।

তোকে কাল একবার পারিজাতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

জহরবাবু কে?

তুই চিনবি না।

খুব নিডি লোক নাকি?

নিডি কে নয় এই বাজারে? যার লাখ টাকা আছে সেও ঘ্যান ঘ্যান করে।

জহরবাবু কি সে ধরনের লোক?

তা বলছি না। ছা-পোষা লোকই। সামান্য মাস-মাইনে, গোটা চারেক মেয়ে।

তা হলে তো মেয়ের চাকরিটা ওঁর দরকার।

তা বটে, তবে তোর দরকার আরও বেশি।

সেও ঠিক কথা। তবু আমি বলব, জহরবাবুর মেয়ের চাকরি হওয়াটা যদি বেশি দরকার বলে মনে করেন তবে আমি সরে দাঁড়াব।

তোকে বেশি পাকামি করতে হবে না তো।

আমি চুপ করে গেলাম।

সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। সকালবেলাটাও মেঘলা, ম্লান, নিস্তেজ। তবে বৃষ্টি নেই। জলকাদায় রাস্তা প্রায় নিশ্চিহ্ন। সেই অদৃশ্য রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে শহরে চলেছি। পদে পদে সাইকেল গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠছে। হ্যান্ডেল বেঁকে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। কয়েক জায়গায় রাস্তার ওপর দিয়ে তোড়ে বয়ে যাচ্ছে জল। এত জল কোথা থেকে আসছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। রাস্তার দু'দিকে মাটি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। জলে জলময়।

বড় একটা গর্তে পড়ে সাইকেল কাত হয়ে গেল। ঝপ করে আমার পা পড়ল হাঁটুভর ঘোলা জলে। উঁচু রাস্তা আর দূরে নয়। জলে সাইকেল চালানোর ঝুঁকি না নিয়ে আমি সাইকেল ঠেলে নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে পড়লাম। দরমার বেড়ওয়ালা দোকানগুলো খুব অল্পই আজ খুলেছে। অন্তত দুটো দোকান মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিছু লোক পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে জড়ো হয়েছে বড় রাস্তার ওপর। দূরে আরও কিছু লোককে জল ভেঙে মাঠের ওপর দিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। তাদের মাথায় বাক্স-প্যাঁটরা।

বৃষ্টিটা এবার বেশ জোরালো। আমাদের উঠোন কাল রাত থেকেই জলে ডুবে আছে। সামনের বাগানটুকুতেও ঘাস দেখা যাচ্ছে না।

গণেশকাকার দোকানে পৌঁছোতেই উনি বললেন, দিদিমণির আজ শরীরটা ভাল নেই। খবর পাঠিয়েছেন। তুই একা গিয়ে পারিজাতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারবি না?

আমি একটু হেসে বললাম, পারব না কেন? লোকটা তো আর বাঘ-ভাল্লুক নয়।

গণেশকাকা একটা ভাঁজকরা কাগজ পকেট থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই হাতচিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন অসীমা দিদিমণি। এটা নিয়ে পারিজাতবাবুর হাতে দিস। সিংহীবাবুদের বাড়ি, চিনিস তো?

চিনি। ফেরার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যাস।

সিংহীবাবুদের বাড়ি আমি শুধু চিনিই নয়, ও-বাড়ির একটি ছেলে সুশীলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। পুরো সামন্ততান্ত্রিক পরিবার। এক সময়ে খুবই বড় অবস্থা ছিল। আমরা জ্ঞানবয়সে যখন সিংহীবাবুদের বাগানে ফল পাড়তে যেতাম তখনই টের পেতাম ওদের অবস্থা পড়তির দিকে। বাড়িতে কলি ফেরানো হয় না, বাগানের শ্রীছাঁদ নেই, চাকর-বাকরের সংখ্যা কমে আসছে এবং সিংহীবাড়ির বাবুরা রিক্সা-টিক্সাতেও চড়ছে। আগে ওদের গাড়িটাড়ি ছিল। মস্ত এই বাড়িটার

মেরামত এবং রক্ষার খরচ ওরা কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। সামন্তদের হটিয়ে অর্থনীতি নিজেদের হাতে নিতে তখন এগিয়ে আসছে নয়া পুঁজিপতিরা। এরা ব্যবসায়ী, ঠিকাদার বা ছোটখাটো শিল্পপতি। সামন্তরা সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধরনটা বুঝতে পারেনি। আলস্য, আত্মসুখ ও পরিবেশ-উদাসীন হওয়ায় তাদের পতন অনিবার্য ছিলই। একদল শোষণকারীর হাত থেকে অর্থনীতি গেল অন্য একদল শোষণকারীর হাতে।

সিংহীবাবুদের বাড়ি এখন পারিজাতবাবু কিনে নিয়েছে। নেওয়াটাই স্বাভাবিক। যতদূর জানি পারিজাতবাবু নয়া ধনতন্ত্রের শরিক। তিনি সিংহী ম্যানসন কেনায় বোধহয় সিংহীবাবুরাও বেঁচেছে। অতবড় জগদ্দল বাড়িটা ছিল তাদের বুকে জগদ্দল এক ভারের মতো।

আমি আশা করেছিলাম নয়া ধনতন্ত্রের এই প্রতিনিধি সিংহীবাড়িকে আবার নতুন করে ঘষে মেজে চকচকে করে তুলেছেন। কিন্তু তা নয়। অবাক হয়ে দেখি বাড়িটা যেমন ছিল তেমনই আছে। বাগান আগাছায় ভর্তি। বাড়ির কলি ফেরানো হয়নি। ফাটা ভাঙা অংশগুলি যেমনকে তেমন রয়ে গেছে। ফটক হাঁ হাঁ করছে খোলা।

ভিতরে মোরামের রাস্তায় পড়তেই ভিতর থেকে দুটো অভিজাত কুকুরের গমগমে ডাক শুনতে পেলাম। একটু ভয় হল, ছাড়া নেই তো কুকুর দুটো?

রাস্তার ওপরে এসে পড়েছে কাঞ্চন গাছের শাখাপ্রশাখা। সাদা ফুলে ঝেঁপে আছে গাছটা। রাস্তার দু'ধারে ফুলের কিছু গাছ নজরে পড়ল। ফটক খোলা, গরু ছাগল ঢুকে খেয়ে যেতে পারে তো। নাকি বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে গরু ছাগলও ভয় পায় আজকাল?

গাড়িবারান্দার তলায় সাইকেল থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলাম। কেউ কোথাও নেই। কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না। শুধু ভিতরবাড়িতে কুকুরের গমগমে গলা আর একবার শোনা গেল।

বড়লোকদের মুখোমুখি হতে আমার কোনও অস্বস্তি কাজ করে না। কারণ আমি এ দেশের বড়লোকদের আকণ্ঠ ঘৃণা করি। একটু নেড়েচেড়ে দেখার জন্য পারিজাতবাবু যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন এতে আমি মজাই পাচ্ছি। আমি ওর সামনে অবশ্যই ভাল মানুষ সেজে থাকব এবং শিক্ষকোচিত 'গুডি গুডি" আচরণ করব। কিন্তু লোকটা জানবেও না, আমাকে চাকরি দেওয়া মানে নিজের চেয়ারের নীচে একটি টাইম বোমা স্থাপন করা। চাকরি পেলে আমি ধৈর্য ধরে কনফার্মেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর তারপর আমার যাবতীয় শানানো ঘৃণা ও আক্রোশ নানা আন্দোলন, বিক্ষোভ ইত্যাদি হয়ে ফেটে পড়বে। শিবপ্রসাদ হাই স্কুলে গণ্ডগোল চলছে, আমি জানি। কীরকম গণ্ডগোল তা জানি না। আর গণেশকাকার কাছে শুনেছি, পারিজাত লোক ভাল নয়। দাদুও সেই কথাই বলেন। সুতরাং আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা মোটামুটি ঠিকই হয়ে গেছে।

সদর দরজায় খানিকক্ষণ কড়া নাড়লাম। দরজা হাট করে খোলা, কিন্তু লোক নেই। আহাম্মকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে?

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বাগানের দক্ষিণ দিকে একটা দোলনা ছিল। লোহার স্ট্যান্ডে লাগানো শেকলের দোলনা। ছেলেবেলায় অনেক চড়েছি সেটায়। এখন আর দোলনাটা নেই। পাথরে তৈরি একটা ছোট্ট ফোয়ারা ছিল গাড়ি-বারান্দার সামনেই। সেটা আছে বটে, কিন্তু লতানো গাছে এমন ঢেকে গেছে যে, বোঝাই যায় না। উত্তর দিকে একটা কাশীর পেয়ারাগাছ ছিল। কিন্তু বারান্দা থেকে বোঝা গেল না, গাছটা আছে কি নেই। কারণ ওদিকটায় আরও বড় বড় গাছ কয়েকটা হয়েছে।

বুরবকের মতো খানিকক্ষণ হাঁ করে এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ পিছনে একটা মৃদু চটির শব্দে মুখ ঘোরালাম। খুব চমকিলি চেহারার একটা মেয়ে। বেশ চটক আছে চেহারায়, যেমনটা বড়লোকদের থাকেই। জন্মগত চেহারা তেমন দেখনসই না হলেও বড়লোকের মেয়েরা সেটাকেই মেজে ঘসে কতটা সুন্দর করে তুলতে পারে।

মেয়েটা আমার দিকে খুব ভ্রূ কুঁচকে এবং অবহেলার দৃষ্টিতে তাকাল বলে আমার মনে হল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। বারান্দা পর্যন্ত এলও না মেয়েটা। বাইরের হলঘর থেকে ডানহাতি আর একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি একটু বেশি সকালে পৌঁছে গেছি। আর একটু পরে আসাই বোধহয় উচিত ছিল। কিন্তু এরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকাটাও আমার ভাল লাগার কথা নয়।

আমি সোজা হলঘরে ঢুকে পড়লাম এবং মেয়েটা যে ঘরে ঢুকেছে সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, শুনছেন?

মেয়েটা একটা ডেসকের ড্রয়ার খুলে নিচু হয়ে কিছু একটা দেখছিল। সেই অবস্থাতেই আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দাদা এখনও ফেরেনি। বারান্দায় বেঞ্চ আছে, অপেক্ষা করুন।

আমার একটু রাগ হল। তা গরিবদের তো চট করে রাগ হয়েই থাকে। সেটা চাপা দিয়ে বললাম, উনি কোথায় গেছেন?

মর্নিং ওয়াক করতে।

কখন ফিরবেন তার কি কোনও ঠিক নেই?

আমি অত জানি না। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

মেয়েটার কথাবার্তা অভদ্র, আচরণে অহংকার। আমি বললাম, দারোয়ানকে তো দেখলাম না।

আছে। খুঁজে দেখুন।

মেয়েটা যা খুঁজছিল তা বোধহয় পেয়ে গেল। সটান এগিয়ে এসে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটা বেশ সুগন্ধ পেলাম তার গা থেকে। নাভির নীচে পরা শাড়ি, খুব সংক্ষিপ্ত ব্লাউজে মেয়েটিকে বেশ দেখাল। আমাকে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল বটে, কিন্তু বউনিটা খুব খারাপ হয়েছে বলে মনে হল না আমার। সকালবেলাতেই একটা সুন্দর মুখ বা একটা সুন্দর ফিগার দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

ভিতরে ভিতরে সবসময়ে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে বলেই বোধহয় আমি আজকাল মেয়েদের নিয়ে বেশি কল্পনা করি না। পারুলের সঙ্গে একটা প্রেম-ট্রেম ঘটেনি আমার। প্রেম-ট্রেম করেও তো লাভ নেই। বেকার মানুষ, বাড়িতে হাঁড়ির হাল, সুতরাং একটা মেয়েকে তুলে আনলে তাকেও কষ্ট দেওয়া, নিজেরাও কষ্ট পাওয়া। তবে প্রেম না করলেও কোনও মেয়ে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে আজও মন খিচড়ে যায়। বহুদিন বাদে এই মেয়েটা আমার মনে একটা খিচ ধরাল। তবু বউনিটা খারাপ হয়নি।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িবারান্দার তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অগত্যা আমার সাইকেলের বেলটা ক্রিং ক্রিং করে বাজাতে লাগলাম। এভাবে যদি খানিকটা ডিসটার্ব করা যায় এদের এবং নিজের উপস্থিতির জানান দেওয়া যায়।

কাজ হল। সিংহীদের বাগানে কয়েকটা কুঞ্জবন আছে। তার ভিতরে লোহার বেঞ্চি পাতা বড়লোকদের কত খেয়ালই না থাকে। এরকমই একটা কুঞ্জবন থেকে হঠাৎ খাকি পোশাক পরা একটা লোক বেরিয়ে আমার দিকে আসতে লাগল।

লোকটা দারোয়ান সন্দেহ নেই। বুঝলাম, পারিজাতবাবুর বাগানে গোরু ছাগল ঢোকে না কেন প্রকাশ্যে দারোয়ান না থাকলেও আড়ালে বসে নজরদারি করার লোক ঠিকই আছে।

লোকটা আমার কাছে এসে বলল, কাকে চাইছেন?

পারিজাতবাবু কোথায়?

লোকটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, উনি এখন জগিং করছেন। আপনি একটু পরে আসুন।

কখন আসবেন তার কিছু ঠিক আছে?

উনি বাগানেই জগিং করছেন।

এই বাগানেই?

হ্যাঁ, কিন্তু এখন দেখা হবে না।

দারোয়ানরা যদিও আমার প্রায় সমশ্রেণির লোক তবু কেন্ জানি এই শ্রেণিটাকে আমি পছন্দ করি না। দারোয়ান মানেই তো বড়লোকের ধনমানের প্রহরী। তার মানে কর্তাভজা। মালিক হাসলে এরাও হাসে, মালিক গম্ভীর হলে এদের মন খারাপ হয়ে যায়।

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, উনি আমার আত্মীয়।

লোকটা খুব ইম্প্রেসড হল না। বড়লোকদের গরিব আত্মীয় থাকতেই পারে, কিন্তু তাদের বেশি লাই দেওয়ার নিয়ম নেই। আমার আকার এবং প্রকার লোকটার পছন্দও হচ্ছিল না। বলল, অপেক্ষা করুন। উনি এসে যাবেন।

লোকটা আবার কুঞ্জবনে ফিরে গিয়ে লুকিয়ে নজর রাখতে লাগল।

সিংহীদের বাগানটা বিরাট। হেসেখেলে বিঘা চারেক জমি হবে। আমি পায়ে পায়ে ঘাসজমি ধরে হাঁটতে লাগলাম।

প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল, সিংহীদের বাগান বা বাড়ির কোনওরকম সংস্কারই বুঝি পারিজাতবাবু করেননি। কিন্তু তা ঠিক নয়। অন্তত একটা সংস্কার তিনি করেছেন। সংস্কার কিংবা সংযোজন। বাগানের চারধারে পাঁচিল ঘেঁষে একটা সরু মোরামের রাস্তা তিনি বানিয়েছেন। সম্ভবত জগিং করার জন্যই।

ধৈর্য ধরে সেই মোরামের রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই লোকটাকে দেখা গেল। পিছনের পুকুরের ধারে কলাঝোপের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে লোকটা এগিয়ে আসছিল। সাদা হাফ প্যান্ট আর তোয়ালের গেঞ্জি পরা, পায়ে কেডস। বেশ পাকানো শক্ত চেহারা। সন্দেহ নেই লোকটা স্বাস্থ্য-সচেতন। তা হবে নাই বা কেন? দেদার টাকা, দেদার ভোগ্যবস্তু, দেদার স্তাবক। এত সব ভোগ করতে হলে স্বাস্থ্য তো চাই-ই।

লোকটা কাছাকাছি আসতেই আমি মোরামের রাস্তায় উঠে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পথ আটকালাম।

কিন্তু লোকটা ভারী একগুঁয়ে। দাড়িয়াবান্দা খেলার খেলুড়ির মতো সাঁ করে আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল এবং হাঁফধরা গলায় চেঁচাল, চলে আসুন। রান বয়, রান।

বুঝলাম এই স্বাস্থ্য-পাগল, দৌড়-মাতাল লোকটাকে নাগালে পেতে হলে ওটাই একমাত্র উপায়। কী যেন হয়ে গেল আমার মধ্যে। বোধহয় সেটা সাময়িক পাগলামিই। আমি লোকটার পিছু পিছু দৌড়তে লাগলাম।

অবশ্য জগিং জিনিসটা ঠিক দৌড় নয়। দৌড় এবং হাঁটার মাঝামাঝি। দৌড়-পায়ে হাঁটা আর কি।

লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম?

অভিজিৎ গাঙ্গুলি।

কী দরকার?

ইস্কুলের অঙ্কের ভেকেন্সিটার জন্য অসীমা দিদিমণি আমাকে পাঠিয়েছেন।

ও হোঃ, তুমিই অসীমার লোক তা হলে?

হ্যাঁ।

অসীমা বলেছিল আমাকে। মাস্টারি করতে চাও কেন?

চাকরি দরকার তাই।

এই অল্প বয়সে মাস্টারি করতে ভাল লাগবে?

আর কী করব?

মাস্টারির চাকরিতে অ্যাডভেঞ্চার নেই, থ্রিল নেই, টাকা নেই।

জানি।

অন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না?
আর কী?
বিপ্লব করো, তছনছ করো, ওলটপালট করে দাও সব কিছু।
স্কোপ নেই। পুলিশে ধরবে।
ধরুক না। সেটাও তো একটা অভিজ্ঞতা।
আমার বাড়িতে বড় অভাব।
কীরকম অভাব?
খুব অভাব।
ভাতের বদলে কখনও আটাগোলা খেয়েছ?
না তো?
ঘাস খেয়েছ কখনও?
না।
মেটে আলু খেতে কীরকম হয় জানো?
না।
কাপড় নেই বলে কোনওদিন গায়ে মাদুর জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছে?
না।
খড়ের বিছানায় শুয়েছ কখনও?
না।
তা হলে কেমন অভাব তোমাদের?
এ ছাড়াও তো অভাব আছে।
তুমি দারিদ্র্যের স্বরূপই এখনও দেখোনি।
আপনি দেখেছেন?
আমি দারিদ্র্যসীমার ওপারের লোক। একেবারের শেকড়ের কাছাকাছি থেকে উঠে আসতে হয়েছে। বড় কষ্ট।
আপনি হাঁফাচ্ছেন। এবার থামুন।
আরও দু' রাউন্ড। তারপর থামব। ভেবো না আমি হাঁফিয়ে পড়েছি।
কিন্তু আপনি তো হাঁফাচ্ছেন।
ওটা কিছু নয়। দৌড়োতে তোমার কেমন লাগে?
ভাল নয়। আমি বহুকাল দৌড়োইনি।
আর আমি চিরটাকাল কেবল দৌড়োচ্ছি।
তাই নাকি? দৌড়োচ্ছেন কেন?
দৌড়ে আসলে পালাচ্ছি।
আমি অবাক হয়ে বললাম, পালাচ্ছেন কেন?
পালাচ্ছি দারিদ্র্য থেকে, ক্ষুদ্রতা থেকে। রানিং বিয়ন্ড টাইম, বিয়ন্ড পভারটি, বিয়ন্ড এভরিবডি এলস। বুঝলে?
না, ভাল বুঝলাম না।
তুমি যথেষ্ট গরিব নও। যথার্থ গরিবও নও। হলে বুঝতে।
পালানোই কি গরিবের ধর্ম?
গরিবদের কোনও ধর্ম নেই, কোনও নিয়ম নেই। কেউ পালায়, কেউ নেতিয়ে পড়ে থাকে, কেউ রুখে উঠতে চায়।

সুন্দর একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় এসে পড়ি আমরা। বন্য একটি গোলাপ গাছের ডাল আমার জামা টেনে ধরে এবং ছেড়ে দেয়। লোকটাকে পিছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার একটা লোভ সংবরণ করে আমি বললাম, আপনি কি পলাতক?

লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে আর একবার আমাকে দেখে বলল, সামনে একটা নালা আছে। সাবধান।

নালাটা আমরা দু'জনেই সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করার পর লোকটা বলে, আমি দৌড়োতে ভালবাসি। ছেলেবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে, দৌড়োতে দৌড়োতে নিজেকেও ছাড়িয়ে যাই। বুঝলে?

না। এসব বোধহয় দার্শনিক কথাবার্তা!

লোকটা উদাস গলায় বলল, তা বলতে পারো। দার্শনিকতা তোমার ভাল লাগে না?

লাগে। তবে উদ্ভট দার্শনিকতা নয়।

উদ্ভট হবে কেন? বরং খুব সাধারণ দার্শনিকতা।

কীরকম?

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মানে গ্রেট সাকসেসেস অ্যান্ড গ্রেটার সাকসেসেস। নিজের যতটা সামর্থ্য আছে বলে তুমি ভাবো তার চেয়েও ঢের বেশি সামর্থ্য অর্জন করতে থাকাই হচ্ছে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

আমি খুব সাবধানে একটা ফুলগাছের কাঁটাওলা ডাল এড়িয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বললাম, তাও বুঝলাম না।

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতেই একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করল। হাঁফাতে হাঁফাতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া খুব শক্ত কাজ। কেননা হাঁফানোর সময় সবক'টা শ্বাসই দীর্ঘ হতে বাধ্য। কিন্তু লোকটা তার মধ্যেও একটা দীর্ঘতর শ্বাসের শব্দ কী করে বের করল সেইটেই রহস্য।

আমরা একটা পুকুরের ধার ধরে দৌড়োচ্ছি। চমৎকার কচুবন। মেলা ঢেঁকিশাক হয়ে আছে। জলের কাছ ঘেঁষে কলমির জঙ্গল। জলে শাপলাফুল। বাঁধানো ঘাট শ্যাওলায় ছেয়ে গেছে। বর্ষার জল কোথাও কোথাও পুকুরের পাড় উপচে মোরামের রাস্তা ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে। লোকটা এবং আমি তার ওপর দিয়ে ছপ ছপ করে দৌড়োতে থাকি।

দৌড়োতে দৌড়োতে লোকটা বলে, পোস্টটার জন্য আর একজন ক্যান্ডিডেট আছে। তোমার কোয়ালিফিকেশন কী?

বি এসসি অনার্স।

মেয়েটারও বোধহয় তাই। তবে সে আবার বি এড।

বি এড হওয়া কিছু শক্ত নয়।

তাই নাকি?— বলে লোকটা ফের ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একটু দেখে নিয়ে বলে, পৃথিবীর কোন কাজটা তোমার কাছে সবচেয়ে শক্ত মনে হয়?

বেঁচে থাকা।

তুমিও তো দেখছি দার্শনিক কিছু কম নও।

এটা দর্শন-টর্শন নয়। বেঁচে থাকাটাই ভারী শক্ত, বিশেষত আমাদের মতো গরিবদের পক্ষে।

কিন্তু আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি জেনুইন গরিব নও।

লোকটাকে পেছন থেকে ল্যাং মারার আর একটা লোভ সংবরণ করে আমি বললাম, কীরকম গরিব আপনার পছন্দ?

গরিবদের আমি পছন্দ করি কে বলল?

করেন না?

তাও বলছি না। তবে একটা লোক গরিব বলেই তাকে পছন্দ করতে হবে এমন কোনও শর্ত আমি মানি না। গরিব হওয়া খুব খারাপ।

আমার হাত পা রাগে একটু নিশপিশ করে উঠল। বললাম, আপনিও তো একদিন গরিব ছিলেন বলছেন। তাদের প্রতি আপনার সিমপ্যাথি থাকা উচিত।

লোকটা কলাগাছের ঝোপটা ডাইনে ফেলে এগোতে এগোতে বলল, আমি গরিব অবস্থায় চোর, মিথ্যেবাদী, নিমকহারাম, পরশ্রীকাতর এবং ধান্দাবাজ ছিলাম।

আমার একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, এখনও কি তাই নন? চেপে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা নিজেই বলল, হয়তো এখনও আমি তাই-ই আছি। তবে এসব দোষের উৎস ওই দারিদ্র্য।

আমি বললাম, বড়লোকেরা আরও বেশি মিথ্যেবাদী, আরও বড় চোর, আরও পরশ্রীকাতর এবং ধান্দাবাজ হয়।

এটাই শেষ রাউন্ড, বুঝলে। এই রাউন্ডে আমি একটু জোরে দৌড়োই।

আমি ধৈর্য হারিয়ে বলি, আপনি রাউন্ডটা শেষ করুন, আমি বরং গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আরে না, না। তুমি তো জানো না দূরপাল্লার দৌড়বাজরা কীরকম নিঃসঙ্গ আর একা। তাদের আনন্দ নেই, উপভোগ নেই, বিশ্রাম নেই, বন্ধু নেই, প্রেম নেই, আছে শুধু দৌড় আর দৌড়।

আপনি এত দৌড়োন কেন? অলিম্পিক যাবেন নাকি?

দূর বোকা ছেলে। দৌড়ের অর্থ এখানে অন্য। আমি যে জীবনযাপন করি সেটাই এক দূরপাল্লার দৌড়।

তা না হয় হল, কিন্তু আনন্দ, বিশ্রাম, বন্ধু বা প্রেম নেই কেন?

খসে পড়ে যে। যতই তুমি দৌড়োতে থাকবে ততই ওসব খসে পড়তে থাকবে। কোনও কিছুই তোমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে না। ক্রমে তুমি একা হয়ে যাবে, ভীষণ একা। ভারী ক্লান্ত বোধ হবে, কিন্তু থামলে চলবে না।

ও, ফের সেই দার্শনিকতা!

লোকটা ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল।

ধন্যবাদ।

তোমাকেও ধন্যবাদ। শেষ দুটো রাউন্ড আমাকে সঙ্গ দিয়েছ বলে।

আজকাল চাকরির জন্য লোকে সব কিছু করতে পারে।

সামান্য একটা মাস্টারির জন্য?

মাস্টারি আপনার কাছে সামান্য মনে হলেও, আমার কাছে অসামান্য।

আমারও এক সময়ে মনে হত আখের গুড়ের চেয়ে ভাল খাদ্য বুঝি আর কিছু নেই। এসো, এবার একটু জোরে দৌড়েই।

দাঁতে দাঁত চেপে আমি গোঁয়ার লোকটার সঙ্গে প্রায় সমান তালে দৌড়োতে লাগলাম। হ্যাঁ, লোকটা গোঁয়ার, একরোখা, খ্যাপাটে, নিষ্ঠুর ও উচ্চাভিলাষী। তবু লোকটাকে আমার খুব খারাপ লাগছিল না।

শেষ রাউন্ডটা জোরে দৌড়োতে হল বলে লোকটার দমে টান পড়েছিল বোধহয়। বেশি কথাটথা বলল না। দমে আমারও টান পড়েছিল। লোকটা কথা না বলায় বাঁচলাম।

ঘেমে হেদিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে যখন দু'জনে গাড়ি-বারান্দার তলায় পৌঁছোলাম তখন দেখি বারান্দায় একজন ভদ্রলোক ও একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্রলোক বিগলিত হাসি হেসে বলল, সকালে উঠে দৌড়োনো খুব ভাল অভ্যাস। সেই জন্যই না আপনার স্বাস্থ্যটি এমন ডগমগে।

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতেই আমাকে চোখ টিপে চাপা গলায় বলল, এসে গেছে। কমপিটিটার।

মেয়েদের দিকে তাকানোর কোনও মানেই আজকাল আর আমি খুঁজে পাই না। তবে অভ্যাসবশে তাকাই। গোরু কি পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্য উপভোগ করে? যতদূর জানি করে না। তবে তাকায়, আমিও আজকাল গোরুর মতো নির্বিকার চোখে মেয়েদের দেখি। তবে লোকটা "কমপিটিটার" বলায় আমি গোরুর চেয়ে আর একটু তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটির দিকে তাকালাম।

আগের দিনে গল্প উপন্যাসে নায়িকা বা স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনার একটা রীতি ছিল। আর তাতে কী বাড়াবাড়িই না থাকত। আজও পৃথিবীতে মেয়েদের রূপ একটা মস্ত বড় আলোচ্য বিষয়। এ থেকেই বোঝা যায়, মেয়েদের অস্তিত্বটা এখনও অনেকটাই শরীরকেন্দ্রিক। তাদের অন্যবিধ গুণাবলীকে এখনও পুরুষশাসিত সমাজ তেমন আমল দিচ্ছে না। তা এই মেয়েটির রূপ তেমন কিছু নয়। ফ্যালনাও বলছি না। একটু শ্যামলা ঘেঁষা রং। মুখখানায় লাবণ্য আছে। বেশ ঢলঢলে মাঝারি গড়ন, মাঝারি দৈর্ঘ্য। পরনে একটা সবুজ ডুরে শাড়ি। গলায় বড় বড় লাল পাথরের মালা, দুল, কপালে টিপ। হাতে দু' গাছা বালা। সাজপোশাক থেকেই মনে হয়, তেমন আধুনিক স্বভাবের নয়। মুখ-চোখও ভারী লাজুক আর সপ্রতিভ। একটু ভয়-ভয় ভাবও আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকাল। এইসব মেয়ের কাছে অপরিচিত যুবা মানেই সম্ভাব্য ধর্ষণকারী বা মহিলালোভী পেশাদার প্রেমিক।

লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, আরে সাতসকালেই জহরবাবু যে!

প্রতিমাকে নিয়ে এলাম। আপনি বলেছিলেন একবার নিয়ে আসতে।

ভালই করেছেন। ঘরে গিয়ে বসুন। আমি ধরাচূড়া ছেড়ে আসছি।— বলেই লোকটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বলল, তুমিও যাও। কমপিটিটারটিকে ভাল করে মাপজোক করে দেখো। হাই কমপিটিশন।

লোকটা দৌড়োতে দৌড়োতে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

না, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি পারিজাত নামক এই ধনতান্ত্রিক, শ্রেণিশত্রু শোষক ও উচ্চাভিলাষী লোকটিকে আমি তেমন অপছন্দ করতে পারছি না। লোকটি পাজি সন্দেহ নেই। শয়তান তো বটেই। অসাধুও নিশ্চয়ই। তবু লোকটার মধ্যে বেঁচে থাকার একটা স্পন্দন আছে। সেই স্পন্দন স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

জহরবাবু হাত কচলে বললেন, আপনি কি ওঁর কেউ হন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

একসঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন। দেখে মনে হল খুব ঘনিষ্ঠ।

আমিও যে চাকরিটার একজন উমেদার সেটা ওঁকে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে না পেরে একটু দোনোমোনো করলাম। তবে লুকিয়ে লাভও নেই। বলে দিলেই বরং ল্যাঠা চুকে যায়। তাই একটু হেসে বললাম, প্রাতঃভ্রমণ করছিলাম না। দৌড়োতে দৌড়োতে উনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন।

বলেন কী! কীসের ইন্টারভিউ?

শিবপ্রসাদ স্কুলে অঙ্কের মাস্টারির।

ওঃ।— বলে বিনীত, অমায়িক ও হাস্যময় জহরবাবু সহসা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমিও চাকরির ক্যান্ডিডেট জেনে প্রতিমা চকিতে আমার দিকে একটু দৃকপাত করল। সুযোগ পেলে সেও হয়তো তার এই কমপিটিটারকে একটু মাপজোক করত, কিন্তু জহরবাবু মেয়েকে সেই সুযোগ দিলেন না। অত্যন্ত বিরক্ত মুখে তিনি মেয়েকে "চল, চল, বসিগে। যত সব উটকো ঝামেলা..." বলে প্রায় হাত ধরে টেনে বাইরের ঘরে ঢুকে পড়লেন। লক্ষ করলাম, জহরবাবু মাঝে মাঝে ঘর থেকে খুনির চোখে আমাকে দেখছেন এবং মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে নিচু স্বরে একটা জরুরি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আলোচ্য বিষয় যে আমি তাতে সন্দেহ নেই।

বিপজ্জনক ঘরটিতে আর ঢুকলাম না। দৌড়োনোর পর আমার শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছিল।

আমি সিংহীদের বাগানটায় পায়চারি করতে করতে পাখির ডাক শুনতে লাগলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পর পারিজাত নামল। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, ঠোঁটে একটু বেসুরো শিস। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিচুস্বরে বলল, কমপিটিটারকে দেখলে?

দেখলাম। তবে আলাপ হয়নি।

কী মনে হল? পারবে কমপিটিশনে?

শুধু চোখে দেখেই কি তা বলা যায়?

তা হলে চলো। ফেস হার। মুখোমুখি বসে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করো। হাই কমপিটিশন।

লোকটা মজার সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি, লোকটাকে আমি তেমন অপছন্দ করতে পারছি না। কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে কমপিটিশনে নামতেও আমার রুচিতে বাঁধছে। আমি চাকরিটার উমেদার শুনে ওর বাবা এমন রিঅ্যাক্ট করল যে, পুরো ব্যাপারটার ওপরেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

আমি বিরসমুখে বললাম, হাই কমপিটিশন যে তা বেশ টের পাচ্ছি। তবে সেই কমপিটিশনে আমার নামবার ইচ্ছে নেই। চাকরি আপনি ওকেই দিন।

কেন বলো তো? মেয়েটাকে দেখে কি তোমার মন নরম হয়ে গেছে?

আমি একটু রাগের গলায় বলি, মোটেই নয়। আমি ক্যান্ডিডেট শুনে মেয়েটার বাবা আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

লোকটা হাসল। বলল, আরে দূর! তুমি বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল। আসলে জহরবাবু খুব সরল লোক। সরল লোকেরা নিজেদের মনের ভাব গোপন করতে পারে না। তোমাকে কী বলেছে?

আমি বললাম, কিছু বলেনি। কিন্তু অপমানজনক ভাবভঙ্গি করেছে।

ওঃ, এই কথা?— লোকটা খুব উদারভাবে হেসে বলে, আমি যে সমাজে জন্মেছি এবং বড় হয়েছি সেই সমাজে মিনিমাম গালাগালি কী ছিল জানো? শুয়োরের বাচ্চা। লোকের সঙ্গে লোকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরুই হত শুয়োরের বাচ্চা দিয়ে। সেই থেকেই অপমান-টপমানের বোধ আমার নষ্ট হয়ে গেছে। অপমানবোধ থাকা মানেই একটা ল্যাঠা, ওটা যত শিগগির চুকিয়ে ফেলতে পারো ততই মঙ্গল।

আমি তো আপনার সমাজে মানুষ হইনি।

সেই জন্যই তো বলছিলাম তুমি যথেষ্ট গরিব নও। এসো, এসো, ছেলেমানুষি কোরো না।

বেশ গম্ভীর মুখে এবং যথেষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে আমি লোকটার পিছু পিছু ঘরে ঢুকি। জহরবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক যেভাবে ক্লাসে মাস্টারমশাই ঢুকলে ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়। অবিকল মাস্টারমশাইয়ের গলায় লোকটা জহরবাবুকে বলল, বসুন, বসুন।

জহরবাবু বসলেন। আমার দিকে না তাকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু কৌতূহল যাবে কোথায়? কাজেই মাঝে মাঝে আমার চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার খুনির চোখ। প্রতিমার চোখেও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা, সংশয় ও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

জহরবাবু খুব বিগলিত মুখে লোকটাকে বলতে লাগলেন, আপনাকে বহুদিন ধরেই জীবনীটা লিখে ফেলতে বলছি, একদম গা করছেন না।

লোকটা উদাস গলায় বলে, কী হবে লিখে?

জহরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হবে হবে। আমার মতো গরিবরা দেশের সর্বহারারা আপনার জীবনী পড়ে লড়াই করতে শিখবে। আশা পাবে, ভরসা পাবে, শক্তি পাবে।

আমার তো অত সময় নেই।

জহরবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, তা জানি। আর সেইজন্যই প্রতিমাকে নিয়ে এলাম, ওর হাতের লেখা খুবই সুন্দর। গোটা গোটা ছাপার অক্ষরের মতো, বানান-টানান ভুল করে না, লেখেও

তাড়াতাড়ি। তাই বলছিলাম, ইস্কুলের কাজটুকু করেই চলে আসবেখন। আপনি নিজের জীবনের কথা বলে যাবেন, ও বসে বসে ডিকটেশন নেবে।

লোকটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। একটু চাপা গলায় বলল, হাই কমপিটিশন। বিডিং শুরু হয়ে গেছে। বি অ্যালার্ট।

আমি কুঁচকে রইলাম।

লোকটা জহরবাবুর দিকে চেয়ে বলল, জীবনীটা ছাপবে কে?

আমরাই ছাপব, দরকার হলে চাঁদা তুলব।

লোকটা হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, কিন্তু একটা মুশকিল আছে। আমি যে সমাজে মানুষ সে সমাজে অনেক নোংরামি, অনেক কলঙ্ক, অনেক লজ্জা। জীবনী লিখতে গেলে সেসব কথাও এসে পড়বে। খুবই খারাপ খারাপ কথা, সেসব লিখতে প্রতিমার মতো ভদ্র এবং যুবতী একটি মেয়ের অসুবিধে হবে না?

জহরবাবু একটা ঢোঁক গিলে আমার দিকে তাকালেন। নারদীয় চোখ। যেন-বা কথাটা আমিই পারিজাতকে প্রম্পট করেছি। তারপর বললেন, তাতে কী? পারবে। পারবি না প্রতিমা?

প্রতিমা পারবে কি না বোঝা গেল না। বাইরে হঠাৎ আবার তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। প্রতিমা সেই দিকে চেয়ে ছিল।

৫। পারিজাত

স্কুলের ঘণ্টা শুনলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ছেলেবেলায় একটা অবৈতনিক উদ্বাস্তু বিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। সেই স্কুলটার অবস্থা ছিল আমাদেরই মতো, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। পেতলের ঘণ্টা কেনার পয়সা ছিল না বলে রেল ইয়ার্ড থেকে কুড়িয়ে আনা একটা লোহার টুকরো আওয়াজ তোলা হত। সে আওয়াজের কোনও জোর ছিল না। স্কুলে বেশিদিন পড়া হয়ওনি আমার। পরিবেশের অমোঘ নির্দেশে আমরা ক্রমে ক্রমে রাস্তার ছেলে হয়ে যাচ্ছিলাম। পরবর্তীকালে আমার জীবনের গতিকে আমি পরিবর্তিত করি বটে, কিন্তু স্কুলের জন্য আজও আমার বুকে কিছু দীর্ঘশ্বাস সঞ্চিত আছে।

আজ ছুটির দিন বলে শিবপ্রসাদ স্কুলে কোনও ঘণ্টার শব্দ নেই। অবশ্য এই সাতসকালে ঘণ্টা বাজেও না। খুব সম্প্রতি আমি ছুটির দিনে স্কুলটায় আসি এবং কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াই বা বসে থাকি।

না, আমি কবি, ভাবুক বা আবেগপ্রবণ লোক নই। আমি যা করি তার পিছনে সর্বদাই অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ কারণ থাকে। ছুটির দিনে শিবপ্রসাদ স্কুলে আমার এই আগমনকে লোকে কী চোখে দেখবে জানি না। কিন্তু কারণটা আমার ব্যক্তিগত।

তটস্থ দারোয়ান ও দফতরিকে হাতের ইশারায় আমার অনুগমন করা থেকে নিবৃত্ত করে আমি প্রকাণ্ড স্কুলটা লম্বা ও প্রায় অন্ত বারান্দা করে বহু দূর পর্যন্ত হাঁটতে থাকি। ক্লাসঘরগুলোর দরজা বন্ধ। ভূতের বাড়ির মতো নিস্তব্ধ পরিবেশ। স্কুলের মাঝখানে মস্ত মাঠ, মাঠের ধারে ধারে বাঁশের বেড়া-দেওয়া চমৎকার বাগান। কমলা সেনের রুচি আছে। স্কুলে ঢুকলেই বোঝা যায়, ভারী ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন এর পরিবেশ। দেওয়ালে কোনও লেখা নেই, বারান্দা বা বারান্দার নীচের ঘাসে কোনও নোংরা নেই। থামের ধারে ধারে ময়লা ফেলার বাক্স সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এসব দেখতে আমি আসিনি। ক্লাস ফাইভের সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসে আমি বিশাল স্কুল-বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকি। মাঠের তিন দিক ঘেরা ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো মস্ত দোতলা বাড়ি। আমি এই স্কুলের সেক্রেটারি বটে, কিন্তু স্কুলটার সঙ্গে আমার কোনও ভাবগত

.গাযোগ নেই। আমি এই জায়গার লোক নই, এই স্কুলে কখনও পড়িনি। তাই এই স্কুলকে নিয়ে আমার কোনও সুখস্মৃতি নেই। সম্ভবত এই স্কুল বা পৃথিবীর অন্য কোনও স্কুলের প্রতি আমার তেমন কোনও দুর্বলতা বা ভালবাসাও নেই।

আমার না থাক, অসীমার আছে। আর সেই ভালবাসা কতটা গভীর এবং কতটা একনিষ্ঠ তা আমার জানা দরকার।

অসীমার আচরণের মধ্যে সম্প্রতি আমি কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছি। যে কোনও স্বাভাবিক মানুষের কাছেই পদোন্নতি একটি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। বিশেষ করে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হওয়াটা তো যে কোনও শিক্ষয়িত্রীর কাছেই শিকে ছেঁড়ার মতো ঘটনা। এই অত্যন্ত ভাল জাতের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হওয়ার স্বপ্ন অনেকেরই দেখার কথা। কিন্তু অসীমার মধ্যে সেই দুর্লভ ইচ্ছাপূরণজনিত কোনও আনন্দের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না।

কমলা সেনকে অসীমা বোধহয় একসময় খুবই শ্রদ্ধা করত এবং ভালও বাসত। কিন্তু সম্প্রতি কমলা সেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। না যাওয়ারই কথা। কমলা সেন আমাকে পছন্দ করেন না, আমার ভাবী স্ত্রীকেও তাঁর পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তবু এই কমলা সেনের পদত্যাগের কথায় অসীমা যেন তেমন স্বস্তি পাচ্ছে না। তার বদ্ধমূল ধারণা, কমলা চলে গেলে স্কুলের অবনতি ঘটবে। এমনকী সে ধরেই নিয়েছে, তার পক্ষে স্কুলের প্রশাসন ঠিক মতো চালানো সম্ভব নয়।

আমার সমস্যা অসীমাকে নিয়ে। আমি তাকে আর একটু জানতে চাই। আমার ভিতরে যে ক্যালকুলেটর যন্ত্রটি সব সময়েই নির্ভুল নির্দেশ দেয় সে যেন বলছে, অসীমার ভাবগতিক ভাল নয়। তার ভিতরে একটা বিদ্রোহের অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। যদিও আমার ধারণা সেই অঙ্কুরটি সম্পর্কে অসীমা নিজেও সচেতন নয়।

বস্তুত এই স্কুলে এসে এর পরিবেশটিকে আমি হৃদয়ঙ্গম করারই চেষ্টা করি। বুঝতে চেষ্টা করি, অসীমার প্রকৃত মনোভাবটি কী।

চিন্তাটা অবশ্য ঘরে বসেও করা যায়। কিন্তু স্কুলে এলে এমনটা এই পরিবেশে আরও সুনিশ্চিয়তার সঙ্গে তার ক্যালকুলেশন চালাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

ক্লাস ফাইভের সামনে সিঁড়িতে বসে আমি অসীমার শুষ্ক ও রুক্ষ মুখখানা স্পষ্টই মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, অসীমা ক্লাসের শেষে বারান্দায় বেরিয়ে এল। আনমনে বাগানের একটা দোলনচাঁপা গাছের দিকে চেয়ে দেখল একটু। সাদা সুন্দর নিষ্পাপ ফুল। তারপর একটু শিউরে উঠল সে। কুসুমে যে কীটও আছে। শিবপ্রসাদ স্কুলের হিসাবনিকাশ অন্তত সেইরকমই একটা আভাস দিচ্ছে। এই শুচিশুভ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘটছে নেপথ্যের লোভী হস্তাবলেপ। তার হয়তো সন্দেহ, সে হেডমিস্ট্রেস হওয়ার পর তার ভাবী স্বামী তাকে সামনে শিখণ্ডীর মতো রেখে তলায় তলায় স্কুলের ভিত ক্ষয় করে ফেলবে। কিন্তু তা হতে দেয় কী করে সে? এই স্কুলকে যে সে প্রাণাধিক ভালবাসে। প্রারম্ভিক প্রার্থনাসংগীত থেকে শেষ পিরিয়ডের ড্রিল পর্যন্ত তার কাছে যেন এক বিশুদ্ধ সংগীতেরই বিস্তার ও পরিণতি।

শিবপ্রসাদ স্কুলের প্রতিটি ইট কমলা সেনের মতোই তার কাছেও বুকের পাঁজর।

চোখ বুজে অসীমার মানসিকতার মধ্যে আমি এমন ডুবে ছিলাম যে আকস্মিক একটা আর্ত চিৎকারে প্রায় লাফিয়ে উঠতে হল।

পরমুহূর্তেই অবশ্য ভুল ভাঙল। চিৎকার নয়, গান। মনে ছিল না যে, রবিবার সকালে এই স্কুলে একটা গানবাজনার স্কুলের ক্লাস হয়।

আমি উঠে পড়লাম, উঠতে উঠতেই সিদ্ধান্ত নিলাম, অসীমার ওপর নজর রাখতে হবে। খুবই সতর্ক নজর রাখতে হবে। তার মানসিকতা এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই।

বেরিয়ে আসবার মুখে ফটকের কাছে একজন তানপুরাধারী লোক আমার পথ আটকাল।

দাদা! আমি হাল ছাড়িনি।

প্রথমটায় চিনতে পারিনি। মস্ত বাবরি চুল, গালে মাইকেলের মতো জুলপি, পরনে চুস্ত পায়জামা আর গায়ে দারুণ চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি। একটু ঠাহর করে দেখে তবে গন্ধর্বকে চিনতে হল।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। বললাম, না গন্ধর্ব, হাল ছাড়াটা ঠিকও হবে না। লেগে থাকো। গান কেমন হচ্ছে?

দারুণ! আজকাল কথা পর্যন্ত গান হয়ে বেরোতে চায়।

বাঃ! আর নাচ?

দুর্দান্ত। আজকাল আমার হাঁটাচলায় পর্যন্ত নাচের ছন্দ।

তোমার হবে গন্ধর্ব।

আপনার আশীর্বাদ।— বলে গন্ধর্ব আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, রুমার সঙ্গে আসানসোলের একটা ফাংশনে দেখা হয়েছিল।

তাই নাকি? কেমন বুঝলে?

পাত্তা দিচ্ছে না।

একদম না?

না, তবে আড়ে আড়ে দেখছে বলে মনে হল।

তুমিও লক্ষ রেখো, রুমা পাঁকাল মাছের মতো পিছল মেয়ে।

লক্ষ রাখার সময় কোথায়? খুব ভোরে গলা সাধি। সকালে যোগব্যায়ামের ক্লাসে যাই। দুপুরে কলেজ। বিকেলে জিমনাসিয়াম। সন্ধেবেলায় নাচের প্র্যাকটিস। ঠাসা প্রোগ্রাম।

আমি সভয়ে বলি, তুমি কি রুমাকে ভুলে যাচ্ছ গন্ধর্ব?

গন্ধর্ব একটু লজ্জা পেয়ে জিব কেটে বলে, তা নয়। তবে আগের মতো সব সময়ে রুমাকে নিয়ে ভাবার মতো সময় হয় না।

কিন্তু মনে পড়ে তো?

একটু-আধটু কি আর পড়ে না!

আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলি, বিরহের ভাবটা কেটে যাচ্ছে না তো গন্ধর্ব?

গন্ধর্ব আমতা আমতা করে বলে, তা কাটছে না। তবে আগের মতো তীব্রতা নেই।

সর্বনাশ! গন্ধর্বের কথা শুনে ও হাবভাব দেখে প্রায় মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা হয় আমার। রুমার বিরহ যদি ও হজম করে বসে থাকে তা হলে হয় রুমাকে অন্যপাত্র দেখতে হবে, নয়তো পাকাপাকিভাবেই আমার কাঁধে ভর করতে হবে। কোনওটাই অভিপ্রেত নয়। আমি ভীষণ উদ্বেগে ওর হাত দুটো ধরে ফেলার চেষ্টা করি। তবে ওর এক হাতে তানপুরা থাকার জন্য মোটে একটা হাতই নাগালে আসে আমার, অতি করুণ স্বরে আমি প্রশ্ন করি, গন্ধর্ব, রুমার জন্য তোমার বিরহের তীব্রতা কেন কমে যাচ্ছে? রুমাকে কি সুন্দর বলে মনে হয় না তোমার? বিবাহিত জীবনের স্মৃতিও কি তোমাকে হন্ট করে না?

গন্ধর্ব খুবই লজ্জা পেয়ে বলে, না না, ওসব ঠিকই আছে। তবে বিরহটা একটু ভোঁতা হয়ে গেছে বটে। আমার মনে হয় দাদা, দুনিয়ার অধিকাংশ বিরহের গল্পই বোগাস। ঠিক মতো ব্যায়াম করলে, গানটান গাইলে বা নাচলে এবং আসন করলে বেশিরভাগ বিরহই কেটে যেতে থাকে!

আমি তার সবল পেশিবহুল হাতখানা জড়িয়ে ধরে রেখেই মিনতির স্বরে বলি, তা হলে তুমি ব্যায়াম বা আসন কমিয়ে দাও গন্ধর্ব, অত নাচগানেরই বা দরকার কী পুরুষমানুষের?

গন্ধর্ব ম্লান একটু হেসে বলে, তা আর হয় না দাদা। ব্যায়াম আমার চোখের সামনে থেকে একটা কূপমণ্ডূকতার পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। নাচ আর গান খুলে দিয়েছে অন্য এক জগতের দরজা, জীবনটা কী যে ভাল লাগে আজকাল। পৃথিবীকে কত সুন্দর লাগে!

রুমাকে ছাড়াও?— করুণতর স্বরে আমি জিজ্ঞেস করি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গন্ধর্ব বলে, রুমাকে ছাড়াও।

কিন্তু এ তো ভাল কথা নয় গন্ধর্ব!

কিন্তু এ পথ আপনিই দেখিয়েছিলেন দাদা। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ব্যায়াম, নাচ বা গানে বিরহের ব্যথা সত্যিই কমে যায় বলে যদি জানতাম তা হলে কি আর সেই পথ দেখাতাম গন্ধর্বকে? মনে হচ্ছে, আমার অভ্যন্তরে স্থাপিত ক্যালকুলেটর মেশিনটা এই প্রথম একটা ঠিকে ভুল করে ফেলেছে।

আশপাশ দিয়ে গান ও নাচের ক্লাসের মেয়েরা যাচ্ছে। বেশ সুন্দরী সব মেয়ে। যেতে যেতে গন্ধর্বের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে। হাসছেও কেউ কেউ চেনার হাসি। আমি তাদের চোখে গন্ধর্বের প্রতি একধরনের সপ্রশংস গুণমুগ্ধতার ভাব লক্ষ করে শিউরে উঠি। ব্যায়াম করে গন্ধর্বর চেহারা খুলেছে। গানও বোধহয় সে খুবই ভাল গাইছে আজকাল। নাচও হয়তো মন্দ নাচছে না। মেয়েরা যদি গন্ধর্বকে পাত্তা দিতে থাকে তবে বোকা এবং আহাম্মক রুমাটা তো একেবারেই বেপাত্তা হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতেই একটি সুন্দরী মেয়ে এসে গন্ধর্বকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

খুবই বেকুবের মতো আমি বাসায় ফিরে আসি এবং ভাবতে থাকি।

আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্নই ছিল। হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। অঝোর বৃষ্টি। আমার চিন্তা রুমা থেকে দাঁড় বদল করে বৃষ্টির ঘরে গিয়ে বসল। বৃষ্টির লক্ষণ ভাল নয়। বন্যা হবেই। হবে কেন, বন্যা শুরুও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গাঁ গঞ্জে কিছু কিছু নিচু জায়গা ডুবে যাওয়ায় ছোটখাটো ইভ্যাকুয়েশনও শুরু হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই স্কুল-কলেজ বন্যার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। বন্যার্তরা এসে ভিড় করবে সেখানে। সরকারি রিলিফ পৌঁছোতে দেরি হবে আর তা করতে জনগণের নেতারা ছিঁড়ে খাবে প্রশাসনকে। তখন অবশ্যম্ভাবী ডাক পড়বে আমার। আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি। আমার কাছে গম, চাল, চিনি, জামাকাপড় সবই মজুত আছে রিলিফের জন্য। তবু একটু খিঁচ থেকেই যাচ্ছে। রিলিফ নিয়ে গোলমাল বেঁধেছিল গেলবারের আগেরবার। সরকারি গুদাম লুট হয়েছিল অধরের নেতৃত্বে। আমার ক্যালকুলেটর বলছে, নেতৃত্ব অধর এবারও দেবে। তবে এবার আর সরকারি গুদাম নয়। তার লক্ষ্য হবে আমার নিজস্ব গুদাম।

প্রতিপক্ষ হিসেবে অধর চমৎকার। শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান। বলতে কী, এই অঞ্চলে আমার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তার জন্যই খানিকটা আটকে আছে। আমাদের মধ্যে একটা শেষ লড়াই হওয়া দরকার। সেটা আসন্ন বলেই আমার অনুমান। এক আকাশে যেমন দুই সূর্যের স্থান নেই তেমনিই এই জায়গার পক্ষে দু'-দু'জন ধুরন্ধর একটা বিশাল বাহুল্য মাত্র। হয় তাকে উচ্ছেদ হতে হবে, নয়তো আমাকে।

অনেকেরই ধারণা অধরের প্রেস্টিজে হাত দেওয়া আর জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনো একই ব্যাপার। আমি অবশ্য এরকম কোনও বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই। দারিদ্র্যসীমার ওই রেলবাঁধটা ডিঙোতে গিয়ে আমাকে বহু উঁচু ও নিচুতে ঠোক্কর খেতে হয়েছে এবং বিবিধ জাতসাপের লেজ দিয়ে বে-খেয়ালে বহুবারই আমি কান চুলকে ফেলেছি। সেই জাতসাপগুলো এখনও বেঁচে আছে কি না আমি তা সঠিক জানি না। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। আসল কথা হল, সাপ যেমন মানুষের শত্রু, তেমনি মানুষও সাপের শত্রু। অন্যের দাঁত নখ দেখে অধিকাংশ মানুষই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, ভগবান তাদেরও যথেষ্ট দাঁত নখ দিয়েছেন।

সন্ধেবেলায় আমি একথাটাই গুণেনবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। গুণেনবাবু খুব মনোযোগী শ্রোতা নন। সাধারণত পণ্ডিত ও বক্তারা অন্যের কথা শুনতে ভালও বাসেন না। কিন্তু

আজ গুণেনবাবুকে খুবই অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। উনি আমার সব কথাতেই 'হুঁ' দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর বললেন, দাঁত নখের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। আবহমানকাল ধরেই মানুষ ও অন্যান্য পশু দাঁত নখ ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলেও একটা কথা আছে পারিজাত।

আমি মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ, ওরকম একটা কথা প্রায়ই আমার কানে আসে।

গুণেনবাবু একটু চিন্তিত মুখে বলেন, কানে তো আসে, কিন্তু কথাটার মানে জানো?

খুব ভাল জানি না।

সোজা কথা হল, দাঁত নখ যদি কোনওদিন ঈশ্বরের কৃপায় লোপাট হয়ে যায় তবে অন্য কথা। কিন্তু যতদিন মানুষের দাঁত নখ থাকবে ততদিন তারা সেটা ব্যবহার করতেও ছাড়বে না। আমাদের শুধু দেখতে হবে, মানুষ যেন অপ্রয়োজনে বা সামান্য কারণেই তা ব্যবহার না করে! শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল একটা আপসরফা মাত্র। দুর্বল ও সবলের মধ্যে একটা নড়বড়ে সাঁকো বাঁধার চেষ্টা। তবু সেই চেষ্টাটাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

আমি একটা হাই গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললাম, তা হবে।

গুণেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অধরের সঙ্গে তোমার যদি একটা শো-ডাউন হয়ই তবে সেটা হবে দুটো বিগ পাওয়ারের লড়াই আমাদের তাতে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। কিন্তু মনে রেখো, দুটো বড় শক্তির লড়াই যখন লাগে তখন কিছু উলুখাগড়ারও প্রাণ যায়। আমার ভয় সেখানেই।

আমি ভ্রু কুঁচকে নিজের নখ দেখতে লাগলাম।

উনি বললেন, অধর লোকটা খুব খারাপ নয় পারিজাত। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি তো। একটু মাথাগরম গা-জোয়ারি ভাব আছে বটে, কিন্তু মানুষের দায়ে দফায় ও সবার আগে গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। এই তো সেদিনও মেথরপট্টির একটা মড়া পোড়ানোর টাকা দিল, নিজে কাঁধে করে মড়া বইল পর্যন্ত। একসময়ে ওর নামই হয়ে গিয়েছিল এ শহরের রবিন হুড।

আমি বিনীতভাবেই বললাম, আমি জানি।

গুণেনবাবু একটু চাপা স্বরে বললেন, আমি বলছিলাম কি ওর সঙ্গে একটা মিটমাট করে নাও।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তো?

ধরো তাই।

তা হলে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারটা আপনি অধরবাবুকেও একটু বুঝিয়ে বলুন না।

গুণেনবাবু অসহায়ের মতো মুখ করে বললেন, মুশকিল হল, তুমি আমার হবু ভগ্নীপতি। তাই অধর ধরেই নিয়েছে যে, আমি তোমার পক্ষে। কাজেই সে আমার কথা কানে তুলছে না। কমলার ব্যাপারটাতেও সে খুব পারটারবড।

তা হলে আর কী করা যায় বলুন!

কমলা আর অধরের ব্যাপারটাকে আমি সাপোর্ট করছি না পারিজাত। আমি মানি, কোনও স্কুলের হেডমিসট্রেসের ব্যক্তিগত জীবনে কোনও কলঙ্ক থাকা উচিত নয়। তবু এতকাল এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য যখন করেনি তখন তুমিই বা হঠাৎ ময়লার গামলায় খোঁচা দিতে গেলে কেন?

আপনারা এতকাল ধরে একটা দুর্নীতি ও ব্যভিচারকে সমর্থন করে আসছেন কেন সেটা আমি আজও বুঝতে পারি না। হয়তো অধরকে আপনারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভয় পান এবং কমলা সেনের যোগ্যতা সম্পর্কে আপনাদের ধারণাও অনেকটাই অতিরঞ্জিত।

গুণেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন। আজ উনি তর্ক করার মুডে নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ। তবু বলি, তুমি যদি কিছু মনে না করো তবে আমি তোমার সঙ্গে অধরের একটা মিটমাট ঘটানোর শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

গুণেনবাবু মরা মাছের চোখের মতো এক ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, অধরের হাতে অনেক লোক আছে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আমি জানি অধরবাবুর হাতে অনেক লোক এবং গুন্ডাও আছে। তদুপরি তিনি হলেন লোকাল লোক, যাকে বলে ভূমিপুত্র। তিনি এখানকার রবিনহুডও বটে। শহরের বেশিরভাগ লোকেরই সমর্থন অধরের দিকে। এ সবই আমি জানি। আমি তাঁর সঙ্গে লাগতেও চাই না। কিন্তু একটা অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া উচিত বলে মনে করি।

গুণেনবাবু চুপ করে গেলেন। অবশ্য এবার চুপ করার অন্য একটা কারণ ছিল। ঘরের বাইরে ভেজা ছাতাটা বারান্দায় রেখে জহরবাবু গায়ের জল ঝাড়ছেন। মুখে বিগলিত হাসি।

এই একজন লোক যিনি এখনও নিরঙ্কুশভাবে আমার দলে। অবশ্য কতদিন ইনি আমার দলে থাকবেন তা বলা শক্ত। প্রতিমার চাকরিটা না হলে হয়তো চট করে দল বদলে ফেলবেন। এই যুগে দল বদলের একটা বীজাণু এসে গেছে।

জহরবাবু ঘরে ঢুকতেই গুণেনবাবু "চলি হে পারিজাত" বলে উঠে পড়লেন। আমি লক্ষ করলাম, গুণেনবাবু যাওয়ার সময় ভুল করে নিজের ছাতাটার বদলে জহরবাবুর ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছুই বললাম না। এই ছাতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে যদি দু'জনের মানসিকতারও একটু বদল হয়? হতেও তো পারে! দুনিয়ায় কি অঘটন আজও ঘটে না?

জহরবাবু বসে রুমাল দিয়ে ভাল করে মাথা মুছে বললেন, ওঃ! প্রতিমা তো সেই থেকে কেবলই আপনার কথা বলছে। যেমন সুন্দর চেহারাখানা, তেমনি অমায়িক ব্যবহার, প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

কথাটায় সত্যতা কত পারসেন্ট তা হিসেব করতে করতেও আমি বেশ খুশিই বোধ করলাম। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের আমি তেমন করে আকর্ষণ করার চেষ্টা কখনও করিনি বটে, কিন্তু কেউ আকৃষ্ট হয়ে থাকলে ভালই লাগে।

বললাম, তাই নাকি?

আর বলবেন না। দিনরাত শুধু আপনার কথা। আজ দুপুরে ওর মাকেও বলছিল, পারিজাতবাবু দরিদ্র অবস্থা থেকে যেভাবে ওপরে উঠে এসেছেন তা নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা যায়। আপনার জীবনী লেখার জন্য তো ও একেবারে মুখিয়ে আছে।

জহরবাবু সেই জীবনীপ্রসঙ্গেই আটকে আছেন। ওঁর মনটা হল খারাপ গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। যেখানে পিন আটকায় ঘুরেফিরে সেই জায়গাটাই বাজতে থাকে।

তবু এইসব কথাতেও আমি কেন যেন খুশি হচ্ছি। স্তাবকতা যে মানুষের কত বড় শত্রু! বেশ খোশ গলায় বললাম, তাই নাকি?

জহরবাবু হঠাৎ টেবিলে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বললেন, ওই ছোকরাটাকে আপনি জোটালেন কোথা থেকে বলুন তো!

আমি অবাক হয়ে বললাম, কোন ছোকরা?

ওই যে অভিজিৎ গাঙ্গুলি না কী যেন নাম।

আমিও চাপা গলায় বললাম, কেন বলুন তো!

আরে দূর! দূর! ও মাস্টারি করবে কী মশাই? ও তো ডেঞ্জারাস নকশাল।

তাই নাকি?

আরে হ্যাঁ, বলছি কী তা হলে? মউডুবির বঙ্কিম গাঙ্গুলির নাতি। বংশটাই গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপের। এ ছোকরা তো শুনি খুনটুনও করেছে।

কোথা থেকে শুনলেন?

খবর নিয়েছি আর কি! ও ছোকরা স্কুলে ঢুকলে স্কুল লাটে তুলে দেবে।
আমি গম্ভীর হয়ে বলি, তা হতে পারে। তবে ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল। হায়ার সেকেন্ডারিতে তিন বিষয়ে লেটার পেয়েছিল।
নির্বিকার মুখে মিথ্যে কথাটা বলে আমি জহরবাবুর রিঅ্যাকশন লক্ষ করতে লাগলাম। জহরবাবু অসহায়ভাবে নিজের ঠোঁট দুটো গিলে ফেলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, তিনটে লেটার!
তিনটে বলেই তো জানি।
টুকেছে তা হলে। বোমা বন্দুক বানিয়ে আর মানুষ খুন করে পড়াশুনোর সময়টা পেল কখন বলুন।
এই একটা ব্যাপার সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুব গভীর। তাই আমি খুব গম্ভীর হয়ে জহরবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনও পরীক্ষায় টুকেছেন?
আমি!— জহরবাবু থতমত খেয়ে বললেন, কী যে বলেন!
আমি মাথা নেড়ে বললাম, তা হলে আপনার একটা জিনিস জানা নেই। টুকে পাশ করা যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই লেটার পাওয়া যায় না। কারণ চোথা দেখে দেখে খাতায় তুলতে ডবল সময় লাগে। তার ওপর গার্ডের দিকেও নজর রাখতে হয়। যদি টোকার অভিজ্ঞতা থাকত তা হলে বুঝতেন, তিন ঘণ্টায় মেরেকেটে ত্রিশ-চল্লিশ নম্বরের ব্যবস্থা করা যায় বটে, কিন্তু কিছুতেই লেটার পাওয়া যায় না। তা যদি যেত তা হলে আমিও হায়ার সেকেন্ডারিতে সব ক'টা বিষয়ে লেটার পেতাম।
জহরবাবু আমার স্বীকারোক্তিতে ভারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আবার নিজের ঠোঁট দুটো গিলে ফেলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, তাই বুঝি?
আমি গলায় যতদূর সম্ভব বিষাদ মাখিয়ে বললাম, হ্যাঁ জহরবাবু, আমিও টুকেই পাশ করেছি। সবক'টা বিষয়ে।
জহরবাবু সজোরে গলা খাঁকারি দিয়ে চট করে লাইন পালটে বললেন, আপনার কথা আলাদা। একদিকে তীব্র দারিদ্র্য, অন্যদিকে সাঙ্ঘাতিক জীবন-সংগ্রাম। মরণপণ লড়াই। হয়তো ঘরে বাতি জ্বালাবার মতো কেরোসিন নেই, বই নেই, খাতা নেই, পেনসিল নেই। অথচ পাশ করতেই হবে। ওরকম কনডিশনে মশাই, আমার তো মনে হয় না টোকা অপরাধ।
আমি মোলায়েম গলায় বললাম, কথাটা প্রতিমাকে বলবেন।
কোন কথাটা?
আমি যে পরীক্ষায় টুকে পাশ করেছি সেই কথাটা। ও তো আমার জীবনী লিখবে, ওর এসব জানা দরকার।
খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জহরবাবু বললেন, বলব। কিন্তু দেখবেন, ও আপনাকে ভুল বুঝবে না। আপনার ওপর ওর শ্রদ্ধা এতই বেশি যে, আপনার প্রতিটি কাজের মধ্যেই ও একটা মহত্ত্ব দেখতে পায়। কিন্তু ওই অভিজিৎ ছোঁড়া সম্পর্কে আমার একটু খিঁচ থেকেই গেল। অতগুলো লেটার ও বাগালে কী করে? ওর হয়ে অন্য কেউ পরীক্ষা দেয়নি তো?
তা কী করে বলব? দিতেও পারে।
লেটার প্রতিমাও গোটাকয় পেত, বুঝলেন পারিজাতবাবু! কিন্তু আচমকা টাইফয়েড হয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। টাইফয়েড বড় সাংঘাতিক জিনিস। পরীক্ষার আগে মাস দুয়েক তো প্রতিমা বই খুলতেই পারত না। অক্ষরের দিকে তাকালেই মাথা ঝিমঝিম করত।
বটে! তারপর?
সে আর বলেন কেন? আমি গরিব মানুষ, তবু কষ্টেসৃষ্টে একজন ভাল মাস্টার রাখলাম। মাস্টার

পড়ত, প্রতিমা শুনত। কিন্তু ব্রেনটা ভাল বলে শুনেই মনে রাখতে পারত।

ওভাবেই পরীক্ষা দিল?

পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না সেবার মেয়েটার। বলেও ছিল, এক বছর ড্রপ দিয়ে পরের বছর পরীক্ষা দিলে গোটা তিন-চার লেটার পাবেই। তা আমি রাজি হলাম না। আবার বছরটাকের ধাক্কা।

আমি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, গরিবদের বড় কষ্ট।

বড় কষ্ট।— প্রতিধ্বনি করে জহরবাবু বলেন, একবছর নষ্ট করা কি আমাদের পোষায়? তবে মাস্টারটি পেয়েছিলাম চমৎকার। চালাকচতুর ছোকরা। সে ভরসা দিল, সব ম্যানেজ করে দেবে।

দিয়েছিল?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে জহরবাবু বললেন, তা দিয়েছিল বটে।

কীভাবে?

জহরবাবু ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বলেন, ওই আর কি!

আমি বুঝলাম এবং আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

জহরবাবু করুণ স্বরে বললেন, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। চোথা দেখে লিখলে পাশ করা যায় ঠিকই, কিন্তু লেটার পাওয়া যায় না। আপনি অতিশয় বিজ্ঞ মানুষ।

অভিজ্ঞও।— আমি বললাম।

প্রতিমার সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই আপনার আশ্চর্য মিল!

তাই নাকি?

প্রতিমাও বলছিল। আপনার ডান গালে একটা তিল আছে। ওরও তাই।

আমি ডান গালে হাত বুলিয়ে বললাম, আছে নাকি? লক্ষ করিনি তো!

জহরবাবু একটু হেসে বললেন, নিজেকে আর আপনি কতটুকু লক্ষ করেন? আপনার হচ্ছে হাতির মতো দশা। হাতি যদি বুঝতে পারত যে সে কত বড় তা হলে তুলকালাম বাঁধিয়ে দিত। কিন্তু নিজেকে তো সে দেখে না। তাই বলছিলাম, আপনার দেখাশোনারও একজন লোক দরকার।

জহরবাবুর ইঙ্গিতটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। কিন্তু মনে হল, উনি কিছু বলতে চাইছেন। গভীর ও গোপনীয় কিছু।

আমি বিনীতভাবে বললাম, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

উনি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, বিপত্নীকদের ভারী অসুবিধে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

শুণেনবাবুর বোন অবশ্য ভাল মেয়ে। তবে বড্ড রুগ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জহরবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, প্রতিমা নিজেই আপনার কাছে আসবে। আপনার জীবনের কথা জানতে খুবই আগ্রহ ওর। বলছিল, পারিজাতবাবুর কাছে গিয়ে বসে থাকলেও জ্ঞানলাভ হয়।

আমি বিনীতভাবে চুপ করে রইলাম। অঝোর বৃষ্টির মধ্যেই অন্যমনস্ক এবং উত্তেজিত জহরবাবু ভুল ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে নিষেধ করলাম না।

ঘরে বসে আমি বাইরের বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে অনেক কিছু ভাবলাম। আমার মন পাখির মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে যায়, কিছুক্ষণ বসে, আবার ওড়ে। গুণেনবাবু, অধর, প্রতিমা... বৃষ্টি...

রাতে খাওয়ার টেবিলে রুমার সঙ্গে দেখা। খুবই সন্তর্পণে দূরত্ব বজায় রেখে আমি বসলাম এবং অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমাদের দারিদ্র্যের দিনে বাস্তবিকই আমরা প্রকৃত অর্থে ছোটলোক হয়ে গিয়েছিলাম। খুব অল্প বয়সেই আমরা সবরকম খারাপ কথা ও গালাগাল শিখি এবং তা প্রয়োগ করতে শুরু করি। একথাও

ঠিক যে, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরুই হত "শুয়োরের বাচ্চা" দিয়ে। কালক্রমে অবশ্য আমি সেইসব শব্দকে সংযত ও সংহতভাবে প্রয়োগ করতে শিখেছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে প্রয়োগ করি না। অনভ্যাসে বহু তীক্ষ্ণ গালাগাল ভুলেও গেছি। কিন্তু রুমা কেন যেন ভোলেনি। যথেষ্ট সংস্কৃতির চর্চা করা সত্ত্বেও ওর মধ্যে সেই নর্দমার বস্তিযুগের ঘরানা এখনও বেঁচে আছে। রেগে গেলেই রুমা সেই নর্দমার মুখটি খুলে দেয়। তখন আর ভদ্রতার লেশমাত্র থাকে না। সেই ভয়ে আমি কোনও সময়েই ওকে চটাই না। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওকে এবার একটু সাবধান করে দেওয়াও দরকার। গন্ধর্ব যদি সত্যিই ওর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হলে আমার বিপদ।

আমি অন্যদিকে চেয়ে থেকেও ওর মুড বুঝবার চেষ্টা করলাম। মনে হল, মুড খুবই ভাল। এত বৃষ্টিতে তা-ই হওয়ার কথা।

সাবধানে বললাম, গন্ধর্বর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।

রুমা একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। পাতাটা ঝটাং শব্দে উলটে দিয়ে বলল, দেখা হতেই পারে।

আমি একটু ফাঁক দিয়ে বললাম, ওর অনেক ফ্যান হয়েছে দেখলাম।

রুমা ঝটাং করে আর একটা পাতা উলটে দিল। বলল, তাই নাকি? কীসের ফ্যান, নাচ না গান না ব্যায়াম?

তা কে জানে! মনে হল তিন রকমেরই।

ঠোঁট উলটে রুমা বলল, দু' চোখে দেখতে পারি না। মাগো। গায়ে গিল গিল করছে গোল গোল মাংসপিণ্ড! তার ওপর আবার পুরুষ হয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচ, গলা কাঁপিয়ে গান! ওয়াক!

আমি ভারী অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলাম। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, তোর পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু বেশ সুন্দরী সব মেয়ে জুটে গেছে ওর চারধারে।

রুমা সশব্দে ম্যাগাজিনটা টেবিলে ফেলে দিয়ে, চেয়ারটা এক ধাক্কায় ছিটকে ঘর থেকে পটাং পটাং চটির শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল।

রেগে গেছে। হয়তো রাতে খাবেও না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করি।

৬। অভিজিৎ

দাদুর সঙ্গে বসবাস করতে গেলে যে মনোভাব এবং চালচলনে অভ্যস্ত হতে হয় তা আমার সহজে হবে না। সন্ধের এবং বিশেষ করে রাতের দিকে একটু বইপত্র না পড়লে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু দাদুর ঘরে বাতির জোগাড় নেই। সরু অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মোম সম্বল। তাতে না হয় আলো, না হয় তার আয়ু বেশিক্ষণ।

দাদুর কাণ্ড শুনে ফুলমাসি হেসে গড়াগড়ি খেলেন কিছুক্ষণ। তারপর তেল ভরে প্রায়-নতুন একটা হ্যারিকেন দিয়ে বললেন, এটা জ্বালিয়ে নিস। কাল যখন আসবি নিয়ে আসিস, আবার তেল ভরে চিমনি মুছে দেব।

দাদুর ঘরের অন্ধকারটা সেই হ্যারিকেনের দাপটে পিছু হটল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা কাচের আলমারি-বন্দি পুরনো কিছু বই আছে। প্রায় সবই পড়া। বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল থেকে অনেকেই আছেন। আমি পুরনো প্রবাসীর একটা বাঁধানো খণ্ড নিয়ে বসে গেলাম।

দাদু বার দুই এসে হ্যারিকেনটা দেখলেন। তারপর থাকতে না পেরে বললেন, কে দিল? গণেশের বউ নাকি?

হ্যাঁ।

তেল পাচ্ছে কোথায়? মহিমের দোকানে এসেছে বুঝি?

কেন, আপনার লাগবে? গণেশকাকাকে বললেই এনে দেবে।

দাদু ঠোঁট উলটে বললেন, তেল দিয়ে কী করব? হ্যারিকেনই নেই। পুরনো দু'-তিনটে যা-ও ছিল সব ভেঙে গেছে।

তা হলে তো কথাই নেই।

হ্যারিকেনটা তো বেশ মজবুত দেখছি। ব্রিটিশ আমলে জার্মান হ্যারিকেন পাওয়া যেত। ছেঁচো জিনিস, বহুদিন চলত। এখনকার দিশিগুলো বড্ড হালকা পলকা।

সে জিনিস আর কোথায় পাবেন?

আজকাল হ্যারিকেনের দাম কত হয়েছে বলো তো!

যেমন জিনিস তেমন দাম। তবে পনেরো-ষোলো টাকার নীচে বোধহয় পাওয়া যায় না।

ও বাবা। এত? দিনে-কালে হল কী?

সেই কথাই তো সবাই বলাবলি করে আজকাল।

একটু আগে ধুপ করে একটা শব্দ হল শুনেছ?

না তো।

হয়েছে। পুরনো পাকঘরের পিছনের গাছটা থেকে নারকোল পড়ল।

ও।

একবার যাও না। নিয়ে এসো।

এত রাতে!

রাত কোথায়? হ্যারিকেনটা নিয়ে যাও। নইলে সকালে ফুলকুড়ুনিরা এসে নিয়ে যাবে। রোজ নিয়ে যায়।

যাক না। একটা নারকোল গেলে যাবে।

রোজ একটা দুটো করে গেলে বছরে কতগুলো যায় হিসেব করেছ?

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, বাইরে তো এখন এক হাঁটু জল।

তোমাকে বলতাম না। আমি নিজে রাতবিরেতে চোখে দেখি না। পড়ে-টড়ে গেলে মুশকিল।

একটা টর্চ দিন।

টর্চ কীসে লাগবে! হ্যারিকেনটা নিয়ে যাও।

গত দু'দিনে দাদুকে আমি প্রায় চার বস্তা নারকোল বিক্রি করতে দেখেছি। গড়পরতা এক-একটার দর পাঁচ সিকে। চার বস্তায় কম করেও শ খানেক নারকোল হবে। দাদুর আয় সে হিসেবে মন্দ নয়। তবু একটা টর্চ কিনবেন না। কিংবা হয়তো আছে, বের করবেন না।

অগত্যা হ্যারিকেনটা নিয়ে বেরোতে হল। একটু আগেই বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু আকাশ গোঁ গোঁ করছে। দাপটের সঙ্গে বইছে বাতাস। হ্যারিকেনের শিখা লাফাতে লাগল।

দাদু তাঁর মোটা বেতের লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা সঙ্গে নিয়ে যাও। লতা-টতা অবশ্য এই দুর্যোগে বেরোয় না। তবে হেলে ঢোঁড়া আছে। সঙ্গে লাঠি রাখা ভাল।

দাদুর অনুমান যে নির্ভুল তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। এই বাড়ির সঙ্গে দাদুর সমস্ত সত্তা এমন জড়িয়ে গেছে যে, ঘরে বসে থেকেও একটা অদৃশ্য অ্যানটেনা দিয়ে কোথায় কী ঘটছে তা টের পান।

পুরনো রান্নাঘরের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে বাস্তবিকই নারকোলটা পাওয়া গেল। সেটা বগলদাবা করে ফেরার সময় আমার কিন্তু বিরক্তিটা রইল না। কেমন যেন একটা মায়া জন্মাল। নিজের বাড়ি, নিজের জমি, নিজেদের দখলি গাছপালা, এর একটা আলাদা ব্যাপার আছে। সব কিছুই পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না, কলকাতায় আমরা এরকমটা ভাবতেই পারি না। সেখানে কান চুলকোনোর জন্যও পয়সা দিতে হয়।

ঘরে এসে দাদুর হাতে নারকোলটা দিতেই উনি নেড়ে দেখলেন, জলের শব্দ হচ্ছে কি না। তারপর চৌকির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার চাকরির কী হল?

এখনও কিছু হয়নি।

হবে মনে হয়?

না হওয়ারই কথা। আর একজন লোকাল ক্যান্ডিডেট আছে।

কে বলো তো!

জহরবাবু নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ে।

জহর বাঁড়ুজ্জে নাকি?

হতে পারে। পদবিটা জানি না।

ইরিগেশনে এক জহর আছে জানি। তার মেয়ে কি তোমার চেয়ে বেশি পাশ?

হ্যাঁ। বি এড।

দাদু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তা তুমি এতদিন ঘরে বসে কোন ভেরেন্ডা ভাজছিলে? বি এডটা পাশ করতে পারোনি?

তখন কি জানতাম যে মাস্টারি করব?

তা বলে একটা মেয়ে তোমাকে লেখাপড়ায় ডিঙিয়ে বসে থাকবে, এ কেমন কথা?

ডিঙিয়ে বেশিদূর যায়নি। তবে একটা পাশ বেশি করেছে বটে।

তবে?

আপনি উতলা হচ্ছেন কেন? পারিজাতবাবু এখনও আমাকে না করেননি।

কী বলেছে?

গণেশকাকা খোঁজ রাখছেন। যা বলার ওঁকেই বলবে।

আবার ডেকে পাঠাবে বলছ?

পাঠাতেও পারে।

চাকরি তোমার একটা হওয়া দরকার। যদি এখানে থাকতে পারো তো খুব ভাল।

দেখছি কী হয়।

ঘরে বসে সময় না কাটিয়ে একটু পারিজাতের কাছে যাতায়াত করলেও তো পারো।

তদবির করতে বলছেন?

উপায় কী? তদবির বরাবরই করতে হত। এখনও হয়।

ওসব আমি ভাল পারি না।

পারতে হয়। তুমি এখানে থেকে চাকরি করলে শেষ বয়সে আমাকে আর বাস্তুভিটে বিক্রি করতে হয় না। তুমিই সব দেখেশুনে রাখতে পারবে।

চেষ্টা তো করছি।

তুমি চেষ্টা করছ না। একে কি চেষ্টা বলে?

আমার হয়ে গণেশকাকা করছেন।

গণেশটা এমনিতে ভাল লোক, কিন্তু কথায়-বার্তায় পোক্ত নয়। ও কি পারবে? তুমি নিজেই কাল একবার যাও। রোজই যাও। ওতে ব্যাপারটা ভুল পড়বে না। তোমাকে দেখলে মনে পড়বে।

মেয়েটার বাবা খুব তেল দিচ্ছে।

দেবেই। চাকরির যা বাজার। তুমি কাল সকালেই যাও। একটা মেয়ের কাছে হেরে এসো না।

দাদু কথাটা ভুললেন না। ভোর না হতেই আমাকে ঠেলে তুলে দিলেন, ওঠো, ওঠো, বেলা হয়ে যাবে। এইবেলা বেরিয়ে পড়ো।

জ্বালাতন আর কাকে বলে। তবে উঠতেও হল।

পারিজাতবাবুকে গিয়ে আমি কী বলব তা আমার মাথায় এল না। অনিচ্ছুকভাবে ধীরে ধীরে চারদিক দেখতে দেখতে আমি সাইকেল চালাতে থাকি।

চারদিকে আজ অবশ্য জল ছাড়া প্রায় কিছুই দেখার নেই। সাইকেলের চাকা সিকিভাগ জলের তলায়। খানা-খন্দে পড়ে ঝফাং ঝফাং করে লাফিয়ে উঠছে। কোথাও থকথকে আঠালো কাদায় পড়ে থেমে যাচ্ছে ঘচাৎ করে। আমার প্যান্টের নিম্নাংশ গুটিয়ে রাখা সত্ত্বেও কাদায় মাখামাখি হল। একজোড়া হাওয়াই চপ্পল ধার দিয়েছে ফুলমাসি। সেও কাদা থেকে টেনে তুলতে গিয়ে একটা স্ট্র্যাপ ফচাক করে খুলে গেল।

এসব আমার অভ্যাস নেই বটে, তা বলে খুব খারাপও লাগছে না। এই গাঁয়ে আমার জন্ম। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এক দুরারোগ্য আকর্ষণ থাকবেই। তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাক বা না থাক। এই গাঁয়ের আরও একটা আকর্ষণ ফুলমাসি। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ যুক্তিসিদ্ধ নয়। আমি তাঁর জামাই হতে পারতাম। কিন্তু হইনি। তবু আমার প্রতি তাঁর এক দুর্জয় দুর্বলতা। কারণটা আমি কখনও খুঁজে দেখিনি। যাকগে, কিছু জিনিস না জানলেও চলে যায়। হয়তো না জানাই ভাল।

সকালে যখন সাইকেলটা চাইতে গেলাম তখন ফুলমাসি চা আর তার সঙ্গে রুটি বেগুনভাজা খাওয়ালেন। খেতে খেতে একসময়ে বলেই ফেললাম, খুব তো আদর দিয়ে মাথায় তুলছ। পরে বুঝবে।

কী বুঝব রে?

যদি চাকরি পাই তো পাকাপাকি আস্তানা গাড়তে হবে এখানে। তখন রোজ জ্বালাতন হয়ে বলবে, অভীটা গেলে বাঁচি।

তাই বুঝি! তুই তো হাত গুনতে জানিস।

আমি মাথা নেড়ে বলি, পাকাপাকিভাবে থাকলে দাম কমে যাবে।

মাসি ঝগড়ার গলায় বলল, সে যদি কমেই তা হলে বরং তোর কাছেই আমার দাম কমবে। তখন বন্ধু হবে, বান্ধব হবে, আড্ডা হবে, মাসি মরল কি বাঁচল কে তার খোঁজ করে। আর যদি বিয়ে করিস তবে তো আর কথাই নেই। বছর ঘুরলেও বাছা আর এমুখো হবে না।

এসব অবশ্য কথার কথা। সবকিছুই নির্ভর করছে একটা জিনিসের ওপর, চাকরিটা আমার হবে কি হবে না। জহরবাবু তাঁর মেয়েকে ঢোকানোর জন্য যে পন্থা নিয়েছেন তা যদি সফল হয় তবে আমার হওয়ার চান্স নেই। কিন্তু পারিজাত লোকটিকে আমার বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছে। লোকটা জহরবাবুর ফাঁদে পা দেবে বলে মনে হয় না। যদি প্রতিমা আর আমার মধ্যে ওপেন কমপিটিশন হয় তবে আমার চান্স কিছু বেশিই। প্রতিমা বি এড, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার রেজাল্টটা একটু ভাল। চাকরিতে এই পরীক্ষাটার রেজাল্টই গুরুত্ব পায় বেশি।

বড় রাস্তায় উঠে দেখি, বহু লোকজন জড়ো হয়েছে। রাস্তার উল্টোদিকের মাঠেও বহু লোক। চাংড়াপোঁতার বাঁধের ওপর সারসার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে লাঠি-সোটা। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব চারদিকে।

একজন চায়ের দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হে মোড়ল, গণ্ডগোল নাকি?

লোকটা আমায় চেনে। বলল, চাংড়াপোঁতার লোকেরা বাঁধ কেটে দিতে এয়েছিল। তাই সবাই বাঁধ পাহারা দিচ্ছে।

ইরিগেশনের খালের ওপাশে চাংড়াপোঁতা। জায়গাটা আমি চিনি। ওখানকার ঝিঙে খুব বিখ্যাত। বললাম, বাঁধ কাটতে চায় কেন? ওপাশে জল নাকি?

খুব জল। চাংড়াপোঁতায় শুধু বাড়িঘরের চালটুকু দেখা যাচ্ছে, আর সব জলের তলায়।

আমি একটু শিউরে উঠলাম। বাঁধ কেটে দিলে মউডুবি চোখের পলকে সাগরদিঘি হয়ে যাবে। ঘরে বুড়ো দাদু।

আমি দোকানিকে বললাম, মারদাঙ্গা লাগলে আমাকে খবর দিয়ো। আমিও জুটে যাব'খন। পাহারা দিতে হলে তাও দেব।

লোকটা হেসে বলল, দরকার হবে না। আমরা তো আছি। সকলেরই জান কবুল।

লাশ-টাশ পড়েছে নাকি?

আজ্ঞে না।

আমি খানিকটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে রওনা হলাম। মনে মনে একটু হাসিও পাচ্ছে। আমরা কত না স্বার্থপর! চাংড়াপোঁতা ডুবুক, মউডুবি না ডুবলেই হয়। অন্যে মরছে মরুক, আমরা বেঁচে থাকলেই হয়। এই স্বার্থপরতাই এখন ভারতবর্ষের জীবন-বেদ। আমরা তার মধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছি। আমাদের জ্যেষ্ঠরা এর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের শেখাতে পারেননি।

অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চাংড়াপোঁতা থেকে খাল পার হয়ে একটা ছেলে স্কুলে পড়তে আসত। তখনও চাংড়াপোঁতায় স্কুল হয়নি। সেই ছেলেটা ছিল বিশু। আমার খুব বন্ধু। একবার তার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর নেমন্তন্ন খেয়েছিলাম।

কে জানে বিশু এখনও বেঁচে আছে কি না। না থাকার কথা নয়। কিন্তু আজকাল আমার বয়সি ছেলেদেরও বেঁচে থাকা সম্পর্কে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। অবশ্য বিশু বেঁচে থাকলেও যে চাংড়াপোঁতাতেই আছে এমন নয়। আবার থাকতেও তো পারে!

একবার ইচ্ছে হল, সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে চাংড়াপোঁতার দিকটা দেখে আসি। তারপর ভাবলাম, থাক। কী দরকার? কিছু ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকাই ভাল।

আজ বৃষ্টি নেই। মেঘ-ভাঙা একটু রোদও উঠেছে। গাছপালা আর ভেজা মাটির গন্ধ ম ম করছে। আমি বুক ভরে দম নিলাম। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে কিছু লোক গাছতলায় বসে গেছে। ইটের উনুনে রান্না চাপিয়েছে কেউ কেউ। কিছু লোক পায়ে হেঁটে চলেছে শহরের দিকে। বুঝতে অসুবিধে নেই, আশপাশের নিচু জায়গাগুলো জলে ডুবেছে।

ডুববেই। বহুকাল ধরে এ দেশের নদীগুলির কোনও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার হয়নি। অধিকাংশ নদীখাতই পলি পড়ে পড়ে অগভীর হয়ে এসেছে। এক ঢল বর্ষার জলও বইতে পারে না। নিকাশি খাল সংখ্যায় অপ্রতুল। প্রতিবছর তাই কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর অবধি প্রায় সব জেলাই ভাসে। বছরওয়ারি এই বন্যা সামাল দেওয়া কিছু শক্ত ছিল না। চাংড়াপোঁতার দিককার বাঁধ যদি যথেষ্ট শক্ত-পোক্ত হত তা হলে গ্রামটা ভেসে যেত না। আমি জানি, খরার সময় ওই সেচখাল শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। আর ভারী বর্ষা হলে সেই খালই হয় বানভাসি।

সাইকেল নিয়ে আমি সারা শহর কয়েকবার টহল দিলাম। বলতে কি পারিজাতের বাড়ি হানা দিতে আমার একটু লজ্জা-লজ্জাই করছে।

গণেশকাকার দোকানে নামতেই গণেশকাকা বলেন, পারিজাতবাবুর বাড়ি হয়ে এলি?

না। এখনও যাইনি।

সর্বনাশ! উনি যে একটু আগে জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি হেসে বললাম, তাড়া কীসের?

গণেশকাকা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেন, তাড়া নেই মানে! জহরবাবু পিছনে জোঁকের মতো লেগে আছে তা জানিস? কাল রাতেও গিয়েছিল পারিজাতবাবুর কাছে। আজ সকালে অসীমা দিদিমণির দাদা গুণেন এসে বলে গেল। এই দেখ, জহরবাবুর ছাতা।

গণেশকাকা কাচের আলমারির তলা থেকে একটা বাঁশের ডাঁটওলা পুরনো ছাতা বের করে বিজয়গর্বে আমাকে দেখালেন।

কিন্তু জহরবাবুর ছাতা দেখেও আমি উত্তেজিত হলাম না। শুধু নিরুৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ওটা পেলেন কোথায়?

কাল পারিজাতবাবুর ওখানে গুণেনবাবুর সঙ্গে জহরবাবুর দেখা হয়েছিল কিনা। ভুল করে গুণেনবাবু জহরবাবুর ছাতাটা নিয়ে এসেছিল। আমাকে দিয়ে গেলেন ফেরত দেওয়ার জন্য।

আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বলি, আপনি ফেরত দেবেন কেন? অন্যের ফাই-ফরমাশ খাটা কি আপনার কাজ?

গণেশকাকা অতি উদার একটু হাসলেন। বললেন, এটুকু করা কি আর ফাই-ফরমাশ খাটা রে? ফেরার সময় জহরবাবুর বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাব, পথেই পড়বে। গুণেনবাবুর সময় ছিল না।

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, বরং আমাকেই দিন। দিয়ে আসি।

তুই দিবি? তা ভাল কথা।

ছাতা ফেরত দেওয়াটা আমার ছুতো মাত্র। জহরবাবু বা তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার আর একবার মুখোমুখি হওয়া দরকার। মেয়েটার চাকরি কতখানি দরকার তা আমি জানতে চাই। যদি বুঝি ওদের প্রয়োজন আমার চেয়েও বেশি তা হলে আমি চাকরিটা ছোঁব না।

গণেশকাকার নির্দেশমতো জহরবাবুর বাড়ি পৌঁছোতে আমার সময় লাগল সাইকেলে মিনিট দেড়েক। বাড়িটা খুবই পুরনো, জীর্ণ এবং ছোট। বাগানের বেড়া ভেঙে পড়েছে বৃষ্টিতে। প্রকাণ্ড একটা গোরু ঢুকে ফুলগাছ খেয়ে নিচ্ছে আর প্রতিমা একটা ছাতা নিয়ে সেটাকে তাড়ানোর অক্ষম একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। বাড়ির সামনে আমাকে নামতে দেখেই সভ য়ে ছাতাটা পিছনে লুকিয়ে ফেলে একদম স্ট্যাচু হয়ে গেল।

আমি বললাম, চিনতে পারছেন? আমি আপনার প্রতিপক্ষ।

প্রতিমা ভারী লজ্জা পেল। আটপৌরে পোশাকে তাকে আজ মন্দ লাগছে না দেখতে। সাজগোজ বেশি না করলেই যে মেয়েদের বেশি সুন্দর লাগে এই সত্যটা মেয়েরা কখনওই বোঝে না।

প্রতিমা সামান্য একটু হেসে বলল, চিনব না কেন? আসুন।

আপনার বাবা বাড়ি আছেন?

না। বাবা অফিসে গেছেন।

আমি ছাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলি, এটা উনি কাল পারিজাতবাবুর বাড়িতে ফেলে এসেছেন। নিন।

প্রতিমা তার পিছনে লুকনো ছাতাটা বের করে চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা! তাই আমি ভাবছি, বাবার ছাতায় আমি যে নামের আদ্যক্ষর সাদা সুতো দিয়ে তুলে দিয়েছিলাম সেটা কোথায় গেল।

আমার ছাতা বিনিময় করলাম। সেইসঙ্গে হৃদয় বিনিময়ও হয়ে গেল কি না বলতে পারব না। তবে এই সময়ে প্রকাণ্ড গোরুটা একটা কলাবতী ফুলের গাছ মুড়িয়ে মসমস করে খাচ্ছিল। আমরা সেটা দেখেও দেখলাম না।

হাঁস যেমন গা থেকে জল ঝাড়ে প্রতিমা তেমনি লজ্জাটা ঝেড়ে ফেলে খুব স্মার্ট হয়ে গেল। বলল, আসুন, গরিবের বাড়ি চা খেয়ে যান। কষ্ট করে এসেছেন।

প্রতিমারা বাস্তবিকই গরিব। ঘরের দেয়ালে বহুকাল কলি ফেরানো হয়নি। বর্ষায় নোনা ধরে গেছে। বাইরের ঘরে তিনটে টিংটিঙে বেতের চেয়ার আর একটা ছোট্ট চৌকি। দেয়ালে কিছু সূচিশিল্প, একটা নেতাজির ছবিওলা ক্যালেন্ডার আর গোবরের চাপড়ার ওপর তিনটে কড়ি লাগানো। দরজা জানলা বড়ই নড়বড়ে। একটা জানলার পাল্লায় ছিটকিনি নেই, তার বদলে পাটের দড়ি লাগানো।

কারা বেশি গরিব, প্রতিমারা না আমরা, তা ভাবতে ভাবতেই প্রতিমা ভিতরবাড়ি থেকে এক পাক ঘুরে এসে আমার মুখোমুখি চৌকিতে বসল।

চাকরিটা আপনারই হবে!— বলল সে।

কেন?

আমার তেমন ইচ্ছে নেই।

তাই বা কেন?

আমি পারিজাতবাবুর জীবনী-টীবনী লিখতে পারব না। বাবা ভীষণ বোকা। কেবলই আমাকে খোঁচাচ্ছে, পারিজাতবাবুর জীবনী লিখতে। বলুন তো, এসব করতে সম্মানে লাগে না?

আমি বললাম, জীবনী লেখার কথাটা আমিও সেদিন শুনেছি। ব্যাপারটা কী বলুন তো! এত লোক থাকতে হঠাৎ পারিজতাবাবুর জীবনী লেখার কী দরকার পড়ল?

আমারও তো সেই প্রশ্ন। বাবাকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু বাবা কেবল বলে, লোকটা অহংকারী। জীবনী লেখার কথা শুনলে খুশি হয়।

হয় নাকি?

তা কে জানে। আমি লোকটাকে ভাল চিনি না। তবে শুনেছি, পারিজাতবাবু ভাল লোক নন।

আমিও ওরকমই শুনেছি। তবে লোকটাকে আমার খুব খারাপ লাগেনি।

কিন্তু লোকটা খারাপই। ওর বউ আত্মহত্যা করেছিল জানেন?

তাই নাকি?

বিষ খেয়ে। সবাই বলে ওটা খুন।

তদন্ত হয়নি?

কে জানে! হলেও পারিজাতবাবুকে ধরা সহজ কাজ নয়।

আপনি জানেন, খুন?

তা-ই তো সবাই বলে।

যাঃ। ওসব গুজব। বুদ্ধিমান লোকেরা কখনও বউকে খুন করে না।

তা হলে কী করে?

ডিভোর্স করতে পারে। খামোকা খুন করতে যাবে কেন?

খামোকা মোটেই নয়। ওর বউ অনেক গোপন খবর রাখত। সেগুলো ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল বলেই একদিন বেচারার জলের গেলাসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাঝরাতে ঘুমের চোখে সেই জল খেয়ে মেয়েটা মরে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপন খবরটা কী রাখত ওর বউ?

পারিজাতবাবুর অনেকরকম বে-আইনি কারবার আছে তো। সেইসব।

আমি পা নাচিয়ে লঘু স্বরে বললাম, তা হলে আর পারিজাতের দোষ কী? গোপন খবর ফাঁস করতে চাওয়াই তো অন্যায়। আইনে ওটাকে বলে ব্ল্যাকমেল।

প্রতিমা বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে, আপনি ওকে সাপোর্ট করছেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ওকেও করছি না, ওর বউকেও করছি না। মনে হয় ব্যাপারটা হয়েছিল শঠে শাঠ্যং।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, পারিজাত খুন করতে পারে না এমন নয়। অতিশয় উচ্চাশাসম্পন্ন, অহংকারী ও যশপ্রতিষ্ঠালোভী লোকের পক্ষে কাজটা অসম্ভবও নয়। কিন্তু পারিজাতকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় না যে, সে খুন-টুন করেছে। লোকটার ক্ষুরধার বুদ্ধি। এ যদি কখনও খুন করে তবে এমন সূক্ষ্ম পন্থায় করবে যাতে তার ওপর লোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবে না।

প্রতিমা অবশ্য তর্কের গলায় বলল, মোটেই শঠে শাঠ্যং নয়। পারিজাতবাবুর বউ ছিল দারুণ সুন্দরী আর খুব শিক্ষিতা।

আমি প্রতিমাকে একটু জ্বালাতন করার জন্যই বললাম, তাতে কী? সুন্দরীই তো গণ্ডগোল করে বেশি। হয়তো তার গোপন প্রেমিক ছিল।

মোটেই নয়।

খুনটা কি এখানে হয়েছিল?

না। কলকাতায়।

তা হলে এত ডিটেলস জানলেন কী করে?

শুনেছি।

শোনা কথার ফিফটি পারসেন্ট বাদ দিতে হয়।

চা নিয়ে এলেন প্রতিমার মা। ভারী রোগা-ভোগা মানুষ। পরনে মলিন একখানা শাড়ি। প্রণাম করার সময় ওঁর পায়ে হাজা লক্ষ করলাম। লাজুক মানুষ। চা দিয়ে শুধু বললেন, তোমরা বসে গল্প করো। বলেই চলে গেলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বুঝলাম, প্রতিমারা বাস্তবিকই গরিব। অত্যন্ত বাজে সস্তা চা-পাতায় তৈরি ক্বাথটি আমি প্রতিমার সুশ্রী মুখখানা দেখতে দেখতে খেয়ে নিলাম। ওই অনুপানটুকু না থাকলে চা গলা দিয়ে নামত না।

পারিজাতের বউকে ছেড়ে প্রতিমা অন্য প্রসঙ্গ তুলল, আচ্ছা, হায়ার সেকেন্ডারিতে আপনি নাকি দারুণ রেজাল্ট করেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে বলল?

সব জানি। চারটে লেটার। আপনি কি নকশাল ছিলেন?

ও বাবা! অনেক জানেন দেখছি!

জানিই তো। লোকে বলে আপনি ডেনজারাস ছেলে ছিলেন।

আমি বললাম, ডেনজারাস জেনেও বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াচ্ছেন?

আপনাকে দেখে মোটেই ডেনজারাস মনে হয় না।

তা হলে কী মনে হয়?

বললাম তো, ডেনজারাস মনে হয় না।

সেটা তো নেতিবাচক গুণ। অস্তিবাচক কিছু বলুন।

মোটে তো আলাপ হল। ক'দিন দেখি, তারপর বলব।

আমি একটু হতাশার গলায় বললাম, দেখবেন কী করে? আমি তো কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যাব।

কেন, ফিরে যাওয়ার কী হল? চাকরি তো পাচ্ছেনই।

চাকরিটা বরং আপনিই করুন। স্কুলের চাকরির সঙ্গে পারিজাতের জীবনী লেখার পার্টটাইম জব। ভালই হবে।

হঠাৎ প্রতিমার মুখখানা ফ্যাকাসে দেখাল। কথাটা বলা হয়তো ঠিক হয়নি। প্রতিমা কিছুক্ষণ মন দিয়ে নিজের হাতের পাতা দেখল। তারপর বলল, একটা মেয়ে বেকার থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা ছেলে বেকার থাকলে ভারী কষ্ট।

কথাটা শুনে মেয়েটাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভাল লেগে গেল। সুস্থির চিন্তা ও স্নিগ্ধ মন ছাড়া এরকম সিদ্ধান্তে আসা বড় সহজ নয়। বিশেষ করে তেমন মেয়ের পক্ষে, যে দরিদ্র পরিবারে মানুষ হয়েছে এবং সংসারের প্রয়োজনেই যার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে চাকরিটা পাওয়া দরকার। আজকাল অনেক বড়লোকের বউ বা মেয়ে স্কুল, কলেজ, অফিসের নানা চাকরি দখল করে বসে আছে। তাদের অর্থকরী প্রয়োজন নেই। নিতান্ত সময় কাটানো বা গৃহ থেকে মুক্তিই তাদের উদ্দেশ্য। এরা যদি জায়গা ছেড়ে দিত তা হলে এই গরিব দেশের অনেকগুলো পরিবার বেঁচে যেত।

প্রতিমার এই কথায় ভিতরে ভিতরে একটা আবেগের চঞ্চলতা অনুভব করছিলাম। সেটার রাশ টেনে একটু উদাস গলায় বললাম, আপনার মতো করে তো সবাই ভাবে না।

প্রতিমা মাথা নিচু করে হাসিমুখে বলল, আমার এমনিতেও চাকরিটা হত না। আমার হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট ভাল নয়।

কিন্তু আপনি যে বি এড, নতুন আইনে বি এড ছাড়া নাকি কাউকে চাকরি দিচ্ছেই না।

আপনাকে দেবে। শুনেছি আপনি অসীমাদির ক্যান্ডিডেট।

আপনি অনেক কিছু শোনেন তো!

প্রতিমা সরল হাসিমুখে বলে, আমার চাকরির জন্য বাবা এত বেশি অ্যাংশাস যে, আপনার সম্পর্কে সব খোঁজ খবর নিয়েছেন। আজ ভোরবেলা কোথা থেকে ঘুরে এসে আমাকে বললেন, তোর হবে না রে। ওই ছেলেটা অসীমার ক্যান্ডিডেট।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আপনি যা শোনেন তার ফিফটি পারসেন্ট বাদ দেবেন। আমি অসীমাদির ক্যান্ডিডেট নই। উনি আমাকে ভাল করে চেনেনও না। তবে একজন মিডলম্যান কিছু তদবির করেছিল। তাতে তেমন কিছু কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ অসীমাদি খুবই অন্যমনস্ক আর বিমর্ষ ছিলেন সেদিন। আমার হয়ে উনি খুব একটা লড়ালড়ি করবেন না। ওঁর বোধহয় মুড নেই।

লড়ালড়ি করতে হবে না। উনি একবার বললেই হবে। পারিজাতবাবুর কাছে অসীমাদির প্রেস্টিজই আলাদা।

আপনি তা হলে আমার কাছে হেরেই বসে আছেন!

হারতেই যখন হবে তখন আগে থেকে হার মেনে নেওয়াই ভাল।

আমি একটা বড় শ্বাস ফেলে বললাম, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।

কী আন্দাজ করেছিলেন?

আপনি একটু সেকেলে। এখনকার মেয়েরা চাকরির জন্য জান লড়িয়ে দেয়।

জান লড়িয়েও আমার লাভ নেই। অসীমাদির ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে পারব কেন!

আপনার বাবাও কি হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনার মতো?

এ কথায় প্রতিমা খুব লজ্জার হাসি হেসে বলল, বাবা একটু কীরকম যেন আছে। কে যেন বাবার মাথায় আইডিয়া দিয়েছে যে, চাকুরে মেয়েদের ভাল বর জুটে যায়।

আমি বললাম, কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। বিবাহযোগ্য যুবকেরা এখন ওয়ার্কিং গার্লই প্রেফার করছে। এখনও ভেবে দেখুন লড়বেন কি না।

লড়ার ইচ্ছে থাকলে আর এতক্ষণ বসে আছি! বাবা বলে গেছে, আজ সকালে যেন পারিজাতবাবুর কাছে একবার যাই। উনি নাকি ডেকেছেন। কিন্তু আমি যাইনি।

গিয়ে কী হত?

তা কে জানে! পারিজাতবাবুর হয়তো কিছু জানার ছিল।

প্রতিমার জন্য আমার একটু দুশ্চিন্তা হতে লাগল। পারিজাতের বাড়িতে ওকে পাঠানোর পিছনে জহরবাবুর কোনও অদ্ভুত উদ্দেশ্য নেই তো! থাকলেও অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। প্রতিমা আমার কেউ নয়, জহরবাবুরই আত্মজা। ওর ভালমন্দ উনিই বুঝবেন। তবু মনটায় একটা খিচ থেকেই গেল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, পারিজাতের সঙ্গে অসীমা দিদিমণির বিয়ের কথা কি একদম পাকা?

ওমা! পাকা নয়তো কী?— খুব অবাক হয়ে প্রতিমা বলে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, বিয়েটা যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ কিছুই বলা যায় না। হয়তো কোনও কারণে বিয়েটা ভেঙে গেল।

কী কারণ?

ধরুন যদি সে কারণ আপনিই হন!

আমি?— প্রতিমা আকাশ থেকে পড়ে বলে, আমি কীসের কারণ? যাঃ!

কথাটা হঠকারিতাবশে বলে ফেলে আমি একটু বিপদেই পড়লাম। প্রতিমা সিধে-সরল মানুষ। বোধহয় সহজেই ঘাবড়েও যায়। মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি সাহস করে বললাম, আপনিই বলেছিলেন পারিজাত ভাল লোক নয়, খুন করারও অভ্যাস আছে। ওর কাছে কোনও যুবতী এবং সুন্দরী মেয়ের কি একা যাওয়া ভাল?

প্রতিমার মুখের আহত ভাবটা রয়েই গেল। বলল, কিন্তু আপনি তো সে ইঙ্গিত করেননি। একটা খুব বাজে কথা বলেছেন। কেন বললেন?

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, মনে হল, তাই বললাম।

প্রতিমা অত্যন্ত অকপটে বলল, আপনি খুব খারাপ।

আমার চেয়েও খারাপ লোক আছে।

প্রতিমা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। ওর চোখে টলটল করছে জল। তবু আমার মনে হচ্ছিল, কথাটা বলে আমি ওর উপকারই করেছি। সরল মেয়ে, হয়তো দুনিয়ার প্যাঁচ খোঁচ তেমন ভাল জানে না। যদি আমার কথায় সচেতন ও সতর্ক হয় তবে ভালই হবে।

কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে বাইরে চেয়ে থেকে হঠাৎ সে আমার দিকে তাকাল। বলল, আমার চাকরির আর দরকার নেই। তাই পারিজাতবাবুর কাছে যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু পারিজাতবাবুর কাছে গেলেই যে মেয়েরা বিপদে পড়ে একথা আপনাকে কে বলল? ওঁর কাছে নানা কাজে কত মেয়ে যাচ্ছে।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, আহা, কথাটা অত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন?

কথাটা আপনি বললেন কেন তা হলে?

আর বলব না।

আপনি ভীষণ খারাপ।— বলতে বলতে প্রতিমা উঠে দাঁড়াল এবং কোনও কথা না বলেই ভিতরবাড়িতে চলে গেল হঠাৎ।

কী আর করা! বেকুবের মতো মিনিটখানেক বসে থেকে আমি ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রতিমাকে একটা কথা বলে আসার সুযোগ হল না। নইলে আমি বলতাম, আমি খারাপ বটে, কিন্তু আপনি ভাল। বেশ ভাল। এরকম ভাল থাকারই চেষ্টা করবেন।

সিংহীবাড়িটা পেরোনোর সময় খোলা ফটক দিয়ে দূরে গাড়িবারান্দার কাছে একটা জিপগাড়ির মুখ দেখতে পেয়ে আমি ব্রেক কষি। পারিজাত হয়তো কোথাও গিয়েছিল, ফিরেছে। নয়তো কোথাও যাবে। আমি খুব কিছু চিন্তাভাবনা না করে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে খোলা ফটক দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

ভিতরে ঢুকে দেখি, একটা নয়, দুটো জিপ এবং একটা অ্যামবাসাডর গাড়িবারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গাড়িতেই ত্রিসিংহ মার্কা দেখলাম। অর্থাৎ সরকারি গাড়ি।

আজ সিঁড়ির মুখেই দারোয়ান। আমি সাইকেল গাড়িবারান্দার তলায় থামাতেই সে বলল, এখন দেখা হবে না। জরুরি মিটিং হচ্ছে।

বাইরের ঘরের দরজা আঁট করে বন্ধ। বেশ হাই লেভেলের গুরুতর সলাপরামর্শ হচ্ছে নিশ্চয়ই। আমি একটু উগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ভিতরে কে কে আছে?

দারোয়ানটা এমনিতে হয়তো আমাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু সেদিন সে বোধহয় সকালে আমাকে পারিজাতের সঙ্গে দৌড়োতে দেখেছে। আমাদের ঘনিষ্ঠতা কতটা তা আন্দাজ করা তার পক্ষে মুশকিল। একটু ইতস্তত করে সে বলল, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আর ফুড অফিসার। আরও কয়েকজন আছে।

আমি সাইকেলটা গাড়িবারান্দার ধারে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বললাম, ঠিক আছে, মিটিং শেষ হোক। আমি বাগানে অপেক্ষা করছি।

দারোয়ান কিছু বলল না।

সিংহীদের বাগান বরাবর আমাকে আকর্ষণ করত। আজও করে। পারিজাতকে ধন্যবাদ যে, বাগানটায় সে হাত দেয়নি। যেমন ছিল প্রায় তেমনই রেখে দিয়েছে। অলস পায়ে আমি বাগানটায় ঘুরতে লাগলাম। সিংহীরা কাঁকর বালি আর কী কী সব মিশিয়ে বাগানের তলায় জলনিকাশি ব্যবস্থা করেছিল। এই ভারী বর্ষাতেও তাই বাগানে তেমন জল দাঁড়ায়নি। তবু চটিজোড়া ভিজে যাচ্ছিল। হাওয়াই চটি ভিজলেই পিছল হয়ে যায়। হাঁটতে অসুবিধে বোধ করে আমি একটা কুঞ্জবনে ঢুকে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। রোদটাও বড্ড চড়চড় করছে।

হাতের কাছে যে কুঞ্জবনটা পাওয়া গেল সেটায় ঢুকেই থমকে যাই। ভিতরের আবছায়ায় একটা মেয়ে বসে আছে। সেই মেয়েটিই, যে আমাকে সেদিন মোটেই আমল দেয়নি। কিন্তু মেয়েটি কেমন যেন গা ছেড়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে বসে আছে। চোখদুটো বোজা। আমাকে টের পায়নি। কুঞ্জবনে ঢুকবার মুখটায় দাঁড়িয়ে আবছায়াতেই আমি মেয়েটিকে লক্ষ করি। সম্ভবত ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। মুখে এক ধরনের লালসা ও নিষ্ঠুরতা আছে। স্বভাব যে উগ্রতা ওর মুখের ছাঁটকাট দেখেই বোঝা যায়। এসব মেয়েরা শরীরকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি সম্পর্কে পর পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিই। আমার একটুও ভয় করছিল না। কারণ ভয় জিনিসটা আমার সহজে হয় না। মেয়েদের সম্পর্কেও আমার অনাবশ্যক ও বাহুল্য কোনও স্পর্শকাতরতা বা সংকোচ নেই। কেউ আমাকে অপমান করতে পারে ভেবেও আমি অস্বস্তি বোধ করি না। এক কথা, আমি বিস্তর অপমান হজম করতে পারি। দ্বিতীয়ত, পালটা অপমান করতেও আমি পিছপা নই।

মেয়েটি তাকাল, কিন্তু চমকাল না। সম্ভবত খুব গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। সেই ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে পুরোপুরি ফিরে আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল। তারপর আমাকে দেখল মেয়েটি এবং কিছুক্ষণ চেনার চেষ্টা করল। তারপর অত্যন্ত নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করল, এখানে কী চাই?

এই প্রশ্নটার জবাব তৈরি করার জন্য আমি অনেকটা সময় পেয়েছি। কিন্তু জবাবটা তৈরি হয়নি। সাদামাটা জবাব দিয়ে লাভও নেই। মেয়েটি কিছু অদ্ভুত। সাধারণ মেয়েরা এরকম পরিবেশে অচেনা কাউকে আচমকা দেখলে চমকায় এবং 'কে' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এ মেয়েটা একটুও চমকায়নি বা 'কে' বলে চেঁচায়নি। বরং অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করেছে 'এখানে কী চাই।' এই প্রশ্নের মধ্যেই দুটো বক্তব্য রয়েছে। এক হল, এটা তোমার জায়গা নয়। দ্বিতীয় হল, এখানে এসে তুমি অন্যায় করেছ, কেটে পড়ো।

এসব অভদ্র মেয়ের কাছে বিনীত হওয়ার কোনও মানেই হয় না। আমি পালটি দেওয়ার জন্যই কুঞ্জবনটায় ঢুকে চারধারে খুব কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, আরিব্বাস! দারুণ জায়গা তো! একেবারে কুঞ্জবন!

মেয়েটা নিশ্চয়ই এরকম ব্যবহার আশা করেনি। বড় বড় চোখ করে অপলকে আমাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, এটা বাইরের লোকেদের জন্য নয়। আপনি বারান্দার বেঞ্চে গিয়ে বসুন।

আমি বোকার মতো বললাম, কেন, এখানেও তো দিব্যি বেঞ্চ আছে! এখানে বসা যায় না!

মেয়েটা যথেষ্ট রেগে যাচ্ছে। কিন্তু দুম করে কোনও বোমা ফাটল না। খুব হিসেবি চোখে আমাকে মাপজোক করল কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা গলাতেই জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পাগল? দেখছেন তো, আমি এখানে বসে আছি।

আমি বোকা ও সরল সেজে বললাম, আপনি কি এ বাড়ির লোক?

হ্যাঁ। কেন?— ভ্রু কুঁচকে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

আমি ক্যাবলার মতো হেসে বললাম, ও, তাই বলুন। নইলে অত চোটপাট করবেনই বা কেন? আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম, আপনিও বুঝি আমার মতো কোনও কাজে এসেছেন পারিজাতবাবুর কাছে।

আমার বোকা ও সরল ভাবটা বোধহয় বিশ্বাস করল মেয়েটা। একটু ভিজলও মনে হয়। গলা এক পর্দা নামিয়ে বলল, উনি আমার দাদা। আপনার ওপর কি আমি খুব চোটপাট করেছি?

আমি ক্যাবলা ভাবটা ধরে থেকেই ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, তাতে কিছু না। যেখানেই যাই সেখানেই লোকে ধমক চমক করে কথা বলে আজকাল। তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

আপনাকে সবাই ধমকায় বুঝি?— মেয়েটা এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসে।

আমি হেঁ হেঁ করতে করতে বলি, আজকালকার যুগটাই পড়েছি অমনি। কারও মেজাজ ঠিক নেই।

মেয়েটা একটু সরে বসে পাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে বলল, বসুন!

আমি বসলাম।

আগের দিন মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর দেখিনি। আজ বসবার সময় কাছাকাছি হতে আচমকা মনে হল, সিঁথিতে লালমতো কী যেন একটু দেখা গেল। সিঁদুরও হতে পারে, বা লিপস্টিক কিংবা কুমকুম জাতীয় কিছু, যা আজকালকার বিবাহিতা মেয়েরা সিঁদুরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে ভালবাসে।

সরল এবং বোকা সাজার কতগুলো সুবিধে আছে। মেয়েটা যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকে যে, আমি নিতান্তই হাবাগোবা গোছের, তা হলে আমি যতই অনভিপ্রেত প্রশ্ন করি না কেন, চটবে না।

আমি বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ফেলে বললাম, আপনি কি এ বাড়িতেই থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনার বিয়ে হয়নি?

মেয়েটা শব্দ করে হাসল। তারপর বলল, কেন, হাতে পাত্র আছে নাকি?

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। মেয়েটা চটছে না। বোকা বলেই ধরে নিয়েছে। অপ্রতিভ ভাব করে বললাম, আজ্ঞে না। কত বড় মানুষ আপনারা। বড় বড় সব পাত্র আসবে আপনাদের জন্য।

মেয়েটা চুপ করে কুঞ্জবনের আবছায়ায় আমাকে একটু দেখল। তারপর বলল, আপনাকে দেখে তো খুব বোকা মনে হয় না!

আমি জিব কেটে বললাম, কী যে বলেন! গাঁয়ের লোক, বোকা ছাড়া আর কী?

আপনার কোন গাঁ?

মউডুবি আজ্ঞে। বেশি দূর নয়।— বলেই মনে মনে ভাবলাম, অতি অভিনয় হয়ে যাচ্ছে না তো! এত আজ্ঞে আজ্ঞে করে যারা কথা বলে তারা আমার মতো পোশাক পরে না।

দাদার কাছে আপনার কীসের কাজ?

আমি মাস্টারির কথাটা চেপে গেলাম। কারণ সেটা বললে আবার লেখাপড়ার কথাটাও উঠে পড়বে। বললাম, এই ছোটখাটো যা হোক একটা কিছু কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছি। পারিজাতবাবুর তো মেলা জানাশুনো।

গাঁয়ের ছেলে, চাষবাস করেন না কেন?

জমিই নেই।

কী হল?

বিক্রিবাটা, জবর দখল এসব নানারকম হয়ে বেহাত হয়ে গেছে।

চলে কী করে?

চলছে না বলেই তো হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছি।

লেখাপড়া কতদূর?

ওই স্কুলটা কোনওরকম ডিঙিয়েছিলাম।

বয়স তো বেশি নয়। পড়লেই তো পারেন।

আর পড়ে কী হবে? শুধু পয়সা খরচ। পড়ে কাজও পাওয়া যায় না।

মেয়েটা আলস্যের বশে একটা হাই তুলে বলল, বেশি লেখাপড়া অবশ্য আমিও পছন্দ করি না। তবে গ্র্যাজুয়েটটা হলে চাকরির অনেক সুযোগ আসে।

আমি হেসে বললাম, গ্র্যাজুয়েট হতে একটু এলেম লাগে।

আপনার সেটা নেই?

না। আমার মাথাটা চিরকালই একটু মোটা।

মেয়েটা খুশিয়াল একটা খিকখিক হাসি হেসে বলল, আমারও তো মাথা মোটা। লেখাপড়া আমারও বেশিদূর হয়নি।

আমি উদাস গলায় বললাম, আপনাদের তো দরকার করে না। টাকা আছে।

মেয়েটা বড় বড় চোখে অবাক ভাব ফুটিয়ে বলে, কে বলল দরকার করে না? লেখাপড়া না শিখলে ভাল বর জোটে না তা জানেন?

আমি নিশ্চিন্তির গলায় বললাম, আপনার মতো সুন্দর মেয়েদের আবার বরের ভাবনা!

ও বাব্বা! কমপ্লিমেন্ট দিতেও জানেন দেখছি! খুব বোকা তো নন।

ঠিক বোকা নয়, তবে গেঁয়ো বটি। রাগ করলেন না তো!

ওমা! প্রশংসার কথায় রাগ করব কেন?

আমি উদাস গলায় বলি, আজকাল ভাল কথাতেও অনেক মেয়ে চটে যায়। গেলবার শীতকালে একবার বাসে বাসেরগঞ্জে যাচ্ছিলাম। একটা সুন্দরমতো মেয়ে দেখি হাতকাটা ব্লাউজ পরে জানলার ধারে বসা। বেশ ঠান্ডা হাওয়াও মারছিল সেদিন। অনেকক্ষণ দেখে থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, দিদি, আপনার শীত করছে না? ও বাবা, এমন রেগে গেল এই মারে কি সেই মারে!

বানিয়ে বলা। মেয়েটা তবু ক্ষীণ একটু হাসল। বলল, ছেলেদেরও অনেক দোষ আছে। মেয়েদের চোখে পড়ার জন্য তারা অনেক বোকা-বোকা কাণ্ড করে।

ইঙ্গিতটা আমার প্রতিই কি না তা বুঝতে না পেরে আমি সরলভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, আজ্ঞে, কথাটা আমাকে মনে করেই বলছেন না তো!

মেয়েটা আমাকে একবার তেরছা চোখে দেখে নিয়ে বলে, আপনি একটু গায়ে পড়া বটে, কিন্তু এখনও তেমন কিছু কাণ্ড করেননি। আমি আর একটা ছেলের কথা জানি। প্রফেসর। লেখাপড়া নিয়ে দিব্যি ছিল। হঠাৎ একটা মেয়েকে খুশি করতে ব্যায়াম শুরু করল। তাতে তার গায়ে ইয়া ইয়া গুলি ফুটে উঠল বটে, কিন্তু মাথাটা গেল মোটা হয়ে। মেয়েটাও পালোয়ান প্রফেসরকে তেমন পছন্দ করতে পারছিল না। তারপর সে কী করল জানেন? গান আর নাচ শিখতে লাগল।

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, বলেন কী? একটা মেয়ের জন্য এত মেহনত? লোকটা মাইরি আমার চেয়েও বোকা আছে। কে বলুন তো?

মেয়েটা মাথা নেড়ে মুখ টিপে হেসে বললে, সব ছেলেই ওইরকম। কিছু কম আর বেশি।

আমি বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম, আমার অত মেহনত কিছুতেই পোষাত না।

মেয়েটা একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, কেন? মেয়েরা কি ফেলনা যে তাদের খুশি করার জন্য কিছু করতে নেই পুরুষদের!

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক তা বলিনি। তবে যার কথা বললেন সে আদত পুরুষই

তো নয়। একটা মেয়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছে, আর লোকটা বাঁদরের মতো নেচে যাচ্ছে।

মেয়েটা এবার আর একটু রেগে গেল যেন। ঝামরে উঠে বলল, বেশ করছে নাচছে। ভালবাসার জন্য সবকিছু করা যায়।

আমি বললাম, এই যে বললেন বোকা-বোকা কাণ্ড!

মেয়েটা তেজের সঙ্গে বলে, মোটেই বোকা-বোকা কাণ্ড নয়। লোকটা সত্যিকারের পুরুষ বলেই পেরেছে। সে অলস নয়, অকর্মা নয়, অক্ষম নয়। একজন মেয়ের প্রেমে তার সুপ্ত সব প্রতিভা জেগে উঠেছে।

এবার আমি হাঁ করে রইলাম। গোলমালটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না। আবছা মনে হচ্ছিল, সেই বোকা লোকটার নায়িকা বোধহয় এ মেয়েটা নিজেই। তাই চট করে স্ট্র্যাটেজি পালটে নিয়ে বললাম, অবশ্য আপনার মতো একজন মেয়ের জন্য অনেক কিছু করা যায়। ব্যায়াম, নাচ, গান, সব কিছু।

মেয়েটা আমার কথা শুনল বলে মনে হয় না। কেমন ভ্রূকুটিকুটিল এবং চিন্তান্বিত মুখে সামনের দিকে চেয়ে আছে। বেশ কিছুটা সময় চেয়ে থেকে বলে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কিছু পেতনি আর শাকচুন্নি সেই ছেলেটার পিছনে লেগেছে। কেন যে মেয়েগুলো এমন হ্যাংলা।

বলেই মেয়েটা একটু সচকিতভাবে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বলল, কিছু মেয়ে এরকম থাকেই। তাই না? তবে জেনারেলি ছেলেরাই হ্যাংলামো বেশি করে। পেতনি আর শাকচুন্নিগুলোকে কী করা যায় বলুন তো।

আমি একগাল হেসে বললাম, ঝাঁটাপেটা করুন। কষে ঝাঁটা মারুন।

মেয়েটা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, তাই মারব। খবর পেয়েছি গন্ধর্ব এক দঙ্গল মেয়ের সঙ্গে নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছে। যাওয়াচ্ছি! এমন কুরুক্ষেত্র করব এবার!

বলতে বলতে মেয়েটা আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক ঝটকায় উঠে ঝম করে চলে গেল।

আমি বসে বসে কিছুক্ষণ আমার বিদীর্ণ মস্তিষ্কের টুকরোগুলো জোড়া দিলাম। একটা ছক ধরা পড়ল। খুব একটা জটিল ছক নয়।

বসে আছি, হঠাৎ দারোয়ান এসে এত্তেলা দিল, বাবু ডাকছেন।

আমি একটু অবাক হলাম। বাবু অর্থাৎ পারিজাতের আমাকে ডাকার কথাই নয়। কারণ, আমি যে এসেছি তা সে জানে না। উপরন্তু আমি উমেদার। আমাকে এড়ানোর চেষ্টাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লাম।

পারিজাত বাইরের ঘরে বসে আছে। আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে বলে ওঠে, আরে তুমি!

আমিও আকাশ থেকে পড়ে বললাম, কেন, আপনিই তো দারোয়ান দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন!

পারিজাত হেসে ফেলল। বলল, তুমিই এতক্ষণ রুমার সঙ্গে কুঞ্জবনে বসে ছিলে? কী আশ্চর্য!

এতে অবাক হওয়ার কী আছে?

পারিজাত আমার দিকে নতুন এক আবিষ্কারকের চোখে তাকিয়ে বলে, তুমি তো দেখছি মেয়েদের পটাতে ওস্তাদ। রুমা আমাকে কী বলে গেল জানো?

না। কী করে জানব?

বলে গেল, কুঞ্জবনে একটা ছেলে বসে আছে। ভারী ভাল ছেলে। একটু বোকা, কিন্তু খুব সরল। ও যে কাজের জন্য এসেছে সেটা যেন ওর হয়।

আমি বললাম, তাই নাকি?

শুধু তাই নয়। এইমাত্র জহরবাবুর ছোট ছেলে প্রতিমার একটা চিরকুট দিয়ে গেল। পড়বে সেটা? পড়ো।—বলে পারিজাত একটা রুলটানা এক্সারসাইজ বুকের ভাঁজ করা পাতা আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমি চিঠিটা খুলি। প্রতিমার হাতের লেখা ভালই। লিখেছে, "পারিজাতবাবু, আমার চাকরির দরকার নেই। দয়া করে চাকরিটা অভিজিৎবাবুকেই দেবেন। উনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আমার বাবা হয়তো ব্যাপারটা সহজে বুঝতে চাইবেন না। আমাদের তো অভাবের সংসার। তবু আমার মনের ইচ্ছেটা আপনাকে অসংকোচে জানালাম।

প্রণাম জানবেন। প্রতিমা।"

পারিজাত আমার মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। চিঠি পড়া শেষ হতেই একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তিন-তিনটে জোরালো রেকমেনডেশন। অসীমা, রুমা, প্রতিমা। মেয়েদের সাইকোলজি তুমি বোধহয় খুব ভাল বোঝো।

আমি একটু লজ্জা পেলাম। বাস্তবিক গোটা ব্যাপারটা যে এইভাবে আমার অনুকূলে এসে যাবে তা আমি আশা করিনি। আমি মিনমিন করে বললাম, কিন্তু এতে আমার কোনও হাত নেই।

পারিজাত অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি? যারা রেকমেনড করেছে তারা কারা জানো? একজন আমার ভাবী স্ত্রী, একজন আমার মায়ের পেটের বোন এবং তৃতীয় জন তোমার সবচেয়ে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী। এই তিনজন মহিলাকে হাত করা খুব সহজ ব্যাপার তো নয়।

আমি কোনও জবাব খুঁজে পেলাম না। শুধু হাসলাম।

পারিজাত বলে, রুমা তোমার সম্পর্কে যে সার্টিফিকেট দিয়ে গেল সেটাও অদ্ভুত। তুমি নাকি খুব বোকা এবং সরল। ওকে এই টুপিটা কী করে পরালে? তোমাকে দেখে তো বোকা বা সরল কিছুই মনে হয় না।

উনি নিজে ভাল বলেই বোধহয় আমাকে ভাল বলেছেন।

রুমা ভাল?—এই প্রশ্ন করে পারিজাত ওপরে তুলে আমাকে নিরীক্ষণ করে বলে, ওরকম গেছো মেয়ে খুব কম আছে। নিজের পছন্দ করা বরকে দু'-দুবার ডিভোর্স করেছে, তা জানো?

না। অতটা জানি না। তবে উনি গন্ধর্ব নামে কে একজন অধ্যাপকের কথা বলছিলেন।

সেই গন্ধর্বই। বেচারা হয়রান হয়ে গেল মেয়েটার জন্য। গন্ধর্ব সম্পর্কে কী বলছিল তোমাকে?

কয়েকজন পেতনি আর শাকচুন্নি নাকি গন্ধর্বর পিছনে লেগেছে। উনি খুব জেলাসি ফিল করছেন।

করছে?—পারিজাতের মুখ উজ্জ্বল হল, যাক বাবা। ইট ইজ এ ড্যাম গুড নিউজ। কোনও প্ল্যান করছে বলে বলল নাকি?

না। উনি আমার সাজেশন চাইছিলেন। আমি সাজেস্ট করেছি পেতনি আর শাকচুন্নিদের ঝাঁটা মেরে তাড়াতে।

খুব হাসল পারিজাত। হোঃ হোঃ করে হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, তাই বোধহয় ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ভাবগতিক দেখেই বুঝতে পেরেছি একটা কিছু ঘটিয়ে আসবে। যাক, বাঁচা গেল। তা তুমি এখনও এই মাস্টারির চাকরিটা চাও?

আমি অবাক হয়ে বলি, চাইব না কেন?

পারিজাত মাথা নেড়ে বলে, তোমার যা প্রতিভা তা এই সামান্য চাকরিতে নষ্ট করবে কেন? ইচ্ছে করলে নিজের যোগ্যতায় অনেক ওপরে উঠে যেতে পারবে। এমনকী, আমার তো মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়াও তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আমি নির্লিপ্ত গলায় বলি, আগে তো মাস্টারিটাই হোক।

হোক মানে! এরপরও না হলে আমাকে কেউ আস্ত রাখবে নাকি! কিন্তু ভাই, আমার ওপর এই ত্রিমুখী আক্রমণ চালানোর কোনও দরকার ছিল না। তিন-তিনটে ভাইটাল রেকমেনডেশন কি সোজা কথা!

৭। পারিজাত

সংকীর্ণ পার্বত্যপথে দু'দিক থেকে দু'জন সশস্ত্র অশ্বারোহী ছুটে আসছে। সামনেই এক উপত্যকা। সেইখানে দু'জনের দেখা হবে। শুরু হবে দ্বৈরথ। দু'জনের মধ্যে যতক্ষণ না একজনের মৃত্যু হয় ততক্ষণ চলবে মরণপণ লড়াই। অস্ত্রে অস্ত্রে ধুন্ধুমার শব্দ উঠবে। অশ্বক্ষুরের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে চারদিক। ঝরে পড়বে রক্ত ও স্বেদ। না, লড়াই এখনও শুরু হয়নি। তবে অমোঘ লক্ষ্যে এখন ছুটে যাচ্ছে নিয়তিনির্দিষ্ট দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

বলাই বাহুল্য এই দুই অশ্বারোহীর একজন আমি, অন্যজন অধর। আমাদের দু'জনের কারওরই ঘোড়া নেই, তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। তরোয়াল নেই, টাকা আছে। দ্বৈরথ ঘটবার সম্ভাবনা নেই। আজকাল লড়াই হয় কূটনৈতিক চালে। কিন্তু লড়াই আসন্ন।

চাংড়াপোঁতার বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার কাগজে ছোট করে বেরিয়েছে সংবাদ। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। বর্ষাকালে ফি বছরই এই রাজ্যের কয়েকটা জেলা ও অঞ্চল ভাসে। কথা হল, চাংড়াপোঁতার দিককার বাঁধ মেরামতির ঠিকা গতবছর অধরকেই দেওয়া হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়তো পুরনো রেকর্ড ঘাঁটতে চাইবেন না, তাই আমি তথ্যটি যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে তার গোচরে এনেছি। যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয় তাহলে ঘটনাটিকে সাধারণ্যে রটনার একটি প্রচ্ছন্ন হুমকিও তাঁকে আমি যথার্যথ বিনয় সহকারে দিয়ে দিতে ভুলিনি। বাঁধ মেরামতি বাবদ খরচ হয়েছিল আট লক্ষ টাকার কাছাকাছি। খুব কম নয়। জনসাধারণের টাকা। কিন্তু জনসাধারণ তাদের টাকা কোথায় কীভাবে নয়ছয় হচ্ছে সে বিষয়ে খুবই নির্বিকার। সুতরাং আমাকেই তাদের প্রতিনিধি হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে।

জাতসাপটা পছন্দ করছে না, তবু আমি বারবারই তার লেজ দিয়ে কান চুলকোচ্ছি। সাপটা রাগছে, ফুঁসছে। এবার ছোবল তুলবে। অধর।

একটা রিকশা এসে থামল আমার গাড়িবারান্দার তলায়। কমলা সেন নামলেন। ভোরের কোমল আলোয় তাঁকে নম্র দেখাচ্ছিল। যৌবনে শ্রীময়ী ছিলেন, সন্দেহ নেই। এখন কিছু মেদ ও মেচেতার সঞ্চারে চটকটা ঢাকা পড়েছে। তার মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ বরাবর ছিল। এখনও আছে। স্বভাবে গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বময়ী এই মহিলাকে আজ কিছু শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পরনে কমলা রঙের একখানা শাড়ি, চওড়া বাসন্তী রঙের পাড়। ওই রঙেরই মানানসই ব্লাউজ। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। এখনও অগাধ ও গভীর, বন্যার মতো এক ঢল চুল তাঁর মাথায়। এলোখোঁপায় বাঁধা। হাতে একটা বড়সড় ফোলিও ব্যাগ।

পর্দা সরিয়ে চৌকাঠে তিনি দেখা দিতেই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললাম, আসুন, আসুন।

এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে কোনও অবিনয় বা কৃত্রিমতা নেই। খাঁটি লোকদের আমি বরাবরই শ্রদ্ধা করি। দেশে এরকম লোকের সংখ্যা বড়ই কম। কমলা সেন শিবপ্রসাদ হাইস্কুলের জন্য যা করেছেন তা এখন প্রায় কিংবদন্তী।

দরজা থেকে টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে আসতে কমলার অনেকটা সময় লাগল। পদক্ষেপ ধীর, অবিন্যস্ত, কুণ্ঠিত। যেন বা তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। কেন এখানে এসেছেন। ওঁর চোখের দৃষ্টিতেও সেরকম একটা অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল, যা ওঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়।

উনি যতক্ষণ কাছে এসে না বসলেন ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

দু'জনেই বসলাম মুখোমুখি। কিন্তু কেউ কারওদিকে সহজভাবে তাকাতে পারছিলাম না। কমলা সেন নীরবে তাঁর কোলের ওপর রাখা ফোলিও ব্যাগ এবং তার ওপর রাখা তাঁর হাত দু'খানি কিংবা মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। আমি ওঁর সিঁথির ওপর দিয়ে, খোঁপার কিনারা ছুঁয়ে দৃষ্টিটাকে মোটামুটি স্থির রাখলাম দরজার দিকে।

ঘর ফাঁকা। শব্দ নেই। বাইরে শুধু পাখির ডাক।

আমরা দু'জন অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করছি। আমাদের আন্ডারস্ট্যানডিং খুবই ভাল। যতদূর জানি আমাকে উনি সেক্রেটারি হিসেবে পছন্দই করতেন, যেমন আমি করতাম ওঁকে হেডমিসট্রেস হিসেবে। কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠানই চিরকাল একভাবে চলে না। চলতে নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও বিবর্তন ঘটে। ঘটা দরকারও। পরিবর্তন যদি না ঘটত তা হলে আমি দারিদ্র্যসীমার ওপাশ থেকে চিরকাল এপাশে আসার স্বপ্নই দেখতাম। সত্যিকারের আসা হত না কখনও।

মৃদুস্বরে বললাম, ভাল তো?

চশমার কাচ ও ফ্রেমে একটু আলো ঝিকিয়ে উঠল, হ্যাঁ। আপনি?

চলে যাচ্ছে।

আবার নিস্তব্ধতা। শুধু অজস্র পাখির ডাকে ভরে উঠল ঘর। সকালের কোমল আলোর এক মায়া ঘরের মধ্যে সম্মোহন বিস্তার করে দিচ্ছে। আমরা কেউ কখনও কাউকে তেমন অপছন্দ করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ছিল না। শত্রুতা নয়। আজও কি অপছন্দ হবে না পরস্পরকে?

কমলা সেন মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। মুখ তুললেন না। শুধু মৃদুস্বরে বললেন, খুব খাটুনি যাচ্ছে তো, আগেকার মতো?

খাটতে তো হয়ই। আপনিও তো বিশ্রাম নেন না।

আমার তো ছোট্ট জায়গা নিয়ে কাজ। আপনার তো তা নয়। টেনশন হয় না?

হয়।

বলে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করি। কমলা আমাকে ঘৃণা করতে পারছেন না। সেটা ঘটে ওঠা সম্ভব বলে আমারও মনে হয়নি কখনও। তবু আশা করেছিলাম, শেষ অবধি আমাকে উনি ঘৃণা করতে পারবেন। পারেননি। মৃদুস্বরে বললাম, ডানহাতে একটা সোনার বালা ছিল বরাবর। আজ দেখছি না।

কমলা চকিতে একবার তাকালেন। চোখ নামিয়ে নিজের শূন্য ডান হাতখানি ঘুরিয়ে দেখলেন একটু। বললেন, পুরনো হয়ে গিয়েছিল।

ভেঙে গড়তে দিয়েছেন?

উনি মাথা নাড়লেন, না। রেখে দিয়েছি।

একটু হাসলাম। ডান হাতখানা বড় শূন্য দেখাচ্ছে। বৈধব্য যেমন দীর্ঘ ও সাদা।

চা?

চশমার কাচ ও ফ্রেমে আবার একটু ঝিলিক, হুঁ।

ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করলাম ওঁর কাছে। ওই হুঁ-টুকুর বড় প্রয়োজন ছিল আজ। টেবিলের গায়ে লাগানো কলিং বেল-এ ওপরের রান্নাঘরে চায়ের সংকেত পাঠিয়ে দিই। ওরাই দেখে যাবে ক'জন এবং ক' কাপ। আমি মুখে উদাস ভাব মেখে বসে থাকি। একটু পিছনে হেলে, গা ছেড়ে।

নীরবতা। পাখির ডাক। কোমল আলো।

চা আসে। দু'জনেই মৃদু চুমুক দিই। কমলা একটু এদিকে তাকান, একটু ওদিকে। কিছু দেখছেন না, জানি। নিজেকে স্থির করছেন। আমাকে ঘৃণা করতে পারলে ওঁর পক্ষে কাজটা সহজ হয়ে যেত। সোজা তাকাতে পারতেন আমার চোখের দিকে। সহজে বলতে পারতেন কিছু কঠিন কথা। পারছেন না।

ঠিক কথা, স্কুলটার জন্য আমার বিশেষ কোনও দরদ নেই। আমার ভাবপ্রবণতা কম। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিছুতেই আমার কাছে জিয়ন্ত ও শরীরী কোনও সত্তা হয়ে ওঠে না। স্কুলের প্রতিটি ইটের প্রতি ওঁর যেরকম ভালবাসা আমার তা কোটি বছরেও হওয়ার নয়। তবু আমরা কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে খেটেছি, যখন যেমন দরকার। এও ঠিক আমার আরও পাঁচ রকমের কারবার আছে। স্কুলের পিছনে আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় দিইনি। কিন্তু কমলা সেন তাঁর অবকাশটিও স্কুলের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলেছিলেন। এই স্কুলের জন্য আমার ব্যক্তিগত ত্যাগ বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ওঁর অনেক আছে। বিদ্যায়তনে নাচগানের ক্লাস বসানোতে ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন তিনি, আমি সেই সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দিইনি। এই নিয়ে খটাখটিও হয়েছে। শেষ অবধি আমার বাস্তববুদ্ধিকে তিনি গ্রহণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে করেননি। লেখাপড়া জিনিসটার প্রতি আমার বিরাগ চিরকালের। স্কুল-কলেজের নামে আমার এলার্জি হয়। অভিজ্ঞতাবলে আমি জানি কিছুটা লেখাপড়া ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে পেটভাতের জোগাড় করার মতো যোগ্যতা অর্জন আরও ঢের ভাল। তাই আমি স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই চাষবাস, গোপালন, ইলেকট্রিক, বা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, ট্যানারি, মৌমাছির চাষ, হ্যান্ডমেড পেপার তৈরি, বাঁশ বা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে ঘর গেরস্থালির জিনিস বানানো ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা করার পক্ষপাতি ছিলাম। সবচেয়ে জোরালো বাধা দিয়েছেন উনি। তাতে নাকি ছেলেমেয়েরা বইয়ের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়বে। তাছাড়া ওসব তো কোর্সেও নেই। বহুবার বহু ব্যাপার নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার মতান্তর হয়েছে, বিতর্ক ঘটেছে। তবু কীভাবে যেন একটা গভীর আস্থাবোধও জন্ম নিয়েছিল।

কমলা সেন আমার কাছে হেরে গেছেন বা আমি জয়ী হয়েছি এমন কিছু আমার মনে হয় না। আমি জয়ী হলেও সেই জয়ের স্বাদ আমি উপভোগ করছি না। আমি ওঁরই জয় চেয়েছিলাম। উনি পারলেন না। সেটা হয়তো আমার পরাজয়ও।

চা শেষ হল। দুটি শূন্য পাত্র ও আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে রইলাম। শব্দ নেই। শুধু পাখি ডাকছে। আজ যে কোথা থেকে এত পাখি এল! না কি রোজই আসে, আমি হয়তো রোজ তাদের ডাক শুনতে পাই না। আজ পাচ্ছি।

কমলা সেন নতমুখে খুব ধীরে ধীরে, শব্দ না করে তাঁর ফোলিও ব্যাগের চেন খুলছিলেন। কেন তা আমি জানি। ব্যাগের মধ্যে একটি চিঠি আছে। টাইপ করা এবং বেশি বড় নয়। ওঁর পদত্যাগপত্র।

আমি ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে আলোর কিছু প্রতিফলন লক্ষ করছিলাম। গত দু'দিন বৃষ্টি নেই। চনমনে রোদ উঠেছে। চাংড়াপোঁতার বাঁধ ভাঙা ছাড়া কি এবারের বর্ষা আর কোনও দুর্দৈবের সৃষ্টি করতে পারল না? বন্যা হবে না তা হলে?

আমি ওপরের দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করি, কোথাও যাচ্ছেন নাকি বাইরে?

উনি চেনটা আধখোলা রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, যাচ্ছি। প্রথমে কলকাতায়। তারপর কাছেপিঠে কোথাও।

আমি মাথা নাড়লাম, অনেকদিন কোথাও যাননি। এবার একটু ঘুরে আসুন।

কথাটার মধ্যে কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নেই। সমবেদনা আছে। কমলা চুপ করে আমার টেবিলের সবুজ কাচে একটা নকশাদার পেপারওয়েটের প্রতিবিম্ব দেখলেন। তারপর বললেন, বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

আমি হাসলাম। বললাম, কাজ ছাড়া আপনার আর কবে কীই বা ভাল লাগল!

উনি সলজ্জ, হেসে খুব মৃদু স্বরে, প্রায় শ্বাসবায়ুর শব্দে বললেন, এবার ছুটি।

আমি ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ওঁর খোঁপার সীমানা ছুঁয়ে দরজা দেখতে দেখতে বললাম, আমি শুনেছি, অনেকগুলো স্কুল থেকে অফার এসেছে আপনার কাছে।

উনি মাথা নাড়লেন, মুখে দুষ্টুমির ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু করব না।

কেন করবেন না?

করা উচিত নয় বলে।—হাসিমুখেই বললেন কমলা, কেন তা তো আপনি জানেন।

জানি। সবই জানি। আমি কমলার চরিত্র বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলেছি তা তো থেকেই যাচ্ছে। এই

সুদক্ষ প্রশাসক ও মহান শিক্ষিকার চাকরির কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই অসাধারণ মহিলার সমস্যা তিনি নিজেই। নৈতিক অধঃপতনের জন্যই যদি তাঁর একটা চাকরি যায় তবে অধঃপতিত তিনি আবার অন্য চাকরিতে যাবেন কেন? কমলা সেনের জীবনদর্শন যা-ই হোক তা বেশ কঠোর। অধরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেমনই হোক, আমাদের শ্রদ্ধা তিনি অকারণে পাননি।

আজ বড় কোমল আলোর দিন। তারের বাজনার মতো বেজে চলেছে পাখিদের আবহসংগীত। দিনটা বড় লাবণ্যময়, বড় গভীর। পৃথিবীর পাত্রটি বুঝি উপচে পড়ছে অধরা মাধুরীতে আজ। এটা কাজের দিন নয়। এইসব দিন আসে মানুষকে খেয়ালখুশিতে পাগল করতে মাঝে মাঝে।

আমি খুব সন্তর্পণে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ আমাকে কিছু বলুন। শুনতে ইচ্ছে করছে।

কমলা হাসলেন। মাস্টারির নির্মোক খসে যাওয়ায় ভিতরকার লাজুক ও অপ্রতিভ এক কমলা সেন আজ জাদুবলে বেরিয়ে এসেছেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, বলতেই আসা।

বেলা বাড়ছে। কাজের লোকেরা ভিড় করে আসবে। ঘরটা হয়ে যাবে হট্টমালার দেশ। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তা হলে বাগানে যাই।

কমলা চোখ না তুলে মাথা নাড়লেন, চলুন।

বাগানের সবচেয়ে দূরবর্তী কোণে অবস্থিত কুঞ্জবনটি এই বর্ষার জলে, আরও ঘন হয়েছে। লতানে গাছ ঝেঁপে উঠেছে চারদিকে। ভিতরে নিবিড় ছায়া। আমরা দু'জন বসি, মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক রেখে। মৌমাছির গুনগুন আনাগোনা চারদিকে। দোলনচাঁপার গন্ধে বাতাস ভারী।

কমলা একটু সময় নিলেন। আমি অপেক্ষা করলাম।

উনি মৃদুস্বরে বললেন, আপনাকেই বলা যায়। বলব?

অপেক্ষা করছি।

আমি বহুদিন আগে মরে গেছি। সেই কিশোরীবেলায়। আজকের ঘটনা তো নয়। তখন দুই বেণী বেঁধে স্কুলে যাই, ফ্রক পরি। অধর কী সুন্দর সাইকেল চালাত আপনি জানেন না। এ উইজার্ড অন এ সাইকেল। তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে যেতে পারত। সাইকেলে চেপে সেটাকে স্থির দাঁড় করিয়ে রাখতে পারত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চমৎকার ছিল তার বন্দুকের টিপ। খুব শরীরী ছিল অধর। চমৎকার গড়ন। উদাত্ত গলায় গান গাইতে পারত। কোন কিশোরীই না তার জন্য? এসব সেই সময়কার কথা। বিয়ে হয়নি, সবসময় তো হয়ে ওঠে না। কিন্তু রেশটা রয়ে গেল কেন তা বুঝি না। অভ্যাসই হবে। মেয়েরা সহজে সম্পর্ক ভাঙতে পারে না।

আমি এসব বুঝি কমলা। আমি ছাড়া কে বুঝবে?

কমলা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। লৌহমানবীরও বুঝি স্পর্শকাতর কোনও জায়গা থাকে। আঁচলটা তুলে রেখেছিলেন মুখের কাছে আগে থেকেই। বুঝি জানতেন, আজ তাঁর কান্না আসবে।

কিন্তু আর সকলের মতো তো তাঁর কাঁদতে নেই। খুব আলগোছে চোখটা একটু ঢাকলেন আঁচলে। সরিয়ে নিলেন। সামান্য ভারী গলায় বললেন, সবাই জানত, কিন্তু বুঝত না। বিয়ে করলাম না বলে বাড়িতে কত অশান্তি পোয়াতে হয়েছে। মেয়েদের যে কত কিছুর জন্য দাম দিতে হয়, কত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা পুরুষেরা বোঝে না। মেয়েরা হয়তো বোঝে। কিন্তু তারা গা করে না।

যার জন্য এত ভোগান্তি সে বোঝে?

কমলা চমৎকার করে হাসলেন। শিশুর মতো। আগে এমন হাসতেন না। মাথা নেড়ে বললেন, না।

আমি ধীরে ধীরে স্বভাববিরুদ্ধ স্মৃতিভারে আক্রান্ত হচ্ছিলাম। স্মৃতি বড় ভারী। বড় মন্থর করে দেয় মানুষের গতি। কিন্তু স্মৃতি কীসের? আমার জীবনে তেমন কোনও প্রেম নেই, হৃদয়দৌর্বল্য

নেই। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এ ব্যাপারেও তেমনি, পিছনটা এক রৌদ্রতপ্ত খাঁখাঁ বালিয়াড়ি। সেই বালিয়াড়ি ভেঙে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে এক পাগল ঘোড়সওয়ার। তাকে একটা সীমারেখা ডিঙোতেই হবে। দারিদ্র্যসীমা। নারীপ্রেম নেই, স্নেহ নেই, অবকাশ নেই। তার স্ত্রী ছিল সুন্দরী। তার স্ত্রী ছিল প্রণয়ভিক্ষু। তার তখন সময় ছিল না। স্ত্রী অপেক্ষা করতে পারত আর একটু। করল না। চলে গেল। ঘোড়সওয়ার তার দারিদ্র্যসীমা ডিঙিয়েছে শেষ অবধি। সে জানে, সেইটেই আসল কথা।

আমি অনুচ্চ স্বগতোক্তির মতো বলি, স্কুল ছাড়া আপনি আর কোনও কিছুর কথাই ভাবেননি বহু বছর ধরে। শুধু স্কুল আর স্কুল। স্কুলটাই সর্বস্ব ছিল আপনার। আমি আপনার সেই সর্বস্বই কি কেড়ে নিচ্ছি?

কমলার ঘাড় নোয়ানো, ঘড়ির স্ট্র্যাপ নিয়ে খেলা করতে করতে মৃদু একটু হাসলেন। জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, এবার অন্য দিকগুলোয় মন দিতে পারবেন।

কমলা আমার দিকে একটু তাকালেন, পট করে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, ঠিক জানেন, পারব?

পারবেন না?

কমলা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে বললেন, কী জানি! মনে হয় না। আমার সবদিকই হারিয়ে গেছে।

বহুদিন। আমি বহুদিন ধরে লক্ষ করছি এক অসম লড়াই। একদিকে স্কুল, অন্যদিকে অধর। একজন বিবাহিত প্রায়-মধ্যবয়স্ক পুরুষ, যে আর সাইকেলের জাদু দেখায় না, কিংবা দেখালেও তাতে আর কিছু যায় আসে না। অন্যদিকে একটা বিশাল স্কুল, যা গড়ে উঠছে, গড়ে তুলছে। প্রাণবন্ত, স্পন্দনশীল। অধরের কিছু দেওয়ার নেই আর। কিন্তু স্কুল অসংখ্য কচি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছে কমলাকে। ব্যগ্র, আকুল হাত। অধর পারবে কেন? কমলার মনের মধ্যে কবেই তো মরে গেছে সে। তবু তার একটা প্রেতচ্ছায়া আছে। সেটাকেই সে বলে ভুল হয় বারবার। আমি জানতাম।

কমলা নতমুখে হাসলেন। কেন হাসছেন? এ তো হাসির সময় নয়!

কমলা আচমকা মুখ তুললেন। স্পষ্ট ও সহজ ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে। মুখে এখনও স্মিত ভাব। বললেন, স্কুলের হিসেবে অনেক কারচুপি ধরা পড়েছে।

আমি মাথা নাড়লাম, জানি।

কমলা আমার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, স্কুলের মেন্টেনেন্সের জন্য আমরা কনট্রাক্ট দিয়েছিলাম অধর বিশ্বাসকে। বহু টাকার কনট্রাক্ট। স্কুলের নতুন দুটো উইং তারই তৈরি। তাকে যেসব পেমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তার অনেকগুলো ভাউচার নেই। আপনি কখনও আমাকে প্রশ্ন করেননি, ভাউচারগুলো কী হল।

আমি মৃদু হেসে বললাম, না। কারণ আমি জানতাম সেগুলো আপনি সরিয়ে নিয়েছেন। হয়তো অধর আপনাকে সরাতে বলেছে।

হ্যাঁ। মানুষকে যখন নিশিতে পায় তখন সে অনেক অস্বাভাবিক কাণ্ড করে। আপনার কাছে কি ক্ষমা চাইতে হবে?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। কারণ আমার কাছে প্রত্যেকটা ভাউচারের ফটোকপি আছে। আমি বিপদে পড়তে ভালবাসি না।

স্নিগ্ধ এক দৃষ্টিতে আমাকে অকপটে কমলা নিরীক্ষণ করছিলেন। মুখে দুষ্টুমির একটু হাসি মেখে নিয়ে বললেন, আমিও জানতাম, আপনাকে বিপদে ফেলা সহজ নয়। আর সেই ভরসাতেই চুরি করেছিলাম।

আমার ভিতরকার সেই আশ্চর্য ক্যালকুলেটরটির কথা ওঁকে বললাম না। সর্বদাই সে হিসেব কষে, সর্বদাই সে টের পায়, সর্বদাই সে দেয় নির্ভুল বিপদ-সংকেত। কিন্তু সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। স্কুলের কাগজপত্রে যে অদৃশ্য হাত পড়ছে তা অনেক আগেই অসীমা মারফত আমি জানতে পারি। ঘটনাটা আমার ভিতরকার ক্যালকুলেটরকে জানাই এবং প্রশ্ন করি, হাতটা কার হতে পারে বলো তো! ক্যালকুলেটর অল্প সময়েই তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছিল, হাতটা কমলা সেনের। কিন্তু মুশকিল হল, কমলা সেনকে আমি জানি। এই কঠোর প্রশাসন ও নীতিপরায়ণা মহিলার পক্ষে এ কাজ করা প্রায় অসম্ভব। তবে ওঁর একটি রন্ধ্র আছে। সেই রন্ধ্র দিয়েই লোহার বাসরে মাঝে মাঝে হানা দেয় কালনাগিনী। অধর। পুরো একটা দিন আমি ক্যালকুলেটরে অনেক হিসেব-নিকেশ করি। বারবার প্রশ্ন করতে থাকি ক্যালকুলেটরকে, কী করব? কমলাকে হাতে-নাতে ধরব, না কি একটা বিকট গণ্ডগোল পাকিয়ে বসব?

না, আমি ওসব করিনি। বরাবর আমার যুদ্ধ ছিল অন্যরকম। অনেক আধুনিক ও বৈপ্লবিক সেই যুদ্ধাস্ত্র। আমি জানতাম, কমলা সেন নিজের দ্বারা চালিত হয়ে এ কাজ করছেন না। এ কাজ তাঁকে দিয়ে করাচ্ছে একটা ভূত। একটা প্রেতচ্ছায়া। একটা মৃত প্রেমের স্মৃতি। একদিন কমলা সেন জেগে উঠবেনই। একদিন সচকিত হয়ে তিনি আত্মধিক্কারে বলে উঠবেন, ছিঃ ছিঃ! এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি অধরকে ঘৃণা করতে শুরু করবেন। এর চেয়ে বড় কাউন্টার-অ্যাটাক আর কী হতে পারে আমার পক্ষে?

তাই আমি শুধু নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য কাগজপত্রগুলির ফোটোকপি গোপনে তৈরি করে রেখেছিলাম মাত্র। মুখে কিছুই বলিনি। আজ কমলা সেনের মুখ দেখে বুঝতে আর কষ্ট নেই তাঁর কৈশোর থেকে বহন করে আনা প্রেমের শবদেহটিতে পচন শুরু হয়েছে। তিনি তা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। স্নান করেছেন। শুদ্ধও হননি কি?

আমার দিকে চেয়ে থাকা কমলা সেনের শেষ হচ্ছে না যেন। চেয়ে থেকেই বললেন, কেউ কথাটা জানবে না, না?

না। জানার দরকার নেই।

কিন্তু লোকে চিরকাল আপনাকে অপবাদ দেবে, এমন একজন ভাল হেডমিসট্রেসকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করেছেন বলে।

মৃদু হেসে বলি, দিক। লোকে আমার আরও অনেক গুরুতর অন্যায়ের কথা জানে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

কমলা সেন মুখ টিপে হেসে বললেন, অথচ পাবলিকের কাছে আমাকে কত ছোট করে দিতে পারতেন আপনি। করলে আর কেউ আপনাকে দায়ী করত না।

আপনি ছোট নন।

কমলা সেন আবার হাসলেন। ভারী শিশুর মতো হাসছেন আজ। শিশুর মতোই সরলভাবে চেয়ে থাকছেন। মৃদুস্বরে বললেন, তাই বুঝি?

আমি একটু আনমনা হয়ে যাই। আমার অস্ত্র শুধু কমলাকে আঘাত করেই যে ক্ষান্ত হয়েছে এমন নয়। অস্ত্রটি হয়তো এখনও ক্রিয়াশীল এবং হয়তো একদিন তা আমাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসবে। অধর যেমন কমলাকে কাজে লাগিয়েছিল, তেমনি কাউন্টার-অ্যাটাকে আমার দাবার ঘুঁটি ছিল অসীমা। জাগ্রতবিবেক কমলা যেমন করে ঘৃণা করছেন অধরকে, তেমনি একদিন অসীমাও কি করবে না আমাকে?

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি ছোট হলে আমিও ছোট। কিন্তু নিজেকে ছোট ভাবতে নেই।

কমলা ধীরে ধীরে উঠলেন। বললেন, চলুন চিঠিটা আপনার হাতে তুলে দিই।

চলুন।—আমিও উঠলাম।

আমরা ঘরে ফিরে আসি। টাইপিস্ট ছেলেটা এসে গেছে। বাইরের বেঞ্চে এসে বসে আছে নানা অর্থীপ্রার্থী। কোমল আলোর লাবণ্য মুছে গেছে ঘর থেকে। পাখিদের সেই নির্ঝরিণীর মতো কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না আর। শুরু হয়ে গেছে কাজের দিন।

কমলা চেনটা খুলে ব্যাগ থেকে খামে আঁটা চিঠিটা বের করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, আসি তাহলে?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

রিকশাটা দাঁড়িয়েই ছিল। কমলা লঘু, ভারহীন পায়ে গিয়ে উঠে বসলেন। মুখে সেই স্মিত ভাবটুকু শেষ মুহূর্ত অবধি লক্ষ করলাম। মনে হল, কমলা এখন সত্যিই ভারহীন। এখন তিনি স্কুলের বাচ্চা এক ছাত্রীর মতোই হঠাৎ হাফছুটি পেয়ে অবাক আনন্দে ভরে আছেন।

রিকশা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি মহৎ বা আমি সৎ এমন কথা আমি বলছি না। কারণ আমি তা নইও। দারিদ্র্যসীমা পার হওয়া যে শুধুমাত্র কর্মদক্ষতা নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতার ওপর নির্ভর করে না তা অভিজ্ঞ মাত্রই জানেন। তবু লোকে আমাকে যতটা অসৎ বা অমহৎ বলে জানে আমি বোধহয় ততটা নই। আমি আমার স্ত্রীর হত্যাকারী বলে গণ-দরবার রায় দিয়েই রেখেছে। হায়, তাদের ফাঁসি দেওয়ার অধিকার নেই। ফলে আমার নিষ্ঠুরতার কথা কেই বা না জানে! অন্যের কথা বাদই দিলাম, কেউ যদি আমার বোন রুমাকে জিজ্ঞেস করে আমি অর্থাৎ তার দাদা আমার স্ত্রী অর্থাৎ তার বউদিকে বিষ দিয়ে মেরেছি কি না তা হলে সে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'না' কথাটা বলতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। এ বিষয়ে একটা দ্বিধা বা সন্দেহ তারও আছে।

এইসব অখ্যাতি ও কিংবদন্তী মানুষের অদৃশ্য শত্রু। এদের বিরুদ্ধে লড়াই চলে না। আমি সেই বৃথা যুদ্ধ কখনও করিনি। বরং একটা কিংবদন্তী গড়ে উঠতে দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যা কিংবদন্তী নয়, যা বহু মানুষের চোখের সামনে নিত্য ধীরে ধীরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে কেউ কোনওদিন একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি। বেশিরভাগ মানুষই যদি বোকা ও কিয়ৎ পরিমাণে অন্ধ না হত তা হলে তারা আমার ও কমলার সম্পর্কে একটা মুখরোচক কাহিনি রটনা করতে পারত। সেটা মিথ্যেও হত না।

কিন্তু তারা তা করেনি।

আমি সারাদিন আজ জনসাধারণের বিচিত্র মানসিকতা নিয়ে ভাবলাম। তাদের সকলের চোখের সামনেই তো ঘটেছিল সবকিছু। একটা স্কুলকে গড়ে তোলার জন্য কমলা প্রাণপাত করছিলেন। আমি তাঁর কাছাকাছিই ছিলাম। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তেন, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, রেগে যেতেন। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রী বেশি হত না। রেজাল্ট ছিল খারাপ। অর্থকরী অবস্থা বিপন্ন। নিজস্ব বাড়ি পর্যন্ত ছিল না। সব ধীরে ধীরে অতি কষ্টে হল। আমি তত পুরনো সেক্রেটারি নই। মাত্র শেষ তিনটে টার্মে আমি কমলার কাছাকাছি আসতে পারি। কো-এডুকেশন আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু কমলা জেদ ধরলেন, শুধু গার্লস স্কুলে ছাত্রী হয় না তেমন। বিশেষ করে একটা সরকারি গার্লস স্কুল যখন শহরে রয়েছে। ওঁর জেদ জয়ী হল। আমি হারলাম। এইসব নানা তুচ্ছ জয়-পরাজয় আমাদের মধ্যে তৃতীয় আর একটা সম্পর্কের দরজা খুলে দিচ্ছিল ধীরে ধীরে। কমলা মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, ধমক দিয়েই বলতেন, টাকা দিন। ধার নয়, ডোনেশন। আমি দিতাম। কমলা একদিন বলেছিলেন, শুনুন পারিজাতবাবু, কেবলমাত্র টাকা আছে বলেই আপনি স্কুলের সেক্রেটারি হতে পেরেছেন, আর কোনও গুণে নয়। আমি মৃদু হেসে কথাটা মেনে নিয়েছিলাম। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ সব ঘটনা। তবু জানি, আর কেউ নয়, একমাত্র আমার কাছেই তিনি স্কুলের জন্য নিঃসংকোচে হাত পাততে পারতেন। সেই হাত আমি কখনও শূন্য ফেরাতে পারিনি। না, এর বেশি কিছু নয়। তবু এর চেয়ে গভীর আর কীই বা হতে পারে? কমলার

মনের মধ্যে অধরকে আমি তো কবেই হত্যা করেছি। কিন্তু কেউ বোঝেনি। বোধহয় অধর নিজেও নয়।

ক'দিন হল বৃষ্টি নেই। শুকনো খটখটে দিন। অ্যাকটিং হেডমিসট্রেস হিসেবে দুটো ব্যস্ত দিন কাটিয়ে অবশেষে এক বিকেলে অসীমা এল। আরও জীর্ণ, আরও শীর্ণ, মুখে চোখে গভীর উদ্বেগের ছাপ।

আমার দিকে পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, রোজ স্কুলে কারা গোলমাল করতে আসে বলো তো!

ঘটনাটা আমিও জানি। তবু নির্বিকার মুখে বললাম, কীসের গোলমাল?

স্কুলের সারা দেওয়ালে পোস্টার। ব্রিং ব্যাক কমলা সেন, অসীমা দিদিমণি গদি ছাড়ো, পারিজাতের মুন্ডু চাই, এইসব। স্কুলে দু'দিনই ঢিল পড়েছে। শ্লোগান দিয়েছে কিছু লোক। শোনা যাচ্ছে, স্ট্রাইকও হবে।

আর স্কুলের ভিতরে কী হচ্ছে অসীমা?

অসীমা একটা শুকনো ঢোঁক গিলল। গভীর এক হতাশা মাখানো মুখে বলল, স্কুলের ভিতর? ভীষণ থমথমে। কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বলে না। টিচার্স রুমে খুব উত্তেজিত আলোচনা চলে সারাদিন।

তুমি ভয় পাচ্ছ না তো অসীমা?

ভয়?—অসীমা অনিশ্চয় মুখে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, একটা ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি পারব না।

কেন পারবে না অসীমা? একটা স্কুল চালানো কি খুব শক্ত?

অসীমা আজ চোখের পলক ফেলছে খুবই কম। আমার দিকে সেই চোখে আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এটা যেন কমলাদিরই স্কুল। আমাকে তো কেউ চাইছে না। এরকম সিচুয়েশনে কি কাজ করা যায় বলো!

আমি তো আছি।

অসীমা ওপর নীচে মাথা নেড়ে চিন্তিতভাবে বলল, হ্যাঁ, তুমি আছ। সেটা অবশ্য ঠিক।

কিন্তু আমি আছি জেনেও অসীমার চোখ মুখ বিন্দুমাত্র উজ্জ্বল হল না। একটুও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল না সে। আজ যেন ও সেই বাড়ি, যার বাথরুমের আলোটাও নিভে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

আমার অসীমাকে একবার বলতে ইচ্ছে হল, বিপদের ভয় তোমার কতটুকু অসীমা? স্কুলে পোস্টার দেখোনি? পারিজাতের মুন্ডু চাই! কই একবারও আমার বিপদের কথা বললে না তো!

একটা নির্জন উপত্যকায় দু'জন অশ্বারোহী বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে। দেখা হবে। আমার ক্যালকুলেটর বলছে, লগ্ন আসন্ন। আর বড় একটা দেরি নেই।

অসীমাকে আমি ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

ফিরে এসে অনেকক্ষণ অন্ধকার কুঞ্জবনে বসে রইলাম চুপ করে। কুঞ্জে কোনও রাধা আসবে না। চিরকাল অপেক্ষা করলেও না। তার বদলে ঝাঁক বেঁধে এল মশা। কিন্তু আজ তাদের হুল আমি তেমন টের পেলাম না।

৮। অভিজিৎ

বুড়ো মানুষদের সঙ্গে থাকার একটা দোষ হল, কখন তাদের কী হয় তা নিয়ে ভাবনা থাকে।

সকালবেলায় দেখি, দাদুর মশারি গোটানো। কেমন কেতরে শুয়ে আছেন। মাথাটা পড়ে গেছে বালিশ থেকে। মুখটা হাঁ-করা। একটা মাছিও ভনভন করছে মুখের সামনে।

পরিষ্কার ডেথ-সিন। সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন। স্ট্রোক। মৃত্যু।

পরের দৃশ্যগুলো পরপর ভেসে যাচ্ছিল চোখের সামনে। লোক ডাকো। কাঁদো, যদি সম্ভব হয়। কাঁধ দাও, পোড়াও।

ডাকলাম, দাদু! দাদু!

পট করে চোখ মেললেন, কী ব্যাপার?

শুয়ে আছেন যে বেলা অবধি?

ও।—বলে উঠে বসলেন। কোমরের আলগা কষিটা ঠিক করতে করতে বললেন, আজকাল এটা হয়েছে। মাঝে মাঝে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ি। রাতে ভাল ঘুম হয় না তো! কাজের মেয়েটা আসেনি?

না।

তা হলে আজ হরিমটর। রাঁধবে কে?

আমার বুকটা এখনও ধুক ধুক করছে। বললাম, দরকার হলে আমি রাঁধব। চিন্তার কিছু নেই।

তুমি রাঁধবে? তুমি রাঁধবে কেন? ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে না?

না। স্কুল এগারোটায় বসে।

দাদু প্রগাঢ় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কাল অনেক রাত অবধি আমার ঘুম হয়নি। তোমার নতুন কেনা হ্যারিকেনটায় খুব আলো হয়। চোখে লাগছিল। অভ্যেস নেই কিনা, অত আলো সহ্য হয় না।

বললেন না কেন, নিবিয়ে দিতাম!

তা কেন, পড়াশুনো করছিলে বোধহয়। নতুন চাকরি, তার ওপর মাস্টারি, একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকারও। তাই কিছু বলিনি।

আমি বললাম, দু' ঘরের মাঝখানের দরজাটায় কপাট নেই। থাকলে লাগিয়ে দিতাম।

কপাট দুটো ঘুণে ধরে পচে গেল। আমি আর লাগাইনি। কী দরকার? ও ঘরটায় তো কেউ থাকে না।

এখন আমি থাকব। কপাট আমিই লাগিয়ে নেবখন।

দাদু মাথা নেড়ে বলেন, তারও দরকার নেই। তুমি থাকবে, আমিই হয়তো থাকব না। কপাট দিয়ে তখন কী করবে?

কথাটা ভেবে দেখার মতো। আমি আর কী বলব?

দাদু বললেন, সাইকেলও তো বোধহয় একটা কেনা দরকার। গণেশেরটা বোধহয় আর বেশিদিন দেবে না, না?

চাইলে দেবে, কিন্তু তার দরকার কী? কিনেই ফেলব একটা।

নতুন চাকরি। টাকা পয়সা হাতে আসতে না আসতেই মোটা খরচ। সামলাতে পারবে?

হয়ে যাবে কোনওরকম।

মা-বাবাকেও কিছু পাঠাতে হবে তো।

ও নিয়ে ভাববেন না।—বলে আমি রান্নাবান্নার জন্য রওনা হচ্ছিলাম।

দাদু বললেন, এক কাজ করো। আমার তেমন খিদে নেই। আজ বোধহয় একাদশীও। ছোট পঞ্জিকাটা দেখো তো।

আমি দেখলাম। একাদশীই।

দাদু বললেন, তা হলে এ বেলা গণেশের বাড়িতেই খেয়ে স্কুলে রওনা হয়ে যাও। প্রথম প্রথম পাংচুয়াল হওয়া ভাল। দেরি হলে কে কী বলবে।

রোজ ওদের বাসায় খাচ্ছি।

আদর করেই তো খাওয়ায়।

তা অবশ্য করে। তবু রোজ খাওয়া ভাল নয়।

রোজ না হয় নাই খেলে, আজকের দিনটা চালিয়ে দাও। কাল কাজের মেয়েটাও এসে যাবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, মেয়েটা কি এমনি কামাই মাঝে মাঝে করে?

করে। তা আমার অসুবিধে হয় না। চালিয়ে নিই। অসুবিধে তোমাদের।

তাই দেখছি।

যতটা বীরত্বের সঙ্গে রান্না করতে রাজি হয়েছিলাম, কাঠের উনুন ধরাতে গিয়ে তা ফানটুস হয়ে গেল। স্টোভ এ বাড়িতে নেই, দাদু তা কিনবেনও না। বাড়িতে শুকনো ডালপালা, পাতানাতার অভাব নেই। এসব ইন্ধন থাকতে পয়সা দিয়ে জ্বালানি কেনে কোন আহাম্মক!

মোটামুটি একটা ডাল ভাত নামাতেই আমার দম বেরিয়ে গেল, স্কুলেরও বেলা প্রায় যায় যায়।

দাদু দূর থেকে সবই লক্ষ করছেন। আমি খেতে বসার পর বললেন, আজ পারলে বটে, কিন্তু রোজ পারবে না। কাজের মেয়েটা আজকাল ঘরের কাজ করতে চায় না। ঠিকাদারের মজুর খাটলে অনেক বেশি পায়। কাজের লোকের খুব অভাব।

আমি গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বললাম, কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশে ঝি চাকর বলে কেউ থাকে না। উন্নত দেশগুলিতেও নেই।

তাই নাকি?—দাদু চিন্তিতভাবে বললেন।

আমি বললাম, ভাববেন না। দু'দিনে এসব অভ্যাস হয়ে যাবে। কাল আমি একটা স্টোভ কিনে আনব।

স্টোভ!—দাদু চোখ কপালে তুললেন, আবার স্টোভ কেন?

ভয় পাবেন না। রোজ জ্বালাব না, যেদিন কাজের মেয়ে আসবে না, শুধু সেদিন।

খুব খরচের হাত তোমার। এটা ভাল নয়।

যা দরকার তা তো কিনতেই হবে।

তা বলে একসঙ্গে এত! এই তো হ্যারিকেন কিনলে, সাইকেলও কিনবে বলছ, আবার স্টোভ!

খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বললাম, আপনার আজ খেতে কষ্ট হবে। শুধু ডাল ভাত আর সেদ্ধ।

যথেষ্ট। আমি তো শুধু সেদ্ধ দিয়ে খাই। আজ তবু ডাল হয়েছে।

আমি গণেশকাকার কাছ থেকে ধার করে আনা সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেশি সময় নেই।

নতুন চাকরির একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে। নিতান্তই মাস্টারি যদিও। তবু এই প্রথম নিজেকে খানিকটা মূল্য দেওয়া যাচ্ছে। একেবারে ফালতু, পরনির্ভরশীল, শিকড়হীন তো আর নই। কিছু একটা করছি, কাজে লাগছি।

আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী তা আমি জানি। শিষ্ট আমি নই, শান্তও নই। কোনওকিছুই আমি সহজে মেনে নিই না। শিবপ্রসাদ স্কুলে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি, এই স্কুলে গভীর গণ্ডগোল আছে। ধীরে ধীরে সেগুলি আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। তারপর জোট বাঁধা। পারিজাত জানে না, কী একখানা টাইমবোমা যে শিবপ্রসাদ স্কুলে স্থাপন করেছে। এর জন্য তাকে নাস্তানাবুদ হতে হবে!

আমি যেদিন প্রথম স্কুলে জয়েন করি সেদিন কিছু লোক এসে বাইরে থেকে খুব শ্লোগান দিল।

কমলা সেনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যর্থ করো। অসীমা দিদিমণি গদি ছাড়ো। পারিজাতের মুন্ডু চাই।

সবাই বারণ করা সত্ত্বেও আমি ফটকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাদের লক্ষ করলাম। এরা কারা তা বুঝলাম না। তবে মনে হল এরা নিশ্চয়ই জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়। ভাড়াটে লোক হওয়াই সম্ভব।

তিনদিন বাদে স্ট্রাইক হয়ে গেল। কমলা সেনের পদত্যাগের প্রতিবাদে।

গণ্ডগোলের আঁচটা প্রথম থেকেই টের পাচ্ছি। বলতে কী, গণ্ডগোলের জায়গাই আমার প্রিয়। এই আমার স্বক্ষেত্র, এই আমার ইনসেনটিভ।

একদিন অসীমাদি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ঘরে।

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে কাজ করতে?

ভালই।—নিস্পৃহ গলায় বললাম। আমার চাকরি হওয়ার পিছনে ওঁর একটু হাত আছে। কিন্তু তা বলে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হওয়ারও মানে হয় না। স্কুলের হেডমাস্টার বা হেডমিসট্রেসের পদটিই একটি কায়েমি স্বার্থের সুযোগ। ভবিষ্যতে হয়তো ওঁর বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে। মনটাকে বেশি কৃতজ্ঞতার মাখন মাখিয়ে রাখলে অনেক ফ্যাচাং।

উনি অবশ্য আমার মুখভাব তেমন করে লক্ষও করলেন না। কেমন যেন অন্যমনস্ক, বিপন্ন মুখভাব। হতেই পারে। কমলা সেন নাকি খুব ভাল অ্যাডমিনস্ট্রেটর ছিলেন। তাঁকে হটিয়ে ইনি এসেছেন। আর এই রদবদলের মূলে আছে পারিজাত। টিচার্সরুমে বসে প্রায় সারাদিনই এসব কথা হয়। কাজেই সাবধান হওয়া ভাল। লোকে যাতে ধরে না নেয় যে, আমি অসীমা বা পারিজাতের লোক। আমি তা নইও।

অসীমা দিদিমণি আমার দিকে আনমনে চেয়ে বললেন, স্কুলে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে, তাই না? এর মধ্যে এসে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে!

না। গণ্ডগোল হতেই পারে।

অসীমাদি একটু চুপ করে চেয়ে থেকে বললেন, আমার ভাল লাগে না। স্কুলটা চিরকাল শান্ত ছিল। কোনও গণ্ডগোল ছিল না। এখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক এসে বিশ্রী স্লোগান দেয়, ঢিল ছোঁড়ে। ছেলেমেয়েরা ভয় পায়।

আমি দোনোমোনো করে বলি, ওই লোকগুলো কারা তা আপনি জানেন?

কারা আর হবে? পাবলিক।

আমার সন্দেহ থেকে গেল। কমলা সেনের পদত্যাগ যদি অবৈধ বা অন্যায় কিছু হয়ে থাকে তবে আইন-আদালত আছে। আর পাবলিকের আন্দোলন ঠিক এরকম প্রকৃতির হয় না। বেশিরভাগ স্কুলেই এরকম কিছু অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকে। তাতে বাইরে থেকে রোজ ঢিল পড়ার কারণ নেই। আন্দোলন আমি কিছু কম করিনি।

পরদিন লোকগুলো আবার এল। আমি এবার ফটক খুলে বেরিয়ে সোজা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জনা ত্রিশেক লোক। আমাকে মুখোমুখি দেখে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করতে যাইনি। তবে হাতজোড় করে বললাম, আমাকে কিছু বলতে দিন।

লোকগুলো সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করল না। আমি স্কুলের সামনে একটা কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে স্ট্রিট কর্ণার করা অভ্যস্ত গলায় আধঘণ্টা ধরে একটা চোস্ত ভাষণ দিলাম। তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিতও ছিল।

কাজ হল। দু'দিন যাবত তারা আসছে না।

টিচার্স রুমে যারা একদম পাত্তা দিত না তারা এখন কথা-টথা বলছে।

স্কুলটা আমার ভালই লাগছে। বেশ বড় স্কুল। হাজার খানেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী, ডিসিপ্লিন চমৎকার। ক্লাস বাগে আনতে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।

আজ স্কুল শুরু হওয়ার মুখেই অসীমাদি ডেকে পাঠালেন।

পারিজাত আপনাকে একটু ডেকে পাঠিয়েছে। জরুরি দরকার।

আমাকে!—আমি একটু ভ্রূ কোঁচকাই। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না।

সেক্রেটারির বাড়িতে গেলে এখন ঘটনাটা অন্যরকম দেখাবে। কিন্তু ডাকলে যেতেই হয়। বললাম, কখন?

আজই। খুব দরকার বলছিল।

অগত্যা।

পারিজাত আজও জরুরি মিটিং করছিল। সুতরাং আমাকে উমেদারের মতোই অপেক্ষা করতে হল বাইরে। আমি আগের দিনের মতোই একটা কুঞ্জবনে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। আজ অবশ্য রুমা নেই। একা আমি।

একটু বাদেই দারোয়ান এসে ডেকে নিয়ে গেল।

পারিজাত একটু ভোম হয়ে আছে। খুব মানসিক ব্যস্ততার মধ্যে থাকলে মানুষের মুখেচোখে যেন একটা আস্তরণ পড়ে যায়। তবে আমাকে দেখে ছুরির ফলার মতো ঝিকিয়ে উঠল তার হাসি, এই যে হিরো, এসো, এসো। বোসো।

আমি বসতে বসতে বললাম, হিরো কীসের?

শুনলাম, অধরের ভাড়াটে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছ! সত্যি নাকি?

কার ভাড়াটে লোক?

একজন নমস্য ব্যক্তির। অধর বিশ্বাস।

আমার ভিতরে একটু টিকটিক আওয়াজ হল। অধর বিশ্বাস। সেই সাইক্লিস্ট! মস্তান!

বললাম, ঠিক জানেন?

পারিজাত হাসল। বলল, জানি। কিন্তু এর বেশি হিরো হতে যেয়ো না। বিপদে পড়বে।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, জামার কলারটা একটু তুলে দিই। তার বদলে খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একটু হাসলাম। প্রথাসিদ্ধ মস্তানদের দিন কবেই শেষ হয়ে গেছে। এক সময়ে খুদে খুদে নকশাল ছেলেদের ভয়ে তাদের আমি প্রাণভয়ে পালাতে দেখেছি।

পারিজাত আমার মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই আমার ভিতরটা দেখে নিয়ে বলল, তুমি অবশ্য নকশাল ছিলে। ভয়ডর কিছু কম: তাই না?

আমি গোমড়া মুখ করে রইলাম।

পারিজাত খুব আস্তে করে বলল, নিমকহারাম।

আমি ছ্যাঁকা খাওয়ার মতো চমকে উঠে বলি, কী বললেন?

নিমকহারাম।

তার মানে?

লজ্জা করে না?

কী বলছেন স্পষ্ট করে বলুন।

হৃদয়হীন। অকৃতজ্ঞ।

আমি চটে উঠে বলি, খামোখা গালমন্দ করছেন কেন?

করা উচিত বলে।

আমি কী করেছি?

এই ঘোরতর বেকার সমস্যার যুগে তুমি একটা ভদ্র চাকরি পেয়েছ।

তাতে কী হল?

চাকরিটা পেয়েছ আর একজনের বদান্যতায়।

সে আবার কে?

যাক, অকৃতজ্ঞতা তাহলে ডিপ রুটেড! এর মধ্যে তাকে ভুলতেও শুরু করেছ! অ্যাঁ।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই লোকটার অদ্ভুত আচরণে। কিন্তু তেজের গলায় বলি, আমি কারও বদান্যতার ধার ধারি না।

ধারো না, তার কারণ তুমি জেনুইন অকৃতজ্ঞ।

আমি অকৃতজ্ঞ নই।

পারিজাত চট করে তার টেম্পোটাকে একটু নামিয়ে এনে বলে, নও?

না।

তুমি তোমার দেশকে ভালবাসো? জনগণকে?

এ প্রশ্ন অবান্তর।

পারিজাতের দুটো চোখ চিকচিক করতে থাকে। বলে, যারা শ্রেণিশত্রু নয় তাদের কথা বলছি! তাদের ভালবাসতে তো অসুবিধে নেই?

আমি আপনার কথা ধরতে পারছি না।

ধরার দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দিয়ে যাও না।

আপনি আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চান বলে মনে হচ্ছে।

বুদ্ধি তো বেশ টনটনে দেখছি।

আমি নির্বোধ নই, আপনিও জানেন।

জানি, হাড়ে হাড়ে জানি। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় তুমি তিন-তিনজন কঠোর মহিলার স্ট্রং রেকমেনডেশন জোগাড় করে ফেলেছিলে।

ও কথা থাক। কাজের কথায় আসুন।

আমি কাজের কথাই বলছি। তুমি জনগণ এবং সর্বহারাদের ভালবাসো কি না।

হয়তো বাসি।

তুমি একটা চাকরি পেয়েছ কি না।

পেয়েছি।

তা হলে?

তা হলে কী?

জনগণের প্রতি তোমার কোনও কর্তব্য আছে কি না।

সব সময়েই আছে।

পারিজাত একটু ঝুঁকে বসে আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে থেকে বলে, জনগণের মধ্যে বিশেষ একজন তোমার জন্য অনেকটাই ত্যাগ স্বীকার করেছিল। প্রায় আত্মোৎসর্গ। মনে পড়ে?

সে কে?

তাকে ভুলে যাওয়াটা অপরাধ অভিজিৎ।

আমি বিরক্ত মুখে বলি, আপনি কি প্রতিমার কথা বলছেন?

পারিজাত একটা শ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দেয়। মৃদু স্বরে বলে, যাক। নামটা অন্তত মনে আছে।

প্রতিমার কী হয়েছে?—আমি জিজ্ঞেস করি।

কী হবে? একজন নিম্ন-মধ্যবিত্তের যুবতী মেয়েদের জীবনে কী আর হয়? কিছুই হয় না। তারা বসে থাকে। অপেক্ষা করে। চাকরি বা বিয়ে কিছু একটা আশা করতে থাকে। শেষ অবধি হয়তো কোনওদিনই হয় না। তুমি কি জানো, বেকার সমস্যার মতো এইসব অনূঢ়া কন্যাদেরও একটা বিশাল সমস্যা রয়েছে এ দেশে?

জানব না কেন? আমারও দুটো বোনের বিয়ে বাকি।

তুমি জানো যে, বেকার সমস্যা এবং অনূঢ়া সমস্যা দুটোই কো-রিলেটেড?

তাই নাকি?

ন্যাকামো কোরো না অভিজিৎ। বুদ্ধিমান ছেলেদের এটা জানার কথা যে, দেশে এত বেকার না থাকলে মেয়েদের বরের অভাব হত না।

তা বটে।

তুমি কি জানো, উপযুক্ত পাত্রদের সংখ্যা কম বলেই দেশে একটা দুষ্ট পণপ্রথা ক্রমেই প্রসারলাভ করছে? এবং বেকার সমস্যা, বিয়ে ও পণপ্রথা এই তিনটেই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত? জানো?

বোধহয়।

তা হলে?

তা হলে কী?

এখন চাকরি পাওয়ার পর তোমার কর্তব্য কী হওয়া উচিত?

আমি বোকার মতো চেয়ে থাকি। লোকটা বাস্তবিকই পাজির পা-ঝাড়া। তবু একে আমি ঘেন্না করতে পারছি না, এর ওপর রেগে উঠতে পারছি না। হঠাৎ হেসে ফেলে বললাম, কিছু কর্তব্য করতে হবে নাকি কারও প্রতি?

দায়িত্বশীলদের তো সেটাই মোটো হওয়া উচিত। তুমি নিজে উঠে গেছ, এবার আর একজনকেও টেনে তোলো।

কী করতে হবে?

ভেবে দেখো। আমি ফোর্স করতে চাই না।

ফোর্স করলেও লাভ নেই। কেউ ফোর্স করে কখনও আমাকে দিয়ে কিছু করাতে পারেনি।

পারিজাত একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, মডার্ন ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই বলে ওকথা বলছ। এ যুগে বুদ্ধিমান লোকেরা ফোর্স কীভাবে অ্যাপ্লাই করে জানো?

খানিকটা জানি।

কিছুই জানো না। তোমাকে কখনও সেই যুদ্ধে নামতে হয়নি।

আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

দেখাচ্ছি। কিন্তু লক্ষ করছি, তুমি ভয় পাচ্ছ না।

আমি হেসে ফেলি, বলি, না, পাচ্ছি না।

তা হলে আমাকে স্ট্র্যাটেজি বদলাতে হয়।

কীরকম?

একবার প্রতিমার সঙ্গে দেখা করে অন্তত একটা "হ্যালো" বলে এসো। এটুকু ওর পাওনা। বেচারা মহৎ হওয়ার জন্য চাকরি থেকে সরে দাঁড়াল অথচ সেই মহত্ত্বটুকু কেউ স্বীকার করল না। এটা নিষ্ঠুরতা অভিজিৎ।

আমি রাগ করে উঠে পড়লাম। বললাম, আর কোনও কথা নেই তো?

সে সব পরে হবে।

আমি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সাইকেলে উঠে ঝড়ের বেগে সেটাকে চালাতে লাগলাম। এসব কী হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি। ষড়যন্ত্র! প্ল্যান! ফাঁদে ফেলার চেষ্টা!

আমি মউডুবির দিকে অর্ধেক পথ গিয়েও আচমকা সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নিই।

দরজা খুলল প্রতিমা। ম্লানমুখী। কয়েকদিনেই যেন কৃশকায়া। বিষণ্ণ। কিছু বলল না প্রথমে। ভাসা ভাসা বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ বলল, এতদিন কোথায় ছিলেন?

ফেরার পথে ধীরে ধীরে সাইকেল চালাচ্ছিলাম। খুব ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে আপনমনে একটু করে হেসে উঠছি আমি। কী হল আমার হঠাৎ? কী হল? যাঃ! পাগল, পাগল, দুনিয়াটাই পাগল!

৯। পারিজাত

এবার বন্যা হল না। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে অসীমা। অভিজিৎ আজকাল স্কুলের পর রোজ প্রতিমাদের বাড়ি যায়। রুমা আবার বিয়ে করেছে। গন্ধর্বকেই। আকাশে শরতের মেঘের আনাগোনা। ভারী সুন্দর এই ঋতু। যদিও প্রকৃতির দিকে তাকানোর সময় আমার কম। তবু টের পাই। বাইরে শরতের আলো আর ছায়া সাদা ও কালো দুটি শিশুর মতো আপনমনে খেলছে।

হে আমার দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞ ভারতবাসী, জীবনের কোনও গল্পেরই কোনও শেষ নেই। একটা ঘটনা থেকে জীবন আর একটা ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে অশেষ হয়ে চলে গল্প। এই বুড়ি পৃথিবী অবিরল বলে যাচ্ছে গল্পের পর গল্প। শেষ নেই। এই গল্পে অর্থহীন জয়, নিরানন্দ পরাজয়, ক্ষণস্থায়ী সফলতা, খণ্ডিত বিফলতা, সূক্ষ্ম প্রেম বা স্থূল বিবাহ ফিরে ফিরে আসে। আমার দারিদ্র্যসীমা পেরিয়ে আসার কিংবদন্তীও পুরনো হয়ে এল। আমি জানি, আমার মতো আরও হাজার হাজার লোক দারিদ্র্যসীমা ডিঙোবে। রচিত হবে আরও কত কিংবদন্তী। একদিন দারিদ্র্যসীমার রেলবাঁধের ওপাশে আর লোকবসতি থাকবে না। আমরা সেদিন সবাই মিলে তুলে দেব ওই রেলবাঁধ। আমি সেই স্বপ্ন দেখি।

শরতের এই রঙিন বিকেলে আজ কিছু নির্জন অবকাশ পেয়ে গেছি। কিছু উন্মন। আমার ক্যালকুলেটর বারবার সংকেত দিচ্ছে। আমার বাগানে শিউলির গন্ধ। পিছনে এক মরুভূমির মতো অতীত। সামনে এক পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা।

আমি নিরালা কুঞ্জবনে একা বসে আছি। একা! অসীমা আজকাল আসার সময় পায় না।

সময় পায় না? না, কথাটা ঠিক নয়। আমি জানি, অসীমা ভয় পায়। বড় ভয় পায়। ক্যালকুলেটর কারই বা নেই! ভিখিরিরও আছে। কারও কারও ক্যালকুলেটর নির্ভুল, কারও ভুলে ভরা। অসীমার ক্যালকুলেটর কেমন তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু তার যন্ত্রটি নিশ্চিত তাকে সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে, ও ভাল নয়, ওর কাছে যেয়ো না। অসীমা হয়তো খুব বেশি আসবে না আর। স্কুল তাকে অজস্র কচি হাতে জড়িয়ে ধরবে। নিয়ে নেবে। নিক।

আমি আজ কিছু ভাবছি না। কুঞ্জবনে অদ্ভুত রূপময় আঁধার। বাইরে পাখি ডাকছে। গুনগুন করছে মৌমাছি। শিউলির মাতাল গন্ধে ভরে আছে দশ দিক।

ফটকের বাইরে আজও চেঁচাচ্ছে সেই মাতাল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লোককে শোনাচ্ছে আমার জীবনকাহিনি। রাজার আলমারির মধ্যে আমি কীভাবে পেয়ে যাই গুপ্তধন। কীভাবে গরিবদের শোষণ করে আমি আস্তে আস্তে উঠে গেছি টাকার পাহাড়ের চূড়ায়। আমার শ্বাসবায়ুতে মিশে আছে কত হতভাগ্যের দীর্ঘশ্বাস।

আমার খারাপ লাগে না। একভাবে না একভাবে নিজের অজান্তে সে পিটিয়ে চলেছে আমারই ঢাক। গড়ে উঠছে কিংবদন্তী। রহস্য। ইন্দ্রজাল।

ফটকের মধ্যে যে চারজন ছায়ামূর্তি ঢুকল তাদের দেখে আমি চমকালাম না। সহজ, সুঠাম তাদের হাঁটার ভঙ্গি। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তাদের শরীর। ক্যালকুলেটর বলল, সাবধান! আমি তাকে চুপ করিয়ে রাখলাম। এরা অন্ধকারের লোক। সে নিজে আসেনি। আসতে নেই।

লোকগুলো দারোয়ানকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। বোধহয়, আমি কোথায় জেনে নিল।

ঘাসজমিতে তাদের পায়ের কোনও শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু তারা আসছে। তারা ভাল লোক নয়। খুনি, গুন্ডা, নিষ্ঠুর। আমি জানি।

শিউলির দম বন্ধ করা গন্ধ আমি বুক ভরে নিই। আমি জীবনে অনেক লড়াই জিতেছি। এক-আধটা লড়াই হারলে আর তত ক্ষতি হবে না আমার। বরং কিংবদন্তী সৃষ্টি হবে আবার। ঘন হয়ে উঠবে রূপকথা।

পরাজয়ের শেষ সীমানায় দাঁড়ানো অধর জানে না, উপত্যকায় আমাদের লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তার রক্তে রাঙানো তলোয়ার মুছে আমি খাপে ভরে ফেলেছি। আকাশে এখন শকুন উড়ছে।

আমি একটু হাসলাম। নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে রইলাম আনমনে। শিউলির গন্ধে বুক ভরে উঠছে।

বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ছ'জন লোক। এদেরও হাঁটার ভঙ্গি সহজ, সুঠাম। চমৎকার চটপটে। ঘাসজমির ওপর ছ'টা বেড়ালের মতো নিঃশব্দে চকিত পায়ে লাফিয়ে নেমে এল তারা।

অধরের লোকেরা কুঞ্জবনের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারল না শেষ অবধি। ছ'জন তাদেরই মতো আত্মবিশ্বাসী নিষ্ঠুর ও জান-কবুল লোক তাদের পথ আটকাল।

তারপর যা হয় হচ্ছিল। আমি একটা হাই তুললাম, অধরের পয়সা-খাওয়া চারটে লোকের সঙ্গে আমার বেতনভুক ছ'জন লোক খুব নিবিষ্ট এক মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঝিকোচ্ছে ছোরা, রিভলভার, নল, ঘুসি, ব্লেড। বড় একঘেয়ে।

দারিদ্র্যসীমা ডিঙোতে গিয়ে আমার পথে বহুরকম বাধা পড়েছে। এক-আধটা লাশও কি পড়েনি? কিন্তু এসবই অত্যন্ত মোটা দাগের ব্যাপার। আমার ভাল লাগে না।

শিউলির গন্ধ বড় মাতাল করেছে আজ আমাকে। নিমীলিত চক্ষে সামনের দিকে চেয়ে আমি মাতাল হয়েও যাচ্ছি। পিছনের ঘাসজমিতে লড়াইটা বোধহয় শেষ হল, কে হারল, কে জিতল তা জানার জন্য আমি মোটেই উদগ্রীব হই না। তবে জানি শেষ অবধি আমার কাছে কেউই পৌঁছতে পারবে না।

ক্লান্তিতে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজলাম।

লাল নীল মানুষ

কুঞ্জনাথকে খুন করবে বলে তিনটে লোক মাঠের মধ্যে বসে ছিল। পটল, রেবন্ত আর কালিদাস।

কুঞ্জনাথ এ পথেই রোজ আসে। আজও আসবে।

রাত তেমন কিছু হয়নি। তবে নিশুত দেখাচ্ছে বটে। মাঘের এই মাঝামাঝি সময়টায় এইদিকে ডাহা শীত। তবে ইদানীং যেমন সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে তেমনি হাওয়া বাতাসও। শীত নেই যে তা নয়, বরং শরীরে কালশিরে ফেলে দেওয়ার জোগাড়। এমন ঠাণ্ডা যে মনে হয় চারপাশের বাতাস দেয়ালের মতো জমে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ বিকেল থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া কোত্থেকে নোংরা কাগজ উড়িয়ে আনার মতো একখানা মেঘ এনে ফেলল। সেই মেঘের ছোট টুকরোটাকেই বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অ্যাত্তো বড় করে এখন আকাশ ঢেকে ফেলেছে। খুব কালো হয়েছে চারধার। ভেজা মাটির গন্ধ আসছে।

তিনজনই আকাশে চেয়ে দেখে বার বার। জল এলে এই খোলা মাঠে বসে থাকা যাবে না। দৌড়ে গিয়ে কোথাও উঠতেই হবে। কুঞ্জনাথও দুর্যোগে খাল পেরিয়ে মাঠের পথে আসবে না। পিচ রাস্তায় ঘুরে যাবে। যদি তাই হয় তো কুঞ্জনাথের আরও এক দিনের আয়ু আছে, তা খণ্ডাবে কে? কিন্তু এ সব কাজ ফেলে রাখলে পরে আলিস্যি আসে, ধর্মভয়ও এসে যেতে পারে। রাত মোটে নটা। কুঞ্জনাথ স্টেশনে নামবে ছটা দশের গাড়িতে। সাড়ে ছটার পর আসবার বাস নেই। সুতরাং ওই সাড়ে ছটার বাসেই তাকে চাপতে হবে। বাজারে এসে নামতে নামতে সাড়ে সাতটা। কুঞ্জনাথ এখানে না নেমে আগের গাঁ শ্যামপুরেও নামতে পারে। তার কত কাজ চারদিকে! তা হলেও গড়িয়ে গড়িয়ে এখন সময় যা হয়েছে তাতে কুঞ্জনাথের এই বেলা আসার কথা। এখন কুঞ্জনাথই আগে আসে, না জল ঝড়ই আগে আসে সেটাই ভাবনা।

ছাতা নিয়ে বড় একটা কেউ খুন করতে বেরোয় না। এই তিনজনও বেরোয়নি। জল এলে ভরসা এক কাছেপিঠে হাবুর বাড়ি। তা সেও বড় হাতের নাগালে নয়। পুকুরপাড় ধরে ছুটে দু-দুটো বাগান পেরিয়ে তবে। তা করতে ভিজে জাম্বুবান হয়ে যাবে তারা।

পটলের হাতে একখানা ভারী কষাই-ছুরি আছে। এটাই কাজ সারার অস্ত্র। কুঞ্জনাথ যাতে আবার জোড়া-তাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তার জন্য এবার ঠিক হয়েছে মুণ্ডু আর ধড় আলাদা করে দুটো কম করে দশ হাত তফাতে রেখে ভাল করে টর্চ মেরে দেখে নিতে হবে কাজটা সমাধা হয়েছে কি না। এর আগে কুঞ্জনাথ দুবার জোড়া দিয়ে উঠেছে।

কালিদাসের ধারণা কুঞ্জনাথের পকেটে হোমিওপ্যাথির একটা ওষুধ থাকে। মরার সময়ে টপ করে এক ফাঁকে খেয়ে নেয়। তাইতে জীয়নকাঠি ছোঁয়ার মতো ওর প্রাণটা ধুক ধুক করতে থাকে নাগাড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা সেলাই-টেলাই করে দিলে বেঁচেও যায়। কুঞ্জর বাপ হরিনাথ মস্ত হোমিও ডাক্তার ছিলেন। মরা মানুষ আকছার বাঁচাতেন। তিনি থাকতে এ অঞ্চলের লোকে সাপের বিষকে জল বলে ভাবত। কলেরাকে দাস্তর বেশি কিছু মনে করত না। এমনকী এত বিশ্বাস ছিল লোকের যে, মড়া শ্মশানে নেওয়ার পথেও হরি ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেত। যদি বাঁচে।

মানুষের এমনি বাঁচার আকাঙ্ক্ষা! ভাবতে ভাবতে কালিদাস মনের ভুলে হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেলল। ফটফটে আলো ফুটে ওঠে ঝোপঝাড়ে, রাস্তার সাদা মাটিতে। আলো জ্বালার কথা ছিল না। রেবন্ত 'হেঃ ই' করে উঠতেই কালিদাস কল টিপে আলো নেভায়।

পটল জানে আসল কাজটা তাকেই করতে হবে। রেবন্তর হাতে একটা মোটা লাঠি আছে, কালিদাসের কাছে টর্চ ছাড়াও একটা হালকা পলকা ছুরি আছে। কিন্তু কাজের সময় যত দায় তারই! লোকে জানে, তার হল পাকা হাত। তবু ঠিক কাজের সময়টায় পটল ভেতরে ভেতরে কেমন থম ধরে থাকে। একটু বেখাপ্পা কিছু শব্দ সাড়া বা স্পর্শ ঘটলে সে তিন হাত লাফিয়ে ওঠে। টর্চের আলোতেও

সে তেমনি চমকে গেল। একবার শুধু দাঁত কিড়মিড় করে। পটল টের পাচ্ছে, তার হাঁফির টানটা ঠাণ্ডায় কিছু তেজি হয়েছে। বুকে শব্দ হচ্ছে। মুখ দিয়ে রাশি রাশি বাতাস টানতে হচ্ছে। সাবধানে কিছু কেশে সে গয়ের ফেলল। এই রোগেই কি একদিন সে মরবে?

রেবন্ত হাতের আড়াল করে সিগারেট টানছে। সব ব্যাপারেই তার মাথা ঠাণ্ডা। অন্তত দেখায় তাই। কিন্তু আসলে সে তার কিশোরী শালী বনাকে ভাবছে। সবসময়েই আজকাল সে বনাকে ভাবে। সে যে ভাবে তা দুনিয়ার আর কেউ টের পায় না। বনাও না। যদি অন্তর্যামী কেউ থাকেন তো তিনি জানেন। আর কারও জানার উপায় নেই। বনাকে ভাবে, কারণ তাকে কোনওদিন পাবে না রেবন্ত। বনা স্বপ্নেও জানে না কখনও যে, তাকে রেবন্ত ভাবে। কিন্তু ওই একটুই রেবন্তর জীবনের আনন্দ। দুঃখ, বিষাদ, উৎসব, আমোদ, আতঙ্ক যাই ঘটুক জীবনে রেবন্ত তৎক্ষণাৎ বনাকে ভাবতে শুরু করে। আর তখন চোখের সামনের ঘটনাটা আর তাকে স্পর্শ করে না। সে একদম বনাময় হয়ে যায়। এখনও তাই হয়ে আছে সে। একটু বাদেই রক্ত ছিটকোবে, হাড় মাসে ইস্পাতের শব্দ উঠবে, গোঙানি, চেঁচানি কত কী ঘটতে থাকবে। এ সময়েও বনার চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক রেখেছে। সব সময়ে রাখে। তাই তাকে ভারী ঠাণ্ডা আর ধীর স্থির দেখায়।

কুঞ্জর সঙ্গে রবি থাকবে। আর সেইটেই কালিদাসের চিন্তা। কুঞ্জকে মারার করা, রবিকে নয়। কালিদাসের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। সে বোঝে, রবির বেঁচে থাকা মানে সাক্ষী রইল। রবি অবশ্য পালাবে। তা পালালেও কিছু না কিছু তো তার নজরে পড়বেই! সাক্ষীর শেষ রাখাটা ঠিক হচ্ছে কিনা তা সে ভেবে পায় না। যাই হোক, কুঞ্জর যে আজ আর শেষ রাখা হবে না তা কালিদাস খুব জানে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, কুঞ্জ প্রথম জখমে মুখ থুবড়ে পড়লেই সে গিয়ে তার পকেট হাতড়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিটা সরিয়ে ফেলবে। এর আগের বার গলার নলি কাটা পড়েও কুঞ্জ বেঁচে যায়। তারও আগে বল্লম খেয়ে বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছিল। কুঞ্জ মরেনি। হোমিওপ্যাথি ছাড়া আর কী হতে পারে? কালিদাস অনেকক্ষণ ধরেই টের পাচ্ছে যে, পটলের হাঁফির টান উঠেছে। কাশছে মাঝে মাঝে।

খালের ওধারে সরু পিচের রাস্তা কল্যাণী কটন মিল অবধি গেছে। সেই রাস্তা থেকে আবার একটা পিচরাস্তা বাঁ ধারে ধনুকের মতো বেঁকে হাইস্কুলের বাহারি বাড়িটার গা ঘেঁষে তেঁতুলতলায় ঢুকেছে। তেঁতুলতলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি লোকবসতি। বাইরের লোকজন নয়, তেঁতুলতলায় কল্যাণী কটন মিলের মালিক ভঞ্জদের বাস। তারাই একশো ঘর। জ্ঞাতিগুষ্টি দূরে যারা ছিল তারাও কিছু এসে গেড়ে বসেছে। ভঞ্জদের জামাই বংশও আছে কয়েক ঘর। কুঞ্জনাথের বাবা হরিনাথও ছিল এদের জামাই।

পিচ রাস্তা দিয়ে গুড় গুড় করে একটা স্কুটার গেল। খুব জোর যাচ্ছে। ধনুকের মতো বাঁকা পথে সেটা ঢুকতেই আলো দেখা গেল। রেবন্ত বহু দূরের আলোটা দেখে। গিরিধারী ভঞ্জই হবে। ললিতমোহনের এই একটি ছেলেই কিছু শৌখিন। স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে স্কুটার জমা রেখে রোজ ট্রেন ধরে কলকাতায় ফুর্তি করতে যায়। এতক্ষণে ফিরছে। তবে কুঞ্জর আসারও আর দেরি নেই।

কিন্তু বৃষ্টিও আসছে। ঠেকানো গেল না। বহু দূরের মাঠে বৃষ্টির ঝিন ঝিন শব্দ।

২

বাজারের মধ্যে ব্রজেশ্বরী গ্রন্থাগার। আসলে পুরোটাই এক মুদিখানা। একধারে হলদি কাঠের একটা মাঝারি আলমারিতে শ দুয়েক বই। আলমারির পাশে একটা চৌকি। তাতে মাদুর পাতা। চৌকির মাঝামাঝি একটা জানালা। ওপাশে খাল। গাছপালার ডগা জানলায় উঁকি মারে।

চৌকিতে বসে জানালার বাইরে ঘরের বিজলি বাতির আভায় যতটুকু দেখা যায় ততটুকু অন্ধকারে মাখা একটু সবুজ দেখছিল রাজু। খুব মন দিয়ে দেখছিল।

গ্রন্থাগার আর মুদির দোকান একসঙ্গে চালায় তেজেন। তার একটু লেখালেখির বাতিক আছে। রাজু এর আগে আরও কয়েকবার এসেছিল, তখন তেজেন তাকে গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ শুনিয়েছে। রাজু হাঁ হুঁ কিছু বলেনি। লেখা যেমনই হোক তেজেন লোকটা ভারী সরল। বি এ পাশ করে বসে বসে এইসব করে। প্রায়ই বলে—আমার কিছু হবে না, না রাজুবাবু?

গ্লাসের চা শেষ হয়ে গেছে। তেজেন পান আনাল। কুঞ্জ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা বলছে।

রাজুর হাতে পান দিয়ে তেজেন বলে—আপনি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন।

রাজুকে এ কথাটা ভীষণ চমকে দেয়। বুকে ঘুলিয়ে ওঠে একটা ভয়। মাথা দপ দপ করতে থাকে।

কুঞ্জ তেজেনের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। তারপর পানের পিক ফেলে—তোর মাথা। এই শীতে সকলেরই শরীরের রস কষ কিছু টেনে যায়।

—না। কিন্তু—তেজেন আরও কী বলতে যায়। কুঞ্জর ইঙ্গিতটা সে ধরতে পারেনি।

কুঞ্জ টপ করে বলে—রাজুর ঝোলায় দুটো বই আছে। চাইলেই রাজু তোর লাইব্রেরিতে দিয়ে দেবে।

রাজুর দিকে চেয়ে তেজেন সোৎসাহে বলে—কী বই?

রাজুর মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল। চোখে একটা জ্বলজ্বলে চাউনি। শ্বাস জোরে চলছে। তেজেনের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

মুখ নামিয়ে রাজু তার শান্তিনিকেতনি ঝোলায় হাত পুরে দুটো বই বের করে দেয়। একটা নভেম্বর মাসের রিডারস ডাইজেস্ট আর একটা ইউ এস আই এস থেকে পাওয়া সল বেলোর উপন্যাস। তেজেনের লাইব্রেরির সভ্যরা ছোঁবেও না। তবু তেজেন খুশি হয়ে বলে—যদি দেন তো দু লাইন উপহার বলে লিখে দেবেন।

রাজু একটু হেসে বলে—দিলাম। লেখা-টেখার দরকার নেই।

এই তেজেনের দিকে চেয়েই রাজুর বুকের ভয়টা একটু থিতিয়ে পড়ে। বই-পাগল সাহিত্য-পাগল এই ছেলেটা কী ব্যর্থ চেষ্টায় লাইব্রেরি বানানোর কাজে লেগে আছে! ছোট থেকে এখন কেউ বড় হয় না। সে যুগ আর নেই। তেজেনের দিকে চেয়ে রাজু ওর ব্যর্থতাকে দেখতে পায়। ভারী মায়া হয় তার।

রবি কোথায় গিয়েছিল। একটা থলে হাতে দরজায় উদয় হয়ে বলল—জল আসছে কুঞ্জদা।

—চল। কুঞ্জ বলে—ওঠ রে রাজু।

তেজেন জিজ্ঞেস করে—আছেন তো কয়েকদিন?

রাজু মাথা নাড়ে—না, কাল পরশুই ফিরব।

—থাকুন না কদিন। একদিন সবাই মিলে বসি একসঙ্গে। এদিকে তো সাহিত্য নিয়ে কথা বলার লোক নেই।

—আবার আসব।

রাজু উঠে পড়ে।

রাস্তায় নেমে এসে যে তারা হন হন করে হাঁটা দেবে তার জো নেই। দুপা এগোতে না এগোতেই কেউ না কেউ কুঞ্জকে ডাকবেই। —ও কুঞ্জদা! কুঞ্জবাবু নাকি? এই কুঞ্জ!

সেবার কুঞ্জ ভোটে দাঁড়িয়ে খুব অল্পের জন্য হেরে যায়। তখন পুরনো কংগ্রেসে ছিল। তারপর হাওয়া বুঝে নতুন কংগ্রেসে নাম লেখাল। কিন্তু নমিনেশন পেল না। এখন রাজনীতির হাওয়া এত উল্টোপাল্টা যে, কোন দলে নাম লেখাবে তা বুঝতে পারছে না। তবে হাল ছাড়েনি। বাপ কিছু টাকা বোধ হয় রেখে গেছে, জমি আছে, বুড়ি দিদিমাও নাকি মরার সময় কিছু লিখে-টিখে দিতে পারে। তবে ভাগীদারও অনেক। ভাইরা আছে, তিন তিনটে বোন বিয়ের বাকি। কুঞ্জর সবচেয়ে বড় মূলধন তার মুখের মিষ্টি কথা। শরীরে রাগ নেই। কাউকে অবহেলা করে না। ওই আকাট বোকা রবি যে রবি সেও কুঞ্জর কাছে যথেষ্ট মূল্য পায়। তাই আঠা হয়ে লেগে থাকে। দু-দুবার কুঞ্জ মরতে মরতে বেঁচেছে। ঘাড়ের জখমের জন্য এখনও বাঁ দিকে মুখ ঘোরাতে পারে না ভাল করে। ঠাণ্ডা লাগলে ডান দিকের ফুসফুসে জল জমে যাওয়ার ভয় থাকে। তবু সে থেমে নেই। তার এই অসম্ভব কাজে ব্যস্ত জীবনটাকে রাজু তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু কুঞ্জকে সে যে ভালবাসে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাস্তায় তিন-চারজন লোক জুটল সঙ্গে। হাঁটার গতি কমে গেল। টর্চ জ্বেলে রবি পথ দেখাচ্ছে। চারদিকে নিকষ্যি অন্ধকার। আঁধারে রাজুর হাঁফ ধরে। সে কখনও আলো ভালবাসে, কখনও অন্ধকার, কখনও অনেক লোকজনের সঙ্গ তার পছন্দ, কখনও নির্জনতা। আজকাল তার এ সব হয়েছে। সেই যে

একদিন সেই ভয়াবহ স্বপ্নটা দেখেছিল, তারপর থেকে...

রবি বাঁ ধারে টর্চ ফেলে দাঁড়িয়ে। বড় রাস্তা থেকে পায়ের পথ নেমে গেছে। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে মেঠো পথে গেলে পথ অর্ধেক। রাজু অনেকবার গেছে।

লোকজন বিদায় নিল এখান থেকে। কুঞ্জ ডাকল—রাজু, আয় রে!

রাজু সামনের গাছপালায় ঘন হয়ে ওঠা পাথুরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চাপা স্বরে বলে—সাপ খোপ নেই তো!

বলেই রাজুর খেয়াল হয়, এ তার শহুরে ভয়। এখন শীতকাল, সাপ বড় বেরোয় না।

সাপের কথায় রবি টর্চের মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ফেলে বলে—নেই আবার! মেলা আস্তিক। এই পোলের ধারেই তো কদমকে ঠুকেছিল। ইয়া চিতি! ওঝা ডাকার সময়ও দেয়নি।

কুঞ্জ বলল—ধুঃ! আয় তো। রোজ যাচ্ছি। রবিটার মাথায় কিছু নেই। কদমকে কামড়েছিল বদরুদের বেড়ার ধারে, সে কি এখানে?

পোলের ওপর উঠে রবি টর্চ মেরে জল দেখে খুব বিজ্ঞের মতো বলে—দ্যাখো কুঞ্জদা, চিত্ত জানা ডিজেলে কেমন জল টানছে। এরপর কিন্তু কাদা ছাড়া খালে কিছু থাকবে না।

—তোর মাথা। চল, বৃষ্টি আসছে। কুঞ্জ সস্নেহে ধমক দেয়।

রাজু জানে, রবি একটা আস্ত ছাগল। বোধবুদ্ধি নেই, পেটে কথা রাখতে পারে না, রাস্তায় বেরোলেই লোকে পিছু লাগে, খ্যাপায়। অতিরিক্ত কথা কয় আর হাবিজাবি বকে বলে তিন মিনিটে লোকে ওকে বুঝে ফেলে, সঙ্গ এড়াতে চায়। কিন্তু ভোটপ্রার্থী কুঞ্জ হচ্ছে আলাদা ধাতের লোক। কারও ওপর না চটা, কাউকে এড়িয়ে না চলা, কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা না করার একরকম অভ্যাস গজিয়ে গেছে তার। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বোকা রবি ছায়া হয়ে ঘুরছে তার সঙ্গে, তবু কুঞ্জর মাথা এখনও বিগড়োয়নি।

রবিকে একটু আগু হতে দিয়ে কুঞ্জ আর রাজু পিছিয়ে পড়ল। কুঞ্জ নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে—তনু চিঠিপত্র দিয়েছে?

—দেবে না কেন? প্রায়ই দেয়।

—সব ভাল তো?

রাজু মনে মনে একটু কষ্ট পায়। এই একটা ব্যাপারে কুঞ্জ বোধ হয় বোকা।

রবি সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে টর্চ ঘুরিয়ে বলে—পা চালাও কুঞ্জদা। এসে গেল জল।

কুঞ্জ বলে—তুই এগো। আমরা কথা কইতে কইতে যাচ্ছি।

রবি এগোয়।

কুঞ্জ আগে, রাজু পিছনে হাঁটে। রাস্তা অন্ধকার বটে, তবে ঘন ঘন আকাশের ঝিলিকে পথ বেশ দেখা যাচ্ছে।

রাজু জানে কুঞ্জ আর একটু কিছু শুনতে চায়। কিন্তু বলার কিছুই নেই। তনু স্বামীর ঘরে সুখেই আছে। কিন্তু সে কথা কি শুনতে চায় কুঞ্জ? বরং ওর ইচ্ছে, এখনও তনু ওর কথা ভেবে স্বামীর ঘর করতে করতেও একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলুক। প্রতি চিঠিতে কুঞ্জর কুশল জানতে চাক। সেই মধ্যযুগীয় ব্যাপার আর কী!

আর এই একটা জায়গাতেই কুঞ্জ বোকা।

একটু চুপ থেকে কুঞ্জ বলে—সিতাংশুবাবুর এখন গ্রেড কত রে?

রাজু মৃদু স্বরে বলে—ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রেড কে জানে বাবা? তবে শুনেছি, হাজার দেড়েকের ওপরে পায়।

—গাড়িও তো আছে?

এ সবই ভাল করে জানে কুঞ্জ। তবু প্রতিবার জিজ্ঞেস করে। এখনও কি নিজের সঙ্গে সিতাংশুকে মনে মনে মিলিয়ে দেখে কুঞ্জ? সিতাংশুর চেহারা মোটাসোটা, কালো, মাঝারি লম্বা। রাজপুত্তুর নয় বটে, কিন্তু সিতাংশু বিরাট বড়লোকের ছেলে, বিলেত-টিলেত ঘুরে এসেছে।

একমাত্র কুঞ্জই জানে না, তনু জীবনে কাউকে সত্যিকারের ভালটাল বাসেনি। খুবই চালাকচতুর ছিল তবু, ছিল কেন, এখনও আছে। খুবই পাকা বিষয়বুদ্ধি তার। স্কুল কলেজে পড়ার সময় রাজ্যের ছেলেকে প্রশ্রয় দিত, নিজের বাপ-ভাই ছাড়া আর বড় বাছবিচার করত না। তা বলে তনু গলেও পড়েনি কারও জন্য। নিজের বোনের জন্য রাজুর লজ্জা বরাবর। কিন্তু তনু যে আগুপিছু না ভেবে কাজ করবে না, হুট করে শরীরঘটিত কেলেঙ্কারি বাঁধাবে না, এ বিষয়ে মা-বাবার মতো রাজুও নিশ্চিন্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত তনু খুবই স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করেছে। এম. এ পাশ করার পর বেছেগুছে নিজের পুরুষ সঙ্গীদের ভিতর থেকে সবচেয়ে সফল আর যোগ্য লোকটিকে বেছে নিয়ে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তনু হয়ে গেছে একেবারে অন্য মানুষ। ঘর-সংসার, টাকা জমানো, স্বামী-শাসন, শ্বশুর-শাশুড়িকে হাত করা ইত্যাদি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে করছে। কে বলবে, এ বিয়ের আগেকার সেই বার-মুখী মেয়েটা!

তনু যখন কিশোরী তখন থেকে কুঞ্জর যাতায়াত। অন্যদের মতো তনু হয়তো কুঞ্জকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। খুব ভালভাবে জানে না রাজু। তবে কুঞ্জর ভাব-সাব দেখে সন্দেহ হত। তনুর কোনও ভাবান্তর ছিল না, সে কুঞ্জকে যদি প্রশ্রয় দিয়েই থাকে তবে তা নিতান্তই অভ্যাসবশে দিয়েছে। তখন কুঞ্জর চেহারা খারাপ ছিল না, কিন্তু চেহারায় পটবার মেয়ে কি তনু? সুপুরুষ দেদার সঙ্গী তার চারদিকে গ্রহমণ্ডলের মতো লেগে থাকত। তনুর সঙ্গী ছেলে ছোকরারাও জানত, তনুকে নিয়ে ফূর্তি দুদিনের। চিড়িয়া একদিন ভাগবে। শুধু কুঞ্জই তা জানত না। আজও তাই জানতে চায়, তনুর স্মৃতিতে সে এখনও একটুখানিও আছে কি না! কুঞ্জ এখনও বিয়ে করেনি, করবে কি না বোঝাও যাচ্ছে না। তবে রাজু বোঝে কুঞ্জ খুব প্রাণপণে বড় হতে চাইছে। বড় কিছু হওয়ার, নামডাকওয়ালা হওয়ার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলল—তনুর বিয়েটা ভালই হয়েছে, কী বল রাজু?

রাজু সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করেই বলল—ভাল হয়েছে বুঝব কী করে? আজকাল বড় চাকরি বা গাড়ি-বাড়ি থাকলেই লোকে সেটা সাকসেস বলে ধরে নেয়। যেন ও ছাড়া জীবনে আর মহৎ কিছু নেই। আমি তো মনে করি, ওর চেয়ে সৎ, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী লোককেই আসলে সাকসেসফুল লোক বলা উচিত।

খুশি হয়ে কুঞ্জ খুব আবেগের গলায় বলে—সে বড় ঠিক কথা। কিন্তু মেয়েরা এ সব বুঝতে চায় না কেন রে? বড় বোকা মেয়েমানুষ জাতটা।

মনে মনে রাজু বলে—কিংবা খুব চালাক।

পুকুরধার, বাগান, নারকোলকুঞ্জের ভিতর দিয়ে পথটা পাক খেতে খেতে গেছে। তারপরই মাঠ। রবি মাঠের ধারে পৌঁছে পিছনে টর্চ মেরে বলে—এসে গেল গো! ভেজা মাটির গন্ধ পাচ্ছি।

গাছের আড়াল সরে যেতেই হাওয়ার ঢল এসে লাগল বুকে। কী শীত! বাতাসে জলের হিম। এত হাওয়ায় শ্বাসকষ্ট হতে থাকে রাজুর। কান কনকন করতে থাকে, নাকের ডগায় জ্বালা। তবু এই মাঠখানা রাজুর বরাবর ভাল লাগে। তেপান্তরের মতো পড়ে আছে উজবুক একটা মাঠ। এখানে সেখানে চাষ হয় বটে, কিন্তু বেশির ভাগটাই এখনও সবুজ। একটা দুটো নৈর্ব্যক্তিক পুকুর আছে, মাঝে মাঝে গাড়লের মতো গজিয়েছে তাল বা নারকোল গাছ। মেঠো পথের ধারে ধারে ঝোপঝাড়ও আছে রহস্যের গন্ধ মেখে। জ্যোৎস্না ফুটলে এ মাঠে বিস্তর পরী নেমে আসবে বলে মনে হয়।

কয়েক কদম আগে আগে কুঞ্জ ভারী আনমনা হয়ে হাঁটছে। ওর মাথা ভর্তি এখন তনুর স্মৃতি। কত জ্যান্ত আর শরীরী হয়ে তনু ওর মনে হানা দেয় এখনও! ভেবে রাজুর কষ্ট হয়। কুঞ্জর সঙ্গে তনুর অসম্ভব বিয়েটা যদি ঘটনাচক্রে ঘটতই তা হলে কি রাজু খুশি হত? না, কিছুতেই না। তনু ঠিক লোককেই বিয়ে করেছে, এমনকী জাত বর্ণ পর্যন্ত মিলিয়ে। এখন এই বিরহে কাতর কুঞ্জটার জন্য তবে কেন কষ্ট রাজুর? মুখ ফুটে কোনওদিন তনুকে ভালবাসার কথা রাজুকে বলেনি কুঞ্জ, শুধু বরাবর আভাস দিয়েছে।

রবি এদিক ওদিক টর্চ ফেলছে। উল্টোপাল্টা হাওয়ায় মাঝে মাঝে তার গানের শব্দ আসছে। এই বিশাল মাঠে, ঢলানি হাওয়ায়, অন্ধকারে তারা তিনজন যেন বহু দূর-দূর হয়ে গেছে। যেন কেউ কারও নয়। যেই এই একা হওয়ার বোধ এল অমনি রাজুর বুক খামচে ধরল সেই ভয়। সকলের অজান্তে কে এক মৃত্যুর জাল ছুড়ে দিচ্ছে তাকে ধরার জন্য!

রাজুর হাঁফ ধরে যায়। গলার কাছে কী যেন পুঁটুলি পাকিয়ে উঠে ঠেলা দেয়। শরীরের কিছুই তার

বশে থাকে না।

গভীর কালো একটা পাথুরে আকাশে নীলাভ উজ্জ্বল এক রথ কোনাকুনি ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছে— এই স্বপ্ন এক রাতে দেখেছিল সে। আর কিছু নয়, শুধু এক তারা চাঁদ সূর্যহীন নিকষ আকাশ, আর ওই ভুতুড়ে রথ। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তার। শব্দহীন তলহীন ওই কালো আকাশ কখনও দেখেনি সে জীবনে। আর সেই নীল আলোয় মাখা রথই বা এল কোথা থেকে? যতবার সে রাতে ঘুমোতে গেল ততবার দেখল। হুবহু এক স্বপ্ন। কেউ কি দেখে এরকম। শেষ রাতটুকু জেগেই কাটাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মাস তিনেক ধরে প্রতি রাত প্রায় জেগেই কাটে তার।

রথযাত্রায় ছাড়া সারা জীবনে রাজু আর রথ দেখল কই? তা ছাড়া ওরকম নীলাভ সুন্দর রথের ছবিটাই বা সে পেল কোথায়? আকাশটাই বা কালো কেন? কেন ধীরগতিতে রথ উপরে উঠে যাচ্ছে? অনেক যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে এই স্বপ্নের সামাজিক বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে দেখেছে রাজু। কিছু পায়নি। কিন্তু উড়িয়েও দিতে পারেনি কিছুতেই। কেবলই মনে হয়, এই যৌবনের চৌকাঠেই বুঝি মৃত্যুদূত পরোয়ানা নিয়ে এল! কাউকেই স্বপ্নের কথা বলেনি সে। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখেছে, এ স্বপ্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত ছাড়া কিছুই নয়। গত তিন মাসে তার শরীর গেছে অর্ধেক হয়ে। খায় না ভাল করে, ঘুম নেই। সারাদিন একটা দূরের অস্পষ্ট সংকেত টের পায়। রাতে সেটা গাঢ় হয় আরও। মৃত্যু আসছে। আসছে।

এই মাঠের মধ্যে ঠিক তেমনি মনে হল। বড় দামাল হাওয়া, বড় খোলামেলা মাঠ, অনেক দূর হয়ে গেছে লোকজন।

কাতরস্বরে রাজু ডাকে—কুঞ্জ!

কিন্তু কুঞ্জ শোনে না। রাজুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মুছে ফেলে দেয় বাতাস।

সামনে, কিছু দূরে তখন হঠাৎ রবির হাতের টর্চটা ছিটকে পড়েছে মাঠে। পড়ে লাশের মতো স্থির হয়ে একদিকে আলোর চোখ মেলে চেয়ে আছে। সেই আলোয় বিশাল প্রেতের ছায়া নড়ছে। কয়েকটা পা, লাঠি।

রবি কি একবার চেঁচাল? বোঝা গেল না, তবে সে টর্চটা কুড়িয়ে নেয়নি তা বোঝা যাচ্ছিল।

কুঞ্জ হেঁকে বলল—রাজু! ডাইনে নেমে যা।

কাঁপা গলায় রাজু বলে—কেন?

সে কথা কানে গেল না কুঞ্জর। দু হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে সে চেঁচাতে লাগল—খুন! খুন! খুন!

রাজু খুনের মতো কিছু তেমন দেখতে পায়নি। কুঞ্জর মতো তার চোখ অত আঁধার-সওয়া নয়। বিজলি বাতি ছাড়া শহুরে রাজু ভারী অসহায়। কিন্তু কুঞ্জ যখন দেখেছে তখন ঠিকই দেখেছে।

রাজুর বুকে এমন ওলট পালট হচ্ছিল যে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। সে ডানদিকে মাঠের মধ্যে ছুটতে গিয়ে দেখে, পা চলে না। শরীরে খিল ধরে আসছে।

কুঞ্জ চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে সামনে। কিন্তু এই বিশাল মাঠে হাওয়ার ঢল ঠেলে সেই চিৎকার কোথাও যাচ্ছে না। দূরে ভঞ্জদের পাড়ায় নিওন বাতি জ্বলছে, রাস্তায় আলোর সারি। লোকজন রয়েছে। কিন্তু অত দূর পর্যন্ত কোনও সংবাদই পৌঁছচ্ছে না।

মাঠের মধ্যে বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে রাজু সিদ্ধান্ত নিল, কুঞ্জটা মরতে যাচ্ছে, মরবেই।

এটা ভাবতেই তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কুঞ্জকে কি মরতে দেওয়া যায়? যার বুকে অত ভালবাসা? যে কখনও কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করে না? কুঞ্জর মতো ভাল কজন?

রাজু অন্ধকারে পথের ঠাহর না পেয়ে সামনের দিকে জোর কদমে এগোতে থাকে। কয়েক কদম হেঁটে আচমকা দৌড় শুরু করে। ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে পরিশ্রমে। হাতে পায়ে খিল ধরছে, কুঁচকিতে খিচ। তবু প্রাণপণে দৌড়োয় রাজু।

ভঞ্জদের এলাকার উজ্জ্বল আলোর পর্দায় সে কয়েকটা কালো মানুষকে ভুঁইফোড় গজিয়ে উঠতে দেখে সামনে। ওদের হাতে লাঠি বা ওই জাতীয় সব অস্ত্র। মুখে কথা নেই।

এর পর থেকে রাজু সঙ্গে ছোরা রাখবে। খুব আফসোসের সঙ্গে সে উবু হয়ে বসে চারদিক খামচে ঢেলা খুঁজতে গিয়ে একটা ভারী মতো কী পেয়ে গেল। পাল্লাটা খুব দূরের নয়। মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে

উঠল—খবরদার। শালা, খুন করে ফেলব! বলেই সে হাতের ভারী বস্তুটা ছোড়ে।

কারও লাগেনি, রাজু জানে। কিন্তু আততায়ীরা বোধ হয় তৃতীয় কোনও লোককে প্রত্যাশা করেনি। চেঁচানি আর ঢিল ছোড়া দেখে হতভম্ব হয়েই বোধ হয় হঠাৎ অন্ধকারে তারা 'নেই' হয়ে গেল।

রাজু পথে বসে হাঁফাতে থাকে। বুক অসম্ভব কাঁপছে গলা চিরে গেছে।

কুঞ্জ খুবই স্বাভাবিকভাবে মাঠে নেমে জ্বলন্ত টর্চটা কুড়িয়ে চারদিকে ফেলে। তারপর নরম স্বরে বলে—ব্যাটা ভেগেছে।

—কে? রাজু জিজ্ঞেস করে।

—রবি। বলে খুব হাসে কুঞ্জ।

—হাসছিস?

—হাসিই আসে রে! বিপদে আজ পর্যন্ত সঙ্গী পেলাম না। আজ শুধু তুই ছিলি। এই দ্যাখ না, রবিকে তো সবাই আমার ছায়া ভাবে। দ্যাখ, শালা লোক দেখেই টর্চ ফেলে আমাকে রেখে হাওয়া।

—ওরা কারা?

—কে বলবে? তবে ঠাকুরের ইচ্ছেয় শত্রুর তো অভাব নেই। উঠতে পারবি এখন? শরীর খারাপ লাগছে না তো!

রাজু ওঠে। পা দুর্বল, শরীরে থরো-থরো কাঁপুনি।

কুঞ্জ শান্ত গলায় বলে—চ, বৃষ্টি এল বলে।

ভারী নির্বিকার কুঞ্জ। যেন এরকম ঘটনা নিত্য ঘটছে। দেখে রাজুর রক্ত গরম হয়ে যায়। কুঞ্জর ঠাণ্ডা রক্ত তার একদম পছন্দ নয়। বলে—লোকগুলো কোথায় গেল দেখবি তো! পথে যদি আবার অ্যাটাক করে?

কুঞ্জ নিভু-নিভু টর্চটা হাতের তেলোয় ঠুকে তেজ বাড়ানোর অক্ষম চেষ্টা করতে করতে বলল—আর মনে হয়, চেষ্টা করবে না। তোকে দেখে ভয় খেয়েছে। ঠাহর পায়নি তো তুই কে বা কেমন ধারা!

—চিনতে পারিসনি?

—না। রবি হয়তো দেখেছে।

রাজু খুবই রেগে যায় মনে মনে। কিন্তু ওঠেও। টের পায়, ঘটনাটা আচমকা ঘটায় তার কিছু উপকার হয়েছে। মনের স্যাঁতসেঁতে ছিচকাঁদুনে ভাবটা আর নেই। ঝরঝরে লাগছে।

৩

বনশ্রীর চেহারা ঠিক তার নামের মতোই, তাকে দেখলে যে কোনও পুরুষেরই গাছের ছায়া বা দীঘির গভীর জলের কথা মনে পড়তে পারে। বনশ্রী নিজেও জানে তার চেহারায় তাপ নেই, তীক্ষ্ণতা নেই, আছে স্নিগ্ধ লাবণ্য। তাকে কেউ মা বলে ডাকলে ভারী ভাল লাগে তার।

সবার আগে বলতে হয় তার চুলের ঐশ্বর্যের কথা। কালো নদীর মতো স্রোত নেমে এসেছে। তাতে সামান্য ঢেউ-ঢেউ। এলো করলে আস্ত একটা কুলো দিয়েও ঢাকা যায় না। তার গায়ের রং যেন কালো চুলেরই ছায়া। একবার এক পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে এসে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল—এ তো কালো! অহংকারী বনশ্রী লজ্জায় নতমুখী হয়েছিল। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—আপনি ভুল করছেন। আপনার চোখ নেই। বলেনি বটে, কিন্তু বনশ্রী মনে মনে ঠিক জানে যারা দেখতে জানে তারা দেখবে, এ রঙের কালো ফর্সা হয় না। এ হল বনের গভীর ছায়া, এ হল দীঘির জলের গভীরতা। সে দেখেছে, পুরুষ মানুষ যখন তার দিকে তাকায় তখন ওদের তেমন কাম ভাব জাগে না, কিন্তু বুক জুড়ে একটা পুরনো তেষ্টা জেগে ওঠে। খুব বেশি পুরুষ যে তাকে দেখে তা নয়, কিন্তু যারা দেখে তাদের চোখ স্বপ্নের চোখ হয়ে যায়। এ সব কি তার কল্পনা? ভুল ভাবা? ভাবতে ভাবতে সারা দিন শতবার আয়নায় মুখ দেখে বনশ্রী। কেমন মুখ? একটু লম্বাটে গড়ন, গালের ডৌলটি লাউয়ের ঢলের মতো। ঘন জোড়া ভ্রূ। এই একটু খুঁত তার, জোড়া বাঁধা ভ্রূ নাকি ভাল নয়। কিন্তু তার নীচে চোখ দুটির দিকে তাকাও। এমন মায়াভরা চোখ দ্যাখেনি কেউ। অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয় সীমানা ছাড়ানো তার দুই চোখ। চোখের মণি যেন

দুধ-পুকুরে এক গ্রহণ-লাগা চাঁদের ছায়া। নাক চাপা বলে দুঃখ নেই বনশ্রীর। তবে ছোট বেলায় একবার বোলপুর রেলস্টেশনে একটা লোক তার নাকছাবি ছিঁড়ে নিয়েছিল নাক থেকে। সেই ক্ষতের দাগ আজও আছে। তার ঠোঁট শীতকালেও কখনও ফাটে না। সব সময়ে টই-টুম্বুর হয়ে আছে পাকা ফলের মতো। লম্বা নয় বনশ্রী, কিন্তু ছোট মাপের মধ্যে তার শরীর স্বাস্থ্য ঢলঢলে। বনশ্রী নিজের রূপে মুগ্ধ বটে, কিন্তু কখনও শরীর বসিয়ে রেখে গতরখাস হওয়ার চেষ্টা করে না। রোদে-জলে সে গাঁয়ের পর গাঁ হেঁটে গ্রাম-সেবিকার কাজ করেছে। হরেক রকম ত্রাণকাজে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে গঞ্জে। কলেজে ইউনিয়ন করার সময় উদয়াস্ত খেটেছে নাওয়া খাওয়া ভুলে।

সে জীবনটা চুকেবুকে গেছে বনশ্রীর। এখন তাকে ঘরেই থাকতে হয়। বরং বলা চলে, ঘরে বসে তাকে অপেক্ষা করতে হয় বিয়ের জন্য। মাঝে মধ্যে পাত্রপক্ষ আসছেও। কেউ কেউ পছন্দও করছে। কিন্তু বড্ড খাঁই তাদের। মিল হতে গিয়েও ফসকে যাচ্ছে নানা গেরোয়। একটা বিয়ে সব ঠিকঠাক, শোনা গেল পাত্র দুম করে আর একজনকে রেজিস্ট্রি করেছে। আর একজন এসেছিল তুকারাম রাঠোর। তারা নাকি তিন পুরুষ ধরে কলকাতায়, বাঙালিদের সঙ্গে বিয়ে শাদি। কিন্তু বাবা বললেন, রাঠোরটা কিছু কঠোর হয়ে যাচ্ছে। আমার নরম মেয়েটার সইবে না। খুব হাসি হয়েছিল সেই নিয়ে। বনশ্রীর বিয়ে নিয়ে কখনও মজার, কখনও দুঃখের, কখনও হতাশার নানা ঘটনা ঘটছে। বাবা সত্যব্রত এক সময়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে কিছুদিন ছাত্র ছিলেন । রবি ঠাকুরকে দেখেছেন। মাঝে মধ্যে তীর্থযাত্রার মতো সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যান। তাঁর ইচ্ছে, বনশ্রীর বিয়ে হোক এমন ছেলের সঙ্গে যে শিল্প বোঝে।

ইচ্ছে করলে বনশ্রী কাউকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু বনশ্রী এই একটা ব্যাপার কখনও মনে মনে পছন্দ করেনি। ছেলে-ছোকরাদের ভারী দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছটফটে আর অবিশ্বাসী মনে হয় তার। সে পছন্দ করে একটু বয়স্ক লোক। অন্তত দশ বছরের বড়, বেশ ধীরস্থির বিবেচক, দায়িত্ববান। খুব পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত পুরুষ হবে সে। গভীর মায়া থাকবে সংসারে, চরিত্রবান হবে, ইতি-উতি তাকাবে না, ছোঁক ছোঁক করবে না। তা ছাড়া বনশ্রী ভাবে, একটা লোকই তাকে পছন্দ করে নিয়ে যাবে, সেটা যেন বড় একপেশে ব্যাপার। সে চায়, পাত্রের গোটা পরিবার তাকে পছন্দ করুক, তারিফ করুক, সবাই মিলে সাদরে গ্রহণ করুক তাকে। সেই ধরনের সম্মান আলাদা। হোটেল রেস্টুরেন্ট ঘুরে, ফাঁকা কথায় পরস্পরকে ভুলিয়ে, নিতান্ত লোভে কামুকতায় জৈবিক ইচ্ছেয় বিয়ে সে কোনওদিন চায়নি। তাই কখনও কারও সঙ্গে প্রেম হয়নি তার, যদিও বহুজন পেয়ে বসতে চেষ্টা করেছে। কত চিঠি আসত তখন। কত ইশারা ইঙ্গিত ছিল চারপাশে। নোংরামিই বা কম কী দেখেছে বনশ্রী। পথেঘাটে সুযোগ বুঝে ইতর পুরুষেরা অশ্লীল নানা মুদ্রা দেখানোর চেষ্টাও করেছে কতবার।

বনশ্রীকে তাই আজও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। নিজের স্নিগ্ধ ছায়া নিয়ে বসে আছে সে। এক দিন সেই পরম মানুষটি বহুদূর থেকে হাক্লান্ত হেঁটে এসে ঠিক বসবে ছায়ায়। তাকে জুড়িয়ে দেবে বনশ্রী।

বিনা কাজে আজও দুপুরে এসেছিল রেবন্তদা—তার জামাইবাবু। যদি বনশ্রী বুকে হাত দিয়ে বলে যে রেবন্ত লোকটাকে সে দু চোখে দেখতে পারে না তা হলে মিছে কথা বলা হবে। লম্বাটে গড়নের ভাবুক ও অন্যমনস্ক রেবন্তকে প্রথম থেকেই তার ভাল লেগেছিল। দিদি শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ নয়, বনার মতোই। তবে তার বুদ্ধি বড় কম। অল্পে রেগে যায়, সামান্য কথা নিয়ে তুলকালাম বাঁধায়। ওদের সংসারে শান্তি নেই। শ্যামশ্রীও খুব ঠ্যাঁটা মেয়ে, রেবন্তদা যা পছন্দ করে না ঠিক সেইটা জোর করে করবে। বিয়ের পর যেটা নিয়ে ওদের সবচেয়ে বেশি অবনিবনা হয়েছিল সেটা হল চরকা। আদর্শগত দিক দিয়ে রেবন্ত চরকার বিরুদ্ধে।

অথচ মা সবিতাশ্রীর প্রভাবে তারা তিন বোনই চরকা কাটতে শিখেছে। সবিতাশ্রীর বাবা কট্টর গান্ধীবাদী ছিলেন এবং এখনও আছেন। সরল ঋজু চেহারার মানুষ, ছাগলের দুধই তাঁর প্রধান পথ্য। খুব ভোরে উঠে চরকা কাটতে বসেন। বাড়ির প্রত্যেককেই দিনের কোনও না কোনও সময়ে কিছুক্ষণ চরকা কাটতেই হবে, তাঁর অনুশাসনে। গান্ধীজির আদর্শ অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাউকে কাউকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আগ্রহ ছিল তাঁর। গান্ধীজি একবার নাকি সি আর দাশকেও বলেছিলেন, তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্তত একজনকে হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। সবিতাশ্রীর

বাবার সেই আগ্রহ অবশ্য কাজে পরিণত হয়নি। এ নিয়ে সত্যব্রত নানা তর্ক করেছেন। এখনও স্ত্রীকে বলেন—তোমাদের গান্ধীজি পরম রামভক্ত ছিলেন। অথচ শম্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙেছিল বলে স্বয়ং রামচন্দ্র ওকে চরম দণ্ড দেন। তা হলে বর্ণাশ্রমের সমর্থক রামচন্দ্রের ভক্ত হয়ে গান্ধীজি বর্ণাশ্রম ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন কেন? সবিতাশ্রী এর সঠিক জবাব দিতে পারেন না, বলেন—সে আমলের কথা আলাদা। সমাজ কত পাল্টে গেছে। সত্যব্রত বলেন— বাইরেটা পাল্টায় বটে কিন্তু তা বলে মানুষের রক্ত তো নীল হয়ে যায়নি। ভিতরটা পাল্টায় না। রবীন্দ্র-ভক্ত সত্যব্রত হিন্দুই বটে, ব্রাহ্ম নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শে তিনি কিছুটা বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন একদা। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরের পরম গান্ধীভক্তি দেখে এবং সবিতাশ্রীকেও যে একদা হরিজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তা জেনে তিনি কঠোর বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন। শ্বশুরের সঙ্গে ঘোর তর্ক জুড়তেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের বক্তব্যকেও প্রকাশ্যে নস্যাৎ করতে লাগলেন। এখন আর স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করেন না বটে তবে মাঝে মাঝে ফুট কাটেন—ওগো শুনছ, এই দ্যাখো খবরের কাগজে লিখেছে পশ্চিমবাংলার একজন পরম গান্ধীবাদী নেতা খুব মাংস খেতে ভালবাসেন। সবিতাশ্রী অবাক হয়ে বলেন—তাতে কী? সত্যব্রত খুব হেসে বলেন, স্বয়ং গান্ধী বলতেন আমি লাঠি ভেঙে ফেলব তবু সাপকে মারব না। তা ওরকম গোঁয়ার অহিংস মানুষের চ্যালারা মাংস খাচ্ছে, এটা একটু কেমন কেমন লাগে না!

সে সব দিন পার হয়ে গেছে! এখন গোটা ব্যাপারটাই পরিহাসের বিষয়। বিয়ের সময় সবিতাশ্রীকে তাঁর বাবা একটি চরকা উপহার দেন যথারীতি। সবিতাশ্রী আগে অভ্যাসবশে রোজ চরকা কাটতেন। ছেলেমেয়ে হলে তাদেরও শেখালেন। শ্যামশ্রী, বনশ্রী, চিরশ্রী এবং শুভশ্রী চমৎকার চরকা কাটতে শিখল। কিন্তু অনুশাসন বজায় রাখার জন্য কোনও গান্ধীবাদী তো এ সংসারে নেই। তাই চরকার অভ্যাস ক্রমে শ্লথ হয়ে এল। এখন সংসারে নানা কাজ আর সম্পর্কে জড়িত সবিতাশ্রী কেবল গান্ধীজির জন্মদিনে কিছুক্ষণ চরকা কাটেন। ছেলেমেয়েরা আর চরকা ছোঁয়ও না। কিন্তু শ্যামশ্রীর বিয়ের সময় দাদু লোক মারফত উপহার বলে একটি চরকা পাঠিয়ে দিলেন। বিয়ের আসরে সেই চরকা দেখে প্রথম হাসাহাসি তারপর কিছু গুঞ্জন উঠল। বোকা কিন্তু জেদি শ্যামশ্রী সেইটেই অপমান বলে ধরে নেয়। অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রোজ চরকা কাটে। রেবন্তর সঙ্গেও তার সেই নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

কিন্তু বনশ্রী জানে, চরকা থেকে ঝগড়াটা জন্মায়নি। দু-চার দিনেই চরকাটা হয় শ্যামশ্রী ভুলে যেত, নয়তো রেবন্ত দেখেও দেখত না। চরকাটা কারণ নয়, উপলক্ষ মাত্র। ব্যক্তিত্ববান পুরুষরা জেদি মেয়ে পছন্দ করে না, জেদি মেয়েরা পছন্দ করে না পুরুষের খবরদারি। এ হল স্বভাবের অমিল।

কিন্তু এ ছাড়াও একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সেই কারণের কথা ভাবতে বনশ্রী ভয় পায়। বড় ভয় পায়। বছর দেড়েক আগে শ্যামশ্রীর যখন বিয়ে হয় তখন বনশ্রীও বিয়ের যুগ্যি যুবতী। তখন সে বেশ ভাল করে পুরুষের দৃষ্টি অনুবাদ করতে পারে। সেই বিয়ের ছ মাসের মধ্যেই সে তার নতুন জামাইবাবুর চোখে অন্য আলো দেখতে পায়। সেই থেকে ভয়।

বাইরে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কোথায় কোনও বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে রেবন্ত তাকে এক-আধ পলক নিবিড় বিহ্বল চোখে দেখে। ঘুরে ঘুরে তাকেই দেখতে আসে না কি? যেমন আজও এসেছিল? এক দিন দুপুরে বনশ্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি হতে থাকে তার। কেমন অস্বস্তি তা বলতে পারবে না, তবে কেমন যেন তার ভিতর থেকেই কেউ তাকে জেগে উঠবার ইশারা দিচ্ছিল বার বার। বেশ চমকে জেগে উঠেছিল সে। আর জেগেই দেখল তার পায়ের দিকে খাটে রেবন্ত বসে আছে। মুখে সামান্য হাসি, চোখে অপরাধীর দৃষ্টি। না, রেবন্ত কোনওদিন তার গায়ে হাত দেয়নি, কখনও খারাপ ইঙ্গিত করেনি। তবে ওই বসে থাকাটা একটু কেমন যেন। যুবতী মেয়ের ঘুমের শরীর পুরুষ দেখবেই বা কেন? বনশ্রী জাগতেই রেবন্ত বলল—বসে বসে তোমার পা দেখছিলাম। বনশ্রী তো লজ্জায় মরে যায়। ছি ছি, পায়ের ডিম পর্যন্ত শাড়ি উঠে আছে। ধড়মড়িয়ে বসে সে ঢাকাঢুকি দিল। তখন রেবন্ত বলল—বনা, লজ্জা পেয়ো না, কিন্তু এমন সুন্দর পায়ের গঠন কোনও মেয়ের দেখিনি। এ খুব ভাগ্যবতীর লক্ষণ।

সেই থেকে কেমন খটকা।

জামাইদের ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি আসাটাও তো খুব স্বাভাবিক নয়। এখান থেকে রেবন্তর গাঁ কাছেই। শ্যামপুর। কিন্তু কাছে বলেই যে আসবে তারও তো মানে নেই। এমনিতেই গাঁয়ের জামাইদের পায়াভারী। ন মাসে ছ মাসে পায়ে ধরে যেচে আনতে হয়। স্বভাব অনুযায়ী রেবন্তর আরও পায়াভারী হওয়ার কথা। সে খুব আত্মসচেতন, রাগি, খুঁতখুঁতে। তবে আসে কেন?

আজ দুপুরের দিকে এল। রুক্ষ চেহারা, দাড়ি কামায়নি, চোখের দৃষ্টিও এলোমেলো। কথাবার্তাও কিছু অসংলগ্ন ছিল। বাইরে থেকে ডাকছিল—চিরু, এই চিরু।

চিরশ্রী তখন বাড়িতে ছিল না, স্কুলে ছিল।

—বাইরে থেকে কে ডাকে দ্যাখ তো। জামাইয়ের গলা নয়? সবিতাশ্রী বনাকে ডেকে বলেন।

বাইরে থেকে ডাকার কিছু নেই। রেবন্ত অনায়াসে ঘরে দোরে ঢোকে। বনা গিয়ে দেখে বারান্দায় কাঁঠাল কাঠের চৌকিতে চুপ করে বসে আছে। একটু আগে পাড়ার বিশু, বাবুয়া আর কটা পাড়ার ছেলে মিলে টোয়েন্টি নাইন খেলছিল। তাস তখনও পড়ে আছে চিত উপুড় হয়ে। রেবন্ত একদৃষ্টে সেই তাসের দিকে চেয়ে। বারান্দায় ঠেস দেওয়া তার সাইকেল।

বনা যথেষ্ট অবাক ভাব দেখিয়ে বলল—ওমা। জামাইবাবু! বাইরে বসে কেন?

রেবন্ত খুব কাতর দুর্বল এক দৃষ্টিতে চাইল বনার দিকে। বলল—আমি এক্ষুনি চলে যাব।

কথাটার মানেই হয় না। চলে যাবে তো এলে কেন? তবু বনা বলে—যাবেন তো, তাড়া কী? মা ডাকছে চলুন। চা বসাই গিয়ে।

রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আমার সঙ্গে লোক আছে।

বনা কথাটা বুঝল না, বলল—তাতে কী? লোকদের ডেকে আনুন না, সবাই বসবেন, চা করে দিচ্ছি।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলল—তা হয় না। কাজ আছে। জরুরি কাজ।

বনা অবশ্য কোনও লোককে দেখতে পায়নি। রাস্তার লোককে বাড়ি থেকে দেখার উপায়ও নেই। সামনে অফুরন্ত বাগান, খানিকটা খেত। মেহেদির উঁচু বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে নিম আম জাম তেঁতুল জামরুল গাছের নিবিড় প্রতিরোধ। তার ওপর এবার অড়হর চাষ হয়েছে বড় জায়গা জুড়ে। সেই ঢ্যাঙা গাছের মাথা দেড় মানুষ পর্যন্ত উঁচু হয়ে সব আড়াল করেছে।

বনা বলল—মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে সকাল থেকে কিছু খাননি। চারটি মুড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছি, ডাল তরকারি দিয়ে খেয়ে তারপর রাজ্য জয়ে যাবেন খন।

রেবন্ত হাঁ করে বনার দিকে চেয়ে থেকে বলল—আমাকে কি খুব শুকনো দেখাচ্ছে? বনা ফাঁপরে পড়ে যায়। শুকনো দেখাচ্ছে বললে জামাইবাবুর যদি মন খারাপ হয়ে যায়? রোগা বলে রেবন্তর কিছু মন খারাপের ব্যাপার আছে। প্রায়ই জিজ্ঞাসা—আমার স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে ভাল হয়নি? বনা তাই দোনো-মোনো করে বলে—রোদে এসেছেন তো তাই।

নিজের গালে হাত বুলিয়ে অন্য মনে কিছুক্ষণ বসে থেকে রেবন্ত বলে—আজ দাড়িটাও কামানো হয়নি।

গাঁয়ের কোনও লোকই রোজ দাড়ি কামায় না। এমনকী বড় ভঞ্জবাবু পর্যন্ত নির্বাচনী সভায় তিন দিনের খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি নিয়ে বক্তৃতা করছেন—এ দৃশ্য বনশ্রী দেখেছে। তবে রেবন্ত শ্বশুরবাড়ি আসার সময় দাড়ি কামিয়ে আসবেই। বেশির ভাগ দিনই বোধ হয় বাজারের সেলুন থেকে কাজ সেরে আসে, গালে ভেজা সাবানের দাগ লেগে থাকে।

বনা বলল—এখন আপনি আমাদের পুরনো জামাই, শ্বশুরবাড়ি আসতে বেশি নিয়ম কানুনের দরকার হয় না। উঠুন তো, ভিতরে চলুন। সঙ্গের লোকের কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? ডেকে আনুনগে তাদের।

রেবন্ত মাথা নেড়ে বলে—ওরা আসবে না।

কথাটা বনার ভাল লাগল না। রেবন্ত যে আজকাল কিছু আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেশে তা শ্যামশ্রীই বলে গেছে। বাবাও একদিন দেখেছেন, জামাই পটলের সঙ্গে বাগনান স্টেশনে বসে আছে। দৃশ্যটা ভাল ঠেকেনি তাঁর চোখে। পটলটা মহা বদমাশ।

সুন্দর চেহারার ভাবুক রেবন্ত কেন বদ লোকের সঙ্গে মেশে তা আকাশ পাতাল ভেবেও কূল করতে পারে না বনশ্রী। শুধু মনটা খারাপ হয়ে যায়।

রেবন্ত বনশ্রীর চোখে চোখ রেখে বলল—আমি যদি আর কখনও না আসি বনা?

বনশ্রী চমকে উঠে বলে—ও কী কথা?

রেবন্ত ম্লান হেসে বলে—অনেক কিছু ঘটতে পারে তো?

বনশ্রীর বুক কাঁপছিল। বলল—কী হয়েছে আপনার বলুন তো! দিদি কিছু বলেছে?

—সে কথা নয়। বলে রেবন্ত তার সাইকেলটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

এ সময়ে সবিতাশ্রী পরিষ্কার কাপড় পরে ঘোমটা অল্প টেনে শান্ত পায়ে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে বলেন—রোদে এসেছ, স্নান করে দুটি খেয়ে যাও।

রেবন্ত অবশ্য রাজি হয়নি। বলল—না, আমার কাজ আছে।

বনশ্রী চা করে দিল। সেটা খেয়েই সাইকেলে চলে গেল রেবন্ত। বনশ্রী মাকে বলল—দিদির সঙ্গে আবার বোধ হয় বেঁধেছে।

গান্ধীবাদী শিক্ষার দরুন সবিতাশ্রীর ধৈর্য খুব বেশি। সহজে রাগ উত্তেজনা হয় না, সব ব্যাপারেই কিছু অহিংস নীতির সমাধান ভেবে বের করতে চেষ্টা করেন। বললেন—জামাইকে দোষ দিই না, শ্যামা বড় জেদি।

বনশ্রী বলল—জামাইবাবুর আজকের চেহারাটা কিন্তু ভাল নয় মা। খুব একটা কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে। তুমি বরং দিদির কাছে কাউকে পাঠিয়ে খবর নাও।

বিকেলের আগেই শুভ সাইকেলে দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলল—দিদি বলেছে জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়নি। তবে কদিন ধরে নাকি জামাইবাবু রাতটুকু ছাড়া বাড়িতে থাকে না, খেতেও যায় না। বাড়ির কেউ কিছু জানে না, কাউকে বলে না কোথায় যায়। দিদি জিজ্ঞেস করে জবাব পায়নি।

সত্যব্রত এ সব খবর জানেন না। কিন্তু বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুতে উঠোনের কোণে পাতা পিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে পায়ে পা ঘষতে ঘষতে সবিতাশ্রীকে বললেন—আজ ইস্কুলের কাজে দুপুরে বাগনান গিয়েছিলাম। ফেরার পথে শ্যামার বাড়ি যাই। সেখানে শুনলাম অমিতার সব ঘটনা নাকি রেবন্ত জানতে পেরেছে। শ্যামার সঙ্গে তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। বলেছে নাকি আগে জানলে এ বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করত না।

অমিতা সবিতাশ্রীর ছোট বোন। খুবই তেজি মেয়ে এবং সমাজকর্মী। কুমারী বয়সে একবার সে সন্তানসম্ভবা হয়। এ নিয়ে হইচই খুব একটা হতে দেননি সবিতাশ্রীর বাবা। শান্তভাবেই তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, সন্তানটির বাবা কে এবং তার সঙ্গে অমিতার বিয়ে সম্ভব কি না। অমিতা সন্তানের বাবার নাম বলেনি, তবে এ কথা বলে যে বিয়ে সম্ভব নয়। সবিতাশ্রীর বাবা গগনবাবু আর কোনও চাপাচাপি করেননি। যথারীতি অমিতার সন্তান জন্মায়। গগনবাবু সেই উপলক্ষে পাড়ায় মিষ্টি বিলোন। অমিতা কিছুদিন পরেই বাবার আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে চাকরি করতে থাকে। এখন সম্পর্কও রাখে না। ঘটনাটা বহুদিনের পুরনো। লোকে ভুলেও গেছে। অমিতা নামে যে কেউ আছে এ নিতান্ত তার আপনজন ছাড়া আর কারও মনেও পড়ে না।

সবিতাশ্রী চিন্তিত মুখে বললেন—কার কাছ থেকে শুনল?

সত্যব্রত ঠোঁট উল্টে বিরক্তির সঙ্গে বলেন—কে জানে! শ্যামাটা তো বোকার হদ্দ। কোনও সময়ে বলে ফেলেছে হয়তো। তবে জামাই অমিতার কাণ্ডকারখানা শুনে বিগড়োয়নি। সে নাকি শ্যামাকে বলেছে, ও সব আমি অত মানি না, কিন্তু তোমার দাদু লোককে মিষ্টি খাওয়াল কেন? এটা কি আনন্দের ঘটনা? আসলে তোমাদের গুষ্টিই পাগল আর চরিত্রহীন।

সেই বিকেলের দিককার ঘটনা। বনশ্রী বা ভাইবোনরা কেউ মা-বাবার কথার মাঝখানে কথা তোলে না। এই সৎশিক্ষা সবিতাই দিয়েছেন। কিন্তু কথা না বলেও সে শীতের মরা বিকেলের ফ্যাকাশে আলোয় নিজের বাবার মুখে একটা গভীর থমথমে রাগ আর বিরক্তি দেখেছিল। ঘরে যেতে যেতে বাবা বারান্দায় ভাঁজ করা বস্তায় জোরে পায়ের পাতা ঘষটাতে ঘষটাতে খুব আক্রোশে, কিন্তু চাপা গলায় বললেন—কোনও পরিবারের অতীতটা যদি ভাল না হয় তবে এ সব ঝঞ্ঝাট তো হবারই কথা। জামাইকে দুষি

কেন? আমাদেরও কি ভাল লাগে?

সত্যব্রতরও গভীর হতাশা রয়েছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলে এসে পাশ করে শিল্পী হওয়ার চেষ্টায় লেগে যান। একটা স্কুলে ড্রইং শেখাতেন সামান্য বেতনে। বড় কষ্ট গেছে। রং তুলি ক্যানভাসের খরচ তো কম নয়। তার ওপর আছে মাউন্টিং আর একজিবিশন করার খরচ। বেশ কয়েক বছর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তিনি। কিন্তু শিল্পের লাইনে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না। বহু টাকা গুনোগার দিয়ে অন্তত গোটা পাঁচেক একক প্রদর্শনী করেছিলেন, গ্রুপ একজিবিশনেও ছবি দিয়েছেন। তেমন কোনও প্রশংসা জোটেনি, ছবি বিক্রিও হয়নি তেমন। শিল্পসন্ধানী সাহেবদের পিছনে হ্যাংলার মতো ঘুরেছেন, শিল্প সমালোচকদের খাতির করে বেড়িয়েছেন। মদটদও তখন ধরেছিলেন ঠাটের জন্য। সব পণ্ডশ্রম। পরে জ্ঞানচক্ষু খুললে ভঞ্জদের স্কুলে ড্রইং মাস্টারের চাকরি নিয়ে চলে আসেন। বলতে কী, এখানেই তাঁর ভাগ্য খুলেছে। বুড়ো ভঞ্জ শীতলবাবু খুব স্নেহ করতেন। এই সব জমিজমা একরকম তাঁর দান বলেই ধরতে হবে। জলের দরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। চাষের জমিও পেলেন শস্তায় এবং ধারে। শীতলবাবু মরে গেলেও ছেলেরা সত্যব্রতকে শ্রদ্ধা করে। ভঞ্জদের বাড়ির অনেকেই তাঁর ছাত্র। সত্যব্রত এখন ড্রইং মাস্টার নন, হেডমাস্টার।

বনশ্রী বাবার দুঃখটা খুব টের পায়। বাইরে এক ধরনের অভাব ঘুচলেও এ লোকটার বুক খাঁ খাঁ করে। ব্যর্থতা কুরে কুরে খায়। তবে সত্যব্রতর আঁকার ব্যর্থতা থাকলেও নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা শিল্পবোধ আর সুরুচি ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। ছেলে শুভশ্রীকে একটু আধটু আঁকতেও শেখান আজকাল। কিন্তু শিল্পের অভ্যাস তাঁকে যত ছেড়ে গেছে ততই তিনি নিজের ওপর আর পারিপার্শ্বিকের ওপর মনে মনে খেপে গেছেন। মুখে প্রকাশ করেন না, কিন্তু মুখের গভীর রেখা ও দৃষ্টিতে তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়।

দিনটা আজ ভাল গেল না। শ্যামশ্রী আর রেবন্তর দাম্পত্যজীবনের কথা শুনে, দেখে বনশ্রীর নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে একরকম ভয় হয়।

এইসব ঘটনায় মনটা উদাস হয়ে গেল। আর আজই যেন তার মন খারাপ করে দিতে মেঘ করল আকাশে। এমনিতেই শীতের বিকেল বড় বিষণ্ণ। তার ওপর মেঘ আর মন-খারাপ।

সন্ধের পর সত্যব্রত বেরোলেন। চিরশ্রী আর শুভশ্রী উঠোনের অন্যপ্রান্তে, পড়ার ঘরে। স্বভাব-গম্ভীর সবিতাশ্রী তার হরেক রকম ঘরের কাজে আনমনা। ফলে বনশ্রী একা। কিছুক্ষণ রেডিয়ো শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু মেঘলা আকাশ আর বিদ্যুৎ চমকানির জন্য রেডিয়োতে বড্ড কড় কড় আওয়াজ হতে থাকায় বন্ধ করে দিল। বই পড়তে মন বসল না। জানালায় দাঁড়িয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে। কিন্তু বড্ড কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া, তাতে বৃষ্টির মিশেল। বড় মাঠে একটা বাজ পড়ল বোধ হয়।

জানালার পাল্লা বন্ধ করতে না করতেই বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। ছোট ছোট ঢিল পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে দক্ষিণের ঘরের টিনের চালে। পুকুরের জলে জল পড়ার শব্দ একরকম, গাছপালায় বৃষ্টির শব্দ অন্যরকম।

মন-খারাপ নিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ বনশ্রী টের পায়, বাইরের বারান্দায় কাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

—কে?

বাইরে থেকে চেঁচিয়ে জবাব আসে—ভয় নেই, আমি কুঞ্জ, ঘরের লোক।

কুঞ্জ সকলেরই ঘরের লোক। লোকে তাকে নিজেদের ঘরের ভাবুক বা না ভাবুক কুঞ্জ নিজেকে সবার ঘরের লোক বলে মনে করে। এই ব্যাপারে তার লজ্জা সংকোচ নেই। কেউ মরলে, বিপদে পড়লে, আপনি এসে হাজির হয়। নিজেই দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কাজ উদ্ধার করে দেয়। কুঞ্জকে লোকে ভোট হয়তো এককাট্টা হয়ে দেয় না, কারণ গাঁয়ের রাজনীতি অত সরল নয়। কিন্তু তাকে পছন্দ করে সবাই। সে কারও বাড়িতে গেলে কেউ বিরক্ত হয় না।

শ্যামশ্রীর বিয়েটা ঘটিয়েছিল কুঞ্জই। রেবন্ত তার খুব বন্ধু ছিল। এখন শোনা যায়, কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্তর নাকি দায়ে-কুড়ুলে।

কুঞ্জকে কথাটা একটু বলতে হবে ভেবে বনশ্রী দরজা খুলে সপাট বাতাসের ধাক্কা খায়। দুটো দরজা ফটাং করে ছিটকে গিয়ে কাঁপতে থাকে। বাইরের গভীর দুর্যোগের চেহারাটা এতক্ষণে টের পায় বনশ্রী।

—কুঞ্জদা, ঘরে আসুন। চেঁচিয়ে বনশ্রী ডাকে।

বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তিকে বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল। দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে।

ডাক শুনে কুঞ্জ উঠে এসে বলে—ভিতরে আজ আর যাব না। জলটা ধরলেই রওনা হয়ে পড়ব।

—জমে যাবেন ঠাণ্ডায়, নিউমোনিয়া হবে।

কুঞ্জ হেসে বলে—আমাদের ও সব হয় না। বারো মাস বাইরে বাইরে কাটে।

—আসুন, কথা আছে।

কুঞ্জ বলে—চা খাওয়াও যদি তবে আসি। সঙ্গে কলকাতার এক বন্ধু আছে কিন্তু।

—আহা, তাতে কী। আমরা কি পর্দানশীন? নিয়ে আসুন। ইস, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে গেছেন একেবারে! ডাকেননি কেন?

—গেরস্তকে বিব্রত করার দরকার কী?

—আসুন তো!

কুঞ্জ গিয়ে তার বন্ধুকে ডেকে আনে। দরজা নিজেই ঠেলে বন্ধ করে। বলে, ওঃ, যা ভেজাটাই ভিজেছি। ঘরের মধ্যে ভারী ওম তো! বুঝলি রাজু, এ বলতে গেলে আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি।

বনশ্রী কুঞ্জর বন্ধুকে ইলেকট্রিকের আলোয় কয়েক পলক দেখে। একটু শুষ্ক চেহারা, চোখের দৃষ্টি একটু বেশি তীব্র, চোখদুটো লালও। গাল ভাঙা, লম্বাটে মুখ। তবে লোকটার মুখে চোখে একটা কঠোরতার পলেস্তারা আছে। খুব শক্ত লোক।

কুঞ্জ বলে—এ হল রাজু; আমার কলেজের বন্ধু, দুজনে একসঙ্গে ইউনিয়ন করতাম।

গাঁ গঞ্জে পুরুষ ছেলের সঙ্গে যুবতী মেয়েদের এরকমভাবে পরিচয় করানো হয় না সাধারণত। তবে বনশ্রীদের বাড়ির নিয়ম অন্যরকম। বনশ্রী নিজেও ছেলেদের সঙ্গে কম মেশেনি। এখন অবশ্য কেমন একটু সংকোচ এসে গেছে। বনশ্রী মৃদুস্বরে বলল—বসুন, খুব ভিজে গেছেন, শুকনো কাপড় দিই কুঞ্জদা?

—আরে না। তেমন ভিজিনি। চা খাওয়াও, তাতেই গা গরম হয়ে যাবে।

রাজু বনশ্রীর দিকে একবারের বেশি তাকায়নি, কথাও বলেনি। এ ঘরে একটা পাটিতে ঢাকা চৌকি আর কয়েকটা কাঠের ভারী চেয়ার আছে। কুঞ্জ চৌকিতে বসল, রাজু চেয়ারে। কুঞ্জ নিঃসংকোচে, রাজু ভারী জড়সড় হয়ে।

কুঞ্জ বলল—কী কথা আছে বলছিলে?

—আগে চা আনি।

ছাতা মাথায় উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত যেতেই বনশ্রী বৃষ্টি আর হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। উনুনের সামনে বসা সবিতাশ্রী ঠাণ্ডা কঠিন মুখটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন—কে এসেছে?

—কুঞ্জদা। ওঁকে কি জামাইবাবুর কথাটা বলব মা?

সবিতাশ্রী সামান্য সময় নিয়ে বললেন—দরকার কী? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বাইরের লোকের না যাওয়াই ভাল।

সবিতাশ্রীর মতই এ বাড়িতে আদেশ। এত বড় হয়েছে বনশ্রী, এখনও মার মুখের কথার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পায় না। তারা কোনও ভাইবোনই পায় না।

সবিতাশ্রীকে কিছু বলতে হল না, বড় উনুনের ওপর রান্নার কড়াইয়ের পাশে চায়ের কেটলি বসিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি যাও, কুসুমকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কজন?

—দুজন।

—মুড়ি দিও চায়ের সঙ্গে।

কিন্তু মুড়িটুড়ি ছুঁলও না কেউ। বনশ্রী দ্বিতীয়বার ঘরে আসার পর রাজু তার দিকে বারকয়েক তাকাল। তারপর প্রথম যে কথাটা বলল তা কিছু অদ্ভুত।

—একটু আগে আমাদের খুব ফাঁড়া গেছে। তিনটে লোক বড় মাঠে কুঞ্জকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। হাসিমুখে ঠাণ্ডা গলায় বলল রাজু।

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে—সেকী!

কুঞ্জ মাঝখানে পড়ে বলে—আহাঃ, ও সব কিছু নয়। রাজু, তোর আক্কেলটা কী রে?

বনশ্রী একটু বিরক্ত হয়ে বলে—লুকোচ্ছেন কেন কুঞ্জদা? এ অঞ্চলের ব্যাপার যখন আমাদেরও জানা দরকার। তিনটে লোক কারা?

—অন্ধকারে দেখেছি নাকি? হবে কেউ। কুঞ্জ উদাসী ভাব করে বলে।

কিন্তু বনশ্রীর ধারণা হয়, কুঞ্জ একেবারে না দেখেছে এমন নয়। হাতে টর্চ আছে, অন্তত এক ঝলক হলেও দেখা সম্ভব। তা ছাড়া কুঞ্জ না চেনে হেন লোক এখানে নেই। অন্ধকারেও ঠিক ঠাহর পাবে।

বনশ্রী বলে—মারতে পারেনি তা হলে?

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে—রাজু থাকায় বেঁচে গেছি। ওকে দেখে ওরা ভড়কে যায়। তিনজনকে আশা করেনি তো। ভেবেছিল রোজকার মতো আমি আর রবি ফিরব।

—রবি কোথায়? বনশ্রী জিজ্ঞেস করে।

—রবির ওপরই প্রথম হামলা করে। সে টর্চ ফেলে দৌড়।

—আপনার লাগে-টাগেনি তো!

—না।

চা খেতে বৃষ্টির জোর কিছু মিয়োলো। বনশ্রী দুটো লেডিজ ছাতা এনে দিয়ে বলল—আমার আর চিরুরটা দিয়ে দিচ্ছি। আর ভিজবেন না।

কুঞ্জ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কী কথা বললে না তো!

—আজ থাক।

—থাকল না হয়। রেবন্ত আর শ্যামার কথা বলবে না তো?

বনশ্রী চুপ করে থাকে। কী বুঝল কুঞ্জ কে জানে, তবে কথা বাড়াল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চ, রাজু।

দুজনে চলে গেলে বনশ্রী ভাবতে বসে।

৪

অন্ধকার উঠোন ছপ ছপ করছে জলে। বৃষ্টির জোর কমে গিয়ে এখন ঝিরিঝিরি পড়ছে। এই গুঁড়ো বৃষ্টি সহজে থামে না। সেই সঙ্গে পাথুরে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইছে থেকে থেকে, দমকা দিয়ে। শরীরের হাজারটা রন্ধ্রপথ দিয়ে হাড়পাঁজরে ঢুকে কাঁপ ধরাচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজু আর কুঞ্জ ঘরে এসে বসেছে। এ ঘরটা বাইরের দিকে, ভিতর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এটায় কুঞ্জ থাকে। ভিতর বাড়িতে তাদের সংসারটা বেশ বড়সড়। রাজু সঠিক জানে না, কুঞ্জরা ক ভাইবোন। আন্দাজ পাঁচ-ছ জন হবে। নিজের বাড়ির সঙ্গে কুঞ্জর সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। খায়, ঘুমোয় এই পর্যন্ত।

গামছায় ঘষে ঘষে পায়ের জল মুছল কুঞ্জ চৌকিতে বসে। বলল—রবির বাড়িতে একটু খোঁজ নিতে হবে।

রাজু বিরক্ত হয়ে বলে—রাত বাজে ন'টা। তার ওপর এই ওয়েদার।

—আরে দূর। এ আবার আমাদের রাত নাকি? তুই শুয়ে পড়! আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরোব। বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব, তোকে উঠে দরজা খুলতে হবে না।

একটি অল্পবয়সি বউ একটু আগে এসে ঘুরঘুর করে গেছে এ ঘরে। বিছানাটা টানটান করল, আলনাটা খামোকা গোছাল। ঘোমটা ছিল একটু, তবু ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেয়েছিল রাজু। দুখানা মস্ত চোখে কেমন একরকমের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। রাজুর মনটা বার বার রাডার যন্ত্রে কী একটা অস্ফুট তরঙ্গ টের পেয়েছিল তখন। সেই বউটাই এখন পিরিচে পান সুপারি দিয়ে গেল ঘরে। আজকাল রাজু যেন

অনেক কিছু টের পায়। অনেক অদ্ভুত গন্ধ, স্পর্শ, তরঙ্গ। যেগুলো স্বাভাবিক মানুষ পায় না।

কুঞ্জ অন্য দিকে চেয়ে ছিল। বউটা চলে যেতেই বলল—ও হল কেষ্টর বউ। বাগনানের এক মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে। বিয়েটা দিতে অনেক ঝামেলা গেছে।

—কেষ্ট কে?

কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে—আমার মেজো ভাই। দেখেছিস, মনে নেই হয়তো। অল্প বয়সেই নেশা-ফেশা করে খুব খলিফা বনে গিয়েছিল। তার ওপর এই মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে। উদ্যোগী হয়ে আমিই বিয়েটা দিই। কিন্তু বাড়িতে সেই থেকে মহা অশান্তি। বউটাকে দিনরাত কথা শোনাচ্ছে, উঠতে বসতে বাপান্ত করছে।

—কেন?

—এরকমই হয়। বিয়ের নামে ছেলে বেচে মোটা টাকা আসে যে। এই কেসটায় তো সেটা হয়নি। বললে বিশ্বাস করবি না, কেষ্ট পর্যন্ত সেই কারণে আমার ওপর চটা। বলে কুঞ্জ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর খুব অন্যমনস্ক ভাবে বলে—এরপর আর বিয়ের ঘটকালিটা করবই না ভাবছি। কয়েকটা অভিজ্ঞতা তো হল। সত্যবাবুর বাড়িতে যে মেয়েটাকে দেখলি তার বড় বোন শ্যামার বিয়ে আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও খুব গণ্ডগোল বেঁধে গেছে। আমার কপালটাই খারাপ।

রাজুর এ সব ভ্যাজর ভ্যাজর কথা ভাল লাগছিল না। সটান বিছানায় শুয়ে গায়ে মস্ত লেপটা টেনে নিয়ে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে চোখ বুজল। বুজতেই বনশ্রীর ঢলঢলে মুখখানা দেখতে পেল চোখের সামনে। কেমন স্নিগ্ধতায় ভরে গেল ভিতরটা। বড় সুন্দর মেয়ে। ও যদি আমার বউ হত।

অবশ্য এটা কোনও নতুন ভাবনা নয়। সুন্দর মেয়ে দেখলেই মনে হয়—ও যদি আমার বউ হত।

কাঠের চেয়ারে একটু কচমচ শব্দ হয়। কুঞ্জ উঠেছে, টের পায় রাজু। ওর হচ্ছে বুনো মোষের স্বভাব। যা গোঁ ধরবে তা করবেই। রবির খোঁজ কাল সকালেও নেওয়া যেত।

চোখ বুজেই রাজু বলে—কুঞ্জ, একটা কথা বলব?

—বল।

—যারা মাঠের মধ্যে রবিকে ধরেছিল তাদের কাউকে তুই চিনিস না?

কুঞ্জ একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলে—কী করে চিনব? দেখতেই পেলাম না ভাল করে।

—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তুই চেপে যাচ্ছিস।

—না রে। তবে রবি কাউকে দেখে থাকতে পারে। ওর হাতে টর্চ ছিল। যদি দেখে থাকে তবে বিপদে পড়বে। লোকগুলো ভাল নয়।

রাজু শ্বাস ফেলে বলে—রবি দেখেছে, তুইও দেখেছিস। ভাল করে না দেখলেও আবছা দেখেছিস ঠিকই। কিন্তু পলিটিকস করে করে তোর মনটা এখন খুব প্যাঁচালো হয়ে গেছে। তাই চেপে যাচ্ছিস।

কুঞ্জ নরম স্বরে বলল—সিওর না হয়ে কোনও মত দেওয়া ঠিক নয় রে। তাই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারব না।

—তুই যে বেরোচ্ছিস, ওরা যদি ধারে কাছে ওঁৎ পেতে থেকে থাকে, তা হলে?

—এই বৃষ্টি বাদলায় শেয়ালটাও বাইরে নেই, ওরা তো মানুষ। বলে কুঞ্জ একটু হাসে।

রাজু আর কিছু বলল না। শুয়ে থেকে চোখ বুজেই টের পায় কুঞ্জ বেরোল, বাইরে শিকল টেনে তালা দিল। কেষ্টর বউয়ের চোখে ওরকম মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি কেন তা ভাবতে থাকে রাজু। বউটা কি কেষ্টকে ভালবাসে না? অন্য কাউকে বাসে?

লেপের ওম পেয়েও ঘুমটা ঘনিয়ে এল না রাজুর। ভিতরটা বড় অস্থির। বুকের মধ্যে ধমাস ধমাস করে মিলিটারির বুটজুতোর মতো তার হৃৎপিণ্ড শব্দ করছে।

চারদিকে ঘনঘোর বৃষ্টির বেড়াজাল। অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। মেঘ ডেকে উঠছে দূরে বাঘের মতো। হাওয়া দাপিয়ে পড়ছে গাছপালায় জানালায় দরজায়। কেমন একা করে দেয় তাকে এই দুর্যোগ। আর যখনই একা মনে হয় নিজেকে তখনই সে সেই কালো আকাশ আর নীলাভ উজ্জ্বল রথটির কথা ভাবে। মনে পড়ে মৃত্যু।

রাজু উঠে বসে। ভেজা জামাটা একটা পেরেকে ব্রাকেটে ঝুলছে। উঠে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট

আর দেশলাই বের করে আনে। কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারে না। দেশলাইটা জলে ভিজে মিইয়ে গেছে। এ ঘরে লণ্ঠনের ব্যবস্থা নেই। কাপড়কলের পাওয়ার হাউস থেকে বিজলি আসে বলে তেঁতুলতলায় প্রায় সকলের ঘরেই বিজলি বাতি। সন্ধেবেলা আলো টিমিয়ে জ্বলে, রাত হলে আলোর তেজ বাড়ে।

রাজু সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে করে বসে রইল চুপচাপ। আর বসে থেকে সিগারেট ধরানোর কথা ভুলে গেল। ভিতর বাড়ি থেকে একটা চেঁচামেচির শব্দ আসছে। উল্টোপাল্টা হাওয়া আর বৃষ্টিতে প্রথমটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর চেঁচানিটা চৌদুনে উঠে গেল। সেই সঙ্গে মারের শব্দ। মেয়েগলার আর্ত চিৎকার। তারপর অনেক মেয়েপুরুষের গলায় চেঁচামেচি—ছেড়ে দে! আর মারিস না! ও নিতাই, ধর না বউটাকে! কেষ্ট, এই কেষ্ট, কী হচ্ছেটা কী? ইত্যাদি। রাজু একটু চমকে গেলেও খুব যেন অবাক হল না। তার মাথায় এখন একটা রাডার যন্ত্র কাজ করে। সে বুঝতে পারে, এরকমই হওয়ার কথা। সম্পর্কের মধ্যে মৃদু বিষ মিশেছে ওদের।

মারের এই সব শব্দ যেন রাজুর ভিতরে বোমার মতো ফেটে পড়ছিল। তার চার পাশের পৃথিবী আজকাল তাকে এইভাবেই আক্রমণ করে। মারধোর, চেঁচামেচি, গালমন্দ তাকে অসম্ভব অস্থির করে তোলে। এমনকী সে আজকাল দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত পড়তে পারে না, খুনখারাপির সংবাদ এড়িয়ে যায়, মৃত্যুর খবর সইতে পারে না। অথচ তার চারপাশে অবিরল এইসবই ঘটছে।

রাজু উঠে সন্তর্পণে ভিতর বাড়ির দিকের দরজাটা খুলে অল্প ফাঁক করে। হাওয়ার চাপে দরজাটা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। পাল্লা ঠেসে ধরে রাখতে বেশ জোর খাটাতে হয় তাকে। পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখে, উঠোনের ডান পাশে কিছু তফাতে এক ঘরের বারান্দায় কিছু চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক লণ্ঠন ঘিরে উবু হয়ে বসে খাচ্ছে। সেই ঘরের বারান্দায় কিছু মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে দরজা ধাকাচ্ছে। একজন মোটা লোক চেঁচিয়ে বলে—মেরে ফেলবি নাকি রে হারামজাদা? ফাঁসিতে ঝুলবি যে! গলাটা ছেড়ে দে বলছি এখনও।

হাওয়া ভেদ করেও বন্ধ ঘর থেকে একটি মেয়ের অবরুদ্ধ গলার কোঁকানি আসছিল। হাঁফ ধরা, দম বন্ধ আর সাঙ্ঘাতিক শ্বাসকষ্ট থেকে মাঝে মাঝে ছাড়া পেয়ে গলার স্বরটা গোঙায়। একজন পুরুষের গলা প্রচণ্ড চাপা আক্রোশে বলছে—বল ঢ্যামনা! বাঁচতে চাস তো স্বীকার কর।

বারান্দার লোকগুলো উবু হয়ে বসে নির্বিকারে খেতেই থাকে। তাদের মাঝখানে লণ্ঠনটার আলো দাপিয়ে উঠে নিভে যেতে চায়। একজন একটা র‍্যাপার দিয়ে লণ্ঠনকে হাওয়া থেকে আড়াল করল। মস্ত একটা ছায়া পড়ল উঠোনে। হয়তো বারান্দার বিজলি আলো ফিউজ হয়ে গেছে, কিংবা হয়তো চাকর-বাকর খাচ্ছে বলে বিজলি আলো জ্বালানো হয়নি। কে জানে রহস্য?

আঁচলে মাথা ঢেকে একটা মেয়ে উঠোন থেকে এ বারান্দায় উঠে এসেছে। ও বারান্দার লণ্ঠনের আলো আড়াল করে সে সামনে এসে দাঁড়াতেই রাজু চমকে ওঠে এবং মেয়েটার মুখোমুখি পড়ে যায়।

মেয়েটা দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা তীব্র স্বরে ডাকে—বড়দা!

রাজু দরজা ছেড়ে দিতেই পাল্লা দুটো ছিটকে খোলে। মেয়েটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাজুকে দেখেই একটু আড়ালে সরে বলে—বড়দা নেই?

—একটু বেরিয়েছে।

রাজু মেয়েটাকে চেনে। কুঞ্জর তিনটে আইবুড়ো বোনের একটি। কখনও কথা-টথা বলেনি আগে।

মেয়েটা বিপন্ন গলায় বলে—কোথায় গেছে বলে যায়নি?

—রবির বাড়ি। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে রাজু বলেই ফেলল—ও ঘরে কী হচ্ছে বলো তো?

মেয়েটির বয়স বেশি নয়, বছর পনেরো-ষোলো হবে। দেখতে কালো, রোগা, দাঁত উঁচু। আড়াল থেকেই জবাব দেয়—মেজদা খেপে গেছে।

—কেন?

মেয়েটা জবাব দেয় না। রাজু বিরক্ত হয়ে একটু ধমকের স্বরে বলে—তুমি ভিতরে এসো তো! ব্যাপারটা খুলে বলো।

মেয়েটা বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েই ঘরে এসে দাঁড়ায়। গায়ে আধভেজা শাড়ি আর খদ্দরের নকশা-চাদর। শীতে জড়সড়। মাথা সামান্য নিচু করে ভয়ের গলায় বলে—দোষটা বউদিরই। বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছিল নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ বিকেলে ভাই এসেছিল নিয়ে যেতে। এ বাড়ির কাউকে আগে জানায়নি পর্যন্ত। খবর পেয়ে মেজদা রেগে গেছে।

রাজু ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রাগে গরম হচ্ছিল। কঠিন গলায় বলে—কেষ্ট কি মদ খেয়ে এসেছে?

—সে তো রোজ খেয়ে আসে।

—বউটাকে তো খুনও করে ফেলতে পারে। তোমরা কী করছ?

—সেই জন্যই তো বড়দাকে খুঁজছি। কেউ ঘরে ঢুকতে পারছে না যে!

—রোজ মারে?

মেয়েটা একটু থতমতভাবে চেয়ে মাথাটা এক ধারে নেড়ে বলে—মারে, তবে রোজ নয়। আজ বড্ড খেপে গেছে। কী যে করছে, মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক নেই রাজুরও। মাথার মধ্যে একটা আগুনের গোলা ঘুরছে। কথার ওজন না রেখে সে গাঁক করে উঠে বলে—কেষ্টকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি যদি বাঁদরামি বন্ধ না করে তবে আমি ওর প্রত্যেকটা দাঁত ভেঙে দেব। তারপর পুলিশে চালান করব। যাও বলো গিয়ে। বোলো, আমার নাম রাজীব ব্যানার্জি।

মেয়েটা কোনও জবাব দিল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু রাজুর ভিতর থেকে একটা পুরনো রাজু ফুঁসছে, আঁচড়ে কামড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভিতরের সেই ছটফটানিতে সে বসে বসে কাঁপে। তারপর শান্ত অবসাদ নিয়ে বসে থাকে। ও ঘরের সামনের বারান্দায় কেউ নেই এখন। অন্ধকার দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর একটু চিকন রেখা দেখা যাচ্ছে মাত্র।

ঠাণ্ডায় কান কনকন করছিল রাজুর। ভেজা বাতাসে ঘরটা স্যাঁতস্যাঁত করছে। ঘরের বিজলি আলো এখন টিমটিম করে জ্বলছে। খোলা দরজার সামনে বসে সে কেষ্টর ঘরের দিকে ভয়ঙ্কর চোখে চেয়ে ছিল।

হুড়কো খোলার শব্দ হল। তারপর ও ঘরের দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। কেষ্টই হবে। বারান্দা থেকেই খুব মেজাজি গলায় ডাকল—টুসি! এই টুসি!

কোত্থেকে 'যাই মেজদা' সাড়া দিল টুসি। কেষ্ট ফের ঘরে ঢুকে পড়ে। একটু বাদে রাজু দেখে সেই কালো রোগা কিশোরী মেয়েটা দৌড় পায়ে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

একটু বাদে দরজাটা খুলে টুসি কেষ্টর বউকে ধরে ধরে বারান্দায় আনে। বউটা টুসির কাঁধে মাথা রেখে এলিয়ে রয়েছে। বারান্দার ধারে টুসি তাকে উবু করে বসায়। একটা ঘটি থেকে জল দেয় চোখে মুখে। ঘরের ভিতরে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে দেখতে পায় রাজু।

হঠাৎ তার দমকা রাগটা আবার ঘূর্ণি ঝড়ের মতো উঠে আসে ভিতর তোলপাড় করে। পুরনো রাজু তার পাঁজরায় ধাক্কা মেরে বলে—ওঠো। ওই শুয়োরের বাচ্চার দাঁত কটা ভেঙে দাও।

এই রকমই রাগ ছিল রাজুর। গোখরোর মতো ছোবল তুলত সে। রাজু কত লোককে যে মেরেছে তার হিসেব নেই। মার খেয়েছেও বিস্তর। কিন্তু যেখানে প্রতিবাদ করা উচিত সেখানে কোনওদিন সে চুপ করে থাকেনি। একশো জন বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও নয়।

কিন্তু আজকাল এ কেমন ধারা হয়ে গেছে রাজু? একটা স্বপ্ন কি মানুষকে শেষ করে দিতে পারে এত নিঃশেষে? বসে বসেই নিজের রাগের হলকায় পুড়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছুতেই উঠোনের দূরত্বটুকু পেরিয়ে গিয়ে ওই হারামজাদার চুলের মুঠি ধরে বের করে আনতে পারছে না। একদিকে ভিতরে যেমন রাগ ফোঁস ফোঁস করছে, অন্যদিকে তেমনি বুকের মধ্যে এক ভয়ের পাতাল কুয়ো।

বউটি মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তেমনি টুসির ওপর ভর রেখে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

রাজু উঠে এসে বিছানায় আধশোয়া হয়ে গলা পর্যন্ত লেপ টেনে নেয়। চোখ বুজে ঠাণ্ডার ছোবল

খেতে থাকে চুপ করে।

হঠাৎ চোখ চেয়েই রাজু কুঞ্জর বোনকে দেখতে পায়। একটা পেতলের জলের জগ আর গেলাস রাখছে টেবিলের ওপর। রাজুকে তাকাতে দেখে কুণ্ঠিত স্বরে বলল—আর কিছু লাগবে আপনার?

রাজু উঠে বসে বলে—একটা দেশলাই দিতে পার?

—দিচ্ছি। বলে মেয়েটা চলে যায়। রাজু টের পায়, মেয়েটা এ ঘরের বারান্দার কোনা থেকে কেষ্টর ঘরের বারান্দার কোনায় লাফিয়ে চলে গেল। দরজায় শেকল নেড়ে কেষ্টর কাছে দেশলাই চাইল।

একটু বাদে দেশলাই হাতে এসে বলে—এই যে।

মেয়েটার সামনে রাজুর লজ্জা করছে। হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে বলে—আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম তখন। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলাটা কে সহ্য করতে পারে বলো!

টুসি রাজুর দিকে অকপটে চেয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন গভীর আতঙ্কের ছাপ আছে। একটু চেয়ে থেকে বলল—বউদির কিন্তু খুব লেগেছে। কেমন এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে বার বার। কথা বলতে পারছে না। চোখ উল্টে আছে। দাঁত লেগে যাচ্ছে। আর...

বলে টুসি দ্বিধা করে একটু।

রাজুর শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। ভয়ে, রাগে। বলে—আর কী?

—খুব স্রাব হচ্ছে। পোয়াতি ছিল। কী জানি কী হবে!

—ডাক্তার নেই আশেপাশে?

মেয়েটা ভয়-খাওয়া গলায় বলে—রাধু যাচ্ছিল ডাকতে। মেজদা তাকে বলেছে ডাক্তার ডাকলে খুন করে ফেলবে। বড়দা কোথায় যে গেল! বড়দা ছাড়া এখন কেউ কিছু করতে পারবে না।

এই বলতে বলতে টুসি চোখের জল ফস করে আঁচলে চেপে ধরে।

আজকাল একটা অক্ষম মন নিয়ে চলে রাজু। বর্ষার জলকাদায় খাপুর-খুপুর করে যেমন কষ্টে চলতে হয়, রাজুর বেঁচে থাকা এবং কাজ কর্তব্য করাটাও তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কাজেই তার ভয়, সব সিদ্ধান্তেই তার নানারকম দ্বিধা।

তবু কষ্টে সে নিজের মনটাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ে। বলে—একটা ছাতা দাও, আর রাধুকে ডেকে দাও।

ধরা গলায় টুসি বলে—আপনি যাবেন?

—যেতেই হবে। নইলে বউটা মরে যাবে যে!

টুসি একটু ভরসা পেয়ে বলে—ঝড়-বাদলায় আপনার যেয়ে দরকার নেই। রাধু ডেকে আনতে পারবে। আপনি শুধু মেজদাকে একটু সামলাবেন। আপনি বড়দার বন্ধু তো, তার ওপর কলকাতার লোক। আপনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কিছু বলতে সাহস পাবে না।

রেগে গেলে রাজু সেই পুরনো রাজু। ভয়ডর থাকে না, দ্বিধা থাকে না।

রাজু উঠে দাঁড়িয়ে বলে—রাধুকে দৌড়ে যেতে বলো। আমি কেষ্টর ঘরে যাচ্ছি। দড়িতে কুঞ্জর একটা খদ্দরের চাদর ঝুলছিল। সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে কেষ্টর দরজায় ধাক্কা মেরে বলল—এই কেষ্ট। দরজাটা খোলো তো।

কেষ্ট দরজা খুলে বেকুবের মতো চেয়ে থাকে। বেশ আঁটসাট গড়নের লম্বাটে চেহারা। ভুরভুর করে কাঁচা দেশি মদের গন্ধ ছাড়ছে। গায়ে এই শীতেও কেবল একটা হাতওলা গেঞ্জি।

রাজু ধমক দিয়ে বলে—কী হয়েছে?

অবাক কেষ্ট গলা ঝেড়ে বলে—সাবির শরীরটা খারাপ হয়েছে। রক্ত যাচ্ছে।

ওকে এক্ষুনি একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করে রাজুর। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, কেষ্ট তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। এ ব্যাপারটা বেশ ভাল লাগে রাজুর। তাকে যে কেউ ভয় পাচ্ছে এটা ভেবে তার আত্মবিশ্বাস এসে যায়। গম্ভীর গলায় সে বলে—তার জন্য কী ব্যবস্থা করেছ এতক্ষণ? কাউকে ডাকনি কেন?

কেষ্ট সামনের বড় বড় শুকনো দাঁতগুলোয় জিভ বুলিয়ে বলে—কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার ভিতরে এসে দেখুন না, খুব সিরিয়াস কেস কি না!

ভিতর থেকে গভীর যন্ত্রণার একটা গোঙানির শব্দ হয় এ সময়ে। রাজুর শরীর কেঁপে ওঠে। একটু আগেই বউটা পান দিয়ে এল ঘরে। আর এখন মরতে চলেছে বুঝি! সে এ সব যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করতে পারে না আজকাল। রক্তের রং দেখলে তার হাত পা মাথা অবশ হয়ে যায়। সে মাথা নেড়ে বলে—না, না! তুমি বরং লোকজন ডেকে আনো।

কেষ্টর রগচটা ভাব মরে গিয়ে এখন সত্যিকারের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মদের নেশা কেটে গেছে একেবারে। বলল—যাচ্ছি। আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, টুসি এক্ষুনি আসবে।

এই বলে কেষ্ট উঠোনে নেমে অন্ধকারে কোথায় তাড়াতাড়ি নিমেষে মিলিয়ে যায়। ওর ভাবসাব রাজুর ভাল লাগল না। তার মনে হল, কেষ্ট এই যে গেল, আর সহজে ফিরবে না। কেষ্টর যাওয়ার ভঙ্গি দেখেই রাজুর ভিতরের রাডার যন্ত্রে ব্যাপারটা ধরতে পারে রাজু। কেষ্ট বোধ হয় ধরেই নিয়েছে যে সাবি বাঁচবে না। থানাপুলিশ হবে। তাই পিটটান দিল।

৫

হাউর বাতাসে ছাতার শিক ছটকে উল্টে গেছে, হাঁটুভর কাদা আর ঝড়-বাদলা ঠেলে শেয়ালের মতো ভিজতে ভিজতে রবির বাড়ি পৌঁছয় কুঞ্জ। ভেজা শরীরে বাতাস লেগে শীতে মুরগির ছানার মতো কাঁপছে।

ডাকাডাকিতে খোড়ো চালের মেটে ঘর থেকে জানালার ঝাঁপ ঠেলে সতর্ক চোখে কুঞ্জকে আগে দেখে নেয় রবি। দরজা খুলতেই কুঞ্জ দেখল রবির হাতে একটা মস্ত দা। কুঞ্জ জামাকাপড়ের জল যথাসাধ্য নিংড়ে ঘরে ঢুকতেই রবি দড়াম করে দোর দিয়ে বাঠাম লাগাল। শুকনো মুখে আর চোখের চাউনিতে কুঞ্জকে ভাল করে আর একবার দেখে নিয়ে দা'টা কুলুঙ্গিতে খাড়া করে রেখে এসে বলল—ভাবলাম বুঝি তোমার পেটি আর গাদা আলাদা করেছে শালারা।

শীতে সিঁটিয়ে গেছে কুঞ্জ। দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক শব্দ। চাদর নিংড়ে মাথা গা মুছতে মুছতে বলে—চিনতে পেরেছিস?

রবি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—টের পেলে খুন করবে। তুমি বলেই বলছি। শালা লাফ দিয়ে সামনে পড়ে আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ফেলল, হাতে অ্যাই বড় গজ। মুখটা কম্ফর্টারে ঢাকা। খুব একটা ঘড়ঘড়ে শ্বাসের শব্দ হচ্ছিল। আমি তো সব সময়ে তোমার পেছু পেছু যাই, তাই মনে হয় আমাকে তুমি ভেবে ভুল করেছিল। গজ যেই তুলেছে, অমনি পিছন থেকে আর এক শালা বলল—ওটা কুঞ্জ নয়, রবি। দুটো গাঁট্টা দিয়ে ছেড়ে দে, খুব পালাবে। তখন ছাড়ল। পেটে দুটো হাটুর গুঁতো দিয়ে বলল—রা করলে খুন হয়ে যাবি। ছাড়া পেয়ে পোঁ-পোঁ দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। পালাতে পালাতেই ঠিক পেলুম, এ হল পটল। পিছনের দুজন কে ঠাহর পাইনি। একজন লম্বা।

কুঞ্জর গা থেকে জল গড়িয়ে ঘরে থকথকে কাদা হয়ে গেল। একদিকে বাঁশের মাচানে চ্যাটাই আর গুচ্ছের ময়লা কাঁথার বিছানা। অন্য ধারে একটা মস্ত ছাগল চটের জামা পরে একরাশ নাদির মধ্যে বসে এই রাতেও কী চিবোচ্ছে। ঘরময় ভরভরে ছাগলের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কুঞ্জ রবির দিকে স্থির চোখে চেয়ে সবটা শুনে মৃদু স্বরে বলল—যা দেখেছিস দেখেছিস। ক্লাবে কিছু জানাসনি তো!

—যখন দৌড়ুচ্ছি তখন ক্লাবের সামনে একজন জিজ্ঞেস করছিল কী হয়েছে, কেন দৌড়ুচ্ছি। কিন্তু তখন এত হাঁফ ধরেছে যে মুখে কথা এলই না। তোমাকে কী করল?

—কী করবে! কিছু করেনি।

—তুমি মরে ভূত হয়ে আসনি তো কুঞ্জদা! ইস, ভিজে ঢোল হয়েছ! আমার ক্যাঁথা কম্বল গায়ে দিয়ে বোসো। ছাতাটা দাও, সুতো দিয়ে শিকগুলো বেঁধে দিই।

রবির ঘরে ছাগলের গন্ধের মধ্যে ময়লা কাঁথা আর তুলোর কম্বল গায়ে চাপিয়ে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকে কুঞ্জ। বস্তা থেকে সুতলি খুলে রবি খুব যত্নে ছাতার ডাঁটির সঙ্গে শিকের ডগাগুলো বেঁধে দিচ্ছিল, যাতে বাতাসে ফের উল্টে না যায়। বলল—ক্লাবে খবর দেবে না? তোমার গায়ে ফের হাত পড়েছে শুনলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে, রক্তগঙ্গা বইবে।

কুঞ্জ জবাব দিল না। চোখ বুজে সে একটা লম্বা লোকের কথা ভাবছিল। রবির টর্চটা কেতরে পড়েছিল মাঠে। আলোটা টেরছা হয়ে ওপর দিকে উঠেছে। সেই আলোতে ক্ষণেকের জন্য একটা ফর্সা মুখ ঝলসে উঠেছিল: রেবন্ত।

কুঞ্জ ছাতাটা নিয়ে উঠে পড়ে বলল—কাউকে কিছু বলিস না। বিপদে পড়ে যাবি। যা করার আমিই করব।

রবি অবাক হয়ে বলল—তুমি একা কী করবে? ও হল খুনে পটলা। ভাল চাও তো ক্লাবে খবর দাও।

সুস্থির চোখে রবির দিকে চেয়ে কুঞ্জ বলে—কাউকে না। কাকপক্ষীতেও জানবে না। বুঝেছিস?

রবি তবু মাথা নেড়ে বলে—পাবলিসিটি হবে না বলছ? তুমিই তো বলো, এরকম সব হামলা-টামলা হলে লোকের পপুলারিটি বাড়ে, ভোট পাওয়া যায়! এমন একখানা জ্বলজ্যান্ত কাণ্ড চেপে যাবে?

কুঞ্জর এত দুঃখেও হাসি হাসে। রবি যে রবি, সেও আজকাল পলিটিক্সের শেয়াল হয়ে উঠল। কথাটা মিথ্যেও নয়। যেবার বুকে সড়কি খেল সেবার হু-হু করে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তখন ভোট হলে কুঞ্জ জিতে যেত। কিন্তু কুঞ্জ জানে, এটা ভোটের মামলা নয়। সে যদি মরে তা হলে এখন হয়তো এ চত্বরে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রবির দিকে চেয়ে সে ঠাণ্ডা গলায় বলে—অনেক ব্যাপার আছে রে। তুই সব বুঝবি না।

দরজা খুলে দিয়ে রবি বলল—সাবধানে যেয়ো। তারপর একটু লজ্জার স্বরে বলে—বুঝলে কুঞ্জদা, সবসময়ে মনে হয় আমি তোমার জন্য জান দিতে পারি, কিন্তু আজ বিপদে পড়ে প্রাণটা কেন যেন পালাই-পালাই করে উঠেছিল। তুমি হয়তো ভাবছ, রবিটা নেমকহারাম। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি...

আবার জলঝড় ঝাঁপিড়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। তোল্লাই বাতাস এসে হ্যাঁচকা টান মারে খোলা ছাতায়। খুব ভাল করে শিক বেঁধে দিয়েছে রবি। সহজে ওলটাবে না। বাতাসের মুখে ছররার মতো ছিটকে আসছে জলের ফোঁটা। কুঞ্জ প্রাণপণে ছাতার আড়াল রাখতে চেষ্টা করে। কাদায় পা রাখা দায়, একবার পা ফেললে দু-তিন কিলো কাদা পায়ে আটকে উঠে আসে। ভুসভাস নরম মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে পা। বাতাস টালাচ্ছে। শীতের কম্প উঠে পেট বুক কাঁপিয়ে তুলছে। কুঞ্জ কোনওক্রমে শুধু এগিয়ে যাওয়াটা বজায় রাখতে থাকে। আর মনের মধ্যে বার বার বীজমন্ত্রের মতো পপুলারিটি শব্দটা এসে হানা দেয়।

এর আগেও কুঞ্জর ওপর বহু হামলা হয়ে গেছে। দুবার মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু তাতে দমে যায়নি কুঞ্জ। তখন শত্রুপক্ষ তাকে মর্যাদা দিতে, প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবত, যত জখম হয়েছে তত লোকের কাছে সে হয়ে উঠেছে গুরুতর মানুষ। লোকে তো আর যাকে তাকে খুন করতে চায় না। কুঞ্জ খুব বিচক্ষণের মতোই সেইসব হামলার ঘটনাকে ভাঙিয়ে নিয়েছিল রাজনীতির খুচরো লোভে। কিন্তু সে জানে, আজকের মামলা তা নয়। ধারে কাছে কোনও নির্বাচন নেই, কোনও তেমন রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেনি। আজ তার কপালে ছিল উটকো মৃত্যু। এই মৃত্যু তাকে মহৎ করত না। লোকের গোপন বেনামি জমি ধরে দেওয়ার বিপজ্জনক কাজে নেমেই সে টের পেয়েছিল, এ হল জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনো। কিংবা যখন হাবুর ঝোপড়ায় মদো মাতাল বদমাশদের আড্ডা ভাঙতে গিয়েছিল তখনই সে কি জেনেশুনে বিষ করেনি পান? কাজেই মরার ব্যাপারে তার তেমন চিন্তা নেই। কিন্তু বার বার আজ পপুলারিটি কথাটা তার বুকে হাতুড়ি মারে। কেন যেন মনে হচ্ছে, তার পপুলারিটির শক্ত ডাঙা জমি বড় ক্ষয় হয়ে গেছে। টর্চের আলোয় রেবন্তর মুখ দেখে চমকে যায়। কিন্তু রেবন্ত তাকে খুন করতে চায় বলে সে তত চমকায়নি। তাকে খুন করতে চাইতেও পারে রেবন্ত। তার কারণ আছে। কিন্তু খুন করলেও রেবন্ত তাকে ঘেন্না করবে না, কুঞ্জর এমন একটা ধারণা ছিল, তাই রেবন্তকে দেখে সে যত না চমকেছে তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়েছে রেবন্তর মুখে একটা খাঁটি নির্ভেজাল তীব্র ঘেন্নার ভাব দেখে।

পিচ রাস্তা পেয়ে কুঞ্জ একটু হাঁফ ছাড়ল। তেঁতুলতলা যুব সঙ্ঘের পাকা বারান্দায় উঠে ছাতাটা মুড়ে নিয়ে সে দরজায় ধাক্কা দেয়। এত রাতেও কয়েকজন বসে তাস খেলছে। কুঞ্জকে দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে সবাই।

গোটা তেঁতুলতলাই কুঞ্জর মামাবাড়ি। জ্ঞাতিগুষ্টি মিলে তারা সংখ্যায় বড় কম নয়। তাস খেলুড়েদের মধ্যেও কুঞ্জর এক মামা, দুই মাসতুতো ভাই রয়েছে।

সতুমামা বলল—এই দুর্যোগে ব্যাপার কী রে? কোনও হাঙ্গামা নাকি?

কুঞ্জ মাথা নাড়ল।

—তা হলে?

তা হলে কী তা কুঞ্জও তো জানে না। সে শুধু আজ সন্দেহভরে জানতে চায় তার বিশ্বস্ত ঘাটিগুলো এখনও তার দখলে, আছে কি না! বোঝা বড় শক্ত। এই ক্লাবখানা তার নিজের হাতে গড়া। রাজ্যের ছেলে-ছোকরা জুটিয়ে জবরদস্ত ক্লাবখানা জমিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ। পিছনের ঘরে লাঠি, সড়কি, দু-একখানা খাঁটি তরোয়াল এখনও মজুত। কুঞ্জর বিপদ শুনলে এখনও হয়তো গোটা ক্লাব ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। গতবার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে কুঞ্জ তার এক মাসতুতো দাদার কাছে হারতে হারতে কোনওক্রমে দশ ভোটে জিতেছিল। এই কথাটা এখন বড় খোঁচাচ্ছে তাকে। পায়ের নীচে মাটি এখনও আছে বটে, কিন্তু চোখের আড়ালে পাতালের অন্ধ গহ্বর নিঃশব্দে মাটি খসিয়ে নিচ্ছে না তো? কুঞ্জর বিপদ শুনলে এক দল রুখে দাঁড়াবে ঠিক, কুঞ্জ নির্বাচনে দাঁড়ালে এক দঙ্গল তার হয়ে খাটবে ঠিক, তবু আর একটা দল নিস্পৃহ থেকেই যাবে।

মাসতুতো ভাইদের মধ্যে একজন নলিনী। সে বলল—খুব ভিজেছ কুঞ্জদা, তোমার না বুকের অসুখ! বইয়ের আলমারির ওপর আমার বর্ষাতিটা মেলে দেওয়া আছে, নিয়ে যাও।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে—না রে, কিছু হবে না।

নলিনী আর কিছু বলে না। তাস বাটা হতে থাকে। বহুকাল বাদে কুঞ্জর যেন একটু অভিমান হয়। বর্ষাতিটা নিলুম না, তা আর একটু সাধতে পারলি না নলিনী?

কুঞ্জ বেরিয়ে আসে। তার আর একটা ঘাঁটি ছিল ফুটুনিমামার দোকান। জেলেপাড়ার যাট সত্তর ঘর রায়ত ফুটুনিমামার ভারী বশংবদ। একসময়ে পড়াশোনা ছেড়ে রাজনীতিতে নামার দরুন কুঞ্জকে তার বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল। তখন ফুটুনিমামা কুঞ্জকে আশ্রয় দেয়। বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বলে এসেছিল, আপনি না রাখেন ত্যাজ্যপুত্র করুন, কুঞ্জকে আমি পুষ্যি নেব। নির্বাচনে ফুটুনিমামা তার রায়তদের কুঞ্জর পক্ষে কাজে নামিয়ে দিয়েছিল।

মোড়ের মাথায় ফুটুনিমামার দোকানে ঝাঁপ ঠেলে বহুদিন বাদে কুঞ্জ হানা দিল। মামা উরুর ওপর লম্বা খাতা রেখে হিসেব করছে। খোল, ভুসি, হাঁসমুরগির খাবার আর মশলাপাতির ঝাঁঝালো গন্ধটা বহুকাল ভুলে গিয়েছিল কুঞ্জ। আজকাল আসা হয় না। গন্ধটা পেয়ে একটা হারানো বয়স কুঞ্জর কাছে ফিরে এল বুঝি।

মামা মুখ তুলে দেখে বলল—কী খবর রে? বলেই ফের হিসেবে ডুব দেয়।

কুঞ্জ ঠাণ্ডা হচ্ছে। খুব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। পাথর হয়ে যাচ্ছে। মামা আবার মুখ তুলে বলে—দুর্যোগে বেরিয়েছিস, ঠাণ্ডা লাগাবি যে! তারপর খবর-টবর কী?

কুঞ্জ বলে—ভাল।

—ভাল বলছিস? ফুটুনিমামা তাকিয়ে একটু হাসে। কিন্তু তাকানোর মধ্যে দৃষ্টি নেই, হাসির মধ্যে অনেক ভেজাল। একসময়ে খুব বাবুগিরি করত বলে নামই হয়ে গিয়েছিল ফুটুনি। এখন বাবুগিরি নেই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, কাছা খুলে রোজগার করছে মামা। কোথায় যায় মানুষের দিন?

ফুটুনিমামা ভ্রূ কুঁচকে বোধ হয় একটা উড়ন্ত মশার দিকে চেয়ে থেকে বলে—তা হলে খবর-টবর সব ভাল?

ঝুরঝুরে মাটির ওপর দিয়ে কুঞ্জ হাঁটছে। যে কোনও একটা পদক্ষেপেই সে দেখতে পাবে সামনেই ধস। তবু কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা হিসেব নিকেশ থাকা ভাল।

পপুলারিটি শব্দটা রবারের বলের মতো মাথার মধ্যে ধাপাচ্ছে কে!

অন্য দিন সময় হয় না কুঞ্জর। এই দুর্যোগে আজ হঠাৎ সময় হল। বহুদিন বাদে ঝড়বাদল ঠেলে সে মেজদাদুর বাড়ির বারান্দায় উঠে এল। মেজদাদু হলেন এখন ভঞ্জদের সবচেয়ে বড় শরিক। কয়েক কোটি টাকা বোধ হয় তাঁর রোলিং ক্যাপিটাল। দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না। সাদাসিধে, গেঁয়ো।

আশির কাছাকাছি বয়স। মস্ত ঘরে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। গায়ে তুষের চাদর, পায়ে মোজা, মাথায় বাঁদুরে টুপি। একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেন। বললেন—এত রাতে এলে? খুব দরকার নাকি? কারও

কিছু হয়নি তো?

—না।

মেজদাদু শ্বাস ছেড়ে বললেন—সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। আমি মরলে তোমাদের অশৌচও হয় না জানি। মাতুল বংশ, তায় জ্ঞাতি। কিন্তু আমার ভাবনা তেমনধারা নয়। আমি ভাবি, তেঁতুলতলায় সব আমার মানুষ। কখন কে মরে, কে পড়ে। ভারী দুশ্চিন্তা।

—অনেকদিন দেখা করিনি, তাই এলাম।

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না মেজদাদুর। সন্দেহের চোখে কুঞ্জর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কারও কোনও বিপদ হয়নি, ঠিক বলছ? ভয়ের কিছু নেই তো!

—না মেজদাদু।

—তুমি ভাল আছ তো? বাড়ির সবাই? তোমার মাকে বহুকাল দেখি না। আজকাল সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করে।

—বলব।

মেজদাদু খানিক চুপ থেকে বলেন—বুদ্ধি পরামর্শ নিতে আমার কাছে কোনওদিন এলে না কুঞ্জ! এলে কি আমি তোমাকে কুপরামর্শ দিতুম! আমি তোমার কতখানি ভাল চেয়েছিলাম তা জানলে না।

কুঞ্জ খুব নিবিড় চোখে মেজদাদুকে দেখছিল। আগে দেখা হলে মেজদাদুর মুখে যে একটা খুশির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ত তা আজ আর কই? সে বুঝতে পারে, সুর কেটে যাচ্ছে। কোথায় লয়ে-তালে গোলমাল।

কুঞ্জকে জেতানোর জন্য সেবার মেজদাদু নিজের নমিনেশন উইথড্র করে নিয়ে বলেছিলেন—লোকে কুঞ্জকেই চায়। আমাদের খামোখা দাঁড়ানো। কথাটা বলেছিলেন হাসিমুখে, আত্মগৌরবের সঙ্গে। সেবার সড়কি খেয়ে কুঞ্জর জখমটা দাঁড়িয়েছিল মারাত্মক। ডাক্তার কলকাতায় পাঠাতে চেয়েছিল। মেজদাদু রুখে দাঁড়িয়ে বললেন—কলকাতার হাসপাতাল! কেন, কুঞ্জ কি ভাগাড়ের মড়া। কলকাতার হাসপাতালে আজকাল মানুষের চিকিৎসা হয় নাকি? ভঞ্জদের লোকবল, অর্থবল সবটুকু ঢেলে দিয়ে মেজদাদু কুঞ্জকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। আর তার জন্যই তেঁতুলতলার ছোট হাসপাতালে হাজারো যন্ত্রপাতি আমদানি হল, ভাল একজন ডাক্তার এল চাকরি পেয়ে, এল এক্স-রে ইউনিট। কুঞ্জ যে খুব একটা কৃতজ্ঞ বোধ করেছে, তা নয়। সে তখন ভাবত, তাকে বাঁচানোর জন্য লোকে তো এ সব করবেই। সে যে নেতা।

আজ মেজদাদুর সামনে তাই একটু লজ্জা বোধ করে কুঞ্জ। মেজদাদুর জন্য তার যা করা উচিত ছিল তা তো করা হয়নি। অকৃতজ্ঞতার পাপ তাকে কিছুটা ছুঁয়ে আছে আজও।

কুঞ্জ মাথা নিচু করে বলে—আপনি আর আগের মতো ডাক খোঁজ করেন না তো দাদু! কোনও অপরাধ করিনি তো?

ভঞ্জবাবু ভারী অবাক হয়ে শশব্যস্তে বললেন—এ সব কী বলছ? অপরাধ আবার কী? বুড়ো বয়সে বাইরের ব্যাপারে বেশি যাই না। তুমিও ব্যস্ত মানুষ। তবে খোঁজখবর সবই পাই। তোমার হচ্ছে পাবলিক লাইফ, আমরা তো নিজের ধান্দা নিয়ে পড়ে আছি। এই বলে মেজদাদু খানিক কী যেন ভেবে আস্তে করে বলেন—তবে তোমার চেহারায় আগে যেমন একটা তেজ দেখতুম এখন আর সেটা দেখি না।

—আমি কি কোনও ভুল করছি? কোনও অন্যায় পথে চলছি? কুঞ্জ গলায় চাপা ব্যাকুলতা ফোটে। টর্চের আলোয় দেখা রেবন্তর মুখটায় বড় ঘেন্না ফুটে ছিল যে! ঠোঁট বাঁকানো, চোখে আগুন, দাঁতে দাঁতে বজ্র-আঁটুনি। হিংসে নয়, সংকোচ বা দ্বিধাও নেই। যেন মাজরা-পোকা নিকেশ করতে এসেছিল।

মেজদাদু এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বলেন—ভেজা শরীরে এই হিমে কতক্ষণ থাকবে? তোমার শরীর ভাল নয়।

কুঞ্জ সংবিৎ ফিরে পায়। আজ সে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তা হঠাৎ টের পেয়ে ভারী লজ্জা করে তার। কোনওদিন কোনও মানুষের কাছে ঠিক এভাবে নিজের সম্পর্কে জানতে চায়নি কুঞ্জ। সে বরাবর নিজের সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসী। নিজেকে অভ্রান্ত ভাবাই কুঞ্জর স্বভাব।

সংবিৎ ফিরে পেয়েই কুঞ্জ গুটিয়ে গেল। গম্ভীর মুখখানায় হাসি এল না, তাই না হেসেই বলল—

যাই মেজদাদু।

—এসো গিয়ে। মাঝে মাঝে এলে ভাল লাগে। বাড়িতে তোমার কেউ যত্ন করে না নাকি তেমন? শুকিয়ে গেছ। তোমার মাকে দেখলে বলব তো।

কুঞ্জ আবার জলঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে আসে। বাতাসের মুখে ধেয়ে আসে খরশান বৃষ্টির অস্ত্রশস্ত্র। গেঁথে ফেলে তাকে বার বার। বৃষ্টির মিছিল চলে তার পিছনে পিছনে, ধিক্কার দেয়—ছিয়া, ছিয়া, ছিয়া...

পিচ রাস্তায় এক নিয়নবাতির তলায় ছোট ভাই রাধানাথের সঙ্গে দেখা। ছাতার নীচে গুঁড়ি মেরে যাচ্ছিল। কুঞ্জকে দেখে ভয়ার্ত মুখ তুলে বলল—বউদির বড্ড অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

—কী অসুখ?

—মেজদা মেরেছে। রক্ত যাচ্ছে খুব।

কুঞ্জ সামান্য কেঁপে ওঠে। হয়তো ভেজা শরীরে হঠাৎ বাতাস লাগল, কিংবা হয়তো অন্য কিছু। ভাবতে চাইল না কুঞ্জ। ভাবতে নেই।

খুব অনেক রাতে মেঘ কেটে আকাশে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাতাস থেমেছে। রুগির ঘরখানা নিরিবিলি হয়েছে এতক্ষণে। টুসি জেগে ছিল এতক্ষণ। আর পারল না। এক ধারে মাদুর পেতে তুলোর কম্বল মুড়ি দিয়ে নেতিয়ে পড়েছে অঢেল ঘুমে।

কুঞ্জ একা হল। সাবিত্রীর অবশ্য সাড় নেই। রক্ত বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। কয়েকবারই অজ্ঞান হয়েছে, আবার জ্ঞান ফিরেছে, ফের দাঁতে দাঁত লেগে চোখ উল্টে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করেছে। মেঝে ভেসে গিয়েছিল রক্তে। কুঞ্জ তখন ঘরে আসেনি। ভাসুর তো। সব ধোয়া মোছা হওয়ার পর, ভিড় পাতলা হয়ে গেলে এসে একটু দূরে চেয়ার পেতে বসে থেকেছে। এ ঘরে এভাবে বসে থাকা তার উচিত নয়। খারাপ দেখায়। তবু তার উপায়ও নেই। রাঙাকাকি আর মা থাকতে চেয়েছিল, কুঞ্জ একরকম জোর করে তাদের শুতে পাঠিয়েছে। কেবল টুসি। ডাক্তার বলে গেছে—ভয় নেই। কিন্তু কুঞ্জর ভয় অন্য জায়গায়। সে নিঃশব্দে চেয়ে থেকেছে সাড়হীন সাবিত্রীর দিকে। টের পেয়েছে ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে তার ডান বুকে জল জমছে। বাঁ বুকে ভয়।

টুসির শ্বাসের শব্দ মন দিয়ে শুনল কুঞ্জ। ঘুমন্ত শ্বাসের শব্দ চিনতে পেরে নিশ্চিন্ত হল একটু। আস্তে নিঃশব্দে উঠে এল বিছানার কাছে। ডাকল না, তবে বিছানার এক পাশে বসল খুব সাবধানে।

অনেক, অনেকক্ষণ বসে রইল। ঘরে একটা মৃদু নীল ঘুম-আলোর ভুম জ্বালানো। তাতে আলো হয় না। কেবল দৃশ্যগুলো জলে-ডোবা আবছায়া মতো দেখা যায়। সেই আলোয় যুবতী সাবিত্রীকে বুড়ি-থুড়ির মতো দেখায়। দেখতে ভাল লাগে না। অনিচ্ছে হয়। চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে জাগে।

গভীর রাতের এক নিস্তব্ধ মুহূর্তে যখন সাবিত্রীর বিছানায় সসঙ্কোচে বসে অন্যমনস্ক কুঞ্জ পপুলারিটির কথাই ভাবছিল তখন হঠাৎ খুব বড় করে চোখ মেলল সাবিত্রী। মাঝরাতে হঠাৎ সেই তাকানো চোখের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে কুঞ্জ। তারপর মুখ এগিয়ে খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে—এখন কেমন আছ?

সাবিত্রী জবাব দিল না। বড় বড় চোখে নিষ্প্রাণ প্রতিমা যেমন চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ সেইরকম চেয়ে রইল। তারপর খুব ক্ষীণ, নাকিস্বরে বলল—ও কোথায়?

কুঞ্জ গম্ভীর হয়ে বলল—পালিয়েছে।

সাবিত্রী চারদিকে চাইল। টুসিকে দেখল, কুঞ্জর দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করে বলল—টুসি?

—ঘুমোচ্ছে।

সাবিত্রী গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে—আর সবাই?

—ধারে কাছে কেউ নেই।

শুনে সাবিত্রী সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলে—আপনাকে কতবার বলেছি, ও আমাকে সন্দেহ করে। কিছু টের পেয়েছে।

—আজ কী বলল?

সাবিত্রী কুঞ্জর দিক থেকে অন্যধারে পাশ ফেরে। বলে—ও জানে।

কুঞ্জর ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় হঠাৎ। বুক জুড়ে একটা বেলুন ফেঁপে ফুলে উঠে তার দম চেপে ধরে।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে—টের পাওয়ার কথা নয়।

সাবিত্রী মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। চোখে জল। একটু ক্ষুব্ধ গলায় বলে—কী করে জানলেন, টের পাওয়ার কথা নয়? আপনি কি কখনও আমাদের গোপন সম্পর্কের কথা জানতে চেয়েছেন? গত চার মাস ও আমাকে ছোঁয়নি।

বজ্রপাতের মতো আবার সেই পপুলারিটি কথাটা মাথার মধ্যে ফেটে পড়ে কুঞ্জর। তার মন অভ্যাসবশে হিসেব করে নেয়, যদি কেষ্ট সন্দেহ করে থাকে, তবে সেটা চাউর করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হাবুর ঝোপড়ায় মদের মুখে স্যাঙাতদের কাছে বলবে না কি আর? বউ আর দাদাকে জড়িয়ে তামসিক আনন্দ পাবে। যদি কথাটা ছড়ায় তবে কুঞ্জর অনেকখানি চলে যাবে। রেবন্তও কি জানে?

বড় ছটফট করে ওঠে কুঞ্জ। বলে—ছোঁয়নি?

সাবিত্রী চেরেই ছিল । ধীর স্বরে বলল—কখনও-সখনও চাইত। আমার ইচ্ছে হত না। ঝগড়া করতুম। তখন রাগ করে গুটিয়ে যেত।

সাবিত্রীর এই বোকামিতে হাঁ হয়ে রইল কুঞ্জ। বোকা, জেদি মেয়েটা। খুব হতাশ গলায় কুঞ্জ বলল—তা হলে আর ওর দোষ কী? যদি কথাটা আমাকে আগে বলতে তবে তোমাকে পরামর্শ দিতুম অন্তত এক-আধবার ওকে অ্যালাউ করতে। দোষটা কেটে থাকত।

সাবিত্রী জেদি গলায় বলে—আমার ইচ্ছে হত না। ঘেন্না পেতাম।

কুঞ্জ কাহিল গলায় বলে—কিন্তু ধরা পড়ে গেলে যে!

সাবিত্রী মুখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ক্ষীণ স্বরে বলে—গেলাম তো! কিন্তু সব দোষ কি আমার? আপনার কিছু করার ছিল না?

সাবিত্রীর ওপর এই মুহূর্তে ভারী একটা ঘেন্নার মতো ভাব হল কুঞ্জর। দোষ তোমার নয় তো কার? বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই কেন তুমি আর সবাইকে ছেড়ে সুযোগ পেলেই হাঁ করে দেখতে আমাকে? বাড়ির লোক আমাকে যত্ন করে না বলে কেন অনুযোগ তুলতে সবার কাছে? কেন আমার স্নানের সময় পুকুরঘাটে গেছ? আমার ঘরে গিয়ে সোহাগ করে বিছানা টান করত, আলনা আর টেবিল গোছাত কে? কেষ্টকে মদ ছাড়ানোর চেষ্টা করনি, রাতে ও না ফিরলে তেমন গা করনি কখনও। সেসব কেন? যদি স্বামী হিসেবে কেষ্টকে তোমার পছন্দ নয়, তবে বিয়ের আগে নটঘটি করেছিলে কেন? ঠিক কথা, দোষ আমারও। কী করব, আমার যে সেচহীন শুকনো জীবনের চাষ। একটা বয়সের পর পুরুষ চোত মাসের খরার জমি হয়ে যায় জান না? মেয়েমানুষ হল জলভরা কালো মেঘের মতো। আমার সেই মেঘ কেটে গেছে কবে! তনু বিয়ে করে চলে গেল। শুকনো ড্যাঙা জমি পড়েছিলুম। ছিলুম তো ছিলুম। কে তোমাকে মেঘ হয়ে আসতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? চনমন করতে, উচাটন হতে, সম্পর্কের বাঁধন খসিয়ে ফেলতে চাইতে। তোমার চোখমুখ দেখেই জলের মতো বোঝা যেত। আর যত সেটা বুঝতে পারলুম তত আমারও চৈত্রের জমি মেঘ দেখে ফুঁসে উঠল। সেটা দোষ বটে, কিন্তু বিবেচনা করলে, বিশ্লেষণ করলে, তলিয়ে দেখলে দেখতে পাবে মেঘের ছায়া পড়েছিল বলেই খরার জমি উন্মন হয়েছিল। শরীর জিনিসটা সম্পর্ক মানতে চায় না, সমাজ মানতে চায় না, আগে পরে কী হবে ভাবতে চায় না। বোবা, কালা, অন্ধ, অবিবেচক। যখন জাগে তখন মাতালের মতো জাগে, লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায় সব। হাবুর ঝোপড়ায় একরাতিয়াকে নিয়ে পড়ে থাকত কেষ্ট। তুমি এ ঘরে একা। আমি ও ঘরে একা। মেঘ ডাকত, খরার মাটিও অপেক্ষা করত। তারপর এক ঘোর নিশুত রাতে ছোট্ট করে শেকল নড়ল দরজায়।...আমি যেন জানতুম, অবিকল এইভাবেই একদিন নিশুত রাতে শিকল নড়বে। আমি এত নিশ্চিতভাবে জানতুম যে শেকল কে নাড়ল তা জিজ্ঞেসও করিনি। উঠে কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলুম। মনে কোরো না যে ভেসে গিয়েছিলুম, ডুবে গিয়েছিলুম, সুখে ভরে উঠলাম। মোটেই তা নয়। শরীর নিভলে বড় ঘেন্না হয়েছিল নিজের ওপর। সমাজ, সংসার, সম্পর্ক সব বজ্রাঘাতের মতো মাথায় পড়তে লাগল এসে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম, তুমি ভারী সুখী হয়েছে, তৃপ্তি শান্তি আনন্দে ঝলমল করছে মুখ। বলেছিলে, যে মানুষ মস্ত বড় তাকে সব দেওয়া যায়। দোষ হয় না। বলনি?

কুঞ্জ শুকনো মুখে বলল—কেষ্ট জানে বলছ! কিন্তু লোকটা যে আমিই তা ঠিক পেল কী করে?

সাবিত্রী গভীর বেদনার শব্দ করল একটু। আস্তে করে বলল—বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ ব্যথা।

সাদা ঠাণ্ডা একটা হাত বাড়িয়ে কুঞ্জর হাতখানা ধরল সাবিত্রী। ভারী দুর্বল হাতের সেই ধরাটা যেন শালিখ পাখির পায়ের আঁকড়ের মতো। কুঞ্জর গা সামান্য ঘিনঘিন করে। অশুচি লাগে। ঘরের কোণে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে রক্তমাখা কাপড়চোপড়, ন্যাকড়া। ঘরের আঁশটে গন্ধটা যেন আরও ঘুলিয়ে ওঠে হঠাৎ। টুসি গভীর ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করে কী বলে ওঠে। কুঞ্জ হাত ছাড়িয়ে নেয়।

সাবিত্রী ক্লান্ত আধবোজা চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে—আপনার কথা আমিই বলেছি।

—তুমি! কুঞ্জ ভারী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—রোজ জানতে চাইত, আপনিই কি-না। পেটে ছেলে এল, অথচ ওর নয়। তবে কার, তা হিসেব করে দেখত। স্বীকার করানোর জন্য মারত। কাল বলে ফেললাম।

—তুমি কি পাগল?

সাবিত্রীর ক্ষীণ স্বরে যেন একটু জোয়ার লাগে—পাগল কেন হব? আমার তো সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে। ভাবতে কত সুখ হয়! গায়ে কাঁটা দেয়। মনে হয়, আপনার মতো মানুষ, এত বড় একটা মানুষ, যার এত নামডাক সে কি-না আমাকে এত স্নেহ করে! আমার এত আনন্দ হয়, সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে। কাল মাঝরাতে যখন ও আমাকে গলা টিপে ধরেছিল তখন চোখে চোখ রেখে একটুও ভয় না খেয়ে বলেছিলাম। একটুও ভয় করেনি। বলে এত সুখ হল, গায়ে কাঁটা দিল আনন্দে। ও যখন মারছিল তখন একটুও লাগছিল না। আমি তখনও হাসছিলুম।

আস্তে আস্তে আড়ষ্ট হয়ে যায় কুঞ্জ। ভিতরে একটা কাঁপুনি শুরু হয়। এ যে বদ্ধ বেহেড হয়ে গেছে। এখন যে এ আর কোনও হায়া লজ্জা মানছে না! মাথাটা টলে যায় কুঞ্জর। বিছানার ওপর হাতের ভর রেখে ঝুঁকে সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন ভূত দেখছে। বলে—কী করলে বলো তো! ছিঃ ছিঃ!

—আমি ভয় পাই না। আমার লজ্জা নেই। এত মারল, কত কষ্ট পেলাম দেখুন তবু এখনও মনে হচ্ছে বলে দিয়ে বেশ করেছি।

কুঞ্জ কুঁকড়ে বসে হাঁটুতে থুঁতনি রেখে ক্ষীণ গলায় বলে—শুনে কেষ্ট কী করল?

—খুব অবাক হল। সন্দেহ করত বটে কিন্তু আপনার মতো মানুষ এ কাজ করতে পারে তা যেন ওর বিশ্বাস হত না। তাই কথাটা শুনে কেমনধারা ভ্যাবলা হয়ে গেল। মারল আমাকে, কিন্তু কেমন পাগলাটে হয়ে গেল মুখ, মারতে মারতেই কেঁদে ফেলল। তারপর দরজা খুলে পালিয়ে গেল দৌড়ে। ফিরল আজ সন্ধেবেলায়। আবার ধরল আমাকে, বলল, দাদাকে মিথ্যে করে জড়াচ্ছ। দাদা নয়, অন্য কেউ। কে সত্যি করে বলো। আমি তেমনি চোখে চোখ রেখে বললাম। বলল, আমাদের দুজনকেই খুন করবে। আগে কোনওদিন পেটে মারেনি, আজ মারল। বলতে বলতে মুখ বালিশে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে সাবিত্রী।

কুঞ্জ অসাড় হয়ে বসে থাকে। পপুলারিটি কথাটা খামচে ধরে মাথা। এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সাবিত্রী। থর থর করে কাঁপছিল, ঠোঁট সাদা। লেপ টেনে মুড়ি দিয়ে গভীর ব্যথা-বেদনার শব্দ করে বলল—আমার শরীর বড্ড খারাপ লাগছে। ভীষণ শীত আর কাঁপুনি।

কুঞ্জ টুসি.কে ডেকে তোলে। রাঙাকাকি আর মাকে ডেকে আনে।

৬

এতদিনে তবে কি বুড়ো হল পটল? চোখে ছানি আসছে নাকি? একটু আলো লাগলেই চোখ বড় ঝলসে যায় যে আজকাল? নইলে কি রবিকে কুঞ্জ বলে ভুল করত? টর্চের আলোটা এমন বিশাল গোলপানা চক্করের মতো ঝলসে উঠেছিল যে ধাঁধা লেগে গেল। সে ভুলটাও শুধরে নিতে পারত। কিন্তু একটা ফাঁকা আওয়াজে, একটা উটকো লোকের হাঁকাড় শুনে মাথাটা কেন যে ঘেবড়ে গেল আজ। হাবুর ঘরে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে অফুরন্ত হাঁফের টান ভোগ করতে করতে এইসব কথা ভাবে পটল। শ্লেষ্মার পর শ্লেষ্মা উঠে আসছে কাশির সঙ্গে। হরি ডাক্তার মরে গিয়ে অবধি এই শ্লেষ্মার আর চিকিৎসা হল না।

বুকের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে শ্বাসের কষ্ট। এরপর কি মরবে পটল? ঝাড়গ্রামে মামাশ্বশুর সস্তায় একটা কলাবাগান বেচে দিচ্ছে। পটলের বড় ইচ্ছে, বাগানটা কেনে। মরবার আগে ছেলেপুলে সহ বউ বাসন্তীকে ঝাড়গ্রামে বসিয়ে যেতে পারলে একটা কাজের কাজ হয়। বাসন্তীর ব্যবসার মাথা আছে, কলা বেচে ঠিক সংসার চালিয়ে নেবে। আজ কুঞ্জকে খুন করতে পারলে রেবন্তবাবু বাগান কেনার টাকা দেবে, কথা ছিল। খুন পটলের কাছে নতুন জিনিস তো নয়। পলিটিক্সয়ালাদের হয়ে, জোত-মালিকের হয়ে, হরেক কারবারির হয়ে নানান রকম মানুষ মেরেছে সে। সেজন্য বড় একটা আফশোসও নেই তার। মশা মাছি, পাঁঠা ছাগল মারলে যদি পাপ না হয় তবে মানুষ মারলেও হয় না। আর যদি পাপ হয়ই হবে পাঁঠা-ছাগল মারলে যতটা হয় তার বেশি হয় না। এ তত্ত্ব পটল অনেক ভেবে ঠিক পেয়েছে। কিন্তু এখন তার সন্দেহ হয়, সত্যিকারের বুড়ো হল নাকি সে? ছানি আসছে চোখে? মাথাটা কাজের সময় ঠিক থাকছে না কেন? এমন হলে লাশটা ফেলতে পারবে না পটল, আর যদি না ফেলতে পারে তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা যে হাতছাড়া হয়ে যাবে! রেবন্তবাবু দায়ে দফায় অনেক দেখেছে তাকে; তার এই কাজটুকু করে যে দিতেই হয় পটলকে! ভাবছে আর কাশছে পটল। হাবুর দেওয়া বড় মাটির ভাঁড়টা ভরে উঠল শ্লেষ্মায়। বড় শ্বাসের কষ্ট।

চ্যাটাইয়ের অন্যধারে বসে কালিদাস তাড়ি টানছিল খুব। মাথাটা টলমলে হয়ে এসেছে। মিটি-মিটি হাসছে আর পটলের দিকে চাইছে। বিড়বিড় করে বলছে—হোমিওর কী গুণ বাবা! নিজের চোখে দেখলুম তো! কুঞ্জ ওই অত দূরে থাকতে পকেট থেকে শিশি বের করে ওষুধ খেল, আর সেই ওষুধের গুণে একশো হাত দূরে পটলার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। শুধু তাই? হোমিওর গুণেই না কুঞ্জ আগেভাগে জানতে পেরেছিল যে আজ সে খুন হবে! তাই না এক বকরাক্ষসকে জুটিয়ে এনেছিল সঙ্গে। কী চেঁচাল বাবা মুশকো লোকটা! কাঁচা খেয়ে ফেলত ধরতে পারলে। পটল যে পটল সেও ভয় খেয়ে পালায় না হলে? রেবন্তবাবুও ঘাবড়ে গেছে খুব। এই জল ঝড়ের মধ্যেই লেজ গুটিয়ে পালাল।

নারকোল বাগানের বাইরে আসতেই ধারালো বৃষ্টি ছেঁকে ধরল রেবন্তকে। পাথুরে ঠাণ্ডা জল। দমফাটা হুমো বাতাস খোলা মাঠের মধ্যে তাকে এলোমেলো ঘাড়ধাক্কা দিতে থাকে। দেয়ালের মতো নিরেট অন্ধকার চারদিকে, এক লহমায় ভিজে গেল রেবন্ত। গায়ের সোয়েটার, জামা গেঞ্জি ফুঁড়ে জল ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। বৃষ্টি বাতাস আর মাঠে জমা জল ঠেলে জোরে হাঁটা যায় না। তবু প্রাণপণে হাঁটে রেবন্ত। শীতে ঠকঠক করে কাঁপে সে। দুটো কানে বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। ঝোড়ো বাতাস হাড়-পাঁজরায় ঢুকে প্রাণটুকু শুষে নিচ্ছে। তবু সে পিছন ফিরে একবার দেখে নিল, ছায়া দুটো পিছু নিয়েছে কিনা, ওই দুজনের কাছ থেকে এখন তাকে যতদূর সম্ভব তফাত হতে হবে।

শরীর অবশ করে গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা আর কাঁপুনি ধরে গেল। কানের যন্ত্রণাটা মাথাময় ভোমরার ডাক ডাকতে থাকে, চিন্তার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। এই অবস্থায় কীভাবে সে শ্যামপুর পৌঁছল সেটা সে নিজেও ভাল বলতে পারবে না।

আবছা মনে পড়ে, বাজারে তেজেনের দোকান থেকে নিজের সাইকেলটা নেওয়ার সময় তেজেন বলেছিল, পাগল নাকি? এ ভাবে যেতে পারে মানুষ! থেকে যাও।

রেবন্ত কথাটা কানে নেয়নি, অন্ধকারে বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে সে প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়েছিল। কয়েকবার সাইকেল হড়কে পড়ে গেল। চাকার রিমে টাল খেয়েছে। চালানোর সময় ফর্কের সঙ্গে টায়ার ঘষা খাচ্ছিল খ্যাস খ্যাস করে। জোরে চলতে চাইছিল না। তবু পৌঁছেও গেল রেবন্ত।

শ্যামশ্রীর সামনে কোনওদিন কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করে না, আজও করল না। যখন উত্তরের দালানের বারান্দায় সাইকেলটা হিঁচড়ে তুলল তখন তার শরীর আপনা থেকেই টলে পড়ে যাচ্ছিল মেঝেয়। স্রেফ মনের জোরে খাড়া রইল সে। গামছায় শরীর মুছল, জামাকাপড় পালটাল। মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে চোখ আর নাক দিয়ে অবিরল জল ঝরছে। প্রবল হাঁচি দিল কয়েকটা।

শ্যামশ্রী মুখে কিছু বলছিল না বটে, কিন্তু দরজা খুলবার পর থেকেই একদৃষ্টে লক্ষ করছিল তাকে। ছাড়া জামাকাপড়গুলোর জল নিংড়ে দড়িতে মেলে দিয়ে এল শ্যামশ্রী। নীরবে শুকনো জামাকাপড় সোয়েটার এগিয়ে দিল। রেবন্তর গা আর জামা-কাপড় থেকে জল ঝরে মেঝেয় গড়িয়ে যাচ্ছিল, নিজে

হাতে চট নিয়ে এসে তা চাপাও দিল শ্যামশ্রী। অস্ফুট স্বরে একবার বলল—ছাদের ঘরে এখন যেয়ো না, ঠাণ্ডা, কিছুক্ষণ এখানেই শুয়ে থাকো লেপ গায়ে দিয়ে।

মাসখানেকের বেশি হল, নীচের শোওয়ার ঘরে শ্যামশ্রীর সঙ্গে শোয় না রেবন্ত। ছাদে একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে শোয়। শ্যামশ্রীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্কও তার নেই বেশ কিছুদিন। কথাবার্তাও প্রায় হয়ই না।

রেবন্ত শ্যামশ্রীর কথার জবাব দিল না, কিন্তু ওর খাটের নরম বিছানায় গিয়ে বসল। ভাঁজ করা লেপটাও টেনে নিয়ে যথাসাধ্য মুড়ি দিল গায়ে। মাথা আর কান জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। সহ্য করতে লাগল চোখ বুজে।

শ্যামশ্রী হয়তো বুঝতে পারল রেবন্তর অবস্থা ভাল নয়। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। একটু বাদে একটা বড় কাচের গ্লাস ভর্তি আদা-চা নিয়ে এল, সঙ্গে মুড়ি, আলুভাজা আর লঙ্কা।

গরম চা পেটে যাওয়ার পর আচ্ছন্নভাবটা কিছু কাটে। কিন্তু স্বাভাবিক বোধ করে না রেবন্ত। ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর অস্থিরতা।

নকশাল আমলে এ অঞ্চলে খুনখারাবি হতে পারেনি। পাঁচটা-সাতটা গাঁ জুড়ে তৈরি হয়েছিল প্রতিরোধ বাহিনী। এ সব কাজে সবচেয়ে বেশি জান লড়িয়েছিল কুঞ্জই। সে ছিল অস্ত্রহীন সেনাপতি। প্রাণের দায়ে পুলিশ কুঞ্জকে সাহায্য করেছে। তখন কুঞ্জর ছায়া হয়ে ফিরত রেবন্ত। রাত জেগে সাইকেলে ঘুরে গাঁয়ের পর গাঁ চৌকি দিত দুজনে। কুঞ্জ বুকের দোষ বলে নিজে সাইকেল চালাত না। তাকে সামনের রডে বসিয়ে নিয়ে চালাত রেবন্ত। সাইকেলেই দুজনের রাজ্যের কথা হত। হৃদয়ের কত গভীর কথা সে সব: স্বর্গরাজ্য তৈরি করার কত অবাস্তব স্বপ্ন! কুঞ্জ কখনও নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে চাইত না। অসম্ভব চাপা ছিল। কিন্তু একদিন মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় খাড়ুবেড়ের মোড় থেকে বেলপুকুর ফিরবার পথে সাইকেলের রডে বসে দুর্বল মুহূর্তে কেঠো স্বভাবের কুঞ্জও বলে ফেলেছিল তনুর কথা। রাজুর বোন তনু। আর কাউকে কখনও বলেনি কুঞ্জ, বিশ্বাস করে শুধু তাকেই বলেছিল।

সেই বিশ্বাসটা আর অবশ্য নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর তারা দুজনে গিয়েছিল যশোর অবধি। তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তখন ছিল প্রবলতম, কিন্তু সেইটেই আবার ছিল বিচ্ছেদেরও পূর্বাভাস। যশোরযাত্রাই ছিল তাদের বন্ধুত্বেরও শেষ যাত্রা! মুক্তিযুদ্ধের পরই ইলেকশন। কংগ্রেসের হয়ে নমিনেশন পাওয়ার আশায় কুঞ্জ লড়ে গেল নানুর সঙ্গে। পারল না। পারার কথাই নয়। কুঞ্জ এ অঞ্চলের জন্য অনেক করেছে বটে, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে বিধানসভায় দাঁড়ানোর ক্ষমতাও তার এসে গেছে। সেই প্রথম রেবন্ত চটেছিল কুঞ্জর ওপর। বোকার মতোই কুঞ্জ দাঁড়াল নির্দল হয়ে। রেবন্ত খাটতে লাগল নানুর জন্য। পাঁচ-সাতটা গাঁয়ে কুঞ্জর প্রভাব বেশি, নানু পাত্তা পাবে না। কিন্তু তখন নানু হারলে দলের বেইজ্জত। নিছক জোর ছাড়া গতি ছিল না। এমনিতেই হয়তো নানু জিতত, তবু সন্দেহের অবকাশ না রাখতে রেবন্তরা বুথ দখল করল ভোটের দিন ভোরবেলায়। তখন থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। কুঞ্জর পোলিং এজেন্ট বেলপুকুর কলেজে মার খায়। যারা মেরেছিল তাদের মধ্যে রেবন্ত ছিল। তখন রেবন্ত দরকার হলে কুঞ্জকেও মারতে পারত।

সে যাত্রা কুঞ্জ জেতেনি। ইলেকশনের পর আবার ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল কুঞ্জর সঙ্গে রেবন্তর। তবে কুঞ্জ আর দলে ফেরেনি। অন্য দলে ভিড়েছে। কিন্তু আজও ঝিমিয়ে যায়নি। সব সময় কিছু না কিছু করছে। দল পাকাচ্ছে, চাঁদা তুলছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, সাহায্য বা ত্রাণের কাজ করছে।

শ্যামপুরে রেবন্তদের পরিবারের প্রতাপ খুব। নামে বেনামে তাদের বিস্তর জমি, চালের কল, বাগনানে তাদের মস্ত কাপড়ের দোকান। রেবন্তকে কাজ-কর্ম করতে হয় না। বি এসসি পাশ করে সে বহুদিন শুয়ে বসে আর পলিটিক্স করে কাটাচ্ছিল। তাঁতপুরে একটা ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করত। অলস মাথায় শয়তানের বাসা। রোজ বিকেলের দিকে একটু নেশা করার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। বেলপুকুর বাজারের পিছনে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ভিতর দিকে নির্জন জায়গায় হাবুর ঝোপড়া হল নেশার আস্তানা।

কিছু বদমাশ লোক হাবুর বউয়ের নামই দিয়েছিল একরাতিয়া। আসল নাম একরত্তি। মা-বাপের আদর করে রাখা সেই নাম একরত্তি এখন বদমাশদের মুখে একরাতিয়া। অর্থাৎ এক রাতের

মেয়েমানুষ। একরাতিয়া দেখতে এমন কিছু নয়। স্বাস্থ্যটা ভাল। ছেলেপুলে নেই। কিছুটা হাবুর লোভানিতে, কিছুটা একঘেয়েমি কাটাতে রেবন্ত সেই ফাঁদে পা দেয়।

একদিন রাত্রে যখন রেবন্ত ঝোপড়ার ভিতরের খুপরিতে একরাতিয়ার সঙ্গে ছিল তখন ঝাঁপ ঠেলে টর্চ হাতে আচমকা ঢুকল কুঞ্জ। তার পিছনে জনা পাঁচ-সাত ছেলে-ছোকরা সমাজরক্ষী। কুঞ্জ অবশ্য টর্চটা পট করে নিবিয়ে ঝাপটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছিল। বলেছিল, পালিয়ে যা সামনের ঘর দিয়ে। আর কখনও আসিস না।

রেবন্ত পালিয়েছিল। তারপর লোকলজ্জার ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে ছিল কয়েকদিন। সামাজিক নোংরামি বন্ধ করতে কুঞ্জ তখন নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে দলবল নিয়ে। যত অকাজের কাজ। কয়েকদিন বাদে একদিন শ্যামপুরে এসে রেবন্তর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বলল—সত্যবাবুর বড় মেয়েটি ভাল। তোদের স্বঘর।

রেবন্ত চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না লজ্জায়। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পেরেছিল এটা ব্ল্যাকমেল। প্রথমটায় রাজি হয়নি। কিন্তু কুঞ্জর উসকানিতে তার বাবা মা আর কাকারা বিয়ের জন্য পিছনে লাগল। পারিবারিক চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা তাকে করতে হয়।

বিয়েটা পুরুষের জীবনের কী সাংঘাতিক গুরুতর ব্যাপার তা আগে জানত না রেবন্ত। বিয়ের পর হাড়ে হাড়ে জানল। বিয়ের আসরে দানসামগ্রীর মধ্যে একটা চরকা দেখে বরযাত্রীরা কিছু ঠাট্টা রসিকতা করেছিল। সে তেমন কিছু নয়। কিন্তু কন্যা সম্প্রদানের সময় রেবন্ত টের পেল তার করতলে শ্যামশ্রীর হাত শক্ত, ঘোমটার মধ্যে মুখখানা গোঁজ। বিদ্রোহের সেই শুরু। রেবন্তকে শ্যামশ্রী বহুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে কালচারের দিক দিয়ে তার যোগ্য বর রেবন্ত নয়। এ কথা আরও নানা জনেও কানাঘুঁষো করে। একদিন এক বকারাজ খুড়শ্বশুর কলকাতা থেকে এসে সব দেখেশুনে মুখের ওপরেই তাকে বলেছিল—সত্যদা কলকাতায় থাকলে এ বিয়ের কথা ভাবতেই পারত না। গাঁ-ঘরে কি শ্যামাকে মানায়?

আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেল রেবন্তও। শ্যামশ্রী দেখতে খারাপ নয়। সত্যিকারের ঢলঢলে চেহারা। মস্ত মস্ত গভীর চোখ। ভারী নরম তার চলাফেরা, কথাবার্তা, কিন্তু ওই নরম চেহারার ভিতরকার স্বভাবটি অহংকারী, জেদি, নিষ্ঠুর। বিয়ের পর থেকেই এক ঘরের মধ্যে তারা দুজন জন্মশত্রুর মতো এ ওকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজত। এখন আক্রমণ নেই। নিরুত্তাপ বিরাগ রয়েছে।

এ বাড়ির কারও সঙ্গেই শ্যামশ্রীর তেমন বনিবনা নেই, তবে সে এত গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বময়ী যে কেউ তাকে বড় একটা ঘাঁটাতে সাহসও করে না। উঁচু গলায় শ্যামশ্রী বড় একটা কথা বলে না। তার তেজ রাগ সব ঠাণ্ডা ধরনের। সকালে উঠে সে রোজ চরকা কাটে, গান্ধীর বাণী পড়ে। এগুলো ওর সত্যিকারের ব্যাপার, না কি বিদ্রোহের প্রকাশ তা জানে না রেবন্ত। সে নিজে কিছু রাজনীতি করেছে বটে তবে কোনও আদর্শই তার ভিতরে গভীর হয়ে বসেনি। তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নেই। নিজের চারপাশেও সে বরাবর তার নিজের মতো লোকজনকেই দেখেছে। তাদের কারওরই কোনও নেতার প্রতি অবিচল ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসও নেই। তাই শ্যামশ্রীকে দেখে তার অসহ্য লাগে। গান্ধী কেন চরকা কাটতেন বা গান্ধী কী বলে গেছেন তা কখনও অনুসন্ধান করে দেখেনি রেবন্ত। সে শুধু জানে গান্ধী অহিংসবাদী ছিলেন, অসহযোগ আর ভারত ছাড়ো আন্দোলন করেছিলেন, লোককে চরকা কাটতে বলতেন, এর বেশি জানার আগ্রহ রেবন্তর নেই। উপরন্তু এখন শ্যামশ্রীর জন্যই গান্ধীকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করতে শুরু করেছে।

বিয়ের পর শ্যামশ্রীকে সে পায়নি বটে, কিন্তু পেয়েছে বনাকে। যতবার সে বনাকে দেখে ততবার মনে হয়, এই বনা তো আমার জন্যই জন্মেছিল। বনশ্রীর কথা মনে পড়লেই তার ভিতরকার অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর, মনপ্রাণ জেগে ওঠে। একাগ্র হয়ে ওঠে সে।

বড় গোপন কথা। কোনওদিন বনশ্রীকে সে কিছু বুঝতে দেয়নি, কখনও লঙ্ঘন করেনি সম্পর্কের নিয়ম। শুধু তার মন জানে। যা অন্তরে গোপন করা যায় তাই বেড়ে ওঠে। যত দিন যাচ্ছে তত তার মন ভরে ওঠে বনশ্রীতে। কখনও পাগল পাগল লাগে। অসহায় আবেগে সে ঘন্টার পর ঘন্টা বনশ্রীকে চিন্তা করে। মনে মনে জিয়ন্ত করে তোলে তাকে। তারপর ভালবাসার কথা বলে পাগলের মতো।

এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আবার সে যাওয়া শুরু করেছিল হাবুর ঝোপড়ায়। একরাতিয়ার সঙ্গে আবার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এখন আর সে লোক-লজ্জার ভয়ও পায় না। ভারী বেপরোয়া লাগে নিজেকে। শ্যামশ্রী তার জীবনটা নষ্ট করেছে, এবং বনশ্রীকে সে হয়তো কোনওদিনই পাবে না। তবে আর ভয় কীসের, ভাবনাই বা কী? কুঞ্জর সমাজরক্ষী দল স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙে গেছে। এখন আর কেউ হামলা করে না। হাবুর ঝোপড়ায় মাইফেল জমেছে খুব। এমনকী কুঞ্জর নিজের ভাই কেষ্টও এখন হাবুর ঝোপড়ায় রোজকার খদ্দের।

বনশ্রীর কথা আর কেউ না জানুক, একদিন জেনে গেল কুঞ্জ। মাতাল অবস্থায় তাকে সেদিন তুলে এনেছিল কুঞ্জ। রিকশায় তাকে পাশে নিয়ে বসে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল রাতের বেলায়। এ সব করাই তো কুঞ্জর কাজ। মহৎ হওয়ার বড় নেশা ওর। আর সেই দিন রিকশায় ফাঁকা রাস্তায় কুঞ্জকে বহু দিন পরে একা পেয়ে রেবন্ত সামলাতে পারেনি নিজেকে। শ্যামশ্রীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল কুঞ্জ, সেই আক্রোশ শীতের সাপের মতো ঘুমিয়ে থাকে তার মনের মধ্যে। কুঞ্জকে পেয়ে ফুঁসে উঠল। দুর্বল হাতে কুঞ্জর জামার গলা চেপে ধরে সে বলল—কেন আমার সর্বনাশ করলি হারামি? কে তোকে দালালি করতে বলেছিল?

বার বার এই প্রশ্ন করে যাচ্ছিল সে। পারলে সেদিনই খুন করত কুঞ্জকে। কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় কুঞ্জ তাকে নানা উপদেশ দিচ্ছিল। ভাল হতে বলছিল, যেমন সবাই বলে। কুঞ্জকে রিকশা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল রেবন্ত বার বার। বলেছিল—কে তোকে শ্যামার সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেছিল? আমি তো বনাকে ভালবাসি, আমি বনাকে ভালবাসি। শ্যামশ্রীকে খুন করে আমি বনশ্রীকে বিয়ে করব।

মাতাল অবস্থায় কী বলেছিল তা মনে ছিল না রেবন্তর। কিন্তু পরদিন সকালে কুঞ্জই এল। নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে থমথমে মুখে বলল—বনশ্রীর সঙ্গে তোর কোনও খারাপ সম্পর্ক নেই তো?

আতঙ্কে সাদা হয়ে গিয়েছিল রেবন্ত। ঘোলাটে স্মৃতি ভেদ করে গত রাত্রির কথা কিছু মনে পড়েছিল তার। সে হাবুর ঝোপড়ায় গিয়ে মদ খায় বা একরাতিয়ার সঙ্গে শোয়—এ কথা লোকে জানলেও সে আর পরোয়া করে না। কিন্তু বনশ্রীর কথা সে কোনও পাখি-পতঙ্গের কাছেও প্রকাশ করতে পারবে না যে। কী করবে ভেবে না পেয়ে রেবন্তর মাথা গুলিয়ে গেল। ঝুপ করে কুঞ্জর দুহাত ধরে বলল—না, না। দোহাই, বিশ্বাস কর।

কুঞ্জ বিশ্বাস করেনি। অত বোকা সে নয়। কিন্তু মুখে বলেওনি কিছু। শুধু কেমনধারা শুকনো হেসেছিল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—বনশ্রী বড় ভাল মেয়ে। নষ্ট করিস না।

তারপর থেকে কুঞ্জ এখন প্রাণপণে বনশ্রীর জন্য ভাল ভাল সম্বন্ধ জোগাড় করছে। বিয়ে হয়েও যেত এতদিনে। কিন্তু বড় মেয়ের বিয়েটা সুখের হয়নি বলে বনশ্রীর মা বাবা চট করে কোনও জায়গায় মত দিতে দ্বিধা করছেন। এবার একটু ভাল করে দেখেশুনে বিয়ে দেবেন ওঁরা।

রেবন্ত জানে, কুঞ্জ কখনও বনশ্রী সম্পর্কে তার মনের কথা কাউকে জানাবে না। মরে গেলেও না। সে স্বভাব কুঞ্জর নয়। কিন্তু রেবন্তর তবু বুকে জ্বলুনিটা যায় না। কুঞ্জ তো জানে। জেনে গেছে। পৃথিবীর একটা লোক তো জানল!

ইদানীং কুঞ্জর আর এক কাজ হয়েছে। কে তার মাথায় ঢুকিয়েছে বে-আইনি জমি ধরতে হবে। সেই থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে পাগলের মতো ঘোরে সে। বাগনান হাওড়া আর কলকাতার কাছারিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দলিল দস্তাবেজের খোঁজখবর নেয়, নকল বের করে। বি ডি ও থেকে শুরু করে মহকুমা হাকিম, ল্যান্ড সেটেলমেন্ট থেকে থানা—কোথায় কোথায় না হন্যে হয়ে হানা দিচ্ছে সে? যে ব্যাপারে হাত দেয় তাতেই ওর রোখ চাপে। আগুপিছু ভাবে না।

জমির স্বত্ব মানুষের কাছে কী সাংঘাতিক তা যে জানে না কুঞ্জ এমন নয়। সরকার বাড়তি জমি ছাড়তে বললেই লোকে ছাড়ে কখনও? তবে তো সরকার একদিন এও বলতে পারে, বাড়তি ছেলেপুলে বিলিয়ে দাও।

কুঞ্জ বিপদটা বুঝেও বোঝেনি। এই জমি উদ্ধারের জন্য সে আর একবার খুন হতে হতে বেঁচে যায় বরাত জোরে। তবু বোঝেনি। রেবন্ত জানে গোটা এলাকা জুড়ে এখন সযত্নে একটি স্টেজ তৈরি হয়ে রয়েছে, যে স্টেজে কুঞ্জর জীবনের শেষ দৃশ্যটার অভিনয় হবে। আজ বেঁচে গেল বটে, কিন্তু রোজ কি

বাঁচবে? তার দিন ঘনিয়ে এল। তার জন্য টাকা খাটছে, পাকা মাথার লোক রয়েছে পিছনে। এও ঠিক হয়ে আছে, কুঞ্জ মরলে পুলিশ তদন্ত করবে পলিটিক্যাল লাইন ধরে। যে কোনও দলের ঘাড়ে দোষটা চাপানো হবে। দল থেকে প্রতিবাদ উঠবে। হই-চই হবে কিছুদিন। তারপর থিতিয়ে পড়বে। কুঞ্জ মরবেই। রেবন্ত, পটল বা কালিদাসের হাতে যদি নাও মরে তবু কারও না কারও হাতে মরতেই হবে। নানা জায়গায় লোক লাগানো আছে। শুধু ইশারার অপেক্ষা। কিন্তু সেজন্য কুঞ্জকে খুন করতে চায়নি রেবন্ত। কুঞ্জ যাই করুক ওকে সত্যিকারের ঘেন্না করতে পারেনি সে কোনওদিন। ঘেন্না না হলে, খুনে রাগ না উঠলে কি মারা যায়? সেই অভাবটুকু এতদিন ছিল। আজ আর নেই। আপন মনে রেবন্ত একটু হাসে। কুঞ্জ, তোর সঙ্গে আর পাঁচজনের তফাত রইল না। তুই আর আমার চেয়ে মহৎ নোস। সাবিত্রীর কথা আমি জানি।

বাইরে একটা দমকা হাওয়া দিল। বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা সাইকেলটা ঘড়াং করে পড়ে গেল। একটা চাকা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। উৎকর্ণ হয়ে শোনে রেবন্ত। খুবই দামি সাইকেল। বিয়ের পাওয়া জিনিস। কিন্তু উঠল না সে। কানের যন্ত্রণায় অস্থির রেবন্ত লেপমুড়ি দিয়ে বোম হয়ে বসেই রইল। শ্যামশ্রী ঘরে নেই, কিন্তু চারদিকে তারই জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিয়ের সময় শ্যামশ্রীদের বাড়ি থেকে অনেক জিনিস আদায় করা হয়েছিল। এ ঘরে খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল এমনকী পাপোষটা পর্যন্ত ওদের দেওয়া। ভেবে হঠাৎ গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে রেবন্তর। লেপটা ফেলে। উঠে পড়ে বিছানা থেকে। আজকাল শ্বশুরবাড়ির জিনিসগুলোতে পর্যন্ত সে ঘেন্না পায়। সেই ঘেন্নায় এ ঘরে থাকার পাটই তুলে দিয়েছে।

ছাদের ঘরে যাবে বলে রেবন্ত বাইরের বারান্দার দিকে দরজাটা খুলতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল শ্যামশ্রী ভিতরে দরদালানের দিককার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদৃষ্টে দেখছে তাকে।

রেবন্ত যথাসম্ভব তেতো গলায় বলে—আমি যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

শীতল কঠিন একরকম গলায় শ্যামশ্রী জিজ্ঞেস করে—তুমি আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?

রেবন্ত শ্যামশ্রীর চোখ থেকে চট করে চোখ সরিয়ে নেয়। বলে—হ্যাঁ।

—পুরুষদের শ্বশুরবাড়িতে বেশি যাওয়া ঠিক নয়।

শুনে রেবন্ত জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে মুখ ঘুরিয়ে বলে—কেন, কোনও অসুবিধে হয়েছে নাকি?

শ্যামশ্রী বড় বড় চোখে অনুত্তেজিত স্বরে বলে—হয়। শুভ এসেছিল তোমার আমার ঝগড়া হয়েছে কিনা তা জানতে। আমি চাই না, আমার বাপের বাড়ির লোকেরা কোনও কিছু সন্দেহ করুক। তোমার হাবভাব দেখে ওরা আজ নাকি ভেবেছে যে তুমি বাড়ি থেকে ঝগড়া করে গেছ।

মনে মনে বড় অসহায় হয়ে পড়ে রেবন্ত। শ্বশুরবাড়ি! শ্বশুরবাড়ি বলে সে সেখানে যায় নাকি? সে তো যায় বনার কাছে। না গিয়ে সে থাকবে কেমন করে? তার জীবনের একমাত্র খোলা জানালা, একমাত্র ডানায় ভর দেওয়া মুক্তি ওই বনা। বনার কাছে সে যাবে না? মুখে সে শুধু বলল—ও।

শ্যামশ্রী মৃদুস্বরে বলল—আর যেয়ো না। আমার ছোট ভাইবোনেরাও এখন বুঝতে শিখছে। তারা টের পায়।

শিউরে উঠে রেবন্ত কূট সন্দেহে বলে—কী টের পায়?

শ্যামশ্রী তেমনি বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে—আমাদের সম্পর্কটা।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রেবন্ত, শ্যামশ্রীর এই কথায় সহজ হল। বলল—টের পেলেও কিছু যায় আসে না।

—তোমার যায় আসে না জানি। কিন্তু তোমার মতো গায়ের চামড়া তো সকলের পুরু নয়। আমার যায় আসে। জামাই হয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঘন ঘন যাবেই বা কেন? তোমার লজ্জা হয় না? এ সব কথা খুবই শান্ত স্বরে আস্তে আস্তে বলল শ্যামশ্রী। যেন বিশ্লেষণ করছে, বোঝাচ্ছে, জানতে চাইছে। শিক্ষয়িত্রীর মতো ভঙ্গিতে।

অনেক দিনের গভীর আক্রোশ জমে জমে তাল পাকিয়ে আছে রেবন্তর ভিতরে। বনার প্রতি গোপন ভালবাসা, কুঞ্জর প্রতি আক্রোশ, শ্যামশ্রীর প্রতি ঘৃণা। সে একদম স্বাভাবিক নেই। কান মাথা জুড়ে তীব্র

যন্ত্রণা ফেটে পড়ছে। বাইরে চলমান হাওয়ায় সাইকেলের চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে অবিরল। ফ্রি হুইলের কির কির শব্দ আসছে।

শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে শুনতে ভিতরে আক্রোশের পিণ্ডটা বোমার মতো ফাটল। তার ভেতরে একটা রাগে উন্মাদ পাগল চেঁচাল—প্রতিশোধ নাও, প্রত্যাঘাত করো।

দাঁতে দাঁত ঘষল রেবন্ত। সন্ধেবেলা কুঞ্জকে খুন করতে গিয়ে পারেনি, এখন সেই আক্রোশটা তার সমস্ত শরীরকে জাগিয়ে তোলে। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়—লণ্ডভণ্ড করে দাও ওকে। শেষ করে দাও।

শ্যামশ্রী ঘরের মাঝখানটায় ভাল মানুষের মতো অবাক চোখে চেয়ে দেখছিল রেবন্তকে। রেবন্ত আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। মারবে? মারুক। শ্যামশ্রী মারকে ভয় খায় না। গান্ধীজিও কি মার খাননি? শ্যামশ্রী এক পাও নড়ল না।

রেবন্ত সামনে এসে দু হাতে খামচে ধরল তার কাঁধ। তীব্র গরম শ্বাস মুখে ফেলে বলল—তুমি আমাকে শেখাবে?

বলে একটা ঝাঁকুনি দিল শরীরে। শ্যামশ্রী শরীর শক্ত করে বলল—দরকার হলে শেখাব। চোখ রাঙিও না, আমি তোমাকে ভয় পাই না।

—পাও না? এক অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে অবাক গলায় বলে রেবন্ত। ভিতরের পাগলটা চেঁচায়—ছিঁড়ে নাও পোশাক। মারো। ধর্ষণ করো। শেষ করো।

শ্যামশ্রীর আঁচল খসে পড়েছিল। বড় বড় চোখে ভয়হীন ঘৃণায় সে দেখে রেবন্তকে। রেবন্তও দেখে ওই নরম চেহারার অহংকারী জেদি মেয়েটাকে।

কয়েক পলক তারা এরকম রইল। তারপরই রেবন্ত হঠাৎ শ্যামশ্রীর সবুজ উলের ব্লাউজের বড় বড় বোতামগুলো হিংস্র আঙুলে খুলে ফেলতে লাগল।

প্রাণপণে বাধা দিল শ্যামশ্রী। দুহাতে ঠেকাচ্ছে রেবন্তর হাত, বলছে—কী করছ! ছাড়ো, ছাড়ো।

প্রবল ঘৃণা, আক্রোশ আর ভীষণ খুন করার ইচ্ছেয় পাগল রেবন্ত একটা চড় কষাল শ্যামশ্রীর গালে। চাপা গলায় বলল—চুপ। খুন করে ফেলব।

শ্যামশ্রী কী করবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার সব আবরণ খসিয়ে ফেলে রেবন্ত। প্রায় হিঁচড়ে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে ফেলে বিছানায়। চুলের মুঠি চেপে ধরে শুইয়ে দেয়। তারপর কামড়ে ধরে ঠোঁট। দাঁতে চিবিয়ে রক্তাক্ত করে দিতে থাকে। দাঁত বসায় গাল, স্তনে, গলায়। প্রবল ব্যথায় গোঙাতে থাকে শ্যামশ্রী। চেঁচায় না। দরদালানের দরজা এখনও খোলা। চেঁচালে কেউ এসে পড়বে। তাই ভয়ে, আতঙ্কে, লজ্জায় যতদূর সম্ভব নীরবে সহ্য করার চেষ্টা করে।

রেবন্ত নয়, যেন ন্যাংটো এক পাগল হামলে পড়ে তার ওপর। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে থাকে। শ্যামশ্রী বুঝতে পারে, রেবন্তর শরীরের ভিতর থেকে যে কাঁপুনি উঠে এসে তাকেও কাঁপাচ্ছে তা ঠিক দেহমিলনের উত্তেজনা নয়, প্রেম নয়। বহুদিনের পুঞ্জীভূত রাগ প্রতিশোধ নিচ্ছে মাত্র। এ হল ধর্ষণ, বলাৎকার।

শান্ত, সংযত, পাথরের মতো শক্ত শ্যামশ্রীকে প্রবল হাতে পায়ে দাঁতে থেঁতলে নিষ্পেষিত করে, নিংড়ে নিতে থাকে রেবন্ত। একদম ছোটলোক বর্বরের মতো হতে পেরে সে তীব্র আনন্দ পায়। এই শাস্তি বহু দিন হল পাওনা হয়েছে শ্যামশ্রীর। দাঁতে দাঁত চেপে আছে শ্যামশ্রী, চোখ ঊর্ধ্বমুখী, শরীর দিয়ে খানিকক্ষণ প্রতিরোধ করেছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছে সব। ওর মুখে গরম শ্বাস ফেলে চাপা গলায় রেবন্ত মাঝে মাঝে হুংকার দেয়—চুপ! খুন! খুন করে ফেলব। একবার অস্ফুট স্বরে শ্যামশ্রী বলেছিল—তাই করো। এর চেয়ে সেটা ভাল। রেবন্ত তক্ষুনি কনুই দিয়ে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে ওর মুখ।

দরদালানের দরজা হাট করে খোলা। বাইরের বারান্দায় প্রবল বাতাসে কিরকির করে ঘুরে যাচ্ছে সাইকেলের চাকা।

শ্যামশ্রীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে যখন উঠে বসল রেবন্ত তখন অবসাদে সে টলছে। তবু কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এসেছে তার। উঠে গিয়ে দরদালানের খোলা দরজা বন্ধ করে খিল দিল। বিছানার দিকে চেয়ে

সে দেখল, শ্যামশ্রী তার শরীর ঢাকা দেয়নি। উপুড় হয়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফোঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অমানুষিক গলায় গোঙানির শব্দ করছে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন কী করবে ভেবে পেল না রেবন্ত। কাউকে ডাকবে? পরমুহূর্তেই মনটা কঠিন হয়ে গেল তার। এইটেই তো সে চেয়েছিল। ঠিক এইভাবে বর্বরের মতো ওকে ধ্বংস করতে।

রেবন্ত বাইরের বারান্দার দরজা খুলল। মুখ ফিরিয়ে হিংস্র গলায় বলল—আমি যাচ্ছি। দরজাটা দিয়ে দাও।

বলতে বলতেই সে লক্ষ করে বিছানার গোলাপি ঢাকনায় রক্তের ফোঁটা পড়েছে অনেক। শ্যামশ্রীর মুখের ওপর এলো চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে। গভীর যন্ত্রণায় গুমরে মুখটা ফেরাতেই দেখা গেল তার রক্তাক্ত ঠোঁটে, গালে গভীর ক্ষত। স্থির চোখে আরও একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত ওর বুকে আর কাঁধে তার নিজের দাঁতের কামড়ে ফুলে ওঠা চাকা চাকা দাগও দেখতে পায়।

রেবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না। তার মনে হল, সে চলে গেলেও শ্যামশ্রী উঠবে না। ঢাকবে না নিজেকে। ঠিক ওইভাবেই পড়ে থাকবে, যাতে বাড়ির লোক এসে তাকে দেখতে পায়। যদি দেখতে পায় তবে রেবন্তর কীর্তির কথাটা চাউর হয়ে যাবে। শ্যামশ্রীর গায়ের সমস্ত ক্ষতচিহ্ন সাক্ষ্য দেবে তার বর্বরতার। শ্যামশ্রী ঠিক তাই চাইবে।

খাটের কাছে গিয়ে রেবন্ত লেপটা টেনে শ্যামশ্রীর শরীরটা ঢেকে দিল। স্থির দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল একটু, তারপর বলল—আমি যাচ্ছি।

জবাব নেই। শুধু গুমরে ওঠার শব্দ হয়। কান্নার একটা ঝলক তরঙ্গের মতো বয়ে যায় শ্যামশ্রীর ওপর দিয়ে। কিন্তু সেই কান্নাও বড় অস্ফুট। বলতে কী শ্যামশ্রীকে কাঁদতে প্রায় কখনওই দেখেনি রেবন্ত। যত যাই হোক, শান্ত ও কঠিন শ্যামশ্রী কখনওই কাঁদে না। তাই নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগে রেবন্তর। তার ভিতরের গরমটা কমে গেছে। অস্বাভাবিক রাগটা আর নেই। মাথা আর কানের যন্ত্রণার সঙ্গে গভীর একটা ক্লান্তি টের পাচ্ছে সে। এক একবার মনে হচ্ছে, এ কাজটা ভাল হল না।

কিন্তু শ্যামশ্রী আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। কান্নায় ভেসে গেল না সে। কিছুক্ষণ পড়ে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে ধীরে উঠে বসল। চুলগুলো সরিয়ে দিল মুখ থেকে। মস্ত মস্ত চোখে গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখল একবার রেবন্তকে। ঠোঁটের রক্ত ঘন হয়ে থকথক করছে, ফুলে ঝুলে পড়েছে ঠোঁট। গালের দু জায়গায় কামড়ের দাগ ঘিরে লালচে বেগনি কালশিটে। চেনা মুখটা অচেনা আর ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে।

আস্তে উঠে দাঁড়ায় শ্যামশ্রী। ধীরে ধীরে পোশাক পরে। রেবন্তর দিকে তাকায় না।

রেবন্ত বাইরের দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনির দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বলল—যাচ্ছি।

শ্যামশ্রী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর ওই বীভৎস ফোলা, প্রচণ্ড ব্যথার ঠোঁটেও একটু হাসল। সে হাসিতে বিষ মেশানো। উত্তেজনাহীন, অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল—তবু যদি মুরোদ থাকত মেয়েমানুষকে ঠাণ্ডা করার! যদি সেই ক্ষমতাটুকুও দেখাতে পারতে!

রেবন্ত তার পাগলা রাগের চোখে চেয়ে থাকে শ্যামশ্রীর দিকে। শ্যামশ্রী তার বড় ঠাণ্ডা চোখে চাউনিটা ফেরত দিয়ে বলে—কত বীরত্ব তোমার!

রেবন্ত দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। আর একটুক্ষণ এ ঘরে থাকলে সে শ্যামশ্রীর গলা টিপে ধরবে হয়তো।

সাইকেলের চাকাটা কির কির করে ঘুরে যাচ্ছে। রেবন্ত সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ছাদের ঘরে উঠে যায়। পিছনে মৃদু শব্দে শ্যামশ্রীর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

৭

এই যে এত সব বানিয়েছে মানুষ, বাড়িঘর আসবাবপত্তর, আর ওই যে গাছপালা, প্রকৃতির জগৎ, এ সব একটা বেড়ালের চোখে কেমন দেখায়? সে তো বোঝে না কেন এই ঘর বারান্দা, খাট, গদি, কাঠের চেয়ার। সে জানেও না এ সবের দাম বা উপযোগ। তবু সে তো দেখে। কেমন দেখে? কী বোধ

করে সে? সে কি অনুভব করে আকাশের নীল, সূর্যের আলো? সে কি লজ্জা পায় মহিলার নগ্নতা দেখে?

রাজু নিবিষ্টমনে পায়ের কাছের বেড়ালটার মাথায় পায়ের চেটো ধীরে ধীরে বুলিয়ে দেয়। মনে মনে প্রশ্ন করে—কেমন রে তুই? তোর চোখ, মন, বুদ্ধি দিয়ে দেখলে কেমন দেখাবে জগৎটাকে? সে কি খুব অন্যরকম? যদি তোর চোখ দিয়ে দেখি তবে কি এই বাড়িঘর হয়ে যাবে পাগলাটে হাস্যকর এক নকশার মতো? অর্থহীন কিছু ধাঁধা? আকাশের নীল রং দেখা যাবে না? জ্যোৎস্না যে সুন্দর তা বুঝতেও পারব না নাকি?

তবে সে কেমন হবে? ভাবতে ভাবতে খুব নিবিড় হয়ে এল রাজুর চিন্তাশক্তি। অল্প অল্প করে সে নিজের ভিতরে একটা বেড়ালের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। বেড়ালের কার্যকারণ জ্ঞান নেই। সে জানে না, বীজ থেকে গাছ হয়। সে জানে না ঘরবাড়ি তৈরি করে মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি, সে বোঝে না যুক্তির বিচারে সৌন্দর্যের সার্থকতা। তার জগৎ কেবল গন্ধ, শব্দ ও জৈব বোধ দ্বারা আচ্ছন্ন। অসীম অজ্ঞানতা তার। সুতরাং বেড়ালের চোখে গোটা জগৎকে দেখতে হলে সব বোধ বুদ্ধি ও যুক্তির বিচার ভুলতে হবে। প্রাণপণে রাজু সেই চেষ্টাই করতে থাকে।

ঝোড়ো হাওয়ার মুখে মুখে কখন উড়ে গেছে মেঘ! মাঝরাতে ভাঙা ভুতুড়ে এক চাঁদের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নায় চারদিকে গহীন প্রেতরাজ্য জেগে ওঠে। সঞ্চিত জল ঝরে পড়ছে টুপ টাপ টিনের চাল থেকে, গাছের পাতা থেকে। কী শব্দহীনতার শব্দ। উঠোন জুড়ে টলটলে জলের গাঙ।

মেঘ কেটে এক মরুণে ঠাণ্ডা পড়ল চারদিকে। এত শীত যে শরীর পাথর হয়ে যায়। কান-মুখ কম্বলে ঢেকে বারান্দার চেয়ারে বসে পাথর হয়েই থাকে রাজু। এখন বাতাসের শব্দ নেই, মানুষের শব্দ নেই। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সে পা দিয়ে বেড়ালটাকে ছুঁয়ে খুব ধীরে ধীরে বেড়ালের চেতনার মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

ক্ষয়া চাঁদটার দিকে চেয়ে সে ভাবে—বেড়ালের চোখে চাঁদের কোনও অর্থ নেই, নাম নেই, বস্তুজ্ঞান নেই। তা হলে কেমন? চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে রাজু। ক্রমে ক্রমে বোধ বুদ্ধি যুক্তি বিচার ও বস্তুজ্ঞান ডুবে যেতে থাকে। হঠাৎ চমকে সে দেখে, আকাশটা এক্সরে প্লেটের মতো স্বচ্ছ, কালো। তার একধারে লাল, রাগি, আগুনের মতো আকারহীন চাঁদ। গ্রহ নক্ষত্র লম্বাটে, আগুনের মতো। চারদিকে ভুসো ছাইরঙা অন্ধকার। কিন্তু তাতে পরিষ্কার বেড়ালের চোখে সে দেখতে পায় লালচে গাছ, লালচে পাতা। অনেক পোকামাকড়ও নজরে আসে তার এই অন্ধকারে।

বুদ্ধিকে আরও ত্যাগ করতে থাকে রাজু। ছেড়ে দিতে থাকে মানুষের বস্তুজ্ঞান। বেড়ালের আত্মীয় হতে থাকে। শুধু চৈতন্যটুকু জেগে থাকে তার। শুধু অনুভব। অনেকক্ষণ চোখ বুজে মনকে স্থির রাখে সে। অনেকক্ষণ। গভীরভাবে ভাবতে থাকে—আমি বেড়াল। আমি বেড়াল। আমি বেড়াল।

ভাবতে ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মানুষের বোধবুদ্ধি নিভে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, সে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী। তার গোষ্ঠী নেই, সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। চারদিকে যে রং ও রূপের ঐশ্বর্যময় জগৎ ছিল তা মুছে গেছে। তার নাকে আসে বিচিত্র সব গন্ধ যা কোনওদিন মানুষ হিসেবে সে টের পায়নি। তার সজাগ কানে এসে পৌঁছোয় অদ্ভুত সব দূর ও কাছের আওয়াজ। সামনে মস্ত গাছের মগডালে ঘুমের মধ্যে একটা পাখি একটু নড়ল বুঝি, সেই শব্দও তার কানে আসে। কোনও স্মৃতি নেই, শুধু মস্তিষ্কের কিছু নির্দেশ কাজ করে তার মধ্যে। কোনও চিন্তা নেই, শুধু ক্ষুধা ভয় ও প্রীতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তার বোধ আছে মাত্র। অবাক হয়ে সে দেখে, চারদিকে সব কিছুই আমূল বদলে গেছে। ভারী গোলমেলে সব নকশা, নানা আকার ও আকৃতি, অদ্ভুত সব রং। লাল, গাঢ় লাল, ফিকে লাল, কালো, আবছা কালো, বেগুনি। নাকের কাছে দিপ দিপ করে একটা পোকা জ্বলে আর নেভে। পোকাটাকে খুবই স্পষ্ট দেখতে পায় সে। তার মুখ চোখ পাখনার গতি কিছুই নজর এড়ায় না। একদৃষ্টে চেয়ে সে একটা থাবা দেয়। পোকাটা ওপরে উঠে যায়। নিস্পৃহ লাগে তার। সামনে একটা সমতল, তারপর নিচু, তারপর আবার সমতল। ওদিকে একটা দরজা খুলে যায়। লম্বাটে এক প্রাণী বেরিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে। তার কানে গমগম করে শব্দটা। তবে সে বোঝে, এ শব্দে তাকে ডাকা হচ্ছে না। সে জানে, অদ্ভুত একটা শব্দ আছে, যে শব্দ হলেই তাকে কাছে যেতে হবে। সে খাবার পাবে, বা

কোলের ওম আর আদর।

রাজু চেয়ে থেকে বুঁদ হয়ে যায়। বেড়ালের চোখে আশ্চর্য এক পৃথিবী দেখতে থাকে। এ যেন দুরূহতম ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা। একদিকে চৌকো কিউবিক সব আকৃতি। অন্যদিকে গলে পড়ছে জ্যাবড়া রং। রঙের সঙ্গে আলোর মিশেল। খুব কাছের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায় সে। একটা পিঁপড়ে হাঁটছে তার থাবার ওপর। কেঁচো বাইছে খুঁটির গায়ে। কিন্তু কেঁচো বা পিঁপড়ে বলে সে চিনতে পারে না এদের। শুধু জানে, কিছু জিনিস চলে, কিছু স্থির থাকে। রাজু অবাক হয়ে দেখে আর দেখে। সে আর মানুষ নেই, বেড়াল হয়ে গেছে।

খুব কাছ থেকে কে যেন তাকে ডাকছে অনেকক্ষণ, সেই ডাক তার বোধের ভিতরে কোনও ঢেউ তোলে না। তারপর আস্তে আস্তে এক গভীর জলের পুকুর থেকে সে ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে—ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাক না। বসে আছিস কেন?

রাজু কথা বলল না। চেয়ে রইল শুধু। তার বেড়ালের বোধ এখনও সবটা কাটেনি।

কুঞ্জর হাতে একটা অচেনা জিনিস। একটু চেয়ে অবশ্য রাজু চিনতে পারে জিনিসটা। হটওয়াটার ব্যাগ।

কুঞ্জ রবারের ব্যাগটা টেনেটুনে দেখছিল। বলল—এটা একটু দ্যাখ তো, চলবে কিনা, বহুকাল পড়ে ছিল ঘরে।

রাজু ব্যাগটা হাতে নিল। বারান্দার আলো জ্বেলেছে কুঞ্জ। রাজু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল—রবার গলে গেছে। গরম জল ভরলেই ভুস করে ফুটো হয়ে যাবে।

—তা হলে অন্য কারও বাড়ি থেকে আনাতে হবে।

কুঞ্জর মুখ কেমন যেন সাদা, চোখে মড়ার মতো দৃষ্টি। মানুষের জগৎ বুদ্ধিতে ফিরে এসে রাজু এখন মাথা ঝাঁকিয়ে বেড়ালের বোধ সবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল—কেষ্টর বউ কেমন আছে?

কুঞ্জ মৃদু স্বরে বলে—ভাল। টুসিকে সঙ্গে নিয়ে কুঞ্জ কোন বাড়ি থেকে গরম জলের ব্যাগ আনতে যাচ্ছে। রাজু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে—চল তা হলে তোদের সঙ্গে খানিকটা ঘুরে আসি

খানিক পরে কুঞ্জ আর টুসির পিছু পিছু টর্চ আর ভুতুড়ে জ্যোৎস্নার আলোয় জল, এঁটেল কাদা আর গর্তে ভর্তি রাস্তা পেরিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছিল রাজু, তখনও তার মনের মধ্যে নানারকম অস্বাভাবিকতা। কোথায় যাচ্ছে তা বার বার ভুলে যাচ্ছিল সে। কেবলই মনে হচ্ছিল, সামনের দুটো ছায়ামূর্তি কেউ নয়। ওরা এক্ষুনি এগিয়ে যাবে, দূরে চলে গিয়ে হারিয়ে যাবে। তখন একা রাজুকে টেনে নেবে উদ্ভিদের জগৎ। টেনে ধরবে গভীর মাটি। রাজুর গতি হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো। এক জায়গায় সে গাছ হয়ে ডালপালায় বাতাস আর রোদ মাখবে সারা দিন, সারা জীবন।

রাতের আর বেশি বাকি নেই। ধোঁয়াটে কুয়াশা ও জ্যোৎস্নায় মাখা অন্ধকারে রাজু কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক উঠে আসে বুকে। ডাকে—কুঞ্জ!

সামনে কুঞ্জ টর্চের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে টুসি। কুঞ্জ বলে—আয়। বড় পিছিয়ে পড়েছিস। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

রাজু নিজের সব অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি নিপুণভাবে চাপা দিতে চেষ্টা করে আজকাল। বলে, বড্ড পিছল। আমার অভ্যেস নেই তো।

টুসি মায়াভরা গলায় বলে—ইস! আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে রাজুদা। এলেন কেন?

আগে অনেকবার কুঞ্জদের বাড়ি এসেছে রাজু। কোনওদিনই টুসি বা কুঞ্জর অন্য বোনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। ওরা বড় বাইরের পুরুষের সামনে আসে না। এবার কেষ্টর বউ যমে মানুষে টানাটানির মধ্যে পড়ায় টুসির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। এইভাবেই ভাব হয়, ঘটনার ভিতর দিয়ে, ঘটনায় জড়িত হয়ে, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে নিতে।

রাজুও প্রাণপণে তাই চায়। পৃথিবীর কোনও-না-কোনও ঘটনার সঙ্গে একের পর এক জড়িয়ে পড়তে। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে সামাজিক হয়ে উঠতে, দায়িত্বশীল হয়ে পড়তে। কিন্তু পারছে না। মনে মনে সে কেবলই ফিরে আসছে ভীষণ ব্যক্তিগত চিন্তায়, সমস্যায়। সে টুসিকে

বলে—এলাম। ভালই লাগছে তো।

প্রাণপণে ওদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটে রাজু। টুসি সামনে থেকে বলে—রাস্তায় পা দেবেন না। পিছল। ঘাসে পা রেখে আসুন।

কুঞ্জ সামনে থেকে মাঝে মাঝেই টর্চ ঘুরিয়ে ফেলে। বলে—এই তো এসে গেছি।

ফটকে ঢুকে অনেকখানি বাগান পার হয় তারা। তারপর অন্ধকার এক বাড়ির দাওয়ায় ওঠে।

এই তো সেই সুন্দর মেয়েটার বাড়ি। না? কী যেন নাম মেয়েটার! বনশ্রী। হ্যাঁ, বনশ্রীই।

রাজুর বুক ধক ধক করে ওঠে। প্রেম নয়। এত সহজে আর আজকাল প্রেম হয় না। রাজু জীবনে বহু মেয়ের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। তবু যে বুক ধবক করে ওঠে তার কারণ অন্য। সে ভাবে—আহা, ওই মেয়েটা যদি আমার বউ হত! ভাবে, তার কারণ আজকাল তার খুব বিয়ের ইচ্ছে হয়। প্রেম বা কাম বা গেরস্থালির জন্য নয়। সে চায়, সারা রাত তার একজন সঙ্গী থাক। তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সদাসতর্ক একজোড়া চোখ তাকে নজরে রাখুক। তার কথা ভাবে এমন এক ঘনিষ্ঠ হৃদয় বড় চায় সে।

টুসি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে থাকে—মাসি! ও মাসি। এই বনাদিদি। চিরু। এই চিরু।

বনশ্রীর ঘুমই সব চাইতে পাতলা। বরাবর এক ডাকে ঘুম ভাঙে তার।

আজও ভাঙল। টুসির গলার স্বর না? এমনিতে বনশ্রীর ভয়টয় খুব কম। তবু মাঝ রাতে চেনা স্বর শুনেই সাড়া দিতে নেই বা দরজাও খুলতে হয় না। তাই একটু অপেক্ষা করে বনশ্রী।

পাশের ঘর থেকে সবিতাশ্রী পরিষ্কার গলায় বলে ওঠেন—কে রে? কী হয়েছে?

বাইরে থেকে টুসি বলে—মাসিমা, আপনাদের গরম জলের ব্যাগটা নিতে এসেছি। বউদির খুব অসুখ।

—দাঁড়া। দিচ্ছি। বলে সবিতাশ্রী উঠতে যাচ্ছিলেন বোধ হয়।

বনশ্রী লেপ সরিয়ে উঠে পড়ে। বলে—মা, তুমি উঠো না। আমিই উঠেছি।

—বউটার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করিস তো। সবিতাশ্রী উদ্বেগের গলায় বললেন।

বাইরের ঘরে এসে বনশ্রী দরজা খোলে এবং একটু সংকুচিত হয়ে পড়ে। টুসির পিছনে কুঞ্জ দাঁড়ানো আর তার পিছনে বারান্দার বাইরে উঠোনের মলিন জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজু।

কপাটের আড়ালে ঘরে এসে বনশ্রী বলে—সাবির কী হয়েছে?

টুসি কলকলিয়ে মিথ্যে কথা বলল, আর বোলো না, পিছল উঠোনে পড়ে গিয়ে খুব লেগেছে।

—সর্বনাশ। বনশ্রী একটু শিউরে ওঠে, তারপর চাপা গলায় বলে—পোয়াতি ছিল যে!

—সেই তো। রক্ষে হল না বোধ হয়।

—দাঁড়া, ব্যাগ এনে দিচ্ছি।

দ্রুতপদে বনশ্রী মায়ের ঘরে ঢোকে। দেয়ালে পুরনো ন্যাকড়ায় বাঁধা ব্যাগটা যথাস্থানে ঝুলছে। এ বাড়িতে সব জিনিস নিখুঁত গোছানো। জায়গার জিনিস সব সময়ে ঠিক জায়গায় পাবে। রবারের ব্যাগটা রাখাও হয়েছে ভারী যত্নে। জল ঝরিয়ে শুকনো করে, ফুঁ দিয়ে একটু হাওয়া ভরে ফুলিয়ে ছিপি এঁটে।

বনশ্রী সেটা এনে টুসির হাতে দিয়ে বলে—কী হবে তা হলে?

—কী করে বলি?

—আমি যাব?

—এত রাতে আর তোমার যেয়ে দরকার নেই। সকালে যেয়ো। যা হওয়ার তো হয়েই গেছে।

—সাবি বাঁচবে তো, ও কুঞ্জদা?

কুঞ্জ চুপচাপ ছিল এতক্ষণ, এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল—বেঁচে যাবে।

বনশ্রী কুঞ্জর দিকে চেয়ে বলে—চিকিৎসা আপনি করছেন না তো?

কুঞ্জ ম্লান হেসে বলে—না না। আমার ওষুধে ওরা কেউ বিশ্বাস করে না।

টুসি তাড়া দিয়ে বলে—চলো বড়দা।

ওরা চলে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ বনশ্রী দরজা বন্ধ করল না। দু হাতে দুই পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে মেঘ ভেঙে সামান্য জ্যোৎস্না ফুটেছে। অল্প কুয়াশা। প্রচণ্ড শীত। বনশ্রীর বেশ লাগছিল

চেয়ে থাকতে। এমনিতে দেখার কিছু নেই। সেই রোজকার দেখা একই বাগান, গাছপালা। তবু রঙের একটা অদল বদল, দু-একটা চৌকস তুলির টানে চেনা ছবিটা কত গভীর হয়ে গেছে। রাজু ওদের সঙ্গে এসেছিল কেন তা কিছুতেই ভেবে পায় না বনশ্রী। কেনই বা ওর মন খারাপ!

ঝরঝরে রোদ মাথায় করে ভোর হল। বনশ্রীর দিন শুরু হয় খুব ভোরে। বিছানাপাটি তুলে ঘরদোর গুছিয়ে সে যখন একটু অবসর পেয়ে ভোর দেখতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল তখনও সে অন্যমনস্ক। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে দাওয়ায় বসে সে নিজের একরাশ খোলা চুলের জট ছাড়ায় আঙুলে। আর ভাবে।

বাইরের ঘরে জনা দশ-বারো ছাত্রকে বসিয়ে পড়াচ্ছেন সত্যব্রত। পড়ানোর শব্দ ভাল লাগছিল না বনশ্রীর। খানিকক্ষণ বসে সে উঠে পড়ল। বাগানের ভিতরে বেড়াতে বেড়াতে চলে গেল অনেকটা। নির্জনে একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে আজ। অলস লাগছে।

সাইকেলের শব্দে বনশ্রী ফিরে দেখে, ঝকঝকে মুগার পাটভাঙা পাঞ্জাবি, ধোয়া শাল আর ধবধবে সাদা ধুতি পরা রেবন্ত সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ফটক দিয়ে সোঁ করে ঢুকে পড়ল। এত সকালেও গালের দাড়ি কামানো। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

দেখে একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল বনশ্রী। রেবন্ত অনেকটা এগিয়ে গেছে ভিতরবাগে।

পিছন থেকে বনশ্রী হঠাৎ ডাকল—রেবন্তদা!

সেই ডাকে সাইকেলটা দুটো মস্ত টাল খেল। যেন পড়ে যাবে। পড়ল না অবশ্য। রেবন্ত লম্বা পা বাড়িয়ে ঠেক দিয়ে ফিরে দেখল তাকে।

বনশ্রী হেসে বলল—এত সকালে?

সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে রেবন্ত আস্তে আস্তে কাছে আসে। মুখে হাসির একটা চেষ্টা আছে, কিন্তু আসলে ওর মনে যে হাসি নেই তা দেখলেই বোঝা যায়।

হালকা হওয়ার জন্যই বনশ্রী বলল—একেবারে জামাইবাবু সেজে এসেছেন যে! ওমা! কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফর্সা রেবন্তর মুখটা লাল হল একটু। গলা সামান্য ভাঙা, একটু কাশি আছে সঙ্গে। সেই গলাতে বলল—আমি একটা কথা জানতে এসেছি বনা।

কথার ধরনটা খুব ভাল লাগল না বনশ্রীর। একটু যেন ছাইচাপা আগুনের মতো রাগ ধিকিধিকি করছে ভিতরে। বনশ্রী মুখে হাসি টেনে বলল—কী কথা বলুন তো।

—শ্যামা আমাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে কেন?

বনা তার মস্ত এলোচুলের ঝাপটার আড়াল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল—আবার ঝগড়া করেছেন আপনারা?

—কী করব? ও যে আমাকে কথায় কথায় অপমান করে। বনা, তোমরা সবাই ভারী অহংকারী।

বনশ্রী শ্বাস ফেলে বলে—হবে হয়তো। আপনি নিজেও খুব কম অহঙ্কারী নাকি মশাই? কাল দুপুরে এসে কেমন ব্যবহারটা করে গেলেন মনে আছে?

জামগাছের নীচে রেবন্ত সাইকেলের ওপর ভর রেখে আধখানা ভেঙে দাঁড়িয়ে। মাথায় কপাল ঢাকা মধু রংয়ের একরাশ ঘন চুলের ঘুরলি ফণা ধরে আছে। দুধ-সাদা শাল, ঝকমকে মুগা আর ফর্সা রঙের ওপর ঝরে পড়ছে অজস্র আলো আর ছায়ার টুকরো। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে ওকে! যেন এই ভোরের আলো থেকে রূপ ধরে এল। কয়েক পলকের রূপমুগ্ধতায় বনশ্রী সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে রেবন্ত যদি বলে—চলো বনা, দুজনে পালিয়ে যাই, তবে বনশ্রী একবস্ত্রে বেরিয়ে যেতে পারে।

মনের ওপর একটু ছায়া ফেলে পাপ-চিন্তাটা সরে যায়। তবু একটু শিহরন থেকে গেল, গা কাঁটা দিয়ে রইল একটু বনশ্রীর। সে কোনওদিন কাউকে ভালবাসেনি, এখনও বাসে না। তবু এ কী?

চাপা অভিমানে টলমল করছে রেবন্তর মুখ। বলল—আমি এ বাড়িতে আসি বলে তোমরা কিছু মনে করো না তো বনা?

বনশ্রী অবাক হয়ে বলে—ওমা! কী মনে করব?

রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—তবে শ্যামা আমাকে এখানে আসতে বারণ করল কেন?

বনশ্রী মুখ নামিয়ে বলল—দিদিই বা কেন বারণ করবে?

রেবন্তর চোখমুখ আস্তে আস্তে অন্য একরকম হয়ে যায়। ভিতরে কী একটা তীব্র বেদনা বোধ চেপে রাখছে অতি কষ্টে। চোখমুখ ফেটে পড়ছে রুদ্ধ আবেগে। নাকের ডগা লাল, ঠোঁট কাঁপছে। স্খলিত গলায় বলল—আমি কি না এসে থাকতে পারব? বনা, একদিন তোমাকে একটা ভারী গোপন কথা বলার আছে।

বিহ্বল বনশ্রী উন্মুখ চোখে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলে—বলবেন।

৮

এন সি সি-র সিনিয়র ক্যাডেট হিসেবে সে যে রাইফেল ব্যবহার করত সেরকম নয়, অথবা সম্বলপুরে শিকার করতে গিয়ে যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালিয়েছে সেরকমও নয়, রাজুর হাতের এ রাইফেলটা প্রচণ্ড ভারী, আকারে বিশাল। ব্যারেলটা কামানের মতো মোটা। একটা ডবল ডেকার বাসের দোতলার একদম সামনের সিটে বসে আছে সে, হাতের ভারী রাইফেলের নল সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাড়ানো। বাসের দোতলাটা একদম ফাঁকা। সামনে নীচে কলকাতার প্রচণ্ড ভিড়ের রাস্তা। বাসটা হরদম চলছে, স্টপ দিচ্ছে না। রাজু ঝাঁকুনিতে টাল্লা খেয়ে যাচ্ছে, রাইফেলের নল জানালার ওপর ঘর-ঘর করে গড়িয়ে যাচ্ছে তাতে। কিন্তু এরকম হলে চলবে না। রাজু শক্ত হতে চেষ্টা করে। সামনেই জানালা থেকে সাপের লেজের মতো একটা দড়ি দেখতে পায় এবং তাতে একটা টান দেয় সে। নীচে ড্রাইভারের কেবিনে টং করে একটা শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসটার গতি কমে আসে।

রাজু রাইফেলটা টিপ করার চেষ্টা করে। তারপর ভাবে—টিপ করার দরকার নেই। এত লোক চারদিকে, গুলি চালালে কেউ না কেউ মরবেই। আর এ কথা কে না জানে যে, সব মানুষই তার শত্রু।

ভাবতে ভাবতে ট্রিগার টেপে রাজু। রাইফেলের কুঁদো ঘোড়ার পিছনের পায়ের মতো লাথি দেয় তাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের টাইট ছিপি আচমকা খোলার মতো দম করে শব্দ হয়। রাজু দেখতে পায়, রাস্তায় একটা লম্বা লোক সটান শুয়ে আছে।

টং টং। দুবার দড়ি টানে রাজু। বাস আবার বেটাল হয়ে প্রচণ্ড জোরে ছোটে। রাজু আবার দড়ি টেনে বাসের গতি কমায় এবং খুব লক্ষ্য স্থির করে একটা বেঁটে লোককে মারে। পরের বার মারে একটা মস্তান গোছের ছোকরাকে। গা গরম হচ্ছে তার। টুকটাক এরকম লোক মারতে তার মন্দ লাগছে না। ভিয়েতনামের জঙ্গলে মার্কিন স্নাইপাররা এইভাবেই গাছের ডাল থেকে, ঝোপঝাড় থেকে লুকিয়ে একটা-দুটো করে ভিয়েতকং গেরিলা মারত।

কিন্তু একটা ভারী মুশকিল হল। আগে লক্ষ করেনি রাজু, রাইফেলের নলের মুখটা ফানেলের মতো ছড়ানো। এত বড় মুখ যে, পুরনো আমলের গ্রামোফোনের চোঙের মতো মনে হয়। আর আশ্চর্য এই, সেই চোঙ থেকে লাউডস্পিকারের বিকট শব্দে হিন্দি গান বাজছে। দম মারো দম। কান ঝালাপালা। মাথা গরম হয়ে গেল রাজুর। রাইফেলের ওপরে একটা ঘোড়া টেনে দিল সে। এবার রাইফেলটা হয়ে গেল অটোমেটিক। রাজু ট্রিগার টিপতেই মুষলধারে নল দিয়ে টিরিটিরি টিরিটিরি শব্দে ছুটতে থাকে বুলেট। সেই সঙ্গে পরিত্রাহি গানও বেজে যায়। তুমসে মুহব্বত...প্যার...হাম তুম...এই সব শব্দ গুলিবিদ্ধ হয়েও তার কানে আসে। আর সে দেখে সামনেই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার একধার দিয়ে বয়ে চলেছে চমৎকার একটা কৃত্রিম খাল, তাতে গণ্ডোলা ভেসে বেড়াচ্ছে। আর একদিকে মাইল মাইল বাগান চলেছে। কিছু অস্বাভাবিক লাগে না তার। সে ঠিকই চিনতে পারে, এটাই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। রাস্তার ওপর হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়ছে গুলি খেয়ে। রক্ত, রক্ত আর লাশ। আর, দম মারো দম।

দৃশ্যটা পাল্টে যায়। সে দেখতে পায়, কলকাতার ঠিক মাঝখানে একটা ভীষণ উঁচু কনট্রোল

টাওয়ারে সে বসে আছে। ঘরটা চক্রাকার, চারদিক স্বচ্ছ কাচে ঘেরা। চারদিকে নিচু জটিল সব যন্ত্রপাতি। সুইচ বোর্ডের সামনে কানে হেডফোন লাগানো গোমড়ামুখো কয়েকজন লোক বসে আছে। বাইরে ঝকঝকে রোদে বহু নীচে দেখা যাচ্ছে শহর। কী সুন্দর শহর! কলকাতা যে অবিকল নিউ ইয়র্কের মতো তা এত ওপর থেকে না দেখলে বোঝাই যেত না। আশি-নব্বুই তলা সব বাড়ি, হাজার হাজার, অফুরন্ত। বহু দূরে আকাশের গায়ে অতিকায় তিমি মাছের পাঁজরের মতো হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ব্রিজের মাথা এত উঁচু যে তাতে মেঘ এসে ঠেকে আছে একটু। হাওড়া ব্রিজ যে এতটাই উঁচু তা তার জানা ছিল না, কিন্তু অবাকও হল না সে। এত বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মনুমেন্টটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না সে। বহু খুঁজে দেখতে পেল মনুমেন্টটা খুবই কাছে টাওয়ারের পায়ের নীচে পড়ে আছে। গড়ের মাঠ দেখা যাচ্ছে ডানদিকে যেদিকটায় শেয়ালদা স্টেশন। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে কয়েকটা একটু হেলে আছে। এত সুন্দর শহর, অথচ মাঝখানটায় একটা কাদাগোলা জলের পুকুর। পুকুরের চারধারে কচু বন, মাটির পাড়। রোদে কয়েকটা লোক আর মেয়েমানুষ গায়ে মাটি মেখে হাপুস হুপুস স্নান করছে পুকুরে। পাশে মস্ত বটগাছ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতিতে এই পুকুরটার কথাই বলেছিলেন বটে। আজও পুকুরটাকে বুজিয়ে ফেলা হয়নি দেখে ভারী রাগ হল রাজুর। এত সুন্দর শহরের মাঝখানে ওই নোংরা পুকুর কি মানায়? হেডফোনওয়ালা একজন বলে উঠল—নাউ, ইটস অলমোস্ট দি টাইম। এ কথায় রাজুর চৈতন্য হয়। তাই তো! এ শহরটার আয়ু তো মাত্র আর কয়েক মিনিট। কথা আছে, বেলা বারোটা পাঁচ মিনিটে কলকাতায় হাইড্রোজেন বোমা ফেলা হবে। রাজু ঝুঁকে দেখে, পুকুরে স্নানরত লোকজন ছাড়া শহরটা একদম ফাঁকা। রাস্তাঘাট থম থম করছে। নিঃশব্দে প্রহর গুনছে শহর। পশ্চিম দিকে নীল আকাশে ছোট্ট বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে একটা উড়োজাহাজকে। রুপালি মশার মতো। চোখের পলকে মশাটা মাছির মতো বড় হয়ে উঠল। মাছিটা আরও কাছে আসতেই হয়ে গেল ফড়িংয়ের মতো বড়। তীরের মতো চলে আসছে, পিছনে দুটো টানা ধোঁয়ার লাইন। হেডফোনওয়ালা একটা লোক মাইক্রোফোনে জিরো আওয়ার গুনতে শুরু করে। টেন...নাইন...এইট... সেভেন... সিক্স... ফাইভ... ফোর... থ্রি... টু—উড়োজাহাজ একটা ঝড়ের বাতাস তুলে পলকে মিলিয়ে যায় দিগন্তে। আর হঠাৎ বাঁ দিকে সামান্য একটু ঝলকানি দেখা দেয়। রাজু তাকিয়ে ভাবে, এই নাকি হাইড্রোজেন বোম, ধুস! কিন্তু না। হেডফোনওয়ালা একজন বলে ওঠে—পিছনে তাকান। তাকায় রাজু, আর আতঙ্কে বরফের মতো জমে যায়। পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক অতিকায় মহাবৃক্ষের মতো জমাট কালো ধোঁয়া। দিরি দিরি করে সেই ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আরও আরও বিশাল করাল চেহারা নিচ্ছে। একটু গরম লাগছিল বটে রাজুর, কিন্তু একটা লোক একটা টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে চেয়ে বলল—অল ভেপোরাইজড। রাজু ঘুরে দেখে শহরের বাড়ি-ঘর সব ছিটকে আকাশে উঠে কাছে বা দূরে ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে। বাষ্পীভূত অবস্থা কি একেই বলে? শুধু হাওড়া ব্রিজ এখনও আকাশ ছুঁয়ে খাড়া রয়েছে, তার ডগায় এখনও লেগে আছে ছবির মতো স্থির একটু মেঘ। একজন হেডফোনওয়ালা বলে উঠল—আমাদের টাওয়ারের সাপোর্টটা উড়ে গেছে। আমরা এখন শূন্যে, ইন অরবিট। রাজু হাইড্রোজেন বোমার ক্রিয়াকাণ্ড আগে কখনও দেখেনি। এখন খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে কিছু খারাপ লাগছে না। একদিকে ছত্রাকের মতো অতিকায় ধোঁয়ার মিশমিশে কালো মেঘ। সেই মেঘের কোলে কলকাতার সব উড়ন্ত ঘর-বাড়ি। তাদের এই কনট্রোল টাওয়ারের কেবিনটাও নাকি উড়ছে। সে অবশ্য তেমন কিছু টের পাচ্ছে না। কিন্তু সে পরিষ্কার দেখতে পেল, কলকাতার মধ্যিখানে সেই আদ্যিকালের নোংরা পুকুরটার কিছুই হয়নি। তার চারদিকে এখনও সেই কচু বন, মাটির পাড়, একধারে মস্ত বট। মেয়েপুরুষরা এখনও কাদাগোলা জলে ঝুপ ঝাপ স্নান করছে। তারা শুধু এক-আধবার অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর নির্বিকারভাবে স্নান করে যেতে লাগল।

ভীষণ বান আসছে! ভীষণ ঢেউ! কে যে চেঁচাচ্ছিল তা বুঝল না রাজু। কিন্তু বুকের ভিতরে একটা ভয় জলস্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে উঠছিল। রেডিয়োতে খুব শান্ত কঠিন গলায় একজন ঘোষক বলে ওঠে: সামুদ্রিক যে ঢেউ কলকাতার দিকে আসছে তার উচ্চতা দেড় শো থেকে দুশো ফুট হতে পারে। রাজু একটা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর সে জানে, এ বাড়িটা তাদেরই। দোতলার ব্যালকনির নীচেই একটা নর্দমা। সে দেখে নর্দমার জল হঠাৎ উপচে পড়ে রাস্তা ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

শুনতে পেল, তাদের কলঘরে এই অসময়ে কল দিয়ে অবিরল জল পড়ছে। বারান্দায় রাখা আধ বালতি জল হঠাৎ ফুলে উঠল, বালতি উপচে বইতে লাগল শানের ওপর। এ কি জলের বিদ্রোহ? এই সব দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলেই সে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। দিগন্তে ও কি মেঘ? আকাশের গায়ে এ প্রান্ত ও প্রান্ত জুড়ে ফ্যাকাশে রঙের ওটা কী তা হলে? ভাবতে হল না। হঠাৎ সে জলের গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাতের শব্দ এক করলে যেমনটা শোনায় ঠিক তেমন গম্ভীর গভীর ভয়াল। নীচের রাস্তা থেকে একটা বুড়ো লোক হঠাৎ মুখ তুলে বলল—আগেই বলেছিলুম এ সব জায়গা সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠেছে। যাকে বলে চরজমি। অনেকদিন পই পই করে বলে আসছি এখানে শহর-টহর কোরো না। যার জিনিস একদিন সে-ই নেবে। এখন হল তো। হুঁঃ! বলে বুড়ো লোকটা রাগ করে রাস্তার জল ভেঙে চলতে লাগল। রাজু দেখল, কয়েক পলকের মধ্যেই নালা থেকে গড়ানে জল রাস্তায় হাঁটু অবধি হয়ে গেছে। দিগন্তে সেই জলের পর্দা ক্রমে আরও উঁচু হয়েছে। চলন্ত পাহাড়ের মতো আসছে। কলঘরে জলের শব্দ চৌদুনে উঠে গেল। কলের মুখ সেই তোড়ে ছিটকে মেঝেয় পড়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল বারান্দায়। রাজু নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা। কলঘরে হোসপাইপের মতো জল ঘর ভাসিয়ে বারান্দায় চলে আসছে। বারান্দার বালতিটায় জলের মাতন লেগেছে। টলে টলে, নাচতে নাচতে উপচে পড়ছে তো পড়ছেই। বুড়ো লোকটা কি ঠিক বলেছে? সমুদ্র তার হারানো জমি উদ্ধার করতে আসছে নাকি? কিংবা পৃথিবীর সব জলই বিদ্রোহ করেছে সৃষ্টির প্রথম যুগের মতো পৃথিবী আবার জলময় করবে বলে? এ কি জলের বিদ্রোহ? এই কি বিপ্লব? ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক রাজু আচমকা চেয়ে দেখে সব পশ্চাৎভূমি মুছে তার হাতের নাগালেই চলে এল জলের প্রকাণ্ড দেয়াল। এই তো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। শব্দ হচ্ছে ল—ল—ল—ল। কী প্রচণ্ড গম্ভীর গভীর শব্দ! মাটি কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে। সামনে নিচু একটা ঢেউ ডিগবাজি খেয়ে রোলারের মতো গড়িয়ে আসছে। তার চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের যত নির্মাণ আর প্রতিরোধ। সেই রোলারের পিছনেই মহামহিম অতিকায় জলের দেয়াল। ঘোলা মেটে এবড়ো-খেবড়ো অন্ধ হৃদয়হীন ও নির্বিকার। রাজু শক্ত হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। সে ভাবল, এবার বরং আত্মহত্যা করি, এ রকম ভয় সহ্য করা যায় না। ভাবতে ভাবতে সে লাফিয়ে উঠল রেলিঙে। ঝাঁপও দিল, কিন্তু নীচে পড়তে পারল না। তার আগেই জলের ঢেউ লুফে নিল তাকে। কোলে নিয়ে তাকে দোল দিল জল। তারপর আস্তে আস্তে তরঙ্গ থেকে তরঙ্গের মাথায় মাথায় তুলে দিতে থাকল। রাজু ওলট পালট খেতে থাকে। টের পায়, ক্রমে ক্রমে সে জলের মাথায় চড়ে এক অসম্ভব উচ্চতায় চলে যাচ্ছে। এত! এত জল! এই কি মহাপ্লাবন? তীব্র ঘূর্ণির সঙ্গে পাক খেয়ে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ রাজু হাতে পেয়ে গেল একটা কার্নিশ। উঠে পড়ল। দেখে, একটা ছোটমোটো ছাদে জনা কুড়ি কাকভেজা লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন বলল—খিচুড়ি হচ্ছে, চিন্তা নেই। রাজুর কথাটা ভাল লাগল। মনে হল, পৃথিবীতে কয়েকটা ভাল লোক আছে এখনও। চারদিকে চেয়ে দেখল, জল ছুটছে নক্ষত্রের বেগে। যেন একটা প্রকাণ্ড জলপ্রপাত শুয়ে পড়েছে হঠাৎ। চারদিকে কিছুই প্রায় নেই। বহু বহু দূরে এক-আধটা বাড়ির ছাদ দেখা যায়। তাতে পিঁপড়ের মতো মানুষ। যে লোকটা খিচুড়ির খবর দিয়েছিল সে এবার বলল—কিন্তু গুনতিতে মেয়েমানুষ বড় কম পড়ে গেল। জল তো কমবেই একদিন, ড্যাঙা জমিও দেখা দেবে। কিন্তু তখন দুনিয়া আবার মানুষে ভরে দিতে অনেক বছর লেগে যাবে। মেয়েমানুষ ছাড়া সে এলেম কারই বা আছে!

পাশ ফিরতেই চটকা ভেঙে রাজু তাকায়, জানালা দিয়ে সাদা ধপধপে একটা রোদের চৌখুপি এসে পড়েছে মেঝে আর খাট জুড়ে। চোখ চেয়েও সে স্পষ্টই সেই জলের শব্দ পাচ্ছিল, সেই উড়ন্ত টাওয়ার আর কলকাতার পথে পথে রক্ত আর লাশ দেখতে পাচ্ছিল স্পষ্ট। এত সত্য, এত স্পষ্ট, এত নিখুঁত কী করে স্বপ্ন হবে? লেপের ভিতরে সে নিজের গায়ে হাত দিয়ে ভেজা ভাব আছে কিনা দেখে। ধাতস্থ হতে অনেক সময় লাগে তার। কোথায় সে আছে তা খুব আস্তে আস্তে মনে পড়ে।

হাতঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা। ভারী লজ্জা করতে থাকে রাজুর। অন্যের বাড়িতে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো! কে জানে কী মনে করবে এরা!

কুঞ্জর বিছানায় থাকার কথা নয়, নেইও। ঘর ফাঁকা। দোর ভেজানো। রাজু খুব স্মার্টভাবে তড়াক করে উঠে পড়ে। যতদূর সম্ভব নিজেকে চারদিকের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে

করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে কটকটে রোদের উঠোন, গাছপালা ঘেরা ঘরোয়া বাগান, কুয়ো, কিছু বিষয়কর্মে রত মানুষ। রাজু চারদিকে চেয়ে সবকিছু চিনে নিতে থাকে। হ্যাঁ, এই তো রোদ, মানুষ, গাছপালা। এই তো সব চেনা!

আজকাল প্রতিদিন রাজুকে এই লড়াইটা করতে হচ্ছে। এক কল্পনার থাবা তাকে কেড়ে নেয় মাঝে মাঝে। আবার ছেড়ে দেয় বাস্তবতার মধ্যে। রাজু ভেবে পায় না, সে কি পাগল?

এই নিয়ে তিনবার বনশ্রীর সঙ্গে দেখা হল রাজুর, বেরিয়েই সকালে প্রথম যে মানুষের মুখ দেখল সে বনশ্রী। কেষ্টর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে টুসির সঙ্গে কথা বলছে। গায়ে শান্তিনিকেতনি খদ্দরের চাদর। এত সুন্দর নকশা কদাচিৎ দেখা যায়, মেয়েটার মাথার খোঁপাটা মস্ত বড়। ঘুম থেকে ওঠার পর এই সকালের দিকটায় মুখখানা আরও একটু বেশি লাবণ্য মাখানো, রাজু হাঁ করে দেখছিল। সে মোটেই মুগ্ধ হয়ে যায়নি, প্রেমে পড়েনি, কিন্তু গুলি, হাইড্রোজেন বোমা আর মহাপ্লাবনের পর এই অসম্ভব শান্ত ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখতে বেশ লাগছিল তার। যেন কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারছিল না এটা স্বপ্ন, না ওটা।

—রাজুদা, উঠেছেন! বলে টুসি হঠাৎ তর তর করে স্রোতের মতো ধেয়ে এল—দাঁড়ান, মাজন এনে দিচ্ছি। বারান্দার কোণে বালতিতে জল রাখা আছে। বলতে বলতে চড়াই পাখির মতো উড়ে গেল যেন ফুড়ুৎ করে।

এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা, মাঝখানে একটু উঠোনের ফাঁকা শূন্যতা। সেই শূন্যতা ভরাট করে বনশ্রী একবার তাকায় রাজুর দিকে। চোখের চাউনির মধ্যে কী দেখল রাজু কে জানে! তার ভিতরে কে যেন ফিস ফিস করে বলে ওঠে, এ মেয়েটা প্রেমে পড়েছে। পাপের ছায়া স্পর্শ করেছে ওকে।

বনশ্রী আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। কেমন যেন বিভোর ভাবভঙ্গি ওর। যেন নিজের ভিতরে কিছু প্রত্যক্ষ করছে নিবিড়ভাবে। কূট চোখে চেয়ে দেখে রাজু। বনশ্রী উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে গায়ে রোদ মেখে, মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে চলে গেল।

টুসি একটা সাদা মাজনের শিশি এনে বারান্দায় রেখে আবার উড়ে যেতে যেতে বলে গেল, চা আনছি।

সকালের দৈহিক কাজকর্ম বড় ক্লান্তিকর রাজুর কাছে। মুখ ধোও, কলঘরে যাও, ছোট বাইরে-বড় বাইরে সারো।

ধীরে ধীরে প্রবল অনিচ্ছের সঙ্গে সবই সেরে নেয় রাজু। এর মধ্যেই টুসির অনর্গল কথা শুনে নিতে থাকে। কেষ্ট কাল রাত থেকে হাওয়া, বউদির পেটে রাজপুত্রের মতো ছেলে ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। রাজুদা নাকি আজই চলে যাবেন? সে হবে না।

বাইরের দিকে আলাদা একটা ঘরে কুঞ্জর ডিসপেনসারি। আজ রোদ হাওয়ার দিনে একাই বেরিয়ে পড়বে বলে রাজু ঘরের বার হয়ে ডিসপেনসারির দরজায় একটু দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো কাঠের বেঞ্চে বিস্তর ছেলেছোকরা গুলতানি করছে। কয়েকজন বিমর্ষ চেহারার রুগীকেও দেখতে পাওয়া যায়। মাঝখানে একটা চেয়ারে কুঞ্জ বসা, সামনের টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাগজের পুরিয়ায় গুনে গুনে বড়ি ফেলছে। একবার চোখ তুলে রাজুকে দেখে স্মিত হাসি হেসে বলে—উঠেছিস? আয়, বোস এসে।

রাজু বলে—আমি একটু ঘুরে আসছি।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। চলে যেতে গিয়েও রাজু মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। আর চেয়ে থাকতে থাকতেই রাজু হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেল। কুঞ্জ যখন তাকাল তখন রাজু কেন একটা মড়ার মুখের মতো ছাপ দেখল ওর মুখে? কেন দেখল, ওর চোখের মণি ঊর্ধ্বমুখী এবং স্থির? কেন ওর সাদা ঠাণ্ডা ঠোঁট? পাঁশুটে দাঁত? কেন মনে হল, কুঞ্জর গায়ের চামড়ার নীচে জমাট রক্তের আড়ষ্টতা?

কুঞ্জ কি মরে যাবে? আজ কিংবা কাল?

রাজু ডিসপেনসারির বারান্দা থেকে নেমে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে। দুর্যোগের পর আজ

চারদিকে এক পুকুর রোদ টলটল করছে। টেরিলিনের মতো মসৃণ নীল আকাশ, চারদিকে গাঢ় সবুজ গাছপালার গহীন রাজ্য। রাজু কিছু ভাল করে দেখছিল না। আজ তার কি কোনও অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল কিংবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? নাকি এ সব তার আবোল-তাবোল ভাবনা মাত্র?

সামনে আড়াআড়ি পথ পড়ে আছে। রাস্তায় পা দিয়ে রাজু অনেকক্ষণ ঠিক করতে পারল না, কোনদিকে যাবে। ডানদিকের পথটায় ভারী সুন্দর গাছের ছায়া পড়ে আছে। লোকজন নেই। শুধু একটা একলা কুকুর ল্যাং ল্যাং করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। রাজু সেই দিকে হাঁটতে থাকে।

ফাঁকা রাস্তায় রাজু একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিল। গন্ধটা ভাল না মন্দ তা সে বুঝতে পারছিল না। তবে চারদিক থেকে অজস্র অদ্ভুত সব গন্ধ ভেসে আসছে। তার মধ্যে এই গন্ধটাই তাকে টানছে। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে রাজু এগোতে থাকে। অনির্দিষ্টভাবে বেড়াবে বলে বেরিয়ে এসেছে সে, কিন্তু এখন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল, তার এই গন্ধটা অনুসরণ করে যাওয়া উচিত। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেতে হবে তাকে।

মাঝে মাঝে উত্তরের শুকনো ঠাণ্ডা বাতাসে গন্ধটা হারিয়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় রাজু। চারদিকে চেয়ে প্রবলভাবে শ্বাস টানে। আকুলি ব্যাকুলি করে ওঠে বুক। গন্ধটা হারিয়ে গেল না তো! না, আবার পায়। রাস্তা ছেড়ে ঘাস জমিতে নেমে গাছপালার মধ্যে গন্ধটা খুঁজতে হয় তাকে। সুঁড়ি পথ ধরে সে তর তর করে এগোতে থাকে। গত রাত্রির জল-কাদায় থকথকে পথটাকে সে গ্রাহ্য করে না। এগোতে হবে। কোথাও পৌঁছোতে হবে।

একটা বাঁশঝাড়ের কোণে ভারী নিস্তব্ধ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পথ ঠিক করতে চেষ্টা করছিল রাজু। সে সময়ে হঠাৎ টের পেল, কাল রাতের মতো আজও সে অন্য এক চোখে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছে। যেন পিছন দিকে তার লেজ নড়ে উঠল হঠাৎ। কান দুটো খাড়া হল। বুঝতে পারল, সে অবিকল কুকুরের চোখে চেয়ে আছে। রোদ, আলো, হাওয়া কোনওটারই আর কোনও অর্থ নেই তার কাছে। তার আছে এক গন্ধের জগৎ। অনেক বিচিত্র শব্দও পায় সে। বহু অদ্ভুত পোকামাকড় দেখে চারদিকে। মাথার মধ্যে কোনও চিন্তা নেই। আছে শুধু এক গন্ধের নিশানা। শুধু জানে, যেতে হবে। কিন্তু যেদিকেই যাক সেদিকেই পথে পথে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা হবে বলে টের পায় সে। খুবই সতর্কতা দরকার। বহু বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পায় সে। আলো অন্ধকারের কোনও অর্থ নেই তার কাছে। শুধু জানে কখনও সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কখনও আবছা। চারদিকে এখন সেই স্পষ্টতা। এটা খেলার সময়। সে টের পায় তার কোনও আপনজন নেই। জন্ম বা মৃত্যুর কোনও চিন্তা নেই। অভাববোধ নেই। সে জানে, খুঁজলে খাবার পাওয়া যাবে। দেহের প্রয়োজনে আর একটা দেহ জুটে যাবে ঠিক।

রাজু এগোতে থাকে। গন্ধের রেখাটা মাটির সমান্তরাল এক অদৃশ্য সুতোর মতো চলেছে। কোনও অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে এক-আধবার ঘুরে পিছনটা দেখে নেয় সে। থমকে দাঁড়িয়ে শব্দ শোনে। কে ডাকল ঘেউ! জবাব দিতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু দিল না। এখন এগোতে হবে।

সুঁড়ি পথটা একটু আগেই আর একটা পথে মিশে গেছে। সেখানে গন্ধের সুতো তাকে টেনে নেয় একটা মস্ত ঘেরা বাগানের দিকে। বাগানের ফটকের ভিতরে ঢুকে পড়ে রাজু। গন্ধটা এখানে খুব গাঢ়, ঘন, পুঞ্জীভূত।

গাছপালার ভিতরে একটা নির্জন কোণে ফাঁকা সবুজ একটা মাঠের মতো জায়গা। সেখানে চুপ করে নিঝুম হয়ে বসে আছে মেয়েটি। তোলা হাঁটুতে মুখ, ডান হাতে আনমনে ঘাস ছিঁড়ছে। চেয়ে আছে, কিন্তু বাইরের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দেখছে নিজের ভিতরের নানা দৃশ্য।

গন্ধটা এইখানে মূর্তি ধরে আছে। উন্মুখ রাজু সামনে দাঁড়ায়। তার ছায়া পড়ে মেয়েটির সামনে।

বনশ্রী চমকায় না। ধীরে মুখ তুলে তাকায়। অনেকক্ষণ লাগে তার পৃথিবীতে ফিরে আসতে।

রাজুরও অনেকক্ষণ লাগে কুকুর থেকে মানুষের অনুভূতি ও বোধে জেগে উঠতে!

তারপর দুজনেই দুজনের দিকে ক্ষণকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বনশ্রী ধীরে উঠে দাঁড়ায়, মৃদু স্বরে বলে—আপনি!

যে গন্ধের রেখা ধরে সে এসেছে তার উৎস যে বনশ্রী তা তো রাজু জানত না। কেন সেই গন্ধ তাকে টেনে এনেছে এখানে তাও জানা নেই। কিন্তু মনের মধ্যে জল-বুদবুদের মতো অস্পষ্ট কথা ভেসে

উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। একে কি কিছু বলার আছে রাজুর?

এক বিচারহীন অনুভূতির জগৎ থেকে বুদ্ধির জগতে জেগে উঠেছে রাজু। শহুরে অভিজ্ঞতা আর বোধ-বুদ্ধি খেলে যাচ্ছে মাথায়। চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে সামান্য হেসে সে বলে—আপনাদের বাগানটা বেশ। বেড়াতে বেরিয়ে বাগানটা দেখে বড় লোভ হল, তাই ঢুকে পড়েছি।

বনশ্রী হেসে বলে—বাগানটা এমন কী সুন্দর! এখন আর গাছ-টাছ লাগানো হয় না। এমনি পড়ে থাকে। কত জঙ্গল হয়েছে।

রাজু মাথা নেড়ে বলে—সাজানো বাগান আমার ভাল লাগে না।

সাজানো বাগানের কথায় কী ভেবে মুখ নিচু করে একটু হাসে বনশ্রী। রাজু স্পষ্ট দেখল, বনশ্রীর মুখ থেকে মিষ্টি হাসিটুকু ঝরে পড়ল ঘাসের সবুজে, ফুলের পরাগের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল বাতাসে, ওর গা থেকে একটা শ্যামল আলো গিয়ে রোদের সঙ্গে মিশে নরম করে দিল আলোর প্রখরতা। ভারী স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারপাশ। দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার নামি কাগজে ইংরিজি আর বাংলায় বুঝে না-বুঝে রাজু আর্ট রিভিউ লিখে আসছে। ছবির চোখ আছে বলেই আবহে ছড়িয়ে যাওয়া হাসিটাকে বুঝতে পারে রাজু। চারদিকে নিবিড় গাছপালার গাঢ় সবুজ, রুপোলি রোদ আর অনেকখানি প্রসারিত ফাঁকা জমির ওপর স্নিগ্ধ শ্যাম মেয়েটির এই ছবি যদি আঁকতে চায় কেউ তবে তাকে খুব বড় দার্শনিক হতে হবে। একটা সবুজ বাগান, কালো মেয়ে বা ফর্সা রোদ এঁকে দিতে পারে যে কোনও ছেঁদো পেইন্টার। গভীর অনুভূতি ছাড়া কী করে টের পাওয়া যাবে এখানে এখন বাতাসের গায়ে রোদের কুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে? ঘাস থেকে এই যে গাঢ় সবুজ আভা উঠে এসে সবুজে ছুপিয়ে দিল বনশ্রীকে, কে দেখবে তা?

কী করে সাধারণ চোখে বোঝা যাবে, মেয়েটির অনেকখানি গলে মিশে আছে চারপাশের সঙ্গে? কে বুঝবে, পিছনে মস্ত ফাঁকা অনেকখানি ওই যে পটভূমি তা কেন্দ্রাভিগ গতিতে ছুটে আসছে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে? তারা বলছে—সরে যেয়ো না, চলে যেয়ো না! তুমি না থাকলে মূল খিলানের অভাবে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে পটভূমি। সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

বনশ্রী মুখ তুলে বলল—কাল সারা রাত আপনাদের ঘুম হয়নি, না? টুসি বলছিল।

টুসি কে মনে পড়ল না রাজুর। কাল রাতে সে কি ঘুমোয়নি? হবেও বা। যা মনে এল তাই বলে দিল রাজু—রাতটা কেটে গেছে কোনওক্রমে। অন্ধকারেই যত গণ্ডগোল। দিনটা কত ফর্সা আর স্পষ্ট!

বনশ্রী মায়াভরা মুখে বলল—বেড়াতে এসে কষ্ট পেলেন। আসবেন আমাদের বাড়িতে? আসুন না, চা খেয়ে যাবেন!

সকালে যখন মেয়েটিকে দেখেছিল তখনও রাজুর মনের মধ্যে একটা কালো বেড়াল হেঁটে গিয়েছিল। এখনও গেল। মেয়েটির মুখের উজ্জ্বলতায় মিশে আছে একটু পাপ। চালচিত্রের মতো ঘিরে আছে। পেখম মেলেছে ময়ূরের মতো। এই উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নয়। দূর থেকে কে যেন আয়নার আলো ফেলার মতো বনশ্রীর মুখে অনবরত প্রক্ষেপ করে যাচ্ছে নিজেকে। কোথায় যেন জ্বালা ধরেছে বনশ্রীর। গেঁয়ো মেয়ে, খুব বেশি ভাববার মতো মাথা নয়। তবু সাজানো বাগানের কথা শুনে হেসেছিল কেন? ও কি এখন একটা সাজানো বাগান ছেয়ে ফেলতে চায় ভয়ঙ্কর বন্যতা দিয়ে? ভাঙতে চায় কারও সাজানো সংসার?

রাজু বনশ্রীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—চলুন।

৯

উঠতে গিয়ে মাথাটা পাক মারল একটা। টেবিলটায় ভর দিয়ে সামলে নিল কুঞ্জ। শ্বাস কিছু ভারী লাগছে। বুকে অস্পষ্ট ব্যথা।

সাবিত্রীর বাবা এসেছে। ভিতর বাড়িতে একবার যাওয়া উচিত। কিন্তু বড় দ্বিধা আসছে। দিনের আলো, চেনা মানুষজন, কথাবার্তা কিছুই সহ্য হচ্ছে না তার। একটা অন্ধকার ঘরে একা যদি বসে থাকতে পারত কিংবা যদি চলে যেতে পারত অনেক দূরে!

ডিসপেনসারির দরজায় তালা দিয়ে কুঞ্জ খুব ধীর পায়ে যেন হাঁটুভর জল ঠেলে ভিতর বাড়িতে আসে। মুখ তুলে কোনও দিকে চায় না।

সাবিত্রীর ঘরে অনেকের ভিড়। শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে সাবিত্রীর বাবা বসে আছে। তাকে ঘিরে মেয়েমানুষেরা একসঙ্গে কথা বলছে সবাই। কুঞ্জ ঘরে ঢুকে সবার পিছনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ কোনওদিকে চাইতে পারে না। কিন্তু যখন তাকাল তখন যেদিকে, যার দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করেছিল তার মুখের ওপর সোজা গিয়ে পড়ল চোখ।

অত ভিড়ের মধ্যেও ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সাবিত্রীর অপলক চোখ তার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁট সাদা, মুখ ফ্যাকাশে, বসা চোখের কোলে দুই বাটি অন্ধকার টলটল করছে। তবু সবটুকু প্রাণশক্তি দিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে সাবিত্রী। লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, অপরাধবোধ নেই, ধরা পড়বার ভয়ও নেই একরত্তি। কুঞ্জর কাছ থেকে ও কোনও আশ্বাস চায়নি, বিপদ থেকে বাঁচাতে বলেনি, কোনও নালিশ নেই ওর। কুঞ্জর কেমন যেন মনে হয়, সাবিত্রী মানুষকে কুঞ্জর সাথে তার সম্পর্কের কথা বলে দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ওকে বোধহয় ঠেকানোও যাবে না। ও কেমন? বেহেড? মেয়েমানুষের কীই বা জানে কুঞ্জ! ওরা যখন বেহেড হয় তখন বুঝি এরকমই হয়। কই, তনু কোনওদিন কারও জন্য হয়নি তো! বরং নাড়ি টিপে, বুকের স্পন্দন শুনে, রক্তচাপ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা যেমন রুগীকে যাচাই করে তেমনি আবেগহীন ঠাণ্ডা মাথায় তনু তার প্রেমিকদের যাচাই করেছে। মেয়েমানুষ সম্পর্কে ভুল ধারণাটা কুঞ্জর মনে গেঁথে দিয়েছিল সে-ই। ধারণাটা ভাঙল। যদি বেঁচে থাকে কুঞ্জ তবে আরও কত ধারণা ভাঙবে, আরও কত শিখবে সে।

সাবিত্রীর স্থির তাকিয়ে থাকা দেখে কুঞ্জ চমকায় না। কেবল তার ভিতরটা নিভে যায়। ঠাণ্ডা এক আড়ষ্টতা শরীরে আস্তে আস্তে নেমে আসে। ভালবাসা কত বিপজ্জনক হয়!

কুঞ্জ দাঁড়ায় না। বেরিয়ে আসে। পিছন থেকে এসে তার সঙ্গ ধরে সাবিত্রীর বাবা। একটু গা শিরশির করে ওঠে কুঞ্জর। ভয়-ভয় করে। বেহেড সাবিত্রী কিছু বলেনি তো! মুখে চোখে তেমন উদ্বেগ নেই, একটু চিন্তার ভ্রূ কোঁচকানো রয়েছে কেবল। বার-বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ওর মার হার্টের ব্যামো, দেখবে কে? যেমন আছে থাক, বরং তুমিই দেখো।

কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে—কদিন ঘুরে এলে পারত।

বলতে গিয়ে সে টের পায়, কখন গলাটা যেন ধরে গেছে।

সাবিত্রীর বাবা মাথা নেড়ে বলে—বাড়িতে ওকে দেখবার কেউ তো নেই। এখানে তোমাদের বড় পরিবার, দেখার লোক আছে। আমার সবচেয়ে বড় ভরসা অবশ্য তুমি।

কুঞ্জ মুখ নিচু করে থাকে, বলে—এখন কিছুদিন বাইরে গেলে ওর মনটা ভাল হবে। শরীরটা—

সাবিত্রীর বাবা ঝাঁকি দিয়ে বলে—এ অবস্থায়? পাগল হয়েছ? ওর মার চিকিৎসা করাতেই আমি ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছি। ঘন ঘন ই সি জি, ওষুধ; সাবি নিজেও তো যাওয়ার কথায় তেমন গা করল না। বলল, এখানে তাকে দেখার লোক আছে।

কুঞ্জর আর কী বলার থাকতে পারে? চুপ করে রইল। সাবিত্রী যাচ্ছে না। তার মানে, সাবিত্রী রইল।

বার-বাড়িতে রওনা হওয়ার মুখে একটু দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর বাবা বলে—কেষ্টকে আজ সকালেই বাগনান স্টেশনে দেখা গেছে জান বোধ হয়?

কেষ্টর নাম কানে আসতেই বুকটা হঠাৎ ক্ষণেকের জন্য পাথর হয়ে যায়। কথা বলতে গলাটা কেঁপে গেল—না তো!

—আমার দুজন ছাত্র দেখেছে। বলছিল। বোধহয় ট্রেন ধরে কলকাতা কি আর কোথাও পালাল। খবরটা সময়মতো পেলে ধরতাম গিয়ে।

পালিয়েছে! কেষ্ট পালিয়েছে! তা হলে কেষ্টর সঙ্গে এখন মুখোমুখি হতে হবে না তাকে! কুঞ্জর মনটায় একটা ভরসার বাতাস দোল দেয়। যদি পালিয়ে থাকে তবে এখনও খুব বেশি লোককে বলে যেতে পারেনি কেষ্ট। খুব বেশি দুর্বল করে দিয়ে যায়নি কুঞ্জর ভিত। পরমুহূর্তেই কুঞ্জর মনের মধ্যে লুকোনো কাঁটা খচ করে বেঁধে। কেষ্ট নয়, কেষ্টর চেয়ে ঢের বেশি বিপজ্জনক সাবিত্রী।

বাগনানের স্কুলমাস্টার বিদায় নিলে কুঞ্জ খুব আস্তে আস্তে একদিকে হাঁটতে থাকে। আর গভীর

চিন্তায় ডুবে যায়।

এই যে এইখানে মস্ত পিপুল গাছ, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় এই গাছের তলায় একটা সাদা খরগোশ ধরেছিল কুঞ্জ। খরগোশটা তেমন ছুটতে পারছিল না, একটু যেন খুঁড়িয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে থিরিক থিরিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দামাল কুঞ্জ তাড়া করে করে ধরে সোজা বুকের মধ্যে জামার তলায় চালান করে দিল। আঙুলে কুটুস করে কামড়ে দিয়েছিল খরগোশটা। আজও খুঁজলে ডানহাতের কড়ে আঙুলে স্পষ্ট দাগটা দেখা যাবে হয়তো। কামড় খেয়েও ছাড়েনি। বুকের মধ্যে কী নরম হয়ে লেগে ছিল খরগোশ! নরম হাড়, তুলতুলে শরীর, চিকন সাদা লোম, চুনি পাথরের মতো লাল চোখে বোতামের ফাঁক দিয়ে দেখছিল কুঞ্জকে। চেয়ে কুঞ্জ মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল—এ আমার। দিন দুই তাদের বাড়িতে ছিল খরগোশটা। রজনীগন্ধা ফুল খেতে ভালবাসত খুব, কাঠের বাক্সে ঘুমোত। তারপর খবর হল ভঞ্জবাড়ির খরগোশ পালিয়েছে। লোকে খুঁজছে। কুঞ্জর মা খবর পাঠিয়ে দিতে বড় বাড়ির চাকর এসে নিয়ে গেল একদিন। খুব কেঁদেছিল কুঞ্জ। গভীর দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝতে শিখেছিল, এ পৃথিবীতে কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়।

এই দিকটা ভারী নির্জন। ভাঁট জঙ্গলের আড়াল। পিপুলের ছায়ায় ভেজা মাটিতে বসে সামনে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে উদাস মাঠখানার দিকে চেয়ে থাকে কুঞ্জ। কী জানি কেন, আজ সেই খরগোশটার কথা তার বড় মনে পড়ছে। কিছু জিনিস তার, কিছু জিনিস তার নয়—এ কথা ভঞ্জদের খরগোশের কাছে শিখেছিল কুঞ্জ। যখন রাত্রিবেলা সব সম্পর্কের বাঁধন ছিঁড়ে নিশি-পাওয়া সাবিত্রী আসত তার কাছে তখন সে কি জানত না, এ হল কেষ্টর বউ? তার নয়?

একটা নোংরা কাদামাখা রোগা ডেঁয়ো পিঁপড়ে তার গোড়ালি বেয়ে উঠে আসছে। পায়ের লোমের ভিতর দিয়ে বাইছে সুড়সুড় করে। হঠাৎ ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে কুঞ্জর গা। পিঁপড়েটা ঝেড়ে ফেলে সে ওঠে, দাঁড়ায়। সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোয়নি কুঞ্জ, তার ওপর রাতে অত ভিজে ঠাণ্ডা বসেছে বুকে। হঠাৎ দাঁড়ালে, হাঁটতে গেলে টলমল করছে মাথা। ডান বুকে একটা ব্যথা থানা গেড়ে বসে আছে কখন থেকে। গায়ে কিছু জ্বরও থাকতে পারে।

কিন্তু শরীরের এই সব অস্বস্তি ভাল করে টেরই পাচ্ছিল না কুঞ্জ। এঁটেল কাদায় পিছল আলের রাস্তায় ভাঙা জমি আর কখনও আগাছা ভেদ করে হাঁটছে সে। এই পষ্টাপষ্টি আলোয় যতদূর দেখা যায়, এই তেঁতুলতলা বেলপুকুর শ্যামপুর জুড়ে গোটা চত্বরকে সে শিশু বয়স থেকে জেনে এসেছে নিজের জায়গা বলে। এইখানেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ চেনাচেনি। কিন্তু এখন তার কেবলই মনে হয়, এ সব তার নিজের নয়। এ বড় দূরের দেশ। এখানে বিদেশি মানুষের বাস। এ তো তার নয়।

মাথার মধ্যে বিকারের মতো অসংলগ্ন সব চিন্তা ভিড় করে কথা কইছে। একবার যেন সে তনুকে ডেকে বলল—তোমার জন্যেই তো। কোনওদিন বুঝতে দাওনি যে, তুমি আমার নও। যখন পরের জিনিস হয়ে গেলে তখনও মনে হত, তুমি আমার, অন্যের কাছে গচ্ছিত রয়েছ। ভাবতুম একদিন খুব বড় হব, নাম ডাক ফেলে দেব চারদিকে, সেদিন বুঝবে তুমি কাকে ছেড়ে কার ঘর করছ। বুঝলে তনু, আমাদের শিশুবয়স কখনও কাটে না। কোনটা আমার, কোনটা নয় তা চিনতে এখনও বড় ভুল হয়ে যায়।

নিচু একটা জমিতে জল জমে আছে এখনও। কুঞ্জ জলে নামবার মুখে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় জলে। সামান্য বাতাসে জল নড়ছে, তার ছায়াটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। এক দুই পাঁচ সাত টুকরো হয়ে যাচ্ছে কুঞ্জ। এই হচ্ছে মানুষের ঠিক প্রতিবিম্ব। কোনও মানুষই তো একটা মানুষ নয়, এক এক অবস্থায় পড়ে সে হয়ে যায় এক এক মানুষ। আর বেশি দিন নয়, কেষ্ট ফিরবে, বেহেড সাবিত্রী বিকারের ঘোরে প্রলাপের মতো গোপন কথা বিলিয়ে দেবে বাতাসে। তেঁতুলতলা, বেলপুকুর, শ্যামপুর হয়ে বাগনান পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে কথা। লোকে জানবে জননেতা কুঞ্জনাথ আসলে কেমন মানুষ।

জলের মাঠ পার হয়ে কুঞ্জ ঢালু জমি বেয়ে উঠতে থাকে। সামনেই অনেক কটা নারকোল গাছের জড়ামড়ি। তার ভিতরে সাদা উঠোন। দুটো মাটির ঘর।

ভূতগ্রস্তের মতো কুঞ্জ এগোতে থাকে। উঠোনে পা দেওয়ার মুখে একবার ফিরে তাকায়। অনেক দূর

অবধি ঢলে পড়েছে গভীর নীল দ্যুতিময় আকাশ। কী বিশাল ছড়ানো সবুজ। কুঞ্জ তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে কেষ্টকে ডেকে বলে—এ সব কিছু নয় রে। সময় কাটতে দে। একশো বছর পর দেখবি আজকের কোনও ঘটনার চিহ্নই নেই পৃথিবীতে। কেউ মনে করে রাখেনি। সময় এসে পলিমাটির আস্তরণ ফেলে যাবে। কুঞ্জ আর সাবিত্রীর কেচ্ছা নিয়ে যেটুকু হইচই উঠবে, পৃথিবীর মস্ত মস্ত ঘটনার তলায় কোথায় চাপা পড়ে যাবে তা। মানুষ কি অত মনে রাখে!

প্রায় মাইল তিনেক এক নাগাড়ে হেঁটে এসে কুঞ্জ উঠোনের মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা রোদে কাঁথা মাদুর শুকোচ্ছে, একটা কালো চেহারার বাচ্চা বসে খেলছে আপনমনে। কাক ডাকছে। উত্তরের হাওয়া বইছে গাছপালায়।

কুঞ্জ ডাকল—পটল। এই পটল।

প্রথমে অনেকক্ষণ কেউ সাড়া দিল না। বাচ্চাটা হাঁ করে বোধহীন চোখে চেয়ে রইল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে উঠোনের মধ্যে এগিয়ে যায়। দাওয়ায় ওঠে। ডাকে—পটল।

নোংরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বিশাল চেহারার পটল আচমকা দরজা জুড়ে দেখা দেয়। গলায় কম্ফর্টার, মাথা কান ঢেকে একটা লাল কাপড়ের টুকরো জড়ানো! ক্রূর চোখ, মুখে হাসি নেই। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে—কী বলছ?

—কথা আছে। কুঞ্জ চোখে চোখে বলে—বাইরে আসবি?

—আমার শরীর ভাল নয়। হাঁফের টান উঠেছে, পড়ে আছি। পটল এক পা ঘরের মধ্যে পিছিয়ে যায়—যা বলবার এইখানে বলো।

কুঞ্জ ঠাণ্ডা গলায় বলে—আমার সঙ্গে লোক নেই রে। ভয় খাস না।

পটল একটু ঝেঁকে উঠে বলে—ভয় খাওয়ার কথা উঠছে কেন বলো তো?

কুঞ্জ খুব ক্লান্ত গলায় বলে—অস্তরটা নিয়ে বেরিয়ে আয়। মাঠবাগে চল, যে জায়গায় তোর খুশি। আজ কেউ ঠেকাবে না। মারবি পটল?

পটল তেরিয়া হয়ে বলে—তোমার মাথাটা খারাপ হল নাকি? ঝুটমুট এসে ঝামেলা করছ? বাড়ি যাও তো বাবু, আমার শরীর ভাল নয় বলছি।

দাঁতে দাঁত চেপে কুঞ্জ গিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, ভ্যাপসা গন্ধ। পটল পিছিয়ে অন্ধকারে সেঁধোয়। কুঞ্জ মৃদুস্বরে বলে—আমি কখনও মিছে বলেছি রে? বিশ্বাস কর, সঙ্গে লোক নেই, লুকোনো ছুরিছোরা নেই। মারলে একটা শব্দও করব না। শুধু দুটো কথা জিজ্ঞেস করব। বাইরে আয়।

পটল বাইরে আসে। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে অনেকক্ষণ কাশে, গয়ের তোলে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে—কী হয়েছে বাবু তোমার, বলো তো?

কুঞ্জ পাথরের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলে—রেবন্ত আমাকে মারতে চায় কেন বলবি?

পটল ভারী অবাক হয়ে তাকায়। তারপর ময়লা ছ্যাতলা পড়া দাঁত বের করে হেসে বলে—বলছ কী গো! তোমায় রেবন্তবাবু মারতে চাইবে কেন? মাথাটাই বিগড়েছে। বাড়ি যাও তো বাবু।

—তুই টাকার জন্য সব করতে পারিস জানি। তোর কথা ধরি না। কিন্তু রেবন্ত কেন চায় তার ঠিক কারণটা বলবি?

—ঝুটমুট আমাকে ধরছ বাবু। আমি মরি নিজের জ্বালায়।

—ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কি কিনে ফেলেছিস পটল?

পটল এ কথায় বিন্দুমাত্র চমকায় না। কলাবাগান কেনার জন্য সে বহুকাল ধরে চেষ্টা করছে। কথাটা সবাই জানে। পটল ঝিম ধরে চোখ বুজে থেকে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, বলল—টাকা কই?

—কেন, রেবন্ত দেবে না?

পটল একটা ঝোড়ো শ্বাস ছেড়ে বলে—পটলকে সবাই দেওয়ার জন্য বসে আছে! রেবন্তবাবু দেবে কেন বলো তো? বলে পটল মিটমিটে ক্রূর চোখে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে।

কুঞ্জর মাথায় এখনও সঠিক যুক্তি বুদ্ধি ফিরে আসেনি। কেমন ধোঁয়াটে অসংলগ্ন চিন্তা। বলল—হাবুর ঝোপড়ায় কেষ্ট তোদের সঙ্গে রোজ বসে?

পটল একটু চুপ করে থেকে দুঃখের সঙ্গে বলল—তার আর আমরা কী করব বলো। বসে।

—কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—বলে না যে—বড় ঠিক সময়ে কুঞ্জর মুখে বন্ধন পড়ে গেল। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—আমার নিন্দে করে না?

—তুমি আজ ভারী উল্টোপাল্টা বকছ বাবু। পটল বিরক্তি প্রকাশ করে মুড়ি দিয়ে বসে। উঠোনের দিকে চেয়ে বলে—নিন্দে করার কী আছে, তুমি কি মন্দ লোক?

কুঞ্জ সামান্য হেসে বলে—তবে কি ভাল? তুই কী বলিস?

পটল আবার হাসল। বলল—লোক ভাল, তবে ডাক্তার ভাল নও। বাপের এলেমদারিটা পাওনি। হরিবাবুর দু ফোঁটা ওষুধে ছ মাস খাড়া থাকতাম। হরিবাবা গিয়ে অবধি রোগটার চিকিৎসে হল না আর। ভাল করে ভেবে চিন্তে একটা ওষুধ দিয়ো দিকি।

কুঞ্জ চেয়ে ছিল। পটল তার কাছে ওষুধ চাইছে। হঠাৎ খুব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে কুঞ্জর বুকটা অনেক হালকা লাগল। এতক্ষণ যে জ্বরটা তার মাথায় বিকারের ঘোর তৈরি করেছিল তা হঠাৎ ছেড়ে গেল বুঝি।

পটলের বউ বাসন্তী কতক কাঁথা কাপড় কেচে নিয়ে এল পুকুরঘাট থেকে। উঠোনে ঢুকে কুঞ্জকে দেখে একটু অবাক। জড়সড়ো হয়ে বলে—ভাল আছেন তো বাবু?

জেলে পাড়ার মেয়ে বাসন্তীকে চেনে কুঞ্জ। এর আগে আরও দুবার বিয়ে বসেছিল। কুঞ্জ যতদূর জানে, ওর দু নম্বর স্বামীকে শিবগঞ্জের হাটে পটলই খুন করেছিল।

বাসন্তীর পিছনে গোটা তিন-চার ছেলে মেয়ে। কুঞ্জ স্থির চোখে চেয়ে দেখে। তিন পক্ষের ছেলেপুলে নিয়েই পটলের ঘর করছে বাসন্তী। গোটা সমাজটা যদি এরকম হত তো আজ বেঁচে যেত কুঞ্জ।

পটল ধীর স্বরে বলল—বাড়ি যাও বাবু।

কুঞ্জ ওঠে। বাইরে এসে উদাস পায়ে ফের তিন মাইল পথ ভেঙে ফিরতে থাকে।

দক্ষিণে শিয়র। শিয়রে খোলা জানালা দিয়ে রোদ হাওয়ার লুটোপুটি। বেলাভর জামগাছে কোকিল ডেকেছে। সেই জানালা দিয়ে বাতাসের শব্দের মতো মৃদুস্বরে ডাক এল—সাবিত্রী।

জেগে ঘুমিয়েছিল সাবিত্রী, অথবা ঘুমিয়ে জেগে। হয়তো ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। বার বার ঢুলে পড়ছে ঘুমে, জেগে উঠছে। কখন ঘুম কখন জেগে ওঠা তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে। জেগে যার কথা চিন্তা করছে, ঘুমের মধ্যে সে-ই হয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন। কাকে ভাবছে? আপনমনে মৃদু হাসে সাবিত্রী। কুঞ্জ ছাড়া কখনও আর কারু কথা তার মনেই আসে না যে। সম্পর্কের কথা তোমরা কেউ বোলো না, বোলো না। বলি, রাধা মেনেছিল? বঙ্কিমের উপন্যাসে শৈবলিনীর বর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—প্রতাপ কি তোমার জার? শিউরে উঠে শৈবলিনী বলেছিল—না, আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল। সাবিত্রীকে কেউ যদি প্রশ্ন করে, কুঞ্জ কি তোমার প্রেমিক? সাবিত্রী ভেবে পায় না কী বলবে। সে কখনও কুঞ্জকে আপনি থেকে তুমি বলেনি। শরীরের গাঢ়তম ভালবাসার সময়েও নয়। প্রেমিক নয়, তবে? কী দেখে মজলে সাবিত্রী? ও যে রোগাটে, কালো, ফুসফুসে জখম, ঘাড় শক্ত। কী এমন ও! তার সাবিত্রী কী জানে? কুঞ্জ সুন্দর কিনা তা তো কখনও ভেবেও দেখেনি সাবিত্রী। তবে? আছে, তোমরা জানো না, আছে। ও কি যে সে? বাগনানের জনসভায় সেই প্রায়-কিশোরী বয়সে সাবিত্রী দেখেছিল কুঞ্জকে। কালো, রোগা এক মানুষ হ্যাজাকের আলোয় দাঁড়িয়ে মুঠি তুলে বক্তৃতা দিচ্ছে। সেই অদ্ভুত গম্ভীর, বিষাদময়, তীব্র ও গভীর স্বর যেন দিকদিগন্তে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। কারও মনে নেই, কুঞ্জরও না, স্কুলের এক পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রেসিডেন্ট কুঞ্জর হাত থেকে প্রাইজ নিয়েছিল সাবিত্রী। তখন কুঞ্জ দাড়ি কামায় না। অল্প নরম দাড়িতে আচ্ছন্ন শান্ত মুখ, টানা কোমল দুটি চোখে বৈরাগ্যের চাহনি। কতই বয়স তখন কুঞ্জর। তবু সেই বয়সেই সে এ অঞ্চলের প্রধান নেতা। প্রাইজ নিতে আঙুলে আঙুল ছুঁয়েছিল বুঝি। সাবিত্রীর সেই শিহরন আজও রয়ে গেছে। ও কি আমার প্রেমিক? না তো। প্রেমিক

বললে যে ভারী ছোট হয়ে যায় ও। তার চেয়ে ঢের বেশি যে। ও কি আমার প্রভু দেবতা? ও সব ভারী বড় বড় কথা। ওতে ওকে মানায় না যে। তবে কী সাবিত্রী? তবে ও তোমার কে? সাবিত্রী মৃদু হাসি হেসে বালিশের কানে কানে বলে—ও আমার।

ঘুমিয়ে ছিল কি সাবিত্রী? নাকি জেগে ছিল? ডাক শুনে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে মৃদু ঝংকারে। কিন্তু চমকায়নি সাবিত্রী, তার সমস্ত শরীর ওর ডাকে এমনিভাবেই সাড়া দেয়। স্বপ্নোত্থিতের মতো সাবিত্রী মাথাটা তুলে বলে—বলুন।

জানালার ওপাশটা দেখা যায় না। ওপাশে রয়েছে ভাট ঘেঁটুর জঙ্গল, খেতের মাচান। জানালা দিয়ে কিছু গাছপালা, আকাশের নীল চোখে পড়ে।

মৃদু বাতাসের মতো স্বর বলে—আমার সব নষ্ট হয়ে গেল। আমরা এ সব কী করলাম?

বিমুগ্ধা সাবিত্রী মৃদু একটু হাসে। বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে করতলে গাল পেতে বলে—আপনি কেন নষ্ট হবেন? পুরুষদের তো দোষ লাগে না।

—কে বলল দোষ লাগে না? জানাজানি হয়ে যাবে সাবিত্রী। তখন আমার যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যাবে।

সামান্য একটু ভাবে সাবিত্রী। তারপর বলে—আপনি তো সকলের মতো সাধারণ মানুষ নন। আলোর গায়ে কি ছায়া পড়ে?

—ও সব বই-পড়া কথা। তোমার নিজের বিপদের কথাও কি কখনও ভাব না সাবিত্রী?

সাবিত্রী আপনমনে অদ্ভুত একটু হেসে বলে—পোয়াতির পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গেল, আর কী বিপদ হবে?

বাইরে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে। মৃদু স্বরে বলে—আমি মরে গেলে সব মিটিয়ে নিয়ো সাবিত্রী। কাউকে আমার কথা বোকার মতো বলতে যেয়ো না। আমি তোমার ভাল চাই।

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়। সচকিত হয়। কষ্টে উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে বলে—ও কথা কেন বলছেন? মরবেন কেন? মরা কি আপনাকে মানায়? শুনুন, আমি না হয় আর কখনও কাউকে বলব না।

কিন্তু জানালার ওপাশে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই, টের পেল সাবিত্রী। নিমীলিত চোখে সে ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রাখল। প্রথমে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। তারপর আবার কান্না: আমি যে মরার কথাও ভাবতে পারি না। মরলে ভালবাসব কী করে? ভালবাসা-নিদানে, পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু পেলে কোনখানে?

১০

ভিতরের বারান্দায় কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে কোলে খাতা রেখে রাজু পেনসিলে দ্রুত হাতে চিরশ্রীর স্কেচ আঁকছে। তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড়।

এ পর্যন্ত গোটা সাতেক স্কেচ এঁকে দিয়েছে রাজু। বনশ্রীর, সবিতাশ্রীর, সত্যব্রতর, শুভশ্রীর, আর কিছু পাড়া-পড়শির। তার আগে ভরাট গলায় শুনিয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। ফাঁকে ফাঁকে পলিটিক্স আর আর্ট নিয়ে দেদার কথা বলেছে। হাত দেখেছে সকলের। খেয়েছে অন্তত চার কাপ চা, ওমলেট, চালকুমড়োর পুর ভাজা। অবশেষে সবিতাশ্রী বলেছেন—আজ আর দুপুরে কুঞ্জদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। যা অঘটন ঘটল ওদের বাড়িতে। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবেলা তুমি এ বাড়িতে খাবে।

এ কথা শুনে রাজু হঠাৎ মুখ তুলে বনশ্রীর দিকে চেয়ে ফেলল। তারপর প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করল, কোন বইতে সে যেন ঠিক এইভাবে প্রেম হওয়ার কথা পড়েছিল। শরৎচন্দ্র? হবে। কিন্তু একসময়ে এরকম ভাবেই প্রেম হত।

তবে রাজু নেমন্তন্নটা নিয়ে নিল।

সবিতাশ্রী একটু দেরিতে হলেন, কিন্তু সত্যব্রত মুগ্ধ হয়েছেন অনেকক্ষণ আগেই। এ ছোকরা একে বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক তার ওপর কলকাতার ছেলে। শ্যামশ্রীর বিয়ের পর সত্যব্রত মনে মনে স্থির করে রেখেছেন আর কোনও মেয়ের বিয়ে গাঁয়ের ছেলের সঙ্গে দেবেন না। কলকাতায় দেবেন। সেই ছেলেই

বুঝি আজ হেঁটে এল ঘরে। কী ভাল ছেলে। কী চোখা আর চালাক। কত খবর রাখে। তার ওপর সান্যাল, বারেন্দ্র, স্বঘর। এত যোগাযোগ একসঙ্গে হয় কী করে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকে? সবিতাশ্রী রান্নাঘরে গেলে তাঁর পিছু পিছু সত্যব্রতও গেলেন। নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলেন দুজনে।

সেই ফাঁকে রাজু মুখ তুলে বনশ্রীকে বলল—এভাবেও হয়।

বনশ্রী সিঁড়ির ধাপে বসে ছিল। চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি। এর আগে সে কোনওদিন প্রেমে পড়েনি। আজ একদিনে দুবার পড়ল কি? সে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল—কী?

রাজু ফের স্কেচ করতে করতে বলে—কোথায় যেন পড়েছিলাম। আগে এইভাবে হত। প্রথম যাতায়াত, তারপর খাওয়া-দাওয়া, তারপর—থেমে চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে রাজু ফের বলে—এ ভাবেও হয়।

স্কেচটা শেষ করে পাতাটা ছিঁড়ে চিরশ্রীর হাতে দিল রাজু। কিশোরী মেয়েটির লাবণ্যে ঢলঢল মুখ আলোয় আলো হয়ে গেল নিজের অবিকল ছবি দেখে।

পরের পাতায় রাজু দুটো নিখুঁত বৃত্ত আঁকল পাশাপাশি। তারপর মৃদু একটু হাসল। বনশ্রী একটু ঝুঁকে এল দেখতে। বলল—এটা কী?

—বলুন তো কী?

বনশ্রী তার বিশাল চুলের বোঝা সমেত মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নেড়ে বলে—জানি না তো কী আছে আপনার মনে।

রাজু দুটো বৃত্তকে ভরে দিল স্পোক দিয়ে, আঁকল মাডগার্ড, হ্যান্ডেল, সিট।

বনশ্রী ভ্রূ তুলে বলে—ওমা। একটা সাইকেল!

একটা সাইকেল। অনেকক্ষণ ধরে সাইকেলটাকে টের পাচ্ছে রাজু। খুব দূরে নয়। একটা সাইকেল গাছপালার আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছে। ঝরে পড়া শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কখনও উঁচু নিচু খানা-খন্দে ঝাঁকুনি খেতে খেতে, অপথ কুপথ দিয়ে চলেছে অবিরাম। উৎকর্ণ হয়ে সাইকেলের শব্দ শোনে রাজু। মনের পর্দায় আবছা দেখতে পায় সাইকেলের ছায়া। চোরের মতো, ভয় দ্বিধা লজ্জায় জড়ানো তার গতি। কিন্তু ঘুরছে। অনেকক্ষণ ধরে এ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। একবার, দুবার, তিনবার করে অসংখ্যবার। এক-একবার যেন আবর্তন পথ থেকে সরে যাবে বলে সাইকেলের মুখ ফেরাতে চাইল অন্যদিকে। পারল না। কেন্দ্রাভিগ এক আকর্ষণ টেনে রাখল তাকে।

রাজু সাইকেলের ছবিটা শেষ করে বলে—একটা সাইকেল হলে বহু দূর ঘুরে আসা যেত। একটা সাইকেল কত কাজে লাগে।

বনশ্রী খুব হেসে বলে—সাইকেল চাই বললেই তো হয়। আমাদের বাড়িতে দু-দুটো সাইকেল।

রাজু সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আপন মনে বলে—অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছে সাইকেলটা।

বনশ্রী সামান্য অবাক হয়ে বলে—কে ঘুরছে? কার সাইকেল?

—আছে। বলে উঠোনে নেমে পড়ে রাজু। একটা সাইকেলের ছায়া, মাটিতে চাকা গড়িয়ে যাওয়ার একটা অস্পষ্ট শব্দকে লক্ষ্য করে এগোতে থাকে।

বাড়ির পিছন দিকে মস্ত খড়ের টাল, ধানের গোলা। সবজির খেত। কপিকল লাগানো একটা কুয়ো থেকে কালো একটা মেয়েছেলে জল তুলছিল, অবাক হয়ে দেখল একটু। খেত ডিঙিয়ে রাজু এগোতে থাকে। অনেকটা জমি পার হয়। সামনে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মতো এক ধরনের জঙ্গল।

পিছনে তিরতিরে পায়ে বনশ্রী এগিয়ে আসতে আসতে ডাকে—শুনুন, শুনুন, কোথায় চললেন? ও দিকে পথ নেই যে।

মানুষের ভাষা রাজু বুঝতে পারে না আর। হিলহিলে সরীসৃপের মতো পিছল গতিতে এগিয়ে যায় সে। চোখে বহু দূরবর্তী এক সাইকেলের ছায়া, কানে মৃদু সাইকেলের শব্দ। ঘাসজঙ্গল মুহূর্তে পার হয়ে যায় সে। সামনে শ্যাওলা ধরা ইটের দেওয়াল। খুব উঁচু নয়। বুকে ভর রেখে রাজু দেয়ালের ওপর ওঠে। উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনে।

বনশ্রী ঘাসজঙ্গল ভেদ করে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাকছে—শুনুন, ও মশাই, পড়ে যাবেন যে। কী করছেন বলুন তো?

মাতালের মতো টলতে টলতে সাইকেলটা আসছে। বড় ধীর গতি। ডান দিক থেকে মোড় ফিরে একটা কাঁচা নর্দমা পার হল ঝকাং করে। খানিকটা উঁচু জমি বেয়ে উঠে এল কষ্টে। সাইকেলটার গা ধুলোয় ধুলোটে; পিছনের টায়ারে হাওয়া নেই, তেলহীন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে যন্ত্রপাতির।

একদৃষ্টে সাইকেলটা দেখল রাজু। এত ক্লান্ত সাইকেল সে আগে কখনও দেখেনি। সামনে সাদা ধুলোর পথের ওপর পড়ে আছে চাকার অসংখ্যবার পরিক্রমার ছাপ।

রাজু বিড়বিড় করে বলে—এ ভাবেও হয়।

ভেবে দেখলে কাজটা খুব সহজ নয়। গলায় ফাঁস আটকে টেনে ধরলে মরতে শ্যামশ্রীর দু মিনিট লাগবে। তারপর সিলিং-এর আংটায় ঝুলিয়ে তলায় একটা টুল কাত করে ফেলে রাখলে হুবহু আত্মহত্যার মতো দেখাবে। কিন্তু সন্দেহের উর্ধ্বে কি তবু থাকতে পারবে রেবন্ত? পুলিশ খোঁজ করবে আত্মহত্যা কবুলের চিঠি। আর, আত্মহত্যা করার সময়ে কেউ ঘরের দরজা খুলে রেখে মরে না তো, রেবন্ত বাইরে থেকে কী করে ভিতরে দরজায় খিল দেবে?

একটা হয়, যখন পুকুরে যাবে তখন জঙ্গলে পথটায় যদি মাথায় ইট মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। বাদবাকি রাস্তাটুকু টেনে নিয়ে জলে ফেলে দিলেই হল। পরিষ্কার অ্যাকসিডেন্টের মামলা। অবশ্য শ্যামা সাঁতার জানে, সুতরাং পুলিশের সন্দেহ থেকেই যাবে! মাথার চোটটাই বা গোপন করবে কীভাবে? আর লোকের চোখে পড়ার ভয়ও থেকে যাচ্ছে না? পুকুরঘাট তো বাথরুম নয়।

যদি শ্যামাকে নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে যায় রেবন্ত? খুব উঁচু পাহাড় হবে, খাড়াই। একদম ধারে চলে যাবে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে। শেষ সময়টায় একটু চমকে দিতে হবে ওকে। সতর্কতা হারিয়ে ফেলবে তখন। সামান্য একটু ধাক্কা মাত্র। একটু সাবধান হতে হবে রেবন্তকে, শেষ সময়ে না পড়বার মুহূর্তে তাকে আঁকড়ে ধরে। যে ভাবে মারলে কাজটা অনেকখানি বিপদমুক্ত। খোঁজ খবর কি আর হবে না? রেবন্ত তো হোটেলে নিজের আসল নাম-ঠিকানা লেখাবে না। খোঁজ করে হয়রান হবে পুলিশ।

খবরের কাগজে পড়েছে রেবন্ত, দীঘার সমুদ্রের ধারে কটেজে কয়েকটাই খুন হয়েছে। মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুরুষটা লোপাট। দীঘা খুব দূরেও নয়। যাবে? কিন্তু পুলিশ নয় তার খোঁজ নাই পেল, বাড়ির লোক কিছু জানতে চাইবে না? শ্যামশ্রীর বাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করবে না—শ্যামাকে কোথায় রেখে এলে রেবন্ত? একটা ক্ষীণ উপায় আছে অবশ্য। রেবন্ত রটিয়ে দেবে, শ্যামা আর একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। খুব অবিশ্বাস্য হবে না। ওদের রক্তে চরিত্রহীনতার বদ রক্ত কি নেই? কেন, সেই মাসি, যে বিয়ের আগে ছেলে প্রসব করেছিল?

কিন্তু যত দিক ভেবে দেখে রেবন্ত, কোনও দিকই নিরাপদ মনে হয় না। সন্দেহ থেকে যাবে, বিপদ থেকে যাবে।

কিছু করতেই হবে যে রেবন্তকে! এতদিন বনশ্রী সম্পর্কে তার কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। আজ সকালে অঝোর আলোয় স্বচ্ছ জলের মধ্যে রঙিন মাছের মতো সে দেখেছে বনশ্রীর হৃদয়। এতটুকু সন্দেহ নেই আর। বনশ্রীর এই দুর্বলতাটুকু কতদিন থাকবে তার কোনও ঠিক তো নেই। তাই দেরি করতে পারবে না রেবন্ত।

পটলকে বলবে? ভাবতে ভাবতে ব্রেক কষে রেবন্ত। সাইকেল থেমে টলে পড়ে যেতে চায়। পায়ে মাটিতে ঠেকা দিয়ে রেবন্ত একটু ভেবে মাথা নাড়ে। মেয়েছেলে মারতে চাইবে না পটল। নিজের বউকে ও বড় ভালবাসে। তবে ঝাড়গ্রামের কলাবাগানটা কেনার বড় ইচ্ছে ওর। রাজি হতেও পারে!

প্যাডেলে আবার ঠেলা মারে রেবন্ত। গত রাত্রির জল রোদের প্রচণ্ড তাতে টেনে গিয়ে এখন ধুলো উড়ছে। থেমে গেছে রেবন্ত। মুগার পাঞ্জাবি, সাদা শাল, কাঁচি ধুতির আর সেই জেল্লা নেই। তার মুখ শুকিয়ে চড়চড় করছে এখন। তবে চলেও যেতে পারে না সে। আর একবার বনশ্রীর গভীর দৃষ্টি দেখবে না? আর একবার শিউরে দেবে না ওকে? কী করে চলে যাবে সে? কত সহজেই ওদের বাড়িতে

এতদিন হুটহাট এসে ঢুকে গেছে রেবন্ত, কিন্তু আজ সকালের দুর্বলতাটুকুর পর আর কিছুতেই ফটক পেরোতে পারছে না। এক টান-সুতোয় বাঁধা সে সম্মোহিতের মতো পাক খেয়ে যাচ্ছে কেবল! কখন কোন কাঁটায় লেগে পিছনের চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে, উঁচুনিচু পথহীন জমি, আগাছা, খানাখন্দ দুরমুশ করে চলেছে অবিরাম সাইকেল। বড় ক্লান্ত হয়েছে শরীর। প্রতিবারই মনে হয়, এবার চলে যাব, আর ফিরব না।

চলে গিয়েওছিল রেবন্ত। তেজেনের দোকান অবধি। আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার মুখে মন ডাক দিল—আর একবার দেখে যাই। এরকম কয়েকবারই চলে গিয়ে ফিরে এসেছে রেবন্ত। ঘুরছে আর ঘুরছে। বাগানের অত ভিতরে গভীরে কেন বাড়ি করলে তোমরা বনা? কেন এত দুর্লভ হলে?

ভ্রূ কুঁচকে আনমনে শ্যামার কথা মাঝে মাঝেই ভেবে দেখে সে। না মেরেও হয়। যদি বনশ্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাই? থাক না শ্যামা বেঁচে বর্তে!

সব দিক ভেবে দেখছে রেবন্ত। পালানোও বড় মুখের কথা নয়। চাকরির প্রশ্ন, আশ্রয়ের প্রশ্ন, টাকার প্রশ্ন নেই? ভাবতে হবে। অনেক ভাবতে হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

কাঁচা নর্দমার ওপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সাইকেলের চাকা গেল। নিচু দেয়ালের ওপর দিয়ে বার বার ভিতরবাগে চেয়ে দেখেছে রেবন্ত। শুধু গাছপালা, দূরে একটা কপিকলের মাথা, বাড়ির ছাদ। আর কিছু দেখা যায় না।

উল্টো সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখে সে। যদি শ্যামা না-ই মরে, যদি পালানোও ঘটে না-ই ওঠে, তবে একদিন নির্জনে বনশ্রীকে সম্মোহিত করবে রেবন্ত। হয়তো বাধা দেবে বনশ্রী। সব বাধা কি মানতে হয়? শরীরে শরীর ডুবিয়ে দেবে জোর করে। তখন সুখ। এতদিন এত সহজে এ সব কথা ভাবতে পারেনি সে। কাঁটা হয়ে ছিল কুঞ্জ। ঘাড় শক্ত, রোগা গড়নের তেরিয়া কুঞ্জ। নীতিবাগীশ, অসহ্য রকমের সৎ ও বিপজ্জনক রকমের সমাজ সংস্কারক।

হেসে ওঠে রেবন্ত। বেলুন চুপসে গেল রে কুঞ্জ? শেষে ভাদ্দরবউ? হাঃ হাঃ! হাসতে হাসতে বুঝি চোখে জল এসে যায় তার। শেষে কেষ্টর বউ? বেড়ে! বাঃ! এই তো চাই। জুজুর মতো তোকে ভয় খেতুম যে রে! অ্যাঁ, ভাবতুম যা-ই করি কুঞ্জ ঠিক টের পাবে। কুঞ্জর হাজারটা কান, হাজারো চোখ ঠিক এসে পথ আগলে দাঁড়াবে। গুপ্ত কথা টেনে বের করবে পেট থেকে। শেষে ভাদ্দর-বউ কুঞ্জ? অ্যাঁ!

রেবন্ত মাথা নাড়ে। বড় কষ্টে প্রাণপণে প্যাডেল মেরে একটা উঁচু জমিতে ঠেলে তোলে হাওয়াহীন সাইকেল। কপালের ঘাম মুছবে বলে রুমালের জন্য পকেটে হাত দেয়। তারপরই ভীষণ চমকে যায় সে। সামনের পথের ওপর লাফিয়ে নামল, ও কে? রাজু না?

সাইকেলের হ্যান্ডেল টালমাটাল হয়ে যায়। প্রাণপণে সামনের চাকা সোজা রাখে রেবন্ত। খুব জোরে প্যাডেল মারতে থাকে। সাইকেল ধীরে ধীরে এগোয়।

রেবন্ত শক্ত করে মাথা নামিয়ে রাখে, যাতে চোখে চোখ না পড়ে যায়। হয়তো রাজুর তাঁকে মনে নেই, হয়তো চিনতে পারবে না। রেবন্তও চেনা দেবে না।

তবু বুক কাঁপতে থাকে তার। কাল রাতে অন্ধকারেও তাকে দেখেছিল নাকি রাজু? চিনেছিল? এ পথে ও ফাঁদ পেতে বসে ছিল না তো! দাঙ্গাবাজ ছেলে রাজু। হামলা করবে না তো?

কিন্তু রাজু কিছুই করে না। সাইকেল ওর খুব কাছ ঘেঁষে পেরিয়ে যায়। রেবন্ত মাথা তোলে না। কিন্তু খুব জোরে প্রাণপণে চালাতে থাকে তার সাইকেল। কিন্তু হাওয়াহীন চাকা এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ক্লান্ত শরীরে তেমন টানতে পারে না। ভারী ধীরে চাকা ঘুরছে।

পিছু ফিরে চোর-চোখে চায় রেবন্ত। আবার চমকে যায়। রাজু আসছে একটু লম্বা পায়ে, তার দিকে স্থির চোখ রেখে হেঁটে আসছে রাজু। মন্থর সাইকেলের সঙ্গে সমান গতিবেগ বজায় রেখে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে রেবন্ত। সিট থেকে উঠে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে ধরে প্যাডেল। নির্মম পায়ের লাথিতে দাঁতে দাঁত চেপে সাইকেলটাকে নির্যাতন করে। কিন্তু নিঃশেষ আয়ুর মতো সাইকেলের গতি ক্রমে আরও কমে আসতে থাকে। রাজু এগিয়ে আসছে। খুব জোরে নয়। প্রায় স্বাভাবিক হাঁটার গতিতে। কিন্তু রেবন্তর সাইকেল যেন আজ এক কোমর জলের মধ্যে নেমেছে। এগোয় না, পালাতে চায় না, ধরে দেবে বলে কেবলই পেছিয়ে পড়ে।

রাজু আসছে। রেবন্ত রাস্তায় উঠে মাঠের দিকে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পিচ রাস্তা ধরলে অনেকখানি পথ। অত পথ পেরোতে পারবে না। কোনাকুনি মাঠ পেরোলে খালের সাঁকো পেরিয়ে বাজারে উঠলেই সাইকেল সারাইয়ের দোকান।

রেবন্ত পিছনে তাকায়। রাজু স্থির চোখে চেয়ে সোজা চলে আসছে। আসছেই। যদি ধরতে চায় তবু একটু জোরে পা চালালেই ধরতে পারে। তা করছে না রাজু। সে সমান একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু আসছে।

বহুকাল এমন শরীরে কাঁটা দেয়নি রেবন্তর। মাঠের গড়ানে জমিতে সাইকেল ছেড়ে দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে নামতে নামতে তার মনে হল, এই নির্জন মাঠে রাজুর মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে?

আবার তাকায় রেবন্ত। একই গতিতে রাজু আসছে। তার পিছু পিছু। মাঠের ঢালু বেয়ে ওই নামল। এখনও একটু দূরে। তবে অনেকটা কমে আসছে দূরত্ব।

মাঠের মধ্যে উল্টোপাল্টা হাওয়ায় সাইকেল টাল খায়। বেঁকে যায় হাতল। এগোয় বটে, কিন্তু বড্ড পিছনের টান। কোত্থেকে এল রাজু? কী করে টের পেল সে ওই পথ দিয়ে সাইকেলে আসবে?

রেবন্ত পিছনে আর একবার চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। জোরে চালাতে চেষ্টা করে লাভ নেই। রাজু ঠিক তার পিছনে এসে গেছে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে আলতো করে ছুঁয়ে আছে ক্যারিয়ার।

রেবন্ত ব্রেক চেপে ধরে। নামে। বলে—রাজুবাবু, কেমন আছেন?

রাজু অবাক হয়ে তার দিকে চায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখে তাকে। বলে—আরে! রেবন্তবাবু না?

—চিনতে পারছিলেন না? কাঠ-হাসি হেসে রেবন্ত বলে।

—না তো! আপনাকে লক্ষ করিনি। আমি শুধু সাইকেলটা দেখছিলাম।

— সাইকেল! বলে বুঝতে না পেরে রেবন্ত রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কোন শহুরে চালাকি বাবা!

মায়া ভরে সাইকেলের সিটে হাত রেখে রাজু বলে—সাইকেলের মতো জিনিস হয় না। একটা সাইকেল থাকলে কত দূর চলে যাওয়া যায়!

বড্ড ঘেমে যাচ্ছে রেবন্ত। কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বিপদটা কোন দিক দিয়ে আসবে। সাইকেলের প্রসঙ্গটা একদম ভাল লাগছে না তার। রুমালে ঘাড় গলা মোছে রেবন্ত। ভাববার সময় নেয়। রাজু তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। রেবন্ত অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় চট করে। বলে—এই সাইকেলটাই নিয়ে ঘুরে আসতে পারতেন, কিন্তু এটার পিছনের চাকাটায় হাওয়া নেই যে!

ভারী খুশি হয়ে রাজু বলে—তা হোক, তা হোক। আফটার অল সাইকেল তো!

কথাগুলো যত বুঝতে না পারে ততই মনে এক আতঙ্ক জেগে ওঠে রেবন্তর। রাজু পাগল নয়। ক্ষুরের মতো ওর বুদ্ধির ধার। ওর মুখোমুখি হলেই একটা ঝাঁজ টের পাওয়া যায়। কেমন গুটিয়ে যেতে, লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে জাগে। রেবন্ত তাই বলল—রেখে দিন তা হলে সাইকেলটা। পরে কুঞ্জর বাড়ি থেকে নিয়ে যাব।

রাজু কোনও কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের কথা বলল না। এক ঝটকায় রেবন্তর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সাইকেলটা। ঘুরিয়ে নিয়ে মহানন্দে উঠে বসল সিটে।

রেবন্ত মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখে দৃশ্যটা। কোনও মানে হয় না। রাজু হাওয়াহীন চাকার সাইকেলে মাতালের মতো টলতে টলতে ওই দূরে চলে যাচ্ছে।

রেবন্ত বাজারের দিকে হাঁটতে থাকে। মাথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট দুশ্চিন্তা খামচে ধরেছে হঠাৎ। কোনও মানে হয় না।

১১

শ্যাওলা-ধরা পিছল দেয়ালের একটা খাঁজে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর রেখে উঠে বনশ্রী অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখল। ধূলিধূসর সাইকেলে হা-ক্লান্ত রেবন্ত আর তার পিছু পিছু রাজু। একটা আতা গাছ তার উচ্ছল সবুজ পাতা নিয়ে ঝেঁপে পড়েছে সামনে। তার আড়ালে চলে গেল ওরা।

এত অবাক বনশ্রী যে, ডাকতেও পারল না। রেবন্ত এই অবেলায় বাড়ির পিছনের ছাড়া জমিতে কী করছিল? কেনই বা রাজু বলছিল সাইকেলের কথা?

বনশ্রী পাঁচিল থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ফটকের দিকে যেতে থাকে। একটা কিছু হবে, একটা কিছু ঘটবে, তার মন বলছে।

ফটকের বাইরে এসে একই দৃশ্য দেখতে পায়। একটু দূরে খুব ধীরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে রেবন্ত। পিছনে রাজু। রেবন্ত মাঝে মাঝে ফিরে দেখছে রাজুকে।

এত দূর থেকে ডাকলে রাজু শুনতে পাবে না। বনশ্রী তাই দ্রুত পায়ে এগোতে থাকে। তাড়াহুড়োয় চটি পায়ে দিয়ে আসেনি, কাঁকর ফুটছে, ব্যথা লাগছে বড্ড। তবু বনশ্রী হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় মাঠের ধারে শিমুল গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঠের মাঝখানে সাইকেলের দুদিকে দুজন দাঁড়িয়ে। কী কথা হচ্ছে ওদের? মারামারি হবে না তো! ভাবসাব বড় ভাল লাগে না বনশ্রীর। বুকটা কেঁপে ওঠে।

মাঠে নামতে ঢালুতে পা বাড়িয়েছিল বনশ্রী, হঠাৎ দেখল রাজু সাইকেলটা কেড়ে নিয়েছে রেবন্তর কাছ থেকে। বহু দূরে মাঠের মধ্যে একা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে রেবন্ত। রাজু টলমল করে বাচ্চা ছেলের মতো চালিয়ে আসছে সাইকেল। মুখে উপচে পড়ছে হাসি। একটু চেয়ে থেকে রেবন্ত মুখ ফিরিয়ে হাঁটা দিল। ক্রমে মিলিয়ে গেল অজস্র ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে। ব্যাপারটা মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না বনশ্রী।

রেবন্ত চলে গেলে বনশ্রী তরতর করে নেমে আসে খোলা মাঠের মধ্যে। রাজু এখনও অনেকটা দূরে। হাত তুলে বনশ্রী ডাকে—এই যে শুনুন, শুনছেন? এই যে!

রাজু টলমলে সাইকেলে আসতে আসতে খোলা মাঠের মধ্যে হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গিয়ে চক্কর খায়। আবার এগিয়ে আসে। কী ভেবে আবার উল্টোবাগে ঘুরে দূরে চলে যেতে থাকে।

আচ্ছা পাগলা! বনশ্রী ডান হাতখানা তুলে ব্যাকুল হয়ে ডাকে—শুনুন, শুনুন, ও মশাই, শুনছেন? স্নান করবেন না? খিদে পায় না আপনার?

রাজু আবার ঘুরে গেল অন্য দিকে। বনশ্রী আবছা শুনতে পায় সাইকেলে বসে রাজু গান গাইছে—ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বড্ড বাঁধন-ছেঁড়া, বড্ড অবাধ্য লোক তো! বনশ্রী দাঁতে দাঁত চাপে। রাগে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লঘু পায়ে ছুটে যায় সে। কোথায় পালাবে লোকটা? পালাতে দেবে কেন বনশ্রী?

ধীর সাইকেলে কিছু দূর চলে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে আসতে থাকে রাজু। যেন জীবনে প্রথম সাইকেল শিখছে।

বনশ্রীর মুখ লাল। ঘামে ভেজা, চুলের ঝাপটা এসে পড়েছে কপালে। সাইকেলের পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে বলে—এটা কী হচ্ছে শুনি!

রাজু বনশ্রীর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। হঠাৎ হ্যান্ডেল ছেড়ে দুহাত তুলে চেঁচায়—ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী হ্যান্ডেল ঠেলে ধরে। সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে। রাজু ফের টেনে তোলে সাইকেল। গম্ভীর মুখে বলে—এটা নিয়ম নয়।

বনশ্রী হাসে—আমি নিয়ম মানি না।

কাতর স্বরে রাজু বলে—সবাই দুয়ো দেবে যে!

অবাক বনশ্রী বলে—কীসের জন্য দুয়ো দেবে?

রাজু মাথা নেড়ে বলে—সাইকেল থামাতে নেই। অবিরাম চলবে। অবিরাম। ঝিলমিল...ঝিলমিল...ঝিলমিল...

বনশ্রী বাধা দিতে ভুলে যায়। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাজু হাওয়াহীন চাকার ধীরগতি সাইকেলে উঠে ভারী কষ্টে প্যাডেল ঠেলতে থাকে।

মাটির নীচে প্যাচপ্যাচে জল, কাদামাখা ঘাস, পিছল জমি হাওয়াহীন চাকাটাকে টেনে ধরে বার বার। গভীর চাকার দাগ বসে যেতে থাকে মাটিতে। সাইকেল ধীরে ধীরে চক্কর দেয়।

বনশ্রীর গা শিউরে ওঠে হঠাৎ। সে দেখে, রাজুর সাইকেল তাকে মাঝখানে রেখে বার বার ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে।

নিজের রোগলক্ষণ খুব ভাল চেনে কুঞ্জ। বুকে ধীরে ধীরে জল জমছে। জ্বর বাড়ছে। অপঘাতের জন্য তাকে হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। শুধু নিজেকে একটু ঠেলে দিতে হবে মৃত্যুর গড়ানে ঢালুর ওপর দিয়ে। যখন গড়িয়ে যাবে তখন কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা না করলেই হল! আজ দুপুরে খুব ঠাণ্ডা হিম পুকুরের জলে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে স্নান করবে সে। পেট পুরে খাবে ভাত, ডাল, অম্বল। হইহই করে জ্বর বেড়ে পড়বে বিকেলের দিকে। ভাবতে ভাবতে কুঞ্জ একটু করে হাসে, আর শুকনো ঠোঁট চিরে রক্ত গড়িয়ে নামে।

তেল মেপে পয়সা গুনে নিয়ে তেজেন ফিরে এলে চৌকিতে উবু হয়ে বসে বলে—মাতালের কথা কে ধরছে বলো। কত আগড়ম বাগড়ম বলে। বাজারের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে তোমাকে আর ওর বউকে নিয়ে অত যে খারাপ খারাপ কথা চেঁচিয়ে বলল তা কে বিশ্বাস করছে? তারপর আমার দোকানেই তো সব এল ভিড় করে। হাসাহাসি কাণ্ড।

—কাল কি পরশু রাতে ঘটনাটা আমাকে বলিসনি কেন তেজেন? সারা বাজার জানল, কিন্তু আমার কানে কেউ তুলল না।

তেজেন খুব সান্ত্বনার স্বরে বলে—ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামিয়েছে নাকি? রোজই কোনও না কোনও মাতালের মাতলামি শুনছে সবাই। গুরুত্বই দেয়নি কেউ। আর তোমাকে ও সব কথা বলতে লজ্জা না? বলে কেউ? আজ তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে বললাম। তুমি ভেবো না, ও সব কেউ মনেও রাখেনি, বিশ্বাস তো দূরের কথা।

কুঞ্জ আস্তে করে বলে—মানুষ ঘেঁটে বড় হলাম রে তেজেন। মানুষের নাড়ি আমি চিনি। ভাল কথা ঢাক বাজিয়ে বললেও মনে রাখে না, মন্দ কথা ফিসফিসিয়ে বললেও মনে গেঁথে রাখে। সবাই না হোক, কিছু লোক কি ভাববে না, হতেও পারে কুঞ্জ এরকম!

—দূর দূর! পাগল ছাড়া কে ভাববে অমন কথা? তোমাকে নিয়ে ও সব ভাবা যায়, বলো? কুঞ্জনাথ নামটার মানেই দাঁড়িয়ে গেছে ভদ্রলোক।

কুঞ্জ মাথা নাড়ে। সে জানে। চোখ জ্বালা করে জল আসে তার। মরতেই হবে, তাকে মরতেই হবে। মহৎ এক মৃত্যুর বড় সাধ ছিল কুঞ্জর। হাজার জন জয়ধ্বনি দিতে দিতে নিয়ে যাবে তাকে শ্মশানে। দলের ফ্ল্যাগে ঢাকা থাকবে তার মৃতদেহ। চন্দন কাঠের চিতায় পুড়বে সে। কত মানুষ চোখের জল ফেলবে! রেডিয়োতে বলবে, খবরের কাগজে বেরোবে, জায়গায় জায়গায় শোকসভা হবে। এখন আর তা আশা করে না কুঞ্জ। না, মৃত্যুটা তেমন মহৎ হবে না তার। তবু মৃত্যু তো হবে। সেটা ভেবে বুক থেকে শ্বাস হয়ে একটা ভার নেমে যায়।

তেজেনের দোকান থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকটায় একটু চেয়ে থাকে কুঞ্জ। জমজমাট বাজার। দর্জিঘর, শুকনো নারকোলের ডাঁই নিয়ে বসে আছে ব্যাপারিরা, শীতের সবজির দোকানে দোকানে থলি হাতে লোক। খুব ফটফটে রোদে সব স্পষ্ট পরিষ্কার। তবু এর ভিতরে ভিতরে উইপোকার সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকারের নালী ঘা ছড়িয়ে রয়েছে। বাজার ইউনিয়নের সেক্রেটারি কুঞ্জনাথ তাকিয়ে থেকে বুকভাঙা আর একটা শ্বাস ফেলল। সেই শ্বাস বলে উঠল—ওরা জানে।

জীবনে এই প্রথম মুখ নিচু করে হাঁটে কুঞ্জ। তার শক্ত ঘাড় ব্যথিত হয়ে ওঠে। তবু কুঁজো হয়ে নিজের পায়ের কাছে মাটিতে মিশে যেতে যেতে সে হাঁটতে থাকে।

মাথায় নীল রঙের ক্র্যাশ হেলমেট, চোখে মস্ত গগলস পরা মামাতো ভাই নিশীথ তার নতুন কেনা স্কুটারে বোঁ-চক্কর দিয়ে এসে খবর দিল—মেলা ঘর পড়ে গেছে। অযোধ্যা, অনন্তপুর, নারকেলদা থেকে বহু লোক বউ-বাচ্চা নিয়ে এসে বাজারে থানা গেড়েছে। যাবে না কুঞ্জদা? মাতব্বররা সব

তোমার জন্য হাঁ করে বসে আছে যে!

বাইরের ঝড়ে কতটা ভাঙচুর হয়েছে তা ভাল করে দেখতে পায় না কুঞ্জ। সে সারাক্ষণ দেখছে তার ভিতরে মূল সুদ্ধ উপড়ে পড়েছে গাছ, উড়ে গেছে ঘরের চাল। ডিসপেনসারির বারান্দায় বিবশভাবে বসে নিজের ভাঙচুর দেখছিল কুঞ্জ।

—চল। বলে উঠতে গিয়ে কুঞ্জর মাথাটা আবার টাল্লা খায়। ডান বুকের ভিতরে একটা রবারের বল ভেসে উঠছে, ফের নেমে যাচ্ছে বার বার। রোগলক্ষণ চেনে কুঞ্জ। স্কুটারের পিছনে বসে বাজারের দিকে যেতে যেতে বার বার ঝিমুনি আসছিল তার। মনে হচ্ছিল, একটা ঢালুর মুখে গড়িয়ে যাচ্ছে সে।

মেলা কাদা মাখা, জলে ভেজা বিপর্যস্ত মানুষ, বাজারের পুব ধারে নিজেদের রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে। শুকোচ্ছে ন্যাংটো আধ ন্যাংটো বাচ্চারা, কাঁথাকানি, মাদুর, চাটাই, পরনের কাপড়, শুকোচ্ছে মেয়েদের তেলহীন মাথার কটাসে রঙের চুল। তেজেনের দোকানঘরে পঞ্চায়েতের মাতব্বররা উদ্বিগ্ন মুখে বসে। কুঞ্জকে দেখে তারা শ্বাস ছাড়ে—ওই কুঞ্জ এসে গেছে! ক্লাবের ছেলেরা জড়ো হয়েছে বিস্তর, কিন্তু মাতব্বরদের তারা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। কী করতে হবে, কার হুকুমে কে চলবে তা নিয়ে কোনও মীমাংসাও হচ্ছিল না।

কুঞ্জ আর নিজের শরীরটাকে টের পেল না অনেকক্ষণ। বাজারে তোলা তুলতে বেরিয়ে পড়ল ছেলেছোকরাদের নিয়ে। একদল গেল নারকেলদা, আর একদল গেল পুবপাড়া, অযোধ্যা, তেঁতুলতলা মুষ্টিভিক্ষা জোগাড় করতে।

বাজারের চালাঘর প্রায় সব কটাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তারই বাঁশ খুঁটি দিয়ে মস্ত উনুনে শ দেড়েক লোকের আন্দাজ খিচুড়ি চাপাতে বেলা হয়ে গেল বেশ।

মহীনের দর্জিঘরের সামনে আতা গাছের ছায়ায় একটা টুল পেতে বসে কুঞ্জ খুব কষ্টে দম নেয়। পোড়া কাঠের ধোঁয়া আর তেল-মশলা ছাড়া খিচুড়ির ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। অনেক বেলা হবে বটে তবু লোকগুলো খেতে পাবে—এই ভেবে কুঞ্জ এক রকম তৃপ্তি পাচ্ছিল। পপুলারিটির কথাটা ক্ষণে ক্ষণে আজও হানা দিচ্ছে বুকের দরজায়। এই তো তোলা আদায় করতে গিয়ে ঘুরে দেখল, সে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষ এখনও না করতে পারে না। কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কখনও করে না সে, কারও আঁতে ঘা দিয়ে বা অহংকারে আঘাত করে কথা বলে না, কাউকেই কখনও খামোখা চটিয়ে দেয় না, তোয়াজে সোহাগে সেবা দিয়ে সে মানুষকে অনেকটাই অর্জন করে রেখেছে। তাই আজও কারও কাছে গিয়ে হাত পাততে তার বাধে না। পাতলে পায়ও সে অঢেল। আর এই করে করেই সে কুঞ্জ, এক এবং অদ্বিতীয় কুঞ্জ। হয়তো এখনও তার সবটুকু শেষ হয়ে যায়নি।

ভাবতে ভাবতে দর্জিঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজেছিল কুঞ্জ। অমনি যেন কোত্থেকে কেষ্ট এসে সামনে দাঁড়াল। লাল চোখ, উলো-ঝুলো চুল, বিকট মুখ। বলল— তা বটে। তুমি হলে এ তল্লাটের মস্ত মাতব্বর কুঞ্জনাথ। তবে কী জানো বড় মানুষের দিকেই সকলের চোখ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। নজর রাখে, লোকটা দড়ির ওপর ঠিক মতো হাঁটতে পারছে কি-না। নাকি টাল খাচ্ছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কিংবা পড়েই গেল নাকি। উঁচুতে উঠলে তাই সবসময়ে পড়ার ভয়। আমাদের মতো মদো মাতাল বদমাশ যত যাই করি লোকে তেমন মাথা ঘামায় না। কিন্তু তুমি হলে কুঞ্জনাথ, তুমি পড়লে লোকে ছাড়বে কেন? বড় মানুষ পড়লে লোকের ভারী আনন্দ হয়। বড় মানুষের গায়ে থুথু দেওয়ার আনন্দ, বড় মানুষের গায়ে লাথি দেওয়ার আনন্দ।

একটা বিলি-ব্যবস্থা হয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে মাতব্বররা যে যার রওনা দিচ্ছে। নেত্য সাঁপুই এসে কুঞ্জর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বলল—পোয়াতি বউটা তোমার জন্যই প্রাণে বেঁচে গেল এ যাত্রা। গোপাল ডাক্তারও বলছিল, কুঞ্জ না থাকলে কেষ্টর বউয়ের হয়ে গিয়েছিল।

মড়ার চোখে কুঞ্জ তাকায়। শুকনো ঠোঁটে একটু হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে রক্তের নোনতা স্বাদ ঠেকে জিভে। সবাই জানে, নেত্য সাঁপুইয়ের পোষা ভূত আছে। এ তল্লাটের লোকের যত গুহ্য আর গুপ্ত কথা, যত কেলেঙ্কারি আছে তার সব খবর এনে দেয় নেত্যকে। নেত্য বাতাস শুঁকে টের পায় কোথায় মানুষের পচন ধরেছে, নিশুত রাতে কার ঘরে কে যায়, কোথায় ইধার কা মাল উধার হয়।

কুঞ্জ চোখ নামিয়ে নেয়।

নেত্য আফশোসের গলায় বলে—বাড়ি যাও। কাল সারাটা রাত জেগে কাটিয়েছ।

কুঞ্জ ওঠে। নেত্য সঙ্গ ধরে আসতে আসতে বলে—বউটা রক্ষে পেল সেইটেই এখন মস্ত সান্ত্বনা। তুমি বুক দিয়ে না পড়লে বাঁচত না। গলাটা খাটো করে নেত্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—কাল সাঁঝবেলায় বড় মাঠে নাকি কারা হামলা করেছিল তোমার ওপর। বলনি তো?

কুঞ্জ উদাস স্বরে বলে—ও কিছু নয়। চোর-টোর হবে, আমাদের দেখে পালিয়ে যায়।

—কেষ্টর কোনও খোঁজ পেলে?

—খোঁজ করিনি।

নেত্য খুব রাগ দেখিয়ে বলে—খোঁজ নেওয়া উচিতও নয়। পাষণ্ড একেবারে। মুখেরও লাগাম নেই।

শীতটা হঠাৎ ভারী চেপে ধরে কুঞ্জকে। নেত্যর শেষ কথাটায় একটু ইঙ্গিত আছে না? মুখের লাগাম নেই—কথাটার মানে কী?

নেত্য সাঁপুইয়ের মুখের দিকে আর তাকাল না কুঞ্জ, বাঁ ধারে ঢালুতে নেমে যেতে যেতে বলল—চলি নেত্যদা, শরীরটা ভাল নেই।

নেত্য চেঁচিয়ে বলে—এসো গিয়ে।

খালপোলে উঠতে গিয়ে এতক্ষণ বাদে কুঞ্জ আবার তার শরীরটাকে টের পায়। গা ভরে জ্বর আসছে। বুকের ব্যথা চৌদুনে উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। শ্বাসকষ্ট চেপে ধরছে কণ্ঠা। দুপুরের সাদা রোদকে হলুদ দেখাচ্ছে চোখে। পুরো রাস্তাটা হেঁটে পার হওয়া যাবে না। কুঞ্জ সাঁকোর ধারে দুর্বল মাথা চেপে উবু হয়ে বসে পড়ে। সুযোগ পেয়ে কেষ্ট যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, দাঁত কেলিয়ে হাসে, বলে—মানুষ পচলে তার গন্ধ বেরোবে না? তোমাকে যে পচায় ধরেছে তা আপনি ছড়িয়ে পড়বে। ও কি ঠেকানো যায়? আমার মুখের কথা বলে লোকে হয়তো প্রথমটায় তেমন বিশ্বাস করবে না, ভাববে কুঞ্জনাথ কি কখনও এ রকম হতে পারে? কিন্তু ধীরে ধীরে পচা গন্ধ ছড়াবে ঠিকই।

সাবিত্রীকে বলে এসেছিল কুঞ্জ, মরবে। মৃত্যুর একটা গহীন গড়ানে ঢালু উপত্যকা এখন তার সুমুখেই। যদি এখন নিজেকে একটু ঠেলে দেয় কুঞ্জ, যদি কোনও কিছু আঁকড়ে না ধরে তবে গড়াতে গড়াতে ঝম করে পড়ে যাবে নীচে, যেখানে মায়ের মতো কোল পেতে আছে শমন। নিজের রোগলক্ষণ চেনে সে। ডান বুকে জল জমছে। ব্যথা জ্বর। আজ ফিরে গিয়ে পুকুরে হিম ঠাণ্ডা জলে খুব ডুবে ডুবে স্নান করবে কুঞ্জ। ভাত খাবে। রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে। নিজেকে একটু ঠেলে দেওয়া মাত্র।

মুখ তুলে সে তনুকে দেখতে পায় মনের মধ্যে। ভারী জলজ্যান্ত দেখতে পায়। বলে, তনু, একদিন তুমিও তো জানতে পারবে কুঞ্জদাকে যা ভাবতে তা সে নয়।

তনু করুণ মায়াভরা চোখে চেয়ে বলে, আমি তো তোমাকে কখনও ভুলিনি কুঞ্জদা। ঘর-সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থাকি তবু এক মুহূর্ত আমার মন তোমাকে ছাড়া নয়। তবে তুমি কী করে ভুললে আমাকে? অন্য মেয়ে, পরের বউ—তাকে কী করে চাইলে?

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে, সাবিত্রীকে তো আমার মন চায়নি তনু, শরীর চেয়েছিল। আমার শরীর এঁটো হয়েছে, মন নয়। ঠিক তোমার যেমন।

খালধারে মজন্তালির বাড়ি। কুঞ্জকে দেখে বেরিয়ে এল—কী গো, বসে পড়লে যে। শরীর ভাল তো?

কুঞ্জ মাথা নাড়ে—ভালই।

বলে উঠে দাঁড়ায়। মাথা টলমল করছে। দুপুরের রোদে কাঁচা হলুদের রং দেখছে সে। আর চারদিকটা কেমন যেন থিয়েটারের সিনসিনারির মতো অবাস্তব। কুঞ্জ হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, সে যেন কল্পনার রঙে ডোবানো অদ্ভুত এক স্বপ্নের মতো জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে। চারদিকটা গভীরভাবে অবাস্তব, অপ্রাকৃত পরীর রাজ্য যেন। ঝিম ঝিম নেশার ঘোরের মতো জ্বর উঠছে তার। ফিরে যাবে নাকি? রিকশা ধরে নিতে পারবে বাজার থেকে কিংবা নিদেন কারও সাইকেলে সওয়ার হতে পারবে।

একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। তারপর ভাবে, নিজেকে সেই গহীন খাদটার দিকে একটু একটু করে ঠেলে দেওয়াই ভাল। সে ফেরে না। বড় মাঠের দিকে এগোতে থাকে।

মস্ত বাঁশবন সামনে। সামনের মেঠোপথে কাঁচা হলুদ রোদে ঝলকানি তুলে কে যেন বাঁশবনের মধ্যে ঢুকে গেল কুঞ্জকে দেখে। চোখের ভুল নয় তো। এক ঝলক দেখা, তবু চেহারাটা কি চেনে না কুঞ্জ? বড় শ্বাসের কষ্ট বুকে। কুঞ্জ একবার বুকটা হাতের চেটোয় চেপে ধরে। বড় করে শ্বাস নেয়। চারদিকে এক অদ্ভুত রঙিন আলোয় অবাস্তব দৃশ্য দেখতে পায় সে। কানে ঝিমঝিম করে ঝিঁঝির ডাক বেজে যাচ্ছে। তবু বাঁশবনের অন্ধকারে ঝরা পাতার ওপর সাবধানী পা ফেলার আওয়াজ ঠিকই শুনতে পায় সে।

মেঠো পথ ছেড়ে কুঞ্জ বাঁশবনের ছায়ায় ঢুকে যায়। সামনে পথ বলে কিছু নেই। রোগা রোগা অজস্র ফ্যাঁকড়া বের করে বাঁশবন পথ আটকায়। কুঞ্জ গুঁড়ি মেরে ঢোকে ভিতরে। ভিতরে চিকড়ি-মিকড়ি আলো-ছায়া। পায়ের নীচে গতকালের বৃষ্টির জল, পচা পাতা। একটা লম্বাটে ছায়া নিচু হয়ে সরে যাচ্ছে পুব দিকে।

—রেবন্ত। চাপা স্বরে ডাকে কুঞ্জ।

ছায়াটা দাঁড়ায়।

কাতর স্বরে কুঞ্জ বলে—দাঁড়া রেবন্ত। চলে যাস না।

বাঁশবনে বাতাসের শব্দ হয় হু হু করে। পচাটে কটু গন্ধ উঠছে।

রেবন্ত গম্ভীর গলায় বলে—কী বলবি?

ধীরে ধীরে বাঁশ গাছের অজস্র কুটিকাটি ডালপালা সরিয়ে এগোয় কুঞ্জ। গালে মুখে চোখে খোঁচা খায়। তার চাদর ধুতি আটকে যায় বার বার। বলে—আমি মরলে কি ভাল হয় রেবন্ত?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—তার আমি কী বলব?

কুঞ্জ প্রাণপণে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে ছায়াটার দিকে এগোয়। বলে—তুই বড় নষ্ট হয়ে গেছিস রেবন্ত। আমিও। আমরা মরলে কেমন হয়?

রেবন্ত চুপ করে থাকে। প্রায় হাত পনেরো তফাতে রেবন্তকে প্রায় স্পষ্ট দেখতে পায় কুঞ্জ। গায়ে শাল, মুগার পাঞ্জাবি, ধুতি। এলোমেলো চুল। বড় সুন্দর দেখতে।

কুঞ্জ বলে—দাঁড়া রেবন্ত। পালাস না।

রেবন্ত খুব অবহেলাভরে বলে—পালাব কেন? তোর ভয়ে?

কুঞ্জ হাসে। বলে—আজ আর আমাকে ভয় পাস না রেবন্ত?

—না।

—আগে পেতিস না?

—কোনওদিনই তোকে ভয় পেতাম না।

কুঞ্জ গর্জন করে ওঠে—পেতিস না? সত্যি করে বল পেতিস না? তোর সব জানি রেবন্ত। সত্যি করে বল!

খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল কুঞ্জ। রেবন্ত মুখ ঘুরিয়ে লম্বা পায়ে একটা ফাঁকা জমি পেরিয়ে আর একটা ঝোপের আড়ালে চলে যায়। বলে—ওইসব ভেবেই আনন্দে থাক। তবে জেনে রাখিস তোকে কেউ ভয় পায় না। ভয় পাওয়ার মতো কী আছে তোর?

কিছু নেই। কুঞ্জ জানে, আর কিছু নেই। থমকে দাঁড়ায় সে। সামনেই যেন কেষ্ট একটা লম্বা বাঁশ বেয়ে নেমে এসে তাকে হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখায়। বলে—তুমি তো আর দাদা নও। তুমি হচ্ছ আমার বউয়ের নাঙ। লোকে জানবে তুমি আর কিছু পেল্লাদ নও, আমরা পাঁচজন যেমন দোষে-গুণে তুমিও তেমনি।

—দাঁড়া রেবন্ত। শোন!

রেবন্ত দাঁড়ায়।

কুঞ্জ বাঁশবনের মাঝখানটায় ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। ভারী নির্জনতা। খাড়া রোদ পড়েছে মুখে। ঝোপের আড়ালে রেবন্ত ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে। বলে—বল।

কুঞ্জ ক্লান্ত স্বরে বলে—অমি যদি মরি তা হলে তো দোষ কাটবে। তখনও কি আমার বদনাম করবি রেবন্ত?

রেবন্ত জবাব দেয় না।

কুঞ্জ আর এগোয় না। উবু হয়ে বসে নিজের টলমলে মাথাটা দু-হাতে ধরে থেকে বলে—আমি একটু ভালভাবে মরতে চাই। দিবি মরতে সেভাবে? একটু সম্মান নিয়ে, একটু ভালবাসা নিয়ে। সাবিত্রীর কথা রটাস না রেবন্ত। পটলকে বলিস আমি সন্ধের পর বড় মাঠে আসব। তৈরি থাকে যেন।

রেবন্ত জবাব দেয় না। বাঁশবনের ছায়ায় ছায়ায় তার লম্বা শরীরটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। ঝরা পাতার ওপর পায়ের শব্দ হয় অস্পষ্ট।

১২

খাওয়ার পর ভিতরের বারান্দায় সাইকেলটা কাত করে ফেলে চাকার ফুটো সারাতে বসেছে রাজু। হাতের কাছে বড় কাঁচি, রবারের টুকরো, সলিউশনের টিউব, রবার ঘষে পাতলা করার জন্য ঝামা, হাওয়া ভরার পাম্প। অভ্যেস নেই বলে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না। শুভশ্রী করুণাপরবশ হয়ে এসে বলেছিল—দিন না রাজুদা, আমি সারিয়ে দিচ্ছি। রোজ সারাচ্ছি, আমার অভ্যেস আছে।

রাজু রাজি হয়নি—না, তুমি বরং দূরে বসে ডিরেকশন দাও।

বাইরের কোনও ছেলে বহুকাল ভিতরবাড়িতে ঢুকে এমন আপনজনের মতো ব্যবহার করেনি। সবিতাশ্রীর মুখে তাই মৃদু একটু স্মিত ভাব। বললেন—আমার জামাই বড় বাবু মানুষ। বিয়ের সময় এই দামি সাইকেল যৌতুক দিয়েছিলুম। বেশি দিনের কথা তো নয়, দ্যাখো কেমন দশা করেছে! একটু কিছু গোলমাল হলেই দোকানে দিয়ে আসে। গান্ধীজি চাইতেন নিজেদের কাজ নিজেরা করতে যেন আমরা লজ্জা না পাই। এই যে তুমি কলকাতার বড় ঘরের ছেলে, কেমন বসে বসে সাইকেল সারাচ্ছ—এই ছবিটাই কী সুন্দর!

রাজু মৃদু হাসে শুধু।

সত্যবাবু তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে দৃশ্যটা দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে। সবিতাশ্রী তাঁকে জলের জগ দিয়ে আসতে গেলে তিনি আনন্দের স্বরে বললেন—ছোকরার রোখ দেখেছ! এ জীবনে যে আরও কত উন্নতি করবে! কুঞ্জকে আজ বিকেলেই বলব, বনার সঙ্গে জোড় মেলাতেই হবে।

মা বাবার মনের ভাব টের পেতে খুব বেশি দেরি হয়নি বনশ্রীর। তাই আর রাজুর সামনে আসেনি লজ্জায়। ঘরে শুয়ে সে একটা খোলা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে আছে। কতবার যে পড়ল পাতাটা। একটা অক্ষরেরও মানে বুঝল না।

রবিবারের দুপুর। শুভশ্রী ক্লাবে গেল ক্রিকেট খেলতে। বাবা শুলেন। মা বসলেন সেলাই নিয়ে। রাজুর অদূরে শুধু ডগমগ চোখে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিল চিরশ্রী। সে মুগ্ধ, সম্মোহিত। অবশেষে সেও গঙ্গা-যমুনা খেলতে যায়।

দ্বিধা জড়ানো পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে বনশ্রী। বলে—হল?

রাজু মুখ তোলে। একটু হাসে। মাথা নাড়ে।—না।

—কী অদ্ভুত মানুষ। ওই সাইকেলটা না হলেই চলছিল না? বাড়িতে দু-দুটো সাইকেল ছিল যে?

রাজু মৃদু হেসে বলে—এই সাইকেলটার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু জেনে নেওয়ার আছে।

বনশ্রী হেসে ফেলে। বলে—মাথায় পোকা।

রাজু গম্ভীর মুখে চায়। ফের মুখ নিচু করে ঝামা দিয়ে রবার ঘষে পাতলা করতে করতে বলে—এই সাইকেলটারও কিছু বলবার আছে। শুনতে জানা চাই। সব জিনিসের মধ্যেই ঘটনা প্রবাহ, চেতনা আর চিন্তার কিছু ছাপ থেকে যায়। নইলে গ্রামোফোনের নিষ্প্রাণ রেকর্ড কি গান ধরে রাখতে পারত?

বনশ্রী তর্ক করল না। কেনই বা করবে? সে এ রকম কথা জন্মে শোনেনি। এ সব কথার প্রতিবাদ করারও কিছু নেই তো! শুনতে বেশ লাগে। হতেও তো পারে!

বলল—আমাকে শেখাবেন?

রাজু রবারে সলিউশন লাগিয়ে টিউবের ফুটোয় চেপে ধরে বলে—কী?

—কী ভাবে সাইকেলের কথা বোঝা যায়।

রাজু ঘাড় কাত করে বলে—শেখাব।

টিউবের ফুটো বন্ধ হয়ে গেল অবশেষে। রাজু সাইকেল দাঁড় করিয়ে হাওয়া ভরে। ক্রমে টনটনে হয়ে ওঠে চাকা। বড় উঠোনটায় সাইকেলটাকে একটা চক্কর দিয়ে এনে বারান্দায় পা ঠেকিয়ে দাঁড় করায় রাজু। বলে—চমৎকার।

জড়ো করা হাঁটুতে থুঁতনি রেখে চেয়ে স্মিত হাসে বনশ্রী। বলে—সাইকেল কী বলল?

রাজু হাসে একটু—সাইকেল বলল, রাজু, আজ সকালেও আমি রেবন্তর ছিলুম, এখন তোমার।

বনশ্রী চোখ বড় করে বলে—আপনার মানে? জামাইবাবুকে সাইকেল ফেরত দেবেন না নাকি আপনি?

রাজু মৃদুস্বরে বলে—কথাটা তো আমার নয়। সাইকেলের। সাইকেল হয়তো ভুল বলছে, কিন্তু বলছে।

—আর কী বলছে?

রাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে—সব কিছু কি সহজে বোঝা যায়? আরও অনেক কিছু বলার আছে এর। ধীরে ধীরে বলবে।

রাজু আবার ধীর গতিতে সাইকেল ছাড়ে। উঠোনে চক্কর দিতে থাকে আস্তে আস্তে।

বনশ্রী জিজ্ঞেস করে—কী বলছে?

রাজু ভ্রূ কুঁচকে বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি জানতে চাই ভরদুপুরে এই সাইকেলটা কেন আপনাদের বাড়ির চারদিকে চক্কর মারছিল।

বনশ্রীর মুখে ধীরে একটা ছায়া নামে। সে মৃদুস্বরে বলে—আমি জানি না।

রাজু মৃদু হাসে—আপনার কাছে জানতে চায়ওনি কেউ। সাইকেলই বলবে।

বনশ্রী হঠাৎ তার বিশাল চোখে চেয়ে বলে—ওটা অলক্ষুণে সাইকেল। আপনি ওতে আর চড়বেন না। নামুন শিগগির! নেমে আসুন!

আত্মবিস্মৃত বনশ্রী বারান্দার প্রান্তে এগিয়ে আসে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে ঝুঁকে বলে—আর কিছুতেই না। সাইকেলের কথা বুঝবার দরকার নেই আমাদের।

রাজু চেয়ে দেখে, সকালে যে লোকটা আয়নার আলো ফেলার মতো করে নিজেকে দূর থেকে বনশ্রীর মুখে প্রক্ষেপ করছিল বার বার সে লোকটার দম ফুরিয়েছে। রূপমুগ্ধ সেই অন্যমনস্কতা কেটে গেছে বনশ্রীর।

রাজু সাইকেল থেকে নামে। একটু ভেবে বলে—আমারও তাই মনে হয়। সাইকেলের কাছ থেকে আর কিছু না জানলেও আমাদের চলে যাবে।

বেলা ঢলে পড়ছে। গাছগাছালির রূপময় ছায়া উঠোনে নকশা ফেলে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দূরে কুয়োয় বালতি ফেলার শব্দ হল ছপ। একটা কোকিল শিউরে উঠল নিজের ডাকে।

সাবিত্রী পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা। আবার ও-পাশ ফিরল। বড্ড যন্ত্রণা!

ডাকল—টুসি! ও টুসি!

কেউ সাড়া দিল না।

বড় অভিমান হল, বড় একা লাগল সাবিত্রীর। শিয়রের জানালায় রোদ মরে এল। মহানিমের গাছে কুলকুল করে পাখি ডাকছে হাজারে-বিজারে।

সাবিত্রী শিয়রের জানালার দিকে তাকায়। ও পাশে কেউ নেই, জানে। তবু খুব কষ্টে উঠে বসে সাবিত্রী। জানালার দিকে চেয়ে বলে—আপনার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কোথায় আপনি?

বলে কান পেতে থাকে সাবিত্রী। পায়ের দিকের জানালা দিয়ে হু হু করে উত্তুরে বাতাস এসে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বয়ে যায়।

সাবিত্রী বলে—এরা কেবল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে আমাকে। আবার হয়তো এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। কোথায় আপনি?

কেউ নেই।

সাবিত্রীর চোখ ভরে জল আসে। বড় অভিমান। বলে—নিজেকে কক্ষনও খারাপ ভাববেন না। লোকে বলবে লম্পট, চরিত্রহীন! লোকে কত বলে। ওরা তো জানে না! দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি নিজে কখনও নিজেকে ভাববেন না।

উত্তর থেকে বাতাস দক্ষিণে বয়ে যায়। বড় ঠাণ্ডা হিম বাতাস। একটা জোলো অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। আকাশে একটা-দুটো তারা ফোটে।

সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়ার আগে চোখের জল মোছে। শিয়রের জানালার দিকে চেয়ে বলে—মরে গিয়ে আমাদের কারও লাভ নেই। আছে, বলুন? রবার ঘষে ঘষে পেনসিলের দাগ তুলতুম ইস্কুলে। দাগগুলো না হয় বাদবাকি জীবন ধরে তুলে ফেলব দু-জনায়। বলছি তিন সত্যি, আর রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যে নামিয়ে দেখব না আপনাকে। দূরে থাকবেন, কিন্তু বলুন বেঁচে থাকবেন!

সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে থাকে জানালার দিকে। কেউ জবাব দেয় না। শুধু পাখিদের শব্দ গাঢ় হয়। বাতাস নদীর স্রোতের মতো শব্দ তুলে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে বয়ে যায়।

অবসন্ন মাথাটা বালিশে ফেলে সাবিত্রী। আবার একটা ঘুমের ঢল নেমে আসছে।

সাবিত্রী চোখ বোজে। নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। চোখের কোলে জল শুকিয়ে শুকনো নদীর খাতের চিহ্ন আঁকা হয়।

কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড মাঠখানা পার হয় কুঞ্জ। কাঁচা হলুদ রঙের রোদ রক্তের মতো লাল হয়েছিল, তারপর গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে চরাচর। আকাশে হাজারো লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। কুঞ্জ দেখে, এক মস্ত সমুদ্রের ধারে বিশাল জাহাজঘাটায় আলো জ্বলছে। সে ওইখানে যাবে।

জ্বরের ঘোর গাঢ় মদের নেশার মতো শরীর ভরে দিল। বার বার টলে পড়ে যায় কুঞ্জ। দাঁড়াতে গেলেই মাথা টলে যায়। তাই হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। আবার ওঠে। ভেজা মাটির ওপর কুয়াশার মেঘ ভেসে আছে। ক্রমে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে দিগ্‌বিদিক। পরীর জগৎ মুছে যায়। চারদিকে কালো স্লেটে আঁকা এক ভুতুড়ে জায়গার ছবি।

রেবন্তকে কথা দিয়েছিল, সন্ধেবেলায় এই মাঠে থাকবে। কথা রাখল কুঞ্জ। ঠিক যেইখানে রবির টর্চ পড়েছিল কাল সেইখানে এসে দাঁড়াল সে। বলল—পটল, বড় দেরি হল রে! গায়ে জ্বর নিয়ে বাঁশ বনের মধ্যে পড়ে রইলুম যে অনেকক্ষণ। বেলা ঠাহর পাইনি। যখন চাইলুম তখন বেলা ফুরিয়েছে। তবু দ্যাখ, কথা রেখেছি। এই তো আমি। দ্যাখ, এই তো আমি। কাজ সেরে ফ্যাল এই বেলা। আর দেরি নয়। কোথায় কোন বাধা হয়, বিঘ্ন আসে!

শুধু বা স বইল। চারদিকে লম্বা লম্বা ভূতের ছায়া। আকাশে লণ্ঠন নাড়ে কালপুরুষ। সমুদ্রে অনেক জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।

—পটল!

কেউ সাড়া দেয় না।

অনেক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কুঞ্জ। বড় হতাশ হয়।

—আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবি বাপ! একটা কোপের তো মামলা। এ তো নাটক নভেলের ভ্যানতারা নয় রে! কত জখম আমার শরীরে। টিকটিক করে বেঁচে আছি। তোর হাতও পরিষ্কার। এক কোপে কাজ হয়ে যাবে। আয় রে, তাড়াতাড়ি আয়।

কেউ আসে না। আকাশে লণ্ঠন নড়ে। সমুদ্রে জাহাজ ভেসে পড়ছে একের পর এক। কয়েকটা বাদুড় উড়ে যায় পাগলাটে ডানায়।

বিশাল ভারী মালগাড়ি টানতে যেমন হাফসে যায় পুরনো বুড়ো ইঞ্জিন, তেমনি বড় কষ্টে নিজেকে টেনে এগোয় কুঞ্জ। কোথাও পৌঁছোতে চায় না সে। শুধু একটা গড়ানে মস্ত খাদের দিকে নিয়ে যাবে সে নিজেকে। একটু ঠেলে দেবে শুধু। নীচে গভীর সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে মায়ের মতো। আজ রাতে শিয়রের জানালা খোলা রেখে শোবে সে, কাল ভোরে পুকুরের হিম জলে ডুবে ডুবে স্নান

করবে অনেকক্ষণ। নিজের রোগলক্ষণ সে চেনে।

হিমে ভিজে যাচ্ছে চাদর। মাথায় ঠাণ্ডা বসে যাচ্ছে। বুকের ডানধারে রবারের বলটা মস্ত হয়ে ফুলে উঠেছে এখন। বাঘের মতো থাবা দিচ্ছে ব্যথা।

কুঞ্জ বসে। হামাগুড়ি দেয়। উঠে আবার কয়েক পা করে হাঁটে। কত ভূতের ছায়া চারদিকে! আকাশে লাল নীল লণ্ঠন দোলে। কত জাহাজ আলো জ্বেলে চলেছে গাঢ় অন্ধকার সমুদ্রে!

শিরীষ গাছের বিশাল ঘন ছায়া পার হতে গিয়ে একটু দাঁড়ায় কুঞ্জ। খুব ভাল ঠাহর পায় না জায়গাটা। এই কি তেঁতুলতলা? ওই কি পিচ রাস্তা? ওইসব আলো কি ভঞ্জদের বাড়ির?

চারদিকে চায় কুঞ্জ। কত জোনাকি পোকা শেয়ালের চোখের মতো দেখছে তাকে! এইখানে ছেলেবেলায় একটা খরগোশ ধরেছিল না সে? সেই খরগোশ শিখিয়েছিল কিছু জিনিস তার, কিছু তার নয়। বড় ভুল শিক্ষা। আসলে আজ কুঞ্জ শিখেছে, এখানে এই প্রবাসে কিছু তার নয়। পরের ধনে জমিদারি। পরের ঘরে বাস। এই তো কুঞ্জর ঝাটি পাটি গুটিয়ে গেল। যে শরীরটা দেখে কুঞ্জ বলে চিনত লোকে তাও সাপের খোলসের মতো ছেড়ে ফেলার সময় হল। সামনেই গড়ানে ঢাল। মৃত্যুর উপত্যকা কোল পেতে আছে।

গাছের গায়ে ভর রেখে দম নেয় কুঞ্জ। শ্বাসকষ্ট গলায় ফাঁসের মতো এঁটে বসছে ক্রমে।

গাছের ভর ছেড়ে কুঞ্জ টলতে টলতে এগোয়।

ডিসপেনসারির সামনে উপুড় হয়ে থেমে আছে একটা গোরুর গাড়ি। অন্ধকারে দুটো গোরু বড় শ্বাস ফেলে ঘাস খাচ্ছে। একটা ধোঁয়ায় কালি লণ্ঠন জ্বলছে ডিসপেনসারির বারান্দায়। সবই আবছা দেখে কুঞ্জ। কিন্তু দেখতে পায় একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া। একটা বউ তার মাথার কাছে বসে আছে।

কুঞ্জর কানে ঝিঁঝি ডেকে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব শব্দই বড় ক্ষীণ মনে হয়। তবু সে শোয়ানো লোকটার ঘড়ঘড়ে শ্বাস আর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ঘঙরঘঙ কাশির শব্দ শুনতে পায়।

আলোর চৌহদ্দিতে পা দেওয়ার আগেই বউটি উঠে দু পা এগিয়ে এসে আর্তস্বরে ডাকল, বাবু!

কুঞ্জর ঘোলাটে মাথার মধ্যে চিৎকারটা ঢোকে। ঢুকে কিছু কুয়াশা কাটিয়ে দেয় যেন। লোকের সামনে কোনওদিন দুর্বলতা প্রকাশ করে না সে। সে যে কুঞ্জনাথ।

প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রেখে গলার ভাঙা স্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে—কে?

—আমি বাসন্তী।

—কে বাসন্তী?

—পটলের বউ। পটল যে যায়! কখন থেকে এসে বসে আছি। গোপাল ডাক্তার জবাব দিয়েছে। বলেছে হাসপাতালে যেতে। সেখেনে নিচ্ছে না।

কুঞ্জ চেয়ে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না অনেকক্ষণ।

বাসন্তী বলে—ও বলছে, হরিবাবুর ভিটেয় নিয়ে চলো। যদি তাঁর আত্মা ভর করে তবে বাঁচব।

টলমল করছিল হাত, পা, মাথা। তবু নিজেকে সোজা রাখতে পারল কুঞ্জ। ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় বলল—কী চাস?

—ওষুধ দাও। আর কী চাইব? পটল বলছে তোমার ওপর হরিবাবা মাঝে মাঝে ভর করে।

কুঞ্জ ডিসপেনসারির বারান্দায় উঠে আসে।

ধোঁয়াটে লণ্ঠনের একটুখানি আলোয় ভাল দেখা যায় না। তবু অন্ধকার থেকে যখন আলোর দিকে মুখ ফেরাল পটল তখন সেই মুখ দেখে বুকটা মোচড় দেয় কুঞ্জর। দুখানা লাল টুকটুকে চোখ, এত লাল যে মনে হয় কেউ গেলে দিয়েছে চোখের মণি। মুখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। মুখের নাল আর শ্লেষ্মায় মাখামাখি ঠোঁট। কম্বলে কম্ফর্টারে জড়ানো বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ। হাঁ করে প্রাণপণে বাতাস টানার চেষ্টা করছে দমফোট বুকে। কথা ফুটছে না। তবু অতি কষ্টে বলল—হরিবাবার ছেলে তুমি...সে মড়া বাঁচাত...পারবে না?...ভর হোক...তোমার ওপর ভর হোক...

কুঞ্জ ডিসপেনসারির দরজা খোলে। বাতি জ্বালে। বাসন্তীকে বলে—ভিতরে এনে শুইয়ে দে বেঞ্চিতে।

গোরুর গাড়ির গারোয়ান আর বাসন্তী ধরে ধরে আনে পটলকে। কুঞ্জ আর তাকায় না পটলের দিকে। তাকাতে নেই। মানুষের মন তো! হিংসে আসে, বিদ্বেষ আসে, সংকীর্ণতা আসে। বেড়া হয়ে পড়ে, গণ্ডি হয়ে পড়ে। কোনওদিন কাউকে শত্রু ভাবে না কুঞ্জ। আজই বা ভাবতে গিয়ে নিজেকে ছোট করবে কেন? সে যদি মরে তো মাথা উঁচু করে মরবে একদিন।

আলমারি খুলে হরেক ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে সে। প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে আস্তে আস্তে তার বাবা এইভাবে গুন গুন করতেন। ধীরে ধীরে ওষুধের সংখ্যা কমে আসত। তারপর ঠিক একটা অমোঘ শিশির গায়ে হাত পড়ত তাঁর।

চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না কুঞ্জ। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কোন তাকে কোন শিশির পর কোন শিশি আছে তা তার মুখস্ত। একটু দোনো-মোনো করতে করতে একটা শিশির গায়ে হাত রাখে সে।

পটল ওষুধটা খাওয়ার আগে মাথায় ঠেকাল।

ঘন্টাখানেকের ওপর বসে রইল পটল। তারপর আর একটা ডোজ দিল কুঞ্জ। শিশিটা বাসন্তীর হাতে দিয়ে বলে—নিয়ে যা। মাঝরাতে একবার খাওয়াস।

যাওয়ার সময় পটল কারও ওপর ভর দিল না। নিজে হেঁটে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে চাইল একবার। অস্পষ্ট স্বরে বলল—হরিবাবা আজ নিজে এসেছিলেন। স্পষ্ট টের পেলুম।

চেয়ারে নেতিয়ে ঝুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে কুঞ্জ। বড় শীত। খোলা দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে ঠাণ্ডার ধারালো হাওয়া আসে। কুঞ্জ চোখ বুজেও টের পায়, সামনেই সেই গড়ানে উপত্যকা, কী সবুজ! কী গভীর!

বহুকাল বাদে বাবা যেন ডিসপেনসারিতে এলেন আবার। কুঞ্জর পিছনে অস্ফুট গুন গুন স্বরে ওষুধের নাম বলতে বলতে আলমারি হাতড়াচ্ছেন। বাবা? নাকি রাজু? একবার মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জকে দেখলেন, খুব হেলাফেলার গলায় জিজ্ঞেস করলেন—তুই মরতে চাস কেন কুঞ্জ?

—না মরে কী হবে?

—জীবনটা কি তোর?

—তবে কার?

—যদি জানতিস কত করে একটা মানুষ জন্মায়, কত কষ্ট, কত খেসারত, কত রহস্য থেকে যায় পিছনে! তুই কি তোর জীবনের মালিক? মানুষের একটা স্রোত, একটা ধারায় তুই একজন। কত কষ্ট হয় গাছের একটা ফল ধরাতে জানিস?

—সব জানি, সব জানি। আর কিছু জানার নেই!

—তুই যে বড় ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ!

কুঞ্জ ধীরে ধীরে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করে। ডানদিকে ফেরাতে পারে না, শক্ত ঘাড়। তাই অল্প শরীর ঘুরিয়ে তাকায়। ঘোলা চোখে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পায় না সে। এখনও চারদিকে অবাস্তব, অপ্রাকৃত, ভুতুড়ে জগৎ। কী প্রকাণ্ড উঁচু দেখায় ওষুধের আলমারিগুলোকে। আলোটাকে মনে হয় গাঢ় হলুদগোলা জলের মতো অস্বচ্ছ। খুব অস্পষ্ট এক ছায়ার মতো মানুষকে দেখতে পায় সে। ছায়াও নয়, যেন কেউ ঘরের শূন্যতায় নিজের একটা ছাপ ফেলে রেখে চলে গেছে। ও কি বাবা? নাকি রাজু?

কুঞ্জ বলে—তুই কি রাজু? রাজু, ভোর রাতে ঘুমের মধ্যে কত ভয়ের শব্দ, যন্ত্রণার শব্দ করেছিস! কত কথা বলেছিস! তোর কীসের দুঃখ তা তো জানি না রাজু, তবে মনে হয়, কলকাতা শহর তোকে অল্প অল্প করে বিস্কুটের মতো ভেঙে ভেঙে খেয়ে নিচ্ছে। টের পাস না? তোকে যেমন খাচ্ছে শহর, আমাকেও তেমনি—

ছায়ামূর্তি গাঢ় শ্বাস ফেলে বলে—সব শহরই মানুষ খায়। সাপের মতো বাঁকানো দাঁত, একবার ধরলে আর ছাড়তে পারে না। যদি জোর করে ছিনিয়ে আনিস তবে সাপের মুখের ব্যাঙ যেমন বাঁচে না শহর থেকে ছিনিয়ে আনা মানুষও তেমনি বাঁচে না। কলকাতা একদিন আমাকে খাবে। কিন্তু তুই যে বড়

ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ!

—আমাকেও ভালবাসাই খেয়ে নিচ্ছে। তুমি কি বাবা? নাকি তুই রাজু? শোনো বাবা, আমি যে কুঞ্জনাথ! কুঞ্জনাথের কি কলঙ্ক মানায়!

রাজু নয়, যেন বাবা অলক্ষ্যে জবাব দেয়—কিন্তু তুই যে একশো বছরের কথা বলেছিলি। মনে নেই? একশো বছর পরের কথা ভেবে দ্যাখ, কেউ মনে রাখেনি এ সব। কে কুঞ্জনাথ আর কীই বা তার কলঙ্ক।

কে লোকটা তা বুঝতে পারে না কুঞ্জ। হয়তো বাবা, হয়তো রাজু। তার কাছে এখন জীবিত বা মৃত দুই জগৎই সমান। বাবা না রাজু তা বুঝতে পারল না কুঞ্জ। অস্পষ্ট লোকটার দিকে চেয়ে বলল—বড় কষ্ট যে।

—তুই যে বড় ভালবাসতে জানতিস কুঞ্জ। কত ভালবাসা তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে বলে—আমি বাঁচব না, বড় জ্বর, বুকে ব্যথা, ডান ফুসফুসে জল জমছে হু হু করে।

বাবা বলে—দূর বোকা, ওঠ না। ডান দিকের আলমারির দু নম্বর তাকে খুঁজে দ্যাখ।

গড়ানে ঢালের মুখে কুঞ্জ থামে। নিজেকে ঠেলে দেওয়ার আগে একবার দেখে নেয় চারদিক। গহীন খাদ। সবুজ উপত্যকা কোল পেতে আছে। টলতে টলতে সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়।

কুঞ্জ ডানদিকের আলমারির পাল্লা খুলে হাত বাড়ায়। ওষুধের নাম গুন গুন করতে থাকে আপনমনে।

সুখ দুঃখ

লোকটা সারাদিন তার ক্ষেতে কাজ করে। একা একা সে মাটির সঙ্গে ক ভালবাসার কথা বলে! আল তুলে জল বেঁধে রাখার সময়ে সে ঠিক যেন এক পিপাসার্তকে জলদানের তৃপ্তি পায়। সে ভালবাসে গাছগুলিকে। যারা ফল দেয়, ছায়া দেয় দূরের মেঘকে টেনে আনে। সে প্রতিটি গাছের সুখ-দুঃখকে বোধ করার চেষ্টা করে। সে ভালোবাসে তার গৃহপালিতগুলিকেও। সে বোঝে, প্রতি-প্রত্যেকের টান-ভালবাসার ওপর সংসার বেঁচে আছে।

পাপপুণ্যময় দিনশেষে সে তার নির্জন নিকোনো দাওয়াটিতে বসে। গুড়গুড় করে তামাক খায়। অন্ধকারে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশে দেবতার চোখের মতো উজ্জ্বল তারা ফুটে ওঠে। সে সেই হিম, নিথর ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে বিশাল ছায়াপথ, ঐ পথ গেছে তার পূর্বপুরুষদের কাছে। কখনো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় উঠোনে খেলা করে তার তিনটি শিশু ছেলেমেয়ে। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। সে কখনো সেই নিথর আকাশকে কখনো বা সেই নিষ্পাপ তিন শিশুকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে বলে—আমি তোমাদের কাছে কোনো লাভ-লোকসান চাই না। তোমরা আমাকে অনাবিল আনন্দ দিও।

সারারাতই প্রায় সে জেগে থাকে। গোয়ালঘর থেকে গরুর দাপানোর শব্দ পেলে উঠে গিয়ে মশা কিংবা ডাঁশ তাড়ায়। টেমি হাতে চলে আসে হাঁসের ঘরে। দেখে, তাদের ডিম স্বচ্ছন্দে প্রসব হয়েছে কিনা। ঝড়ের রাতে সে উঠে চলে যায় বাগানের গাছগুলির কাছে। বাঁশ-কাঠের ঠেকনো দিয়ে রাখে বড় গাছগুলিতে।

মাঝে মাঝে অন্ধকার নিশুত রাতে বারান্দায় বসে সে যখন তামাক খায়, তখন তার বউ আর ছেলেমেয়েরা ঘরে ঘুমোয়, ঘুমোয় তার গাছপালা, তার গৃহপালিতরা, লোকটা তখন একা জেগে দেখে, দূরের মাঠ ভেঙে ধোঁয়াটে লণ্ঠন হাতে অস্পষ্ট কারা যেন চলে যাচ্ছে, কানে আসে ক্ষীণ হরিধ্বনি। কখনো বা দেখে, ভিন গাঁয়ের দিকে মশাল হাতে চলেছে একদল লোক, তাদের হাতে বন্দুক, সড়কি, খাঁড়া, মুখে ভুসোকালি মাখা। লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকে। তার আর ঘুম আসে না।

গ্রামের ধারে রুপোলি নদীটির পাশে শিবরাত্রি কি রথযাত্রার মেলা বসে। কত দূর থেকে রঙে ছোপানো জামাকাপড় পরে আসে অচেনা মানুষেরা। রঙিন ছেলেমেয়েরা মুখোশ পরে ঘোরে, বাজিকর খেলা দেখায়। পায়ে পায়ে রাঙা ধুলোর মেঘ ওড়ে। ছেলের হাত ধরে লোকটি মেলায় আসে। ছেলেকে ডেকে বলে—মানুষের মুখ দেখ বাবা, মানুষের মুখ দেখ। এর বড় নেশা। হাটুরেরা ঘোরেফেরে, দরদাম করে। লোকটা কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে অচেনা হাটুরেদের দেখে আর দেখে। কখনো বা ছেলেকে

বলে—অচেনা মানুষকে একটু পর-পর লাগে বটে, কিন্তু আপন করে নেওয়া যায়। কাজটা শক্ত না।

সে জানে দেশের আইন, জমি এবং ফসলের মাপ, অঙ্কের হিসেব, লোকটা জানে চিকিৎসাবিদ্যা। সে জানে, কোন উদ্ভিদের কী গুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল, কোন বীজ থেকে কী গাছ। তাই এ গাঁ সে গাঁ থেকে নানাজন আসে তার কাছে। আইন জেনে যায়। জমির মাপ জেনে যায়, আসে চিঠি লেখাতে কিংবা হিসেব মিলিয়ে নিতে। লোক আসে রোগের ওষুধ জানতে। সে কেবল মানুষকে দেখে আর দেখে। সে জানে, পৃথিবীর কোনো কিছুই একটি ঠিক আর একটির মতো নয়। আছে বর্ণভেদ। আছে বৈশিষ্ট্যের তফাত। এক গাছের দুটি পাতাও নয় এক রকমের। সে মানুষে মানুষে সেই ভেদ দেখতে পায়। দেখে বৈশিষ্ট্য। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য তার আলাদা বিধান, আলাদা ব্যবহার, আলাদা ওষুধ। এক-একটি মানুষের অর্থ এক-একটি আলাদা জগৎ। প্রতিটি মানুষেরই আছে অস্তিত্বের বিকিরণ। মানুষ দেখতে দেখতে লোকটার এমন অবস্থা হয়, যে সে মানুষের সেই বিকিরণটি অনুভব করে। সেই বিকিরণ অনেকটা আলোর মতো। বিভিন্ন মানুষের আলোর রঙ আলাদা। বড় সরল লোক সে। সে ভাবে তার মতো আর সবাইও মানুষের বিকিরণ দেখতে পায়। তাই সে কখনো হয়তো কোনো লোককে দেখে চেঁচিয়ে বলে—এঃ হেঃ তোমার আলোটা যে লাল গো—বড্ড লাল। ও যে রাগের রঙ।

শুনে লোকে হাসে, বলে পাগল।

লোকটা নানারকমের আলো দেখেছে জীবনে। কখনো পাঠশালা থেকে ফেরার পথে—যখন বর্ষার ভারী মেঘ নিচু হয়ে ঘন ছায়া ফেলেছে চরাচরে—ঝুমকো হয়ে এসেছে আলো—তখন মহাবীরথানের বটগাছ পেরোবার সময়ে লোকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখেছে, তার সামনে এক আলোর গাছ। আলোর ঝালর তার পাতায় পাতায়, কাণ্ডে, ডালে। তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখছে হঠাৎ যেন পাল্টে গেছে পৃথিবীর রূপ। বাতাসে মাটিতে শূন্যে সর্বত্রই আলোময় কণা। খেলা করছে চরাচর জুড়ে আলোর কণিকাগুলি। সে দেখল নানা রঙের আলোর ছাড়া আর কিছু নেই। সেই কণাগুলিই খেলার ছলে তৈরি করছে গাছপালা, মাটি, মেঘ। তারাই ঘুরছে, ফিরছে, তৈরি করছে সবকিছু, আবার ভেঙে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে অন্য চেহারায়। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে ভয় পেয়ে চোখ বুজল। টের পেল, তার দেহ জুড়ে সেই কণাগুলিরই খেলা চলেছে। মাঝে-মাঝেই সে সেই কণাগুলিকে দেখতে পেত, ভারত—তবে কি সৃষ্টির সত্য চেহারাটা এই যে, তা আলোময় এবং কণিকাময়? কখনো কখনো সে দেখেছে, সেই কণাগুলির চলাফেরা ছন্দময় যেন এই মহাবিশ্বের কোনো অশ্রুত সঙ্গীতের সঙ্গে তারা সুরে বাঁধা। তাদের দোলা এবং চলা সেই ছন্দটিকে প্রকাশ করছে।

কোনো লোকই তার এইসব কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। সে সব বিচিত্র আলোর বর্ণনা দিত মায়ের কাছে, বন্ধুর কাছে। তারা বলেছে পাগল।

সংসারী মানুষের আছে সুখবোধ। গৃহস্থ সুখ পায় পুত্রমুখ দেখে, নিজের সঞ্চয় দেখে। যত কিছু সে অধিকার করে পৃথিবীতে তত তার সুখ। লোকটার তেমন সুখ নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে তার অদ্ভুত এক আনন্দ আসে। একা একা সেই অকারণ আনন্দের

প্লাবনে ভেসে যেতে যেতে সে চিৎকার করে ছেলে-বউকে ডাকে, ডাকে চেনা লোকেদের, সেই আনন্দে সবাইকে সামিল করতে। বস্তুত কেউই তার সেই আনন্দকে বুঝতে পারে না। লোকটা অবাক হয়ে ভাবে, তবে বুঝি আমি পাগলই! আমার একার জন্যই বুঝি কিছু দৃশ্য আছে, কিছু শব্দ আছে, আছে অপার্থিব আনন্দ!

মাঝে-মাঝে ক্ষেতের কাজ করতে করতে, পোয়াল নাড়া বাঁধতে বাঁধতে, গোয়াল পরিষ্কার করতে করতে, হঠাৎ চমকে উঠে ভাবে—আরে! আমি লোকটা কে। আমি এখানে কেন? এতো আমার ক্ষেত নয়! এতো নয় আমার বাড়িঘর। আরে! আমি যেন কোথায় ছিলাম—কোথায় ছিলাম! সে যে এক গভীর নীল স্নিগ্ধ জগৎ। সেখানে এক অদ্ভুত আলো ছিল। ছিল এক বিচিত্র সুন্দর শব্দ! সেই আমার জগৎ থেকে কে আমাকে এখানে আনল? কেন আনল এই মৃত্যুশীলতার মধ্যে, হঠাৎ সে চমকে উঠে বোধ করে—যে পথ দিয়ে আমি এসেছিলাম সেই পথের দুধারে ছিল অনেক তারা নক্ষত্র। সেই বীথিপথটি অনন্ত থেকে চলে গেছে অনন্তে। তার শুরু নেই শেষও নেই। সেই পথে চলতে চলতে কেন আমি থেমে গেলাম। নেমে এলাম এইখানে? এই কথা ভেবে লোকটা চারদিকে চেয়ে এক সম্পূর্ণ অচেনা অদ্ভুত অপার্থিবতাকে বোধ করে। কোনো কিছুকেই সে আর চিনতে পারে না

সংসারী মানুষদের কাছে ক্ষেতখামার পশুপাখি গাছপালা ছেলে-বউ। এই সবের সঙ্গে তারা কেমন মেখেঝুখে থাকে। তারা নিজের জিনিস চেনে, চেনে পরের জিনিস। তারা সেসব জিনিসে নিজেদের চিহ্ন দিয়ে রাখে। অবিকল তাদের মতোই এই লোকটারও আছে সব। কিন্তু তাতে তার চিহ্ন দেওয়া নেই। বউ রাগ করে—তোমার বাড়ি তো বাড়ি নয়, এ হচ্ছে হাট। সারাদিন এখানে লোক আসে যায়। তোমার দিন কাটে দাওয়ায় বসে। কখনো বা বলে—তুমি অন্যের ক্ষেত থেকে পাখি-পাখালি তাড়াও, ছাগল-গরু তাড়াও, অন্যের অসুখের দাও ওষুধ, অন্যের দুঃখে গলে পড়ো। আমাদের ওপর তোমার মন নেই। অথচ আমরাই তোমার আপনজন, আর এ সমস্ত তোমার নিজের জিনিস।

লোকটা ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে না। কেমন গুলিয়ে যায়। মাঝে-মাঝে সে যে নিজেকেই অনুভব করতে পারে না ঠিকমতো, তবে নিজের বলে কী অনুভব করবে

এ কথা সত্য যে মানুষটি পৃথিবীকে ভালবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে। গৃহস্থের এরকম হতে নেই। গৃহস্থকে এরকম হতে নেই। গৃহস্থকে আরো শক্ত হতে হয়, হতে হয় হিসেবি সঞ্চয়ী, তার চাই আত্মপর ভেদজ্ঞান। তার বউ বলে—আরো পাঁচ জনকে দেখ। দেখ, তারা নিজেদের ঘরে বাস করে। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি আছো পরের ঘরে।

লোকটার বউ বলে এ কথা। লোকটার বুড়ি মাও বলে। বেঁচে থাকতে লোকটার বাবাও বলত—এ সংসারে তুমি দুঃখ পাবে বলেই জন্মেছো।

লোকটা অন্যরকম বোঝে। সে যখন দাওয়ায় বসে দূরের গাঢ় ধূসর পাহাড়টিকে দেখে, যখন দেখে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশ কিংবা নিষ্পাপ শিশুর মুখ, তখন যে অনাবিল আনন্দকে সে টের পায়, সে আনন্দ তো তার নিজের। সে আনন্দের কারণ হোক না তার নিজের শিশু কিংবা দূরের পাহাড় কিংবা আকাশ—না কিনা সংসারের

বাইরে—তার সৌন্দর্য। তবে তো আনন্দই নিজের, সেই আনন্দই আপন করে তোলে এই বিশ্বসংসারকে। যে জানে সে জানে, পর বলে কিছু নেই।

জলে ডুবে মারা গেছে একটি শিশু। বাপ তার মৃত শিশুকে শরীর ঢেকে কোলে নিয়ে চলেছে। লোকটা থেমে চেয়ে থাকে। দেখে শিশুটির মুখখানা ঢাকা, তবে পা দুটি কেবল ঝুলে আছে। সেই শিশুটিকে কোনোদিনই দেখেনি লোকটা। আজও দেখল না। কেবল সেই চির অপরিচিত শিশুটির দু'খানা পা দেখে রাখল। বুকখানা ব্যথিয়ে উঠল তার। হু-হু করে কান্না এল। অচেনা বাপটির মুখ দেখে ফেটে গেল বুক। বড় অবাক হল সে। ভাবতে বসল, কেন এরকম হবে। যাকে কোনোদিন দেখিনি, যে আমার চেনা ছিল না, তার জন্য কান্না কেন। তাহলে কি যাদের পর করে রেখেছি তারা আমার যথার্থ পর নয়? ঐ যে এক মুহূর্তের একটু দুঃখ তা কি কাঁটার মতো নির্ভুল বলে দেয় না যে, ঐ অপরিচিত শিশুটিও ছিল আমারই জন। যেমন দূরের দেশে আকাল এলে, মড়ক লাগলে মানুষের প্রাণ ছটফট করে। ঐ একটু দুঃখ কি কয়েক পলকের জন্য দূর ও নিকট, আপন ও পরের ভেদরেখা মুছে দেয় না? চাবুকের মতো চকিতে আঘাত করে না মানুষের স্বার্থপরতাকে?

গাঁয়ের বুড়ো মাতব্বররা শুনে বলে—তুমি বাপু আহাম্মক। অচেনা একটা জলে ডোবা শিশুকে দেখে তোমার যে দুঃখ তা তো আসলে তোমার নিজের ছেলের কথা ভেবেই। ঐ যে অচেনা বাপটির মুখে তুমি শোক দেখলে, ঐ বাপের জায়গায় তুমি দেখেছো নিজেকেই। মানুষ কি পরের জন্য দুঃখ পায়। দুঃখ পায় নিজের যদি ঐ অবস্থা হয়—এই ভেবে। দূরের দেশের আকাল কি মড়কের কথা শুনে লোকে যে অস্থির হয়, তা তার নিজের দেশের কথা মনে করেই। পরের জন্য যে দুঃখ, তা আসলে নিজেরই প্রক্ষেপ।

লোকটা উঠে পড়ে। ভাবতে ভাবতে যায়। মাঝপথে কী যেন মনে পড়ে। অমনি ফিরে এসে মাতব্বরদের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটাকে বলে—খুড়োমশাই, পূর্ণিমা কি অমাবস্যার জোরে আপনার হাঁটুতে বাতের ব্যথাটা বাড়ে, তা কি সত্যি?

—বাড়ে তো।

—তাহলে তো বলতেই হয় দূরের চাঁদের সঙ্গে আপনার শরীরের একটা সম্পর্ক আছে! বাইরে থেকে তো তা বোঝা যায় না।

আকাশে ঘনিয়ে আসে বর্ষার গাঢ় মেঘ। ঘন মেঘের ছায়া পড়ে চারধারে। বর্ষার ব্যাঙ ডাকে। বৃষ্টি নামে। লোকটা তখন তার দরজার চৌকাঠে বসে সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে। কোন্ দূর থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আসে, গাঢ় ভালবাসায় মাখে মাটিকে, ভিজিয়ে দেয় গাছপালা! বৃষ্টির শব্দে যেন কোন ভালবাসার কথা বলা হতে থাকে। সে ভাষা বোঝে না লোকটা কিন্তু টের পায়। ঐ যে বর্ষার ব্যাঙ ডাকে, গাছপালার শব্দ হয়, সে প্রাণ দিয়ে তা শোনে। তার মনে হয় ঐ ব্যাঙের ডাক মেঘকে টেনে আনে, গাছপালা তাকে আকর্ষণ করে, মাটিতে টেনে নামায় মেঘ থেকে জল—এরকম টান-ভালবাসার ওপরেই চলেছে সংসার! লোকটা সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে নিথর হয়ে তার চৌকাঠে বসে থাকে তো বসেই থাকে। তার চোখের পলক পড়ে না। এমনিই বসে থেকে সে শীতের কুয়াশা দেখে, দেখে বৈশাখের ঝড়।

মাঝে-মাঝে বিছানায় শুয়ে নিশুতরাতে তার ঘুম ভাঙে। বুকচাপা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে সে তবু তার হঠাৎ মনে হয় সে ঠিক ঘরে নেই। নিশিরাতের পরী তাকে উড়িয়ে এনেছে ঘরের বাইরে। শুইয়ে দিয়ে গেছে অবারিত মাঠের মাঝখানে। ঘরের দেয়াল নেই, দরজা নেই, আগল নেই। টের পায়, ম্লানমুখ চাঁদের মৃদু জোৎস্নার মায়াবী রূপ ধরেছে চরাচর। কুকুর কাঁদে। বাতাসে ভাসে পায়রার পালক। পায়রার ঘর ভেঙে রক্তমাখা মুখে বেড়ালটা নিঃশব্দ থাবায় হেঁটে উঠেছে ঘরের চালে। তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা কাঁদছে, চাঁদ ও শূন্যতার দিকে চেয়ে—তার দুটি ছানা নিয়ে গেছে শেয়ালে। বেড়ালটা সেই কান্না শুনে আকাশের দিকে তাকায়। দেখে, বিপুল বিস্তার। ম্লান জ্যোৎস্না। সেই জোৎস্নায় পার্থিব পালকগুলি ঝেড়ে উড়ে যায় একটি পায়রা। নিশুতরাতের মায়াবী আলোয় সে পৃথিবীর সব সীমা পার হয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে বেড়ালটা সেই দৃশ্য দেখে। কুকুরটা কাঁদে, আর কাঁদে। চাঁদ দেখে, দেখে শূন্যতা। কায়াহীন সেই দূরগামী পায়রাটির দিকে একবার থাবা তোলে বেড়ালটা—দূরতর পায়রাটির জন্য সে একবার লোভ বোধ করে। তারপর কুকুরের কান্না শুনে থাবাটি তুলে রেখেই সে বসে থাকে।

লোকটা ঘুমোয় না। প্রতিটি দুঃখীর দুঃখকেই তার বহন করতে ইচ্ছে করে, ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে প্রতিটি পাপীকে। তার বাবা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল—এই সংসারে দুঃখ পাবে বলেই তুমি জন্মেছো। সেই অভিশাপকে হঠাৎ তার আশীর্বাদ বলে মনে হয়। সে উঠে চলে আসে। রুপালি নদীটির ধারে অবারিত মাঠটিতে! দেখে, আকাশের মহাসমুদ্র সাঁতরে ধীর গতিতে চলেছে গ্রহপুঞ্জ, ঊর্ধে সময়কে পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাদের জ্যোতি। লোকটির পায়ে পায়ে ক্ষণস্থায়ী ঘাসের ডগাগুলি থেকে গড়িয়ে পড়ে শিশিরের কণা। ঘরের চালে তখনো স্তব্ধ বিমর্ষতায় থাবা তুলে বসে থাকে বেড়ালটি। কুকুরটি তার দুটি হৃত সন্তানের জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে কাঁদে। লোকটির পায়ে পায়ে শিশির ঝরতে থাকে। কেবল শিশির ঝরে যায়।

কেমন নির্বিকার বয়ে যায় রুপালি নদীটি। সেই নদীটির আছে উচ্ছ্বাস, আছে আনন্দ বেদনা তবু কেমন উদাসীনতার গৈরিক রঙ তার সর্বাঙ্গে লোকটা দেখে, আর ভাবে। দুঃখও একরকমের ভাব, সুখও একরকমের ভাব। জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, সুখকেও। সুখ-দুঃখ কোনটাই যেন ব্যাপ্ত না হয়, সব উৎপাত চুকে যাক। এই দয়া হোক তার প্রতি চিত্ত যেন উদাস থাকে। দয়া হোক তার প্রতি—এই দয়া হোক। সুখে দুঃখে তার থাক অপ্রতিহত আনন্দ, তার থাক বয়ে-যাওয়া। রুপালি নদীটি যেমন নিয়ে যায় মানুষের আবর্জনা ক্লেদ শ্রান্তি, বহন করে মানুষের বাণিজ্যের ভার! তেমনই সে বোধ করে, দুঃখ পাবে বলে নয়, সে সংসারে জন্মেছে সকলের দুঃখকে বহন করবে বলে। রুপালি নদীটির মতো নির্বিকার বয়ে যাবে।

বিনীত, সুন্দর একখানা অহংশূন্য মন নিয়ে সে চেয়ে থাকে। তখন তার চারপাশে খেলা করে আণবিক আলোর কণিকাগুলি। এক নিস্তব্ধ সঙ্গীতের দোলাচল তাদের চলাফেরায়। তার কাছে উড়ে আসে এক নীলাভ জগতের স্মৃতি, উড়ে আসে আলো, আসে সুন্দর সব শব্দ—যা এই সংসারের নয়। এক অপরূপতাকে ঘিরে ধরে। তখন একে

একে নিভে যায় জাগতিক হাত, পা, চোখ এবং মন। নিভে যায় চেনা মানুষের মুখ। তখন পাখির ডিমের মতো ভোর নীল আকাশের নিচে ঘাসের ওপর সে বসে হাঁটু গেড়ে। অনুভব করে, সে আর সে নয়। এখন ভোর, আকাশের তলায়, রুপালি নদীটির পাশে, অবারিত মাঠের ঘাসের উপর পড়ে আছে তার বীজ। সেই বীজটিতে একটিমাত্র বোধ সংলগ্ন হয়ে আছে—আমি। যে প্রাণপণে পৃথিবীর ঘাস মাটি আঁকড়ে ধরে। যেন বা এক দূত এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর দরজায়, হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে তাকে। সে বিড়বিড় করে বলে—আর কিছুক্ষণ—আর কিছুক্ষণ আমাকে সংলগ্ন থাকতে দাও এই সংসারের সঙ্গে। তারপর আমি চলে যাবো।

গ্রামের এক প্রান্তে থাকে এক সাধক। বুড়োসুড়ো মানুষ। সাধন-ভজন আর ভিক্ষেসিক্ষে করে তার দিন কাটে। লোকটা তার কাছে যায়, তার দাওয়ায় বসে, জিজ্ঞেস করে—আপনি কি কখনো দেখেছেন আলোর গাছ? কিংবা ছন্দোবদ্ধ আলোর কণিকাগুলি? দেখেছেন মানুষ আলো বিকিরণ করে? কখনো কোন নীলাভ জগতের স্মৃতি আপনার মনে আসে না? আপনি শোনেনি সেই শব্দ যা মানুষকে ভিক্ষা করে ফেরে?

বুড়োসুড়ো মানুষটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানায়—না। অনেকক্ষণ চিন্তান্বিত মুখে তামাক খায়। তারপর একসময়ে লোকটার দিকে চেয়ে বলে—আমি ওসব কিছুই দেখিনি বাবা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি দেখলেও বা দেখতে পারো। হয়তো সত্যিই আছে ওসব। আমিও শুনেছি সৃষ্টির মূলে আছে এক শব্দ।

লোকটার আর চাষবাস করতে ইচ্ছে করে না, যেমন ইচ্ছে করে না গরুর দুধ দোয়াতে, ইচ্ছে করে না নিজের জন্য উপার্জন করতে। তা বলে সে বসেও থাকে না। সে লোয়াজিমা সংগ্রহ করে মানুষের জন্য। সে দেখে মানুষের জ্যোতি। বৈশিষ্ট্যমাফিক তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্ট করে। সে মানুষকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে। দান করে দক্ষতা এবং ধর্ম। সে যা জানে সবই শেখায় তাদের, বর্ণভেদ অনুসারে। কেউ নেয় তার চিকিৎসাবিদ্যা, কেউ নেয় অঙ্কশাস্ত্র, কেউ শেখে চাষবাস।

বউ গঞ্জনা দেয়—তোমার সংসার যে ভেসে গেল।

লোকটা হাসে—তাই কখনো যায়!

বউ বলে—তোমার যে বৃত্তি-পেশা নেই, উপার্জন নেই!

লোকটা বলে—তা কেন! আমার সব আছে। যেখানেই আমি বীজ বপন করেছি সেখানেই দেখেছি বৃক্ষের উৎপত্তি! একথা ঠিক যে নিজের জন্য আমার কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু মানুষে যদি বুঝতে পারে যে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের স্বার্থের পক্ষেই প্রয়োজন, তবে তারাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার লোয়াজিমা তারাই এনে দেবে আমাকে। সংসারের মরকোচটা এরকমই হওয়া উচিত। টান-ভালবাসার ওপর সংসার চলুক। আমি কেন স্বার্থ খুঁজে বেড়াব? লোকের ভালবাসা জাগিয়ে দিই, তারা আমার সংসার কাঁধে করে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

কিন্তু বউ তা মানতে চায় না। ঝগড়া করে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাপকে সাবধান হতে বলে। কিন্তু ততদিনে লোকটা হয়ে গেছে মানুষ-মাতাল জগৎ-মাতাল। তার

নিকটজনেরা তাকে বলে—অপদার্থ, বাউণ্ডুলে। তারা মনে করে এই লোকটাই তাদের দুঃখের কারণ। তারা লোকটার হাজার দোষ দেখতে পায়, দেখে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা।

কিন্তু যারা দূর থেকে আসে, তারা তার কাছে এসে এক আশ্চর্য সুগন্ধ পায়। তারা টের পায়, এক স্নিগ্ধ আলোর ছটা তাকে ঘিরে আছে। বলে—আহা গো কী সুন্দর গন্ধ এখানে! তুমি যে মানুষের গায়ের আলোর কথা বল, সে আলো যে তোমারও রয়েছে! বড় সুন্দর আলোটি—হাঁসের পালকের মতো সাদা—এর মধ্যে কোনো হিংসা নেই, দ্বেষ নেই। এই আলোতে দু'দণ্ড বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেউ বা এসে বলে—তুমি যে আমাকে ওষুধের গাছ চিনিয়েছিল, চিনিয়েছিলে রোগ নির্ণয় করতে, দেখ, সেই পেশায় আমি এখন দাঁড়িয়ে গেছি। একটা সময়ে আমি পড়ে থাকতুম বাবুদের বাড়ির আস্তাবলে, গরু-ঘোড়ার সেবা করতুম, কিন্তু সে কাজে আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারত না যে আসলে ও কাজ আমার নয়। আমার মধ্যে যে বৈদ্য হওয়ার গুণ আছে তা তুমিই বুঝেছিলে। এই দেখ, তোমার জন্য জামাকাপড়, তোমার বউয়ের জন্য শাড়ি-গয়না, তোমার ছেলেপুলেদের জন্য খেলনা আর খাবার।

এইভাবে লোকটার সামনে অযাচিত উপহার জমে ওঠে।

যে লোকটা ছিল এ গাঁয়ের বিখ্যাত চোর, সে এসে একদিন সলজ্জ হাসিমুখে প্রণাম করে দাঁড়াল, বলল—আমাকে—মনে আছে তো তোমার? আমি ছিলাম এ-দিকের দশখানা গাঁয়ের বিখ্যাত চোর। রোজ আমি রাতে চুরি করতে বেরোতুম, আর তুমি তোমার দাওয়া থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বলতে—ওরে যাস চুরি করতে যাবি তো তার আগে একটু তামাক খেয়ে যা। দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করি। তা আমি বুদ্ধিটা মন্দ নয় দেখে এসে বসতাম। তামাক খেতে খেতে পাঁচটা কথা এসে পড়ত। কথায় কথায় যেত ভোর হয়ে। আমি কপাল চাপড়ে চাপড়ে দুঃখ করে বলতাম—ঐ যাঃ, গেল আমার একরাতের রোজগার। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতে—আজ রাতে সকাল-সকাল বেরোস। আবার পরের রাতেও তুমি ডাক দিতে। আবার রাত পুইয়ে যেত। আমি মনে মনে ভাবতাম, এই লোকটাই খাবে আমাকে। উপোস করিয়ে মারবে। তাই আমি তোমার দাওয়ার সামনেকার রাস্তাটা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলাম একদিন। কী করে টের পেয়ে মাঝপথে তুমি ছিলে ঘাপটি মেরে। ধরলে আবার, কথায় কথায় দিলে রাত পুইয়ে। রোজ এমন হতে থাকলে আমি একদিন অন্য উপায় না দেখে ধরলাম ঠেসে তোমার পা, বললাম—ঠাকুর, ব্রাহ্মণ হয়ে কেন তুমি আমার অন্ন মারছো! এ যে আমার বৃত্তি। এ না করলে যে ভাতে মরণ! তুমি হেসে বললে—আচ্ছা, আজ বাড়ি যা। তুই আর চুরির জানিস কী? আমি তোকে চুরির ভাল কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দেবো। আজ আমি যাবো তোর সঙ্গে। শুনে ভারি ফূর্তি হল মনে। জানতাম, তোমার জানা আছে বিবিধ বিদ্যা। তুমি জানো রসায়ন, জানো গণিত, জানো বলবিদ্যা, জানো পদার্থের গুণ, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি হবো চোরের রাজা। সেই রাতে বেরোলাম তোমার সঙ্গে। গল্পে গল্পে পথ হাঁটছি, যাবো ভিনগাঁয়ে, ধনী মহাজনের দোকান লুটে আনবো দুজনে। মনে বড় ফূর্তি। হঠাৎ মাঝপথে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁরে, তোর ঘরে না সুন্দরী বৌ আছে। আমি বললাম—তা আছে তো'

তুমি বললে—আরে, তুই না একবার বলেছিলি, তোর পাশের বাড়িতে একটা বদ লোকের বাস, সে লোকটা তোর বৌয়ের দিকে নজর দেয়! আমি বললাম—হ্যাঁ, দেয়। তখন তুমি বললে—তা এই রাতে যদি সে লোকটা তোর ঘরে আসে। তুই তো রাতবিরেতে ফিরিস, তোর বৌ ঘুমচোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। সে লোকটা হয়তো তোর গলা নকল করে ডাকবে, আর তোর বৌ উঠে দরজা খুলে দেবে। যদি তাই হয়! রাতবিরেতে এক সুন্দরী বৌকে রেখে বেরিয়েছিস—পাশেই ঘোষের বাসা—কাজটা কি ঠিক হয়েছে? অমনি বিছের কামড়ের মতো মন ছটফট করে উঠল। বললাম—তাই তো বলে সিঁদকাঠি ফেলে দৌড় লাগালাম ঘরের দিকে। তারপর থেকে সেই বিষ-যন্ত্রণায় আর ঘর থেকে বেরোতে পারি না। রাত হলেই ঘরের বাইরে মন টানে। বাইরে বেরোই তো ঘরের কথা ভেবে ফাঁপর হয়ে পড়ি। সে এমন যেন্ত্রনায় পড়লাম যে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, রোগা হয়ে হাড় বেরিয়ে গেল। তখন আবার গিয়ে তোমার পায়ে পড়লাম—এ কী সর্বনাশ করলে আমার! আমার যে বৃত্তি ঘুচে গেল। অথচ চুরি ছাড়া আর যে আমি কিছুই শিখিনি! এখন কী করে আমার দিন চলবে? তুমি গম্ভীর হয়ে ভাবলে, ভেবে বললে—তোর যন্ত্রপাতিগুলো আন তো। এনে দেখালাম। তুমি সেসব দেখে-টেখে বললে—তুই তো তালাচাবির কলকব্জা ভাল চিনিস। জানিস এদের ঘরকোচ। দেখ তো ভাল তালা বানাতে পারিস কিনা—যে তালা চোর খুলতে পারে না। এইসব যন্ত্রপাতি তোর সবই কাজে লাগবে তাতে। তোমার সেই কথামতো মনের দুঃখে অগত্যা তালা তৈরি করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সেসব তালার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এখন শহরে আমার ফলাও কারবার। পাঁচজন আমাকে ভদ্রলোক বলে সম্মান করে।

সেই চোর এই কথা বলে লোকটার সামনে তার পোঁটলা খুলে দেয়, বলে—তোমরা জন্য এনেছি ভাল তামাক, হুঁকো, একজোড়া শহুরে চটিজুতো, ফলমূল—

এইভাবে মানুষেরা আসে। নিজেদের গল্প বলে। তাদের সংগৃহীত উপহার দিয়ে যায়। তারা জানে, এ লোকটা বেঁচে থাকলে তারাও বাঁচবে, বাঁচবে আরো হাজারটা লোক। তাই লোকেরা এসে তাকে ঘিরে বসে, নিজের খাবারের ভাগ দিয়ে যায়, দেয় পরিধেয়, কখনো বা শৌখীন জিনিস, রাত জেগে তাকে পাহারা দেয়।

তবু কেউই তাকে সঠিক বুঝতে পারে না। বলে—আরে! আহাম্মকটাকে দেখছি বিগ্রহ বানিয়েছে সবাই! প্রণামীর ঠেলায় আহাম্মকটা যে হয়ে গেল ধনী। কেউ বলে—ঘড়েল লোকটাকে দেখ, আহাম্মকদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে!

এরকম বিবিধ কথা হয় লোকটার সম্বন্ধে। কিন্তু সকলেরই জিজ্ঞাসা—'বাপু, তুমি আসলে কে? আসলে কী? তুমি সত্যিকারে কেমন?'

লোকটা উত্তর দিতে পারে না। আলো যেমন বলতে পারে না—আমি আলো, বাতাস যেমন বলতে পারে না—আমি বাতাস; সেইরকম সেও বলতে পারে না সে কী বা কে। কিন্তু মানুষের প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে একরকম অনুভব করে। বুঝতে পারে যোজন যোজন বিস্তৃত তার অস্তিত্ব। সে কেবল পৃথিবীকে ভালবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে।

চৈতন্যময় আলোর আণবিক কণিকাগুলি তাকে ঘিরে খেলা করে। তার ভিতর

থেকে স্পন্দমান সৃষ্টির মূল শব্দটি উঠে আসতে থাকে। লোকটা ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশের দিকে চায়, চেয়ে থাকে দূরের পাহাড়টির দিকে। হঠাৎ অনুভব করে, তারই অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিচ্ছে আকাশ, বাতাস, নক্ষত্রপুঞ্জ, আলো এবং অন্ধকার। ঐ যে দূরের পাহাড়টি, রুপালি নদীটি, ঐ যে অবারিত মাঠ, অচেনা যেসব মানুষ চলেছে রাস্তা দিয়ে, এই যেসব গাছপালা, পশুপাখি-এই সবই জন্ম নিচ্ছে তার অস্তিত্ব থেকে, লয় পাচ্ছে তারই ভিতরে। সে তার এই অনন্ত অস্তিত্বের কথা লোককে বলতে পারে না। সে রাত জেগে দাওয়ায় বসে গুড়গুড় করে তামাক খায়, আর ভাবে, আর অনুভব করে। অনাবিল এক আনন্দের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সে সেই আনন্দের ভাগ কাউকেই দিতে পারে না। সে ঘোরেফেরে তার গাছপালাগুলির কাছে, বলে বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। সে পশুপাখি, গৃহপালিতদেরও বলে—বেঁচে থাকো। বেড়ো ওঠো। সে তার ছোট ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বলে—বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। তার দেহ থেকে সৌরভ এবং আলোর মতো ঐ কথা সমস্ত বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে যায়—বেঁচে থাকো। বেড়ো ওঠো।

তারপর একদিন পড়ে থাকে তার সংসার, তার সঞ্চিত সম্পদ। সে একা একা চলে আসে পাহাড়ে। একটা গুহা খুঁজে বের করে। গুহায় ঢুকে সে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয় ভারী পাথরে। তারপর সেই নিস্তব্ধতায় বসে সে মানুষের জন্য কয়েকটি সৎ চিন্তা করে মরে যায়।

লোকটা মরে যায়, তার সেই চিন্তাগুলি কিন্তু মরে না। তারা ধীরে ধীরে তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ঘুরে ঘুরে গুহা থেকে বেরোবার মুখ খোঁজে। তারপর তারা পাহাড় ভেদ করে, পার হয় নদী, প্রান্তর, পার হয়ে যায় সমুদ্র। অদৃশ্য কয়েকটি অলীক পাখির মতো মানুষের কাছে চলে আসে। ঘুরে ঘুরে বলে—তমসার পাড়ে আছেন এক আলোকময় অনামী পুরুষ। আমরা তার কাছ থেকে এসেছি, তোমরা আমাদের গ্রহণ কর।

কিন্তু, নিজের সুখ-দুঃখে কাতর মানুষ সেই ডাক শুনতেই পায় না।

ঘরজামাই

১

বাঁকা নদীতে তখন জল হত খুব। কুসুমপুরের ঘাটে নৌকো ভিড়ত। জষ্টিমাসে শ্বশুরবাড়িতে আসছিল বিষ্ণুপদ। কী ঠাঁটবাট। কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, তাতে সোনার বোতাম, পায়ে নিউকাট, ঘাড়ে পাকানো উড়ুনি। চোমড়ানো মোচ আর কোঁকড়া চুলের বাহার তো ছিলই। আরও ছিল, কটা রং আর পেল্লায় জোয়ান শরীর। নৌকো ঘাটে লাগল। তা কুসুমপুরের ঘাটকে ঘাট না বলে আঘাটা বলাই ভাল। খেয়া নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই যাত্রীরা ঝাপাঝপ জলে কাদায় নেমে পড়ে। বিষ্ণুপদ সেভাবে নামে কী করে। উঁচু পাড়ের ওপর স্বয়ং শ্বশুরমশাই ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে, পাশে তিন সম্বন্ধী, নতুন জামাইকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। বিষ্ণুপদ টলোমলো নৌকোয় বাঁ হাতে সাত সেরী একখানা রুই মাছ আর ডান হাতে ভারী স্যুটকেস নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে হেল-দোল করছে। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণুপদ পুরুষমানুষই ছিল বটে। দেমাকও ছিল তেমনি। নৌকো থেকে জামাই নামছে, নৌকোর মাঝিই এগিয়ে এল ধরে নামাবে বলে। বিষ্ণুপদ বলল, কভি নেহি। আমি নিজেই নামব।

তা নামলও বিষ্ণুপদ। সাতসেরী মাছ আর স্যুটকেস সমেত বাঁ পা-টা কাদায় গেঁথে গিয়েছিল মাত্র, আর কিছু হয়নি। মাছ বা স্যুটকেসও হাত ছাড়া হয়নি, সেও কাদায় পড়ে কুমড়ো গড়াগড়ি যায়নি। তিন শালা দৌড়ে এসে কাদা থেকে বাঁ পা-খানা টেনে তুলল। জুতোখানা অবশ্য একটু খুঁজে বের করতে হয়েছিল।

সেই আসাটা খুব মনে আছে বিষ্ণুপদর, কারণ সেই আসাই আসা। একেবারে চূড়ান্ত আসা। শ্বশুরমশাই মাথায় ছাতা ধরলেন, দুই চাকর মাছ আর বাক্স ভাগাভাগি করে নিল। পাড়ার দু'চারজন মাতব্বরও জুটে গিয়েছিল সঙ্গে।

শ্বশুরমশাই কাকে যেন হাসি হাসি মুখে অহংকারের সঙ্গে বললেন, কেমন জামাই দেখছ?

আহা, যেন কার্তিক ঠাকুরটি। তোমার বরাত বেশ ভালই হরপ্রসন্ন।

গৌরবে বুকখানা যেন ঠেলে উঠল বিষ্ণুপদর।

বাড়িতে ঢুকতেই মেয়ে মহলে হুড়োহুড়ি, উলু, শাঁখ। সে এক এলাহি কাণ্ড। সদ্য পাঁঠা কাটা হয়েছে মস্ত উঠোনের একধারে। বাঁশে উল্টো করে ঝুলিয়ে তার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। আর এক ধারে অন্তত বিশ সেরী পাকা একখানা কাতলা মাছ বিশাল আঁশ বঁটিতে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাটছে দু'জন মুনীশ। সারা বাড়িতে একটা উৎসবের কলরব। শুধুমাত্র একটি জামাইয়ের জন্য। পাড়ার বাচ্চারা সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। বউরা সব দৌড়ে আসছে কাজকর্ম ফেলে।

কাছারিঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়েছিল তাকে। নিচু একখানা চৌকির ওপর গদি, তাতে ধপধপে চাদর, তাকিয়া। গোলাপজল ছিটোনো হল গায়ে। দু'জন চাকর এসে বাতাস করতে লাগল। গাঁয়ের সজ্জন, মুরুব্বি সব দেখা করতে এল। সকলের চোখই সপ্রশংসিত।

সে একটা দিন গেছে। বর্ষার জল নামলে নদী আর সে জল বইতে পারে না, পাড় ভাসিয়ে দেয়। খেয়া বন্ধ হয়েছে অনেক দিন। কংক্রিটের ব্রিজ হয়ে অবধি এখন ভারী ভারী বাসের যাতায়াত। কুসুমপুর ঘেঁষেই পাকা সড়ক, তা ধরে নাকি হিল্লি-দিল্লি যাওয়া যায়।

ওই পাকা সড়ক থেকেই রিকশা করে পঁক পঁক করতে করতে বিষ্ণুপদর জামাই গোবিন্দ এল। একে কি আসা বলে! খবর নেই, বার্তা নেই, পাতলুনের ওপর হাওয়াই শার্ট চাপিয়ে চটি ফটফটিয়ে এসে দাঁত কেলিয়ে হাজির হলেই হল।

নতুন জামাই কত ভারভাত্তিক হবে, তা নয়। এ যেন এক ফচকে ছোঁড়া ফস্টিনস্টি করতে এসেছে। তা হচ্ছেও ফস্টিনস্টি। দাওয়ায় মামাতো শালিরা সব ঘিরে ধরেছে, হাহা হি হি হচ্ছে খুব। চারদিকে

গুরুজন, তোয়াক্কাই নেই। কিন্তু দুঃখ অন্য জায়গায়। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ে মুক্তির ভাব হচ্ছে না, কিছু একটায় আটকাচ্ছে। মেয়েকে বিয়ের পর থেকেই ফেলে রেখেছে বাপের বাড়িতে। খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

কাঁঠাল গাছের ছায়ায় সাতকড়ি পুরনো কাঠ জুড়ে একখানা চৌকি বানাচ্ছে। গুষ্টি বাড়ছে, জিনিসও লাগছে। গাছের ছায়ায় একখানা মোড়া পেতে বসল বিষ্ণুপদ।

সাতকড়ির দাঁতে ধরা একখানা বিড়ি। তাতে অবশ্য আগুন নেই। বিড়িখানা দাঁতে ধরে রেখেই সাতকড়ি বলে, মেয়েখানা দিব্যি পার করেছ জামাইদা। এখন আমার কপালে কী আছে তাই ভাবছি। তিন তিনটে মেয়ে বিয়োলো বউ। সবই কপাল।

সাতকড়ির দুঃখটা বেশ করে অনুধাবন করে নেয় বিষ্ণুপদ। দোষটা যে কার তা এই বয়সেও সে ঠিক বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। কিছু কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে তা শেষ অবধি বুঝ-সমঝের মধ্যেই আসে না। কপাল বললে ল্যাটা চুকে যায় বটে, কিন্তু তাতে মনটা কেমন সায় দেয় না।

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেমন কার্তিকের মতো জামাই!

বিষ্ণুপদর একটু আঁতে লাগে। সবাই কার্তিক হলে তো কার্তিকের গাদি লেগে যাবে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলে, হুঁ, কার্তিক: না কেলে কার্তিক!

সাতকড়ি র‍্যাঁদা চালাতে চালাতে বলে, রং ধুয়ে কি জল খাবে জামাইদা? নাটাগড়ে তোমার জামাইয়ের মোটর গ্যারাজখানা দেখেছ? দিনরাত আট দশজন লোক খাটছে। বাপ আর চার ভাই মিলে মাস গেলে অন্তত পাঁচ ছ হাজার টাকা কামাচ্ছে। তার ওপর চাষ-বাস, মুদিখানা। এ যদি কার্তিক না হয় তা হলে কার্তিক আর কাকে বলে শুনি!

তা বলে অমন পাতলুন-পরা ফচকে জামাই আমার পছন্দ নয় বাপু। চেহারা দেখ, পোশাক দেখ, হাবভাব দেখ, জামাই বলে মনে হয়? একটু ভারভাত্তিক, গুরুগম্ভীর না হলে মানায়! আমরাও তো জামাই ছিলুম, না কি? সহবত কিছু কম দেখেছিস?

সাতকড়ি পুরনো লোক। হাতের কাজ থামিয়ে সে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে বলে, পুরনো কথা তুললেই ফ্যাসাদ, বুঝলে জামাইদা? ওসব নিয়ে ভেবো না। মেয়ে খেয়ে-পরে সুখে থাকলেই হল।

বিষ্ণুপদ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তার জামাই গোবিন্দ একটু তেরিয়া গোছের লোক। নিতান্ত দায়ে না পড়লে পেন্নাম টেন্নাম করে না, বিশেষ পাত্তাও দেয় না শ্বশুরকে। কানাঘুঁষো শুনেছে, শ্বশুর ঘরজামাই ছিল বলে গোবিন্দ একটু নাক সিঁটকোয়। বিপদ হল নাটাগড় থেকে তার নিজের বাড়ি গ্যাঁড়াপোতা বিশেষ দূরে নয়, পাঁচ ছ মাইলের মধ্যে। আর গ্যাঁড়াপোতায় গোবিন্দর এক দিদির বিয়ে হয়েছে। যাতায়াতও আছে। জামাই একদিন ফস করে বলেও বসল, আপনার মা ঠাকরোন যে এখনও বেঁচে আছেন সে কথা জানেন তো।

বড্ডই স্পষ্ট খোঁচা। কথাটা ঠিক যে, নিজের বাড়ির পাট একরকম চুকিয়েই দিয়েছিল বিষ্ণুপদ, বাপ আর ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাবও ছিল না। বিয়ের পর এ যাবৎ দু'চার বার গেছে বটে, কিন্তু সে না যাওয়ারই সামিল। গত দশ বারো বছরের মধ্যে আর ওমুখো হয়নি। কিন্তু তাতে দোষের কী হল সেইটেই বুঝে উঠতে পারে না বিষ্ণুপদ। সেই কারণেই কি জামাই তাকে অপছন্দ করে?

সাতকড়ি বিড়িটা খেয়ে বলে, আগে কত শেয়াল ডাকত সাঁঝবেলা থেকে, এখন একটারও ডাক শোনো?

বিষ্ণুপদ একটু অবাক হয়ে বলে, শেয়াল! হঠাৎ শেয়ালের কথা ওঠে কেন রে?

বলছিলুম, পুরনো দিনের কথা তুলে লাভ নেই। শেয়াল নেই, কুসুমপুরের ঘাট নেই, বাঁকা নদী মজে এল, পাকা পুল হল, শেতলা পুজোয় মাইক বাজা শুরু হল, ফি শনিবার বাজারে ভি ডি ও বসছে। এত সব হল, আর জামাই পাতলুন পরলেই কি কল্কি অবতার নেমে এল নাকি?

কিন্তু পুরনো দিনের কথা বিষ্ণুপদই বা ভোলে কী করে? গ্যাঁড়াপোতায় নিজের বাড়িতে তার কদর ছিল না। তিনটে ভাই আর তিনটে বোন নিয়ে সংসার। বাবার অবস্থা বেহাল ছিলই। তার ওপর বিষ্ণুপদ ছিল একটু পালোয়ান গোছের। ডন-বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, ফুটবল, সাঁতার এইসব দিকে মন। অনেক সময় হয়, এক মায়ের পেটে জন্মেও সকলে সমান আদর পায় না। বিষ্ণুপদ ছিল হেলাফেলার ছেলে।

স্পষ্টই বুঝত এ বাড়িতে তার কদর নেই। কদর জিনিসটা সবাই চায়, নিতান্ত ন্যালাক্ষ্যাপারও কদরের লোভ থাকে। দু' বেলা দুটো ভাত আর মেলা গঞ্জনা জুটত। কাজ-টাজের চেষ্টা নেই. দুটো পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই, বোনগুলো ধুমসো হয়ে উঠছে—সেদিকে তার খেয়াল নেই। নানা গঞ্জনায় জীবনটা ভারী তেতো হয়ে যাচ্ছিল। গ্যাঁড়াপোতার বটতলাই ছিল তখন সারা দিনমানের ঠেক। গাঁয়ের আরও কয়েকটা ছেলে এসে জুটত। পতিতোদ্ধারের জন্য মহাকালী ক্লাব খুলেছিল তারা। মড়া পোড়ানো থেকে বন্যাত্রাণ, কাঙালি ভোজন বারোয়ারি পুজো, মারপিট, যাত্রা থিয়েটার কথকতা সবই ছিল তাদের মহা মহা কাজ। বাইরে বাইরে বেশ কাটত। ঘরে এলেই মেঘলা, গুমোট, মুখভার, কথার খোঁচা, বাপান্ত। সেই সময় গ্যাঁড়াপোতার পাশেই কালীতলা গাঁয়ে এক শ্রাদ্ধবাসরেই তাকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল ভাবী শ্বশুর হরপ্রসন্নর। টাকাওলা লোক। পাঁচ গাঁয়ের লোক এক ডাকে চেনে। চারটে ছেলের পর একটা মেয়ে। বাপের খুব আদরের। হরপ্রসন্ন তখন ঘরজামাই খুঁজছেন। শ্রাদ্ধবাড়িতেই ডেকে কাছে বসিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে সব হাঁড়ির খবর নিলেন। গরিব ঘরের ছেলেই খুঁজছিলেন, নইলে ঘরজামাই হতে রাজি হবে কেন? বিয়ের গন্ধে বিষ্ণুপদও চনমন করে উঠল। এতকাল ও কথাটা ভাববার সাহসটুকু অবধি হয়নি। বিয়ে যে তার কোনওকালে হবে এমনটি সে কারও মুখে শোনেওনি কোনও কালে। যেই কথাটা উঠল অমনি বিষ্ণুপদর ভেতরে তুফান বয়ে যেতে লাগল। পারলে আগাম এসে শ্বশুরবাড়িতে হামলে পড়ে। সেই বিয়ে নিয়েও কেচ্ছা কম হয়নি। প্রথমেই বাপ বেঁকে বসল। মাও নানা কথা কইতে শুরু করল। ঘরজামাই যখন নিতে চাইছে তখন মেয়ে নিশ্চয়ই খুঁতো। তা ছাড়া এ-বংশের কেউ কখনও ঘরজামাই থাকেনি, ওটা বড় লজ্জার ব্যাপার।

বিষ্ণুপদ দেখল তার সুমুখে ঘোর বিপদ। বিয়ে বুঝি কেঁচে যায়। চিরটা জীবন তা হলে গ্যাঁড়াপোতায় খুঁটোয় বাঁধা থেকে জীবনটা জলাঞ্জলি দিতে হবে। এ সুযোগ আর কি আসবে জীবনে? সে তার মাকে বোঝাল, ধরো, আমি তোমার আর একটা মেয়েই, তাকে বিয়ে দিয়ে বেড়াল-পার করছ। এর বেশি তো আর কিছু নয়।

ঘরজামাই থাকা মানে জানিস? শ্বশুরবাড়িতে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবি ভেবেছিস? তারা তোকে দিয়ে চাকরের অধম খাটাবে। দিনরাত বউয়ের মন জুগিয়ে চলতে হবে। এ যে বংশের মুখে চুনকালি দেওয়া।

বাপের সঙ্গে কথা চলে না। তবে বাপ সবই শুনল, শুনে বলল, কুলাঙ্গার, বিয়ের বাই চাপলে মানুষ একেবারে গাধা হয়ে যায়।

তলিয়ে ভাবলে গাধার চেয়ে ভালই বা কী ছিল বিষ্ণুপদ? দু' বেলা দু' মুঠো খাওয়া আর অচ্ছেদ্দায় দেওয়া লজ্জা নিবারণের কাপড় জামা, এ ছাড়া আর কীসের আশা ছিল বাপ মায়ের কাছে। গাধা বলায় তাই দুঃখ হল না বিষ্ণুপদর। সে মাকে আড়ালে বলল, ধরো, তোমার একটা ছেলে বখেই গেছে বা মরেই গেছে। গাধা গোরু যাই হই আমার আখের আমাকে দেখতে দাও তোমরা। গলার দড়িটা খুলে দাও শুধু।

হরপ্রসন্ন—অর্থাৎ তার ভাবী শ্বশুর লোক মারফত খোঁজ নিচ্ছিল। বিষ্ণুপদর বাবা সেই লোকদের কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগল। তা একদিন জোঁকের মুখে একেবারে এক খাবলা নুন পড়ে গেল। হরপ্রসন্নর এক অমায়িক ভাই দুর্গাপ্রসন্ন এসে বিষ্ণুপদর বাপকে কড়কড়ে হাজার টাকা গুনে দিয়ে বলল, বরপণ বাবদ আগাম পাঠিয়ে দিলেন দাদা। বিয়ের আসরে আরও হাজার।

হরপ্রসন্ন মানুষকে প্রসন্ন করতে পারতেন বটে। বাপের মুখে খিল পড়ল, মুখখানাও হাসি-হাসি হয়ে উঠল। মাও আর রা কাড়ে না। শুধু চোখের জল মুছে একদিন বলল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি মাকে মনে থাকবে রে বাপ? ওরা বড় মানুষ, টাকায় ভুলিয়ে দেবে।

কথাটা ভাঙল না বিষ্ণুপদ। ভাঙলে মা দুঃখ পাবে। সে আসলে ভুলতেই চায়। ভাবী শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মাথাটা নুয়ে আসছিল বারবার।

বাবা আর এক ভাই গিয়ে পাত্রীও দেখে এসে বলল, দেখনসই কিন্তু নয়। তবে গাঁ-ঘরে চলে যাবে। এ বাড়িতে তো আর থাকতে আসবে না, আমি মত দিয়েই এসেছি।

পাত্রী কেমন তা বিষ্ণুপদ জানত না। কথাটা তার খেয়ালই হয়নি। লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি

পাওয়াটাই তখন বড কথা। পাত্রী সুন্দরী না বান্দরী তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছুই ছিল না। গ্যাঁড়াপোতা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে এই ঢের।

আর বিয়েটাও হল দেখার মতো। বাদ্যি বাজনা ঠাট ঠমক জাঁকজমকে পাত্রী চাপা পড়ে গেল কোথায়। শুভদৃষ্টির সময় এক ঝলক দেখে কিছু খারাপ লাগল না বিষ্ণুপদর। কম বয়সের কিন্তু চটক আছে একটা। পাত্রী নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থাও তখন তার নয়। তাকে নিয়েই তখন হই-চই। চারদিকের লোক জামাইয়ের চেহারা দেখে ধন্য ধন্য করছে। এতদিন পর জীবনে প্রথম একটা কাজের কাজ করেছে বলে আনন্দে দেমাকে বুঁদ হয়ে গেল বিষ্ণুপদ।

বিচক্ষণ হরপ্রসন্ন গোপনে নাকি বউ-ভাতের খরচাটাও জুগিয়েছিল। গ্যাঁড়াপোতায় সেই প্রথম ও শেষবার আসা বিষ্ণুপদর বউ পাপিয়ার। মোট বোধহয় দিন সাতেক ছিল। ওই সাতদিনে তাকে যথেষ্ট উত্যক্ত করেছিল বিষ্ণুপদর হিংসুটে বোনেরা। মাও খোঁচানো কথাবার্তা বলত। বড়লোকের মেয়ে বলে কথা। তার ওপর বাড়ির ছেলেকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে পাপিয়াকে রেখে গ্যাঁড়াপোতায় ফিরল বিষ্ণুপদ। তখন তিনটে মাস বড় জ্বালা যন্ত্রণায় কেটেছে। কেউ কথা শোনাতে ছাড়েনি। গঞ্জনা একেবারে মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠেছিল। কথা ছিল জামাইষষ্ঠীতে পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বিষ্ণুপদ। সুতরাং বাড়ির লোক ওই তিনমাস সুদে আসলে উশুল করে নিল। বিষ্ণুপদ কারও কথার জবাব দিল না, ঝগড়া কাজিয়া করল না। তার সামনে সুখের ভবিষ্যৎ। কটা দিন একটু সয়ে নিল দাঁত চেপে। শ্বশুরবাড়িতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তোয়াজে আদরে একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড। চাইবার আগেই জিনিস এসে যায়। ডাইনে বাঁয়ে চাকরবাকর। লটারি জিতলেও ঠিক এরকমধারা হয় না।

তবে সব কিছুর মূলেই ছিলেন শ্বশুর হরপ্রসন্ন। কী চোখেই যে দেখেছিলেন বিষ্ণুপদকে। সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। কাজকারবার, চাষবাস, মামলা মোকদ্দমা, ধানকল-আটাচাকি, গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বি থেকে শুরু করে সরকারি আমলাদের সঙ্গেও ভাব-ভালবাসা ছিল তাঁর।

সম্বন্ধীরা কি আর ভাল চোখে দেখছিল এইসব বাড়াবাড়ি? চার সম্বন্ধীই বিয়ে করে সংসারী। ছেলেপুলে আছে। ভবিষ্যৎ আছে। তারা কি বিপদের গন্ধ পায়নি এর মধ্যে? খুবই পেয়েছিল এবং পেছন থেকে তাদের বউদেরও উস্কানি ছিল, আরও উসকে দিচ্ছিল বউদের বাপের বাড়ির লোকজন।

বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অশান্তি হচ্ছিল বেশ। কিন্তু হরপ্রসন্নর মাথায় গোবর ছিল না। তিনি আগেভাগেই জানতেন, এরকমধারা হবেই। মেয়ের নামে আলাদা বাড়ি, কিছু জমি আর একখানা কাঠচেরাইয়ের কল করে রেখেছিলেন। ছেলেদের ডেকে একদিন তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়সম্পত্তির বাঁটোয়ারা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ বাবারা, কোনও অবিচার যদি করে থাকি তো এইবেলা বলে ফেল। তা হলে গাঁয়ের পাঁচটা লোক সালিশে বসুক এসে। আমার মনে হয় সেটা ভাল দেখাবে না।

ছেলেরা একটু গাঁইগুঁই করলেও শেষ অবধি মেনে নিল। তারা কিছু কম পায়নি।

হরপ্রসন্ন তাঁর বিশাল বাস্তুজমি পাঁচভাগ করে দেয়াল তুলে দিলেন। আগুপিছু এবং পাশাপাশি পাঁচখানা বাড়ি হল। নিজের নামে বড় বাড়িখানা শুধু রইল। বেঁচে থাকতেই সংসারের শান্তির জন্য ছেলেদের পৃথগন্ন করে দিলেন। শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে থেকে থেকেই সংসারের চোখ ফুটল বিষ্ণুপদর। বিষয়বুদ্ধি হল। কেনাবেচা, আদায়-উশুল লোক চরিত্র সব শিখল। শ্বশুরই ছিল তার গুরু। ফচকে নিতাই বলত, বাপু হে, তুমি দেখছি বিয়ে বসেছ তোমার শ্বশুরের সঙ্গেই।

তবে হ্যাঁ, সবটাই এমন সুখের বৃত্তান্ত নয়। তার বউ পাপিয়া বড় অশান্তি করেছে। কথায় কথায় কান্না, আবদার, রাগ। সে ঘরজামাই থাকুক এটা পাপিয়া একদম চাইত না। এমন কথাও বলত, তুমি তো আমার বাবার চাকর। বিষ্ণুপদ মধুর সঙ্গে এইসব ছোটখাটো হুল হজম করে গেছে। কারণ সত্যি কথাটা হল, বউকে নয়, শ্বশুরকে খুশি করতেই প্রাণপণ চেষ্টা করত বিষ্ণুপদ। সে বুঝত এই একটা লোকের কাছে তার কদর আছে।

প্রথম প্রথম যতটা খাতির-যত্ন ছিল তা কালধর্মে কমে গিয়েছিল। তা যাক, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থিতু হয়েছিল সে। সেইটেই বা কম কী? জমিজমা, চালু কারবার, দিব্যি বাড়ি, ছেলেপুলেও হতে লাগল। প্রথমটায় মেয়ে, তারপর দুই ছেলে।

সেই মেয়েরই জামাই ওই গোবিন্দ। শ্বশুর মরার পরই বিয়েটা হয়েছে। বড় সম্বন্ধী পরিতোষই এই বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়ে আসে। পাল্টি ঘর, অপছন্দের কিছু ছিল না। বিয়ে হয়েও গেল। তবে জামাই কেমন যেন একটু ফণা-তোলা সাপের মতো। একটুতেই কেমন যেন রোখা-চোখা ভাব দেখায়।

তাকে ভাবিত দেখে সাতকড়ি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, তোমার বরাত হল সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। নিজের বিয়ে যেমন বোমা ফাটিয়ে করলে, মেয়েটারও তেমনি।

২

পোলের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্ত ঝুঁকে নদী দেখছিল। ব্যাটারা পোলটা বানিয়েছে ভাল। দিব্যি তকতকে জায়গা। বর্ষাবাদল না থাকলে শুয়ে ঘুমোনো যায়। বসে ভাত খাওয়া যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে পোলের তলায় সেঁধিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকলেই হল। পোলটা হয়ে ইস্তক কৃষ্ণকান্ত এখানেই থানা গেড়েছে। বড় পছন্দের জায়গা। কত উঁচু! এখানে দাঁড়ালে কতদূর অবধি দেখা যায়, আর হাওয়া-বাতাসও খেলে।

সবাই জানে না, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত খবর রাখে, পোল বাঁধতে তিনটে নরবলি হয়েছিল, বাজঠাকুরকে পাঁচখানা পাঁঠা মানত করতে হয়েছিল। তাতেও হয়নি। রোজ ব্যাটারা থাম বানাত আর নিশুত রাতে হারুয়া-ভূত এসে থাম নড়িয়ে গোড়া আলগা করে রেখে যেত। শেষে বাতাসপুরের শ্মশান থেকে হাতে-পায়ে ধরে নকুড় তান্ত্রিককে এনে ভূত বশ করতে হয়েছিল।

কিন্তু এত করেও লাভটা হল লবডঙ্কা। পোল বানানো হল বলে বাঁকা নদী রাগ করে সেই যে শুকোনো শুরু করল, এখন তো লোপাট হওয়ার জোগাড়। শালারা নদীকে গয়না পরাতে গিয়েছিল। বেহদ্দ বেকুব না হলে মা মুক্তকেশীকে কেউ গয়না পরায়? বাঁকা নদীর জলে চান করলে আগে পুণ্যি হত। কৃষ্ণকান্ত রোজ নিশুত রাতে পোলের তলায় শুয়ে শুনতে পায়, হারুয়া-ভূত নদীর দু ধারে দুই ঠ্যাং ফাঁক করে রেখে ছ্যাড়ছ্যাড় করে নদীতে পেচ্ছাপ করছে। এখন খা শালারা ভূতের মুত।

কৃষ্ণকান্ত রেলিং থেকে ঝুঁকে নদী দেখছে আর আপনমনে হাসছে। নদীর যত বৃত্তান্ত তা তার মতো আর কেউ জানে না। নন্দবাবুর মেয়ে শেফালি পোল থেকে লাফিয়ে পড়ে ম'লো—এ বৃত্তান্ত সবাই জানে। বিষ্ণুপদর ছেলে জ্ঞানের সঙ্গে তার একটু ইয়ে ছিল। টের পেয়ে নন্দবাবু খুব ঠ্যাঙায়। অপমানে শেফালি এসে ঝাঁপ খেল। কিন্তু কেউ জানে না, বাঁকা নদী কিছুদিন হল খুব ডাকাডাকি করছিল শেফালিকে। পরীক্ষায় ফেল হয়ে বিশ্বেসদের ফটিকও ঝাঁপ খেল। সে কি এমনি এমনি? বাঁকা রোজ সব কচিকাঁচা ছেলেপুলেকে ডাকছে। একটি দুটি করে এসে ঝাঁপ খাবে আর মরবে।

তারপর যে কাণ্ডখানা হয় সেটাও কেউ টের পায় না। কৃষ্ণকান্ত পায়। মরা মেয়ে বা ছেলের জন্য মা-বাপেরা যখন কান্নাকাটি করছে তখন শেফালি দিব্যি বাঁকা নদীর বালিয়াড়িতে দাগ কেটে এক্কাদোক্কা খেলে আর ছুটোছুটি করে বেড়ায় মনের আনন্দে। ফটিকই বা কোন দুঃখে আছে? হারুয়াভূতের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বটফল-নাটাফল পাড়ে আর খায়। ভরদুপুরে পোলের তলায় ছায়ায় শুয়ে শুয়ে আধবোজা চোখে সব দেখতে পায় কৃষ্ণকান্ত। মাঝে মাঝে হরপ্রসন্নবাবু এসে পোলটার দিকে চেয়ে খুব রাগারাগি করেন, এত জল ছিল নদীতে, সব গেল কোথায়? অ্যাঁ! গেল কোথায় অত জল? এই বলে ইয়া বড় বড় ঢ্যালা তুলে পোলের গায়ে ভটাভট ছুঁড়ে মারেন। ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

পোলটাকে ঘুরেফিরে সারাদিনই দেখে কৃষ্ণকান্ত। ঝাঁ ঝাঁ করে যখন বাস আর লরি পার হয় তখন শব্দটা যা ওঠে তাতে বুকটা ঝনঝন করতে থাকে। পোলের তলায় বসে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আবার যখন বাতাস বয় তখন পোলটার গায়ে বাতাসের ঘষটানির শব্দটা কেমন যেন বড় বড় শ্বাসের আওয়াজ তোলে।

রেলিংটা বেশ চওড়া। উঠে হাঁটাহাঁটি করা যায়। মজাও খুব। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল রেলিং-এর ওপর। তারপর হাঁটতে লাগল। বাঁ ধারে বাঁকা নদীর খাদ, ডানধারে পাকা রাস্তা। বেশ লাগছে তার।

পোলের মুখে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে চাকা বদলাচ্ছে। ক্লিনারটা চেঁচিয়ে বলে, এই শালা পাগল, পড়ে যাবি যে!

কৃষ্ণকান্ত খুব হাসে, পড়ব মানে! পড়লেই হল! এ হল আমার পোল। সেঁটে ধরে রাখে।

এদিককার লোকগুলো সুবিধের নয়। বড্ড লাথিঝাঁটার ঝোঁক এদের। যতদিন হরপ্রসন্ন বেঁচে ছিলেন ততদিন তেমন চিন্তা ছিল না কৃষ্ণকান্তর। চণ্ডীমণ্ডপে পড়ে থাকত। হরপ্রসন্ন মরার পর চণ্ডীমণ্ডপ গেল ঘরজামাই বিষ্ণুপদর ভাগে। সে ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ি। প্রথমটায় চোখ রাঙিয়ে, পরে মেরে ধরে তাড়াল। গিয়ে উঠেছিল হাটখোলার এক চালার নীচে। চৌকিদার শিবু এসে একদিন বলল, প্রতি রাতের জন্য চার আনা করে পয়সা লাগবে। তা সেখান থেকেও উঠতে হল। কিন্তু শালারা বুঝতে চায় না যে, মানুষের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা চাই। এই পোলটা হয়ে ইস্তক তার একখানা ঘরবাড়ি হয়েছে। পোলের তলায় ওপরে যেমন খুশি শোয়, বসে থাকে, ঘুরে বেড়ায়, কারও কিছু বলার নেই।

একটা বাস ঢুকছে কুসুমপুরে। জানলা দিয়ে লোকগুলো হাঁ করে তাকে দেখছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, গেল শালা মায়ের ভোগে।

না, অত সহজে যাচ্ছে না কৃষ্ণকান্ত। পোলের রেলিং ধরে সে রোজ হাঁটাহাঁটি করে। সে বুঝতে পারে, এ হল তার নিজের পোল। সরকার বাহাদুর তার জন্যই বেঁধে দিয়েছেন। এ হল তার তেতলা বাড়ি। পুব ধারের প্রান্তে এসে আবার ঘুরে পশ্চিমধারে এগোতে থাকে সে।

ছাতা মাথায় গুটিগুটি হেঁটে একটা লোক আসছিল। তাকে দেখে একটা লাফ মেরে পোলের শানের ওপর নামল কৃষ্ণকান্ত।

ঘরজামাই যে, একখানা বিড়ি ছাড়ো তো!

লোকটা দাঁড়াল। তার দিকে চাইল। তারপর বলল, পোলটা দিব্যি বাপের সম্পত্তি পেয়ে গেছিস দেখছি।

বাপের বাপ বড় বাপ। এ হল সরকার বাহাদুরের জিনিস। দেবে নাকি একখানা বিড়ি?

বিড়ি? তোর সাহস তো কম নয় দেখছি!

এতক্ষণ রেলিংয়ের ওপর খেলা দেখালুম যে! সারা দিনমান দেখাই। তবু কোনও শালা কিছু দেয় না, জানো?

কস্মিনকালে আমাকে বিড়ি সিগারেট পান খেতে দেখেছিস?

কৃষ্ণকান্ত একটু অবাক হয়ে বলে, বিড়ি খাও না? খাও না কেন বলো তো ঘরজামাই! বিড়ি তো খুব ভাল জিনিস।

ঘরজামাই! বলে খেঁকিয়ে ওঠে বিষ্ণুপদ, ঘরজামাইটা আবার কী রে? তোর তো দেখছি বেশ মুখ হয়েছে!

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, খারাপটা কী বললুম শুনি! তুমি হরপ্রসন্নবাবুর ঘরজামাই হয়ে এসেছিলে না এ গাঁয়ে?

তাতে তোর বাপের কী? বলে, ছাতাটা ফটাস করে বন্ধ করে বিষ্ণুপদ। লক্ষণটা ভাল নয়। ছাতাটা যেমন জুত করে ধরেছে, পেটাতে পারে।

না এই বলছিলুম আর কী। কৃষ্ণকান্ত দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, বিড়ি না দাও দশটা বিশটা পয়সাও তো দিতে পারো। সরকার বাহাদুর এত বড় পোলটা আমার জন্য বানিয়ে দিতে পারলেন, আর তোমরা এটুকু পারো না?

এঃ, সরকার বাহাদুর তোনার জন্য পোল বানিয়েছেন! তোর বাপের পোল!

কৃষ্ণকান্ত বুঝল, হবে না। সব সময়ে হয় না। মাঝে মাঝে আবার হয়েও যায়। লোকটাকে ছেড়ে কৃষ্ণকান্ত পোলের নীচে নেমে এসে ছায়ায় বসল। বেশ জুত করে বসল। মাথার ওপর ছাদ, চিন্তা কীসের?

একটা বিড়ি হলেও হত, কিন্তু না হলেও তেমন কষ্ট নেই। তার মাথায় হঠাৎ একটা কথা এল। আচ্ছা ঘরজামাই থাকলে কেমন হয়? ঘরজামাই থাকা তো খারাপ কিছু নয়। বিষ্ণুপদ কিছু খারাপ আছে কি? দিব্যি আছে। এতদিন কথাটা খেয়াল হয়নি তো তার! এদিককার লোকগুলোও যেন কেমনধারা, একবার ডেকে তো বলতে পারে, ওরে কেষ্টপাগলা, ঘরজামাই থাকবি? কেউ বলেওনি, তাই কৃষ্ণকান্তর খেয়াল হয়নি।

ঘরজামাই থাকার মেলা সুবিধে। কাপড়জামা জুতো ছাতা সব বিনি মাগনা পাওয়া যাবে। চারদিকে দেয়ালওলা ঘর হবে। দু বেলা দিব্যি খ্যাঁট। কাজকর্মও নেই। বগল বাজিয়ে মজাসে থেকে যাও। বিষ্ণুপদ যেমন আছে।

ইস্ কথাটা আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। কিন্তু আর দেরি করাটাও ঠিক নয়। এইবার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা দরকার। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল।

রাস্তায় নামতেই কে যেন হাঁক মারল, ওরে কেষ্টা, বলি হন হন করে চললি কোথা?

দিল পিছু ডেকে। কৃষ্ণকান্ত ফিরে দেখে সাতকড়ি। লোকটা বড় ভাল নয়। একখানা জলচৌকি করে দিতে বলেছিল কৃষ্ণকান্ত, বহুদিন হল ঘোরাচ্ছে। জলচৌকি হলে কৃষ্ণকান্তের একটু সুবিধে হয়। গোলের তলায় উবু হয়ে বসে থেকে থেকে হাঁটু দুটোয় ব্যথা। জলচৌকি হলে দিব্যি গা ছেড়ে বসে আরাম করা যেত। তা সাতকড়ি কখনও না করেনি। শুধু বলে রেখেছে, বিশ্বাসবাবুদের বড় কাঁঠালগাছটা কাটা হলেই সেই কাঠ দিয়ে বানিয়ে দেবে। বিশ্বাসবাবুদের বড় কাঁঠালগাছটা প্রায়ই গিয়ে দেখে আসে কৃষ্ণকান্ত। বে-আক্কেলে গাছটা মরেও না, পড়েও না। এবারও রাজ্যের কাঁঠাল ফলেছে। তবে সে নজর রাখছে।

সাতকড়ি সঙ্গ ধরে বলে, বড় ব্যস্ত দেখছি যে!

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, কাজে যাচ্ছি।

এ গাঁয়ে দেখলাম, একমাত্র তুই-ই কাজের লোক। সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছিস।

কৃষ্ণকান্তর হঠাৎ মনে পড়ল, সাতকড়ির তিনটে না চারটে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে। পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে কবে থেকে। কৃষ্ণকান্ত গলাটা একটু নামিয়ে বলল, সাতকড়িদাদা, আমাকে ঘরজামাই রাখবে?

সাতকড়ি একটু থমকাল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে, ঘরজামাই থাকতে চাস নাকি?

আজ ঠিক করে ফেললাম ঘরজামাই হয়েই থাকা ভাল। চারদিকে দেয়াল, মাথার ওপর ছাদ, দুবেলা খাওয়া, সকাল বিকেল চা। কী বলো! বিষ্ণুপদ কেমন আরামে আছে দেখছ তো!

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো জামাই পেলে কে না লুফে নেবে বল! আমিও নিতুম। তবে কি না আমরা হচ্ছি গরিব মানুষ। নিজেদেরই ঘরে ঠাঁই হয় না, তো জামাইকে রাখব কোথায় বল।

আমি বারান্দাতেও পড়ে থাকতে রাজি।

তুই তো রাজিই, কিন্তু জিনিসটা ভাল দেখায় না। শত হলেও জামাই বলে কথা, তার খাতিরই আলাদা। তার ওপর ধর আমাদের খাওয়াদাওয়াও তো শাক জুটলে অন্ন জোটে না। ঘরজামাই যদি থাকতে চাস তো তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কে যেন বলছিল সেদিন, ঠিক মনে পড়ছে না, ভাল একটা পাত্র পেলে খবর দিতে। ঘরজামাই রাখবে।

কে বলো তো!

একটু বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখ তো। যার দরকার সে ঠিকই বেরিয়ে এসে তোকে ধরবে।

মা কালীর দিব্যি কেটে বলছ তো!

ওরে হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ফিরিওলারা যেমন হাঁক মেরে মেরে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে তেমনি হাঁক মেরে মেরে গাঁটা একটা চক্কর দিয়ে আয়। সবাইকে জানান দিতে হবে তো। একটু বেশ গলা ছেড়ে হাঁক মারবি, ঘরজামাই রাখবে গো-ও-ও। ঘর-জামা-আ-আ-ই। পারবি না?

কৃষ্ণকান্ত খুশি হয়ে বলল, এ আর শক্ত কি?

যা লেগে পড় কাজে। হিল্লে হয়ে যাবে।

তেমাথার মোড়ে সাতকড়ি ভিন্ন পথ ধরল।

কেউ যদি একটু ধরিয়ে দেয় তা হলে সব কাজই কৃষ্ণকান্ত ঠিকঠাক করতে পারে। ধরিয়ে দেওয়ার লোকই যে সব সময়ে পাওয়া যায় না, এইটেই কৃষ্ণকান্তর মুশকিল। এই যে সাতকড়িদাদা এ বেশ ভাল লোক। কী করতে হবে, কেমন করে করতে হবে তা ধরিয়ে দিল। এখন বাকিটা জলের মতো সোজা। হাঁক মারতে মারতে কৃষ্ণকান্ত পুবপাড়ায় ঢুকে পড়ল।

মল্লিকবাড়ির বউ মালতী উঠোন ঝেঁটিয়ে ধানের তুষ তুলে রাখছিল হাঁড়িতে, সেই প্রথম ফিরিওলার ডাকটা শুনতে পেল। কিন্তু কী হেঁকে যাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে আগড় ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওরে ও কেষ্ট, কী বিক্রি করছিস? হাতে তো কিছু দেখছি না!

কেষ্ট রাস্তা থেকে নেমে এসে এক গাল হেসে বলল, ঘরজামাই রাখবে আমাকে?

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওরে সুবাসী, দৌড়ে আয়, ছুট্টে আয়। দেখসে পাগলা কী বলছে!

ছোট বউ সুবাসী এল, বাড়ির আরও মেয়েরা বেরিয়ে এল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল তাদের মধ্যে।

কৃষ্ণকান্ত বুঝল হবে না। বেশির ভাগ সময়েই হতে চায় না। মাঝে মাঝে হয়। কৃষ্ণকান্ত ফের পথে নেমে পড়ল।

গড়াইদের বাড়ির বুড়ো মদন গড়াই ক্ষেতের কাজ করছিল। হাতের দাখানা নেড়ে তেড়ে এল বেড়ার ধারে, ব্যাটা নতুন চালাকি ধরেছে! খুব বিয়ের শখ হয়েছে, হ্যাঁ!

কৃষ্ণকান্ত আরও একটু এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতেই বুঝতে পারল সে বেশ একখানা কাণ্ডই বাঁধিয়েছে। কেউ হাসছে, কেউ তাড়া করছে, কেউ গাল দিচ্ছে। তবে হাসির দিকটাই বেশি। ছেলেপুলেরাও লেগেছে পাছুতে। দু' চারটে ঢিলও পড়ল গায়ে। নানা কথা কানে আসছে, পাগলা বলে কী রে...কে করবে লো, ঘরজামাই থাকবে...বসবি নাকি বে ওলো নিত্যকালী, পোলের নীচে থাকবি ঘর বেঁধে...মরণ...কে যেন ক্ষেপিয়েছে আজ পাগলাকে...এঃ, শালার আজ বড় রস উথলেছে দেখছি...

গোবিন্দ খেতে বসেছিল ভিতরের বারান্দায়। তাকে ঘিরে শালিরা। সামনে শাশুড়ি। কচি বউ ঘোমটা টেনে দরজায় দাঁড়ানো। থালা ঘিরে বাটি। ঠিক এই সময় পাগলার হাঁক শোনা গেল। ছোট ফ্রক পরা শালি পটলী ছুটে গিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ফিরে এল, এ মা, কী অসভ্য! বলছে, ঘর-জামাই রাখবে গো ঘর-জামাই!

শাশুড়ির মুখখানা কালো হয়ে গেল, কে বলছে রে?

কে আবার! কেষ্টপাগল।

গোবিন্দ হাসি চাপতে গিয়ে এমন বিষম খেল যে খাওয়া বরবাদ হওয়ার জোগাড়। অন্য শালিরাও হাসছে। তাদের কারোও গায়ে লাগছে না। তারা সব মামাতো শালি।

গোবিন্দ চেয়ে দেখল, দরজায় তার বউটাও নেই। পালিয়েছে। বোধহয় লজ্জায়।

৩

হাতে কলমে না করলে চাষের মর্ম বোঝা কোনও শর্মার কর্ম নয়। চাষা যখন চষে তখন সে মাটির সঙ্গে কথা কয়, বলদের সঙ্গে কয়, লাঙলের সঙ্গে কয়, মেঘ-বাদল-রোদের সঙ্গে কয়, বাজঠাকুরের সঙ্গে কয়, সাপখোপের সঙ্গে কয়, নিজের কপালের সঙ্গে কয়, এমনকী ভগবানের সঙ্গেও কয়। এই সব কটা জিনিস মিলিয়ে তবে চাষ। কত তোতাই পাতাই করে, সোহাগ করে, মিতালি পাতিয়ে তবে এক একজনের সঙ্গে ভাবসাব হয়। তার চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে প্রাণ। মাটির ঢেলাটাও তার কাছে জ্যান্ত, লাঙলটা কাস্তেটা সবই জ্যান্ত। এরা সব সতীশের বন্ধু-বান্ধব। ছাঁচতলায়, উঠোনে যে সব গোখরো ঘুরে বেড়ায় তারাও বাস্তুর লক্ষ্মী—সতীশ তাদেরও বন্ধু মনে করে। সেদিন চাষের মাঠে এক কেউটে সুমুখে পড়ে কোমর অবধি ফণা তুলল। শানানো কাস্তে ছিল সতীশের হাতে, এক চোপাটে কেটে ফেলতে পারত। কিন্তু কাটেনি। শুধু বিড়বিড় করে বলেছিল, ধান কাটতে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি বাপু, মাপ করে দাও। কেউটেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে চলে গেল। ঝড় বাদলার দিনে ভারী বাতাস আসে, চালাঘর উড়ে যেতে চায়, যায়ও। ছেলেপুলে বউ নিয়ে সতীশ জড়সড় হয়ে বসে থাকে শুধু। জানে ঝড় দুনিয়ার নিয়মে আসে, তারও বিষয়কর্ম আছে। ঘাসের মতো মাথা নুইয়ে থাকতে হয়, ঝড় কিছু করে না গরিবের ক্ষতি। মেঘের ওপর থেকে বাজঠাকুর যখন বজ্রের বল্লম ছুঁড়ে মারেন তখনও সতীশ নিশ্চিন্তে ক্ষেতে কাজ করে। জানে, মরার হলে কেউ কি ঠেকাতে পারবে?

প্রাণ, চারদিকে কেবল প্রাণের খেলা দেখতে পায় সতীশ। সবাই ভারী জ্যান্ত, ভারী বন্ধুর মতো।

আগে বাঁকা নদীতে জল ছিল খুব। উপচে পড়ত। আজকাল আর জল নেই। বালির ওপর বালি জমা হয়ে উঁচুতে উঠেছে নদীর খাত। একধার দিয়ে শুধু নালার মতো জল বয়ে যায়। যখন জল ছিল, তখন বাঁকা নদীর জল ছেঁচে ক্ষেত ভাসিয়েছে সতীশ। আজকাল একটু কষ্ট, বর্ষাবাদল না হলে ক্ষেত জল পায় না। নদীকেও কেমন মানুষ-মানুষ লাগে সতীশের। সেও যেন কিছু বলে, কিছু শোনে।

ভারী ঠাণ্ডা সুস্থির সতীশের জীবন। সকাল থেকে রাত অবধি তার খাটুনির শেষ নেই। ক্ষেতে চাষ, বলদ গোরু, কুকুর বেড়াল কাক সকলের যত্নআত্তি করা, ছেলেপুলে বউ সকলের পালনপোষণ আছে, গাছপালা আর পঞ্চভূত আছেন। সকলকেই সতীশ খুশি রাখতে চেষ্টা করে। কেউ জানে না, তার দুটো হেলে বলদ কখন হাসে কখন কাঁদে। তার গোরুটা কখন উদাস হয়ে যায়। তার কুকুর চারটে, তার তিনটে বেড়াল এদেরও কি ঠিক মতো কেউ বুঝতে পারে, সতীশ ছাড়া? বাতাসে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, রাতবিরেতে যাদের দেখলে লোকে ভিরমি খায়, তাঁদেরও টের পায় সতীশ। গভীর রাতে মাঝে মাঝে সে যখন ঘুম ভেঙে উঠে মহাবিস্ময়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে তখন টের পায়, কারা যেন বাতাসের মধ্যে বাতাসের শরীর নিয়ে মিশে কাছাকাছি আসে। একটু গা শিরশির করে তার।

একদিন বেহান বেলায় ঘাড়ে ভারী লাঙ্গল আর দুটো বলদ নিয়ে মাঠে যাচ্ছে সতীশ। আলের ওপর মুখোমুখি একটা ফুটফুটে ছেলের সঙ্গে দেখা। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা। কী যে সুন্দর তার মুখচোখ। সতীশ হাঁ করে দেখছিল। ছেলেটা তার কাছাকাছি এসে একগাল হেসে বলল, এই দেখ, আমি দাঁত মেজেছি। আমার হাতে দেখ একটুও ময়লা নেই। আমি আজ কোনও দুষ্টুমি করিনি।

এত সুন্দর করে বলল যে ওই সামান্য কথাতেই কেন যেন জল এল সতীশের চোখে। সে ধরা গলায় বলল, তোমার ভাল হবে বাবা, তুমি বড় ভাল ছেলে।

ছেলেটা খুশি হয়ে নদীর ধার দিয়ে কোথায় চলে গেল। সতীশ কাউকে কিছু বলেনি, বলতে নেই। মনে মনে সে জানে, সেদিনই সে ভগবানকে দেখেছে।

দুপুরবেলা দুটো তৃষ্ণার্ত বলদকে একটা মাটির গামলায় নুন মেশানো জল খাওয়াচ্ছিল সতীশ। উঠোনে একটা ছায়া এসে পড়ল।

সতীশ, আছিস নাকি রে?

মনিবকে দেখে সতীশ তটস্থ হল। বাঁকা নদীর পোল পেরিয়ে মনসাতলা দিয়ে টুকটুক করে ছাতাটি মাথায় দিয়ে উনি নিত্যই আসেন। আসেন, এসে চাষের সময় ক্ষেতের ধারে আলের ওপর বসে থাকেন। ধান ঝাড়া হলে দেখতে আসেন। ধান মাপবার সময় দেখতে আসেন। কী দেখেন তা সতীশ জানে। বিঘে প্রতি যা ন্যায্য পাওনা হয় তা সতীশ বরাবর তুলে দিয়ে আসে মনিবের গোলায়। খরা বা বান হলে কম বেশি হয়।

মেয়ে খেঁদি দৌড়ে গিয়ে একটা জলচৌকি এনে পেতে দিল দাওয়ায়। মুখের ঘামটি কোঁচায় মুছে মুনিব বসলেন। ফর্সা মুখখানা রোদের তাতে রাঙা হয়ে আছে। চুল আর গোঁফ কিছু পেকেছে, তবু মান্যিগন্যি করার মতোই চেহারা।

খেঁদির কাছে চেয়ে এক ঘটি জলের অর্ধেকটা খেয়ে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ আছিস তোরা।

এ কথাটার মানে হয় না। শুনলে লজ্জা করে সতীশের। ভাল থাকা মন্দ থাকার সে কীই বা জানে। তবে মেখেজুখে আছে, মিলেমিশে আছে। চারদিকটার সঙ্গে তার ভারী ভাবসাব। মনে হয় পোকাটা মাকড়টা অবধি তাকে চেনে জানে।

সে মনিবের সামনে উঠোনে উবু হয়ে বসে বলে, দুটো ডাব পাড়ি?

ডাব! না রে, এ দুপুরে তোকে আর গাছে উঠতে হবে না।

কিছু নয় কর্তাবাবু। হনুমানের মতো উঠব আর নামব। যাওয়ার সময় কয়েকটা গন্ধরাজ লেবু নিয়ে যাবেন। এবার মেলা ফলেছে।

ডাবটা আস্তে আস্তে খেতে খেতে মনিব বললেন, সেই শ্বশুরমশাইয়ের আমল থেকে তোকে দেখে আসছি। একই রকম রয়ে গেলি। তুই বুড়ো হস না?

সতীশ মাথা চুলকে বলে, বয়স ভাঁটিয়ে গেছে অনেক দিন। সে কি আর আজকের কথা! বুড়োও

হচ্ছি নিশ্চয়ই, বয়স তো হলই।

সেইরকম পাকানো চেহারা, শক্তপোক্ত, সারাদিন রোদে জলে খাটিস, বয়স মানিস না, তোর রকমটা বুঝতে পারি না।

ওই আজ্ঞে একরকম। চাষাভুষোর শরীর তো।

ওরে, আমিও পালোয়ান কিছু কম ছিলুম না। দেখেছিস তো সেই চেহারা!

আজ্ঞে দেখিনি আবার! সব চোখের সামনে ভাসছে। যেদিন বিয়ে করতে এলেন নৌকো করে, পালকি ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়েছিলাম! বুড়োকর্তার সে কী আহ্লাদ। কার্তিকের মতো জামাই হয়েছে।

আর লজ্জা দিস না। আজকাল নড়তে চড়তে হাঁফ ধরে যায়।

শরীর তো কিছু বেজুত দেখছি না আমি। অনেকটা সেইরকমই আছেন।

বিষ্ণুপদ উদাস চোখে মাঠঘাট পেরিয়ে কোন উধাওয়ের দিকে যেন চেয়ে থাকে। তারপর একটু ধরা-ধরা গলায় বলে, বিষয়-বিষয় করেই বোধহয় এরকম ধারা হল, কী বলিস!

গন্ধরাজ লেবু ক'টা কুয়োর জলে ধুয়ে এনে দাওয়ার ওপর রেখে সতীশ বলে, আপনার বিষয় না থাকলে আমার পেট চলত কী করে? আপনার জমিতে চাষ, আপনার ভুঁয়েই বাস।

বিষ্ণুপদ বড় বড় চোখে কেমন বিকল একরকম নজরে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে বলে, ঠিক জানিস?

কীসের কথা বলছেন?

এ জমি যে আমার, এই চাষবাস যে আমার!

তা কে না জানে! হরপ্রসন্নবাবু আপনার নামে লিখে দেননি এসব?

কর্তাবাবুর আজ বড় বড় শ্বাস পড়ছে, লক্ষ করে সতীশ। মুখখানাও ভার। আজ বাবুর মনটা ভাল নেই। মন নিয়ে কারবার নেই সতীশের। তাব মন বলে কি বস্তু নেই? থাকলেও ঠাহর পায় না। সকাল না হতেই কাজে নেমে পড়তে হয়। শরীর বেটে দিতে হয়, জান চুয়াতে হয়, তবে মাঠে মাঠে ফলন্ত মা লক্ষ্মীকে দেখা যায়। তখন শরীরে কেমন একখানা ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগে।

বিষ্ণুপদ ডাবের খোলাটা সতীশের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলেন, লিখেই তো দিয়েছিলেন রে। তুই তো লেখাপড়া শিখিসনি, দলিলে কী লেখা থাকে তাও জানিস না।

সতীশ গম্ভীর মাথা নেড়ে বলে, তা অবশ্য জানি না। তবে এটা মনে হয় কোন জমিটা কার তা স্পষ্ট করে বলা থাকে দলিলে।

তাও থাকে। তবে আমরা হচ্ছি ভাড়াটে। আসল জমি হল সরকার বাহাদুরের। ভোগ দখল বিক্রি, বা বিলিব্যবস্থার অধিকার আছে মাত্র। সরকার ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারে।

সতীশ মাথা নেড়ে বলে, সে কথাও ঠিক নয়। এই আলো বাতাস এসব তো সরকার বাহাদুরের নয়, নাকি?

আলো বাতাস! তা কী করে সরকারের হতে যাবে?

তা হলে জমিও নয়! দুনিয়াটা যার এসব হচ্ছে তারই জিনিস।

বিষ্ণুপদ সতীশের দিকে মায়াভরে চেয়ে থেকে বলে, তোর মধ্যে এই একটা জিনিস আছে। এটাই তোকে বুড়ো হতে দেয় না। এর জন্যই এই বয়সেও তোর গায়ে মোষের মতো জোর। তোর মতো নয়, তাহলেও শ্বশুরমশাইয়ের মধ্যেও এরকম একটা ব্যাপার ছিল।

তিনি ছিলেন আমার অন্নদাতা দেবতা। ওরকম মানুষ হয় না।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, তুই তো সবার মধ্যেই ভগবান দেখতে পাস। এ খুব ভাল। আমাকে শেখাবি কী করে সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখতে হয়?

সতীশ লজ্জায় মুখ নিচু করে হাসে, কী যে বলেন তার ঠিক নেই। আমি শেখাব কি? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমরা। ওসব আস্পর্ধার কথা শুনতে নেই। তবে এটা জানি, জমির মালিক যদি আপনি না হন তবে সরকার বাহাদুরও নয়। আপনার যা বন্দোবস্ত সরকার বাহাদুরেরও তাই।

বুঝেছি রে। আর বোঝাতে হবে না। তুই সবকিছুর মধ্যে ভগবান দেখিস, আর আমি দেখি বিষয়।

তাই দেখেন কর্তাবাবু, তাই ভাল করে দেখেন।

বিষ্ণুপদ একটু ম্লান হেসে বলে, দূর পাগল! বিষয়ের মধ্যে আছেটা কী? তাও যদি নিজের জোরে করতে পারতুম তো বলার মুখ থাকত। এ হল গিয়ে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। শ্বশুরমশাই ঘর-জামাই করতে চাইল, তখন বড় গরিব ছিলুম তো, বাপের কাছে কলকে পেতুম না, তাই নেচে উঠেছিলুম। ভাবলুম না জানি চারখানা হাত গজাবে। এসে সাজানো সংসারে ঘটের মতো বসলুম। ফক্কিকারিটা যদি তখনও বুঝতে পারতুম রে। আজ যেন কোথায় একটা খোঁচা টের পাচ্ছি।

মানুষকে দুঃখ পেতে দেখলে সতীশের কেমন যেন জলে-পড়া অবস্থা হয়। সে একটু ব্যগ্র হয়ে বলে, তা এর মধ্যে খারাপটা কীসের দেখলেন? আমি তো কিছু খারাপ দেখছি না!

খারাপ নয়! পাঁচজন কি আর আমাকে ভাল বলে রে? আড়ালে রঙ্গ রসিকতা করে, আমি টের পাই। সম্বন্ধীরাও ভাল চোখে দেখে না। এমন কী বউ ছেলেপুলেরাও নয়। এই তো আজ জামাই এল, তার ভাবখানা যেন লাটসাহেবের মতো, শ্বশুর বলে যে কেউ একজন আছে তা গায়েই মাখতে চায় না।

সতীশ মাথা চুলকোয়। বাবুর সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে তা ঠিক ধরতে পারছে না সে। এই হল মুশকিল। নিজেকে বাবু-টাবুদের জায়গায় বসিয়ে তো আর ভাবতে পারে না। তার তো ওসব বড় বড় সমস্যা নেই। তবু সে বলল, জামাই তো দিব্যি আপনার। এই তো সেদিন বে হল। গাড়ি চেপে জামাই এল, কাছ থেকে বেশ করে দেখলুম।

বিষ্ণুপদ ঠাট্টা করে বলে, কী দেখলি? ভগবান নাকি?

সতীশ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, কিছু খারাপ নয় তো।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, খারাপ কাউকে বলি কী করে? খারাপ আমার কপাল। ভাবছি এখানে তোর কাছাকাছি একখানা ঘর তুলে থাকব। আমাকে তুই একটু চাষের কাজ শেখাবি?

কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

তোর সঙ্গে থেকে থেকে চাষবাস শিখব, বুড়ো বয়সকে ঠেকাতে শিখব, আর ভগবান দেখতে শিখব। শেখাবি?

আজ বাবুর কথাগুলো বড় উঁচু উঁচু দিয়ে চলে যাচ্ছে। সতীশ নাগাল পাচ্ছে না। কী বলতে হবে তাও মাথায় আসছে না তার।

ঠিক এই সময়ে তার বউ সুরবালা রান্নাঘর থেকে ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় আধখানা বেরিয়ে এসে বলল, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। বাবুকে বলো এখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে যেতে।

বিষ্ণুপদ গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বলে, সে কথাটাও মন্দ নয়। খাওয়াবি নাকি রে সতীশ দুটি ভাত?

সতীশ এত অবাক হল যে বলার নয়। বাবু খাবেন! তার বাড়িতে? সে উত্তেজিত হয়ে বলে, কচুঘেঁচু কী রান্না হয়েছে কে জানে! এ কি আপনি মুখে দিতে পারবেন? কত ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় আপনাদের।

রোজ তো নিজের মতোই খাই। আজ না হয় তোর মতোই খেয়ে দেখি। তেলটেল থাকলে দে। স্নানটা করে আসি।

এই যে দিই।

বলে সতীশ ছোটাছুটি শুরু করল। তেল এনে দিল। নিজেই গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলল। একখানা নতুন গামছা কিনেছিল হাট থেকে। সেইটি বের করে দিল। বিষ্ণুপদ যে সত্যিই তার বাড়িতে খেতে বসবে এটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার।

বিষ্ণুপদ সত্যিই স্নান করে এসে খেতে বসে গেল।

খেতে খেতে বলল, আমার মা এখনও বেঁচে আছে তা জানিস? গ্যাঁড়াপোতায় আমাদের বাড়ি। বহুকাল যাওয়া হয়নি। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে এমন মজে আছি যে—

সতীশ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। মিনমিন করে বলল, মোটা চালের ভাত, গিলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে খুব।

ছেলেবেলায় এই মোটা চালের ভাতই জুটতে চাইত না। কষ্ট ছিল খুব, আর কষ্টে থাকলে মানুষ কত কী করে ফেলে। শ্বশুরমশাই এমন লোভানীতে ফেলে দিলেন যে সব ছেড়েছুড়ে একেবারে

পুষ্যিপুত্তুরটি হয়ে চলে এলুম। একটা বড় লাফ মেরে খানাখন্দ সব ডিঙিয়ে এলুম বটে, কিন্তু একবার ফিরে দেখা তো উচিত ছিল ভাইরা, বোনরা, আমার মা-বাবা তারা ডিঙোতে পারল কি না। উচিত ছিল না, বল?

সতীশ সুরবালার দিকে চেয়ে বলে, বাবুকে আর একটু ডাল দাও বরং। আর একটু চচ্চড়িও নিন। ঝাল হয়নি তো বাবু?

ঝালটাই তো ব্যঞ্জন ছিল রে। ভাত পাতে আর কীই বা জুটত! শুধু লঙ্কা। বোনগুলোর একটাও ভাল বিয়ে হয়নি শুনেছি। ভাইগুলোও বড় কেউকেটা হয়নি। বাবা দুঃখে কষ্টে গেছে। মাটা এখনও ধুক্‌ধুক করে বেঁচে আছে।

সতীশ উঁচু হয়ে বসে পাতে আঁকিবুকি কাটছে। তার হল চাষাড়ে খিদে। যখন খেতে বসে তখন অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদ পায় না, গোগ্রাসে শুধু গিলে যায়। চোখের পলকে পাত সাফ। আজ তার ভাত যেন উঠতেই চাইছে না। পাহাড়প্রমাণ পড়ে আছে পাতে।

আপনার পেট ভরল না বাবু।

বিষ্ণুপদ খুব ধীরে ধীরে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে এসে বলল, এই দাওয়াতেই একটা মাদুর পেতে দে, একটু গড়িয়ে নিই। এখানে দিব্যি হাওয়া আছে।

সতীশের মেয়ে বেঁদি একটা পান সেজে এনে দিল। পান খায় না বিষ্ণুপদ। তার কোনও নেশা নেই, এক বিষয় সম্পত্তির নেশা ছাড়া। তবু আজ পানটা খেল।

আমাদের বালিশ বড় শক্ত কর্তাবাবু। তুলোর বড্ড দাম বলে পুরনো ন্যাকড়া-ট্যাকরা ভরে খোল সেলাই করে নিই। আপনার অসুবিধে হবে।

তুই অনেকক্ষণ ধরে কেবল ভদ্রতা করছিস। কাছে এসে বোস।

সতীশ বসল।

আধশোয়া হয়ে অনেকক্ষণ আবার সামনের মাঠঘাটের দিকে চেয়ে চেয়ে পান চিবোয় বিষ্ণুপদ। তারপর বলে, মানুষ যে কী চায় সেটাই তো বুঝতে পারে না। তুই বুঝিস?

সতীশ ঘনঘন মাথা চুলকে বলে, ক্ষেতে কিছু লাল শাক হয়েছে। খেঁদি তুলে দেবে'খন। নিয়ে যাবেন। মা ঠাকরুণ লাল শাক বড় ভালবাসেন।

আমাকে একটা ঘর করে দিবি? ওই ক্ষেতের মাঝখানটায় হবে। চারদিকে ধানক্ষেত থাকবে, মাঠ ময়দান থাকবে, গাছপালা থাকবে। একা একা বেশ থাকব। দিবি?

এবারও ধান ভাল হবে না। ক্ষেতে জল না হলেই বড় মুশকিল। নদীটাও শুকোল।

বালিশে মাথা রেখে বিষ্ণুপদ চোখ বুজল। আপন মনে বলল, কত বয়েস হয়ে গেল রে।

৪

পাগলাটাকে আজ বেধড়ক পিটিয়েছে ছানু। একেবারে অমিতাভ বচ্চনের কায়দায়। সে একা নয়, তাদের শীতলা মাতা স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরাও ছিল। তবে তারা বেশি মারেনি। ছানুরই রাগটা বেশি চড়ে গিয়েছিল। ঘর-জামাই রাখবে! ঘর-জামাই রাখবে বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করলে কার না রাগ হয়! জামাইবাবু খেতে বসেছে সবে, এমন সময় কোথা থেকে পাগলাটা এসে হল্লা জুড়ে দিল। তার বাবা ঘর-জামাই ছিল বলে একটু চাপা কানাকানি হাসি মশকরা বরাবরই শুনে আসছে ছানু। আজকের বাড়াবাড়িটা তাই সহ্য হয়নি।

কিন্তু মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল, একটা চোখ কালশিটে পড়ে বুজে গেছে, কাঁকালেও জোর লেগেছে। কোঁকাতে কোঁকাতে অজ্ঞান মতো হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়া ফেলে গোবিন্দই এসে জাপটে ধরল তাকে, করছটা কী? মেরে ফেলবে নাকি?

ছানু তখনও রাগে ফুঁসছে, কত বড় সাহস দেখলেন! বাবাকে অপমান!

গোবিন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল, নিজেদের ঘাড়ে নিচ্ছ কেন? পাগলরা কত কিছু করে, তার কি কিছু ঠিক আছে? এঃ, এর যে খুব খারাপ অবস্থা!

ক্লাবের ছেলেরাই দৌড়ে জল নিয়ে এল। বহুক্ষণ জলের ঝাপটাতেও কাজ হল না।

গোবিন্দ গম্ভীর মুখ করে বলল, ভিক্ষে করে খায়, কখনও তাও জোটে না, ওর কি এত মার খাওয়ার মতো ক্ষমতা আছে শরীরে? দেখছ না কেমন হাড়-বের-করা চেহারা, দুর্বল!

ছানু একটু ভয় খেয়ে গিয়েছিল তখন। যদি মরে টরে যায় তা হলে কী হবে? সে একটু কাঁপা গলায় বলল, ওরকম না বললে কি মারতুম?

গোবিন্দ শালার দিকে কঠিন চোখে চেয়ে বলল, পাগল আর দুর্বল বলেই মারতে পেরেছ, নইলে কি পারতে?

গোবিন্দ গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে কৃষ্ণকান্তের নাকে অনেকক্ষণ ধোঁয়া দিল। কাজ হল না তাতে।

পাগলটা বড্ড টানা মারছে শরীরটাতে। খিঁচুনির মতো।

এ গাঁয়ে ডাক্তার নেই? গিরীন না কে একজন ছিল না?

ক্লাবের একটা ছেলে বলে, হ্যাঁ, আমার কাকা। কাকা তো বেলপুকুর গেছে।

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, রাস্তায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না। তোমরা ধরো ওকে। দাওয়ায় তুলে শুইয়ে দাও। এ বোধহয় আজ খায়নি, পেটটা খোঁদল হয়ে আছে।

ক্লাবের ছেলেরা ধরাধরি করে, চণ্ডীমণ্ডপে তুলে শোয়াল কৃষ্ণকান্তকে। কে একটা পাখা নিয়ে এসে মাথায় বাতাস করতে লাগল।

ছানুকে ভিতর বাড়িতে নিয়ে গেল তার দিদি, এই তোকে মা ডাকছে।

পাপিয়া—অর্থাৎ ছানুর মা ছেলের দিকে চেয়ে বলে, খুন করেছিস নাকি পাগলটাকে?

তুমিই তো আমাকে ডেকে বললে পাগলটা কী সব অসভ্য কথা বলছে, গিয়ে দেখতে।

তা বলে অমন মারবি?

বেশি মারিনি। বেকায়দায় লেগে গেছে।

জামাই তোকে কী বলছিল? বকছিল নাকি?

জামাইবাবু মনে হয় রেগে গেছে।

এ কথায় তার দিদি আর মায়ের মুখ শুকোল।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, বিয়ের পর দু মাসও কাটেনি, এর মধ্যে জামাইকে কে যে ওষুধ করল কে জানে, বিষ নজরে দেখে আমাদের। মেয়েকে নেওয়ার নামটিও করে না। কেমন যেন রোখা-চোখা রাগ-রাগ ভাব। সাতবার খবর পাঠিয়ে আনিয়েছি, এ নিয়ে কথা বলব বলে। দিলি সব ভণ্ডুল করে। জামাই আরও রেগে রইল। এখন কী হবে?

কী হবে তার ছানু কী জানে? তবে গোবিন্দদা যে তাদের বিশেষ পছন্দ করে না এটা সে টের পায়। কিন্তু মাথা ঘামায় না। সংসারের সম্পর্ক টম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ভাল লাগে না।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, সব অশান্তির মূলে ওই একটা লোক। লোভী, স্বার্থপর, অন্ধ। বিয়ের পরই আমি পই পই করে বলেছিলাম, ওগো, বাবার সম্পত্তি আঁকড়ে পড়ে থেকো না, নিজের পায়ে দাঁড়াও। চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। মতিচ্ছন্ন হলে কি কেউ ভাল কথা কানে নেয়? বাবার পিছনে পিছনে চাকরবাকরের মতো ঘুরত। গাঁয়ে কত হাসাহাসি হয়েছে তাই নিয়ে, গ্রাহ্যও করত না।

মেয়ে মুক্তি বলল, ওসব কথা থাক তো এখন। চণ্ডীমণ্ডপে ভীষণ ভিড় জমে গেছে। আমার ভয় করছে।

পাপিয়া আর একবার চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে কাঁদল। তারপর মুক্তিকে বলল, কিছু টাকা বার করে ক্লাবের ছেলেদের হাতে দে। নাটাগড়ের হাসপাতালে ওকে নিয়ে যাক। মরলে সেইখানেই মরুক, এখানে যেন না মরে।

মুক্তি চলে গেলে ছানুর দিকে চেয়ে পাপিয়া বলে, জামাই যখনই আসে অমনি ওরা এসে জোটে।

কারা মা?

তোর মামাতো দিদি আর বোনেরা। ওরাও মাথাটা খাচ্ছে। মুক্তির দিকে ফিরেও চায় না। শালিদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে ফিরে যায়।

বিরক্ত হয়ে ছানু বললে, এখন একটা বিপদের সময় কেন যে জামাই নিয়ে পড়লে!

বিপদ তো তুই-ই বাঁধিয়েছিস মুখপোড়া। সংসারের কত রকম বিপদ আছে তা জানিস?

ছানু রাগে দুঃখে ঠোঁট কামড়ায়। বুকে বড্ড ভয়ও তার। মাথাটা কেমন করছে যেন। সে ক্যারাটে মারার কায়দায় একখানা লাথিও কষিয়েছিল পাঁজরে। সত্যিই মরে যাবে নাকি পাগলটা?

সে ঘুরে সদর দরজার কাছে এসে দূর থেকে ভিড়টা দেখতে পেল। তার দিদি মুক্তি গোবিন্দদার সঙ্গে কী যেন কথা বলছে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। গোবিন্দদার মুখটা লাল টকটক করছে। খুব রাগের সঙ্গে কী যেন বলছে। মুক্তি বোধহয় কাঁদছে। বারবার আঁচল তুলছে চোখে।

মরে গেল নাকি?

আজ বাজারে একটা সিনেমা দেখানো হবে। শিবা। দারুণ ঝাড়পিটের ছবি। ফিল্মটা দেখবে বলে কতদিন ধরে শানিয়ে রেখেছিল ছানু। অবস্থা যা দেখছে তাতে ফিল্ম দেখা লাটে উঠল।

এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। পাগলটার জন্য দরদ উথলে উঠবে মানুষের। অথচ লোকটা যে খেয়ে না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে রোজ মরতে মরতে বেঁচে ছিল তখন দরদটা ছিল কোথায়? যে কোনও দিন বাঁকা নদীর পোলের ওপর থেকেও তো পড়ে মরতে পারে। রোজ রেলিং-এর ওপর উঠে এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পায়চারি করে।

ভিড়ের ভিতর থেকে একটা চেঁচামেচি ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছে, কে মেরেছে রে? বাপের জমিদারি পেয়েছে নাকি? যা তো বলাগড় থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে আয় তো, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাক।

আর একজন খুব তেজের গলায় বলে, ঘর-জামাই রাখার কথায় বাবুদের খুব আঁতে লেগেছে বোধহয়। সাতে পাঁচে নেই পাগলটা, পোলের নীচে পড়ে থাকত। ইস, একেবারে খুনই করে ফেলেছে!

ধরে দে না ঘা কতক ছোঁড়াটাকে টেনে এনে। পালাল কোথায়?

ছানু কী করবে বুঝতে পারছে না। তার বীরত্বও উবে গেছে।

মাথাটা কেমন কেমন লাগছে।

গোবিন্দকে দেখতে পেল ছানু, ভিড় সরিয়ে চণ্ডীপণ্ডপে উঠে গেল। গোলমালটা একটু কম। সবাই খুব মন দিয়ে নিচু হয়ে কী যেন দেখছে। ভগবান! মরে যাচ্ছে নাকি? এবারকার মতো বাঁচিয়ে দাও ভগবান! জীবনে আর কারও গায়ে হাত তুলব না।

ছানু বিহ্বল হয়ে অবশ শরীরে শুয়ে পড়ল বারান্দায়।

কতক্ষণ শুয়ে আছে তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখতে পেল তার দিদি মুক্তি এক গ্লাস গরম দুধ আঁচলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে।

চোখ মেলেছে! চোখ মেলেছে! চিৎকার উঠল একটা।

ভগবান! বলে ডেকে কেঁদে ফেলে ছানু। পাঁচ সিকে মানত করে ফেলে শীতলা মায়ের কাছে। একটা শোরগোল উঠল চণ্ডীমণ্ডপে।

কেষ্ট পাগলা উঠে বসেছে। দুধ খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। একরকম জড়িয়ে ধরে আছে তাকে গোবিন্দ। দুধ খাওয়াচ্ছে।

মারমুখো ভিড়টাকে শেষ অবধি সামলে নিল গোবিন্দই। উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় ধমকের সুরে বলল, যে যার বাড়ি যান। এখানে ভিড় করে লাভ নেই। কৃষ্ণকান্তর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। এখন হাওয়া-বাতাস খেলতে দিন।

ভিড়টা পাতলা হতে লাগল। শেষ অবধি রইল গোবিন্দ, মুক্তি আর ক্লাবের দুটো ছেলে, যারা ছানুর বন্ধু।

গোবিন্দ হাতছানি দিয়ে ডাকল ছানুকে। ছানু দুর্বল পায়ে গিয়ে দাঁড়াল চণ্ডীমণ্ডপের কাছটিতে। কখন একটা শতরঞ্চি পেতে বালিশে শোয়ানো হয়েছে কৃষ্ণকান্তকে। চোখ মিটমিট করছে। ঠোঁটে একটু ভ্যাবলাকান্ত হাসি। পাগল বলে কথা, সে কি আর মারধোর অপমানের কথা মনে রাখে। গোবিন্দ ছানুর দিকে চেয়ে বলে, কেসটা খুব খারাপ করে ফেলেছিলে।

ছানু শুকনো গলায় বলে, আর হবে না।

খুব ভয় পেয়েছ না!

ছানু চুপ করে থাকে।

আর ভয়ের কিছু নেই। কৃষ্ণকান্ত মনে হচ্ছে, টিঁকে যাবে। গাঁয়ের লোক বলাবলি করছিল, ও নাকি আগে এই চণ্ডীমণ্ডপেই থাকত।

মুক্তি বলে, হ্যাঁ থাকত। নোংরা করে রাখে বলে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপ, তোমরা যা ভাল বুঝেছ করেছ। কিন্তু লোকে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। হরপ্রসন্নবাবু নিজেই থাকতে দিয়েছিলেন ওকে। একধারে পড়ে থাকত। কী এমন ক্ষতি হচ্ছিল তাতে?

তার দিদি মুক্তির সঙ্গে জামাইবাবু গোবিন্দর যে তেমন বনিবনা হচ্ছে না, এটা ছানুও জানে। তার দিদি বোধহয় এ কথার জবাবে একটা বাঁকা কথা বলে বসত। সম্পর্কটা এভাবেই খাট্টা হয়ে যায়। ছানু ছলছল চোখে বলল, না, ক্ষতি কীসের? আমি বাবাকে রাজি করিয়ে ওকে রেখে দেব।

দেখো চেষ্টা করে। হরপ্রসন্নবাবুর মায়াদয়ার শরীর ছিল। অনেকের আশ্রয়দাতা ছিলেন। লোকে সেকথা এখনও বলে। সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে এখন পোলের নীচে থাকে।

এতক্ষণ ছেলে দুটো কোনও কথা বলেনি। এবার তাদের একজন বলল, পোলের নীচেও তো দুপাশ খোলা। ঝড় জল হলে ভেজে।

প্রাণেশ বলল, রেলিঙের ওপর উঠে রোজ হাঁটে। কবে যে পড়ে মরবে।

গোবিন্দ একটু গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বলে, হরপ্রসন্নবাবুর বিষয়বুদ্ধিও ছিল, মহত্ত্বও ছিল। তার বিষয়বুদ্ধিটুকু শুধু নিলাম, মহত্ত্বটা নিলাম না এটা ভাল নয়।

খোঁচাটা কাকে তা টের পেল ছানু। কান একটু গরম হল।

মুক্তি বলল, এভাবে বলছ কেন? দাদু দাদুর মতোই ছিল, তা বলে সবাই তার মতো হবে নাকি?

সেই কথাটাই তো বলছি। সবাই কি আর ওরকম হয়? অনেকে শাঁসালো শ্বশুর পেয়ে মা-বাপকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। যাকগে, একে একটু দেখো। আমার ফেরার বাসের সময় হয়েছে। আমি এবার উঠব।

মুক্তির মুখ রাগে অভিমানে ফেটে পড়ছে। গোবিন্দকে খবর দিয়ে না আনলে সেও আসতে চায় না। এলেও রাতে থাকে না। ছানু বোঝে, কোথায় একটা কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। গোবিন্দদা বাবাকে একদম দেখতে পারে না। আর দিদি বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। তাই কি ওদের ঝগড়া।

৫

হেগে মুতে ফেলে বলে ছেলেরা আর মাকে ঘরে থাকতে দেয় না। বারান্দায় হোগলার বেড়া তুলে ঘিরে দিয়েছে, সেই বেড়ারও ওপর নীচে ফাঁক। শীতের হাড়-কাঁপানো হাওয়া, বর্ষাবাদলা, ধুলো বালি, সাপ-ব্যাঙ সবই ঢোকে। দরজা বলে কিছু নেই। খাঁ খাঁ করছে একটা দিক। বেড়াল-কুকুর ঢুকে পড়ে অহরহ। শরীরে নানা রোগভোগ নিয়ে বুড়ি একখানা নড়বড়ে চৌকির ওপর পড়ে থাকে। এ একরকম ঘরের বার করে দেওয়া। একরকম বিদায় দিয়ে দেওয়া।

গ্যাঁড়াপোঁতায় দিদির বাড়িতে গেলে একবার করে যায় গোবিন্দ। বুড়ো মানুষদের ওপর তার এমনিতেই একটা টান আছে। পুরনো সব দিন যেন ঘিরে থাকে তাদের, কত গল্প শোনা যায়। তাদের কষ্ট গোবিন্দ ঠিক সইতে পারে না।

তার ওপর এ হচ্ছে সম্পর্কে তার দিদিশাশুড়ি। নাতজামাই এ গাঁয়ে আসে জেনে বুড়ি বড্ড কাকুতি মিনতি করে ধরেছিল গোবিন্দর দিদি দিমিকে। নাতজামাই এলে যেন একবারটি চোখের দেখা দেখতে পায়। তারপর গোবিন্দ প্রায়ই যায়। মানুষকে মানুষের এত অপমান করার অধিকার নেই। থাকতে পারে না। বুড়িকে তার ছেলেরা যেভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্ছে এরকমটা কিন্তু কোনও বুড়ো মানুষেরই সঠিক পাওনা নয়। গোবিন্দর ইচ্ছে করে রাগে ফেটে পড়ে খুব অপমান করতে এদের।

এসে সে একখানা মোড়া পেতে কাছেই বসে থাকে। রসগোল্লা বা সন্দেশ নিয়ে আসে বুড়ির জন্য। বুড়ির নোংরা বিছানা বা কাপড় জামা, মুতের মেটে হাঁড়ি কিছুতেই সে ঘেন্না পায় না।

বুড়ি তার সাড়া পেলেই উঠে বসে। রোগা জীর্ণ চেহারা। রোগের যন্ত্রণায় চোখ মুখ বসে গেছে। তবু গোবিন্দ এলে ফোকলা মুখে খুব হাসে।

এসেছিস ভাই? তোকে দেখলে আমার প্রাণটা কেন ঠাণ্ডা হয় রে?

আপনার ঠাণ্ডা হয়, আর আপনার অবস্থা দেখলে যে আমার মাথা গরম হয়।

এরকমই তো হওয়ার কথা। সংসার বড় জঞ্জাল।

সংসার জঞ্জাল কেন হবে ঠাকুমা? সংসারকে জঞ্জাল বানালে তবেই তা জঞ্জাল হয়। আপনার ছেলেরা বড্ড অমানুষ।

বুড়ি ভয় খেয়ে বলে, ওরে, জোরে বলিসনি। শুনলে আমাকে খুব হেনস্থা করবে। একটু ওদের কথা বল, শুনি।

গোবিন্দ হাসে। ওদের কথা বলতে, বড় ছেলে আর তার সংসারের কথা। গোবিন্দ বলে, সে ছেলেও তো আপনাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে কেটে পড়েছে। বলি নাতি নাতনি কাউকে চোখে দেখেছেন?

বুড়ি খোঁতা মুখ করে বলে, কোত্থেকে দেখব বল! কে দেখাবে? তারা কি আর আসে? তবে ভাল থাকলেই ভাল।

ভাল থাকবে না কেন? দিব্যি ভাল আছে। আপনার ছেলে শ্বশুরের পয়সায় হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।

তোর বউটা কেমন হল? ভাল? যত্ন আত্তি করে?

এখনও ভাল করে ঘরে আনিনি।

ওমা! তা কেন রে?

ইচ্ছে হয় না। মেয়েটা বড্ড মুখরা। একটু তেল মজিয়ে নি।

ত্যাগ দিবি না তো!

গোবিন্দ হাসে, বিয়ে করার ইচ্ছেই ছিল না আমার। বিয়ে করলেই নানারকম ভজঘট্ট পাকিয়ে ওঠে। আপনার নাতনিটিও সোজা নয়। বিয়ের রাতেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল আলাদা বাসা করে থাকতে। সেই যে পিত্তি জ্বলে গেল, আর তা ঠাণ্ডা হল না।

তোর কিন্তু বড্ড রাগ ভাই। আমার নাতনিটাকে এনে একবার দেখাবি আমায়! তাকে দেখিনি তো কখনও। বড্ড দেখতে ইচ্ছে যায়। কবে মরে যাব, একবার মুখখানা দেখে রাখি। কেমন চেহারা রে? বাপের মতো মুখ পেয়েছে?

হ্যাঁ।

তা হলে দেখতে ভালই হবে। তোর পছন্দ তো?

চেহারা খারাপ নয়। আপনি তো তাদের কথা শুনতে চান, কিন্তু তারা কখনও আপনার কথা ভুলেও মুখে আনে না কেন ঠাকুমা? এটাই কি সংসারের নিয়ম?

বুড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুনেছি বিষ্টু নাকি এ বাড়িতে খুব কষ্টে ছিল বলে তার রাগ আছে। বিয়ে করে বিদেয় হওয়ার জন্য বড্ড অস্থির হয়েছিল। তা সে তার ছেলেপুলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই হল। এই বুড়ো বয়সে একটা কথাই কেবল মনে হয়, যে কটা দিন আছি যেন শোকতাপ পেতে না হয় আর। ওইটাই ভয়ের ব্যাপার, বুঝলি? ছেলেপুলে নাতি নাতনি যখন অনেকগুলো হয়ে যায় তখনই ভয় হয়, কোনটা পড়ল, কোনটা মরল। বড় জ্বালা।

বুঝেছি ঠাকুমা।

আর একটা হয়, সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বিষ্টুর তো দুই ছেলেও আছে। তারা কেমন?

আর পাঁচটা ছেলের মতোই।

এই পোড়া চোখে তো আর দেখতে পাব না তাদের। তোর চোখ দিয়েই যেন দেখতে পাচ্ছি।

এত মায়া কেন বলুন তো ঠাকুমা। এত মায়া থাকলে যে শরীর ছাড়তে কষ্ট হবে।

বুড়ি একটু কেঁপে ওঠে, শরীর কি আর ছাড়তে চায় রে!

এত কষ্ট, তবু শরীর ধরে পড়ে আছি। পাপের মন তো, সহজে তাই মরতে দেয় না ভগবান। আরও অনেক ভোগাবে, তবে মারবে।

গোবিন্দ বসে বসে বুড়ির ঘরখানা দেখে। আদপে ঘরই নয়। একটা আব্রু মাত্র। রাতের বেলায়

ছেলেরা ঘরে দোর দিয়ে শোয়। বুড়ি বাইরে বেওয়ারিশ পড়ে থাকে। মানুষ যে কী করে এত হৃদয়হীন হয়।

শ্বশুরবাড়ি থেকে পর পর শাশুড়ির চিঠি এল। কুসুমপুর থেকে যারা নাটাগড়ে আসে তাদের হাত দিয়েই চিঠি পাঠায় শাশুড়ি। একটাই বয়ান। মেয়েকে কবে ঘরে নেবে গোবিন্দ। সংসারে মন দিতে আর ইচ্ছাই হয় না গোবিন্দর। সংসার বড় নিমকহারাম জায়গা। তার ওপর ওই বাপেরই তো মেয়ে, তার আর কতটুকু মায়া দয়া হবে? তার চেয়ে একাবোকা বেশ আছে সে। তার বাড়ির লোক বউ আনার জন্য খুব গঞ্জনা দেয়, বিশেষ করে মা। তবে সে মাথা পাতে না। গড়িমসি করে।

গত সপ্তাহেও গ্যাঁড়াপোতা গিয়ে বুড়িকে দেখে এসেছে গোবিন্দ। মনে হয়েছে, আর বেশিদিন নেই। বুড়ি বালিশের তলা থেকে একখানা তোবড়ানো সোনার আংটি বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, তোর বউকে দিস।

এটা আবার কেন? এ আমি নেব না। আপনার শেষ সম্বল এসব।

চুপ চুপ। গলা তুলতে নেই। আমার যা ছিল সব ওরা নিয়ে নিয়েছে। এটা অতি কষ্টে লুকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সম্বল বলিসনি, এ আমার শত্রু। অভাবের সংসারে গয়না সব অনেক আগেই গাপ হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ গাছা চুড়ি, দুটো ঝুমকো দুল, দুটি মাকড়ি আর তিনটে আংটি ছিল। এইটেই শেষ আংটি। টের পেলেই নিয়ে নেবে। এটা মুক্তির জন্য আমি রেখেছি।

কে রেখেছে কে জানে। তবে বুড়ি যার জন্য রেখেছে তার কাছে যে এই আংটির কোনও দাম হবে না তা গোবিন্দ ভালই জানে। মুক্তি তার বাপের একমাত্র মেয়ে বলে গয়নাগাঁটি মেলাই পেয়েছে। হরপ্রসন্ন নাকি নাতনিকে খুব ভালবাসতেন, বিয়ের গয়না তিনিও কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তি এই তোবড়ানো আংটির আসল দাম বুঝতে চাইবে কি?

কিন্তু গোবিন্দ বোঝে, আংটিটা মাথায় ঠেকিয়ে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে সে বলল, এ আংটির দাম লাখ টাকা।

সে তোর কাছে ভাই। তুই যে সোনার মানুষ।

এত চট করে সার্টিফিকেট দিয়ে বসবেন না। এখনও কিন্তু আপনার নাতনিকে নিয়ে ঘর করা শুরু করিনি। সংসারে পড়লেই কে কেমন বোঝা যায়।

তোদের সংসার কি আমি দেখতে যাব রে? এই যে তুই আমার কাছে আসিস এইতেই তুই সোনার মানুষ। বুড়ো-বুড়িদের কাছে কেউ আসতে চায় না রে ভাই, সারাদিন দুটো কথা কওয়ার লোক পাই না। আজকাল আরও কী হয়েছে জানিস, শুনলে হাসবি। আজকাল রাত বিরেতে বড় ভয় পাই।

কীসের ভয় ঠাকুমা?

দাওয়ার উত্তর দিকে ওই লেবু গাছটা দেখছিস তো!

দেখছি।

ওদিক্‌টায় বেড়া দেয়নি ওরা। নিশুতরাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই কারা যেন সব এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে দেখছে আমাকে।

কারা? চোর ছ্যাঁচড় নয় তো?

না রে ভাই। এ বাড়িতে চোর ছ্যাঁচড়েরও আসবার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় তোর দাদাশ্বশুর আসে, আমার এক ভাসুর, শাশুড়ি আরও সব কারা যেন। তারা কেউ জ্যান্ত মানুষ নয়।

তা হলে ভূত। বলে খুব হাসে গোবিন্দ।

বুড়ি হাসিটাকে গ্রাহ্য না করে বলে, তখন ভাই বড্ড ভয় করে। কত ডাকি ছেলেদের, বউদের, কেউ কোনও সাড়া দেয় না। হাতে পায়ে ধরে বলেছি, ওরে এদিক্‌টাতে একটা বেড়া দিয়ে একটা ঝাঁপের দরজা করে দে। তাও কেউ গ্রাহ্য করে না।

ঠাকুমা, আমি যদি ভাল করে বেড়া দিয়ে ঘরখানা বেঁধে দিই তা হলে কী হয়?

কী জানি ভাই, তাতে বোধহয় আমার ছেলেদের আঁতে লাগবে। তোকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমাকে দিনরাত ঝাঁপা ঝাঁপা করবে। কাজ কী তোর ওসব করতে যাওয়ায়? মাঝে মাঝে যে এসে দেখে যাস সেই আমার ঢের। এখন একটা মানুষ এসে দু'দণ্ড কাছে বসলে এত ভাল লাগে যে মনে হয়

আর কিছু চাই না। কেউ যে আসে না তাতেও দোষ দিই না কাউকে। হেগে মুতে ফেলছি, ঘরে নোংরা পড়ে থাকে, ঘেন্নায় আসে না। হ্যাঁ রে, তোরও ঘেন্না করে, তাই না?

গোবিন্দ মাথা নেড়ে হেসে বলে, আমার ওসব ঘেন্নাপিত্তির বালাই নেই। আমার এক কাকার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। বাহ্যের দ্বার বন্ধ করে ডাক্তাররা পেটের বাঁ পাশে একটা কৌটো লাগিয়ে দিয়েছিল। তাইতে মল জমা হত, নিজে হাতে সেসব পরিষ্কার করেছি। রুগির সেবায় আমার খুব অভ্যাস আছে। আমাদের বাড়িতে কারও অসুখ বিসুখ হলে আমিই সব করি।

তবে কেন তুই সোনার ছেলে নোস বল তো? তোকে দেখেই যে বুকটা জুড়িয়ে যায় আমার।

রুগির সেবা তো নার্সরাও করে। তারাও কি সব সোনার মেয়ে। ওটা কথা নয়, আমার ঘেন্নার ধাতটাই নেই।

একটু কাছে আয়। তোর মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করি।

আশীর্বাদের কোনও দাম আছে কিনা গোবিন্দ জানে না। কিন্তু বুড়ির রোগা হালকা দুখানা হাত যখন তার একরাশ চুলওলা মাথায় থরথর করে কাঁপছিল তখন গোবিন্দর মনে হল, বুড়ির প্রাণটাই যেন হাত বেয়ে আঙুল থেকে চুঁইয়ে তার ভেতরে ঢুকে আসতে চাইছে। আশীর্বাদের যদি কোনও অর্থ হয় তবে এর চেয়ে বেশি আর কী হবে?

সেই তোবড়ানো আংটিটা নিয়ে এসেছিল আজ গোবিন্দ। মুক্তি সেটা হাতে নিয়ে খুশি হল না, কিন্তু অবাক হল, এটা কীসের?

তোমার ঠাকুমা দিয়েছে। আশীর্বাদ।

হঠাৎ এটা দেওয়ার মানে কী?

মানে কিছু নেই। আশীর্বাদের যদি কিছু মানে থাকে তবে এরও মানে আছে।

মুক্তি আংটিটা খুব হেলাভরে একটা দেরাজে রেখে দিয়ে বলে, তুমি বুঝি এখন খুব যাও ও বাড়িতে?

না। মাঝে মাঝে যাই। তুমি বোধহয় কখনওই যাওনি।

সেটা তো আর আমার দোষ নয়। ও বাড়ির সঙ্গে বাবারই সম্পর্ক নেই।

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সম্পর্ক যে কেন থাকে না সেটাই যে আমার মাথায় আসে না।

মুক্তি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে অন্য কথায় চলে গেল।

রাগ গোবিন্দর সাধে হয় না। বুড়িটার লাঞ্ছনা আর অপমান যে একেবারেই অকারণ, কতগুলি নির্মম বেআক্কেলে মানুষের চূড়ান্ত স্বার্থপরতাই যে তার কারণ, এটা ভেবে তার মাথা আগুন হয়ে যায়।

তার শ্বশুর বিষ্ণুপদ বোধহয় গোবিন্দর নীরব রাগ আর ঘেন্না টের পায়, তাই গোবিন্দ এলেই একটু তফাত হয়, লুকোনোর চেষ্টা করে। এমন কী একসঙ্গে খেতে অবধি বসে না।

তার দুই শালি, অর্থাৎ মুক্তির ছোট মামার মেয়েরা বিকেলে আলুকাবলি করবে, খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। নইলে আগেই চলে যেতে পারত গোবিন্দ। শালা ছানু পাগলটাকে মেরে বসায় যাওয়া হয়নি। গোলমালে আলুকাবলিও মুলতুবি রেখে গোবিন্দ রওনা হওয়ার জন্য চুল আঁচড়াতে যখন ঘরে এল তখন শাশুড়ি খুব কাঁচুমাচু মুখে ঘরের দরজায় এসে বললেন, উনি কিন্তু এখনও ফিরলেন না!

কে? কার কথা বলছেন?

তোমার শ্বশুর কখনও তো এত দেরি করেন না। আজ যে কী সব হচ্ছে।

গাঁয়েই কোথাও গেছেন-টেছেন হয়তো।

চারদিকে লোক পাঠিয়েছি। যেখানে যেখানে যান তার কোথাও নেই।

গোবিন্দ ঘড়ি দেখে নিল। বাস ধরবার জন্য মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে। পা চালিয়ে হাঁটলে দশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়। কাজেই খুব দেরি হয়ে যায়নি।

তুমি যাচ্ছ বাবা?

হ্যাঁ। শেষ বাস পাঁচটায়।

আজকাল তো কিছুতেই তোমাকে একটি দিনও আটকে রাখতে পারি না। মুক্তির কী করবে তা কি ভেবেছ? বিয়ের পর তো অনেক দিন হয়ে গেল?

বলেছি তো, আরও কিছুদিন আপনাদের কাছে থাক। তারপর ভেবে দেখব।

ব্যাপারটা তো ভাল দেখাচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে।

আপনার মেয়ের মন এখনও তৈরি হয়নি। আমাদের বেশ বড় পরিবার। মানিয়ে গুছিয়ে চলা খুব সহজ নয়। তাই মন তৈরি হোক।

পাপিয়া খুব সংকোচের সঙ্গে বলে, আসলে বড় আদরে মানুষ তো। অত কাজকর্মের মধ্যে গিয়ে পড়লে খেই হারিয়ে ফেলবে।

গোবিন্দ চিরুনিটা পকেটে গুঁজে রেখে বললে, তা বলে তো আমিও আর ঘর-জামাই থাকতে পারি না।

শাশুড়ি বিবর্ণ মুখে বলে, সে কথা কি বলেছি বাবা?

আপনার মেয়ে আমাকে আলাদা সংসার করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেটা কোনওদিনই সম্ভব না। আমরা মা-বাপকে আস্তাকুঁড়ে ফেলতে শিখিনি।

গোবিন্দর হঠাৎ খেয়াল হল, তার গলা কিন্তু সপ্তমে পৌঁছে গেছে। এবং ভেতরে ভেতরে রাগের একটা ঝড় পাকিয়ে উঠছে। সে লজ্জা পেয়ে হঠাৎ চুপ করল। গুম হয়ে গেল।

তারপর গলা কয়েক পর্দা নামিয়ে এনে বলল, আপনি আর আমাকে চিঠি লিখে আনানোর চেষ্টা করবেন না।

পাপিয়া কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বলল, আলাদা থাকা কি ঘর-জামাই থাকা বাবা?

তার চেয়ে খুব বেশি ভালও নয়। আমার আর সময় নেই। আমি যাচ্ছি।

আমার মনটা ভাল নেই বাবা, কী বলতে হয়তো কী বলেছি। তোমার শ্বশুরকে কিন্তু ঘরজামাই থাকতে আমিই বারণ করতাম। লোভে পড়ে হল, তার প্রায়শ্চিত্ত এখনও করতে হচ্ছে।

কান্না একদম সইতে পারে না গোবিন্দ। কেউ কাঁদলেই—তা সে কপট কান্না হলেও সে কেমন দ্রব হয়ে পড়ে। পাপিয়া দরজার কপাট দুহাতে আঁকড়ে ধরে তাতে মুখ গুঁজে কাঁদছিল।

দ্রব হলেও গোবিন্দ কখনও গলেও যায় না। সে গম্ভীর নিচু গলায় বলে, আপনি কাঁদছেন কেন! কান্নাকাটি দিয়ে তো এ জট খোলা যাবে না।

পাপিয়া তার হেঁচকি মেশানো কান্নার মধ্যেই বলে, তোমরা কি ভাব ওই লোকটা খুব সুখে আছে? একমাত্র বাবা ছাড়া প্রত্যেকে ওকে দিন রাত অপমান অবহেলা করেছে। আমাদের কাছেও সম্মান পায় না। নিতান্ত বেহায়া আর লোভী বলে বিষয় আঁকড়ে পড়ে থাকে।

ওঁর কথা টেনে আনছেন কেন? আমি তো আপনার মেয়ের কথা বলছিলাম।

তুমি তো ওঁকে দু'চোখে দেখতে পারো না। ও সেটা টের পায় বলেই তোমার সামনে আসে না। বোধহয় তুমি আছ বলেই চৌপর দিন কোথায় গিয়ে না খেয়ে বসে আছে।

তা হলে তো আমার না আসাই ভাল।

আমার কপাল! যা বলি তার উল্টো অর্থ হয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম শ্বশুরকে অপছন্দ করো বলেই মুক্তিকেও তুমি সহ্য করতে পারো না।

আমি ওভাবে ভাবিনি। আপনারা যা খুশি হয় ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, চোখের জলটা আমার ওপর না খাটিয়ে আপনার মেয়ের ওপর খাটালে অনেক বেশি কাজ হত।

চোখের জলের কথা বলছ বাবা? আমার চোখের জল ধরে রাখলে এতদিনে সমুদ্র হয়ে যেত। বাকি জীবনটা কাঁদতে কাঁদতেই যাবে। আমি বলি কী, তুমি মুক্তিকে জোর করে নিয়ে যাও।

জোর করে মানে? চুলের মুঠি ধরে নাকি?

দরকার হলে তাই করবে। নিয়ে গিয়ে বাসন মাজাও, কাপড় কাচাও, ঘর মোছাও, লাথি মারো, খুন করো, তবু ওকে নিয়ে যাও।

তার মানে আমরা ওসব করি নাকি? লাথি মারি? খুনও করি?

পাপিয়া অসহায়ের মতো বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একরকম ছুটে পালিয়ে গেল।

একথা ঠিকই যে, গোবিন্দর একটা ক্ষ্যাপাটে রাগ আছে। সেই চরম রাগটা উঠলে তার ভেতরটা শুধু আগুন আর মাথায় মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ হতে থাকে। কিন্তু এই রাগটা আর কারও তত নয়, যতটা

ক্ষতি করে তার নিজের। সে তখন কোনও কাজ করতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, খেতে পারে না। শুধু ভেতরকার নিরুদ্ধ রাগে কাঁপতে থাকে।

সত্যিই হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল তার। একরকম টলতে টলতে মাতালের মতো সে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ ডাইনে রেখে সোজা বাসরাস্তার দিকে হাঁটা দিল।

বাবু! বলি ও জামাইবাবু!

গোবিন্দ দাঁড়াল, পাগলটা না? সে তাকাতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। এখন পাগলটার কাছে কেউ নেই। ফাঁকা চণ্ডীমণ্ডপে একা বসে আছে।

যাবে না যাবে-না করেও গোবিন্দ গেল তার কাছে, কী বলছ?

কৃষ্ণকান্ত এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করে, বন্দোবস্তটা কীরকম হল? এই চণ্ডীমণ্ডপটা কি আমাকে দিয়ে দিলেন ঘরজামাই?

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সে পাত্র পাওনি।

তা হলে কী হবে এখন?

যতদিন পারো থাকবে। দুধটুধ খাওয়াতে পারে কয়েকদিন। গাঁয়ের থেকে চাপ দিলে থেকেও যেতে পারো।

কৃষ্ণকান্ত একটু বিরস মুখে বলে, পাকা কাজ হল না। বড্ড দোটানায় পড়ে গেলুম যে! আপনি তো ঘোড়েল লোক, একটা বুদ্ধি করতে পারেন না?

আমার তত বুদ্ধি নেই।

কৃষ্ণকান্তকে ভাবিত দেখাল। বলল, সুবিধের জায়গা নয়। মজা নেই। বড্ড ভ্যাতভ্যাত করছে।

তাই নাকি? তবে ইচ্ছেটা কী?

এখানে পোষাবে না। আমার বাঁকা নদীর পোলই ভাল। ঘরজামাই যদি চণ্ডীমণ্ডপটা লিখে দিতে তা হলে বেশ হত। এটা বেচে দিয়ে জিলিপি খেতুম।

গোবিন্দ একটু ম্লান হেসে বলে, চলি হে। আমার আর সময় নেই।

একটু দাঁড়ান বাবু। মাজায় বড় ব্যথা, একটু ধরে তুলবেন?

উঠে কোথায় যাবে?

একটু কষ্ট করে আমাকে পোলের কাছে পৌঁছে দিন। সরকার বাহাদুর আমার জন্যই পোলটা বানাল। আমিই দেখিশুনি কিনা।

তাই বুঝি?

খুব মজা হয় সারাদিন। কত রগড় দেখতে পাই।

বলতে বলতে নিজেই উঠে পড়ল কৃষ্ণকান্ত। একটু ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

গোবিন্দ পাঁচটা টাকা তার হাতে দিয়ে বললে, নাও, জিলিপি খেয়ো।

টাকাটা ছেঁড়া জামার পকেটে রেখে নেমে এল কৃষ্ণকান্ত, দূর শালা? এটা একটা বাজে জায়গা, শতরঞ্চি বালিশ কি আমাদের পোষায়? পোলের নীচে দিব্যি থাকি। বাবু, বিড়ি দেবেন একটা।

নেই রে।

বিড়ি ছাড়াও চলে কৃষ্ণকান্তর। বিড়ি পেলেও চলে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে গোবিন্দর পিছু পিছু এগোতে লাগল। গোবিন্দ মাঝে মাঝে তার দিকে ফিরে চাইছে। রাগটা কমে যাচ্ছে তার।

৬

ও কি আমার গু বউমা?

আপনার নয় তো আবার কার? বাড়িটা যে নরক বানিয়ে ফেলেছেন! এখন কে এসব পরিষ্কার করে বলুন তো! হাঁটতে তো একটু আধটু পারেন, আর উঠোনটুকু পেরোলেই তো পায়খানা। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে কে আর কষ্ট করতে যায়, তাই না?

বুড়ি খুব দুশ্চিন্তা মুখ নিয়ে বলে, এ তো মনে হয় বেড়ালটার কাণ্ড বউমা।

বেড়ালের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আপনার ঘরে হাগতে এসেছে। লোক ডেকে পরিষ্কার করাতে পয়সা লাগে, বুঝলেন? ঘরভরা তো আর দাসি চাকর নেই। ছিঃ ছিঃ!

বুড়ি আজকাল বড় ভয় খায়। সারাটা দিন মনে শুধু ভয় আর ভয়। কখন বয়সের দোষে কোন অকাজটা করে ফেলে তার ঠিক কী? এরা কেউ ছাড়বার পাত্রপাত্রী তো নয়। বাক্যে একেবারে পুড়িয়ে দেয়।

বড় নাতনি নাচুনি এসে মাটির হাঁড়ির ভাঙা দুটো চারা আর এক খাবলা ছাই দরজার পাশে রেখে বলল, ও ঠাকমা, গুটা তুলে পিছনের কচুবনে ফেলে দিয়ে এসো।

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এই যে যাই।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বড় বউ পুতুল পাড়া জানান দিয়ে চেঁচাচ্ছে, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু কি নোলা বাবা। এটা দাও, সেটা দাও। গুচ্ছের খাবে আর ঘরদোর নোংরা করবে। সামলাতে যখন পারো না তখন খাওয়া কেন বাপু? কাল এই এককাঁড়ি কলমি শাক গিলল। তখনই বুঝেছিলুম ঠিক পেট ছাড়বে।

বুড়ি মন দিয়ে শুনছিল। গতকাল কলমি শাকই খেয়েছিল বটে। কিন্তু বুড়ির গলায় তত জোর নেই যে পাল্টা চেঁচিয়ে সবাইকে জানাবে, কলমি শাক ছাড়া আর কোনও পদই তাকে দেওয়া হয়নি।

নাচুনি চাপা গলায় বলে, তাড়াতাড়ি করো ঠাকমা, দেরি করলে আরও বকবে।

এই যে যাই।

মাথাটা আজ বশে নেই। কেমন যেন পাক খাচ্ছে। শরীর কিছুতেই খাড়া হতে চায় না। বুড়ি চৌকি থেকে নেমে নোংরাটার সামনে উবু হয়ে বসল। তারপর নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এটা বেড়ালের কাণ্ড নয়, তুই-ই বল তো!

বেড়ালগুলোকে ঢুকতে দাও কেন?

ঢুকবে না কেন বাবা, কোন আগল দিয়ে আটকাব! এ যে খোলা ঘর।

বুড়ি নোংরাটা চেঁছে মাটির সরায় তুলল। কচুবনটা যে কত দূর বলে মনে হয়। খিল ধরা হাঁটু আর টলমলে মাথা নিয়ে অতদূর যাওয়া মানে যেন তেপান্তর পার হওয়া।

মেলা পাপ জমেছে বাবা। পাপের পাহাড়। সব ক্ষয় করে যেতে হবে তো...

উঠোন পেরিয়ে পুকুরের ধারে সেই কচুবন যেন এক অফুরান মরুভূমি। বয়সকালে বুড়ি এই উঠোনেই উদূখলে সর্ষে গুঁড়ো করত, ঢেঁকিঘরে পাড় দিত, পাঁজা পাঁজা বাসন মেজে নিয়ে আসত ঘাট থেকে। সেই শরীরই তো এইটে। সেই উঠোন। কিন্তু আজ আর বনিবনা নেই কারও। শরীরের সঙ্গে না, উঠোনের সঙ্গে না, কচুবনের সঙ্গে না।

ঢেঁকিঘর উঠে গেছে। উদূখল বিদেয় হয়েছে। ঘরবাড়িতে ধরেছে ক্ষয়। দুই বউয়ের তিন সংসার। তারা পালা করে পোষে। না পুষলে পাড়ায় নিন্দে হবে বলেই বোধহয় পোষে। নইলে গু-মুত, মরা ইঁদুর, আবর্জনার মতো তাকেও ফেলে দিত আস্তাকুঁড়ে।

বড় বউ মাঝে মাঝে মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, এখন তো রস মজে বষ্টুমি হয়েছেন, যখন বিয়ে হয়ে নতুন বউ এসেছিলুম তখন কম ঝাল ঝেড়েছেন? উঠতে খোঁটা, বসতে খোঁটা। আর কী মুখ বাবা, কী অন্তরটিপ্পনী। চোখের জলে বিছানা ভিজত আমার। সংসারে একতরফা কিছু হয় না, বুঝলেন! এখন দান উল্টে গেছে।

উঠোনটা পেরোতে পারল কী করে তা জামগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ভেবে পাচ্ছিল না বুড়ি। বুকটা এত ধড়াস ধড়াস কাঁপছে যে, এখনই না আবার মূর্ছা হয়। চোখে এই দিনের আলোতেও কেমন আঁধার ঘনিয়ে এল যে। কুঁজো হয়ে হাঁটার বড় কষ্ট। মাজার ব্যথায় কতকাল সোজা করতে পারেনি শরীরটাকে!

এমন হাঁফ ধরে গেছে যে জামতলার আগাছার মধ্যেই বুড়ি ধপ করে বসে পড়ে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখটা বোজে। হাতে মাটির চারায় নিঘিন্নে মল। তবে বুড়ি আর ঘেন্না পায় না। দিন রাত এসব নিয়ে মাখামাখি, ঘেন্না করবে কাকে?

আজকাল বেশিক্ষণ চোখ বুজে থাকলে একটা ভয় হয়, মরে গেলুম নাকি? ঘুমোনোর সময় মনে হয়, আর যদি না উঠি? মরার পর কেমন সব হবে তার চিন্তাও পেয়ে বসে বুড়িকে। যমদূতরা এসে তো

ধরবে সব গাজি গাজি করে। তারপর টানতে টানতে বৈতরণী পার করাবে। নিয়ে গিয়ে হাজির করবে যমরাজার সামনে। তখনই বুড়ি পড়বে বিপদে। কী জিজ্ঞেস করে না করে কে জানে বাবা। এ দিকে ছেলেরা যে শ্রাদ্ধশান্তিটাও ভাল করে করবে এমন ভরসা হয় না। শ্রাদ্ধশান্তি ঠিকমতো না হলে আত্মাটা বড্ড খাবি খাবে।

বুড়ি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছিল। খানিক অন্ধকার, খানিক আবছায়া, খানিক হিজিবিজি, ঝুলকালি, কী সব যেন চোখের সামনে। মাথায় আজকাল অবাক-অবাক সব চিন্তা আসে, ছবি আসে।

বুড়ি একটু বাদে চোখ খুলে চাইল। চোখের পাতাটা খুলতেও যেন কষ্ট, বাকি পথটা আর দাঁড়ানোর চেষ্টা করল না বুড়ি। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে কচুবনের কাছে এসে নোংরাটা ফেলল।

কতকাল যে স্নান করে না খেয়াল নেই। আজকাল কেউ তো আর চান করিয়ে দেয় না। কুয়ো থেকে জল তুলে চান করবে তার সাধ্যি কী? সামনে পুকুরটা দেখে বড় লোভ হল, একটু ডুব দিয়ে নিলে হয় না?

কিন্তু পারবে কি? তালগাছের বাঁধানো ঘাটে, পা ঠিক রাখা মুশকিল। আর এ পুকুরের ধারেই ডুবজল। বুড়ি ভাবে, সাঁতার তো জানতুম, কিন্তু সে জানা কি আর কাজে দেবে? আজকাল বড় ভয় করে। সব কিছুকে বড় ভয় করে।

বুড়ি বসে আর একটু জিরোলো। গলাটা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। কিন্তু ফিরে তাকালেই আবার তেপান্তরের মাঠ মনে হয় উঠোনটাকে। কত দূরে সব সরে যাচ্ছে! ঘর, মানুষজন, ছেলেমেয়ে। বুড়ি চোখ বোজে। হাজারো স্বপ্নের বৃষ্টি মাথায় ঝরে পড়তে থাকে।

ও ঠাকমা, জঙ্গলে বসে কী করছ তখন থেকে? ও ঠাকমা...

এই একটা মাত্র নাতনি নাচুনিই তার যা একটু খোঁজখবর নেয়। কাছে বেশি আসে না, এলে মা বকবে। তবু একটু টান আছে, একটু মায়া।

বুড়ি কথা বলতে গিয়ে দেখল, গলায় কেন যেন স্বর নেই। কিছুতেই একটাও কথা গলায় তুলে আনতে পারল না বুড়ি।

ও ঠাকমা, অমন করছ কেন? ঘরে যাও।

বুড়ি চোখ বুজে ভাবল, মরে গেছি নাকি? ছেলেরা ঠিকমতো শ্রাদ্ধটা করবে তো! শ্রাদ্ধ করে বড় ছেলে। তা বুড়ির বড় ছেলে হল বিটু। তাকে কি খবরটা ঠিকমতো দেবে এরা? মুখাগ্নি তো সে আর পেরে উঠবে না। অতটা রাস্তা, খবর পেয়ে আসতে আসতে মড়া বাসি হবে। নাঃ, বাঁচাটা যেমন ভাল ছিল না, মরাটাও তেমন ভাল হল না বুড়ির।

ও ঠাকমা?

কাকে ডাকছে ছুঁড়িটা? মরে পড়ে আছি এখানে, দেখতে পায় না নাকি? কানে ঝিঁঝি ডাকছে। হাত পা সব ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বুকখানা যেন পাথর। আর মাথাটা অন্ধকার।

ও ঠাকমা। ঠাকমা গো! ওঠো না। বলে গায়ে ধাক্কা দেয় নাচুনি।

বুড়ি দেখল, না, এখনও মরেনি সে। ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, একখানা কাঁকলাস হাত বাড়িয়ে মাটিতে ভর রাখল।

একটা শ্বাসও পড়ল ফোঁস করে।

ও ঠাকমা! তোমার কী হয়েছে?

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে মুখখানা মায়া ভরে দেখল। কত কাছে, কিন্তু কত দূর! বলল, একটু ধন্দ লেগেছিল রে। এখন ঠিক আছি।

ধরে তুলব তোমায়?

ঘেন্না পাবি না তো!

বাঃ, তোমাকে আবার ঘেন্না কীসের? মা বকবে বলে, নইলে তোমার ঘর তো রোজ আমিই পরিষ্কার করতে পারি।

অত জুড়িয়ে-দেওয়া কথা বলিসনি রে, ওতে মায়া বাড়ে।

এখন আমাকে শক্ত করে ধরো তো! তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নাচুনি ধরে ধরে ঘর অবধি নিয়ে এল। একটা ভেজা ন্যাতা এনে দিল ছুটে গিয়ে, ও ঠাকমা, গুয়ের জায়গাটা লেপে দাও। নইলে বকুনি খাবে।

দিই। বলে বুড়ি উবু হয়ে বসল। মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। মুখাগ্নি কে করবে, শ্রাদ্ধটা হবে কি না, এ সব ভেবে বড্ড উচাটন লাগছে। বিষ্টু যদি সময়মতো খবর না পায়, তা হলে কী হবে? এদের মোটে গা নেই যে!

উঠোনের রোদে বাচ্চারা খেলছে। তারই মধ্যে কে একজন চটি ফটফটিয়ে উঠে এল দাওয়ায়। বুড়ির মেজো ছেলে কৃষ্ণপদ।

আজও ঘরে হেগে ফেলেছ শুনলাম!

বুড়ি সভয়ে চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। এদের মুখচোখের চেহারা মোটেই ভাল নয়। কেমন যেন রাগ-রাগ ভাব। কখন যে বকাঝকা করবে তার কোনও ঠিক নেই।

না বাবা, সে একটা বেড়ালের কাণ্ড।

কৃষ্ণপদ মহা বিরক্ত গলায় বলে, এ বাড়িতে বাস করাই যে কঠিন করে তুললে! এরকম হলে তো মুশকিল দেখছি।

বুড়ির বুক গুড়গুড় করতে থাকে। কী বলবে তা ভেবে পায় না। কথার বড় ফের থাকে। কখন কোন কথাটায় লোকে দোষ ধরে তার কিছু ঠিক নেই।

এরকম চললে আর দাওয়ার কিন্তু জায়গা হবে না। গোয়ালঘরটা খালি পড়ে থাকে, ওটায় গোবর দিয়ে দেব'খন। ওটাতেই থেকো গিয়ে।

বুড়ি তেমনি চেয়ে থাকে। গোয়াল আর এর চেয়ে কি খারাপ হবে? বুড়ি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

কৃষ্ণপদ ঘরে গেল। বুড়ি বিছানায় উঠে একখানা কাঁথা টেনে গায়ে দিয়ে বসল। কখন শীত করে, কখন হাঁসফাঁস করে ভেতরটা তার কিছু ঠিক নেই। আজ কী দিয়ে ভাত দেবে এরা? মুখে বড্ড অরুচি কিন্তু পেটে খিদে থাকে। একটু লেবু হলে দুটি খাওয়া যেত।

বেড়ালটা ঘরে এসে একখানা ডন দিয়ে লাফিয়ে বিছানায় উঠল। রোজই ওঠে। তাড়ালেও যায় না। তা ওঠে উঠুক। একটা প্রাণ তো। কাছাকাছি আর একখানা বুকও ধুকধুক করছে জানলে কেমন যেন একটু ভরসা হয়।

বেড়ালটার দিকে চেয়ে বুড়ি বলে, আজ বড় জ্বালিয়েছিস মুখপুড়ি।

বেড়ালটা চোখ মিটমিট করে ফের কাঁথাখানির মধ্যে আরামে পুঁটুলি পাকিয়ে চোখ বুঝল। বড্ড মায়া।

নাতজামাই পাঁচটা টাকা প্রতিবারই হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। বুড়ি সেই টাকাটা পরে আর খুঁজে পায় না কিছুতেই। বালিশের তলায় না, তোশকের তলায় না, চাদরের তলায় না, আঁচলে বাঁধা না। কাউকে জিজ্ঞেস করা মহাপাপ। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, চুরি করেছি নাকি?

পরশু না কবে যেন এসেছিল নাতজামাই। টাকাটা সেই থেকে খুঁজছে বুড়ি। পাচ্ছে না। পাবে না, জানা কথা। টাকা দিয়ে কিছু করেও উঠতে পারবে না সে। তবে ঘাটখরচার অভাবে গরিবগুরবোরা যেমন মড়া না পুড়িয়ে মুখাগ্নি করে জলে ফেলে দেয় তার বেলাতেও যেন ছেলেরা অমনিধারা না করে তার জন্যই কেষ্ট আর হরির হাতে টাকাগুলো দেওয়ার ইচ্ছে ছিল বুড়ির। হল না। ঘাটখরচাটা পেলে আর মড়া নিয়ে হেলাফেলা করত না।

দুপুরবেলা বুড়ি ঘুমোচ্ছিল, নাচুনি এসে চাপা গলায় ডাকল, ঠাকমা! ও ঠাকমা!

কে রে!

তোমাকে গোয়ালঘরে পার করবে বলে গোয়াল পরিষ্কার হচ্ছে যে! রাখাল ছেলেটা ঝাঁটপাট দিচ্ছে।

বুড়ি নাতনির দিকে চায়, তোর কি তাতে কষ্ট হবে রে ভাই!

গোয়ালে তুমি একা থাকতে পারবে? ভয় করবে না?

যেখানে ফেলে রাখবে সেখানেই পড়ে থাকব মা। আর ক'দিনই বা। কিন্তু তোর কি মনে কষ্ট হবে

তাতে? বল না।

কষ্ট হবে না? গোয়ালঘর সেই কত দূরে! রান্নাঘরের পিছনে। ওখানে আমগাছটায় ভূত থাকে যে। কত ভূত এ বাড়িতে। আমি রোজ দেখি।

বল কী গো!

ওই লেবুতলায়। রোজ নিশুতরাতে ভূত আসে। তোর দাদু, জ্যাঠাদাদু, আরও কত।

ওম্মা গো!

ভয় পাসনি। ভয়ের কী? যখন বুড়ো হবি তখন দেখবি, তুই ভূতের দলেরই হয়ে গেছিস।

গোয়ালঘরে কিন্তু কাঁকড়াবিছে আছে। আর মশা।

সে জানি। আমাকে কম হুল দিয়েছে বিছে? তখন একটা গোরু ছিল, রোজ পরিষ্কার করতে যেতুম তো।

বড় কাকার সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হল দুপুরের খাওয়ার সময়। বাবা গোয়ালঘরের টিন আর খুঁটি বিক্রি করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল, তুমি থাকলে তো আর তা হবে না। তাই রেগে গেছে।

তাই বুঝি? কোন ভাবে যে রাখবে আমাকে তার ঠিক পাচ্ছে না। এ বাড়ি আমার শ্বশুরদের তিন চার পুরুষের ভিটে ছিল। এখনও নিশুত রাতে তারাই আসে। দেখে যায় আমার কেমন হেনস্থা হচ্ছে।

তোমার কান্না পাচ্ছে না ঠাকমা?

কান্না? না, আজকাল আর কেন কান্না আসে না বল তো! চোখে এক ফোঁটা জল নেই। শুধু কেবল সারাদিন ভয়-ভয় করে। কেবল ভয়। আগে তো কত কাঁদতুম! চোখে কত জল ছিল তখন। আজকাল পোড়া চোখে জলও নেই।

নাচুনি চলে যাওয়ার পর বুড়ি ভাবতে বসল, গোয়ালঘর কি এর চেয়ে কিছু খারাপ হবে? না বাবা, গোয়ালঘরই তো ভাল মনে হচ্ছে। অন্তত একটু চোখের আড়াল হয়ে তো থাকতে পারবে। বেড়াগুলো এতদিনে আর বুঝি আস্ত নেই। চালের টিনেও ফুটো ছিল। তা হোক বাবা, বাক্যের বিষ যদি তাতে কিছু কমে।

গোয়ালের কথা ভাবতে ভাবতেই বেলাটা গেল আজ।

নিশুত রাতে রোজই ঘুম ভাঙে। আজও বুড়ি উঠে বসল। মেটে হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করতে বসে খোলা জায়গাটা দিয়ে চোখ গেল, লেবুতলাটার দিকে। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। ভুল দেখছে নাকি? লেবুতলা থেকে একটা ছায়ামূর্তি যে উঠে এল বারান্দায়! এদিকেই আসছে।

বুড়ি বুঝল এবার ডাক এসে গেছে। ওই নিতে এসে গেছে তাকে।

বুড়ি কাঁপা গলায় বলে উঠল, খাবি বাবা যমদূত? খাবি আমায়? দাঁড়া বাবা, এরা সব কী করতে কী করবে তার ঠিক নেই। ও হরি, ও কেষ্ট, তোরা একটু বিষ্টুকে খবর পাঠাবি তো! মুখাগ্নি না হলে যে আত্মা বড় কষ্ট পায়। শ্রাদ্ধও তো সে ছাড়া কেউ করতে পারবে না। বলি ও হরি...

মা।

এ ডাক গত একশো বছরেও যেন শুনতে পায়নি বুড়ি। খানিক হাঁ করে থেকে বলে, ভুল হয়নি তো বাবা! মা বলে ডাকছ!

মা! আমি বিষ্টু।

আবার বোধহয় স্বপ্নই দেখছে। আজকাল হিজিবিজি কত কী দেখে।

কে বললি? সত্যিই বিষ্টু তো!

হ্যাঁ মা।

তোকে ওরা খবর পাঠিয়েছে নাকি? আমি তবে কখন মরলুম বল তো! অনেকক্ষণ মরেছি নাকি? মড়া বাসি হয়নি তো!

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি মরোনি মা। বুড়ো বয়সে ওরকম ভীমরতি হয়।

একটা টর্চের ফোকাস মেরে চারদিকটা দেখে বিষ্ণুপদ বলল, তা হলে এইখানেই থাকতে হচ্ছে আজকাল।

বুড়ি একটু ধাতস্থ হল এইবার। কাঁপা গলায় বলে, ও বিষ্টু, হঠাৎ এই মাঝরাতে এলি কেন বাবা!

খারাপ খবর নেই তো!

না মা। বাসেই তো উঠলুম বিকেলের পর। নাটাগড়ে বাস বদলাতে হল। তার ওপর আবার সেই বাসের চাকা খারাপ হল মাঝরাস্তায়। এই এসে নামলুম।

ও বিষ্টু, কোথায় বসাব তোকে বাবা। এ সব হাগামোতা বিছানা, এখানে তো বসতে পারবি না বাবা। ওদের সব ডেকে তুলি?

না মা। তোমাকে তো ঘরের বার করেছে দেখছি। আমার সঙ্গেই কি আর ভাল ব্যবহার করবে? ওদের কাছে তো আসা নয়, তোমার কাছেই আসা। বিছানাতেই বেশ বসতে পারব।

প্রবৃত্তি হলে তাই বোস বাবা। বুড়ো বয়সে আর কিছু ধরে রাখতে পারি না। বাহ্যে-পেচ্ছাপ হয়ে যায় আপনা থেকেই। কত কথা শুনতে হয় সে জন্য। তা এবার ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। গোয়ালঘরে গিয়ে শান্তিতে থাকব।

এরপর গোয়ালঘরও আছে মা! তোমার ভোগান্তি দেখছি শেষ হয়নি!

টর্চখানা তোর মুখের দিকে একটু তুলে ধর তো! দেখি মুখখানা! কতকাল দেখিনি, ভাল করে মনেও পড়ে না।

এ মুখ কি দেখাতে আছে মা! কত পাপ করেছি।

খুব বুনো হয়ে গেছিস না কি বাবা? কী সুন্দর রাজপুত্তুরের মতো চেহারা ছিল তোর।

ও কথা আর বোলো না মা। শুনলে গা যেন রী-রী করে। শুনলুম, গোবিন্দ তোমার কাছে খুব আসেটাসে।

খুব আসে। সোনার চাঁদ ছেলে। বুক ভরা মায়াদয়া।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, হ্যাঁ মা, খুব ভাল।

বুড়ির একখানা কঙ্কালসার হাত বিষ্ণুপদর পিঠে মাকড়সার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিষ্ণুপদ দু হাতে মুখখানা ঢাকে।

ও বিষ্টু, কথা কইছিস না যে! আমার যে কথা শুনতে বড় ভাল লাগে। নিঃস্সাড়ে পড়ে থেকে কতবার মনে হয়, মরে গেছি বুঝি!

তোমার কাছটিতে যদি বাকি জীবনটা থাকি মা, তা হলে কেমন হয়?

বিশ্বাস হওয়ার মতো কথাই নয়। বুড়ি থরথর করে কেঁপে উঠে বলে, মানিক আমার! সোনা আমার! ভোলাচ্ছিস বুঝি! নইলে ঠিক আমি স্বপ্নই দেখছি।

বিষ্ণুপদ ফিসফিস করে বলে, বড় ইচ্ছে করে মা।

যখন ছোটটি ছিলি, যখন শুধু মায়ের ধন ছিলি, তখন মায়ের বুকেই জায়গা হয়ে যেত। এখন তো কত কী হয়েছিস বাছা। বউয়ের স্বামী, ছেলেপুলের বাবা, জামাইয়ের শ্বশুর। কেমনধারা সব হয়ে যায় বল তো!

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে জ্বেলে ঘরখানা দেখে। কুসুমপুরে তার পাকা ঘরবাড়ি, খেতখামার, টাকা পয়সা। টর্চের আলোয় সে তার সব ঐশ্বর্যের অর্থহীনতা দেখতে পায় যে, একটা কুকুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। এদিকটায় বেড়া নেই, দরজার ঝাঁপ নেই। বিষ্ণুপদ টর্চটা নিবিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মা, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি কাছটিতে বসে থাকি।

ঘুম কি আসে বাবা! কতবার ঘুম ভেঙে উঠে উঠে দেখি। ওই লেবুঝোপের দিকটায় নিশুতরাতে তোর বাবা আসে, জ্যাঠা আসে, আরও কারা সব আসে যেন। ও বিষ্টু, একটু মা বলে ডাক তো!

মা! মাগো! এবার শুয়ে একটু ঘুমোও।

তুই কী করবি? কিছু খাসনি তো! খিদে পায়নি?

না মা। বাস থেকে নেমে হোটেলে খেয়ে নিয়েছি নাটাগড়ে।

তুমি এবার ঘুমোও।

পালাবি না তো ঘুমোলে? ও বিষ্টু!

পালাব না।

আজ বড় ঘুম জড়িয়ে আসে কেন চোখে? বুড়ি ভাল করে বালিশে মাথা না রাখতেই রাজ্যের ঘুম নেমে আসে চোখে। শরীরটা মুড়ে একটুখানি হয়ে বুড়ি আজ ঘুমোয়। বুকটা ঠাণ্ডা লাগে বড়। বিষ্টু এসে গেছে। বুড়ির তবে মুখাগ্নি হবে, শ্রাদ্ধ হবে। যমরাজের কাছে গিয়ে আর হেনস্থা হতে হবে না।

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে দেখতে পেল, তার মায়ের মুখে ব্যথা বেদনার অনেক আঁকিবুকি, গভীর সব রেখা। তবু ঠোঁটে একখানা কী সুন্দর ফোকলা হাসি ফুটে আছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

কাগজের বউ

প্রথম সংস্করণ: ১ বৈশাখ ১৩৮৪
দশম মুদ্রণ: চৈত্র ১৪০৪
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ৮ + ১০২। মূল্য: ২৫.০০
প্রচ্ছদ: বিপুল গুহ
উৎসর্গ: 'রা-স্বা'/শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/শ্রদ্ধাস্পদেষু

ঘুণপোকা
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯
সপ্তম মুদ্রণ ১৯৭৮

সাঝের বেলা
প্রথম সংস্করণ ১৯৮১
মৌসুমী প্রকাশনীর দশ
দিগন্ত সংকলন থেকে উপন্যাসটি এখানে গৃহীত।

ফুলচোর
প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৯
অষ্টম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৫
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

দিন যায়
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৩

নীলু হাজারার হত্যা রহস্য
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ প্রথম পেপার ব্যাক সংস্করণ
জুলাই ১৯৯৭

রক্তের বিষ
প্রথম সংস্করণ ১৩৮৩
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স কলকাতা

জীবন পাত্র
প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯

অসুখের পরে
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯
প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫

ছায়াময়ী
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

ক্ষয়
প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৮০
চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ১৯৯৭
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শিউলির গন্ধ

প্রথম সংস্করণ: ১ বৈশাখ ১৩৯০
ষষ্ঠ মুদ্রণ: আষাঢ় ১৪১৩
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ৬ + ১০২। মূল্য: ৫০.০০
উৎসর্গ: 'রা-স্বা'/শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/শ্রীমতী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়/করকমলেষু

লাল নীল মানুষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯।
পঞ্চম মুদ্রণ: এপ্রিল ১৯৯৬। পৃ [৪] + ১৬০। মূল্য ৩০.০০
প্রচ্ছদ: বিপুল গুহ
উৎসর্গ: 'রা-স্বা'
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ/হাসনে আরা বেগম/ করকমলেষু
প্রথম সংস্করণ: মার্চ ১৯৮০। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সুখ দুঃখ
প্রথম সংস্করণ ১৯৮২
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
কলকাতা-৯

ঘরজামাই। মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯।
প্রথম প্রকাশ: শুভ ১লা বৈশাখ ১৪০০ সন, ইংরাজি ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩। পৃ. ১২০। মূল্য: কুড়ি টাকা।